উপন্যাসসমগ্র
৩

উপন্যাস সমগ্র

৩

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

“রা-স্বা”

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
পাদপদ্মে বিনম্র প্রণামপূর্বক
নিবেদন

নিবেদন

কোনও মানুষের জীবনই বোধহয় সহজ সরল নয়, নদীর মতো বারবার বাঁক খেয়ে খেয়ে অগ্রসর হয়। কিছু ঘটনা তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর কিছু ঘটনা তাকেই নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের ঘটনাগুলিই বারবার আমাকে অপ্রস্তুত করেছে। মজার কথা হল, আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার মন ও মস্তিষ্কই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এমন সব জটিল ও অদ্ভুত চিন্তাজালে আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন থাকে যার কোনও মাথামুণ্ডু বা যৌক্তিক শৃঙ্খলা নেই। সেসব মহতী চিন্তাও নয়, অতি তুচ্ছ অপ্রাসঙ্গিক এবং বিচ্ছিন্ন চিন্তা। চৈত্রের পাগল বাতাসে যেমন কুটোকাটা, কাগজের টুকরো উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমন পরম্পরাহীন, আর এই অসংলগ্ন মন নিয়ে যখন রাস্তাঘাটে হাঁটি তখন আমার নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। অন্যেরা দয়া করেন বলেই আমি এতটা বয়স পেরিয়ে আসতে পেরেছি। ছেলের এই ভাবঘোর অবস্থা দেখে আমার মাও খুব উদ্বেগে থাকতেন। প্রায়ই বলতেন, এই ন্যালাখ্যাপা ছেলেটাকে নিয়েই আমার যত চিন্তা। এই অন্যমনস্কতার সঙ্গে লড়াই আমি কম করিনি। নিজেকে বুঝিয়েছি, বাপু, তুমি যখন কোনও দার্শনিক নও, স্কলার বা পণ্ডিত নও, তেমন ভারভাত্তিক কোনও মাথার কাজ করো না, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অফিসারও নও, তখন মাথাখানা বাজে জিনিসে বোঝাই করে রেখে লাভ কী? তুমি কি পাগল? এই প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা নেই। অল্পবিস্তর পাগল আমরা সবাই। কিন্তু আমার পাগলামিটা কোন স্তরের সেটাই মেপে ওঠা হল না আজও। এসব কথা ঠারেঠোরে আগেও বলেছি। এই পাগলামির কথাটা উঠল একটি উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে। আর সেটি হল 'শূন্যের উদ্যান'। প্রথমে ছোট আকারে কোনও শারদসংখ্যায় বেরিয়েছিল বোধহয়। তারপর বই হয়ে বেরোনোর সময় সেটা খানিকটা বর্ধিত হয়। প্রথম প্রকাশক কে তা সঠিক মনে পড়ে না। তবে পরে অন্যান্য প্রকাশকেরা কয়েকটি মুদ্রণ বের করে। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে লেখা, পোলিও হয়ে যার হাত পা কমজোরি। কোনও পাঠক বা পাঠিকা এই উপন্যাসটি পড়লেই বুঝতে পারবেন এর ছত্রে ছত্রে মাঝে মাঝেই লাগামহীন পাগলাটে ব্যাপার আছে। আশ্চর্যের বিষয়, আমার এই অস্বাভাবিক উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন আমার এক প্রাচীনা বউদি, যার সাহিত্যপাঠের তেমন অভ্যাস ছিল না। তাঁর অকপট এবং অযাচিত সাধুবাদ শুনে আমি বড্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বাস্তবতা ও যুক্তিসিদ্ধতার অভাবে এই উপন্যাসটি কিছু উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, পাঠ করা সুখকর হওয়ার কথা নয়। তবু বলি, 'শূন্যের উদ্যান' লিখে তৃপ্তি না হলেও অপরাধবোধে ভুগিনি।

'রক্তের বিষ' বোধহয় আমার থ্রিলার লেখার প্রথম কাঁচা প্রয়াস। শেষ অবধি থ্রিলার হয়ে ওঠেনি ঠিকই, নানা সম্পর্কের টানা-পোড়েন ও পুনর্বিন্যাসে ঘুরপাক খেয়েছে। বলা যায় হাফ-হার্টেও লেখা, কোথায় পৌঁছেছে তা জানি না। আদৌ কোথাও উত্তরণ ঘটেছে কি না সেটাও বলা মুশকিল। তবে এর মধ্যে আমার একজন গেম টিচারের চরিত্র আছে।

আমার লেখক-বন্ধু বরেন গঙ্গোপাধ্যায় কট্টর বামপন্থী ছিল বটে, কিন্তু হাত দেখে একটা ব্যাপার নির্ভুল বলে দিতে পারত। যেমন সে একবার আমার হাত দেখে বলেছিল, আমি একটা ব্যাপারই বলতে পারি, সেটা হল তোর বাসগৃহ-সমস্যা। তোকে বলে রাখছি, তুই কোনওদিন একটা বাড়িতে

বেশিদিন থাকতে পারবি না। তোকে বারবার বাসা বদলাতে হবে। এমনকী নিজে বাড়ি করলেও সেই বাড়িতে বেশিদিন থাকা হবে না।

আশ্চর্যের বিষয় তার এই চেতাবনী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আমাকে সত্যিই বহুবার বাসস্থান বদল করতে হয়েছে। আর সেটা শুরু হয়েছে প্রায় আমার জন্মলগ্ন থেকে। দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে এবং বাবার বদলির চাকরির জন্য আমাদের বার বার জায়গা আর বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটেছিল। হোস্টেলের জীবনেও বহুবার ঠাঁইনাড়া হয়েছি। বিয়ের পর সংসার পেতেছিলাম বালি স্টেশনের পশ্চিমে মাইলখানেক দূরে সমবায় পল্লিতে ত্রিশ টাকা ভাড়ার একখানা ঘরে। ওই অঞ্চলেই বার তিনেক বাসা বদল করে কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে, যেখানে চারবার বাসা-বদল। মাঝখানে কিছুদিন নাকতলাতেও থাকতে হয়েছে। অবশেষে নিজের ফ্ল্যাট হল যোধপুর পার্কের কাছে রাইস ওস্তাগড় রোডের লালকেল্লায়। সেখানে আঠারো বছর কাটিয়ে ভেবেছিলাম, যাক, এবার বোধহয় থিতু হওয়া গেল। গ্রহদোষ এবং গৃহদোষ কেটেছে। কিন্তু না, ফের আরও একবার ক্রমবর্ধমান আসবাবপত্র এবং গৃহস্থালীর বিপুল সামগ্রী নিয়ে বর্ধিত বয়সে ভিন্ন বাসস্থানে আসতে হল। এটাই শেষ কি না তা এখনও জানি না। ব্যাটা বরেন জ্যোতিষী জানত না বটে, কিন্তু এই একটা ব্যাপার বড় জব্বর বলেছিল, যা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। বরেন অবশ্য অকপটে স্বীকার করেছিল, মানুষের কররেখা দেখে সে শুধু বাসগৃহ-সমস্যার ব্যাপারটা বলে দিতে পারে। আর কিছু নয়।

বাসা বদলের কথাটা বলছি, তার একটা কারণ আছে। কোন বাড়িতে, কোন পরিবেশে এবং কোন অবস্থায় কোন কোন উপন্যাস লিখেছি সেটা মাঝে মাঝে ভেবে দেখলে কিছু সুবিধে হয়। আমার ভুলোমনে স্মৃতিশক্তি কোনও জোরালো আলো ফেলতে পারে না। সেইজন্য অধিকাংশ উপন্যাসের ঘটনাক্রম বা চরিত্রদের নাম মনে থাকে না। এমনকী উপন্যাসের নামও নয়। শুধু ওই বাড়িগুলোর কথা ভাবলে কিছু কিছু স্মৃতি ধরা দেয়। আমার প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' লেখা হয়েছিল পূর্ণ দাস রোডের মেসবাড়িতে। 'পারাপার' লেখা শুরু হয়েছিল বালির সমবায় পল্লির এক ঘরের বাসায়। স্ত্রী আমার প্রথম সন্তান মেয়ের জন্ম দিতে বাপের বাড়ি যাওয়ায় আমি ফের মেসবাড়িতে ফিরে আসি। 'পারাপার' শেষ হয় সেখানে। যাদবপুরের নর্থ রোডের ভাড়াবাড়িতে লিখেছিলাম 'রক্তের বিষ'। 'কাগজের বউ'ও ওখানেই রচনা করেছিলাম।

'কাগজের বউ' আমার মতে একটি মজার উপন্যাস, তবে বেদনাবিধুর মজা। নায়ক উপলের ভিতরে আমার নানা অসাফল্যকে ভরে দিয়েছি। আমার নানা ব্যর্থতা, বোকামি, আমার ধারাবাহিক অপ্রতিভতা, গ্লানি ও অমর্যাদার কথা ভেবে আমি একা একাই হাসি। নিজেকে জীবনে বহুবার আমি নাকচ করেছি, অপছন্দ করি বলে। হ্যাঁ, বাস্তবিকই নিজেকে আমার বেশ অপছন্দ। কিন্তু এই অপছন্দের খোলের মধ্যেই আমাকে বসবাস করতে হয়। 'কাগজের বউ' খানিকটা আমার সেই অপছন্দের প্রকাশ। এই উপন্যাস শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর, জীবনে প্রথম টের পেলাম এটি অনেকেই পড়েছেন এবং পড়েছেন মন দিয়ে। এবং তাঁরা খুব একটা অপছন্দও করেননি। কিছু পিঠ চাপড়ানি এবং বাহবা পাওয়া গেল। এল সিনেমার প্রস্তাবও। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

বলতে গেলে 'কাগজের বউ' আমার প্রথম উপন্যাস যা খানিকটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু যে কারণে 'আশ্চর্য ভ্রমণ' জনপ্রিয় হয়নি সেই একই কারণ 'কাগজের বউ'-এর ক্ষেত্রেও ছিল। তবু 'কাগজের বউ' যে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তার কারণ, পনেরো-ষোলো বছরে পাঠকরুচির পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তন যে আরও একটু বিবর্তিত হয়েছে তা আজকাল আরও বেশি টের পাই।

'লাল নীল মানুষ' আবার একটি জটিল রচনা এবং পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ। প্রয়াসটা কিন্তু মন্দ ছিল না। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের যাজনিক কাজে প্রতি বছরই আমাকে পশ্চিমবঙ্গের বা

অন্যান্য প্রদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর তা করতে গিয়ে গাঁ গঞ্জের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বেশ নিবিড়। এক সময়ে বাগনান হয়ে হাওড়ার এক বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে আমি প্রবল পরিক্রমা করেছি। তখনই গ্রামাঞ্চলের নানা মানুষের সংস্পর্শ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 'লাল নীল মানুষ'-এর ভিতরে তাদেরই কথা। কিন্তু যেমন তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গাঁয়ের মানুষের কথা লিখতেন, তেমনটা তো আমি পারিনি। বা শরৎচন্দ্রের মতোও নয়। আমার দেখা আমার মতো করেই। লেখাও আমার মার্কামারা মুদ্রাদোষে আক্রান্ত। গাঁয়ের গল্প বটে, কিন্তু সহজ সরল গল্প নয়, তাতে ঘাপলা আছে। আমার নিজের কাঠগড়ায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে যখন বিচার করি তখন মনে হয়, গল্প বলার সহজ দক্ষতা হয়তো আমার নেই, আর সেইজন্যই আমার গল্প বা চরিত্র কিছু জটিল হয়ে ওঠে। লক্ষ্যাভিমুখী তীব্র গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে কি না জানি না। পাঠক নিক বা না নিক, 'লাল নীল মানুষ' আজও গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়, এটাই যা আমার পক্ষে আশার কথা।

নর্থ রোডের বাড়িতেই কোনও একটা পূজাসংখ্যায় 'ফজল আলী আসছে' প্রকাশিত হয়। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধার বিরুদ্ধে এক অন্য সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। আর তার চার পাশে আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্ররা। এতে আগাপাশতলা নানা মজার আয়োজন আছে। তবে সেগুলো আমার নিজস্ব রকমের মজা। লোকে তাতে মজা পায় কি না তা বুঝে উঠতে পারি না। বলতে হবে, এই উপন্যাসটি অনাদৃত হয়নি। কিছু আলোচনাও কানে এসেছে। বড় কথা এ যুগের আধুনিক ও প্রাগ্রসর পাঠকও উপন্যাসটির উল্লেখ করে থাকেন।

শুধু প্রশংসা বা সাধুবাদের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা একজন লেখকের উচিত হয় না। অনেক সময়ে প্রশংসা বা গুণগান ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। আসল কথা লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়টা পাঠককে স্পৃষ্ট, অপ্রস্তুত, বিচলিত বা বিস্মিত করেছে কি না। শুধু ভাল লাগানোর জন্য তো লেখা নয়, সৃজনশীল লেখা মানুষকে এই জীবন, এই পৃথিবী, প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা বা সবকিছু সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। আর বারবার পুরোনো পৃথিবী, পুরোনো জীবন, পুরোনো গল্প পুনরাবিষ্কৃত হয়। অবশ্য লেখকের নিজের কাছে তা ঘটলে এবং লেখার ভিতর তা সঠিক ভাষা ও ভঙ্গিতে সঞ্চারিত হলে। লেখকের জীবন তাই নিশ্চিতভাবেই একটু আলাদারকমের হওয়ার দরকার। তার মনোজগতেরও চাই আগ্রাসী গ্রহণক্ষমতা। আর চাই অগাধ পরিশ্রম।

ফজল আলীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং সেটা আমি ঘটনাক্রমে দেখেছিলাম। নাটকের দলটি, মনে হয়েছিল, উপন্যাসটির যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত ছিলেন। ফলে জমাট হয়নি। নাটুকে উপাদানগুলিকেও চয়ন করেননি।

'ক্ষয়' উপন্যাসটি যখন লিখি তখন আমার বয়স চল্লিশের কোঠায়। তৎকালীন যুবক যুবতীরা যেরকম ছিলেন সেরকমই লেখায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। দুটি প্রধান পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল। বলা যায় নানা বিসদৃশ চরিত্রের সংঘাতই এর উপজীব্য। মানুষকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়া কখনও আমার পছন্দের বিষয় ছিল না। তাই এই কাহিনির মধ্যে এক ধরনের উন্মার্গগামিতা আছে, আত্মসমর্পণ নেই। কে কীভাবে এই গ্রন্থটিকে গ্রহণ করবে তা বলা কঠিন। কিছু নাঙ্গা এবং খুল্লামখুল্লা ব্যাপার আছে, যা অনেকের পছন্দ না-ও হতে পারে, আবার কারও সেটাই পছন্দ হয়ে যেতে পারে। আমার নিজস্ব কোনও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই ভাল।

'নীলু হাজরার হত্যারহস্য'-এর নামটি দেখে কিছু বিভ্রান্তি ছড়িয়ে গিয়েছিল এটিকে রহস্য উপন্যাস বলে ধরে নেওয়ায়। রহস্য অবশ্য আছে এবং সেটি উন্মোচিতও হয়নি। বোধহয় তার দরকারও ছিল না। নীলু হাজরা প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসে নেই, কাহিনি শুরু হওয়ার অনেক আগেই সে খুন হয়। কিন্তু তার তীব্র অনুপস্থিতি এই উপন্যাসের প্রাণবীজ। অনেকে এটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে মনে করেন, সেটা অস্বীকার করারও মানে হয় না। তবে আসল কথা হল মানুষ নানা

পরিস্থিতিতে কেমন নিজেকে বদলে ফেলে এবং অন্যরকম হয়ে যায় তারই বিধৃতি এই কাহিনিতে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই গ্রন্থটি খুব একটা অনাদৃত বা অনালোকিত থাকেনি।

তখন নাকতলায় এক বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকি। আমার লেখার টেবিলের পাশেই বড় জানালা, তার নীচে ছোট্ট একটু বাগান, তাতে কয়েকটা ফুলগাছ। শিউলি, টগর এইসব। ভোর ভোর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ফুল তুলে নিয়ে যেত। তাদের সঞ্চার টের পেতাম। তাই থেকেই কিনা কে জানে 'ফুলচোর' উপন্যাসের সূত্রপাত। এটি রোমান্টিক উপন্যাস। শারদসংখ্যায় যখন প্রকাশিত হয় তখন এর শেষটা ছিল বিয়োগান্তক। কিন্তু সেটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। পরে বই বের করার সময় আমি শেষটা একটু পালটে দিই। মিলনান্তিক না হলেও কাহিনির প্রধান চরিত্রটির মৃত্যু অন্তত ঘটতে দিইনি।

'শিউলির গন্ধ'ও রোমান্টিক, তবে এতে একটা হালকা চাল আছে। রঙ্গ রসিকতা আছে, প্রেম তো আছেই। কিন্তু মুশকিল হয়, অনেকেই আমার লেখার সঙ্গে টিউনড হতে পারেন না বলে ভুল বোঝেন। সেটা আমারই দোষ বলেও যদি ধরে নিই, তা হলেও বলব, লেখার মধ্যে একটু-আধটু জটিল প্যাঁচ থাকলেই তা বর্জন করা উচিত নয়। 'শিউলির গন্ধ' অবশ্য বর্জিত হয়নি। সামান্য বিলম্বে নিজের একটু জায়গা করে নিতে পেরেছে বোধহয়।

আমার অন্যান্য লেখার মতো 'ভুল সত্য' একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এক ধরনের জীবন নিয়ে গবেষণাকর্ম।

পূর্ব, উত্তর আর দক্ষিণবঙ্গে পড়ে আছে আমার তিন খণ্ড, বিহার ও অসমে আরও দুই খণ্ড। কারণ এইসব জায়গায় আমার অবিস্মরণীয় বাল্যকৈশোর ছড়িয়ে আছে। আমার জীবনে হরিৎবর্ণের প্রভাবই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কী সবুজের মধ্যেই না কেটেছে আমার সেইসব দিন! গাছপালা আর জলের কাছাকাছি আমি বড় হয়েছি। তাই মাঝে মধ্যেই আমার পটভূমি শহর ছেড়ে ওইসব জায়গাকে আঁকড়ে ধরে। 'ভুল সত্য' উপন্যাস জীবন ও মৃত্যু এবং মৃত্যুর উত্তরণের কথা বলুক না কেন, তার আসল টান উত্তরবঙ্গের অপরূপ শ্যামল স্নিগ্ধ পটভূমির দিকে। দিগিনকে আমি একটু দেখেছি। একটু গড়েছি। দিগিনকে আমি চিনি, বাস্তবে পরাবাস্তবেও। আব এই দিগিনের ব্যথাতুর কথা নিয়েই কোন পত্রিকায় যেন লিখেছিলাম 'ভুল সত্য'। সত্যের ভুল ধরার জন্য নয়। কত সত্য কতবার পালটেছে এ জীবনে তার হিসেব তো নেই। এই উপন্যাস পড়ে কেউ চোখের জল ফেলবে না জানি, কিন্তু দিগিনের কথা ভাবলে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়।

'ছায়াময়ী' নিয়ে আমার তেমন কিছু বলার নেই। উপন্যাসটি কেমন তাও আমার বিচার করার ক্ষমতা নেই। তবে এই উপন্যাসটিতে একজন বিখ্যাত জননেত্রীর প্রসঙ্গ আছে, যা কাল্পনিক নয়। বিষয়টি উল্লেখ করে উপন্যাসের শুরুতে আমি একটি 'মুখবন্ধ' লিখি, যা এই সংকলনের 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে রাখা হয়েছে। মনে পড়ছে শ্রীসুনীল মণ্ডল ছিলেন বইটির প্রকাশক।

লেখক লিখতে পারে, সে তার ইচ্ছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারে না যে, আমার বইটি পড়ুন! সব বই পাঠকের ভাল লাগার জন্য নয়ও। যে যার নিজের পছন্দের লেখককে বেছে নেয়। পাঠকের বিচারও বড় রকমারি। তবু গ্রন্থ রচনার লক্ষ্য শেষ অবধি পাঠকই। তাবড় পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদিত আমার এই উপন্যাসনিচয় কতটা গুরুত্ব পাবে কে জানে।

সূচি

রক্তের বিষ

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা গরম হয়ে যায়।

গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজ-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখারি মেয়ে তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তাব ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার জড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ছুড়ে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিল। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেঁউ কেঁউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যারাজ-ঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে, তরকারির মশলা এখনও পেষা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল-নোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাইতেই সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে-জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এই যে হামানদিস্তায় একটা বিকট টংটং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিয়ো বাজছে, টুকরো-টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল, বাসন-কোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরে নিচু ছাদের একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িঅলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজস্ট্রিট মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালিদের দু'-তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে-পোষে। তার বউ শোভারানি ভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, শিল-নোড়া না থাকে তো বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়, না কি সেটা কারও চোখে পড়ে না। হাড়-হারামজাদা পাড়া-জ্বালানি গু-খেগোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে!

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা ন'টা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারাজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপরতলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন। ভিতর-বাড়ির আরও চার ঘর ভাড়াটের ষোলো-সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকাং হয় যে বছরে ন'মাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে। তাই জলের হিসেব ওই একটা মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা-উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মতো জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরেই অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমনকী তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ, উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়ামশিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভরতে দেয় না। নরেশ মাস আষ্টেক আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল, আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ

তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে চড় তুলে বলেছিল, এক থাপ্পড়ে তিন ঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন দুঃখে! ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ওই অখাদ্য কেউ খায়? তা ছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরও কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি নেই।

গ্যারাজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাদলা শুরু হবে। ঠান্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রু কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নিচু, রাস্তার সমান-সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘত-খানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাং এবং কখনও-সখনও ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সে-সব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত ঘেন্না। দুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জ্বেলে চৌকিতে বসে সাহেবি কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষাকালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশি হয় না।

এখনও হল না। কিন্তু আবার বর্ষা-বৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলিতে বৃষ্টি যেমন তার না-পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গাঁয়ে তার যে অল্প কিছু জমিজিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মন ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহদ্দি ফুঁড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন এক সময় খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশি নাচিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায়-ঘাটে মানুষ দু'পলক ফিরে দেখে। সুরেন গুন্ডামি করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরির ব্যাবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মতো ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে।

বলল, কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধারে। এবার গন্ধ ছাড়বে।

গম্ভীর গগন বলল, হুঁ।

ছোকরাটা কে তা এখনও পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?

না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর বসল। বলল, প্রথমে শুনেছিলাম খুন। গিয়ে দেখি তা নয়। কোনওখানে চোট-ফোট নেই। রাতের শেষ ডাউন গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো-আঠারো হবে বয়স। বেশ ভাল পোশাক-টোশাক পরা, বড় চুল, জুলপি, গোঁপ সব আছে।

হুঁ।— গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়া চাপিয়ে জিরে-ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যান্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল, বড্ড গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

হবে।— গগন বলে, হলে আর তোমার কী! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর বসে থাকবে।

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মতন ব্যবহার করতে

লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, তোমার ঘরে গরম বড় বেশি, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কী করে?

প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন-তখন ঢালাই হয়ে যাবে। এক বার ধরে পড়ো না, নীচের তলাকার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে সস্তায়।

গগন ভাতের ফেন-গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল, তা বললে বোধহয় দেয়। ওর বউ শোভারানি খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

একদিন উঠে গিয়ে ঝাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলল, ফুঁঃ! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বউ মানুষ।

বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান দেওয়ার জন্যই বলে, দিক না একটু গালমন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগি আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাব জানো তো, যা বলবে তার উলটোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দু'জনেরই। শোভারানির অবশ্য কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোনও বাচ্চা বুঝি স্কিপিং করছে, তারই ঢিপ ঢিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িঅলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়লেই সে অন্য কোনও বখেড়ায় না গিয়ে বউ শোভারানিকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আঁস্তাকুড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশে আঁস্তাকুড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সে-বাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গতজন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারানি অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মতো যাতায়াত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না-করা খাবার পাঠায়, দায়ে-দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ওইভাবেই তাদের সংসারেব হাল-চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না দুটো-চারটে গোপন ব্যাপার আছে! সেই সব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মতো শোভার ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মতো কিছু রং-পালিশ করে এবং আরও কিছু বানানো কথা যোগ করে শোভা দিন-রাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে, এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশি কলজেব জোর দেখতে পাই!

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। যেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারানি একনাগাড়ে ঘণ্টা আষ্টেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যত রকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সবচেয়ে মারকুট্টা যে চেলা আছে গগনের দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারানির মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা তো আর যায়নি। বিশেষত গগন তখনও ইচ্ছেমতো জল তোলে, কলে কোনও দিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ওই বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন!

কী ভাবছ?

এখনও নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

ছেলেটা এখানকার নয় বোধহয়। সারাদিনে কম করে দু'-চারশো লোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

এসেছিল বোধহয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং ট্যানিং-এর ওদিককার হতে পারে।

সুরেন মাথা নেড়ে বলল, বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরত করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে, ভাল শরীর?

বেশ ভাল। তৈরি।

আহা!— বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে, অমন শরীর নষ্ট করল?

সুরেন খাঁড়া বলে, তাও তো এখনও চোখে দেখোনি, আহা-উহু করতে লাগলে।

ও সব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়। গত মাঘ মাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই-খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম কলেজের প্রথম বছরের মেয়ে একটা। সে দেওয়ালির দিন সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ওইসব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস, বুঝলে সুরেন? ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। ভিড়-টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কী মরি মরি রূপ, কচি, ফরসা! ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল!

সুরেন খাঁড়া বলে, ও রকম কত মরছে রোজ!

গগনচাঁদ ব্যাপারটা 'কত'-র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল, না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কি না তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতে মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে!

সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার শরীরটাই হোঁতকা, মন বড্ড নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিকতে পারবে? চারদিকের এত অপঘাত, মৃত্যু, অভাব— এ সব সইতে হবে না?

গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে, তোমাদের এক-এক সময়ে এক-এক রকমের কথা। কখনও বলছ গগনের মন নরম, কখনও বলছ গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাওর পাও না নাকি!

সুরেন বলে, সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।

ভাবছ কেন?

ভাবছি ছেলেটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কসরত করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কি না তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি!

গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুঁয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল, ও, তাই আগমন হয়েছে!

তাই।

কিন্তু ভাই, ও সব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।

খেয়ে নিয়েই চলো, আমি ততক্ষণ বসি।

গগন মাথা নেড়ে বলে, তা-ও হয় না, খাওয়ার পর ও সব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।

সুরেন বলে, তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নার দৃশ্য কিছু নয়, কাটা-ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।

গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল, কার না কার বেওয়ারিশ লাশ! তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? ছেড়ে দাও, পুলিশ যা করার করবে।

সুরেন ভ্রু কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল, সে তো মুখ্যুও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ, খুন। তা সে যা-ই হোক, ছেলেটাকে চেনা গেলে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিশ কত কী করবে তা তো জানি!

সুরেন এ অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ-সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা পাঁচেক জিমনাশিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবিশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মতো সে এখানকার শিকড়-গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানেই, এ অঞ্চলে যা ঘটে সব তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। খেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যান্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পলজোড়া পায়ে দিয়ে বলল, চলো।

খেলে না?

না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

দুই

গতবার সন্তু একটা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। বেড়ালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝে মাঝে দু'-একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোট বোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধরের ভয় দেখিয়ে দুধের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশ মিনিট ধরে আগড়ম বাগড়ম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠান্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেড়ালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। এক সময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই সে গেলাস কাত করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এ রকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত আরও কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কী করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিকঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমোনোর ভান করত, আর সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত মা-মাসিদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কি হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসি ঠিক বাঘের মতোই অ্যাও করে উঠত। দেখা গেছে মা-মাসির হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধেনি, দুধের ডেকচিও সে ওলটাতে জানত মা-মাসির হাতের নাগালে গিয়ে। ও রকম বাঁদর বিড়াল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি দাঁতে নখে ইঁদুরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাগানটার একাধিক হেলে আর জাতি সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহিদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক

আঁচড়-কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়া-কামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, সমঝে চলত তাকে। রাস্তা-ঘাটে বেড়াল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন বোধহয় রায়েদের বুড়ি মা-ই হবে, বেড়ালটার নাম দিয়েছিল গুন্ডা। সেই নামই হয়ে গেল। হুলো গুন্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেতে, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু'-একটা স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবি স্কুল, খুব আদব-কায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভরতি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেকটর জানালেন, আপনার ছেলে মেন্টালি ডিরেঞ্জড। আপনারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দু'মাস ট্রায়ালে রাখব, যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টিসি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ তাঁর মনে বরাবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু ছিল বেশি নিষ্ঠুর, কখনও কখনও মার খেলে হেসে ফেলে। এবং এমন সব দুষ্টুমি করে যার কোনও মানে হয় না। যেমন সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা-দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোক চলে। একবার একটা সন্তুর বয়সি ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘ দিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরদ্গব হয়ে গেছে। যেমন সে একবার সেফটি-পিন দিয়ে টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে লাল অশ্রুর মতো। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কী অমানুষিক চিৎকার! খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোট বোনকে বারান্দার এক ধারে দাঁড় করিয়ে জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভাল করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না-গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দু'মাস পর ঠিক কথামতোই টিসি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভাল নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দু'মাস পর সেখান থেকে চিঠি এল— আপনার ছেলে পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেন্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টিসি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভরতি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরী। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরিব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষত সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরীকে এখন সন্তুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। তাতে শরীরের পেশি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে, ও সব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি হ্যান্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার-এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাপড় মারবে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাশিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু'-চারজন চাকুরে ব্যায়ামপ্রীর এসে

কসরত করে আর নিজেদের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুন্ডা বেড়ালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহীদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই। কোমর-সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহু দূর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহীদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক আগে বুড়ো নীলমাধব সিং মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকরবাকরের মতো, হেঁটো ধুতি. গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে-ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিয়োপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিস এনে রান্না করে খেতেন। বাগানে কাশীর পেয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা-কাচ্চা কেউ ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজি, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়ি-বাঁধা হয়ে চরে বেড়াত। নীলমাধব পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না তবে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশি হতেন, অনেক পুরনো দিনের গল্প ফেঁদে বসতেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাণ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পায়। লোকের ধারণা, নীলমাধব তার স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব, কোনও প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হাতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

চিরকালই জীবন্ত কোনও কিছু দেখলেই তাকে উত্ত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যা-ই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখত। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর—মহীদা, গাড়ি আসছে...এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত। এবং মহী কয়েক বারই এভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এ রকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহীদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত, সিংহীদের বাগানের ঘর-দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত-টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলতি মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের কাজল-টানা চোখ। কখনও বা গাছের মতো দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহিন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দূরবিন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দূরবিন দিয়ে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তাঁর জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতোই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চার দিক রোদে খাঁ খাঁ করছে সিংহীবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়। শিরিষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনও পুরোপুরি আসেনি। চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও

ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। এক দিক থেকে কুকুরটা, অন্য ধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন? মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জন্তুটা ঘাসজঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর খাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ আসছে নাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন, ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোনও কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারী লজ্জা পেয়েছিল সন্তু দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ওইরকমই ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সব শেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো, দড়ির নীচের দিকে ফাঁস, অন্য প্রান্তটা সিলিং-এর আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন, তোমার ফাঁসি হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনেটুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসি হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাঁস পরে টুলের ওপর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্য প্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই এক ঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর। নীলমাধবের পূর্বপুরুষ কীভাবে বাঘ ভালুক এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনি! শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভারী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, এক ঘণ্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটা কয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন, ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে কেটে পড়ে চাকরটা। নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেড়ালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেড়াল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেড়ালের চেয়ে অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, গুন্ডামি কোনওটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেড়ালটায় ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কী করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শিগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুন্ডা বেড়ালকে সিংহীদের বাগানে তক্কে তক্কে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেড়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়াবাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকতেই ফাঁসির হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করেনি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মতো লাগিয়ে বেড়ালটাকে অন্য প্রান্তে বেঁধে সে বলল, তোমার ফাঁসি হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এ সময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল, না, হবে না!

চমকে উঠে চার দিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে নিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুন্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চার

দিকে চেয়ে দেখছিল, এ সময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোনও কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন পেয়ে সিংহীদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন সাতেক সন্তু ব্রেন-ফিবারে ভোগে। তারপর ভাল হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুন্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায়নি। একটা বেড়ালের কথা কে-ই বা মনে রাখে!

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষে তার একজন শুভাকাঙক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তাব শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। ঘটনার পব নানক চৌধুরী থানা-পুলিশ করেনি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। সন্তুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। এমনকী কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করবার চেষ্টা করেনি। নানক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি আর নগদ টাকা আছে। বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সম্পত্তি পেয়েছে কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালি, অর্থাৎ সন্তুর মাসির ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান-সম্ভাবনা নেই। সেই শালি সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মাসি যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো একদিন সন্তুই পাবে। মাসি সন্তুকে বড় ভালবাসে। সন্তুও জানে একমাত্র মাসি ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালবাসে না। যেমন মা। মা কোনও দিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোটবোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া সন্তুর অস্তিত্বই নেই তার কাছে। লোকটা সারা দিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী-সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমত সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশি বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে কাউকেই খুব একটা ভালবাসতে পারে না। তৃতীয়ত, সে যে ধরনের দুষ্টুমি করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একা। দু'-চারজন সঙ্গী তার কাছে আসে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধেবেলা কিন্তু জিমনাশিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশি নয়। সন্তুদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরও কারবার আছে। স্টেশনে, বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি-ছিনতাই করে। কখনও ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজি করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনও ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দু'জনে দু'জনকে 'কী রে, কেমন আছিস রে' বলে।

কাল কালু একটু অন্য রকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাডল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখ দুটো চকচকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল, উঠে পড়।

সন্তু ভ্রু কুঁচকে বলল, কোথায় যাব?

ওঠ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে এক জায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল, আয়।

তারপর খানিক দূর তারা নির্জনে পথহীন জমি ভেঙে রেল লাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তার দাগ। আর-একটু দূরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল, এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে!
ছেলেটা কে?
চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।
কে?
কালু খুব ওস্তাদি হেসে বলল, যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন?

তিন

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেল লাইনের ওপর উঠে এল। এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জ্বেলে চারিদিকে ফেলে বলল, হল কী? এইখানেই তো ছিল!

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছা। বলতে কী রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল, নেই?

দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিশ এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিটঠি পাথরের স্তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে, তুই এখানে কী করছিস?

হাওয়া খাচ্ছি।— কালু উদাস উত্তর দেয়।

কখন নিয়ে গেল?

একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

পুলিশ কিছু বলল?— সুরেন জিজ্ঞেস করে।

ফের টর্চটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মতো, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশি মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে, পুলিশ কিছু বলেনি। পুলিশ কখনও কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

কী জানিস?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে, সব জানি।

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে, হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে, যা পাই খেয়ে দিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

ইঃ, মস্ত ফিলজফার!

কালু ফের মাতাল গলায় হাসে।

পুলিশকে তুই কিছু বলেছিস?— সুরেন জিজ্ঞেস করে।

না। আমাকে কিছু তো জিজ্ঞেস করেনি। বলতে যাব কোন দুঃখে?

জিজ্ঞেস করলে কী বলতিস?

কী জানি!

শালা মাতাল!— সুরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে, জাতে মাতাল হলে কী হয়, তালে ঠিক আছে সব। সব জানি।

ছেলেটা কে জানিস?

আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

কে?

বলব কেন? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

খুন!— একটু অবাক হয় সুরেন, খুন কী রে? সবাই বলছে রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে!

মাথা নেড়ে কালু বলে, সন্ধের আগে এইখানে খুন হয়। আমি নিজে চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডান্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখেছি।

কে মারল?

বলব কেন? পাঁচশো টাকা পেলে বলব!

পুলিশ যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বার করবে তখন কী করবি?

বলব না। যে খুন করেছে সে পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

ঠিক জানিস তুই?

জানাজানি কী! দেখেছি।

বলবি না?

না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলেনি। এইখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল, খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

আমার বিপদ আবার কী! আমি তো কিছু করিনি।— কালু বলল।

দেখেছিস তো!— সুরেন খাঁড়া বলে।

দেখলে কী?

দেখলে বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই।— সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে, তা হলে দেখিনি।

শালা মাতাল!— সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু একটু কর্কশ স্বরে বলে, বারবার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা-হুজ্জত করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কালু এক বার 'আউ' করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল। আলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না তবে সে-ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমেলো। বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। বলে, শালা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কাতর শব্দটা থেমে যায়।

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কী হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে। বলে, শালা জোর লেগেছে। রক্ত পড়ছে।

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কালু লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা রেল লাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে-কোনও মুহূর্তে ওর ডান হাতটা দু' ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহু দূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মতো একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিছু ধীর-স্থির। টপ করে কোনও কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমনকী ভাবনা-চিন্তাতেও সে বড় ধীর। কখন কী করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই সে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কী করতে হবে তাও ভাবল! এভাবে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরে-সুস্থে পাথরের স্তূপটা পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নিচু হয়ে পাঁজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে। একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁষে। এখানে ঘাসজমি কিছু পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল মুষলধারে বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চার দিকে। সব অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে এক রকম তাপ উঠেও চার দিকে অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল, ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চলো।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল, জ্ঞান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সুরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালুর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

সুরেনের গলায় এখনও রাগ। বলল, পড়ে থাক। অনেক দিন শালার খুব বাড় দেখছি। চলো, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনচাঁদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর-একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি ফুঁড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে এত তোড়। কোনও মানুষই দাঁড়াতে পারে না। চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, দেরি কোরো না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোঁপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল, ওঠ!

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না-হওয়া বাড়ি! ভাড়া বাঁধা হয়েছে। একতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেখানেই নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল, শরীরে কি কিছু আছে নাকি! মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল, তোর রিকশা কোথায়?
সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।
কেন?
মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।
গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।
গগন বললে, যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয়?
কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসে ছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না।
তারপর বলল, বিড়ি-টিড়ি আছে?
আমি তো খাই না।
কালু ট্যাঁক হাতড়ে বলল, আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে।
ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে, সুরেন শালার খুব তেল হয়েছে গগনদা, জানলে?
গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।
গগন বলল, ছেলেটা কি এখানকার?
কোন ছেলেটা?
যে খুন হল?
সে-সব বলতে পারব না।
কেন?
বলা বারণ।— কালু উদাস গলায় বলে।
গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল, শোন একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেল লাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময় গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।
কালু নড়ল না। কেবল বলল, মাইরি।
তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?
কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত! তা যেত তো যেত। এক-আধটা হাত-পা গেলেই কী থাকলেই কী!
গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল, দূর ব্যাটা, হাত-কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তা হলে! রিকশা চালাত কে?
চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভাল, জানলে গগনদা। তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।
কথাটা বলবি না তা হলে?
কালু একটু চুপ করে থেকে বলল, পাঁচটা টাকা দাও।
গগন একটু অবাক হয়ে বলে, টাকা! টাকা কেন?
নইলে বলব না।
গগন একটু হেসে বলে, খুব টাকা চিনেছিস! কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিশের কাছে গেলেই জানা যায়।
তাই যাও না।
গগনেরও ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে সে কথা মনে করে গগন খুশিই হল। বলল টাকা অত সস্তা নয়।

অনেকের কাছে সস্তা।
গগন মাথা নেড়ে বলে, তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামি।
কালু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, দিয়ো না।
গগন একটু ভেবে বলে, কিন্তু যদি পুলিশকে বলে দিই?
কী বলবে?
বলব খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস!
বলো গে না, কে আটকাচ্ছে?
পুলিশ নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে!
দিক।— কালু নির্বিকারভাবে বলে, এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড়ো তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছ, তোমাদের এত খতেনে দরকার কী?
গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায়-আসে না। কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কী? সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না। যে মরল সে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। বিশেষত যখন শুনেছে যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরত করা। ভাল শরীরওয়ালা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত কষ্টে এক-একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা-ছেঁড়া হয়ে যাবে! ভাবতে কেমন লাগে?
বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনও অবিরল পড়ছে। আধখ্যাঁচড়া বাড়িটার জানালা-দরজার পাল্লা বসেনি, ফাঁক-ফোকরগুলি দিয়ে জলকণা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার-ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা এক বার ঘুরিয়ে ফেলল গগনচাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। একহাতে বাজারের থলি। গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের দরজায় টিনের অস্থায়ী ঝাঁপ লাগানো। লোকটা ঝাঁপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।
কালু উঠে বলল, দেখি, লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কি না, বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে!
কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল, সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা? চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, বিড়ি টানতে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন. তাই গা-গতরে খাসি, আমাদের মতো রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।
গগন গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ।
হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধহয় কালুর মেজাজটা ভাল হয়ে গেল। বলল, যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা!
গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাবসাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল, চিনি?
হুঁ।
কে রে?
এক বান্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো? আর একটা ম্যাচিস?
গগন হেসে বলে, খবরটার জন্য দেব না।
দিয়ো মাইরি।— কালু মিনতি করে, আজকের রোজগারটা এমনিতেই গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।
গগন বলল, দেব।

কালু বলল, আগে দাও।
গগন দিল।
কালু বলে, ছেলেটা বেগমের ছেলে।
বেগম কে?
তোমার বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের শালি। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজি নগরে থাকে।
ও।— বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।
ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে, ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।
জানি। এ সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে, আর কী জানিস?
তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজি বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।
ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।
ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়! প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে-ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেককে নেশা ধরিয়েছে।
ড্রাগ নাকি?— গগন জিজ্ঞেস করে।
কী জানি কী! শুনেছি খুব সাংঘাতিক নেশা হয়।
গগন বলল, এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো, ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?
কালু হেসে বলল, দিনমানে আসত না। রাতে আসত। তা ছাড়া অনেক দিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে! আর চিনতে চায় ক'জন বলো! সবাই চিনি না চিনি না বলে এড়িয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট তো।
নরেশ মজুমদার খবর করেনি?
কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো। বোধহয় খুব ভাল করে খবর পায়নি।
বৃষ্টি ধরে এল। এখনও টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের ঝেঁপে আসবে হয়তো।
গগন গলা নামিয়ে বলল, সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? না কি গুল ঝাড়ছিস?
কালু হাতের একটা ঝাপট মেরে বলে, শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কী! আমার মাথায় অত গল্প খেলে না!
ছেলেটাকে তুই চিনলি কী করে?— গগন জিজ্ঞেস করে।
কোন ছেলেটাকে?
যে খুন হয়েছে, ফলি।
প্রথমটায় চিনতে পারিনি। এক কেতরে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, একটু চেনা-চেনা লাগছিল বটে। পুলিশ যখন ধাঙড় এনে বডি চিত করল তখনই চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারিনি তখনও। পুলিশের একটা লোকই তখন বলল, এ তো ফলি, অ্যাবসকন্ডার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা-ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।
গগন খুব ভেবে বলল, খুনের ব্যাপারটাও মনে না-রাখলে ভাল করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস, তা হলে তোকে ধরবে!
ধরুক না। তাই তো চাইছি। পাঁচ কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনির কাছে খবর পৌঁছয়!
পৌঁছলে কী হবে?
পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে, আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে, সাবধানে থাকিস।

কালু বলল, ফলিকে তুমি চিনতে পারলে?

গগন মাথা নেড়ে বলে, চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভাল শরীর হত।

শরীর!— বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে কালু। বলে, শরীর দিয়ে কী হয় গগনদা? অত বড় চেহারা নিয়েও তো কিছু করতে পারল না। এক ঘা ডান্ডা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে...ফুঃ!

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারানির বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কী যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনও চমৎকার যুবতীর মতো। শোনা যায় স্বামী আছে। কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধেবেলায় আড্ডা বসায়, তাসটাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে বলে, ওইটেই বেগমের আসল ব্যাবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফুর্তির ব্যাবসা করে। তা বেগম থাকেও ভাল। দামি জামা-কাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকর-বাকর, দাস-দাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড বিলিতি গাড়িও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করেনি। তার যা ব্যবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের জায়গা মতো নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারওরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভাল ইস্কুলে ভরতি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভরতি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে, যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এ সব ছেলে অল্প কসরত করলেই শরীরের গুপ্ত এবং অপুষ্ট পেশিগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড় আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। এক নজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল, যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধহয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি-হ্যান্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেডস আর হাফপ্যান্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফ্রি-হ্যান্ড। ফলি খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতেই তাকে অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরে কোনও পেশি শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয়, কসরত করা ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা লেখাপড়ার দিকে খাঁকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সে রকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খরবুদ্ধি ছিল তার।

শোভারানি অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে, ওই গুন্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুন্ডা তৈরি হবে। কেন তুমি ওকে ওই গুন্ডার কাছে দিয়েছ?

ফলির শরীর সদ্য তৈরি হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোলো! বিশাল সুন্দর দেখনসই চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই সময়ে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুনশিবাড়ির বড় মেয়ে, যাকে স্বামী নেয় না, বয়সেও সে ফলির চেয়ে অন্তত চোদ্দো বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির ছোট বউ, সে বাড়ির ধুমসি মেয়ে, এ রকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফক্কিকারি বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলের সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এই ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কামবোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সেসবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারা দিন ধরে মেলামেশা এবং মেয়ে-শরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলেনি গগন। কিন্তু অবশেষে সেন্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারেনি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসি আর মেসোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দু'জনে এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে, ফলি মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে, ফলিকে আড়ংধোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিশের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতাও রাখে না। সে মাত্র ব্যায়াম-শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল তখনও। কারণ গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালবাসত। আর ভালবাসা জিনিসটা কে না টের পায়! কিন্তু ফলিরও কিছু ছিল না! মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে কী-ই বা করতে পারে! যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এ সব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারানি গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যেসব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায়নি। কেননা সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লোকে বলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময়বোধ করছিল যে, ফলির মতো বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ শনাক্ত করতে পারল না! ঠিক কথা যে, ফলি বহু দিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষত সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওয়ালা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে। গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধূমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল, কী হল?

গগন কিছু বিস্মিতভাবেই বলে, তুমি ফলিকে চিনতে পারোনি?

ফলি! কোন ফলি? কার কথা বলছ?

যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালির ছেলে।

সুরেন এ.টু চুপ করে থেকে বলে, বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা?

সে-ই। তোমার তো চেনা উচিত ছিল। তা ছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে, ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ-কুড়ি বা কিছু বেশিই হতে পারে।

সুরেন গম্ভীরভাবে বলল, চেনা কি সোজা? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপি, তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা-চেনা ঠেকছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কী করে!

কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি-দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে।

সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল, ব্যাটা বেঁচে আছে এখনও? থাপ্পড়টা তা হলে তেমন লাগেনি।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয়নি সুরেন। ওরা সব ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, জীবনশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ করে গাঁজা টেনে রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থাপ্পড়ে মরবে? এত সোজা নাকি! ওদের বেড়ালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে, তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাক গে, কালু মরেনি। এখন দিব্যি উঠে বসেছে।

ভাল। মরলে ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দু'জনে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল। কেউ কোনও কথা বলছে না।

চার

সন্তু একবার উঁকি মেরে তার বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নানক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কী করে ঠিক নেই। এই হয়তো আধ হাত দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবু নানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক, তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাতরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশি সাংঘাতিক।

সন্তু পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিল ল্যাম্পের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর চৌধুরীর বড়সড় অন্ধকার ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এ সময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল, সন্তু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খাই যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি, তো আমাকেও ফুটিয়ে দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহীদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল, কাল কেন? আজই বল না!

কালু মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়। আমি আগে ভেবে-টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠান্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল, কত টাকা পাবি বললি?

পাঁচশো। তাতে ক'দিন ফুর্তি করা যাবে। রিকশা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সবজির দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল, পাঁচশো কেন? তুই এক হাজারও চাইতে পারিস।

দেবে না।

দেবে। খুনের কেস হলে আরও বেশি চাওয়া যায়।

দূর!— কালু ঠোঁট উলটে বলে, বেশি লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। ক'জনকে ধরছে পুলিশ! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মতো। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভাল ঘুমোয়নি। বলতে কী সে কাল থেকে একটু অন্য রকম বোধ করছে। খুন সে কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়াল-ঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নানক চৌধুরী ব্যায়ামবীর বা গুন্ডা-ষণ্ডাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আটকাবে কেন?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ংকর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা দুই সেল টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহীদের বাড়ির বাগান ভাল জায়গা নয়। পোড়োবাড়ির মতো পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আড্ডা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জ্বেলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুমে বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূরে চলে আসে। সিংহীদের পাঁচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে কি না দেখবার জন্য এধার-ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরিষ গাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। দু'বার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে। না, কালু এখনও আসেনি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুলকোনিতে জ্বালা ধরে যায়। সন্তু দু'-চারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনও আসছে না।

চার দিক ভয়ংকর নির্জন আর নিস্তব্ধ। ওই প্রকাণ্ড পুরনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু গুন্ডাকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ো। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশি নয়, একটা বেশ ভাল জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভাল প্যান্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপি আর গোঁফ ছিল। ওইরকম বড় চুল আর জুলপি রাখার সাধ সন্তুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা নানক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে এক বার পপুলার সেলুন ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা স্ক্র-কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কী যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না সন্তু, তবে মনে হচ্ছে অলক্ষে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো-বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এখুনি জোর শব্দে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে শব্দ ওঠে। সন্তু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধরের সেই সড়ালে কুকুরটা যেমন জঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্তু কেবল প্যান্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত-পা ঠান্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, তবু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিকশার বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ংকর টলতে টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু টর্চটা জ্বেলে বলে, কালু, এদিকে।

কোন শালা রে।— কালু চেঁচাল।

আমি সন্তু।

কোন সন্তু?— বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে কালুর হাত ধরে বলে, আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে, ওঃ, সন্তু!

হ্যাঁ।

আয়।

বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়ো বাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে, আজ বেদম খেয়েছি মাইরি! নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে, কী বলবি বলেছিলি?

কী বলব?— কালু ধমকে ওঠে।

বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা।

কোন খুন? ফলির?

হ্যাঁ।

কালু হা হা করে হেসে বলে, আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

কে দিল?

যে খুনি সে।

লোকটা কে?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে, তোকে বলব কেন?

বলবি না?

না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ারকি মারতে নিয়েছি?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল, তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে, পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরও অনেক আছে, পালবাজারে সবজির দোকান দেব, নয়তো লন্ড্রি খুলব। দেখবি?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে দেখায়। বলে, গোন তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুনল। বাস্তবিক এখনও চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল, খুনি তোকে কিছু বলল না?

না! কী বলবে! বলল, কাউকে বলবি না, তা হলে তোকেও শেষ করে ফেলব।

পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে, দূর, পাঁচশো টাকা আর কী! এ রকম আরও কত ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু উত্তেজিত হয়ে বলে, ব্ল্যাকমেল!

কালু চোখ ছোট করে বলে, আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমরা সব ভদ্রলোক, না?

ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস! রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল, ব্ল্যাকমেল হল...

চুপ শালা। ফের কথা বলেছিস কি...

বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজি ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে বলল, এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলিনি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল, আহা চাঁদু! গরম কে খাচ্ছে শুনি?

বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তু হাত-পা নিশপিশ করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশি বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনও পর্যন্ত এটা কোনও কাজে লাগেনি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লক-লক করে উঠল।

সন্তু বলল, দেব শালা ভরে।

দিবি?— কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল, দে না!

বলে জিব ভেঙিয়ে দু' হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে খুব উঁচুতে। তারপর বিদ্যুদ্‌বেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কী কৌশল করল কে জানে। লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারি ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হা করে। সর্বনাশ! আর-একটু হলেই সে কালুকে খুন করত! ভেবেই ভয়ংকর ভয় হয় সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লটপট করছে। অনেকক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল, ছুরি চমকেছিস শালা, তুই মরবি।

সন্তু আস্তে করে বলে, তুই খিস্তি দিলি কেন?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনও মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে, ও সব আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারও ফোসকা পড়ে? আমাকেও তো কত লোক রোজ দু'বেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মতো খুন করতে হবে নাকি!

সন্তু বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা!

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু?

বলব কেন?

আমি জানি। গগনদা।

দূর বে!

গগনদা খুন করেছে?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে, কোন শালা বলেছে?

তুই তো বললি।

কখন? নাঃ, আমি বলিনি।

সন্তু হেসে বলে, দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

কী বলবি?

গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনি।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে, টাকা! হ্যাঁ, টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করেনি!

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরে-সুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

পাঁচ

অন্ধকার জিমনাশিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মতো।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রং রক্তবর্ণ। কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এ রকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধহয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজ-ঘরটা জলে থইথই করছে। অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেয়ালে। ও রকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভাল নেই।

অন্ধকার জিমনাশিয়ামের চারধারে এক বার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা এক বার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্ল্যান্টিংবোর্ড কত কী! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামি যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এ রকম রাতে এসে বসে থাকে, দারোয়ান তা জানে। তবে গগনকে দেখে অবাক হয়নি। জিমনাশিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দারোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজ-ঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা,

ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। গগনের রোজগার এমন কিছু বেশি নয় যে লাটসাহেবি করে। এ অঞ্চলে বাড়িভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কত বার চেষ্টা করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশি নড়াচড়া পছন্দ করে না। গ্যারাজ-ঘরটায় তার মন বসে গেছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। গ্যারাজ-ঘরটায় বেশ আছে সে। শোভারানি বকাবকি করে, ভাড়াটেদের ক্যাচক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড্ড জ্বালায় এসে। তবু বর্ষা-বৃষ্টি হোক, না হলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সবকিছুই তার কোনও-না-কোনওভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এইসব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয়নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ বোলতা-বিছে, বাঘ-ভালুক— ভাল করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মতো এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাশিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার-পাঁচ বছরে এ সব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব! আয়না কারও প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতোই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারিদিক দেখে। ওই রিং ধরে একদা ঝুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরি করেছে ফলি। বুকে মস্ত চাঁই পাথর তুলেছে। বিম ব্যালান্স আর প্যারালাল বার-এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরি করে সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভাল লাগে না। বরং সে চায় ভাল জিমন্যাস্ট তৈরি করতে, কি মুষ্টিযোদ্ধা, কি জুডো খেলোয়াড়। সেসব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে-বিথরে মাংসপেশিতে, তেমনি জিমন্যাস্টিকসেও সে ছিল পাকা। ফলিকে কিছুকাল জুডো আর বক্সিং শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল।

ভূতের মতো একা একা গগন জিমনাশিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার-ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ডগা দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উলটে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুল খেল। প্যারালাল বার-এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না। মনটা আজ ভাল নেই। ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ও সব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজ-ঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ থেকেছে। না, শোভারানিদের ঘর থেকে তেমন কোনও সন্দেহজনক শব্দ হয়নি। রাত ন'টায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখনও ফলির মৃত্যুসংবাদ পায়নি। বড় আশ্চর্য কথা! ফলিকে এখানে সবাই একসময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ শনাক্ত করতে পারেনি? কেবলমাত্র পুলিশ আর কালু ছাড়া। তাও পুলিশ বলেছে, ফলি অ্যাবসকন্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়। খুব দ্রুত ভাবনা-চিন্তা করা তার আসে না। সবসময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি-তর্ক এবং গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না। গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবত নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা

ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বদ্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রূণ, এদের দেখে তার বড় মায়া হয়। আরও একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং-উৎপন্ন বিষ টকসিন খুব বেড়ে যায়। টকসিন বাড়লে শরীরে কোনও রোগ হলে তা বড় জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে, নিরামিষভোজীরা খুব ধীরগতিসম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারও চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনও বিদ্যুতের মতো। জুডো বা বক্সিং শিখতে আসে যারা তারা জানে গগন কত বড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কী? প্রায় দিনই আধ সেরটাক ডাল আর সবজি-সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সবজি, দু'-চারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধ সের দুধ, সয়াবিন, কয়েকদানা ছোলা-বাদাম। তাও বড় বেশি নয়। শরীর আন্দাজে গগনের খাওয়া খুবই কম। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনও দিনই সে বেশি মাথা ঘামায় না। এইসব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোনও নেশাই তার নেই।

মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরত করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমন্যাশিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তক্কে জিমন্যাশিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কি না বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশি চেয়ে দেখত গগনকে। তার তাকানো ছিল কী ভয়ংকর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে-আঁকা চেহারা, গায়ের রং সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কী চমৎকার ফিগার! প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীর কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যান্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যান্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভঙ্গে বেঁকেছে, দুলছে বা ওজন তুলবার সময় থামের মতো দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে, এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখেছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য! তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দু'-তিনেকের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল, মা চমৎকার সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখনও রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলত, কত দিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিজ্ঞেস করত, জামাইবাবুর সঙ্গে কারও বুঝি খুব খটাখটি চলছে আজকাল। পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল, আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীতভাবে গগন জবাব দিল, উনতিরিশ।

একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন?

না।

কেন?

গগন হেসে বলে, খাওয়াব কী? আমারই পেট চলে না।

অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব!

তাই তো দেখছি।

আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন?

জানি।

তা হলে আপনাকে কাজ দিতে পারি, করবেন?

গগন উদাসভাবে বলল, করতে পারি।

একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভাল মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল, আমার সময় কোথায়?

খুব হেসে বেগম বলল, তা হলে করবেন বললেন কেন? ওই ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো-ছাটকা ম্যাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগি-টুগি, তাও দিতে পারি।

গগন বলল, ভেবে দেখব!

আসলে গগন ও সব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরি করতে। ভাল শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, জুডো-বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়দের পা বা রুগির গা ম্যাসাজ করতে যাবে কেন?

কিন্তু ওই যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ একবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনির বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

হেসে বলেছিল, খুব ব্যথা বুঝলেন!

গগন পা-খানা নেড়ে-চেড়ে বলল, কোথায়?

বেগম বলল, সব ব্যথা কি শরীরে? মন বলে কিছু নেই?

তারপর কী হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় না। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ওই বেগম। কিছুকাল খুব ভালবেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয়! ও সব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না! গগন তো তার ব্যাবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোনও প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মতো।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভাল ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমন্যাশিয়ামে প্যারালাল বার-এর ওপর বসে গগনের দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়বিড় করে কী একটু বলল গগন। বোধহয় বলল, দুর শালা! জীবনটাই অদ্ভুত!

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজ-ঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। নইলে সে লক্ষ করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ বাড়ি সে বাড়ির জানালায় কারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ মজুমদারের ঘরে স্টিক-লাইট জ্বলছে। এত রাতে ও রকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এ সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় নানক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠান্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুয়ে রইল। বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা-মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উঠে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কী?

ঘুম না এলে গগনচাঁদ জেগে থাকে। চোখ বুজে মটকা মারা তার স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল

না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতর দিকে গ্যারেজ-ঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চার ফুট দরজা আছে। ওই দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবত কোনও দিন ওই দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি-বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বউ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনও ওই দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মতো দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছিটকিনি খোলার কষ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলছে বলে মনে হল। সিলিং-এর দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ংকর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকে ঝট করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরও ভয়ংকর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে গেল। আর চার ফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারানি একটা পাঁচ ব্যাটারির মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারানি সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না। শোভা কালো, মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনও দিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারানি ঝুঁকে বলল, এই এলেন?

হুঁ।— বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বাইরে।

ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফলির খবরটা পেয়েছে! তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারানির মুখে অবশ্য কোনও শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদ্‌বেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল, লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সে কে জানেন?

জানি।— একটু ইতস্তত করে গগন বলে।

সবাই বলছে ফলি। সত্যি নাকি?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

ফলিকে কে দেখেছে?

গগন বলল, পুলিশ দেখেছে। আর রিকশাওলা কালু।

ঠিক দেখেছে?— তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিজ্ঞেস করে।

তাই তো বলছে।— গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারানি ঠোঁট উলটে বলল, আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল, ঘরে জল ঢোকে দেখছি।

বর্ষাকালে ঢোকে রোজ।— গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

বলেননি তো কখনও।

গগন আস্তে করে বলে, বলার কী। সবাই জানে।

শোভা মাথা নেড়ে বলে, আমি জানতাম না।
গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।
শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।
গগন উঠে বসে উর্ধ্বমুখে যেন কোনও স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে, এমনভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে, বলুন।
কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।
কী?
ফলিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।
গগন মাথা নেড়ে বলল, জানি।
কী জানেন?
কালু ও কথা আমাকেও বলেছে।
কে খুন করেছে তা বলেনি?— শোভা ঝুঁকে খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে।
গগন মাথা নাড়ে, না। ও পাঁচশো টাকা দাবি করবে খুনির কাছে। বলবে না।
শোভা হেসে বলে, সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।
শোভারানির হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায়-আসেনি? বোনপোটা মরে গেল, তবু ও কী-রকম যেন স্বাভাবিক!
গগন ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, কার কাছে পেয়েছে?
শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল, ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন!
আমি! আমি টাকা দিয়েছি!
খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।
শোভা বলল, একটু আগে কালুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।
গগন তেমনি দেবী-দর্শনের মতো উর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে, আমি ওকে টাকা দিইনি।
শোভা ঠোঁট ওলটাল। বলল, ও তো বলছে!
আর কী বলছে?
শোভা হেসে বলে, খুনির নামটাও বলেছে।
কে?
বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল, কে!
শোভা তীব্র চোখে চেয়ে থেকে বলল, ও আপনার নাম বলছে।
আমি! আমার নাম!— বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে, না তো! ও মিথ্যে কথা বলছে।
শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল, কালু মদ-গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া! তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি। আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।
গগন উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শুধু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।
শোভা বলে, শুনুন। যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো আমার দুঃখের কিছু নেই। আমার-স্বামী কাঁদছেন। তাঁর বোধহয় কাঁদবারই কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব ফলির নামে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভাল নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল, আপনি বা যে-কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভাল কাজই হয়েছে। পেস্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, সে এখনও আমার কাছে আসে। তার বোধহয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! তবু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিশ ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাবেন।

আমাকে!

শোভা সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে, ও রকম ভ্যাবলার মতো করছেন কেন? এ সময়ে বুদ্ধি ঠিক না-রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল, কী করব?

শোভা বলে, কী আর করবেন, পালাবেন!

গগন দিশাহারার মতো বলল, পালাব কেন?

সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিশে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাববার সময় পাবেন।

কোথায় পালাব?

সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশি সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন?

গগন হাসল এবার। সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ লোক। গ্যারাজ-ঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। মাথা নেড়ে বলল, খুব।

তা হলে বাতিটা নিবিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের কারখানার মাঠ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জ্বেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো-একটা টুকিটাকি দরকারি জিনিস ভরে নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জ্বেলে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারানি তাকে বলে, এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে?

গগন মাথা নাড়ে, না।

শোভা হেসে বলে, লাগবে। সদ্য সদ্য পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি!

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারানি সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যান্টের পকেটে বোধহয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে, বেগম খারাপ। আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারাজ-ঘরের ভিতরটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মতো ফিরে এসে দেখবেন ঘরটা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখব। এখন আসুন তো!

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্তত কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নিচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পথটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোনও যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারি খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তা ছাড়া বাবুয়ানি তার সয় না। আজ উঠে বসল। কারণ অবস্থাটা আজ গুরুতর। তা ছাড়া

শোভারানির দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজ-ঘরে জল ওঠে আধ-হাঁটু। জীবনটা এ রকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এ রকম পালাতে হয়।

অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারানির কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তার।

ছয়

কালুকে পুলিশ তেমন কিছু করেনি। দু'-চারটে ঠোকনা যে না মেরেছে তা নয়, কিন্তু সে বলতে গেলে সিপাইদের আদর। পুলিশের আসল ধোলাই কেমন তা খানিকটা কালু জানে।

পুলিশের কাছে কালু কারও নাম বলেনি।

থানার বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ফলিকে খুন হতে দেখেছিস?

কালু দম ধরে রেখে খানিক ভাবল। ভেবে দেখল, সে অনেককেই ঘটনাটা বলেছে, তাই এখানে মিছে কথা বললে নাহোক ধোলাই হবে। আর পুলিশ যদি মারে তো কোনও শালার কিছু করার নেই। তাই সে চোখ পিটপিট করে বড়বাবুর কোঁতকা চেহারাটা চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলল, দেখেছি।

সত্যি দেখেছিস, না কি নেশার ঘোরে বানিয়েছিস?

কালুর সেই তেজ আর নেই, যেমনটা সে সুরেন খাঁড়া, গগন আর সন্তুকে দেখিয়েছিল। পুলিশের সামনে কারই বা তেজ থাকে?

কালু মেঝেয় উবু হয়ে বসা অবস্থায় মাথা চুলকে বলল, নেশাও ছিল, তবে আবছা দেখেছি।

বড়বাবুর বুটসুদ্ধ মোটা একখানা পা তার কাঁকালে এসে লাগল এ সময়ে। খুব জোরে নয়, তবে কালু তাতেই টাল্লা খেয়ে হড়াত করে পড়ে গেল। একদাঁত হেসে সে আবার উঠে বসে।

বড়বাবুর মুখে হাসি নেই, ভ্রু কুঁচকে বলে, ঠিকসে বল।

অন্ধকার ছিল যে।

সেখানে তুই কী করছিলি?

সাঁজ-বাজারে একটা লোক তাড়ি আনে। রোজ যেয়ে তার কাছে বসি।

বড়বাবু পা ফের তুলে বলে, এটুকু বয়সেই মালের পাকা খদ্দের!

খাই মাঝে মাঝে, তাকত পাই না নাহলে।

এবারের লাথিটা আরও আস্তে এল। লাগল না তেমন।

বড়বাবু বলে, ঠিক করে বল কী করছিলি!

বড় একটা ভাঁড় নিয়ে লাইনের ধারে বসে খাচ্ছিলাম। এ সময় কতগুলো ছেলে এল লাইনের ওধারে। কী সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

কিছু শুনতে পাসনি?

না, খুব আস্তে বলছিল।

ঝগড়া-কাজিয়া বলে মনে হয়েছিল?

না। আপসে যেমন কথা হয় দোস্তদের মধ্যে।

তারপর?

ওরা আমাকে দেখেনি, জায়গাটা অন্ধকার।

ক'জন ছিল?

চার-পাঁচ জন হবে। তাদের একজন খুব লম্বা-চওড়া।
অন্ধকারে বুঝলি কী করে?
বললাম তো আবছা দেখা যাচ্ছিল।
লম্বা-চওড়া লোকটা কে? গগন?
কী জানি।
তবে লোককে বলছিস কেন যে গগনবাবু লাশ নামিয়েছে?
কালু অবাক হয়ে বলে, কখন বললাম?
বলিসনি?— বড়বাবু চোখ পাকিয়ে বলে।
মাইরি না।
এই সময়ে একটা সিপাই পাশ থেকে ঠোকনা মারে। খুব জোরে নয়, তবে তাতে কালুর ডান গালের চামড়া থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে গেল, আর কষের একটা দাঁতের গোড়া বুঝি নাড়া খেয়ে আরও খানিক রক্ত চলকে দিল। মুখের রক্ত ঢোক গিলে পেটে চালান দিয়েছিল কালু। থানায় ধরে আনার পর থেকে দাঁতে কুটো পড়েনি। পেট জ্বলছে।
বড়বাবু বলে, সব ঠিকঠাক করে বল।
কালু হাসবার চেষ্টা করে বলে, বলছি তো বড়বাবু, গগনদার কথা কাউকে বলিনি।
খুনটা কেমন করে হল?
সে খুব সাংঘাতিক। হঠাৎ দেখি সেই চার-পাঁচজনের মধ্যে একজনকে সেই জোয়ান লোকটা পিছন থেকে কী দিয়ে যেন মাথায় মারল।
জোরে মারল?
তেমন জোরে নয়, তবে ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে।
তারপর?
তারপর একটা তোয়ালে বা কাপড় কিছু একটা দিয়ে ছেলেটার গলা পেঁচিয়ে সেই জোয়ান লোকটা খুব চেপে ধরল।
কতক্ষণ?
খুব বেশিক্ষণ নয়, ভয়ে আমি শব্দ করিনি।
তারপর কী হল?
লোকগুলো চলে গেল।
তুই খুনিকে চিনতে পারিসনি?
মাইরি না।
তবে তোকে টাকা দিল কে?
টাকা!— কালু খুব অবাক হয়।
তোকে নাকি খুনি পাঁচশো টাকা দিয়েছে?
মাইরি না বড়বাবু—
কালু পা ধরতে যাচ্ছিল, এ সময়ে আর একটা বেতাল ঠোকনা খেয়ে পড়ে যায়। মাথার পিছনে বাঁ ধারে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলু ফুটে উঠল। ঝাঁ ঝাঁ করছিল ব্যথায়।
টাকা পাসনি?
কালু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিল কোন শালা কথাটা ফাঁস করেছে। সন্তু জানে, আর রিকশাওয়ালা নিতাই তার দোস্ত, সে জানে। আর সুরেন, গগন এ রকম দু'-চারজনকে সে মুখে বলেছিল বটে যে টাকা পেলে খুনির নাম বলবে। এদের মধ্যেই কেউ ব্যাপারটা ফাঁস করেছে। কালুর সন্দেহ সন্তুকে। ও রকম হাড়বজ্জাত ছেলে হয় না।

না।— কালু চোখের জল মুছে বলে। পুলিশ অবশ্য তাকে ধরে এনে প্রায় উদোম করে সার্চ করেছে। টাকা পায়নি।

মারধর কালুর যে খুব লাগে তা নয়। কিন্তু এটা ঠিক তাকে কেউ গমের বস্তা বলে মনে করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে হুজ্জত করার মুরোদ কারই বা থাকে?

বড়বাবু বললেন, দ্যাখ ত্যাঁদড়ামি করিস না, করলে মেরে পাট করে দেব। আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রোজ এসে হাজিরা দিয়ে যাবি। সত্যি মিথ্যে কী কী বলেছিস তার সব আমরা টের পেয়ে যাব। এটা সত্যিই খুনের মামলা কি না, না কি তুই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলেছিস, এ সব জানতে আমাদের বাকি থাকবে না। যদি শালা আমাদের ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকো তবে জন্মের মতো খতম হয়ে যাবে।

কালুকে এরপর প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কালু অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি। সে জানে সে একটা রিকশাওয়ালা মাত্র। কাজটা এতই ছোট যে দুনিয়ার কারও কাছে কিছু আশা করা যায় না। ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়বার সময়েই সে কেন যেন টের পেত যে তার জীবনটা খুব সুখের হবে না। গড়ফায় তার বাবার একটা টিনের ঘর ছিল, উঠোন নিয়ে মোট চার কাঠা জমি। উদ্বাস্তুদের জবর-দখল জায়গা। সেইখানে ছেলেবেলা থেকেই নানা অশান্তিতে বড় হয়েছে। বাবা রোজ মাকে দা বা কুড়ুল নিয়ে কাটতে যেত, দিদি বাসন্তী গিয়ে আটকাত। মা আর দিদি দু'জনেই ঝি-গিরি করে বেড়াত, বাবা ছিল কাঠের মিস্ত্রি, প্রায় দিনই কাজ জুটত না। তার ওপর লোকটার একটা ভয়ংকর অর্শের যন্ত্রণা ছিল যার জন্য বেশিক্ষণ উবু হয়ে বসে কাজ করতে পারত না, রোজগার যা হত তাতে দু'বেলা খাওয়া জুটে যেত মাত্র, তা সে যে-ধরনের খাবারই হোক! দিদি বাসন্তীর চরিত্র খারাপ নয় তবে বাসন্তী যার সঙ্গে বিয়ে বসল তার আগের পক্ষের বউ আর চার-চারটে ছেলেমেয়ে আছে। জেনেশুনেই করল। সে লোকটার আবার বাসন্তীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক, কোথাও বেরোতে দেয় না। এইসব ছেলেবেলা থেকে দেখেছে কালু। বাবার মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে। অর্শ থেকেই খারাপ ঘা হয়ে গিয়ে থাকবে। রক্ত পড়ত দিনরাত। শেষদিকে ওই রক্তপাতেই দিন দিন ক্ষীণ হয়ে হয়ে একদিন রাতে ঘুমিয়ে সকালে আর ওঠেনি। মা এখনও ঝি খেটে বেড়ায়, ছোট বোন হেমন্তীও বেরোচ্ছে কাজে, ছোট ভাই ভুতু আর হাবু সন্ধ্যাবাজারে ডিম বেচে আর চুরি করে বেড়ায়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে কালুকে থামতে হল। পড়তে ভাল লাগত না।

সেই থেকে কালুর সব দুঃখবোধ আর কান্না বিদায় নিয়েছে। কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে সে। মনে কিছু ভুরভুরি কাটে না। গাল খেলে গাল দেয়, মার খেলে উলটে মার দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যস, এই ভাবেই যতদিন বেঁচে থাকা যায়। কালু যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে শিখেছে তা হল টাকা। টাকার মতো কিছু হয় না।

সেলিমপুরে সওয়ারি ছেড়ে রিকশাওয়ালা মগন ফাঁড়ির উলটোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসে ছিল। যাদবপুরে ফিরবে, সওয়ারি পাওয়ার লোভে খানিক অপেক্ষা করছিল।

কালু গিয়ে মগনকে বলল, নিয়ে চলো দেখি মগনদা।

তোর গাড়ি কোথায়?

ছেড়ে এসেছি, পুলিশ ধরে আনল একটু আগে।

মগন ঝুঁকে বলল, পুলিশ! আই বাপ। কী হয়েছিল?

সে অনেক কথা, পরে কোনও সময়ে শুনো।

পেঁদিয়েছে তোকে?

ও শালার সম্বন্ধীর পুতেরা কাকে না প্যাঁদায়?

মগন রিকশার হুড তুলে দিয়ে বলল, চেপে বোস, শালারা আবার টের না পায় যে আমার গাড়িতে উঠেছিস!

মগন রিকশা ছেড়ে জোর হাঁকাল।

কালু কেতরে বসেছিল তার সিটে, মারধর নয়, আসলে খিদেয় পেট ব্যথা করছে। মদের ঝোঁকটা উবে গেছে কখন। এখন পেটে একটা চোঁ-ব্যথা। তবে তার মনটা এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে পুলিশের হাতে পড়েও সে কারও নাম বলেনি।

এইট-বি বাস স্ট্যান্ডে ছেড়ে দিয়ে মগন বলল, মালিককে তিন দিনের পয়সা দিইনি।

কালু দাঁত বের করে বলল, আমার এক হপ্তার বাকি। কাল থেকে গাড়ি দেবে না। তার ওপর পুলিশ লেগেছে।

দু'দিন জোর বৃষ্টি হলে ভাল সওয়ারি পাওয়া যায়।

ইচ্ছেমতো তো আর বৃষ্টি হবে না।

মগন গাড়ি মালিকের বাড়িতে তুলে রাখতে বিজয়গড় গেল।

কালু স্টেশন রোডের মুখে খানিক দাঁড়িয়ে আর-একটা রিকশা খুঁজল। পেল না, হাঁটতে লাগল। বাড়ি না গেলেও হয়। গরফা পর্যন্ত হাঁটতে ইচ্ছে করছে না খিদে পেটে।

স্টেশনের গায়ে একটা তেলেভাজার ঝোপড়ার দোকান আছে। সেটা চালায় বিশে, তার দোস্ত, সেখানে গেলে কিছু খাবার জুটতে পারে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই, স্টেশনে গামছা পেতে পড়ে থাকলেই হল।

বিশে জেগে ছিল, ঝোপড়ায় হারিকেন জ্বলছে। একটা বিদ্ঘিকিচ্ছিরি কম দামের ট্রানজিস্টারে কোথাকার একটা পুরনো হিন্দি গান হচ্ছে।

তাকে দেখে বিশে দাঁতের বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল, পরশু মাল খাওয়াবি কথা ছিল।

কালু বলে, কাল খাওয়াব।

তোর শালা মুখ না ইয়ে।

বেশি মেজাজ লিস না বিশে, আমার কচকচে সাড়ে চারশো টাকা আছে।

যাঃ যাঃ।

কিছু পেটের ব্যবস্থা হবে?

বিশে বলল, শালা রোজ এসে জ্বালালে এবার ঝাপড় খাবি।

তা বলে বিশে ফিরিয়ে দেয় না। মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ আর ঠান্ডা বেগুনি খাওয়ায়। তারপর দুই বন্ধুতে বিড়ি ধরিয়ে গিয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়ে গল্পগাছা করতে থাকে। বিশের মা ঝোপড়া আগলে রাখে।

বিশে সব শুনে বলে, তুই শালা ঘুণচক্করে পড়বি। খুনখারাবি নিয়ে দিল্লাগি নয় দোস্ত! সত্যি কথা বল তো কাউকে দেখেছিলি?

স্টেশনের শক্ত মেঝের ওপর চট পেতে শোয়া কালু পাশ ফিরে বিশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান মেরে বলে, তুই লাশটা দেখেছিলি?

বিশে বলে, দেখব না কেন? লাইনের ধারে দিনভর পড়ে ছিল। অনেক বার গিয়ে দেখেছি।

চিনতে পেরেছিলি?

বিশে মাথা নেড়ে বলে, খুব। ফলি গুন্ডাকে কে না চেনে? এ সব জায়গাতেই আড্ডা ছিল। সব সময়ে ট্রেনে আসত আর ট্রেনেই চলে যেত।

ট্যাবলেট বেচতে আসত যে আমিও জানি। কিন্তু ট্রেনে আসত কেন বল তো?

মনে হয় পাড়ায় ঢুকতে ভয় পেত। বাসে-টাসে এলে তো বড় রাস্তা বা স্টেশন রোড ধরে আসতে হবে। ও সব জায়গায় ওর কোনও বিপদ ছিল মনে হয়।

কালু আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, লুকিয়ে-চুরিয়ে আসত তা হলে।

বিশে গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু ফলিরও দল ছিল। সন্তোষপুর, পালবাজার, স্টেশন রোড এ সব

এলাকার বিস্তর মস্তান ছিল ওর দোস্ত। আমার দোকানে এসে ইট পেতে বসে কত দিন দিশি মাল আর তেলেভাজা খেয়েছে।

তুই তা হলে ভালই চিনতি?

বললাম তো।

তুই খুনটা নিজে চোখে দেখলি?

নিজের চোখে।

খুনিকেও চিনলি?

কালু হেসে বলে, নাম বলব না তা বলে। চিনলাম।

বিশে একটা আস্তে লাথি মারল কালুর পাছায়।

তারপর বলল, মালকড়ি ঝাঁকবি?

ঝেঁকেছি, কাল তোকে মাল খাওয়াব।

বিশে ঘুমোয়। কালুর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। গালটা ফুলে টনটনে ব্যথা হয়েছে। মাজাতেও ব্যথা বড় কম নয়। এপাশ-ওপাশ করে সে একটু কোঁকাতে থাকে।

শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কালু। উঠতে অনেক বেলা হল। দেখল, বিশে উঠে গেছে। স্টেশনে গিজগিজ করছে।

লাইন পার হয়ে কালু পাড়ায় ঢুকে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে।

দরজায় পা দিতে-না-দিতেই মা চেঁচিয়ে বলে, হারামজাদা বজ্জাত, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি? কাল রাতে চারটে গুন্ডা এসে বাড়ি তছনছ করেছে। ছেলেদুটোকে ধরে কী হেনস্থা, যা বাড়ি থেকে দূর হয়ে! গুন্ডা বদমাশ কোথাকার!

সাত

নানক চৌধুরীর পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়।

ঘরে নানক চৌধুরী একাই থাকে। বাড়ির কারও সঙ্গেই হলাহলি-গলাগলি নেই, এমনকী স্ত্রীর সঙ্গেও না। নিজের ঘরে বইপত্র আর নানান পুরাদ্রব্যের সংগ্রহ নিয়ে তার দিন কেটে যায়। কাছেই একটি কলেজে নানক অধ্যাপনা করে। না-করলেও চলত, কারণ টাকার অভাব নেই।

টাকা থাকলে মানুষের নানা রকম বদ খেয়াল মাথা চাড়া দেয়। নানক চৌধুরী সেদিক দিয়ে কঠোর মানুষ। মদ-মেয়েমানুষ দূরের কথা নানক সুপুরিটা পর্যন্ত খায় না। পোশাকে বাবুয়ানি নেই, বিলাসব্যসন নেই। তবে খরচ আছে। জমানো টাকার অনেকটাই নানকের খরচ হয় হাজারটা পুরাদ্রব্য কিনতে গিয়ে। ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও নানক প্রত্নবিদ নয়। তাই সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে সে ঠকেছেও বিস্তর। কেউ একটা পুরনো মূর্তি কি প্রাচীন মুদ্রা এনে হাজির করলেই নানক ঝটপট কিনে ফেলে। পরে দেখা যায় যে জিনিসটা ভুয়া। মাত্র দিন সাতেক আগে একটা হা-ঘরে লোক এসে মরচে-ধরা একটা ছুরি বেচে গেছে। ছুরিটা নাকি সিরাজদৌল্লার আমলের। প্রায় ন'শো টাকা দণ্ড দিয়ে সেটা রেখেছে নানক।

দেখলে নানককে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দাড়ি-গোঁফ থাকায় এখন তো তাকে রীতিমতো বুড়োই লাগে। কিন্তু সন্তু যদি তার বড় ছেলে হয়, তা হলে তার বয়স খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। নানকের হিসেবমতো তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশি।

রাত বারোটা নাগাদ নানক তার পশ্চিমধারের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে পাড়ার বড়রাস্তা দেখা যায়। পাশের বাড়িটা নিচু একটা একতলা। তার পরেই নরেশের বাড়ির ভিতর দিকের উঠোন। উঠোনে আলো নেই বটে, তবে বাড়ির ভিতরকার আলোর কিছু আভা এসে উঠোনে

পড়েছে। লোকজন কাউকে দেখা যায় না। এত রাতে আলো বা লোকজন দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। তবে আজকের ব্যাপার আলাদা। ফলি নামে কে একটা ছেলে লাইনের ধারে মারা গেছে, তাকে নিয়ে নানা গুজব। কেউ বলছে খুন। একটা রিকশাওয়ালা খুনির নাম বলেছে গগন। এই নিয়ে পাড়ায় ভীষণ উত্তেজনা। প্রায় সবাই জেগে গুজগুজ ফুসফুস করছে।

গুজব নানকের পছন্দ নয়। সে জানে কংক্রিট ফ্যাক্ট ছাড়া কোনও ঘটনাই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাস্য নয়। তার নিজের বিষয় হল ইতিহাস, যা কিনা বারো আনাই কিংবদন্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই কেচ্ছাকাহিনি। তা ছাড়া ইতিহাস মানেই হচ্ছে রাজা বা রাজপরিবারের উত্থান-পতনের গল্প। তাই ইতিহাস সাবজেক্টটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না নানক। তার ইচ্ছে এমন ইতিহাস লেখা হোক যা সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং সমাজবিবর্তনের দলিল হয়ে থাকবে। ইতিহাস মানে গোটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য প্রাচীন ইতিহাসগুলো সেদিক থেকে বড়ই খণ্ডিত।

নানক দাঁড়িয়ে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। চারদিককার পৃথিবী সম্পর্কে সে এখন কিছুটা উদাস এবং নিস্পৃহ। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থটি হল রবিনসন ক্রুশো। এই প্রায়-শিশুপাঠ্য বইটি যে কেন তার প্রিয় তা এক রহস্য। তবে নানক দেখেছে, যখনই তার মন খারাপ হয় বা অস্থিরতা আসে তখন রবিনসন ক্রুশো পড়লেই মনটা আবার ঠিক হয়ে যায়। শুনলে লোকে হাসবে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

আজ বিকেল থেকে নানকের মনটা খারাপ, তার প্রত্নবিদ বন্ধু অমলেন্দু এসেছিল, ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, এ হল একেবারে ব্রিটিশ আমলের বস্তু। বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। তবে একটু ঐতিহাসিক নকলে তৈরি হয়েছিল বটে। ন'-ন'শোটা টাকা গালে চড় দিয়ে নিয়ে গেছে হে!

নানক চৌধুরী তখন থেকেই রবিনসন ক্রুশো পড়ে গেছে। এখন মনটা অন্যমনস্ক। নানক চৌধুরী নিজেকে সেই নিরালা দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বলে ভাবতে ভারী ভালবাসে। সে যদি ও রকম জীবন পায় তবে ফ্রাইডের মতো কোনও সঙ্গীও জোটাবে না। এ রকম একা থাকবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে নানক হঠাৎ নরেশের বাড়ির উঠোনে টর্চের আলো দেখতে পায়। সেই সঙ্গে দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি হলেও চিনতে অসুবিধে নেই। বিপুল মোটা বেঁটে শোভারানিকে অন্ধকারেও চেনা যায়। আর গরিলার মতো হোঁতকা জোয়ান-জোয়ান চেহারার গগনকেও ভুল হওয়ার কথা নয়।

দু'জনে করছে কী ওখানে? কোনও লাভ-অ্যাফেয়ার নয় তো!

একটু বাদেই নানক দেখে গগন দেয়াল ডিঙোচ্ছে। শোভারানি টর্চ জ্বেলে ধরে আছে। গগন দেয়ালের ওপাশে নেমে না-যেতে যেতেই পুলিশের গাড়ির আওয়াজ রাস্তায় এসে থামে। ভারী বুটের শব্দ। কিছু টর্চের আলো এলোমেলো ঘুরতে থাকে।

তা হলে এই ব্যাপার।

নানক চৌধুরী লুঙ্গির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। নিজের ঘরে তালা দেওয়া তার পুরনো অভ্যাস। বাড়ির কারও বিনা প্রয়োজনে তার ঘরে ঢোকা নিষেধ। তালা দিয়ে নানক নীচে নেমে আসে। চাকরকে ডেকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরোয়।

মুখোমুখি একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা। নানক বলে, কাউকে খুঁজছেন?

অফিসার বলে, হ্যাঁ। গগন নামে কাউকে চেনেন?

চিনি।

লোকটা ঘরে নেই। পালিয়েছে।

নানক বলে, হ্যাঁ। আমি পালাতে দেখেছি।

কোন দিকে?

পিছনের দেয়াল টপকে ল্যাবরেটারির মাঠ দিয়ে। এখন আর তাকে পাবেন না। বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

কখন গেল?

মিনিট দশ-পনেরো হবে। নরেশ মজুমদারের স্ত্রীও ছিল। পালাবার সময় টর্চ দেখাচ্ছিল।

আপনি কে?

নানক চৌধুরী প্রফেসর।

নানক চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে পুলিশ অফিসার খুব বেশি প্রভাবিত হননি। শুধু বললেন, পালিয়ে যাবে কোথায়?

এত রাতেও পাড়ার লোক মন্দ জমেনি চার দিকে। তা ছাড়া চারিদিকের বাড়ির জানালা বা বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছে।

রাস্তার ভিড় থেকে সুরেন খাঁড়া এগিয়ে এসে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, মদনদা, তোমরা একটা মাতাল আর চ্যাংড়া রিকশাওলার কথায় বিশ্বাস করে অ্যারেস্ট করতে এলে, এটা কেমন কথা?

পুলিশ অফিসারের নাম মদন। সুরেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের সকলের খাতির। অফিসার একটু ভ্রু কুঁচকে বলেন, অ্যারেস্ট করতে এসেছি বললে ভুল হবে। আসলে এসেছি এনকোয়াবিতে। তা তুমি কিছু জানো নাকি সুরেন?

কী আর জানব? শুধু বলে দিচ্ছি, কালুর কথায় নেচো না। ও মহা বদমাশ। গগনকে আমরা খুব ভাল চিনি। সে কখনও কোনও ঝঞ্ঝাটে থাকে না।

থাকে না তো পালাল কেন?

সে পালিয়েছে কে বলল! পালায়নি। হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে ভয় খেয়ে। মদনদা, তোমাদের কে না ভয় খায় বলো?

পুলিশ অফিসার একটু হেসে বললেন, আরও একজন এভিডেন্স দিয়েছে, শুধু কালুই নয়। গগনবাবুর ল্যান্ডলর্ড নরেশ মজুমদার। আবার এই প্রফেসর ভদ্রলোক বলেছেন, গগনের সঙ্গে একটু আগেই নাকি মিসেস মজুমদারকেও দেখা গেছে। তোমাদের এ পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার বেশ ঘোরালো দেখছি।

নরেশ মজুমদার এতক্ষণ নামেনি। এইবার নেমে আসতে সবাই তার চেহারা দেখে অবাক। রাস্তার বাতি, পুলিশের টর্চ আর বাড়ির আলোর জায়গাটা ফটফট করছে আলোয়। তাতে দেখা গেল নরেশ মজুমদারের চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো। গায়ে জামা-গেঞ্জি কিছুই নেই, পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র।

নরেশ নেমে এসেই মদনবাবুকে হাতজোড় করে বলে, ভিতরে চলুন। আমার কিছু কথা আছে।

মদন সুরেনের দিকে ফিরে একটু চোখ টিপলেন। প্রকাশ্যে বললেন, সুরেন, তুমি তো পাড়ার মাথা, তা তুমিও না হয় চলো সঙ্গে।

নরেশ বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সুরেন খুব ডাঁটের সঙ্গে বলে, নরেশবাবু কথা আপনার যা-ই থাক, বিনা প্রমাণে আপনি গগনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেননি। কাল সন্ধেবেলা গগন জিমনাশিয়ামে ছিল, ত্রিশ-চল্লিশ জন তার সাক্ষী আছে।

নরেশ গম্ভীরমুখে বলে, সব কথা ভিতরে গিয়েই হোক। রাস্তা-ঘাটে সকলের সামনে এ সব বলা শোভন নয়। আসুন।

নরেশের পিছু পিছু সুরেন আর মদন ভিতরে ঢোকে।

নানক চৌধুরী ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তাকে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। অথচ একটা অতি গুরুতর ব্যাপারের সে প্রত্যক্ষদর্শী।

ঘরের এক ধারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বেগম আধ-শোয়া হয়ে চোখ বুজে আছে, কপালে একটা জলপট্টি লাগানো, ডান হাতের দুটো আঙুলে কপালের দু'ধার চেপে ধরে আছে। তার কান্না শোনা যাচ্ছে না, তবে মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো শব্দ উঠছে।

শোভারানি ভিতরের দরজায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তার দু'চোখে বেড়ালের জ্বলন্ত দৃষ্টি।

নরেশ মজুমদার যখন তার অতিথিদের এনে ঘরে ঢুকল তখন শোভারানির ঠোঁটে একটা হাসি একটু ঝুল খেয়েই উড়ে গেল।

বেগম এক বার রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকায়। আবার চোখ বুজে বসে থাকে।

নরেশ মজুমদার বেগমের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলে, ওই হল ফলির মা, আমার শালি।

মদন গম্ভীরমুখে বলে, ও সব আমরা জানি।

নরেশ মজুমদার এ কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, এতক্ষণ আমি আমার শালির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

মদন আর সুরেন দু'টি ভারী নরম সোফায় বসে। সুরেন বলে, অনেক রাত হয়েছে নরেশবাবু, কথাবার্তা চটপট সেরে ফেলুন।

নরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সুরেনের দিকে চেয়ে বলে, আপনি বলছিলেন গতকাল গগন সন্ধেবেলায় জিমনাশিয়ামে ছিল। আপনি কি ঠিক জানেন ছিল?

আলবত।— সুরেন ধমকে ওঠে।

নরেশ মাথা নেড়ে বলে, না সুরেনবাবু গগন সন্ধেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল না! সে সন্ধে সাতটার পর ব্যায়াম শেখাতে আসে। তারও সাক্ষী আছে।

সুরেন পা নাচিয়ে বলে, এ এলাকায় গগনকে সবাই চেনে নরেশবাবু। সে দেরি করে জিমনাশিয়ামে এলেও কিছু প্রমাণ হয় না। জিমনাশিয়ামে যাওয়ার আগে সে কোথায় ছিল সেইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য? তার জবাবে বলি, যেখানেই থাক লুকিয়ে ছিল না। আপনি গগনের পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো!

এ কথা শুনে বেগম আবার তার রক্তরাঙা চোখ খুলে তাকাল। সোজা সুরেনের দিকে চেয়ে কান্নায় ভাঙা ও ভারী স্বরে বলল, গগনবাবু কাল সন্ধেবেলা কোথায় ছিলেন তা কি আপনার জানা আছে?

না।

তা হলে জামাইবাবুকে খামোকা চোখ রাঙাচ্ছেন কেন? যদি জানা থাকে তা হলে সেটাই বলুন।

মদন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বলল, ও সব কথা থাক। সাসপেক্ট কোথায় ছিল না-ছিল সেটা পরে হবে। আপাতত আমি জানতে চাই আপনারা কোনও ইনফর্মেশন দিতে চান কি না, আজেবাজে খবর দিয়ে আমাদের হ্যারাস করবেন না। কংক্রিট কিছু জানা থাকলে বলুন।

নরেশ মজুমদার বলল, ফলি কি খুন হয়েছে?

মদন গম্ভীর মুখে বলে, পোস্টমর্টেমের আগে কী করে তা বলা যাবে?

খুন বলে আপনাদের সন্দেহ হয় না?

আমরা সন্দেহ-টন্দেহ করতে ভালবাসি না। প্রমাণ চাই।

কিন্তু আই-উইটনেস তো আছে!

সুরেন ফের ধমকে ওঠে, উইটনেস আবার কী? একটা বেহেড মাতাল কী বলেছে না বলেছে সেটাই ধরতে হবে নাকি?

শোভারানি এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার সামান্য সুর করে নরেশকে বলল, তোমার অত দরদ কীসের বলো তো?

তুমি ভিতরে যাও।

কেন, তোমার হুকুমে নাকি?

নরেশ রেগে গিয়ে বলে, যাবে কি না!

যাব না। আমারও কথা আছে।

কী কথা?

তা পুলিশকে বলব।

মদন হাই তুলে বলল, দেখুন, এখনও কেসটা ম্যাচিওর করেনি। চিলে কান নেওয়ার বৃত্তান্ত। খুন না দুর্ঘটনা কেউ বলতে পারছে না। আপনারা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

নরেশ বলল, যদি খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে?

কিন্তু খুনের তো কিছু কংক্রিট প্রমাণ বা মোটিভ থাকবে।

নরেশ বলল, আপনারা পুলিশের কুকুর আনলেন না কেন? আনলে ঠিক—

মদন হেসে উঠে বলে, কুকুরের চেয়ে মানুষ তো কিছু কম বুদ্ধি রাখে না। আপনার যা বলার বলুন না।

বেগম তার রিভলভিং চেয়ার আধপাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে, আমাদের তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমাদের যা সন্দেহ হচ্ছে তা আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কেসটা চট করে ছেড়ে দেবেন না বা অ্যাকসিডেন্ট বলে বিশ্বাস করবেন না।

ঠিক আছে। এ ছাড়া আর-কিছু বলবেন?

গগনবাবুকে আপনারা ধরতে গেলেন না?

কেন ধরব?— মদন অবাক হয়ে বলে।

ধরতেই তো এসেছিলেন!

মদন হেসে বলল, হুটহাট লোককে ধরে বেড়াই নাকি আমরা?

তা হলে কেন এসেছিলেন?

আপনার জামাইবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা ছাড়া কালুও কিছু কথা আমাদের কাছে বলেছে। আমরা তাই গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উনি তো পালিয়ে গেলেন। তাইতেই তো প্রমাণ হয় ওঁর দোষ কিছু-না-কিছু আছে।

সুরেন ঝেঁকে উঠে বলে, না, হয় না।

নরেশ বলে, কালু যে গগনকে দেখেছে নিজের চোখে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?

এবার পুলিশ অফিসার মদন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, নরেশবাবু, কালু কিন্তু কারও নাম বলেনি। আর গগনবাবু যে পালিয়েছেন সেও গট-আপ ব্যাপারটা হতে পারে। কারণ পাড়ার একজন বলছেন যে, একটু আগে আপনার স্ত্রীই নাকি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

আট

ট্যাক্সিতে বসে গগন কিছুক্ষণ মাথা এলিয়ে চোখ বুজে রইল। মাথাটা বড্ড গরম, গা-ও গরম। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লেগে আছে।

গোলপার্কের কাছ বরাবর এসে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন?

কোন চুলোয় যাবে তা গগনের মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তার আত্মীয়স্বজন বা চেনাজানা

লোক হাতে গোনা যায়। কালীঘাটে এক পিসি থাকে। কিন্তু পিসির অবস্থা বেশি ভাল নয়। ছেলের বউয়ের সংসারে বিধবা পিসি কোল ঘেঁষে পড়ে থাকে, তার কথার দাম কেউ বড় একটা দেয় না। তা ছাড়া আপন পিসিও নয়, বাবার মামাতো বোন।

আর এক যাওয়া যায় ছটকুর কাছে। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু ছটকু একসময়ে গগনের সবচেয়ে গা-ঘেঁষা বন্ধু ছিল।

গগনের বন্ধু মানেই গায়ের জোরওলা, পেশিবহুল মানুষ। ছটকু ঠিক তা নয়। আড়ে-বহরে ছটকু খুব বেশি হবে না। সাড়ে পাঁচ ফুটিয়া পাতলা গড়নের ছিমছাম চেহারা। তবে কিনা ছটকু একসময়ে বালিগঞ্জ শাসন করত। আর সেটা করত বুদ্ধির জোরে। মারপিট করতে ছটকুকে কম লোকই দেখেছে। তবে দারুণ তেজি ছেলে, দরকার পড়লে দু'হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। ফেদার ওয়েটে ভাল বক্সার ছিল কলেজে পড়ার সময়। গগন যখন কলেজে পড়তে আসে ওই ছটকু ছিল তার ক্লাসের বন্ধু, পরে জিমনাশিয়ামে গায়ের ঘাম ঝরাতে গিয়ে পরিচয়টা আরও গাঢ় হয়।

বক্সিং ছটকু খুব বেশি দিন করেনি, কলেজের প্রথম দিকে খুব লড়ালড়ি করল কিছুদিন। ফোর্ট উইলিয়ামে এক কমপিটিশনে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পড়াশুনোর তাগিদে সে সব ছেড়ে ভাল ছাত্র হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। ফার্স্টক্লাস পেল, এম এসসিতেও তাই। কিছুদিন বোম্বাই গিয়ে চাকরি করল। সেখান থেকে গেল বিলেত, বিলেতে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে কিছুদিন ভুগে ছ'মাস বাদে ফিরে এল। বলল, বিলেত কি আমাদের পোষায়! টাকাটাই গচ্চা।

ছটকু বড়লোকের ছেলে। তার বাবা সরকারি ঠিকাদার, জাহাজের মাল খালাস করার ব্যবসাও আছে। এলাহি বাড়ি, এলাহি টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছটকু কলকাতায় চাকরি নেয়। গগন কিছুদিন আগে খবর পেয়েছে যে ছটকু চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করছে, খুব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং বউয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না।

কোনও মানুষই নিখাদ সুখে থাকে না। পৃষ্ঠব্রণ একটা না একটা থাকবেই। ভেবে গগন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ট্যাক্সিওলাকে বলল, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস।

ছটকুদের বাড়িটা এত রাতেও জেগে আছে। পুরোটা জেগে আছে বললে ভুল হবে। দোতলা-তেতলার বেশির ভাগই অন্ধকার। তবু দু'-চারটে জানালায় আলো জ্বলছে। দোতলার বাঁ-দিকের কোণের ঘরটা ছটকুর। তাতে আলো দেখা যাচ্ছে। সদরটা খোলা। দুটো দারোয়ান বসে কথা কইছে।

গগন ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে সদরে উঠতেই দারোয়ানদের একজন বলে ওঠে, কাকে চাইছেন?

ছটকু আছে?

আছে।

একটু ডাকবে ওকে? বড় দরকার। বলো গগন এসেছে।

দেখি।— বলে দারোয়ান ভিতরে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হল। হঠাৎই পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছটকু দরজায় দেখা দিয়ে অবাক হয়ে বলে, তুই কোত্থেকে রে?

কথা আছে। রাতের মতো একটু থাকতে দিবি?

হোল লাইফ থেকে যা না। আয় আয়।

গগন শ্বাস ফেলে বাঁচল। ছটকুর বউকে সে চেনে না। সে মহিলা কেমন হবে কে জানে! যেখানে মহিলারা সুবিধের নয় সেখানে থাকা বড় জ্বালা। তার ওপর ছটকুর সঙ্গে তার বউয়ের বনিবনা নেই বলে শুনেছে। তাই স্বস্তির মধ্যেও একটু কাঁটা বিঁধে রইল মনে। নিখাদ সুখ বলে তো কিছু নেই।

ছটকুর পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল গগন। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে। বড়লোকদের বাড়ি

যেমন হয় তেমনি সাজানো। যেখানে কার্পেট পাতা নেই সেখানকার মেঝে এত তেলতেলে আর ঝকঝকে যে পা পিছলে যেতে পারে।

ছটকুর ঘর তিনটে। কোণেরটা শোওয়ার ঘর। ঢুকতেই বিশাল একটা বসবার ঘর। বাঁ দিকেরটা স্টাডি। বরাবর তিনখানা ঘর ছটকু একা ভোগ করেছে। এ সব দেখে নিজের গ্যারেজের ঘরখানার কথা ভাবলে গগনের হাসি পায়। মানুষে মানুষে অবস্থার পার্থক্য কী বিপুল আশমান-জমিন!

বসবার ঘরে মেঝে-ঢাকা পুরু উলের গালচে। গাঢ় খুনখারাপি রঙের। দারুণ সব সোফা আর কৌচ, বিশাল রেডিয়োগ্রাম, টি ভি সেট, বুককেস, কাচের শো-বকস। দরজায় পরদার বদলে লম্বা হয়ে ঝুলছে সুতোয় গাঁথা বড় বড় পুঁতির মালা।

ছটকু তাকে বসিয়ে একটা চাকা লাগানো পোর্টেবল রুম এয়ার-কন্ডিশনার কাছে টেনে এনে চালু করল। হিমঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গগনের শরীরে। বড় ভাল হাওয়াটা।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা মেঝেয় রেখে গগন একটা আরামের 'আঃ' শব্দ করে চোখ বুজে থাকে। মুখোমুখি বসা ছটকু কিন্তু একটা প্রশ্নও করেনি। চুপ করে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল, সময় দিল গগনকে।

গগন খানিক বসে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল যে এবার তার কিছু বলা উচিত। ছটকু কী ভাবছে?

গগন বলে, তোর বউ ঘুমিয়েছে?

কেন?— ছটকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

না, বলছিলাম কী পাশের ঘরে উনি এখন ঘুমিয়ে আছেন আর আমরা কথাবার্তা বলছি, এতে ওঁর ডিসটার্ব হতে পারে।

নিভন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ছটকু মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোয়নি, একটু আগেই কথা হচ্ছিল।

গগন আড়চোখে দেখে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। জোরালো আলো নয়, মিষ্টি একটা হলুদ আভার বাতি। শোওয়ার ঘরের দরজায় ফুটফুটে সাদা জালি পরদা ঝুলছে। ওপাশে যে মহিলা আছেন তিনি গগনকে কী চোখে দেখবেন সেইটাই সমস্যা।

গগন বলল, একটু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।

ছটকু হেসে বলে, গগ্, বিপদটা একটু নয়। একটু বিপদে পড়ে এত রাতে তুই আসিসনি।

বরাবরই ছটকু তাকে গগ্ বলে ডাকে। প্রথম জীবনে ছটকু তার নাম দিয়েছিল গগ্যাঁ। গগন থেকে গগ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত আঁকিয়ে গগ্যাঁর সঙ্গে নাম মিলিয়ে। পরে আর-এক আর্টিস্টের নামের সঙ্গে মিলিয়ে গগ্ বলে ডাকত। ছটকুর ওই স্বভাব, যে কারও নামই খানিকটা পালটে বা বিকৃত করে ডাকবে।

গগন রুমালে মুখ-গলা মুছে বলল, বিপদটা কঠিন বলে মনে হয় না। তবে আমার একজন হিতৈষিণী আমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে।

হিতৈষিণীটি কে?

ল্যান্ডলর্ডের বউ। নাথিং রোমানটিক।

অ। আর বিপদটা?

একটা খুনের ব্যাপার।

খুন!— বলে ভ্রু তোলে ছটকু।

গগনের হাসি আসে না, তবু দাঁত দেখিয়ে গগন বলে, খুন কি না জানি না। তবে কেউ কেউ বলছে খুন। আর তাতে আমাকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা হয়েছে।

ছটকু কী একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে সামলে গেল। কিছু একটা টের পেয়েছিল ছটকু। কারণ কথাটা গগন শেষ করার পরপরই শোয়ার ঘর থেকে একটি মেয়ে বাতাসে ভেসে আসবার মতো এ ঘরে এল। ভারী উদাসীন নিঃশব্দ আর অনায়াস হাঁটার ভঙ্গি।

এত সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গায়ের রং, তেমনি ফিগার আর মুখখানা। এইসব মুখের জন্য দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। লম্বাটে, পুরন্ত, ধারালো সুন্দর সেই মুখশ্রী, ভারী দু'খানা চোখের পাতা আধবোজা। অল্প একটু লালচে চুলের ঢল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনে একটা রোব।

ঘরে ঢুকে গগনের দিকে দু'-এক পলক নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে মেয়েটি। ঘরটা এক সুগন্ধে ভরে যায়।

ছটকু ওর দিকে পিছন ফিরে বসে ছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল,. লীনা, এ আমার বন্ধু গগন চৌধুরী।

লীনা কথা বলল না। তবে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, নাইস টাইম ফর এ ফ্রেন্ড টু কল!

ছটকু সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলে, লিভ ইট।

লীনা বসবার ঘরের পিছনে বড় পরদার ওপাশে আড়ালে চলে যায়।

ছটকু আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, কী খাবি?

খাব?— গগন অবাক হয়ে বলে, খাব কী রে?

না খেয়ে থাকবি নাকি? না কি লজ্জাটজ্জা পাচ্ছিস?

বাস্তবিক গগন লজ্জা পাচ্ছিল। সঙ্গে আবার একটু ভয়ও। এইমাত্র ছটকুর বউ লীনা অ্যায়সা দারুণ অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বুলি ঝেড়েছে যে তাতেই গগন থমকে গেছে, ইংরিজিটা তো মেমসাহেবের মতো বলেই, তার ওপর মেজাজও সেই পরদায় বাঁধা। তাই গগন বড় ভিতু-সিতু হয়ে পড়েছে।

ছটকু একটু হাসল। বরাবর ছটকুর মাথা ক্ষুরের মতো ধারালো। টক করে অনেক কিছু বুঝে নেয়। গগনের ব্যাপারটাও বুঝে নিয়ে বলল, ঘাবড়াচ্ছিস? কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার ঘর এটা, আমিই মালিক। তোর কে কী করবে?

গগন বলে, আরে দূর! ও সব নয়। আমার খিদেও নেই।

অত বড় শরীরটায় খিদে নেই কী রে? দাঁড়া, ফ্রিজে কিছু আছে কি না লীনাকে দেখতে বলছি।

এই বলেই বেশ গলা ছেড়ে দাপটে হাঁক দিল ছটকু, লীনা! এই লীনা—

অত্যন্ত ভয়াবহ মুখে লীনা পরদা সরিয়ে দেখা দেয়। চুলের একটা ঝাপটা তার অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখে সাপের চাহনি, মাথাটা এক বার ঝাঁকিয়ে বলে, চেঁচিয়ে কি নিজেকে অ্যালার্ট করতে চাইছ? কী বলবে বলো।

ছটকু সুখে নেই তা গগন নিজের দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও বুঝতে পারে। মেয়েছেলেরা অ্যায়সা হারামি হয় আজকাল!

ছটকু গম্ভীর মুখে কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলে, গগনকে কিছু খেতে দাও।

লীনা খুব অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়। এত রাতে একটা উটকো লোক এসে খেতে চাইবে এটা যেন কল্পনার বাইরে।

গগন মিন মিন করে বলল, না, না, আমার কিছু লাগবে না।

লাগবে।— ছটকু ধমক দেয়।

লীনা অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে খুব চাপা সরু গলায় বলে, তা সেটা আমাকে হুকুম করছ কেন? বেল বাজালেই সামু আসবে। তাকে বলো।

বেলটা তুমিই না হয় বাজালে!

গগন না থাকলে লীনা আরও ঝামেলা করত। সেটা গগন ওর চোখের ঝাঁজালো কটাক্ষেই বুঝল। কিন্তু মুখে কিছু না-বলে দেয়ালের একটা বোতাম একবার টিপে দিয়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

ছটকু গগনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন জয়ের হাসি হাসে। তবে হাসিটাতে বিষ মেশানো। আবার নিভে যাওয়া পাইপ ধরায়। বলে, বেশ আছি।

গগন একটু ঘামে। এয়ারকুলার যথেষ্ট ঠান্ডা হাওয়া দিয়ে তাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবু গগন ঠান্ডা হচ্ছে না তেমন। পকেটে একগোছা নোট ভরে দিয়েছে শোভা। কেন দিয়েছে, কত দিয়েছে তা ভাববার বা দেখবার সময় পায়নি গগন। তবে দিয়েছে ঠিকই। এই টাকায় গগন বরং গিয়ে একটা হোটেলে উঠলে ভাল করত। এখানে এসে উপরি ঝামেলা পোয়াতে হত না। দুটো মানুষের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তখন তার ফাঁপর অবস্থা।

ধোপদুরস্ত পায়জামা আর শার্ট পরা চাকর সামু এল। ছটকুর হুকুমে তক্ষুনি গিয়ে কোত্থেকে খাবার এনে ডাইনিং হলে সাজিয়ে দিল।

ছটকুর তাড়ায় গিয়ে খেতেও বসল গগন। বড়লোকের বাড়ি বটে কিন্তু এরা অখাদ্য ইংরেজি খানা খায়। এক পট সাদা মাংস দেখে সরিয়ে রাখল গগন। মাংস খায়ই না সে। দুটো চিজ স্যান্ডউইচ ছিল মস্ত মস্ত। একখানা কামড়ে তার তেমন ভাল লাগল না। তবে টমেটো আর চিলি সস দিয়ে কোনওক্রমে গিলল সেটা। দ্বিতীয়টা ছুঁল না। এক বাটি সবজি দিয়ে রান্না ডাল ছিল, সেটা খেল চুমুক দিয়ে।

ছটকু উলটো দিকে বসে তার খাওয়া দেখছে! সামু সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়াল।

গগন বেসিনে হাত ধুয়ে বলল, তুই বুঝছিস না ছটকু, খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নয়।

ছটকু জবাব দেয় না! গগনকে নিয়ে ড্রয়িংরুম পার হয়ে স্টাডিতে ঢোকে। দরজা থেকেই ফিরে সামুকে হুকুম দেয়, এই সাহেবের বিছানা লাগিয়ে দাও স্পেয়ার রুমে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে ছটকু মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিলবাতি জ্বলছিল বলে ঘরটা আবছা। দুটো এয়ারকুলার চালু আছে বলে বেশ ঠান্ডা। নিঝুমও বটে। এত নিস্তব্ধ ঘর গগন আর দেখেনি। মনে হয় খুব ভাল ভাবে সাউন্ডপ্রুফ করানো আছে। তা-ই হবে। দেয়ালে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র। রেডিয়ো স্টেশনের স্টুডিয়োতে গগন এ-রকম দেখেছে। একবার আকাশবাণীর বিদ্যার্থী মণ্ডলে সে স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেছিল, তখন দেখেছে সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিয়োর দেয়ালে এ রকম ফুটো থাকে। কথা বললে কোনও প্রতিধ্বনি হয় না।

এখানেও হল না। গগন বলল, তোকে খুব জ্বালাচ্ছি।

ছটকু মাথা নেড়ে বলল, না। বরং এসে আমাকে বাঁচালি। ওই ভ্যাম্পটার কাছ থেকে খানিকক্ষণ সরে থাকতে পারছি।

গগন চুপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গটা স্টু। না মন্তব্য করাই ভাল।

ছটকু বলল, এবার তোর কথা বল।

গগন কোনও ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করে না। ও জিনিসটাই তার নেই। যা করে বা বলে তা ভেবেচিন্তে গুছিয়ে। তাই খুব আস্তে আস্তে সে ঘটনাটা ছটকুর কাছে ভাঙতে লাগল।

খুব বেশি সময় লাগল না। মিনিট কুড়ি বড় জোর। ঘটনা তো বেশি নয়।

ছটকু যতক্ষণ শুনছিল ততক্ষণ তার দিকে তাকায়নি, মাথা নিচু করে ছিল। গগন থামতেই চোখ তুলে বলল, সব বলা হয়ে গেল? কিছু বাদ যায়নি তো?

না।— গগন বলে।

ছটকু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বলে, ঘটনার দিন খুনের সময়ে তুই কোথায় ছিলি?

গগন এটা ভেবে দেখেনি। তাই তো! কোথায় ছিল? অনেক ভেবে বলল, সন্ধের একটু পরে জিমনাশিয়ামে ছিলাম।

আর তার আগে?

একটু বোধহয় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম বাজারে।
কোন বাজারে?
গগন একটু চমক খেয়ে বলল, সাঁজবাজার।
সেটা তো স্পটের কাছেই।
গগনের গলা হঠাৎ শুকনো লাগছিল। নাড়ির গতি বাড়ল হঠাৎ। সে কেমন ভ্যাবলার মতো বলল, হ্যাঁ।
ছটকু একটু চিত হয়ে আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, আবার ভাল করে ভেবে দ্যাখ। কিছু একটা লুকোচ্ছিস।
না না।— গগন প্রায় আঁতকে ওঠে। আর তার পরেই নির্জীব হয়ে যায়।
বলে ফেল গগন।— ছটকু ছাদের দিকে চেয়ে বলে।
ঠান্ডা ঘরে হঠাৎ আরও ঠান্ডা হয়ে যায় গগন। উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে। বেগমের কথা সে ছটকুকে বলেনি। নিজের চরিত্রদোষের কথা কে-ই বা কবুল করতে যায় আগ বাড়িয়ে।
গগন কথা বলে না।
ছটকু পাইপ পরিষ্কার করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বলে, তুই তো জানিস না, আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই। মানে বাবা আমাকে কোনও কাজ দিচ্ছে না, মোর অর লেস তাঁর একটা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব অপদার্থ, বউয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই গোলমাল করছি। ফলে বাড়িতে এখন দারুণ অশান্তি, লীনা নাকি টের পেয়েছে যে আমি একজন বিগতযৌবনা ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের সঙ্গে শোয়া-বসা করে থাকি। বাড়িতে বলেওছে সে কথা।
গগন নড়ে বসে। সে সাহস পাচ্ছে।
পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে ছটকু বলে, কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে কিনা সে মহিলাটির যৌবন এখনও যায়নি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, শরীরের সম্পর্ক হয়নি এমন নয়, তবে কোনও সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট নেই। প্রেম-ট্রেম তো নয়ই। জাস্ট এ সর্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ। উঁচু সমাজে খুব চলে এটা। নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। তা ছাড়া বিয়ের পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ইনি। কিন্তু লীনা সেটাকে ঘুলিয়ে তুলছে।
মেয়েটি কে?
তুই চিনবি না, পঞ্চাশের ডিকেডে ফিল্মে নামত। তেমন নাম-টাম করেনি। যা বলছিলাম, এ সব কারণে আমার অবস্থাটা খুব খারাপ ফ্যামিলিতে। অলমোস্ট জবলেস ভ্যাগাবন্ড, বউয়ের সঙ্গে শুই না। কিছুদিন মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা আমার স্যুট করে না একদম। বদহজম আর অ্যাসিড হয়ে অসম্ভব কষ্ট পাই। একজন বন্ধু জুটে কিছুদিন ড্রাগের নেশা করাল, খুব জমেছিল নেশাটা, বাবা নার্সিংহোমে ভরতি করিয়ে কিওর করাল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুকুমার রায়ের সেই অবস্থা। হাতে রইল পেনসিল। বউয়ের সঙ্গে বনে না, বাপের সঙ্গে বনে না, মদের সঙ্গে বা ড্রাগের সঙ্গেও বনে না, কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে।
বলে পাইপটা দেখিয়ে একটু হেসে চোখ টিপে বলে, এর মধ্যে যে টোব্যাকো রয়েছে, তাতে আছে অল্প গাঁজার মিশেল। গন্ধ পাচ্ছিস না?
না!
কিন্তু আছে। আজকাল নানা রকম নেশার এক্সপেরিমেন্ট করি। সময় কাটে না। বুঝলি গগন?
বুঝলাম।
তাই বলছিলাম তোর সব কথা আমাকে বল। তোকে নিয়ে আর তোর প্রবলেম নিয়ে একটু ভাবি। সময় কাটবে।
ছটকুকে গগন খুব চেনে। ও কুকুরের মতো বিশ্বাসী, কম্পিউটারের মতো মাথা ওর। ছটকুকে

বক্সিং অভ্যাস করতে দেখেছে গগন। অজস্র মার খেত, মারত। রোখ ছিল সাংঘাতিক। ভিতু নয়, লোভী নয়। ওকে বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

কিন্তু গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হাই তুলে বলল, তোকে আমার সব কথা বললাম কেন জানিস? যাতে আমাকে তোর অবিশ্বাস না হয়। বিশ্বাস কর, আমার তোকে হেলপ করতে ইচ্ছে করছে।

গগন চোখ বুজে এক দমকায় বলে উঠল, ফলির মায়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ঠান্ডা মুখে কথাটা শুনল ছটকু। একটু সময় ছাড় দিয়ে ঠান্ডা গলাতেই প্রশ্ন করে, ফলির মা কে?

ওঃ, সে একজন সোসাইটি লেডি।— গগন আবার চোখ বুজে বলে।

সোসাইটি লেডি? তার সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায়?

হয়ে গেল।

হয়ে গেল মানে? তোর কাছ থেকে সে পাবে কী? সোসাইটি লেডি বলতে আমরা অন্য রকম বুঝি। একটু নাক-উঁচু স্বভাবের, সিউডো ইনটেলেক্ট-ওলা মহিলা। এরা জেনারেলি হাই ফ্যামিলির মেয়ে। যেমনটা একদিন লীনা হবে।

গগন নিজের হাতের ঘাম প্যান্টে মুছে বলে, এও অনেকটা সে রকম, তবে হাই ফ্যামিলির নয়, স্বামী সামান্য চাকরি করে।

খদ্দের ধরে পয়সা নেয় নাকি?

না বোধহয়। তবে প্রেজেন্টেশন নেয়, সুবিধে আদায় করে, ধারও নেয়।

ছটকু হেসে বলে, তা হলে হাফ-গেরস্ত বল। ও সব মেয়েকে আমরা তাই বলি। সোসাইটি লেডি অন্য রকম, যদিও জাত একই। তোর কাছ থেকে কী নিত?

কী নেবে? আমার আয় তো জানিস। চাইলেও দিতে পারতাম না। তবে চায়নি।

শুধু শরীর?

শুধু তাই।— গগন লজ্জা পেয়ে বলে।

ছটকু চিন্তিত হয়ে বলে, ও সব মেয়ে তো ভাল তেজি পুরুষ বড় একটা পায় না। যারা আসে তারা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া কামুক, নইলে নভিস। তাই তেমন পুরুষ পেলে বিনা পয়সায় নেয়। নিতান্ত শরীরের স্বার্থে। তারপর কী হল?

কিছুদিন পর ফলির মা বেগম আমাকে রিজেক্ট করে দেয়। গেলে আর খুশি হত না আগের মতো। আমি কিন্তু ওকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছিলাম।

বুঝেছি।

মনে মনে বেগমের জন্য খুব ছটফট করেছি বহু দিন। এখনও করি। যাই হোক, ফলি যেদিন মারা যায় তার দিন দুই আগে বেগমের একটা চিঠি পাই। তাতে ও লিখেছিল, একটা বিশেষ দিনে সন্তোষপুরের একটা ঠিকানায় গিয়ে যেন দেখা করি ওর সঙ্গে। খুব জরুরি কথা, যেদিনের কথা লিখেছিল সেটা ছিল খুনের তারিখটাই।

বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

না। সে ঠিকানায় গিয়ে আমি বুড়বাক। সেখানে বউ-বাচ্চা নিয়ে এক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার দিব্যি সংসার করছে। বেগমের কথা তারা জানে না।

বেগমের হাতের লেখা তুই চিনিস?

না।

তবে বুঝলি কী করে যে বেগম লিখেছিল?

অবিশ্বাসের তো কিছু ছিল না!

যাক গে। তারপর কী হল?

কী হবে? ওকে না পেয়ে ফিরে এলাম।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আসবার পথে?

গগন চুপ করে থাকে। বলা উচিত হবে কি? অথচ না-বলেই বা গগন পারে কী করে? এত দূর এগিয়ে আবার পিছোবে?

গগন চোখ বুজে বলে, ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এ কথায় ছটকুও যেন চমকে যায়। তবে গলার স্বরটা খুবই ঠান্ডা রেখে বলে, কোথায়?

বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। আমাকে দেখে উঠে আসে।

কথা যা হয়েছিল তা মিঠে বা মোলায়েম নয়। একসময়ে সে আমাকে একলব্যের মতো ভক্তি করত, কথায় জান দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেদিন সে হুট করে বেরিয়ে এসে আমার রাস্তা আটকে বলল, গগনদা, আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার মুখ-চোখ দেখে আর গলার স্বর শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। একটু যে ভয়ও খাইনি তা নয়। বে-জায়গায় হঠাৎ ও রকম সিচুয়েশন হলে যা হয়। আমতা আমতা করছিলাম, কারণ মনে পাপ। আমি এসেছিলাম ওর মা'র চিঠি পেয়ে দেখা করতে, সেটা তো ভুলতে পারছি না। ও আমাকে একটা দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বলল, আমার মা'র সঙ্গে আপনার খারাপ রিলেশন আছে আমি জানি, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ ভাষায় বলেনি, তবে সেন্সটা এই রকমই। তখন আর গগনদা বলে ডাকছিল না।

মারধর করার চেষ্টা করেছিল?

হ্যাঁ, দু'-চারটে কথা চালাচালি হল। আমি দুম করে বলে বসলাম, বেগম কি আমার জন্যই নষ্ট? ওর তো অনেক খদ্দের, খোঁজ নিয়ে দেখোগে। আমি আবার মিথ্যে কথাটথা বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না। বেগমের সঙ্গে আমার রিলেশনটা যে অন্য রকম যে কোনও লোক হলে তা দিব্যি বানিয়ে-ছানিয়ে বলত। আমি পারিনি। যা হোক, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেমক্কা একটা পিস্তল বের করল পকেট থেকে। ওর চোখ দুটো তখন পুরো খুনির। দোকানের পিছনের সেই জায়গাটা আবছা অন্ধকার মতো। সেই আবছায়ায় দু'-চারজন যে গা-ঢাকা দিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারছিলাম। তাদেরই একজন এ সময়ে বলে উঠল, ফলি, চালাস না। স্টিল ভরে দে। ফলি তাতে দমেনি। পিস্তলটা তুলে বলল, তোমাকে এইখানে নাকখত দিতে হবে, থুতু চাটবে, জুতো কামড়ে ঘুরবে, তারপর তোমার পাছায় লাথি মারব। বুঝলাম খুন না-করলেও ফলি এবং তার বন্ধুরা আমাকে বেদম পেটাবে। তার আগে নানা রকম ভাবে অপমান করবে। ফলি আর আগের ফলি নেই।

তুই কী করলি?

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অতটা ভয় না পেলে আমি ফলিকে মারতাম না।

মেরেছিলি?

গগন অবাক হয়ে বলে, তুই কি বলিস, মারা উচিত হয়নি?

ছটকু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি।

গগন একটু অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে, আমিও ভেবে দেখেছি মারাটা উচিত হয়েছে কি না, কিন্তু আমার আর কী করার ছিল? বুঝি যে মায়ের নষ্টামির জন্য ছেলের অপমানবোধ হয়, হতেই পারে। কিন্তু ফলির মাকে তো আমি নষ্ট করিনি, কোনও দিনই আমি মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরি না, কিন্তু বেগম আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। তার জন্য ফলি খামোখা আমার উপর শোধ নেবে আর আমি দাঁড়িয়ে মার খাব নাকি? তা ছাড়া তখন প্রাণের ভয়।

কী করলি?

ফলি চোখেই দেখতে পেল না কী ওর মুখে গিয়ে লাগল, খুব কুইক ঝেড়েছিলাম ঘুষিটা। ফলি অ্যাই জোয়ান। সহজে কাবু হওয়ার মাল নয়, তার ওপর হাতে পিস্তল ছিল। কাজেই সে ছিল

নিশ্চিন্ত। আশেপাশে বন্ধুবান্ধবও রয়েছে। ভয় কী? তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা ঘুসি খেয়েই টলে পড়ল সামারসল্ট হয়ে। আমি দুই লাফে বেরিয়ে বাজার ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি।

তা হলে তোকে অনেকে দেখেছিল তখন।

দেখাই স্বাভাবিক। দোকানে লোক ছিল, বাজারে তো তখন গিজগিজ করছে।

কেউ তোর পিছু নেয়নি?

না।

তারপর কী করলি?

সোজা জিমনাশিয়ামে চলে যাই।

ছটকু আবার পাইপ ভরে বলে, রিকশাওয়ালা কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল গগন?

গগন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর যেন ছিপি খুলে সোডার বোতলের গ্যাস বের করে দেয়, আস্তে করে বলে, জানি না।

এমনিতেই শব্দহীন ঘর। তার ওপর যেন আরও ভারী এক নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ছটকু গগনের চোখে চোখ রেখে চোখাদৃষ্টিতে কী একটু দেখে নেয়। তারপর গম্ভীর মুখেই বলে, ঠিক বলছিস?

গগন ভাবছে, ছটকু শালা কি আমাকেই সন্দেহ করছে? করারই কথা অবশ্য। ঘটনা যা ঘটেছে তার সবকিছুই আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে।

গগন ছটকুর চোখের দিকে আর না-তাকিয়ে বলে, আমি টাকা দিইনি। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য হয়তো কখনও কালুকে টাকাটা দেব। যদি তাতে মেটে!

মিটবে না।— ছটকু বলে।

গগন বলে, বিশ্বাস কর, ফলিকে একটা ঘুসি মারা ছাড়া আর-কিছু করিনি। এক ঘুসিতে মরার ছেলে ফলি নয়। পরে আর-কেউ লাইনের ধারে ফলিকে মারে।

ছটকু খুব বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, দ্যাখ গগন, যে মানুষ জীবনে একটাও খুন করেছে তাকে চোখে দেখেই আমি চিনতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ইনস্টিংট আছে। এ ব্যাপারে কখনও ভুল হয় না আমার। তুই যদিও কখনও ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কাউকে খুন করে থাকিস, তবে তোকে প্রথম দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা খুবই সত্যি কথা যে তোর চেহারায় খুনির সেই অবশ্যম্ভাবী ছাপটা নেই।

গগন নিশ্চিন্ত হল কি? বলা যায় না, তবে সে এবার কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে দম নিল। বলল, আমি যে খুন করিনি তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! কিন্তু লোকে কি তা বিশ্বাস করবে? সকলের তো আর তোর মতো ইনস্টিংট নেই।

ছটকু একটু হাসে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, ফলি যে লাইফ লিড করত তাতে যে-কোনও সময়ই তার খুন হওয়ার বিপদ ছিল। এ নিয়ে ভাবিস না। কাল থেকে আমি তোর ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাকশনে নামব। সকালে ক'টায় উঠিস?

খুব ভোরে। চারটে-সাড়ে চারটে।

ছটকু একটু ভেবে বলে, আমি উঠি ছ'টায়, কিন্তু কাল থেকে আমি তোর মতো সকালে উঠব। মনে হচ্ছে, একটু একসারসাইজ দরকার। সকালে উঠে দৌড়োবি?

নয় কেন?

দৌড়ের পর দু'জনে একটু কসরতও করা যাবে, কী বলিস?

গগন হাসে। বলে, ঠিক আছে।

নয়

অনেক রাত পর্যন্ত বেগম অঝোরে কেঁদেছে পুত্রশোকে। নরেশ পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। বড় ডোজের সেডেটিভ ইনজেকশন দেওয়ার পর বেগম ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলা অবধি সে ওঠেনি।

নরেশ সারারাত ঘুমোয়নি। কখনও কেঁদেছে, কখনও পায়চারি করেছে ঘরে বা ছাদে। শোভা তার তীব্র জ্বালা-ধরা দু'খানা চোখে দেখেছে সবই, সেও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে বিছানায় গেছে, আবার উঠেছে, দেখেছে, তারপর আবার শুয়েছে। বিছানা খুব তেতে যাচ্ছিল বার বার। কী এক জ্বালায় তার নিজের শরীর আর শ্বাস এত গরম যে বিছানায় শরীর রাখতে পারছে না। সোফা কৌচে বসতে পারে না। নরেশের সঙ্গে মুখোমুখি কথাও হচ্ছিল না তার। দু'জনেই দু'জনকে এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে শোভা গিয়ে ঘুমন্ত বেগমকে দেখেছে। চোখের কোলে এখনও জল বেগমের, চুল উসকোখুসকো, একটু বুড়োটে হয়ে গেছে মুখের শ্রী, তবু এখনও বেগম হাড়জ্বালানি সুন্দরী। শোভার ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়ে মারতে। চিরকাল খোলাখুলি পুরুষদের নাচাল বেগম। কত মেয়েমানুষের স্বামী কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করেছে। নরেশ হল বেগমের ভেড়ার পালের একজন।

শেষরাতে যখন আকাশের তারা ফিকে হচ্ছে তখন শোভা আর থাকতে না পেরে ছাদের সিঁড়িতে গিয়ে নরেশকে ধরল।

তুমি ভেবেছটা কী, অ্যাঁ?

নরেশ তার দিকে খুব আনমনে চেয়ে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, তুমি বিছানায় যাও।

কেন যাব? তোমার হুকুমে?

আমার মন ভাল নেই। একা থাকতে দাও।

মন ভাল নেই কেন? ফলির জন্য?

নরেশ বলে, শোভা , তুমি মানুষ নও? ফলি কি তোমার কেউ নয়?

শোভা খুব খনখনে পেতনির হাসি হেসে বলে, ওমা! সে কথা কি বলতে আছে? ফলি যে আমার বুকের ধন, কোলের মানিক! লজ্জা করে না তোমার?

কী বলছ?

কী বলছি বুঝতে পারছ না, ন্যাকা!

পারছি না।

আমি জানতে চাই শালির ছেলের জন্য তোমার অত ভেঙে পড়ার কী? দয়া করে রহস্যটা বলবে, না কি আমার মুখ থেকে শুনবে?

নরেশ গুম হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, এ সময় রাগারাগি থাক, তুমি শুতে যাও।

আমি শোব না। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে আগে শুনি, তারপর কী করব না করব তা আমি জানি।

আমার কিছু বলার নেই।

ফলি কার ছেলে, তাও ঠিক জানো না?

নরেশ চুপ করে থাকে।

শোভা আবার সেই পেতনির হাসি হেসে মোটা শরীরে হিল্লোল তুলে বলে, আমার গর্ভে হয়নি বটে কিন্তু বেগম হারামজাদির পেটে ফলি এসেছিল কী করে তা আজ স্বীকার হও না কেন?

তুমি যাবে?

জবাবটা এল অপ্রত্যাশিত একটা প্রচণ্ড চড় হয়ে।

মোটা হলেও শোভার হাজারটা ব্যামো। হার্ট খারাপ, প্রেসার বেশি, মেয়েমানুষি রোগও অনেক,

তা ছাড়া আরামে আয়েসে থেকে শরীর অকেজো। চড়টা লাগতেই চার ধাপ সিঁড়ি টপকে অত বড় লাশটা পড়ল সিঁড়ির মোড় ঘোরার চাতালে। বাড়ি কেঁপে গেল তার পড়ার শব্দে।

দশ

বাড়িতে ঢুকেই কালু বুঝতে পেরেছিল, জায়গাটা গরম আছে। তার মতো লোকের ঘরে ঢুকে মস্তানরা যখন হুটোপাটি করে গেছে তখন বুঝতে হবে কেস খারাপ।

মা প্রথম দিকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, একটু বাদে দম ফুরিয়ে ঘ্যাজর-ঘ্যাজর করতে লাগল।

সেদিকে মোটে কানই দিল না কালু। বলল, ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথাটা বলে লে দিকি। কী হয়েছে কী?

তোকে যমে নেয় না কেন বলবি?

অরুচি বলে নেয় না। কারা এসে হাল্লাক করে গেছে?

সে গিয়ে তোর পেয়ারের লোকদের জিজ্ঞেস কর গে। আমি কি সবাইকে চিনে রেখেছি? নাহ'ক হাবুকে আর ভুতুকে ধরে এই মার কি সেই মার। কেবল জিজ্ঞেস করে, কালু কোথা বল। আমি ঠেকাতে গেলাম তো আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কনুই ছ'ড়ে এখনও রক্ত পড়ছে।

হাবু ভুতু কই?

তারা থানায় গেছে।

কালুর মাথাটা ঠিক নেই। বড্ড ঘোঁট পাকাচ্ছে চার দিকে। বলল, কাউকে চিনতে পারিসনি?

হাবু বলছিল একজন নাকি বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে সুরেন খাঁড়া না কে যেন!

কালু সময় নষ্ট করল না। সোজা উঠোনে গিয়ে কচুগাছের গোড়ার মাটি খামচে তুলে ফেলল। তলায় একটা প্লাস্টিকের খামে তার টাকা। সেটা তুলে পকেটে পুরে সে গিয়ে মাকে বলে, আমি পাতলা হচ্ছি। খুঁজিস না। বাড়িতে থাকলে শালারা আবার আসবে।

কী করেছিস বল! নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

চেঁচাস না। জানাজানি হলে আমিও যাব, তুইও যাবি।

ভয় পেয়ে মা চুপ করে যায়।

কালু অপথ-কুপথ ঘুরে স্টেশনে চলে আসে। বিশে গনগনে আঁচে বেগুনি ভাজছে। কালু গিয়ে সোজা সেখানে বসে পড়ে বলে, গাড্ডায় পড়ে গেলাম।

বিশে এক খদ্দেরকে বিদেয় করে বলে, আজ মাল খাওয়াবি বলেছিলি।

মাইরি খাওয়াব। আমাকে দু'-একদিন থাকতে দিবি?

বিশে হেসে বলে, থাকার জন্য স্টেশন আছে।

কালু মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক।

গাড্ডা কী?

বাড়িতে হামলা করছে শালারা।

কারা?

আছে।

রামরতন রিকশাওয়ালা চপ কিনতে এসে কালুকে দেখে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বলে, অ্যাই শালা! তোকে নাকি শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়েছে?

কালুর মেজাজ ভাল নেই। উঠে সটাং করে এক চড় কষাল রামরতনের গালে। বলল, জল ভরে দেব শালা। গেলবারে গুপ্তর দোকানের মাল সরিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি ঘোরোনি?

রামরতন বেশি ঘাঁটাল না। কালু একা নয়, বিশে আছে। বিশে মহা মারকুট্টা ছোকরা। স্টেশনের ভিখিরিদের দঙ্গলটা দরকার মতো বিশের পক্ষ নেয়। বিশে ওদের ভাজা বেসনের কুঁড়ো আর নিংড়ানো মুড়ি দিয়ে হাতে রাখে। তাই রামরতন গালে হাত বুলিয়ে বলল, খচছিস কেন? আমি শালা ভাল কথা বলতে গেলাম।

কালু আর বসল না। বিশেকে বলল, আমি সাঁজের পর আসব।

বিশে মাথা নাড়ে।

কালু স্টেশন রোড ধরে সোজা হাঁটা দেয়।

ঘুরে-ফিরে কোথাও যাওয়ার নেই দেখে সন্তুদের বাড়ির কাছে চলে আসে কালু। এসে দেখে নরেশবাবুদের বাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। দোতলা থেকে নরেশের মোটা গিন্নির চেঁচানি আসছে, সব জানি, সব জানি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব তোমার চরিত্রের কথা।

সন্তু নীচের তলায় ছিল। কালুর এক ডাকে বেরিয়ে এসে বলল, চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।

দু'জনে সিংহীদের বাগানে ঢুকে পড়ে।

সবেদা গাছটা ন্যাড়া করে ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। সেই গাছের তলায় বসে সন্তু গম্ভীর মুখে বলে, তুই এ রকম ডে-লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

তাতে তোর বাবার কী?

মুখ খারাপ করিস না কালু।

কালু হেসে বলে, রং লিস না সন্তু। আমি কাউকে ভয় খাই না।

সন্তু কালুর দিকে ভ্রু কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে, যখন প্যাঁদানি খাবি তখন বুঝবি।

কালু বলল, ছোড় বে।

সন্তু চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।

আমার ভাল নিয়ে তোর মতো ভদ্দরলোকদের ভাবতে হবে না। আগে বল কী বলতে চেয়েছিলি।

সন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে। তুই পুলিশকে গগনদার নাম বলেছিস?

আমি বলব কেন?

তবে কে বলেছে?

তার আমি কী জানি? গগনদাকে ফাঁসিয়ে আমার কী লাভ?

কিন্তু সবাই জানে তুই গগনদার নাম বলেছিস। গগনদা কাল পালিয়ে গেছে।

কালু এটা জানত না। একটু থমকে গিয়ে একগাল হেসে বলে, লাগ ভেলকি লাগ। খুব জমে গেল মাইরি।

সন্তু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ কালু মুখ গম্ভীর করে বলল, সুরেন শালাকে আমার বাড়ি চেনাল কে বল তো?

তার আমি কী জানি!

জানিস না?

আমি জানব কী করে?

আমার বাড়িতে সুরেন গিয়ে হামলা করেছে কেন তা জানিস?

সন্তু স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু খুব তেজের গলায় বলে, ও সব আমার জানার কথা নয়।

সুরেন আমার কাছে কী চায় তাও জানিস না?

না।

এর আগেও সুরেন আমাকে একবার মেরেছে। শালা জানে না, কালু রিকশাওয়ালা হলেও মেড়া নয়। শালার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ও সব আমাকে বলছিস কেন?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ সুরেনকে আমার বাড়ির পাত্তা লাগিয়েছে। নইলে আমার বাড়ি চেনার কথা ওর নয়।

আমি ঠিকানা দিইনি।

কালু খুব হীন চোখে সন্তুর দিকে চেয়ে বলে, কাল তুই আমাকে ছোরা চমকেছিলি, মনে আছে?

সন্তু জবাব দেয় না। অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

কালু বলে, আমি কিছু ভুলি না।

সে তোকে মারার জন্য নয়। ভয় দেখানোর জন্য।

কালু হাত বাড়িয়ে বলে, ছুরিটা দেখি।

কাছে নেই।

কালু এক্কেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে পটাং করে একটা লাথি লাগাল সন্তুর থুতনিতে। লাথিটা তেমন জোরালো হল না। কালুর শরীরে এখন আর তত তেজ বল নেই। সন্তু শালা ভাল খায়-দায়, গগনের কাছে ব্যায়াম শেখে। শক্ত জান, তবু আচমকা লাথি খেয়ে মুখ চেপে মাটি ধরে নিল।

কালু সময় নষ্ট করে না। পড়ে-থাকা সন্তুর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে মালটা বের করে ফেলে। বিলিতি ছুরি, কল টিপলে ছ' ইঞ্চি ইস্পাত বেরিয়ে আসে পটাং করে।

সন্তু যখন উঠল তখন কালুর হাতে ফলাটা জমে গেছে। চকচক করছে রোদে। কালু বলল, দেখ শালা, আমার জানের পরোয়া নেই। দরকার হলে আমি লাশ ফেলব। ঠিক করে বল, সুরেনকে কে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

দাঁত বসে গিয়ে সন্তুর ঠোঁট ফেটে হাঁ হয়ে আছে। অঝোর রক্ত। হাতের পিঠে ক্ষতস্থান মুছে নিজের রক্ত দেখল সন্তু। তারপর খুব ঠান্ডা চোখে চাইল কালুর দিকে!

কালু কখনও ছুরি চালায়নি, সন্তু জানে। এও জানে, কালুর শরীরে কিছু নেই। তবে রোখ আছে।

হিসেব করতে কয়েক পলক সময় নিল সন্তু। গগনের কাছে সে বিস্তর প্যাঁচ শিখেছে।

সন্তু কী করল তা চোখে ভাল দেখতেও পেল না কালু। কিন্তু হঠাৎ টের পেল তার ছুরির হাতটা মুচড়ে ধরে সন্তু তাকে উপুড় করে ফেলেছে। পিঠে হাঁটু চেপে বসিয়ে মাথাটা ঠুকবার তাল করছে মাটিতে।

কালুর লাগে না। মারধর সে বিস্তর খেয়েছে। প্রায়ই খায়। মুহূর্তে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে পটাং করে শরীরটা ছুড়ে দিল উলটোবাগে। সন্তু ছিটকে গেল।

দু'জনেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসে পরস্পরের দিকে। কালুর হাতে আধলা ইট, সন্তুর হাতে ছুরি।

এগারো

খুব ভোরেই উঠে পড়তে হল গগনকে। ভোরে ওঠা তার অভ্যাস, তার ওপর এখন প্রবল দুশ্চিন্তা চলছে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে যখন বাসি বিছানাটা নিজেই গোচ্ছাচ্ছে, তখন ছটকুর ঘর থেকে অ্যালার্ম বাজার শব্দ এল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ছটকু ফিটফাট হয়ে এসে গগনের দরজায় টোকা মেরে ডাকে, গগ্, উঠেছিস?

উঠেছি।

চল।

গগনের মন ভাল নেই। সকালে উঠে শরীর রক্ষার জন্য দৌড়ানো বা ব্যায়াম করার মতো মন এখন তার নয় তবু ছটকুর আগ্রহে যেতে হল।

বড়লোকি সব ব্যাপার। ছটকু তার ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে ময়দানে এল। ঘড়িতে সোয়া চারটে। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে দুই বন্ধুতে ধীরলয়ে দীর্ঘ দৌড় শুরু করে। পাশাপাশি।

গগন টের পায়, ছটকু নেশাভাং যাই করুক এখনও ওর প্রচণ্ড দম। প্রায় মাইল দুই দৌড়ের পর বরং গগনের কিছু হাঁফ ধরেছে, কিন্তু ছটকু একদম ফিট।

বাড়িতে ফিরে ছটকু গগনকে নিয়ে গেল তার জিমনাশিয়ামে। ছোটর মধ্যে এত ভাল জিমনাশিয়াম গগন চোখেও দেখেনি। প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি ঝা-চকচকে নতুন আর দামি। বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আনা।

ছটকু বলে, এ সব পড়েই থাকে বেশির ভাগ। আমি মাঝে মাঝে খেয়াল হলে ব্যায়াম করি।

দু'জনে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা নীরবে নিখুঁত ব্যায়াম করে যায়। গগন নিজে প্রশিক্ষক, কাজেই ব্যায়ামের খুঁটিনাটি সব তার জানা। কিন্তু সেও অবাক হয়ে যায় ছটকুর নিখুঁত ব্যায়াম দেখে। কোথাও কোনও খাঁকতি নেই।

ব্যায়ামের পর দু'জনেই গ্লাভস পরে কিছু সময় ঘুসোঘুসি করে। ছটকু খুবই ভাল লড়ে। ওর বাঁ হাতের ছোবল বিষে ভরা। গগন দুটো ভুতুড়ে ঘুসি খেয়ে গেল ছটকুর হাতে। বলল, তুই এখনও একটি বিচ্ছু আছিস। লড়া ছেড়ে দিলি কেন?

আরে দূর! লড়ে হবে কী?

কিন্তু এখনও তোর ঘুসিতে অনেক ব্যাপার আছে।

ছটকু গ্লাভস খুলে ফেলে উদাস মুখে বলে, কী জানিস! আসলে আমার জীবনটা তো হ্যাপি নয়। চারদিকটার ওপর আমার আক্রোশ। ঘরে একটা কালো সাপ পুষছি। কেউ আমাকে বোঝে না, আমার প্রতি কারও সিমপ্যাথি নেই। সেই সব দুঃখে, রাগ, আক্রোশ সব আমার ঘুসিতে বেরোয়।

গগন বুঝতে পারে। ছটকুর জন্য তার একটু মায়াও হয়। বড়লোকেরাও দুনিয়াতে সুখে থাকে না তা হলে!

গগনের চিন্তা ভাত-কাপড় নিয়ে। অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় তার দিন ক্ষয় হয় রোজ। সে লড়াই ছটকুর নেই। তবু ভগবান ওকেও তো সুখ দেননি।

এলাহি জলখাবারের আয়োজন টেবিলে সাজানো। বেশিরভাগই ইংলিশ খানা। হ্যাম অ্যান্ড এগ, পরিজ, টোস্ট, ফল। গগন মাছ-মাংস খায় না বলে তার জন্য অনেকখানি ছানা দেওয়া হয়েছে। আর বাদামের শরবত।

গগন খুব বেশি খায় না। পেট ভার করে খাওয়া তার ভীষণ অপছন্দ। ছটকুও বেশি খেল না। সাজানো খাবারের অধিকাংশই পড়ে রইল।

ছটকু তার পাইপ ধরিয়ে বলে, তুই তো জুডো শিখছিলি, না?

হ্যাঁ।

আমিও শিখেছিলাম লন্ডনে।

জানি।

জুডো শেখার সময় যে শপথ করানো হয়, তা মনে আছে গগ্?

আছে।

ছটকু হেসে বলে, নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ছাড়া কাউকে আঘাত করা যাবে না।

জানি।

আমার সে নিয়মটা প্রায়ই ভাঙতে ইচ্ছে করে। বুঝলি! আজকাল মাঝে মাঝে আমার মাথা ভিসুভিয়াস হয়ে যায়।

গগন ব্যাপারটা বুঝল না । চুপ করে রইল।

সামু খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। আর একজন উর্দি পরা লোক কফির ট্রে নিয়ে এল।

গগন কফি বা চা খায় না। ছটকু কালো কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে, কাল রাতে আই হ্যাড অ্যানাদার এনকাউন্টার উইথ হার।

গগন চোখ নামিয়ে নেয়। ছটকু এবং তার বউয়ের প্রসঙ্গটা বড় অপ্রীতিকর বলে তার মনে হয়। সে লক্ষ করেছে সকালে জলখাবারের টেবিলে ছটকুর বউ লীনা আসেনি। কিন্তু ভদ্রতায় বলে, আসা উচিত ছিল। তবে গগন নিজেকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে করে, তাই তার প্রতি কেউ তেমন সৌজন্য না দেখালেও সে কিছু মনে করে না।

কিন্তু ছটকুর বোধহয় ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। কফি আর পাইপে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে হঠাৎ বলল, দুনিয়ার কাউকেই ও মানুষ বলে মনে করে না । কাল রাতে আই হ্যাড টু বিট হার।

গগন ব্যথিত হয়ে মুখ তোলে। বলে, সে কী রে! মারলি?

মারতে হল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। আই অ্যাম এ ফলেন গায়।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আফটার অল মেয়েমানুষ তো!

তুই মেয়েমানুষ চিনিস না গগ্। চিনলে অত দয়া হত না তোর। মেয়েমানুষকে যারা অবলা বলে তারা অনভিজ্ঞ। ওদের মতো এত নিষ্ঠুর আর নেই।

গগন রাত্রিবেলা কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘুম খুব চটকা। তার ওপর গতকাল সে ভাল ঘুমোয়নি। তবে কি ছটকুর ঘরটাও সাউন্ড-প্রুফ করা? কিন্তু তা হলে সকালে অ্যালার্মের আওয়াজ এল কী করে?

ছটকু অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, কিন্তু মেরেও লাভ হয় না। লীনা যেমন-কে-তেমনই থেকে যায়। তেমনি কোল্ড-ব্লাডেড, ক্রুয়েল, সেলফিশ, অ্যামবিশাস।

সামু সবই শুনছে। গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, চল। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া এখন আমার আর পথ নেই।

ছটকুর ফিয়াট গাড়িটা যখন প্রকাশ্য দিনের আলোয় পাড়ায় ঢুকছে তখন গগনের বুকটা একটু বেশি ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে।

ছটকু গগনের গ্যারাজ-ঘরের সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গগনের দিকে ফিরে একটু হেসে বলল, দ্যাখ গগ্, তুই আর আমি একসঙ্গে বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। সুতরাং ঘাবড়াবি না। আমার মনে হয় না কেউ তোকে খামোখা ধরপাকড় করতে আসবে।

গগন গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তা নয়। তবে আমার লজ্জা করছে। তুই এখানে এলি কেন?

এখান থেকেই কাজ শুরু করব বলে।

বেরোবার আগে ছটকু অনেকক্ষণ টেলিফোনে যাদবপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠার জোরে ছটকু থানা-পুলিশের খাতির পায়। সকলের সঙ্গেই তার ভাল ভাবসাব।

টেলিফোনে কী কথা হয়েছে তা গগন শোনেনি। কথা বলার পর ছটকু তাকে সংক্ষেপে জানিয়েছে, যাদবপুর থানা থেকে যেটুকু জানবার জেনে গেছি। এখন তোর কোনও ভয় নেই।

গগনের তবু ভয় যায় না।

বেলা বেশি হয়নি। দশটা বোধহয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ চার দিক পোড়াচ্ছে। ছোট্ট গাড়িটা এর মধ্যেই তেতে ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গগনকে একটা রোদ-চশমা ধার দিয়েছে ছটকু। নিজেও একটা পরেছে। ছদ্মবেশ খুবই সামান্য। তবু হয়তো লোকের চোখ থেকে কিছুটা আড়াল করা যাবে নিজেকে।

নরেশের বাড়ির ওপরতলা থেকে শোভার প্রচণ্ড গলার শব্দ আসছে। বোধহয় সে নরেশেরই শ্রাদ্ধ করছিল, মায়ের পেটের বোন না হাতি। ঢ্যামনা কোথাকার। কার হুকুমে তুমি ওকে কোলে করে এনে এ বাড়িতে তুলেছ? বাড়ি আমার নামে।

জবাবে একজন পুরুষ বোধহয় কিছু বলল।

শোভার গলা তুঙ্গে উঠে যায়, বেশ করেছি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। একশোবার দেব। নির্দোষ লোকের নামে খুনের নালিশ করেছ, তোমার নরক হবে না!...হ্যাঁ হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে তো আছে...তোমার ভাব নেই কারও সঙ্গে? ঢলানি মাগিটার সঙ্গে তো লোককে দেখিয়েই শোয়া-বসা করো।

গাড়িটা লক করতে করতে ছটকু মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল, অ্যানাদার লীনা।

দু'-চারজন লোক তাদের লক্ষ করছিল। আশপাশের জানলা দিয়ে প্রচুর উঁকিঝুঁকিও টের পায় গগন।

ছটকুর তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে সে চার দিকে তাকিয়ে দেখে। পাইপ ধরায়। তারপর বলে, চল।

কোথায়?

নরেশের ঘরে। বেগমকে একটু ক্রস করা দরকার।

বেগম? সে এখানে থাকে না।— গগন বলে।

এখন আছে, চল।

গগনের বুক অসম্ভব কেঁপে ওঠে। পিছোনোর উপায় নেই। তবু বলল, তুই যা, আমি অপেক্ষা করি।

ছটকু ভ্রু কুঁচকে বলে, তাতে লাভ হবে না। বেগমের সামনে তোর প্রেজেন্স খুব দরকার। নইলে ও শকড হবে না। বেগমের লেখা সেই চিরকুটটা কি হারিয়ে ফেলেছিস?

গগন মনে করতে পারল না। বলল, কোথায় রেখেছি কে জানে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছটকু বলল, এমন কিছু এসেনশিয়াল নয়। তুই পিছনে আয়, আমি আগে উঠছি।

দোতলায় নরেশের বৈঠকখানার দরজা খোলাই রয়েছে। ভিতরের কোনও ঘর থেকে শোভার গলা আসছে, সবাইকে বলব ফলির আসল বাপ তুমি। ওই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গে তোমার শোয়া-বসা।

ছটকু খুব হাসছে শুনে।

দু'বার কলিংবেল বাজানো সত্ত্বেও কেউ এল না। তিনবারের বার ঝি এসে খোটকা মুখ করে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাইছ?

ছটকু রোদ-চশমাটা এতক্ষণ খোলেনি। এবার খুলল। মুখটা ভয়ংকর গম্ভীর। চোখে ভীষণ ভ্রুকুটি। ছটকুর চোখ খুবই মারাত্মক। যখন রেগে যায় তখন তার দিকে তাকাতে হলে শক্ত কলজে চাই।

ঠান্ডা গলাতেই ছটকু নির্দ্বিধায় বলল, তোমার বাপকে চাইছি।

ঝিটা কেমনধারা হয়ে গেল। চোখেমুখে, স্পষ্টই ভয়। কথা বলল না, কিন্তু শুকনো মুখে চেয়ে রইল।

ছটকু প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল, যাও, গিয়ে নরেশবাবুকে ডেকে দাও।

ঝি চলে গেল। ছটকু নিঃসংকোচে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা কৌচে গা এলিয়ে বসে গগনকে ডাকল, আয় গগ।

গগন খুব সংকোচের সঙ্গে ঢুকল, যেন বাঘের ডেরায় ঢুকছে। গরমে এমনিতেই তার ঘাম হচ্ছিল। এখন হঠাৎ তার সারা গায়ে ফোয়ারার মতো ঘামের স্রোত নামছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে, চোখে জিভে নোনতা জল ঢুকছে।

অনেকক্ষণ বাদে নরেশ এল। ভিতরে শোভার চেঁচামেচি একটু থেমেছে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে এখনও, তবে বকবকানির।

নরেশের পরনের লুঙ্গিটা উঁচু করে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, চোখ লাল, চুল উসকোখুসকো, যেন এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকেই নরেশ আচমকা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল। বিস্ময়ে বোবা। চোখ পটপটাং করে খুলে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ছটকু উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় নরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লোহার হাতে চেপে ধরে বলল, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। বসুন।

ছটকুর কণ্ঠস্বরে কিছু ভদ্রতা থাকলেও আচরণে নেই। সে নরেশকে ধীরে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল।

নরেশ ঝেঁঝে উঠে বলল, হাত ধরছেন কেন?

ছটকু হেসে বলে, লাগল বুঝি?

নরেশ সে কথার জবাব না দিয়ে ছটকুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এ সব কী ব্যাপার?

প্রশ্নটা গগনকে করা। নরেশ ছটকুকে চেনে না।

গগন জবাব দেয় না।

ছটকু কৌচে এলিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে বলে, নরেশবাবু, গগনকে অ্যারেস্ট করতে আপনি পুলিশ ডেকেছিলেন?

নরেশ হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, একশোবার ডাকব, শালার গুন্ডার দল! ভেবেছ কী তোমরা? বাড়িতে ঢুকে গায়ের জোর দেখানো হচ্ছে? অ্যাঁ?

বলতে বলতে আচমকাই নরেশ বে-হেড হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা জয়পুরি ফুলদানি তুলে তেড়ে এল গগনের দিকে, গুন্ডামির আর জায়গা পাওনি?

ছটকু হাত বাড়িয়ে নরেশের হাত টেনে ধরল এবং নিছক একটি ঝাঁকুনিতে তাকে নিস্তেজ করে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, মেইনলি আমরা বেগমের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে নয়। তবে আপনাকেও দু'-একটা জরুরি কথা বলা দরকার। সেটা পরেও হতে পারবে। এখন বেগমকে ডেকে দিন।

নরেশ যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ংকর রাগী চোখে সে ছটকুকে দেখল, তারপর বলল, বেগমের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনারা বেরিয়ে যান।

ছটকু পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে. বেয়াদপির সময় এটা নয়। গগন আমার বন্ধু। তাকে আপনি না-হক হ্যারাস করেছেন, পেছনে পুলিশ লাগিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে রসের কথা বলতে আসিনি। বেশি ত্যাঁদড়ামি করলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যাব মেরে।

ছটকুর এই গলার স্বর গগনও চেনে না। খুবই ঠান্ডা গলা, কিন্তু তাতে ইস্পাতের মিশেল। যে শোনে সে জানে ছটকু প্রত্যেকটা কথাই মেপে বলছে। একটুও ভয় দেখাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছে তা-ই করবে।

নরেশ এবার চোখ নামিয়ে বলল, বেগম ঘুমোচ্ছে।

ছটকু কিছু অধৈর্যের সঙ্গে বলল, তাকে তুলে দিন।

সে অসুস্থ। তার ছেলে মারা গেছে।

সেটা আমরা জানি। তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভিতরের দরজার পরদা সরিয়ে হঠাৎ শোভা

ভিতরে আসে। তার চেহারাটা বড় কিস্তুত দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাগলির মতো উড়োখুড়ো, মুখ ফুলে রাবণের মা, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গগনের দিকে চেয়ে বলল, আবার এসেছেন? ভাল চান তো পালান। নইলে ওই বদমাশ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। জানেন না তো, ওর এখন পুত্রশোক।

নরেশ উঠে শোভার দিকে তেড়ে যায়। গগন আটকানোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল। ছটকু হাত বাড়িয়ে ইশারা করায় থেমে গেল।

নরেশ তেড়ে গিয়ে শোভাকে মারল না বটে, কিন্তু জাপটে ধরে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে ছিটকিনি পড়ল ভিতর থেকে।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, ছটকু চল।

ছটকু না-নড়ে বলে, দাঁড়া।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প বাদেই অন্য একটা দরজার পরদার আড়ালে একটা ফোঁপানির শব্দ উঠল, হিক্কা তোলার আওয়াজ। তীব্র হতাশার গলায় কোনও মহিলা বলে উঠলেন, সব গেল রে...!

ঠিক তারপরেই পরদা সরিয়ে খানিকটা টলমলে পায়ে বেগম ঘরে ঢোকে। খুবই করুণ তার চেহারা। সুন্দরী বেগমকে কে যেন চোখের জল আর শোকের শুষ্কতা দিয়ে চটকে মেরেছে। সব রূপটুকু ধুয়ে তার চেহারায় বয়সের ভাঁটা ফুটে উঠেছে এখন।

বেগম তার দু'খানা বিভ্রান্ত চোখে গগনকে চেয়ে দেখল। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল, আমার ফলি কোথায় গেল?

ছটকু খুব নরম গলায় বলে, আপনি বসুন।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে-যাওয়া গলায় বেগম বলে ওঠে, হা ভগবান!

তারপর নিজের অজান্তেই বুঝি সোফায় বসে পড়ে বেগম। চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ভিজিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে বেগম, শুধু থরথর করে তার রক্তহীন সাদা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ছটকু বলে, ফলির মৃত্যুতে গগনের কোনও হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।

বেগম তার রক্তবর্ণ চোখে চাইল। প্রথমে কিছু বলল না। সামলাতে সময় নিল।

কিন্তু সামলে নিলেও সে। আঁচলে চোখ মুছল। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন...কবে যেন?

গগন বলল, পরশু।

বেগম গগনের দিকে স্থির চোখে চায়। তারপর একটু শিউরে উঠে বলে, সেদিন ফলি সন্ধের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। বলল, গগনদা আমাকে মেরেছে। আপনি কি ওকে সত্যিই মেরেছিলেন?

গগন চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে মারত। ওর হাতে পিস্তল ছিল।

বেগম ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে, জানি। ওর কাছে পিস্তল থাকত। ইদানীং ও খুব বিপদের জীবন কাটাত। আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি, সে পাপের শাস্তি পেলাম গগনবাবু।

ছটকু নরম স্বরে বলে, কিন্তু ফলির মৃত্যুর পেছনকার ঘটনাটা আমাদের দরকার।

বেগম মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, ফলি গগনবাবুকে মারবার জন্য প্ল্যান করেছিল। মারা মানে খুন নয়। উলটে ও নিজেই মার খায়। সন্ধেবেলা যখন আমার কাছে এল তখন ভীষণ ফুঁসছে, ও রকম রেগে যেতে ওকে আর কখনও দেখিনি।

ছটকু হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেদিন?

বেগম মুখটা নামিয়ে রেখেই বলল, হ্যাঁ। শুধু ঝগড়া নয়, আমাকেও ও মারে।
গগন অবাক হয়ে বলে, মেরেছে?
আমার ওপর ওর ভয়ংকর রাগ ছিল। যতটা ভালবাসত ততটাই ঘেন্না করত আমাকে। আমার সম্পর্কে ওর কানে কে যেন কিছু খারাপ গালগল্প বলে বিষ ঢেলেছে, সেই দিন ও আমার জবাবদিহি চায়, আমি ওকে যত শান্ত করতে চাই, ও তত রেগে ওঠে। অবশেষে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়, চড়-চাপড় মারে, গালাগাল করতে থাকে। হয়তো আরও মারত, পাড়ার লোক এসে ঠেকায়। তখন ও কার ওপর যেন শোধ নেবে বলে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তখন এত দিশেহারা যে ওকে আটকাতে পারিনি। পারলে—
ছটকু জিজ্ঞেস করে, ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনও কথাবার্তা হয়নি?
না। সেদিন গগনবাবুর কাছে মার খেয়ে ফলি রাগে বেহেড হয়ে যায়। কেবল গগনবাবুর নামই করছিল। সেই থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে—
ছটকু মাথা নেড়ে বলে, ভুল সন্দেহ বেগম দেবী।
বেগম ছটকুর দিকে স্থির-চোখে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তা হলে ফলিকে কে মেরেছে?
সেটা অনুমানের ব্যাপার।
ছটকু গম্ভীর মুখে বলে। তারপর পাইপ ধরায়।
অনুমানটা কী?
তার আগে বলুন এ পাড়ায় ফলি আর কার কার কাছে যেত?
আমি তা জানি না। আমার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হত না। তবে শুনেছি আমার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে ধার করে টাকা নিত। কিন্তু বাড়িতে আসত না। গদিতে গিয়ে দেখা করত।
আর কেউ?
বেগম ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবে। তারপর বলে, না, আর কারও নাম কখনও বলেনি।
আচমকা ছটকু প্রশ্ন করে, আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আসেননি?
বেগম অবাক হয়ে বলে, স্বামী? তিনি তো কাজে...মানে বাইরে গেছেন।
তিনি ফলির মৃত্যু-সংবাদ জানেন?
শুনেছেন।
বাইরে কোথায় গেছেন?
বলে যাননি।
তাঁর কলেজের ঠিকানাটা দিতে পারেন?
বেগম একটু গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তাঁকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। ওর শরীর খারাপ, তার ওপর এই ঘটনা।
ছটকু উঠে পড়ে। বলে, আপনার এই শোকে কিছু বলার নেই। শুধু অনুরোধ, গগনকে খামোকা ঝামেলায় জড়াবেন না। গগন ফলিকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার জন্য। ও খুনে নয়।
বেগম একবার গগনের দিকে তাকাল। কবে সেই ভালবাসা মরে গেছে। এখন আছে শুধু কিছু সন্দেহ আর আক্রোশ।
তবু গগন বেগমের চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজল কি?

বারো

মধ্য কলকাতার বিশাল কলেজবাড়ির ভিতরে ফলির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আর খোঁজখবর করতে হল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি থেকে বেয়ারা প্রায় ধরে আনল অ্যাপ্রন পরা বুড়ো মানুষটিকে।

বাঁ চোখের চশমার কাচ ফাটা, মুখে ক'দিনের বিজবিজে সাদা কাঁচা দাড়ি, মোটা গোঁফ ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। ক্ষয়া ছোট চেহারা। চোখে সন্দেহের বা কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। একটু ভিতু ভাব। পুত্রশোক অবশ্যই তাঁকে স্পর্শ করেনি। নিজেই প্রশ্ন করলেন, আপনারা আমাকে কেন খুঁজছেন?

এঁকে চেনেন?— বলে ছটকু গগনকে দেখিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র গগনকে খুব ঠাহর করে দেখে বলেন, দেখেছি। ফলিকে ব্যায়াম শেখাত।

ফলি মারা গেছে, জানেন?

জানি।— মহেন্দ্রর চোখে-মুখে অস্বস্তি।

আমরা ফলির বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

জানার কিছু নেই। অতি বখাটে ছেলে ছিল। মরেছে, তা সে নিজেরই দোষে।

শেষ কবে আপনার ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মহেন্দ্র ভেবে-টেবে বলেন, কবে যেন! পরশুই হবে।

কোনও কথা হয়নি?

যত দূর মনে পড়ে, ও খুব রেগেমেগে বাড়িতে এসেছিল। কোনও দিনই আমার সঙ্গে বনে না। ওর সঙ্গেও না, ওর মায়ের সঙ্গেও না। আমরা একটা অদ্ভুত পরিবার।

কোনও কথা হয়নি?

তেমন কিছু নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ফলি আমার ছেলে কি না তাও আমি জানি না। ওর মায়ের চরিত্র ভাল নয়।

করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আশেপাশে বহু ছেলে-ছোকরার যাতায়াত। কেউ হয়তো কথাটা শুনে ফেলতে পারে ভেবে গগন বরং সিঁটিয়ে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলেন, তাই ও ছেলের জন্য আমার তেমন দুঃখ নেই।

ছটকু হতাশ হয় না। আস্তে করে বলে, কিন্তু আমার এই বন্ধুকে ফলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ নির্দোষ।

মহেন্দ্র ফাটা কাচের চশমা দিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব নির্দোষ কি?

ছটকু দৃঢ়স্বরে বলল, অন্তত খুনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

তা হবে। সে সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।— মহেন্দ্র বললেন।

সংসারে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা আর মূল্যহীনতায় ভুগে ভুগে মহেন্দ্র এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, আর কোনও ঘটনাকেই তেমন আমল দেন না। তাঁর মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় আর কারও কাছ থেকেই কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

ছটকু বলল, আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন?

মহেন্দ্র একটু হাসলেন। সামনের চার-পাঁচটা দাঁত নেই। হাসিটা ভৌতিক এবং শ্লেষে ভরা। বললেন, আমার কিছু করার নেই। ফলির মা শাস্তি পাচ্ছে, একমাত্র সেটাই সান্ত্বনা! প্রায়শ্চিত্ত যে এখনও করতে হয়, চন্দ্র-সূর্য যে বৃথা ওঠে না, সেটা জেনে বড় ভাল লাগছে।

ছটকু মহেন্দ্রবাবুর কাঁধ হাত বাড়িয়ে ধরে খুব নরম স্বরে বলে, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দরকার হলে আমার এই বন্ধু সাক্ষ্য দেবে, আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়।

মানুষের দুর্বলতা কোথায় কোন সুপ্ত মনের কোণে থাকে কে জানে! কিন্তু ছটকু ঠিক জায়গায়

খোঁচাটা মেরেছে। মহেন্দ্রর চোখ হঠাৎ উৎসাহে চিকমিকিয়ে ওঠে। দু' পা হেঁটে মহেন্দ্র বলে, এখানে নয়। চলুন, একটা ঘর আছে।

ল্যাবরেটরির পাশেই একটা ছোট বসবার ঘর। ফাঁকা। সেখানে অনেক ক'টা কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতে ধুলোর আস্তরণ।

মহেন্দ্র গোটাতিনেক চেয়ার একটা ঝাড়নে পরিষ্কার করলেন। সবাই বসলে মহেন্দ্র বললেন, বেগমকে আমি জানি। তাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করি! তবে আমি শরীরের দিক থেকে খুব পটু ছিলাম না। বেগম বদমাইশি শুরু করল বিয়ের দু'-তিন বছরের মধ্যে। সবই টের পেতাম, তবে তাকে রেড-হ্যান্ডেড ধরতে পারিনি কখনও।

চেষ্টা করেছিলেন?— ছটকু স্বাভাবিক কৌতূহল দেখায় যেন।

না। ভয় করত। মনে হত, রেড-হ্যান্ডেড ধরলে মুখোমুখি ওর লাভারের সঙ্গে লড়াই লেগে যেতে পারে। তা ছাড়া চক্ষুলজ্জা।

অথচ ধরতে চান?

খুব চাই। কিন্তু ধরলেই বা কী করব? থানা-পুলিশ আদালতে যেতে পারব না। তা হলে লোকলজ্জা। নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারব না। কারণ শক্তি নেই। এমনকী দুটো কথা যে শোনাব, তাও বেগমের সঙ্গে গলার জোরে পেরে উঠব না। তাই ধরতে চাইলেও সেটা চাওয়াই থেকে যাবে।

এতকাল ধরে ব্যাপারটা সহ্য করলেন কী করে?

মানুষ সব পারে, পারতে হয়।

স্ত্রীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান না?

মহেন্দ্র হেসে বললেন, শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন।

ভগবানের দেওয়া শাস্তিতে কি মানুষের মন ভরে?

আমার মতো দুর্বলের সেইটেই একমাত্র ভরসা।

ছটকু হেসে ফেলে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলে, মহেন্দ্রবাবু, আমি নিজে ভাল বক্সার। গায়ের জোরে এখনও যে-কোনও পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে আমি আজও এঁটে উঠতে পারিনি। আমি আপনার মতোই দুর্বল। কিন্তু সেটা মনের দুর্বলতা, শরীরের নয়। কাজেই আপনি শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল বলেই নিজেকে দুর্বল ভাববেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরের অভাবে প্রকৃত সাহসীদের কেউ দুর্বল ভাবেনি।

মহেন্দ্র যেন বহুকাল পর এক ভরসার কথা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, কথাটা খুব ঠিক। আমার মনের জোর কম নেই। কিন্তু বেগমের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়ানো। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু বরাবর নিজেকে ছোট ভেবেছেন!

মহেন্দ্র প্রসন্ন হেসেই বললেন, কী করা ঠিক হত বলুন তো।

চাবকানো।— পাইপে টান দিয়ে ধীরস্বরে ছটকু বলে।

ওটা পারতাম না।

এবার পারবেন।

মহেন্দ্র গগনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি সাক্ষী দেবেন?

গগনের কান-মুখ গরম হয়ে ওঠে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছটকুর সব বেহায়া কাণ্ড!

ছটকুই বলে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই গগনের ফিজিকাল রিলেশন ছিল।

গগন ভেবেছিল মহেন্দ্র এ কথা শুনে ফেটে পড়বে।

কিন্তু তার বদলে মহেন্দ্র চেয়ার আর-একটু কাছে টেনে এনে বিগলিতভাবে বললেন, তা হলে এই প্রথম আমি একটা প্রমাণ পাচ্ছি। একটু বলুন তো এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা!

গগন লজ্জা ভুলে ভীষণ অবাক হয়।

ছটকু সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে বলে, ও কী বলবে? ওর তো দায়িত্ব ছিল না। চেহারাটা ভাল বলে আপনার স্ত্রীই ওকে পিক-আপ করে।

মহেন্দ্র গগনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, চেহারাটা ভাল। আপনারা দু'জনেই ব্যায়াম করেন, না?

করি।— ছটকু জবাব দেয়।

আমারও খুব শখ ছিল। হয়নি। অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে গেলাম। আমার স্ত্রী কী রকম করত আপনার সঙ্গে?— গগনকে জিজ্ঞেস করেন মহেন্দ্র।

ছটকু গগনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, বল না।

গগন টের পায়, মহেন্দ্র খুবই কুৎসিত মনোরোগে ভুগছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেহ-সম্বন্ধ নেই, ঘৃণা আর রাগের সম্পর্ক। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর অবদমিত শারীরিক ক্ষুধা মেটেনি বলেই তা আজ বিকৃতভাবে তৃপ্তি খুঁজছে, স্ত্রীর প্রেমিকের কাছ থেকে তিনি সেই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিবরণ চান।

ছটকু আবার ঠেলা দিয়ে চোখের ইশারা করে বলে, বল না।

মহেন্দ্রও বলে ওঠেন, ও কি খুবই কামুক? বাঘিনীর মতো?

গগন অস্পষ্ট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

কামড়ে দিত আপনাকে? মারত?

হ্যাঁ।

ছটকু বাধা দিয়ে বলে, আর সব পরে শুনবেন মহেন্দ্রবাবু, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক। সেদিন ফলির সঙ্গে আপনার কী কথা হয়?

মহেন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তবে সে উত্তেজনা আনন্দের। চোখ চকচক করছে, মুখটা উজ্জ্বল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটা চালু করলেন। চারিদিকে ধুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

মহেন্দ্র মুখোমুখি বসে বললেন, ফলি কোনও দিনই আমাকে পাত্তা দিত না। বুঝতেই পারছেন, মা যদি সম্মান না করে তার ছেলেমেয়েরাও কোনও দিন বাবাকে সম্মান করতে শেখে না। বেগম কোনও দিন আমাকে মানুষ বলেই মনে করেনি কিনা! তবে ফলি যখন খুব ছোট ছিল, তখন কিন্তু আমাকে ভীষণ ভালবাসত।

আপনি কি বরাবরই জানতেন যে, ফলি আপনার ছেলে নয়?

মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে ভৌতিক দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, ওই একটা বিষয়ে আমি আজও ডেফিনিট নই। ফলি যখন জন্মায় তখনও ওর মা'র সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই কী করে বলি ও আমারই ছেলে নয়? তবে ওর চেহারা স্বভাব কিছুই আমার মতো ছিল না।

তারপর?

বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর ফলি জন্মায়। তখন বেগম খুব বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। আমি তখন ঝিমিয়ে গেছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন খুব খারাপ। ফলি সে সময়ে জন্মায়। তার আগে অবশ্য আমি গোপনে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, সন্তানের বাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। তাই ফলি জন্মানোর পর আমি তাকে নিজের ছেলে মনে করে খুব ভালবাসতাম। পরে ও বড় হলে বেগম ওর মন বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফলে বেগমেরও কিছু লাভ হয়নি। ফলি ওকেও দেখতে পারত না। এক ছাদের তলায় আমরা তিন শত্রু বসবাস করতাম।

ফলির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হত?

না, কারও সঙ্গেই আমার মুখোমুখি ঝগড়া ছিল না। তবে মানুষ মানুষকে অপছন্দ করলে সেটা মুখে বলার দরকার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়।

তা ঠিক।

তবে ফলির সঙ্গে আমার কখনও-সখনও কথা হত। ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে হতই না।

সেদিন কী কথা হল?

আমি সন্ধের বেশ কিছু পরে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি চলছে। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেই শুনলাম ফলি তার মাকে খুব মেরেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। এর আগেও ফলি কয়েক বার ওর মাকে মারধর করেছে। বড় হয়ে মায়ের গুণের কথা শুনেছে তো! ছেলে হয়ে মায়ের বদমাইশি সহ্য করে কী করে? সে যাই হোক, গোলমাল দেখে আমি আর বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বাদে দেখি ফলি খুব জোরে হেঁটে আসছে। ওর মুখ-চোখ খুনির মতো। কী যেন হল আমার, ওকে ডাকলাম। ও থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারে। কিন্তু ও সব করল না। খুব ঠান্ডা গলায় বলল, নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো না? আমি তার জবাব দিলাম না। মনে মনে জানি, আমাকে মারতে হবে না। মা-ব্যাটায় নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরবে একদিন। যাক গে, ফলি আমাকে বলল, সিংহীদের বাগানে আমার সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ দেখা কোরো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। তবে রাত আটটার অনেক আগে।

বলে মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টি এমনিতে যতই নির্বিকার মনে হোক, ছটকু টের পেল মহেন্দ্র কিছু একটা বলতে চান। তাই সে নরম স্বরে বলল, কী দেখলেন সেখানে?

ফলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আগে আগে পৌঁছে ভাবলাম, জায়গাটা ঘুরে দেখি। বুড়ো সিংহীর অনেক টাকা ছিল। কৃপণ লোক ছিলেন। আমার ধারণা, সিংহীবাড়ির কোনও গুপ্ত জায়গায় বিস্তর লুকোনো টাকাকড়ি বা সোনাদানা আছে। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই গুপ্তধনের শখ। একটা টর্চ ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ঘরের দরজায় তালা ছিল। তবে একটা জানালার পাল্লা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি সেই পাল্লা খুলে দেখি, লোহার গরাদের একটা শিক ভাঙা। ঢোকা যায় দেখে ঢুকেই পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি, ধুলোটুলো কিছু নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। এদিক-ওদিক ঘুরে একটা ভিতর দিকের ঘরে গিয়ে দেখি, খাটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে। শতরঞ্চি, মোমবাতি, তাস , সিগারেটের অনেক প্যাকেট আর খালি মদের বোতল। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই গুন্ডা-বদমাশের আস্তানা। ভয় খেয়েও অবশ্য পালাইনি, ভাল করে চারধারের সবকিছু দেখে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ বাইরে কোথায় চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দোতলার সিঁড়ির তলায় গা-ঢাকা দিই। বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই ফলি আর কয়েকজন লোকের গলা পেলাম। খুব ঝগড়ার গলায় কথা হচ্ছিল। ফলি চিরকালের ডাকাবুকো। শুনলাম সে বলছে, গগনকে আজই খতম করব। তারপর তোদেরও ব্যবস্থা হবে। আমি তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। শুধু গলা শুনেছি।

কোনও স্বর চেনা মনে হয়নি?

না। ফলির গলা ছাড়া আর কারও গলা চিনতে পারিনি। তবে একজনের গলা খুব মোটা। যেন মাইক লাগিয়ে কথা বলছে। সে ফলিকে বলল, গগন তোর মা'র সঙ্গে লটগট করেছে, তাতে আমাদের কী? আমরা খুনখারাবির মধ্যে নেই। একজন বুড়ো মানুষের গলাও পেয়েছিলাম বলে মনে হয়। তবে সে যে কী বলেছিল তা ধরতে পারিনি।

আর কিছু?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, না, কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আর সেখানে থাকবার সাহস পাইনি।

ফলি আপনাকে কী বলতে চেয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারেন?— নিভন্ত পাইপে আবার আগুন দিয়ে ছটকু বলে।

না। আপনাদের সঙ্গে পরে আবার কথা হতে পারে। এখন আমার কাজ আছে।— বলে মহেন্দ্র উঠে পড়লেন।

ছটকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ফলির জন্য আপনার কোনও শোক নেই?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, থাকার কথাও নয়। একে সে আমার ছেলে কি না তাই সন্দেহের বিষয়, তা ছাড়া অতি বদমাশ ছেলে।

তেরো

কী হয়েছিল তা কেউ বলতে পারবে না।

সন্তুর হাতে-মুখে রক্ত চটচট করছে। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। গোঙাতে গোঙাতে সে কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে কালু নট নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সিংহীদের নির্জন বাগান। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পায় না। সন্তু যখন শেষবার জ্ঞান ফিরে পেল তখন তার শরীর এত দুর্বল যে, বাগানটা হেঁটে পার হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবাই যায় না। চোখে সে সবকিছু সাদা দেখছে। বমি আসছে বুক গুলিয়ে। ওঠার ক্ষমতা নেই। হাঁফ ধরে যাচ্ছে শুধু টানার পরিশ্রমে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনওক্রমে বসে। তারপর বহু দিন বাদে তার চোখ দিয়ে হু-হু করে কান্নার জল নেমে আসে।

আর সেই কান্নার আবেগে আর-এক বার সে জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফেরে আবার। তাকিয়ে দেখে সে একটা ঘরে শুয়ে আছে। তার মাথা-মুখ ভেজা।

চোখ খোলার পরই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। দাড়িওলা সেই ভয়ংকর মুখ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। দয়ামায়া রস-কষহীন এক মানুষ এই নানক চৌধুরী।

ঠান্ডা গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কালুকে মেরেছ?

এ কথার জবাব সন্তুর মাথায় আসে না। কিন্তু খুব আবছা হলেও তার মনে পড়ে, কালুকে মারবার সুযোগ সে পায়নি। ছুরি নিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে কালুর ইটের ঘায়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তারপরও আবছা মনে পড়ে, কালু ছুটে এসে ইটটা তুলে তার মুখে মাথায় বার বার মেরেছে। তারপরও যদি সে কালুকে মেরে থাকে, তবে তা সজ্ঞানে নয়।

সন্তু বলল, মনে নেই।

নানক গম্ভীর হয়ে বলেন, কালুর পেটে আর বুকে ছুরির জখম। কাজটা ভাল করোনি।

এক ভয়ংকর আতঙ্কে সন্তু চোখ বুজল। খানিক বাদে আবার চোখ খুলল। সে শুয়ে আছে সিংহীদের বাড়িতে। এই ঘরেই একদা তাকে নীলমাধব মেরেছিল। এ বাড়িতেই সে একদিন গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিতে এসে এক রহস্যময় অচেনা লোকের হাতে মার খায়।

সন্তু ডাকল, বাবা!

তার গলাটা কেঁপে যায়।

নানক সামান্য ঝুঁকে বলেন, কী?

এ বাড়িতে কে থাকে?

কে থাকবে?— নানক অবাক হয়ে বলেন, কেউ থাকে না।

সন্তু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। তেষ্টায় গলা শুকনো। জিভে ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে, কেউ থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একবার কে যেন এখানে আমার মাথায় পিছন থেকে লাঠি মেরেছিল।

নানক ঘটনাটা জানেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, জানি না।

সন্তু তার বাবার দিকে তাকায়। বাবার পাঞ্জাবির হাতায় রক্ত লেগে আছে। দাড়ির ডগাতেও তাই। তাকে বাগান থেকে তুলে আনবার সময় বোধহয় লেগেছে। তবু সন্তু তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে নানা কথা উঁকি মারে।

সন্তু হঠাৎ বলল, আমি কালুকে মারিনি।

তুমি ছাড়া কে?

তা জানি না। তবে আমি নই।

নানক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, সে কথা এখন ভাববার দরকার নেই। ঘুমোও।

আমি বাড়ি যাব।

একটু পরে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আরও ব্লিডিং হতে পারে।

সন্তু তার বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বলে, মা'র কাছে যাব। আমাকে এখানে রেখেছেন কেন?

নানক গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি সময়মতো এসে না-পড়লে এতক্ষণ তুমি বাগানেই পড়ে থাকতে!

সন্তু উঠবার চেষ্টা করে বলে, কালু কি এখনও বাগানেই পড়ে আছে?

নানক ঠান্ডা গলায় বলেন, ও বোধহয় বেঁচে নেই।

কিন্তু আমি ওকে মারিনি। ও একটা মার্ডার কেস-এর ভাইটাল আই-উইটনেস।

এ সব কথা সন্তু ডিটেকটিভ বই পড়ে শিখেছে। সে জানে কালু মরে গেলে ফলির খুনের কিনারা হবে না।

নানক তার বুকে হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিলেন। একটু কড়া গলায় বললেন, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শোনো, কালুর সঙ্গে যে তোমার আদৌ দেখা হয়েছে তা আর কাউকে বলতে যেয়ো না।

কেন?

নানক বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার ভালর জন্যই বলছি। এইটুকু বয়সেই তুমি সব রকম অন্যায় করেছ। তুমি ইনকরিজিবল। কিন্তু তবু আমি চাই না, পুলিশ তোমাকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাক।

কিন্তু কালুকে আমি মারিনি।

সেটা আমি বিশ্বাস করি না, পুলিশও করবে না। কাজেই বেয়াদবি করে লাভ নেই। যা বলছি শোনো।

সন্তু আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

নানক বললেন, তুমি ছাড়া কেউ কালুকে মারেনি।

আমি নই।— সন্তু গোঁ ধরে বলে।

তুমিই। আমি ভাবছি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেব। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

সন্তু চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মন নিশ্চুপ নয়। সেখানে অনেক কথার বুদ্বুদ উঠছে। সে খুব নতুন এক রকম চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। তারপর এত ব্যথা আর যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষীণ একটু হাসে।

গগন আর ছটকু যখন সিংহীদের বাড়িতে ঢুকল তখন বিকেল যাই-যাই। এর আগে তারা আর-একটা মস্ত কাজ সেরে এসেছে। মৃত্যুপথের যাত্রী কালুকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে।

কালুর জ্ঞান ফেরেনি। ফেরার সম্ভাবনাও খুব কম। অক্সিজেন চলছে। ওই অবস্থাতেই ডাক্তাররা

তার ওপর অপারেশন চালিয়েছে। জানা গেছে তার ফুসফুস ফুটো হয়েছে, পেটের দুটো নাড়ি কাটা। বাঁচা-মরার সম্ভাবনা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

ছটকু পুলিশকে ঘটনাটা ফোনে জানিয়ে দিল। তারপর গগনকে নিয়ে বিকেলের দিকে সোজা আবার গাড়ি চালিয়ে সিংহীদের পোড়ো বাড়িতে।

ছটকু জানে। জেনে গেছে।

সদর দরজায় তালা ছিল, যেমন থাকে। ছটকু একটু চার দিক ঘুরে দেখল। পিছনের বাথরুমে মেথরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকে ছটকু। সঙ্গে গগন।

ভিতরে অন্ধকার জমেছে। এখানে-সেখানে কিছু পুরনো আধন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথুরে মূর্তি। শেষ রোদের কয়েকটা কাটাছেঁড়া রশ্মি পড়েছে হেথায়-হোথায়।

বেড়ালের পায়ে এগোয় ছটকু। এ ঘর থেকে সে ঘর।

অবশেষে ঘরটা খুঁজে পায় এবং চৌকাঠের বাইরে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভিতরে সন্তু ক্ষীণ একটু ব্যথার শব্দ করে বলে, আমি বাড়ি যাব বাবা।

যাবে। সময় হলেই যাবে।

ছটকু সামান্য গলাখাঁকারি দেয়।

অন্ধকার ঘরে নানকের ছায়ামূর্তি ভীষণ চমকে যায়।

ছটকু ঘরে ঢোকে। মাথা নেড়ে বলে, কাজটা ভাল হয়নি নানকবাবু।

নানক অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

ছটকু গগনকে ডেকে বলে, তুই সন্তুকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে যা। ওকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।

গগন ঘরে ঢোকে। গরিলার মতো দুই হাতে সন্তুকে বুকে তুলে নেয়। নিজের ছাত্রদের প্রতি তার ভালবাসার সীমা নেই।

নানক কী একটু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

গগন সন্তুকে নিয়ে চলে গেলে ছটকু পাইপ ধরায়। তারপর নানকের দিকে চেয়ে বলে, আমি সবই জানি। কালু মরেনি।

নানক কথা বললেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ছটকু বলল, কিছু বলবেন?

নানক খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমার ছেলেটা মানুষ হল না।

আমরা অনেকেই তা হইনি। কালুকে কে মারল নানকবাবু?

বদমাশ এবং পাজিদের মরাই উচিত।

কিন্তু সে কাজ আপনি নিজের হাতে করতে গেলেন কেন?

নানক আস্তে করে বললেন, সন্তুর জন্য। ভেবেছিলাম সন্তুকে চিরকাল একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখব। সেই ভয়ে ও ভাল হয়ে যাবে।

নিজের ছেলের স্বার্থে আর-একটা ছেলেকে মারতে হয়?

মাঝে মাঝে হয়।

ছটকু পাইপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল?

আমি। ভেবেছিলাম, কালুকে হাত করে গগনকে ফাঁসাব। ওর ব্যায়ামাগারটা তুলে দেওয়া দরকার। সেখান থেকে গুন্ডা বদমাশের সৃষ্টি হচ্ছে।

ছটকু হেসে বলে, আপনি সমাজের ভাল চান, ছেলের ভাল চান, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা কিছু

১।

বোধহয়।— শান্ত স্বরেই নানক বলেন।

ছটকু আবার হেসে বলে, আর ফলির ব্যাপারটা?

জটিল নয়। ওকে যে মেরেছে সে অন্যায় করেনি।

কিন্তু কে মেরেছে?

নানককে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু গলার স্বরে ঝাঁঝ ফুটল। বললেন, আপনি কে?

আমি গগনের বন্ধু। গগনকে খুনের মামলা থেকে বাঁচাতে চাই।

অ। তা বাঁচবে। গগন খুন করেনি।

সেটা জানি। করল কে?

আমিই করিয়েছি। ফলি এ পাড়ার ছেলেদের নষ্ট করছিল। ড্রাগের নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী নরেশ নজুমদারের বাড়িতে থাকার সময়ে সে এক কুমারীর সর্বনাশ করে। নানক একটু থেমে বললেন, আমি সমাজের ভাল চাই। রাষ্ট্র যা করছে না তা আমাকেই করতে হবে।

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, বুঝলাম।

বুঝলে ভাল!

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু যে-সব গুন্ডাকে টাকা খাইয়ে আপনি ফলিকে মারার কাজে লাগিয়েছিলেন তারাই কি ভাল? তাদের অবস্থা কী হবে?

তারাও মরবে।

কী করে?

তারা আমার টাকা খায়। এ বাড়িতে তাদের আড্ডা আমি মেইনটেন করি। একে একে সবাই যাবে। দুনিয়ায় খারাপ, লোচ্চা, বদমাশ একটাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।

ছটকু নিঃশব্দে বসে রইল। মনটা দুঃখে ভরা।

বাইরে ক্ষীণ পুলিশের বুটের আওয়াজ শুনল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটকু উঠে দাঁড়ায়।

কাগজের বউ

১

ছোঁচা শব্দটা কোত্থেকে এল মশাই? ছুঁচো থেকে নাকি? হাতটান শব্দটারই বা ইতিহাস কী? কিংবা দু' কান-কাটা কথাটাই বা অমন অপমানজক কেন?

অবশ্য অপমান কথাটারও কোনও মানে হয় না। অপমান মনে করলেই অপমান। আমার যা অবস্থা তাতে অপমান গায়ে মাখতে যাওয়াটাও এক লাটসাহেবি শৌখিনতা।

সুবিনয়দের পিছনের বারান্দায় আমি শুই। বারান্দাটা খারাপ নয়। বুক-সমান দেয়ালের গাঁথুনি, তার ওপরটা গ্রিল দেওয়া। বারান্দার অর্ধেকটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে খাওয়ার ঘর হয়েছে, বাকি অর্ধেকটায় এঁটো বাসনপত্র ডাঁই করা থাকে, মুখ ধোওয়ার বেসিন রয়েছে, কয়েকটা প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে খালি। এইসব বাক্সে বিদেশ থেকে কেমিকালস আসে। বিদেশের জিনিস বলে বাক্সগুলো বেশ মজবুত। দিনের বেলা প্যাকিং বাক্সগুলো, মোট তিনটে, একটার ওপর আর-একটা দাঁড় করানো থাকে। রাত্রিবেলা ওগুলো নামিয়ে আমি পাশাপাশি সাজিয়ে নিই। বাক্সগুলো সমান নয়, যার ফলে একটু উঁচু-নিচু হয়। তা হোক, তা হোক। আমার কিছু অসুবিধা হয় না। একেবারে মেঝেয় শোওয়ার চেয়ে এটুকু উচ্চতা মন্দ কী?

বারান্দার লাগোয়া পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে সুবিনয়ের বিধবা মা শোন খাটে, মেঝেয় শোয় ষোলো-সতেরো বছর বয়সের ঝি কুসুম। অন্য ঘরে সুবিনয় এক খাটে শোয়, অন্য খাটে দুই বাচ্চা নিয়ে সুবিনয়ের বউ ক্ষণা। সামনের দিকে আরও দুটো ঘর আছে। তার একটা সুবিনয়ের ল্যাবরেটরি, অন্যটা বসবার ঘর। কিন্তু সেইসব ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়ার কথা ওদের মনে হয়নি। সুবিনয়ের এক বোন ছিল এই সেদিন পর্যন্ত বিয়ে হচ্ছিল না কিছুতেই। যতই তার বিয়ের দেরি হচ্ছিল ততই সে দিনরাত মুখ আর হাত-পায়ের পরিচর্যা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। ছেলে-ছোকরা দেখলে কেমন হন্যের মতো হয়ে যেত, এবং শেষমেষ আমার মতো অপদার্থের দিকেও তার কিছুটা ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ দেখে আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ি। একদিন তো সে পরিষ্কার তার বউদিকে বলে দিল, এই শীতে উপলদা একদম খোলা বারান্দায় শোয়, তার চেয়ে খাওয়ার ঘরটায় শুতে দাও না কেন? এ কথা যখন হচ্ছিল তখন আমি চার-পাঁচ হাত দূরে বসে সুবিনয়ের মুখোমুখি খাওয়ার টেবিলে চা খাচ্ছি। চোর-চোখে তাকিয়ে দেখি, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো সুবিনয়ের বোন অচলার দিকে চেয়ে রান্নাঘরের ভিতরে টুলে-বসা ক্ষণা একটু চোখের ইঙ্গিত করে চাপা স্বরে বলল, উঃ হুঁ!

আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ঠিকই তো! খাওয়ার ঘরে দেয়ালের র‍্যাকে দামি স্টিলের বাসনপত্র, চামচ থেকে শুরু করে কত কী থাকে সরানোর মতো। এখানে আমাকে শোওয়ানো বোকামি। তা সে যাক গে। অচলার যখন ওইরকম হন্যে দশা, তখন আমার এ বাড়িতে বাস সে এক রাতে প্রায় উঠিয়ে দিয়েছিল আর কী! কোথাও কিছু না, মাঝরাতে একদিন দুম করে চলে এসেছিল বারান্দায়। বাথরুমে যাওয়ার প্যাসেজের ধারেই আমি শুই, মাঝরাতে বারান্দা দিয়ে বাথরুমে আনাগোনা করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু অচলা বাথরুমে যায়নি, সটান এসে আমার প্যাকিং

বাঙ্কের বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। সেটা নিতান্ত মানবিক করুণাবশতও হতে পারে। কিন্তু তাইতেই আমার পাতলা ঘুম ভেঙে যেতে আমি 'বাবা গো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম ভূত ভেবে। অচলা সময় মতো পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে বিকট শব্দ করেছিল। গোলমাল শুনে তার মা উঠে এসে বারান্দায় তদন্ত করেন, আমি তাঁকে বলি যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। তিনি তা বিশ্বাস করেননি এবং আমার উদ্দেশেই বোধহয় বলেন, এ সব একদম ভাল কথা নয়। কালই সুবিনয়কে বলছি।

সুবিনয়কে তিনি কী বলেছিলেন কে জানে, কিন্তু সুবিনয় ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। ঘামালে বিপদ ছিল। কারণ, সুবিনয়ের চেহারা দানবের মতো বিশাল এবং রাগলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোনও ব্যাপার নিয়েই সে বড় একটা মাথা ঘামায় না। সর্বদাই সে এক ভাবনার ঘোরে বাস করে। জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তাকে কেউ কোনও কথা বললে সে ভারী বিরক্ত হয়। এই যে আমি তার বাড়িতে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, এটাও যে খুব বাঞ্ছিত ব্যাপার নয় কোনও গৃহস্থের কাছে তাও সে বোঝে না। সে সর্বদাই তার কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে আছে। মস্ত এক কোম্পানির চিফ কেমিস্ট, কিছু পেপার লিখে বৈজ্ঞানিক জগতেও নাম-টাম করেছে। প্রায়ই বিদেশে যায়। সুবিনয় বাংলাদেশের সেই লুপ্তপ্রায় স্বামীদের একজন যাদের বউ খানিকটা সমীহ করে চলে। স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করে, এ ব্যাপারটা আমি আর কোথাও দেখিনি এ জীবনে। সুবিনয়ের এই কর্তৃত্বময় অস্তিত্বের দরুনই আমি এ বাড়িতে বেশ কিছুকাল টিকে আছি। সুবিনয় যে আমাকে তাড়ায় না তার একটা গূঢ় কারণও আছে।

তা বলে যেন কেউ মনে না করেন যে, আমার প্রতি সুবিনয় স্নেহশীল। সত্য বটে, স্কুলজীবনে আমরা সহপাঠী ছিলাম মিত্র ইনস্টিটিউশনে। গলায় গলায় ভাব ছিল তখন। কলেজে ও সায়েন্স নিল, আমি কমার্স। কোনওক্রমে বি কম পাশ করে আমি লেখাপড়া ছাড়ি, সুবিনয় সোনার মেডেল পেয়ে এগিয়ে গেল। আমরা ভিন্ন হয়ে গেলাম। দুই বন্ধুর একজন খুব কৃতী হয়ে উঠলে আর বন্ধুত্ব থাকে না, কমপ্লেকস এসে যায়।

এখন আমাকে সবাই অপদার্থ বলে জানে। কেবল দীর্ঘকাল আমি নিজেই সেটা বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, আমার প্রতিভা একদিন বিকশিত হবেই। আমি মোটামুটি ভাল গান গাইতে পারতাম, চমৎকার থিয়েটার করতাম, নাটক-ফাটকও লিখেছি এককালে উদ্বাস্তুদের দুঃখ নিয়ে, অল্পস্বল্প ছবি আঁকতে পারতাম, সবচেয়ে ভাল পারতাম কাদামাটি দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরি করতে। এত বহুমুখী প্রতিভা নিজের ভিতরে দেখে আমার ধারণা ছিল, একটা না একটা লাইন ধরে আমি ঠিক উন্নতি করব, আর সবক'টা লাইনেই যদি উন্নতি করি তা হলে তো কথাই নেই। আরও অনেকেরই এককালে ধারণা ছিল। আমার বিচক্ষণ বাবা কিন্তু বরাবর বলে এসেছেন, এ ছেলের কিছু হবে না। এত দিকে মাথা দিলে কি কারও কিছু হয়?

আমার পারিবারিক ইতিহাসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। আমার পাঁচ বছর বয়সে মা মারা গেলে বাবা আমার এক মাসিকে বিয়ে করেন। মায়ের পিসতুতো বোন। মাসির এক চোখ কানা আর দাঁত উঁচু বলে তাঁর বিয়ে হচ্ছিল না। আমি সেই মাসির কাছে মানুষ। বি কম পরীক্ষার কিছু আগে বাবা অপ্রকট হলেন। দুনিয়ায় তখন আমার মাসি, আর মাসির আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কেউ কারও ভরসা নই। মাসি বলত, তুই যদি চুরি ছ্যাঁচড়ামি গুন্ডামি বা ডাকাতি করেও দুটো পয়সা আনতে পারতিস!

বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে-সব উন্নতি হয় বলে শুনেছি তার কিছুই আমার হল না। হ্যাঁ, গান আমি এখনও আগের মতোই গাই, সুযোগ পেলে অভিনয়ও খারাপ করব না, আগের মতো নাটকও লিখতে পারি। ছবি কিংবা মাটির পুতুলও আঁকতে বা বানাতে পারি। কিন্তু সে সবও যেন কোথায় আটকে আছে, উন্নতি হয়নি। সিনেমায় নামতে গিয়েছিলাম। দু'-চারটে সিনেমায় চান্সও

পেলাম বটে ছোট ছোট ভূমিকায় কিন্তু তাকে সিনেমায় নামা বলে না ঠিক। দুটো-একটা চাকরিও পেয়েছিলাম, একটার কোম্পানি ক্লোজার হল, অন্যটায় অস্থায়ী চাকরি টিকল না। মাসির লেখাপড়া ছিল না তেমন। বাবা লোকান্তরিত হওয়ার পর মাসি বিস্তর সেলাই-ফোঁড়াই করে সংসার চালাতে গিয়ে একটা ভাল চোখকেও প্রায় খারাপ করে ফেলল। মাসি যখন কাঁদত তখন কিন্তু তার অন্ধ চোখেও জল পড়ত।

বিনা কাজে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। বেশ লাগত। কাজকর্ম না করতে করতে এক ধরনের কাজের আলসেমি পেয়ে বসেছিল। আড্ডার অভাব ছিল না। সংসারের ভাবনা একা মাসিকে ভাবতে দিয়ে আমি চৌপর দিন বাইরে কাটাতাম। নিছক সঙ্গী না জুটলে ময়দানের ম্যাজিক, খোলামাঠের ফুটবল বা ক্রিকেট, ইউসিস লাইব্রেরিতে ঢুকে ছবির ম্যাগাজিন দেখে সময় কাটাতাম। বাবা বাড়ি করে যাননি, ভাড়া বাকি পড়ায় একবার বাড়িওলা হুড়ো দিয়ে তুলে দিল। বুড়ো বাড়িওলা মারা গেছে, ছেলেরা লায়েক হয়েছে। তাদের অত মায়া-দয়া নেই। মহা আতান্তরে পড়ে মাসি তার লতায়-পাতায় সম্পর্কের এক বড়লোক ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে উঠল। ভাই মাসিকে তাড়াল না, গরিব আত্মীয়দের আশ্রয় দিলে বিস্তর কাজ আদায় করা যায়। কিন্তু সেখানে আমার ঠাঁই হল না। তাঁরা পরিষ্কারই বলে দিলেন, তোমার বোনপোকে রাখতে পারব না বাপু, বড়সড় ছেলে, নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে। এ কথা শুনে মাসি বলে, ওমা, বোনপো কী? ও আমার ছেলে, নিজের হাতে মানুষ করেছি যে! কিন্তু তারা কিছুতেই মত দিল না যখন মাসির তখন হাউ-হাউ করে কান্না। আমি মাসিকে অনেক স্তোকবাক্য দিয়ে তখনকার মতো ঠান্ডা করে কেটে পড়লাম। আমার যা হোক, কানা মাসিটা আমার তো না খেয়ে মরবে না। তবে সে বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে, কয়েক বার নেমন্তন্নও খেয়েছি।

তখন হাওড়া-কদমতলা রুটের একটা প্রাইভেট বাসে কন্ডাক্টরি করি। সারাদিন পয়সার ঝনঝন, লোকের ঘেমো গা, গাড়ির চলা, তার মধ্যে কখনও ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ত না যে, আমি বি কম পাশ বা এ কাজের চেয়ে একটা কেরানিগিরি পেলে অনেক ভাল হত। সে যা হোক, কন্ডাক্টরি কিছু খারাপ লাগত না। তবে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়ার সময়ে আমি বেশি সুবিধা করতে পারতাম না। আর একটা লাভও হত বেশ, প্যাসেঞ্জারদের মুখে নানা খবর শুনে শুনে দুনিয়া সম্পর্কে বিনা মাগনা অনেক জ্ঞানলাভও হয়ে যেত। কয়েক দিনের মধ্যেই এলাকার হেক্কোড়দের চিনে ফেললাম, তাদের কাছে টিকিট বেচার প্রশ্ন উঠত না, উলটে খাতির দিতে হত। মনাই ঘোষ ছিলেন এলাকার মাথা। মনে আছে একবার তিনি পঞ্চাননতলার মোড়ে বাস থামিয়ে নেমে গিয়ে লন্ড্রির জামা-কাপড় আনলেন, বাস ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। চোর, ছিনতাইবাজ, পকেটমার বিস্তর চেনা-জানা হয়ে গেল, আজও ও-সব জায়গায় গেলে দু'-চার কাপ চা বিনা পয়সায় লোকে ডেকে খাওয়ায়। আনাড়ি ছিলাম বলে প্রথম দিকে আমার ব্যাগ থেকে বার দুই খুচরো হাপিশ হয়েছে। পরের দিকে কাকের মতো চালাক হয়ে উঠি। বাস চালাত ধন সিং নামে একটা রাজপুত। জলের ট্যাঙ্কের কাছে একবার সে একটা ছোকরাকে চাপা দিলে রাস্তার লোক রে রে করে তাড়া করল। ভয়ে ধন সিংয়ের আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। পঞ্চাননতলার সরু রাস্তায় যে আপ-ডাউন বাস কী করে চলে সেইটাই লোকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না, আর সেই মারাত্মক ভিড়ের সরু রাস্তায় ধন সিং বাসের গতি বোধকরি ত্রিশ-চল্লিশ মাইল তুলে দিল। কোনও স্টপে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে না। প্যাসেঞ্জাররা প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও। এই স্টুপিড! এই উল্লুকের বাচ্চা! এই শুয়োরের বাচ্চা! কে শোনে কার কথা! আমরা দুই কন্ডাক্টর, আমি আর গোবিন্দ, দুই দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বিপদ দেখলেই লাফাব। ধন সিং কদমতলা পর্যন্ত উড়িয়ে নিল বাস। তারপর যেই থামল, অমনি কোত্থেকে যে শয়ে শয়ে লোক জুটে গেল চারধারে কে জানে! পালানোর পথ ছিল না। ধন সিং প্রচণ্ড মার খেয়ে আধমরা হয়ে হাসপাতালে গেল, আমি আর গোবিন্দ ঠ্যাঙানি খেয়ে কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে রইলাম

রাস্তায়। মুখ-টুখ ফুলে, গায়ে গতরে একশো ফোড়ার ব্যথা হয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা।

অনেক পরে চেনা একটা হোটেলের বাচ্চা বয়গুলো এসে আমাদের জলটল দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। দু'জনে কষ্টেসৃষ্টে চেনা দোকানে গিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে বসলাম। ব্যাগ দু'জনেরই হাপিশ হয়ে গেছে, জামা-টামা ছিঁড়ে একাকার, গোবিন্দর চটিজোড়াও হাওয়া। পাবলিক প্যাঁদালে তো কিছু করার নেই। রাগও করা যায় না, কার মুখ মনে করে রাগ করব? গোটা জীবন আর তাবৎ দুনিয়ার ওপর রাগে চোখে জল আসে শুধু। গোবিন্দ আর আমি একটা করে কোয়ার্টার রুটি আর ছোট সানকির মতো কলাই করা প্লেটে হাফ প্লেট করে মাংস নিয়ে বসলাম। মাংস মুখে দিয়েই গোবিন্দ উঁহু উঁহু করে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, জিভটা কেটে এই ফুলেছে মাইরি, নুন ঝাল পড়তেই যা চিড়িক দিয়েছে না! খাই কী করে বল তো!

এ সব কথা যখন হচ্ছে তখনই ছোকরা বয়টা এসে বলল, গোবিন্দদা, আপনার দেশ থেকে আপনার খোঁজে একটা লোক অনেক বার এসে ঘুরে গেছে। ওই আবার এসেছে, দেখুন।

গোবিন্দ মুখ তুলল, আমিও দেখলাম, বুড়ো মতো একটা লোক খুব বিষণ্ণ মুখের ভাব করে এসে বেঞ্চে বসে মুখের ঘাম মুছল সাদা একটা ন্যাকড়া পকেট থেকে বের করে।

গোবিন্দ বলল, তারক জ্যাঠা, খবর-টবর কী? খারাপ নাকি?

হ্যাঁ বাবা। তোমার পিতৃদেব—

গোবিন্দ আঁতকে উঠে বলল, আর বলবেন না, আর বলবেন না।

লোকটা ভড়কে থেমে গেল। আর দেখলাম, গোবিন্দ গোগ্রাসে মাংস-রুটি খাচ্ছে জিভের মায়া ত্যাগ করে। খেতে খেতেই বলল, ও শুনলেই খাওয়া নষ্ট। এখন পেটে দশটা বাঘের খিদে। একটু বসুন, ও খবর পাঁচ মিনিট পরে শুনলেও চলবে। শত হোক, হিন্দুর ছেলে তো! ও খবর শুনলে খাই কী করে!

খাওয়ার শেষে গোবিন্দ উঠে দাম-টাম দিয়ে এল, বলল, চলুন, দেশে যেতে হবে তো?

তারক জ্যাঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা তো হবেই। পরশুদিনের ঘটনা বাবা, মাঠ থেকে ফিরে তোমার বাবামশাই হঠাৎ উঠোনে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কত জল, পাখা, ওঝা, বদ্যি, হাঃ—

গোবিন্দ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, উপল, খবরটা ভাল। তারপর গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, হক্কের মরা মরেছে, জ্যাঠা। আর বেঁচে থেকে হতটা কী? দুনিয়া তো ছিবড়ে হয়ে গিয়েছিল। এই বলে সে আমার দিকে চেয়ে বলল, উপল, তুইও চল। গায়ের ব্যথাটা ঝেড়ে আসবি। দেশে আমাদের ধানজমি আছে। বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল বদমাইশির জন্য, তাই ফিরতে পারছিলাম না। নইলে কোন শালা মরতে কন্ডাক্টরি করে।

বিনা নোটিশে চাকরি ছেড়ে দু'জনে সেই রাতে কেটে পড়লাম হাওড়া জেলার শিবগঞ্জে।

আমার স্বভাব বসতে পেলেই ঠেলেঠুলে শুয়ে পড়া। গোবিন্দর দেশটা বেশ ভালই। বাগনান থেকে বাসে ঘণ্টা কয়েকের রাস্তা। পৌঁছে গেলে মনে হয়, ঠিক এ রকমধারা জায়গাই তো এতকাল খুঁজছিলাম। গোবিন্দদের ধানজমি বেশি না হোক, ওদের দু'বেলা ভাতের অভাব নেই। বিরাট একটা নারকোল বাগান আছে। মেটে দোতলা বাড়িতে বেশ মাঝারি বড় সংসার।

দু'বেলা খাওয়ার-শোওয়ার ভাবনা নেই, আমি তাই নিশ্চিন্তে সেখানে শেকড় চালিয়ে দিলাম। ভরসা হল, বাকি জীবনটা এখানেই কেটে যাবে বুঝি! গোবিন্দ তখন প্রায়ই বলত, দাঁড়া তোকে এ দিকেই সেটল করিয়ে দেব। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই গোবিন্দ বিয়ে করে বসল, আর তার দু'মাস বাদেই গোবিন্দর মুখ হাঁড়ি। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। বুঝলাম, ওর বউ বুদ্ধি দিয়েছে। তবু গায়ে না-মেখে আমি আরও এক মাস কাটিয়ে দিলাম। মোট ছ' মাস পর গোবিন্দর বড় ভাই একদিন খাড়ুবেড়েতে যাত্রা দেখে ফেরার পথে গহিন রাতে রাস্তায় টর্চ ফেলে

ফেলে আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে নরমে গরমে বলেই ফেলল, এ বয়সটা তো বসে খাওয়ার বয়স নয় গো বাপু। গাঁ-ঘরে কাজকর্মই বা কোথায় পাবে। বরং কলকাতার বাজারটাই ঘুরে দেখোগে।

গোবিন্দর বড় ভাই নন্দদুলালের খুব ইচ্ছে ছিল তার মেয়ে কমলিনীকে আমি বিয়ে করি। কিন্তু কমলিনীর বয়স মোটে বারো, সুশ্রীও নয়, তা ছাড়া আমারও বিয়ের ব্যাপারটা বড় ঝামেলা বলে মনে হয়, তাই রাজি হইনি, ঘরজামাই রাখলেও না হয় ভেবে দেখতাম। তা সে প্রস্তাবও নয়, বরং কমলিনীর মা আমাকে প্রায়ই কাজ খোঁজার জন্য হুড়ো দিত, চাষবাস দেখতে পাঠাত। বেলপুকুর বাজারে গিয়ে শুকনো নারকোল বেচে এসেছি কতবার। আখের চাষ হবে বলে গোটা একটা খেত নাড়া জ্বেলে আগুনে পোড়াতে হয়েছিল। এত সব কাজকর্ম আমার ভাল লাগে না। বউ হলে সে আরও তাড়া দেবে সারা জন্ম।

এক বর্ষার রাতে গোবিন্দদের গোলাঘরে চোরে সিঁধ দিল। বিস্তর ধান লোপাট। সকালবেলা খুব চেঁচামেচি হল, তারপর থিতু হয়ে সবাই বসে এক মাথা হয়ে ঠিক করল যে, এবার থেকে আমাকে সারা রাত বাড়ি চৌকি দিতে হবে। একটা নিষ্কর্মা লোক সারা দিন বসে খাবে, কোনও কাজে লাগবে না, এ কি হয়?

দিন পনেরো পাহারা দিতেও হল। এক রাতে ফের চোর এল। আমার চোখের সামনে পরিষ্কার পাঁচ-ছ'জন কালো কালো লোক। তাদের দু'-একজন আমার মুখ চেনা। দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে লণ্ঠন পাশে নিয়ে একটা লম্বা লাঠি উঠোনে মাঝে মাঝে ঠুকছিলাম, দুটো দিশি কুকুর সামনে ঝিমোচ্ছে। এ সময়ে এই কাণ্ড। চোর দেখে ভিরমি খাই আর কী। লাঠি যে মানুষের কোন কাজে লাগে তা তখনও মাথায় সেঁধোচ্ছে না। চোর ক'জন এসে সোজা আমার চারধারে দাঁড়িয়ে গেল, একজন বলল, উপল শালা, মেরে মাঠে পুঁতে দিয়ে আসব, মনে থাকে যেন। কুকুর দুটো দু'বার ভুক ভুক করে হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে লাগল চোরদের খাতির দেখানোর জন্য। দিশি কুকুরদের বীরত্ব জানা আছে। আমিও তাদের দেখে কায়দাটা শিখে গেলাম, এক গাল হেসে বললাম, আরে তোমরা ভাবো কী বলো তো, অ্যাঁ? পাহারা কি আসলে দিই? গুঁতোর চোটে পাহারা দেওয়ায়। যা করার চটপট সেরে নাও ভাই সকল, আমি চার দিকে চোখ রাখছি।

চোরেরা যখন মহা ব্যস্ত ঠিক তখনই আখের বুঝে আমি লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে লম্বা দিলাম। নইলে পরদিন আমার ওপর দিয়ে বিস্তর ঝামেলা যেত।

তা সেই লাঠি আর লণ্ঠন ছাড়া তখন আর আমার কোনও মূলধন ছিল না। আফসোস হল, চোরদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে যদি কিছু নগদ বা ঘটিবাটি গোবিন্দদের বাড়ি থেকে হাতিয়ে আনতে পারতাম তো বেশ হত।

আমার বাবা সারা জীবনটাই ছিলেন ডাকঘরের পিয়োন, শেষ জীবনে সর্টার, আর এক থাক উঁচুতে উঠতে পারলে তাঁকে ভদ্রলোক বলা চলত, তা তিনি উঠতে পারেননি। বিস্তর ধারকর্জ করে খাওয়া-দাওয়া ভাল করতেন। ওই এক শখ ছিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর অর্ধেকই প্রায় ফৌত হয়ে গিয়েছিল ওই কর্মে। সারাটা জীবন তাঁকে কেবল টাকা খুঁজতে দেখেছি। অন্য সব টাকার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বাড়ির আনাচে কানাচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের মতো সার্চ চালাতেন। বিছানার তোশক উলটে, জাজিম উঁচু করে চাটাইয়ের তলা পর্যন্ত, ওদিকে কাঠের আলমারির মাথা থেকে শুরু করে রান্নাঘরের কৌটো বাউটো, পুরনো চিঠিপত্রের বান্ডিলের মধ্যে পরম উৎসাহে তিনি টাকা বা পয়সা খুঁজতেন। কদাচিৎ এক আধটা দশ বা পাঁচ পয়সা পেয়ে আনন্দে 'অ্যাই যে, অ্যাই যে, বলেছিলুম না!' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। ঘরের গোছগাছ হাঁটকানোর জন্য মাসি খুব রাগ করতেন বাবার ওপর। বাবা সে-সব গায়ে মাখতেন না, বরং সুর করে মাসিকে খ্যাপাতেন, 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ. .।' কানা মাসির নামই হয়ে গিয়েছিল কানামাছি।

বাবার কাছ থেকে ওই একটা স্বভাব আমি পেয়েছি। আমারও স্বভাব যখন তখন যেখানে

সেখানে অবসর পেলেই পয়সা খোঁজা, হাটে-বাজারে, রাস্তায়-ঘাটে ঘর-দোরে প্রায় সময়েই আমি হাঁট পাট করে পয়সা খুঁজি। সিকিটা আধুলিটা পেয়েও গেছি কখনও সখনও। না পেলেও ক্ষতি নেই, খোঁজাটার মধ্যেই একটা আনন্দ আছে, যেমন লোকে খামোকা ঘুড়ি উড়িয়ে বা মাছ ধরতে বসে আনন্দ পায় এ অনেকটা সে রকমই আনন্দ।

একবার হরতালের আগের দিন বিকেলে বাবা পবদিনের বাজার করতে গেছেন। তখনও বুড়ো বাড়িওলা বেঁচে। বাজারে বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বুড়ো বাড়িওলা আঁতকে উঠে বললেন, এ কী বাপু, তোমাকে না আজ সকালেই বাজার করে ফিরতে দেখলুম! আবার এ বেলা বাজারে কেন বাবা? বাবা মাথা চুলকে বললেন, কাল হরতাল কিনা, তাই কালকের বাজারটা সেরে রাখছি। শুনে বুড়ো রেগেমেগে খেঁকিয়ে উঠলেন, হরতাল ছিল তো হরতালই হত, শাকভাত নুনভাত কি মুড়ি-টুড়ি চিবিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতে না! অ্যাঁ? এ কী ধরনের অমিতব্যয় তোমাদের, দিনে দু'-দুবার বাজার! এ বয়সেই যদি দুটো পয়সা রাখতে না পারো তো কি গুচ্ছের ছেলেপুলে হয়ে গেলে তখন পারবে? দুটো পয়সার মর্ম যে কবে বুঝবে তোমরা! বয়স হয়ে গেলে কপাল চাপড়াবে।

সেই থেকে বাবা একটা ঠাট্টার কথা পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সময়েই খুক খুক করে হাসতে হাসতে বললেন, দুটো পয়সা রাখতে না পারলে...!

কিন্তু ঠাট্টার কথা হলেও, ওই দুটো পয়সা রাখতে না পারায় কানা মাসিকে ভাইয়ের বাড়িতে ঝিগিরি করতে হচ্ছে। আর আমার হাতে হারিকেন।

বাস্তবিকই হারিকেন আর লাঠি সম্বল করে গোবিন্দর বাড়ি থেকে যেদিন পালাই সেই দিন রাতে ভারী একটা দুঃখ হচ্ছিল আমার। বলতে কী গোবিন্দর বাড়িতে থাকতে আমি দুটো পয়সা করেছিলাম। প্রায় দিনই এটা-সেটা নিয়ে গোপনে বেচে দিতাম, ঘরের মেঝেয় একটা সোনার মাকড়ি কুড়িয়ে পেয়ে রেখে দিয়েছিলাম, দু'-চারটে পয়সা কুড়িয়ে-টুড়িয়ে একটা বাঁশের চোঙায় জমিয়েও রেখেছিলাম। সেই গুপ্ত সম্পদ গোবিন্দদের পশ্চিমের বাতায় গোঁজা আছে। আনতে পারিনি।

২

কাল রাতে সুবিনয় আর ক্ষণা অনেকক্ষণ আমাকে নিয়ে কথা বলাবলি করছিল। ক্ষণা চায় না যে আমি আর এক দিনও এ বাড়িতে থাকি। কথায় কথায় সে তার বরকে বলল, বাজার-ফেরত পঁয়ত্রিশটা পয়সা তুমি খাওয়ার টেবিলে রাখলে আজ সকালে, নিজের চোখে দেখা আমার! পনেরো মিনিট বাদে গিয়ে দেখি পয়সা হাওয়া। তোমার ওই দু' কান-কাটা ছোঁচা বন্ধুটির কিন্তু বেশ ভালরকম হাতটান আছে।

সুবিনয় ঘুমগলায় বলল, পয়সা-কড়ি সরিয়ে রাখলেই হয় সাবধান মতো।

আহা, কী কথার ছিরি? সারাক্ষণ ঘরে একটা চোর ছোঁচা বসবাস করলে কাঁহাতক সাবধান হবে মানুষ? তার চেয়ে ওকে এবার সরে পড়তে বলো, অনেক দিন হয়ে গেছে। আজ তুমি বাজার করলে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই তো তোমার ওই প্রাণের বন্ধুই বাজার করে, বাজারে কত পয়সা হাতায় তার হিসেব কে করছে?

এই রকম সব কথা হচ্ছিল, আমি প্যাকিং বাক্সের বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজায় কান পেতে সব শুনছি। খুবই অপমানজনক কথা। কিন্তু কতটা অপমানজনক তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া, আমাকে শুনিয়েও তো বলেনি যে খামোকা অপমান বোধ করতে যাব!

নিশুত রাতে আমার বিছানায় শুয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে এক ভাঙা চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুম ছুটে

গেল। কী করে বোঝাই এদের যে, আমারও দু'-চারটে পয়সাকড়ির দরকার হয়! আমার সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, আমার আজকাল বড় খিদের ভয়। সারা দিন আমার পেটে একটা খিদের ভাব চুপ করে বসে আছে। ভরা পেটেও সেই খিদের স্মৃতি। কেবল ভয় করে, আবার যখন খিদে পাবে তখন খেতে পাব তো!

আমার আর-একটা সমস্যা হল, পয়সা। পয়সা খুঁজতে খুঁজতে আমার জীবনটা গেল। সেই যে লণ্ঠন আর লাঠি হাতে গোবিন্দদের বাড়ি থেকে নিশুত রাতে বেরিয়ে পড়লাম, সেই থেকে পয়সা খোঁজার বিরাম নেই। পয়সাও যে কত কায়দায় আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে, জীবনভোর লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে তা বলে শেষ হয় না।

লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে সেই পালানোর পর দু'দিন বাদে বাগনানের বাসের আড্ডায় তিনটে ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। তাদের ব্যাবসাপত্র খারাপ নয়, চুরি, ছিনতাই আর ছোটখাটো ডাকাতি করে তাদের ভালই চলে। অনেক বলে কয়ে ভিড়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। তারা আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে, বিস্তর শাসিয়ে সাবধান করে দিল, বেগরবাঁই করলে জান যাবে।

বাগনান বাজারে এক দুপুরে বসে আছি, ছোট্ট একটা খুকি তার বাচ্চা ঝিয়ের সঙ্গে দোকানের সওদা করতে এসেছে। ছ্যাঁচোড়দের একজন কদম বলল, ওই খুকিটা হল হোমিয়ো ডাক্তার কালীপদ ঘোষের ছোট মেয়ে, কানে একজোড়া সোনার বেলফুল দেখা যাচ্ছে। দেখবে নাকি হে উপল ভদ্র?

ওরা কেন যে আমার নামের সঙ্গে ভদ্র কথাটা জুড়ে নিয়েছে তা ওরাই জানে। প্রস্তাব শুনে আমার হাত-পা ঝিমঝিম করছিল। আসলে আমার সব কাজে বাগড়া দেওয়ার জন্য একজন সং আছে। সে আমার বিবেকবুড়ো। যখন-তখন এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করে রাজ্যের হিতকথা ফেঁদে বসে। তাকে না পারি তাড়াতে, না পারি এড়াতে।

ছ্যাঁচোড়দের অন্য একজন হাজু আমাকে জোর একটা চিমটি দিয়ে বলল, দু'দিন ধরে খাওয়াচ্ছি তোমাকে, সে কি এমনি? যাও কাজে লেগে পড়ো। ধরা পড়ে মার খাও তো সেও এ লাইনের একটা শিক্ষা। মারধর বিস্তর খেতে হবে। বাবুয়ানি কীসের?

সত্যিই তো। আমার যে মাঝে মাঝে এক পাগলাটে খিদে পায়। সেই সব খিদের কথা ভেবে বড় ভয় পাই। কাজে না-নামলে কেউ খেতে দেবে কেন? উঠে পড়লাম।

জানা আছে, কালীপদ ঘোষের মেয়ে, কাজেই একটা সুবিধে। অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটিতে খানিকটা বনস্পতি কিনে মেয়েটা রাস্তায় পা দিতেই গিয়ে বললাম, ও খুকি, কালীপদদার কাণ্ডখানা কী বলো তো! পেট ব্যথার একটা ওষুধ কবে থেকে করে দিতে বলছি।

খুকি কিছু অবাক হয়ে বলল, বাবা তো খড়্গপুরে গেছে।

খুশি হয়ে বলি, আমাকে চিনতে পারছ তো? আমি রামকাকা, লেভেল ক্রসিং-এর ধারে রঘুদের বাড়ি থাকি। চেনো?

খুকি মাথা নাড়ল দ্বিধাভরে। চেনে।

আমি বললাম, তোমার বাবা কয়েকটা জিনিস চেয়ে রেখেছিল আমার কাছে, দেব দিচ্ছি করে আর দেওয়া হয়নি। মহীনের দোকানে রেখে দিয়েছি, নিয়ে যাবে এসো।

বলে বাজারের ভিতর দিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যাই। ঝি মেয়েটা দুনিয়া কিছু বেশি চেনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, ও বিন্তি যাসনে, এ লোকটা ভাল না।

ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে এক ধমক মারলাম, মারব এক থাপ্পড় বদমাশ ছোটলোক কোথাকার! এই সেদিনও কালীপদদা বলছিল বটে, বাচ্চা একটা ঝি রেখেছে সেটা চোর। তোর কথাই বলছিল তবে।

ঝি মেয়েটা ভয় খেয়ে চুপ করে গেল। মাথাটা আমার বরাবরই পরিষ্কার। মতলব ভালই খেলে।

খানিকটা ভয়ে, খানিকটা বিশ্বাসে খুকিটা এল আমার সঙ্গে, ঝি মেয়েটাও। বাজারের দোকানঘরের পিছু দিকটায় একটা গলি মতন। মুদির দোকান থেকে একটা ঠোঙায় কিছু ত্রিফলা কিনে এনে খুকির হাতে দিয়ে বললাম, এইটে বাবাকে দিয়ে আমার কথা বোলো, তা হলেই হবে। সবই বলা আছে।

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল, ঠোঙা হাতে আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। পিছু ফিরতেই আমি ফের ডেকে বললাম, ও বিন্তি, তোমার বাপ-মায়ের কি আক্কেল নেই! ওইটুকু মেয়ের কানে সোনার দুল পরিয়ে বাড়ির বার করেছে! এসো, এসো, ওটা খুলে ঠোঙায় ভরে নাও। কে কোথায় গুন্ডা বদমাশ দেখবে, দু' থাপ্পড় দিয়ে কেড়ে নেবে। কালও ছিনতাই হয়েছে এখানে।

মেয়েটা কাঠ হয়ে আছে। ঝি মেয়েটা ঝেঁঝে উঠল, কেন খুলবে, অ্যাঁ? চালাকির আর জায়গা পাওনি?

তাকে ফের একটা ধমক মারলাম। কিন্তু বিন্তিও দুল খুলতে রাজি নয়। মাথা নেড়ে বলল, না, খুলব না। সদ্য কান বিঁধিয়েছি, দুল খুললে ছ্যাঁদা বুঁজে যাবে।

কথাটা আমারও যুক্তিযুক্ত মনে হল। এ অবস্থায় ওর কান থেকে দুল খুলি কী করে?

ছ্যাঁচোড়দের তিন নম্বর হল পৈলেন। সে কম কথা আর বেশি কাজের মানুষ। আমি যখন খুকিটিকে তার ঝি সমেত চলে যেতে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি, ওরাও চলে যাচ্ছে, ঠিক সে সময়ে পৈলেন এসে গলির মুখটা আটকে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, রোগা কিন্তু পাকানো শক্ত চেহারা। কলাকৌশলের ধার দিয়েও গেল না। ঝি মেয়েটাকে একখানা পেল্লায় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, চেঁচালে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব।

সেই দৃশ্য দেখে বিন্তি থর থর করে কাঁপে, কথা সরে না। এক-একটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে পৈলেন পুট পুট করে দুটো বেলকুঁড়ি তার কান থেকে খুলে বলল, বাড়ি যাও, কাউকে কিছু বললে কিন্তু মেরে ফেলব।

রেল স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পৈলেন আমাকে বলল, সব জায়গায় কি আর কৌশল করতে আছে রে আহাম্মক? গায়ের জোর ফলালে যেখানে বেশি কাজ হয়, সেখানে অত পেঁচিয়ে কাজ করবি কেন?

হক কথা।

বেলকুঁড়ি দুটো বেচে যে পয়সা পাওয়া গেল তার হিস্যা ওরা আমাকে দিল না, আমার আহাম্মুকিতেই তো ব্যাপারটা নষ্ট হচ্ছিল প্রায়।

এক দিন পাঁশকুড়া-হাওড়া ডাউন লোকালে তক্কে তক্কে চারমূর্তি উঠেছি। শনিবার সন্ধে, ভিড় বেশি নেই। এক কামরায় একজোড়া বুড়োবুড়ি উঠেছে। বুড়ির গায়ে গয়নার বন্যা। ইদানীং কারও হাতে মোটা বালা সমেত ছ'গাছা করে বারোগাছা চুড়ি, গলায় মটরদানা হার বা কানে ঝাপটা দেখিনি। আঙুলে অন্তত পাঁচ আনি সোনার দুটো আংটি। বুড়োর হাতে ঘড়ি, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। এ যেন চোর-ছ্যাঁচোড়দের কাছে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়ে বেরোনো।

ফাঁকা ফাঁকা কামরায় বুড়ো উসখুস করছে। মুখোমুখি আমরা বসে ঘুমের ভান করে চোখ মিটমিট করে সব দেখছি। বুড়ো চাপা গলায় বলল, এত সব গয়না-টয়না পরে বেরিয়ে ভাল কাজ করোনি। ভয়-ভয় করছে।

বুড়ি ধমক দিয়ে বলল, রাখো তো ভয়! গা থেকে গয়না খুলে রেখে আমি কোনও দিন বেরিয়েছি নাকি? ও সব আমার ধাতে সইবে না।

বুড়ি ঝাঁপি থেকে স্টিলের তৈরি ঝকঝকে পানের বাটা বের করে বসল। বাটাখানা চমৎকার। বারোটা খোপে বারো রকমের মশলা, মাঝখানে পরিষ্কার ন্যাতায় জড়ানো পানপাতা। দামি জিনিস।

পৈলেন আর হাজু গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, আমি আর কদম কামরার দু'ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পৈলেনের পিস্তল আছে, হাজুর ছুরি। কদম নলবন্দুক হাতে ওধার সামলাচ্ছে। কী জানি কেন, আমার হাতে ওরা অস্ত্রশস্ত্র কিছু দেয়নি। কেবল ধারালো দুটো ব্লেড আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরতে শিখিয়ে দিয়েছে হাজু, বলেছে, যখন কাউকে ব্লেড ধরা হাতে আলতো করে গালে-মুখে বুলিয়ে দিবি, তখন দেখবি কাণ্ডখানা। রক্তের স্রোত বইবে।

পৈলেন পিস্তল ধরতেই বুড়ো বলে উঠল, ওই যে দেখো গো, বলেছিলুম না! ওই দেখো, হয়ে গেল।

বুড়ি পানটা মুখে দিয়ে পৈলেনের দিকে তাকিয়ে বলল, এ মিনসেটাই ডাকাত নাকি! ওমা, এ যে একটু আগেও সামনে বসে ঝিমোচ্ছিল গো!

বুড়ো আস্তে করে বলল, এখন ঝিমুনি কেটে গেছে। সামলাও ঠ্যালা।

বুড়ি ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে, আমি সামলাব কেন তুমি পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকতে? এককালে তো খুব ঠ্যাঙা-লাঠি নিয়ে আবগারির দারোগাগিরি করতে। এখন অমন মেনিমুখো হলে চলবে কেন?

পৈলেন ধৈর্য হারিয়ে বলল, অত কথার সময় নেই, চটপট করুন। আমাদের তাড়া আছে।

বুড়ি ঝংকার দিল, তাড়া আছে সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু গয়না আমি খুলছি না। তাড়া থাকলে চলে যাও।

হাজু 'চপ' বলে একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে হাতের আধ-হাত দোধার ছোরাটা বুড়োর গলায় ঠেকিয়ে বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি গয়না খুলতে। যদি দেরি হয় তো এই বুড়োমানুষটার হয়ে যাবে দিদিমা। বিধবা হবেন।

বুড়ি জর্দা আটকে দু'বার হেঁচকি তুলে হঠাৎ হাঁউড়ে মাউড়ে করে কেঁদে উঠে চেঁচাতে লাগল, ওমা গো, ওগো তোমরা সব দেখো, কী কাণ্ড। বুড়োটাকে মেরে ফেলল যে!

কামরায় মোট জনা কুড়ি লোকও হবে না। এধার-ওধার ছিটিয়ে বসে ছিল। কেউ নড়ল না। সবাই অন্যমনস্ক হয়ে কিংবা ভয়ে পাথর হয়ে রইল। কেবল দুটো ছোকরা টিটকিরি দিল কোথা থেকে, দাদাদের কমিশন কত? একজন বলল, ও দাদা, অথরিটি কত করে নেয়? সব বন্দোবস্ত করা আছে, না?

গলায় ছোরা-ঠেকানো অবস্থায় বুড়ো তখন তম্বি করছে, কী ব্যাপার বলো তো তোমার! গা করছ না যে? পাঁচ মিনিটের আর কত বাকি আছে শুনি! শিগগির গয়না খোলো।

বুড়ি তখনও জর্দার ধক সামলাতে পারেনি। তিন-তিনটে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, খুলতে বললেই খুলব, না? এ সব গয়না ফের আমাকে কে তৈরি করে দেবে আগে বলো! তুমি দেবে?

দেব, দেব! শিগগির খোলো।— বুড়ো তাড়া দেয়।

কিন্তু বুড়ি তবু গা করে না। কষ্টেসৃষ্টে একগাছা চুড়ি ডান হাত থেকে আঙুলের গাঁট পর্যন্ত এনে বলে, সেই কবে পরেছিলুম, এখন তো মোটা হয়ে গেছি, এ কি আর খোলা সহজ?

হাজু তার ছোরাটা এগিয়ে দিয়ে পিস্তলটা পৈলেনের হাত থেকে নেয়। পৈলেন ছোরাটা চুড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে এক টানে কেটে নেয়। দিদিমা চেঁচাতে থাকেন ভয়ে, কিন্তু পৈলেনের হাত পাকা, কোথাও একটুও ছড়ে যায়নি। পৈলেন পটাপট চুড়িগুলো কাটতে থাকে।

দিদিমা দাদুর দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কথা দিলে কিন্তু! সব গয়না ঠিক এ রকম তৈরি করে দিতে হবে। তখন নাকিসুরে বলতে পারবে না, এঁখঁন রিঁটাঁয়াঁর কঁরেঁছি, কোঁথেঁকেঁ দেঁবঁ!

দেব, দেব।

দিদিমা তখন চার দিকে তাকিয়ে লোকজনের মুখ চেয়ে বলে, শুনে রেখো তোমরা সব, সাক্ষী রইলে কিন্তু। উনি বলেছেন সব ফের গড়িয়ে দেবেন।

পৈলেন গোটা চারেক চুড়ি ততক্ষণে খুলে ফেলেছে কেটে, চমৎকার কাজ হচ্ছে। হাজু বাঁ হাত বাড়িয়ে বুড়ো লোকটার হাতঘড়ি খুলে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল, এবার গলার কাছে পাঞ্জাবির সোনার বোতামের প্রথমটা খুলে ফেলেছে। আমার কিছু করার নেই, দাঁড়িয়ে দেখছি। বলতে কী ট্রেনের কামরায় ডাকাতির কথা বিস্তর শুনলেও চোখে কখনও দেখিনি সে দৃশ্য। তাই প্রাণভরে দেখে নিচ্ছিলাম।

বুড়ি ফের দুটো হেঁচকি তুলে বুড়োর দিকে চেয়ে বলল, পিস্তলের নল মাথায় ঠেকিয়ে বোকার মতো বসে আছ কী? বোতামটা নিজেই খুলে দাও, নইলে ও মিনসে যেভাবে বোতাম খুলছে পুরনো পাঞ্জাবিটা না ফেঁসে যায়। আর প্রেশারের বড়ি থাকলে দাও তো, খেয়ে ফেলি। মাথাটা কেমন করছে। দুটো বড়ি দিয়ো।

এ সব কথাবার্তার মাঝখানেই হঠাৎ একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল কী করে। মাঝখানের ফাঁকা বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ যাবৎ একটা লোক হাকুচ ময়লা একটা চাদরে আগাপাশতলা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। এই সব গণ্ডগোলে বোধহয় এতক্ষণে কী করে তার ঘুম ভেঙেছে। চাদরটা সরিয়ে মস্ত একটা গোলপানা মুখ তুলে লোকটা তাকাল। চোখদুটো টকটকে লাল, নাকের নীচে মস্ত ভুঁড়ো গোঁফ, গালে বিজবিজে কালো দাড়ি। লাল চোখে কয়েক পলক দৃশ্যটা দেখেই লোকটা হঠাৎ ঘুমের ধন্দভাব ঝেড়ে ফেলে তড়াক করে উঠে বসে বিকট গলায় বলে উঠল, মান্‌কে বলে সাবাস!

কথাটার অর্থ কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু ওই দুর্বোধ্য বিকট চিৎকারে হাজুর নার্ভ নষ্ট হয়ে গেল বুঝি। পৈলেনের পিস্তলটাও বোধহয় সে আগে বড় একটা হাতে পায়নি। পিস্তল হাতে থাকলে আনাড়িদের যেমন হয় হাজুরও তেমন হঠাৎ ফালতু বীরত্ব চাগিয়ে উঠল। বুড়োকে ছেড়ে ঘুরে হুড়ুম করে আচমকা একটা গুলি ছুড়ল সে। গুলিটা গাড়ির ছাদে একটা ঘুরন্ত পাখায় পটাং করে লাগল শুনলাম। যে লোকটা চেঁচিয়েছিল সে লোকটা হঠাৎ দ্বিগুণ চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে চার দিকে দাপাতে লাগল, মেরে ফেলেছে রে, মেরে ফেলেছে রে! তখন দেখি, লোকটার পরনে একটা খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পুঁটলির মতো একটা ভুঁড়ি সামনের দিকে দাপানোর তালে তালে নড়ছে। পৈলেন ছোরা হাতে বাঁই করে ঘুরে দৃশ্যটা দেখল। আমার আজও সন্দেহ হয়, পৈলেন লোকটাকে নির্ঘাৎ পুলিশ বলে ভেবেছিল। নইলে এমন কিছু ঘটেনি যে পৈলেন মাথা গুলিয়ে ফেলে হঠাৎ দৌড় লাগাবে। আমি আজও বুঝি না, পৈলেনের সেই দৌড়টার কী মানে হয়। দৌড়ে সে যেতে চেয়েছিল কোথায়? চলন্ত গাড়ি থেকে তো আর দৌড়ে পালানো সম্ভব নয়।

তবু ছোরাটা উঁচিয়ে ধরে পৈলেনও এক সাংঘাতিক আতঙ্কের স্বরে 'যে ধরবি মেরে ফেলব, জান লিয়ে লেবো শ্‌শালা...জান লিয়ে লেবো—রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে বলে দিচ্ছি...' এই বলতে বলতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খ্যাপার মতো এ দরজা থেকে ও দরজা পর্যন্ত কেন যে খামোকা ছোটাছুটি করল তা ওই জানে। কেউ ওকে ধরতেও যায়নি, মারতেও যায়নি। কিন্তু ও তখন আতঙ্কে, মাথার গণ্ডগোলে কেমনধারা হয়ে মস্ত খোলা দরজার দিকে পিছন করে কামরার ভিতরবাগে ছোরা উঁচিয়ে নাহক লোকেদের বাপ-মা তুলে গালাগাল করছিল। দরজার কাছেই সেই দুটো টিটকিরিবাজ ছেলে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেয়েছে এতক্ষণ। তাদেরই একজন, স্পষ্ট দেখলাম, আস্তে করে পা বাড়িয়ে টুক করে একটা টোকা মারল পৈলেনের হাঁটুতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটু কেতরে জোর একটা লাথি কষাল পৈলেনের পেটে। প্রথম টোকাটায় পৈলেনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরের লাথিটা সামলাতে পারল না। বাইরের চলন্ত অন্ধকারে বোঁ করে বেরিয়ে গেল, যেমন গুবরে পোকারা ঘর থেকে বাইরে উড়ে যায়।

হাজুর আনাড়ি হাতে ধরা পিস্তলটা তখন ঠকাঠক কাঁপছে। পুরনো পিস্তল, আর কলকবজা কিছু নড়বড়ে হবে হয়তো। একটা ঢিলে নাটবল্টুর শব্দ হচ্ছিল যেন। অকারণে সে আর-এক বার গুলি

ছুড়ল। মোটা কালো লোকটা তিড়িং করে লাফিয়ে একটা বেঞ্চে উঠে চেঁচাচ্ছে সমানে, গুল্লি, গুল্লি! শ্যাষ হয়ে গেলাম। প্যাটটা গেল। বুকটা গেল!

কিন্তু আমি দেখেছি, গুলিটা একটা জোনাকি পোকার মতো নির্দোষভাবে জানালা দিয়ে উড়ে বাইরে গেছে। কিন্তু হাফ প্যান্ট পরা লোকটাকে সে কথা তখন বোঝায় কে? লোকটা এখন নিজের উরুতে থাবড়া মেরে কেবল বলছে, মান্‌কে বলে সাবাস! আবার গুল্লি?

হাজু তখন বুড়োকে ছেড়ে হঠাৎ দুটো বেঞ্চের মাঝখানে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে পিস্তলটা মাঝে মাঝে নাড়ে আর বলে, চেন টানবে না কোনও শুয়োরের বাচ্চা। খবরদার, এখনও চারটে গুলি আছে, চারটে লাশ ফেলে দেব।

এ সব সময়ে হামাগুড়ি দেওয়াটা যে কত বড় ভুল তা বুঝলাম যখন দেখি হাজুর মাথায় কে যেন একটা পাঁচ-সাত কেজি ওজনের চাল বা গমের বস্তা গদাম করে ফেলে দিল। বস্তার তলায় চেপটা লেগে হাজু দম সামলাতে না সামলাতেই দরজার ছেলে দুটো পাকা ফুটবল খেলাড়ির মতো দু'ধার থেকে তার মাথায় লম্বা লম্বা কয়েকটা গোল কিক-এর শট জমিয়ে দিল। কামরার অন্য ধার থেকে কদম তখন চেঁচাচ্ছে, আমাকে ধরেছে। এই শালার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করি। এই ষাঁড়ের ছেলে হাজু, পিস্তল চালা শালা, লাশ ফেলে দে...।

কিন্তু তখন হাজুর জ্ঞান নেই, পিস্তল ছিটকে গেছে বেঞ্চের তলায়। দু' সেকেন্ডের মধ্যে ওধার থেকে হাটুরে মারের শব্দ আসতে লাগল। লোকজন সব সাহস পেয়ে গেছে। সোনার বোতামওলা বুড়োটাও তখন রুপো-বাঁধানো লাঠি হাতে উঠে গেল ওধারে। তাকে বলতে শুনলাম, আহা হা, সবাইকেই চান্স দিতে হবে তো। অমন ঘিরে থাকলে চলে! একটু সরো দিকি বাবারা এধার থেকে, সরো, সরো...

বলতে না বলতেই কদমের মাথায় লাঠিবাজির শব্দ আসে ফটাস করে। কামরাসুদ্ধু লোক ওদিকে ধেয়ে যাচ্ছে। এধারে হাজুর মাথায় সমানে ফুটবলের লাথি, কয়েকটা গাঁইয়া লোক উঠে এসে উবু হয়ে বসে বেধড়ক থাপড়াচ্ছে, একজন বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে হাজুর নাকে আঙুল ঢুকিয়ে চড়চড়িয়ে নাকটা ছিঁড়ছে।

আমি বেকুবের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারি, আরে! আমিও যে এদের দলে ছিলাম! বুঝেই হঠাৎ চারধারে চনমনে হয়ে তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজি।

ঠিক এ সময়ে সেই মোটা কালো লোকটা বেঞ্চের ওপর থেকে নেমে এসে দু' হাতে আমাকে সাপটে ধরে ফেলল। বিকট স্বরে বলল, মান্‌কে বলে সাবাস! দেখেন তো মশয়, আমার কোথায় কোথায় গুল্লি দু'টো ঢুকল। দেখেন, ভাল করে দেখেন। রক্ত দেখা যায়?

আমি খুব অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, আরে না, আপনার গুলি লাগেনি।

বলেন কী?— লোকটা অবাক হয়ে বলল, মান্‌কে বলে সাবাস! লাগে নাই? অ্যাঁ। দুহ দুইটা গুল্লি!

লাগেনি। আমি দেখেছি।

ওধার থেকে কদম আমার নাম ধরে বারকয়েক ডাক দিয়েই থেমে গেল। পাইকারি মারের চোটে তার মুখ থেকে কয়েকটা 'কোঁক কোঁক' আওয়াজ বেরোল মাত্র। এধারে হাজুর আধমরা শরীরটার তখনও ডলাইমলাই চলছে।

মোটা কালো লোকটা ভাল করে নিজের গা দেখে-টেখে গুলি লাগেনি বুঝে নিশ্চিত হয়ে চারধারে তাকিয়ে অবস্থাটা দেখল। বোধহয় পৌরুষ জেগে উঠল তার। হাজুকে দেখে সে পছন্দ করল না। বলেই ফেলল, এইটারে আর মেরে হবেটা কী? টেরই পাবে না। চলেন, ওই ধারের হারামজাদারে দুইটা দেই।

এই বলে আমাকে টানতে টানতে ওধারে নিয়ে গেল। রুপো-বাঁধানো লাঠি হাতে বুড়ো লোকটা

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কত আর পারা যায়! হাতে আবার আর্থারাইটিস।

যারা মার দিচ্ছিল তারা কিছু ক্লান্ত। দু'-একজন সরে গিয়ে আমাদের জায়গা করে দিয়ে খাতির করে বলল, ভালমতো দেবেন। এদের গায়ে মারধর তেমন লাগে না।

কালো মোটা লোকটা অসুরের মতো লাফিয়ে পড়ল কদমের ওপর। মুহূর্তে কদমের মাথার একমুঠো চুল উপড়ে এনে আলোতে দেখে বলল, হেই শালা, পরচুলা নাকি?

না, পরচুলা নয়। আমি জানি। কিন্তু সে কথা বলাটা ঠিক হবে না বলে বললাম না। কালো লোকটা আমাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাড়া দিল, মারেন, মারেন! দেখেন কী?

মারতেই হল। চক্ষুলজ্জা আছে, নিজের প্রাণের ভয় আছে। একটু আস্তের ওপর দুটো লাথি কষালাম। গালে একটা চাপড়। কদমের জ্ঞান ছিল। একবার চোখ তুলে দেখল। কিন্তু কথা বলার অবস্থা নয়। গাড়ির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে উবু হয়ে মার খেতে লাগল নাগাড়ে। তারপর শুয়ে পড়ল।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই হই-রই কাণ্ড। ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ফাঁকে পালিয়ে অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠলাম গিয়ে। হঠাৎ দেখি, আমার সঙ্গে সেই কালো মোটা লোকটাও উঠেছে এসে। আমাকে একটা বিড়ি দিয়ে বলল, পালিয়ে এসে ভাল কাজ করেছেন। আপনি বুদ্ধিমান। নইলে থানা-পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যেতে হত।

আমি একটা হুঁ দিলাম। বাস্তবিকই বোধহয় আমি বুদ্ধিমান। ডাকাতের দলে আমিও যে ছিলাম সেটা কেউ ধরতেই পারল না।

কথায় কথায় লোকটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বেশ লোক। ক্যানিংয়ের বাজারে তার আটাকল আছে, তিনটে নৌকোরও মালিক। আমাকেও লোকটা পছন্দ করে ফেলল। শেষমেশ বলেই ফেলল, তোমারে তো বিশ্বাসী মানুষ বলেই মনে হয়। আমার তিনটে মালের নৌকো লাট এলাকায় খেপ দেয়। চাও তো তোমারে তদারকির কাজে লাগিয়ে দিই। মানকে বলে সাবাস! বলে খুব হাসল। গলা নামিয়ে বলে, আমার নামই মানিক। মানিকচন্দ্র সাহা, বৈশ্য। আবার বৈষ্ণবও বটে হে। বাঙাল দেশে বাড়ি। কিন্তু এতদঞ্চলে থাইকতে থাইকতে দেশি ভাষা প্রায় ভুলে গেছি। যাবা নাকি আমার সঙ্গে? আমি লোক ভাল।

রাজি হয়ে ক্যানিং চললাম। বরাবর দেখেছি, উড়নচণ্ডীদের ঠিক সহায়-সম্বল জুটে যায় কী করে যেন। ঘর ছেড়ে এক বার বেরিয়ে পড়লে আর বড় একটা ঘরের অভাব হয় না।

৩

ক্যানিং জায়গা ভাল। ঘিঞ্জি বাজারটার ভিতরে মানিক সাহার আটাকল। আটাকলের পিছনেই দমবন্ধ তিনটে ঘরে তার তিন-তিনটে জলজ্যান্ত বউ থাকে। ছেলেপুলে কত তা গুনে শেষ করতে পারিনি। যে ক'দিন ছিলাম সেখানে প্রায় দিনই ছেলেপুলেদের মধ্যে দু'-একটা নতুন মুখ দেখতাম। তার ক'টা ছেলেমেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে মানিক নিজেও প্রায়ই গুলিয়ে ফেলত। এক দিন আমার চোখের সামনেই রাস্তায় ঘুগনিওলার ছেলে কাদা মাখছিল, মানিক সাহা তাকে নিজের ছেলে মনে করে নড়া ধরে তুলে এনে আচ্ছাসে পিটুনি দিয়ে দিল। ভুল ধরা পড়তেই জিভ কেটে বলল, মানকে বলে সাবাস।

বড় ভাল লোক মানিক সাহা। সে নিজেও সে কথা প্রায়ই বলত, বুঝলে হে উপল, আমি লোকটা বড় ভাল। লোকে আমারে ভয় দেখায়, বলে, একের অধিক বিবাহ বে-আইনি। একদিন নাকি আমারে জেল খাটতে হবে। কিন্তু আমি কই, জেল খাটাবা খাটাও, কিন্তু আমারে মন্দ কোয়ো না!

কেউ। আমি তো কোনও মেয়ের সঙ্গে নষ্টামি করি নাই। বদমাইশ লোক ঘরে বউ থুয়ে অন্যের সঙ্গে নষ্টামি করে। আমি বদমাইশ না। মেয়েছেলে দেখে মাথা খারাপ হলে আমি তারে বিয়ে করে ফেলি। এইটে সাহসের কাজ, না কি ডুব দিয়ে জল খাওয়াটা সাহসের?

ঘিঞ্জি বাজারটা পার হলেই বিপুল নদী, আকাশ, ব্রিটিশ আমলের কুঠিবাড়ি। হাজার রকমের মাল বোঝাই হয়ে নৌকো যায় বাসন্তী হয়ে গোসাবা। আরও ভিতরবাগে নানা নদীনালা ধরে ধরে গহিন সুন্দরবন পর্যন্ত। নৌকোয় থেকে থেকে জোয়ার-ভাঁটা, গাঙের চরিত্র, মেঘ, বর্ষা, শীত সবই চিনে গেলাম। নদীর জীবনে না থাকলে পৃথিবীর কত রূপ অদেখা থেকে যেত। লাট অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই, মোটরগাড়ি নেই, রিকশা নেই, এমনকী সাইকেল বা গো-গাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। মাইল মাইল চষা খেতের তফাতে এক-এক খানা গ্রাম। নৌকো ভিড়িয়ে প্রায়দিনই গাঁ দেখতে চলে গেছি গভীর দেশের মধ্যে। সেখানে নিঝুম এক আশ্চর্য জগৎ। ফিরে আসতে মন চাইত না।

আমার সে-জীবনটা ভণ্ডুল করে দিল মানিক সাহা নিজেই। বাসন্তী ছেড়ে ক্যানিংমুখো নৌকো বড় গাঙে পড়তেই ঝড়। মাল গস্ত করতে সেবার মানিক সাহা নিজেই গিয়েছিল। খড় কিনে ফিরছে। পাহাড়-প্রমাণ বোঝাই নৌকো। মানিক হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় খালি গায়ে হালের কাছে বসে গুন গুন করে ঢপের গান গাইছে। সুরের জ্ঞান ছিল। একটু আগেই একটা পচা কাঠ কুমিরেব মতো আধো ডুবন্ত ভেসে যাচ্ছিল দেখে কামঠ! কামঠ! বলে চেঁচিয়ে আমাদের সঙ্গে রঙ্গ করছিল। জোর বাতাস ছাড়তেই কিছু আলগা খড় উড়ে গেল ডাইনির চুলের মতো। আকাশে গুমগুম শব্দ। নৌকোর জোড় আর বাঁধনে একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল বিপদের। জল ঘোর কালো। আকাশে ঘূর্ণি মেঘ উড়ে আসছে।

কেমনধারা অন্য রকম চোখে মানিক সাহা এক বার পিছু ফিরে দেখল। তার দু' হাত পিছনে আমি দাঁড়িয়ে, আমার পিছনে খড়ের গাদা। কিন্তু আমাকে বা খড়ের গাদাকে দেখল না মানিক সাহা। এমনকী গোঙানো জলে গহিন ছায়া ফেলে যে প্রকাণ্ড ঝড় আসছে তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করল না সে। তবু কী যেন দেখল। মাঝিরা চেঁচামেচি করছিল নৌকো সামলাতে।

মোজাম্মেল খড়ের গাদার ওপর থেকে একটা দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে নেমে এসে মানিক সাহাকে বলল, সাহাবাবু, খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ুন। ইদিক-সিদিক কিছু হলে তিন-তিনটে ঠাকরোন বিধবা হবেন।

খাকি হাফপ্যান্ট পরা মানিক সাহা উবু হয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি রইল। পুরনো পালের কাপড় হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে ফেড়ে গিয়ে নিশেনের মতো উড়ছে। নৌকো কিছু বেসামাল। মাঝিরা ডাঙার দিকে মুখ ঘুরিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু একটা ঘোলায় পড়ে নৌকোটা এগোতে চাইছে না। ওদিকে দিকবিদিক একটা ধোঁয়াটে চাদরের মতো আড়াল করে বড় গাঙ ধরে উড়োজাহাজের শব্দ তুলে ঝড় আসছে। আলগা খড় মুঠো মুঠো উড়ে যায় বাতাসে, এদিক-সেদিক পাক খেয়ে জলে পড়ে। মানিক সাহা যেভাবে উবু হয়ে বসে আছে ধারে তাতে বাতাসের তেমন চোট এলে না উলটে জলে গিয়ে পড়ে।

ভাল ভেবে আমি গিয়ে পিছন থেকে মানিক সাহার বাঁ কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরে বললাম, মানিকদা, চলো খোলে বসে কেত্তন গাই।

মানিক সাহা মুখ তুলে, ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তার বাঁ হাতে রুপোর চেনে বাঁধা পীত পোখরাজ, গোমেদ, বৈদূর্যমণি, সিংহলের মুক্তো, চুনি নিয়ে পাঁচটা পাথর, তা ছাড়া তাগায় বাঁধা দুটি মাদুলি। আমি যেখানটায় ধরেছি তার হাত, সেখানে তাবিজ আর পাথর খজবজ করে উঠল। দেখি, মানিক সাহার দু' চোখে টলমল করছে জল।

হাত বাড়িয়ে আমার গলা ধরে মাথাটা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, কাজগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। না?

কী কাজ খারাপ হয়েছে, কেনই বা হল, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, মানিক সাহার হঠাৎ কোনও কারণে বড় অনুতাপ এসে গেছে।

আন্দাজে বললাম, কেন, কাজ খারাপ হবে কেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখি না।

মানিক সাহা কথা বলল না। সেই ঝড় বাতাসে খাকি হাফপ্যান্ট পরে, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে উবু হয়ে বসে চোখের জলে গঙ্গার জল বাড়াতে থাকে, আর কেবল কী মনে করে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে।

ও সব কথার তখন সময় নেই। ঘুণে ধরা মাস্তুল পালের নিশেন সমেত মড়াৎ করে ভেঙে জলে ভেসে গেল। নন্দর মাথায় চোট হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে গাল ভাসিয়ে। এই তক্কে নৌকো ঘোলা পেরিয়ে একখানা চক্কর মারল। ধড়াস ধড়াস করে তিন-চারজন আমরা কুমড়ো গড়াগড়ি দিয়ে উঠে দেখি, দুনিয়া মুছে গেছে। চার দিকে বাতাসের হাহাকার শব্দ। তাল-বেতাল জল ফুলে উঠছে গহিন আঁধার গাঙে। নৌকো আকাশে উঠে পাতালে পড়ছে।

এই সব গোলমালে যে যার সামলাতে যখন ব্যস্ত তখন মানিক সাহার হাফপ্যান্ট পরা শরীর পাটাতনে চিত হয়ে পড়ে আছে। মাল্লারা নৌকো একটা ঘাটের মাটির বাঁধে প্রচণ্ড ঘষটানি লাগিয়ে ভিড়িয়ে দিল। লাফিয়ে নেমে সব দড়িদড়া আর খোঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মানিক সাহা তখনও চিত হয়ে পড়ে আছে। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির ধারালো বর্শা ফুঁড়ছে চার দিক। আগুনের হলকা ছড়িয়ে দড়াম দড়াম করে বাজ পড়ে কাছেপিঠে। মানিক সাহা চোখ বুজে পড়ে আছে। তাগা ছিঁড়ে কয়েকটা তাবিজ আর কবচ ছিটকে পড়েছে চারধারে।

আমি তাকে নাড়া দিতেই সে সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই, যেন বিছানায় শুয়ে আছে, এমন আরামে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, কাজগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে।

এ অঞ্চলের ঝড় হঠাৎ এসে হঠাৎ যায়। ঝড় থেমে গেলে দেখা গেল, খড় ভিজে নৌকো তিন গুণ ভারী হয়ে জলের নীচে মাটিতে বসে গেছে। তার ওপর ভাঁটিতে এখন উলটো স্রোত। মাল্লারা ওপরে উঠে খড়ের চাপান কমানোর জন্য ভেজা খড়ের আঁটি হাতে হাতে চালান করছিল ডাঙায়। ভিজে সবাই চুব্বুস। খড়গুলো পড়ে থাকবে এখানে, কাল অন্য নৌকো নিয়ে যাবে এসে।

খোলের ভিতর আমার একটা টিনের সুটকেস আছে। তার ভিতর থেকে সস্তার সিগারেট আর দেশলাই এনে পাটাতনে মানিক সাহার পাশে বসলাম। দিব্যি ঠান্ডা হাওয়া। পরিষ্কার আকাশে ফুটফুট করছে তারা। ভেজা গায়ে উঠে বসে মানিক সাহা একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলল, উপলভাই, বড় অপরাধ করে ফেলেছি হে। মান্‌কে বলে সাবাস।

কিছুই বুঝতে পারছি না। ধমক দিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কী?

সে গম্ভীর হয়ে বলে, তখন তুমি ফচ করে এসে যদি হাতটা না-ধরতে তা হলে এতক্ষণে আমার লাশ গাঙে ভাসত। যেই না মনের জ্বালায় লাফিয়ে পড়ব বলে মন করেছি অমনি তুমি এসে—

শুনে ভয় খেয়ে যাই। মানিক সাহা লাফিয়ে পড়লে আগামী কাল থেকে আমার গতি হত কী? বললাম, লাফাবে কেন?

ঝড়জলের ওই বিকট চেহারা দেখে হঠাৎ নিজের সব পাপের কথা মনে পড়ে গেল কিনা। কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

সারাক্ষণ মানিক সাহার সেই এক কথা। কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে। কী খারাপ হল, কেন খারাপ হল এ সব জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। সে রাতে লঞ্চ ধরে ক্যানিং ফিরে এসে অবধি তার মাথার জট ছাড়ল না। তারপর তিন দিন, চার দিন করে সময় যেতে লাগল। মানিক সাহা খায় দায়, হাসে, গল্প করে, কিন্তু হঠাৎ সব কিছুর মাঝখানে একটা বড় শ্বাস বুক থেকে ছেড়ে বলে, কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

মাসখানেকের মধ্যে তিনটে নৌকো বেচে দিল সে জলের দরে। আটাকল আর দোকানঘর

বউদের নামে লিখে দিল। বউরা কেউ মরাকান্না কাঁদে, কেউ বিকট চেঁচিয়ে গালমন্দ করে মানিক সাহাকে। কিন্তু লোকটা নির্বিকার, কেবল বলে, কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

আরও ক'দিন বাদে আমার কাছে গোপনে সে ঝেড়ে কাশল। বললে, তিন বিয়ে ভাল নয়, বুঝলে? অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে এক বিয়ে ভাল। আর এই ব্যাবসা-ট্যাবসার কোনও মানে হয় না, আসল জিনিস হল চাষবাস।

আমি ঢাকের বাঁয়া হয়ে মাথা নাড়ি।

কিছুদিন বাদে একদিন সকালে মানিক সাহা আমাকে নিয়ে দাঁতন করতে করতে বাঁধে হাঁটতে লাগল। সেদিনও তার পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গা আদুড়। খানিক দূর গিয়ে দাঁতন জলে ফেলে দিয়ে পিছু ফিরে আমাকে বলল, দৌড়োও!

বলে সে নিজে হাঁসফাঁস করে ছুটতে থাকে। আমার জাগতিক অবলম্বনকে ছুটতে দেখে আমিও দৌড়োই। লঞ্চ তখন ছাড়ে-ছাড়ে অবস্থা। মানিক সাহা এক লম্ফে চড়ে গেল, পিছনে আমি।

একগাল হেসে সে বলল, খুব জোর পালিয়েছি হে। তিন-তিনটে বউ যার, জীবনে কি তার শান্তি আছে? বউগুলো চারটে শালাকে আমদানি করেছে আমাকে নজরে রাখার জন্য। মান্‌কে বলে সাবাস।

আমি বেজার মুখে বললাম, কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?

মানিক সাহা সংক্ষেপে বলল, এক বিয়ে, আর চাষবাস। আর কোনও ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

গোসাবায় নেমে মাইল পাঁচেক মাঠ বরাবর হেঁটে পাখিরালয় গাঁ। সেখান থেকে নদী পেরিয়ে দয়াপুর। সেখানে পৌঁছতে বেলা কাবার হয়ে গেল। গিয়ে দেখি, মানিক সাহা সেখানে আগেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে কবে থেকে। জমিজোত কেনা হয়ে গেছে, দিব্যি মাটির বাড়ি আর ঘেরা বাগান। লোকজন কাজকর্ম করছে। এমনকী সেখানে ডজন খানেক খাকি হাফপ্যান্টও মজুত রয়েছে।

পরদিনই মানিক সাহা বিয়ে বসল। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে ছিল আগে থেকেই। গরিবের ঘরের শ্রীময়ী একটা কালো, অল্পবয়সি মেয়ে লাজুক হেসে মানিকের বউ হয়ে গেল। নাম ঝুমুর।

মানিক আমাকে চুপি চুপি বলল, এক বিয়ে, বুঝলে? এখন থেকে আর বহু বিবাহ নয়।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নাড়ি। তখন মানিক হঠাৎ ধর্মভয়ে কাতর হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে—বলো তো, ধর্মত আমি কাউকে ঠকাইনি তো, জোচ্চুরি করিনি তো কারও সঙ্গে? সকলের পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি তো? তারপর নিজেই কর গুনে হিসেব করে বলে, বউদের ছেলেপুলে, টাকা-পয়সার অভাব রাখিনি, এক, মহাজনের কাছেও বাকি বলে কিছু পড়ে নেই, দুই, কর্মচারীদের কারও এক পয়সা মারিনি, তিন...

দয়াপুরে দিব্যি আমার থাকা চলছিল। কাজকর্ম নেই, বসে খাও, আর চাষবাস একটু দেখাশোনা করো, কাজের লোকদের কিছু হাঁকডাক করো, বাস হয়ে গেল। সেই খিদের চিন্তাটা তেমন মাথা চাড়া দেয় না। ভাবলাম, আমার সেই খিদের ভূত বোধহয় রোজার হাতে পড়েছে।

কিন্তু মানিক সাহার নতুন বউ জ্বালালে। এক মাসের মাথায় সে আমার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি শুরু করে। সেটা মন্দ লাগত না। মেয়েছেলের সঙ্গ তো খারাপ না, সময়টা কাটেও ভাল। কিন্তু দু' মাস যেতে না যেতেই সে নানা রকম ইশারা ইঙ্গিত শুরু করল। রাত-বিরেতে উঠে আসত আমার বিছানায়।

আমি তাকে বলতাম, দেখো, মেয়েমানুষের চেয়ে আমার ঢের বেশি দরকার একটা আশ্রয়। তুমি অমন করলে একদিন ধরা পড়ব ঠিক, তখন মান্‌কে আমাকে তাড়াবে।

ইস, তাড়ালেই হল?— বলে খুব দেমাক দেখাত। আবার কখনও বলত, চলো পালিয়ে যাই।

অত বোকা আমি নই। পালানোর কথায় পাশ কাটাতাম।

শেষতক ঝুমুরের মধ্যে একটা হন্যে ভাব দেখা দিল। কাঁচা অল্পবয়সি পুরুষমানুষের গন্ধে তার আর রাখ-ঢাক রইল না। মানিক সাহা খেত থেকে ফিরে এসে যখন জিরেন নিচ্ছে তখন আমি কত বার বলেছি, যাও বউঠান, একটু হাওয়া-টাওয়া করো, দুটো ডাব কেটে দাও।

সে তখন আমার সঙ্গে প্রায় মান্‌কের চোখের সামনে ঢলাচ্ছে। বলত, ডাব ও নিজে কেটে নিতে পারবে না?

রাত-বিরেতে মান্‌কে ভাল করে ঘুমোবার আগেই উঠে আসত। চোখের সামনেই দিন দুপুরে আমাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যেত বাগানের দিকে।

টের না-পাওয়ার কথা নয় মান্‌কের। ভাল করে দেখেশুনে সে অবশেষে একদিন গর্জন করে উঠে বলল, অসতী! অসতী!

যাদের স্বভাব খারাপ তারা টপ করে পায়ে ধরতে পারে। ঝুমুরও পায়ে ধরে কান্নাকাটি করল। প্রথম বলল, ভুল দেখেছ। পরে স্বীকার হয়ে বলল, আর হবে না এ রকম।

কিন্তু তাই কি হয়! যা হওয়ার তাই হচ্ছিল ফের।

এবার মানিক সাহা কেঁদে উঠল এক রাতে। বউয়ের হাত-পায়ে ধরে বিস্তর বোঝাল। ঝুমুরও কাঁদল, আদর করে বলল, তোমায় ছুঁয়ে বলছি, আর হবে না।

আবার হল।

তৃতীয় দফায় মানিক সাহা একদিন বউকে ধরে বেধড়ক ঠেঙাল, তারপর দেড় বেলা বেঁধে রাখল ঘরে।

কী জানি কেন এ ব্যাপারে আমাকে তেমন কিছু বলত না মানিক। মাঝে মাঝে কেবল ছানি পড়া চোখের মতো যেন ভাল ঠাহর করতে পারছে না, এমনভাবে তাকাত। এক-আধবার করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, উপলভাই, এর চেয়ে কি তিন বিয়েই ভাল ছিল?

আমি তার কী জানি। চুপ করে থাকতাম।

সে নিজেই ভেবেচিন্তে বলত, তিনটে বউ থাকলে সুবিধে এই যে, তারা পরপুরুষের কথা ভাববার সময় পায় না, একটাকে নিয়েই কাড়াকাড়ি করে। হিংসুক জাত তো! এক বিয়ের দেখছি বিস্তর ঝামেলা।

ইদানীং খুব তাড়ি খাওয়া ধরেছিল মান্‌কে। ঝুমুর কাঁকড়ার ঝাল, মাছের চচ্চড়ি করে দিত। আমি আর মান্‌কে সেই চাট দিয়ে জ্যোৎস্নার উঠোনে বসে সন্ধের পর খেতাম।

ঝুমুর একদিন আধ টিন পোকামারার সাংঘাতিক বিষ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আজ রাতেই নিকেশ করবে।

বোকা মেয়েমানুষ। ডাক্তার, থানা-পুলিশ, আদালত এ সব খেয়াল নেই। কিন্তু ঝুমুরের চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, রাজি না হলে এ বিষ একদিন আমার ভিতরে কোনও কৌশলে চালান করে দেবে। একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে ও।

টিন নিয়ে গ্যাজানো তাড়িতে মেশাতে হল।

কী বুদ্ধি!— ঝুমুর দেখে বলল, প্রথমটায় খেলেই তো গন্ধে টের পাবে। আগে ভাল তাড়ি দিয়ে নেশা করিয়ে নেবে তারপর এটা দিয়ো। নেশার ঝোঁকে কী খাচ্ছে টের পাবে না।

ঝুমুরের বুদ্ধি দেখে আমি তখন অবাক। মেয়েমানুষ একই সঙ্গে কত বোকা আর চালাক হতে পারে!

সন্ধেবেলা ঝুমুর বাপের বাড়ি গেল। কাল সকালে ফিরে এসে কান্নাকাটি করবে। বিধবা হবে তো!

আমি আর মান্‌কে তাড়িতে বসলাম।

আকাশে চাঁদ ছিল না, উঠোনে একটা হারিকেন ছিল শুধু। চাঁদের অভাবে মান্‌কে উদাস চোখে

হারিকেনটার দিকে চেয়ে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। আমি তাকে পা দিয়ে ছোট একটা আদুরে লাথি মেরে মুখটা কাছে আনতে ইশারা করলাম। সে হামাগুড়ি দিয়ে কাছে আসতেই বললাম, বোঝো কেমন?

কী বুঝব ভাই?

শোনো মানিকদা, যখন-তখন না দেখেশুনে যা-তা খেয়ে বোসো না এ বাড়িতে।

কেন বলো তো?

দু' নম্বর হাঁড়িতে বিষ মেশানো আছে।

বিষ?

বলে হঠাৎ হাফপ্যান্ট পরা মানিক লাফিয়ে উঠে হাতের ভাঁড় ছুড়ে ফেলে পেল্লায় চেঁচাতে থাকল, বিষ দিছে! বিষ দিছে! মরে গেলাম, ও বাবা রে, মরে গেলাম। আমার বুকটা কেমন করে। আমার প্যাটটা কেমন করে।

এই বলে আর সারা উঠোন জুড়ে লাফিয়ে নৃত্য করে।

হুবহু সেই ট্রেনের কামরার দৃশ্য।

হাতের ভাঁড়টা শেষ করে আমি হারিকেনটা তুলে নিয়ে রওনা দিলাম। পুঁটুলি একটা বাঁধাই ছিল।

মাঠ পেরিয়ে যখন ঘাটের কাছে পৌঁছেছি তখন পিছন থেকে মানিকও হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। কোনও কথা হল না দু'জনে। জোয়ারের জল এখন বেশ ফেঁপে আছে। পাড়ে তোলা নৌকোটা এঁটেল কাদায় ঠেলে নিয়ে জলে ফেলে দু'জনে উঠে বসলাম।

মানিক সাহা পাখিরালয়ে নেমে গেল অন্ধকারে। আমি তাকে হারিকেনটা ধরিয়ে দিলাম হাতে। সেই আলোতে দেখা গেল, তার মুখ-চোখ কেমন ভোম্বলপানা হয়ে আছে। পিছনে দিগন্তজোড়া অন্ধকার পৃথিবী, অচেনা। সেদিকে চাইল। তারপর আমাকে বলল, না ভাই, এবার পুরো ব্যাচেলার। চিরকুমার থাকব এখন থেকে।

এই বলে খাড়াই ভেঙে উঠে গেল। কোথায় গেল তা আমি আজও জানি না। আমি নৌকো বেঁধে রেখে গোসাবামুখো হাঁটা ধরলাম।

৪

বারান্দাটায় থাকতে আমার কিছু খারাপ লাগে না। শীত বা বর্ষায় একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ও সব গায়ে মাখা আমার অভ্যাস নয়।

বারান্দার বাতি নিভলেই রোজ এক অতিথি আসে। কেঁদো একটা ছুঁচো। এত স্বাস্থ্যবান ছুঁচো কদাচিৎ দেখা যায়। হুলো বেড়ালের মতো বড় চেহারার এক মিস্টার ইউনিভার্স, বেসিনের তলায় এঁটো বাসন-কোসন ডাঁই করা থাকে, সে এসেই বাসনপত্রে হুটোপাটি শুরু করে দেয়। বাতি জ্বাললেই গ্রিলের দরজার বাইরে বা জালের ফুটোর ভিতরে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। তার লোমহীন মোটা লেজটা দেখা যায়। ভারী চালাক ছুঁচো। রান্নাঘরে এক রাতে চারখানা পরোটা নিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেল। গোটা তিনেক নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন ক্ষণা বারবারই সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এ কি আর ছুঁচোর কাজ! বাটির ঢাকনায় নোড়া চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। অত ভারী জিনিস সরাতে পারে নাকি ছুঁচোরা? এ অন্য ছুঁচোর কাজ। যাদের লোকে ছোঁচা বলে।

শুনে আমার একটু লজ্জা করল। ছুঁচোটার ওপর রাগও হল খুব।

এ বাড়িতে আর একটা উৎপাত আছে চড়াই পাখির। গ্রিলের ফুটো দিয়ে রাজ্যের চড়াই এসে লোহার বিমের খাঁজে রাত কাটায়। রাতে বিমের গায়ে ডিম ডিম সব চড়াই বসে নানা রকমের শব্দ

করে। অসুবিধে হল তাদের পুরীষ নিয়ে। যখন-তখন লাজলজ্জার বালাই নেই, হড়াক করে খানিকটা সাদায় কালোয় ক্বাথ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। আমার বালিশ বিছানা বলতে যা একটু কিছু আছে সব দাগ-ধরা হয়ে গেল। এখন কাচলেও ওঠে না। মাঝেমধ্যে প্রথম রাতে দুটো-তিনটে চড়াইয়ের মধ্যে মাথা গরম করা ঝগড়া লেগে পড়ে। একটা আর-একটাকে খোঁচাতে খোঁচাতে দুটো-তিনটে মিলে জড়াজড়ি করে পড়ে যায় নীচে।

এ দুই উৎপাত ছাড়া এখন আর কোনও অসুবিধে নেই।

ছুঁচোটার সাহস ক্রমেই বাড়ছে। পরোটা চুরির পরদিন যেই এসেছে অমনি উঠে বাতি জ্বাললাম। একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। রোজ যেমন সুট করে পালায় সেদিন মোটেই তেমন কিছু করল না। একটু লজ্জার ভান করে কয়েক পা দৌড়ে গ্রিলের দরজার কাছে গিয়ে সামনের পায়ের মধ্যে মুখ ঘষে প্রসাধন করতে লাগল নিশ্চিন্তে।

কিছু করার নেই। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্প একটু অভিমান হয়েছিল বটে ছুঁচোটার ওপর, কিন্তু সেটা বোঝার মতো হৃদয় ওর নেই।

কয়েকটা বাজারের থলি খামকা দাঁতে কেটে রেখে গেল কয়েক বার। একটা বাসি চাদর বারান্দায় পড়ে ছিল, পরদিন ঝি কাচবে, সেটা সাত জায়গায় ছ্যাদা হল একদিন। তা ছাড়া নাদি মেখে রেখে যায় বারান্দায় রোজ। পরিষ্কার করতে ঝি চেঁচামেচি করে। আজকাল আবার রাতে এত বেশি সাড়াশব্দ শুরু করে যে আমার ঘুম চটে যায়। বাতি জ্বেলে তাড়া দিলে চলে যায় ঠিকই। বাতি নেভালেই আসে।

ক্ষণা একটা লাঠি আমার বিছানার পাশে রেখে দিয়ে এক রাতে বলল, শুধু চেয়ে চেয়ে ছুঁচোর কাণ্ড দেখলেই তো হবে না। এটা দিয়ে আজ ওটাকে পিটিয়ে মারা চাই।

আমার কমলাকান্তের মতো অবস্থা। সে রাতে ছুঁচো মহারাজ এলে আমি নানা শব্দ সাড়া করে উঠে বাতি জ্বাললাম। ছুঁচোটার ভয় ভেঙে গেছে একেবারেই। আজকাল আমাকে দেখলে নড়েও না। কষে এক বার লাঠিটা চালালাম, সে অলিম্পিকের চালে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ক্ষণাকে শোনানোর জন্য কয়েক বার প্রবল লাঠির শব্দ আর গালাগাল করে আমিও শুয়ে পড়ি।

কয়েক রাত এইভাবে কাটলে একদিন ক্ষণা বলল, অসহ্য করে তুলল তো ছুঁচোটা। আজ বাজার থেকে ইঁদুর মারা বিষ আনবেন তো। অন্য কিছুতে হবে না।

শুনে আমার ঘাম দিল।

শেষবার বিষ দিয়েছিলাম মানিক সাহার তাড়িতে। আর বিষ-টিষ বড় একটা দেওয়া হয়নি। দুনিয়ায় ফালতু লোক বা অপ্রয়োজনীয় জীবজন্তু কীটপতঙ্গের অভাব নেই ঠিকই, তবু এই জনে জনে বিষ দিয়ে বেড়ানোর কাজটা আমার তেমন পছন্দ নয়।

দু'-চারদিন গড়িমসি করে কাটিয়ে দিই। রাতে ছুঁচোটা এসে ফের হুটোপাটা শুরু করলে অন্ধকারে মাথা-তোলা দিয়ে আধশোয়া হয়ে তাকে ডাকি, এই মোটা, শুনছিস? পালা, পালিয়ে যা মানিক সাহার মতো।

ছুঁচোটা চিড়িক মিড়িক করে কী জবাবও দেয় যেন। কিন্তু ঠিক ভাবের আদানপ্রদান হয় না। নির্বোধটাকে কী করে বোঝাই যে, মানুষকে অত বিশ্বাস করা ঠিক নয়?

মশা বা ছারপোকাও আমি পারতপক্ষে মারতে পারি না। আমার বাবারও এই স্বভাব ছিল। প্রায়ই বলতেন, লেট দি লিটল ক্রিচারস এনজয় দেয়ার লিটল লাইভস। একজন মহাপুরুষের বাণী থেকে কোটেশনটা মুখস্থ করেছিলেন। আমাদের একটা পোষা বেড়ালকে মাঝে মাঝে খড়ম দিয়ে এক ঘা দু' ঘা দিয়েছেন বড় জোর, তাঁর নিষ্ঠুরতা এর বেশি যেতে পারত না। বেড়ালটা খড়মের ঘা খেয়ে লাফিয়ে গিয়ে জানালায় উঠে বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। তার চোখে অবিশ্বাসভরে যেন বলে উঠত, ইউ টু ব্রুটাস? বাবাও তার দিকে চেয়ে খুব সবজান্তার মতো বলতেন, কেমন লাগল

বল? মনে করছিস তেমন কিছু লাগেনি? সে এখন টের পাবি না। রাত হোক, হাড়ের জোড়ে জোড়ে টের পাবি।

বেড়ালটা টের পেত কি না জানি না, তবে বাবাকে দেখেছি, রাতের বেলা চুপি চুপি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট জলে গুলে বেড়ালকে জোর করে খাইয়ে দিতেন।

আমার কানা মাসিরও প্রাণটা ভাল ছিল। রাজ্যের কাক, কুকুর, বেড়াল, পায়রাকে ডেকে ডেকে এঁটো-কাঁটা খাওয়াতেন। এই করে করে কুকুর বেড়াল তো পোষ মেনে গিয়েছিলই, কয়েকটা কাক শালিকও তার ভক্ত হয়ে পড়ে। মাসি কোথাও বেরোলে রাস্তা থেকে গুনে গুনে এগারোটা কুকুর তার পিছু নিত। বড় রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসত। কানা মাসি যখন রান্নাঘরে বসে ছ্যাঁক ছোঁক করছে তখন চৌকাঠে এসে নির্ভয়ে কাক তাকে ডেকে কত রকম কথা বলত ক্যাও ম্যাও করে। সেসব কথার জবাবও কানা মাসিকে দিতে শুনেছি, রোসো বাছা, খিদেয় তোমাদের সব সময়ে পেটের ছেলে পড়ে গেলে তো চলবে না। বসে থাকো, ভাতের দলা মেখে দিচ্ছি একটু বাদে...

ছেলেবেলা থেকে এই সব দেখেশুনে আমার প্রাণেও একটা ভেজা-ভাব এসে গেছে।

কিন্তু সকলের প্রাণ তো আমারটার মতো পান্তা ভাত নয়। ক্ষণার ও সব দুর্বলতা নেই। তিন দিন বাদে সে আমাকে বাজারের টাকা দেওয়ার সময়ে সকালবেলাটাতেই বলে ফেলল, ফর্দ দেখে জিনিস আনেন, তবু ভুল হয় কেন বলুন তো! আজ যদি বিষ আনতে ভুল হয় তবে কিন্তু...।

বাকিটা প্রকাশ করল না ক্ষণা। কিন্তু তাতেই নানা রকম অজানা ভয় ভীতিতে আমার ভিতরটা ভরে গেল। ক্ষণার মুখে একপলকের জন্য ঝুমুরের সেই মুখের ছায়া দেখতে পেলাম বুঝি।

ক্ষণার চেহারা খারাপ নয়, আবার ভালও নয়। ওই একরকমের চেহারা থাকে, না লম্বা না বেঁটে, না ফরসা না কালো। ক্ষণার মুখ নাক চোখ কান সব ঠিকঠাক। গালের মাংস বেশি নয়, কমও নয়। দাঁত উঁচুও নয়, আবার ভিতরে ঢোকানোও নয়। অর্থাৎ, ক্ষণাকে যদি কেউ সুন্দর দেখে তো বলার কিছু নেই, আবার খারাপ দেখলেও প্রতিবাদের মানে হয় না।

হাত পেতে বাজারের টাকা নেওয়ার সময়ে আজ আমি ক্ষণাকে একটু আড় চোখে দেখে নিলাম। ক্ষণাকে এক-এক সময়ে এক-এক রকম দেখায়। আজ খুব রগচটা, রসকষহীন দেখাচ্ছিল।

সুবিনয় পারতপক্ষে বাজারহাট করতে চায় না, ওসব তার অভ্যাস নেই। খুবই চিন্তাশীল, ব্যস্ত মানুষ। নিজের ঘর-সংসার বা আত্মজনদের সে চোখে দেখেও দেখতে পায় না। তার এই দেখা-টেখাগুলো অনেকটা ফিল্মহীন ক্যামেরায় ছবি তোলার মতো। শাটার টিপে যাও, ছবি উঠবে না। সুবিনয়ের ভিতরেও সেই ফিল্মের অভাব আমি টের পাই। নিজের মনোমতো কাজ ছাড়া দুনিয়ার কোনও কিছুই সে লক্ষ করে না।

বাজারের থলি হাতে যাচ্ছি, রাস্তায় সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা। সুবিনয় মস্ত লম্বা লোক, ছ' ফুট দু'-তিন ইঞ্চি হবে। গায়ের রং কালচে। স্বাস্থ্য খারাপ নয় বলে দানবের মতো দেখায়। ওর গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি আছে সেটাও ও জানে না ভাল করে। নিজে সুন্দর কি কুচ্ছিত তাও ও খেয়াল করে কি?

এই লম্বা-চওড়া হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। যেমন কাজের নয় খুব সুন্দর বা বিখ্যাত হওয়া। যারা খুব লম্বা-চওড়া, কিংবা খুব সুন্দর দেখতে, কিংবা বিখ্যাত ফিল্মস্টার, নেতা বা খেলোয়াড় তাদের একটা অসুবিধে তারা দরকার মতো চট করে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে না, অচেনা জায়গায় পালিয়ে যেতে পারে না। তারা কী করছে না করছে তা সব সময়েই চারপাশের লোক লক্ষ করে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুন্ডা হল নব। সেই নব যখন রাস্তাঘাটে বেরোয় বা দোকানপাটে যায় তখন তাকে পর্যন্ত লোক ফিরে ফিরে দেখে। ভারী অস্বস্তি তাতে। এই যে রাস্তা উপচে শয়ে শয়ে লোকের যাতায়াত, এই ভিড়ে এমনিতে কেউ কাউকে লক্ষ না করুক, ভিড়ের

মাথা ছাড়িয়ে তালগাছের মতো উঁচু মাথার সুবিনয়কে সবাই দু' পলক দেখে যাচ্ছে। সুবিনয় যদি এখন থুতু ফেলে, কি ডাবের খোলায় লাথি মারে, বা একটা আধুলি কুড়িয়ে পায় তো সবাই সেটা নজর করবে।

ঠিক এই কারণেই আমার কখনও গড়পড়তা মানুষের ওপরে উঠতে ইচ্ছে হয় না। কখনও কখনও লুকিয়ে পড়া বা পালিয়ে যাওয়ার বড় দরকার হয় মানুষের। বড় মানুষ হলে পালানোর বা লুকোনোর বড় অসুবিধে।

সুবিনয়ের ডান হাতের আঙুলে লম্বা একটা ফিলটার সিগারেট, বাঁ হাতে মাথার চুল পিছন দিকে সটাসট সরিয়ে দিচ্ছে বারবার। এটাই ওর সব সময়ের অভ্যাস।

আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল, ফিল্মহীন ক্যামেরার চোখে এক বার তাকালও আমার দিকে। কিন্তু চিনতে পারল না একদম।

আমি ওকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেছি, তখন হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিল, উপল!

দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাই।

ও খুব বিরক্ত মুখে চেয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

বাজারে।

বাজারে!

বলে সুবিনয় যেন খানিকক্ষণ 'বাজার' শব্দটা নিয়ে ভাবল। শব্দটা কোথায় যেন শুনেছি বলে মনে হল ওর, একটু ভ্রু কুঁচকে চেনা শব্দটা একটু বাজিয়ে নিল বোধহয় মনে মনে। তারপর বলল, কিন্তু তোকে যে আমার খুব দরকার! একটা জায়গায় যেতে হবে।

বলতে কী অন্য কারও চেয়ে সুবিনয়ের ফাইফরমাশ খাটতেই আমার অনিচ্ছা কম হয়। বললাম, বাজারটা সেরে যাচ্ছি।

সুবিনয় হাতঘড়ি দেখে বলল, না, দেরি হয়ে যাবে।

তা হলে?

সুবিনয় জটিল সমস্যাটা মুহূর্তে জল করে দিয়ে বলল, আমি বরং বাজার করছি। তুই এক বার প্রীতির কাছে যা।

এই বলে সুবিনয় পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা দিস।

খামে প্রীতির ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো। সুবিনয় নিজেই বলল, ডাকে দিতে গিয়ে ভাবলাম দেরি হয়ে যাবে পেতে। হাতে হাতে দেওয়াই ভাল। মুখেও বলে দিস।

কী বলব?

বলিস রবিবার।— সুবিনয়ের মুখটা খুবই থমথমে দেখাচ্ছিল।

এ সব সংকেত বুঝতে আমার আজকাল আর অসুবিধে হয় না। গত বছরখানেক এই কর্ম করছি। বাজারের ফর্দ, থলি আর টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম, ক্ষণা বলেছিল, ইঁদুরের বিষ আনতে।

'বিষ' কথাটায় বুঝি অন্যমনস্ক সুবিনয় শিউরে উঠল। বলল, কীসের বিষ?

ইঁদুরের। একটা ছুঁচো খুব উৎপাত করে।

সুবিনয় আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল বাজারমুখো। ভ্রু কোঁচকাল, মুখ গম্ভীর। হঠাৎ বলল, আমার কোম্পানিও প্রোডাকশনে নামছে।

কীসের?

পেস্টিসাইড, ইনসেকটিসাইড আর র‍্যাটকিলার। তার মধ্যে র‍্যাটকিলারটাই ইম্পর্ট্যান্ট। কত লক্ষ টন ক্রপ যেন রোজ ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলছে, তুই কিছু জানিস?

অনেক খাচ্ছে শুনেছি।

হুঁ, অনেক। কোম্পানি বলছে এমন একটা পয়জন তৈরি করবে যা ইনস্ট্যান্ট, চিপ, ইজিলি

অ্যাভেইলেবেল হবে। এখনকার র‍্যাটকিলার যেমন আটার গুলি-ফুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয় সে রকম হবে না। বিষটা ইটসেলফ্ ইঁদুরদের কাছে খুব প্যালেটেবল হওয়া চাই। নইলে কোটি কোটি ইঁদুর মারতে হাজার হাজার মন গম খরচ করতে হয়।

কোটি কোটি ইঁদুর নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার পরিচিত মোটা ছুঁচোটাকে নিয়েই আমার একটুখানি উদ্বেগ রয়েছে মাত্র। বললাম, বিষটা তৈরি করে ফেল তাড়াতাড়ি। অত খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়া ঠিক নয়।

কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট জব। ও রকম পয়জন বের করতে পারলে রিভোলিউশনারি ব্যাপার হবে। প্রীতিকে বলিস কিন্তু মনে করে। রবিবার।

এই বলে সুবিনয় রাহাখরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমার দিকে বাতাসে ছুড়ে দিল।

লুফে নিয়ে বলি, হ্যাঁ রবিবার। মনে আছে।

খানিক এসে সুবিনয় বাজারের রাস্তা ধরল। আমি সোজা গিয়ে বাসরাস্তায় উঠে পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুবিনয় ইঁদুর মারা বিষ কিনতে ভুলে যাবে। ফর্দের প্রথমেই লেখা আছে, ইঁদুরের বিষ। কিন্তু ফর্দটা তেমন লক্ষ করবে কি সুবিনয়? ভুল হবেই।

সুবিনয়ের বেহিসেবি বুদ্ধি। যে চিঠি হাতে হাতে দেওয়া হবে তাতে পঁচিশ পয়সার ডাকটিকিটটা একদম ফালতু খরচ। আমি পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনতে পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে নিই। আর পানের জলে আঙুল ভিজিয়ে সাবধানে খাম থেকে ডাক টিকিটটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখি। যদিও আমি জন্মে কাউকে চিঠি লিখি না, তবু কখন কী কাজে লেগে যায় কে বলবে!

৫

গোলপার্কের কাছে একটা দারুণ ফ্ল্যাটে এক বান্ধবীর সঙ্গে প্রীতি থাকে। সুবিনয়ের একটু দূর সম্পর্কের শালি। এখন অবশ্য প্রীতিকে আর সুবিনয়ের শালী বলা যায় না। এইসব প্রাথমিক স্তর ওরা অনেককাল অতিক্রম করে এসেছে।

কী করে ব্যাপারটা হয়েছিল তা আমি সঠিক জানি না। তবে এটা ঠিকই যে, প্রীতি দেখতে চমৎকার। ছোটখাটো, রোগা, আর খুব ফরসা চেহারা প্রীতির। এমন একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব ওকে ঘিরে থাকে যে, রক্তমাংসের মানুষ বলে মনেই হয় না। ঘাড় পর্যন্ত বব করা হলেও ওর মাথার চুল অসম্ভব ঘন। তেলহীন, একটু রুক্ষ চুলের মাঝখানে মুখখানি টুলটুল করে। বড় দু'খানা চোখ, পাতলা নাক, পুরন্ত ঠোঁট, থুতনির গভীর খাঁজ। অর্থাৎ, সুন্দর হওয়ার জন্য যা যা লাগে সবই স্টকে আছে। বাঁ গালে এক ইঞ্চি লম্বা একটা জড়ুল আছে। অন্য কারও হলে জড়ুলটাই সৌন্দর্যহানি ঘটাত, কিন্তু প্রীতির সৌন্দর্য এমনই যে জড়ুলটাকে পর্যন্ত সৌন্দর্যের খনি করে তুলেছে।

প্রীতি কেমিস্ট্রির এম এসসি। ডক্টরেট করতে আমেরিকা গিয়েছিল চার বছরের জন্য।

যত দূর জানি, আমেরিকায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রীতি সুবিনয়ের শালিই ছিল। এমনকী মাঝে মাঝে প্রীতি তার জামাইবাবুর কাছে পড়াশুনো করতেও আসত। আমেরিকায় যাওয়ার আগে সে নাকি সুবিনয়কে বলেছিল, একা একা সাত হাজার মাইল দূরের দেশে যেতে যা ভয় করছে না জামাইবাবু! আপনি যদি সঙ্গে যেতেন তো বেশ হত।

সুবিনয় ফি-বছরই এক-আধবার ইউরোপ, আমেরিকায় যায়। দু'-চার-ছ' মাস থেকে আসে। যেবার প্রীতি গেল তার ছ' মাসের মধ্যে সুবিনয়ও গেল আমেরিকায়। ওদের সম্পর্কটা হয়তো সেখানেই পালটে যায়। শুনেছি, সেটা বেশ খোলামেলা ফুর্তির দেশ, অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। ফিল্মহীন সুবিনয় এমনিতে মেয়েদের খুব একটা লক্ষ করে না, কিন্তু বিদেশে গিয়ে সুন্দরী শালিটির

সৌন্দর্য বোধহয় সে প্রথম লক্ষ করল। যখন ফিরে এল তখন সে অসম্ভব অন্যমনস্ক আর নার্ভাস। ডক্টরেটের জন্য প্রীতি আমেরিকায় রয়ে গেছে, আর এদিকে আমেরিকা শব্দটা শুনলেই সুবিনয় চমকে ওঠে। ক'মাস চিঠি আর টেলিগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্যপরায়ণ ডাকবিভাগকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সে। আমার ধারণা, ম্যাসাচুসেটসের যে-কোনও ডাকপিয়নই প্রীতি রায় নামটা শুনলেই আজও আঁতকে উঠে বলবে, প্রীতি এগেইন। ওঃ মাই গড!

সুন্দরবন থেকে ফিরে তখন কলকাতায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে ঘুরতে টাকা ধার করার চেষ্টা করি। সুবিনয়কেও বার কয়েক ট্যাপ করলাম। ও কয়েক বারই বিনা প্রশ্নে এবং মুখ বেজার না করে ধার দিয়ে গেল। শোধ হবে না জেনেও। তারপর একদিন বলল, তুই আমার বাড়িতে এসে কয়েক দিন থাক। তোর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

আমার মনটা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল। ঠিক এইরকমই আমি চাই। অন্যের সাজানো সুখের সংসারের এককোণে বেশ নিরিবিলিতে থেকে যাব। পোষা বেড়াল-কুকুরের মতো। ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই।

আমি তো জেনে গেছি, দুনিয়াতে আমার আর বেশি কিছু করার নেই, হওয়ার নেই।

আমি যখন সুবিনয়ের বাড়ি প্রথম আসি তখন এই চিঠির যুগ চলছে। সেইসব চিঠির অধিকাংশই আমার নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলা। এর কিছুকাল বাদে প্রীতি ফিরে এসে কলেজে চাকরি নিল।

যাতায়াতের জন্য সুবিনয় যে রাহাখরচ দিয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এখন মনে হতে পারে যে, সুবিনয়ের কাছে ভাঙানি ছিল না বলেই, গোটা পাঁচ টাকার নোটটাই দিতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সুখের ব্যাপার হল, যেদিনই প্রীতির কাছে আমাকে কোনও চিঠি বা খবর নিয়ে যেতে হয় সেদিনই সুবিনয়ের কাছে ভাঙানি থাকে না, পাঁচ বা দশ টাকার নোট দিতে হয়। আর কোনও দিনই সে ফেরত পয়সা চায় না।

আমার মনে হয়, এই রাহাখরচের বহুগুণ বেশি টাকা দেওয়ার মধ্যে একটা নিঃশব্দ কাকুতি-মিনতি আছে। টাকাটা প্রায় সময়েই আমার পকেটের মধ্যে খচমচ শব্দ করে দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে অনুরোধ করে, বোলো না, কাউকে বোলো না।

আমি বলতে যাব কোন দুঃখে! বলার কোনও মানেও হয় না। আমার সন্দেহ হয়, যদি আমি বলেও দিই তা হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে, উপলটা তো গাড়ল, কত আগড়ম-বাগড়ম বলে।

বহু কষ্টে এই গাড়লত্ব আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। ভেবে দেখেছি, চূড়ান্ত গাড়ল না হলে দুনিয়াতে টিকে থাকা মুশকিল। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই হাফ বুদ্ধিমান হয়ে জন্মায়, তারপর কেউ কেউ পুরো বুদ্ধিমান হওয়ার বৃথা চেষ্টায় আয়ুক্ষয় করে, কেউ কেউ বিনা চেষ্টায় গাড়ল হতে থাকে। আমি বরাবর এই দু' নম্বরি দলের।

গাড়লদের সবচেয়ে বড় গুণ হল, তারা ওপরসা-ওপরসা দুনিয়াটাকে দেখে, আর ভাবে, দুনিয়াটা খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে। দিন হচ্ছে, বাতাস বইছে, কীটপতঙ্গ পশু-পাখি মানুষ সব বিষয়কর্মে ব্যস্ত রয়েছে, গাছে ফুল ফুটছে, আকাশে চাঁদ উঠছে, রোজ খবরের কাগজ বেরোচ্ছে বা রেডিয়োতে গান হচ্ছে, মেয়ে-পুরুষরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর করছে। ন্যায্য জীবন যে-রকম হয় আর কী! বেশ চলছে সব কিছু। গাড়লরা কখনও দুনিয়ার গায়ের এই স্বাভাবিকতার জামাটা তুলে ভিতরের খোস-পাঁচড়া, দাদ-চুলকুনি দেখার চেষ্টা করে না।

আমিও করি না। সুবিনয়ের প্রীতিকে দেওয়া এইসব চিঠি বা কথার সংকেতের মধ্যে কী জিনিস লুকিয়ে আছে তা যেমন গাড়ল পাবলিকের জানার কথা নয়, তেমনি আমিও না-জানার চেষ্টা করি।

রবিবার। রবিবার। আমার অবশ্য পুরো জীবনটাই রবিবার। স্কুল-কলেজে এক হপ্তায় আরও

ছ'টা দিন ছিল, বাস-কন্ডাক্টরি করার সময়ে হপ্তায় রবিবারটাও ঘুচে পুরো সাতটা কাজের দিন হল। তারপর সাত-সাতটা কাজের দিন জীবনের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলে এক অচেনা মাস্টারমশাই চকখড়ি দিয়ে কেবল রবিবার কথাটা লিখে দিলেন। রোজ সেই কথাটা আমি ব্ল্যাকবোর্ড থেকে মুখস্থ করি।

রবিবার নিয়ে আমি খুব বেশি কিছু ভাবতে চাই না। সুবিনয় বা প্রীতির রবিবার কেমন সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ গাড়ল থাকতে চাই।

যে বন্ধুর সঙ্গে প্রীতি বসবাস করে তার নাম রুমা মজুমদার। হাওড়া জেলা মহিলা ভলিবল টিমের প্রাক্তন খেলোয়াড় রুমা বিদ্যুতের গতি আর বজ্রের মতো জোরালো স্ম্যাশ করে বিস্তর পয়েন্ট করেছিল এককালে। তার নামই ছিল স্ম্যাশিং রুমা। এক বার বাংলা দলেও খেলেছিল। হাওড়ায় বাস কন্ডাক্টরি করার সময়ে একবার গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে দু' দিন জিরেন নিচ্ছি, সে সময়ে ডালমিয়া পার্কে মেয়েদের ম্যাচ প্র্যাকটিস হচ্ছে। আমরা কয়েকজন চ্যাংড়া-প্যাংড়া মেয়েদের উরু দেখব বলে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। লাল রঙের খাটো প্যান্ট আর সাদা জামা পরা মস্ত চেহারার রুমাকে তখনই দেখি, উড়ন্ত বলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ আটকে আছে, চিতাবাঘের মতো লাফানোর আগে একটু কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ পাকানো শরীরটাকে হাউইয়ের মতো শূন্যে তুলে ডান বা বাঁ হাতে হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিচ্ছে বলে, সেই বসান খেয়ে তোড়ে চোটে বলটা যেন ধোঁয়াটে মতো হয়ে যেত, চোখে ভাল করে ঠাহর হওয়ার আগেই মাটিতে মাথা ঠুকে রুমাকে পয়েন্ট এনে দিত। লম্বা, কালো জোরালো চেহারা। ভাল দৌড়ত, হাইজাম্প দিত, ডিসকাস ছুড়তে পারত, গঙ্গার সাঁতারে কয়েকবার জিতেছে। এখন সরকারি দফতরের ছোট অফিসার। খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছে। মাঝেসাঝে একটু-আধটু সাঁতরায় বা টেবিল টেনিস খেলে। অফিসে তার অধস্তনরা তাকে যমের মতো ভয় খায়।

রুমার চেহারাটা একটু বন্য প্রকৃতির হলেও আর মুখে একটু মেদহীন চোয়াড়ে ভাব থাকলেও ভয়াবহ কিছু নেই। বরং আর পাঁচটা লাফ-ঝাঁপ করা মেয়ের তুলনায় সে দেখতে ভাল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে এমন এক তাচ্ছিল্য আর ঠোঁটে এমন এক বক্র হাসি যে মুখোমুখি হলেই কেমন এক অস্বস্তি হতে থাকে। আর মুশকিল এই যে, পুরুষদের সে দু'চোখে দেখতে পারে না। উইমেনস লিব-এর সে একজন গোঁড়া সমর্থক। ছেলে-মেয়েদের প্রেম ভালবাসাকে সে 'পশুর মতো আচরণ' বলে মনে করে। অসম্ভব সিগারেট খায় রুমা। দিনে তিন প্যাকেট। ধোঁয়া দিয়ে নিখুঁত রিং ছাড়তে পারে।

পাড়ার বখাটেরা পর্যন্ত রুমাকে আওয়াজ দেয় না। এক বার একটি ফাজিল ছোঁড়া তাকে 'ক্লিওপেট্রা' বলে ডেকেছিল, রুমা তাকে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছ থেকে ধাওয়া করে রেল লাইন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য ছেলেটা ডাউন ট্রেনে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

রুমা মজুমদারের জন্যই প্রীতির দোতলার এই ফ্ল্যাটে আসতে আমার কিছু ভয় ভয় করে। প্রথম দিন আমাকে দেখেই রুমা খুব রক্ত-জল করা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! মুখটা চেনা-চেনা লাগছে!

সেই শুনে ভয়ে আমি সিঁটিয়ে যাই।

হয়েছিল কী, সেই ডালমিয়া পার্কে দু' দলের ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় দু'-চারজন সুযোগ সন্ধানী মতলববাজ দর্শক উপস্থিত ছিল। প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক সব। ময়দানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের হকি খেলা দেখতে যারা ভিড় করে তাদেরই সমগোত্রের লোক। খুব বাহবা বা হায় হায় দিচ্ছিল খেলা দেখে, যেন ও খেলার ওপর দেশের সম্মান নির্ভর করছে। যেই রুমার দল শেষ সেট জিতে ম্যাচ নিল অমনি সেই ভদ্রবাবুরা দৌড়ে গিয়ে কোর্টে ঢুকে যে যাকে পারে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানানোর চেষ্টা করেছিল। একজন লোক মেয়েদের চুমু খাওয়ারও চেষ্টা করে। মেয়েরা

অতিষ্ঠ হয়ে রাঙামুখে পালানোর চেষ্টা করছে। সেই দেখে হঠাৎ হরির লুটের গন্ধ পেয়ে আমি বিনি মাগনা একটা মেয়েছেলের গা ছোঁব বলে নেমে পড়েছিলাম। কপাল মন্দ। আমি হাতের সামনে এই রুমাকেই পেয়ে গিয়েছিলাম, যে কিনা এক নম্বরের ম্যানহেটোর। 'সাবাস' বলে চেঁচিয়ে যেই তাকে ধরতে গেছি অমনি কসরত করা মেয়েটা এক পা পিছিয়ে চটাং করে একটা চড় মেরেছিল বাঁ গালে। আমার মাথাটা ভলিবলের মতোই সেই স্ম্যাশে জমি পর্যন্ত নেমে গেল, সেইসঙ্গে আমার গোটা শরীরটাও।

কাজেই আমি রুমাকে কখনও দেখেছি বলে স্বীকার করিনি। বলেছি, কোথায় আর দেখবেন! আমি তো হাওড়ার লোক নই।

সেই রুমাই আজ দরজা খুলল। পরনে গোলাপের ছাপওলা হাউসকোট, বুকের দিক'টায় তিনটে বোতাম লাগানো নেই বলে হাউসকোটের তলায় স্পোর্টস গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। গেঞ্জির সহনশীলতাকে চরম পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে ওর বুকের দুর্দান্ত মেয়েমানুষি।

ভয় খেয়ে চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাই।

নিরুত্তাপ গলায় রুমা বলে, কী খবর?

রুমা সুবিনয়ের চিঠির খবর জানে না। সে জানে, আমি প্রীতির দিদির বাড়ি থেকে খোঁজ নিতে আসি। কিন্তু এই ঘন ঘন আসাটাকে সে বড় ভাল চোখে দেখে না।

আমি নিচু স্বরে বলি, ক্ষণা পাঠাল।

রুমা তেমনি উদাস স্বরে বলল, প্রায়ই পাঠাচ্ছে। আসুন ভিতরে, প্রীতি আছে।

বলে রুমা সামনের ঘর দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল। একটু বাদেই ও-ঘর থেকে স্টিরিওতে ট্যাংগো নাচের বিকট জোর বাজনা শুনতে পেলাম। ট্যাংগো কি না তা আমি সঠিক জানি না, জোরালো বিদেশি বাজনা মাত্র-ই আমার কাছে ট্যাংগো।

সামনের ঘরটায় প্রীতি থাকে। ঘরের দুটি দিক বুক-শেলফ বোঝাই। এক ধারে সিঙ্গল খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ঘোরানো যায় এমন চেয়ার। মস্ত আলমারির একটা আধ-খোলা পাল্লা দিয়ে ভিতরে শাড়ির বন্যা দেখা যাচ্ছে। মেঝেয় একটা টমেটো রঙের নরম উলের কার্পেট, সেখানেও বই-খাতা পড়ে আছে।

প্রীতি টেবিলে ঝুঁকে কিছু লিখছিল। সম্প্রতি এক কলেজের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হয়েছে সে। বড়লোকের মেয়ে হওয়ায় দেদার টাকা ওড়াতে পারে।

আমি ঢুকতেই দেখি প্রীতি তার স্বপ্নঘেরা মুখখানা ফিরিয়ে দরজার দিকেই চেয়ে আছে। হাতের কলমটা নিক্ষেপে উদ্যত ছুরির মতো ধরা। প্রীতি দেখতে যতই সুন্দর হোক, রাগলে ওর কালো জড়ুলটা লালচে হয়ে যায়, এটা ক'দিন লক্ষ করেছি। আজও জড়ুলটা লালচে দেখাচ্ছিল।

আমি খুব বেশি সাহস পেলাম না কাছে যাওয়ার। ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুখে একটু বিনীত হাসি নিয়ে এগিয়ে ব্রেক কষলাম।

প্রীতি খুব বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু আমার কাজ তো আমাকে করতেই হবে। চিঠিটা বের করে দূর থেকে একটু আলগা হাতে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, রবিবার।

রবিবার কী?— প্রীতি দাঁতে কলমটা কামড়ে ঠান্ডা চোখে চেয়ে বলল।

আমি আর জানি না।—- বললাম।

প্রীতি চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, আপনারা দু'জনেই পাগল। জামাইবাবুকে বলবেন, রবিবার নয়, কোনও বারই না। আমি আর এ সব প্রশ্রয় দেব না।

আমি ফের বললাম, রবিবারটা মনে রাখবেন।

বলেই পিছু হটে দরজার নাগালে পৌঁছে যাই প্রায়। প্রীতি চিঠিটা নেড়ে আমাকে ডেকে বলল, উপলবাবু, একটু শুনুন।

আমি দাঁড়াই। প্রীতি উঠে কয়েক পা কাছে আসে, তারও পরনে হালকা গোলাপি রঙের হাউসকোট। বোতাম সব লাগানো। পিছনে হাত রেখে সে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, আপনি তো জানেন, জামাইবাবু এ সব চিঠিতে আবোল-তাবোল সব কথা লেখেন। জানেন তো।

না। আমি কখনও খুলে পড়িনি।— ভয়ে ভয়ে বলি।

পড়েননি!— বলে প্রীতি যেন একটু চিন্তিত হয়, বলে, পড়েননি কেন?

যাঃ, পরের চিঠি পড়ে না, কেন খুব যা-তা লেখে নাকি?

প্রীতি চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, আমি এটা এখনও পড়িনি। পড়বার ইচ্ছেও নেই। আপনি বরং পড়ে দেখুন। উনি একদম পাগল হয়ে গেছেন। এরপর আমি ক্ষণাদিকে জানাব।

একটু ভড়কে যাই। গলা খাঁকারি দিয়ে বলি, এ চিঠিটা হয়তো অনুতাপের। পড়ে দেখুন না!

প্রীতি খুব করুণ হেসে বলল, বেচারা!

কে?

আপনি।

প্রীতি চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মাথার খাটো চুল দু'হাতে পেছনের দিকে সরিয়ে চুলের গোড়া মুঠো করে ধরে রইল খানিকক্ষণ। খুবই মনোরম ভঙ্গি। নানা উদ্‌বেগ সত্ত্বেও আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। প্রীতি আমার মুখের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, অনুতাপের চিঠি হলে রবিবার কথাটা মুখে বলে পাঠাত না। উপলবাবু, আপনি কি রবিবার কথাটারও অর্থ জানেন না?

আমি যথেষ্ট গাড়ল হওয়ার চেষ্টা করে বলি, সপ্তাহের সপ্তম দিন।

প্রীতি গভীর শ্বাস ফেলে বলে, বেচারা!

কে?

আপনি?

কেন?

রবিবার কথাটার অর্থ অত সহজ নয়। জামাইবাবু চান, রবিবারে আমি একটা বিশেষ জায়গায় ওঁর সঙ্গে দেখা করি। আপনাকে দিয়ে ও অনেক বারই অনেক কথা বলে পাঠিয়েছে। যেমন কার্জন পার্ক কিংবা বিজলি সিনেমায় ছ'টার শো কিংবা স্যাটারডে ক্লাব। আপনি কি কখনও এ-সব কথা ডিসাইফার করার চেষ্টা করেননি?

না। তবে খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম।

বসুন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলব।

বলে প্রীতি তার নিজের ঘুরন্ত চেয়ারে ফিরে গেল। আমি একটা টুল গোছের গদি-আঁটা নিচু জিনিসের ওপর বসলাম। কত রকম আসবাবপত্র আছে দুনিয়ায়, সবগুলোর নাম কি আর জানি! যেটার ওপর বসেছি সেটা কী বস্তু তা আজও জানা নেই।

প্রীতি চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে বলল, কোম্পানি থেকে জামাইবাবুকে সাউথ এন্ড পার্কে একটা দারুণ ফ্ল্যাট দিয়েছে, আপনি জানেন?

আমি মাথা নিচু করে রাখি। দুর্ভাগ্যবশত ফ্ল্যাটের কথা আমি জানি এবং এমনকী সুবিনয়ের নির্দেশমতো সেই ফ্ল্যাটটা নানা আসবাবপত্র দিয়ে আমাকেই সাজাতে হয়েছে। প্রায়ই সেখানে সুবিনয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

প্রীতি আমার অপরাধবোধের ভাবটা লক্ষ না-করেই বলল, ফ্ল্যাটটা এখান থেকে খুব দুর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ফ্ল্যাট পেয়েও জামাইবাবু সেখানে তার ফ্যামিলি শিফট করেনি। কেন জানেন?

আমি গলা খাঁকারি দিই। পাশের ঘরে ট্যাংগো থেমে গেছে। পরদা সরিয়ে এক বার দরজার ফ্রেমে রুমা এসে দাঁড়াল, বলল, এনি ট্রাবল প্রীতি?

প্রীতি ঘাড় নেড়ে বলল, না।

তা হলে আমি বাথরুমে যাচ্ছি।— বলে চলে যাওয়ার আগে খুব কূট সন্দেহের চোখে রুমা আমাকে এক বার দেখে নিল। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। বাঙালি মেয়েরা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

প্রীতি একটু দুষ্টু হেসে বলল, আপনি এলেই রুমা ও ঘরে স্টিরিয়োতে লাউড মিউজিক বাজায় কেন জানেন?

না তো! তবে বাজায় লক্ষ করেছি।

ওর ধারণা, আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসেন।

বুকটা কেঁপে গেল। আমি এবার সত্যিকারের গাড়লের মতো বলে ফেললাম, মাইরি না।

বেচারা!— প্রীতি বলল।

কে?

আপনি।

এই নিয়ে এ ডায়লগ তিন বার হল। আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

প্রীতি বলল, রুমা প্রেম-ট্রেম দু'চোখে দেখতে পারে না। তাই পাছে আপনার আর আমার প্রেমের কথাবার্তা ওর কানে যায় সেই ঘেন্নায় আপনি এলেই ও স্টিরিয়ো চালায়। বেচারা!

কে?

রুমা।

আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলি।

প্রীতি গভীর অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, তবু তো রুমা আসল ব্যাপারটা জানে না। যদি জানত, একজন লোক যার স্ত্রী এবং সন্তান আছে, সে সব ভুলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে তা হলে বোধহয় সুইসাইড করে বসত।

আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কী করব? প্রীতি এই ক'দিন আগেও এত ভাল মেয়ে ছিল না। সুবিনয়কে লেখা ওর বেশ কিছু চিঠি আমি হাতসাফাই করেছি। গত সপ্তাহেও সুবিনয়ের ফ্ল্যাটের ঠিকানায় প্রীতির চিঠি গেছে। সুবিনয়টা নিতান্ত গাড়ল, প্রীতির চিঠিপত্র সে যেখানে-সেখানে বেখেয়ালে ফেলে রাখে। ক্ষণা কখনও খুলে পড়লে সর্বনাশ। কিন্তু অসময়ে কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি কয়েকখানা চিঠি সরিয়ে রেখেছি। সেগুলো আমার কানা মাসির কাছে জমা আছে।

প্রীতি বলে, হ্যাঁ, সেই ফ্ল্যাটটার কথা। জামাইবাবুর খুব ইচ্ছে আমাকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে সংসার পাতে। তার জন্য ক্ষণাদিকে ডিভোর্স করবে বলেও ঠিক করেছে। যত দিন ডিভোর্স না হয় তত দিন আমার সঙ্গে এ রকম রবিবারে রবিবারে ওই ফ্ল্যাটে কাটানোর খুব শখ জামাইবাবুর।

আমি যথেষ্ট লজ্জিত হওয়ার ভান করি।

প্রীতি বলল, বেচারা!

কে?

জামাইবাবু! ম্যাসাচুসেটসেও আমাকে ভয়ংকর জ্বালাতন করতে শুরু করেছিল। তারপর ফিরে এসে এত চিঠি লিখেছিল যে সে চিঠি সব পড়তে গেলে রিসার্চ বন্ধ করতে হয়।

আমি মুখভাবে সমবেদনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। যদিও জানি, এটা প্রীতির আসল কথা নয়। অন্য একটা কিছু আছে এর মধ্যে।

প্রীতির ঘোরানো চেয়ারটা খুব ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে ঘুরে যাচ্ছিল। ভ্রু কুঁচকে কী একটু ভাবতে ভাবতে প্রীতি আস্তে করে বলল, ওঁকে বুঝিয়ে বলবেন, এ হয় না। আমি অবশ্য এ সব নোংরামি থেকে পালানোর জন্য আবার আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। মিনেসোটার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও হাতে এসেছে।

বলে টেবিলের বইপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বার আগে প্রীতি একটু হেসে বলল, আপনি অত বোকা সেজে থাকেন কেন বলুন তো! এ সব কি আপনি টের পেতেন না! আপনিই জামাইবাবুর মিডলম্যান, আপনার জানা উচিত ছিল।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বলি, আজ তা হলে আসি।

প্রীতি বলল, আসি-টাসি নয়। বলুন যাই। আর আসার কোনও প্রভিশন না-রাখাই ভাল। আপনিও খুব ভাল লোক নন উপলবাবু।

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

প্রীতি বলল, বেচারা!

কে?

আমি নিজেই।

আমি সকালে তেমন কিছু খাইনি, ক্ষণা দুটো বিস্কুট দিয়ে চা দিয়েছিল। সুবিনয় আজকাল ফ্যাট হওয়ার ভয়ে আর কর্মক্ষমতা এবং যৌবনরক্ষার জন্য খাওয়া-দাওয়ার খুব কাটছাঁট করেছে। সেই মাপে আমারও খোরাক কমাচ্ছে ক্ষণা। কিন্তু আমার ফ্যাটের বা কর্মক্ষমতার বা যৌবনহানির কোনও ভয়ডর নেই, আমার বাস্তবিক খিদে পায়। এখনও পেয়েছে। প্রীতিদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে নিজের ভিতরে মাঠের মতো মস্ত ধু ধু খিদেটাকে টের পেয়ে অসম্ভব খেতে ইচ্ছে করছিল। অনেকক্ষণ ধরে গোগ্রাসে খেলে তবে যেন খিদেটা যাবে। মুখ রসস্থ, শরীরটা চনমনে।

পকেটে পাঁচ টাকার কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। রেস্টুরেন্টে বসে খেলে এক লহমায় ফুরিয়ে যাবে, পেটও ভরবে না। এ সব ভাবতে ভাবতে আধাআধি সিঁড়ি নেমেছি, এ সময়ে তলার দিক থেকে আর-একটা লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। অল্প বয়সের যুবক, ভীষণ অভিজাত আর সুন্দর চেহারা। খুব লম্বা-চওড়া নয়, কিন্তু ভারী ছমছমে শরীর তার। পরনে হাঁটুর কাছে পকেটওলা নীলরঙের জিনস্, গায়ে ক্রিমরঙা দুটো বুক পকেটওলা একটা জামা, পায়ে সম্বরের গোড়ালি-ঢাকা বুট, চোখে একটা বড় চশমা, হাতে মস্ত একটা ঘড়ি, ঘাড় থেকে স্ট্র্যাপে একটা ব্যাগ ঝুলছে। এক পলকেই বোঝা যায়, এ লোকটা বিদেশে থাকে, বা সদ্য বিদেশ থেকে এসেছে। শিস দিতে দিতে তরতর করে উঠে আসছিল, আমার মুখোমুখি পড়ে 'এক্সকিউজ মি' বলে দেয়ালের দিকে সরে গেল। তার মুখে একটু মেয়েলি কমনীয়তা আছে, খুব ফরসা রং, চোখের দৃষ্টির মধ্যে যে সুদূরতা মিশে আছে তা দেখলে বোঝা যায়, এ খুব পড়াশুনা করেছে বা করে। ব্যাগের গায়ে লেখা 'প্যান-অ্যাম'। আমাকে পেরিয়ে ওপরে উঠে গেল যুবকটি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, প্রীতিদের আধ-খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যুবকটি ভালবাসার গলায় ডাক দিল, প্রীতি!

আমি তাড়াতাড়ি নেমে আসতে থাকি। আমি চাই না, প্রীতি এই অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলুক। নামবার সময়ে ভাবতে থাকি, যদি কখনও এই যুবকটির সঙ্গে সুবিনয়ের মারপিট লাগে তবে কে জিতবে! সুবিনয়েরই জেতবার কথা, যদি এ ছোকরার কোনও মার্কিন প্যাঁচ ফ্যাঁচ জানা না থাকে।

কিন্তু পৃথিবীর সুখী মানুষদের এ সব প্রেম-ভালবাসার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা আমার এখন নয়। খিদেটা অসম্ভব চাগিয়ে উঠেছে। খিদের মুখে সবসময়ে খাবার জুটবে এমন বাবুগিরির অবস্থা আমার নয়। খিদে পেলেও তা চেপে রাখার অভ্যাস আমার দীর্ঘকালের। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয়, খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠি। তখন সব রকম রীতিনীতি ভুলে কেবল একনাগাড়ে গবগব করে খেতে ইচ্ছে করে।

খিদের মুখে মাসির কথা আমার মনে পড়বেই।

৬

মেডিকাল কলেজের উলটো দিকে আরপুলি লেন দিয়ে ভিতরে ঢুকে মধু গুপ্ত লেন ধরে এগোলে প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ি। বাড়ি প্রকাণ্ড হলেও শরিকানার ভাগাভাগি আছে। তবে সামনের দিকের বড় একটা অংশই বড়বাবুর দখলে। বাড়ির সামনে বড় একটা দরজা, দরজার দু'দিকে চওড়া টানা দুটো রক। বাঁ দিকের রক বড়বাবুর, ডান দিকের রক ছোটবাবুর। বাইরের লোকজনের লিমিট এই রক পর্যন্ত, এর ভিতরে আর বড় কেউ একটা ঢুকবার অনুমতি পায় না। প্রায়ই দেখি, কেউ দেখা করতে এলে বড়বাবু তাঁর রকে বা ছোটবাবু তাঁর রকে এসে দাঁড়ান। দু' ভাইয়ের রংই ফরসা টকটকে, বেশি লম্বা না হলেও পেট-কাঁধ-বুক-পায়ের গোছা নিয়ে বিশাল চেহারা, পরনে গামছা, খালি গা ও পা। রকে রাজারাজড়ার মতো বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়ান, প্রয়োজন হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেমনি দাঁড়িয়ে কথা বলেন, কখনও অভ্যাগতকে ভিতর-বাড়িতে নেওয়ার নাম করেন না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, গামছা পরে আছেন কেন, তা হলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সকালে বা বিকেলে দু' ভাই-ই একই উত্তর দেন, এই তো, এবারে গা ধুতে যাব।

আসলে গা ধুতে যাওয়ার কথাটা স্রেফ মামদোবাজি। আমি জানি দু' ভাই-ই বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে সবসময়ে গামছা পড়ে থাকেন। অবশ্য তাঁদের গামছার প্রশংসা না করাটা অন্যায় হবে। তাঁরা যে গামছা পরে থাকেন তা বাজারের সেরা জিনিস।

বড় ভাই গিরিবাবু এক সময়ে দারুণ ঘুড়ি ওড়াতে পারতেন, এখন পায়রা পোষেন, পাশা খেলেন। চেহারার মধ্যে একটা সব পেয়েছির তৃপ্ত ভাব। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখাই যে জীবনের সব সার্থকতার মূলে তা বোঝাতে থাকেন।

এ বাড়িতে আমিও বহু বার রক থেকে ফিরে গেছি। আজকাল অন্দরে ঢুকতে বাধা হয় না। বিয়ে-পৈতে-পাল-পার্বণ বা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য হলেও মাসি আমাকে নেমন্তন্ন জুটিয়ে দেয় এ বাড়িতে। সেই থেকে ভিতর-বাড়িতে ঢোকার ভিসা পাওয়া গেছে। মিথ্যে বলব না, বড়বাবু, ছোটবাবু বা এ বাড়ির অন্যসব পুরুষদের কিছু বংশগত বদ দোষ আছে। কিন্তু এ বাড়িতে যখন নেমন্তন্ন করে কাউকে খাওয়ানো হয় তখন আয়োজন দেখে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। ছ' রকমের ভাজা, শুকতুনি, দু' রকম ডাল, তিন ধরনের মাছ, মাংস, ডিম, চাটনি, দই মিষ্টির সে এক দিশেহারা ব্যাপার। কিন্তু অসুবিধে হল, আমি যখন এই প্রলয়ংকর ভোজের ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি তখন আমার পাশে বসেই অনর্গল কথা বলতে বলতে বড়বাবু এবং নিস্তব্ধ মুখে বড়বাবুর ছানাপোনারা অতি সাধারণ ডাল তরকারি মাছের ঝোল দিয়ে সাদামাটা খাওয়া সেরে মাথা নিচু করে বসে আছে। এ বাড়ির এই নিয়ম। বাইরের লোকের জন্য এক আয়োজন, বাড়ির লোকদের জন্য আর-এক। মাসি আমাকে একবার কানে কানে সাবধান করে দিয়েছিল, খেতে বসে— এ বাড়িতে কিন্তু কোনও পদ আর-এক বার চাসনে। ওদের বাড়তি জিনিস থাকে না।

যা যা থাকলে মেয়েদের সুন্দর বলা যায় তার যদি একটা বিশ দফা ফর্দ করা হয় তবে তার মধ্যে ষোলো দফাই বড়বাবুর মেয়ে কেতকীর সঙ্গে মিলে যাবে। গায়ের রং বড়বাবুর মতোই ফরসা, চেহারা লম্বাটে গড়নের, মুখখানা এত মিষ্টি যে মনে হয় পিঁপড়ে ধরবে। ভারী একটা সরল মুগ্ধতার হাবভাব আছে তার মধ্যে। যার দিকে চায়, যেদিকে চায় তাকেই বা সেটাকেই যেন ভালবেসে ফেলে। এই বিভ্রান্তকারী দৃষ্টি যার ওপর পড়ে সেই ভুল করে ভেবে ফেলতে পারে যে, কেতকী তার প্রেমে পড়েছে। গয়লা শিউপূজন থেকে শুরু করে পাড়ার ছেলেছোকরা এবং এমনকী আমি পর্যন্ত ভাবি। কেতকীর কটাক্ষের প্রভাব ক্যানসারের মতো সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। ট্রেনের কামরায় বা বাসের জানালায় যারা একঝুঁকে তার চোখে চোখ রাখতে পেরেছে তাদের কেউই বোধহয় আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এইরকম হিসেব ধরলে সারা কলকাতায়

এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে কেতকীর প্রেমিক অগুনতি। কেতকীর নামে ডাকে এবং হাতে রোজ যত চিঠি আসে তার হিসেব এবং ফাইল রাখতে একটা পুরো সময়ের কেরানি দরকার।

বড়বাবু কেরানি রাখেননি, তবে কেতকীর ভাইদের অবসর সময়ের একমাত্র কাজ হল চিঠি-ধরা। দরজার ফাঁকে, জানালার ফোকরে, ডাকবাক্সে, বইয়ের ভাঁজে, ঘরের জলনিকাশী ফুটোয়, ভেন্টিলেটারে সর্বদাই তারা চিঠি খুঁজছে এবং পাচ্ছে। এমনকী ছাদে ঢিল-বাঁধা চিঠিও প্রতি দিনই বেশ কিছু এসে পড়ে। প্রেমিকদের প্রাবাল্য দেখে বড়বাবু একসময়ে ঠিক করেছিলেন কেতকীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু কেতকী পড়াশুনোয় সাংঘাতিক ভাল হওয়ার ফলে সেটা আর হয়নি। কেতকী এখন এম এ পাশ করে মঙ্গলকাব্যে নারীর সাজ নিয়ে রিসার্চ করছে। দুটো গুমসো গুমসো ভাই সঙ্গে করে ইউনিভার্সিটি বা লাইব্রেরিতে নিয়ে যায় নিয়ে আসে।

আজ ছোটবাবুর রকে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। নতুন রাঙা গামছায় তার চেহারার বড় খোলতাই হয়েছে। বাঁ হাতে তেলের শিশি থেকে ফোঁটা মেপে ডান হাতের তেলোয় তেল নিয়ে চাঁদিতে পালিশওলা ছোকরা যেমন বেগে বুরুশ চালায় তেমনি ঘষছেন। এ বাড়ির পুরুষরা চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারেন না, আমাকে দেখেও ছোটবাবু বিকট চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাই যা উপলচন্দোরকে দেখছি যেন! অ্যাঁ!

ছোটবাবুর পায়ের ডিম দেখে অবাক মানতে হয়। গোদ নেই, তবু পা কী করে অত মোটা হয় তা গবেষণার বিষয়। ছোটবাবুও আমার চোখ দেখে ব্যাপারটা ধরে ফেলে তেমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এ আর কী দেখছ ভায়া, সে বয়সে দেখলে ভিরমি খেতে। এমন মাস্‌ল্ ড্যানসিং করেছি যে জজ ব্যারিস্টার পর্যন্ত দেখতে এয়েছে।

অমায়িক হেসে বড়বাবুর অংশে ঢুকতে ঢুকতে শুনি, ভিতরে বড়বাবু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছেন. অ্যাঁ, ডিম এনেচ্যা! ডিমের গুষ্টির তুষ্টি করেছি। যা ফেলে দিগে যা। কাল থেকে পোনা মাছের টক খাব বলে পই পই করে বলে রাখলুম, গুষ্টির মাথা গুচ্ছের ডিম এনে দাঁত বের করছিস কোন আক্কেলে র‍্যা!

দালানে গিয়ে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়, এ বাড়িতে এখনও পুরুষদের প্রাধান্য। মেয়েদের দাপট অতটা নেই। বড়বাবুর এত চেঁচামেচিতে বড়গিন্নির গলার কিছু সরু শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল মাত্র।

অফিসের সময় হয়েছে, বড়বাবু খুব দাপুটে পায়ে দালান কাঁপিয়ে কলঘরে যাওয়ার সময়ে আমাকে দেখে যাওয়া না-থামিয়েই বলতে বলতে গেলেন, উপল-ভাগ্নে যে! খবর সব ভাল তো! সাত-সকালে দেখো গে যাও গোবিন্দ গুচ্ছের অযাত্রার ডিম এনে ফেলেছে। পাখি-পক্ষীর ডিম খেয়ে মানুষ বাঁচে, বলো? বাঙালির শরীরে মাছ ছাড়া রক্ত হয়, শুনেছ? বলেছি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে।

কলঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তবু ভিতর থেকে জলের শব্দের সঙ্গে চেঁচানি আসতে লাগল, পয়সা মেরেছে। হিসেব নিয়ে দেখো না। আজকাল বিড়িটিড়ি ফুঁকছে তো।

রান্নাঘরের দিক থেকে বড়গিন্নির স্বর প্রবল হল, ঝাঁটা মেরে বিদেয় করতে হয় ছেলেকে। ডিম-ডিম করে দিনরাত পাগল করে খেলে! যা গিয়ে এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়।

কলঘর থেকে বড়কর্তা তখনও চেঁচাচ্ছেন, আরে, আমি বলেছি তো, ওর পকেট-টকেট ঝেড়ে দেখো গে। লায়েক হয়েছে, পয়সা চিনেছে। দু'-চার পয়সা এদিক-ওদিক বাজার থেকে আমরাও বয়সকালে করেছি। তা বলে পোনা মাছের বদলে বাপের জন্মে ডিম আনিনি বাবা। দাও ওর মুখে কাঁচা ডিম ঘষে।

রান্নাঘর থেকে গিন্নি গলার রগ ছিঁড়ে এবার চেঁচান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা ফেরত দিতে না পারবি তো। তেঁতুল গুলে, ফোড়ন সাজিয়ে বসে আছি, মাছ এলে রান্না হবে, উনি খেয়ে আপিস যাবেন, বেলা সাড়ে ন'টায় থলি দুলিয়ে বাবু এলেন। ঝাঁটা, ঝাঁটা—

তাড়া খেয়ে বড়বাবুর গুমসো মতো বড় ছেলে গোবিন্দ দালানে বেরিয়ে এল। আকাট মুখ্যুর মতো রাঙামুলো চেহারা। পাজামা আর নীল শার্ট পরা ছেলেটা ডিম ফেরত দিতে যাওয়ার সময়ে আমাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে ভ্যাবলা মতো হেসে চলে গেল। চেহারার মধ্যে বংশের ছাপ পড়ে গেছে। বড়বাবুর চার ছেলের মধ্যে কেউই পকেটে কখনও পয়সা নিয়ে বেরোয় না, নিতান্ত বাস বা ট্রামের ভাড়াটা ছাড়া। রাস্তায় চটি ছিঁড়লে সারানোর পয়সা পর্যন্ত থাকে না পকেটে। কী সাংঘাতিক! বাড়তি পয়সা থাকলেই খরচ হওয়ার ভয়। পৌষপার্বণের দিন পিঠে তৈরি হয় বলে এ বাড়িতে সেদিন রান্না বন্ধ। সবাই পিঠে খেয়ে থাকে। আমার বাবার বাড়িওয়ালা বাবাকে হরতালের আগের দিন দু'বার বাজার করতে দেখে খেপে গিয়েছিলেন। এদের দেখলেই সেই বুড়ো বাড়িওলা ভারী খুশি হতেন।

এত চেঁচামেচির মধ্যে মাসির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। পাওয়ার কথাও নয়। আমার বোকাসোকা, ভালমানুষ কানা মাসি সবসময়ে তার আশপাশের লোকজনকে বড় বেশি চালাক-চতুর বলে মনে করে। 'কী জানি বাবা, আমি যখনই কথা কই তখনই কেমন বোকা-বোকা কথা বেরিয়ে পড়ে' প্রায়ই এই বলে দুঃখ করত মাসি। এ বাড়িতে আসা ইস্তক বোকা-কথা বলে ফেলার ভয়ে মাসির বাক্য প্রায় হরে গেছে। যাও-বা বলে তাও ফিসফিসের মতো আস্তে করে। এ বাড়ির ঝি-চাকরকেও খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে মাসি। কোনও ঝগড়া কাজিয়া চেঁচামেচির মধ্যে নাক গলায় না। কর্তা যা বোঝায় তা-ও বোঝে, আবার গিন্নি যা বোঝায় তা-ও বোঝে। যা কিছু বলার কথা থাকে তা আমাকে বলার জন্য পেটে জমিয়ে রাখে মাসি।

বকাবকি এখনও শেষ হয়নি। ভিতর-বাড়ির দিক থেকে একটা গদি-আঁটা মোড়া এক হাতে, অন্য হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বড়গিন্নি উঠে আসছিলেন বকতে বকতে, মতিচ্ছন্ন, মতিচ্ছন্ন! বাজারে যাওয়ার সময়ে পই পই করে বললুম মাছের কথা, কান দিয়ে শুনল

কলঘর থেকে বড়কর্তা বললেন, মাছ কান দিয়ে মাথায় ঢুকেই ডিম হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের করে দাও আজই জুতোপেটা করে।

মাসির কাছে যাতায়াত করতে করতে আমি এ বাড়ির পুরনো লোক হয়ে গেছি। তাই বড়গিন্নি আমাকে দেখে লজ্জা পেলেন না, খবরের কাগজ ধরা হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে বললেন, ডিম নিয়ে কী কাণ্ড শুনছ তো! আমার ছেলেরা সব ওইরকম। যাও, ঠাকুরঝি রান্নাঘরে আছে।

মাসি রান্নাঘরেই চৌপর দিন পড়ে থাকে, আমি জানি। ইচ্ছে করেই থাকে। রান্নাঘরের বাইরের দুনিয়াটায় মাসির বড় অস্বস্তি।

মাসি আলু কুচিয়ে নুন মাখা শেষ করেছে, কড়াইতে তেল হয়ে এল। ছাড়ার আগে তেলের ফেনার শেষ বুদবুদটার মিলিয়ে যাওয়া একটা চোখে সাবধানে দেখছিল। মুঠোয় ধরা জল নিংড়ানো ঝিরিঝিরি করে কুচোনো আলু! আজ মাছের বদলে বড়বাবু এই আলুভাজা খেয়েই যাবে।

'মাসি' বলে ডাকতেই মাসি ঠান্ডা সুস্থির মুখখানা ফেরাল। কানা চোখটার কোলে জল জমে আছে। একগুচ্ছ উঁচু নোংরা দাঁত ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে থাকে সবসময়ে, ওই দাঁতগুলোর জন্য কখনও দুই ঠোঁট এক হয় না। দু'গালের হনু জেগে আছে। ময়লা থানের ঘোমটায় আধো-ঢাকা মাথায় অনেকগুলো পাকাচুল ভেসে আছে। মাসি দেখতে একদম ভাল না। দাঁতগুলোর জন্যই আরও কুচ্ছিত দেখায়। বাবার দু'-একজন শুভানুধ্যায়ী বা বন্ধুবান্ধব বাবাকে বলত, বাপু হে, দ্বিতীয় বিয়েটা আর-একটু দেখেশুনে করলে পারতে! বাবা জবাব দিত, না হে, বউ সুন্দর-টুন্দর হলে আমি হয়তো বা বউ-খ্যাপা হয়ে যেতাম. তা হলে আমার উপলের কী হত! উপলকে মানুষ করার জন্যই তো দ্বিতীয় বিয়েতে বসা।

কানা মাসি সুন্দর নয় বলে আমার তো কিছু খারাপ লাগে না।

তেল থেকে ধোঁয়া উঠতে, মাসি কুচোনো আলু ছাড়তে ভুলে গিয়ে দু'গাল ভরতি করে হেসে

বলল, দিন-রাত ভাবছি। ও উপল, দু'বেলা ভরপেট খাস তো।

খাই। আমার খাওয়ার চিন্তা কী?

পিঁড়ি পেতে বোস।

বসলাম। বললাম, মাসি তেল পুড়ে যাচ্ছে, আলু ছাড়ো।

তেলে পড়ে আলু চিড়বিড়িয়ে উঠল। মাসি এক চোখের দৃষ্টিতে গোরু যেমন বাছুরকে চাটে তেমনি চেটে নিল আমাকে। বলল, একটা মাত্র চোখ, তা সে চোখে ছানি আসছে।

উদাস হয়ে বললাম, আসবেই। বয়স হচ্ছে।

কলঘর থেকে বড়বাবু মাটি কাঁপিয়ে বেরোলেন। শব্দ হল। মাছের শোক এখনও ভুলতে পারেননি, চেঁচাচ্ছেন সমানে, বললুম তো, বিড়ি-টিড়ি খেতে শিখেছে, খোঁজ নিয়ে দেখোগে যাও। কত করে ডিমের জোড়া এনেছে বলল?

বলতে বলতে বড়বাবু পুরনো সিঁড়িতে ভূমিকম্প তুলে ওপরতলায় উঠে গেলেন।

মাসি একটা সোনার মতো রঙের ঝকঝক করে মাজা কাঁসার থালায় ভাত বাড়তে লাগল। এমন যত্নে ভাত বাড়তে বহুকাল কাউকে দেখিনি। নিখুঁত একটা নৈবেদ্যের মতো সাজানো ভাতের ঢিবি, একটা ভাতও আলগা হয়ে পড়ল না। ঢিবিটার ওপর ছোট একটা মধুপর্কের মতো বাটিতে একরত্তি ঘি। নুনটুকু পর্যন্ত কত যত্নে পাতের পাশটিতে সাজিয়ে দিল। দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

মাসি বলল, আজ মাছ নেই বলে ঘিয়ের ব্যবস্থা, নইলে ঘি রোজ দেওয়ার কথা নয়। গোবিন্দটা বড্ড বকুনি খেল আজ।

মাসির রান্নার কোনও তুলনা হয় না। আমাদের মতো গরিব-গুর্বোর বাড়িতে কীই বা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল! তবু মাসি জলকে তেল বলে চালিয়ে, কি কাঠখোলায় ভাজা সম্বর দিয়ে এমন সব রান্না করত যে আমরা পাত চেটেপুটে উঠতাম। সেই রান্নার ধাঁচ আজও আছে। মাসি একটু নিরামিষ বাটিচচ্চড়ি যখন বড়বাবুর পাতে সাজিয়ে দিচ্ছিল তখন পুরনো আভিজাত্যের গন্ধ নাকে ঠেকল এসে।

বললাম, মাসি, তোমাকে এরা খেতে-টেতে দেয়?

মাসি চাপা গলায় বলল, এ সব অত জোরে বলিস না। কে শুনতে পাবে।

বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, দেয়। আবার একটু চুপ করে আলু ভাজা ওলটাল মাসি, খানিক নেড়ে চেড়ে তেল থেকে হলুদ, মুড়মুড়ে ভাজা ছেঁকে তুলে বড়বাবুর পাতের বাহার বাড়িয়ে বলল, তোকে দেয়?

দেবে না কেন? তা ছাড়া পুরুষ ছেলের আবার খাওয়ার ভাবনা। তোমার খাটুনি কেমন?

মাসি রেখে-ঢেকে বলল, সে আর বেশি কী? দু'বেলা মোটে তো রান্না। চোখটাই আজকাল বড় অসুবিধে করে। সকালে কী খেয়েছিস?

চা আর বিস্কুট। তুমি?

বড় অফিস গেলে এইবার খাব। বোস। তোর জন্য একটা জিনিস রেখেছি। কতকাল আসিস না বল তো! মাঝরাতে উঠে বুক কেমন করে। কাঁদি কত।

ওপর থেকে বড়গিন্নি ডাক দিল, ঠাকুরঝি ভাত দিয়ে যাও।

মাসি এক হাতে থালা, অন্য হাতে ডালের বাটি নিয়ে উঠে গেল। ফাঁকা রান্নাঘরে বসে নিজেকে খুব খারাপ লাগল। আমার কত কিছু হওয়ার কথা ছিল! তার একটা কিছু হলে মাসি কি এ বাড়িতে রেঁধে খায়? একটু বাদে মাসি ফিরে এসে বলল, ওদের ফাইফরমাশ খাটিস নাকি?

খাটি।

খাটিস। না খাটলে ভালমতো খেতে দেবে না। বড়কে বলে রেখেছি ওর অফিসে তোকে একটা কাজ দিতে।

বড়বাবু আমাকে দেবে কেন? তার বড় ছেলেকে ঢোকাবে বরং।

তোকেও দেবে। বি কম পাশ চাট্টিখানি কথা নাকি! বড়র একটা ছেলেরও অত বিদ্যা আছে? তা ছাড়া তুই কত কী জানিস! গান, আঁকা, পাট করা।

মাসি পুরনো একটা কৌটো খুলে দু'-তিনটে পাউরুটির টুকরো বের করে আমাকে দিয়ে বলল, খা।

মাসির এই এক রোগ, কোনও কিছু ফেলবে না। আমাদের বাড়িতে লাউ বা আলুর খোসা পর্যন্ত ফেলত না, চচ্চড়ি বা ভাজা করে ফেলত। এমনকী পেঁপের খোসা পর্যন্ত রসুন-টসুন দিয়ে বেটে ঠিক একটা ব্যঞ্জন তৈরি করে ফেলত।

পাউরুটির টুকরোগুলো বিস্কুটের মতো। কটকটে শক্ত।

উনুনের ধারে রেখে রেখে করেছি। ভাল না?

ভালই। খেতে খেতে বলি, পয়সাকড়ি দেয় কিছু?

না। পয়সা দিয়ে হবেই বা কী? এক মাঝে মাঝে তোকে একটু জামা-টামা দিতে ইচ্ছে করে। কেমন এক ছোটলোকি পোশাক পরে বেড়াস। গোবিন্দর কেমন সব জামা-কাপড়। কিন্তু কাজ-টাজ হয় না কেন তোর বল তো! তা হলে তোর কাছে থেকে দু'বেলা দুটো রেঁধে খাওয়াতাম।

ক্ষণার দেওয়া বাজারের পয়সা থেকে বা সারা বাড়ি আঁতিপাঁতি খুঁজে যা পয়সাকড়ি জমিয়েছি তা সবসুদ্ধ গোটা ত্রিশ টাকা হয়েছে। সেগুলো আনার সময় পাইনি আজ। সুবিনয়ের দেওয়া পাঁচটা টাকার যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে দুটি টাকা পকেট থেকে বের করে মাসিকে দিয়ে বলি, রেখে দাও। কিছু খেতে-টেতে ইচ্ছে করলে কিনে খেয়ো।

কানা চোখে জল পড়ছিলই, এবার ভাল চোখ দিয়েও গড়াতে লাগল।

ঠাকুরঝি, ভাত আনো।— বড়গিন্নি সিঁড়ির ওপর থেকে বলে।

যাই।— বলে মাসি বাটি-টাটি নিয়ে উঠে গেল।

রান্নাঘরটা ঝকঝক করছে পরিষ্কার। কোথাও একটু ঝুল-কালি নেই, মেঝেয় গুচ্ছের জল পড়ে নেই, খাবার আঢাকা অবস্থায় রাখা নয়। মাসি এ সব কাজে পি-এইচ ডি।

মাসি খবরের কাগজে মোড়া একটা মুগার থান হাতে ফিরে এসে বলল, এটা দিয়ে দুটো জামা করিয়ে নিস।

হাতে নিয়ে দেখি, পুরনো হলেও আসল মুগার জিনিস। এখানে সেখানে কয়েকটা ছোপ ছোপ জলের দাগ বাদ দিলে এখনও ঝকমক করছে। বললাম, কোথায় পেলে?

বড়র মা মরে গেল তা বছর দুই হবে। তার সব বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে এই সেদিন পুরনো কাপড়-চোপড় যা বেরিয়েছিল তার থেকে বড়গিন্নি এইটে আমাকে দিয়েছে। তখনই ভেবে রেখেছি, তুই এলে জামা করতে দেব। ভাল দরজিকে দিয়ে বানাস। ভাল না জিনিসটা?

হুঁ।

কেতকীর সঙ্গে খুব ঝগড়া হচ্ছে বাড়ির সবার।

কেন?

কেন আর! মেয়েটা বড় ভাল, কিন্তু ওকে ছোঁড়ারা বড় যন্ত্রণা করে। ওর দোষ কী?

আমি চুপ করে থাকি। কেতকীর ব্যাপারে মাসির একটা দুরাশা আছে। মাসি চায়, কেতকীর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক।

বললাম, মাসি, কেতকীকে নিয়ে অত ভেবো না। তাকে নিয়ে ভাববার অনেক লোক আছে।

মাসি দমের আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়াচ্ছিল। বলল, কাকে নিয়ে না-ভেবে পারি বল। আপনা থেকেই সব ভাবনা আসে। এই যে গোবিন্দটা আজ বকুনি খেল সেই বসে বসে সারা

দিনমান ভাবব। বড্ড গোবেচারা ছেলে। ডিমের নামে পাগল। কত দিন লুকিয়ে-চুরিয়ে আনে, বলে, ভেজে দাও। আমিও দিই।

মনটা একটু খচখচ করে। একদিন ছিল, যখন মাসির গোটা বুকখানা জুড়ে আমিই ছিলাম। এখন আবার সেই জায়গায় অন্য লোকজন একটু-আধটু ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ছে। দোষ নেই, আমি মাসির বল্গাছাড়া ছেলে, এক বুক মায়া নিয়ে মাসিরই বা একা পড়ে থাকতে কেমন লাগে। মায়া এমনিই, থাকতে থাকতে দেখতে দেখতে একজন না একজনের ওপব পড়ে যায়।

বললাম, কেতকীকে নিয়ে তুমি আর ভেবো না মাসি, আমার গতিক তো দেখছ।

মাসি একটা চোখে ছানি সত্ত্বেও বেশ খর করে তাকিয়ে বলল, হালগতিক খারাপটা কী? বরাবরই তুই একটু কুঁড়ে বলে, নইলে তোরটা খেয়ে লোকে ফুরোতে পারত না। মা যেমন ছেলে চেনে তেমন আর কে চিনবে রে? ও সব বলিস না। বোস একটু, দমটা কষাই, দু'খানা রুটি দিয়ে খেয়ে যা। না কি ভাত খাবি দুটো?

না, না। ঝামেলায় যেয়ো না। পাঁচটা কথা উঠে পড়তে পারে।

মাসি একটা মাত্র ছানিপড়া চোখ সার্চলাইটের মতো আমার ওপর ফেলল। স্টিমারের বাতি যেমন তীরভূমির অন্ধকার থেকে খানাখন্দ, গাছপালা ভাসিয়ে তোলে, মাসির চোখ তেমনি আমার ভিতরকার খিদে-টিদে, জ্বালা-যন্ত্রণা সব দেখে নিল।

বেশি কথার মানুষ নয়, আলুর দম চাপিয়ে ঝকঝকে একটা কাঁসার থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, লোকে তোকে সোনা হেন মুখ করে খেতে দেবে, তেমন কপাল করেছিস নাকি? যে বাড়িতে থাকিস তারাও না জানি কত গালমন্দ শাপ-শাপান্ত করে তবে খেতে দেয়।

আমার খিদেটা কোনও সময়েই তেমন তৃপ্তি করে মেটে না। খুব তৃপ্তি করে খেলে পেটে যে একটা চমৎকার যুদ্ধবিরতির অনুভূতি হয়, তা আজকাল টের পাই না। সব সময়েই একটা খিদের ভাব থাকে, সেটা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কয়েক দিন আগে এক বিকেলে ক্ষণা সবাইকে আনারস কেটে দিয়েছিল। আমাকে কিছু কম, অন্যদের কিছু বেশি। সুবিনয় আনারস চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলছিল। দেখলাম, ক্ষণাও ছিবড়ে ফেলে, সুবিনয়ের মাও। কিন্তু আমার আর ছিবড়ে হয় না। যত বার মুখে দিয়ে চিবোই, তত বার শেষ পর্যন্ত গিলে ফেলি। পাছে ওরা লোভী ভাবে, সেই ভয়ে একবার-দু'বার অতি কষ্টে একটু-আধটু ছিবড়ে ফেলেছি বটে, কিন্তু আগাগোড়া ছিবড়ে ফেলার ব্যাপারটাকেই আমার খুব অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। আমার তো আজকাল আখ খেলেও ছিবড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না।

মাসি ভাতের থালাটা রান্নাঘরের কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, খেতে থাক। দমটা হয়ে এল, ঘি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে ফেলব এবার। পেট ভরে খা, ভয়ের কিছু নেই।

পেট ভরে খা এই কথাটা বহুকাল কেউ বলেনি আমাকে। আমার দুনিয়া থেকে কথাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। তাই ভাবি, শুধু এক থালা ভাতের জন্য নয়, ওই কথাটুকু শুনবার জন্যই বুঝি মাসির কাছে মাঝে মাঝে এই আসা আমার।

ভাতের থালাটা নিয়ে আবডালে সরে বসে খেতে খেতে বলি, মাসি, এর জন্য তোমাকে না আবার কথা শুনতে হয়।

মাসি আলুর দমের ঢাকনা খুলে চার দিক গন্ধে লন্ডভন্ড করে দিয়ে বলল, অত কিটির কিটির করিস না তো বাপঠাকুর। সারাদিন এ বাড়ির জন্য গতরপাত করছি, তাও যদি আমার ছেলে এখান থেকে শুধু মুখে ফিরে যায় তো এর চেয়ে ফুটপাথে গিয়ে থাকা ভাল।

মাসিব এই তেজ দেখে অবাক হই। আগে মাসির এত তেজ ছিল না। এ বাড়িতে বেগার খেটে খেটে কি মাসির একটা মরিয়া ভাব এসেছে নাকি!

জানালার শিকের ফাঁকে একটা বেড়াল লাফ দিয়ে উঠে এসে পরিষ্কার গলায় ডাকল, মা।

মাসি তার দিকে চেয়ে বলল, সারাটা সকাল কোন মুলুকে ছিলে? এখন হাত জোড়া, বসে থাকো ওইখানে। খাবেই বা কী, আজ মাছ-টাছের বালাই নেই।

জানালার বাইরে একটা কাক হুতুম করে এসে বসল, একটা চোখে মাসিকে দেখে খুব মেজাজে বলল, খা?

মাসি তাকেও বলল, মুখপোড়া কোথাকার! যখন-তখন তোমাদের আসবার সময় হয়! যা, এখন ঘুরে-টুরে আয়।

বলতে বলতে মাসি বেড়ালকে এক খাবলা দুধে-ভাতে মেখে দিল, জানালার বাইরে কাকটাকে দু' টুকরো বাসি রুটি দিয়ে বিদেয় করল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম, এইসব কাক বেড়াল সেই আমাদেরগুলোই নাকি! মাসির গন্ধে গন্ধে এসে এখানেও জুটেছে!

বললাম, মাসি, সারাটা জীবন তোমার পুষ্যিরা আর তোমাকে ছাড়ল না। কাক, কুকুর, বেড়াল, আমি।

মাসি বলল, মুখ্যু।

কে?

তুই।

এই যে বলে বেড়াও, আমি বি কম পাশ করা মস্ত লায়েক!

তা হলেও মুখ্যু। যে নিজেকে কাক কুকুরের সমান ভাবে, সে মুখ্যু ছাড়া কী?

তাই তো হয়ে যাচ্ছি মাসি দিনকে দিন।

বালাই ষাট। একদিন দেখিস, তোরটা কত লোকে খাবে।

আলুর দম দিয়ে মাখা ভাত মুখে দিয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গেল। আমি কোথায় আছি, আমি কে, এ সব জরুরি ব্যাপার পর্যন্ত মনে পড়ছে না। পেটের ভিতর এক অপরিসীম প্রশান্তি নেমে যাচ্ছে। মনে হয়, আমার হৃদয়ের কোনও সমস্যা নেই, মস্তিষ্কের কোনও চাহিদা নেই, আমার কেবল আছে এক অসম্ভব খিদে।

সেই মুহ্যমান অবস্থা থেকে যখন বাস্তবতায় জেগে উঠি, পৃথিবীটা তখন নতুন রকম লাগে। একটা কুয়াশার মতো আবছায়ার ভিতর থেকে রান্নাঘরটা যখন আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তখন দেখি, দরজার চৌখুপিতে সাংঘাতিক ঝলমলে রঙে একটা মেয়ের ছবি কে এঁকে রেখেছে। অবাক হয়ে মেয়েটা আমাকে দেখছে। আমিও অবাক হয়ে তাকে দেখি।

মেয়েটা বলল, উপলদা না?

কেতকীকে দেখে মনে হল, সে খুব হালে খোলস ছেড়েছে। কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে তাকে। রোগা, বিষণ্ণ। সেই ভালবাসার চোখও যেন আর নেই।

লজ্জা পেয়ে বলি, এই দেখো না, মাসি জোর করে খাওয়াল।

কেতকী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আপনার খুব খিদে পেয়েছিল। এমনভাবে খাচ্ছিলেন!

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো বলি, হ্যাঁ, আমার খুব খিদে পায়।

আমার পায় না।

এই বলে কেতকী তার স্নান করা ভেজা এলোচুল বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে আঙুলে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, খাওয়া জিনিসটাই এত বাজে আর বিচ্ছিরি! আমার একদম খেতে ইচ্ছে করে না। লোকে যে কী করে খায়!

মাসি জড়সড় হয়ে বসে ছিল। বেরিয়ে থাকা দাঁতের ওপর দুটো মাছি বসে একটু মারপিট করে উড়ে গেল। মাসি টের পেল না।

কেতকী পিছনে হেলে আবার তার চুলের গোছ পিঠে ফেলে দিয়ে বলল, পিসি খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু তবু আমার খেতে ইচ্ছে করে না।

এই বলে কেতকী চলে গেল।

মাসি অকারণে বলল, বড় ভাল মেয়েটা। খাওয়া-টাওয়া খুব কম। কোনও বায়নাক্কা নেই।

আমি বললাম, হুঁ, বেশ ভাল।

পড়াশুনোতেও খুব মাথা।

হুঁ।

কেবল ছোঁড়াগুলো জ্বালায়, তার ও কী করবে! ও কারও দিকে ফিরেও দেখে না। তবু সেদিন বড়গিন্নি ওকে কী মার মারলে! তারপর মেয়ে তিন দিন খায়নি।

অবাক হয়ে বলি, অত বড় মেয়েকে মারল কী গো?

তাও কী মার বাবা! একবার ছড়ি দিয়ে, একবার জুতো দিয়ে, শেষমেষ মেঝেয় মাথা ঠুকে ঠুকে উস্তম কুস্তম মার। সে মার দেখে আমার বুকে ধড়াস ধড়াস শব্দ আর শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল।

হয়েছিল কী?

ওই গলির মোড়ের লাল বাড়িটায় একটা গুন্ডা ছেলে থাকে। তার বড় বাড় হয়েছে। রাস্তায়-ঘাটে যখন তখন কেতকীকে জ্বালাতন করে। তার সঙ্গে আবার ছোটকর্তার সাট আছে। কাকা হয়ে ভাইঝিকে হেনস্থা করার যে কী রুচি বাবা। সেই ছোটকর্তার লাই পেয়ে ছোঁড়াটার আরও সাহস বেড়েছে। এই তো সেদিন কেতকী কলেজ থেকে ফিরছে সন্ধেবেলা। ছোঁড়াটা মোড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, কেতকী যেই এসেছে অমনি দু'-তিনজন মিলে তাকে ধরেছে ট্যাক্সিতে তুলবে বলে। চেঁচামেচি, রই-রই কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি ভাগ্যে! সেইজন্য নির্দোষ মেয়েটাকে ধরে এই মার কি সেই মার।

পুলিশে ধরিয়ে দিল না কেন ছেলেটাকে?

কে দেবে বাবা! সে ছেলের ভয়ে নাকি সবাই থরহরি। বড়কর্তা খানিক চেঁচামেচি করল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তারপর সব চুপচাপ। মার খেয়ে কেতকী আমাকে ধরে সে কী কান্না। কেবল বলে, বাবাকে বলো আমার বিয়ে দিয়ে দিক, আমি আর এ সব যন্ত্রণা সইতে পারছি না।

উৎসুক হয়ে বলি, কাকে বিয়ে করতে চায় কিছু বলল।

না, তেমন মেয়ে নয়। মা-বাবা যার সঙ্গে দেবে তাকেই বিয়ে করবে। তাই বলছিলাম, তোর যদি একটা কিছু হত, একটু যদি মানুষের মতো হতি! বড় ভাল ছিল মেয়েটা। একদিন ঠিক ষণ্ডাগুন্ডায় টেনে নিয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ি।

৭

সুবিনয়ের সঙ্গে যদি কখনও আমার কোনও শলাপরামর্শ থাকে তবে আমরা সাধারণত সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটবাড়িতে দেখা করি। কোম্পানির লিজ নেওয়া বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি। চারখানা মস্ত শোওয়ার ঘর, একটা বসবার, একটা খাওয়ার আর একটা পড়াশুনো করবার ঘরও আছে, তিনটে বাথরুম, গ্যাস লাইনের ব্যবস্থাসহ রান্নাঘর, টেলিফোন—কী নেই? এত ভাল বাসা ছেড়ে সুবিনয় বোকার মতো তার প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোডের পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছে। কোম্পানির দেওয়া এ বাসার খবর তার বাড়ির কেউ জানেও না।

বাইরের ঘরে সোফায় বসে মস্ত লম্বা দুটো ঠ্যাং সামনে ছড়িয়ে প্রায় চিতপাত অবস্থায় শুয়ে সুবিনয় আমার কাছ থেকে সব শুনল। একমনে সিগারেট খাচ্ছিল কেবল, কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই একটা ঝাঁকি মেরে উঠে বসল। তার পরনে কেবলমাত্র

একটা আন্ডারওয়্যার আর স্যান্ডো গেঞ্জি। উঠে বসতেই তার শরীরের সব সহজাত মাংসপেশিগুলো টনটনে হয়ে উঠল। দুটো চোখে আলপিনের ডগার মতো সরু এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভ্রু কোঁচকানো। দশাসই বিশাল চেহারাটায় একটা উগ্র রাগ ডিনামাইটের মতো অপেক্ষা করছে।

বলল, তুই তো এর আগেও কত বার প্রীতিকে আমার চিঠি দিয়ে এসেছিস, কোনওবার এমন কথা বলেছে?

না।

তবে আজ বলল কেন? ঠিক কীভাবে বলল হুবহু দেখা তো! ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে নাকি?

না, ঠাট্টা নয়। খুব সিরিয়াস।

ঠিক আছে, সে আমি বুঝব। তুই দেখা তো।

বহুকাল বাদে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আমি রুমার দরজা খোলা থেকে শুরু করেছিলাম। রুমা দরজা খুলে খুব অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

সুবিনয় বলল, আঃ, প্রীতিরটা দেখা না।

আমি একটু আহত হই মনে মনে। তারপর প্রীতির কথাবার্তা হাবভাব দেখাতে থাকি। তার 'বেচারা' বলার তিন রকম নিখুঁতভাবে অভিনয় করলাম। চিঠি ছিঁড়ে ফেলার ভঙ্গিটাও চমৎকার হল।

কিন্তু অত দেখল না সুবিনয়। বেরসিকের মতো অভিনয়ের মাঝখানে উঠে গিয়ে খোলা জানালার ধারে দাঁড়াল। স্যান্ডো গেঞ্জি আর মাত্র আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় খোলা জানালায় দাঁড়ানো কতটা বিপজ্জনক তা ভেবে দেখবার মতো স্থিরবুদ্ধি ওর এখন আর নেই। জানালা থেকেই মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত গমগমে বিকট গলায় আমাকে বলল, প্রীতি তোকে মিথ্যে কথা বলেছে, তা জানিস? ম্যাসাচুসেটসে ও আমাকে বারবার উত্ত্যক্ত করত, বিয়ে করার কথা বলত। ওর কয়েকটা চিঠিতেও ছিল সে সব কথা, দেশে ফিরে আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু চিঠিগুলো...

আমি প্রায় নিঃশব্দে বললাম, আমার কাছে আছে।

আছে?— সুবিনয় গর্জে ওঠে।

ভয় খেয়ে বলি, আছে বোধহয়।

তবে?

বলে বুনো মোষের মতো ঘরের মাঝখান অবধি তেড়ে এল সুবিনয়, সিলিং-ছোঁয়া বিকট দানবীয় চেহারাটা ধক ধক করছে রাগে। আবার বলল, তবে?

আমি খুব সংযত গলায় বললাম, সুবিনয়, ছেড়ে দে না। তোর তো ক্ষণা আছেই। আবার কেন হাঙ্গামায় জড়াবি?

সুবিনয় হঠাৎ অট্টহাসি হাসল। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে কোনও জিনিয়াস কখনও একটামাত্র মেয়েমানুষ নিয়ে থাকতে পারে না। দে নিড গার্লস। এ লট অব গার্লস। বুঝলি? এক সময়ে গ্রিক ফিলজফাররা রক্ষিতাদের বাড়িতে বা বেশ্যাপাড়ায় বসে শাস্ত্রের আলোচনা করত।

মিনমিন করে বললাম, প্রীতি যখন চাইছে না তখন ছেড়ে দে।

ডোন্ট টক লাইক এ ফুল।

ভয় পাই, তবু বলি, ক্ষণাকে কেন ডিভোর্স করবি? ও তো কোনও অন্যায় করেনি!

সুবিনয় গর্জে ওঠে ফের, অন্যায় করেনি তো কী? ওকে নিয়েই আমাকে থাকতে হবে এমন কোনও কথা আছে? যা তো, দুনিয়ার সব বিবাহিত পুরুষমানুষকে জিজ্ঞেস করে আয়, তাদের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট তাদের একজিস্টিং ওয়াইফকে ছেড়ে নতুন কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায় কি না। যদি না চায় তো আমি কান কেটে কুত্তার গলায় ঝোলাব।

মরিয়া হয়ে বললাম, প্রীতির একজন আছে, বললাম তো। সেও বাগড়া দেবে।

সুবিনয় সোজা এসে আমার কলারটা চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বাগড়া দেবে! বাগড়া দেবে! উইল হি লিভ আপ টু দেন?

সামান্যই ঝাঁকুনি, কিন্তু সুবিনয়ের আসুরিক শক্তির দুটো নাড়া খেয়েই আমার দম বেরিয়ে গেল। একটা মানুষের শারীরিক শক্তি যে কী প্রবল হতে পারে তা সেই ঝাঁকুনিতে টের পেলাম। যদি প্রীতির সেই ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে সুবিনয়ের বাস্তবিকই কোনও শো-ডাউন হয় তো আমি নির্দ্বিধায় সুবিনয়ের দিকেই বাজি ধরব।

সুবিনয় আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফের সোফায় চিতপাত হয়ে বসল। সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, উপল, আই ওয়ান্ট দ্যাট চ্যাপ ফেস টু ফেস।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, ছেলেটার দোষ কী? ও কি তোর সঙ্গে প্রীতির অ্যাফেয়ার জানে?

তা হলেও, আমি ওকে একবার হাতে পেতে চাই। প্রীতির চোখের সামনে আমি ওকে গুঁড়ো করে ফেলব।

সকালবেলায় পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা যে অন্যমনস্ক লম্বা, ভদ্র বৈজ্ঞানিককে রাস্তার লোকেরা হেঁটে যেতে দেখেছে সে আর এই সুবিনয় এক নয়। আন্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি পরা এ এক অতি বিপজ্জনক প্রেমিক।

পৃথিবীর ওপরকার জামা তুলে তার শরীরের লুকোনো দাদ চুলকুনি আমি দেখতে চাই না। তবু আমার জীবন আমাকে তা দেখাবেই।

আমি বললাম, তুই কী চাস?

সুবিনয় একটা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, এ শো-ডাউন। ভেরি প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ শো-ডাউন।

তুই মারধর করবি?

মারধরের চেয়ে দুনিয়াতে আর কোনও কুইক এফেকটিভ জিনিস নেই!

সুবিনয়!

কী?

ভেবে দ্যাখ।

দুর্বলরা ভাবে, শক্তিমানরা কাজে নামে। টেকনিকাল কাজের বাইরে আমি খুব একটা ভাবনা-চিন্তা করার লোক নই। প্রীতিকে আমার চাই, অ্যাট এনি কস্ট।

সেই ছেলেটাকে যদি মারিস তা হলে পুলিশ কেসে পড়ে যেতে হবে, মামলা মোকদ্দমায় গড়াবে। কে জানে, ছেলেটার হয়তো ভাল কানেকশনসও আছে, যদি থাকে তো তোর ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুবিনয় মাথা তুলে তাকাল। মুখের এক পাশে হলুদ আলো পড়েছে, অন্য পাশটা অন্ধকার। মেদহীন মুখের খানাখন্দে আলো-আঁধারের ধারালো রেখা। চোখ স্থির। যে-কেউ দেখলে ভয়ে হিম হয়ে যাবে।

সুবিনয় বলল, ডু আই কেয়ার?

সুবিনয় উঠে জামা-প্যান্ট পরতে লাগল। আপনমনে কেবল বলল, আমি সহজ সরল সম্পর্ক বিশ্বাস করি। জটিলতা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

আশ্চর্য এই যে, আমি নিজেও জটিলতা পছন্দ করি না। পৃথিবীটা আমার কাছে খুবই সাদামাটা। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, মানুষ বিষয়কর্মে যায়, ছানাপোনা নিয়ে ঘর করে, শীতের পর আজও বসন্ত আসে, ঘড়ির কাঁটা ধরে আমার খিদে পায়। আমার সমস্যা একটাই, বড় খিদে পায়। কখনও নিশ্চিতভাবে খিদে মেটে না। মিটলেও, আবার খিদে পাবে বলে একটা দুশ্চিন্তা থাকে। এ ছাড়া

আমার জীবন সহজ সরল। প্রীতি নেই, ক্ষণা নেই, প্রীতির প্রেমিক নেই। কেবল খিদে আছে, খিদের দুশ্চিন্তা আছে।

দিন দুই পর কালো চশমা আর নকল দাড়ি-গোঁফওলা একটা লোককে খুবই অসহায়ভাবে গোলপার্কের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। সকাল কি সন্ধেবেলা লোকটা রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে, দাঁড়ায়, উর্ধ্বপানে তাকিয়ে কী যেন দেখে, বাতাস শোঁকে। এতই পলকা তার ছদ্মবেশ যে এক নজরেই ছদ্মবেশ বলে চেনা যায়। তার হাবভাবে এত বেশি আত্মবিশ্বাসের অভাব যে, যে-কোনও সময়ে সে রাস্তার লোকের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, লোকটা প্রীতিদের ফ্ল্যাটবাড়ির নীচের তলার সদর দরজার কাছে নিচু হয়ে কী খোঁজে, কিংবা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আকাশের চিল দেখে, কিংবা উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খায়। আমি ঠিক জানি, সেই সময়ে লোকটাকে কেউ নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলে লোকটা অবশ্যই বোকার মতো একটা ভোঁ-দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, কিংবা হয়তো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত ভয়ে। রুমা মজুমদার একদিন বিকেলে বাসায় ফেরার সময়ে লোকটাকে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে রুমাল দিয়ে নিজের জুতো মুছতে দেখে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিল। লোকটা অতি কষ্টে একটা করোনারি অ্যাটাক থেকে বেঁচে যায় সে বার। তিন-চার দিন লোকটা ওইভাবে ঘোরাঘুরি করল এলাকাটায়। নজর রাখল। নকল দাড়ির নীচে বড্ড চুলকুনি হয়, নকল গোঁফের ক্লিপ বড্ড জোরে এঁটে বসে নাকের লতিতে। কালো চশমার অনভ্যাসে চোখ ভেপে ওঠে। এইসব অস্বস্তি নিয়েও লোকটা লেগে রইল একটানা। প্রীতিকে সে রোজই দেখতে পেল, কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে। প্রীতির প্রেমিকও রোজ সকালে একবার আসে, বিকেলে আর একবার। বিকেলে প্রেমিকটি নিজের একটি জেফির গাড়ি নিয়ে আসে, প্রীতিকে নিয়ে বেড়াতে যায় কোথায় কে জানে! রাত আটটা নাগাদ ওই একই গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সকালের দিকে আসে একটা লাল রঙা স্পোর্টস-কারে। কখনও-সখনও সেই গাড়িতেই প্রীতি কলেজে যায়, যেদিন ক্লাস থাকে আগেভাগে। নইলে খালি গাড়ি নিয়ে প্রেমিকটি ফিরে যায়। লোকটা আরও খবর নিল, রুমা যদিও এখন আর ভলিবল খেলে না, তবু রোজ সন্ধের দিকে খানিকক্ষণ লেকে সাঁতরায়। কিংবা ওয়াই এম সি এ-তে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলে। সন্ধের দিকে রুমা কখনওই বাসায় থাকে না। লোকটা আরও ধৈর্য ধরে দেখে দেখে জানল যে, প্রীতিদের বাসার নীচের তলায় দুটো ফ্ল্যাটের একটায় কয়েকজন মাদ্রাজি ছেলে মেস করে থাকে, তারা খুব নিরীহ। অন্য ফ্ল্যাটটায় এক স্বামী-স্ত্রী থাকে মাত্র। ওই স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়া হয় রোজ, আবার সিনেমায় যাওয়ারও বাতিক আছে। মাদ্রাজি ছেলেরা প্রায় রাতেই বাইরে থেকে খেয়ে ফেরে বলে সন্ধেবেলা তাদের ফ্ল্যাটটাও খালি থাকে। ওপরতলায় অন্য ফ্ল্যাটটা সদ্য খালি হয়েছে, সামনের মাসে হয়তো ভাড়াটে আসবে। লোকটি যখন এইসব খবর নিচ্ছিল তখন তার ছেলেমানুষি ছদ্মবেশ এবং আত্ম-অবিশ্বাসী হাবভাব সত্ত্বেও সে ধরা পড়েনি। তবে এক দিন একটা মফস্‌সলের লোক আচমকা তাকে 'গড়িয়াহাটা কোন দিকে' জিজ্ঞেস করায় সে আঁতকে উঠে জবাব না-দিয়ে হুড়মুড় করে হাঁটতে শুরু করেছিল। আর একদিন দুটো ফচকে ছোকরার একজন তাকে দেখিয়ে অন্যজনকে বলেছিল, দ্যাখ ঠিক হাবুলের বাবার মতো দেখতে! তাইতে লোকটা আত্মরক্ষার জন্য কিছুক্ষণ পাগলের অভিনয় করেছিল! নিজের স্বভাববশত লোকটা এ ক'দিন অবসর সময়ে রাস্তায়-ঘাটে পয়সা খুঁজে বেড়াত। কত লোকের পয়সা পড়ে যায় রাস্তায়। সর্ব মোট পঁচাত্তর-পয়সা, একটা দিশি কলম, একটা আস্ত বেগুন, দুটো সিগারেট সুদ্ধু একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা স্টিলের চামচ, একটা মেয়েলি রুমাল আর একটা প্লাস্টিকের পুতুল কুড়িয়ে পেয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটা তার কাজে লেগেছিল আর কয়েকটা পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে সে জমিয়ে রেখেছিল।

এই নকল লোকটা আমিই। রোজ রাতে সুবিনয় তার সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করত,

আমি গিয়ে তাকে সারা দিনের রিপোর্ট দিতাম। গম্ভীর হয়ে সুবিনয় শুনত, আর একটা কাগজে কখন কে বেরোয়, আর কে ঢোকে তার একটা টাইম চার্ট তৈরি করত। গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার পরা তার সুবিশাল চেহারাটা খুনির মতো দেখায় রোজ।

একদিন অনেক হিসেবের শেষে সে বলল, উপল, রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা হচ্ছে সবথেকে সেফ সময়। রুমা রোজই সাড়ে আটটায় ফেরে। প্রীতি আর তার লাভার ফেরে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাদ্রাজি ছেলেরা ন'টার আগে কমই ফেরে, দু'-একজন আগে ফিরলেও ক্ষতি নেই।

আমি আঁতকে উঠে বলি, ক্ষতি নেই কীরে? ওরা থাকলে—

সুবিনয় গম্ভীর হয়ে বলে, চার-পাঁচজনকে আমি একাই নিতে পারব। খুব বেকায়দা দেখলে তুই হেল্প করবি।

তার দরকার কী?

দরকার কে বলেছে! যদি বাই চান্স ফেরে তবেই দরকারের কথা ওঠে। বাকি থাকছে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী। এদের আচরণ আনসার্টেন। ওরা বিশেষ কোনও দিন সিনেমায় যায় না?

না। দু'দিন যায় না, তারপর যায়, আবার হয়তো তিন দিন যায় না, এইরকম আর কী!

আনওয়াইজ অফ দেম। যাকগে, অত ভাবলে চলে না।

না ভাবলেও চলবে না।

সুবিনয় আমার মুখের দিকে স্থির চেয়ে বলল, প্রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে আমেরিকায় আমি একটা ছোকরাকে ঠেঙিয়েছিলাম খোলা রাস্তার ওপর। তাতে কিছু হয়নি। অত ভাবলে চলে না।

আমি অসহায়ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

পরদিনই সুবিনয় প্রীতির ফ্ল্যাটবাড়িতে হানা দিল।

কপালটা ভালই সুবিনয়ের। সেদিন মাদ্রাজি ছেলেরা কেউ ছিল না। স্বামী-স্ত্রীও সেদিন সিনেমায় গেছে। রুমাও যথারীতি বাইরে। এবং প্রীতি আর তার প্রেমিকও সেদিন দুর্ভাগ্যবশত সাড়ে সাতটায় ফিরে এল।

সুবিনয় সিঁড়ির নীচের অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল, আমি উলটো দিকের ফুটপাথে। প্রীতি তার প্রেমিককে নিয়ে দোতলায় উঠল দেখলাম। ঠিক তার কয়েক সেকেন্ড পর সুবিনয়ের বিশাল চেহারাটা বেড়ালের মতো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে আমি।

ভেজানো দরজা ঠেলে সুবিনয় ঘরে ঢুকল। প্ল্যান মাফিক আমিও ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি আটকে পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কী ঘটছে তা দেখার সাহস আমার ছিল না। দরজার পাল্লায় পিঠ দিয়েই আমি চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। টের পাই সামনে শি-ক শি-ক, চপ, মাগো, গড, ধুপ গোছের কয়েকটা আওয়াজ হল। তারপর সব চুপচাপ।

চোখের পাতা জোর করে বন্ধ করায় ব্যথা হচ্ছিল, কানে-দেওয়া আঙুল টনটন করছে, কানের মধ্যে দপ দপ আওয়াজ হচ্ছে। বেশিক্ষণ এভাবে থাকা যায় না।

তাই অবশেষে চোখ-কান খোলা রাখতে হল।

তেমন কিছু হয়নি। ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়নি, লণ্ডভণ্ডও হয়নি। প্রীতি তার ঘোরানো চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার পায়ের কাছেই পড়ে আছে প্রেমিক। প্রেমিকের চশমা একটু দূরে কার্পেটের ওপর ডানাভাঙা পাখির মতো অসহায়। সুবিনয় প্রীতির সামনে কোমরে হাত দিয়ে ওয়েস্টার্নের নায়কের মতো দাঁড়িয়ে।

পুরো একখানা বিদেশি স্টিল ছবি।

সুবিনয় ডাকল, প্রীতি, হানি, ডার্লিং!

উঁ!— স্বপ্নের ভিতর থেকে প্রীতি জবাব দিল।

তুমি কি আমাকে ভালবাসো না?

স্বপ্নের দূর গলায় প্রীতি বলল, বাসতাম। আমেরিকায়।

সুবিনয় গর্জে উঠল, আমেরিকায়? তা হলে আমরা আবার আমেরিকায় চলে যাই চলো। সেখানে তুমি আবার আমাকে ভালবাসবে।

অনেকক্ষণ ভেবে প্রীতি ওপর-নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, তাই যেতে হবে। এ দেশে থাকলে তোমাকে ভালবাসা অসম্ভব। নানা সংস্কার বাধা দেয়।

প্রীতির পড়ে-থাকা প্রেমিকের একখানা হাত সুবিনয় জুতোর ডগা দিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, এ ছেলেটা কে প্রীতি? কেমন ছেলে?

প্রীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ও একটা কাওয়ার্ড, একটা উইকলিং। এক ঘণ্টা আগেও ওকে আমি ভালবাসতাম।

এখন?— সুবিনয় গর্জন করে ওঠে।

এখন বাসি না।— প্রীতি মৃদুস্বরে বলল।

সুবিনয় কোমরে হাত রেখে টারজানের মতো হাসল। বন্য এবং সরল হাসি।

প্রীতি হাসল না। মাথা নিচু করে স্থির বসে রইল। চুলের ঘেরাটোপে মুখখানা ঢাকা।

দৃশ্যটা আমার কেন যেন বড্ড বিদেশি বলে মনে হচ্ছিল। যেন কলকাতায় নয়, নিউ ইয়র্ক বা টেক্সাসে ঘটনাটা ঘটছে। বিদেশি কোনও ছবিতে বা বইতে দৃশ্যটা কি দেখেছি বা পড়েছি? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার পেটের মধ্যে সেই স্থায়ী খিদের ভাবটা মৃদু মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল।

বাস্তবিক, এইসব হৃদয়ঘটিত কোনও সমস্যাই আমার নেই। আমার একটাই সমস্যা, বড় খিদে পায়। অনেকক্ষণ ধরে নানা সুস্বাদু খাবার খেয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সুবিনয় মার্কিন প্রেমিকের মতো লম্বা এক পদক্ষেপে প্রীতির কাছটিতে পৌঁছতেই আমি চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিই। তারপর অন্ধের মতো ঘুরে হেঁটে গিয়ে, হাতড়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি নীচে।

ঠিক সদরের দরজায় রুমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তার কাঁধে একটা ব্যাগ, মুখ গম্ভীর।

বলল, কী খবর?

আমি ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে জানাই, কোনও খবর নেই।

ও আবার বলে, প্রীতি কি আপনাকে রিফিউজ করেছে!

একটু ভেবে নিয়ে আমি ওপরে-নীচে মাথা নাড়ি, করেছে।

ভেবেছিলাম, খুশি হবে। হল না। মুখখানা গোমড়া করে বলল, প্রীতি বড্ড বোকা। একজনের পর একজনের সঙ্গে ইনভলভ্‌ড হয়ে যাচ্ছে। আজ ওকে একটু বকব।

আমি বললাম, প্লিজ, বকবেন না। ওর মন খুব খারাপ।

কেন?

ওর এ প্রেমটাও কেঁচে গেছে।

রুমা কিছু বলার আগেই সিঁড়িতে প্রচণ্ড ভারী পায়ের শব্দ তুলে সুবিনয় নেমে আসছিল। তার বাঁ কাঁধে একটা পাট করা চাদরের মতো প্রীতির প্রেমিক ভাঁজ হয়ে ঝুলে আছে।

রুমাকে দেখে সুবিনয় খুব স্মার্ট হেসে বলল, লোকটা নেশা করে হল্লা করছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

দৃশ্যটা দেখে অসম সাহসী রুমাও শিউরে উঠে কাছে সরে এসে আমার একটা হাত জোরে চেপে ধরে বলল, উঃ মা গো! এ লোকটা কে?

আমি সান্ত্বনার ছলে রুমার ভেজা এলোচুলে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু ভয়ের নেই। আপনি ভয় পাবেন না। আমি তো আছি।

রুমা আমার বুকের সঙ্গে প্রায় লেগে দাঁড়িয়েছিল, এ কথা শুনে হঠাৎ ছিটকে সরে গিয়ে বলল, স্কাউন্ড্রেল।

আমি তবু রাগ করি না। মলিন একটু হাসি। সুবিনয় গিয়ে প্রীতির প্রেমিকের জেফির গাড়ির দরজা খুলে পিছনের সিটে প্রেমিককে শুইয়ে দিয়ে নিজে হুইলে বসল। তারপর ডাকল, উপল, চলে আয়।

রুমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে হঠাৎ বলল, আপনি নিশ্চয়ই গুন্ডা লাগিয়েছিলেন, না? আপনি... আপনি...

বলতে বলতে রাগে হঠাৎ রুমার ভিতরে সেই ডালমিয়া পার্কের ভলিবল খেলোয়াড়টা জেগে উঠল। তেমনি চিতাবাঘের মতো চকিত ভঙ্গি, তেমনি নিশ্চল নিবদ্ধ চোখে বলের বদলে আমার মুখের দিকে চেয়ে। তারপর হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ লঘু পায়ে ছুটে এসে তার প্রচণ্ড স্ম্যাশিং-এর ডান হাতখানা তুলল।

আমারও অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আগের বারের মতো বোকা দর্শক আমি আর নেই এখন। মাথাটা সরিয়ে নিলাম পিছনে। রুমার আঙুলের ধারালো ডগা কেবল থুতনি ছুঁয়ে গেল।

এক লাফে বাইরে এসে দৌড়ে ফুটপাথ পার হচ্ছি, রুমাও ছুটে এল, পিছন থেকে জামা টেনে ধরার চেষ্টা করল। গাড়ির দরজা খুলতে সুবিনয়ের যেটুকু সময় লেগেছিল সেটুকুর মধ্যে সে আমার গালে নখের আঁচড় বসিয়ে দিল। হাত টেনে ধরার চেষ্টা করল। চেঁচিয়ে লোকজনকে জানান দিতে লাগল, চোর! খুনে! গুন্ডা! পাকড়ো—

সুবিনয় গাড়ি ছেড়ে দিল। লেকের একটা নির্জন ধারে এক জায়গায় গাড়িটা প্রীতির প্রেমিক সমেত রেখে দিয়ে সুবিনয় আমাকে নিয়ে ফিরতে লাগল।

৮

মঞ্চসজ্জা একই। সুবিনয়ের সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটের বাইরের ঘর। তেমনি আন্ডারওয়্যার আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সুবিনয় সোফায় চিতপাত হয়ে বসে আছে। সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে একটানা। ফ্ল্যাটে ফিরে এসেই সে প্রীতির কাছ থেকে টুকে-আনা তার প্রেমিকের বাড়ির ফোন নম্বরে ডায়াল করে জানিয়ে দিয়েছে, ঠিক কোথায় এলে তারা লোকটার অচৈতন্য দেহটি খুঁজে পাবে। এখন সে খুবই শান্ত মেজাজে বসে আছে।

আমার গাল থেকে ডেটলের গন্ধ নাকে আসছে। শরীর কিছু দুর্বল লাগছিল। বুকে একটা ভয়।

সুবিনয় তেমনি মুখের এক পাশে আলো আর অন্য পাশে অন্ধকার নিয়ে হঠাৎ মাথাতোলা দিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি স্পষ্ট দেখলাম. ও আর বাঙালি সুবিনয় নেই। ওর মুখে, চোখে চেহারায় বিদেশি ছাপ পড়ে গেছে। কখন যে পড়ল কে জানে!

ও হুবহু মার্কিন উচ্চারণে বলল, ইউ নো! সামথিং বাডি?

আমি সভয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও আপন মনে একটু হেসে বলল, উই আঃ গোয়িন টু সেট্‌ল ইন দ্য স্টেটস। হেল্লুভা গুড কান্ট্রি।

আমি মাথা নাড়লাম। ডেটলের গন্ধটা উবে যাচ্ছে ক্রমে। গালটা জ্বালা করছে অল্প অল্প।

সুবিনয় উঠল। দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা হুইস্কির বোতল বার করে ঢক ঢক করে খেয়ে নিল খানিকটা। হাতের পিঠে মুখটা মুছে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে ফিরে বলল, উই ওয়্যার লাভারস ইন আমেরিকা, উই শ্যাল বি লাভারস ইন আমেরিকা। ইউ নো বাডি?

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝেছি।

সুবিনয় আরও খানিকটা নিট হুইস্কি খেয়ে এসে আবার চিতপাত হয়ে সোফায় বসে বলল, আই'ল হ্যাভ প্রীতি, প্রসপেক্ট অ্যান্ড এভরিথিং ইন দ্য স্টেটস। দ্যাটস দ্য কান্ট্রি ফর আস। গিম্‌মি আমেরিকা বাড়ি, গিম্‌মি আমেরিকা।

বলে একটু হাসে সুবিনয়। তারপর গম্ভীর হয়ে হঠাৎ উঠে সোজা হয়ে বসে বাংলায় বলে, কিন্তু যাওয়ার আগে দুটো খুব জরুরি কাজ আছে।

আমার খিদেটা ক্রমে পেটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। জাগছে। খোঁচা দিচ্ছে আমাকে। আমি একটু কোলকুঁজো হয়ে বসে সুবিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

সুবিনয় বলে, প্রথম কাজ, ক্ষণাকে ডিভোর্স করা। দ্বিতীয় কাজ, টু ইনভেন্ট এ প্যালেটেবল পয়জন ফর দ্য মাইস অফ ইন্ডিয়া। ভারতবর্ষের ইঁদুরদের জন্য একটি সুস্বাদু বিষ।

উঠে পায়চারি করতে করতে সে বলল, দ্বিতীয় কাজটা অনেকখানি এগিয়েছে। ইট উইল বি এ রিভলিউশনারি ইনভেনশন। কী রকম জানিস?

কী রকম?

অনেকটা যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে সুবিনয় বলল, অসম্ভব টেস্টফুল বিষ। যেখানেই রাখবি গন্ধে গন্ধে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ইঁদুর ছুটে আসবে আনাচ-কানাচ থেকে। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে, আসবে আলমারির তলা থেকে, বইয়ের র‍্যাক থেকে, ভাঁড়ার ঘর থেকে। অসম্ভব তৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে খাবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে চিরদিনের মতো। হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা যেমন টেনে নিয়ে গিয়েছিল ইঁদুরদের, অনেকটা তেমনি। সারা দেশে ইঁদুরদের সমস্ত নড়াচড়ার শব্দ থেমে যাবে। শুধু জমে থাকবে এখানে-সেখানে ইঁদুরের স্তূপ।

আমি সুবিনয়ের দিকে চেয়ে আছি গাড়লের মতো। আমার পেটের ভিতর অন্ধকারে একটা ইঁদুর আমার নাড়ি কাটছে, ছ্যাঁদা করছে পাকস্থলী, নিপুণ দাঁতে করাতের মতো চিরে দু' ভাগ করছে অন্ত্র।

আর-এক ঢোঁক হুইস্কি খেয়ে সুবিনয় উদ্‌গার তুলে বলল, দ্যাট উইল বি হেল্লুভা গুড ইনভেনশন। বিষটা বের করতে পারলে ওরা আমাকে নোবেল প্রাইজ দেবে। আই শ্যাল বি দ্য থার্ড ইন্ডিয়ান নোবেল লরিয়েট। অ্যান্ড দেন আমেরিকা। গট দ্য আইডিয়া চাম?

আমি মাথা নাড়ালাম।

সুবিনয় আমার কাছে এসে আঁচড়ানো গালটায় এক বার খুব আস্তে হাত রাখল। তাইতে আমার গাল জ্বালা করে উঠে। সুবিনয় একটা দুঃখের 'চুক চুক' শব্দ করে বলল, খুব জোর আঁচড়ে দিয়েছে তোকে। হাঃ হাঃ।

টারজানের মতো আবার খানিক হেসে সুবিনয় ফের গম্ভীর হয়ে বলল, আমি কি তোকে বিশ্বাস করতে পারি উপল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি নিজেই নিজেকে করি না সুবিনয়। আমাকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে না।

খুব করুণ মুখ করে সুবিনয় বলল, কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই যাকে খুব বিশ্বাসের সঙ্গে একটা জরুরি কাজের ভার দেওয়া যায়।

আমি গালে আঙুল ঘষে ডেটলের গন্ধ আঙুলের ডগায় তুলে এনে শুঁকতে শুঁকতে বলি, কী কাজ?

সুবিনয় তার সোফায় চিতপাত হয়ে বসে মুখটা আড়াল করল। তারপর বলল, পরশুদিন আমি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি।

কী ব্যাপারে?

ডিভোর্স।

ও।

সুবিনয় সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিন্তু কাজটা সহজ নয়। আমার একটা ক্লিন ডিভোর্স চাই।

আমি হেলাভরে বললাম, মামলা কর।

সুবিনয় একটুও না-নড়ে বলল, পয়েন্ট কী? এ দেশে ডিভোর্স করা কি সোজা! হাজার রকম ঝামেলা। তা ছাড়া ক্ষণা কিছুতেই ডিভোর্স দেবে না। আমি ওকে চিনি।

তা হলে?

ডিভোর্স আমার চাই-ই। উকিল বলছিল, আমি যদি অ্যাডালট্রিতে ইনভলভ্‌ড হতে পারি তবে আমার বউ সহজেই এভিডেন্স দেখিয়ে ডিভোর্স পেয়ে যাবে। শুনে আমি হেসেছি। আমি কয়েক শ' অ্যাডালট্রি করলেও ক্ষণা আমার এগেনস্টে মামলা করতে যাবে না, ডিভোর্সও চাইবে না। এ দেশের মেয়েরা যেমন হয় আর কী, ভয়েড অফ অল সেলফ রেসপেকটস।

তা হলে?

একটা উপায় আছে। ক্ষণাকেই যদি অ্যাডালট্রিতে ইনভলভ্‌ড করা যায় তবে আমি এভিডেন্স দেখিয়ে মামলা করতে পারি।

আমি স্থির চোখে চেয়ে থাকি।

বুঝলি?— সুবিনয় বলে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, বুঝেছি। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে?

অ্যাডালট্রি।

কার সঙ্গে?

তেমনি চিতপাত শুয়ে থাকা, মুখ আড়াল করা সুবিনয় একটুও না-নড়ে বলল, ক্ষণা।

বলিস কী?— আমি আঁতকে উঠে বলি।

সুবিনয় আস্তে করে উঠে বসে। মুখের এক ধারে আলো পড়ে, অন্য ধারে অন্ধকার। গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি মুখ। আমার দিকে চেয়ে থেকে বলে, দেয়ার উইল বি মানি ফর ইট। এনাফ মানি।

আমি মাথা নেড়ে বলি, পাগল!

সুবিনয় স্থির চোখে আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় বলে, তুই কি মরালিস্ট উপল?

দ্বিধাভরে বলি, নন্‌নাঃ!

কোথা থেকে হঠাৎ একটা টাকার তোড়া আমার দিকে ছুড়ে দেয় সুবিনয়। আমার হাঁটুতে লেগে সেটা মেঝেতে পড়ে। তুলে নিয়ে দেখি, একশো টাকার দশখানা নোট, টাটকা তাজা নোট, সদ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আনা। এখনও স্টেপলারের পিনে আটকে আছে।

সুবিনয় বলল, স্টার্ট উইথ এ থাউজ্যান্ড। দেয়ার উইল বি মোর থাউজ্যান্ডস।

আমি মাথা নেড়ে বলি, এ হয় না সুবিনয়।

কিন্তু আমার গলাটা কেঁপে যায়।

সুবিনয় অতি করুণ স্বরে বলে, অবলাইজ এ ফ্রেন্ড বাডি। গিভ পিস টু এ সাফারিং সোল।

আমি কী করব তা বুঝতে পারি না। টাকার জন্য আমি চুরি-ডাকাতি করতে গেছি, আমি অনায়াসে নিয়েছি মানিক সাহার চার নম্বর বউ ঝুমুরকে। আমার গোটা জীবনে কোনও নৈতিকতা নেই। উপরন্তু আমার আছে কালব্যাধির মতো একটা খিদে। যখন খিদে মিটে যায় তখনও আবার খিদের চিন্তা থাকে, ভয় থাকে। ক্যানসারের মতো, কুষ্ঠের মতো সেই খিদে কখনও সরে না।

সারাটা জীবন আমার বাবার মতোই আমি কেবল নিষ্ফল পয়সা খুঁজেছি। পাইনি যে তা নয়। কিন্তু গুপ্তধনের মতো, জলপ্রপাতের মতো, বিস্ফোরণের মতো পয়সা কখনও আমরা খুঁজে পাইনি। আগে ছিল, মফস্‌সলে শহরের সিনেমার নতুন ছবি এলে ড্রাম বাজিয়ে রিকশায় বিজ্ঞাপন বেরোত, একটা লোক রিকশা থেকে অবিরল বিলি করত হ্যান্ডবিল। বাচ্চারা প্রাণপণ ছুটত সেই রিকশার

সঙ্গে, মুঠো মুঠো হ্যান্ডবিল কেড়ে আনত। একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম, ঠিক ওইরকম একটা ছ্যাকড়া রিকশা থেকে হুবহু ওইরকম একটা লোক হ্যান্ডবিলের বদলে টাকা বিলি করতে করতে যাচ্ছে। আমি বরাবর ওইরকম অনায়াসে হ্যান্ডবিলের মতো টাকা চেয়েছি। চেষ্টাহীন টাকা, বিনা কষ্টের টাকা।

হাতের আঁজলায় হাজার টাকার দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। একটু কি কাঁদলামও? বললাম, তুমি এলে?

ক্ষণার কথা মনেও রইল না, সুবিনয়ের কথাও না, প্রীতি বা আর কারও কথাও নয়, ডেটলের গন্ধ নাকে আসছিল না আর, গালের জ্বলুনি টেরও পাচ্ছি না। শুধু অনেক টাকার দিকে চেয়ে আছি। ভাবছি, তুমি এলে? কী সুন্দর তুমি?

করবি তো উপল?— সুবিনয় জিজ্ঞেস করল, তারপর বলল, দেয়ার উইল বি মোর থাউজ্যান্ডস।

কী করার কথা বলছে সুবিনয় তা আর আমার মনে পড়ল না। প্রাণভরে টাকার সৌন্দর্য দেখে আমি দুই মুগ্ধ, জলভরা চোখ তুলে তাকাই। ঝাপসা ঘর। ঝাপসা এক অস্পষ্ট মানুষ। ঝপসা আলো-আঁধারি।

বললাম, করব।

৯

প্যাকিং বাক্সের ওপর কষ্টকর বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না রাতে। গ্রিলের চৌখুপি দিয়ে নীলাভ আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্নার অনেক টুকরো এসে পড়েছে আমার গায়ে, বিছানায়। উঠে বসে আমি দু'হাতের শূন্য আঁজলা পাতলাম। হাত ভরে গেল জ্যোৎস্নায়। কী অনায়াস, অযাচিত জ্যোৎস্না। ঠিক এইরকমভাবে আমি বরাবর পয়সা চেয়েছি। ঠিক এইরকমভাবে আঁজলা পেতে। অনায়াসে।

ঠিক এই সময়ে আমার বিছানার পায়ের দিকটায় আমার বিবেককে বসে থাকতে দেখলাম। হুবহু যাত্রাদলের বিবেকের মতো কালো আলখাল্লা পরা, গালে দাড়ি, মাথায় টুপি, হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র। সে গান গাইছিল না, কিন্তু কাশছিল। কাশতে কাশতেই একটু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কাজটা কি ঠিক হবে উপলচন্দ্র?

একটু রেগে গিয়ে বলি, কেন, ঠিক হবে না কেন? আমি কাজটা করি বা না-করি, সুবিনয় ডিভোর্স করবেই। ডিভোর্স না পেলে হয়তো খুনই করবে ক্ষণাকে। ভেবে দেখো বিবেকবাবা, খুন হওয়ার চেয়ে ডিভোর্সই ভাল হবে কি না ক্ষণার পক্ষে।

উপলচন্দ্র, বড্ড বেশি অমঙ্গলের সঙ্গে জড়াচ্ছ নিজেকে। খারাপ হয়ে যাচ্ছ। ওই হাজার টাকা হাতে না-পেলে তুমি ঠিকই বুঝতে পারতে যে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

আমি আমার বিবেকের কাছ ঘেঁষে বসে বললাম, শোনো বিবেকবাবা, তোমাকে বৈকুণ্ঠ ফোটোগ্রাফারের গল্পটা বলি। তেঠেঙে একটা পুরনো ক্যামেরা নিয়ে ফোটো তুলে বেড়াত সে। ছেলেবেলায় সে অনেক বার আমাদের গ্রুপ ফোটো তুলেছে। ক্যামেরার পিছনে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে তাক করত। এত সময় নিত যে আমাদের ধৈর্য থাকত না। বৈকুণ্ঠ তার খদ্দেরদের ধৈর্য নিয়ে মাথা ঘামাত না, সে চাইত একেবারে নিখুঁত ফোটোগ্রাফ তুলতে। শতবার সে এসে একে বাঁ দিকে সরাত, ওকে ডান দিকে হেলাত, কারও ঘাড় বেঁকিয়ে দিত, কারও হাত সোজা করত, কাউকে বলত মুখটা ওপরে তুলুন, 'আঃ হাঃ আপনাকে নয়, আপনি মাথাটা একটু নামান।'

এইভাবে ছবি তোলার আগে বিস্তর রিহার্সাল দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন সে ক্যামেরায় ফিল্মের প্লেট ভরে লেন্সের ঠুলি খুলবার জন্য হাত বাড়াত তখন খুব আশা নিয়ে দম বন্ধ করে বসে আছি, এইবার ছবি উঠবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ হঠাৎ বলে উঠত, উঁহুঃ! ঠুলি থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে আবার এসে হয়তো কোনও বাচ্চার বুকের বোতাম এঁটে দিয়ে যেত। আবার সব ঠিকঠাক, আবার ঠুলিতে হাত, ফোটো উঠবে, আমার শরীর নিশপিশ করছে উত্তেজনায়। উঠবে উঠল বলে। কিন্তু ঠিক শেষ সময়ে বৈকুণ্ঠ আবার অমোঘভাবে বলে উঠত, উঁহুঃ! হতাশায় ভরে যেত ভিতরটা। বৈকুণ্ঠ এসে কাউকে হয়তো একটু পিছনে সরে যেতে বলল। আবার সব রেডি। ঠুলিতে হাত। ছবি উঠল বলে! কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে আবার সেই—উঁহুঃ! শোনো বিবেকবাবা, আমার ভাগ্যটা হচ্ছে ঠিক ওই বৈকুণ্ঠ ফোটোওয়ালার মতো। যখনই কোনও একটা দাঁও জোটে, যখনই কোনও পয়সাকড়ির সন্ধান পাই, যখন সব অভাব ঘুচে একটু আশার আলো দেখতে পাই, ঠিক তখনই বেশ আড়াল থেকে কে বলে ওঠে, উঁহুঃ!

আমার বিবেক ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল।

আমি বললাম, নইলে বলো, কন্ডাক্টারি করতে গিয়ে কেন নির্দোষ মানুষ সেই হাটুরে মারটা খেলাম? গোবিন্দর বাড়িতে না হোক চোর-তাড়া করে খেদালে। ডাকাতি করতে গিয়ে প্রথম চোটেই কেন কাজ ঢিলা হয়ে গেল! কোথাও কিছু না, মানিক সাহার ঘাড়ে যখন নিশ্চিন্তে চেপে বসেছি তখনই হঠাৎ তাকেই বা ভাবের ভূতে পেল কেন? সারাদিন আমার পেটে এক নাছোড় খিদের বাস। মাথায় চৌপর দিন খিদের চিন্তা। বিবেকবাবা, একটু ভেবে দেখো, এই প্রথম আমি এক থোকে এত টাকা হাতে পেলাম। বোমা ফাটবার মতো টাকা, জলপ্রপাতের মতো টাকা। এ কাজটা আমাকে করতে দাও। বাগড়া দিয়ো না বিবেকবাবা, পায়ে পড়ি।

আমার বিবেক একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, উপলচন্দ্র, টাকাটা তোমাকে বড় কাহিল করে ফেলেছে হে। শোনো বলি, টাকা থাকলেই যে মানুষ গরিব হয় না তা কিন্তু নয়। দুনিয়ায় দেখবে, যার যত টাকা সে তত গরিব।

আমি আমার বিবেককে হাত ধরে তুলে বললাম, শোনো বিবেকবাবা, এই যে প্যাকিং বাক্স সব দেখছ, এতে করে নানা দেশ থেকে হাজার রকমের কেমিকাল আসে। তার সবটুকু তো আর কোম্পানিতে যায় না। বেশির ভাগই চড়া দামে চোরাবাজারে বিক্রি হয়ে যায়। সুবিনয়ের পয়সার ঢলাঢলি। সেই পয়সার কিছু যদি আমার ভোগে লাগে তো লাগতে দাও। তাতে ওর পুণ্য হবে। দোহাই বিবেকবাবা, আজ তুমি যাও। আজ যাও বিবেকবাবা। আমি একটু নিজের মতো থাকি।

বিবেক গ্রিলের বন্ধ দরজা ভেদ করে চলে গেল। জ্যোৎস্নায় আর তার চিহ্নও দেখা গেল না।

আর রবিবার। ডি-ডে।

আজ ক্ষণাকে নিয়ে সুবিনয়ের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্ল্যান মাফিক আজ সকালেই সুবিনয়ের জরুরি কাজ পড়ে গেল। আমাকে ডেকে বলল, উপল, তুই ক্ষণাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তো! আমার একটা মিটিং পড়ে গেল আজ। স্টেটস থেকে একটা ডেলিগেশন এসেছে।

ক্ষণা বলল, থাক গে, আমারও তা হলে যাওয়ার দরকার নেই। পরের রবিবার গেলেও হবে।

সুবিনয় আঁতকে উঠে বলল, না না, তুমি যাও। পুজো দেবে মনে করেছ যাবে না কেন? উপল, তুই বরং দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে রেডি হয়ে নে।

ক্ষণা খুব বেজার মুখ করে বলল, কাজের লোকদের যে কেন বিয়ে করা। সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিন তাও তোমার ফি রবিবার মিটিং।

সুবিনয়ের দামি রেজারে যখন দাড়ি কামাচ্ছিলাম তখন নার্ভাসনেসের দরুন দু' জায়গায় গাল কেটে গেল।

শুনলাম ঘরে ক্ষণা সুবিনয়কে বলছে, তোমার সেফটি রেজার উপলবাবুকে ইউজ করতে দিলে কেন?

তাতে কী?— খুব উদার স্বরে সুবিনয় বলল, উপলের কোনও ডিজিজ নেই। তা ছাড়া ও আমার ভীষণ রেভিয়ারড ফ্রেন্ড। জানো না তো স্কুল-কলেজে ও কী সাংঘাতিক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। এ জিনিয়াস ইন ডিসগাইজ।

ক্ষণা বিরক্ত হয়ে বলল, কে কী ছিল তা জেনে কী হবে। এখন কে কীরকম সেইটেই বিচার করা উচিত। আর কখনও তোমার সেফটি রেজার ওকে দিয়ো না।

সুবিনয় খুব ব্যগ্র গলায় বলে, এ রকম বলতে নেই ক্ষণা। উপল একটু চেষ্টা করলেই মস্ত আর্টিস্ট হতে পারত, কিংবা খুব বড় গায়ক কিংবা শিশির ভাদুড়ির মতো অভিনেতা। ও যে সিনেমায় নেমেছিল তা জানো? তারপর ফিল্ম লাইনে ওকে নিয়ে টানাটানি। কিন্তু চিরকালের বোহেমিয়ান বলে ও বাঁধা জীবনে থাকতে রাজি হল না। এখনও ইচ্ছে করলে ও কত কী করতে পারে।

দাড়ি কামানোর পর আমি জীবনে এই প্রথম সুবিনয়ের দামি আফটারশেভ লোশন গালে লাগানোর সুযোগ পেলাম। গন্ধে প্রাণ আনচান করে ওঠে। এ রকম একটা আফটারশেভ লোশন কিনতে হবে। আরও কত কী কেনার কথা মনে পড়ছে সারা দিন! অবশ্যই একটা সেফটি রেজার। কিছু খুব নতুন ডিজাইনের জামা-কাপড়, একটা ঘড়ি, একটা রেডিয়ো...

ক্ষণা স্নান করতে গেল। সেই ফাঁকে যথাসাধ্য সাজপোশাক পরে নিয়েছি। সুবিনয় আমাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, নট ব্যাড। কিন্তু, তুই একটু রোগা। ইউ নিড মাচ প্রোটিন অ্যান্ড এনাফ কারবোহাইড্রেট। কাল সকালেই ডাক্তার দত্তকে দিয়ে একটা থরো চেক আপ করিয়ে নিবি। গুড ফুড অ্যান্ড গুড মেডিসিন উইল মেক ইউ এ হ্যান্ডসাম ম্যান। মনে রাখবি ফিজিকাল অ্যাট্রাকশনে আমাকে বিট করা চাই।

আমি একটু ম্লান হেসে বললাম, টারজান, তোমার হাইট আর বিশাল স্বাস্থ্য কিছুতেই আমার হওয়ার নয়।

সুবিনয় ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, দেন ট্রাই টু ইমপ্রেস হার বাই আর্ট অর লিটারেচার অর বাই এনি ড্যাম থিং। আই ডোন্ট কেয়ার। আই ওয়ান্ট কুইক অ্যাকশন।

মাথা নাড়লাম।

সুবিনয় একটা সেলফ-টাইমারওলা ক্যামেরা আর একটা সুপারসেনসিটিভ খুদে টেপ-রেকর্ডার এয়ার ব্যাগে ভরে দিয়েছিল। সেইটে কাঁধে ঝুলিয়ে ক্ষণাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। বাচ্চারা ঠাকুমার কাছে রয়ে গেল। সুবিনয়ের সাত বছরের মেয়ে দোলনা তেমন ঝামেলা করেনি, কিন্তু পাঁচ বছরের ছেলে ঘুপটু সঙ্গে যাওয়ার জন্য ভীষণ বায়না ধরছিল। ক্ষণার খুব ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নেয়, কিন্তু সুবিনয় দেয়নি।

ট্যাক্সি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষণা আর আমি একা। আমাব বুকেব মধ্যে ঢিবঢিব ভয়ের শব্দ। গলা শুকনো। শরীর কাঠের মতো পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিন্তু ক্ষণার কোনও ভয়ডর নেই, স্নায়ুর চাপ নেই। সে আমাকে বাড়ির ফাইফরমাশ করার লোক ভিন্ন অন্যকিছু মনে করে না।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে আসা বাতাসে ক্ষণার আঁচল উড়ে এসে একবার আমার কাঁধে পড়ল। ক্ষণা আঁচল টেনে নিয়ে বলল, আপনার পোশাক-আশাকে কিছু বাসি নেই তো। পুজো দেব ছোঁয়া-টোঁয়া লাগলে বিশ্রী।

এই ক্ষণার সঙ্গে প্রেম! ভারী হতাশ লাগল। বললাম, না, কিছু বাসি নয়।

নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষণা তার হাতের সন্দেশের বাক্স আর শালপাতায় মোড়া ফুল আর ভ্যানিটি ব্যাগ দু'জনের মাঝখানে সিটের ফাঁকা জায়গায় রাখল।

ধাঁ ধাঁ করে ট্যাক্সি এগিয়ে যাচ্ছে। পথ তো অফুরান নয়। এখন আমার কিছুটা সহজ হওয়া

দরকার। দুটো-চারটে করে কথা এক্ষুনি বলতে শুরু না-করলে সময়ের টানাটানিতে পড়ে যাব।

একবার সন্তর্পণে ক্ষণার দিকে তাকালাম। না-সুন্দর, না-কুৎসিত ক্ষণা পিছনে হেলে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনছে না। আমি তার চলনদার মাত্র, তার বেশি কিছু নই। কিন্তু এ ভাবটা ভেঙে দেওয়া দরকার।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ ক্ষণা আমার দিকে চেয়ে বলল, ও এল না কেন বলুন তো!

আচমকা ক্ষণার কণ্ঠস্বরে একটু চমকে গিয়েছিলাম। এমনিতে চমকানোর কথা নয়, প্রতি দিনই ক্ষণার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়। কিন্তু এখন আমার মনটা এত বেশি ক্ষণা-কনশাস হয়ে আছে যে, ও নড়লেও আমার হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগছে।

বললাম, মিটিং-এর কথা বলছিল।

নিজের গলাটা কেমন মিয়োনো শোনাল।

ক্ষণা এক-দুই পলক আমার দিকে চেয়ে বলল, রোজই যে কেন মিটিং থাকে বুঝি না। লোকেরা এত মিটিং করে কেন?

বুঝতে পারলাম ক্ষণা একটা ক্যাচ তুলেছে। লুফতে পারলে আউট।

ব্যাগে হাত ভরে টেপ-রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে বললাম, এই একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার ভীষণ মিল। আমিও মিটিং পছন্দ করি না।

ক্ষণা মিলটা পছন্দ করল কি না জানি না, বলল, অবশ্য ইম্পর্ট্যান্ট লোকদের প্রায় সময়েই মিটিং করতে হয়। ইম্পর্ট্যান্ট হওয়ার অনেক ঝামেলা।

দক্ষিণ কলকাতা পার হয়ে গাড়ি চৌরঙ্গি অঞ্চলে পড়ল। টেপ-রেকর্ডার চলছে।

আমি বললাম, আপনি গান ভালবাসেন?

গান কে না ভালবাসে! কেন বলুন তো?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, আমি একসময় গাইতাম।

হ্যাঁ শুনেছি, আপনি নাকি ভালই গাইতেন!

ছবি আঁকতাম।

ক্ষণা ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ সব তো আমি জানি। আপনি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার কিছু হয়নি।

দুঃসাহস ভরে বললাম, আমার বুকের মধ্যে অনেক কথা জমা আছে বুঝলেন! তেমন মানুষ পাই না যাকে শোনাব।

তেমন মানুষ ক্ষণাও নয়। সে শুনতে চাইল না। শুধু বলল, শুনিয়ে কী হবে? সকলের বুকেই কিছু না কিছু কথা জমা থাকে। আমারও কি নেই?

আশান্বিত হয়ে বলি, আছে?

থাকতেই পারে।

বলবেন আমাকে?

ক্ষণা একটু অবাক হয়ে বলল, আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো!

রাস্তার একটা বিধবা বুড়িকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাক্সিটা জোর একটা টাল খেল। আমার মাথাটা বেটাল হয়ে দরজায় ঠুকে গেল একটু। যত না লেগেছে তার চেয়ে কিছু বেশি মাত্রা যোগ করে বললাম, উঃ!

ব্যথা পেলেন?

ভীষণ।

দেখি!— বলে ক্ষণা একটু ব্যগ্র হয়ে মুখ এগিয়ে আনে।

আমি মাথাটা এগিয়ে আঙুলে ব্যথার জায়গাটা দেখিয়ে বলি, এইখানে।

ক্ষণার মনে কোনও দুর্বলতা নেই। সে দিব্যি ব্যথার জায়গাটা আঙুল বুলিয়ে পরীক্ষা করছিল। কিন্তু সেই স্পর্শে আমার ভিতরে বিদ্যুৎ খেলছে। সেটা প্রেমের অনুভূতি নয়। ভয়ের।

ক্ষণা নিজের জায়গায় সরে গিয়ে বলল, তেমন কিছু হয়নি। মন্দিরে গিয়ে একটু ঠান্ডা জল দেবেন ঠিক হয়ে যাবে।

এই ব্যথার প্রসঙ্গ থেকে অনায়াসেই আমি হৃদয়ের কথায় সরে গিয়ে বলতে পারতাম, ব্যথা কি শুধু ওইখানেই ক্ষণা? হৃদয়েও। কিন্তু প্রথমেই অতটা বাড়াবাড়ি কতে সাহস হল না।

দক্ষিণেশ্বরে ক্ষণা জুতো জমা রেখে পুজো দিতে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, পরস্ত্রী নিয়ে আমার এই কর্মতৎপরতা কবে নাগাদ শেষ হবে।

বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে পুজো দিল ক্ষণা। যখন বেরিয়ে এল তখন বেশ বেলা হয়েছে। বেরিয়ে এসেই বলল, উপলবাবু, ট্যাক্সি ডাকুন।

আমি উদাস স্বরে বললাম, গঙ্গার ধার ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন?

এখন গঙ্গা দেখবার সময় নেই। দোলন আর ঘুপটুর জন্য মন কেমন করছে। ওরাও মা ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

অন্তত পঞ্চবটীটা ঘুরে যান। হনুমানকে খাওয়াবেন না?

নিতান্ত অনিচ্ছায় ক্ষণা রাজি হল। রবিবারের ভিড়ে পঞ্চবটী এলাকা থিকথিক করছে। হাজারটা বাচ্চার চেঁচানি, লোকজনের চিৎকার। এর মধ্যে কোনও সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা বৃথা। তবু সহজ হওয়ার জন্য আমি ক্ষণার পাশাপাশি হেঁটে ঘুরতে লাগলাম। কী বলি? কী বললে ক্ষণার হৃদয়-কম্পাসের কাঁটা কেঁপে উঠবে তা আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারছিলাম না।

হঠাৎ বললাম, একটা জিনিস দেখবেন?

কী?

আমি অবিকল হনুমানের নকল করতে পারি।

যাঃ!

সত্যি।

বলে আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। ক্ষণার হাতখানা হঠাৎ ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলাম গঙ্গার আঘাটায় একটু ফাঁকা মতো জায়গায়। আমার আচরণে ক্ষণা অবাক হয়েছে ভীষণ।

একটু হেসে বললাম, আমার সব আচরণকে মানুষের যুক্তি দিয়ে বিচার করবেন না। আমার মধ্যে হনুমানের ইনস্টিংক্ট আছে।

ক্ষণা হাসল না। তবে রাগও করল না। কেবল বড় করে একটা শ্বাস ছাড়ল।

আমি ওর পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে প্রথমে চমৎকার 'কুক কুক' ধ্বনি দিয়ে হনুমানের ডাক নকল করে শোনালাম। তারপর দেখাতে লাগলাম হনুমানের পেট চুলকোনো, চোখের পিটির পিটির, উকুন বাছা, বানর নাচ, মুখ ভ্যাঙানো।

দু'-চারজন করে আমার চারধারে লোক জমে যেতে লাগল। বাচ্চারা হাতে তালি বাজাচ্ছে, লোকজন চেঁচিয়ে বলছে, ঘুরে-ফিরে দাদা। একদম ন্যাচারাল হচ্ছে।

অনেক দিন বাদে পাবলিকের সিমপ্যাথি পেয়ে আমার বেশ ভাল লাগছিল। শেষে গাছ থেকে হনুমানগুলো পর্যন্ত 'হুপ হুপ' করে সাবাস জানাতে থাকে। একটা ছোকরা বলল, দাদা, ওরা আপনার আসল চেহারা চিনতে পেরে গেছে। ডাকছে।

ঘেমে-নেয়ে যখন খেলা শেষ করেছি তখন ভিড়ের মধ্যে ক্ষণা নেই। ভিড় ঠেলে চার দিকে খুঁজতে লাগলাম ওকে। নেই। মাথাটা কেমন ঘোলাটে লাগছিল। খুব কি বোকামি হয়ে গেল? কিন্তু একটা কিছু বাঁধভাঙা কাজ তো আমাকে করতেই হবে। নইলে ও আমাকে আলাদা করে লক্ষ করবে কেন?

হতাশ এবং শ্লথ পায়ে নতমুখে আমি বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। মনের মধ্যে নানা রকম টানা-পোড়েন।

বাসরাস্তার দিকে আনমনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, একটা থেমে থাকা ট্যাক্সির দরজা একটু খুলে ডাকল, উপলবাবু।

কেঁপে উঠি। কোনও কথা বলতে পারি না। তাকাতেও পারি না ক্ষণার দিকে। শুধু, বাধ্য চাকরের মতো সিটে ওর পাশে উঠে বসি।

কথাহীন নৈঃশব্দ্যে গাড়ির ভিতরটা ভারাক্রান্ত। শুধু মোটরের একটানা আওয়াজ।

শ্যামবাজার পার হয়ে গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়ল। ক্ষণা বাইরের দিকে ফেরানো মুখখানা ধীরে আমার দিকে ঘুরিয়ে এনে বলল, আপনার অডিয়েন্স খুশি হল?

আমি লজ্জায় মরে গিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, আমার অডিয়েন্স কেউ তো ছিল না।

ওমা! সে কী! অনেক লোককে তো জুটিয়ে ফেললেন দেখলাম!

ম্লান হেসে বললাম, আমার একজন মাত্র অডিয়েন্স ছিল। সে তো দেখল না!

সে কে?

আপনি।— বলে আমি চতুর হাতে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিই।

আমি! আমি কেন আপনার অডিয়েন্স হতে যাব? ও রকম ভাঁড়ামো করছিলেন কেন বলুন তো? ভারী বিশ্রী।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি সেই বাজিকরের গল্পটা কি জানেন! যে কেবল নানা রকম খেলা দেখিয়ে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়! তার আর-কিছু জানা ছিল না। সে একদিন মাতা মেরির মন্দিরে গিয়ে দেবীকে ভক্তিভরে তার সেই বাজির খেলা নিবেদন করেছিল। দেবী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমিও ওই বাজিকরের মতো আমার যা আছে তাই দিয়ে আপনাকে খুশি করতে চেয়েছিলাম।

আমাকে খুশি করতে এত চেষ্টা কেন?

উদাস স্বরে বললাম, কী জানি!

ক্ষণা একটু হাসল, হঠাৎ বলল, আর কখনও ও রকম করবেন না। ঠিক তো?

আচ্ছা।

১০

আজও সুবিনয় আন্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি পরা চেহারা নিয়ে তার ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরের সোফায় চিতপাত হয়ে পড়ে ছিল। সামনে সেন্টার টেবিলে টেপ-রেকর্ডার চলছে।

রেকর্ড শেষ হলে সুবিনয় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, নট ব্যাড। তবে আর-একটু ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ না করলে ম্যাচিওর করতে দেরি হবে।

সুবিনয় খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাতে নিট হুইস্কির গেলাস। টপ করে তলানিটুকু গিলে ফেলে আমার দিকে ফিরে বলল, শোন উপল, প্রেমের ভান করলে হবে না। ইউ হ্যাভ টু ফল ইন লাভ উইথ হার। সিরিয়াসলি।

শ্বাস ফেলে বললাম, চেষ্টা করব।

পরশুর অ্যাসাইনমেন্টটা মনে আছে তো? মেট্রোতে।

আমি মাথা নাড়লাম। মনে আছে।

মেট্রোতে সোয়া ছ'টার শোতে পাশের সিটে সুবিনয়ের বদলে আমাকে দেখে ক্ষণা অবাক। বলল, ও কোথায়?

আমি কৃচ্ছ্রসাধনের মতো করে হেসে বললাম, মিটিং।

আবার মিটিং। কিন্তু তা বলে ওর বদলে আপনাকে কেন পাঠাল বলুন তো!

নইলে একটা টিকিট নষ্ট হত।

না হয় বেচে দিত।

বাড়ি ফেরার জন্য আপনার একজন এসকর্টও তো দরকার। যখন শো ভাঙবে তখন হয়তো ভিড়ে আপনি বাসে-ট্রামে উঠতেই পারবেন না। তার ওপর আপনি আবার একা ট্যাক্সিতে উঠতে ভয় পান।

ক্ষণার মুখখানা রাগে ক্ষোভে অভিমানে ফেটে পড়ছিল। খানিক চুপ করে থেকে আস্তে করে বলল, ওর সময় কম জানি। কিন্তু এত কম জানতাম না।

এ সময়টায় কথা বলা বা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা বোকামি। আমি ক্ষণাকে সুবিনয় সম্বন্ধে ভাবতে দিলাম। আজও আমার কাঁধে ঝোলানো একটা শান্তিনিকেতনি চামড়ার ব্যাগ। তাতে টেপ-রেকর্ডার। ব্যাগে হাত ভরে সুইচে সতর্ক আঙুল ছুঁইয়ে রেখেছি।

অনেকক্ষণ বাদে বললাম, পান খাবেন?

ও মাথা নাড়ল। খাবে না।

আরও খানিক সময় ছাড় দিয়ে বললাম, খিদে পেয়েছে, দাঁড়ান কাজুবাদাম কিনে আনি। শো শুরু হতে আরও পাঁচ মিনিট বাকি।

বলে উঠে আসছি, ক্ষণাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাইরে কোথাও চা পাওয়া যাবে?

গলার স্বরে বুঝলাম, একটু সময়ের মধ্যেই কখন যেন ও একটু কেঁদে নিয়েছে। গলাটা সর্দি লাগার মতো ভার।

যাবেন? চলুন।

বাইরের একটা রেস্টুরেন্টে ক্ষণাকে বসিয়ে বললাম, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, সময় বেশি নেই।

ও মাথা নেড়ে বলে, আমি ছবি দেখব না। ভাল লাগছে না।

তা হলে?

আপনি দেখুন। আমি চা খেয়ে বাড়ি চলে যাব।

আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। জীবনে কোনও কাজই আমি শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। এটাও কি পারব না?

একটু ভেবে বলি, এ সময়টায় ট্রামে-বাসে উঠতে পারবেন না। বরং একটু বসে বা বেড়িয়ে সময়টা কাটিয়ে যাওয়া ভাল।

বেয়ারা আসতেই ক্ষণাকে জিজ্ঞেস করলাম, চায়ের সঙ্গে কী খাবেন? আজ আমি খাওয়াব।

ক্ষণা অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি খাওয়াবেন? কেন, চাকরি পেয়েছেন না কি?

পেয়েছি।— মৃদু হেসে বললাম।

কবে পেলেন? কই, চাকরিতে যেতেও তো দেখি না আপনাকে!

একটা শ্বাস ফেলে বললাম, সব চাকরিতে কি আর দূরে যেতে হয়। এই ধরুন না, আপনার সঙ্গে বসে থাকাটাও তো একটা চাকরি হতে পারে।

ক্ষণা কথাটার একটু অন্য রকম মানে করে বলল, আমার সঙ্গে বসে থাকাটা যদি চাকরি বলেই মনে হয় তবে বসে থাকবার দরকার কী?

কথাটা দারুণ রোমান্টিক। টেপ-রেকর্ডারটা চালু আছে ঠিকই, তবু ভয় হচ্ছিল কথাটা ঠিকমতো উঠবে তো! ব্যাটারি কিছুটা ডাউন আছে। সুবিনয় নতুন ব্যাটারি কিনে লাগিয়ে নিতে বলেছিল। আমি ব্যাটারির টাকাটা কিছু বেশি সময় সঙ্গে রাখবার জন্য কিনিনি। যতক্ষণ টাকার সঙ্গ করা যায়। এই সুদিন তো চিরস্থায়ী নয়।

আমি আনন্দে প্রায় স্খলিত গলায় বললাম, চাকরি কী বলছেন? আপনার সঙ্গে এ রকম বসে থাকার চাকরি হয় তো আমি রিটায়ারমেন্ট চাই না।

ক্ষণা রাগ করল না। একটু হেসে বলল, আপনার আজকাল খুব কথা ফুটেছে।

হৃদয় ফুটে উঠলেই মুখে কথা আসে।

এটা পেনাল্টি শট। গোল হবে তো!

ক্ষণা মাথাটা উঁচু রেখেই বলল, হৃদয় ফোটাল কে?

বোঝেন না?

না তো!

তা হলে থাক।

গোল হল কি না তা বুঝবার জন্য আমি উগ্র আগ্রহে ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম।

আমাদের কথাবার্তা বলতে দেখে বেয়ারা চলে গিয়েছিল। আবার এল। বিরক্ত হয়ে বললাম, দুটো মাটন রোল, আর চা।

বেয়ারা চলে গেল। তখন হঠাৎ লক্ষ করি, ক্ষণার মুখখানা নত হয়েছে টেবিলের দিকে। নিজের কোলে জড়ো করা দু'খানা হাতের দিকে চোখ নেমে গেল।

গোল! গোল! গোল!

আনন্দে বুক ভেসে যাচ্ছিল আমার। দুইদিনে অগ্রগতির পরিমাণ সাংঘাতিক। আমার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি সুবিনয়ের ফ্ল্যাটে ছুটে গিয়ে ওকে বিবরণটা শোনাই।

কিন্তু তা তো হয় না। তাই বসে বসে মাটন রোল খেতে হল। ক্ষণা মৃদু আপত্তি করে অবশেষে খেল আধখানা। বাকি আধখানা প্লেটে পড়ে ছিল, আমি তুলে নিলাম। দামি জিনিস কেন নষ্ট হয়?

ক্ষণা বলল, এ মা, পাতেরটা খায় নাকি?

সকলের পাতেরটা খাব আমি তেমন কাঙাল নই। তবে কারও পাতের জিনিস আমার খুব প্রিয় হতে পারে।

যাঃ।— ক্ষণা বলল, আপনি একটা কীরকম যেন। আগে কখনও এত মজার কথা বলতেন না তো।

আপনাকে ভয় পেতাম।

কেন, ভয়ের কী?

সুন্দরী মেয়েদের আমি বরাবর ভয় করি।

যাঃ! আমি নাকি সুন্দরী!

প্রতিবাদ করলেও কথাটা ওর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, টের পাই।

ট্যাক্সিতে ফেরার সময়ে আমি বিস্তর মজার কথা বললাম। সুবিনয় মেট্রোয় আসেনি বলে যে দুঃখ ছিল ক্ষণার তা ভুলে গিয়ে ও খুব হাসতে লাগল।

বলল, বাবা গো, হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গেল।

ক্ষণাকে পৌঁছে দিয়ে সুবিনয়ের ফ্ল্যাটে এসে দেখি সুবিনয় বেশ খানিকটা মাতাল হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে বলল, সামথিং নিউ বাডি?

আমি অনেকটা মার্কিন অনুনাসিক স্বরে বললাম, ইঁয়াপ।

সুবিনয় টেপ-রেকর্ডারের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, হেল অফ এ গুড।

টেপ শোনা হয়ে গেলে সুবিনয় মাথা নেড়ে বলল, কাল থেকে ওকে তুমি তুমি করে বলবি। আর-একটু ইন্টিম্যাসি দরকার। ইঁদুরের বিষটা আমি প্রায় তৈরি করে ফেলেছি। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি শিগগির। স্টেটসের চারটে বিগ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়ে আছে। মেক ইট হেসটি চাম। কাল কোথায় যেন?

চিড়িয়াখানা। সেখানে প্রথম ফোটোগ্রাফ নেওয়ার চেষ্টা করব।

সুবিনয় চিন্তিত হয়ে বলে, বাট দ্য চিলড্রেন উইল বি দেয়ার। দোলন আর ঘুপটু।

তাতে কী! ওদেরও তুলব, আমাদেরও তুলব।

দ্যাটস এ গুড বয়।

পরদিন চিড়িয়াখানায়। আমি আর ক্ষণা পাশাপাশি হাঁটছি। দোলন আর ঘুপটু হাত ধরাধরি করে সামনে। ক্ষণা ঘড়ি দেখে বলল, এখনও দোলনের বাবা আসছে না কেন বলুন তো! বেলা দুটোর মধ্যে আসবে বলেছিল।

আসবে। আচ্ছা ক্ষণা, আপনার বয়স কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা না!- মৃদু হেসে ক্ষণা বলে।

আমি আগের থেকে অনেক সাহসী আর চতুর হয়েছি। ঠিক সময়ে ঠিক কথা মুখে এগিয়ে আসে।

সিরিয়াস মুখ করে বলি, আপনাকে এত বাচ্চা দেখায় যে, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায় না।

আপনি আজকাল খুব কমপ্লিমেন্ট দিতে শিখেছেন দেখছি!

ক্ষণা একটু বিরক্তির ভান করে বলল। ভান যে সেটা বুঝলাম ওর চোখের তারায় একটু চিকিমিকি দেখে।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট?— আমি উদ্‌বেগ চাপতে পারি না গলার স্বরে।

ক্ষণা হেসে বলে, মেয়েরা এ সব বললে খুশি হয় সবাই জানে। কিন্তু আমার বয়স বসে নেই উপলবাবু। পঁচিশ চলছে।

আমি একবার ক্ষণার দিকে পাশ চোখে তাকিয়ে দেখলাম। দুঃখের বিষয়, ক্ষণাকে পঁচিশের চেয়ে বেশিই দেখায়।

আমি খুব বাজে অভিনেতার মতো অবাক হওয়ার ভাব করে বললাম, বিশ্বাস করুন, অত মনেই হয় না। বাইশের বেশি একদম না। আমার কত জানেন?

সত্যিকারের বয়সের ওপর আরও চার বছর চাপিয়ে বললাম, চৌত্রিশ।

ক্ষণা অবাক হয়ে বলে, কী করে হয়? আপনার বন্ধুর বয়স তো মোটে ত্রিশ, আপনারা তো ক্লাসফ্রেন্ড? একবয়সিই হওয়া উচিত।

সে কথায় কান না দিয়ে বললাম, শোনো ক্ষণা, আমার চেয়ে তুমি বয়সে অনেক ছোট। তোমাকে আপনি করে বলার মানেই হয় না।

এটা গিলতে ক্ষণার একটু সময় লাগল। কিন্তু ভদ্রতাবশে সে না-ই বা করে কী করে! তাই হঠাৎ 'ঘুপটু, ঘুপটু' বলে ডেকে কয়েক কদম দ্রুত এগিয়ে গেল।

আমি ওকে সময় দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে আনমনে ঘাসের ওপর হাঁটি। ডাক্তার দত্ত আমার শরীরের সব চেক-আপ করেছেন। তাঁর মতে আমার অনেক রকম চিকিৎসা দরকার। পেট, বুক, চোখ কিছুই সাউন্ড নয়। দত্ত পেল্লায় ডাক্তার, বিলেতফেরত, আধহাত ডিগ্রি, পুরো সাহেবি মেজাজের লোক। আমাকে দেখেই প্রথম দিন বলে দিয়েছিলেন, ব্লাড, ইউরিন, স্টুল, স্পুটাম সব পরীক্ষা করিয়ে তবে আসবেন। সে এক বিস্তর ঝামেলার ব্যাপার। সব রিপোর্ট দেখে দেখে পরে একদিন বললেন, ম্যালনিউট্রিশনটাই মেইন। এই বলে অনেক ওষুধপত্র, টনিক লিখে দিলেন। এক কোর্স ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে। পেরিয়াকটিন ট্যাবলেট খেয়ে খিদে আরও বেড়েছে। ঘুমও।

অল্প একটু মোটা হয়েছি কি! আত্মবিশ্বাসও যেন আসছে!

পাখির ঘর দেখা হয়ে গেলে আমরা জলের ধারে এসে বসলাম। ক্ষণা আর বাচ্চাদের গুটি ছয়-সাত ছবি তোলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও ভাইটাল ছবিটা বাকি। ক্ষণার আর আমার একটা যুগল ছবি। এভিডেন্স।

দোলন আর ঘুপটু টিফিন বাক্স খুলে ছানা আর বিস্কুট খাচ্ছে। রোদে ঘুরে ঘুরে ওদের মুখ-চোখ লাল, আনন্দে ঝিকিমিকি চোখ। ক্ষণা একটু দুশ্চিন্তার ভাব মুখে মেখে শ্রান্ত গা ছেড়ে দিয়ে বসে থেকে বলল, উপলবাবু, আজও ও এল না। আজকাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও রাখছে না। কেন বলুন তো?

কাজের মানুষ। বলতে বলতে আমি চার দিকে আলোর পরিমাপ দেখে ক্যামেরার অ্যাপারচার ঠিক করি, শাটারের স্পিড নির্ণয় করি। সবই আনাড়ির মতো। ঠিকঠাক করে ক্ষণাকে বললাম, তোমার এই দুঃখী চেহারাটা ছবিতে ধরে রাখি।

এই বলে টাইমার টেনে দিয়ে ক্যামেরাটা একটু দূরে ফ্লাস্কের ওপর সাবধানে উঁচুতে বসাই। শাটার টেপার পর মাত্র দশ সেকেন্ড সময়। তার মধ্যেই আমাকে দৌড়ে গিয়ে ক্ষণার পাশে বসতে হবে।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। আমি ওর পাশে বসব গিয়ে, সেটা কি ওকে আগে বলে নেব? না কি আচমকা ঘটাব কাণ্ডটা! ব্যাপারটা যদি ও পছন্দ না করে? যদি শেষ মুহূর্তে সরে যায়!

ক্ষণা হতাশ গলায় বলল, ছবি তুলে কী হবে? আমার অনেক ছবি আছে।

আমার নেই। আমি বললাম। কথাটা সত্যি। ছেলেবেলায় বৈকুণ্ঠ ফোটোওলা তুলেছিল, বড় হয়ে আর ছবি তোলা হয়নি।

ক্ষণা হাত বাড়িয়ে বলল, ক্যামেরাটা দিন, আমি আপনার ছবি তুলে দিচ্ছি।

আমি ভিউ ফাইন্ডারে ক্ষণাকে খুব যত্নে ফোকাস করছিলাম। ওর বাঁ দিকে একটু জায়গা ছেড়ে দিলাম যাতে আমার ছবি কাটা না পড়ে যায়। বেশ খানিকটা দূর থেকে তুলছি, কাটা পড়বে না। তবু ভয়।

ও ছেলেমানুষের মতো ক্যামেরার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। হাসি মুখে বলছে, আমি অবশ্য আনাড়ি। আপনি সব যন্ত্রপাতি ঠিক করে দিন, আমি শুধু শাটার টিপব।

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি চিড়িক দিয়ে উঠল। ক্যামেরায় যে সেলফ টাইমার আছে তা ক্ষণার জানার কথা নয়। পৃথিবীর খুব বেশি কিছু জানা নেই ক্ষণার। আমি শাটার টিপে উঠে গিয়ে ওর পাশে বসলে ও হয়তো টেরও পাবে না যে ছবি উঠল।

কিন্তু অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল শেষ মুহূর্তে। পারব তো! ক্ষণা কিছু সন্দেহ করবে না তো!

ভাবতে ভাবতেই শাটারটা টিপে দিলাম। চিড় চিড় করে টাইমার চলতে শুরু করে। আমি দ্রুত পায়ে জমিটা পার হয়ে ক্ষণার কাছে চলে আসি।

কিন্তু সময়টা ঠিকমতো হিসেব করা হয়নি। যে মুহূর্তে আমি ক্ষণার পাশে এসে হুমড়ি খেয়ে বসেছি ঠিক সেই সময়ে দোলন আধখানা কেক হাতে দৌড়ে এসে ক্ষণার ঘাড়ের ওপর উপুড় হয়ে কানে কানে বলল, মা। বাথরুমে যাব।

টাইমারের শেষ ক্লিক শব্দটা শুনতে পেলাম। হতাশা।

ক্ষণা উঠে গিয়ে দোলনকে বাথরুম করিয়ে আনল। ততক্ষণে আমি ক্যামেরাটা আবার তৈরি করে রেখেছি।

ক্ষণা এসে ঘাসের ওপর রাখা ব্যাগ, টিফিন বাক্সর পাশে তার আগের জায়গায় বসল। কিন্তু এবার তার কোলে এসে বসল ঘুপটু। অসম্ভব অধৈর্য বোধ করতে থাকি।

দোলন জলের ধারে গিয়ে হাঁস দেখে। ঘুপটু একটু বাদে তার দিদির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষণা

ব্যাগট্যাগ গোছাতে গোছাতে বলে, ওর আজও বোধহয় মিটিং। এল না। চলুন, আমরা চলে যাই।

আমি দাঁতে দাঁত টিপে রাখি। এবার আমাকে সত্যিই বেপরোয়া কিছু করতে হবে। সময় চলে যাচ্ছে।

হিংস্র আঙুলে শাটারটা টিপে টাইমার চালু করেই আমি দুই লাফে ক্ষণার পাশে এসে পড়ি। ক্ষণা অবাক হওয়ারও সুযোগ পায় না। আমি ক্ষণার গালে গাল ঠেকিয়ে বসেই ওর কাঁধে হাত রেখে বলি, ক্ষণা, দেখো!

ক্ষণা আমার দিকে অবাক মুখ ফিরিয়ে বলল, কী দেখব?

ওই যে, একটা অদ্ভুত পাখি উড়ে গেল।

ক্ষণা খুব বিস্মিত, বিরক্ত। আমি ক্ষণার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, বোধহয় চিড়িয়াখানার সেই ম্যাকাও পাখিটা পালিয়ে গেল।

ক্ষণা সরে বসে ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো? এমন সব কাণ্ড করছেন!

অনেকক্ষণ আগে সেলফ টাইমার শেষ হয়েছে। আমার সারা শরীরে ঘাম দিচ্ছে। হাত পা কাঁপছে উত্তেজনায়। অবসাদে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

পরদিন প্রিন্টটা দেখল সুবিনয়। ছবিটা ব্লো-আপ করা হয়েছে বিরাট করে।

নট ব্যাড চাম। ইউ হ্যাভ মেড প্রোগ্রেস। — বলে হাসল।

ছবিটা অসম্ভব ভাল হয়েছে। পিছনে মস্ত একটা খেজুর গাছের মতো ঝুপসি গাছ, সেই পটভূমিতে আমাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমার গালের সঙ্গে প্রায় ছুঁয়ে ক্ষণার গাল, ওর কাঁধে আমার হাত। দু'জনেই দু'জনের দিকে হেলে বসে আছি। কী সাংঘাতিক স্ক্যান্ডালাস ছবি! অথচ কত মিথ্যে!

সুবিনয় হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত পায়চারি করছিল। মুখে মৃদু একটু হাসি, আর অন্যমনস্কতা। এক সময়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, হ্যাভ ইউ ফলেন ইন লাভ উইথ হার বাডি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জানি না।

ইউ লুক ডিফারেন্ট।— কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুবিনয় বলে।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। হয়তো সত্যিই আমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। আমি কি একটু মোটা হয়েছি! আজকাল ঘুম হয়। খিদের চিন্তায় কষ্ট পাই না।

ঠিক আগের দিনের মতো সুবিনয় আজও একশো টাকার পাঁচখানা নোট ছুড়ে দিল আমার দিকে। বলল, এক্সপেন্সেস।

মাথা নাড়লাম। উত্তেজনায় শরীর গরম হয়ে ওঠে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে হাঃ করে সুবিনয় একটা শব্দ করল। তারপর বলল, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না উপল। আই বিলিভ নান, অ্যান্ড দ্যাট মেকস মি ভেরি লোনলি।

কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু চিন্তা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম। তারপর উঠে চলে এলাম এক সময়ে। সুবিনয় এখন অনেক রাত পর্যন্ত মদ খাবে।

দু' দিন পর সুবিনয় তার সুটকেস গুছিয়ে দিল্লি গেল। আসলে কোথাও গেল না। শুধু আমি জানলাম, সুবিনয় সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটে ক'দিন লুকিয়ে থাকবে। আমাকে গোপনে বলল, নাউ ইউ উইল বি ইন এ ফ্রি ওয়ার্ল্ড। বোথ অব ইউ।

দীর্ঘ খরার পর সেই রাতে অসম্ভব বৃষ্টি নামল। কী যে প্রবল বৃষ্টি! গ্রিলের ফাঁক দিয়ে অবিরল ছাঁট আসতে লাগল। ঘুমের চটকা ভেঙে উঠে বসলাম। গহিন মেঘ সিংহের মতো ডাকছে। জলপ্রপাতের মতো নেমে আসে জল।

বিছানা গুটিয়ে প্যাকিং বাক্সগুলো যত দূর সম্ভব দেওয়ালের দিকে সরিয়ে আনতে থাকি। একটু-আধটু শব্দ হয়। বিছানাটা পেতেও কিন্তু শোয়া হয় না, বৃষ্টির ছাঁট হু হু করে সমস্ত বারান্দাকে ছেয়ে ফেলছে।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে থাকি বাতি নিবিয়ে। কিছু করার নেই। ঝড় বৃষ্টি আমাকে অনেক বার সহ্য করতে হয়েছে। আজও বসে বসে গাড়লের মতো ভিজতে থাকি।

সুবিনয় আর ক্ষণার ঘরের দরজা খোলবার শব্দ হল। আমার পাঁজরার নীচে ভিতু খরগোশের মতো একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। কোনও কারণ নেই। তবু।

ঘরের আলোয় দরজার চৌখুপিতে ক্ষণা ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অন্ধকারে বারান্দাটা একটু দেখে নিয়ে সাবধানে ডাকল, উপলবাবু!

ক্ষীণ উত্তর দিলাম, উঁ!

আপনি কোথায়?

এই তো।

ক্ষণা বারান্দার আলো জ্বেলে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, এ কী! ছাঁট আসছে না কি!

মৃদু হেসে বললাম, ও কিছু নয়। বৃষ্টি থেমে যাবে।

ক্ষণা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বারান্দার বৃষ্টির ঝাপটা দেখল, আমার বিছানায় একবার হাত ছুঁইয়েই বলল, এ মা! বিছানাটা ভিজে গেছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, একটু।

একটু নয়, ভীষণ ভিজে গেছে। এ বিছানায় কেউ শুতে পারে না।

এ কথার উত্তর হয় না। চুপ করে থাকি।

ক্ষণা খুব সহজভাবে বলল, আপনার বন্ধুর বিছানা তো খালি পড়ে আছে, আপনি ঘরে এসে শোন। আমি আমার শাশুড়ির ঘরে যাচ্ছি।

কেঁপে উঠে বলি, কী দরকার!

আসুন না!

সন্তর্পণে উঠে আলো-জ্বলা ঘরের উষ্ণতায় চলে আসি। বগলে বিছানা। কাঁধের ব্যাগে গুপ্ত টেপ-রেকর্ডার। সুইচ টিপে রেকর্ডার চালু করি। ঠিক এ রকমটাই কি সুবিনয় চেয়েছিল? ওর ইচ্ছাপূরণ করতেই কি বৃষ্টিও নামল আজ!

ক্ষণা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ও এত বড় চাকরি করে, তবু এই বিচ্ছিরি বাসায় যে কেন থাকা আমাদের বুঝি না। একটা এক্সট্রা ঘর না থাকলে কি হয়! ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসছে যাচ্ছে। কেন এ বাসা ছাড়ে না বলুন তো?

ছাড়বে।— সংক্ষেপে বললাম।

ছাড়বে, আমি মরলে।

ক্ষণা সুবিনয়ের শূন্য বিছানার স্ট্যান্ডে দ্রুত হাতে মশারি টাঙিয়ে দিল। তারপর নিজের বিছানা থেকে বালিশ আর ঘুমন্ত ঘুপটুকে কোলে নিয়ে বলল, দোলন রইল।

থাক।

আসছি।— বলে ও ঘরে গেল ক্ষণা। আলো জ্বালাল। শাশুড়ির সঙ্গে কী একটু কথা বলল সংক্ষেপে। আবার এসে দোলনের পাশে বালিশ ঠেস দিয়ে বলল, বড্ড ছটফট করে মেয়েটা। পাশ ফিরতে গিয়ে পড়ে না যায়।

ক্ষণা?— আমি ডাকলাম।

বলুন।

এত কাণ্ড না করলেই চলত না? আমি তো বরাবর বারান্দায় শুই। শীতে, বর্ষায়।

ক্ষণা হঠাৎ সোজা হয়ে আমার দিকে তাকাল। মুখখানা লজ্জায় মাখানো। আস্তে করে বলল, দোষ কি শুধু আমার? আপনার বন্ধু কেন এইটুকু ছোট্ট বাসায় থাকে?

বাসাটা ছোট নয়। আমি জানি, ইচ্ছে করলে বাইরের ঘরের মেঝেতেও ওরা আমাকে শুতে বলতে পারত। বলেনি। আর আজ কত আদর করে বাড়ির কর্তার বিছানা ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আমি হেসে বললাম, তবে কি আমি থাকব বলেই তোমাদের একটা বড় বাসা দরকার ক্ষণা?

শুধু সেজন্যই নয়। কত জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি আমাদের ঘর দেখছেন না? বাচ্চাদের একটা পড়াশুনো করার ঘর নেই।

এগুলো কাজের কথা নয়। আমি বললাম, আমার তো এ বাড়িতে থাকবার কথা নয়। অনেক দিন হয়ে গেল। তুমি কষ্ট করছ দেখে মনে হচ্ছে, আর এখানে আমার থাকা ঠিক হচ্ছে না।

ক্ষণা মৃদু হেসে বলল, থাক, এত রাতে আর কাব্য করতে হবে না। ঘুমোন।

ক্ষণা, আমার ধারণা ছিল তুমি আমাকে একদম দেখতে পারো না। তোমাকে ভীষণ অহংকারী বলে মনে হত।

ক্ষণা একটু ইতস্তত করে বলল, আপনাকেও আমার অন্য রকম মনে হত যে!

কীরকম?

মনে হত, আপনি ভীষণ কুঁড়ে।

এখন?

এখন অন্য রকম।

কীরকম ক্ষণা?

খুব মজার লোক।— বলে ক্ষণা হাসল। বেশ হাসিটি। চমৎকার দেখাল ওকে।

কবে থেকে?

যেদিন সেই হনুমানের নাচ দেখিয়েছিলেন। ও মা, আমি তো দেখে অবাক! ওইরকম একটা ভিতু গোছের লোক যে অমন কাণ্ড করতে পারে ধারণাই ছিল না।

আমি কি কেবলই মজার লোক?

ভীষণ মজার।

করুণ মুখ করে বলি, তার মানে কি আমার ব্যক্তিত্ব নেই?

ক্ষণা হাই তুলে বলল, পরে বলব।

চলে গেল।

১১

টাকার ব্যাপারে আমার কাউকে তেমন বিশ্বাস হয় না। না ব্যাঙ্ক, না পোস্ট অফিস। আমার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হল মাসি।

মধু গুপ্ত লেন-এর বাড়ির সামনে দুটো রকে আজ বড় তরফ বা ছোট তরফের কেউ ছিল না। কিন্তু ছোট তরফের রকে গুটি চারেক ছোকরা ছেলে বসে আছে।

বড় তরফের সদরে ঢুকবার মুখে ছেলেগুলোর একজন আমাকে ডাকল, এই যে মোসাই, সুনুন।

নানা চিন্তায় মাথাটা অন্য রকম। ডাকটাও কেমন যেন। শরীরটা কেঁপে গেল।

দু' পা এগিয়ে বললাম, কী?

যে ছেলেটা ডেকেছিল তার মুখখানার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, এ ছোকরা বিস্তর পাপ করেছে। মুখে কাটাকুটির অনেক দাগ, শক্ত ধরনের চেহারা, চোখ দুটোয় একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল

দৃষ্টি। তার বাঁ হাতটার বুড়ো আঙুল বাদে আর চারটে আঙুল নিশ্চিহ্ন। আঙুলহীন হাতের চেটোটা খুন্তির ডগার মতো দেখাচ্ছে। সেই আঙুলহারা হাতের চেটোয় খুব কর্তৃত্বের একটু হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।

কাছে যেতেই বলল, কোথায় যাচ্ছিলেন?

গিরিবাবুর বাড়িতে।

গিরিবাবু কে হয় আপনার?

আত্মীয়।

কীরকম আত্মীয়?

ভড়কে গিয়েছিলাম। আত্মীয়তাটা মনে করতে একটু সময় লাগল। তারপর বললাম, সম্পর্কে মামা।

অন্য একটা ছেলে ওপাশ থেকে বলল, ছেড়ে দে সমীর। আসে মাঝে মাঝে। রিলেটিভিটি আছে। যান দাদা, ঢুকে পড়ুন।

কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই হঠাৎ কপাটের আড়াল থেকে গামছা-পরা খালি গায়ে গিরিবাবু বেরিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে ভিতরবাগে টেনে নিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় বললেন, কী বলল ওরা বলো তো?

আমি কে জিজ্ঞেস করছিল।— অবাক হয়ে বলি, কী হয়েছে মামা?

আর বলো কেন উপল ভাগনে, আমাদের বড় বিপদ চলছে। বাড়ির বাইরে বেরোনোই এখন মুশকিল। কেউ এলে তারও বিপদ।

এই বলে গিরিবাবু আবার কলঘরে ঢুকে যান।

বাড়িটা থমথম করছে। বড়গিন্নি সিঁড়ির মাঝ বরাবর পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন, আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, কে? কে? ও উপল বুঝি?

দেখি, বড়গিন্নি বেশ রোগা হয়ে গেছেন। মুখ থমথমে। মাঝসিঁড়ি থেকেই আবার কী ভেবে উপরে উঠে গেলেন।

মাসি আমাকে দেখে একটা চোখে বড় করে চাইল। মুখখানায় নরম কয়েকটা ঢেউ খেলে গেল যেন।

আয়।

এমনভাবে বলল যেন এতক্ষণ আমার জন্যই বসে ছিল মাসি। যেন আমার জন্যই সব সময়ে বসে থাকে।

জলচৌকিতে বসে বললাম, কী ব্যাপার গো মাসি?

মাসি শ্বাস ছেড়ে বলল, মানুষ কি আর মানুষ আছে! সেই গুন্ডা ছেলেটা জ্বালিয়ে খাচ্ছে বাবা। ভাবগতিক যা দেখছি, শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচবার জন্য কর্তা-গিন্নি মিলে কেতকীকে না ওই গুন্ডাটার হাতেই তুলে দেয়। ওরা তো রকেই বসে থাকে, তোকে ধরেনি?

ধরেছিল।

সবাইকে ধরছে। পাছে মেয়ে পাচার করে দেওয়া হয় সেইজন্য পাহারা দিচ্ছে। ছোট তরফ ওদের পক্ষে। দুই তরফে দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে।

কেতকী কোথায়?

তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয় না। একদম ঘরবন্দি। দিনরাত কান্নাকাটি।— মাসি এই বলে একটু শ্বাস ছাড়ে। তারপর একটা চোখে আমার দিকে অভিমানের দৃষ্টি দিয়ে বলে, তুই যদি একটু মানুষের মতো হতিস।

হেসে বলি, দুনিয়ায় মানুষের অভাব কী! আমার জন্য তুমি আর অত ভেবো না মাসি।

তোর কথা ছাড়া আর যে কোনও ভাবনা আসে না মাথায়।— মাসি মুখ করুণ করে বলল, তোর কথা ভাবতে ভাবতেই সারা দুনিয়ার কথা ভাবি। মনে হয়, পৃথিবীটা যদি আর-একটু ভাল জায়গা হত, অভাব-টভাব যদি না থাকত, মানুষ যদি আর-একটু দয়ালু হত, তবে আমার উপলটার এত দুর্দশা হত না। তোর যে খিদে পায় সে যদি সবাই বুঝত!

অবাক হয়ে বলি, উরে বাবা, কত ভাবো তুমি!

কত ভাবি! এই যে কাক, কুকুর, বেড়ালদের ভূত-ভোজন করাই তাও তোর কথা ভেবে। ভাবি কী, ওরা যদি আশীর্বাদ করে তবে আমার উপলের একটা গতি হবে হয়তো।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকি।

মাসি বলে, বড় ভাল ছিল মেয়েটা। তোর সঙ্গে মানাতও খুব।

গুন্ডাটা কি ওকে বিয়ে করতে চায় মাসি?

তাই তো শুনি, আমার মনে হয়, ছোট তরফের টাকা খেয়ে এ সব করছে।

বাজে কথায় সময় নষ্ট। আমি টাকাটা বের করে হাতের চেটোর আড়ালে মাসির কোলে ফেলে দিয়ে বললাম, সাবধানে রেখো।

মাসির একটা চোখই পটাং করে এত বড় হয়ে গেল। বলল, ও মা! তোর কি তা হলে কিছু হল? ও উপল, কোথায় পেলি?

বিরক্ত হয়ে বলি, অত জেরা করো কেন বলো তো?

মাসি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, ভাল টাকা তো! চুরি ছ্যাঁচড়ামি করিসনি তো বাপঠাকুর!

এই কি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস?

মাসি আঁচলের আড়ালে টাকা লুকিয়ে নিয়ে রেখে এল। এসে ফিসফিস করে বলল, কেতকী তোকে ডাকছে।

কেন?

যা না। সিঁড়ির নীচেকার ঘরে আছে। একটু বসে যা, বড় কর্তা কলঘর থেকে বেরিয়ে কাপড় মেলছে, ও ওপরে যাক।

একটু বাদে সিঁড়িতে কম্প তুলে গিরিবাবু ওপরে উঠে গেলেন। মাসি ভাত বাড়তে বসল। আমি সুট করে বেরিয়ে সিঁড়ির আড়ালে সরে যাই।

এ ঘরটায় মাসি থাকে। পরদা সরাতেই কেতকীকে দেখলাম। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শোওয়া, চুলগুলি ঝেঁপে আছে ওর মুখ আর মাথা। ডাকতে হল না, কী করে যেন টের পেয়ে ও উঠে বসল। তখন দেখি, ওর চেহারাটা খুব ভীষণ রকমের খারাপ হয়ে গেছে। মোটা গরাদ দেওয়া ছোট জানালা দিয়ে একটুখানি আলোর যে আভা আসছে ঘরে তাতে দেখা যায়, কেতকী অনেক কালো হয়ে গেছে বুঝি। সমস্ত মুখ ফুলে আছে অবিরল কান্নার ফলে।

কোনও ভূমিকা না করেই কেতকী ভাঙা স্বরে বলল, আমি যাব।

অবাক হয়ে বলি, কোথায়?

যেখানেই হোক। এ বাড়ির বাইরে।

আমি কৃশকায় মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকি। কত বাধা ওকে ঘিরেছে আজ! বললাম, তোমার যাওয়ার কোনও জায়গা ঠিক করা আছে?

ও মাথা নেড়ে বলল, না।

তা হলে?— আমি দ্বিধায় পড়ে বলি।

কেতকীর চোখে ফের জল এল। তীব্র সেই চোখে চেয়ে বলল, আজ মা কী বলেছে জানেন? বলেছে, তোকে নিয়ে যখন এত অশান্তি তখন তুই ওই গুন্ডাটাকেই বিয়ে কর। অথচ মা ক'দিন

আগেই মিথ্যে সন্দেহ করে আমাকে মেরেছিল। আমি এ বাড়িতে থাকব না। আমাকে কোথাও নিয়ে যাবেন?

বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খাই। আশা জাগে, লোভ জাগে, ইচ্ছের নানা রঙের বর্ণালী খেলা করে। কিন্তু আমি কোথায় নিয়ে যাব ওকে? আমার তো কোনও জায়গা নেই।

আমি মাথা নিচু করে বলি, সেটা কি হয়?

কেন হয় না উপলদা? আমার লজ্জা করার সময় নেই, নইলে এত সহজে কথাটা বলতে পারতাম না। শুনুন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।

এত চমকে গিয়েছিলাম যে, মাথাটা চক্কর মারল। খাটের স্ট্যান্ড ধরে সামলে নিলাম। একটু সময় নিয়ে বললাম, কেন আমাকে বিয়ে করবে কেতকী?

এ প্রশ্নটা সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে জটিল।

কেতকী বলল, করব। ইচ্ছে। আপনি রাজি নন?

আমি মৃদুস্বরে বলি, শুনে লজ্জা পাই কেতকী। আমি বড় সামান্য মানুষ।

কেতকীর মুখ উদাস হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে রইল শূন্যের দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে বলল, পিসি বলেছিল, আপনি রাজি হবেন।

বিপদের মধ্যে পড়ে তুমি উলটোপালটা ভাবছ। বিপদ কেটে গেলে দেখবে, এ এক মস্ত ভুল।

কেতকী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, এরকম কথা জীবনে এই প্রথম বললাম উপলদা। বেহায়ার মতো। আর কাউকে বলিনি কখনও।

বলে উপুড় হয়ে পড়ল বালিশে। কাঁদতে লাগল।

আমি কখনও ব্যায়াম-ট্যায়াম করিনি। গায়ে জোর নেই। তেমন কিছু সাহসও আমি রাখি না। কোনওক্রমে বেঁচে আছি পৃথিবীতে, এই ঢের। কেতকীর জন্য আমি কী করতে পারি?

ঘর থেকে বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই বিবেকের সঙ্গে দেখা। সেই কালো জোব্বা পরা কেশো বুড়ো, হাতে বাদ্যযন্ত্র। কাশতে কাশতে বলল, কাজটা কি ঠিক হল উপলচন্দোর?

তার আমি কী জানি বিবেকবাবা? দুনিয়ার মানুষ অধিকাংশ কাজই করে ভাল-মন্দ না ভেবে। তারা তো সবটা দেখতে পায় না।

তবু ভেবে দেখো আর একবার।

বলো কী বিবেকবাবা, শেষে গুন্ডার হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে প্রাণটা যাবে! যদি প্রাণ বাঁচাতে পারিও তা হলেও বা বউ নিয়ে খাওয়াব কী? আবার মেয়ে ভাগানোর জন্য ঝামেলাও কি কম হবে?

এই সময়টায় আমার বিবেকের একটা জোর কাশির দমক এল। সেই সুযোগে আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসি।

সদরের বাইরে পা দিতেই দেখি, ছোট তরফের রকে ছেলে-ছোকরাগুলো কেউ নেই। ছোট কর্তা রাঙা নতুন গামছা পরে দাঁড়িয়ে। ভারী হাসি-হাসি আহ্লাদি মুখ। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, আরে উপল ভায়া যে! তোমার তো দেখাই একদম পাই না। ভোল পালটে গেছে, অ্যাঁ! ভাল জামা-কাপড়, চেহারাও দিব্যি ফনফন করছে! পেশকারি পেয়োচ নাকি, অ্যাঁ!

খুব হাসলেন। সম্পর্কে মামা হন, তবু বরাবরই ছোট তরফ ভায়া বলে ডাকেন আদর করে।

বললাম, ছোট মামা, ভাল আছেন তো!

বেশ আছি, বেশ আছি!

বলে এই গরমকালে নাইকুণ্ডলীতে আঙুল দিয়ে তেল ঠাসতে ঠাসতে অন্য হাতে আমাকে কাছে ডেকে গলা নামিয়ে বললেন, ও বাড়ির কী সব গণ্ডগোল শুনছি হ্যাঁ! ব্যাপারখানা কী জানো কিছু?

একটু গাড়ল সেজে বললাম, আমিও শুনছি। কে একটা মাস্তান ছেলে নাকি কেতকীকে বিয়ে করতে চাইছে!

ছোট কর্তা খুব গম্ভীর মুখে শুনে মাথা নেড়ে বললেন, আমিও পাড়ায় কানাঘুষো শুনছি। কী কেলেঙ্কারি বলো তো! তা দাদা বলছে-টলছে কী?

খুব ঘাবড়ে গেছেন।

ছোট কর্তা আহ্লাদের ভাবটা চেপে রাখতে পারলেন না। প্রায় হেসেই ফেললেন বলা যায়। মুখটা নামিয়ে বললেন, কেতকীর ভাবগতিক কিছু বুঝলে?

না।

ছোটবাবু একটা দুঃখের শ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ব্যাপার কি আর ঠেকানো যায়! আজকালকার ছোঁড়াছুঁড়িদের কারবার সব। আমি বলি কি উদ্যোগ-আয়োজন করে বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়! আজকাল আর বংশ-টংশ জাত-ফাত কে-ই বা মানছে। আমেরিকা ইউরোপে তো শুনি হরির লুট পড়ে গেছে। নিগ্রোয়, চিনেম্যানে, সাহেবে, হিন্দুতে একেবারে বিয়ের খিচুড়ি। এ দেশেও হাওয়া এসে গেছে। দাদাকে বুঝিয়ে বোলো, বংশ-টংশের মর্যাদা আঁকড়ে থাকলে আর চলবে না। ছেলেটাকে আমি মোটামুটি চিনি। খারাপ তেমন কিছুই নয়, একটু হাত-ফাত চালায় আর কী!

আমি বললাম, বলব।

ছোটবাবু একটু হেসে বললেন, তোমার তা হলে ভালই চলছে বলো! পোশাক-আশাক চেহারা দেখে এক ঝটকায় চিনতেই পারিনি। মানুষের উন্নতি দেখলে বড় আনন্দ হয়। করছ-টরছ কী আজকাল?

ওই টুকটাক।

খুব ভাল, খুব ভাল। দেখছ তো চারদিকে কেমন বেকারের বন্যা এসেছে! এই রকটাই এখন নিজের দখলে থাকে না, পাড়ার ছেলেছোকরা সব এসে বসে। তাড়াতেও পারি না। তাড়ালে যাবে কোথায়! তা এই বেকারের যুগে তোমার কিছু হয়েছে দেখে বড় খুশি হলুম ভায়া।

দু'-চারটে কথা বলে কেটে আসি। বুঝতে পারি, ছোট তরফ লোক ভাল নয়, বড় তরফকে বেইজ্জত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ পাড়ায় ছোট তরফেরই হাঁকডাক বেশি, তাঁর নিজের একটা ক্লাবও আছে।

কিন্তু ছোট তরফের দোষ দিয়ে কী হবে! আমিও কি লোক ভাল? তার চেয়ে দুনিয়ার ভাল-মন্দের ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়াই কাজের কাজ। ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে হাঁটছি। বুকের মধ্যে একটা বড় কষ্ট ঘনিয়ে উঠছে। কেতকীর কথাগুলো ট্রেসার বুলেটের মতো ছুটে আসছে বার বার। ঝাঁকে ঝাঁকে। ঝাঁঝরা করে দিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন হতে পারত। হল না। হয় না।

গলির তেমাথায় আঙুলহারা সমীরের সেই স্যাঙাত দাঁড়িয়ে ছিল। রোগা শুটকো চেহারা, লম্বা চুলে তেলহীন রুক্ষতা, মস্ত মোচ চিনেদের মতো ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, একটা কথা বলব?

ছেলেটা কানকি মেরে চেয়ে বলল, বলুন।

বললাম, বিয়ে-টিয়ের অনেক ঝামেলা। মেয়েটাও রাজি হচ্ছে না। তার চেয়ে ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটিয়ে ফেললে হয় না?

ছেলেটা অন্য দিকে চেয়ে বলল, বিয়ে কে চাইছে মসাই? ক্যাস ছাড়তে বলুন, সব মিটিয়ে নিচ্ছি। নেবেন?

আলবত নেব। ক্যাস ছাড়লে আমরা কেতকীর বিয়েতে পিঁড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে আসব। ওর বাপকে রাজি করান।

আমার সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় কাঁপছে। মাথার মধ্যে টিক টিক শব্দ। বললাম, সমীরবাবু ছাড়তে রাজি হবেন?

ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সমীরের কি মেয়েছেলের অভাব পড়েছে নাকি! সামনে হাড়কাটা গলি থাকতে! ও সব ভড়কি দিচ্ছে। তবে আমরা দু'-চারদিন ফুর্তি-টুর্তি করব, মাল-ফাল খাব, ফাংশান করব, তার জন্য দু' হাজার ছাড়তে বলুন। যদি রাজি না হয় তবে কেস সিরিয়াস হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে তো খুব রিলেটিভিটি আছে। দেখুন বলে।

আপনারা কি গিরিবাবুর কাছে টাকা চেয়েছিলেন?

না। টাকা চাইব কেন? গিরিবাবু আমাদের পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল, তাই সমীরের জেদ চেপে গেছে, এসবার-ওসপার করে দেবে। আমরা ক্যেলো করতে চাই না। ও সব ভদ্রঘরের, শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে সমীর বরং আরও ফেঁসে যাবে, ওর ক্লাস এইট-এর বিদ্যে। অনেক বুঝিয়েছি সমীরকে। রাজি হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি, ক্যাস পেলে ও কেস ছেড়ে দেবে।

মাথার ভিতরটায় টাকডুমাডুম বাজছে। এক বার অস্ফুট 'দাঁড়ান' বলে দৌড়ে ফিরে আসি। সদরে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেরোচ্ছেন। খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে রাস্তাঘাট দেখে নিচ্ছেন, চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়ার আগে।

আমাকে দেখে বললেন, ফিরে এলে যে!

একটা জিনিস ফেলে গেছি।

উনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, অ। তা এসো নিয়ে, তোমার সঙ্গে বাসরাস্তা পর্যন্ত যাবখন।

মাসিকে গিয়ে বললাম, কেতকীকে বাঁচাতে চাও তো পাঁচশোটা টাকা গুনে এনে দাও। আমার গুনবারও সময় নেই।

মাসি মুহূর্তের মধ্যে এনে দিল। আমি পাখনা মেলে উড়ে বেরিয়ে এলাম। গিরিবাবু সঙ্গ নিলেন বটে, কিন্তু আমার দৌড়-হাঁটার সঙ্গে তাল দিতে না-পেরে পিছনে পড়ে রইলেন।

ছেলেটা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে ছিল। তার বুক পকেটে ঝট করে টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, বাকিটা সামনের সপ্তাহে।

ছেলেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আস্তে বলল, কত আছে?

পাঁচশো।

পলকের মধ্যে ছেলেটা ভীষণ বিনয়ী হয়ে বলল, গিরিবাবু দিলেন?

মানুষ চরিয়ে খাই। পলকের মধ্যে বুঝলাম, এক্ষুনি ঘটনার লাগাম নিজের হাতে ধরে ফেলতে হবে। গিরিবাবু টাকা দিয়েছে এমন কথা মিথ্যে করে বললে ওরা বড়বাবুকে পেয়ে বসবে। ফের টাকার দরকার হলে আবার ঝামেলা করবে। গম্ভীর হয়ে বললাম, না। আমিই দিচ্ছি। কিন্তু আর কোনও ঝামেলা হলে বাকি টাকাটা তো দেবই না, উলটে অন্য রকম ঝামেলা হয়ে যাবে।

ছেলেটা সদ্য টাকা খেয়েছে। যারা টাকা খায় তাদের ব্যক্তিত্ব থাকে না। ভাল-মন্দের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। এ ছেলেটাও মাস্তানি ঝেড়ে ফেলে একটু খোশামুদে হাসি হেসে বলল, ঝামেলা হবে কেন? সমীর সালাকে আমরা টাইট দিচ্ছি। আপনি ডেফিনিট থাকুন।

গিরিবাবু পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি। ছেলেটা সেদিকে তাকালও না।

ছেলেটার আরও কয়েকজন সাঙাত এসে চারধারে দাঁড়িয়ে গেল। টাকার ব্যাপারটা আড়াল থেকে লক্ষ করে থাকবে। টাকার গন্ধ গোলাপ ফুলের মতো, যারা গন্ধ নিতে জানে তারা ঠিক গন্ধ পায়।

ছেলেটা সঙ্গীদের দিকে চোখ মেরে আমাকে বলল, তা হলে ফের সামনের সপ্তাহে, কেমন?

হ্যাঁ। কিন্তু ছোটবাবু কী হবে?

ছেলেটা মাথাটা সোজা রেখেই বলল, ছোটবাবু ফোতো কাপ্তান। দশ-বিশ চাক্কি ঝাঁক দিতেই

আমাদের দম বেরিয়ে যায়। ওর মামলায় আমরা আর নেই। তবে ওর ছেলে সন্তু আমাদের দোস্ত, কিন্তু তাকে টাইট দেওয়ার ভার আমার। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান।

নিশ্চিন্ত হয়েই আমি বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। নিজের ভিতরটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। টাকাটা চলে গেল হাত থেকে। সামনের সপ্তাহে আরও যাবে। যেন এই যাওয়ার জন্যই হুড়মুড় করে টাকাটা এসেছিল।

বাসরাস্তায় ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে বড়বাবু দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই প্রায় ছুটে এসে বললেন, চেনো নাকি ওদের?

চেনা হল। আপনি আর ভাববেন না বড় মামা, সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। আর কেউ হুজ্জত করবে না।

মিটে গেল মানে? কী করে মেটালে?

একটু মহৎ হতে ইচ্ছে করল। অনেককাল মহৎ হইনি। বললাম, সে শুনে আপনার কী হবে? তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আর কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

বড়বাবু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে আছেন। এ কয়দিনে তাঁর বয়স বহু বেড়ে গেছে, আয়ুক্ষয় হয়েছে অনেক। একটা বহুদিনকার চেপে রাখা শ্বাস হুস করে ছেড়ে বললেন, সত্যি বলছ উপল ভাগ্নে! তুমি কি হিপনোটিজম জানো?

জানি বড়মামা। হিমনোটিজম সবাই জানে। যাক গে, কেতকীর বিয়ের আর দেরি করবেন না। এই বেলা দিয়ে দিন।

কার সঙ্গে দেব? ওই হাতকাটা সমীরের সঙ্গে?

আরে না না।— হেসে ফেলে বলি, কলকবজা নেড়ে দিয়ে এসেছি বড়মামা, এখন আপনারা বিয়ে দিতে চাইলেও সমীর উলটো দৌড়ে পালাবে। তার কথা বলিনি। ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিন।

কিন্তু ছোট তরফ?

রা কাড়বে না।

ঠিক বলছ?

তিন সত্যি।

বড়বাবুর মন থেকে সন্দেহটা শতকরা আশিভাগ চলে গিয়েও বিশভাগ রইল। সেই তলানি সন্দেহটা মুখে ভাসিয়ে তুলে বললেন, ইঞ্জিনিয়ার ছেলে একটা হাতেই রয়েছে। বড্ড খাঁই তাদের। তা এখন আর সে সব ভেবে দেরি করলে হবে না দেখছি।

লাগিয়ে দিন।

যদি ভরসা দাও তো এ মাসেই লাগাব। কলকাতায় দুই দিনে বিয়ের জোগাড় হয়।

অন্যমনস্ক ও উদাস স্বরে 'তাই করুন বড়মামা' বলে বিনা ভূমিকায় হাঁটতে থাকি। টের পাই, ড়বাবুর চোখ আমাকে বহু দূর পর্যন্ত প্রচণ্ড বিস্ময়ে দেখতে থাকে।

অনেক দিন বাদে নিজেকে বেশ মহৎ লাগছে।

১২

একটু আগে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। লেকের জলের ধারে ঘাসের ওপর বর্ষাতি পেতে চুপ করে বসে আছি। মেঘ ভেঙে অল্প রাঙা শেষবেলার রোদ উঠল ওই। ফ্যাকাসে গাছপালা যেন রূপকথার রাজ্যে জেগে উঠল হঠাৎ। জল উঠল ঝিলমিলিয়ে। জীবন এ রকম। কখনও মেঘ, কখনও রোদ।

ক্ষণা আসবে। আমার আর ক্ষণার মধ্যে এখন গোপনীয়তা তৈরি হয়েছে। যেন পাতালের নদী। বাড়ির বাইরে আমরা আজকাল লুকিয়ে দেখা করি।

ক্ষণার ভিতরে আজকাল আর-এক ক্ষণা জন্ম নিচ্ছে। সে অন্য এক রকম চোখে নিজেকেও দেখে আয়নায়। বেরোবার সময়ে ক্ষণা বলে দিয়েছিল, লেকে থেকো। আমি সিনেমার নাম করে বেরোব। পৌনে ছ'টায় দেখা হবে।

আমি জলে একটা ঢিল ছুড়ি। ঢেউ ভাঙে। কিছু ভাবি না। কিছু মনে পড়ে না। শুধু জানি, ক্ষণা আসবে। বর্ষাতির পকেটে লুকোনো টেপ-রেকর্ডার উন্মুখ হয়ে আছে।

ঘড়িতে পাঁচটা চল্লিশ। পিচের রাস্তাটা দ্রুত পায়ে পার হয়ে ক্ষণা ঘাসে পা দিয়েই হাসিমুখে ডাকল, এই!

পলকে মুখে হাসির মুখোশ পরে তাকিয়ে বলি, এসে গেছ?

দেরি করেছি? বলো!

না। একটুও না।— বলে বর্ষাতিটা বড় করে পাতি। টেপ-রেকর্ডার চালু হয়।

ক্ষণা কাছ ঘেঁষে বসল। গায়ে গা ছোঁয়-ছোঁয়। বলল, ঠিক বেরোবার আধ ঘণ্টা আগে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি দেখে আমার যা কান্না পাচ্ছিল না! কখন থেকে তুমি এসে বসে আছ। আর আমি যদি বেরোতে না পারি!

খুব না-ভেবেই বলি, ঝড়-বৃষ্টিতে কি কিছু আটকাত ক্ষণা? তোমাকে আসতেই হত।

ক্ষণা পাশমুখে আমার দিকে তাকায়। বড় প্রকট হয়ে আছে ওর আজকের সাজ। চোখের পাতায় আউটার আই ক্রিম লাগানো, কাজল, ম্যাসকারা, মুখে মেক-আপ, কপালে মস্ত টিপ, কানে ঝুমকো, চুল ফাঁপিয়ে আঁচড়ানো, রেশমি বুটির দামি শাড়ি পরেছে কচি কলাপাতা রঙের। ঠোঁটে রক্ত-গাঢ় রং। আধবোজা মদির এক রকম চোখের দৃষ্টি খানিকক্ষণ ঢলে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, তুমি কী করে বুঝলে?

তারপর একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক। আমাকে আসতেই হত। কেন আসতে হত বলো তো!

কেন ক্ষণা?

ক্ষণা অকপটে চেয়ে থেকে বলল, তোমাকে ভালবাসি বলে।

সত্যিই ভালবাসো ক্ষণা?

কী করে বোঝাব বলো? সারা দিন কেবল তোমার কথা মনে আসে। সারা দিন। ঘুমিয়েও তোমার কথা ভাবি। ঘুম থেকে যেই চোখ মেলি অমনি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস করো।

আমার অবস্থা তোমার চেয়ে ভাল নয় ক্ষণা। আমার সমস্ত মাথা জুড়ে তুমি। শুধু তুমি।

শোনো।

উঁ!

ক্ষণা খুব কাছে ঘেঁষে আসে। ও বেহেড। সম্মোহিত। ওর চেতনা নেই যে, এখনও দিনের আলো ফটফট করছে। যে-কেউ, চেনা বা আধচেনা লোক আমাদের দেখে ফেলতে পারে। অবশ্য দেখে ফেললে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি। যত স্ক্যান্ডাল, তত পাবলিসিটি। যত পাবলিসিটি তত সুবিনয়ের সুবিধে। আমি এও জানি, আজ লেকে সুবিনয় সাক্ষী হিসেবে কয়েকজনকে হাজির রেখেছে। তারা

কে আমি চিনি না। কিন্তু আছে আশেপাশে। দেখছে। আমাকে আজ খুব ভাল অভিনয় করতে হবে।

ক্ষণা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, তুমি ছাড়া আর কেউ কখনও আমাকে এত সুন্দর দেখেনি। কখনও বলেনি, তুমি বড় সুন্দর।

তুমি সুন্দর ক্ষণা।— বলে ক্ষণার কোমরের দিকে হাতটা আলতোভাবে জড়াই। বলি, সকলের কি সৌন্দর্য দেখবার চোখ থাকে?

ক্ষণা অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল একটু। তারপর বলল, তোমার বন্ধু কখনও আমাকে সুন্দর দেখে না। ও আমাকে দেখলই না ভাল করে, নিলও না। বিয়ের পর থেকেই দেখছি, ও বড় কাজের মানুষ। আমরা হানিমুনে যাইনি, এমনকী সিনেমা থিয়েটার বেড়ানো কিছু নয়। এই সেদিন প্রথম সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে এল না, তোমাকে পাঠাল। চিড়িয়াখানাতেও তাই। ও কেন এ রকম বলো তো!

গম্ভীর থেকে বলি, মহৎ মানুষরা ও রকমই হয় বোধহয়। আমি সে তুলনায় কত সামান্য।

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলল, না। তুমি সামান্য নও। যদি তাই হতে তো তোমাকে এত ভালবাসলাম কী করে? তোমার ভিতর একটা কী যেন আছে, ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু সুন্দর কী যেন আছে। তুমি নিজে বোঝো না?

অবাক হয়ে বলি, না তো!

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলল, আছে।

ফের একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, কিন্তু আমি অত কাজের মানুষ, মহৎ মানুষকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম কেন বলো তো। শুনি, ওর নাকি পৃথিবীজোড়া নাম। শুনে ভয় পাই। আমার তো অত বড় মানুষের বউ হওয়ার যোগ্যতা ছিল না! আমি আরও অনেক বেশি সাধারণ কারও বউ হলে কত ভাল হত বলো তো!

কথায় কথায় বেলা যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে। আজ বৃষ্টি-বাদলা গেছে। লেক তাই বেশ নির্জন। আর এই ঘনায়মান অন্ধকার ও নির্জনতায় আমি ঠিকই টের পাই, আমাদের চারধারে ছায়া ছায়া কিছু মানুষ ঘোরাফেরা করছে। নজর রাখছে আমাদের দিকে। কারও হাতে কি ফ্ল্যাশগান লাগানো ক্যামেরা আছে? কথা ছিল, থাকবে।

ঝিরঝির একটু বৃষ্টি হেঁটে গেল চারপাশে। গাছের পাতায় পাতায় সঞ্চিত জলের বড় বড় ফোঁটা নামল। গ্রাহ্য করলাম না। ঘাস ছেড়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চে উঠে বসেছি দু'জনে, বর্ষাতিটা দু'জনের গায়ের ওপর বিছানো। বর্ষাতির নীচে আমাদের শরীর ভেপে উঠছে, ঘামছে।

ক্ষণা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওর তো দিল্লি থেকে ফেরার সময় হল।

আমিও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি, কী করবে ক্ষণা?

কী আর করব? যত যাই হোক, ওর ঘরই তো আমাকে করতে হবে!

শিউরে উঠে বলি, তা কেন ক্ষণা? আমি তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলে, তা কি হয়?

কেন হবে না?

আমার ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে যে!

তাতে কী! নিজের জীবনটা কেন নষ্ট করবে? সুবিনয়ও দেখো একদিন বিদেশে বড় চাকরি পেয়ে চলে যাবে। আর আসবে না, খোঁজও করবে না। সেদিনের জন্য তৈরি থাকা ভাল ক্ষণা।

ক্ষণা আমার হাত ধরেই ছিল। সেই ধরা হাতটা একটু শক্ত হয়ে উঠল শুধু। ও বলল, তুমি কিছু শুনছ নাকি?

শুনেছি।

ক্ষণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমারও কখনও কখনও ও রকম মনে হয়। মনে হয়, ও

যেন বিদেশের মানুষ। মনে হয়, ও একদিন খুব দূরে সরে যাবে।

সময় থাকতে তুমি কেন সাবধান হচ্ছ না ক্ষণা? আমি— আমি তোমাকে ভালবাসি।

বলতে বলতেও আমার উৎকর্ণে কোনও একটা অস্পষ্ট কাশির শব্দ পৌঁছয়। সংকেত। আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমার অভ্যন্তরে ক্ষণার জন্য একটুকু ভালবাসা নেই। তৈরি হয়নি। তবু কাজটা আমাকে করতেই হবে।

বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ ক্ষণা। আমি ভাল এক্সপোজারের জন্য বর্ষাতিটা গা থেকে ফেলে দিই। তারপর গাছের ছায়ায় গভীর অন্ধকার নির্জনে ওকে জড়িয়ে ধরি। বাধা দেওয়ার কথা নয়। দিলও না ক্ষণা। আমার বিবেক এই অবস্থায় সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আড়াল থেকে তার ঘন ঘন কাশির আওয়াজ শুনতে পাই। আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য সে কয়েক বার তার বাদ্যযন্ত্রটা বাজাল। আমি পাত্তা দিলাম না। আমি ক্ষণাকে যথেষ্ট, যত দূর সম্ভব আবেগে চুমু খাই। কষ্টকর, ভয়ের চুমু। আমি তো জানি আমরা একা নই। জানি, ক্ষণার স্বামীও দৃশ্যটা দেখছে। বড় বিস্বাদ চুমু। তবু ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে অপেক্ষা করছি ফ্ল্যাশগানের ঝলকটার জন্য। অপেক্ষা করছি। অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে।

চমকাল। ফ্ল্যাশের আলো নীল বিদ্যুতের মতো ঝলসে দিয়ে গেল আমাদের। পর পর দু'বার।

ক্ষণা চমকে চোখ চেয়ে বলে, কী গো?

বিদ্যুৎ।

ও।

আবার সংলগ্ন হই। দক্ষ লোকদের হাতে ক্যামেরা আরও একটু পর পর চমকে চমকে উঠল।

তটস্থ ক্ষণা সোজা হয়ে বসে বলে, কে টর্চ ফেলছে?

টর্চ নয় ক্ষণা। আকাশে মেঘ চমকাল।

ক্ষণা আমার দিকে চেয়ে অন্ধকারে একটু চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ বলে, শোনো, মনে হচ্ছে কারা যেন লুকিয়ে থেকে দেখছে আমাদের।

আমার টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেট শেষ হয়ে আসছে। আমি হঠাৎ ওকে কাছে টেনে বলি, কেউ নয়। লেক হচ্ছে মুক্ত অঞ্চল, সবাই প্রেম করতে আসে। কে কাকে দেখবে? শোনো ক্ষণা, তুমি সুবিনয়কে ডিভোর্স করবে?

ক্ষণা নিজের চুল ঠিক করছিল। একটু চনমনে হয়ে চার দিকে তাকাচ্ছে। বিপদ। আমি ওকে টেনে নিই কাছে। ও বাধা দেয় না। বরং চোখ বুজে থাকে। অস্ফুট গলায় বলে, আমাকে বহুকাল কেউ আদর করে না উপল। একটু আদরের জন্য আমার ভিতরটা মরুভূমি হয়ে থাকে।

আমার রেকর্ডারের ফিতে ফুরিয়ে আসছে। সময় নেই।

বলি, বলো ক্ষণা, সুবিনয়কে ডিভোর্স করবে?

তেমনি অস্ফুট গলায় ও বলে, তুমি কি আমাকে একেবারে চাও?

চাই।

ভালবাসবে আমাকে চিরকাল?

বাসব ক্ষণা। বলো, ডিভোর্স করবে?

ও যদি বাধা দেয়! যদি মারে তোমাকে?

মারবে না ক্ষণা। ও আমাকে ভয় পায়। বাধা ও দেবে না।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ।

আমার ছেলেমেয়ে কার কাছে থাকবে?

আমাদের কাছে।

তা হলে করব ডিভোর্স।

কথা দিলে?

দিলাম।

আদরের ছলে আমি ওকে ফের চুমু খেতে খেতে শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসি। অন্য হাতে ওর চোখ চেপে রেখে বলি, দেখো না। আমাকে দেখো না।

সামনে থেকে, পিছন থেকে, পাশ থেকে আরও তিন বার ক্যামেরার আলো ঝলসায়। অন্ধকারে ছায়া-ছায়া মূর্তি ঝোপের আড়ালে সরে যায়। আবার অন্য দুটো ছায়া দৌড়ে এক ধার থেকে অন্য ধারে সরে গেল। ফ্ল্যাশ চমকাল ফের। ক্ষণার শরীরের ঠিক কোথায় আমার হাত রয়েছে তার নির্ভুল ছবি তুলে নিল।

ক্ষণা বলল, চোখ ছাড়ো। কী করছ?

আমার সর্বাঙ্গে ঘাম। বুকের ভিতরে অসম্ভব দাপাদাপি। হাত-পা অবসাদে খিল ধরে আসে। বর্ষাতির পকেটে টেপ-রেকর্ডার থেমে গেছে। ক্যাসেট শেষ।

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, চলো ক্ষণা।

বোসো আর-একটু। আমার তো সিনেমার শো ভাঙার পরে ফিরলেও চলবে। কী সুন্দর দিন ছিল আজ, ফুরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

লজ্জা, ভয়, ক্লান্তি ও অনিচ্ছায় আমার মাথাটা বেভুল লাগে। আর বসে থাকার মানে হয় না। ক্লান্তির বোঝা বাড়বে কেবল।

তবু অনিচ্ছায় বসে থাকতে হয়।

ক্ষণা বলল, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো। আমাকে, দোলনাকে, ঘুপটুকে। ওরা তো অবোধ।

আমার ভিতরকার অনিচ্ছার ভাবটা ঠেলে আসে গলায়। বমির মতো। আমি যতটুকু করার করেছি। টেপ শেষ হয়ে গেছে। ক্যামেরা নিয়ে সরে গেছে লোকজন। এখন আর প্রেমের কথা আসে না। ফাঁকা লাগে, নিরর্থক লাগে।

রাত্রে সুবিনয় টেপ শুনছিল। তেমনি আধখানা ছায়া, আধখানা আলোয় পাথুরে মুখ দেখা যাচ্ছে। তবে ওর মুখে আজকাল অনেকগুলি নতুন গভীর রেখা পড়েছে। টেপ শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ঘাড় এলিয়ে দিচ্ছে। আবার সোজা হয়ে বসছে কখনও। অস্থির। সিগারেট খানিক খেয়েই প্রায় আস্ত গুঁজে দিচ্ছে অ্যাশট্রেতে।

আস্তে আস্তে ঘুরে টেপ শেষ হয়। সুবিনয় নিঃশব্দে উঠে ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে নীট হুইস্কি ঢক ঢক করে জলের মতো তিন-চার ঢোক খেয়ে একটা হেঁচকি তুলল।

খুব আস্তে মড়ার মতো একখানা মুখ ফেরাল আমার দিকে। দু'চোখে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। যেন-বা ভয়।

খুব আস্তে করে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি? ইউ আর এ বর্ন লেডি-কিলার। এ ডেমন! এ ড্রাগন!

চুপ করে থাকি। সুবিনয়ের দিক থেকে একটা মস্ত মোটা আর ভারী নোটের বান্ডিল উড়ে এসে কোলে পড়ল।

ফাইভ থাউজ্যান্ড। ইউ হ্যাভ আর্নড ইট।

এ কথা যখন বলছিল সুবিনয় তখন ওর গলায় কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। ভয় পাওয়া মানুষের মতো গলা।

মাথা নিচু করে টাকাটার দিকে চেয়ে থাকি। অনেক টাকা। দারিদ্র্যের মুক্তিপণ।

সুবিনয় জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। আমার দিকে চাইছে না। সেইভাবেই থেকে

বলল, আই ডোন্ট বিলিভ ইট। ইয়েট দি ইম্পসিবল হ্যাজ হ্যাপেনড বাডি।

আমি টাকা থেকে মুখ তুললাম।

সুবিনয় এসে সোফায় তার প্রিয় চিতপাত ভঙ্গিতে বসল। নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বলল, আমার ধারণা ছিল, ক্ষণা আমার সঙ্গে পুলটিশের মতো সেঁটে গেছে। কখনও ওকে সরানো যাবে না। অ্যাডামেন্ট ওয়াইফ।

হুইস্কির আধ গেলাস টেনে নিয়ে তীব্র অ্যালকোহলের যন্ত্রণায় গলা চেপে বুম হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আলোছায়াময় মুখ তুলে অদ্ভুত হেসে বলল, ইউ হ্যাভ ডান ইট বাডি। কংগ্র্যাচুলেশনস।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। যখন দরজার কাছ বরাবর পৌঁছে গেছি তখন ও ডেকে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি, ইউ আর ইন লাভ উইথ হার। গোয়িং টু ম্যারি হার বাডি, হোয়েন আ'ল বি অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার?

আমি চুপ করে রইলাম। তারপর মাথা নাড়ালাম। না।

লাভ হার বাডি। প্লিজ।

আমি ওর দিকে তাকালাম। স্পষ্ট টের পাই, আমার চোখ বাঘের মতো জ্বলছে। সমস্ত গায়ে শিরশির করে উঠছে রাগ। কিন্তু মাতাল সুবিনয় আমাকে লক্ষই করল না। বলল, আই অ্যাম গোয়িং হোম টুনাইট। ওয়েট বাডি, আই ক্যান টেক ইউ হোম।

রাতে আমি ফের বারান্দায় শুয়েছি। প্যাকিং বাক্সগুলি একটু নড়বড় করে। বিছানাটা বড্ড শক্ত আর স্যাঁতস্যাঁতে ঠেকে। এ সবই ক'দিন সুবিনয়ের পুরু গভীর বিছানায় শোওয়ার অভ্যাসের ফল। শুয়ে জেগে থাকি। সুবিনয়ের ঘর থেকে কোনও শব্দ আসে না। ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখি। ক্ষয়া একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। বড় ভাল লাগে। চেয়ে থাকি। ভিতরটা বিস্বাদে ভরে আছে। চাঁদ বড় ভাল লাগে। চাঁদ কোনও কাজে লাগে না, ব্যবহার হয় না। শুধু অকারণে আকাশে ঝুলে থাকে। চাঁদ তাই বড় ভাল।

বুড়ো বিবেক আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, পাপ হল লঙ্কার মতো। যেমন ঝাল তেমনি স্বাদ। না উপল?

হ্যাঁ বিবেকবাবা।

কাঁদছ নাকি?

না বিবেকবাবা। চেষ্টা করে দেখেছি. আজকাল কান্না আসে না।

বিবেক শ্বাস ফেলে বলে, কাঁদলে ভাল লাগত।

জানি। কিন্তু সব সময়ে কি আসে?

বিবেক শ্বাস ফেলে বলে, পেটে অম্বল জমলে যেমন বমি করলে আরাম হয়, কান্নাও তেমনি। তোমার কোনও দুঃখের কথা মনে পড়ে না? কিছু একটা মনে করে দেখো। কান্না এসে যাবেখন।

আসে না। আমি মাথা নেড়ে বলি, অনেক দিন বাদে এই প্রথম একটা কাজ আমি শেষ করেছি বিবেকবাবা। মেলা ঝামেলা কোরো না। তুমি যাও।

বিবেক চলে যায়।

সে যেতে না যেতেই ছুঁচোর চিড়িক ডাক আসে অন্ধকার বারান্দার কোথা থেকে যেন। চমকে উঠে বসি। বহুকাল কি ছুঁচোটা আসেনি? না কি আমিই লক্ষ করিনি ওকে, নিজের অন্যমনস্কতায় ডুবেছিলাম বলে ওর ডাক কানে আসেনি?

চকিতে মনে পড়ল, বিষ আনতে বার বার ভুল হয় বলে ক্ষণা আজ নিজেই কিনে এনেছে। শোওয়ার আগে আটার গুলিতে বিষ মাখিয়ে বারান্দায় আর বাথরুমে ছড়াচ্ছিল। আর তখন একবার

আমার খুব কাছে এসে চাপা স্বরে বলেছিল, ও এসেছে। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কী করে যে আর একটা রাতও থাকব! পারছি না, একদম পারছি না। তুমি আমার কী করলে বলো তো! আমি কি নষ্ট হয়ে গেলাম? এ কি ভাল হল?

আমি উঠে বাতি জ্বালি। মুখ ধোওয়ার বেসিনের নীচে এঁটো বাসনের ওপর ছুঁচোটা তুরতুর করছে। আমাকে দেখে মুখ তুলল। দুটো চোখ আলোয় আলোময়। ওর অল্প দূরেই সেই বিষ মাখানো আটার গুলি। আমি নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিই।

লোভে আমার পায়ের কাছে ছুটে আসে ছুঁচোটা। করুণ মুখ তুলে যেন বলে, দাও। বড় খিদে।

আমি তাকে পাত্তা দিই না। তড়িৎগতিতে আমি বারান্দা আর বাথরুম থেকে আটার গুলি তুলে নিতে থাকি। ছুঁচোটা আমাকে আর ভয় পায় না। পায়ে পায়ে ঘোরে আর ডাকে। চিড়িক স্বরে যেন বলে, দাও। আমার বড় খিদে। আমাদের দর্শন-বিজ্ঞান নেই, সুখ-দুঃখ নেই, প্রেম-ভালবাসা নেই। আছে শুধু খিদে। দাও।

আমি হাঁটু গেড়ে তার মুখোমুখি বসে বলি, আমিও কি নই তোমাদের মতো? সব কিছু খেতে নেই। আমারও চারধারে কত বিষ মাখানো খাবার ছড়িয়ে রেখেছে কে যেন। মাঝে মাঝে খেয়ে ফেলি। বড় জ্বালা।

১৩

সুবিনয় অফিসে গেল। ক্ষণা গেল মার্কেটিং-এ। সুবিনয়ের মা কুসুমকে নিয়ে কালীঘাটে।

আমি বাথরুমে বসে নিবিষ্ট মনে গেঞ্জি কাচছিলাম। আজকাল ক্ষণা কাচাকাচি করতে দেখলে রাগ করে বলে, তুমি কাচবে কেন? কুসুম দেবে'খন। না হয় তো আমি দেব। পুরুষ মানুষের কাজ নাকি এ সব!

গেঞ্জি কাচা আমার খুব পছন্দের কাজ নয়। কিন্তু ভাবি, সারা জীবন আমাকেই তো কাচতে হবে। আমার তো কোনও দিন বউ হবে না। মধু গুপ্ত লেনের রুস্তমদের টাকা আমি মিটিয়ে দেব। কেতকীর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। সেই ইঞ্জিনিয়ার। তাই ভাবি, এত কাল পর কেন এই আদরটুকু নিই? আমার এমনিই যাবে।

বাথরুমের দরজায় কে এসে দাঁড়াল। প্রথমে তাকাইনি। কিন্তু নিথর এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়ে চোখ তুলেই চমকে উঠি।

প্রীতি!— আমার গলার স্বর কেঁপে যায়।

সাদা খোলের চওড়া জরিপেড়ে একটা ভীষণ দামি শাড়ি পরনে। ওর মুখও সাদা। ঠোঁট ফ্যাকাসে। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

ও চৌকাঠের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কাছেই এসেছি।

আমার কাছে?

উপলবাবু, ক্ষণাদিকে নষ্ট করলেন?

আমি মাথা নিচু করে বলি, না তো। আমি ওকে ভালবাসি।

প্রীতি জলময় নোংরা চৌকাঠের ওপর সাদা শাড়ির কথা ভুলে গিয়ে বসে পড়ল ঝুপ করে। ঠিক আমার চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল।

কী হল?— আমি অবাক হয়ে বলি।

আমি সব জানি উপলবাবু।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, মাইরি।

বেচারা!— প্রীতি হেসে বলে, না, ক্ষণাদিকে নয়, আপনি বড় বেশি টাকা ভালবাসেন।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। আমি টাকা ভালবাসি না। আমি শুধু চেয়েছিলাম টাকা সহজলভ্য হোক! বৃষ্টির মতো, জলপ্রপাতের মতো টাকা ঝরে পড়ুক। হ্যান্ডবিলের মতো টাকা বিলি হোক রাস্তায় রাস্তায়।

তাই টাকার জন্য আমার দিদিকে নষ্ট করলেন?

নষ্ট?

বলে আমি অবাক হয়ে তাকাই। তারপর প্রীতির কাছে হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, দেখুন। আমার মুখের মধ্যে দেখুন।

এই বলে হাঁ করে থাকি।

প্রীতি আমাকে পাগল ভেবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী দেখব?

দেখলেন না আমার মুখের মধ্যে?

কী?

বিশ্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে। আপনিও ভাল করে দেখলে দেখতে পেতেন, আমি কাউকে নষ্ট করিনি। যে যার কর্মফলে নষ্ট হয়ে আছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।

লোকে যেমন রাস্তার পাশে পচা ইঁদুর দেখে তেমনি একরকম ঘেন্নার চোখে আমাকে দেখছিল প্রীতি। অনেকক্ষণ দেখে বলল, আপনি অন্য কোথাও যেতে চান না উপলবাবু?

গেঞ্জিটা ধুয়ে নিংড়ে আমি উঠে আসি। হেসে বলি, যাব। আমাকে তো যেতেই হবে। প্রীতি, জীবনে এই প্রথম একটা কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছি। এই আনন্দটা আমাকে কিছুক্ষণ উপভোগ করতে দিন।

কী কাজ?

ক্ষণাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। এবার আপনারা আমেরিকা চলে যেতে পারবেন।

বেচারা!— প্রীতির দীর্ঘশ্বাস ফাঁকা বাড়িতে বড় করে শোনাল। বলল, আপনি কি ভাবেন, যে লোকটা তার বউকে স্ক্যান্ডালে জড়ানোর জন্য এত কাণ্ড করছে তাকে আমি বিশ্বাস করব? ক্ষণাদিকে আমরা ছেলেবেলা থেকে জানি। চিরকাল ওর ঘর-সংসারের দিকে ঝোঁক। এমন গুছিয়ে পুতুল খেলত যে সবাই বলত, ও খুব সংসার-গোছানি মেয়ে হবে। তাই হয়েছিল ক্ষণাদি। স্বামী, শাশুড়ি, বাচ্চা সংসার নিয়ে কেমন জড়িয়ে গিয়েছিল। অমন ভাল বউকে কেউ এত নীচে টেনে নামায়?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

প্রীতি আমার একটা হাতে হাত রেখে বলল, কেন করলেন এমন? কী দিয়ে ভোলালেন ক্ষণাদিকে?

উদাস স্বরে বলি, আমি নিমিত্ত মাত্র। যা হওয়ার তা হয়েই ছিল।

প্রীতি আরও এক পা কাছে সরে এসে বলল, কিছু হয়নি উপলবাবু। জামাইবাবুকে আমি নিইনি মনের মধ্যে। কখনও হয়তো কোনও দুর্বলতা এসেছিল, এখন নেই। আপনি দিদিকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায় প্রীতি?

আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।

কেন প্রীতি?

বলব। আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

গোছানোর মতো কিছু নেই।

তা হলে চলুন।

আমি পোশাক পরে নিই। টাকার মস্ত বাণ্ডিলটা পকেটে পুরি।

প্রীতি আড়চোখে দেখে বলল, কত টাকা!

অনেক।

প্রীতি চেয়ে রইল আমার দিকে। করুণাঘন চোখ।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিল প্রীতি। উঠতে গিয়েই চমকে উঠে দেখি, রুমা বসে আছে। পিছনের সিটে হেলে বসে নিজের বাঁ হাতের নখগুলো দেখছিল। আমার দিকে খরচোখে একবার তাকাল। প্রীতিকে বলল, ওঁকে সব বলেছ প্রীতি?

না। তুমি বলো।

বলছি।

বলে রুমা সিটের মাঝখানে সরে এসে বসল। এক ধারে প্রীতি, অন্য ধারে আমি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালা ধীরগতিতে গাড়ি চালায়। হয়তো তাকে ও রকমই নির্দেশ দেওয়া আছে।

রুমা পাশে বসতেই আমার শরীরে একটা কাঠের মতো শক্ত ভাব দেখা দিল। বুকে ভয়। নার্ভাস লাগছে।

রুমা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, শুনুন রোমিও, প্রীতি অবশেষে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

আমি অনেকখানি বাতাস গিলে ফেলি।

আমাকে?

আপনাকে। কেন, আপনি রাজি নন?

উদভ্রান্তের মতো বলি, কী বলছেন? আমি কি ঠিক শুনছি?

ঠিকই শুনছেন। প্রীতি আপনাকে বিয়ে করতে চাইছে। আজই এক্ষুনি। অনেক স্যুটারের ভিতর থেকে প্রীতি আপনাকেই বেছে নিয়েছে। আপনি ভাগ্যবান।

মাথাটা ঘুলিয়ে ওঠে। কিছু বুঝতে পারি না। পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভারের সবুজ পাগড়ির দিকে চেয়ে থাকি। আমার শরীরের কোথায় যেন একটা বৈদ্যুতিক তার ছুঁয়ে আছে। মৃদু শিহরনে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। নতুন এক চোখে প্রীতির দিকে পাশ ফিরে চাইলাম।

প্রীতি আমার দিকে চেয়ে ছিল, চোখ চোখ পড়তেই মুখখানা ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

গোলপার্কে ওদের ফ্ল্যাটে এসে রুমা বলল, আমি পাশের ঘরে আছি প্রীতি। তোমরা কথা বলে নাও।

রুমা তার ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকানি দিয়ে দিল। তারপর ও ঘর থেকে সেই ট্যাংগো নাচের বাজনা আসতে লাগল।

তার সেই ঘোরানো চেয়ারে প্রীতি মাথা নত করে বসে আছে। কার্ল করা খাটো চুলের রাশি থোপা থোপা কালো আঙুরের মতো ঘিরে আছে মুখখানা।

গদি-আঁটা টুলের ওপর হতভম্ব মাথা নিয়ে বসে আছি। কথা আসছে না।

অনেকক্ষণ বাদে প্রীতি তার সুন্দর কিন্তু ফ্যাকাসে মুখখানা তুলে আমার দিকে ফেরাল। নরম আদরের গলায় ডাকল, উপল!

উঁ।

আমাকে বিয়ে করবে না উপল?

মাথা নেড়ে বললাম, আমি কি স্বপ্ন দেখছি প্রীতি?

না।— প্রীতি মাথা নেড়ে বলল, শোনো উপল, তোমাকে ছাড়া আমার উপায় নেই।

চোখের জল মুছে নিয়ে বললাম, আমাকে কেউ ভালবাসে না প্রীতি!

প্রীতি আবার কালো আঙুরের থোপায় মুখ ঢেকে মাথা নত করে মৃদু স্বরে বলল, আমি বাসি।

কবে থেকে প্রীতি?

যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম। জামাইবাবুর পাগলামির চিঠি নিয়ে এসেছিলে। আমি তোমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলাম উপল। কিন্তু তখন থেকেই তোমাকে ভুলতে পারি না। কেন ভুলতে পারি না তা অনেক বার ভেবে দেখেছি, বিরক্ত হয়েছি নিজের ওপর। পরে বুঝতে পেরেছি, তোমাকে আমি কবে থেকে যেন ভালবেসে ফেলেছি! বুঝে নিজের ওপর রেগে গেছি। কিন্তু ভালবাসার ওপর কি কারও হাত থাকে, বলো!

প্রীতি, আমি সামান্য মানুষ।

কে বলল উপল? তুমি সামান্য নও। তোমার ভিতরে কী আছে তা তুমি কোনও দিন বুঝতে পারোনি।

কী আছে প্রীতি?

নতমুখী প্রীতি বলে, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি খুব ভাল।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না প্রীতি। আমি ভাল নই। আমার যখন খিদে পায় তখন আমার মাথার ঠিক থাকে না। তখন মানুষ আমাকে যা করতে বলে তাই করি। বরাবর মানুষ আমাকে নিমিত্তের ভাগী করেছে প্রীতি। কিন্তু যদি খিদে না পেত—

সজল, বিশাল দু'খানা চোখে প্রীতি আমার দিকে তাকায়। তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। কথা ফোটে না প্রথমে। তারপর খুব অন্য রকম এক গলায় আস্তে করে বলে, আমি তোমাকে খাওয়াব উপল। আমি তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব। দু'জনে মিলে খাটব, খাব। খিদের কথা বোলো না। আমার বড় কষ্ট হয়।

অবাক হয়ে বলি, আমেরিকায় নিয়ে যাবে?

ও মাথা নেড়ে বলল, নিয়ে যাব। আমি সামনের রবিবারে চলে যাচ্ছি। গিয়েই তোমার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করব। ভেবো না, সে দেশে কখনও খাবারের অভাব হয় না।

নিয়ে যাবে! আমার রক্তে রক্তে ট্যাংগো নাচের বাজনা ঢুকে যায়। আমার ভিতরে যেন এক নাচঘর তৈরি হয়ে গেল। সেই ঘরে জোড়া জোড়া পা ফেলে সাহেব-মেম নেচে বেড়াচ্ছে।

প্রীতি!

প্রীতি উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছিল। জবাব দিল, উঁ!

কবে আমাদের বিয়ে হবে?

আজ। বেলা তিনটের সময় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আসবেন, সাক্ষীরা আসবেন।

আমি হাসলাম। বহুকাল এমন গাড়লের মতো হাসিনি।

প্রীতি, শোনো। বিয়ের পর আমরা জোড়ে মাসির কাছে যাব।

প্রীতি অবাক হয়ে বলে, মাসি কে?

আমার এক মাসি আছে। মাসি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বড় খুশি হবে মাসি। কত আদর করবে তোমাকে, দেখো। যাবে তো!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব উপল।

তুমি মাসিকে প্রণাম করবে তো প্রীতি?

করব, নিশ্চয়ই করব।

ক'টা বাজে প্রীতি?

প্রীতি মৃদু হেসে বলে, তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট। তুমি ঘাবড়ে যাওনি তো উপল?

অবাক হয়ে বলি, না তো! ঘাবড়াব কেন? আমার অসম্ভব, অসহ্য এক আনন্দ হচ্ছে। প্রীতি, তুমি বিয়ের পর সিঁদুর পরবে তো?

প্রীতি করুণ মুখখানা তুলে বলে, পরতে তো হবেই।

শাঁখা?

তাও।— বলে প্রীতি হাসল। বড় সুন্দর হাসি।

তুমি কি রাঁধতে পারো প্রীতিসোনা?

প্রীতি ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ। আমি অনেক রকম রান্না জানি। দেশি, বিলিতি। আমেরিকায় তো আমাকেই রাঁধতে হবে তোমার জন্য।

কেন প্রীতি? আমরা রান্নার লোক রাখব।

ওদের দেশে ভীষণ টাকা লাগে লোক রাখতে।

লাগুক। তোমাকে আমি তা বলে রাঁধতে দেব না।

আচ্ছা।— বলে প্রীতি চোখে চোখে একটু হাসে।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ উঠে আসছে। উত্তেজনায় কেঁপে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

প্রীতিও উঠে দাঁড়ায়। ম্লান মুখ করে বলে, ওরা আসছে।

আমি আজ দাড়ি কামাইনি প্রীতি।— গালে হাত বুলিয়ে বলি।

তাতে কিছু হবে না উপল। সারা জীবন তো কামাবেই।

সাজিনি।

তোমাকে অনেক পোশাক করে দেব।

তিনজন লোক ঘরে এসে দাঁড়ায়। একজনের হাতে খাতাপত্র। প্রথমে উত্তেজনার বশে আমি তাদের মুখ ভাল করে দেখতে পাই না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়, তিনজনের মধ্যে একজন প্রীতির সেই প্রেমিক।

প্রীতি আমার কাছে ঘেঁষে এসেছিল। ওর একটা হাত কখন আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমি ফিস ফিস করে বলি, ও কে প্রীতি? ও কেন এখানে?

প্রীতি মৃদু স্বরে বলে, ও আমার কেউ না উপল। ও শুধু সাক্ষী দিতে এসেছে।

পাশের ঘরে ট্যাংগো থামল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল রুমা। খাতা হাতে লোকটা চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসল। প্রীতির প্রাক্তন প্রেমিক আর একজন অচেনা লোক গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

থমথম করছে ঘর। কেউ কোনও আনন্দ করছে না। এই শোকের ছায়ার মধ্যে কী করে বিয়ে হবে?

প্রীতি আমার হাত চেপে ধরে বলল, এসো উপল।

আমি বললাম, কেউ উলু দিল না প্রীতি, শাঁখ বাজল না।

প্রীতি আমাকে টেবিলের সামনে নিয়ে গেল। ম্যারেজ রেজিস্টার আঙুল দিয়ে ফর্মে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এইখানে সই করুন।

একদম সময় লাগল না। আমি আর প্রীতি সই করার পর রুমা, প্রীতির ভূতপূর্ব প্রেমিক আর অচেনা লোকটা সই করল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তার খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠল। চলে গেল।

প্রীতি তার ঘোরানো চেয়ারে বসে আছে। নতমুখ। কালো আঙুরের থোপায় ঘিরে আছে মুখখানা। হঠাৎ ও একটু কেঁপে উঠল। চাপা কান্নার একটা অস্ফুট শব্দ কানে এল। ঘরের মাঝখান থেকে আমি ছুটে ওর কাছে যাওয়ার জন্য এগোতেই মাঝখানে রুমা এসে দাঁড়াল।

উপলবাবু! ওকে এখন আর ডিস্টার্ব করবেন না।

ডিস্টার্ব!— আমি ভীষণ অবাক হয়ে বলি, ডিস্টার্ব মানে? ও আমার বউ। আমার বউ কাঁদছে কেন সেটা আমার জানা দরকার।

রুমার দু' পাশে প্রীতির প্রাক্তন প্রেমিক আর অচেনা লোকটাও এসে দাঁড়াল। করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে প্রেমিকটি বলল, সে তো ঠিকই উপলবাবু। ও তো চিরকালের মতোই আপনার হয়ে গেল। এখন ওকে একটু রেস্ট নিতে দিন।

তীব্র আকুলতায় আমি বললাম, আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। আমার বউ কাঁদছে।

রুমা অত্যন্ত উদাস গলায় বলল, উপলবাবু, এখনও ও কেবলমাত্র কাগজের বউ। সেটাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

ভীষণ অবাক হয়ে বলি, কাগজের বউ! তার মানে?

কাগজে সই করা বউ।— রুমা নিষ্ঠুর গলায় বলে, তার বেশি নয়।

আমি গাড়লের মতো তাকিয়ে থাকি। তিনজন মানুষ আমার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওপাশে প্রীতি তার টেবিলে মাথা রেখে কাঁদে অঝোরে।

প্রীতি!— আমি প্রাণপণে ডাকি।

প্রীতি উত্তর দেয় না। কাঁদতে থাকে।

প্রেমিক আমার হাত ধরে বলে, ইমোশনাল হবেন না উপলবাবু। এখন আপনার অনেক দায়িত্ব।

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিকই তো। আমি বিয়ে করেছি, দায়িত্ব হওয়ারই কথা।

প্রাক্তন প্রেমিক মাথা নেড়ে বলে, সেইজন্যই তো বলছি। দেয়ার আর মাচ টু বি ডান। এখন আপনার প্রথম কাজ সুবিনয়বাবুকে খবরটা পৌঁছে দেওয়া। ওকে জানিয়ে দেবেন, প্রীতির সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। এ কাজটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট উপলবাবু।

আমি বুঝতে পারি না। সব ধোঁয়াটে লাগে। তবু মাথা ঝাঁকাই। চিরকাল লোকে আমাকে এটা-সেটা ভালমন্দ কাজ করতে বলেছে। আমি করে গেছি।

প্রাক্তন প্রেমিক বলল, কেন ইম্পট্যার্ন্ট জানেন? সুবিনয়বাবুর পাগলামি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে গেছে। উনি সব সময়ে প্রীতিকে গার্ড দিচ্ছেন। অথচ পরশুদিন প্রীতিকে ফ্লাই করতেই হবে।

পরশুদিন!— আমি চমকে উঠে বলি।

পরশুদিন রবিবার। প্রীতির প্যাসেজ বুকড হয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আজ কী বার?

শুক্রবার।— উপলবাবু, শুনুন, সুবিনয়বাবুকে বলবেন, প্রীতির সঙ্গে কোনও রকম ঝামেলা করলে আমরা পুলিশের প্রোটেকশন নেব। প্রীতি এখন একজনের লিগাল ওয়াইফ।

একজনের নয়। আমি মাথা নাড়ি। 'একজন' কথাটা আমার পছন্দ হয় না। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলি, প্রীতি আমার বউ।

পেপার ওয়াইফ।— রুমা তীব্র গলায় বলল।

না না।— প্রেমিক বলে ওঠে, উপলবাবু ঠিকই বলছেন। প্রীতি এখন উপলবাবুরই স্ত্রী।

প্রীতি টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। অঝোর কান্না। আমার বুকের মধ্যে ঢেউ দুলে ওঠে। আমার সামনে তিনজন মানুষ দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি বলি, একবার আপনারা আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। ও আমার বউ। আমার বউ কাঁদছে।

প্রাক্তন প্রেমিক বলে, ওকে কাঁদতে দিন। ও আনন্দে কাঁদছে। এবার কাজের কথা শুনুন উপলবাবু, সুবিনয়কে আপনি এই ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা দেখাবেন। ফেস হিম লাইক এ হিরো। মনে রাখবেন, আপনি আপনার স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য লড়ছেন।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলি, বুঝেছি। সুবিনয় কিছু করবে না। ও আমাকে ভয় পায়।

বলে আমি হাসতে থাকি।

প্রাক্তন প্রেমিক বলে, সেটা আমরা জানি উপলবাবু। সুবিনয় আপনাকে ভয় পায়। কারণ, আপনি ওর অনেক গোপন কথা জানেন। আর ঠিক সেই কারণেই আপনাকে এ কাজের জন্য চুজ করা হয়েছে।

চুজ করা হয়েছে!— আমি বাতাস গিলে বলি, তার মানে?

স্লিপ অফ টাং মাই ডিয়ার।— প্রাক্তন প্রেমিক একটু হেসে বলল, ডোন্ট মাইন্ড। কাজের কথাটা শুনে নিন। আপনি সুবিনয়কে আরও বলবেন যে, প্রীতি পরশু দিন আমেরিকা যাচ্ছে না। তার বদলে আপনি কাল প্রীতিকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছেন। কুলু ভ্যালিতে।

কুলু ভ্যালি?

কুলু ভ্যালি। সুবিনয়কে মিসলিড করবেন। ও আপনাকে ফলো করার চেষ্টা করবে। যদি করে তো আপনি কলকাতা থেকে দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রীতির রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত সুবিনয়ের কলকাতায় থাকাটা নিরাপদ নয়। হি ইজ ডেঞ্জারাস।

আমি মাথা নাড়লাম। প্রাক্তন প্রেমিক এক বান্ডিল নোট বের করে আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, ফর দি এক্সপেনসেস, ফাইভ থাউজেন্ড।

অবাক হয়ে বলি, টাকা! টাকা কেন? আমি আমার স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য কাজ করব, আপনি টাকা দেবেন কেন?

কাগজের বউ।— রুমা বলল।

না না।— প্রেমিক বাধা দিয়ে বলে, আপনার বউ তো ঠিকই। কিন্তু টাকার তো দরকার হতে পারে। কিপ ইট অ্যাজ এ গিফট।

ইতস্তত করি। টাকা! কত টাকা! টাকা কি দুনিয়ায় সত্যিই সস্তা হয়ে গেল? আজকাল আমি পাশ ফিরলেও টাকা আসে। গোছা গোছা হ্যান্ডবিলের মতো টাকা।

প্রাক্তন প্রেমিক আমার পিঠে হাত রেখে দরজার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। আমি জেদ্দির মতো দাঁড়াই।

প্রীতি মুখ তুলছে। চোখ মুছল। তারপর তাকাল আমার দিকে। দুই চোখ লাল। মুখখানা রুদ্ধ আবেগে ফেটে পড়ছে। ওর ঠোঁট নড়ল। কিছু বলল কি? কিছু শোনা গেল না। কিন্তু বুঝতে পারি, ও বলল, বেচারা!

প্রাক্তন প্রেমিকের হাত ছাড়িয়ে আমি প্রীতির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, প্রীতিসোনা, আমি তোমার জন্য সব করব। ভেবো না।

আমি প্রীতির দিকে এগিয়ে যাই। প্রীতি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি, প্রীতি, বউ আমার!

চকিত পায়ে রুমা রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। কঠিন গলায় বলে, উপলবাবু, প্রীতিকে একা থাকতে দিন।

অসম্ভব রাগে আমার শরীর স্টার্ট নেওয়া মোটরগাড়ির মতো গর্জন করতে থাকে। আমি বলি, সরে যান!

রুমা তার স্যাশ করার প্রিয় ভঙ্গিতে হাতখানা ওপরে তোলে। বলে, নট এ স্টেপ ফারদার।

অভিজ্ঞতা-বলে আমি কুঁকড়ে যাই। ডালমিয়া পার্কের সেই স্মৃতি দগদগ করে ওঠে পুরনো ব্যথার মতো। প্রাক্তন প্রেমিক এসে আমার হাত ধরে সান্ত্বনার গলায় বলে, আগে কাজ তারপর সব কিছু। প্রীতি আপনারই রইল। এখন ওকে বিপদ থেকে বাঁচানোটা আগে দরকার।

আমি মাথা নাড়ি। তারপর প্রাক্তন প্রেমিকের কানে কানে বলি, এর আগে আমার কখনও বিয়ে হয়নি, জানেন! আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে।

প্রাক্তন প্রেমিক আমাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। বলে, জানি। আপনি বড় ভাল লোক। পৃথিবীর শেষ কয়েকটা ভাল লোকের মধ্যে আপনি একজন।

সুবিনয় মুখ তুলে আমাকে দেখল। নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সারা ঘরে বিদেহী আত্মার মতো অ্যালকোহলের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরটা আবছা, অস্পষ্ট।

আমি কাঁপা গলায় ডাকি, সুবিনয়!

ইঁয়াপ বাডি।— বলে সুবিনয় হেঁচকি তোলে।

আমার কিছু কথা আছে।

কলকল করে গেলাসে মদ ঢালবার শব্দ হয়। খস করে ওঠে দেশলাই। একটু আলো জ্বলে নিবে যায়।

সুবিনয় বলে, উপল, আমার কিছুতেই নেশা হচ্ছে না। সকাল থেকে একটানা খাচ্ছি। তবু কেন নেশা হচ্ছে না বল তো!

সুবিনয়, আমার কথাটা খুব জরুরি।

কী কথা?

আমি প্রীতিকে বিয়ে করেছি।

সুবিনয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাত্র। তার সিগারেটের আগুন তেজি হয়ে মিইয়ে যায়। গেলাস টেবিলে রাখার শব্দ হয়।

সুবিনয় বলে, কংগ্র্যাচুলেশনস।

ঠাট্টা নয় সুবিনয়, প্রীতি আমার বউ। মাই লিগাল ওয়াইফ। এই দ্যাখ সার্টিফিকেট।

সুবিনয় হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নেয়। দেখে। তারপর সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বলে, ড্যাম ফুল।

কে?

সুবিনয় আবছায়ার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকাল। গাঢ় স্বরে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি? ইউ আর ফ্রেমড।

তার মানে?

সুবিনয় মাথা নেড়ে একটু হাসে। বলে, ইটস এ পেপার ম্যারেজ বাডি। এ পেপার ম্যারেজ। অ্যান্ড ইউ আর দ্য স্কেপগোট।

মাথাটা ঝিম করে ওঠে। তবু আমি যথাসাধ্য দৃঢ় গলায় বলি, না সুবিনয়, প্রীতি আমাকে ভালবাসে। ও সিঁদুর পরবে, শাঁখা পরবে। আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে।

জলপ্রপাতের মতো সুবিনয়ের হাসি ঝরে পড়তে থাকে। ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, যা, এটাকে বাঁধিয়ে রাখিস।

আমি পাকানো কাগজটা খুলে সমান করতে করতে বলি, প্রীতি এখন আমার বউ সুবিনয়, তুই ডিস্টার্ব করবি না।

সোফায় চিতপাত হয়ে শুয়ে সুবিনয় বলে, করব না উপল। বোস।

আমি বসি।

সুবিনয় উদাস গলায় বলে, প্রীতি পরশুদিন যাচ্ছে তা হলে?

না না। আমরা কাল হানিমুনে যাচ্ছি। কুলু ভ্যালিতে। মুখস্থ বলে যাই।

ও হাসে, বলে, আই ক্যান স্মেল দ্য ট্রুথ বাডি। ডোন্ট টেল লাইজ।

আমি ভয় পাই। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ঘামতে থাকি।

সুবিনয় উঠে বসে। বলে, উপল, এ সব ছেলেমানুষি চালাকি ও করছে কেন? কোনও লাভ নেই।

আমি ইচ্ছে করলেই ওর যাওয়া আটকে দিতে পারি। ওর প্রেমিককে ছ'মাসের জন্য হাসপাতালে পাঠাতে পারি।

আমার শরীরে একটা মোটরগাড়ি হঠাৎ স্টার্ট নেয়। গরগর করে গর্জন করতে থাকে রাগ।

চাপা গলায় বলি, সুবিনয়! সাবধান।

সুবিনয় বলে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আমার সব স্বাভাবিক বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। আমি এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাই। বলি, প্রীতি সম্পর্কে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না আর। শি ইজ মাই ওয়াইফ।

সুবিনয় একটা হেঁচকি তুলে হেসে ওঠে।

আমি বিনা দ্বিধায় ওর মুখের দিকে লাথি চালিয়ে বলি, স্কাউন্ড্রেল।

লাথি লাগল জুতোসুদ্ধ। সুবিনয় একটা ওঁক শব্দ করে দু'হাতে থুতনি চেপে ধরল। দ্বিতীয় লাথিটা লাগল ওর মাথায়। টলে সোফায় পড়ে গেল সুবিনয়। আমি বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে দু' হাতের থাবায় ওর গলার নলি আঁকড়ে ধরে বলি, মেরে ফেলব কুকুর। মেরে ফেলব।

আমার দাঁতে দাঁতে এত জোর ঘষা লাগে যে, গম পেষাইয়ের শব্দ হতে থাকে।

সুবিনয় চোখ চেয়ে খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখল।

আমি আমার সর্বস্ব শক্তি দিয়ে ওর গলায় আঙুল বসিয়ে দিচ্ছি। মস্ত মোটা গর্দান, প্রচণ্ড মাংসপেশি। তবু আমার তো কিছু করতে হবে। প্রাণপণে ওর গলা টিপে বলি, মরে যা! মরে যা! মরে যা।

সুবিনয় বাধা দিল না। শুধু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

আমি কার্পেটের ওপর হড়াস করে পড়ে গেলাম।

আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে সুবিনয় তার মদের গেলাস তুলে নিয়ে বলল, তুই কত বোকা উপল। তুই বুঝিসনি, ওরা তোকে আমার হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।

আস্তে আস্তে আমি উঠে বসি। মাথাটা ঘুরছে। আমি অনেকক্ষণ কিছু খাইনি।

সুবিনয় আমাকে দেখল। মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু প্রীতির জন্য তোকে আমি মারব না উপল। প্রীতি ইজ নট মাই প্রবলেম। আমি জানতে চাই, তুই ক্ষণাকে কী করেছিস।

আমি কষ্টে মুখোমুখি সোফায় উঠে বসি। শরীরে রাগ ছেড়ে যাওয়ার পর গভীর অবসাদ। মাথাটা চেপে ধরে বললাম, আমি কিছু করিনি সুবিনয়। তুই যা করতে বলেছিস।

সুবিনয় গেলাসে মদ ঢালে। ফের সিগারেট ধরায়।

উপল।

উঁ।

ক্ষণা নষ্ট হয়ে গেছে। থরোলি স্পয়েল্ট।

বলে সুবিনয় আমার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে ভয়, ঘৃণা, বিস্ময়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে আর-একটু তীব্র স্বরে বলল, ডেমন! শয়তান! ক্ষণাকে তুই কী করেছিস?

আমার সমস্ত শরীর সেই স্বরে কেঁপে ওঠে। মুখে জবাব আসে না।

সুবিনয় তার বিশাল চেহারা নিয়ে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ওকে বড় ভয়ংকর দেখাতে থাকে। আমি কুঁকড়ে বসে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকি।

ক্ষণা সম্পূর্ণভাবে আমার ছিল। আমি যা চাইতাম ও তাই করত। যেমনভাবে চলতে বলতাম তেমনি চলত। কখনও এতটুকু অবাধ্য ছিল না। আমার দিকে যখন তাকাত তখন ওর চোখে একটা আলো দেখা দিত। বড় সুন্দর আলো। পৃথিবীতে আমি ছাড়া কোনও পুরুষকে ও কোনও দিন ভাল করে লক্ষও করেনি। কিন্তু কাল রাতে ও আমাকে দেখে ভয়ে আতঙ্কে নীলবর্ণ হয়ে গেল। কাছে এল না। চোখে চোখ রাখল না। বার বার আমার চোখ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল। কী করেছিস উপল?

আমি মার ঠেকানোর জন্য দুটো হাত তুলে বলি, সুবিনয়, দ্যাখ।
সুবিনয় এক পা এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে, কী দেখব?
আমি হাঁ করে আমার মুখের ভিতরটা দেখতে ওকে ইঙ্গিত করি। ও দেখে, তারপর বলে, কী?
দেখলি না?
না। কী দেখাচ্ছিস হাঁ করে?
শ্বাস ফেলে বলি, বিশ্বরূপ। অর্জুন দেখেছিল। তুইও দেখলে দেখতে পেতিস, যা হওয়ার তা হয়ে আছে। আমি নিমিত্তমাত্র।
সুবিনয় দুই হাতের চাপে মদের গেলাসটা ভেঙে ফেলল। তীব্র বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আমাকে বলল, তুই ক্ষণাকে কীরকম বিশ্বরূপ দেখিয়েছিস উপল? ওকে কী করে নষ্ট করলি?
আমি কী করব সুবিনয়? আমাকে দিয়ে করিয়েছিস তুই।
সুবিনয় মাথা নাড়ল, ক্ষণা কী করে নষ্ট হতে পারে? কী করে আমাকে ছেড়ে ও তোকে ভালবাসে উপল? ইজ ইট পসিবল?
কাছে এগিয়ে এসে সুবিনয় আমার বুকের জামাটা ধরে টেনে তোলে আমাকে। তারপর হেঁচড়ে নিয়ে যায় আলোর কাছে। ভাল করে দেখে আমাকে। মৃদু সাপের মতো হিসহিসে স্বরে বলে. কী আছে তোর মধ্যে? কী দেখেছিল ক্ষণা? টেল মি বাস্টার্ড, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু হার?
আমার জামার কলার এঁটে বসে গেছে। দম নেওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করি। সুবিনয় আমার চোখের ভিতর দিয়ে আমার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করে। বলে, কী করেছিস তুই আমার ক্ষণাকে? কেন ক্ষণা আর আমাকে ভালবাসে না? বল। বল।
আমাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেয় সুবিনয়। আমি দাঁড়াই। ঠিক তৎক্ষণাৎ সুবিনয়ের ঘুসি এসে লাগে আমার মুখে।
সমস্ত চেতনায় ঝিঁঝি ডেকে ওঠে। অতল অন্ধকারে পড়ে যেতে থাকি। শুনতে পাই এক ঘ্যাঙানে ভিখিরির স্বরে সুবিনয় বলছে, ফিরিয়ে দে। ফিরিয়ে দে ক্ষণাকে।

সারা শরীর ব্যথা-বেদনার ডুবজলে ডুবে আছে। মাথাটা ফাঁকা, ভার। কঁকিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করি। হাত বাড়িয়ে একটা রেলিং-এর থাম হাতে পাই। ধরি। চোখে ভাল ঠাহর হয় না। ঝাপসা বুঝতে পারি, দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে অনেক ওপরে। ওখান থেকে গড়িয়ে পড়েছি এত দূরে।
সিঁড়িটা আমার দিকে চেয়ে আছে। করুণ চোখে বলে দিচ্ছে, যা দিয়ে নামা যায় তা-ই দিয়েই ওঠা যায়। কিন্তু তুমি আর সিঁড়ি বেয়ে উঠো না উপলভায়া। এই আশ্রয়টাও তুমি হারালে।
সিঁড়ির দিকে চেয়ে আমি মাথা নাড়ি; বুঝেছি।
কাঁকালটা চেপে ধরে অষ্টাবক্রের মতো বেরিয়ে আসি রাস্তায়। ফাঁকা আকাশ, খোলা হাওয়া। এখন এ ছাড়া আমার আর কী রইল? বড় ভাল লাগল দুনিয়াটাকে।
কিন্তু বিবেকশালা কি ছাড়ে? পিছু থেকে এসে কানে কানে বলে দেয়, আছে হে। এখনও অনেক আছে।
পকেটে হাত দিই। ট্যাঁকে হাত দিই। হাজার হাজার টাকা খচমচ করে ওঠে।
বিবেক বলে, একটা ট্যাক্সি করো হে উপলচন্দোর। ওড়াও।
জিভটা কেটে দু'আধখানা হয়ে গেছে প্রায়। জমাট রক্ত থুঃ করে ফেলি। কপালের দু'ধারে দুটো আলু উঠেছে। চোখ ফুলে ঢোল। পাঁজরায় খিঁচ ধরে আছে। ঘাড় শক্ত। হাতের পায়ের জোড়ে সাড় নেই।
কাটা জিভটা নেড়ে বড় কষ্টে বলি, সবাই বড় মারে বিবেকবাবা।
সামনে একটা ট্যাক্সি থামে। উঠে পড়ি। ট্যাক্সিওলা সন্দেহের চোখে এক বার, দু' বার তাকায় আমার দিকে। ভয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকি। যদি এই মার-খাওয়া চেহারা দেখে নিতে না চায়।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে, আমার পকেটে অফুরন্ত টাকা আছে। অনেক টাকা। ব্যক্তিত্ব এসে যায়। আত্মবিশ্বাস আসতে থাকে। গম্ভীর মুখ করে বলি, মধু গুপ্ত লেন চলুন।

মধু গুপ্ত লেন-এর সমীর আর তার সাঙাতরা দিনরাত আমার পথ চেয়ে আছে। ওরা আশায় আশায় পথে পায়চারি করছিল। ট্যাক্সি থামতেই ছুটে এল রুস্তমরা।

আমি টাকা মুঠো করে জানালার বাইরে হাত বাড়াই। কাটা জিভে বড় কষ্টে বলি, কেতকীকে ছেড়ে দেবেন।

এক রুস্তম জানালায় ঝুঁকে পড়ে বলে, আপনি কেতকীকে নেবেন? বলুন, তুলে এনে গাড়িতে ভরে দিই।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমার বউ আছে। আমি বউয়ের কাছে যাব।

আগের দিনের সেই ছেলেটা গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বলে, কোন বাঞ্চোত আপনার গায়ে হাত তুলেছে বলুন তো? শুধু ঠিকানা বলে দিন, খবর হয়ে যাবে।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমি সবাইকে ক্ষমা করেছি। আমি আমার বউয়ের কাছে যাব এখন। আমার ব্যথার জায়গাগুলোয় সে হাত বুলিয়ে দেবে। আমি ঘুমিয়ে পড়ব। অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে ঘুমোব।

ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আমি বড় রাস্তায় চলে আসি। চার দিকে রাত আটটার কলকাতা ডগমগ করছে। বড় ভাল লাগে। যেন এক অনন্ত উৎসব চলেছে। সুখী মানুষরা জড়ো হয়েছে দোকানে দোকানে, সিনেমায়, রাস্তায়।

কাটা জিভ নেড়ে বলি, মানুষকে আরও সুখী করতে চাই আমি বিবেকবাবা। আজ রাতে আমি আমার বউয়ের কাছে যাব তো! আজ সবাই সুখী হোক। আশীর্বাদ করুক।

আমার বিবেক তার বাদ্যযন্ত্রে একটা পিড়িং শব্দ তুলে বলে, এখনও অনেক টাকা রয়ে গেল তোমার উপলচন্দোর। তুমি যে হ্যান্ডবিলের মতো টাকা ওড়াতে চেয়েছিলে।

ঠিক। ঠিক।— আমি মাথা নাড়ি।

এক মুঠো টাকা বান্ডিল থেকে খুলে এনে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিই বাইরে। ঠিক অবিকল হ্যান্ডবিলের মতো বাতাসের ঝটকায় টাকা উড়ে যায়। ঘুড়ির মতো লাট খায় শূন্যে। তারপব আলোকিত রাস্তা-ঘাট আর মানুষজনের ওপর নেমে আসে।

পিছনের কাচ দিয়ে আমি ঘুরে দেখি। মানুষজন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দৌড়োচ্ছে টাকার দিকে। চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে নেমে পড়ছে রাশি রাশি মানুষ। একটা লোক চলন্ত গাড়ির নীচে চলে গেল টাকা কুড়োতে গিয়ে।

আর-এক মুঠো উড়িয়ে দিই। দেখি। দোকান ছেড়ে নেমে আসছে দোকানি। হাড়কাটা গলির ভাড়াটে মেয়েরা খদ্দের ভুলে পিল পিল করে রঙিন মুখ আর তেল-সিঁদুরের ছোপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একটা ঠ্যাং-ভাঙা লোক টানা রিকশায় বসে মেডিকেল কলেজে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ দু' পায়ে লাফ মারল রাস্তায়।

বউবাজারের মোড় পেরিয়ে আর-এক মুঠো ওড়াই।

ট্যাক্সিওলা ট্যাক্সি থামিয়ে বলে, কী হচ্ছে বলুন তো পিছনে?

কিছু না। আপনি চলুন।

ট্যাক্সিওলা আবার গাড়ি ছাড়ে। আমি টাকা ওড়াতে থাকি। আমার পিছু পিছু কলকাতা পাগল হতে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ ডিউটি ভুলে লাফিয়ে পড়ে রাস্তায়। সিনেমা ভেঙে যায়। দোকানে-বাজারে ঝাঁপ পড়তে থাকে। দাঙ্গা লেগে যায়। ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হতে থাকে। একটা কালো পুলিশের গাড়ি ধেয়ে আসতে থাকে আমার দিকে। আমি পাত্তা দিই না। চৌরঙ্গির মোড়ে আমি মহানন্দে টাকা ছড়াই।

টাকা ওড়ে। লাট খায়। পড়ে।

আমি মুগ্ধ চোখে দেখি। ঠিক এইরকম ভাবে আমি টাকাকে দেখতে চেয়েছি বরাবর। সস্তা, সহজ, প্রচুর। দেখতে দেখতে এত মোহিত হয়ে যাই যে, আমার কিছু খেয়াল থাকে না। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে কখন। পুলিশের গাড়ি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সিপাইজিরা যখন ধরাধরি করে গাড়িতে তুলছিল তখন কেবল আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলছিলাম, ছেড়ে দাও আমাকে। আমার বউ বসে আছে আমার জন্য। আমি তার কাছে যাব।

পিস্তলওলা এক পুলিশ সাহেব বলল, এত কালো টাকা আমি কখনও দেখিনি।

আমার ক'মাসের মেয়াদ হয়েছিল আমি জানি না। যখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রায় পড়ছিলেন তখন আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

কম্বলে শুয়ে আমার গায়ে বড় চুলকুনি হয়েছে, তাই খুব চুলকোচ্ছিলামও। রায় পড়া হয়ে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে আটকে রাখল।

তারপর ছেড়েও দিল একদিন।

কোনও মানে হয় না। খামোকা এই আটকে রাখা আর ছেড়ে দেওয়া।

বেরিয়ে এসে পৃথিবীর রাস্তাঘাট কিছু অচেনা ঠেকছিল, আর-একটা লোকও ছাড়া পেয়ে সঙ্গে নিয়েছিল। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, শালারা বোকা।

কারা?

ওই যারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল। বুঝলে! আসলে খুনটা আমিই করেছিলাম। বদ্যিনাথ নয়। তা বদ্যিনাথের যাবজ্জীবন হল, আমার ছ' মাস।

বলে খুব হাসল লোকটা। বলল, কালীমায়ের থানে একটা পুজো দিই গে। তারপর গঙ্গাস্নান করে সোজা বাড়ি। তুমি কোন দিকে?

বেঁটে, কালো, মজবুত চেহারার লোকটার দিকে চেয়ে থাকি। তারপর বলি, আমার রাস্তাঘাট সব গুলিয়ে গেছে। ঠিক চিনতে পারছি না। আমি আমার বউয়ের কাছে যাব।

তা আর ভাবনা কী। চলো একসঙ্গে যাই। একদিন-না-একদিন ঠিক বউ এসে জুটবে তোমার।

আমি মাথা নেড়ে তার সঙ্গ ধরলাম।

লোকটা পুজো দিল, গঙ্গাস্নান করল। তারপর আমাকে নিয়ে কালীঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ধরল। ফের শিয়ালদায় এসে ট্রেন পালটে আর-এক ট্রেন। লোকটা যায়। আমিও যাই। বরাবরই দেখেছি একবার বেরিয়ে পড়লে কেউ-না-কেউ জুটে যাবেই।

পলাশি স্টেশনে নেমে অনেকখানি মাঠঘাট, খানাখন্দ পেরিয়ে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে বলি, ওহে বাপু, বড় যে নিয়ে যাচ্ছ, খুব খাটাবে নাকি?

লোকটা ভালমানুষি ঝেড়ে ফেলে বলে, তার মানে? কালীঘাটে খাওয়ালুম, এতগুলো গাড়িভাড়া গুনলুম, সে কি এমনি এমনি নাকি? মুখ দেখব বলে তো নয়। একটু ছিটেল লোক আছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু বসে খাওয়া আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। গতরখাস হয়ে বসে থাকলে ঠ্যাঙানি খাবে।

এরকমই সব হওয়ার কথা। একটা শ্বাস ফেলি। ভাবি, একদিন রাস্তাঘাট যখন সব ভেসে উঠবে চোখের সামনে, সেদিন দুনিয়ার সুন্দর একটা সহজ রাস্তা ধরে আমি যাব আমার বউয়ের কাছে। তত দিন একটু অপেক্ষা। মাথাটা পরিষ্কার হোক।

লোকটার কাজ বড় কম ছিল না। দু'বিঘে একটা চাষের জমি কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে ভেজাতে হয়। বড় কষ্ট। আগাছা সাফ করি। উঠোন ঝাঁটাই। গোরুর জাবনা দিই। সারা দিন আর সময় হয়ে ওঠে না—

রাত্রিবেলা সব দিন ঘুম আসে না। বিছানা ছেড়ে উঠে চলে আসি খোলা হাওয়ায়, মাঠের মধ্যে। চার দিকে মস্ত আকাশ, পায়ের নীচে মস্ত মাটি। এই আকাশ গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে। এই মাটি চলে গেছে বরাবর সব মানুষের পায়ের নীচ দিয়ে। যোগ রেখেছে সকলের সঙ্গে সকলের। ভাবতে বড় ভাল লাগে।

এক-একদিন বুড়ো বিবেক এসে পাশে বসে। বলে, উপলচন্দোর, তোমাকে একটু দুঃখের গান শোনাতে ইচ্ছে করছে।

শোনাও।

কিন্তু গান গাইতে গেলেই বিবেকের বড় কাশি উঠে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর শোনাতে পারে না। হাঁপিয়ে উঠে বলে, কী কাণ্ড! ওঃ, কেতকীর বিয়েতে খুব খাইয়েছিল হে উপলচন্দোর। খুব। কুমড়োর একটা ছক্কা যা করেছিল!

কেতকী কি কেঁদেছিল বিবেকবাবা?

তা কাঁদবে না? মেয়েরা শ্বশুরঘরে যাওয়ার সময়ে কত কাঁদে।

কিন্তু আমার জন্যও তার কাঁদবার কথা ছিল যে!

বিবেক বলে, তা সে এক কান্নার মধ্যেই মানুষের কত কান্না মিলেমিশে থাকে। আলাদা করে কি বোঝা যায় কার জন্য কোন হিক্কাটা তুলল। তবে তোমার মাসিকে একবার বলেছিল বটে, পিসি, উপলদা এল না। তার জন্যই আমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে। সে কথা থাক উপলচন্দোর। তোমাকে বরং কুমড়োর ছক্কাটার কথা বলি, কী ভুরভুরে ঘিয়ের বাস, গরম মশলার সে যে কী প্রাণকাড়া গন্ধ, কাবলি ছোলা দিয়েছিল তার মধ্যে আবার।

সুবিনয় কি ক্ষণার সঙ্গে ঘর করে বিবেকবাবা?

বিবেক ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, খুব করে, খুব করে। সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তারা এখন খুব সিনেমা-থিয়েটারে যায়। আর সময় পেলেই তোমার খুব নিন্দে করে বসে বসে।

বিবেকবাবা, প্রীতির কথা কিছু জানো?

সে আর জানা শক্ত কী! আমেরিকায় গিয়ে তোমার নামে ডিভোর্সের মামলা দায়ের করল। তুমি তখন জেলে। একতরফা ডিক্রি পেয়ে তার সেই ভাবের লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। পাঁচ হাজার টাকা কি তোমাকে এমনি এমনি দিয়েছিল বাপু? তবে মাঝে মাঝে বলে বটে, উপলটা বড্ড বেচারা!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি।

বিবেক আমার দিকে চায়। বলে, আরও খবর চাও নাকি? সেই যে পৈলেন ট্রেন থেকে পড়ে গেল। মনে আছে? সে কিন্তু মরেনি। এক ঠ্যাং কাটা গেছে, সে এখন ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি করে বেচে। হাজু আর কদম এখনও ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াচ্ছে। সেই মানিক সাহা সুন্দরবনে একা থাকে, এক নৌকোয় চাকরি পেয়েছে। বড় আনন্দে আছে। আরও শুনবে?

মাথা নেড়ে বলি, না বিবেকবাবা।

বিবেক বলে, আমিও তাই বলি। শুনে কাজ কী উপলচন্দোর? ও সব তো তোমার সমস্যা নয়। তোমার সমস্যা তুমি নিজেই। তাই বরং তোমাকে কুমড়োর ছক্কার গল্পটা বলি, আচ্ছা, না হয় কেতকীর বিয়েতে যে রসকদম্ব খাইয়েছিল সেটার কথা শোনো। সে রসকদম্বের কোনও জুড়ি নেই—

আমি ঘুমিয়ে পড়ি শুনতে শুনতে। বিবেক বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

আর তখন সেই অন্ধকার, একা মাঠের মধ্যে হঠাৎ চিড়িক করে ডেকে ওঠে মেঠো ছুঁচো, ইঁদুর, কীটপতঙ্গেরা, চার দিকে তাদের ডাক বেজে ওঠে। পরস্পরকে ডেকে জাগিয়ে তোলে তারা।

আমিও জাগি। বসে থাকি চুপ করে। আস্তে আস্তে আমার পেটের মধ্যে জেগে ওঠে ভূতের মতো খিদে। ক্যানসারের মতো, কুষ্ঠের মতো দুরারোগ্য খিদে। জেগে টের পাই, পৃথিবী জুড়ে খিদে

জাগে, ঘুম ভেঙে যায় ইঁদুরের, মানুষের, কীট ও পতঙ্গের।

শেষরাতে চাঁদ উঠে আসে আকাশে। চেয়ে থাকি। ইঁদুরেরাও চায়। বলি, বড় খিদে পায়।

বিদ্যুৎবেগে আমার সেই কথা চলে যায় দিকবিদিকে। সারা দেশ ও বিদেশ জুড়ে পশু পাখি ও মানুষের অনেক স্বর বলে ওঠে, আমাদের হৃদয়ের কোনও সমস্যা নেই। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রেম-ভালবাসা নেই। শুধু খিদে পায়। বড় খিদে পায়।

শূন্যের উদ্যান

গেরো! শালার মিছিল!

গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এ রাস্তায় গাড়ি যাবে না দাদা।

পিছনের সিটে মুখে উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে চশমা-পরা মোটাসোটা গোলগাল যুবকটি। মুখে ঘেমো ভাব। চশমাখানা পিছলে নাকের ডগার দিকে নেমে এসেছে। খুবই বোকাটে আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। ফরসা মুখখানায় লালচে আভা। মানুষের যে কত রকমের বিপদ আছে! এ ছেলেটার কীরকম বিপদ কে জানে! গৌরহরি অতশত জানে না। জানার দরকারই বা কী! সব মানুষই চলেছে নিজের গলির গলিপথে। সে সব প্রাইভেট গলিপথ। সব মানুষের জীবনই প্রাইভেট গলিপথ, সেখানে গৌরহরির ট্যাক্সি ঢোকে না।

ছেলেটা বলল, তাহলে কী হবে! আমার যে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

দেখছেন তো মিছিল! এর ল্যাজা মুড়ো কোথায় কে জানে! সামনেটা হয়তো কলেজ স্ট্রিট পেরোচ্ছে, পিছনটা বোধহয় শ্যামবাজারের পাঁচমাথা পেরোয়নি।

কিন্তু আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার!

গৌরহরি বিড়বিড় করে আপনমনে হিন্দিতে বলে, তব ক্যা করুঁ! উড়কে যাঁউ!

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে, দেখুন যদি গাড়িটা ঘোরাতে পারেন। সারকুলার রোড দিয়ে আরও নর্থে গেলে বোধহয় মিছিলটা এড়ানো যাবে।

গ্রে স্ট্রিটে এখন গায়ে গায়ে গাড়ি জমে আছে। ভিড়ের মধ্যে বদ ছোকরারা যেমন মেয়েদের গায়ে গা ঘষে সেরকমই গা ঘষটাচ্ছে গাড়ি। একটা লম্বা প্লিমাউথ গৌরহরির ট্যাক্সির ডানদিকে এসে দাঁড়াল, দরজা খোলারও জায়গা রইল না।

এই প্রাইভেট!—গৌরহরি চেঁচাল, এটা কী হচ্ছে অ্যাঁ! এটা কী ধরনের ইন্টারফিয়ারেন্স!

ইংরিজি শব্দটা গৌরহরি উচ্চারণ করল ঠিক যেমন ঢাকার ইংলিশ স্কুল সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর ফাদার ইভান্স উচ্চারণ করত। আজও যখন গৌরহরি মাঝেমধ্যে এক আধটা ইংরিজি বলে তখন সমঝদার মানুষ তাকে একটু চেয়ে দেখে। এ সব উচ্চারণ সেই ইংলিশ স্কুলে শেখা, পাক্কা সাহেবদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর শেষ ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছয়নি গৌরহরি। পর পর দু'বছর টাইফয়েড আর পোলিও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। টাইফয়েড নিয়েছিল গৌরহরির মগজটাকে, পোলিও নিল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা। এখনও উত্তেজিত হলে গৌরহরির মাথার মধ্যে কেমন ঝমঝম একটা শব্দ হয়। পাগল-পাগল লাগে। টাইফয়েডের পর সে যখনই বইপত্র নিয়ে পড়তে বসেছে, তখনই কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পর মাথায় কোথাকার কোন সাজঘর থেকে দু'খানা নূপুর-পরা পা তার মাথার মঞ্চে চলে আসত নাচতে নাচতে। কীরকম রিমঝিম শব্দ হতে থাকত। তখন গৌরহরি প্রায়ই সেই শব্দে সম্মোহিত হয়ে বসে থাকত, চোখের সামনের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠত এক শূন্যতার দৃশ্য। আর কেবল সেই শব্দ আর শব্দ। রিমঝিম রিমঝিম, দু'খানা নাচের পা ঘুরছে, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিচ্ছে গুলিয়ে। সেই শব্দে তার সব বোধ ডুবে যেত। তার বাবা বগলাপতি ডাকসাইটে ব্যবসাদার, টিকাটুলিতে সাহেবের বাড়ির মতো বাড়ি করেছিলেন। সব ছেলেকে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন, এরকম সংকল্প ছিল তাঁর। বড় দুই ছেলে সেন্ট

অ্যান্টনিজ পার হল, কিন্তু গৌর পারল না। গিরি ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার, কলকাতার স্পেশালিস্ট, কেউই সেই শব্দটাকে বন্ধ করতে পারল না। বগলাপতি আপনমনে অনেক গাল দিলেন ছেলেকে, ডাক্তারদের এবং নিজের ভাগ্যকে। অবশেষে স্কুল ছাড়িয়ে গৌরহরিকে অসাধ্যসাধন থেকে মুক্তি দিলেন। বাড়িতে মাস্টারের কাছে গৌর পড়ত একটু-আধটু। পড়ার কোনও চাপ দেওয়া হত না। পরের বছরই পোলিও। আবার দীর্ঘকাল বিছানা নিতে হল তাকে। অনেক চিকিৎসার পর মেহের কালীবাড়ি থেকে এক তান্ত্রিক এসে বলল, সারিয়ে দিতে পারি, তবে খুঁত থেকে যাবে। থাক খুঁত, সারাও। কীসে সেরেছিল কে জানে। তবে সেরেছিল ঠিকই। কেবল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে রইল। অবশ্য সে দুটো একেবারে অকেজো নয়। একটু কমজোরি, এই যা। নইলে গৌরহরি তাদের দিয়ে সব কাজই করিয়ে নেয়। মেয়েমানুষকে আদর করা পর্যন্ত।

গৌরহরির ইংরিজি কথাটা শুনে প্লিমাউথের জানালা দিয়ে কালো চশমাপরা একজোড়া চোখ তাকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। প্লিমাউথের জন্যই জ্যাম হয়ে গেল রাস্তাটা। ঘোরানোর জায়গা নেই। একটু পিছু হটবার চেষ্টা করল সে, পিঁ পিঁ করে অমনি পিছন থেকে আর্তনাদ করল একটা ফিয়াট। গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে বলল, দেখছেন তো গাড্ডা! ডানদিকের প্রাইভেটটাই ঝামেলা করেছে। এ জট ছাড়াতে এখন কত সময় লাগে কে জানে!

ছেলেটা চশমা-জোড়া ঠেলে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল টালমাটাল। বলল, নেমে যদি মিছিলটা ক্রস করে ওপাশ থেকে ট্যাক্সি ধরতে পারি তবে বোধহয়—

তাই করুন।

মিছিলটা কি খুব বড় মনে হচ্ছে?

গৌরহরি হাসে, ভুখা মানুষ, বেকার মানুষ সমস্ত দেশে ভর্তি। তা মিছিল তো একটু বড় হবেই। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন না, ল্যাজ দেখা যাচ্ছে কি না।

ছেলেটা দরজা খুলে নেমে একটু এগিয়েই ফিরে এল, ও বাব্বাঃ, ওদিকটা লালে লাল। আরও মাইল খানেক আছে বোধহয়।

এই বলে ছেলেটা মিটার দেখে পয়সা দিয়ে দেয়। গৌর বলে, মিছিলটা ক্রস করতে পারবেন তো?

বলে কয়ে চলে যাব। আমার বড় জরুরি দরকার। ওরা দেবে না ক্রস করতে?

তাই দেয়? পেরোতে গেলে ঝাড় লাগাবে।

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে, তাহলে?

গৌর হাসে, লাইনে ঢুকে মিছিলে শামিল হয়ে যান। কয়েক পা হেঁটে দু'-একটা স্লোগান ঝেড়ে লাইন পালটে ওপাশের লাইনে চলে যাবেন। আবার স্লোগান ঝাড়বেন কয়েকটা, তারপর টুক করে কেটে পড়বেন। মিছিল ক্রস করার ওই হচ্ছে কায়দা।

ছেলেটা চলে গেল। ওই রকম গোল চশমা-পরা মোটাসোটা বোকাটে ছেলে এ যুগে অচল। ভাবে গৌর, আর হাসে। বলতে কী, একসময়ে সবাই মনে করেছিল যে গৌরহরিও অচল। এ সংসারে দুটো শুখো হাত-পা আর মগজে নাচের শব্দ নিয়ে কিছুতেই বেশিদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। বগলাপতি তাই ভাবতেন আর বিড়বিড় করে গাল দিতেন। মুখটা বড় খারাপ বগলাপতির। ছেলেদেরও শালা-শোরের বাচ্চা বলতে আটকায় না। তা গৌরহরি ছিল তাঁর ছেলেদের মধ্যে একেবারে অচল মুদ্রা। বড় দুই ছেলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে পাস করল, তারপর গেল কলকাতা, তারপর গেল বিলেত। তৃতীয় গৌরহরি হয়ে রইল অর্ধেক তৈরি করা পুতুলের মতো। যেন বা কোনও কারিগর গড়তে গড়তে হঠাৎ হাত থামিয়ে উঠে গেছে, তাই গৌরহরির মূর্তিখানা আর শেষ হয়নি।

বগলাপতি দেশভাগের সময়ে বিস্তর বুক চাপড়ে ভিতরে ভিতরে মাল পাচার করলেন

কলকাতায়। তখনও দুই ছেলে বিলেত থেকে ফেরেনি। কেবল অপদার্থ গৌরহরি তাঁর সহায়-সম্বল। বগলাপতি একা-একাই অতবড় ব্যাবসা গোটালেন বিড়বিড় করতে করতে। বউ আর আধা-ফিনিশ ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। একটা বাড়ি কিনলেন বালিগঞ্জে গোপনে। আর প্রকাশ্যে খানিকটা জায়গা দখল করলেন যাদবপুরে রিফিউজি কলোনিতে। সে সময়ে খবর এল, তাঁর বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সে আর ফিরবে না। বগলাপতি ভয়ংকর ভেঙে পড়লেন। গৌরহরি তখন যুবাপুরুষ, কিন্তু অপদার্থ। তবু হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ছেলে। বগলাপতি বরাবরই গৌরকে একটু বিশ্রী প্রশ্রয় দিতেন, সে অসুস্থ এবং নিরীহ বলে। বড় ছেলের খবর পেয়ে তিনি আরও আঁকড়ে ধরলেন গৌরকে। কিন্তু গৌর তো অপদার্থ, হাফ-ফিনিশ। চলে-ফেরে, খায়-দায়, কথা বলে, কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, তার দ্বারা কিছু হবে। বগলাপতিরও হল না। তিনি বড় ছেলেকে চিঠি লিখলেন, বিধিমতো মেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস। তোমার আবার বিবাহ দিব। উত্তরে ছেলে লিখল, তা সম্ভব নয়। আমার আশা ত্যাগ করুন। তখন থেকেই গৌর জানে, সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। বগলাপতি তাকে গড়িয়াহাটায় একটা দোকান করে বসিয়ে দিলেন। গৌরহরি দোকান করতে লাগল। বিক্রিবাটা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঝামেলা হত দিনের শেষে, যখন দোকান বন্ধ করে গৌর হিসেব করতে বসত। হিসেবের অঙ্ক তার কাছে বরাবরই ভয়াবহ। কাজেই টাকা-আনার হিসেব শুরু করলেই সে স্পষ্ট টের পেত তার মাথার মধ্যে সেই অনভিপ্রেত নর্তকী তার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝমঝম করে, এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। বগলাপতি আবার চিন্তায় পড়লেন। গৌরকে ডেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, কী করবি গৌরা? কী করতে তোর ইচ্ছে করে? বসে বসে তো আর খেতে পারবি না, পাঁচভূতে লুটে খাবে। একটা কিছু কর।

গৌর খুব ভাবত। কিন্তু ভেবে কিছু পেত না। বস্তুত তার মাত্র দু'-একটা বিষয়ই প্রিয় ছিল। ময়দানে ফুটবল খেলা দেখা, সিনেমা আর ঘুম। এইসব, আর চিন্তাভাবনাহীন, উদ্বেগহীন হালকা দিন-কাটানো। কোনও কাজের কথা ভাবলেই তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করত, আমি ব্যাটা হাফ-ফিনিশ, ফিফটি পারসেন্ট মানুষ, আমি শালা কী করব?

কিন্তু তারপরও একটা কয়লার ডিপো তাকে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বগলাপতি। সেটা ফেল মারল তো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন এদিক ওদিক। বগলাপতির ব্যাবসা ছিল নানারকম জটিল-কুটিল পথে, সেগুলো বোঝবার মতো চিন্তাশক্তি গৌরের ছিল না। বগলাপতি ক্রমেই হতাশ হতে হতে একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, যাঃ শুয়োরের বাচ্চা, কিছুই যখন পারবি না, তখন যা, গিয়ে ড্রাইভারি শেখ। শিখে আমার গাড়ি চালাবি। প্রতি মাসে কেন পরের ছেলেকে দেড়শো টাকা করে ধরে দিই! অর্থাৎ সোজা কথা, বগলাপতি ছেলের বসে খাওয়া সইতে পারতেন না। কিছু না পারো তো বাপের সোফারি কর।

পুরনো একখানা ডজ গাড়ি ছিল তাদের। সেটা চালাত হরিপদ। রোগাটোগা ভালমানুষ ছেলেটা। হাফ-ফিনিশ গৌরহরি গাড়ি চালানো শিখবে জেনে সেও খানিকটা হাঁ করে রইল। বলল, গাড়ির যে অনেক ব্যাপার রে! ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসেলেটার, গিয়ার, স্টিয়ারিং, তুই সব সামলাতে পারবি?

গৌরহরি উদাস গলায় বলল, তা আমি কী করব? আমি কি চেয়েছি শিখতে? বগলু ছাড়ছে না যে!

আড়ালে-আবডালে গৌরহরি বাপকে আদর করে বগলু বলে উল্লেখ করত। ফলে কতবার বকুনি খেয়েছে।

তারপর বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, অর্থাৎ বগলুর পোলা গৌরা পুরনো আমলের ডজ গাড়িতে ভালমানুষ হরিপদর পাশে বসে অবরে সবরে গাড়ি চালানো শিখত কলকাতার নির্জন রাস্তা-ঘাটে।

আরে বাঃ! প্রথম দিনেই ভাল লেগে গেল গৌরহরির। গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলো খুব একটা জটিল

না তো। কিংবা হয়তো জটিলই, কিন্তু তার কাছে এই প্রথম একটা কাজ এল যে কাজ তার 'পারব না' বলে মনে হ'ল না। ব্যাপারটা এরকমই হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে অপদার্থ লোকটারও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য মাফিক কাজ আছে, সেটা খুঁজে পেলে বিস্তর বখেরা চুকে যায়। গৌরহরি তার দুটো রুখো-শুখো হাত-পা আর মগজের ঝমঝম নিয়েও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সেঁধিয়ে গেল। কেমন যেন নেশা পেয়ে বসল তাকে। একমাসে সে গড়-গড় করে গাড়ি চালাতে লাগল। পিছনের সিটে বসে তার কান্ড দেখে বগলাপতি হেসে খুন, আরে বাঞ্চোত, খুব শিখেছে তো! অ্যাঁ! আরে বাঃ! এ যে মোলায়েম ব্রেক মারে! ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে বাঁক নেয়! অ্যাঁ! এ যে দিব্যি স্পিডও মারছে!

বাবা আর মাকে কয়েকদিন সে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, পানিহাটি ঘুরিয়ে আনল। মাস চারেক পর হরিপদকে বিদায় দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে হরিপদ আড়ালে ডেকে বলল, ছোটবাবু, তুমি মাইরি এক নম্বরের টিকরমবাজ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তোমার মতো হাফ-ফিনিশ লোক ব্যাপারটা কোনওকালে শিখতে পারবে। ভাবলে কি শেখাতুম! ঠিক গোলেমেলে হরিবোল করে দিতুম।

ডানদিকে প্লিমাউথ, পিছনে ফিয়াট, বাঁদিকে পার্ক করা কয়েকটা অ্যামবাসাডার, সামনে মিছিল, বিচিত্র গাড্ডা। ভিতরে বসে বাতাসহীনতায় ঘামতে লাগল গৌরহরি। ছেলেটা নেমে যাওয়ার পর সে লাল শালুর টুকরোটা দিয়ে মিটার ঢেকেছে। এখন নো সোয়ারি বিজনেস। বগলাপতির ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা কি কারও সার্ভেন্ট? ইজ হি? এই বলে গৌর গাড়ির ছোট চৌকো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। সদ্বংশের ছেলেদের মুখে কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। তার মুখেও আছে। এই যেমন তার কপালখানা, কেমন গড়ানে, মাঝখানে মাথার চুল ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে। কিংবা, যেমন তার দু'খানা কান, দুটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তির কানের মতো ভারী ভারী বড় লতিতে কানদুটো বাহারে দেখায়। নাকখানাও চোখা। আর কিছু লক্ষ করার মতো নেই অবশ্য। গাল ভাঙা চোয়াড়ে চেহারা, গালে কয়েকদিনের দাড়ি। রুখু চুল। একটু গোঁফ আছে গৌরের। সেখানে আজকাল চিকমিকে দু'-একটা পাকা রোঁয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শালা প্রাইভেটটা যদি ডানদিকে না থাকত তবে এতক্ষণে দাশ কেবিনে গিয়ে টিফিন করত গৌরহরি। সে ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এখন গৌরবাবুর টিফিন টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। গৌরবাবুর খিদে পেয়েছে আর এ শালারা রাস্তা আটকে এ সব কী টিকরমবাজি শুরু করেছে! অ্যাঁ! গৌরবাবুর খিদে পায় না নাকি? ডানদিকের ওই শালা প্রাইভেটটা! কালো চশমা-পরা লোকটা থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিমোচ্ছে। খিদে পেলে গৌরের ঘুম আসে। বাবুদের বাড়ির ছেলে, খিদে তেষ্টা সে একদম সইতে পারে না। সে হল গে টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা, খিদে তেষ্টা সইতে নারে—ছা-রা-রা-রা-রা, গুনগুন করে গান গাইল গৌর। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল দিল দুনিয়ার সব প্রাইভেটদের, আর মিছিল করা যাবতীয় ভুখ্‌খা পার্টির লোকদের। গৌরবাবুর গাড়ি আটকে শালাদের যত আশনাই!

একটা টেরিলিন পরা লোক জানালায় ঝুঁকে বলল, গাড়ি যাবে নাকি?

কোথা দিয়ে যাবে দাদা? উড়ে?

মিছিল তো শেষ হয়ে এল। রাধা সিনেমার কাছে পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওই তো শেষ।

গাড়ি যাবে না দাদা, আমার টিফিন হয়নি।

লোকটা একটু শ্বাস ফেলে বলে, আপনি মালিক, আপনার দয়া।

বলে সরে গেল।

মালিক! আলবত মালিক। গৌরবাবুর টিফিন হয়নি আর গাড়ি যাবে বললেই যাবে! কে না জানে বিশ্বসংসারে যে, বিকেল সাড়ে চারটেয় চা না পেলে গৌরবাবুর ঘুম পায়! স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা ঝুঁকে আসে! তখন নিজেকে কত কাকুতি মিনতি করে গৌর, ওঠো গৌরবাবু, ওঠো, অমন হেঁদিয়ে

পড়লে কি চলে? ওঠো বাবা, গৌর, ওঠো। চোখ মেলে তাকাও তো বাপধন। নইলে যে কখন লাল আলো পেরিয়ে যাবে। কোন গাড়ির পিছনে ভিড়িয়ে দেবে, আর ধরবে এসে পুলুসবাবা। ওঠো হে বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি। জেগে থাকো হে বগলুর ছাওয়াল,

তবু শালার ঘুম পায়! আড়মোড়া আসে। দাশ কেবিনের চা কড়া, গৌরের চা আরও কড়া করে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে বিস্তর কাঁচা লঙ্কার কুঁচি মেশানো রগরগে গরম অমলেট আর টোস্ট। শালার টোস্টে মাখনের বদলে লাড লাগানো। এইসব খায় গৌর, আর বলে, খেয়ে নে বাবা গৌর, এই শেষ খাওয়া রে। এই অমলেট ভেজেছে মবিল অয়েলে, পাউরুটিতে চর্বি, আর শুকনো চোতরাপাতার ক্বাথ দিয়ে হয়েছে এই চায়ের লিকার, আফিমের জল মিশিয়ে। খেয়ে নে বাবা গৌর, তোর শেষ খাওয়া।

তারপর রুমালে মুখ মুছে মৌরি চিবিয়ে আবার নিজেকে বলে, না বে, মরবি না। তোর ঠাকুদ্দা খেত মুক্তাভস্ম, তোর বাবা খেত স্বর্ণসিন্দুর, তোরা রুপোর গেলাসে জল খেয়ে বড় হয়েছিস। বিস্তর সোনারুপো মুক্তো হজম করা পেট তোর, সেই পেটের কী করবে রে শালার চোতরাপাতার ক্বাথ, কিংবা চর্বি, কিংবা মবিল অয়েল? সব হজ্‌মে দে শালা, সব হজ্‌মে দে, যা খাবি সব হজ্‌মে দিয়ে বসে থাকবি, কেউ যদি এসে 'বাতাপী' বলে ডাক দেয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই, বাতাপী আর বেরোবে না।

মিছিলের লেজ ভেসে যাচ্ছে। পিছনে পুলিশের কালো গাড়ি। তারপর রাস্তা ক্লিয়ার। স্টার্ট, গৌরবাবু। মাথাটা সত্যিই ঘুমে ভরে আসছে। ঘুম যেন ঠিক জলের মতো, টল টল করে আর তার মধ্যে নানা টুকরো-টাকরা স্বপ্ন মাছের মতো ঘাই মারে। যখন এরকম হয় তখনই গৌরহরির সামনে উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। গৌর দেখে, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশটা বুড়িগঙ্গার ধারের সেই কামানটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কখনও বা হঠাৎ গৌর আচমকা ব্রেক চেপে ধরে বলে, আরে সাবাস, এখানকার রাস্তাটা কেটে কবে খাল বানিয়েছে শালারা! তারপর চোখ কচলে দেখে, কোথায় খাল, রাস্তাই তো! কিংবা কখনও বা দেখে সামনের রাস্তায় অনেক রঙিন বল ভাসছে, লোকজন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা হঠাৎ যেতে যেতে আকাশমুখো খাড়া উঠে গেছে। ঘুম পেলে গৌরহরির এরকম সব হয়। তখনই দাশ কেবিনের সেই চোতরাপাতার ক্বাথ না হলে, ওরা কি বাস্তবিক আফিঙের জল মেশায় নাকি! নইলে গৌরের এরকম হবে কেন? কলকাতার যেখানেই থাকুক গৌর, একটা না একটা সময়ে, প্রায়ই বিকেলের দিকে ওই অদ্ভুত ঝিমুনি আসতে থাকে তার। আর এলেই পাগলের মতো সে লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ভোঁ ভোঁ করে চালিয়ে দেয় দাশ কেবিনের দিকে। পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দাশ কেবিন।

ও বাবা পুলুস, ও পুলুসবাবা!—গৌর নরম গলায় বিড়বিড় করে ডাকে, হাতটা একনাগাড়ে তুলে রাখলে যে ভেরে যাবে বাবা। হাতটা একটু নামাও। আমরাও তো যাব বলেই রাস্তায় বেরিয়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পিছনখানা দেখলে তো চলবে না বাবা, গৌরবাবু যে এখনও চা খায়নি, তার যে টিফিন টাইম, রাস্তাটা একটু ছাড়ো বাবা পুলিশ।

অবশেষে ট্রাফিক পুলিশ হাত নামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুলে দেয়।

আই বাবা পুলুস, তোমার পায়ে পায়ে দণ্ডবৎ। দরগায় শিন্নি, বাবার গির্জেয় মোমবাতি, এই মৌতাতটার সময়ে আর আটকে রেখে মেরো না।

এই ট্যাক্সি!

গেরোর পর গেরো। শালা সার্জেন্ট।

গৌর গাড়ি থামায়। কোমরে পিস্তল-ওলা সার্জেন্টটা এগিয়ে আসে। খামোকা হাত বাড়িয়ে বলে, লাইসেন্স দেখি।

এসব ফালতু বদমাইশি।

কী করতে হবে স্যার, বলুন না।

সার্জেন্টটা ধমক দেয়, বদমাইশির আর জায়গা পান না! শিগগির ওই লাল কাপড় খুলুন। এই ভদ্রলোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সির জন্য। শিগগির খুলুন।

খুলছি পুলুসবাবা, খুলছি। কিন্তু আমার যে টিফিন হয়নি। মিছিলের হুজ্জতে হড়কে গেছে টিফিন টাইম। গৌরবাবু যে হেঁদিয়ে পড়ছে বাবা পুলুস!

গৌর বিড়বিড় করে লাল কাপড় খুলে নেয়। বুড়োমতো লোকটা সবিনয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ঢোকে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সার্জেন্টকে বলে, ধন্যবাদ, আপনি না থাকলে কিছুতেই ট্যাক্সি পেতাম না। সবেতে লাল কাপড়। নয়তো মিটার ডাউন। আচ্ছা চলি।

সার্জেন্টটা হাসে তৃপ্তির হাসি। জানালায় ঝুঁকে গৌরকে বলে, ঠিকমতো নিয়ে যাবেন। রাস্তায় যেন আবার ব্রেকডাউন না হয়। আমি কিন্তু নম্বর টুকে রেখেছি।

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, শালার পুলুস যেন না ছোঁয় গৌরবাবুকে। নিয়ে যাবে, পুলুসবাবা, ঠিক নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেন কেমন রাস্তাগুলো খালের মতো লাগে, ঢাকার কামানটা এসে বসে থাকে চৌরাস্তায়, রঙিন বল ভাসে বাতাসে, মানুষগুলো উড়তে থাকে, রাস্তা উঠে যায় আকাশমুখে খাড়া হয়ে, গৌরবাবুর চায়ের টাইম যে হড়কে গেছে বাবা!

কোথায় যাবেন?

পি জি।—বুড়োটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, তবু ভাল, দক্ষিণে। যদি উত্তরে হত। আর যদি দাশ কেবিন থেকে আরও দূরে কোনও গাড্ডায় বেঘোরে নিয়ে ফেলত বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরিকে. বগলুর পোলা গৌরাকে!

রাস্তাগুলো এমন সব জলে ডোবা, আবছা আবছা, রঙিন রঙিন গোলার মতো বল ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢাকার সেই কামান। চৌরঙ্গির ট্রাফিক পুলিশ আড়বাঁশিতে পূরবী ধরেছে, দুটো পা কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণের কায়দায় ক্রস করা, চারপাশে মুগ্ধ গাভীর মতো ভিড় করে এগিয়ে আসছে গাড়ির পর গাড়ি, গৌর চোখ মুছে নেয়। কোথায় যেন যাচ্ছে সে? ওঃ হ্যাঁ, পি জি। পিছনের সিটে বুড়োটা আছে তো ঠিকমতো? বুড়ো মানুষদের বিশ্বাস কী! কখন আছে, কখন নেই। সার্জেন্টটা নম্বর টুকে রেখেছে।

গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আপনি ঠিক আছেন তো স্যার? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে!—বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে, কীসের অসুবিধে!

গৌর ভারী মুশকিলে পড়ে। সত্যিই তো, অসুবিধে কীসের! ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদি; চারদিকে শরতের রোদ মজা বিউটিফুল বিকেল, চৌরঙ্গির মতো জায়গা দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, তবে আর অসুবিধে কীসের? অসুবিধে যা, তা তো গৌরের। এই শালা রিয়্যালিটির সঙ্গে কে যেন স্বপ্নের ভেজাল দিয়ে দিচ্ছে, চামচে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে এমন যে আর আলাদা করা যাচ্ছে না, কোনটা শালার রিয়্যালিটি, আর কোনটা ড্রিম।

সে একটু আমতা আমতা করে বলে, অসুবিধে আর কী! আপনার বয়সটাই যা একটু গোলমেলে। এই বয়সে বুঝলেন. যখন তখন যা তা হয়ে যেতে পারে।

কী রকম!

গৌর একটু ইতস্তত করে বলে, এই কয়দিন আগেও আপনার মতো এক বুড়ো মানুষকে তুলেছিলুম। মাঝরাস্তায় ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ঘাড় লটকে নেতিয়ে আছে। থ্রম্বসিস। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হল, তাই বলছিলুম কোনও অসুবিধে ফিল করলে বলবেন।

পিঁ, পিঁ, প্যাঁ, প্যাঁ গাভীর ডাক। চলো বাবা গৌর, পুলুসবাবা হাত দেখাচ্ছে। চোখে সবুজ মারছে

ট্র্যাফিকের আলো। চলো হে বগলাপতির ব্যাটা পি জি। মনে থাকে যেন সার্জেন্ট শালা নম্বর টুকে রেখেছে, দেবে'খন ঠুকে!

কোথায় যেন যাবেন স্যার!

বললাম যে পি জি!

আই। ঠিক। পি জি। চলো বাবা গৌর। বুড়োর গল্পটা সে সম্পূর্ণ বানিয়ে বলল। এমনিই। আসলে বুড়োটাকে সাবধান করে দিল, যেন তার গাড়িতে বসে হঠাৎ বুড়োর মরার শখ না হয়।

যখন কখনও গৌরহরি একা একা তার ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকে, প্রায়ই দুপুরের দিকে হঠাৎ হঠাৎ তার কেমন অদ্ভুত ব্যাপার সব মনে হয়। মনে হয় পিছনের সিটে একটা মৃতদেহ বসে আছে। মাঝেমধ্যে অনেক রাতে নাইট শো-র ট্রিপ মেরে গ্যারাজ করার সময়ে তার সুস্পষ্ট মনে হয় রাস্তার টালে গাড়ি লাফিয়ে উঠতেই লাগেজ বুটে কী যেন নড়ল। সে যেন এক মৃত মানুষের শরীর। কে যেন কখন অলক্ষিতে মালটি তার ঘাড়ে পাচার করে গেছে। কত দিন এমন হয়েছে। গৌর গাড়ি থামিয়ে সত্যিই লাগেজ বুট খুলে দেশলাই জ্বেলে খুঁজে দেখেছে। খুঁজেছে পিছনের সিটে, মেঝেয়। কোথাও কিছু নেই। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে কি নিশুত রাত্রে গাড়ি চালাতে চালাতে তার এই রকম আজও মনে হয়। একটা মৃত লোক বসে আছে পিছনের সিটে ঘাড় লটকে, লটপট করছে দুলুনিতে। কিংবা কারা লোড করে দিয়ে গেছে লাগেজ বুটে হাত পা বাঁধা ডেডবডি। তখন যে মৌতাতের সময় তা নয়। এমনিতেই সহজ স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে পিছনের সিট। গাড়ি থামিয়ে খুঁজে এসেছে লাগেজ বুট।

তাই গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে গৌর। বুড়োটা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। খুব বুড়ো নয় লোকটা, তবু মরার কি কোনও বয়স আছে? মরলেই হল।

গৌর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, পি জি-তে কী ব্যাপার স্যার! কারও অসুখ?

আমার মেয়ে। ডেলিভারি কেস।

বাঃ বাঃ। কী হল! নাতি না নাতনি?

হয়নি। আজকালের মধ্যেই হওয়ার কথা। পেইন উঠেছে কাল বিকেল থেকে।

আজকালকার বাচ্চা তো! জন্মের আগে থেকেই জ্বালাতে শুরু করে, শেষ জীবন তক জ্বালায়।

আসলে এসব কথার কোনও মানে নেই। খামোখা বলে যাচ্ছে গৌরহরি। তার সন্দেহ, বুড়ো মানুষটা যদি হঠাৎ টেঁসে যায় স্ট্রোক-ফোক হয়ে, আর সে হয়তো টেরও পেল না, ওদিকে সার্জেন্টের কাছে তার নম্বর টোকা, তাই কথায় কথায় সে বুড়ো মানুষটার বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে।

গাড়িটা সে কিনেছিল এক পাঁইয়ার কাছ থেকে। সেই পাঁইয়ার কাছেই গাড়িটার দোষ ধরেছিল। কোনও অপঘাত ঘটেছিল গাড়ির মধ্যেই। তারপর থেকেই এ গাড়িতে একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। কেবলই ওই মৃতদেহ টের পায় গৌর। শালার পাঁইয়া পোড়ো গাড়ি ঠকিয়ে বেচে গেল ন' হাজারে, কিনল বগলুর পোলা গৌরা।

ডজটা পেলে এসব ঝামেলা হত না। সেটাতেই সে শিখেছিল গাড়ি চালানো।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর বাবা বগলাপতি ছেলে গৌরহরিকে দেড়শো টাকায় সোফার রাখলেন। গৌর আপত্তি করল, হরিপদ তো রাত্রে থাকত না। আর আমি চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভার।

শালার টনটনে বুদ্ধি দেখ! আচ্ছা যা, একশো পঁচাত্তর পাবি, তার বেশি কিছুতেই না। বলেছিলেন বগলাপতি, বগলু, গৌরের বাবা।

গৌর একশো পঁচাত্তর পেত, প্লাস খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, ঘরদোর। মা কেবল দুঃখ করে বলত, এ রকম কাণ্ড জম্মে শুনিনি, ছেলে নাকি বাবার চাকরি করে।

বাবা বগলাপতি বলত, তবুও তো বাবার চাকরি করে। তাতে মানসম্মানের হানি হয় না। যা

ছেলের সুরত তোমার, অন্য জায়গায় হলে কী কান্ড যে হত!

তা গৌর গাড়ি চালাত। বাবাকে নিয়ে যেত এখানে সেখানে। ব্যাবসাপত্রের নানা ধান্ধায় ঘুরতেন বাবা। আস্তে আস্তে জমিয়ে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন, তোর হাতে গাড়ি থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বেশ তো চালাস রে! অ্যাঁ! বেশ তো হাত তোর! দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস কলকাতার রাস্তাঘাটে। অ্যাঁ! পাকা হয়ে গেছিস বেশ।

এ সবই গ্যাস। গৌরহরি বুঝত। কেননা পিছনের সিটে বসে বাবা বিস্তর টাকাপয়সার লেনদেন করতেন নানা পার্টির সঙ্গে। গোছা গোছা নোট বেহাত হত। আসত তার বাবার পোর্টমান্টোতে। খুশি হত গৌর। বড়দা কেটেছে। এখন যা আসবে একদিন তার অর্ধেক বখরা পাবে সে, যদি না ইতিমধ্যে মেজদাও কাটে। গৌর সেইসব টাকাপয়সার হিসেব বুঝত না। কিন্তু ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে টাকার ছবি সে দেখেছে বিস্তর। বাবা বগলাপতি সেটা বুঝতে পেরে গৌরকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গৌর তখন টাকা চিনেছে। অঙ্কের হিসেব না বুঝলেও এটুকু জানা ছিল যে টাকা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়। টাকার শক্তি অসম্ভব।

তাই সে মাঝে মাঝে বাপ বগলাপতির দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসত। একটু টেরছা হাসিটি, চোখদুটি মিটমিট করত, গরগরে একটা শব্দ হত গলায়। এইসব দেখে বগলাপতি সাবধান হয়ে যেতেন। বলতেন, এ সবই তো তোদের জন্য। বড়দা উচ্ছন্নে গেল, এখন তোদের দুটোকে যদি একটু রেখেটেখে যেতে পারি।

গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্টর বগলাপতি। তখন বিস্তর বালি মেশাচ্ছেন সিমেন্টে। না মিশিয়ে উপায়ও নেই। গভর্নমেন্টের লোকেদের খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুই থাকে না প্রায়। বগলাপতি ব্যাবসা জানতেন হাতের উলটোপিঠের মতো। কলকাতার বাজার ছিল নখদর্পণে। কোন মালের কত স্টক আছে বাজারে, কতদিনের মধ্যে সেই মালের চালান আর আসবে না,এসবই প্রাচীন কবিরাজের নাড়িজ্ঞানের মতো টনটনে ছিল তাঁর। একবার ইচ্ছে করেই একটা মালের টেন্ডারে উঁচু রেট দিলেন। তারপর বাজারের সব মাল কিনে মজুত করলেন গুদামে। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আপনমনে। আয়নায় গৌরহরি সেই হাসি দেখত। মাঝে মাঝে আপনমনে বলতেন, বুঝলি গৌর, মালটা বছর খানেকের মধ্যে আর আসছে না বাজারে। গৌরকে সম্বোধন করে বলা, কিন্তু আসলে বলা নিজেকেই। টেন্ডার বগলাপতি পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পেল সে বাজার ঘুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্ট, সিকিউরিটির টাকা জমা দেওয়া আছে, পিছোবার উপায় নেই, ওদিকে মাল নেই এক কণাও। মাল কোথায়! মাল কোথায়! লোকটা যখন পাগল পাগল, ঠিক সেই সময় বগলাপতি তার কাঁধে হাত রাখলেন, আছে, মাল আছে। তবে লোকসানে তো দিতে পারি না। এই আমার রেট। বলে রেট দেখালেন। লোকটা ডজ গাড়ির পিছনের সিটে বসে বগলাপতির পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলল, দাদা, আর একটু কমান। আমি যে গভর্নমেন্টকে ওর চেয়ে চার আনা কম রেট দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট, এত লস হলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাব। বগলাপতি হাসেন, তবু তো জেল থেকে বাঁচবে। অবশেষে বগলাপতি রেট কমিয়েছিলেন। লোকটা প্রতি ইউনিটে দু'পয়সা ক্ষতি করে মাল নিল। বগলাপতি কয়েক লাখ কামালেন। একা একা পিছনের সিটে বসে গৌরকে ডেকে বললেন (আসলে নিজেকেই বলা), বুঝলি গৌরা, বাঘকে যদি ধরতে না পারিস, ঘোগকে ধরিস। বাজারটাকে হাতের মুঠোয় না রাখলে কি ব্যাবসা চলে?

গৌরের মাইনে বেড়ে দুশোয় দাঁড়াল। সে সারাদিন গাড়ি নিয়ে থাকত। ইঞ্জিনটা সে খুব ভাল চিনত, যেমন বাজার চিনতেন বগলাপতি। ইঞ্জিনের একটু সর্দিকাশি, একটু ফ্যাঁস শব্দ থেকেও গৌর তার গোলমাল বুঝে নিত। সারাদিন সে গাড়িখানার পিছনে খাটত। মাটিতে শুয়ে ইঞ্জিনের তদবির করত সারাদিন। গাড়ি ধোয়াত, মুছত। ঝকঝকে রাখত সবকিছু। বগলাপতি দূরে দাঁড়িয়ে খাড়

এধারে ওধারে কাত করে পুরনো গাড়িখানার শোভা দেখতেন। আর বলতেন, বাহাঃ রে গৌর, বাহাঃ! প্রশংসাটুকু খুব উপভোগ করত গৌরহরি। এতদিন বাদে সে এমন একটা কাজ পেয়েছে যে কাজ তার উপযুক্ত। যে কাজ তাকে মানায়। সে তাই জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ওই গাড়িখানার যত চমক-ঠমক ততটাই তার হাতযশ ততটাই তার গুণ। গৌরহরি পুরনো ডজখানাকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে উঠেছিল। সে যখন গাড়ি চালাত তখন মন-প্রাণ দিয়ে। কোনওদিন তাব হাতে গাড়ি ঘষাটাও খায়নি। স্টিয়ারিং-এ বসলেই তার হাত পা মগজ চোখ সব ধীরে ধীরে অধিকার করে নিত গাড়ির যন্ত্রপাতি। সে হয়ে যেত গাড়িটা স্বয়ং। তখন গৌরহবি না গাড়ি, তা বোঝাও যেত না।

তা গৌরহরি মাঝে মাঝে গাড়ি হয়ে যায়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। ভুলেই যায় যে সে গৌরহরি, বগলাপতির ব্যাটা, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা।

বগলাপতি তখন স্টোরিং এজেন্ট। বিস্তর ঝামেলার কাজ। অনেক বখেরা। ঠিকমতো চালাতে পারলে লাভও বিস্তর। বগলাপতির তখন হাই-ব্লাডপ্রেশার। সহায়-সম্বল বলতে হাফ-ফিনিশ গৌরহরি আর কর্মচারীরা। মেজো ছেলে রাখোহরি বিলেতে যা পড়তে গিয়েছিল তা শেষ না করে আর একটা কী পড়তে লেগেছে। আসলে পড়ার নাম করে বাপের পয়সায় ফালতু কিছুদিন বিলেতে থেকে যাওয়া। ইতিমধ্যেই সে টাকার বরাদ্দ কয়েকবার বাড়িয়ে নিয়েছে। ফুর্তি লুটছে খুব। বড় ছেলে থাকোহরি সে সব কথা মাঝে মাঝে জানাত। সে নিজেও ফুর্তি লুটেছিল। তাই রেখে-ঢেকে লিখত। যেটুকু লিখত না বুদ্ধিমান বগলাপতি আন্দাজ করে নিতে পারতেন। গভর্নমেন্টের স্টোরিং এজেন্সি পেয়ে বগলাপতি যখন ফ্যাসাদে পড়লেন তখন বিস্তর পয়সা খরচ করে তার করলেন মেজো ছেলেকে গৌরহরির নামে, ফাদার সিক, কাম শার্প।

রাখোহরি চলে এল। পুরোদস্তুর সাহেব। বিলেতে সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখেছে কয়েক বছর। পাস করেনি, কিন্তু যা পড়েছে তার দাপটেই ম্লান হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বিশাল জাল ছড়াল চারদিকে। আসলে জালটা টাকার। রাখোহরির বুদ্ধিটা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। অমনিতে সে ছিল মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং ছোটখাটোর মধ্যে সুপুরুষ, নেভি ব্লু স্যুট আর বো পরলে তাকে বড় সুন্দর দেখাত। কতবার ফার্পো কি গ্র্যান্ড কি মোকাম্বোর পার্টিতে ডজে চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেছে গৌর। অল্প ক'দিনেই গৌর রাখোহরির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাখোহরির যোগাযোগটা ছিল মিনিস্টার আর সেক্রেটারিদের লেভেল-এ। অল্প কয়েকদিনেই সে এজেন্সির ব্যাপারে বিস্তর সুবিধে আদায় করে নিল। তার পক্ষে এবং পিছনে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে দৈনিক কাজ-কারবার সেইসব ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা ইত্যাদিকে একদম গ্রাহ্য করত না সে। তাদের ওপর দিয়ে চলত। রাখোহরির বিশাল বিশাল লোকের সঙ্গে ভাব দেখে তারাও সহ্য করত মুখ বুজে। বগলাপতির আমলে তারা কিছু পয়সাকড়ি রোজগার করেছিল, রাখোহরির আমলে দেখা দিল উলটো, তাদের চাকরির ভয়। কিংবা বদলির। বগলাপতি রাখোহরিকে বোঝানোর চেষ্টা করত, বাবা, এরা সব খুদে দেবতা, এদেরই সঙ্গে কাজ-কারবার, এদের একেবারে পায়ে ঠেলো না। মিনিস্টার, সেক্রেটারির বদল হয় কিন্তু এদের হয় না। কারবারে ঘুরেফিরে এদের সঙ্গেই দেখা হবে। ছোট মানুষ সব, তোমাকে ভয়ও পায়, কিন্তু জোট বাঁধলে তোমাকে আমাকে দেশছাড়া করবে। রাখোহরি তখন গরম। বাপের টাকায় তখন ব্ল্যাঙ্ক চেক কেটে দেওয়া আছে তার নামে। স্টোরিং-এ বিস্তর ডিমারেজ দেখিয়ে সে মাল পাচার করছে। ইন্সপেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা সবাই হাঁ করে দেখছে। সবাই ওরকম করে, কিন্তু তারা ভাগ পায়, রাখোহরির আমলে তাদের ভাগ নেই। রাখোহরি ফুড স্টোরিং-এর প্রায় একরারনামা পেয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিকরাপশান তার পিছনে ঘোরে, তার নামে রিপোর্টও যায়। কিন্তু তা সব চাপা পড়ে থাকে। বগলাপতি নীরবে একা ঘরে বুক চাপড়ান। রাতারাতি উন্নতি দেখে তিনি ভেঙে পড়েন, আর বলেন, বুঝলি গৌরা, ভিত না গেঁথে বাড়ি উঁচু করার অনেক বিপদ। ভিতটাই যে কাঁচা। এ ছেলেটা যে বোঝেই না দারোগাকে খাতির

করা দরকার। ইন্সপেক্টরকেও পান-তামাক দিতে হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকে এসব শিখেছিলাম। বিপদে-আপদে এরা যে কত কাজে আসে।

রাখোহরি তখন একটার পর একটা কন্ট্রাক্ট নিচ্ছে। প্রায় সবই সরকারি। তখন আলাদা মেজাজে চলে। কিন্তু তখনও ডজ গাড়িটার বশংবদ ড্রাইভার হয়ে পরমানন্দে গাড়িখানা চালায় গৌরহরি। সে উন্নতি ভাল বোঝে না, কেবল আনন্দ বোঝে। রাখোহরি যখন মোকাম্বোর ভিতরে স্বপ্ন-আলোয় নাচে গায়, গ্র্যান্ডে পার্টি দেয়, তখন গৌরহরি সযত্নে পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িখানা বার বার মুছছে আর মুছছে। ওই তার আনন্দ, সুখ, সম্পদ। অল্প একটু মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে রাখোহরি, ইংরিজিতে কথা বলে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে, বিদায় নেয়। গৌরহরি গাড়ির দরজা খুলে ধরে থাকে। সযত্নে গাড়ি চালিয়ে রাখোহরিকে নিয়ে আসে। বগলাপতি জেগে অপেক্ষা করে থাকেন। গৌরহরিকে ডেকে রাখোহরির গতিবিধির খবর নেন, ব্যাবসাপত্রের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করেন। গৌরহরি বুঝতে পারে, একটা গোলমাল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন গোলমাল তা তার মাথায় আসে না, সে যা দেখে তাই বলে দেয় বগলাপতিকে। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন, বড়গাছে নৌকো বাঁধবার চেষ্টা। গৌরা, এবার তোর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হচ্ছে। সবংশে রাখোহরি যদি ডোবায়, তুই কেন মরবি? তুই আলাদা ব্যবস্থা করে নে। তোর জন্যই রাতে আমার ঘুম নেই।

পি জি-তে গাড়ি ঢোকাল না গৌর। বাইরেই ছেড়ে দিল বুড়ো লোকটাকে। লোকটা খুব সাবধানি। ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে নোট বের করল, ঝুলপকেট থেকে খুচরো। যা ভাড়া টায়ে-টায়ে তা-ই দিল, খুচরো ফেরতের কোনও ঝামেলা রাখল না। একজ্যাক্ট ফেয়ার। বাহাঃ রে বাহাঃ!

স্যার, ওই সার্জেন্ট কি আপনার কেউ হয়? হলে নম্বরটা কেটে দিতে বলবেন। আমি তো ঠিকমতোই পৌঁছে দিয়েছি আপনাকে! দিইনি?

বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে, সার্জেন্ট আমার বাবাকেলে আত্মীয় হয় আর কি! নম্বর টুকেছে তো আমি কী করব? তোমাদের বদমাইশি কে না জানে? দেয় যদি ঠুকে তো ঠিকই করবে। উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। লোকে বিপদের সময়ে ট্যাক্সি পায় না, আর তোমরা নানা কাজে ট্যাক্সি ভাড়া খাটাও। গভর্নমেন্টের পুষ্যিপুত্তুর সব!

বুড়োটা বকবক করতে করতে কাটল।

শালা! গৌরবাবুর টিফিন টাইম হড়কে দিয়ে আবার গরম খাওয়া হচ্ছে!

শালার ওই সার্জেন্ট না ধরলে গৌরবাবু কবে পিছলে বেরিয়ে যেত, তখন কী করতে বাবা বুড়ো মাল!

বিড়বিড় করতে করতে গৌরহরি আবার লাল কাপড়ে তার মিটার বাঁধে। একটা মেয়েছেলে দূর থেকে আঙুল দেখাচ্ছে, এই যে, এই ট্যাক্সি!

আর না বাবা। আর না। এবার দাশ কেবিন। সোজা নাক বরাবর। একচুল এধার ওধার হয়েছে তো গৌরহরির নামই গৌরহরি নয়। কারও সার্ভেন্ট নাকি বগলাপতির ছেলে? অ্যাঁ! তোমাদের পকেট গরম বাবা, সে তো বুঝতেই পারছি। মাসের প্রথম দিকটা তো, জানি। কিন্তু বাবা, আমি কারও পয়সায় কেনা চাকর নই। এই ল্যান্ডমাস্টার এখন প্রাইভেট প্রপার্টি। বগলাপতির ডজ গাড়িটার মতো। হ্যাঁ, আলবত, লাল কাপড়ে মিটার ঢাকার পর এখন এটা আমার প্রাইভেট। ফোটো সবাই, ফুটে যাও সব সোয়ারি। গৌরবাবুর টি-পার্টি আছে দাশ কেবিনে। ছাড়ো রাস্তা।

বদর-বদর। দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, বাবা পুলুসে যেন আর না ধরে। পুলুসে ধরলে আঠারো ঘা।... অই দ্যাখো, শালাদের কারবার। রসা রোডটা বেমালুম গায়েব করে দিয়ে নদী বানিয়েছে! কেমন ঢেউ দিচ্ছে দেখো। কেমন কুলকুল শব্দ ঢাকার বুড়িগঙ্গার মতো। দোতলা

একতলা স্টিমলঞ্চ যাতায়াত করছে দিব্যি। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জল-পুলুস। লাল-নীল সবুজ বলগুলো উড়ে আসছে, উঠছে নামছে। দু'-একটা এসে ধীরে ধীরে বসল গৌরবাবুর গাড়ির বনেটে। সেই বুড়ো লোকটা উড়ে আসছে পি জি হাসপাতালের দিক থেকে, চেঁচিয়ে বলছে, এই ট্যাক্সিওলা, আট আনা পয়সা বেশি চলে গেছে ভাড়ার সঙ্গে, পালিয়ো না, নম্বর টোকা আছে, সাবধান!

গৌর চোখ কচলে নেয়, কেমন ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার মধ্যে রিমঝিম শব্দ। ঠাহর করে সে রাস্তাঘাট বুঝবার চেষ্টা করে। নাঃ, রসা বোড রসা রোডের মতোই দেখাচ্ছে আবার। কেবল ওই রঙিন বলগুলো ঝামেলা করছে। উড়ে উড়ে আড়াল করছে উইন্ডস্ক্রিনটা, ওই তো পুলিশটার কাঁধে একটা নীল বল চেপে বসল।

নাঃ, ওটা গ্রিন লাইট। চলো হে গৌরবাবু।

গৌর তার খুদে ল্যান্ডমাস্টার একটা ডবলডেকারের গা ঘেঁষে উড়িয়ে নিল। দাশ কেবিন। আফিং মেশানো চোতরাপাতার ক্বাথ না হলে আর এখন গৌববাবুর নার্ভ কাজই করবে না, পুরোটা ব্রেক ডাউন হয়ে বডি পড়ে যাবে।

গৌর ওড়ে। সত্যিই ওড়ে। তার স্পষ্টই মনে হয়, মাটির ছ' ইঞ্চি ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার গাড়ি, রাস্তার টালগুলো আর চাকায় লাগছে না। ভারী ভাল লাগে গৌরহরির। নিরন্তর রাস্তা আঁকড়ে চলতে কাঁহাতক ভাল লাগে রোজ? মাঝে মাঝে এই উড়ে যাওয়া কীরকম ভাল! গৌর খুশিতে শিস দেয়। তার গাড়ি উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে।

সামনের আয়নাটা ঠিক করে নেয় গৌর। পিছনের ফাঁকা সিটটা নজরে রাখে। শালার ডেডবডিটা আছে ওখানে ঠিকই। কেবল সবসময়ে ওটাকে ঠাহর করা যায় না এই যা। মগন সিং-এর কাছে যখন ছিল তখনই শালা কোনও হুজ্জতে গাড়িটার গ্রহদোষ ঘটে গেছে। সেই অপঘাতের মড়া এখন সবসময়ে বসে আছে পিছনের সিটে। নয়তো নড়ছে লাগেজ বুটে। নড়বি তো নড় শালা, আমার কী! আমি তোরটা খাই, না পরি! আমি হচ্ছি গে বগলাপতির অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা গৌরা। আমি শালা কার সার্ভেন্ট! লাল কাপড়ে মিটার ঢাকলেই এ আমার প্রাইভেট প্রপার্টি। এই দেখ, আমি গৌরা, নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চলেছি দাশ কেবিনে। চা খাব। তুই মরা মানুষ, মরা মানুষের মতো থাকবি, নো ইন্টারফিয়ারেন্স। মড়াদের সঙ্গে জ্যান্তদের নো বিজনেস। মাগনা ট্যাক্সি চড়ছিস, এই ঢের। খবরদার যদি গৌরবাবুকে কখনও ভয় দেখিয়েছিস!

ভবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দাশ কেবিন আর খুব দূরে নয়। তবু, দেয়ার আর মেনি এ স্লিপস, । ফুটপাথে রং-বেরঙের মানুষের ভিড়। খালি ট্যাক্সি দেখলেই শালারা হাত ওঠায়। মোড়ে লালবাতিতে দাঁড়িয়েছ কি, যেতে চাও বা না চাও, দরজা লক করা না থাকলে নিজেরাই খুলে ঢুকে পড়বে। একশো কারণ দেখালেও কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে, বড় দরকার দাদা, একটু কাইন্ড হয়ে নিয়ে যান। বাড়তি পয়সা দেব। দেখছেন তো সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। গৌর খেয়াল করে চলতি গাড়িতেই পিছনের দরজা দুটো হাত বাড়িয়ে লক করে দিল। এখন দাশ কেবিন ছাড়া কোথাও যাবে না গাড়ি। কেবল যদি ধরে বাবা পুলুসে তবে অন্য কথা। পুলিশকে বরাবর ডরায় গৌরহরি, যেমন ডরাত তার বাবা বগলাপতি। কত দারোগা যে তাদের বাড়িতে পাঁঠা খেয়ে ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ করে গেছে। গৃহদেবতার মতো তাদের খাতির ছিল। যেদিন দারোগা খেত, সেদিন বগলাপতির ছিল সকাল থেকে বাঁধা উপোস। সেই সব ভয়-ভীতি থেকেই তাদের উন্নতি। সেটা কোনওকালে বুঝল না রাখোহরি। সে এসে দারোগাদের দাবড়াতে লাগল, ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো ছিল তার ব্যবহার। এই যেমন এখন গৌরহরির গাড়িখানা উড়ছে, ঠিক তেমনই উড়ত রাখোহরি। পুরনো দারোগা সমাদ্দার মাঝে মাঝে বগলাপতির কাছে দুঃখ করে যেত, তোমার ছেলের কাছে আর আমাদের পদমর্যাদা বলে কিছু রইল না হে বগলা। বগলাপতি তাকে হাত কচলে বলতেন, ও আমার ছেলে না। আমার রক্তের ধাতই নয়। ও ব্যাটা পেয়েছে ওর

মামাবাড়ির ধাত। আমার শ্বশুরবাড়িটার ওই দোষেই কিছু হল না। ও শালা ওর মায়ের ছেলে, আমার না।

চুলকে ঘা করা। রাখোহরি তাই করেছিল। তার দূরের খুঁটির জোরে সে আশেপাশের সবাইকে মাটির ঢেলার শামিল করে দিয়েছিল। চুরি-চামারি যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। বাড়িতে এল রেডিয়োগ্রাম, রেফ্রিজারেটার, বগলাপতির ঘরে লাগানো হল এয়ারকুলার। তারপর ডজ গাড়িটা বেচতে চেষ্টা করতে লাগল রাখোহরি।

সেবার উত্তরবাংলায় বন্যার পর স্টোরিং এজেন্টদের খুব রবরবা দেখা দিল। হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত হতে লাগল এজেন্টদের মারফত। রাখোহরির ছোটাছুটি গেল বেড়ে। সে কেবল গুদাম ভাড়া করে, আর মজুত করে মাল। লোডিং আনলোডিং-এর দরুন শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার একটা হিসাব ধরে শস্যের পরিমাণ বাদ দেয় সরকার। ধরে-করে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল রাখোহরি। সেটা ছিল হাতের মুঠোর আইনসঙ্গত ইনকাম। তার ওপর কমিশন আর হ্যান্ডলিং। এইসব নিয়ে রাখোহরি যখন ভীষণ ব্যস্ত তখন একদিন বগলাপতি গৌরহরিকে ডেকে পুরনো ডজ গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সাজ-পোশাক পরে বেরোলেন। গৌরহরি গাড়ি চালিয়ে দিল। না, পুরনো ব্যাবসাপত্রের জায়গায় আর গেলেন না তিনি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি এসে থামল মগন সিং-এর গ্যারেজে। সেইখানেই ল্যান্ডমাস্টারখানা ছিল। প্রথমদিককার মডেল, খুব চালু গাড়ি। বগলাপতি ন' হাজারে কিনলেন গাড়িখানা। গৌরকে ডেকে বললেন, বুঝলি গৌরা, তোকে যা দেব ভেবেছিলাম তা আর বুঝি হল না। তা এই গাড়িখানা দেবই, এটায় তোর সারা জীবন চলে যাবে হয়তো বা, যদি ভাগ্যে থাকে। রাখোহরি সর্বনাশ আনল বলে। তা তুই অবোধ প্রাণী, সে গর্দিশে তোর কষ্ট পাওয়ার দরকার কী? যার যেমন গুণ তার তেমনি প্রাপ্য হওয়া উচিত। তোকে লাখ টাকা দিলেও তো গুনে-গেঁথে হিসেব করে চলতে পারবি না। ওই রাখোহরিই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নেবে। তার চেয়ে এই ট্যাক্সিখানা চালা। চালাবিও ভাল, থাকবি আনন্দে, খেয়ে-পরে। খুব বেশি লোভ-টোভ করিস না বাবা।

তারপর সেই গাড়ি সাদা-হলুদ রং করে, সিট-টিট পালটে, মেরামত করে, কালীঘাটে নিয়ে মায়ের পুজোর ফুল-সিন্দূর ঠেকিয়ে লাইসেন্স পারমিটের ঝামেলা মিটিয়ে একদিন ট্যাক্সি হয়ে রাস্তায় বেরোল। মা দৃশ্য দেখে বুক চাপড়ালেন, ছেলেটাকে চাকরের অধম করেছ। এতদিন ছিল ড্রাইভার, তাও না হয় বুঝতাম। এখন কিনা ট্যাক্সিওয়ালা!

দূরদর্শী বগলাপতি কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, লজ্জার কী! এখন ওর স্বাধীন ব্যাবসা। ওর যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী ওকে স্বাধীন করে দিলাম। এখন ও নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবে। ভাইদের হাততোলা হয়ে থাকলে আমাদের চোখ বুজবার পর ও সত্যিই চাকর-বাকর হয়ে যেত। বাপ-মা মরলে ভাইতে আর তালুইতে তফাত কী?

মা তবু ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন, তা দিলেই যদি তবে নতুন আর ভাল গাড়ি দিলে না একখানা? বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার দামি গাড়ি হলেও না হয় বুঝতাম।

দূরদর্শী বগলাপতি আবার কপালে ভাঁজ ফেলে কী একটু ভাবেন, তারপর বলেন, সামনে বড় দুর্দিন, বুঝলে বড় বউ! সেই দুর্দিনে একখানা দামি গাড়ি যদি গৌরের কাছে থাকে তবে রাখোহরি কি ছেড়ে দেবে? সেটা একটা অ্যাসেট বলে কেড়ে নেবে হয়তো বা। তা নতুন ল্যান্ডমাস্টার একটা দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে হবে। এই বয়সে এখন আর আমার দেরি সইছে না। নতুন না হোক গৌরাই জানে যে গাড়িখানা খুব চালু, পচা মাল দিয়ে ওকে ঠকাইনি। আমারই তো ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে ঠিক জিনিসখানাই দিয়েছি, এখন ইবলিশের বাচ্চা নিজের কপাল যদি নিজে না ভাঙে তো সংসারে চালু থাকবে।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোই ভাল। না আছে মিছিল, না জ্যাম। পুলিশও নয় নর্থের মতো টিকরমবাজ।

গৌরহরি ট্যাক্সির মিটার ঢেকে এখন মালিকের মতো গাড়ি চালাচ্ছে। মিটার খুললেই ট্যাক্সিওয়ালা। মিটার ঢাকলেই গৌরবাবু। তার ঘুমটা এখন মাথা থেকে বেরিয়ে একটা মাছির মতো চারধারে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই আবার ঢুকে পড়বে মাথায়। অমনি আবার আবছা হয়ে যাবে রাস্তাঘাট, রিয়্যালিটির সঙ্গে ড্রিম মিশে যেতে থাকবে। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরের সেই কামানখানা এখনও লাল নীল হলুদ বল ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। সেইসব বল ওড়াউড়ি করছে। ধীর গতিতে গড়াচ্ছে, ভাসছে, এসে বসছে বনেটের ওপর। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা উঠে যাচ্ছে উঁচুতে। এক-আধজন মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে কোথায়! ভুস করে। ঠিক থাকো গৌরবাবু, ঠিক থাকো। আর একটু দুরেই দাশ কেবিন। এই তো প্রায় এসে গেছি বাপধন। আর একটু, আর একটু মাথাখানা পরিষ্কার রাখো তো বগলুর ছাওয়াল।

পিছনের সিটে মচ করে একটা শব্দ হয়। পরিষ্কার শব্দ। কোনও ভুল নেই। গৌরহরি আয়নায় চোখ রাখে। ওই শালা ডেডবডিটা। বস্তুত ডেডবডিটাকে দেখা যায় না কখনও। কিন্তু শালা আছে ঠিকই। যখনই গৌর গাড়িতে একা তখনই শালার নড়াচড়া শুরু হয়। বিনা পয়সার সোয়ারি শালা, ধরতে পারলে ঘাড় ধরে ঝাঁকার দিত গৌর। বগলুর ছাওয়ালের সঙ্গে চিটিংবাজি! শালা ডাকটিকিটের মতো অন্যের জিনিসে সেঁটে থাকা! কিন্তু ওই একটা অসুবিধে। জ্যান্তদের সঙ্গে তবু ট্যাকল করা যায়, যতই জাঁহাবাজ হোক। কিন্তু মড়াগুলোকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই ডেডবডিটাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না গৌর। শালা বগলুর ব্যাটাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে দিব্যি ল্যান্ডমাস্টারখানা বিনিপয়সায় ভোগ করে যাচ্ছে। দেখছে কলকাতা। ফোর টুয়েন্টি কোথাকার!

বিস্তর হাত উঠছে ভিড় থেকে তার ল্যান্ডমাস্টার লক্ষ্য করে। লোকে চেঁচাচ্ছে, ট্যাক্সি, ই, ই,

মাছিটা ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে মাথার আশেপাশে। এক্ষুনি নাক কি কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। গৌর বিড়বিড় করে, আর একটু বাবা গৌর, আর একটু। শালারা ভেবেছে ভাড়ার গাড়ি। দেখছে না শালা যে লাল কাপড়ে মিটার ঢেকেছি! এখন শালা এ গাড়ি আমার প্রাইভেট। ওই ডেডবডিটা ছাড়া আর কোনও সোয়ারি নেই। এখন আমি ফ্রি। এখন আমার টিফিন টাইম।

ফাদার ফ্রান্সিস যখন খেলা শেখাত, তার সঙ্গে শেখাত উচ্চারণও। সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর ঘেরা মাঠে ফাদার ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ডাকত, হে গৌরঅরি, ফ্যাস দি বল।

গৌর চেঁচিয়ে বলত, পাস দি বল।

সে ফ্যাস ফ্যাস, নট পাস।

গৌর হেসে কুটিপাটি, ফ্যাস ফ্যাস, আই ওনট ফ্যাস দি বল ফাদার, আই উড লাইক টু পাস।

ডুষ্টু ছেলে গৌরঅরি, অ্যাও, বালো ওবে না।

আই! অবিকল ফাদার ফ্রান্সিস লাল নীল বলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন এধার ওধার। সারা চরাচর জুড়ে ভাসছে সেই সব রঙিন গোলা। ফাদার চেঁচিয়ে বলছেন, এই গৌরঅরি, ফ্যাস ইট, ফ্যাস ইট।

আই ফাদার,-- গৌরহরি বিড়বিড় করে, আই উড লাইক টু ফ্যাস ইট ফাদার। আই উড ভেরি মাচ লাইক টু—

ফাদার ফ্রান্সিস চরাচর জুড়ে খেলা করেন। তাঁর সঙ্গে খেলে স্বপ্নের শিশুরা।

উড়ন্ত মানুষেরা বল ধরে এগিয়ে দিচ্ছে ফাদারের পায়ে। গৌরের গাড়ি আবার মাটি ছেড়ে উড়তে থাকে। গৌর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা লাল বল ধরার চেষ্টা করে। পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়েন ফাদার, গৌরঅরি, অ্যাও গৌরঅরি, গুড ফর নাথিং!

রাসবিহারীর মোড়ে তার গাড়ি আবার মাটিতে নামে ঝং শব্দ করে। গৌরহরি চমকে ওঠে। চমকায় পিছনের সিটের সেই ডেডবডি।

গৌরের জানালায় দুটো মুখ ঝুঁকে পড়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, যাবেন দাদা! আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

দেখছেন তো মিটার ঢাকা রয়েছে।

একটু দয়া করুন।

দয়া! কীসের দয়া! কোন পুলুসটা দয়া করে বগলুর ব্যাটাকে! কোন ম্যাজিস্ট্রেট! কোন সোয়ারি কথা না শুনিয়ে ছাড়ে! অ্যাঁ! পুলুস ডেকে যখন ট্যাক্সি ধরো, তখন! না, হবে না। কে বলেছে এটা ট্যাক্সি? এটা গৌরবাবুর প্রাইভেট।

দাশ কেবিনে কি পৌঁছনো যাবে শেষ পর্যন্ত? কে জানে! রাস্তাটা যে অফুরান লাগছে গৌরহরির। এখনও মনে হচ্ছে হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে। মোড়ে জ্বলছে লালবাতি। বাবা লালবাতি, গৌর যে আর পারে না, বগলুর পোলার প্রাণটা যে গেল। দাশ কেবিনের সেই চোতরাপাতার ঘন ক্বাথটি, যার নাম কিনা চা, সেইটি সিস্টেমে না ঢাললে যে এখন ড্রিমে আর রিয়্যালিটিতে চামচে-নাড়া হয়ে যাচ্ছে, আমে-দুধে মিশে যাচ্ছে বাবা।

মচ করে পিছন থেকে আবার শব্দ হয়।

চোপ!—বলে ধমক মারে গৌরহরি। শালা ডেডবডিটা। বিনিপয়সার পার্মামেন্ট সোয়ারি! হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌর না হলে শালা তোমার দম বের করে দিত।

গ্রিন লাইট।

গৌর শ্বাস ছেড়ে গাড়ি ছাড়ে।

দাশ কেবিন থেকে যখন বেরোল গৌর, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে। শরীরের ভিতরটায় বাতাস বইছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে, বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে। শরীরের ভিতরে এইসব হচ্ছে এখন। গৌর মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা শুখো আর একটা ভাল পায়ের ওপর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শরীরের ভিতরকার সেই জ্যোৎস্না, সেই বাগান, সেই বাতাস অনুভব করল কিছুক্ষণ। গৌর কোনওদিনই কারও সার্ভেন্ট নয়। ওই সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ল্যান্ডমাস্টার, মিটারে লাল কাপড় জড়ানো প্রাইভেট। গৌর যখন খুশি খুলবে কাপড়, যখন খুশি প্রাইভেটকে ভাড়াটে গাড়ি বানাবে। কোনও শালার কিছু বলার নেই। এখন দাশ কেবিনের গরম অমলেট, চা আর টোস্ট তার পেটে গিসগিস করছে। ঠিক যেন বাতাসে, চাঁদের আলোয় একখানা ফুল-ফোটা বাগান। ইচ্ছে করলে, যতক্ষণ খুশি শরীরের ভিতরকার সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে বগলুর পোলা গৌরা, কোনও শালার কিছু বলার নেই। বাপ বগলাপতিই তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে। লোকটার ফোর-সাইট ছিল বটে।

স্টোরিং এজেন্সিটা যখন ফুলেফেঁপে একটা বিশাল আকার নিয়েছে তখনই বলতে কী রাখোহরি তার ভুল বুঝতে পারছিল। কারবারটা এত ছড়ানো তার ঠিক হয়নি। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ এবং তদবির করতে হচ্ছিল। সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল বিবিধ ফুটোফাটা। ওদিকে বড়কর্তাদের রদবদল শুরু হয়ে গেছে। পালটে গেছে মিনিস্টার। নতুন করে আবার কোমরে কাপড় বেঁধে রুই-কাতলা ধরো। যাদের চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে রাখোহরি, তখন তাদের জো। তারা ওঁত পেতেই ছিল। কোনও গুদামেই মাপমতো মাল থাকে না। একথা কে না জানে! রাতারাতি মাল এদিক ওদিক হয়, ওজন ম্যানেজ হয়, বড়কর্তারা পান-তামাক খেয়ে ব্যাপারটা চেপে যান। কিন্তু সেবার বড়কর্তাদের পান-তামাকের বন্দোবস্ত তখনও করে উঠতে পারেনি রাখোহরি। উত্তরবাংলার গর্দিশে আটকে গিয়েছিল। এক রাতে ইন্সপেক্টর আর দারোগা তার দুটো গুদাম দিল সিল করে! রাখোহরি প্রথমে চোখ রাঙাল, তারপর লোভ দেখাল, তারপর বসল মাথায় হাত দিয়ে। ফুডের সেক্রেটারি রিটায়ার করেছে, মিনিস্টার পেয়েছে অন্য পোর্টফোলিও। রাখোহরি করে কী?

প্রথমে বগলাপতি ব্যাপারটা জানতেও পারেননি। একা-একাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে রাখোহবি। অবশেষে বেগতিক দেখে এসে পড়ল বগলাপতির কোলে, বাবা, বাঁচাও।

বগলাপতি চুপ করে সব শুনলেন। বুঝলেন, শুধু দারোগা বা ইন্সপেক্টর নয়, অন্য ব্যবসায়ীরাও আছে এই চক্রান্তে। প্রফেশনাল জেলাসি। বিলেতে ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি মূলেই গণ্ডগোল করে বসে আছে। তবু বগলাপতি শেষ চেষ্টা করতে বেরোলেন। কিন্তু বৃথা। ব্যাপারটা নাঙ্গি ঘায়ের মতো চাউর হয়ে গেছে তখন। পাবলিক গেছে খেপে। কাগজেও ছোট্ট করে খবর বেরিয়ে গেল। পাবলিকের দুর্ভিক্ষের খাবার নিয়ে কালোবাজার। দেশদ্রোহ, মানবতার শত্রুতা। তার ওপর রাখোহরি বোকার মতো নিজের দোষ ঢাকতে সিল করা গুদামের টিন লোক লাগিয়ে রাতারাতি ফুটো করে চুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা টিকল না। রাখোহরি আর বগলাপতি, দু'জনকেই পুলিশে ধরল। বালিগঞ্জের বাড়িটাতে তখন মা আর হাফ-ফিনিশ গৌরা।

গৌরা অতশত বোঝে না। মা সারাদিন কান্নাকাটি করে। গৌরা সকালে ল্যান্ডমাস্টার নিয়ে বেরোয়। সারাদিন কলকাতার সোয়ারি এধার ওধার করে, রাতে টাকা আর খুচরো একগাদা নিয়ে এসে মায়ের কোঁচড়ে ফেলে। মা কেঁদে আকুল হয়, ও আমার গৌরা! শেষে তুই খাওয়াবি আমাকে, একথা কে ভেবেছিল বাপ আমার? তোর যে বাঁচার আশা ছিল না। টিক টিক করে টিকে আছিস এই যে আমার ভাগ্যি!

ধীরেসুস্থে মিটারের লাল কাপড়টা খোলে গৌর। অমনি তৎক্ষণাৎ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসে গাড়ির দরজার হাতল ছুঁয়ে বলে, আমরা একটু গঙ্গার ঘাটে যাব।

গঙ্গার ঘাট! মৃদু হাসে গৌর। মন্দ কী? দাশ কেবিনের পর এখন গঙ্গার ঘাট ভালই লাগবে গৌরের।

চলুন।—বলে সে লক খুলে দেয়।

ছেলেমেয়ে দুটো কলকল করতে করতে পিছনে উঠে পড়ে।

তাদের কথার মাঝখানে মাঝখানে একটু-আধটু ফিসফিসানি শুনতে পায় গৌর। মেয়েটা বলে, লোকটার একটা হাত দেখেছ। কেমন শুকনো কাঠের মতো?

ছেলেটা বলে, একটা পা-ও তাই।

ওমা! তাই নাকি? কী করে তবে গাড়ি চালায় গো? অ্যাকসিডেন্ট করবে না তো!

দূর। গাড়ি তো অভ্যাসে চলে।

গৌর হাসে। আহা, বগলুর পোলা গৌরা, হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট, ছা-রা-রা-রা-রা—

জামিনে খালাস পেয়ে বগলাপতি যখন বেরোলেন তখন তাঁর চেহারা রোঁয়া-ওঠা কাকের বাচ্চার মতো। মুখের চামড়া কী এক রোগে কালো হয়ে গেছে অর্ধেক। চামড়া দুল দুল করে ঝোলে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট লালবাতি দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। ডজ গাড়িটা ছ' হাজারে বিক্রি করেছে রাখোহরি। কেস চলতে লাগল। সে কী চলা! তার ব্রেক নেই, ইঞ্জিন গরম হয় না, ড্রাইভার টিফিন খায় না। কেস চলে তো চলেই। সেই কেসই আস্তে আস্তে শুষে নিল তাদের সংসার। বগলাপতি ঘন ঘন দু'টো স্ট্রোক সামলালেন। তৃতীয় স্ট্রোকে হড়কে গেলেন দুনিয়া থেকে। তার দু'মাস পর মা। তখন বিলেত-ফেরত ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খায়। বিলেত থেকে ফিরে অনেক কান্ড করার পর বিয়ে করেছিল। গুষ্টি বেড়েছে। মাঝেমধ্যে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, এটার যেন কত দাম পড়েছিল রে?

গৌরহরি সতর্ক হয়ে বলত, হাজার চারেক বোধহয়। এখন দু' হাজারেও বিকোবে না।

বিক্রি করতে করতে অস্থাবর সবকিছুই ফিনিশ করেছিল রাখোহরি। এক কথা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝেই ধার বলে পয়সা নিত গৌরের কাছ থেকে। বিনিপয়সায় তার ট্যাক্সিতে এধার ওধার যেত। বাপের যা ছিল তার এক পয়সাও ছোঁয়াল না গৌরকে। দূরদর্শী বগলাপতি তা জানতেন। ল্যান্ডমাস্টারখানা নিয়ে গৌর তাই সুখেই আছে।

তা গৌরা তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না কোনওদিনই। করলেই মলপরা দুটি পা মাথার

মধ্যে চক্কর মারতে থাকে। সে এমন চক্কর যে গৌর ছোটাছুটি করে, শব্দ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, গায়ে ঘাম দেয়, চোখ-মুখ ফেটে পড়তে থাকে। কিন্তু সেই নাচুনে মাগির নাচ আর শেষই হতে চায় না। শেষে সেই ঝমঝম মাথা থেকে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার রক্ত, হাড়, মজ্জা সব সেই ঝমঝমের সঙ্গে তাল দেয়। বড় নেতিয়ে পড়ে গৌরহরি। তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বগলাপতি দুনিয়া থেকে হড়কে গেলে তার স্থাবর-অস্থাবর সব যা ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিল রাখোহরি। রিফিউজি কলোনির বাড়িতে উঠে গিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাড়াটে বসাল। কেবল ছুঁল না কম দামের ল্যান্ডমাস্টারটা। তার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে গৌরহরির আয় থেকে সে নিয়মিত ভাগ বসাতে পারত। এই সব যে করল রাখোহরি, তার এত যে কায়দা কৌশল, এই সব গৌরহরি বুঝতে পারত, কিন্তু বেশি বুঝতে গেলেই মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা দেখা দিত। আর তার সঙ্গে ওই নাচুনে মাগির বেহদ্দ নাচ। তাই চিন্তাভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে গৌর। কেবল মাঝে মাঝে ভাবে, আমি শালা গৌরহরি বগলাপতির ছাওয়াল, এই দুনিয়ায় আমি কি খুব ঠকে গেলুম! এই যে রুখো-শুখো দুটো হাত-পা, মগজে এই যে এত ঝমঝম, এই সব নিয়ে আমি কতদূর কী করছি দুনিয়ায়? কী করার ছিল আমার? আর কী-ই বা করেছি? তবে কি আমার সারাজীবনের একমাত্র কাজ একখানা পুরনো ল্যান্ডমাস্টারে সারা কলকাতা চষে এধারকার মানুষ ওধারে নেওয়া! এই করতে করতেই কি শালা কোনও মানষ পারফেকশানে পৌঁছাতে পারে! অ্যাঁ? বগলুর পোলার কপালে শেষে কি এইটুকু মাত্র পারফেকশান লেখা ছিল? বিলেত না, বিদেশ না, পয়সাকড়ি না, বউ না, না ছেলেপুলে, কেবল একটা ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, আর দাশ কেবিনের চোতরাপাতার কাথ, আর শালা পুলুসবাবা, লাল নীল আলো, ঝুটঝামেলা, গঙ্গার ঘাট থেকে পগেয়াপট্টি, টেরিটিবাজার থেকে সাউথ সিঁথি, আর মাঝে মাঝে মৌতাতের সময় বয়ে গেলে ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার!

একটা বাজে মেয়েমানুষ আছে চৌরঙ্গির। তাকে জুটিয়েছিল আর এক ট্যাক্সিওয়ালা মদনা। মদনাই ধরে দিয়েছিল তাকে মেয়েমানুষটা। সেই মেয়েমানুষটারও সোয়ারি আছে। সোয়ারি জুটলে গৌরের ট্যাক্সি ডাকায়। ডাকিয়ে চক্কর দেওয়ায় ময়দানে। একটু অন্ধকার মতো হয়ে এলে গঙ্গার ঘাটে নির্জনে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাতে বলে। গৌরহরি তখন নেমে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, আর দেখে দূর থেকে, তার গাড়ির পিছনের কাচে দুটো ছায়া পরস্পর লেপ্টে গেল। তারপর আর তাদের দেখা যায় না। গৌরহরি চোখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ঘণ্টাখানেকের এইসব ব্যাপারের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয় হয় তার। আর সেই সঙ্গে কখনও সেই মেয়েমানুষটার শরীর একটু-আধটু ছোঁয়া যায়। সেটুকু ভাল লাগে না গৌরের। কেবল বদরক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা রিমঝিমে ক্লান্তি আর ঘুম আসে। জীবন থেকে সে মাত্র এইটুকু পাচ্ছে, এইটুকু পারফেকশান। তার বাপের কিনে দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারে এইসব পাপের কাজ হয় বলে মাঝে মাঝে মরমে মরে থাকে গৌরহরি। তার আর উন্নতি হয় না। সে যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

রাখোহরির সংসার বিস্তর টেনেছিল গৌর। এক এক সময়ে মাসের পর মাস। কেস চলছিল। তিনটে কেস। কপাল ভালই রাখোহরির। একের পর এক কেস জিতে গেল। কী করে জিতল, কোন গলিঘুঁজির পথে, কে জানে! তবে জিতল ঠিকই। ফিরে গেল বালিগঞ্জের বাড়িতে। আবার গাড়ি কিনল। দাবড়ে শুরু করল বাবা বগলাপতির ব্যাবসা। রিফিউজি কলোনির বাড়িটাতেই রয়ে গেল গৌর। তার আর উন্নতি হল না। রাখোহরি বগলাপতির কথার মতোই এখন তার তালুই।

বিচিত্র গাড্ডা। এ নিয়ে যে সে ভাববে তারও উপায় নেই। কোনও সুন্দর সকালে সে রাখোহরির কাছ থেকে বাবা বগলাপতির কিছু বিষয়-সম্পত্তি ঝেঁকে আনবে এমনটা সে ভাবতেই পারে না। লড়াকু ছেলে রাখোহরি। বিপরীত ভাগ্যকে নিজের কোলে টেনে এনেছে আবার। মদনা গৌরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মামলা কর।

আই বাপ! বাপের দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারখানা আর রিফিউজি কলোনির দু'খানা টিনের ঘর ছাড়া তার কিছুই নেই। মামলার খুরে খুরে তাও চলে যাবে। তার ওপর রাখোহরির মতো লড়াকু।

গাড়িটা চমকাচ্ছে। ইঞ্জিন টানছে না তেমন। গৌর বিড়বিড় করে গাল দেয়, শালা, তুই কি হিউম্যান বিয়িং যে চমকাচ্ছিস! আর একটু চল বাবা, গঙ্গার হাওয়া খাওয়াব।

গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে পিছনের সিটে ছেলেটা আর মেয়েটা বসে আছে। পিছনের আবছা কাচে তাদের ছায়া দুটোকে দেখা যায়, লেপ্টে আছে। একটু আগেও কলকলাচ্ছিল। এখন চুপ, চুমকুড়ি কাটছে বোধহয়। আঠা দেখ শালার। কাটে কাটুক। তাতে গৌরের কী! গৌর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা ঘুরিয়ে দেয় একটু।

রেসকোর্সের গা ঘেঁষে চমৎকার একখানা বাঁকে গাড়িখানা উড়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাস ঝাপটা মারে। নিয়োনের আলোয় তারার গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। ওই দেখা যায় জাহাজের হলুদ মাস্তুল, জিরাফের মতো উঁচু গলার ক্রেন। আলোয় আলো বন্দর। চওড়া রাস্তায় ধুলোর কণা মেলে না প্রায়। যতবার এই ঘাটে এসেছে গৌর ততবার মনে হয়েছে, এই তো বিদেশ! এই তো শালার লন্ডন, যেখানে একদা ল্যান্ড করেছিল তার দুই দাদা, রাখোহরি আর থাকোহরি। গৌরও করত। স্বভাবের নিয়মে সব চললে আজ তারও হয়তো মেম বউ। বেগড়বাঁই বাধালো মগজের ওই ঝমঝম শব্দ, আর দুটো রুখো-শুখো হাত-পা।

ভাবতে ভাবতে শ্বাস টানে গৌর। গঙ্গার বাতাসে তার ফুসফুস পালের মতো ফুলে ওঠে। কলকাতা পার হয়ে লন্ডনের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

ওমা! এসে গেছি!— মেয়েটা চমকে গিয়ে বলে।

আড়চোখে আয়নাটা দেখে গৌর। ছায়া দুটো আবার আলগা দিয়েছে। শালা ভুখ্‌খা পার্টি! ঘরদোরে জায়গা পায় না, তাই ট্যাক্সিতে চড়ে যত আশনাই। গৌরবাবুর ল্যান্ডমাস্টারখানাকে কী পেয়েছিস তোরা? ফুলশয্যার বিছানা, না হানিমুন কটেজ?

ছেলেটা নেমে মিটার দেখল না, জিজ্ঞেস করল, কত?

গৌরও মিটার দেখল না, কেবল একটু আলস্যের সঙ্গে বলল, চার টাকা দশ পয়সা।

ছেলেটা ভ্রুক্ষেপও করল না। দিয়ে দিল। তারপর ছেলেটা আর মেয়েটা গঙ্গার ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো চুল হাতে সামলাতে সামলাতে আলো থেকে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

গৌর নেমে মিটার ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিকারের কত উঠেছিল তা দেখার চেষ্টাও করে না। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে ডাঁটিয়াল ছেলেরা মিটার-ফিটার দেখার ঝামেলা করে না। গৌরেরই বা কী দায় পড়েছে! সেও আন্দাজি মারে। বগলুর পোলা গৌরা, প্রেস্টিজে সে কম যায় কীসে?

বনেটটা খুলে দেয় গৌর। খা বাবা ল্যান্ডমাস্টার, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নে। মিটারটা আবার লাল শালুতে ঢাকে গৌর।

তারপর বগলুর ব্যাটা গৌর গাড়ির গায়ে বসে পেচ্ছাব করে, থুতু ফেলে। তারপর নির্জন ঘাটের কংক্রিটের রেলিং ধরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই হলুদ একখানা জাহাজ। তার সর্বত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উঁচু মাস্তুল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় ধু-ধু করছে। জাহাজের বিশাল খোল দেখে গৌর, দেখে তার সাদা কেবিন, আর শুনশান ডেক। কোনওখানে কোনও মানুষ নেই। এমন নির্জন আলোকিত জাহাজ কখনও দেখেনি গৌর। সে হাঁ করে দেখে আর দেখে। জাহাজটা খুব ধীর লয়ে দোলে। কোন কোন মুলুকে চলে যাও হে জাহাজবাবা! বগলুর ছাওয়াল পড়ে আছে কোন গাড্ডায়! ফিফটি পারসেন্ট বলে গৌরার সব ফুর্তিই বিলা হয়ে গেল। নইলে বাবা জাহাজ, তোমার ওই ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে আমি সমুদ্র দেখতুম। অ্যালবাট্রসের ছায়া দেখতুম, আমার টাই ফুরফুর করে উড়ত হাওয়ায়। জাহাজবাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার লাইফটায় কী আছে বলো তো! ওই ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মগজে এক বেহদ্দ নাচুনে মাগির ঝমাঝম। কলকাতার

সওয়ারি এধার ওধার করে কেটে যাচ্ছে জীবন। বাবা জাহাজ, সাত ঘাটের জল খাও তুমি। সমুদ্রের জলে তোমার ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় খেলা করে স্বপ্নের পৃথিবী। নোনা হাওয়ায় কোন কোন মুলুকের গন্ধ ভেসে আসে। আর গৌরা!

মার শালা ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের মুখে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতার সোয়ারিদের, আর তিন লাথি লাগা গৌরার কপালটায়। ফিফটি পারসেন্ট হাফ-ফিনিশ গৌরা এইসব ভাবে, আর বিভোর হয়ে দেখে হলুদ জাহাজখানা।

ল্যান্ডমাস্টারটা হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছে, গাঁই গাঁই করে ডেক-এ বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। গৌরার লম্বা চুল ওড়ে। বিদেশি বাতাসে ভরে ওঠে বুক। গৌরার ফিরতে ইচ্ছে করে না, জাহাজখানা দেখতে দেখতে গৌর এক অদ্ভুত ওয়্যারলেস শুনতে পায়। বাতাসের ডাকের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা ভাষা ভেসে আসে। জাহাজটা গৌরকে কী যেন বলে। আই! জাহাজখানা হাফ-ফিনিশ গৌরাকে ওয়্যারলেসে ডাকে, বলে, বুয়েনস এয়ারিসের মতো সুন্দর শহর বড় একটা নেই। আমি সেখান থেকে এলুম। যাচ্ছি টোকিও, ফিরব লন্ডনে, যতদিন চালু আছি ততদিনই জীবনটা সুন্দর। জল আর স্থলের জীবন দু'রকম বাবা গৌর। যেমনই হোক, চালু থাকাটাই আসল কথা। জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালু থেকো হে বগলাপতির ব্যাটা, বগলুর ছাওয়াল। সংসারে চালু থাকাটাই সাকসেস।

অবিকল এইরকম কথা বলতেন বগলাপতিও। ইবলিশের বাচ্চা যদি নিজের কপাল না ভাঙে তবে এই ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই সংসারে চালু থাকবে। বগলুর ফোর-সাইট ছিল বটে। আজও যে সংসারে চালু আছে গৌর তা ওই ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ওই যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ওই ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ওই যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ওই ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, মগন সিং-এর গ্যারাজ থেকে যেটাকে ন' হাজারে কিনেছিলেন বগলাপতি। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি বলে রাখোহরি ছোঁয়নি ওটাকে। গৌর চালু আছে ল্যান্ডমাস্টারটার জোরে, তবু কখনও-সখনও গঙ্গার ঘাটে এলে নীল সাদা হলুদ জাহাজগুলো অনেকক্ষণ দেখে গৌর। তখন তার ইচ্ছে করে ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটাকে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতা আর কলকাতার সোয়ারিদের আর তিন লাথি নিজের কপালটায় মারতে।

জাহাজবাবা, আমার বাবা বগলুও বলত এরকম কথা তোমার মতো। সংসারে চালু থাকাটাই আসল কথা। তবু মাঝে মাঝে জাহাজ কি উড়োজাহাজ দেখলে, কিংবা হাওড়া কি শেয়ালদা থেকে দূরের রেলগাড়ি ছাড়ার সময়ে হঠাৎ বুকে বড়শি বিঁধে যায়। কোন অচেনা দূর যেন আমায় কলকাতার ঘোলা জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চায় জাহাজবাবা। আমি তো জানি, আমি হচ্ছি গে ঢাকার টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা, হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌরা, খুব বেশিদূর যাওয়া আমার নেই। কলকাতাই আমার লিমিট। ঘুরে ঘুরে সেই কলকাতা, ঘুরে ঘুরে ফের কলকাতা। বাবা হলদে জাহাজ, আমি যখন মুরগিহাটার সোয়ারি বাগবাজারে খালাস করি, তখন তুমি বুয়েনস এয়ারিস ছেড়ে চলেছ টোকিও, কিংবা ফিরতি পথে লন্ডনে। নীল পাহাড়ের ওপর বাতিঘরের আলো দেখো তুমি, দেখো সমুদ্রের ঝড়। ইটালির জলপাইয়ের বনের ঝড় এসে লাগে তোমার মাস্তুলে। বাবা জাহাজ, বুকের বড়শিটা মাঝে মাঝে জোর টান মারে। কলকাতার ঘোলা জলে গৌর চমকায়, ঠিক যেমন ইঞ্জিন গরম হলে মাঝে মাঝে চমকায় তার ল্যান্ডমাস্টার। হাফ-ফিনিশ বলে গৌরা যে কোনও কিছুই পায়নি জাহাজবাবা!

খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌর, সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চমকে ওঠে। আই! বগলুর দুই ব্যাটা বিস্তর জাহাজ দেখেছিল, দেখেছিল সমুদ্র, বিদেশ, দেখেছিল বিস্তর মেয়েছেলে। কিন্তু বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা আটকে গেছে এক ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের বগলতলায়। ছাড় নেই। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌর আবার ল্যান্ডমাস্টারের কাছে ফিরে আসতে থাকে।

মিটারের লাল শালুটা অন্যমনস্কভাবে খোলে গৌর, বনেট বন্ধ করে। ড্রাইভিং সিটে বসে চাবিটা বের করে, তারপর হঠাৎ আগাপাশতলা চমকে উঠে বুঝতে পারে, তার পিছনের সিটে কে যেন বসে আছে। আয়নায় দেখা যায় পিছনের কাচের গায়ে একটা মাথা একটু হেলে আছে। এলানো একটা শরীরের ছায়া দেখা যায়। দরজাটা ঠেলে এক লাফে বেরিয়ে আসে গৌর। শালা ডেডবডিটা!

কয়েক পা নেংচে নেংচে দৌড়ে যায় গৌরহরি। তারপর থামে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাস্তবিক ল্যান্ডমাস্টারটা কোনওদিনই সেন্ট পারসেন্ট গৌরহরির না। ওর ফিফটি পারসেন্ট ওই শালা ডেডবডিটার, এটা গৌর মাঝে মাঝে টের পেত। এখন ডেডবডিটার আবছা অবয়ব দেখে গৌরহরি বুঝতে পারে, শালা ভূতেরাও দাবি-দাওয়া ছাড়ে না। কবে মরে-হেজে গেছিস, তবু একটা পুরনো ল্যান্ডমাস্টারের মায়া কাটাতে পারলি না, বাবা ডেডবডি! মানুষের কত কিছু চলে যায়। আমার বাপ বগলু সাতটা জাহাজডুবির শোক পেয়েছিল। আর আমি সেই বগলুর তিন লম্বর ব্যাটা, দ্যাখ এই হাফ-ফিনিশ আমার জীবনটা, টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছাওয়াল আমি, তবু আমার কপালে কেবল অবশিষ্ট আছে ওই ল্যান্ডমাস্টারটা, যার ফিফটি পারসেন্ট ভূতের কবজায়। বাবা ডেডবডি, গৌর কি কখনও ইন্টারফিয়ার করেছে তোমাদের ব্যাপারে? তবে তুমি কেন বাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার ল্যান্ডমাস্টারে? ল্যান্ডমাস্টারটা ছাড়া গৌরের যে আর কিছুই নেই বাবা!

গৌর দূরে দাঁড়িয়ে তার ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে। তারপর চমকায়।

গাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে একটা মাথা বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ গৌরকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে, হেই! কাম হিয়া—

অমনি গৌরের মাথার ধোঁয়া কেটে যায়। গাড়ির দরজা লক করা ছিল না। মাতালের পো উঠে বসে আছে। ভারী রেগে যায় গৌরহরি। নেংচে নেংচে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে সেন্ট অ্যান্টনিজের পাক্কা ইংরিজিতে বলে, এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ? বেরোও, বেরিয়ে যাও!

লোকটা তবু দিব্যি গা ছেড়ে বসে থাকে, মাথাটা পিছনে হেলানো। ডান হাতখানা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে নেড়ে গৌরের ধমক-ধামক উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, টেক মি টু স্যু।

স্যু ফু আমি জানি না। তুমি বেরিয়ে এসো।

মাতাল লোকটা তবু হাত নেড়ে বলে—দেন টেক মি টু এ গুড উম্যান মেট।

বগলাপতির ছাওয়াল কি মেয়েছেলের দালাল? ইজ হি?— চোস্ত ইংরিজিতে গৌর বলে, মাতাল আর মেয়েছেলেদের আমি ঘেন্না করি। তুমি কেটে পড়ো।

গৌরের ইংরিজি শুনেই বোধহয় লোকটা একটু থমকে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। গৌর লক্ষ করে, লোকটা বেঁটে-খাটো, বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। জুলপিতে পাক ধরে একগোছা চুল সাদা হয়ে আছে। গায়ের রং রোদে জলে খেয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না কোন দিশি। তবে জাহাজি বলেই মনে হয়। বাতাস যদিও ওড়াচ্ছে সবকিছু, তবু গৌর একঝলক মদের গন্ধ পায়। মাতালদের গাড়িতে তোলে না গৌর। শালাদের কখনও কোনও স্থির ডেস্টিনেশন থাকে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই শরীরের ক্বাথ হড়হড় করে ঢেলে দেয় গাড়িতে। ধোয়ামোছা করতে গৌরের দম বেরোয়।

নামবে কি না বাপু, না কি পুলিশ ডাকব?— গৌর ইংরিজিতে বলে।

গৌরের সেন্ট অ্যান্টনিজের নির্ভুল ইংরিজি শুনে লোকটা সত্যি ভড়কে যায়। নামবে কি না ইতস্তত করে, ঠোঁট চাটে, চুলে হাত বোলায়, উদভ্রান্ত চোখে চারদিকে চায়।

উত্তেজনার মধ্যেও লোকটার হাবভাব দেখে গৌর তৃপ্তি পায়। আই জাহাজির পো, শুনে লে ইংরিজি কাকে বলে! বগলাপতির এক ব্যাটা বিলেতে রয়ে গেছে, আর এক ব্যাটা বিলেত ফেরত,

তিন নম্বর যদিও হাফ-ফিনিশ তবু ইংরিজি শিখেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে। শুনে লে বাবা জাহাজি।

লোকটা অসহায়ের মতো বিড়বিড় করে বলে, আমাকে স্যু-র কাছে যেতেই হবে! আমাকে পৌঁছে দাও। দয়া করো।

বলতে বলতে লোকটা একটু কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে একগোছা দশ টাকার নোট বের করে গৌরকে দেখায়, বলে, আমার টাকা আছে, চিন্তা নেই। একটু আগে আমি একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি, আর একটা স্পাই ক্যামেরা। এই দেখো কত টাকা।

টাকা দেখাচ্ছে! টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, যে কিনা ডজ গাড়িটার আয়না দিয়ে বিস্তর রাজার মাথা আর তিন সিংহের মূর্তির ছবি দেখেছে, তাকে কিনা দেখাচ্ছে ফুটো পকেটের জাহাজি! ভারী রেগে যায় সে। ভাল হাতখানা বাড়িয়ে সে জাহাজিটার হাত ধরে টান মারে, চেঁচিয়ে বলে, নামো, নামো, টাকা আমি বিস্তর দেখেছি।

গৌর টানে। লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ভিতরে সেঁধোতে থাকে। পা দু'খানা সিটের ওপর তুলে গোঁজ হয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসে, বলে, দয়া করো।

অসুবিধে এই যে গৌরের একটা হাত আর একটা পা কমজোরি। আর লোকটা সেন্ট পারসেন্ট হাত-পাওলা, গৌর সুবিধে করতে পারে না। যত টানে, তত লোকটা সিট আঁকড়ে শুয়ে পড়তে থাকে। গৌর রেগে বাংলায় বলে, ফোট শালা বেজন্মা। আজ তোরই একদিন কি আমারই!

শুনে, শুয়ে থেকেই জাহাজিটা বড় বড় চোখ করে চায়। বলে, আরে বাঃ, তুমি বাঙালি দেখছি!

লোকটাকে গৌর সাহেব ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকাল খুব। হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল, তুমি সাহেব নও?

লোকটা সিট আঁকড়ে আধাশোয়া অবস্থাতেই বলে, আরে দূর! আমি তোমাকেই সাহেব ভেবেছিলাম। যা ইংরিজি বলছিলে! মাইরি, শিখলে কোত্থেকে অমন ইংরিজি?

গৌর একটু দম নিয়ে বলে, সেন্ট অ্যান্টনিজ, ঢাকা। তুমি কোত্থেকে শিখেছ?

লোকটা যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এমনভাবে সহজ ভঙ্গিতে উঠে বসে, হাত-টাত ঝেড়ে বলে, আমি শিখেছি জাহাজে, সাত ঘাটের জল খেয়ে।

গঙ্গার বাতাসে গৌরের রাগ উড়ে গেল। বাঙালির মুখে ভাল ইংরিজি শুনলে গৌরের এরকম হয়। তবু সে বলে, আমার গাড়িটা মাতালদের জায়গা না।

লোকটা ভয়ে ভয়ে মিটমিট করে তাকায়, বলে, আমি শুধু একটু বিয়ার খেয়েছি। মুখ শুঁকে দেখো। হাই!

লোকটা হাঁ করে এগিয়ে আসে। গৌর পিছোয়। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। গাড়ি খুলে আমি দেখি একটা ভূত বসে আছে।

লোকটা হাসে। একটা সোনালি দাঁত চিকমিক করে। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে, আজ বিকেল থেকেই আমার মনটা খুব খারাপ, বুঝলে! খুব খারাপ।

মাতালদের দুঃখের কথা সহজে শেষ হয় না। গৌর জানে। তাই সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বুঝেছি। এখন গাড়িটা ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

লোকটা আতঙ্কিতভাবে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে ভয়ের চোখে গৌরের দিকে চায়।

তাকে ভয় পায় এমন লোক বড় একটা দেখেনি গৌর। বরং সারাটা দিন গৌরই বিস্তর লোককে ভয় পায়। কখন কোন পুলুসবাবা ধরে, কোন সোয়ারি কোন গাড্ডায় নিয়ে ফেলে, কখন ল্যান্ডমাস্টারের ভূতটা শব্দ করে ওঠে। সারা দিনটা ভয়ে ভয়েই কাটে গৌরের, তাই এখন একজন তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে গৌরের একটু মায়া হয়। সে নরম গলায় বলে, তোমার মতলবখানা কী?

লোকটা মিনতি করে, আমাকে নামিয়ে দিয়ো না। স্যু-র কাছে পৌঁছে দাও। আমি বড় দুঃখী লোক, বুঝলে, সারা সন্ধে একটাও ট্যাক্সি আমাকে নেয়নি।

বলতে বলতে লোকটা হেঁচকি তোলে। কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দেয়, এই নাও সিগারেট।

গৌর মাথা নাড়ে, না।

লোকটা মিনতি করে, নাও মেট। খুব ভাল সিগারেট। পুরো প্যাকেটটাই তুমি নিয়ে নাও।

গৌরা মাথা নাড়ে, না।

লোকটা করুণ চোখে চেয়ে বলে, আমার জাহাজের জাহাজিরা সব যে যার মেয়েমানুষের কাছে চলে গেছে, ফুর্তি লুটছে সবাই। আর আমি শেষ জাহাজিটা সারা সন্ধেবেলা চেষ্টা করছি, কোথাও যেতে পারছি না। মাইরি!

জাহাজিটা ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে থাকে।

গঙ্গার এই হুড় বাতাসটাই খারাপ। গৌরের মনটাকে দুবলা বানিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্ট বদমেজাজি হওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না। তার ওপর লোকটা কাঁদতে শুরু করতেই সে কেমন কেবলে যায়। মায়েদের মতো 'ষাট ষাট' করতে ইচ্ছে করে।

তা না করে গৌর লোকটার সিগারেট নেয়।

বলে, স্যু কে?

লোকটা নীরবে খানিকটা চোখের জল মোক্ষণ করে রুমালে চোখ মোছে। একটু চুপ করে থেকে আবার দাঁত দেখায়। সোনালি দাঁতটা চিকমিক করে। সযত্নে সে একটা দামি গ্যাসলাইটার বের করে গঙ্গার বাতাস থেকে নিপুণ হাতের তেলোয় আড়াল করে আগুন জ্বালে। গৌরের সিগারেট ধরিয়ে দেয়, নিজে ধরায়। অন্ধকারে ভিতরে সরে গিয়ে গৌরের জন্য জায়গা করে দিয়ে বলে, বোসো।

বনেটটা আবার খুলে দেয় গৌর। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে বাবা ল্যান্ডু। লাল শালুতে আবার মিটারখানা ঢাকা দেয় সে। এসে পিছনের সিটে বসে দরজাটা খোলা রেখে, গঙ্গার হুড় বাতাস বিদেশের গন্ধ উড়িয়ে আনে। তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষের মন।

লোকটা নরম গলায় বলে, দেশের মাটিতে যখন জাহাজ ভেড়ে তখন জাহাজিরা নামে লাফ দিয়ে, তারপর দৌড় লাগায়। আত্মীয়স্বজনকে আঁকড়ে ধরে, হাগিং কিসিং, কত আদর ভালবাসার কথা হয় না? বুঝলে, ওরকম হত, কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে। বাচ্চাবেলায় পালিয়ে গিয়ে জাহাজে চাকরি নিই। মা কান্নাকাটি করত, বাপ দুশ্চিন্তা করত, আমারও জাহাজে সময় কাটত না। কলকাতা-মুখো জাহাজ মুখ ফেরালে দুনিয়ার রং পালটে যেত। মা বাপ ছোট্ট ভাইটার জন্য আনতাম রাজ্যের জিনিস, কত আদর হত আমার, কলকাতায় কয়েকটা দিন উড়ে যেত ফুঁয়ে। তারপর বুড়ো হয়ে বাপ মরল, মা মরল। দু'বার দুনিয়া চক্কর দিয়ে এসে দুটো সংবাদ পেয়ে মন ভেঙে গেল খুব। কলকাতার ওপর টান কমতে থাকল। ছোট ভাইটা ছিল, তার কাছে আসতাম। কিন্তু সে ব্যাটা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হল প্রফেসর, আর আমি লেখাপড়া শিখিনি, জাহাজের খালাসি। আমাকে ব্যাটা ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া বাপের কয়েক কাঠা জমি-বাড়ি সে ভোগদখল করছে। আমি এলে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তার বউ বাচ্চা পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে না। এটা বুঝবার পরই হঠাৎ একদিন কলকাতার ওপর আমার টানটা ঝড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল, জাহাজের টানে যেমন জেটির মোটা কাছি ছিঁড়ে যায়। তখন কলকাতা-মুখো জাহাজ চললেও মনে হত বিদেশেই যাচ্ছি, যেমন লন্ডন বা টোকিওয় যাই। তা এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন চলন্ত জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আরে, আমার যে কোনও পিছুটান নেই! আমি যে কেবল যাই, কোথাও ফিরি না! অন্য জাহাজিরা দুনিয়ার সর্বত্র যায়, আবার দেশে ফেরে। আমার দেশ নেই বলে যে ফেরাও নেই! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল, বুঝলে! ছেলেবেলা

থেকেই আমার ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস নেই। বেশি চিন্তা করলে আমার মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হত, ওই শব্দের জন্যই আমার পড়াশুনো হয়নি।

গৌর চমকে জিজ্ঞেস করে, কেমন শব্দ বললে?

ঝাঁইঝাঁই। অনেকটা বড় কত্তালের মতো।

গৌর শ্বাস ছাড়ে। বলে, আমার হত ঝমঝম। অনেকটা নূপুরের মতো।

আই।— লোকটা বলে, তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে যখন মাথা ঝাঁইঝাঁই করতে শুরু করল তখন আর এক জাহাজি পরামর্শ দিল, বিয়ে করো। ঘরসংসার হলে তোমার ফেরার জায়গা হবে। তা আমি বিয়ে করলাম, সানফ্রান্সিসকোতে। আমার বউ বেশ সুন্দরীই ছিল, খুব আদুরে। তার আর আমার টাকা-পয়সা যোগ করে আমরা তিন-চার মাসের লম্বা হানিমুন কাটালাম আমেরিকার নানা জায়গায়। সে কী ফুর্তি! কিন্তু সুখের দিন যায়। সেবার হানিমুনের শেষে অস্ট্রেলিয়া হয়ে জাপান যেতে হল, লম্বা টুর। ফিরতে ফিরতে বছর গেল ঘুরে। শেষে ক'মাস বউয়ের চিঠি পাইনি। জাহাজ আমেরিকা-মুখো হতেই আমার মন আনন্দে হাততালি দিল, এতদিন বাদে আমি ফিরছি। আমার ফেরা আছে। জাহাজ ডাঙার দিকে এগোয় আর আমি উৎকণ্ঠায় সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে তীর দেখার চেষ্টা করি। অবশেষে পৌঁছে দেখলাম, বউ জাহাজঘাটায় আসেনি। খানিক দূরে এক ছোট্ট টিলার নীচে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, বাসায় অন্য লোক। বাড়িওলা বুড়ো অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল, খুবই দুঃখের কথা, সে মেয়েটি তো আবার বিয়ে করে নিউইয়র্ক চলে গেছে। বুঝলাম, বউ ভেগেছে। সেই দুঃখে জমি নিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলে তার দোষ দেওয়া যায় না। মেমসাহেবরা বেশিদিন একা একা থাকতে পারে না। আমি আবার ভেসে পড়লাম, একা একা ফাঁকা ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি, বিয়ার খাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার কেবল যাওয়া আছে, ফেরা নেই। বয়স বাড়ল। বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় ঢুকল মনে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়লে আবার গাড্ডায় পড়লাম। আর একটি মেয়ে। আমাকে দুঃখী দেখে ভালবেসে ফেলল। বুঝলে, মেমসাহেবরা চট করে ভালবেসে ফেলে। আমারও বয়স বাড়ছে, মনে হাঁকুপাঁকু। তাই প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে বিয়ে করে ফেললাম আবার। আমার এ বউ গরিব অরফ্যান। ভাবলাম, গরিবের মেয়ে হয়তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। যথাসাধ্য টাকা-পয়সা খরচ করলাম তার জন্য, একটা বাসা করে দিলাম বন্দরের কাছাকাছি। মাস দুই হানিমুনে কাটালাম। তা আমার এ বউ টিকল। কয়েকবার টুর সেরে তার কাছে ফিরেছি। ফিরে যত্ন আদর পেয়েছি, দেশে ফেরার আনন্দ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়। ভাবলাম, জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওখানেই জমিজিরেত কিনে বসবাস করব। পোলট্রি, ফার্মিং করব। তা সেবার লম্বা টুরে বেরোনোর সময়ে মনে মনে ঠিক করলাম, এটাই শেষ টুর, আর জাহাজে না। হলদে জাহাজটায় বসবাস করতে করতে আমার মনে ন্যাবা ধরে যাচ্ছে। তা সেবার টুরে বছর দেড়েক লেগে গেল। বউ মাঝে মধ্যে অভাব দুঃখের কথা জানিয়ে টাকা-পয়সার জন্য লিখত। আমি গা করতাম না। মেয়েছেলেদের অভাব কে কবে মেটাতে পেরেছে বলো! দেড়-দু'বছর বাদে ফিরে বাসায় ঢুকতেই মনে হল, এ বাসাটা যেন কেমন কেমন! ঠিক আগেকার মতো ঘর-গেরস্থালির গন্ধ যেন পাচ্ছি না! বউ কেমন চোর-চোখে চাইছে, হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে ঝাঁঝ দিচ্ছে! বিছানায় শুয়ে কেমন যেন অন্য পুরুষের গায়ের গন্ধ পেলাম। তারপর পাড়ায় ঘুরে এ-মুখ সে-মুখ থেকে যা খবর পেলাম তাতে আমি তাজ্জব। আমার বউটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। জাহাজিদের এন্টারটেন করে। ভীষণ রেগে যখন বউয়ের ওপর চোটপাট করে কৈফিয়ত চাইলাম সে উল্টে ঝাড়ল আমাকে, তা কত টাকা-পয়সা আর সোনাদানা দিয়ে গেছ আমাকে? আমার পেট চলে কী করে? খুব ঝগড়া হল দু'জনে, এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঝগড়া করে লাভ নেই। মেয়েমানুষটা সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেছে। কোনও কোনও মেয়েমানুষের মধ্যে নষ্টামির বীজ থাকে। বুঝলে! তারপরও তার কাছে

তিন-চারদিন ছিলাম আমি। সেও রাগ-টাগ ঝেড়ে ফেলে আমাকে খুব খাতির যত্ন করল, অন্য কোনও পুরুষ সে ক'দিন ঘেঁষতে দিল না। কিন্তু আমি আর তাকে ঘরে তোলার চেষ্টা করলাম না। বাঁধা মেয়েমানুষের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে লোকে, সে রকমই ট্রিট করলাম তাকে। সে আপত্তি করল না। তারপর তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লাম আবার। কিন্তু মুশকিল হল, দুই বউয়ের জন্য দু'রকম দুঃখ মাঝে মাঝে বুকের দু'ধারে খামচে ধরে, মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হতে থাকে। আর কেবলই মনে হয়, আমিই একমাত্র জাহাজি. যার ফেরা নেই, কেবলমাত্র যাওয়া আছে। জাহাজ ভোঁ দিলে আমার বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। অবসর সময়ে মদ খেয়ে ঝুম হয়ে থাকি, আর তখন জাহাজের আনাচে-কানাচে ভূত দেখি। এরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন কলকাতায় জাহাজ ভিড়ল। আমি পাগলের মতো 'মা' বলে ডাক দিয়ে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, দৌড় দিলাম গ্যাংওয়ে ধরে। ডাঙায় পা দিয়েই খেয়াল হল, মা তো নেই। অমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। কার কাছে যাব? আবার ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরলাম জাহাজে। শূন্য জাহাজ, সব জাহাজি গেছে ফুর্তি লুটতে। আমি একা একা ভুতুড়ে জাহাজটার আনাচে-কানাচে গিয়ে দাঁড়াই আর কাঁদি। কাঁদি মরা মা-বাপের জন্য, দুই বউ আর না-হওয়া বাচ্চা-কাচ্চার জন্য, কাঁদি দেশের জন্য, কলকাতার জন্য। এইরকম অবস্থায় কয়েকদিন পর আর এক অভিজ্ঞ জাহাজি আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওয়েসিস বার-এ। স্যু-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটা বাংলা বলত, ইংরিজিও বলত। শাড়ি পরত, চেহারাটা ছিল সাদামাটা বাঙালি মেয়ের মতো। ভারী ভাল লেগে গেল তাকে, চোখ জুড়িয়ে গেল। বার থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। ঘরে যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ছিল, কালীর পটও ছিল। বিছানা পরিষ্কার, মাটির কুঁজোয় জল, হাতপাখা, সবই ছিল তার। ভারী আমুদে মেয়ে, বলল, তুমি এখানেই থাকো। থাকলাম। এক রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ফুটল আকাশে। রাত তখন অনেক। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আমাকে স্যু বের করে আনল। ট্যাক্সি করে এসে নামলাম ভিক্টোরিয়ার ধার ঘেঁষে। চারিদিক শুনশান, নির্জন। চুপি চুপি দেয়াল পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম দু'জনে। ঢুকেই দেখি পৃথিবী ছেড়ে আমরা এক গভীর মায়ার রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে মায়াবী ফুল, শিশিরের জল, জ্যোৎস্নার মোম, নরম জলের শব্দ, মাটির সুগন্ধ—ও রকম সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখিনি। সামান্য মদ ছিল দু'জনেরই পেটে, ঝুমঝুম মাতাল ছিলাম দু'জনেই। আমরা আনন্দে ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ স্যু লাফিয়ে উঠে বলল, দেখো দেখো, কীরকম বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না পড়ছে! আঁজলা ভরে তুলে নাও। বলে দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে মুখ তুলে বলে, ইস দেখো, কীরকম হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে, আঁঠার মতো ঘন...কী মিষ্টি...কী স্বাদ...! দেখতে দেখতে আমি ঠিক তার মতো আঁজলা পেতে দিলাম শূন্য আকাশের তলায়। কী আশ্চর্য, অমনি টলটলে ঘন জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আঁজলা, উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুমুক দিয়ে দেখি, কী স্বাদ! কী গন্ধ! যত খাই, পিপাসা বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর তেজি ঘোড়ার মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না দেখি, গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর, মিশছে জলে, গাছ বেয়ে পড়ছে টুপটাপ। আমরা আঁজলা ভরে খেলাম, ঘাস থেকে চেটে নিলাম, জলে মুখ ডুবিয়ে খেলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করলাম দু'জনে। যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত আমরা জ্যোৎস্না খাওয়া ছাড়িনি। সে এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তিন-চারদিন ছিলাম স্যু-র কাছে। সারা দিনটা রাত্রির অপেক্ষায় কাটত। সন্ধেবেলা দু'জনে হালকা মদ খেয়ে নেশা করে নিতাম। চোখে চোখে আমাদের গোপন বোঝাপড়া হত। রাত গভীর হলেই বেরোতাম জ্যোৎস্নায়। পার হতাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচু দেওয়াল। শুরু হত জ্যোৎস্না খাওয়া। আহা!

জাহাজিটা চুপ করে অতীতের কথা ভাবে একটু। লম্বা রথম্যান সিগারেট গৌরের আঙুলে ছ্যাঁকা দিচ্ছে ছোট হয়ে। জাহাজিটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদভ্রান্তের মতো গৌরের দিকে চায়, বলে, এসব

আড়াই-তিন বছর আগেকার কথা, সেই শেষবার কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর কত জায়গায় গেছি, কতবার জ্যোৎস্না রাতে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্না খাওয়ার চেষ্টা করেছি কত মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখেছি আঁজলায় কিছু নেই। ফাঁকা। বুঝেছি, স্যু ছাড়া আর কেউ পারে না জ্যোৎস্না খাওয়াতে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র স্যু পারে। খুব ভাগ্যবান কেউ কেউ স্যু-র দেখা পায় তারা জ্যোৎস্নার স্বাদ জেনে যায়। আর কেউ জানে না।

জাহাজিটা রথম্যানের প্যাকেটটা গৌরের ডান হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে, বার ওয়েসিস, স্যু, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও।

গৌর একটু সময় নেয়। ব্যাপারটা তার এখনও হজম হয়নি।

জাহাজিটা মিনতি করে, দশটার পর স্যু থাকবে না, বার বন্ধ হয়ে যাবে, মেট। মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষের যে ব্যাপার স্যু-র সঙ্গে আমার তা নয়। আমি আর-একবার সেই জ্যোৎস্না খাব। তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। গত তিন বছর ধরে আমি কলকাতায় আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আজই জাহাজ ভিড়েছে। দুপুর গড়িয়ে নামার পারমিশান পেয়েছি। অন্য জাহাজিরা পাছে স্যু-র কথা জেনে যায় সেই ভয়ে আমি নেমেছি সবার পরে। এমনই কপাল, সব জাহাজি গাড়ি পেল, বাদে আমি। দু'ঘণ্টা ধরে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করেছি, একটাও থামেনি। সবশেষে তোমার ফাঁকা ট্যাক্সিটা দেখে উঠে বসে আছি, আমাকে ফেলে যেয়ো না, সেই জ্যোৎস্না স্যু ছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারে না মেট। সে পৃথিবীর জিনিস না। সেই মায়াবী বাগান, জ্যোৎস্না, সেইসব ফুল, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। কী নেশা তার। বয়স কমে যায়। চোখের জ্যোতি বাড়ে। শরীর ফুঁসে ওঠে। আর-একবার সেই জ্যোৎস্না খেতে পারলে আমি আর কোথাও যাব না। মেট, তাড়াতাড়ি করো, স্যুকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়!

ঠিক হয় তবে।— গৌর বিড়বিড় করে তার মিটারের ঢাকা খোলে, বন্ধ করে গেট। বিড়বিড় করে বলে, দুনিয়ার যত মাতাল আর পাগল গৌরার গাড়ির জন্য রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। চল বাবা ল্যাম্ভু, জাহাজিটাকে খালাস দিই।

গৌড় গাড়ি ছাড়ে। পিছনের সিটে ঝিম মেরে থাকে জাহাজিটা। আয় বাবা ধরমতলা, বার ওয়েসিস, জাহাজিটাকে ডেলিভারি দিই। গৌর বিড়বিড় করে। জ্যোৎস্না খাবে, মাইরি, জ্যোৎস্না খাবে! আই! গৌরের ব্যাপারটা হজম হয় না। সে আয়নায় দেখে, জাহাজীটা গম্ভীর স্থিরভাবে ঝুম মেরে আছে। আলোকিত এসপ্ল্যানেড গৌরের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

বার ওয়েসিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর। জ্যোৎস্না খাবে! মাইরি! গৌরের ধন্দ লেগে আছে এখনও। জাহাজিটা দরজা খোলার জন্য খুটখাট করে, পারে না। গৌর হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। জাহাজিটা নামে। একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কিপ ইট মেট। বলে হাত তুলে বিদায় জানায়। একটু টলমলে পায়ে উজ্জ্বল শুঁড়িখানার দিকে চলে যেতে থাকে।

গৌর চেঁচিয়ে ডাকে, এই, চেঞ্জটা নিয়ে যাও।

জাহাজিটা শুনতেই পায় না।

ভারী অপমান লাগে গৌরের; বখশিশ-টখশিশ সে কখনও নেয় না, দরকার মতো মিটারের বেশি পয়সা নেয় নিজের ইচ্ছেমতো। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটাকে কে দয়া করবে? কোন মালদার? বাপ বগলু তাকে স্বাধীন করে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কার দয়া ভিক্ষা করেছে?

গৌর মিটার দেখল। দেড় টাকা। ফেরত-পয়সা গুনে গেঁথে হাতে নিল সে। ফুটো পয়সার জাহাজিটার দয়া গৌর রিটার্ন দেবে।

সাবধানে গাড়িটা লক করে গৌর নামে। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তাবপর ধীরেসুস্থে ফুটপাথ পার হয়ে কাচের দরজা ঠেলে শুঁড়িখানাটায় ঢুকে পড়ে।

ভিতরে, শুঁড়িখানায় যেমন হয়, তেমনি নরম আলো-টালো, চেয়ার-টেবিল, কয়েকজন গম্ভীর

মাতাল। লম্বা কাউন্টারের ওপাশে কাচের ঝিলিক, নানা রঙের বোতল চিকমিক করে। সেই কাউন্টারে কনুইয়ের ভর রেখে তিন-চারজন মেয়েছেলে।

গৌর দরজার কাছে তার শুখো পায়ের ওপর তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে। জাহাজিটাকে নিম-আলোয় ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আরও দু'-এক পা এগোয় গৌর। দু'-একজন মুখ তুলে তার নেংচে-হাঁটা দেখে, একটা মেয়ে নিঃশব্দে হাসে, একজন বেয়ারা মাঝপথে থেমে তাকায়।

গৌর দেখতে পায় ছায়ার মতো জাহাজিটা সারা শুঁড়িখানা চক্কর দিয়ে দরজার দিকে আসছে।

গৌর হাত তুলে ডাকে, এই।

জাহাজিটা তার দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে। এগিয়ে এসে গৌরের দু'কাঁধ দু'হাতে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, নেই। এখানে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও।

বলে গৌরের হাত ধরে টানতে টানতে কাউন্টারের দিকে এগোতে থাকে।

কী হচ্ছে! ছেড়ে দাও।

জাহাজিটা কেবল চাপা গলায় বলে, কম অন। স্যুকে এইখানে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। কম অন।

কাউন্টারের স্যুট-পরা লোকটা মুখ তোলে। জাহাজিটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চোস্ত জাহাজি ইংরিজিতে বলে, স্যু, শ্যামলা পাতলা চেহারা, মিষ্টি মুখ, চোখের পাতা ভারী ভারী, খুব ফুর্তিবাজ, তিন বছর আগে এইখানে তাকে দেখেছিলাম, খোঁজ দিতে পারো?

লোকটা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে, না। ও নামে কাউকে চিনি না। তিন বছর লম্বা সময়, কত কী হয়ে যায়!

বলে লোকটা হাসে।

কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েদের সবচেয়ে কাছের জন জাহাজিটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বাংলায় বলল, আমরা সবাই স্যু, কেউ কু নই গো!

বলে হেসে অন্য একটি মেয়ের কাঁধে শরীর ছেড়ে দিল।

জাহাজিটা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে তাকে দ্যাখে, তারপর হতাশ গলায় বলে, না, তোমরা নও। স্যু অনেক জাদু জানত। সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

শোন লতিকা!— বলে সেই মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির কাঁধে হেসে গড়াল। দু'জনেই হাসতে থাকে। গৌরের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। বগলুর পোলা গৌরা এ কোন গাড্ডায় এসে পড়েছে! জাহাজিটা ধরে আছে তার শুখো বাঁ-হাতখানা। কমজোরি হাতটা তার, ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় নেই, চেঁচামেচিও করা যাচ্ছে না।

জাহাজিটা ঠোঁট চেটে বলে, বড় তেষ্টা। চলো একটু বিয়ার খাই।

গৌর মাথা নাড়ে, আমি না। চেঞ্জটা ফেরত নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

সেসব কথায় কানই দেয় না জাহাজি। বলে, তেমন কিছু না। একটু বিয়ার, এসো।

তার শুখো হাতখানা ধরে টেনে নেয় জাহাজি, এক টেবিলে পাশাপাশি বসে হাতখানা ধরে রাখে। ফিসফিস করে বলে, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না মেট। কলকাতায় এক স্যু ছাড়া তোমাকেই আমি চিনি। তুমি ভাল লোক।

দুটো বাহারি কাচের জগ-এ বিয়ার আসে। আসে সেঁকা পাপর, শসা আর পেঁয়াজের চাক। গৌর কিছু বুঝবার আগেই এসব ঘটে যায়। তখনও তার ডানহাতের মুঠোয় ফেরত পয়সা, বাঁ-হাতখানা জাহাজির কবজায়। ধন্দ ভাবটা গৌরের এখনও কাটেনি। মাথাটা ঝিমঝিম করে। সে একটু ভাববার চেষ্টা করে, এসব কী হচ্ছে! চোখ বন্ধ করে পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল গৌর, অমনি তার মাথার মধ্যে একখানা মল-পরা পা ঝম করে তাকে সতর্ক করে দিল। অমনি চোখ খোলে গৌর। মাথা নেড়ে ভাবনা-চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে।

মদ সে কখনও খায়নি, এমন নয়। খেয়েছে শখে শখে, নেশা করেনি। কিন্তু নেশা করলেই বা কী? এ দুনিয়ায় গৌরের আর ক্ষতির ভয় কী? যদি সে নিজে টিঁকে থাকে, আর থাকে তার ল্যান্ডমাস্টারখানা, তো এই জীবনটা পিছলে বেরিয়ে যাবে গৌর।

বুক জুড়ে তেষ্টা ছিল। হাতটা ছাড়ানো গেল না। মাথার মধ্যে মল-পরা পা আর-একবার ঝম করার জন্য ধীরে ধীরে উঠছে, টের পেল গৌর। এখনই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া দরকার। সে ঠান্ডা জগটা ঠোঁটে তোলে। তারপর আকণ্ঠ ডুব দেয় একটা। জাহাজিটা এক চুমুকে সবটা টেনে নেয়। তারপর মুখ তুলে বলে, বড্ড তেষ্টা। বেয়ারা!

বেয়ারা বিনীতভাবে টেবিলে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়।

আরও।

বেয়ারা জগ ভরে দিয়ে যায়।

মেয়েছেলেগুলো ঘুরঘুর করে চারপাশে। একটুক্ষণ। তারপরই ঝুপ করে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ে দু'জন। কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই দু'জনই।

একটু খাওয়াও না গো! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!— যে মেয়েটা হেসেছিল সে বলে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের তেষ্টা ফুটে আছে। কাছ থেকে এখন তার ভাঙা মুখ, মুখে ঘামে-ভাসা পাউডার, চোখের গাঢ় কাজল দেখা গেল। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাক দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী সেই লতিকা। একটু মোটাসোটা, কালো, পুরু ঠোঁট, বেশি বয়স। মুখখানা গোল, কপাল বেরিয়ে এসেছে ঝুলবারান্দার মতো। সে হাত বাড়িয়ে গৌরের জগটা ধরবার জন্য উদ্যত হয়েও ঠিক সাহস পায় না, হাতটা টেবিলের ওপর ওইভাবেই ফেলে রেখে বলে, নতুন পেগ না নাও, তোমাদের গেলাস থেকেই ঢেলে দাও একটু করে।

বলে সে টেবিলে উপুড় করে রাখা পাতলা গ্লাস উলটে বাড়িয়ে ধরে, দাও।

এইসব মেয়েছেলেদের বিস্তর দেখেছে গৌর। প্রায় একই রকম শ্রীহীন চেহারা, কেউ একটু রোগা, কেউ মোটা। মুখে প্রচুর পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, পরনে ঝলমলে শাড়ি। তার ল্যান্ডমাস্টারে মাঝে মাঝে এরকম মেয়েরা খদ্দেরের পয়সায় ফুর্তি লোটে। টের পেলে তোলে না গৌর, ভুল করে তুললে আয়নায় বিস্তর নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে গৌর তাড়া দিত, কিন্তু বিয়ারের ঝাঁঝটা তার পেট থেকে মগজে রিনরিন করে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেললে রিনরিন শব্দটা বহুদূর গভীরে গড়িয়ে যায়। গৌর তাই রাগ করে না। কেবল অবাক হয়ে বলে, এঁটো খাবে?

এঁটো আবার কী গো!— প্রথম মেয়েটা বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, মুখের এঁটোকে এঁটো ধরলে আমরা তো পচে গেছি।

আমাদের সবকিছু এঁটো!

বড় অশ্লীল কথা। অঙ্গভঙ্গিও ভাল না। গৌরের বড় ঘেন্না করে। সে অর্ধেক জগ মোটা মেয়েটার গ্লাসে ঢেলে দেয়, বাকি অর্ধেক টেনে নেয় নিজে। তারপর শ্বাস ছেড়ে মেয়ে দুটোকে বলে, এবার ফোটো। যথেষ্ট হয়েছে।

জাহাজিটা জগ-এ লম্বা ডুব মেরে মুখ তোলে। মেয়েদুটোর দিকে তাকিয়ে মাতাল হাসি হাসে, বলে, আরও খাবে? খাও। বেয়ারা!

মেয়েদুটো আনন্দে, সুখে ভেসে যায়। বেয়ারা বিনীতভাবে দুটো জগ ভরে দিয়ে যায়।

এবার বলো।— জাহাজীটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

কী?— মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

স্যু-র কথা।

মেয়েদুটো রুমালে মুখ চেপে হাসে।

কেমন ছিল তোমার স্যু?— রোগা জন জিজ্ঞেস করে।

লম্বা। সোনালি চুল। নীল চোখ। খুব ফরসা।

যদিও মাথাটা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তবু গৌর বোঝে জাহাজিটা ঠিক কথা বলছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, এই, তুমি যে একটু আগে বললে, শ্যামলা রং, চোখের পাতা ভারী ভারী।

লম্বা রথম্যান ধরিয়ে জাহাজিটা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাববার চেষ্টা করে বলে, বলেছি?

নিশ্চয়ই।— গৌর ডানহাতে টেবিলে চাপড় মারে।

জাহাজিটা শ্বাস ছেড়ে বলে, তবে তাই।

মাতাল।— গৌর হাসে।

জাহাজিটা প্রশ্ন করে, চেনো?

মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ে, না।

সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

রোগা মেয়েটা তার লম্বা দাঁতগুলো বের করে গরগরে হাসি হাসে, জ্যোৎস্না আমরাও খাওয়াতে পারি। চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, কত কী খাওয়াই আমরা।

জাহাজিটা স্থিরভাবে মেয়েটিকে লক্ষ করে, তারপর গম্ভীর গলায় বলে, পৃথিবীর সাত ঘাটের মেয়েমানুষ আমাকে ওই কথা বলেছে। কেউ পারেনি। তিন বছর ধরে আমার বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

গৌরকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহাজি।

চলো মেট, সময় নেই।

তারপর মেয়েদুটোর দিকে চেয়ে বলল, তোমরা খাও। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, তার জন্যে দুঃখ কোরো না। সময় বড় মূল্যবান, নইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতাম।

জাহাজিটা বিল মেটায়। গৌরের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।

গৌর চারদিকে একটা রিমঝিম আনন্দকে টের পাচ্ছিল। ঠিক নেশা নয়। কিন্তু রাস্তা দোকান সিনেমাহল-এর আলোগুলো আরও রঙিন, মানুষেরা ভারী আনন্দিত। চরাচর জুড়ে ফুর্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জাহাজিটাকে মনে হচ্ছে বহুকালের পুরনো বন্ধু, মাঝখানে কেবল একশো বছর দেখা হয়নি।

দু'জন সৈন্যের মতো পায়ে পা মিলিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে ল্যান্ডমাস্টারের কাছে আসে।

এবার কোথায়?

জাহাজিটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে, স্যু যেখানে। খুঁজে বের করতে হবে। কাছাকাছি কোনও বার-এ সে আছে।

গৌরের এখনও যাকে নেশা বলে তা হয়নি ঠিক। গাড়িটা সে দিব্যি চালায়। জাহাজি তার বাঁ পাশে, মাঝখানে সিটের ওপর রথম্যানের প্যাকেটটা পড়ে আছে। সবই বুঝতে পারছে গৌর। না, নেশা হয়নি। গাড়িটা মাখনের মতো যাচ্ছে।

ব্যস মেট। একবার এ জায়গাটা—

জাহাজি হাত বাড়িয়ে গৌরের হাত চেপে ধরে।

গৌর গাড়ি থামায়। বাঁ পাশে আর-একটা বার। খুব বড় নয়, কিন্তু জায়গাটার বেশ ফুর্তিবাজ চেহারা। আলোয় আলোময়। দুঃখ-কষ্টের কথা ভুল পড়ে যায় মানুষের।

জাহাজি হাত ছাড়ে না।

নামো।

গৌর হাই তুলে বলে, আমি বরং বসে থাকি, তুমি খুঁজে এসো।

না, আমি একা খুঁজে পাব না। শহরটা বড় অচেনা লাগছে, নামো মেট।

গৌর নামে।

জায়গাটা ফুর্তিবাজ ঠিকই। ঢুকতেই আচমকা একটা মোলায়েম শীতভাব জড়িয়ে ধরে। গিজগিজ করছে লোকজন, কাউন্টারে বেয়ারাদের ভিড়। একধারে কাঠের পাটাতনে মাইক্রোফোনের মাউথপিস মুখের কাছে ধরে দরাজ গলায় গান গাইছে কালো চেহারার একটা লোক, বোঙ্গো বাজছে দমাদম। লোকটা দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে গায় হিন্দি বিষাদসংগীত। তবু ফুর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সুদিন এসে গেছে এইখানে। গান গাইছে টাবু। টাবু সিংগস! আঙুরের রস তার গলা ছুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মনের গেলাসে।

সিনেমার মতোই কাচ লাগানো একটা কাউন্টারের ওপাশে সাহেবি চেহারার দু'জন লোক ভারী ব্যস্ত। টাকা-পয়সা গুনে নিচ্ছে। জাহাজিটা কাচের ওপর টোকা দিতে দু'জন মুখ তোলে।

স্যু নামে একটি মেয়ে, গায়ের রং শ্যামলা, বাদামি চুল, নীল চোখ—

মাতাল। গৌর হাসে। বলে, অ্যাই, গায়ের রং শ্যামলা হলে চোখ নীল হয় কী করে? অ্যাঁ!

হয় না?— ভারী অবাক হয় জাহাজি। বলে, তবে কী রকম চোখ ছিল তার?

গৌর একটু ভাববার চেষ্টা করে। মাথা রিমঝিম করে তার। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলে, কালো।

তো তাই।

জাহাজিটা আবার লোকদুটোর দিকে ঝুঁকে বলে, তার চোখ আর চুল কালো, খবর দিতে পারো? লোকদুটো গম্ভীর বিনীত মুখে শোনে। একজন নরম গলায় বলে, দুঃখিত। আমাদের এখানে নেই।

আমরা একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা?

অফ কোর্স। বেয়ারা নিয়ে যাবে তোমাদের।

আধবুড়ো ভদ্র এক বেয়ারা তাদের নিয়ে যায়। টাবুর গান থেকে দূরে ছায়াচ্ছন্ন কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে, ড্রিংকস?

হুইস্কি।— বলে ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রাখে জাহাজি।

এই!

ডাক দেয় গৌর।

অনেকক্ষণ বাদে মাথা তোলে জাহাজি। চোখ রক্তজবা। গলায় টাবুর বিষাদসংগীতের বিষাদ এসে বাসা নিয়েছে। বলে, এখানে স্যু নেই। এসব তার জায়গা নয়। আরও নিরিবিলি জায়গায় তার থাকার কথা।

বোঙ্গোর শব্দ মৃদু গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। টাবু তার বিষাদসংগীতের করুণতম অংশে এসে গেছে। ঘুমপাড়ানির মতো মৃদু, অশ্রুরুদ্ধ তার গলা। যেন বা এই রাত আর ভোর হবে না। মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে পৃথিবী। টাবুর অনন্ত বিষাদ বুকে নিয়ে সরে যাবে মানুষ। লোকে তাই শেষ আনন্দটুকু গেলাস থেকে তুলে নিক।

গৌর নিল। জাহাজিও।

আমি জানি স্যু এখানে নেই। এখানে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পেতাম।— জাহাজিটা ফিসফিসিয়ে বলে।

গৌরেরও তাই মনে হয়। তার চোখে কোনও মেয়েছেলে পড়ে না। তবু সে একবার চারদিক চেয়ে দেখে, না, নেই।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠে বোঙ্গোর শব্দ। দুলে ওঠে টাবু। আশা-নিরাশায় দোলে মানুষের মন।

চলো মেট।

গেলাস শেষ করে গৌর ওঠে। একটু দোলে তার শরীর। মাথা ফাঁকা লাগে। তবু বলে, চলো।

কোথাও না কোথাও আছেই।— জাহাজি আত্মবিশ্বাসে বলে।

গৌর তা বিশ্বাস করে। কলকাতার জ্ঞান তার নখে নখে। কোথায় যাবে জাহাজির মেয়েছেলে স্যু? গৌর ঠিক বের করবে।

যদিও একটু দুলছে কলকাতার রাস্তাঘাট, তবু গৌর, বগলুর ছাওয়াল, যার হাতে গাড়ি কোনওদিন ঘষাটাও খায়নি, ঠিক গাড়িটা বের করে আনল চৌরঙ্গির বড় রাস্তায়।

ওই যে দেখছ উঁচু মিনার, ওই যে—

এই বলে জাহাজি গৌরকে কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে অদূরের মনুমেন্টটা দেখায়। গৌর দেখে।

জাহাজি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, ওই মিনারটা আমি আমার মায়ের চিতার ওপর তুলেছিলাম। ভাল হয়নি?

মনুমেন্টটাকে আবার ভাল করে দেখে গৌর। দেখে-টেখে মাথা নেড়ে বলে, ভাল। দিব্যি উঁচু।

আই!

জাহাজি শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়।

পার্ক স্ট্রিটকে কখনও কলকাতা বলে মনে হয় না গৌরের। বিয়ারের মাথায় হুইস্কি বসে আছে পেটে। এখন তাই আরও মনে হয় না। স্পষ্টই যেন লন্ডনের এক রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

জাহাজি বলে, লন্ডন হুবহু এরকম।

গৌর হাসে।

সামনেই একটা বিশাল রেস্তরাঁর চওড়া মুখ, সে মুখে হাসি।

গেট-এর কাছে দু'জন সাহেবি পোশাক পরে দাঁড়ানো। তারা সিঁড়িতে পা দিতেই দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আপনা থেকেই। ভারী অবাক হয় গৌর। এরকম জাদুই দরজা সে আর দেখেনি। দরজাটা পরখ করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে, জাহাজিটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

কম অন। সময় নেই। এখনও আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখছ না?

গৌর আকাশ দেখার জন্য মুখ তুলল। তুলে দেখল, সুন্দর সিলিং, তাতে নরম রঙের ওপর মানুষের কত কারুকাজ, কাচে ঢাকা আলো। জ্যোৎস্নার মতোই। কিংবা ঠিক জ্যোৎস্নার মতো নয়। কিন্তু সুন্দর।

তারা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটে। কী নরম! এরকম কার্পেটের ওপর হাঁটলে গৌরের শুখো পায়ে কোনও ব্যথা লাগে না। কার্পেটটা একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল গৌর। জাহাজি তাকে টেনে তুলল।

সময় নেই মেট।

ওঃ হ্যাঁ, ঠিক। গৌর বুঝতে পারে।

এমন সুন্দর জায়গা, তবু কেউ কোথাও তাদের পথ আটকায় না। বলে না ভিতরে যাওয়া বারণ। কেন বলে না? অ্যাঁ! গৌর বুঝতে পারে না। তার দাদা রাখোহরি যখন এসব জায়গায় আসত, গৌরই পুরনো ডজ গাড়িটায় নিয়ে আসত তাকে। স্যুট আর বো পরা বিলেতফেরত সুন্দর চেহারার রাখোহরি অনা য়াসে ঢুকে যেত সব জায়গায়। পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িটার গা মুছতে মুছতে ভয়ের চোখে চেয়ে দেখত গৌর। তার ধারণা ছিল, হাফ-ফিনিশ গৌরার এসব জায়গায় অ্যাডমিশন নেই। সেই ধারণা নিয়েই সে এত বড়টা হল। অথচ আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব দরজা খুলে যাচ্ছে আপনা থেকে, একটু নেংচে হাফ-ফিনিশ গৌরা, বগলুর ছাওয়াল, অর্থাৎ কিনা বগলাপতির তিন নম্বর, আজ যে সব জায়গায় চলে যেতে পারছে। কী হচ্ছে এসব! অ্যাঁ! এরকম আর দেখেনি গৌর। প্রজাপতি, রামধনু, সুন্দরীর চোখ, এইসব জিনিস দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে এই দোকান। এখানে দেয়াল নেই, কড়িকাঠ নেই, দরজা জানালা নেই, কেবল আলো আর রং, গন্ধ আর সুন্দর শব্দ, একটু স্বপ্ন আর

কল্পনার মিশেল। পৃথিবীরই, তবু ঠিক পৃথিবীতে নয়। একটু উঁচুতে যেন বা বাতাসে ভর করে আছে জায়গাটা! বাতাসে ভর করে আছে? সত্যি? পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা লাফ দিল গৌর। দেখল দোলে কি না। হ্যাঁ, দোলে। একটু একটু।

জাহাজি তাকে টেনে বসায়, গভীর পালকের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে গৌর। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়।

কে যেন মুখের কাছে ভরা গেলাস রাখে। গৌর ঠোঁটে তোলে গেলাস। আনন্দে চোখের জল নেমে আসে।

একটা ভিতর প্রকোষ্ঠের দরজা নিঃশব্দে খোলে। উদ্দণ্ড ড্রামের শব্দ, সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শোনা যায়। আবার দরজা বন্ধ হয়। শব্দটা ক্ষীণ হৃৎপিন্ডের শব্দের মতো টিপটিপ করে বাজে।

জাহাজিটা হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায়।

চলো মেট, শিগগির।

কোথায়?

ওইখানে। ভিতরে কোথাও নাচ হচ্ছে, একটা মেয়ে. স্যু হতে পারে।

গৌর ওঠে।

সত্যিই একটা রঙিন দরজা রয়েছে। সামনে সতর্ক পাহারা। তারা দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা হাত এগিয়ে আসে।

টিকিট?

জাহাজি হিপ পকেট থেকে টাকার গোছাটা টেনে বের করে। অফুরন্ত টাকা। দরজা খুলে যায়।

লোলা নাচছে স্পটলাইটে। আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায় লোলা। আলোটা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করে। লোলার বাদামি শরীরের চামড়া যেন তেল মাখা। চামড়ার তলায় তার খেয়ালি নরম মাংসের ঢেউ। কোমরে জাফরান রঙের পুঁতির ছোট্ট ঘাগরা, বুকে জাফরানি পুঁতির কাঁচুলি, মাথার চারদিকে ঘিরে আছে এক সবুজ সাপ, চুলের চূড়ার ওপর তার ফণা। আলো থেকে অন্ধকারে, আবার আলোয়, মায়াবী যাতায়াত করে লোলা। পৃথিবীর পুরুষকে ডাক দেয় তার পায়ের তলায়। নরমুণ্ড লুটিয়ে পড়ে পায়ে। লোলা অন্ধকারে, আবার আলোয়, আবার অন্ধকারে, তার জাদুকরী মুদ্রাগুলি ছিটিয়ে দেয়। আলো তাকে চঞ্চল হয়ে খোঁজে, খোঁজে অন্ধকার। চারদিকে অনেক মানুষ, কাউকে দেখা যায় না। কেবল অন্ধকারে সিগারেটের আগুন তীব্র হয়ে উঠে মিইয়ে যায়। শ্বাস পড়ে, শ্বাস ওঠে, কাউকে দেখা যায় না। চরম মুহূর্তের কাছে উঠে যায় ড্রামের অসহ্য আনন্দের শব্দ—লোলা-লোলা-লোলা।

হঠাৎ আলো নিভে যায়। গৌর টপ করে চোখ বুজে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে কখনও ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখেনি।

অন্ধকারেই জাহাজি তার হাত চেপে ধরে, মেট, এ নয়।

নয়?

নাঃ।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তারা বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু তখন লোলা তার ঘাগরা ছেড়েছে, কাঁচুলি দিয়েছে ফেলে। অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। পাগলের মতো আলো তাকে খুঁজছে। লোলা দু'হাত বাড়িয়ে আলোকে বলছে। এসো, এসো, এইখানে পৃথিবীর প্রিয়তমা লোলা।

তবু সে স্যু নয়। হতাশ জাহাজিকে সে খাওয়ায়নি অলৌকিক জ্যোৎস্না। দুটি দুঃখী লোক তাকে অবহেলা করে চলে গেল।

দুটি মানুষের কাছে ব্যর্থ লোলার নগ্ন শরীরে তখন লাল নীল সবুজ আলোগুলো পাগলের মতো

এসে আঘাত করছে, মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তখন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে স্যু-র খোঁজে।

আই! গৌর টের পায়, গাড়িটা উড়ছে। উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে পার্ক স্ট্রিটের আলোর ধাঁধা। গৌর চোখ কচলে নেয়। মোড়ের ট্র্যাফিক-বাতি দেখতে পাচ্ছে না সে, দেখবার দরকারই বা কী! গাড়িটা উড়ছে যখন।

মেট!— জাহাজি মৃদুস্বরে বলে।

উম।

নেশাটা কেটে যাচ্ছে। কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়।

হবেও বা। গৌর জানে না। সে ঝুঁকে রাস্তাটা দেখে। ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। চোরাগলির অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। চলেছে মাতাল, ভিখিরি, মতলববাজ লোক, এসবের ওপরে ওই আকাশ। জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ওই আকাশে থাকেন ফাদার ফ্রান্সিস। তাঁকে ঘিরে থাকে স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল সবুজ বল গড়িয়ে সারা দিনমান শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন ফাদার। পৃথিবীর ওপরে যে আকাশটা আছে সেটা মানুষের বাবার ভাগ্যি। গৌর মাঝে মাঝে তাই চোখ তুলে আকাশখানা দেখে। ভারী খুশি হয়। গাড়িটা আর-একটু উঁচুতে উঠে যায়। ভাল লাগে গৌরের। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, দেখ, কত উঁচুতে উঠেছি।

জাহাজিটা গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে চায়, তারপর বলে, আর একটু ওপরে ওঠো মেট। স্যু বোধহয় পৃথিবীতে নেই। এখানে বড় ধুলো ময়লা, নোংরা মানুষ। এ সব দেখে সে বোধহয় উঁচুতে উঠে গেছে।

মাতাল। গৌর আপনমনে হাসে। একটা লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যায়। পুলিশ নেই। কেউ তাকে থামায় না।

জাহাজিটা এলিয়ে পড়েছে সিটে। বিড়বিড় করে বকছে, বাড়ি-বাড়ি খুঁজব। ভিখিরিদের মুখ দেখে দেখে ফিরব। প্রতিটি শুঁড়িখানায়, বেশ্যার ঘরে, দোকানে, অফিসে। কোথায় যাবে স্যু?

গৌর রাস্তাটা ভাল দেখতে পায় না। কুয়াশা হয়েছে নাকি? কিংবা স্বপ্ন দেখছে? সামনের রাস্তাটা জুড়ে পরি নামছে। শিশু-পরি সব। ন্যাংটো, ফরসা, সুন্দর। দুটো করে ছোটো ডানা। গাছে গাছে ফলের মতো ঝুল খাচ্ছে। রাস্তায় খেলা করছে। ব্রেক কষে গৌর। চোখ মুছে নেয়। হর্ন দেয়। চাপা পড়বে যে বাবারা সব! ওড়ো, উড়ে যাও।

তারপরই হাসে গৌর। চাপা দেবে কী? উড়ন্ত গাড়ি কাউকে চাপা দেয় না। গৌর আবার গাড়ি ছাড়ে। আকাশে ফাদার ফ্রান্সিস রয়েছেন। শিশুদের তিনিই সরিয়ে নেবেন। ভয় নেই।

কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়, বুঝলে মেট? ভীষণ জল মেশায়।— বলে হেঁচকি তোলে জাহাজি।

গাড়িটা জোরে চালাও মেট। নইলে জমছে না। আমার নেশা কেটে যাচ্ছে।

পাগলা! জোরে চালালে ওদের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে।

কাদের?— জাহাজি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ওই যে, পরিরা নেমেছে সব। বাচ্চা পরি, ভাল উড়তে শেখেনি এখনও।

জাহাজি ঝুঁকে রাস্তাঘাটে পরি দেখার চেষ্টা করে।

কোথায় পরি?

শালা মাতাল। দেখতে পাচ্ছে না। গৌর হাসে।

ওই তো। সব জায়গায় রয়েছে। গাছে ঝুল খাচ্ছে, রাস্তায় খেলছে, আকাশে উড়ছে, কোথায় নেই? ওই দেখো একজন আমার গাড়ির বনেটে বসল, ওই আবার উড়ে গেল। নীল চোখ, কী সুন্দর নীল চোখ!

জাহাজি শ্বাস ফেলে বলে, দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতার শুঁড়িরা বড্ড জল মেশায় মদে।

কিন্তু পরিরা আছে ঠিক। সেন্ট অ্যান্টনিজে এরকম পরিদের ছবি ঘরে ঘরে ঝোলানো থাকত। সোনালি ডানা, লাল ঠোঁট, নীল চোখ...

জাহাজি বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে, নীল চোখ! নীল চোখ! স্যু-রও ছিল ওই নীল চোখ। ঠিক নীল নয়, একটু বাদামি। কিন্তু ওর গায়ের রং ছিল বড্ড কালো। যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত, বুঝলে, যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত তখন ওকে কিছুতেই খুঁজে পেতাম না। ওর ওই কালো রঙের জন্যই। স্যু-র বুকভরা দিল, একশো মজা। বাতি নিভিয়ে সে লুকোত, আর আমি দু'হাত বাজিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে কখনও দেয়ালে, কখনও ওয়ার্ডরোবে, কখনও খাটের বাজুতে ধাক্কা খেতাম। ও লুকোত খাটের তলায়, আলমারির ভিতরে কিংবা ছেড়ে রাখা পোশাকের নীচে। একশো মজা ছিল ওর। বড্ড কালো ছিল বলে—

কালো!— গৌর ভারী অবাক হয়, কালো কোথায়! তুমি যে বললে, ফরসা আর নীল চোখ!

বলেছি?

আলবাত!

তবে তাই।— জাহাজিটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে. তবে তাই। কিন্তু তাহলে অন্ধকার ঘরে ওকে খুঁজে পেতাম না কেন?

গৌর হাসে, দূর। অন্ধকার ঘরে কালোই কী, ফরসাই কী? সব সমান। সোজাসুজি একটা নিয়োন সাইন ছিল। কী যেন সাইনটা! আঃ হাঃ, কী যেন? ঠিক মনে পড়ছে না, কী যেন?

লিপটন? লুফটাহানসা? গুড ইয়ার? ক্যাপস্টান?

নাঃ। ওসব নয়। কলকাতার শুঁড়িরা—

জাহাজি হেঁচকি খেল।

যেতে দাও।— গৌর বলে।

জাহাজিটা মাথা নাড়ে, না না। যেতে দেব কেন? সেই নিয়োন সাইনটা ছিল খুব ইম্পর্ট্যান্ট। খুব। দাঁড়াও মনে করি।

জাহাজি মুখে আঙুল পুরে ভাবে। শিস দেয় মাঝে মাঝে। ওদিকে রাস্তায় পরিরা আরও নামছে। কলকাতা জুড়ে কেবলই পরি নেমে আসছে। দু'-তিনজন গাড়ির জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কাচ তোলা বলে পারছে না। আহা! গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের জানালার কাচ নামায়। বোসো বাবারা। বসে থাকো! আমি তোমাদের পুরো কলকাতা দেখিয়ে দেব।

ইয়াঃ! সেই নিয়োন সাইনে লেখা ছিল—ইউ ওয়ান্ট লায়লাজ ব্রেড। তুমি চাও লায়লার রুটি। প্রথমে জ্বলত 'তুমি', তারপর 'চাও,' তারপর 'লায়লার', সবশেষে 'রুটি', চারটে শব্দ। 'তুমি' জ্বললে ঘরটায় স্বচ্ছ আলো আসত—সবুজ আলো। দ্বিতীয়টা ছিল 'চাও', সেটা জ্বললে আরও একটু সবুজ আলো আসত। তারপর 'লায়লার' থেকে রুটি পর্যন্ত চমৎকার আলো হত ঘরে। সবুজ আলোয় ভরে যেত ঘর। মনে হত, মাঠঘাট, সবুজ ঘাস— এই সবের মধ্যে রয়েছি। আবার হঠাৎ দপ করে নিভে যেত আলো, কী অন্ধকার এখন। ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ আবার জ্বলে উঠত—'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর—

জাহাজিটা হেঁচকি তোলে।

পিছনের জানালা গলে তিনটে পরি ঢোকে। গৌর আড়চোখে আয়নায় দেখে নেয়। ন্যাংটাপুটো. সাদা। মোটা মোটা থোরা, নধর হাত, নাদা পেট। সোনালি ডানাগুলো পাতলা ফিনফিনে, যেন বা মাকড়সার জালে তৈরি পাখাগুলো থিরথির করে কাঁপে।

ই-ফ!— জাহাজি আবার হেঁচকি গেলে।

চোপ!— ধমক মারে গৌর, হেঁচকি তুলো না। পরিরা ভয় পাবে।

জাহাজি অবাক হয়ে বলে, কারা বললে?

পরিরা।

কোথায়?

পিছনের সিটে বসে আছে। তিনজন। এখন হেঁচকি তুলো না।

জাহাজি মুখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে, কোথায় কী?

আছে। তাকিয়ো না।

জাহাজি গম্ভীর হয়ে বলে, আসলে কলকাতার শুঁড়িরা—

বলে ঠোঁট চাটে জাহাজি। গৌর গাড়িখানা ফাঁকা রাস্তায় ঘোরাতে থাকে। ড্যাশবোর্ডে তেলের কাঁটা নেমে যাচ্ছে। গৌর তা লক্ষ্য করে না। সে কেবল চরাচর জুড়ে পরিদের কাণ্ড দেখে।

জাহাজিটা বলে, আমরা জানালায় বসে সেই নিয়োন সাইনটা দেখতাম।

কোন নিয়োন সাইন?

সেই যে, তুমি চাও লায়লার রুটি। সবুজ রঙের নিয়োন সাইন। ঘরটা সবুজ আলোয় চমকাত। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যু, লায়লা কে? স্যুও আমাকে জিজ্ঞেস করত, লায়লা কে? আমরা কেউ বলতে পারতাম না। অথচ নিয়োন সাইনটা সন্ধে রাত্রি থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবুজ আলো দিয়ে একই কথা বলত, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...লায়লার রুটি। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যু, তুমি লায়লার রুটি চাও? সে বলত, চাই। ফের সে আমাকেও ওই কথা জিজ্ঞেস করত, আমিও চাই কি না, আমি বলতাম, চাই। কিন্তু মেট, খুঁজে দেখেছি, সেই রুটি পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় না?

না।

সে কী! তাহলে নিয়োন সাইনটা ছিল কী করতে?

জাহাজিটা একটু ভেবে বলে, অবিশ্যি দিনের বেলা তো কখনও লায়লার রুটির খোঁজ করিনি। দিনের বেলা মনেই থাকত না। রাত্রি বেশি হলে যখন নিয়োন সাইনটা নজরে পড়ত, তখন আমরা খুঁজতে বেরোতাম। পাওয়া যেত না। মেট, সেই থেকে লায়লার রুটির জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। এখনও মাঝে মাঝে মাঝ-রাতে ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি, নিয়োন সাইন জ্বলে জ্বলে উঠছে, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...ভয় পেয়ে উঠে বসি, আর তখন বাদবাকিটা মনে পড়ে, লায়লার রুটি...লায়লার রুটি...লায়লার রুটি...

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজিটা ঠোঁট চাটে। একটা রথম্যান ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই জ্বালতেই গৌর ধমকায়, আলো জ্বেলো না।

কেন?

পরিরা পালাবে।

আঃ! জাহাজি হতাশভাবে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর বলে, লায়লার রুটি। সবুজ আলো, স্যু, জ্যোৎস্না—মেট, এসব কোথায় গেল? কলকাতা একদম শুকিয়ে গেছে যে। কিছু নেই!

গাড়িটা আপনা থেকেই ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছিল। গৌর দিক ঠিক করতে পারে না। আসলে গাড়ি যখন মাটির ওপর দিয়ে যায় তখন রাস্তাঘাট ঠিকই চিনতে পারে গৌর, গৌরা, বগলাপতির ব্যাটা। তখন তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। কিন্তু এখন, এই পরিদের রাজ্যে চলে এলে, মাঝরাতে দিক নির্ণয় করা ভারী মুশকিল। গাড়ি তখন নিজের থেকেই চলে। গৌর কেবল নিমিত্তমাত্র।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের একদিকটা কালিবর্ণ, বেশ্যার চোখের কাজলের মতো, সেই কালিবর্ণে ফ্যাকাসে শসার মতো চাঁদ ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গৌর এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জাহাজি হঠাৎ আঁতকে উঠে বলে, এটা কোন জায়গা। অ্যাঁ! কোন জায়গা? থামো মেট।

গৌর থামে।

একটা পুরনো প্রকাণ্ড বাড়ি বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। রাস্তাটা নিঝঝুম। চারদিকে সুনসান নির্জনতা। রাস্তায় সারি সারি গাছ। গাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় টিমটিমে আলো। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে আলোগুলো দোল খেয়ে যেতে থাকে। গৌর রাস্তাটা ঠিকঠাক চিনতে পারে না। গম্ভীর গলায় বলে, কী জানি!

জাহাজিটা মুখ তুলে বাড়িটা দেখে।

মেট!

উম।

এই বাড়িটা আমার চেনা।

গৌরও বাড়িটা দেখে। কলকাতার প্রথম বয়সে তৈরি বাড়ি। পলেস্তারা খসে পড়ছে। বোধহয় কর্পোরেশনের নোটিশ পেয়েছে। ভেঙে ফেলা হবে। তাই সবাই ছেড়ে গেছে বাড়ি। একা অন্ধকার বাড়িটা আয়ুর শেষে ক'টা দিন নির্জনে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

গৌর হাই তোলে।

জাহাজি হঠাৎ গৌরের হাত চেপে ধরে বলে, বাড়িটা আমি চিনি মেট। এখানে আমি এসেছি।

কার কাছে?

জাহাজি ফিসফিস করে বলে, স্যু-র কাছে।

গৌর চমকে বলে, এই বাড়িটাই?

তারা নামে। আগে জাহাজি, পিছনে গৌর।

বাড়ির দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। একটা পাল্লা বাতাসে নড়ে চামচিকের মতো শব্দ করছে। আরশোলার নাদির গন্ধ পাওয়া যায়। আর বহু পুরনো এক বদ্ধ বাতাসের ঘ্রাণ।

জাহাজি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, এইটাই। সেটারও দরজা এরকম চামচিকের মতো শব্দ করত।

জাহাজি শ্বাস ছাড়ে। বলে, মেট, চলো। দেখা যাক।

দু'জনে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। সিঁড়ি যতই ওপরে উঠেছে ততই আরও অন্ধকার, পিছল পিছল, ধাপ তত উঁচু উঁচু। ক্রমান্বয়ে চুন-বালি খসে পড়ার একটা ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ হতে থাকে। মুখে গায়ে ঝাপটা মেরে উড়ে যায় চামচিকে। টিকটিকি ডাকে।

ক'তলায়?— গৌর জিজ্ঞেস করে।

দশ তলায়। আমার মনে আছে।

গৌর অবাক হয়ে বলে, কিন্তু এ বাড়িটা তো মোটে চার-পাঁচ তলা।

ঠিক বলছ?

ঠিক। এ কলকাতার পুরনো বাড়ি, চুন-সুরকির গাঁথুনি, এর ওপর দশ তলা হয় না।

তাহলে!— বলে জাহাজিটা নাক চুলকোতে চুলকোতে ভাবে। বলে, তাহলে ক'তলায়! ঠিক মনে পড়ছে না তো!

চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝি হঠাৎ ডেকে উঠে আরও নিস্তব্ধ করে দিতে থাকে। চুনবালি খসছে তো খসছেই। ঝিরঝির ঝুরঝুর। বাইরে পরিরা নামছে এখন। কিন্তু এখানে, বাড়িটার ভিতরে কেবল হাজার বছরের অন্ধকার। হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোব গন্ধ।

দু'জনে আবার সিঁড়ি ভাঙে। পলেস্তারা খসে, চুনবালি পড়ে সিঁড়িতে পুরু আস্তরণ। পায়ে লেগে ঢেলা গড়িয়ে পড়ে। ইঁদুরের নরম পা তাদের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দৌড়ে যায়। মুখে গায়ে লেগে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে সেই মিহিন পতনের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর। আপনা

থেকেই বাড়িটা অবিরল ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা জানলা হাঁ-হাঁ করছে খোলা। বেশির ভাগেরই পাল্লা নেই। দু'-এক জায়গায় বাঁশের ঠেকনা দাঁড় করানো আছে। জাহাজিটা ভালুকের মতো ঘরে দোরে ঢুকে দেখে। চারদিক খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো মুখ তুলে বাতাস শোঁকে।

কোনও ঘরেই নেই খাট পালং, টেবিল চেয়ার, আলমারি। কিছু নেই। দু'-একটা কৌটো-বাউটো পায়ে লেগে শব্দ করে গড়িয়ে যায়। একটা শিশি পড়ে ভেঙে গেল।

মেট!

উম।

এই বাড়িটাই। এইখানে স্যু থাকত। এইসব ঘর আমার চেনা।

আবার তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। ওপরে আবর্জনা বেশি। ইঁটের স্তূপ পড়ে আছে। ইঁদুর চামচিকে আরশোলা ঝিঁঝি অবিরল নানারকম শব্দ করতে থাকে। তারা এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়। ঘরের পর ঘর দেখতে থাকে। এক-একবার এক-একটা জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখে জাহাজি। মাথা নেড়ে বলে, এ ঘর নয়। এখান থেকে লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন দেখা যায় না তো! অন্য ঘরে চলো মেট। যে ঘর থেকে সবুজ নিয়োন সাইনে দেখা যাবে, তুমি চাও লায়লার রুটি, সেইটাই স্যু-র ঘর। প্রথমে জ্বলবে 'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর 'লায়লার', সবশেষে 'রুটি'।

অন্ধকার ঘরে, প্যাসেজে, বারান্দায়, প্যানট্রিতে তারা বার বার হোঁচট খায়। ডেব্রিসের ওপর হাঁটু ভেঙে যায়। আরও বাঁশের ঠেকনা, ডেব্রিস, ইটের স্তূপ তারা চারদিকে টের পায়। বার বার দেশলাই জ্বালে জাহাজি। চারদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির জরা ম্লান ছবির মতো জেগে উঠে মিলিয়ে যায়। পোড়া কাঠি ছুঁড়ে ফেলে জাহাজি মাথা নাড়ে, না, এ ঘরটা নয়। কিন্তু এই বাড়িতেই ঘরটা আছে মেট। অনেকটা এইসব ঘরের মতোই। স্যু তো কালো ছিল, ভীষণ কালো। বাতি নিভিয়ে যখনই সে লুকোত তখন অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পেতাম না। বাইরে তখন বার বার জ্বলে উঠত, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...লায়লার...লায়লার...রুটি। সবুজ আলোয় ঝলসে ঝলসে উঠত ঘর, কিন্তু সেই আলোতে ঠিক গায়ের রং মিলিয়ে লুকিয়ে থাকত সে। কিন্তু তার গায়ে একটা সুগন্ধ ছিল। সেই গন্ধটা ঘর ভরে থাকত। আমি সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে চারধারে খুঁজতাম। ধরি ধরি করেও, কাছাকাছি গিয়েও ছুঁতে ধরতে পারতাম না। পালিয়ে যেত। তখন আবার পাগলের মতো খুঁজতাম। বাইরে তখন সবুজ আলো দপদপিয়ে উঠত, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...এইরকম—ঠিক এইরকম ঘরে সেইসব দারুণ ঘটনা ঘটত।

প্রকাণ্ড পাঁজর-কাঁপানো শ্বাস ছাড়ে জাহাজি। বলে, বুঝলে মেট, বড্ড কালো ছিল স্যু, কিন্তু মধুরঙের চুল ছিল তার। খয়েরি চোখ—

খয়েরি?— অবাক হয় গৌর।

খয়েরি নয়?

দূর! বাদামি তো।

তবে তাই।— জাহাজি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়।

আর ফরসা রং।

ঠিক আছে।

আর কালো চুল।

আই।— জাহাজি বলে। বলেই শ্বাস ছাড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরায়। সেটা নিভে যেতে হতাশভাবে আবার মাথা নাড়ে।

আবার পুরনো পিছল অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙে তারা। টের পায়, সেই অন্ধকারে এক আলাদা জগৎ রয়েছে। সে জগৎ মানুষের নয়। চামচিকে, আরশোলা, ইঁদুর, ঝিঁঝির। রয়েছে তাদের ভয়, খেলা, আত্মীয়তা। তারা নড়ে চড়ে, দৌড়ায়, ওড়ে, ডাকে। একটি বহু পুরনো বাতাস বাড়িটার ভিতরে

এখনও রয়ে গেছে। তাতে একশো-দুশো বছর আগেকার মানুষের শ্বাস মিশে আছে। অবিরল বাড়িটার বিন্দু বিন্দু গুঁড়ো গুঁড়ো পতনের মিহিন শব্দ হয়। ঝিরঝির ঝুরঝুর। ক্ষয়, অবিরল ক্ষয়।

অন্ধকারে জাহাজি হঠাৎ লাফ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে যায়।

কর্কশ চাঁপা গলায় বলে, মেট, এইখানে একটা বন্ধ দরজা।

দরজা?

দরজা। দুটো পাল্লা বন্ধ।

অন্ধকারে গৌর কিছুই দেখে না। উঠে আসে। জাহাজি দেশলাই জ্বালতেই দেখা যায়, দুই মানুষ সমান উঁচু এক বিশাল, নিরেট, বিবর্ণ দরজা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজি হাতড়ে দরজাটা দেখে বলে, মেট, ভিতর থেকে বন্ধ।

এইটাই কি স্যু-র ঘর?

মনে হচ্ছে।

জাহাজি সাবধানে দরজায় টোকা দিয়ে বলে, কে আছ?

সাড়া নেই।

কে আছ?

সাড়া নেই।

জাহাজি ক্রমে ক্রমে জোরে, আরও জোবে কড়া নাড়তে থাকে।

কে আছ? কে আছ? কে আছ?

প্রকাণ্ড পুরনো বাড়িটা তার স্বর শুষে নিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল চামচিকের ডানা নড়ে। টিকটিকি হঠাৎ ডেকে ওঠে। অলক্ষে চুনবালি খসে পড়ার শব্দ হয়। ক্ষয়ের শব্দ। পতনের।

জাহাজি দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে শোনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে গৌরহরি একটা রথম্যান ধরায়। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। চোখের সামনে রঙিন ডানাওয়ালা পরিরা ভেসে ওঠে। গৌর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকে।

মেট!

উম।

ঘরের ভিতরে শ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে।

অ্যাঁ!

কেউ আছে। শোনো।

গৌর কান পাতে। বহুকালের পুরনো কাঠের দরজাব গন্ধ পায় গৌর। ভারী কাঠের, পুরু পাল্লার দরজা। গৌর কোনও শব্দ পায় না। সে কান পেতে কেবল অবিরল বাড়িটার ক্ষয়ের শব্দ পায়। চামচিকের ডানা বাতাস কাটে। টিকটিকি ডাকে। আরশোলা ফর ফর করে উড়ে যায়।

কোথায় শব্দ?

মন দিয়ে শোনো। খুব লম্বা টানা শ্বাস। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে যাচ্ছে। বুকের একটা ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। বড় কষ্টের শ্বাস। শুনতে পাচ্ছ না?

না।

জাহাজি আবার কান পেতে শোনে। তারপর অন্ধকারে তার অস্পষ্ট মুখখানা গৌরের মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলে, মেট, এই ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে।

অ্যাঁ?

এই শব্দ আমি চিনি।

গৌরের নেশা ধাক্কা খায়। টলমল করে মাথা। সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, কী বলছ?

এখানে কেউ মারা যাচ্ছে। নিরিবিলি, নির্জন এইখানে একা একা একজন মারা যাচ্ছে। খুব কষ্টের শ্বাস। বুকের শব্দ। মরবার আগে ঠিক এইরকম শ্বাস ওঠে। উঠতে উঠতে ভেঙে ভেঙে যায়।

তাহলে?— গৌর তার রথম্যানে টান দেয়। তারপর কাশে।

চুপ!— জাহাজি ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলে, ডিসটার্ব কোরো না।

কাকে?

যে মরছে, তাকে। সারাজীবন কত দুঃখকষ্ট মানুষের, কত খোঁজা, কত না-পাওয়া। বোধহয় অনেক শোকতাপ পেয়েছে। আহা! এতদিনে একটু সময় পেয়েছে মরার। একা একা, অন্ধকারে, নির্জনে আরামে মরছে এখন। ডিসটার্ব কোরো না। অতিথি এসেছে বুঝতে পারলেও তার পক্ষে উঠে এসে দরজা খোলা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মবার সময়টায় কাউকে বিরক্ত করা ঠিক না।

তারা চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। গৌর কেবল বাইরে বাতাসে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। আর পোকা-মাকড়, পাখিদের শব্দ। আর ক্ষয়ের শব্দ।

জাহাজি দেশলাই জ্বালে। সেই ম্লান আলোয় তার মুখখানা বড় বিবর্ণ দেখে গৌর। জাহাজি ফিসফিস করে বলে, এই ঘরের জানালা থেকেই দেখা যাবে, 'তুমি চাও লায়লার রুটি'। এই ঘরেই স্যু রয়েছে মেট।

গৌরের শিরদাঁড়া বেয়ে সাপ নেমে যায়। গায়ের রোমকূপ শিউরে ওঠে। শীত করে তার।

সে স্খলিত গলায় বলে, স্যু?

স্যু।

জাহাজি আবার দেশলাই জ্বালে। আগুনটা জ্বলে উঠতেই জাহাজির দিশেহারা মুখ দেখতে পায় গৌর। কাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। আস্তে আস্তে কালো হয়ে কুঁকড়ে আসতে থাকে। আগুন সরে এসে জাহাজির আঙুল ছোঁয়। দিশেহারা মুখখানা আবার অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। কোনওখানে আলো নেই। তবু গৌর মনশ্চক্ষে দেখে একটা সবুজ আলো দপ করে জ্বলে উঠল। তাতে লেখা—তুমি চাও...

প্রকাণ্ড ভারী দরজায় হেলান দিয়ে জাহাজি দাঁড়িয়ে। গৌর হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা ধরে।

কিন্তু সেই নিয়োন সাইনটা কোথায়? সেটা তো দেখা যাবে!

জাহাজি শ্বাস ছেড়ে বলে, কোথাও নেই। কেবল ওই ঘর থেকে দেখা যায়।

মাতাল। গৌর হাসে। বলে, চলো তো দেখি।

অন্ধকারে তারা দু'জন হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশের ঘরগুলো অন্য সব ঘরের মতোই ফাঁকা, চুন সুরকির স্তূপ পড়ে আছে। বাঁশের ঠেকনা রুজু রুজু দাঁড়িয়ে। তার ভিতর দিয়ে পথ করে করে তারা এ জানালায় ও জানালায় উঁকি মেরে দেখে। গাছের ডাল, ল্যাম্পপোস্ট, ঘুমন্ত বাড়ি, নিঝঝুম রাস্তা দেখা যায়। কোথাও নেই 'তুমি চাও লায়লার রুটি'-র সেই সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন। নেই, তবু গৌরের মনে হতে থাকে, আছে। কোথাও না কোথাও আছে। বাস্তবিক, বাজারে লায়লার রুটি নামে কোনও রুটি পাওয়া যায় কি না সে জানে না। ওরকম নিয়োন সাইনও তার চোখে পড়েনি। তবু মনে হয়, আছে। সে দেখেছে। বোধহয় স্বপ্নে। ঠিক ওই রকম একের পর এক সবুজ আলোর বান—তুমি...চাও...লায়লার...রুটি। ওই কথা ক'টি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও জগৎ থেকে ভেসে আসে। লোভ দেখায়। স্বপ্নে জাগরণে কেবলই তার অলীক নিমন্ত্রণ। মানুষের ভিতরে কানায় কানায় উথাল-পাথাল ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে লায়লার রুটি। মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে চায়, তখন কোথায় মিলিয়ে যায় সবুজ অলৌকিক নিয়োন সাইন।

কষ্টেসৃষ্টে তারা আরও এক তলা ওঠে। সিঁড়ি কোথাও কোথাও ভাঙা, রেলিং ভেঙে পড়েছে, অন্ধকার। তবু তারা ওঠে। নিয়োন সাইনটা খোঁজার জন্য। আছে, কোথাও আছে ঠিক। কিন্তু উঠতে কষ্ট হয় খুব। আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কড়ি বরগা পড়ে আছে চারদিকে। আলটপকা বেরিয়ে

থাকা লোহার শিক গায়ে খোঁচা মারে। বাঁশের ঠেকনোতে তারা ধাক্কা খায়।

ওপরে হাঁ হাঁ দরজার সব ঘর। আবর্জনা প্রচুর। পা দিতেই ধুলো ওড়ে। পা হড়কায়। ধুলোয় কোথাও বা পা ডুবে যায়। কিন্তু এখানে অন্ধকার তেমন জমাট নয়। ফিকে। একটা অপার্থিব হলদে আলোর আভা চারদিকে, ভারী অবাক হয় তারা। হলুদ আলোয় নানারকম ছায়া পড়েছে। তারা আবর্জনার স্তূপ পার হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন খোঁজে, পায় না। হলুদ আলোয় নিজেদের মুখ দেখে তারা।

গৌর হঠাৎ মুখ তুলে ভারী চমকে যায়। কী সুন্দর ছাদ! কী প্রকাণ্ড! তাতে চুমকি বসানো। একটা হলুদ আলোর ডুম জ্বলছে একধারে। কারা যেন ডুমটাকে ভারী অদ্ভুতভাবে ফিট করেছে দেয়ালে। বড় ভাল লাগে গৌরের। আরে বাঃ! দিব্যি ঘর। জাহাজিও হাঁ করে ছাদটাকে অনেকক্ষণ দেখে।

কয়েক পলক সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝতে।

কী সুন্দর সিলিং!— গৌর বলে।

উম।

ডুম জ্বলছে!

জাহাজি শ্বাস ফেলে বলে, ওটা সিলিং নয় মেট।

তবে?

জাহাজি বিষণ্ণ গলায় বলে, ওটা আকাশ। ওর ওপর আর কোনও তলা নেই।

গৌর তখন বুঝতে পারে। ঠিক। মাথার ওপর ওটা আকাশই বটে। ছাদটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিকে কড়ি বরগা শোয়ানো। বাড়িটা এখানেই শেষ।

চাঁদের আলোয় তারা ছাদহীন ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আকাশের একধারে বেশ্যার চোখের মতো কালি ঢালা গাঢ় কালোর মধ্যে বিবর্ণ মণির চোখ ওই চাঁদ। শেষে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সোনার গুঁড়োর মতো চারদিকে জ্যোৎস্নার ধুলো ওড়ে। পরিদের আবার দেখতে পায় গৌর। ফিনফিনে শিফনের পাখায় উড়ে যাচ্ছে। তাদের ছায়া পড়ে না। জ্যোৎস্নাময় শরীর। 'ওড়ো বাবারা, ওড়ো'— সে বিড়বিড় করে বলে।

জাহাজি তার হাত ধরে, মেট, একমাত্র স্যু-র ঘর থেকেই দেখা যায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন। আর কোথাও ওই বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু স্যু-র ঘরে তো ঢোকা যাবে না। এখন, মরে যাওয়ার সুন্দর সময়ে সে কিছুতেই এসে দরজা খুলবে না। টু-নাইট শি উইল এন্টারটেন ওনলি ওয়ান গেস্ট। ডেথ।

বাড়িটা খুবই উঁচু। গাঁই গাঁই গঙ্গার হাওয়ায় দমকা ধুলোবালি উড়ে আসে। চোখ কির কির করে, মাথার চুলে আটকে থাকে। হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বগলুর পোলা গৌরা, অর্থাৎ কিনা বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরির দম আটকে আসতে থাকে। 'ডেথ' কথাটাই বাতাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফুসফুস বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে চায়। কষ্ট হয় গৌরের। চাঁদের নীচে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

তারা বেভুল ঘুরতে ঘুরতে সিঁড়ির দরজায় আসে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বন্ধ দরজার সামনে তারা একটু দাঁড়ায়। স্বপনের ঘর। দরজা খুললেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যেত। যেখানে রয়েছে স্যু, জাহাজিকে যে একদিন অলৌকিক জ্যোৎস্না খাইয়েছিল। আর রয়েছে সবুজ আলোর অপার্থিব বিজ্ঞাপন, তুমি চাও লায়লার রুটি। পৃথিবীর আর কোনও ঘরের জানলা থেকে যা দেখা যাবে না। ঘরের মধ্যে স্যু-র গায়ের সুগন্ধ। সেই সুগন্ধের রেশ ধরে এসেছে এক হিম বাতাস। ভাঙা দীর্ঘ কয়েকটি শ্বাস শেষবারের মতো টানছে স্যু, অন্ধকারে একা।

জাহাজি দরজায় একটুক্ষণ কান পাতে। তারপর শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে, বিরক্ত করা ঠিক হবে না। চলো মেট।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা নামতে থাকে। অন্ধকার ধুলোর গন্ধ। চামচিকে, ঝিঁঝি, ইঁদুর, আরশোলার শব্দ। আর সব শব্দের আড়ালে অবিরল এক মিহিন পতনের শব্দ শোনে গৌর। ক্ষয়ের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর।

ফাঁকা কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে এক ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস হুড় দৌড় করে ঢোকে। ধুলো উড়তে থাকে। দুইজন দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

বাইরে এসে তারা দেখতে পায়, জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কী উল্লাস বৃষ্টির! চারদিকে জলে মাটিতে প্রবল ভালবাসার চিৎকার ওঠে। জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাপ। বৃষ্টি ভেদ করে ক্ষয়া চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে। চরাচর জুড়ে দৌড়চ্ছে বৃষ্টির পা। অপার্থিব শিশু-পরিরা ধুয়ে মুছে গেছে। মেঘ ডাকে। পুরনো বাড়ির ভিত কেঁপে ওঠে। গুরগুর করে বাড়িটার বুক। অন্ধকারে তার অবিরল ক্ষয় চলেছে। মেঘের ডাকে তার আলগা পলেস্তারাগুলো খসে পড়ে। মৃত্যুভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে সে।

তারা দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি দেখে। তারপর জাহাজি হাত বাড়িয়ে গৌরের শুখো হাতখানা ধরে আত্মীয়ের মতো বলে, চলো মেট।

গৌর ঘাড় নাড়ে।

ল্যান্ডমাস্টারটা গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। লোকে যেমন গৃহপালিতের গায়ে হাত রাখে তেমনি আদরে গৌর ল্যান্ডমাস্টারের বনেটে একটা চাপড় দিয়ে বলে, চল বাবা ল্যান্ডু।

গভীর বৃষ্টির অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকে তারা। রাস্তা কিছুই চেনা যায় না। পুরনো কলকাতা ধুয়ে গলে গেছে। তার বদলে মাঝরাতের বৃষ্টির ঝরোখা ভেদ করে এক অপরূপ কল্পনার শহর ফুটে ওঠে উইন্ডস্ক্রিনে। চাঁদের হলুদ আলো, টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট, গাছের ছায়া, রাস্তার জল থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর বিন্দুর দ্রুত সরে যাওয়া। ঝিলমিলে অস্পষ্ট এক শহরের ভিতর দিয়ে জল ঠেলে চলে গৌরের ল্যান্ডমাস্টার, ওয়াইপারের কাঁটা দুটো পাগলের মতো নড়ে। তবু জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টির তীব্র ফোঁটাগুলো গভীর আবেগে এসে ফাটে কাচের ওপর। গৌর চোখে তেমন দেখে না। দু'জনের ভেজা শরীরে বাতাস লাগে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। গাড়ির কাচ তোলা, বদ্ধ বাতাসে তাদের শ্বাসের ভাপ জমতে থাকে কাচের গায়ে।

গৌরের গাড়ি বড় আনন্দে অচেনা শহরটাকে ফাঁকা রাস্তায় চক্কর মেরে ফিরতে থাকে। কিন্তু ক্রমে শহরের বাড়িঘর ফুরিয়ে যেতে থাকে। গাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসে। সামনে বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছোট্ট ছোট্ট ফুটোর মতো কয়েকটা আলো। বৃষ্টির তীব্র শব্দ উইন্ডস্ক্রিন ফাটিয়ে দেয়। গৌর হাত দিয়ে কাচ মুছে ভাল করে সামনেটা দেখে। ঠিক বুঝতে পারে না, এটা কোন জায়গা। মনে হয়, একটা বিশাল মাঠ সামনে।

ল্যান্ডমাস্টার ঘড় ঘড় করে। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার মতো শব্দ হয়। তারপর কাশির শব্দ করে ল্যান্ডমাস্টার। গৌর একটু ঝুঁকে সামনে হঠাৎ দেখতে পায়, বিশাল সাদা একটা বাড়ি। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। তবু বাড়িটা আবছায়ায় ঠিকই দেখতে পায় গৌর। বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান।

ল্যান্ডমাস্টারটার সব শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। নিঃশব্দে গাড়িটা গড়ায় খানিক।

শালা!— গৌর বলে।

কী?— জাহাজি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

শালার ল্যান্ডমাস্টারের তেল মরেছে।

জাহাজি উত্তর দেয় না। উইন্ডস্ক্রিনের ঝাপসা ভেদ করে প্রবল বৃষ্টির চিকের ভিতর দিয়ে সে সেই প্রকাণ্ড বাগান আর অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছে।

মেট, ওই বাড়িটা আমার চেনা। আর ওই বাগান।

আমারও চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

জাহাজি মুখ ফিরিয়ে বলে, ওই তো সেই বাগান যেখানে স্যু আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

অ্যাঁ!

জাহাজি মাথা নেড়ে বলে, ওই সেই ভিক্টোরিয়ার বাগান। চারদিকে অন্ধকার, তবু দেখো ওই বাগানে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনও পড়ে আছে।

গৌর প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না দেখতে পায় না। বলে, কোথায় জ্যোৎস্না?

জাহাজি গম্ভীর গলায় বলে, আছে মেট। আমার জন্য এখনও একটু জ্যোৎস্না রয়েছে। সবাই সবকিছু দেখতে পায় না।

জাহাজি হাতড়ে দরজার হাতল খোঁজে।

কোথায় যাবে?— গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

জাহাজি বিড়বিড় করে বলে, ওই বাগানে আর একবার আমি যাব।

পাগল! যা বৃষ্টি!

জাহাজি মাথা দুলিয়ে বলে, জাহাজ ছেড়ে গেলে আর হয়তো ফেরা হবে না। পৃথিবী বড় বিশাল। হারিয়ে যাব। আর এই বাগান, এই জ্যোৎস্নায় আসা হবে না মেট। আমাকে নামিয়ে দাও।

গৌর হাত বাড়িয়ে লক খুলে দেয়। বড় মায়া হয় তার। আহা, দুঃখী জাহাজি যদি ওই বৃষ্টির ফাঁকা বাগানে কিছু পেয়ে যায় তো যাক।

দরজা খুলতে খুলতে জাহাজি বিড়বিড় করে বলে, স্যু...জ্যোৎস্না...সবুজ আলো...লায়লার রুটি...

বলতে বলতে নেমে যায় জাহাজি। মুহূর্তে বৃষ্টির ঝরোখা ঢেকে নেয় তাকে। অন্ধকার ডাকে। বিদ্যুতের চমক, বাতাস, প্রকাণ্ড বাগানের বিস্তার ছোট্ট একা মানুষটাকে গ্রাস করে নেয়।

হুড় হাওয়া দেয়। উড়ে আসে তীব্র বৃষ্টির ফোঁটা। সব ওলট-পালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে শহর। বদলে দিচ্ছে মানুষের মন। চেনা চারদিকে অচেনা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। গৌর অস্পষ্ট চোখে এইসব দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। গৌর আবছায়া ভেদ করে ঘুমের আঁষ-জড়ানো চোখে, জাহাজি বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে দেয়াল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতরে নেমে গেল।

চারটে দরজাই ভাল করে লক করে গৌর। হাই তোলে। পরিদের আর দেখা যাচ্ছে না। গৌর সামনের সিটে তার দুটো রুখো-শুখো হাত-পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর বগলুর তিন নম্বর, হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌর বড় আরামে ঘুমোতে থাকে।

দুই

পৃথিবীটা আবার বড় ম্লান, রংচটা, ধুলোটে লাগে গৌরের। যখন চড়চড়ে রোদ দেয়, ঘামে আঠা-আঠা করে শরীরে, তখন কলকাতার এধারের সোয়ারি ওধারে করতে করতে গৌরের মাঝে মাঝে লায়লার রুটির কথা মনে পড়ে। সেই সবুজ ঘর, স্যু, জ্যোৎস্না, সেই জাহাজি। কিন্তু কিছুই সত্য বলে মনে হয় না। বগলুর তিন নম্বরের ওইটাই মুশকিল। ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার। কোনটা ড্রিম, কোনটা রিয়্যালিটি তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে।

হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় ঢুকলে পুলিশের বিশ পয়সা। পুলিশ হাতে নেয় না। ছোকরা আছে। ছোকরারা দাপটে পুলিশের বাবা। কাট মারার চেষ্টা করলে এক চোখ ছোট করে, আঙুল তুলে নম্বর

ধরে ডাকে। বিশ পয়সার দশ পুলিসের, দশ ছোকরাদের। বে-লাইনে সোয়ারি নিলে একটাকা। হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় কখনও আসতে চায় না গৌর, ব্রিজ পার হওয়া বড় ঝামেলা। তার ওপর সোয়ারির লাইন, পুলিশ, ছোকরা, তারপর সবার বাবা জ্যাম। তবু আজ এসে যেতে হল। দুপুরে কালীঘাটের গলিতে পাঞ্জাবি হোটেলে খেয়েছে, শেষপাত টক দই। খেয়ে ঝিমোচ্ছিল গৌর। পাশেই একটা লটারির গাড়ি মেলাই চিল্লাচ্ছিল। ওদের মাইক্রোফোনটা ঘ্যার-ঘ্যারে। ইউ-পি লটারির শেষ তিনদিন নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করল। সেই সময়ে ভাতঘুমে একটা ভাল স্বপ্ন দেখে উঠে গৌরের মনে হল, পৃথিবী জায়গাটা ভালই। সে তখন দরজা খুলে নেমে গিয়ে লটারির গাড়িটার কাছ থেকে একটা টিকিট কেনে। হরিয়ানা এবার পনেরো লাখ দিচ্ছে। গাড়িতে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ টিকিটের ছবি দেখেছিল গৌর, অর্থাৎ কিনা গৌরহরি, বগলাপতির তিন নম্বর। সেকেন্ড প্রাইজ মোটে এক লাখ। গৌর ঠোঁট বেঁকায়। পেলে ওই পনেরো লাখ। পনেরো লাখে জাহাজ কেনা যায়। সেই তুলনায় এক লাখ বড়ই গরিবিয়ানা।

সেই লটারির ছবি দেখার সময়েই একজোড়া বুড়োবুড়ি হামলে এসে পড়ল, ও বাবা, কোনও গাড়িই যে ইস্টিশনে যাচ্ছে না! আর দেরি হলে যে আমরা কাটোয়ার গাড়ি ধরতে পারব না।

হাওড়া যাবে না গাড়ি।

বুড়িটাই উথলে ওঠে, ও বাবা, কলকাতা তো তোমাদেরই শহর। আমরা মফস্‌সলের লোক। রাস্তাটা পার করে দাও বাবা, তোমাদের ভাল হবে।

আড়চোখে গৌর দেখল, সঙ্গে নাতি, বুড়ো, আর বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি। দশ-বারো বছরের নাতিটার হাতে একটা নতুন বালতি, আর তোলা উনুন। বুড়োর এক হাতে পেটা লোহার কড়াই, অন্য হাতে ডালের কাঁটা, খুন্তি, কুয়োর বালতি তোলার হুক। বুড়ির হাতে কয়েকটা পট, জাঁতা, নতুন বেডকভারের পুঁটলি থেকে উঁকি দিচ্ছে গঙ্গাজলের বোতল। এই বয়সে নতুন সংসার পাতার কথা নয়। তাহলে বোধহয় কালীঘাটের জিনিস কিনে নিয়ে পাঁচজনকে দেখানো হবে। গৌর আবার টিকিট দেখে।

ও বাবা, আমরা পয়সা দেব। ফাঁকি যাবে না।

ট্যাক্সির কী দরকার! বাসে চলে যান।

উঠতে দিচ্ছে না যে! যা ভিড়! বাবা গো, নিয়ে চল।

গাড্ডা। গৌর শ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেয়। তিনজন ভারী খুশি হয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছাড়তে বুড়ি হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় সিঁদুরমাখা প্যাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে, জবাফুল, আর একটা কমলালেবু। সেসব এখনও গৌরের সিটে পড়ে রয়েছে। কাটোয়ার গাড়ি পেয়ে গেছে ওরা।

বে-লাইনে গাড়ি ঢোকায় গৌর। একটা টাকার মামলা। বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভেঙে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে। ফরসা চাদরের মতো ধবধবে রোদ পড়ে আছে। ঘড়িতে মোটে একটা। বে-লাইনে আরও কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে! তার মধ্যে একটা গৌরের চেনা। গৌর একটু এগোতেই মলিনকে দেখতে পায়। সিটে দুই পা তোলা, ঠোঁটে ভেজা সিগারেট, হাতে বই, মলিন বসে আছে। কোনওদিকে খেয়াল নেই।

গৌর বলে, মামু!

মলিন মুখ তুলে হাসে, কী বে ত্রিভঙ্গমুরারী, কী খবর?

খবর নেই। তোমার খবর বলো।

মলিন উদাস গলায় বলে, তোমার সাউথে গ্যারেজ, আরামে আছো।

আরাম কীসের?

মলিন হাসে, বেশ্যা আর ব্যাপারিদের গা আর বগলের গন্ধ শুঁকতে হয় না আমার মতো। এই মাত্তর একবোঝা বিড়ির পাতা খালাস দিলাম। তোমার গাড়িতে যারা ওঠে তারা আতরের গন্ধ রেখে যায়।

গৌর হাসে, এখনও সোনাগাছিতে কমলার বাবু ধরে দিচ্ছ নাকি?

মলিন উদাস গলায় বলে, দিই। গাড়ির যেমন সোয়ারি দরকার তেমনি ওদেরও। নর্থের গলিঘুঁজিতে ঘুরলে না তো, তাই তোমার চুল পাকেনি। তা সাউথে বৃষ্টিবাদলা কেমন? আর মেয়েমানুষ?

গৌর বলে, কী যে বলো!

মলিনের মুখের আটক কোনওকালে নেই। ওর ট্যাক্সিখানা গৌরের মতো হরবখত যেমন-তেমন পাবলিককে তোলে না। বেছে বেছে তোলে। দু'হাতে পুলিশকে পয়সা দেয় মলিন, আবার দু'হাতে লোটে। বলতে গেলে, সারা দিনমান গাড়িখানা গ্যারেজেই থাকে, বেরোয় বিকেলের পর। জায়গা বেছে দাঁড়ায় বড় হোটেলের তলায়, মাতালদের পৌঁছে দেয়। শনিবারে বাঁধা রেসের ময়দান। সেখানে শেয়ারের পান্টদের তোলে। মাসে তিরিশদিন পুলিস তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। তিরিশদিন ফেরত দেয়। হাড়কাটার মতিয়া কখনও-কখনও মলিনের গাড়িখানা ভাড়া নেয় সারা বিকেলের জন্য। ময়দানের কাছাকাছি নির্জনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মলিন নেমে গিয়ে ঘাসে শুয়ে থাকে। মলিনের গাড়ি তখন মতিয়ার ঘর হয়ে যায়। বাবু আর মতিয়া থাকে কেবল। আর থাকে গঙ্গার হাওয়া। থাকে জ্বালা-যন্ত্রণা। টাকা ওড়ে।

মতিয়া বড় সুন্দর। এত সুন্দর গৌর কদাচিৎ দেখেছে। থোপা থোপা লালচে চুল, নরম মুখ, রোগাটে শরীর, আর কী গম্ভীর চোখ! তাকে একবার পৌঁছে দিয়েছিল গৌর। সেদিন মলিনের গাড়ি ছিল খারাপ। গৌরের বুক খুব কেঁপেছিল। মতিয়া কিন্তু একবারও দেখেনি কে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা রুখো-শুখো হাত-পাওয়ালা দুঃখী লোক গৌর, গৌরা, বগলুর ছাওয়াল, সময়মতো পোলিও আর টাইফয়েড না ধরলে যে বিলেত চলে যেত, হয়তো বিয়ে করত মেম। এতদিনে কত কী হয়ে যেত গৌর! মতিয়া সেই গৌরকে দেখেইনি। ট্যাক্সিওয়ালা ভেবে ভ্রুক্ষেপও না করে নেমে গেল হাড়কাটা গলির ভিতরে এক বাড়ির সামনে। চাকর এসে টাকা দিয়ে গেল। মতিয়ার সঙ্গে পাবলিকের কারবার নেই, গৌর জানে। মতিয়া দরজায় দাঁড়ায় না, ডাকে না, ইশারা করে না। তার ঘরে টেলিফোন আছে, সাদা শিশুকাঠের খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, রেফ্রিজারেটারও। যেমন বাছাই তার জিনিসপত্র, তেমনই বাছাই তার পুরুষেরা। আজও গৌরের গাড়ির গদি শুঁকলে বোধহয় মাতিয়ার সেই দুর্লভ গন্ধটুকু পাওয়া যাবে।

মতিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছিল গৌরের। মলিন ডেকে বলে, তোমার ফাতনা নড়ছে গৌর, দেখো।

একটা লম্বা লোক কোলে একটা ফ্যাতফ্যাতে বাচ্চা, সঙ্গে ফরসা বউ। তারা গৌরের গাড়ির হাতলে লক করা বলে দরজা খুলতে পারেনি, নইলে উঠে বসত। ভুখ্‌খা পার্টি, বালী কি রিষড়ে থেকে এসেছে। সিনেমায় যাবে হয়তো, কিংবা যাদবপুর কি বেহালার আত্মীয়বাড়ি। মাসে এক-দুই দিন বউ নিয়ে বেরোয়, তখন ট্যাক্সি চড়ে।

গৌর এগোয় না। দূর থেকেই হেঁকে বলে, গাড়ি যাবে না দাদা।

লোকটা একভিড় মানুষের মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালাকেই খুঁজছিল। এখন গৌরকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, কেন?

গাড়ি খারাপ আছে। ইঞ্জিন গরম।

লোকটা কপালের ঘাম হাত দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলে। বউটার মুখের পাউডার ঘামে গলে যাচ্ছে।

লোকটা একবার মুখ তুলে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে গৌরকে ধমকাবে না কাকুতি মিনতি করবে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে, বড় বিপদ ভাই। সোয়া একটা বেজে গেছে, দুটোয় পৌঁছতেই হবে।

লাইনে দাঁড়িয়ে যান না, পেয়ে যাবেন।

লোকটা শুকনো গলায় বলে, লাইনে দাঁড়ালে পঁচিশজনের পিছনে পড়ে যাব। অন্তত আধঘণ্টা। বড্ড বিপদ।

বিপদ! কার না বিপদ! কলকাতা-সুদ্ধু মানুষ রাস্তায় দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে সারা দিনমান 'বিপদ, বিপদ' বলে চেঁচাচ্ছে। গৌরের গাড়ি কি দমকল না অ্যাম্বুলেন্স? তবু তো গৌর দাঁড়ায়, মলিন হলে? যেদিন, যেখানে তার গাড়ি যাচ্ছে, একমাত্র সেদিকের বা সেখানের সোয়ারি ছাড়া তুলবেই না। পুলিশ ডাকো, তম্বি করো, মলিন উত্তর দেবে না। পুলিশ লাইসেন্স কেড়ে নিলে শান্তভাবে দিয়ে দেবে। জানে, লাইসেন্স তার পোষা পাখির মতো। লোক-দেখানোর জন্য উড়ে যায়, আবার চোরাপথে ফিরে আসে। কার কী বিপদ তা নিয়ে মলিন মাথা ঘামায় না, রেসের বইটি খুলে ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে বইখানায় ডুবে যাবে। আর তখন ভুখ্‌খা পার্টিদের পিঁজরাপোলে বৃথা টক্কর মেরে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের আয়ুক্ষয় হয়। মতিয়ার গায়ের গন্ধটুকু লোকের গায়ের ঘষায় ঘষায় উঠে যাচ্ছে ক্রমে।

পারবে না গৌর। দূর থেকেই খেঁকিয়ে বলে, বলছি তো গাড়ি খারাপ আছে।

লোকটা নিরীহ, ভিতু ধরনের, বউটাও তাই। গৌরের ধমক খেয়ে এ ওর দিকে চায়। লোকটার গলা বেয়ে দারুণ ঘাম নামছে। বাচ্চাটা তার ছোট্ট মাথা তুলে চারদিকে চায়। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ।

গৌর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে বলে, ওই গাড়ি কি যাবে?

মলিন মাথা নাড়ে, না দাদা, আমার বিয়ের পার্টি আছে।

লোকটা চারদিকে চায়। বাস লোক গাদাই হয়ে আছে। চারদিকে মেলার ভিড়। লোক যে কোথা থেকে আসে! কোথায় যায়!

কোনও দরকার ছিল না তবু মলিন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

পি জি হাসপাতালে। মেয়েটির পোলিও ভ্যাকসিনের ডেট আজ। সেকেন্ড ডোজ। দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ভ্যাকসিনটা না পড়লে কী হয় না হয়,

মলিন মোলায়েম গলায় বলে, বাসে চলে যান না। এখনও পৌনে একঘণ্টা সময় আছে, পৌঁছে যাবেন।

পোলিওর কথা শুনে গৌর থমকে গিয়েছিল। পোলিও! আই বাপ! ওই জিনিস না হলে কবে কলকাতা থেকে পাখি হয়ে যেত গৌর! প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াত বিদেশের বাগানে। পোলিও না হলে গৌরের চারখানা পুরো হাত-পা, আর আত্মবিশ্বাস থাকত। হত মেম-বউ। বিলেতেই শিকড় চারিয়ে দিত সে। তার শিশুকালে দুনিয়ার নেমকহারাম মানুষেরা কেউ পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেনি।

ঘড়িটা দেখে গৌর। মূল্যবান আরও পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে। ব্রিজের শেষ মাথায়, বড়বাজারের গায়ে একটু জ্যাম আছে বটে। তবে ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পৌঁছে দিতে পারবে।

সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়, উঠুন।

লোকটা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, উঠব?

বলছি তো।

তারা ওঠে। গঙ্গা পেরোতে বউটা ভারী খুশি গলায় বলে, কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া গো, কাচটা আর একটু নামিয়ে দাও না।

শালারা এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেছে। গৌর একটা সিঙ্গাপুরি কলা-বোঝাই লরির পেছনে প্যাঁপোর-পোঁ হর্ন মারে। কলার পাহাড়ের ওপর বসে দুটো কুলি অনিচ্ছেয় একটার পর একটা কলা খেয়ে যায়। গাড়িটা নড়ে না। হারামির বাচ্চা! গাল দেয় গৌর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বেরিয়েছে! তা এতদিন কী করছিল মানুষ? হোয়াট বিজনেস?

গৌর ভারী বিরক্ত হয়। রুখো-শুখো দুটো হাত-পায়ের জন্য তার আবার দুঃখ হতে থাকে। একবার মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে। টুলটুলে একটুখানি মুখ, ড্যাবা চোখে চারদিক দেখছে, মুখে আঙুল। থোপা থোপা চুল উড়ছে, নড়ছে হাওয়ায়। ভারী মায়া হয় গৌরের। বেঁচে থাকো। সব ক'টা হাত-পা নিয়ে, আস্ত মানুষ থাকো। পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রোগ-ভোগ হাত বাড়ায়। সাবধান।

কলার গাড়িটা থেকে একটা কলার খোসা উড়ে এসে বনেটের ওপর পড়ে পিছলে যায়। গৌর একবার মাথাটা বের করে। কুলিটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্য সময় হলে গৌর অন্তত 'শুয়োরের বাচ্চা' বলতই। এখন বলল না। ইচ্ছে করল না, মুখটা আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে গৌর।

জ্যামটা আস্তে আস্তে নড়ে। হাত-পা শিরশির করে গৌরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বেশি দেরি।

কুড়ি মিনিট লাগল ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে পৌঁছোতে। তারপর ঝড়ের মতো গাড়ি ছাড়ে গৌর। টেম্পো, ঠেলা, লরি মুহুর্মুহু কাটিয়ে যায়। গাড়ি টাল খায়, পিছনের সোয়ারি এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গৌর সেসব খেয়াল করে না। গতির উত্তেজনায় বউটা বাচ্চার ভ্যাকসিনের কথা ভুলে গিয়ে বরের হাত চেপে ধরে ভয়-পাওয়া হাসি হেসে বলে, মাগো, কী জোর গাড়ি যাচ্ছে দেখো।

লোকটা কাঠ-কাঠ হাসে। শক্ত হয়ে বসে থাকে।

গৌর এক ঝটকায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট পেরোয়। তারপর ময়দানের ভিতর দিয়ে উড়িয়ে দেয় গাড়ি। উড়োজাহাজের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে গাড়ি। ইঞ্জিন ধোঁয়ায়। গৌর দাঁতে দাঁত চেপে রাখে। জোরে গাড়ি ছাড়লে রাস্তাঘাট আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দানে বড় খেলা আছে। বোধহয় মোহনবাগান আর মহামেডান। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে ময়দানমুখো। গৌর ভ্রুক্ষেপ করে না। গাড়িটা মানুষজনের ওপর ছুঁড়ে মারে যেন। সটাসট সরে যায়। গৌর হাসে।

গাড়ি ওড়ে। উড়তে থাকে। পিছনের সোয়ারিরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিভোর হয়ে গেছে। ময়দানের হাওয়া বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোলিও! পোলিও! গৌর বিড়বিড় করে। গাড়িখানা বাঁকে ঘুরতে থাকে। একটুও গতি কমায় না গৌর! চালিয়ে দেয়।

ঘড়িতে তখনও দশ মিনিট বাকি, গৌর গাড়িখানা পি জি-র আউটডোরে ভিড়িয়ে দেয়। পয়সা দেওয়ার সময়ে ওরা স্বামী স্ত্রী অবাক চোখে গৌরকে দেখে কিছুক্ষণ। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা দুঃখী চেহারার লোকটা অত জোর গাড়ি চালাতে পারে! সম্ভবত তারা বহুকাল গৌরের গাড়িতে চড়ার রোমহর্ষক গল্প করবে মানুষের কাছে।

একা গাড়ি আর গৌর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে থাকে। চারটে বাজলে দাশ কেবিন। দক্ষিণের সোয়ারি পেলে ভাল। নইলে মিটার রইল ঢাকা, বনেট তোলা রইল। ফোটো পাবলিক। গাড়ি দক্ষিণ-মুখো দাঁড় করিয়ে গৌর ঝিমোয়। পাঁইয়ায় হোটেলের দই ভাতের আমেজ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু গৌরের জীবনে শান্তি নেই। মল-পরা একখানা পায়ের শব্দ ঝম করে বেজে ওঠে। মাইরি! এ কী! গৌর একটু চমকায়। খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করলে তবে মাগিটা তার বেহদ্দ নাচ শুরু করে বটে মাথার ভিতরে। তারপর নানা কায়দায় নানান তালে নাচে। গৌরের জীবন খাস্তা করে ছেড়ে দেয়। পাগল-পাগল লাগে। কিন্তু এখন তো কোনও চিন্তা করেনি গৌর। না রাখোহরির কথা, না তার বাপ বগলুর কথা, তবে? গৌর আধখানা চোখ খোলে। পশ্চিমের রোদ কানকি মেরে চোখে আঙুল ঢোকায়। ঝলসানো হিজিবিজি দেখে সে। আবার চোখ বোজে। ঝমাঝম মলের শব্দ হয় আবার। গৌর আধা-জাগা অবস্থায় বড় করে শ্বাস ফেলে। মাগিটা কেন যে নাচে, নেচে তার কী বেহদ্দ সুখ, গৌর তা আজও বুঝল না। টাইফয়েডেরও ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সে আমলে টাইফয়েড

হয় পুরো মানুষ নিত, নয়তো নিত হাত-পা-চোখ কিংবা ওরকম কিছু। গৌরের মাথা নিয়েছিল। সেই থেকে মাথায় বেহদ্দ মাগিটা ঢুকে বসে আছে। বেরোবার নাম নেই। টাইফয়েডটা যদি তার হাত-পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওয় শুকিয়ে যাওয়া ফালতু হাত-পা দেখিয়ে দিত গৌর, বলত, এই দুটো নাও, কাজে লাগে না তেমন, পড়ে আছে।

গৌর চোখ খোলার চেষ্টা করে। অমনি আবার ঝমঝম পায়ের শব্দ বাজে। বাজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না গৌরের। হাসপাতালের বাড়ির হাত দুয়েক ওপরে সূর্য। আউটডোরের বাইরে একটা কল থেকে ফালতু জল পড়ে যাচ্ছে। কিলবিল করে মা-বাপ আর আয়ার সঙ্গে ঘুরছে রঙিন বাচ্চারা। খুব ভিড়! পোলিওর ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ হয়ে এল। একটা বাচ্চা মা'র হাত থেকে ছুটে ওই কলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সবই ঠিকঠাক দেখতে পায় গৌর। কোনওখানে গোলমাল নেই। তবু আবার ঝমঝম শব্দ হয়। চকিতে গৌর ঘাড় ঘোরায়।

চোখে ঘুমের আঁষ জড়ানো। পিছনে কাচে ধুলো পড়েছে। গৌর অস্পষ্ট দেখতে পায়, পিছনের কাচের ওপাশ থেকে একটা দেহাতি মেয়ের মুখ জ্বলজ্বল করে তাকে দেখছে। তার পরনে বাহারি হলুদ শাড়ি, গায়ে রুপোর গয়না, নাকে বেসর। চোখে কাজল টেনেছে গভীর করে, চোখ দু'খানা তাই বোধহয় অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে গৌরের অস্বচ্ছ চোখে, ধুলোটে কাচের ওপারে মেয়েটাকে স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মেয়েটা কাচের ওপর একখানা হাত পেতে রাখল। গৌর সেই হাতে মেহেদির নকশা দেখে।

কী চাই?— গৌর জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটা এক-পা দু'-পা এগোয়। মলের শব্দ হয় ঝমঝম।

গাড়ি জায়েগি?

কঁহা?

পারক সারকাস।

গৌরের সন্দেহ হয়।

কিরায়া কৌন দেগা?

মেয়েটা হাত তুলে দাঁতে আঙুল কামড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের দিকটা দেখিয়ে বলল, উও।

ভঙ্গিটা বড় ভাল লাগে গৌরের। গৌর মুখ বাড়িয়ে দেখে, ফুটপাথে দেয়ালে ঢলে বসে আছে এক বুড়ি, তার সামনে রুপোর মোটা বালা-পরা হাত, বাসন্তী রঙের পাগড়ি মাথায় এক সুন্দর দেহাতি লোক বসে বুড়ির মুখে লোটা থেকে জল নিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে।

কী হয়েছে?

বড্ডি গরম ছে, দাঁতি লাগি।

ও তোমার কে হয়?

মেয়েটা উদাস মুখ করে বলে, শাস।

আর ওই লোকটা?

তেমনই উদাস মুখে মেয়েটা বলে, আদমি।

মেয়েটার মনে যেন সুখ নেই। গায়ে হলুদ শাড়ি, চোখে কাজল, হাতে মেহেদির রং, তবু তার কোথায় যেন রংহীনতা ফুটে আছে। তার সুডৌল হাতে উল্কির ছাপ, কাচের চুড়ি, রুপোর গয়না, তবু হাত দু'খানা বড় উদ্দেশ্যহীন। কপালে টিকলি পরেছে সে, লম্বা চুল বেণীতে বাঁধা, তবু সব সাজের ভিতর থেকে দেহাতের গমের খেতে গোধূলির নির্জন উদাসীন বৈরাগ্য ফুটে আছে।

গৌর জিজ্ঞেস করে, এখানে মরতে কী করছিলে?

মেয়েলি হিন্দিতে মেয়েটি বলে, খেতে ফসল হয় না। মাটি মরে গেছে। আমাদের খেতিও ছিল

ছোট। আদমিটা বাজি দেখাতে জানত। আমি নাচতাম। দেহাতে ওসবের পয়সা কেউ দেয় না। তাই আমরা শহরে চলে আসি। বাজি দেখাই। আমার আদমি লাঠি ঘোরায়, চারটে ছোরা শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নেয়, লোহার গোলার খেলা দেখায়, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরায়, হেঁটমাথা হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচায়, কত কী করে!

আর তুমি?

মেয়েটি একটু হাসে, আমি নাচি। ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী দুলিয়ে, ঝমঝম করে। লোকে পয়সা দেয়।

এই বলে মেয়েটা কৌতূহলে গৌরকে দেখে। কী দেখে তা গৌর, অর্থাৎ বগলুর তিন নম্বর, জানে। টাইফয়েডের খাজনা দিতে শুকিয়ে যাওয়া হাতখানা, আর পা, আর চোয়াড়ে মুখ।

ভারী বিরক্ত হয় গৌর। মার শালা গৌরার কপালখানায় তিন লাথি। গৌরার যে আর দেখাবার কিছু নেই মাইরি!

পাখির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আমাদের নেবে না?

গাড্ডা। গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে এখন এক দাঁতি-লাগা বুড়ি উঠবে। গৌরের সুখ নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলে, নেব, নিয়ে এসো।

কত নেবে?

মিটারে যা ওঠে।— বলে গৌর হাসে, তারপর চোখ ছোট করে বলে, আর একদিন তোমার নাচ দেখিয়ে দিয়ো।

মেয়েটা একপলক গৌরকে দেখে, তারপরই আবার দেহাতি উদাসীনতা মেখে নেয় মুখে। বলে, কত লোক তো দেখে! তুমিও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ো।

বালা-পরা সুন্দর পুরুষটা মুখ ফিরিয়ে রাগের গলায় কী একটা নাম ধরে মেয়েটাকে ডাকে। গৌর নামটা ঠিক বুঝতে পারে না। মেয়েটা ঝুঁকে বলে, একটু দাঁড়াও, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে হবে কিন্তু।

গৌর মাথা নেড়ে সিগারেট ধরায়।

বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি, কাটারি ওঠে ল্যান্ডমাস্টারের লাগেজ বুটে। ততক্ষণে মেয়োর নাকের নীচে নিটোল ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। পুরু পুরু দুটি ঠোঁট ভিজে যায় জিভের লালায়। সুন্দর পুরুষটির মুখে জবজবে ঘাম, পাগড়ি শিথিল। তারা খুব অস্বস্তির সঙ্গে পিছনের সিটে বসে থাকে কাঠ হয়ে। মাঝখানে এলিয়ে আছে বুড়ি। তার চোখ বোজা।

দৃশ্যটা দেখে আয়না একটু ঘুরিয়ে দেয় গৌর। মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে। গভীর কাজলের ভিতর থেকে দু'খানা চোখের উদাসীনতা দেখা যায়। আর ভয়। ক্ষুধা। ফিফটি পারসেন্ট গৌরা মেয়েটার মুখে চোখ রেখে ল্যান্ডমাস্টার চালু করে।

খুব শিগগির পৌঁছে যাওয়ার কথা। গৌর গাড়িও ছাড়ে জোরে। কিন্তু পৌঁছোয় না। ময়দানের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অকারণ চক্কর দিতে থাকে। এ রাস্তা ও রাস্তা করে ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। অলিগলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

লোকটা নড়েচড়ে বসে। মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছ? এ তো অন্য রাস্তা।

গৌর গম্ভীর গলায় বলে, সব রাস্তায় গাড়ি যায় না। ঘুরে যেতে হবে।

তুমি ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের।

গৌর উদাস গলায় বলে, সন্দেহ হলে নেবে যাও।

পুরুষটা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলে, চোপ। কলকাতার তুই কী জানিস?

মেয়েটা চোখের বিদ্যুৎ পলকে তার পুরুষকে স্পর্শ করে বলে, আমি জানি, ও ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

নিক। কত নেবে? রাস্তা ঠিক পেয়ে যাব।

মেয়েটা দমে না। হাত বাড়িয়ে গৌরের শার্ট খামচে ধরে বলে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গৌর বিনীত স্বরে বলে, পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দাও না। কিংবা মারো লাঠি। পুলিশও ডাকতে পারো।

মেয়েটা জামা ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে। আয়নায় গৌর দেখে, কী সুন্দর সাদা দাঁত! এমন ঝকঝকে সরল দাঁত সে কারও দেখেনি।

দেহাতি লোকটা দার্শনিক। ঠিক জানে তাদের বেশিদূরে নিয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ঘুণচক্করে ঘুরে খানিক মিটার ওঠাবে মাত্র। দেহাতি বোকাসোকা লোক, ঝগড়া করে পারবে না। মিটার যা ওঠে তা দিয়ে দেবে। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা আর মাথায় এক বেহদ্দ মাগির পাগলা নাচ নিয়ে গৌর কোনও শালার কিছুই আর কেড়ে নিতে পারে না। এইসব ভাবে গৌর আর গাড়িটাকে বেমক্কা ঘোরায়। যে রাস্তায় যায়, ঘুরেফিরে আবার সেই রাস্তায় আসে। কী যে সঠিক সে চায় তা বুঝতে পারে না।

আরে বাঃ! এতক্ষণ মেয়েটা আয়নাটা লক্ষ করেনি। এখন করেছে। গৌর চোখ তুলেই মেয়েটার চোখ দেখতে পায় একপলক। মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আয়নার দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রথমে ভয়, তারপর কৌতূহল দেখা দেয়। গৌর চেয়ে থাকে। ল্যান্ডমাস্টার টাল খায়। কিন্তু বহুকালের পোষা গাড়ি বলে বে-জায়গায় টক্কর খায় না। গৌর সামলে নেয়। আবার আয়নায় চোখ চলে যায়। মেয়েটা চেয়ে আছে। চোখ পড়তেই রহস্যময় হাসে। ঘোমটা তুলে আধখানা মুখ ঢাকে মেয়েটা, ঢাকে সেই দিকটা যে দিকে তার শাশুড়ি আর স্বামী রয়েছে। তারপর হঠাৎ চোখ ছোট করে জিব বের করে গৌরকে ভেঙিয়ে দেয়। আরে বাঃ! খুব শিখেছে তো!

লোকটা গৌরের যথেচ্ছাচারে বাধা দেয় না। কেবল একবার বিরক্ত হয়ে ভিতু গলায় বলে, একটু আস্তে চলো না ভাই। আমার বুড়ি মা'র শরীর ভাল না, জোরে চললে বুড়িমার কষ্ট হবে।

গৌর একটু স্পিড কমায়, আবার বাড়ায়। কঁ্যা-চ করে ব্রেক কষে। ঘাড়ের যে জায়গাটায় মেয়েটা শার্টের কলার চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা একটু শিরশির করে। ল্যান্ডমাস্টারটা জলের মতো বয়ে যায়। তাতে অনেক মুখের ছায়া পড়ে, আঙুলে কেউ বা জলে ছবি এঁকে যায়। কিছুই থাকে না। ক্ষণস্থায়ী একটি দেহাতি মেয়ের মুখ গৌর তার আয়নায় কতক্ষণ বা ধরে রাখতে পারে!

ল্যান্ডমাস্টার গাঁই গাঁই করে ঘোরে। জলের মতো বয়ে যায়। মেয়েটা যে কোণে বসে আছে, সেই কোণে একটু হেলে আধবোজা চোখে বসে ছিল মতিয়া। বহুদিন হয়ে গেল, তবু গৌরের হুবহু মনে আছে, দুর্লভ আতরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল ল্যান্ডমাস্টার, সবুজ কাচের মতো স্বচ্ছ ওড়নার সোনালি চুমকির পিছনে তার মুখ। চকমকে চুমকি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল বার বার। ওড়না উড়ছিল হাওয়ায়। সিল্কের লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরে লাল রঙের সুন্দর মতিয়া আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। সেইদিনই ল্যান্ডমাস্টারের দশ পারসেন্ট আয়ু বেড়ে যায়।

কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই আতরের সুগন্ধ লোকের গায়ে লেগে লেগে মুছে গেছে। ঘাসপাতার সুবাস-ওলা এই মেয়েটির সতেজ শরীর, একটু ঘামে-ভেজা গায়ের বোঁটকা গন্ধ ল্যান্ডমাস্টারের গদির গায়ে কতক্ষণ লেগে থাকবে! ট্যাক্সি আসলে এক বহমান নদী। স্রোতে ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়।

গৌর শ্বাস ফেলে গাড়ি আনে সহজ রাস্তায়। পার্ক সার্কাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিটারে দেড় টাকার মতো বেশি উঠে গেছে, মৌতাতের সময়টা এগিয়ে আসছে ক্রমে।

চোখে ঘুমের আঁষ জড়িয়ে আসে। কোন শূন্য থেকে লাল নীল হলুদ বল নেমে আসে পৃথিবীতে। চরাচর জুড়ে রঙিন বলগুলো ওড়ে কেবল। ঢাকার কামান নিঃশব্দে গোলা ছোঁড়ে শূন্যে। মুহুর্মুহু দাগতে থাকে গোলা। গৌরের আয়নায় মেয়েটা ঘোমটায় আধোঢাকা মুখে আবার জিব ভেঙায়।

তার খাঁদা নাকের নীচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে। দেহাতি শরীরের কাঁচা গন্ধ, তার সঙ্গে রোদ-মাটির সুবাস, গাছপালার ক্লোরোফিল সব ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরকার চৌকানা বাতাসকে টইটম্বুর করে দেয়। গৌর শ্বাস টানে। তবু সোয়ারি খালাস দিতে হবে বগলুর তিন নম্বরকে। তারপর দাশ কেবিন। গৌরের সঙ্গে দু'খানা রুখো-শুখো হাত-পায়ের মতোই সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার। সেঁটে গেছে দাশ কেবিন। সেঁটে গেছে কলকাতার রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ। মিটারের পরিবর্তনশীল সংখ্যা আর মিটার ঘোরানোর টুংটাং। মৌতাতের সময়ে ঢাকার কামান কোন দূর থেকে ঠিক রঙিন বল ছুঁড়ে মারে আকাশে। রাস্তার ওপর দিকে উঠে যায়। কলকাতার মাঝখানে কারা যেন জলময় শহর বানিয়ে রেখে যায়। গাভীর ডাক শোনে গৌর। মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ হঠাৎ ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে কদমতলার বাঁশের বাঁশিটি আড় করে ধরে পা দুটো ক্রশ করে কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়ায়। এ সব জিনিসই সেঁটে গেছে গৌরের সঙ্গে। এর কোনও পরিবর্তন নেই।

গৌর শেকসপিয়ার সরণি পেয়ে যায়। লোকজন ভুসভাস উড়ে যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছাড়ে গৌর। পিছনে বুড়িটা ককিয়ে ওঠে। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করে পুরুষটা। মেয়েটা মুখ ভেঙাতে গিয়ে হঠাৎ টের পায় বাতাসে ঘোমটা উড়ে গেছে, স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে। লজ্জায় জিব কাটে সে। বাতাস তার বেণীতে বাঁধা চুল লুট করে এনে কপালে ঝাপটা মারে। গৌরের গাড়ি গতির যন্ত্রণায় গোঙায়। টায়ার রাস্তায় গভীর বসে যায় লাঙলের মতো। গাড়ির জোর টানে ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদির মধ্যে দেহাতিরা সেঁধিয়ে যেতে থাকে, ডুবে যেতে থাকে।

কোথায় যেন! আঃ, পার্ক সার্কাস। গৌরের মনে পড়ে, আবার ভুলে যায় গৌর। আবাব মনে পড়ে। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক চেনা লাগে না। আয়নায় দেহাতি মেয়েটার সুন্দর সরল মুখখানা ঝাপসা হয়ে যায়। একটা সবুজ নিয়োন সাইন দপদপিয়ে ওঠে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না গৌর। তারপর দেখে, সবুজ নিয়োন সাইন দপ করে জ্বলে উঠে বলে, তুমি... তুমি... চাও... চাও... লায়লার... লায়লার... রুটি... রুটি...। আবার সব মুছে যায়। মেয়েটির মুখ দেখতে পায় গৌর। চোখে গমখেতের ধূসর বৈরাগ্য, অবহেলা, আবার কৌতুকও। আবার মুখ মুছে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় গৌর, ল্যান্ডমাস্টারের সামনে পার্ক স্ট্রিট, পিছনে এক দূর সমুদ্রের ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। গভীর বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা হলদে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়। জল দোলে, মাস্তুল দোলে, মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে। গৌর আর গৌর থাকে না। তার ল্যান্ডমাস্টারও নিজেকে ভুলে যায়। গাড়ি জমি ছেড়ে হঠাৎ সমুদ্রে লাফ দেয়। তুলে দেয় মাস্তুল। গৌর হর্ন টেপে। অবিকল জাহাজের ভোঁ-ও-ও-ও শব্দ বেজে ওঠে। ল্যান্ডমাস্টার জাহাজ হয়ে চলতে থাকে। সমুদ্র পাড়ি দেয়। দূরে এবং বিদেশি বন্দরে আঙুরের লতায় ছায়ায় থোপা থোপা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঝিরঝিরে নদী বয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েছে বলে সমুদ্রের প্রবল বাতাসে চুল উড়ছে তার, উড়ছে ঘাগরা। পিছনে টিলার উপরে ছোট্ট বাসা। বাসা ঘিরে বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। জাহাজ হওয়া ল্যান্ডমাস্টার থেকে সব দেখা যায়। জাহাজ মেয়েটির দিকে, বন্দরের দিকে এগোয় ধীরে ধীরে। ভোঁ দেয়। মেয়েটা একখানা হাত তোলে। কী আনন্দিত হাতখানা, সেই হাতে কী নিয়ন্ত্রণ! গৌর স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই হচ্ছে তার মেয়েমানুষ। ওই টিলার ওপরকার রঙিন সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়িটা তার ডেরা। বহুকাল সমুদ্রযাত্রার শেষে সে ফিরে আসছে।

গৌরের মাথার ভিতরে কোথায় সবুজ আলোটা জ্বলে জ্বলে ওঠে, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও। কী যে চায় গৌর তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। আয়নায় একখানা উল্কিপরা হাত ঝলক দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। ল্যান্ডমাস্টার, জাহাজ বিপুল জলরাশি ভেদ করে চলতে থাকে, দুলতে থাকে। আয়নায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছায়া পড়ে। নিসর্গ ভেসে ওঠে। আঙুরফলের গা বেয়ে টসটসে রস ঝরে পড়ে। মাতাল মৌমাছিদের অনন্ত পিপাসার শব্দ হয়। টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি, রঙিন ফুল, জাহাজঘাটায় একা একটি বাতিঘরের মতো মেয়ে, এই সবই কি গৌর চায়? লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন

তেমন স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। শুধু বলে, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...

আই! আলবত গৌর চায়। গৌর চায় মেলা কিছু। কত কী যে চায় গৌর তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এক-একদিন তার মৌতাত জমে উঠলে ল্যান্ডমাস্টারের মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার জাঙ্গাল ভেঙে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে ঠিক জানে না গৌর। তবে হয়তো যাবে, কোনও ডুবজল নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসে স্বচ্ছ জলের নীচে মাছেদের খেলা দেখবে। দেখবে গমের খেতের পাড়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে দেখবে দূর বিদেশি বন্দরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েমানুষের হাতছানি। টিলার ওপর রঙিন ফুলে-ঘেরা বাড়ি।

কিন্তু না। মাথা নাড়ে গৌর। যাওয়া যাবে না কখনও। তার সঙ্গে সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার, ল্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে সেঁটে গেছে কলকাতা, কলকাতার সঙ্গে সেঁটে গেছে বগলুর তিন নম্বরের কপাল।

আই বাপ। আর একটু হলে ট্রামের পিছনে ল্যান্ডমাস্টারটাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছিলে বাবা! গৌর বিড়বিড় করে। একঝটকায় ট্রামটাকে পার হয়ে যায়। পিছন থেকে দেহাতি লোকটা চেঁচায়, রোখকে রোখকে, বাঁয়া তরফ।

গৌর থামে।

দেহাতিরা একে একে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। লোকটা এগিয়ে এসে বলে, কিতনা?

গৌর কষ্টে মিটারটা দেখার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পায় মিটারে পঞ্চাশ টাকা উঠছে। যখনই মৌতাতের সময়ে এরকম অদ্ভুত সব সংখ্যা দেখে গৌর তখনই মনে মনে সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে ভাগ করে নেয়। হিসেব ঠিকঠাক মিলে যায়।

পাঁচ টাকা।

লোকটা টাকা দেয়। সভয়ে একটুক্ষণ গৌরকে দেখে। দেখে, এই রুখো-শুখো হাত-পায়ের লোকটা কেমন স্থলের গাড়ি জলে ভাসায়! আবার জলের জাহাজ আকাশে ওড়ায়। লোকটাকে দেখে রাখে দেহাতি। দেশে ফিরে গল্প করবে।

দেহাতির কাঁধে একটা ভাগলপুরি চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে গৌর এক ঝলক মেয়েটাকে দেখে নেয়। গৌরের গাড়িতে চড়ার ক্ষণকালের উত্তেজনার শেষে মেয়েটি আবার উদাস হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাস্তায় এই দারুণ রোদে নাচতে নাচতে তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে হয়তো, কত কাল সে গেহুঁর খেতি দেখে না, পোড়া পাতার সুঘ্রাণ নেয় না বুকের বাতাস ভরে। কত কাল নিজের আনন্দে নাচেনি সে। গৌর চোখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি ছাড়ে। দাশ কেবিন।

গৌরের পিছনের সিটে একটা রঙিন টিপ পড়ে থাকে। বাতাসে মেয়েটার কপাল থেকে খসে পড়েছিল। আবার কোনও সোয়ারির গায়ে সেঁটে একদিন উঠে যাবে টিপটা। গৌর টেরও পাবে না।

তিন

দালানকোঠাই করতে চেয়েছিলেন বগলাপতি। কিন্তু জবরদখল জমিতে ছাদ দেওয়া বারণ। তাই ছাদটা হয়নি। পাকা ভিতের ওপর দেয়াল উঠেছে। ওপরে টিন। ঘর দু'খানা। রাখোহরির পরিবারের সঙ্গে যখন এখানে প্রথম এসেছিল গৌর তখন বাড়িটা জমজম করত। ওরা চলে যেতে আবার সব নেতিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময় আলমারি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল সবই নিয়ে গেল রাখোহরি, ভাঙাচোরা দু'-একটা আসবাব, কম দামের তক্তপোশ, ছেঁড়া বই-কাগজ, সংসারে জমে ওঠা আবর্জনা আর গৌরহরিকে ফেলে রেখে গেল। সেই থেকে গৌর ভাবে, বাড়িটা তার নিজের হয়ে গেছে বুঝি। বগলাপতির সবই দখল করে নিয়েছে রাখোহবি। এই হাফ-ফিনিশ বাড়িটার ওপর

দাবি-দাওয়া বোধহয় ছেড়েই দেবে। দলিল-দস্তাবেজ নেড়েচেড়ে দেখেছে গৌর, একে ওকে তাকে দেখিয়েছে। না, বাড়িটা পেলে পাবে তাদের তিন ভাই। কিন্তু গৌরের আশা, অত পেয়ে রাখোহরি বোধহয় আর এটা চাইবে না। কিন্তু কেবলই একটা আশা-নিরাশার ভিতরে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না। রাখোহরি কী চাইবে আর চাইবে না। যদি চায় তো কী করবে গৌর? যদি সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর রাখোহরি, যদি লড়ে, যদি চায় তো দিয়েই দিতে হবে।

একটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে পুরনো ব্যাটারি, পুরনো টায়ার, গাড়ি সারানোর কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। অন্য ঘরটায় একখানা তক্তপোশ, দু'খানা সস্তা বেতের চেয়ার, দু'-একটা ট্রাঙ্ক, বাক্স, একটা ফ্যান, দু'-একটা থালা-বাসন। ব্যস, আর কিছু নেই। ঘর দু'খানা ঘিরে কাঠা চারেক জমি। উত্তরদিকে খানিকটা নন্দীরা সীমানা-দেয়াল দেওয়ার সময়ে দখল করে নিয়েছে। রাখোহরি থাকলে পারত না। নন্দীবাড়ির মেয়েটা সকালে বা বিকেলের দিকে গৌর বাড়ি থাকলে এক-একদিন কুঁচো নিমকি দিয়ে চা দিয়ে গেছে। ডাঁটো শরীরের মেয়ে, দু'বার তাকাতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর চা নিমকি! এসব গৌরের সামনে রেখে নন্দীরা তার নাকের ডগাতেই হাতখানেক ভিতরে দেয়ালের জন্য ধরল, গৌরকে ডেকে দেখাল, দেখ তো, ঠিক আছে? গৌর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। দেয়াল উঠে গেল। গৌরের লজ্জায় কিছু বলা হল না। তা যাক গে এক হাত জমি। গিয়েও যা আছে তা গৌরের পক্ষে অনেক। সামনের দিকে শখ করে বাগান করেছিলেন বগলাপতি। এখন বাগান হেজে-মজে আগাছার জঙ্গল। একটু উঠোন মতো জায়গায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ ছায়া দেয়। মাঝে মাঝে গাছটা জামরুলে ছেয়ে যায়। গাছের গায়ে কাঠপিঁপড়ের বাসা। সেইসব পিঁপড়েদের তুচ্ছ করে কচিকষ্টি জামরুল পাড়ে বাচ্চা ছেলেরা। ডাল ভাঙে, পাতা ছড়ায়। গৌর কিছু বলে না। বাগানের বেড়াটা ভেঙে গেছে কবে। গৌর সারায়নি। গোরু ঢুকে আগাছা খায় মটমট করে। পিছনের দিকে ঘর থেকে দূরে সেপটিক ট্যাঙ্কওলা পায়খানা আর বাথরুম, টিউবওয়েল ফিট করেছিলেন বগলাপতি। সে সবই রংচটা, পিছল, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে যেতে বুক-সমান জঙ্গল। কচুপাতা, বিছুটি বন, ভাট আর ভাং গাছে ছেয়ে আছে। তার পিছনে বারোয়ারি পুকুর। অনেক রাতে পুকুরের জলে মাছ ঘাই দেয়, ব্যাং লাফিয়ে পড়ে। দেশ-গাঁয়ের শব্দের মতো সব শব্দ ওঠে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। মশার ঝাঁক পিন পিন করে। বাগানের একধারে গৌরের গ্যারেজ। সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় ল্যান্ডমাস্টার। গৃহস্থ যেমন মাঝরাতে গোয়ালঘরে শব্দ পেলে কুপি জ্বালিয়ে দেখে আসে, ঠিক সেই রকম গ্যারেজে খুটখুট শব্দ পেলে গৌর টর্চ জ্বালিয়ে বেরোয়। ল্যান্ডমাস্টারখানা দেখে আসে। বগলাপতির দেওয়া সেকেন্ডহ্যান্ড ল্যান্ডুটা ছাড়া তার আর আছেটা কী?

ক'দিন পর পর বৃষ্টি গেছে খুব। কলকাতার রাস্তা-ঘাটে এখনও হাঁটুভর জল জমে আছে। গৌর তাই আজ সকালে গাড়ি বের করেনি। মেঘ কাটছে, রোদ উঠছে একটুখানি। উঠোনের মাঝখানে মাটি শুকিয়ে সাদা হচ্ছে ক্রমে। জামরুল গাছে এবার ফুল আসেনি। খুব পিঁপড়ে বাইছে। নন্দীদের পাঁচটা হাঁস পুকুর থেকে উঠে এসে গৌরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ায়। এ ওর ঝুঁটি ধরে পিঠে চাপে। একটা মাদি হাঁস খেলতে খেলতে সামলাতে না পেরে তলতলে একটা ডিম পেড়ে ফেলে মাটিতে, একটা হাঁস সেটা কপকপ করে খেয়ে নেয়। জামরুল গাছের ছায়ায় একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসেছে গৌর। কলকাতার একখানা স্ট্রিট ডাইরেক্টরিই গৌরের প্রিয় বই। অবসর পেলেই সেটা নিয়ে বসে। আজও বসেছে। কলকাতার সঙ্গে জানপয়ছান এখনও তার শেষ হয়নি। কবে হবে তা বলাও যায় না।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না সে। রাস্তার নাম মুখস্থ করতে করতে অন্য মনে চেয়ে থাকে। হাই তুলে বইখানা কোলে ফেলে রেখে তার বাড়িখানা দেখতে থাকে।

কতটুকুই বা জমি! কীই বা ভাল ঘরখানা। তবু বগলাপতির বড় সাধের বাড়িখানা। দেশের

লোকদের সঙ্গে মিলেজুলে একদিন এইখানে থাকবেন, এরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। ওদিকে বড়লোকদের পাড়ায় তিনতলাখানা ছাড়তেও কষ্ট হত তাঁর। তাই এই বাড়িটা করে এক গরিব জ্ঞাতিকে বসিয়েছিলেন। কড়ার ছিল, যতদিন না বগলাপতির দরকার হয় ততদিন বিনা ভাড়ায় থাকবে। জ্ঞাতি কাকা হরিরাম সেই থেকে বসলেন বাড়িটায়। পুরুত মানুষ, খুব নিরীহ। তার পাঁচ ছেলেমেয়ে, বউ, বিধবা বোন নিয়ে বিরাট সংসার। কষ্টে চলত। বড় ছেলে নিতাই ছিল ব্যাঙ্কের পিয়োন। কী ভাগ্যে তার বউটা হল সুন্দরী। সেই বউই অবশেষে ভাগ্য ফিরিয়ে দিল তার। বিকেলের দিকে সাজগোজ করে বেরোত, একটু বেশি রাতে ফিরে আসত আবার। ঘরের বউয়ের মতোই চলাফেরা, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে ঘোমটা, সব বজায় রেখে চলত সে। বিয়ের আগেকার এক ছোকরা প্রেমিক ছিল তার। সে এখনও মুখের বড়শি ছাড়াতে পারেনি। চলে আসত রবিবারে রবিবারে। হাতে মাছ, মিষ্টি দইয়ের হাঁড়ি, বউটি তাকেও খুশি রাখত। চা খাওয়াত, ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করত মাঝে মাঝে। সব বজায় রেখে বউটি নিতাইয়ের অবস্থা ফেরাতে লাগল আস্তে আস্তে। টেরিলিন-টেরিকটন পরতে লাগল নিতাই, সিগারেটের ব্র্যান্ড পালটে ফেলল। কিন্তু পাড়ায় তখন তার বউয়ের নামে টিটিক্কার। কত লোক যে তাকে দামি গাড়িতে চড়ে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কত লোক লক্ষ করেছে রাতে ফেরার সময়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত তাকে গাড়ি এসে পৌঁছে দেয়। তখন নিতাইয়ের বউয়ের পা টলমল করে, খোঁপায় ফুল গোঁজা থাকে। নিতাই সেসব শুনে ভারী বিরক্ত হয়ে বলত, রিফিউজিদের সঙ্গে থাকা যায় না। পাড়ার উঠতি মেয়েরা পাছে ওই বউয়ের খপ্পরে পরে যায় সেই ভয়ে প্রতিবেশীরা মাঝে-মধ্যে চড়াও হলে নিতাই ঘর থেকে হেঁকে বলত, কেন তোমাকে সন্দেহ করে বলো তো! তুমি সত্যিই কিছু করো-টরো না তো? বউ কেঁদে বলত, ওমা! তাই কি পারি! নিতাই বলত, আমার গা ছুঁয়ে বলো যে তুমি ওসব করো না! বউ তখন নিতাইয়ের গা ছুঁয়ে বলত যে সে ওসব করে না। তখন নিতাই বলত, তাহলে তোমার ভয় কী? সকলের মুখের ওপর বলে দাও সেই কথা। এ সব ঘটলে ক'দিন নিতাইয়ের বউ বেরোত না। তারপর আবার একদিন সাজগোজ করত, বেরোত, ফিরত রাত নিশুতির সময়ে। আবার তার বিয়ের আগের ছোকরা প্রেমিক রোববার দই, মিষ্টি নিয়ে আসত। বগলাপতি কানাঘুষো শুনে ডেকে পাঠালেন, এ সব কী শুনছি হরিরাম? হরিরাম ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বলতেন, ওরকম বউ হয় না। লক্ষ্মীমন্ত যাকে বলে। অবস্থার উন্নতি দেখলে কবে না পাঁচজন পাঁচ কথা বলেছে! ওই বউ আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি। বিষয়ী লোক বগলাপতি উন্নতির কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠতেন, তোমার ছেলেরা কোন লাটসাহেবি পেয়েছে যে রাতারাতি উন্নতি হয়ে গেল? ওসব বোলো না। টাকাপয়সা কোন গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায় তা আমি জানি। আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। হরিরাম ম্লান মুখে চলে গেলেন বটে কিন্তু তারপরই গোলমাল শুরু করে নিতাই আর হরিরামের আরও দুই ছেলে মাধু আর সতু। মাধু সতুর চেহারা বিশাল, স্কুলের এইট ক্লাসে আটকে পড়েছে, চুরি-চামারি দিয়ে বাল্যজীবন শুরু করে জোয়ান বয়সে বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠেছে। বাড়ির বউয়ের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তারাও দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল অবশ্য এই সাড়ে কাঠা জমিওলা বাড়িটা। জমি বগলাপতির বাপের নয়, জবরদখল। যে দখল করে তার। দখলের অনেক পরে সরকার নামে নামে মঞ্জুর করেছে জমি। হরিরামের ছেলেরা বলে বেড়াতে লাগল, এই জমি বাড়িতে বগলাপতি কখনও থাকেননি, সুতরাং জমি তাঁর নয়। জবরদখল জমিতে বসবাস না করলে স্বত্ব জন্মায় না। তারাই এতকাল যখন বসবাস করেছে তখন জমি তাদেরই। এইসব বলে তারা পাড়ার লোককেও ভজাতে লাগল। বগলাপতি জ্ঞাতিভাই হরিরামকে ঠিক তুলে দিতে চাননি। চাইলে তুলতে পারতেন। তার বদলে তিনি হরিরামকে অন্য জায়গায় জমি দেখে দিয়ে বললেন, বাড়িটা ছেড়ে দাও। হরিরাম ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, ছেলেরা ছাড়ল না। মাধু আর সতু তখন পাড়ার মস্তান। নিতাইয়ের পকেটে বিস্তর নম্বরি নোট। তার আদুরি বউ বাড়িতে পাকা

বাথরুম তুলে ট্যাপের জলে অনেকক্ষণ গন্ধ সাবান দিয়ে স্নান করে। কাউকে গ্রাহ্য করার নেই। পাড়ার ক্লাবে মোটা চাঁদা দেওয়া আছে। রাতে না ফিরলেও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল বাড়িতে, ফি বছর শ'খানেক নারকোল বগলাপতির বাড়িতে পৌঁছে দিত হরিরাম। গোটা কুড়ি সুপুরি গাছ থেকে প্রায় পনেরো বিশ সের সুপুরি আসত। হঠাৎ সেসব দেওয়া তারা বন্ধ করে দিল। বগলাপতির চাকর পৌষপার্বণের আগে নারকোল আনতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। হরিরাম এসে একদিন হাতে পৈতে জড়িয়ে কেঁদে পড়লেন, দাদা, আপনার জমিতে আমি পরগাছা। উঠতে চাই, কিন্তু ছেলেরা দিচ্ছে না। আপনি আমার দোষ নেবেন না। বগলাপতি শ্বাস ফেললেন। মানুষটা বিষয়ী বটে কিন্তু হৃদয়হীন ছিলেন না। ভেবেচিন্তে বললেন, আমি যদিও রিফিউজি, কিন্তু জবরদখলের জমি আমার দরকার নেই। তুমিও অভাবী লোক, সময়মতো জমি নাওনি, এখন আর যাবে কোথায়? ওখানেই থেকে যাও। কিন্তু একটা শর্ত। আমার একটা ন্যাংলা-নুলো ছেলে আছে, গৌরা। ওর যদি কোনও চুলোয় যাওয়ার না থাকে তো তোমরা ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ো। হরিরাম উত্তর দিলেন না। জামার হাতায় চোখ মুছে বললেন, দাদা, আমরা মা-বাপ হয়েও ওই বাড়ির কোন কোণে পড়ে আছি, তো তোমার গৌরা! আমাদের দেশের বাড়িতে এ কোণে ও কোণে বেড়ালের মতো পড়ে থেকে কত জ্ঞাতি মানুষ হয়ে গেল, কত কর্মনাশা বুড়ো হয়ে দাবা তাস পাশা খেলে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে মরল, কেউ ফিরেও দেখেনি। কিন্তু আমার ছেলেরা তো একান্নবর্তী পরিবার দেখেনি। বড়বউমা যদি আজই বলে তার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়িকে আলাদা করে দিতে তো নিতাই তাই দেবে। ওরা রক্তের সম্পর্ক চেনেই না। জ্ঞাতি তো দূরের কথা। কুকুর বেড়ালটা যে এঁটো-কাঁটা খায় তাও ওদের গায়ে লাগে।

বাড়িটা ওইভাবে একরকম হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বগলাপতি আর উকিল-মোক্তার করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, না-হক-এর জমির জন্য লড়াই করে খামোকা রক্ত জল হবে। কোর্ট তাঁকে ডিক্রি দিলেও উচ্ছেদ করতে পারবেন না। রিফিউজিদের জমির মায়া বড় বেশি। কলোনি থেকে এতকাল বসবাসের পর কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে জানলে সবাই রুখে দাঁড়াবে, দাঙ্গা লেগে যাবে। তিনি তা করেননি। উপরন্তু তিনি পুরনো আমলের লোক বলে জ্ঞাতির সম্পর্ক মানতেন। হরিরাম উচ্ছেদ হবে, এটা ভাবতে তাঁর ভাল লাগত না বোধহয়।

কিন্তু সেই সময় ডাকাতের মতো এসে পড়ল রাখোহরি। বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার সময়ে সে হিসেবে নানারকম ফাঁক-ফোঁকর দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় বখেরা লেগে যায়। বগলাপতির পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি হাত কচলে টাকা করেছেন। কাউকে চটাতেন না। তিনি ক্ষয়ক্ষতি হাসিমুখে সামলাতেন।আবার ধৈর্য ধরে সেই ক্ষয়পূরণও করতেন। মানুষকে খাতির করা ছিল তাঁর স্বভাব। যার কাছ থেকে কাজ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাকেও তিনি হাতে রাখতেন। জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন কী হয় বলা যায় না। তাঁর সেই পদ্ধতি কার্যকরীও হত। ফুড করপোরেশনের নগণ্য একজন কেরানিকে তার বউয়ের টিবির সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন বগলাপতি। সাহায্য না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই কী সব পরীক্ষা দিয়ে সেই কেরানি ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে গেল। বগলাপতিকে সে মনে রেখেছিল। বগলাপতির এই সহজ দার্শনিকতা রাখোহরি কখনও বুঝত না। বগলাপতি যে সরকারি অফিসের পিয়োন বা আর্দালিরও বাড়ির কুশল নেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেন, মাঝে-মধ্যে একটা দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন, এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব বলেই ভেবে নিল রাখোহরি। সে তাই বুড়ো বয়সের বগলাপতিকে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। যাদবপুরের জমি, ওটা বিক্রিও করা যাবে না, আমরা থাকবও না। হরিরাম আছে, থাক। কিন্তু রাখোহরি ছাড়ল না। সে বলল, জমির জন্য বলছি না। সাড়ে চার কাঠা জমি দিয়ে আমাদের হবেটা কী? কিন্তু ওরা যে আপনাকে অপমান করে, জমির ফসল দেয় না, আমাদের জমিতে আছে বলে যে ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, তার জন্য কিছু

করা দরকার। বগলাপতি শঙ্কিত হয়ে বললেন, ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না রাখু। গুন্ডা-বদমাইশদের সঙ্গে লেগে ইজ্জত যাবে। রাখোহরি ফুঁসে উঠে বলে, আপনার ওইরকম ছেড়ে-দাও ছেড়ে-দাও ভাব আমার বরাবর খারাপ লাগে। হরিকাকা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর ছেলেরা মাথা নিচু করে থাকবে না কেন? আমি ওদের মাথাটা নুইয়ে ছেড়ে দিতে চাই। বগলাপতি তখন জিজ্ঞেস করলেন, কী করবি তুই? কী করতে চাস? রাখোহরি বলল, মামলা করব। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জবরদখলের জমি, বিক্রিবাটার স্বত্ব নেই, বসতও করবে না কেউ, ওই নীরেস চার কাঠার মামলায় টাকা খাওয়ানোর মতো অপচয় হয় না। মামলা-মোকদ্দমা বগলাপতি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। যেখানে কিছু ছেড়ে দিলে হয়, সেখানে বরাবর বগলাপতি কিছু ছেড়েছেন। মামলা করেননি।

কিন্তু রাখোহরি দাপের লোক। বগলাপতির সেকেলে পদ্ধতি সে মুহুর্মুহু বাতিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, মামলায় ডিক্রি পেলেও উদ্বাস্তু কলোনি থেকে কাউকে বিধিমতো উচ্ছেদ করাও শক্ত ব্যাপার। কোর্টের পেয়াদা কিংবা পুলিশ গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। তাই সে অন্য কায়দা নিল।

সে সময়ে মাঝে মাঝেই ডজ গাড়িটায় রাখোহরিকে নিয়ে বেরোত গৌর। দু'-চার জায়গায় কী সব খোঁজখবর নিয়ে রাখোহরি একদিন ডজ গাড়িটা যাদবপুরের সেন্ট্রাল রোডে বিকেলের দিকে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে গৌরকে বলল, তুই ঘুরে-টুরে আয়, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করব। নেংচে নেংচে গৌর একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সে সময়ে দূর থেকে দেখতে পেল, ভারী সুন্দর একখানা মেয়ে এসে উঠল তাদের গাড়িতে। পুরনো আমলের গাড়ি, এখনকার মতো বড় বড় কাচ লাগানো নয়। ভিতরটা একটু অন্ধকার, জানালা দরজা ছোট ছোট। সেই অন্ধকারে কী যে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল না গৌর। একটু পরেই অবশ্য গৌরকে ডেকে গাড়ি ছাড়তে বলল রাখোহরি। মেয়েটা তখন নেমে গেছে। কিন্তু আবার ক'দিন পর সেন্ট্রাল রোডে ডজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল রাখোহরি। মেয়েটা আবার এল। কাছ থেকে গৌর চিনতে পারল, নিতাইয়ের বউ। পালে-পার্বণে তাদের বাড়ি অনেকবার গেছে। সেদিন আর নিতাইয়ের বউ নেমে গেল না, ময়দানে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ হাওয়া খেল রাখোহরির সঙ্গে। কত হাসি গল্প, ঠাট্টা-ঠিসি, গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে পড়া! বড় লজ্জা করছিল গৌরের। কথার মাঝখানে একবার রাখোহরি তার পাসপোর্ট বের করে নিতাইয়ের বউকে দেখিয়ে বলল, দেখো, এখনও তাজা পাসপোর্ট। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আবার বিলেতে চলে যেতে পারি। যদি বিয়ে করি তো বউয়েরও ভিসা পেয়ে যাব। তখন গৌর অল্পবুদ্ধিতেও বুঝতে পারল, বিস্তর মেম-ঘাঁটা রাখোহরি নিতাইয়ের হাফ-গেরস্ত বউয়ের জন্য একটুও নয়, অন্য কারণে লেজে খেলাচ্ছে বউটাকে। রাখোহরিরও ফোর-সাইট ছিল। বুঝেছিল, এ মেয়েকে কেবল টাকা বা ভয় দেখালে কিছু হবে না। এমন কিছু দেখাতে হবে যা নতুন, যার মধ্যে চমক আছে। পাসপোর্ট ভিসা আর বিলেতের গল্পে সেই কাজটা হয়ে গেল। বিলেতের গল্প শুনতে শুনতে ভারী নেতিয়ে পড়ত নিতাইয়ের বউ, শ্বাস ফেলতে ভুলে যেত। রাখোহরি গল্প বলতেও জানত। গোল্ডার্স গ্রিনের শীতের রোদ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের পায়রা, হাইড পার্কের সবুজ ঘাস, বিখ্যাত কান্ট্রিসাইডের টিলা, শৌখিন জঙ্গলে শিকার, গলফ লিঙ্কে ছুটির দুপুর, উইক এন্ডে সমুদ্রের ধারের একশো মজা, সব জীবন্ত হয়ে উঠত। ছুটিছাটায় প্যারিস, মোমবাতির আলোয় ডিনার আর নাচ। সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি হ্রদের ধারে চেরি আর আপেলের খেত, ইটালির জলপাইরঙের মানুষ দেখে বেড়ানো। কলকাতার দ-য়ে পড়ে থাকা নিতাইয়ের বউয়ের বুকের ভিতরে ঝড় তুলে দিল রাখোহরি। আর সামনের সিটে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে গৌর ওই সব গল্প শুনতে শুনতে কলকাতার কথা ভুলে গিয়ে উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে কেবল বিদেশি রাস্তার দৃশ্য দেখত।

রাখোহরির কয়েকটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতগুলোকে সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিত। নিতাইয়ের বউটা কয়েকদিনের মধ্যেই ভূতে পাওয়া মানুষ হয়ে গেল। রাখোহরি গৌরকে কোনওদিন পুরো মানুষ বলে ভাবেনি। তাই তার সামনেই ভূত ঢোকানোর খেলা খেলত। একদিন ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, বসন্তকাল, হাওয়া-টাওয়াও ভালই দিচ্ছিল, দু'-চারবার কোকিলও ডাকল নিয়মমতো, সে সময়ে গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ, সে শুনতে পেল, রাখোহরি নিতাইয়ের বউকে বলছে, চলো বিয়েটা সেরে ফেলি।

সে কী? তা কী করে হবে?— বউটা বলে অবাক হয়ে।

রাখোহরি হাসে, আইনে আটকায় জানি। কিন্তু এখন ডাইভোর্স করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আর তার দরকারই বা কী? আমরা যদি বিলেতে পালিয়ে যাই নিতাইয়ের সাধ্য নেই অত দূরের পাল্লায় কিছু করে। কিন্তু পালিয়ে যেতে হলেও পাসপোর্ট ভিসা তো চাই। তাতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দরকার। তাই বলছিলাম। একটা রেজিস্ট্রি করে আমি তোমাকে বউ বলে পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত দাখিল করি। বউয়ের জন্য ভিসা পেতে বড়জোর দিন কুড়ি লাগে, তারপর—

বউটা শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে তখন। ডজ গাড়ির আয়নায় গৌর দেখে, নিতাইয়ের বউয়ের ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল বউটা। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, কবে?

সাড়ে চার কাঠা জমির জন্য বিস্তর ভূতের খেলা দেখাল রাখোহরি। সেই থেকেই গৌর জানে রাখোহরির মতো লড়াকু হয় না। ভাবলে আজও গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একদিন সকালে নিতাই এসে রাখোহরিকে ধরল, দাদা, এ কী শুনছি?

কী শুনছ?

সে বড় পাপকথা! এ সব করবেন না, ভাল হবে না। আমি পুলিশে খবর দেব।

দাও।— উদাসভাবে হাই তুলে রাখোহরি বলে।

এ সব করবেন না।— আবার বলে নিতাই। কিন্তু তার গলার স্বর এক পর্দা নেমে গেছে তখন। সুন্দর চেহারার রাখোহরির মুখে সর্বদা যে নিষ্ঠুরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফুটে থাকত তার সামনে অনেকেই দাঁড়াতে পারত না। নিতাই জানত, বউ গেলে সে আটকাতে পারবে না। অথচ তার দুধেল গাই। তারই ওপর খেয়ে-পরে আছে তারা, টেরিলিন-টেরিকটন পরছে, সিগারেটের ব্র্যান্ড পালটেছে। বউয়ের কাজকর্মে পাছে বাধা হয় সেই ভয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হতে দেয়নি। এখনও কেমন আঁট গড়নের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি রয়ে গেছে বউ। পুরুষদের বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। কিন্তু হঠাৎ এ কী? এমনটা তো কখনও ভাবেনি নিতাই!

রাখোহরি কঠিন মুখ করে বলল, কী আর খারাপ কাজটা করছি! একটা মেয়েকে নষ্ট করছ তোমরা। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাকে সত্যিকারের ঘরসংসার দেব।

ও সব ব্লাফ। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবেন। আমি জানি।

জানো যদি তো ওকে সেটা বুঝিয়ে দাও না কেন?

কিন্তু নিতাই যে তা অনেক বুঝিয়েছে, এবং বউ বুঝতে চায়নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ হম্বিতম্বি ছেড়ে নিতাই রাখোহরির পা চেপে ধরল, দাদা, দয়া করুন।

রাখোহরি তখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

ক'দিন পর জমির মামলা দায়ের হলে নিতাই রাখোহরির পক্ষে সাক্ষী দেয়। পাড়ার লোকদেরও সে-ই বোঝায়। উচ্ছেদের নোটিশ পড়ার আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে কসবার দিকে উঠে গেল। একটা শ্বাস ছেড়ে আর-একটু বুড়ো হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বাড়ির প্লাস্টার ফেলে নতুন সিমেন্ট

লাগিয়ে রং করে নিল। তারপরই বিয়ে করে রাখোহরি অন্য কাজে মন দেয়। বাড়িটা ভাড়া দেয় এক বুড়ো ব্যাচেলারকে।

এই সেই বাড়ি। দু'খানা টিনের ঘর, সাড়ে চার কাঠা জমি। তেমন কিছু না। তবু গৌর মনে মনে আজও বাহবা দেয় রাখোহরিকে। বগলুর ফোর সাইট ছিল, রাখোহরিরও ছিল। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোই যেন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে বালিগঞ্জের বাড়ি একদিন মর্টগেজ যাবে! তাই আগে থেকেই খালাস করে রেখেছিল এই বাড়িখানা। বুড়ো ব্যাচেলার ভাড়াটে বসিয়েছিল, যাতে তুলে দিতে কষ্ট না হয়। বাড়িখানা কাজে লেগেছিল বটে। আবার কাজ ফুরালে রাখোহরি উঠে গেছে বালিগঞ্জে। জঙ্গলে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে একা পড়ে আছে গৌর! মাঝে মাঝে সে ভাবে, বোধহয় বাড়িখানা তারই হয়ে গেল, রাখোহরি স্বত্ব ছেড়েই দিল বোধহয়। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোর কথা মনে পড়তেই আজও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় গায়ে। কোন কায়দায় যে রাখোহরি কাকে উচ্ছেদ করবে বলা যায় না। এইসব ভেবে গৌরের কেবলই মনে হয়, এই দুনিয়াতে একটা জীবন সে পরের ঘরে বাস করে যাচ্ছে। কোথাও তার নিজের ঘর নেই। পাখিদের মতো মানুষের পালক নেই যে উড়ে গেলেও দু'-একটা পালক পড়ে থাকবে। কিন্তু গৌরের মনে হয়, পালক নয়, কিন্তু পালকের মতোই হালকা মিহি নরম কী যেন সব পড়ে আছে বাড়িটাতে। হাওয়া দিলে সেগুলো উড়ে উড়ে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গৌর ঠিক টের পায়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখে, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানা ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হঠাৎ দেখতে পায়, হালকা কুয়াশার মতো কী যেন ভেসে আছে। ঘুরছে ফিরছে উঠছে নেমে আসছে। এ সব কী তা সঠিক জানে না গৌর, তবে তার মনে হয়, এ সব হচ্ছে মানুষের অদৃশ্য পালক। যেখানে কিছুদিন বাস করে মানুষ, সেইখানে তার কথার স্বর বাতাসে থেকে যায়, থাকে কামনা-বাসনার ছাপ, ইচ্ছে-অনিচ্ছে থেকে যায়। সেসবই হালকা মিহিন পালকের মতো ঘোরে ফেরে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইট কাঠ মেঝের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য গাছের মতো শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে। তাড়ানো যায় না। হরিরাম কাকা, নিতাই, তার বউ, মাধু, সতু, সেই বুড়ো ব্যাচেলার ভদ্রলোক, রাখোহরির ছেলে বউ, সকলেরই পালক পড়ে আছে। সেইসব পালক গৌরের শ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যায়, চোখে আঁষের মতো জড়ায়। প্রজাপতির মতো কাঁধে বা মাথায় বসে ডানা কাঁপায়।

দুনিয়াভর ভূতের খেলা চলেছে। সবাই দেখে না। গৌর দেখে। এই যে এখন দিনদুপুরে জামরুল গাছের ছায়ায় চেয়ার টেনে বসে আছে গৌর, তার চারদিকে অফুরান রোদ, এর ভিতরেও সেইসব পালকেরা উড়ে উড়ে ঘুরছে। দেখা যায় না, কিন্তু টের পাওয়া যায়। হালকা, মিহি। জ্যোৎস্নার মতো, সুখের স্বপ্নের মতো পলকা জিনিস দিয়ে তৈরি। চারদিকে এইসব মানুষের পালক উড়ছে, টের পায় গৌর। তার হাই ওঠে। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছু নেই আর। বগলাপতি যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু নিল রাখোহরি, আর যা আছে তা ভূতের কব্জায়। আরও আছে রাখোহরির ভূত। কখন যে সে কাকে উচ্ছেদ করে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা ন'টায় চড়া রোদ উঠে গেছে। পিঁপড়ের সারি নেমে আসছে গাছ বেয়ে। সকালটা বড় সুন্দর। গৌর গুনগুন করে একটা ইংরিজি প্রার্থনাসংগীত গাইতে থাকে। ফাদার ইভান্স গাইতেন প্রার্থনার গান। সেন্ট অ্যান্টনিজের প্রকাণ্ড হলঘরে পিয়ানোর ঢাকনার ছায়ায় ফাদার ইভান্সের মগ্ন মুখখানা চোখে পড়ে। বুড়ো মানুষ, বড় নরম মুখখানা তাঁর। ধর্মসংগীত ছিল তাঁর প্রাণ। জিশুর ক্রুশবহনের দিনে তিনি বিষাদসংগীত গাইতে গাইতে কাঁদতেন। জিশুর পুনরুত্থানের দিন তাঁর গলায় রৌদ্র ঝিলমিল করত। হুল্লোড়বাজ অত ছেলের মধ্যে কোন ছেলেটার মুখে আনন্দ নেই, মনে নেই সুখ, তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ফাদার ইভান্স। ভিড় ঠেলে পথ করে আসতেন তার কাছে, কাঁধে হাত রাখতেন, গল্প বলতেন। টাইফয়েডের ঘোরলাগা অবস্থায় কতদিন গৌর দেখেছে

শিয়রের কাছে বুড়ো-সুড়ো সান্তাক্লসের মতো ফাদার ইভান্স বসে আছেন। বাদামি দাড়ির ভিতরে হাসি, ঘন ভ্রু-র নীচে স্বচ্ছ জলের মতো চোখ। সেই জলের নীচে কৌতুক খেলা করে মাছের মতো। বাগানের গোলাপ-কাঁটায় সুন্দর একটা জামা একবার ছিঁড়ে ফেলেছিল গৌর। তার কান্না দেখে ফাদার ইভান্স, 'অ্যাও, কাঁডে টো মেয়েরা। টুমি মেয়ে নাকি?' বলে তার জামা খুলে নিপুণ হাতে রিপু করে দিয়েছিলেন। তারপরও বহুকাল জামাটা পরেছে গৌর।

খুব বুড়ো হয়েছিলেন ফাদার ইভান্স। তাই একদিন মারা গেলেন। অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল সেদিন। ছায়াচ্ছন্ন দিন। ইভান্সের দেহ বহন করে আনল বাহক বন্ধুরা। কালো পোশাক, গম্ভীর মুখ সকলের। শব-বহনকারী গাড়ির পিছনে সেন্ট অ্যান্টনিজের ছাত্রদের বিরাট সারি। নিঃশব্দে তারা ধীরগতি গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন ফাদারেরা। সাহেবরা কাঁদে না। গৌরের পাশেই ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। সে অনেকবার মুখ তুলে ফাদারের মুখখানা দেখল, গম্ভীর মুখ, কিন্তু কান্নার চিহ্ন নেই। কাঁদতে কাঁদতে গৌরের বুকে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ছিট ছিট বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছিল তার মুখ। ফাদার ফ্রান্সিস তার হাত ধরে রাখলেন। কবরখানায় যখন ফাদারের দেহ রাখা হল গর্তে, ঝুরঝুরে মাটি চাপা পড়তে লাগল কফিনে, তখনও ফাদারেরা কেউ কাঁদে না। সাহেবরা কাঁদে না, গৌরের মনে হয়েছিল। যখন গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি দিচ্ছে কবরে, তখন গৌর হঠাৎ দেখে, একটা ভয়-পাওয়া ছোট্ট ব্যাং লাফিয়ে পড়েছে কবরে। বেরোবার পথ পাচ্ছে না। চারদিকে ভিড়। মাটির চাপ এসে পড়ছে তার ওপরে, সে প্রাণপণে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে মাটির ঢেলা এসে পড়ছে। ব্যাংটা প্রায় চাপা পড়ে-পড়ে। সেই সময় গৌর দেখল, ফাদার ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের ধারে, দু'হাত বাড়িয়ে ব্যাংটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘকায় ফাদারের শরীরটা নুয়ে আছে ফাদার ইভান্সের কবরের ওপর, চারদিক থেকে মাটির চাপড়া এসে পড়ছে তাঁর বাড়ানো দুই হাতে, মেঘের ঘন ছায়ায় ফাদার ফ্রান্সিসের মায়াময় মুখখানা কী গভীর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল! আজও গৌরের মনের মধ্যে ওই ছবিটা রয়ে গেছে, ফাদার ফ্রান্সিস কুঁজো হয়ে কবরের ভিতরে একটা বিপন্ন ব্যাংকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন গভীর মমতায়। সেই সময়ে নতমুখ ফাদারের চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে পড়ছিল। তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতের তেলোয় ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাং প্রাণভয়ে বসে আছে। গৌর দেখেছে।

ফাদার ইভান্সের শেখানো ধর্মসংগীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে গৌর ওঠে। কতকাল ধরে মানুষ কত পালক ফেলে গেছে পৃথিবীতে। শিমুল তুলোর মতো ওড়াউড়ি করে সব পালকেরা। গৌর আপনমনে হাসে। ধর্মসংগীত গায়।

উকো দিয়ে গভীর মনোযোগে একটা পিস্টন রিং ঘষছিল গৌর। এখনও তার ঠোঁটে ধর্মসংগীত। সেই সময়ে নন্দীদের বাড়ির মেয়েটা এক কাপ চা নিয়ে এল। সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট।

কী খবর?— গৌর আলগাভাবে জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটাব গড়ন বেশ। বয়সকালের লকলকে ভাব শরীরে ফুটে আছে। পিছল চামড়া। তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবু চোখের দীর্ঘ পাতায় একটা শীতলতা আছে। তাকিয়ে থাকলে জিরোতে ইচ্ছে করে।

চা দিয়েই মেয়েটা চলে গেল না। বলল, গৌরদা, আজ বেরোবেন না?

বেরোব।

কখন?

এই তো। বেরোলেই হয়।

আমি আর মা একটু কালীঘাটে যাব। নিয়ে যাবেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌর মনে মনে একটু হাসে। বলে, কালীঘাটে গিয়ে কী হবে?

মেয়েটা বলে, মা পুজো দেবে। মানত আছে।

ও। আচ্ছা, নিয়ে যাব।

মেয়েটা ঘুরে ঘুরে ঘরখানা দেখে। তারপর হঠাৎ গৌরের দিকে ফিরে বলে, জিজ্ঞেস করলেন না কীসের মানত?

কীসের?

মেয়েটা আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে হাসে। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখখানা থমথমে করে বলে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো, তাই।

ও। তা কোথায় ঠিক হল?

মেয়েটা থমথমে মুখেই বলে, সব কি বলতে আছে?

কেন, বলতে নেই কেন?

ভাংচি দেন যদি!

ভাংচি দেব? কেন?

অনেকে তো দেয়।

গৌর ঠিক বুঝতে পারে না। ফাদার ইভান্সের ধর্মসংগীতের মধ্যে ডুবে ছিল সে, দুনিয়াময় মানুষের ফেলে যাওয়া পালক দেখছিল। সেই ডুবজল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ পৃথিবীর ওপরকার সব কথাবার্তা, সম্পর্ক কিংবা ঘটনা বুঝতে তার একটু কষ্ট হয়। মেয়েটার মুখচোখে রহস্য ফুটে আছে। চোখে সজল বিদ্যুৎ, ঠোঁটে টেপা নিষ্ঠুর হাসি। মেয়েটা হঠাৎ পালটে গেল যেন এইমাত্র। গৌর তা লক্ষ করে। কথাটা ঠাট্টা ভেবে সে একটু হাসে। বলে, ভাংচি দেব না।

এই মেয়েটাকে দিয়ে চা আর কুঁচো নিমকি পাঠিয়ে গৌরের এক হাত জমি এনক্রোচ করেছিল নন্দীরা। গৌরের সেই কথা মনে পড়তে একটু হাসল। মেয়েটা কি তা জানত? ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো মেয়েটা জানত, হয়তো জানত না। এই জমির জন্য লড়াকু রাখোহরি কত কী করেছিল, আর গৌর কুঁচো নিমকি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা বয়সকালের মেয়ের দিকে কয়েক পলক তাকানোর সুযোগ পেয়ে সেই দুর্লভ জমির এক হাত ছেড়ে দিয়েছে। এক হাত বাই চল্লিশ হাত, কত হয়? একটু ভাববার চেষ্টা করল গৌর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতেজ গাছের মতো ডালপালা সমেত মেয়েটা। গৌরের, ফিফটি পার্সেন্ট হাফ-ফিনিশ, বগলুর তিন নম্বরের, ল্যান্ডমাস্টারে চড়েই হয়তো একদিন এর বর আসবে।

মেয়েটা কী যেন বলবে-বলবে করে। বলে না। পিস্টন রিংটা হাতে ধরে থেকেই গৌর চেয়ে থাকে।

মেয়েটা একটু দম ধরে থেকে হঠাৎ চোখ বুজে বলে, আপনি আমার বিয়েতে ভাংচি দিলে আমি খুশি হতাম।

অ্যাঁ!— গৌর ভারী অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ায় না। কথাটা বলেই বাতাসে ভেসে তর তর করে চলে যায়।

যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই শূন্য জায়গাটায় অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করে খুব। পিস্টন রিং আর উকোটা রেখে দেয় গৌর। জানালার ওপর একটা নিমডাল ঝুঁকে পড়েছে। নতুন বর্ষায় পাতা এসেছে তার। সতেজ পাতা। তাতে রোদ পড়ে সবুজ আলো দিচ্ছে চারধারে। পোকামাকড়ের আনন্দের শব্দ ওঠে চারদিকে। একটা কেন্নো জানালার শিক বাইছে। গৌর জানালায় দাঁড়িয়ে এইসব দেখে আর দেখে। সতেজ নিমগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ওই দূরের মেঘহীন আকাশ দেখা যায়। ওইখানে ফাদার ফ্রান্সিস থাকেন, আর ফাদার ইভান্স। স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল বল। চারদিকে ওড়াউড়ি করে মানুষের ফেলে যাওয়া পালক। গৌর চেয়ে থাকে। মেয়েটার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হাতের তেলকালি ঝাড়নে মুছে গৌর তার শোওয়ার ঘরে আসে। পেরেকে ঝোলানো

হাত-আয়নাটা পেড়ে নেয়। মুখ দেখে। চোয়াড়ে একখানা মুখ। রুখো-শুখো দু'খানা হাত-পা। স্থাবর অস্থাবর কিছুই নেই গৌরহরির। যা আছে সবই ভূতের কব্জায়। রাখোহরি চোয়ালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চায় যদি, গৌর ঠেকাতে পারবে না। ভূতের খেলায় রাখোহরি বড় ওস্তাদ। মাথাটা এক বেহদ্দ নাচুনে মাগির নাটমঞ্চ। গৌর নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আয়নায়। তবু সে বিয়েতে ভাংচি দিলে মেয়েটা খুশি হয়। আরে বাঃ। এর অর্থ কী? মানে কী?

জানালা দিয়ে মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে। চারদিক আলোয় আলোময়। এমন দিনে কিছুই অস্বচ্ছ থাকে না। গৌর ভাবে, এমন সুন্দর দিন বহুকাল দেখেনি সে। কিন্তু কী বলল মেয়েটা? গৌর ভাংচি দিলেই খুশি হয়? না কি যে কেউ ভাংচি দিলেই খুশি হয়? কোন কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটা, 'আপনি' না 'ভাংচি'? ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে। কিন্তু ভাবে। চারদিক থেকে মেঘভাঙা রোদ এসে তাকে ঘিরে ধরে। চড়াই পাখিরা উড়ে আসে ঘরে। আসে এক-আধটা মৌমাছি, ফড়িং। পিঁপড়েরা দেয়ালে বায়, কেন্নো আসে, সবুজ পোকা একটা জানালার শিক বেয়ে ওঠে। ভেজা জঙ্গলে রোদ পড়ে একটা বুনো মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে থাকে।

বেলা সোয়া দশটা নাগাদ গৌর বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভালবাসে। কী করে বাসল, কবে বাসল তা ভেবে দেখতে আরও সময় লাগবে। কত সময় তা ঠিক জানে না গৌর। হয়তো একটা জীবনের সময় লেগে যাবে। তা লাগুক। একটা লম্বা জীবন এখনও পড়ে আছে গৌরের। সেই একা নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কিছু কিছু সুন্দর প্রবলেম থেকে যাক। গৌর অবরে-সবরে বসে ভাববে।

দরজায় চাবি দিয়ে গৌর বেরোয়। গাড়ি বের করে হর্ন দিতে থাকে। হর্নটা আজ অন্যরকমের আওয়াজ ছাড়ে। ভোরবেলার অস্বচ্ছ আলো দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মুরগি যেমন ডাকে।

চার

বিয়ের দিন দমদম থেকে বর আনল গৌরহরি। বউবাজার থেকে ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। সেই ফুলের গন্ধে গাড়ির ভিতরকার চৌকো বাতাসটা টই-টম্বুর হয়ে রইল। বেশ লাগছিল গৌরের।

সন্ধে লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আসরে উঁকি মেরে গৌর একবার মেয়েটাকে দেখে নিল। চন্দনে, সিঁথিমৌরে, গয়নায়, বেনারসিতে, ফুলে মেয়েটাকে চেনাই যায় না। মাইকে সানাই বাজছিল বুক খালি করে দিয়ে।

শেষ ব্যাচে খেয়ে গৌরকে বারকয়েক ট্রিপ দিতে হল আত্মীয়-স্বজনদের যে যার ডেরায় পৌঁছে দিতে। দু' খিলি পান গ্লাভস চেম্বারে রেখে দিয়েছিল। শেষ ট্রিপটা মেরে ফেরার পথে লেকে জলের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল গৌর। জলে আলো ভাঙছে। নানারকম আলো। জোর বাতাসে জলের গন্ধ আসে। শব্দ আসে। ফুলের মালাগুলি বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকোবার আগে শেষ তীব্র সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে সেই গন্ধ ভার হয়ে থাকে গৌরের বুকে। এক-একটা ঝিমুনি চমকে আবার জেগে যায়।

কী বলেছিল মেয়েটা? কী যেন! আপনি আমার বিয়ের ভাংচি দিলে খুশি হতাম। আরে বাঃ! গৌর ঘুম-ঘুম চোখে ভাবে। কথা ক'টা নেশারু ওম এনে দেয় চারধারে। এমন স্বার্থহীন ভালবাসার কথা তাকে কেউ কখনও বলেনি। মেয়েটার যে বর জুটছিল না এমন নয়। চা আর কুঁচো নিমকি দিয়ে এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমিও তারা পেয়ে গেছে। তবে আর ওই কথা বলার কী স্বার্থ ছিল তার? না কি ঠাট্টা করেছিল? তাও নয়, গৌর একা একা মাথা নাড়ে। কথাটা কুঁচো নিমকি আব চা-কে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমির স্বার্থত্যাগও তার কাছে লাগে

না। বিয়ের চিত্রিত পিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়েও কীরকম দীর্ঘশ্বাস তার! সে তো কখনও কিছু বলেনি গৌরকে আগে! বললেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। হাফ-ফিনিশ গৌরের মূর্তিখানা পুবো গড়া হয়নি যে। তার অর্ধেক দুনিয়া ভূতের কব্জায়, বাকি অর্ধেক সে এক দুলদুলে মিহিন বোঁটায় দুলছে। কখন ছিঁড়ে পড়ে কে জানে! মেয়েটা সবই জানত। তবু ওই কথাটা বলে চিরকালের মতো চলে গেল।

চলে গেল বলে অবশ্য গৌরের কোনও ক্ষতি নেই। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হয় না। বরং যতবার সেই কথাটা মনে হয় ততবার আনন্দে গৌরের গা কেমন করে। ওই কথাটুকুর মধ্যেই রয়ে গেল গৌরের মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, মাথায় টোপর। গৌরের আর কী চাই! জীবনে এরকম অনেক রহস্য থেকে যায়, যার সমাধান মানুষ চায় না। ওরকম দু'-একটা রহস্য থেকে যাক। বাংলাদেশে ঝড়তি-পড়তি মেয়ের অভাব নেই। গৌরের আছে চালু ল্যান্ডমাস্টার, সাড়ে চার কাঠা জমি, এখনও দু'খানা ভাল হাত-পা রয়েছে তার। এর জোরে গলা বাড়ালে কেউ কেউ এখনও মালা দেয়। কিন্তু অমন স্বার্থহীন কথা কেউ শোনাতে পারে না।

এক গভীর আত্মপ্রসাদে, আনন্দে তার মনের আনাচে-কানাচে আলো এসে পড়ে। বাতাস বয়। দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মাথায় নাচের শব্দ, হাফ-ফিনিশ গৌর তার ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের সিটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে লেকের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নানারকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে।

পরদিন আবার কলকাতার সোয়ারি এধার ওধার করতে বেরোয় গৌর।

কলকাতার সোয়ারিরা 'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি' বলে ডাকে। গৌরের গাড়ি থামে। মিটার ঘোরে। সোয়ারি খালাস হয় আবার। তখন গৌর মাঝে মাঝে আয়নাটা মেপে-জুখে ঘুরিয়ে রাখে। পিছনের ফাঁকা সিটখানা দেখা যায়। সেই সিটে মাঝে মাঝে নন্দীদের মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে গৌর। তার কল্পনার মেয়েটা আরও সুন্দর হয়। ক্রমে ক্রমে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। চোখে চোখ পড়ে। কেউ চোখ সারায় না। গৌর বিড়বিড় করে বলে, আরও সুন্দর হও, আরও আরও সুন্দর। মেয়েটা সুন্দর হতে থাকে। তার বাদামি চামড়ায় দুর্লভ গোলাপি রং ফুটে ওঠে, চোখের তারা হয়ে যায় আকাশি নীল, চুলে ভোরের আলোর সোনালি আভা এসে লাগে, ঠোঁট তরমুজের মতো লাল। আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলে গৌর। গায়ের চামড়া বাদামি, চুলে মধুর মতো রং, চোখ সমুদ্রের মতো সবুজ...

ডেডবিটিটা মাঝে মাঝে মচ করে নড়ে ওঠে। গৌর ধমক দিয়ে বলে, চোপ! নো ইন্টারফিয়ারেন্স ইন লাভ...নো ইন্টারফিয়ারেন্স...বলতে বলতে গৌর হাসে। তার মনে হয়, লম্বা সুতো ছেড়ে যেমন উলের বল গড়িয়ে যায় তেমনই নন্দীদের মেয়েটার সেই কথাটা গড়িয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই। যতদূর যাবে গৌরহরি, বগলুর ব্যাটা, ততদূর যাবে। সেই সুতোর একপ্রান্তে বসে মেয়েটা বুনে যাচ্ছে একখানা সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ডিজাইনের পরতে পরতে গৌরহরির নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সোয়ারিরা মুখ বাড়ায় জানালায়।

কোথায় যাবেন?— গৌরহরি জিজ্ঞেস করে।

সোয়ারিরা কত নাম বলে। টেরিটিবাজার, হাটখোলা, মুর্গিহাটা, হাওড়া। সেইসব নাম লোহার পাতের মতো গৌরের চারধারে একখানা শক্ত জাল বুনতে থাকে। ছেলেবেলায় সার্কাসে গৌর মৃত্যুকূপের যে খেলা দেখেছিল, তাতেও ছিল ওইরকম মজবুত একখানা জাল। ভিতরে দু'খানা মোটর-সাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরত ফিরত, ল্যান্ডমাস্টার তেমনই কলকাতার চারধারে জালে আটকে ঘোরে ফেরে। বাইরে যায় না।

বিকেলের দিকে মৌতাত জমে ওঠে ঠিক। সেইসময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট মুছে গিয়ে কে যেন

খাল নদী নালা কেটে রেখে যায়। কোথা থেকে জলধারা এসে কুল-কুল করে বইতে থাকে। স্টিমলঞ্চ যায় আসে। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে টালমাটাল জল-পুলুস ট্রাফিক সামলায়। ঢাকার কামান দূর থেকে রঙিন গোলা ছুঁড়ে মারে। তখন ফাদার ফ্রান্সিস তার স্বপ্নশিশুদের নিয়ে মাটির কাছাকাছি চলে আসেন। গৌরহরির দিকে ছুঁড়ে দেন সেই বল, ফ্যাস...ফ্যাস দি বল, গৌর...। গৌর হাত বাড়ায়। ধরতে পারে না। ফাদার হেসে কুটিপাটি হন। মাঝে মাঝে গাভীর ডাক শোনে সে। ট্রাফিক পুলিশ কৃষ্ণের মতো দাঁড়ায়, হাতে আড়বাঁশি, পা দু'খানা ক্রশ করা! সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে আটক গাড়িগুলো তখন গাভী হয়ে ডাকতে থাকে।

সন্ধে হয়ে আসে। কলকাতার অন্ধকারে নিয়োন সাইন দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে। ভারী অবাক হয়ে গৌর দেখে সেইসব নিয়োন সাইনে নন্দীদের মেয়েটার সেই কথা ক'টা জ্বলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া দেয়। সেই বাতাসে ফিসফিস ভেসে আসে সেই কথা। কলকাতার রাস্তায় একা বকুলগাছ যখন অন্ধকারে তার বকুল ঝরায় তখন সেই পতনশীল বকুলের শব্দে গন্ধে সেই কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময় বয়ে যায়। তবু সেই উলের বল গড়িয়েই আসে। দীর্ঘ সুতো পড়ে থাকে। যতদূর যায় গৌর, ততদূর গড়ায় উলের বল। যতদূর যাবে গৌর, ততদূর গড়াবে। সুতো দীর্ঘ থাকবে। ফুরোবে না।

বর্ষাকাল আর খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ওয়াইপার প্রাণপণে ঘোরে উইন্ডস্ক্রিনে। বৃষ্টির ঝরোখা দিয়ে এক ভিন্ন শহরের মায়াময় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৌরের শ্বাসের ভাপ বন্ধ কাচের গায়ে লেগে মুছে যায়। বৃষ্টি থামলে চারদিকে অপরূপ জলছবি। জলে ছায়া আর রোদ ভাঙে। গাছে গাছে ঝালর ঝোলে।

মুর অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে দুপুরবেলা গাড়ি থামিয়ে গৌর দেখে, রাস্তার ধারে ভিড়। ঢোলকের শব্দ হচ্ছে, আর মলের শব্দ। গৌর হাই তুলে গ্লাভস চেম্বার থেকে পুরনো লটারির টিকিটটা বের করে নম্বর দেখে। মেলেনি, তবু টিকিটটা ছেঁড়েনি সে, রেখে দিয়েছে। কতকিছু রেখে দেয় মানুষ। টিকিটটা মমতাভরে আবার জায়গায় রেখে সে হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে। আঙুল মটকায় সে। পেট্রলের গন্ধ জমে আছে গাড়ির ভিতরে। খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে বাইরে আসে গৌর। তারপর পায়ে পায়ে ভিড়টার দিকে এগোয়।

খুনখুনে এক বুড়ি ঢোলক বাজাচ্ছে। দুলে দুলে। চমৎকার হাতের কারুকাজ তার। একবারও ভুলভাল টোকা পড়ে না। গমকে গমকে ঢোলকের শব্দ ছিটিয়ে দেয় বুড়ো লোল হাতে। ভিড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা চত্বর। সেইখানে বাসন্তী রঙের ঘাঘরা দুলিয়ে গোলাপি রুমাল হাতে একটা মেয়ে নাচছে। তার চোখে কাজল, কপালে টিকলি, নাকে বেসর। দেহাতের গমখেতের উদাসীনতা তার মুখে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই মুখে মেঘ করে। বিদ্যুৎ চমকায়। পায়েব বোল ফুটিয়ে মেয়েটা ঘুরে যায়, ঘুরে-ঘুরে যায়। হেলে দোলে কাঁপে। চোখের পাতা নাচায়। তার একটু ভোঁতা নাকের নীচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। উত্তোলিত বাহুর নীচে বগলের জামা জুড়ে স্বেদচিহ্ন। দুই সবল পায়ে ফিনফিনে শরীর সে কোন অদৃশ্য লেত্তিতে জড়িয়ে ছেড়ে দেয়। মাতালের মতো ঘোরে। তার পুরুষ সেই সুন্দর দেহাতি যুবা মাঝে মাঝে চরকিবাজি লাফ দিয়ে উঠে মেয়েটার সঙ্গে দু' চক্কর নাচে। চারদিকে ভিড়েব দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইশারা করে। ভিড় জমলে সে তার বাজির ছোরা বের করবে, দেখাবে লাঠির খেলা, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরানো, হেঁটমুণ্ড হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচাবে। মেয়েটা তখন ক্লান্ত মুখে জনে-জনের কাছে যাবে মাগুতে।

গৌর দাঁড়িয়েই থাকে। শুখো পায়ের ওপর শরীরটা বেঁকে থাকে তার। রুখো হাতখানা পকেটে ঢোকানো। পুরুষটা তার বাজি শুরু করে। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ছোরা একে একে শূন্যে ছুঁড়ে

দেয়। লোফে, ছুঁড়ে দেয়। ছোরাগুলো রোদে ঝিলিক খেয়ে ওঠা নামা করে শূন্যে। মেয়েটা ঝম করে এক পা ফেলে, আবার ঝম করে অন্য পা। জনে-জনের কাছে ঘুরতে থাকে।

ক্রমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে গৌরের দিকেও হাত বাড়ায়। প্রত্যাশার চোখে তাকায় গৌরের মুখে। চিনতে পারে না। গৌর তো ভিড়ের একজন, চিনবে কী করে?

গৌর তার রুখো হাতখানা বের করে আনে, সেই হাতে একটা সিকি মেয়েটার চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর কোষবদ্ধ হাতে সিকিটা ফেলে দেয়। মেয়েটা হাতখানা দেখে। হাত থেকে চোখ সরে আসে মুখে। ঘোলা জল কেটে যায়। চিনি-চিনি করে মেয়েটা চিনতে পারে গৌরকে। একটু হাসে। আশপাশের লোকজন একমনে বাজি দেখে। লোকটা তখন আশ্চর্য নিপুণতায় দুই হাতে চারটে কাঠিতে চারটে পিরিচ বন বন করে ঘোরায়। গৌর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, কী খবর?

মেয়েটা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলে, ভাল। কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

কেন?

এখন চাষবাসের সময়। ফসল উঠে গেলে আবার শীতের শেষে আসব।

আমি তোমার নাচ দেখে নিয়েছি।

কত লোক রোজ তার নাচ দেখে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খঞ্জনার মতো ক্লান্তিহীন, লজ্জাহীন, ইচ্ছাশূন্য কত নাচ নেচেছে সে। তবু গৌরের কথায় লজ্জা পেয়ে সে রাঙা মুখ একটু নত করে।

তারপর বলে, আবার যখন আসব তখন আবার দেখো। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর চুপ করে থাকে।

মেয়েটা মুখ তোলে। সেই মুখে পড়ন্ত রোদ তার ঝলক তোলে। আনন্দিত মুখখানা। মেয়েটা তীব্র সুখের শ্বাসের সঙ্গে বলে, কাল, কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

কী আছে দেশে?

কিছু নেই তেমন। গঁহু আর ধানের খেত, জল, মাটি, আর কী? শীতের শেষে আবার আমরা আসব। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর হাসে। মেয়েটা হাসে।

মলের ঝম শব্দ হয়। মেয়েটা আর এক পা এগোয়। অপরিচিত পুরুষেরা সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে মেহেদির নকশা, উল্কি, প্রত্যাশা।

কাল ওরা দেহাত যাবে।

গৌর ফিরে এসে তার ল্যান্ডমাস্টারে বসে।

স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর। জলের গাড়ি আকাশে ওড়ায়। তার সেই আশ্চর্য জাদুর খেলা কেউ লক্ষ করে কি না কে জানে! জলে স্থলে অন্তরিক্ষে অবাধ ঘোরে ল্যান্ডমাস্টার। কখনও কখনও তার পিছনে কাচ দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র, জাহাজের নিঃশব্দ মাস্তুল। দূর জাহাজঘাটায় একটা টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি। বন্দরে একটা উঁচু জায়গায় নন্দীদের মেয়েটা একখানা হাত তুলে রাখে। গৌর এইসব দেখে।

ফিসফাস করে গঙ্গার বাতাস বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতা জুড়ে জ্যোৎস্না ওঠে। বটের আঠার মতো জ্যোৎস্না। সেই আলোর নদী বয়ে যায়, গাছপালার ডালপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে! সুস্বাদ সুঘ্রাণ সেই জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে গৌর একটা পুরনো প্রকাণ্ড বাড়িকে মনে মনে খোঁজে। সেই বাড়িটা ভাঙা হয়ে গেছে নাকি! কোথাও গৌর সেটাকে আর খুঁজে পায় না। জানালা দরজার পাল্লা নেই, হাঁ-হাঁ বাতাসে ফাঁকা বাড়িটায় কেবলই ক্ষয় আর পতনের ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ ওঠে। মিহিন পতনের শব্দ। একটা বন্ধ দরজার ওপাশে টানা দীর্ঘ কষ্টের শ্বাস টানে কেউ। কোথায় অলক্ষে জ্বলে সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...লায়লার রুটি! কোথাও

পাওয়া যায় না সেই রুটি। গৌর খুঁজে দেখেছে। কিন্তু আছে স্যু-র ঘরে। সেখানে সবুজ আলো এসে পড়ে। তখন ঘরখানায় মাঠঘাটের ছবি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির ঝরোখা ঠেলে চলে ল্যান্ডমাস্টার। উইন্ডস্ক্রিনে বিদেশি শহরের ছবি।

সর্বত্রই ওড়ে মানুষের ফেলে-যাওয়া পালক। উড়ে আসে ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরে। গৌরের মাথার চারধারে ঘুরে বেড়ায়, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে চলে যায়। কাঁধে বসে, মাথায় বসে প্রজাপতির মতো ডানা কাঁপায়।

মলিনের লাইসেন্স কেড়ে নেয় পুলিশ। আবার ফেরত দেয়। নির্বিকার মলিন গৌরের গাড়ির সামনে এসপ্ল্যানেডে গাড়ি ভিড়িয়ে হাই তোলে।

মামু, কী খবর?— গৌর জিজ্ঞেস করে।

মলিন আড়মোড়া ভেঙে বলে, ত্রিভঙ্গ, তোমার গাড়িটা যে রং জ্বলে, চটা উঠে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে গেল। মাডগার্ডের লোহা মুড়মুড়ে হয়ে এসেছে। এবার গাড়িটা মল্লিকবাজারে ছেড়ে দাও।

গৌর শ্বাস ফেলে তার ল্যান্ডমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই পৃথিবীতে অজর অমর নয়। গাড়িটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাবা ল্যান্ডু, আমরা দু'জনেই কি উচ্ছন্নে চলেছি!

বিবেকানন্দ ব্রিজ থেকে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে একদিন গৌর নেমে আসছিল। সকাল দশটা। বালি চৈতলপাড়ার সোয়ারি ছিল, খালাস দিয়ে এসেছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সামনের চত্বরে গাড়ি নেমে এলে একজন মেয়েমানুষ হাত তুলল। গৌর গাড়ি থামায়।

কোথায় যাবেন?

কলেজ স্ট্রিট যাব বাবা, নিয়ে যাবে?

পথেই পড়বে। গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলতে খুলতে একঝলক মেয়েমানুষটাকে দেখে। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি, ঘাড়ে আঁচল। কপালে প্রসাদি সিঁদুর দগদগ করছে। উপোসি মুখখানার শুষ্কতা ভেদ করে পবিত্রতা ফুটে আছে। চোখ দু'খানায় ঘোরলাগা সম্মোহিত ভাব। সঙ্গে দাসী, তাদের হাতে ফুল বেলপাতা, সন্দেশের বাক্স, পট, গঙ্গাজলের মেটে কলসি।

গৌর গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু মুখখানা চেনা-চেনা লাগে তার। ওই সুন্দর মুখ, কপালে ওড়া চুলের গুছি, গভীর চোখ সে আগেও দেখেছে। তেমন বেশি বয়স নয়, কিন্তু গরদের শাড়ি, সিঁদুর, উপবাস, সব মিলিয়ে একটা কেমন গম্ভীর পবিত্রতার ভাব মেয়েমানুষটাকে বয়স্কা করে রেখেছে। মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ে না গৌরের।

কপাল থেকে চুলের গুছি সরানোর জন্য হাত তোলে মেয়েমানুষটা। কী সুন্দর আঙুল! লম্বা, নিটোল, হলুদ রঙের আঙুল, মুক্তোরঙের পরিষ্কার নখ। চুলের গুছি সরাতে গিয়ে আঙুলগুলি, যেন বা পিয়ানোর রিডে, সুন্দর আলগোছে নড়ে। আর তখন একটা আংটির হিরে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে।

সেই হিরের ঝলকই গৌরের অন্ধকার মাথায় তীব্র আলো ফেলে। মনে পড়ে। হাড়কাটা গলির মতিয়া। এক পলক ঘাড় ঘোরায় গৌর। আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মতিয়া! মতিয়াই তো! কিন্তু পাউডার লিপস্টিক নেই, নখে পালিশ নেই। সব রং ধুয়ে ফেলেছে সে। দুর্লভ আতরের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। গরদের শাড়ি থেকে মৃদু ন্যাপথলিনের গন্ধ আসে। আর ফুল বেলপাতার গন্ধ। এ কীরকম মতিয়া? আর একবার মতিয়ার কাছাকাছি যাবে, যে বাতাসে শ্বাস ফেলে মতিয়া সেই বাতাসে শ্বাস টেনে নেবে, এরকম একটা ইচ্ছে ছিল গৌরের। আজ এত কাছে বসে আছে সে, গঙ্গাস্নানের পর, উপবাসের পর, রং ধুয়ে-ফেলা মতিয়া, তবু একটুও রোমাঞ্চ হয় না গৌরের। গৌর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে। মতিয়ার সুন্দর আঙুল শ্বেতপদ্মের মতো কপালে নড়ে, হিরেটা ঝিকোয়।

সম্মোহিত মুখে মতিয়া হঠাৎ একটু ঝুঁকে গৌরকে জিজ্ঞেস করে, বাবা, তুমি ওই মন্দিরে কখনও গেছ?

না।

একবার যেয়ো। বড় ভাল লাগবে।

আচ্ছা।

ওখানে স্নান করলে শরীর বড় ঠান্ডা হয়। রামকৃষ্ণদেবের পায়ের ধুলো এখনও ছড়িয়ে আছে ওখানে। গড়াগড়ি দিলে সেই ধুলো শরীরে উঠে আসে। মানুষের কত জন্ম ধন্য হয়ে যায়। একবার যেয়ো বাবা।

চোখের জল গড়িয়ে নামে মতিয়ার। দুর্লভ ফোঁটাগুলি পড়ে। সেই অশ্রুর চিহ্ন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার ধরে রাখে ঠিক। এ সব মানুষের পালক। মানুষ চলে যায়, তার চিহ্নগুলি পড়ে থাকে।

গৌরকে রাস্তা চেনাতে হয় না। সে নিজে থেকেই কলেজ স্ট্রিট ছেড়ে বাঁয়ের গলিতে ঢোকে। নির্ভুলভাবে মতিয়ার বাড়ির সদরে গাড়ি দাঁড় করায়।

ভ্রু দুটো ওপরে তুলে মতিয়া জিজ্ঞেস করে, তুমি বাবা, আমার বাড়ি চিনলে কী করে?

গৌর একটু হাসে।

মতিয়া লাজুক গলায় বলে, তাহলে আমাকে তুমি চেনো!

গৌর উত্তর দেয় না।

মতিয়া শ্বাস ফেলে বলে, আমি বড় পাপী বাবা। বড় পাপী।

মতিয়া পয়সা দেয়। গৌর নেয়।

আসি বাবা। তুমি বড় ভাল লোক।— মতিয়া বলে।

গৌর চুপ করে ফেরত-পয়সা গুনে দেয়।

মতিয়া জানালায় ঝুঁকে ফিসফিস করে বলে, আমাকে মনে রেখো না বাবা।

কিন্তু তবু গৌরের সবই মনে থেকে যায়! স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর, জলের গাড়ি শূন্যে ওড়ায়। ওড়ে পালক, থাকে আতরের সুগন্ধ, একটা টিকলির নকশা। কলকাতার নিয়োন সাইনগুলিতে কত পুরনো দিনের কথা ফুটে ওঠে! গৌর ভুলবে কী করে?

পাঁচ

অনেক রাতে নাইট শো ভাঙার একটু আগে গাড়িখানা দক্ষিণমুখো করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরহরি। শো ভাঙলে যদি গ্যারেজের দিকের সোয়ারি পায়। আসলে এখন অনেক রাতে একা একা গাড়িখানা চালিয়ে নির্জন ঘুমন্ত গ্যারেজটায় যাওয়ার সময়ে প্রায়ই গা ছমছম করে গৌরের। ওই ডেডবডিটা ম্যাক্সিমাম নড়াচড়া করতে থাকে। ও শালাকে টিট করার একমাত্র উপায় গাড়িতে সোয়ারি তোলা। তুললেই শালা চুপ। আর নড়াচড়া নেই। তাই অপেক্ষা করছে গৌর। তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। পাইস হোটেলে সে খেয়ে নেয়। একটা মিঠে পান খেয়েছে। তারপর রুখো-শুখো দু'খানা হাত-পা-ওলা দুঃখী গৌরহরি আরামে বসেছে স্টিয়ারিঙের পিছনে হেলান দিয়ে। অপেক্ষা করছে। বহু ট্যাক্সি ওইরকম দাঁড়িয়ে। শেষ ট্রিপ যদি পায়। গৌরহরির পয়সার লালচ নেই। গৌরা যেমন কারও সার্ভেন্ট না, তেমনি না পয়সারও স্লেভ। কেবল এক-আধজন সঙ্গী খোঁজে। নিশুত রাতে একটা ল্যান্ডমাস্টারে একা বসে থাকতে তার কেমন একটু লাগে ঠিকই। যখন শালা ডেডবডিটা সবসময়েই রয়েছে সঙ্গে, একটু সাবধান থাকা ভাল। বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা তেরো-চৌদ্দ বছরের হাফপ্যান্ট পরা ছেলে মুখ বাড়াল। চারদিক চেয়ে দেখছে। মুখখানা

শুকনো। কেমন একটা অস্থির ভাব। পায়ে পায়ে সে গৌরের ট্যাক্সিটার কাছে আসছে। কিন্তু গৌর কারও সার্ভেন্ট নয়। আসুক যে কেউ। গ্যারেজের দিকের সোয়ারি না হলে নেবে না। গৌরহরি অর্থাৎ বগলুর ছাওয়াল গৌরা মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রাখে। ছেলেটা ম্লান মুখে কাছে আসে।

ট্যাক্সি যাবে?

কোনদিকে?

ছেলেটা ইতস্তত করে বলে, সাউথে।

আমার গ্যারেজ যাদবপুরে। ওদিকে হয় তো যেতে পারি।

ছেলেটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, ওদিকেই।

তবে উঠে পড়ো।— গৌরহরি সরে গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করে।

ছেলেটা নরম গলায় বলে, ওই গলির মধ্যে একটু যেতে হবে। মেয়েছেলে রয়েছে।

ঝামেলা! তবু তো সোয়ারি। নাইট শো ভাঙতে এখনও প্রায় আধঘন্টা দেরি। তার আগেই যদি চলে যাওয়া মন্দ কী?

গলিতে গাড়ি ঢুকবে তো? ঘষা-ফষা লাগে যদি?

লাগবে না। গলি চওড়া।

সাবধানে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গলিতে ঢোকে গৌরহরি। ছেলেটা পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে বলে, আর একটু এগিয়ে।

কতদূর?

এই সামনেই, কয়েকটা বাড়ি পর।

বিরক্ত গৌরহরি ঘুমন্ত, অন্ধকার গলিটার মধ্যে হেডলাইট জ্বেলে এগোয়। বলে, গাড়ি ঘোরাব কী করে? ওদিকে বেরোবার রাস্তা আছে?

আছে। কোনও অসুবিধে নেই। আমরা তো আছি।

গৌরহরি এগোয়। পাকা হাত তার। আঁকা-বাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে ফিরে তার গাড়ি যায়।

আর কতদূরে?

আর একটু। বাঁ হাতে আর একটা গলি পড়বে, সেখানে।

ইস! বড় ঝামেলায় ফেললে।

এখন গৌরবাবুর বেড-টাইম নয় ঠিক। তবে মাঝে মাঝে হাই উঠছে। কেন গৌরবাবু নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে না? বিশেষত সে যখন কারও চাকর নয়। কার ধার ধারে সে?

গাড়ি আর খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের গলিটা পায়।

ওরেব্বাস! এ যে যম অন্ধকার। গলিটাও সরু।

গাড়ি যায়।

যায় যাক। আমি যাব না। এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমায় লোকজন ডেকে আনো। এইটুকু সবাই হেঁটে আসতে পারে।

এইটুকু নয়। গলিটা অনেক লম্বা। একদম ও-প্রান্তে যেতে হবে। তাছাড়া সঙ্গে খুচরো কিছু মালপত্র আছে। চলুন না, মিটারের বেশি দেব।

গৌরহরিকে পয়সা দেখাচ্ছে! অ্যাঁ। পয়সা দেখাচ্ছে বগলুর পোলা গৌরাকে! বগলাপতির আমলে পুরনো ডজ গাড়িটার ছোট আয়নায় গৌরহরি কি বিস্তর নম্বরি নোটের ছবি দেখেনি!

বেশি দিলেই কী! আমি যাব না।

ছেলেটা হঠাৎ অসহায় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হাসল, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

যাবেন না মানে! যাবেন, যাবেন। না গেলে কি চলে?

না গেলে কী করবে?

ছেলেটা, বাচ্চা মিষ্টি চেহারার ছেলেটা হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে গৌরের ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, চল শালা, ফের মুখ খুলেছিস কি ভোঁতা করে দেব। ঢোক গলিতে!

গৌরহরি কোনওকালে মারপিট করেনি, মার খায়ওনি কখনও। বগলাপতি ক্বচিৎ কখনও চড়টা চাপড়টা দিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। ঘাড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ গৌরের বড় অপমান লাগল। সে কিনা গৌরহরি, টিকাটুলির বগুলার পোলা গৌরা, তার কিনা ঘাড়ে হাত! গৌর তার ভাল হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরল, খুব সাহস যে খোকা! অ্যাঁ! শালা মারব এমন থাপ্পড়!

ছেলেটা অনায়াসে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সির দুই জানালায় দু'জন ছায়ার মতো উটকো লোক এসে দাঁড়াল। তারা শুধু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, হুজ্জত করছে নাকি রে?

একটু একটু।

বাইরে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে গৌরের কলার চেপে ধরে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, জান নিয়ে ফিরতে পারবে না, বুঝলে? গাড়ি জ্বালিয়ে দেব তোমাকে সুদ্ধ।

জ্বালিয়ে দেবে! মানে! জ্বালিয়ে দেবে ল্যান্ডমাস্টারখানা! বগলাপতি অর্থাৎ কিনা বাপ বগলুর দেওয়া একমাত্র নিজস্ব জিনিসখানা তার! এত আদরের গাড়িখানা, যেটা কখনও তার প্রাইভেট কখনও বা পাবলিক! গৌরের আপাদমস্তক চমকে যায়। চেয়ে থাকে।

যাবে কি না?

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, বদর-বদর, যাব বই কী! রাস্তা দেখাও বাবাসকল। গৌরা যাবে। যদিও বগলুর পোলা গৌরা কারও চাকর না, তবু ল্যান্ডমাস্টারখানা গেলে গৌরের আর থাকে কী! অ্যাঁ। থাকে কী? থাকে শুধু দুটো রুখো-শুখো হাত পা আর মগজের ঝমঝম শব্দ!

গৌর একটু দম নিয়ে বলে, যাব।

গাড়ি ঘোরান। বাঁ দিকে।

গৌর গাড়ি ঘোরায়।

সেই দুটো লোক তার গাড়ির মধ্যে এসে বসেছে এখন। তাদের একজন তার বাঁ পাশে। তারা খুব চুপচাপ। কথা বলে না একটাও।

আর কতটা পথ?— গৌর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

চালাও। আমরা বলব।

গলিটা অনেক লম্বা। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে একটা জানালা দরজাহীন পাঁচিল চলেছে। ডান হাতে কয়েকটা ছুটকো-ছাটকা বাড়ি। এসব পার হল গৌরহরি। ল্যান্ডমাস্টারখানা শব্দ না করে যাচ্ছে। পুরনো আমলের ইঞ্জিন, তার ওপর যত্নে থাকে গৌরের কাছে।

ক্রমে ডানদিকের বাড়িঘর শেষ হয়ে গেল। একটা মাঠ। তাতে হেডলাইটের আভায় অনেক আগাছা দেখল গৌর। বাঁ দিকে একটা কারখানার মতো। সেটা অন্ধকার, নিশ্চুপ। কথা না বলে গৌর এগোল। আবার বাড়িঘর শুরু হচ্ছে। ছুটকো-ছাটকা। বাঁ দিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে গৌরের হাতে চাপ দিল, চাপা গলায় বলল, এইখানে। বাতি নিভিয়ে দাও।

গৌর বাতি নেভাল। লোকগুলো কেউ নামল না। বসে রইল।

বড় ভয় করে গৌরের। বগলুর ছেলে গৌরাকে এ কোথায় নিয়ে এল অচেনা লোকেরা? ব্যাপারখানা কী। তার গাড়ির ডেডবডিটা নাছোড় বটে। কিন্তু কখনও তেমন কোনও বিপদে ফেলেনি তাকে। মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে। লেগে থাকে এই পর্যন্ত। তা ছাড়া ডেডবডিটার আর কোনও নিন্দে কেউ করতে পারবে না! এদের চেয়ে সেই ডেডবডিটা অনেক ভাল! তাকে নিয়েই

তো এতকাল ল্যান্ডমাস্টারখানা দাবড়ে বেড়াচ্ছে বগলুর ছাওয়াল।

আরও তিনজন লোক অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মানে ছ'জন। গৌর বে-আইন দেখেও চুপ করে থাকে। লক্ষ করে যে তিনজন আসছে তাদের মধ্যে মাঝখানের জন নিজের ইচ্ছেয় বা শক্তিতে আসছে না। তাকে আনা হচ্ছে ধরে ধরে। বাঁ দিকের ছোট্ট জমিটুকু পার হয়ে তারা গাড়ির কাছে চলে এল। বাচ্চা ছেলেটা নেমে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিনজন উঠল পিছনের সিটে। আবছা মনে হল গৌরহরির, মাঝখানের লোকটার হাত বাঁধা। মুখে ন্যাকড়ার দলা ভরা আছে। লোকটা অস্পষ্ট একটু শব্দ করল। দু'ধারের দু'জন সিগারেট ধরাল। কথা বলল না। বাচ্চা ছেলেটা আর পিছনের সিটে আগে যারা উঠেছিল তারা নেমে গেল।

গৌরহরির বাঁ পাশের লোকটা বলল, চালাও। সোজা গিয়ে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তা পাবে সেইটে ধরো। হেডলাইট জ্বেলো না, জ্যোৎস্না আছে।

তাই সই। গৌর গাড়ি ছাড়ে। কোথায় চলেছে বগলুর বাচ্চা কে জানে! ডান হাতের রাস্তাটা চওড়াই। আলো আছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যেন চেনা কলকাতার কোনও রাস্তাই নয়। এ রাস্তা গৌরহরি তার বাপের, বগলাপতির আমলেও দেখেনি।

কোনদিকে যাব?

চলো সোজা। আমরা বলে দেব।

পিছনের সিটে ডেডবডিটা নেই বটে এখন, কিন্তু যা আছে তা জ্যান্ত বডি। হাত-পা বাঁধা লোকটা একটু পরেই ডেডবডি হয়ে যেতে পারে।

গৌর গাড়ি চালাতে থাকে। যেমন সে চালায় মন-প্রাণ দিয়ে তেমনই চালাচ্ছিল। তার হাত পা মগজ ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ল্যান্ডমাস্টারটার যন্ত্রপাতি।

আস্তে।— বাঁ দিকের লোকটা বলে।

গাড়ি ধারে করে গৌর।

লোকটা পিছনের দিকে তাকায়। কী একটা ইঙ্গিত করে।

গৌর দেখে, রাস্তাটা বড় অন্ধকার। কোনওখানে আলো নেই। জ্যোৎস্নাও দেখতে পায় না গৌর। বোধহয় আকাশে মেঘ আছে, কিংবা লোকটা মিথ্যে বলল।

গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। বাঁ দিকের লোকটা পিছন ফিরে কী দেখছে। গৌরের ঘাড় ঘোরাতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কোঁক করে হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ হয়। মাঝখানের লোকটাই শব্দ করল। অনিচ্ছাতেও উইন্ডস্ক্রিনের ওপর ছোট্ট আয়নাটায় চোখ গেল গৌরহরির। আবছায় তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, ডানপাশের লোকটা একটা ছোরার হাতল মাঝখানের লোকটার পেট থেকে টেনে বার করল। সঙ্গে সঙ্গে একটু কী যেন ছিটকে এসে লাগল গৌরের বাঁ কানের পিঠে। শুখো হাতটা অবশ হয়ে আসছিল, কোনওক্রমে টাল সামলে নিল গৌরহরি।

বাঁ দিকের লোকটা তার হাত ছুঁয়ে বলল, ব্যস, আর না! গাড়ি থামাও।

খুব ম্লান জ্যোৎস্না ফুটেছে। অচেনা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছে গৌরহরি। এ জায়গা সে চেনে না। কোনওকালে আসেনি।

তিনজন লোক তিনটে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। একজন জানালায় ঝুঁকে বলল, একটা বডি রইল। যেখানে হয় ফেলে দিয়ো। পুলিশে যদি যাও, আমরা নম্বর টুকে রেখেছি।

বডি!— গৌরহরির চোখ কপালে ওঠে। সত্যিই একটা বডি অবশেষে সামিল ল্যান্ডমাস্টারটায়! বগলুর দেওয়া গাড়িটাতে! ভয় না, ভারী অবাক হয় গৌর।

কী হে, শুনতে পাচ্ছ, যা বললাম?

গৌর মাথা নাড়ে।

যাও। লাইট না জ্বেলে যাও। এগিয়ে গড়িয়াহাটা রোড পাবে।

গৌর মাথা নাড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। গড়িয়াহাটা রোডটা যে আসলে কোথায় তা তার মাথায় ঢোকেই না। সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ছাড়ে।

তারপর বগলাপতির ছাওয়াল গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুব পোলা গৌরা, তার অদ্ভুত সোয়ারিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাস্তাঘাট সে আর চিনতে পারে না। তার মাথার মধ্যে মল-পরা দুটি পা ঝমঝম শব্দ করে। সে শব্দে কেমন তালগোল পাকাতে থাকে রাস্তাগুলি। যেন তাকে ধরেছে কানাওলা। একই রাস্তায় তার গাড়ি ঘুরছে আর ঘুরছে।

কী করেছি আমি! অ্যাঁ! কী করেছি আমি! কী পাপ? কোন অপরাধ? কী করেছে হে বগলুর ছাওয়াল, যার জন্য তার ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি? তাকে কেন ধরেছে কানাওয়ালায়? কোন অপরাধ হে বগলুর ছাওয়ালের, যার জন্য তার দুটো হাত-পা শুখো। আর মগজে ওই বেহদ্দ নাচের শব্দ? এইসব কাকে জিজ্ঞেস করব আমি? কে জবাব দেবে?

পিছনের সিটে ডেডবডিটা নড়ছে আর নড়ছে। একবার পিছন ফিরে তাকায় গৌর। দেখে, বডিটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে জানালায় মাথা আটকে থেমে আছে। পেটে একটা হাঁ। রক্ত জমে গেছে। কে হে বাপু তুমি? কোত্থেকে এলে বগলুর ছাওয়ালের ল্যান্ডমাস্টারে! উড়ে এসে জুড়ে বসলে, কে হে তুমি?

গৌরহরির হাতে গাড়ি এই প্রথম টাল খাচ্ছে। নড়েচড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে হাত সিধে রাখে গৌর। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ল্যান্ডমাস্টারে জীবন কাটে গৌরহরির, অর্থাৎ কিনা বগলুর ছাওয়ালের। তবু আজ তার গাড়ি এ কোন কলকাতা দিয়ে যাচ্ছে! মাইরি, এ সব গাছপালা, রাস্তা, আলো এসব যে গৌরবাবু কখনও দেখেনি! সোয়ারি যেমন বলে তেমনি চলে গৌর, কিন্তু আজকের সোয়ারি যে শালা কথাও বলে না! কেন শালা ভয় দেখাও গৌরবাবুকে! কোন অন্যায় করেছে গৌরা? হ্যাঁ, সত্যি বটে, মাঝে মাঝে সে সোয়ারি কাট মারে। কতবার কত বিপদে পড়া লোককে সে তুলে নেয়নি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক নতুন পোয়াতি কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা শরীরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল, অনেকদিন আগেকার কথা, গৌর তাকে কাট মেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর একবার দুটো কচি মেয়ে আর বউ নিয়ে একটা মফস্‌সলি হাবা লোক গাড়িতে উঠেছিল। মাঝপথে যখন গৌর বুঝতে পারল এরা হাওড়া স্টেশনে যাবে, হাওড়ায় যাওয়া মানে বিচ্ছিরি জ্যাম আর পুলিশের আওতায় যাওয়া, তখনই সে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লোকদেখানো জ্যাক লাগিয়েছিল গাড়িতে। সেই বোকা লোকটা মাঝপথে কচি মেয়ে আর বউকে নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এরকম আরও অপরাধ আছে তার। অনেক। কিন্তু কেউ কি গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের জন্য ঠেকে ছিল? যে যার গন্তব্যে পৌঁছয়নি কি শেষ পর্যন্ত? পৌঁছেছে, গৌর জানে। তবে আর কী! তবে কেন গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি? বগলুর ছাওয়ালকে কেন ধরেছে কানাওলা?

ডেডবডিটা নড়ে আর নড়ে। রাস্তার টালে গাড়ি লাফায়, আর লটপটে মাথাটা জানালায় ঠুকে যায়। চমকে ওঠে গৌর। কে হে বাপু তুমি? অ্যাঁ! উটকো উঠে বসে আছো! কোথায়? কে হে—?

নিঃশব্দ একরকম কথা আছে, সবাই শুনতে পায় না। গৌর শুনল।

ডেডবডিটা নিঃশব্দে বলল, আমি একজন, তুমি চিনবে না হে গৌরবাবু। কোটি কোটি মানুষের ক'জনকে তুমি চেনো? তবে আমি, বুঝলে, আমি এই সংসারের ভাল চেয়েছিলুম। ওইটুকুই আমার পরিচয়। তা দেখো গৌরবাবু, সংসারের ভালমন্দয় হাত দিলেই বিপদ। দিলেই তোমার ভালমন্দেও হাত পড়বে। তবু এই খেলার বড় মায়া। একবার শুরু করলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। আমিও শেষ পর্যন্ত গেছি। এই দেখো না, আমার পেটটা কেমন হাঁ হয়ে আছে! কিন্তু

তার জন্য আমার দুঃখ নেই গো, বেশ আরামই লাগছে। সব ভালমন্দ শেষ করেছি আমি। তোমার ল্যান্ডমাস্টারের চমৎকার গদিতে শুয়েছি আরামে, আর উঠব না হে। দিব্যি লাগছে। বলতে কী গৌরবাবু, গাড়ি চালানোর হাত তোমার ভালই। দুলুনি লাগছে, ঘুম আসছে, বাইরে জ্যোৎস্না, মোলায়েম বাতাস বইছে, এর মধ্যে অনন্ত ঘুম ছাড়া বেশি সুখ আর কীসে! চালাও গৌরবাবু, চালাও, থেমো না। আমরা দু'জনে চলো, এই ল্যান্ডমাস্টারে সংসার ছেড়ে যাই, চলো হে বগলুর পোলা!

তা গৌর তার উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে সত্যিই সংসারের বাইরের দৃশ্য দেখতে পায়। ঢাকার সেই কামান অবিরাম লাল নীল হলুদ গোলা ছুঁড়ছে। সেই গোলাগুলো ভাসতে ভাসতে চলেছে ফাদার ফ্রান্সিসের পিছু পিছু। ফাদার হেসে কুটিপাটি, ডেকে বলছে, হেই গৌরঅরি, ফ্যাস, ফ্যাস দি বল!

গাছের পাতায় পাতায় ডালে কুয়াশায় সাদা ফুল দোলে, দোলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল ফল। রাস্তা হঠাৎ এঁকে-বেঁকে আকাশমুখো উঠতে থাকে। গৌরহরির ল্যান্ডমাস্টার রাস্তার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ শূন্যে উঠে উড়তে থাকে। ভেসে ভেসে চলে।

অনন্ত যাত্রায় একটা ডেডবডি সহ গৌরের ল্যান্ডমাস্টার চলে যায়। যেতে থাকে। তার মিটারের টাকা-পয়সার অঙ্ক মুছে যায়। সেখানে পর পর ফুটে উঠতে থাকে, ভালবাসা...পরিপূর্ণতা...ঈশ্বর...

❦ লাল নীল মানুষ

কুঞ্জনাথকে খুন করবে বলে তিনটে লোক মাঠের মধ্যে বসে ছিল। পটল, রেবন্ত আর কালিদাস।

কুঞ্জনাথ এ পথেই রোজ আসে। আজও আসবে।

রাত তেমন কিছু হয়নি। তবে নিশুত দেখাচ্ছে বটে। মাঘের এই মাঝামাঝি সময়টায় এইদিকে ডাহা শীত। তবে ইদানীং যেমন সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে তেমনি হাওয়া বাতাসও। শীত নেই যে তা নয়, বরং শরীরে কালশিরে ফেলে দেওয়ার জোগাড়। এমন ঠান্ডা যে মনে হয় চারপাশের বাতাস দেয়ালের মতো জমে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ বিকেল থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া কোত্থেকে নোংরা কাগজ উড়িয়ে আনার মতো একখানা মেঘ এনে ফেলল। সেই মেঘের ছোট টুকরোটাকেই বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অ্যাত্তো বড় করে এখন আকাশ ঢেকে ফেলেছে। খুব কালো হয়েছে চারধার। ভেজা মাটির গন্ধ আসছে।

তিনজনই আকাশে চেয়ে দেখে বার বার। জল এলে এই খোলা মাঠে বসে থাকা যাবে না। দৌড়ে গিয়ে কোথাও উঠতেই হবে। কুঞ্জনাথও দুর্যোগে খাল পেরিয়ে মাঠের পথে আসবে না। পিচ রাস্তায় ঘুরে যাবে। যদি তাই হয় তো কুঞ্জনাথের আরও এক দিনের আয়ু আছে, তা খণ্ডাবে কে? কিন্তু এ সব কাজ ফেলে রাখলে পরে আলিস্যি আসে, ধর্মভয়ও এসে যেতে পারে। রাত মোটে ন'টা। কুঞ্জনাথ স্টেশনে নামবে ছ'টা দশের গাড়িতে। সাড়ে ছ'টার পর আসবার বাস নেই। সুতরাং ওই সাড়ে ছ'টার বাসেই তাকে চাপতে হবে। বাজারে এসে নামতে নামতে সাড়ে সাতটা। কুঞ্জনাথ এখানে না নেমে আগের গাঁ শ্যামপুরেও নামতে পারে। তার কত কাজ চারদিকে! তা হলেও গড়িয়ে গড়িয়ে এখন সময় যা হয়েছে তাতে কুঞ্জনাথের এই বেলা আসার কথা । এখন কুঞ্জনাথই আগে আসে, না জল-ঝড়ই আগে আসে সেটাই ভাবনা।

ছাতা নিয়ে বড় একটা কেউ খুন করতে বেরোয় না। এই তিনজনও বেরোয়নি। জল এলে ভরসা এক কাছেপিঠে হাবুর বাড়ি। তা সেও বড় হাতের নাগালে নয়। পুকুরপাড় ধরে ছুটে দু'-দুটো বাগান পেরিয়ে তবে। তা করতে ভিজে জাম্বুবান হয়ে যাবে তারা।

পটলের হাতে একখানা ভারী কসাই-ছুরি আছে। এটাই কাজ সারার অস্ত্র। কুঞ্জনাথ যাতে আবার জোড়া-তাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য এবার ঠিক হয়েছে মুন্ডু আর ধড় আলাদা করে দুটো কম করে দশ হাত তফাতে রেখে ভাল করে টর্চ মেরে দেখে নিতে হবে কাজটা সমাধা হয়েছে কি না। এর আগে কুঞ্জনাথ দু'বার জোড়া দিয়ে উঠেছে।

কালিদাসের ধারণা কুঞ্জনাথের পকেটে হোমিওপ্যাথির একটা ওষুধ থাকে। মরার সময়ে টপ করে এক ফাঁকে খেয়ে নেয়। তাইতে জিয়নকাঠি ছোঁয়ার মতো ওর প্রাণটা ধুক ধুক করতে থাকে নাগাড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা সেলাই-টেলাই করে দিলে বেঁচেও যায়। কুঞ্জর বাপ হরিনাথ মস্ত হোমিও ডাক্তার ছিলেন। মরা মানুষ আকছার বাঁচাতেন। তিনি থাকতে এ অঞ্চলের লোকে সাপের বিষকে জল বলে ভাবত। কলেরাকে দাস্তর বেশি কিছু মনে করত না। এমনকী এত বিশ্বাস ছিল লোকের যে, মড়া শ্মশানে নেওয়ার পথেও হরি ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেত। যদি বাঁচে।

মানুষের এমনি বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। ভাবতে ভাবতে কালিদাস মনের ভুলে হাতের টর্চটা জ্বেলে

ফেলল। ফটফটে আলো ফুটে ওঠে ঝোপঝাড়ে, রাস্তার সাদা মাটিতে। আলো জ্বালার কথা ছিল না। রেবন্ত 'হেঃ ই' করে উঠতেই কালিদাস কল টিপে আলো নেভায়।

পটল জানে আসল কাজটা তাকেই করতে হবে। রেবন্তর হাতে একটা মোটা লাঠি আছে, কালিদাসের কাছে টর্চ ছাড়াও একটা হালকা পলকা ছুরি আছে। কিন্তু কাজের সময় যত দায় তারই! লোকে জানে, তার হল পাকা হাত। তবু ঠিক কাজের সময়টায় পটল ভেতরে ভেতরে কেমন থম ধরে থাকে। একটু বেখাপ্পা কিছু শব্দ সাড়া বা স্পর্শ ঘটলে সে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে। টর্চের আলোতেও সে তেমনি চমকে গেল। একবার শুধু দাঁত কিড়মিড় করে। পটল টের পাচ্ছে, তার হাঁফির টানটা ঠান্ডায় কিছু তেজি হয়েছে। বুকে শব্দ হচ্ছে। মুখ দিয়ে রাশি রাশি বাতাস টানতে হচ্ছে। সাবধানে কিছু কেশে সে গয়ের ফেলল। এই রোগেই কি একদিন সে মরবে?

রেবন্ত হাতের আড়াল করে সিগারেট টানছে। সব ব্যাপারেই তার মাথা ঠান্ডা। অন্তত দেখায় তাই। কিন্তু আসলে সে তার কিশোরী শালি বনাকে ভাবছে। সবসময়েই আজকাল সে বনাকে ভাবে। সে যে ভাবে তা দুনিয়ার আর কেউ টের পায় না। বনাও না। যদি অন্তর্যামী কেউ থাকেন তো তিনি জানেন। আর কারও জানার উপায় নেই। বনাকে ভাবে, কারণ তাকে কোনওদিন পাবে না রেবন্ত। বনা স্বপ্নেও জানে না কখনও যে, তাকে রেবন্ত ভাবে। কিন্তু ওই একটুই রেবন্তর জীবনের আনন্দ। দুঃখ, বিষাদ, উৎসব, আমোদ, আতঙ্ক যাই ঘটুক জীবনে রেবন্ত তৎক্ষণাৎ বনাকে ভাবতে শুরু করে। আর তখন চোখের সামনের ঘটনাটা আর তাকে স্পর্শ করে না। সে একদম বনাময় হয়ে যায়। এখনও তাই হয়ে আছে সে। একটু বাদেই রক্ত ছিটকোবে, হাড় মাসে ইস্পাতের শব্দ উঠবে, গোঙানি, চেঁচানি কত কী ঘটতে থাকবে। এ সময়েও বনার চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সব সময়ে রাখে। তাই তাকে ভারী ঠান্ডা আর ধীর স্থির দেখায়।

কুঞ্জর সঙ্গে রবি থাকবে। আর সেইটেই কালিদাসের চিন্তা। কুঞ্জকে মারার কথা, রবিকে নয়। কালিদাসের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। সে বোঝে, রবির বেঁচে থাকা মানে সাক্ষী রইল। রবি অবশ্য পালাবে। তা পালালেও কিছু না কিছু তো তার নজরে পড়বেই! সাক্ষীর শেষ রাখাটা ঠিক হচ্ছে কি না তা সে ভেবে পায় না। যাই হোক, কুঞ্জর যে আজ আর শেষ রাখা হবে না তা কালিদাস খুব জানে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, কুঞ্জ প্রথম জখমে মুখ থুবড়ে পড়লেই সে গিয়ে তার পকেট হাতড়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিটা সরিয়ে ফেলবে। এর আগের বার গলার নলি কাটা পড়েও কুঞ্জ বেঁচে যায়। তারও আগে বল্লম খেয়ে বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছিল। কুঞ্জ মরেনি। হোমিওপ্যাথি ছাড়া আর কী হতে পারে? কালিদাস অনেকক্ষণ ধরেই টের পাচ্ছে যে, পটলের হাঁফির টান উঠেছে। কাশছে মাঝে মাঝে।

খালের ওধারে সরু পিচের রাস্তা কল্যাণী কটন মিল অবধি গেছে। সেই রাস্তা থেকে আবার একটা পিচরাস্তা বাঁ ধারে ধনুকের মতো বেঁকে হাইস্কুলের বাহারি বাড়িটার গা ঘেঁষে তেঁতুলতলায় ঢুকেছে। তেঁতুলতলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি লোকবসতি। বাইরের লোকজন নয়, তেঁতুলতলায় কল্যাণী কটন মিলের মালিক ভঞ্জদের বাস। তারাই একশো ঘর। জ্ঞাতিগুষ্টি দূরে যারা ছিল তারাও কিছু এসে গেড়ে বসেছে। ভঞ্জদের জামাইবংশও আছে কয়েক ঘর। কুঞ্জনাথের বাবা হরিনাথও ছিল এদের জামাই।

পিচ রাস্তা দিয়ে গুড় গুড় করে একটা স্কুটার গেল। খুব জোর যাচ্ছে। ধনুকের মতো বাঁকা পথে সেটা ঢুকতেই আলো দেখা গেল। রেবন্ত বহু দূরের আলোটা দেখে। গিরিধারী ভঞ্জই হবে। ললিতমোহনের এই একটি ছেলেই কিছু শৌখিন। স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে স্কুটার জমা রেখে রোজ ট্রেন ধরে কলকাতায় ফুর্তি করতে যায়। এতক্ষণে ফিরছে। তবে কুঞ্জর আসারও আর দেরি নেই।

কিন্তু বৃষ্টিও আসছে। ঠেকানো গেল না। বহু দূরের মাঠে বৃষ্টির ঝিন ঝিন শব্দ।

বাজারের মধ্যে ব্রজেশ্বরী গ্রন্থাগার। আসলে পুরোটাই এক মুদিখানা। একধারে হলদি কাঠের একটা মাঝারি আলমারিতে শ' দুয়েক বই। আলমারির পাশে একটা চৌকি। তাতে মাদুর পাতা। চৌকির মাঝামাঝি একটা জানালা। ওপাশে খাল। গাছপালার ডগা জানলায় উঁকি মারে।

চৌকিতে বসে জানালার বাইরে ঘরের বিজলিবাতির আভায় যতটুকু দেখা যায় ততটুকু অন্ধকারে মাখা একটু সবুজ দেখছিল রাজু। খুব মন দিয়ে দেখছিল।

গ্রন্থাগার আর মুদির দোকান একসঙ্গে চালায় তেজেন। তার একটু লেখালেখির বাতিক আছে। রাজু এর আগে আরও কয়েকবার এসেছিল, তখন তেজেন তাকে গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ শুনিয়েছে। রাজু হাঁ হুঁ কিছু বলেনি। লেখা যেমনই হোক তেজেন লোকটা ভারী সরল। বি এ পাশ করে বসে বসে এইসব করে। প্রায়ই বলে, আমার কিছু হবে না, না রাজুবাবু?

গ্লাসের চা শেষ হয়ে গেছে। তেজেন পান আনাল। কুঞ্জ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা বলছে।

রাজুর হাতে পান দিয়ে তেজেন বলে, আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন।

রাজুকে এ কথাটা ভীষণ চমকে দেয়। বুকে ঘুলিয়ে ওঠে একটা ভয়। মাথা দপ দপ করতে থাকে।

কুঞ্জ তেজেনের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। তারপর পানের পিক ফেলে, তোর মাথা। এই শীতে সকলেরই শরীরের রস কষ কিছু টেনে যায়।

না। কিন্তু—

তেজেন আরও কী বলতে যায়। কুঞ্জর ইঙ্গিতটা সে ধরতে পারেনি।

কুঞ্জ টপ করে বলে, রাজুর ঝোলায় দুটো বই আছে। চাইলেই রাজু তোর লাইব্রেরিতে দিয়ে দেবে।

রাজুর দিকে চেয়ে তেজেন সোৎসাহে বলে, কী বই?

রাজুর মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। চোখে একটা জ্বলজ্বলে চাউনি। শ্বাস জোরে চলছে। তেজেনের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

মুখ নামিয়ে রাজু তার শান্তিনিকেতনি ঝোলায় হাত পুরে দুটো বই বের করে দেয়। একটা নভেম্বর মাসের রিডারস ডাইজেস্ট আর একটা ইউ এস আই এস থেকে পাওয়া সল বেলোর উপন্যাস। তেজেনের লাইব্রেরির সভ্যরা ছোঁবেও না। তবু তেজেন খুশি হয়ে বলে, যদি দেন তো দু' লাইন উপহার বলে লিখে দেবেন।

রাজু একটু হেসে বলে, দিলাম। লেখা-টেখার দরকার নেই।

এই তেজেনের দিকে চেয়েই রাজুর বুকের ভয়টা একটু থিতিয়ে পড়ে। বই-পাগল সাহিত্য-পাগল এই ছেলেটা কী ব্যর্থ চেষ্টায় লাইব্রেরি বানানোর কাজে লেগে আছে! ছোট থেকে এখন কেউ বড় হয় না। সে যুগ আর নেই। তেজেনের দিকে চেয়ে রাজু ওর ব্যর্থতাকে দেখতে পায়। ভারী মায়া হয় তার।

রবি কোথায় গিয়েছিল। একটা থলে হাতে দরজায় উদয় হয়ে বলল, জল আসছে কুঞ্জদা।

চল।— কুঞ্জ বলে, ওঠ রে রাজু।

তেজেন জিজ্ঞেস করে, আছেন তো কয়েকদিন?

রাজু মাথা নাড়ে, না, কাল-পরশুই ফিরব।

থাকুন না ক'দিন। একদিন সবাই মিলে বসি একসঙ্গে। এদিকে তো সাহিত্য নিয়ে কথা বলার লোক নেই।

আবার আসব।

রাজু উঠে পড়ে।

রাস্তায় নেমে এসে যে তারা হন হন করে হাঁটা দেবে তার জো নেই। দু'পা এগোতে না এগোতেই কেউ না কেউ কুঞ্জকে ডাকবেই। ও কুঞ্জদা! কুঞ্জবাবু নাকি? এই কুঞ্জ!

সেবার কুঞ্জ ভোটে দাঁড়িয়ে খুব অল্পের জন্য হেরে যায়। তখন পুরনো কংগ্রেসে ছিল। তারপর হাওয়া বুঝে নতুন কংগ্রেসে নাম লেখাল। কিন্তু নমিনেশন পেল না। এখন রাজনীতির হাওয়া এত উল্টোপাল্টা যে, কোন দলে নাম লেখাবে তা বুঝতে পারছে না। তবে হাল ছাড়েনি। বাপ কিছু টাকা বোধ হয় রেখে গেছে, জমি আছে, বুড়ি দিদিমাও নাকি মরার সময় কিছু লিখে-টিখে দিতে পারে। তবে ভাগীদারও অনেক। ভাইরা আছে, তিন তিনটে বোন বিয়ের বাকি। কুঞ্জর সবচেয়ে বড় মূলধন তার মুখের মিষ্টি কথা। শরীরে রাগ নেই। কাউকে অবহেলা করে না। ওই আকাট বোকা রবি যে রবি সেও কুঞ্জর কাছে যথেষ্ট মূল্য পায়। তাই আঠা হয়ে লেগে থাকে। দু'-দু'বার কুঞ্জ মরতে মরতে বেঁচেছে। ঘাড়ের জখমের জন্য এখনও বাঁ দিকে মুখ ঘোরাতে পারে না ভাল করে। ঠান্ডা লাগলে ডান দিকের ফুসফুসে জল জমে যাওয়ার ভয় থাকে। তবু সে থেমে নেই। তার এই অসম্ভব কাজে ব্যস্ত জীবনটাকে রাজু তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু কুঞ্জকে সে যে ভালবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাস্তায় তিন-চারজন লোক জুটল সঙ্গে। হাঁটার গতি কমে গেল। টর্চ জ্বেলে রবি পথ দেখাচ্ছে। চারদিকে নিকষ্যি অন্ধকার। আঁধারে রাজুর হাঁফ ধরে। সে কখনও আলো ভালবাসে, কখনও অন্ধকার, কখনও অনেক লোকজনের সঙ্গ তার পছন্দ, কখনও নির্জনতা। আজকাল তার এ সব হয়েছে। সেই যে একদিন সেই ভয়াবহ স্বপ্নটা দেখেছিল, তারপর থেকে...

রবি বাঁ ধারে টর্চ ফেলে দাঁড়িয়ে। বড় রাস্তা থেকে পায়ের পথ নেমে গেছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে মেঠো পথে গেলে পথ অর্ধেক। রাজু অনেকবার গেছে।

লোকজন বিদায় নিল এখান থেকে। কুঞ্জ ডাকল, রাজু, আয় রে!

রাজু সামনের গাছপালায় ঘন হয়ে ওঠা পাথুরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে বলে, সাপখোপ নেই তো!

বলেই রাজুর খেয়াল হয়, এ তার শহুরে ভয়। এখন শীতকাল, সাপ বড় বেরোয় না।

সাপের কথায় রবি টর্চের মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে বলে, নেই আবার! মেলা আস্তিক। এই পোলের ধারেই তো কদমকে ঠুকেছিল। ইয়া চিতি! ওঝা ডাকার সময়ও দেয়নি।

কুঞ্জ বলল, ধুঃ! আয় তো। রোজ যাচ্ছি। রবিটার মাথায় কিছু নেই। কদমকে কামড়েছিল বদরুদের বেড়ার ধারে, সে কি এখানে?

পোলের ওপর উঠে রবি টর্চ মেরে জল দেখে খুব বিজ্ঞের মতো বলে, দ্যাখো কুঞ্জদা, চিত্ত জানা ডিজেলে কেমন জল টানছে। এরপর কিন্তু কাদা ছাড়া খালে কিছু থাকবে না।

তোর মাথা। চল, বৃষ্টি আসছে।— কুঞ্জ সস্নেহে ধমক দেয়।

রাজু জানে, রবি একটা আস্ত ছাগল। বোধবুদ্ধি নেই, পেটে কথা রাখতে পারে না, রাস্তায় বেরোলেই লোকে পিছু লাগে, খ্যাপায়। অতিরিক্ত কথা কয় আর হাবিজাবি বকে বলে তিন মিনিটে লোকে ওকে বুঝে ফেলে, সঙ্গ এড়াতে চায়। কিন্তু ভোটপ্রার্থী কুঞ্জ হচ্ছে আলাদা ধাতের লোক। কারও ওপর না চটা, কাউকে এড়িয়ে না চলা, কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা না করার একরকম অভ্যাস গজিয়ে গেছে তার। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বোকা রবি ছায়া হয়ে ঘুরছে তার সঙ্গে, তবু কুঞ্জর মাথা এখনও বিগড়োয়নি।

রবিকে একটু আগু হতে দিয়ে কুঞ্জ আর রাজু পিছিয়ে পড়ল। কুঞ্জ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, তনু চিঠিপত্র দিয়েছে?

দেবে না কেন? প্রায়ই দেয়।

সব ভাল তো?

রাজু মনে মনে একটু কষ্ট পায়। এই একটা ব্যাপারে কুঞ্জ বোধ হয় বোকা।

রবি সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে টর্চ ঘুরিয়ে বলে, পা চালাও কুঞ্জদা। এসে গেল জল।

কুঞ্জ বলে, তুই এগো। আমরা কথা কইতে কইতে যাচ্ছি।

রবি এগোয়।

কুঞ্জ আগে, রাজু পিছনে হাঁটে। রাস্তা অন্ধকার বটে, তবে ঘন ঘন আকাশের ঝিলিকে পথ বেশ দেখা যাচ্ছে।

রাজু জানে কুঞ্জ আর একটু কিছু শুনতে চায়। কিন্তু বলার কিছুই নেই। তনু স্বামীর ঘরে সুখেই আছে। কিন্তু সে কথা কি শুনতে চায় কুঞ্জ? বরং ওর ইচ্ছে, এখনও তনু ওর কথা ভেবে স্বামীর ঘর করতে করতেও একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলুক। প্রতি চিঠিতে কুঞ্জর কুশল জানতে চাক। সেই মধ্যযুগীয় ব্যাপার আর কী!

আর এই একটা জায়গাতেই কুঞ্জ বোকা।

একটু চুপ থেকে কুঞ্জ বলে, সিতাংশুবাবুর এখন গ্রেড কত রে?

রাজু মৃদু স্বরে বলে, ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রেড কে জানে বাবা? তবে শুনেছি, হাজার দেড়েকের ওপরে পায়।

গাড়িও তো আছে?

এ সবই ভাল করে জানে কুঞ্জ। তবু প্রতিবার জিজ্ঞেস করে। এখনও কি নিজের সঙ্গে সিতাংশুকে মনে মনে মিলিয়ে দেখে কুঞ্জ? সিতাংশুর চেহারা মোটাসোটা, কালো, মাঝারি লম্বা। রাজপুত্তুর নয় বটে, কিন্তু সিতাংশু বিরাট বড়লোকের ছেলে, বিলেত-টিলেত ঘুরে এসেছে।

একমাত্র কুঞ্জই জানে না, তনু জীবনে কাউকে সত্যিকারের ভালটাল বাসেনি। খুবই চালাকচতুর ছিল তবু, ছিল কেন, এখনও আছে। খুবই পাকা বিষয়বুদ্ধি তার। স্কুল কলেজে পড়ার সময় রাজ্যের ছেলেকে প্রশ্রয় দিত, নিজের বাপ-ভাই ছাড়া আর বড় বাছবিচার করত না। তা বলে তনু গলেও পড়েনি কারও জন্য। নিজের বোনের জন্য রাজুর লজ্জা বরাবর। কিন্তু তনু যে আগুপিছু না ভেবে কাজ করবে না, হুট করে শরীরঘটিত কেলেঙ্কারি বাঁধাবে না, এ বিষয়ে মা-বাবার মতো রাজুও নিশ্চিন্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত তনু খুবই স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করেছে। এম এ পাশ করার পর বেছেগুছে নিজের পুরুষ সঙ্গীদের ভিতর থেকে সবচেয়ে সফল আর যোগ্য লোকটিকে বেছে নিয়ে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তনু হয়ে গেছে একেবারে অন্য মানুষ। ঘর-সংসার, টাকা জমানো, স্বামী-শাসন, শ্বশুর-শাশুড়িকে হাত করা ইত্যাদি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে করছে। কে বলবে, এ বিয়ের আগেকার সেই বার-মুখী মেয়েটা!

তনু যখন কিশোরী তখন থেকে কুঞ্জর যাতায়াত। অন্যদের মতো তনু হয়তো কুঞ্জকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। খুব ভালভাবে জানে না রাজু। তবে কুঞ্জর ভাব-সাব দেখে সন্দেহ হত। তনুর কোনও ভাবান্তর ছিল না, সে কুঞ্জকে যদি প্রশ্রয় দিয়েই থাকে তবে তা নিতান্তই অভ্যাসবশে দিয়েছে। তখন কুঞ্জর চেহারা খারাপ ছিল না, কিন্তু চেহারায় পটবার মেয়ে কি তনু? সুপুরুষ দেদার সঙ্গী তার চারদিকে গ্রহমণ্ডলের মতো লেগে থাকত। তনুর সঙ্গী ছেলে ছোকরারাও জানত, তনুকে নিয়ে ফুর্তি দু'দিনের। চিড়িয়া একদিন ভাগবে। শুধু কুঞ্জই তা জানত না। আজও তাই জানতে চায়, তনুর স্মৃতিতে সে এখনও একটুখানিও আছে কি না। কুঞ্জ এখনও বিয়ে করেনি, করবে কি না বোঝাও যাচ্ছে না। তবে রাজু বোঝে কুঞ্জ খুব প্রাণপণে বড় হতে চাইছে। বড় কিছু হওয়ার, নামডাকওয়ালা হওয়ার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলল, তনুর বিয়েটা ভালই হয়েছে, কী বল রাজু?

রাজু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করেই বলল, ভাল হয়েছে বুঝব কী করে? আজকাল বড় চাকরি বা গাড়ি-বাড়ি থাকলেই লোকে সেটা সাকসেস বলে ধরে নেয়। যেন ও ছাড়া জীবনে আর মহৎ কিছু নেই। আমি তো মনে করি, ওর চেয়ে সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী লোককেই আসলে সাকসেসফুল লোক বলা উচিত।

খুশি হয়ে কুঞ্জ খুব আবেগের গলায় বলে, সে বড় ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েরা এ সব বুঝতে চায় না কেন রে? বড় বোকা মেয়েমানুষ জাতটা।

মনে মনে রাজু বলে, কিংবা খুব চালাক।

পুকুরধার, বাগান, নারকোলকুঞ্জের ভিতর দিয়ে পথটা পাক খেতে খেতে গেছে। তারপরই মাঠ। রবি মাঠের ধারে পৌঁছে পিছনে টর্চ মেরে বলে, এসে গেল গো! ভেজা মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

গাছের আড়াল সরে যেতেই হাওয়ার ঢল এসে লাগল বুকে। কী শীত! বাতাসে জলের হিম। এত হাওয়ায় শ্বাসকষ্ট হতে থাকে রাজুর। কান কনকন করতে থাকে, নাকের ডগায় জ্বালা। তবু এই মাঠখানা রাজুর বরাবর ভাল লাগে। তেপান্তরের মতো পড়ে আছে উজবুক একটা মাঠ। এখানে সেখানে চাষ হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগটাই এখনও সবুজ। একটা-দুটো নৈর্ব্যক্তিক পুকুর আছে, মাঝে মাঝে গাড়লের মতো গজিয়েছে তাল বা নারকোল গাছ। মেঠো পথের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ও আছে রহস্যের গন্ধ মেখে। জ্যোৎস্না ফুটলে এ মাঠে বিস্তর পরি নেমে আসবে বলে মনে হয়।

কয়েক কদম আগে আগে কুঞ্জ ভারী আনমনা হয়ে হাঁটছে। ওর মাথা ভর্তি এখন তনুর স্মৃতি। কত জ্যান্ত আর শরীরী হয়ে তনু ওর মনে হানা দেয় এখনও! ভেবে রাজুর কষ্ট হয়। কুঞ্জর সঙ্গে তনুর অসম্ভব বিয়েটা যদি ঘটনাচক্রে ঘটতই তা হলে কি রাজু খুশি হত? না, কিছুতেই না। তনু ঠিক লোককেই বিয়ে করেছে, এমনকী জাত বর্ণ পর্যন্ত মিলিয়ে। এখন এই বিরহে কাতর কুঞ্জটার জন্য তবে কেন কষ্ট রাজুর? মুখ ফুটে কোনওদিন তনুকে ভালবাসার কথা রাজুকে বলেনি কুঞ্জ, শুধু বরাবর আভাস দিয়েছে।

রবি এদিক ওদিক টর্চ ফেলছে। উলটোপালটা হাওয়ায় মাঝে মাঝে তার গানের শব্দ আসছে। এই বিশাল মাঠে, ঢলানি হাওয়ায়, অন্ধকারে তারা তিনজন যেন বহু দূর-দূর হয়ে গেছে। যেন কেউ কারও নয়। যেই এই একা হওয়ার বোধ এল অমনি রাজুর বুক খামচে ধরল সেই ভয়। সকলের অজান্তে কে এক মৃত্যুর জাল ছুড়ে দিচ্ছে তাকে ধরার জন্য!

রাজুর হাঁফ ধবে যায়। গলার কাছে কী যেন পুঁটুলি পাকিয়ে উঠে ঠেলা দেয়। শরীরের কিছুই তার বশে থাকে না।

গভীর কালো একটা পাথুরে আকাশে নীলাভ উজ্জ্বল এক রথ কোনাকুনি ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছে, এই স্বপ্ন এক রাতে দেখেছিল সে। আর কিছু নয়, শুধু এক তাবা চাঁদ সূর্যহীন নিকষ আকাশ, আর ওই ভুতুড়ে রথ। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তার। শব্দহীন তলহীন ওই কালো আকাশ কখনও দেখেনি সে জীবনে। আর সেই নীল আলোয় মাখা রথই বা এল কোথা থেকে? যতবার সে রাতে ঘুমোতে গেল ততবার দেখল। হুবহু এক স্বপ্ন। কেউ কি দেখে এরকম? শেষ রাতটুকু জেগেই কাটাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মাস তিনেক ধরে প্রতি রাত প্রায় জেগেই কাটে তার।

রথযাত্রায় ছাড়া সারা জীবনে রাজু আর রথ দেখল কই? তা ছাড়া ওরকম নীলাভ সুন্দর রথের ছবিটাই বা সে পেল কোথায়? আকাশটাই বা কালো কেন? কেন ধীরগতিতে রথ উপরে উঠে যাচ্ছে? অনেক যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে এই স্বপ্নের সামাজিক বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে দেখেছে রাজু। কিছু পায়নি। কিন্তু উড়িয়েও দিতে পারেনি কিছুতেই। কেবলই মনে হয়, এই যৌবনের চৌকাঠেই বুঝি মৃত্যুদূত পরোয়ানা নিয়ে এল! কাউকেই স্বপ্নের কথা বলেনি সে। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখেছে,

এ স্বপ্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই নয়। গত তিন মাসে তার শরীর গেছে অর্ধেক হয়ে। খায় না ভাল করে, ঘুম নেই। সারাদিন একটা দূরের অস্পষ্ট সংকেত টের পায়। রাতে সেটা গাঢ় হয় আরও। মৃত্যু আসছে। আসছে।

এই মাঠের মধ্যে ঠিক তেমনি মনে হল। বড় দামাল হাওয়া, বড় খোলামেলা মাঠ, অনেক দূর হয়ে গেছে লোকজন।

কাতরস্বরে রাজু ডাকে, কুঞ্জ!

কিন্তু কুঞ্জ শোনে না। রাজুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুছে ফেলে দেয় বাতাস।

সামনে, কিছু দূরে তখন হঠাৎ রবির হাতের টর্চটা ছিটকে পড়েছে মাঠে। পড়ে লাশের মতো স্থির হয়ে একদিকে আলোর চোখ মেলে চেয়ে আছে। সেই আলোয় বিশাল প্রেতের ছায়া নড়ছে। কয়েকটা পা, লাঠি।

রবি কি একবার চেঁচাল বোঝা গেল না, তবে সে টর্চটা কুড়িয়ে নেয়নি তা বোঝা যাচ্ছিল।

কুঞ্জ হেঁকে বলল, রাজু! ডাইনে নেমে যা।

কাঁপা গলায় রাজু বলে, কেন?

সে কথা কানে গেল না কুঞ্জর। দু' হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে সে চেঁচাতে লাগল, খুন! খুন! খুন!

রাজু খুনের মতো কিছু তেমন দেখতে পায়নি। কুঞ্জর মতো তার চোখ অত আঁধার-সওয়া নয়। বিজলিবাতি ছাড়া শহুরে রাজু ভারী অসহায়। কিন্তু কুঞ্জ যখন দেখেছে তখন ঠিকই দেখেছে।

রাজুর বুকে এমন ওলট পালট হচ্ছিল যে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সে ডানদিকে মাঠের মধ্যে ছুটতে গিয়ে দেখে, পা চলে না। শরীরে খিল ধরে আসছে।

কুঞ্জ চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে সামনে। কিন্তু এই বিশাল মাঠে হাওয়ার ঢল ঠেলে সেই চিৎকার কোথাও যাচ্ছে না। দূরে ভঞ্জদের পাড়ায় নিয়োন বাতি জ্বলছে, রাস্তায় আলোর সারি। লোকজন রয়েছে। কিন্তু অত দূর পর্যন্ত কোনও সংবাদই পৌঁছচ্ছে না।

মাঠের মধ্যে বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে রাজু সিদ্ধান্ত নিল, কুঞ্জটা মরতে যাচ্ছে, মরবেই।

এটা ভাবতেই তার মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। কুঞ্জকে কি মরতে দেওয়া যায়? যার বুকে অত ভালবাসা? যে কখনও কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে না? কুঞ্জর মতো ভাল ক'জন?

রাজু অন্ধকারে পথের ঠাহর না পেয়ে সামনের দিকে জোর কদমে এগোতে থাকে। কয়েক কদম হেঁটে আচমকা দৌড় শুরু করে। ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে পরিশ্রমে। হাতে পায়ে খিল ধরছে, কুঁচকিতে খিঁচ। তবু প্রাণপণে দৌড়োয় রাজু।

ভঞ্জদের এলাকার উজ্জ্বল আলোর পর্দায় সে কয়েকটা কালো মানুষকে ভুঁইফোড় গজিয়ে উঠতে দেখে সামনে। ওদের হাতে লাঠি বা ওই জাতীয় সব অস্ত্র। মুখে কথা নেই।

এর পর থেকে রাজু সঙ্গে ছোরা রাখবে। খুব আফসোসের সঙ্গে সে উবু হয়ে বসে চারদিক খামচে ঢেলা খুঁজতে গিয়ে একটা ভারী মতো কী পেয়ে গেল! পাল্লাটা খুব দূরের নয়। মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার! শালা, খুন করে ফেলব!

বলেই সে হাতের ভারী বস্তুটা ছোড়ে।

কারও লাগেনি, রাজু জানে। কিন্তু আততায়ীরা বোধ হয় তৃতীয় কোনও লোককে প্রত্যাশা করেনি। চেঁচানি আর ঢিল ছোড়া দেখে হতভম্ব হয়েই বোধ হয় হঠাৎ অন্ধকারে তারা 'নেই' হয়ে গেল।

রাজু পথে বসে হাঁফাতে থাকে। বুক অসম্ভব কাঁপছে গলা চিরে গেছে।

কুঞ্জ খুবই স্বাভাবিকভাবে মাঠে নেমে জ্বলন্ত টর্চটা কুড়িয়ে চারদিকে ফেলে। তারপর নরম স্বরে বলে, ব্যাটা ভেগেছে।

কে?— রাজু জিজ্ঞেস করে।
রবি।— বলে খুব হাসে কুঞ্জ।
হাসছিস?
হাসিই আসে রে! বিপদে আজ পর্যন্ত সঙ্গী পেলাম না। আজ শুধু তুই ছিলি। এই দ্যাখ না, রবিকে তো সবাই আমার ছায়া ভাবে। দ্যাখ, শালা লোক দেখেই টর্চ ফেলে আমাকে রেখে হাওয়া।
ওরা কারা?
কে বলবে? তবে ঠাকুরের ইচ্ছেয় শত্রুর তো অভাব নেই। উঠতে পারবি এখন? শরীর খারাপ লাগছে না তো!
রাজু ওঠে। পা দুর্বল, শরীরে থরো-থরো কাঁপুনি।
কুঞ্জ শান্ত গলায় বলে, চ, বৃষ্টি এল বলে।
ভারী নির্বিকার কুঞ্জ। যেন এরকম ঘটনা নিত্য ঘটছে। দেখে রাজুর রক্ত গরম হয়ে যায়। কুঞ্জর ঠান্ডা রক্ত তার একদম পছন্দ নয়। বলে, লোকগুলো কোথায় গেল দেখবি তো! পথে যদি আবার অ্যাটাক করে?
কুঞ্জ নিভু-নিভু টর্চটা হাতের তেলোয় ঠুকে তেজ বাড়ানোর অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আর মনে হয়, চেষ্টা করবে না। তোকে দেখে ভয় খেয়েছে। ঠাহর পায়নি তো তুই কে বা কেমন ধারা!
চিনতে পারিসনি?
না। রবি হয়তো দেখেছে।
রাজু খুবই রেগে যায় মনে মনে। কিন্তু ওঠেও। টের পায়, ঘটনাটা আচমকা ঘটায় তার কিছু উপকার হয়েছে। মনের স্যাঁতসেঁতে ছিচকাঁদুনে ভাবটা আর নেই। ঝরঝরে লাগছে।

৩

বনশ্রীর চেহারা ঠিক তার নামের মতোই, তাকে দেখলে যে কোনও পুরুষেরই গাছের ছায়া বা দিঘির গভীর জলের কথা মনে পড়তে পারে। বনশ্রী নিজেও জানে তার চেহারায় তাপ নেই, তীক্ষ্ণতা নেই, আছে স্নিগ্ধ লাবণ্য। তাকে কেউ মা বলে ডাকলে ভারী ভাল লাগে তার।
সবার আগে বলতে হয় তার চুলের ঐশ্বর্যের কথা। কালো নদীর মতো স্রোত নেমে এসেছে। তাতে সামান্য ঢেউ-ঢেউ। এলো করলে আস্ত একটা কুলো দিয়েও ঢাকা যায় না। তাব গায়ের রং যেন কালো চুলেরই ছায়া। একবার এক পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে এসে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, এ তো কালো! অহংকারী বনশ্রী লজ্জায় নতমুখী হয়েছিল। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আপনি ভুল করছেন। আপনার চোখ নেই। বলেনি বটে, কিন্তু বনশ্রী মনে মনে ঠিক জানে যারা দেখতে জানে তারা দেখবে, এ রঙের কালো ফরসা হয় না। এ হল বনের গভীর ছায়া, এ হল দিঘির জলের গভীরতা। সে দেখেছে, পুরুষ মানুষ যখন তার দিকে তাকায় তখন ওদের তেমন কাম ভাব জাগে না, কিন্তু বুক জুড়ে একটা পুরনো তেষ্টা জেগে ওঠে। খুব বেশি পুরুষ যে তাকে দেখে তা নয়, কিন্তু যারা দেখে তাদের চোখ স্বপ্নের চোখ হয়ে যায়। এ সব কি তার কল্পনা? ভুল ভাবা? ভাবতে ভাবতে সারা দিন শতবার আয়নায় মুখ দেখে বনশ্রী। কেমন মুখ? একটু লম্বাটে গড়ন, গালের ঢৌলটি লাউয়ের ঢলের মতো। ঘন জোড়া ভ্রু। এই একটু খুঁত তার, জোড়া বাঁধা ভ্রু নাকি ভাল নয়। কিন্তু তার নীচে চোখ দুটির দিকে তাকাও। এমন মায়াভরা চোখ দ্যাখেনি কেউ। অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয় সীমানা ছাড়ানো তার দুই চোখ। চোখের মণি যেন দুধ-পুকুরে এক গ্রহণ-লাগা চাঁদের

ছায়া। নাক চাপা বলে দুঃখ নেই বনশ্রীর। তবে ছোটবেলায় একবার বোলপুর রেলস্টেশনে একটা লোক তার নাকছাবি ছিঁড়ে নিয়েছিল নাক থেকে। সেই ক্ষতের দাগ আজও আছে। তার ঠোঁট শীতকালেও কখনও ফাটে না। সব সময়ে টই-টুম্বুর হয়ে আছে পাকা ফলের মতো। লম্বা নয় বনশ্রী, কিন্তু ছোট মাপের মধ্যে তার শরীর-স্বাস্থ্য ঢলঢলে। বনশ্রী নিজের রূপে মুগ্ধ বটে, কিন্তু কখনও শরীর বসিয়ে রেখে গতরখাস হওয়ার চেষ্টা করে না। রোদে-জলে সে গাঁয়ের পর গাঁ হেঁটে গ্রাম-সেবিকার কাজ করেছে। হরেক রকম ত্রাণকাজে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে গঞ্জে। কলেজে ইউনিয়ন করার সময় উদয়াস্ত খেটেছে নাওয়া-খাওয়া ভুলে।

সে জীবনটা চুকেবুকে গেছে বনশ্রীর। এখন তাকে ঘরেই থাকতে হয়। বরং বলা চলে, ঘরে বসে তাকে অপেক্ষা করতে হয় বিয়ের জন্য। মাঝে মধ্যে পাত্রপক্ষ আসছেও। কেউ কেউ পছন্দও করছে। কিন্তু বড্ড খাঁই তাদের। মিল হতে গিয়েও ফসকে যাচ্ছে নানা গেরোয়। একটা বিয়ে সব ঠিকঠাক, শোনা গেল পাত্র দুম করে আর একজনকে রেজিস্ট্রি করেছে। আর একজন এসেছিল তুকারাম রাঠোর। তারা নাকি তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়, বাঙালিদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি। কিন্তু বাবা বললেন, রাঠোরটা কিছু কঠোর হয়ে যাচ্ছে। আমার নরম মেয়েটার সইবে না। খুব হাসি হয়েছিল সেই নিয়ে। বনশ্রীর বিয়ে নিয়ে কখনও মজার, কখনও দুঃখের, কখনও হতাশার নানা ঘটনা ঘটছে। বাবা সত্যব্রত এক সময়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে কিছুদিন ছাত্র ছিলেন । রবি ঠাকুরকে দেখেছেন। মাঝে মধ্যে তীর্থযাত্রার মতো সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যান। তাঁর ইচ্ছে, বনশ্রীর বিয়ে হোক এমন ছেলের সঙ্গে, যে শিল্প বোঝে।

ইচ্ছে করলে বনশ্রী কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু বনশ্রী এই একটা ব্যাপার কখনও মনে মনে পছন্দ করেনি। ছেলে-ছোকরাদের ভারী দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছটফটে আর অবিশ্বাসী মনে হয় তার। সে পছন্দ করে একটু বয়স্ক লোক। অন্তত দশ বছরের বড়, বেশ ধীরস্থির বিবেচক, দায়িত্ববান। খুব পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত পুরুষ হবে সে। গভীর মায়া থাকবে সংসারে, চরিত্রবান হবে, ইতি-উতি তাকাবে না, ছোঁক ছোঁক করবে না। তা ছাড়া বনশ্রী ভাবে, একটা লোকই তাকে পছন্দ করে নিয়ে যাবে, সেটা যেন বড় একপেশে ব্যাপার। সে চায়, পাত্রের গোটা পরিবার তাকে পছন্দ করুক, তারিফ করুক, সবাই মিলে সাদরে গ্রহণ করুক তাকে। সেই ধরনের সম্মান আলাদা। হোটেল রেস্টুরেন্ট ঘুরে, ফাঁকা কথায় পরস্পরকে ভুলিয়ে, নিতান্ত লোভে কামুকতায় জৈবিক ইচ্ছেয় বিয়ে সে কোনওদিন চায়নি। তাই কখনও কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি তার, যদিও বহুজন পেয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। কত চিঠি আসত তখন। কত ইশারা ইঙ্গিত ছিল চারপাশে। নোংরামিই বা কম কী দেখেছে বনশ্রী। পথেঘাটে সুযোগ বুঝে ইতর পুরুষেরা অশ্লীল নানা মুদ্রা দেখানোর চেষ্টাও করেছে কতবার।

বনশ্রীকে তাই আজও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। নিজের স্নিগ্ধ ছায়া নিয়ে বসে আছে সে। একদিন সেই পরম মানুষটি বহুদূর থেকে হা-ক্লান্ত হেঁটে এসে ঠিক বসবে ছায়ায়। তাকে জুড়িয়ে দেবে বনশ্রী।

বিনা কাজে আজও দুপুরে এসেছিল রেবন্তদা—তার জামাইবাবু। যদি বনশ্রী বুকে হাত দিয়ে বলে যে রেবন্ত লোকটাকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না তা হলে মিছে কথা বলা হবে। লম্বাটে গড়নের ভাবুক ও অন্যমনস্ক রেবন্তকে প্রথম থেকেই তার ভাল লেগেছিল। দিদি শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়, বনার মতোই। তবে তার বুদ্ধি বড় কম। অল্পে রেগে যায়, সামান্য কথা নিয়ে তুলকালাম বাঁধায়। ওদের সংসারে শান্তি নেই। শ্যামশ্রীও খুব ঠ্যাঁটা মেয়ে, রেবন্তদা যা পছন্দ করে না ঠিক সেইটা জোর করে করবে। বিয়ের পর যেটা নিয়ে ওদের সবচেয়ে বেশি অবনিবনা হয়েছিল সেটা হল চরকা। আদর্শগত দিক দিয়ে রেবন্ত চরকার বিরুদ্ধে।

অথচ মা সবিতাশ্রীর প্রভাবে তারা তিন বোনই চরকা কাটতে শিখেছে। সবিতাশ্রীর বাবা কট্টর

গাঁধীবাদী ছিলেন এবং এখনও আছেন। সরল ঋজু চেহারার মানুষ, ছাগলের দুধই তাঁর প্রধান পথ্য। খুব ভোরে উঠে চরকা কাটতে বসেন। বাড়ির প্রত্যেককেই দিনের কোনও না কোনও সময়ে কিছুক্ষণ চরকা কাটতেই হবে, তাঁর অনুশাসনে। গাঁধীজির আদর্শ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাউকে কাউকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগ্রহ ছিল তাঁর। গাঁধীজি একবার নাকি সি আর দাশকেও বলেছিলেন, তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তত একজনকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। সবিতাশ্রীর বাবার সেই আগ্রহ অবশ্য কাজে পরিণত হয়নি। এ নিয়ে সত্যব্রত নানা তর্ক করেছেন। এখনও স্ত্রীকে বলেন, তোমাদের গাঁধীজি পরম রামভক্ত ছিলেন। অথচ শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিল বলে স্বয়ং রামচন্দ্র তাকে চরম দণ্ড দেন। তা হলে বর্ণাশ্রমের সমর্থক রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে গাঁধীজি বর্ণাশ্রম ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন কেন? সবিতাশ্রী এর সঠিক জবাব দিতে পারেন না, বলেন, সে আমলের কথা আলাদা। সমাজ কত পালটে গেছে। সত্যব্রত বলেন, বাইরেটা পালটায় বটে কিন্তু তা বলে মানুষের রক্ত তো নীল হয়ে যায়নি। ভিতরটা পালটায় না। রবীন্দ্র-ভক্ত সত্যব্রত হিন্দুই বটে, ব্রাহ্ম নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে তিনি কিছুটা বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন একদা। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরের পরম গাঁধীভক্তি দেখে এবং সবিতাশ্রীকেও যে একদা হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তা জেনে তিনি কঠোর বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। শ্বশুরের সঙ্গে ঘোর তর্ক জুড়তেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের বক্তব্যকেও প্রকাশ্যে নস্যাৎ করতে লাগলেন। এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করেন না বটে তবে মাঝে মাঝে ফুট কাটেন, ওগো শুনছ, এই দ্যাখো খবরের কাগজে লিখেছে পশ্চিমবাংলার একজন পরম গাঁধীবাদী নেতা খুব মাংস খেতে ভালবাসেন। সবিতাশ্রী অবাক হয়ে বলেন, তাতে কী? সত্যব্রত খুব হেসে বলেন, স্বয়ং গাঁধী বলতেন আমি লাঠি ভেঙে ফেলব তবু সাপকে মারব না। তা ওরকম গোঁয়ার অহিংস মানুষের চ্যালারা মাংস খাচ্ছে, এটা একটু কেমন কেমন লাগে না!

সে সব দিন পার হয়ে গেছে! এখন গোটা ব্যাপারটাই পরিহাসের বিষয়। বিয়ের সময় সবিতাশ্রীকে তাঁর বাবা একটি চরকা উপহার দেন যথারীতি। সবিতাশ্রী আগে অভ্যাসবশে রোজ চরকা কাটতেন। ছেলেমেয়ে হলে তাদেরও শেখালেন। শ্যামশ্রী, বনশ্রী, চিরশ্রী এবং শুভশ্রী চমৎকার চরকা কাটতে শিখল। কিন্তু অনুশাসন বজায় রাখার জন্য কোনও গাঁধীবাদী তো এ সংসারে নেই। তাই চরকার অভ্যাস ক্রমে শ্লথ হয়ে এল। এখন সংসারে নানা কাজ আর সম্পর্কে জড়িত সবিতাশ্রী কেবল গাঁধীজির জন্মদিনে কিছুক্ষণ চরকা কাটেন। ছেলেমেয়েরা আর চরকা ছোঁয়ও না। কিন্তু শ্যামশ্রীর বিয়ের সময় দাদু লোক মারফত উপহার বলে একটি চরকা পাঠিয়ে দিলেন। বিয়ের আসরে সেই চরকা দেখে প্রথম হাসাহাসি তারপর কিছু গুঞ্জন উঠল। বোকা কিন্তু জেদি শ্যামশ্রী সেইটেই অপমান বলে ধরে নেয়। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রোজ চরকা কাটে। রেবন্তর সঙ্গেও তার সেই নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

কিন্তু বনশ্রী জানে, চরকা থেকে ঝগড়াটা জন্মায়নি। দু'-চার দিনেই চরকাটা হয় শ্যামশ্রী ভুলে যেত, নয়তো রেবন্ত দেখেও দেখত না। চরকাটা কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র। ব্যক্তিত্ববান পুরুষরা জেদি মেয়ে পছন্দ করে না, জেদি মেয়েরা পছন্দ করে না পুরুষের খবরদারি। এ হল স্বভাবের অমিল।

কিন্তু এ ছাড়াও একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই কারণের কথা ভাবতে বনশ্রী ভয় পায়। বড় ভয় পায়। বছর দেড়েক আগে শ্যামশ্রীর যখন বিয়ে হয় তখন বনশ্রীও বিয়ের যুগ্যি যুবতী। তখন সে বেশ ভাল করে পুরুষের দৃষ্টি অনুবাদ করতে পারে। সেই বিয়ের ছ' মাসের মধ্যেই সে তার নতুন জামাইবাবুর চোখে অন্য আলো দেখতে পায়। সেই থেকে ভয়।

বাইরে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কোথায় কোনও বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে রেবন্ত তাকে এক-আধ পলক নিবিড় বিহ্বল চোখে দেখে। ঘুরে ঘুরে তাকেই দেখতে আসে নাকি? যেমন আজও

এসেছিল? একদিন দুপুরে বনশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি হতে থাকে তার। কেমন অস্বস্তি তা বলতে পারবে না, তবে কেমন যেন তার ভিতর থেকেই কেউ তাকে জেগে উঠবার ইশারা দিচ্ছিল বার বার। বেশ চমকে জেগে উঠেছিল সে। আর জেগেই দেখল তার পায়ের দিকে খাটে রেবন্ত বসে আছে। মুখে সামান্য হাসি, চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। না, রেবন্ত কোনওদিন তার গায়ে হাত দেয়নি, কখনও খারাপ ইঙ্গিত করেনি। তবে ওই বসে থাকাটা একটু কেমন যেন। যুবতী মেয়ের ঘুমের শরীর পুরুষ দেখবেই বা কেন? বনশ্রী জাগতেই রেবন্ত বলল, বসে বসে তোমার পা দেখছিলাম। বনশ্রী তো লজ্জায় মরে যায়। ছি ছি, পায়ের ডিম পর্যন্ত শাড়ি উঠে আছে। ধড়মড়িয়ে বসে সে ঢাকাঢুকি দিল। তখন রেবন্ত বলল, বনা, লজ্জা পেয়ো না, কিন্তু এমন সুন্দর পায়ের গঠন কোনও মেয়ের দেখিনি। এ খুব ভাগ্যবতীর লক্ষণ।

সেই থেকে কেমন খটকা।

জামাইদের ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি আসাটাও তো খুব স্বাভাবিক নয়। এখান থেকে রেবন্তর গাঁ কাছেই। শ্যামপুর। কিন্তু কাছে বলেই যে আসবে তারও তো মানে নেই। এমনিতেই গাঁয়ের জামাইদের পায়াভারী। ন' মাসে-ছ' মাসে পায়ে ধরে যেচে আনতে হয়। স্বভাব অনুযায়ী রেবন্তর আরও পায়াভারী হওয়ার কথা। সে খুব আত্মসচেতন, রাগী, খুঁতখুঁতে। তবে আসে কেন?

আজ দুপুরের দিকে এল। রুক্ষ চেহারা, দাড়ি কামায়নি, চোখের দৃষ্টিও এলোমেলো। কথাবার্তাও কিছু অসংলগ্ন ছিল। বাইরে থেকে ডাকছিল, চিরু, এই চিরু।

চিরশ্রী তখন বাড়িতে ছিল না, স্কুলে ছিল।

বাইরে থেকে কে ডাকে দ্যাখ তো। জামাইয়ের গলা নয়?— সবিতাশ্রী বনাকে ডেকে বলেন।

বাইরে থেকে ডাকার কিছু নেই। রেবন্ত অনায়াসে ঘরে দোরে ঢোকে। বনা গিয়ে দেখে বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে চুপ করে বসে আছে। একটু আগে পাড়ার বিশু, বাবুয়া আর ক'টা পাড়ার ছেলে মিলে টোয়েন্টি নাইন খেলছিল। তাস তখনও পড়ে আছে চিত-উপুড় হয়ে। রেবন্ত একদৃষ্টে সেই তাসের দিকে চেয়ে। বারান্দায় ঠেস দেওয়া তার সাইকেল।

বনা যথেষ্ট অবাক ভাব দেখিয়ে বলল, ও মা! জামাইবাবু! বাইরে বসে কেন?

রেবন্ত খুব কাতর দুর্বল এক দৃষ্টিতে চাইল বনার দিকে। বলল, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

কথাটার মানেই হয় না। চলে যাবে তো এলে কেন? তবু বনা বলে, যাবেন তো, তাড়া কী? মা ডাকছে চলুন। চা বসাই গিয়ে।

রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমার সঙ্গে লোক আছে।

বনা কথাটা বুঝল না, বলল, তাতে কী? লোকদের ডেকে আনুন না, সবাই বসবেন, চা করে দিচ্ছি।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না। কাজ আছে। জরুরি কাজ।

বনা অবশ্য কোনও লোককে দেখতে পায়নি। রাস্তার লোককে বাড়ি থেকে দেখার উপায়ও নেই। সামনে অফুরন্ত বাগান, খানিকটা খেত। মেহেদির উঁচু বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে নিম আম জাম তেঁতুল জামরুল গাছের নিবিড় প্রতিরোধ। তার ওপর এবার অড়হর চাষ হয়েছে বড় জায়গা জুড়ে। সেই ঢ্যাঙা গাছের মাথা দেড় মানুষ পর্যন্ত উঁচু হয়ে সব আড়াল করেছে।

বনা বলল, মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে কিছু খাননি। চারটি মুড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছি, ডাল তরকারি দিয়ে খেয়ে তারপর রাজ্যজয়ে যাবেন খন।

রেবন্ত হাঁ করে বনার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমাকে কি খুব শুকনো দেখাচ্ছে? বনা ফাঁপরে পড়ে যায়। শুকনো দেখাচ্ছে বললে জামাইবাবুর যদি মন খারাপ হয়ে যায়? রোগা বলে রেবন্তর কিছু মন খারাপের ব্যাপার আছে। প্রায়ই জিজ্ঞাসা, আমার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে ভাল হয়নি? বনা তাই দোনো-মোনো করে বলে, রোদে এসেছেন তো তাই।

নিজের গালে হাত বুলিয়ে অন্য মনে কিছুক্ষণ বসে থেকে রেবন্ত বলে, আজ দাড়িটাও কামানো হয়নি।

গাঁয়ের কোনও লোকই রোজ দাড়ি কামায় না। এমনকী বড় ভঞ্জবাবু পর্যন্ত নির্বাচনী সভায় তিন দিনের খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি নিয়ে বক্তৃতা করছেন, এ দৃশ্য বনশ্রী দেখেছে। তবে রেবন্ত শ্বশুরবাড়ি আসার সময় দাড়ি কামিয়ে আসবেই। বেশির ভাগ দিনই বোধ হয় বাজারের সেলুন থেকে কাজ সেরে আসে, গালে ভেজা সাবানের দাগ লেগে থাকে।

বনা বলল, এখন আপনি আমাদের পুরনো জামাই, শ্বশুরবাড়ি আসতে বেশি নিয়ম কানুনের দরকার হয় না। উঠুন তো, ভিতরে চলুন। সঙ্গের লোকেরা কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? ডেকে আনুন গে তাদের।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলে, ওরা আসবে না।

কথাটা বনার ভাল লাগল না। রেবন্ত যে আজকাল কিছু আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেশে তা শ্যামশ্রীই বলে গেছে। বাবাও একদিন দেখেছেন, জামাই পটলের সঙ্গে বাগনান স্টেশনে বসে আছে। দৃশ্যটা ভাল ঠেকেনি তাঁর চোখে। পটলটা মহা বদমাশ।

সুন্দর চেহারার ভাবুক রেবন্ত কেন বদ লোকের সঙ্গে মেশে তা আকাশ পাতাল ভেবেও কূল করতে পারে না বনশ্রী। শুধু মনটা খারাপ হয়ে যায়।

রেবন্ত বনশ্রীর চোখে চোখ রেখে বলল, আমি যদি আর কখনও না আসি বনা?

বনশ্রী চমকে উঠে বলে, ও কী কথা?

রেবন্ত ম্লান হেসে বলে, অনেক কিছু ঘটতে পারে তো?

বনশ্রীর বুক কাঁপছিল। বলল, কী হয়েছে আপনার বলুন তো! দিদি কিছু বলেছে?

সে কথা নয়।— বলে রেবন্ত তার সাইকেলটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

এ সময়ে সবিতাশ্রী পরিষ্কার কাপড় পরে ঘোমটা অল্প টেনে শান্ত পায়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, রোদে এসেছ, স্নান করে দুটি খেয়ে যাও।

রেবন্ত অবশ্য রাজি হয়নি। বলল, না, আমার কাজ আছে।

বনশ্রী চা করে দিল। সেটা খেয়েই সাইকেলে চলে গেল রেবন্ত। বনশ্রী মাকে বলল, দিদির সঙ্গে আবার বোধ হয় বেঁধেছে।

গাঁধীবাদী শিক্ষার দরুন সবিতাশ্রীর ধৈর্য খুব বেশি। সহজে রাগ উত্তেজনা হয় না, সব ব্যাপারেই কিছু অহিংস নীতির সমাধান ভেবে বের করতে চেষ্টা করেন। বললেন, জামাইকে দোষ দিই না, শ্যামা বড় জেদি।

বনশ্রী বলল, জামাইবাবুর আজকের চেহারাটা কিন্তু ভাল নয় মা। খুব একটা কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে। তুমি বরং দিদির কাছে কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও।

বিকেলের আগেই শুভ সাইকেলে দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলল, দিদি বলেছে জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়নি। তবে ক'দিন ধরে নাকি জামাইবাবু রাতটুকু ছাড়া বাড়িতে থাকে না, খেতেও যায় না। বাড়ির কেউ কিছু জানে না, কাউকে বলে না কোথায় যায়। দিদি জিজ্ঞেস করে জবাব পায়নি।

সত্যব্রত এ সব খবর জানেন না। কিন্তু বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুতে উঠোনের কোণে পাতা পিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে পায়ে পা ঘষতে ঘষতে সবিতাশ্রীকে বললেন, আজ ইস্কুলের কাজে দুপুরে বাগনান গিয়েছিলাম। ফেরার পথে শ্যামার বাড়ি যাই। সেখানে শুনলাম অমিতার সব ঘটনা নাকি রেবন্ত জানতে পেরেছে। শ্যামার সঙ্গে তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। বলেছে নাকি আগে জানলে এ বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করত না।

অমিতা সবিতাশ্রীর ছোট বোন। খুবই তেজি মেয়ে এবং সমাজকর্মী। কুমারী বয়সে একবার সে

সন্তানসম্ভবা হয়। এ নিয়ে হইচই খুব একটা হতে দেননি সবিতাশ্রীর বাবা। শান্তভাবেই তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, সন্তানটির বাবা কে এবং তার সঙ্গে অমিতার বিয়ে সম্ভব কি না। অমিতা সন্তানের বাবার নাম বলেনি, তবে এ কথা বলে যে বিয়ে সম্ভব নয়। সবিতাশ্রীর বাবা গগনবাবু আর কোনও চাপাচাপি করেননি। যথারীতি অমিতার সন্তান জন্মায়। গগনবাবু সেই উপলক্ষে পাড়ায় মিষ্টি বিলোন। অমিতা কিছুদিন পরেই বাবার আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে চাকরি করতে থাকে। এখন সম্পর্কও রাখে না। ঘটনাটা বহুদিনের পুরনো। লোকে ভুলেও গেছে। অমিতা নামে যে কেউ আছে এ নিতান্ত তার আপনজন ছাড়া আর কারও মনেও পড়ে না।

সবিতাশ্রী চিন্তিত মুখে বললেন, কার কাছ থেকে শুনল?

সত্যব্রত ঠোঁট উল্টে বিরক্তির সঙ্গে বলেন, কে জানে! শ্যামাটা তো বোকার হদ্দ। কোনও সময়ে বলে ফেলেছে হয়তো। তবে জামাই অমিতার কাণ্ডকারখানা শুনে বিগড়োয়নি। সে নাকি শ্যামাকে বলেছে, ও সব আমি অত মানি না, কিন্তু তোমার দাদু লোককে মিষ্টি খাওয়াল কেন? এটা কি আনন্দের ঘটনা? আসলে তোমাদের গুষ্টিই পাগল আর চরিত্রহীন।

সেই বিকেলের দিককার ঘটনা। বনশ্রী বা ভাইবোনরা কেউ মা-বাবার কথার মাঝখানে কথা তোলে না। এই সৎশিক্ষা সবিতাই দিয়েছেন। কিন্তু কথা না বলেও সে শীতের মরা বিকেলের ফ্যাকাসে আলোয় নিজের বাবার মুখে একটা গভীর থমথমে রাগ আর বিরক্তি দেখেছিল। ঘরে যেতে যেতে বাবা বারান্দায় ভাঁজ করা বস্তায় জোরে পায়ের পাতা ঘষটাতে ঘষটাতে খুব আক্রোশে, কিন্তু চাপা গলায় বললেন, কোনও পরিবারের অতীতটা যদি ভাল না হয় তবে এ সব ঝঞ্ঝাট তো হবারই কথা। জামাইকে দুষি কেন? আমাদেরও কি ভাল লাগে?

সত্যব্রতরও গভীর হতাশা রয়েছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলে এসে পাশ করে শিল্পী হওয়ার চেষ্টায় লেগে যান। একটা স্কুলে ড্রইং শেখাতেন সামান্য বেতনে। বড় কষ্ট গেছে। রং তুলি ক্যানভাসের খরচ তো কম নয়। তার ওপর আছে মাউন্টিং আর একজিবিশন করার খরচ। বেশ কয়েক বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শিল্পের লাইনে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। বহু টাকা গুনোগার দিয়ে অন্তত গোটা পাঁচেক একক প্রদর্শনী করেছিলেন, গ্রুপ একজিবিশনেও ছবি দিয়েছেন। তেমন কোনও প্রশংসা জোটেনি, ছবি বিক্রিও হয়নি তেমন। শিল্পসন্ধানী সাহেবদের পিছনে হ্যাংলার মতো ঘুরেছেন, শিল্প সমালোচকদের খাতির করে বেড়িয়েছেন। মদটদও তখন ধরেছিলেন ঠাটের জন্য। সব পণ্ডশ্রম। পরে জ্ঞানচক্ষু খুললে ভঞ্জদের স্কুলে ড্রইং মাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে আসেন। বলতে কী, এখানেই তাঁর ভাগ্য খুলেছে। বুড়ো ভঞ্জ শীতলবাবু খুব স্নেহ করতেন। এই সব জমিজমা একরকম তাঁর দান বলেই ধরতে হবে। জলের দরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। চাষের জমিও পেলেন সস্তায় এবং ধারে। শীতলবাবু মরে গেলেও ছেলেরা সত্যব্রতকে শ্রদ্ধা করে। ভঞ্জদের বাড়ির অনেকেই তাঁর ছাত্র। সত্যব্রত এখন ড্রইং মাস্টার নন, হেডমাস্টার।

বনশ্রী বাবার দুঃখটা খুব টের পায়। বাইরে এক ধরনের অভাব ঘুচলেও এ লোকটার বুক খাঁ খাঁ করে। ব্যর্থতা কুরে কুরে খায়। তবে সত্যব্রতর আঁকার ব্যর্থতা থাকলেও নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা শিল্পবোধ আর সুরুচি ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে শুভশ্রীকে একটু-আধটু আঁকতেও শেখান আজকাল। কিন্তু শিল্পের অভ্যাস তাঁকে যত ছেড়ে গেছে ততই তিনি নিজের ওপর আর পারিপার্শ্বিকের ওপর মনে মনে খেপে গেছেন। মুখে প্রকাশ করেন না, কিন্তু মুখের গভীর রেখা ও দৃষ্টিতে তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়।

দিনটা আজ ভাল গেল না। শ্যামশ্রী আর রেবন্তর দাম্পত্যজীবনের কথা শুনে, দেখে বনশ্রীর নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একরকম ভয় হয়।

এইসব ঘটনায় মনটা উদাস হয়ে গেল। আর আজই যেন তার মন খারাপ করে দিতে মেঘ করল আকাশে। এমনিতেই শীতের বিকেল বড় বিষণ্ণ। তার ওপর মেঘ আর মন-খারাপ।

সন্ধের পর সত্যব্রত বেরোলেন। চিরশ্রী আর শুভশ্রী উঠোনের অন্যপ্রান্তে, পড়ার ঘরে। স্বভাব-গম্ভীর সবিতাশ্রী তার হরেক রকম ঘরের কাজে আনমনা। ফলে বনশ্রী একা। কিছুক্ষণ রেডিয়ো শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু মেঘলা আকাশ আর বিদ্যুৎ চমকানির জন্য রেডিয়োতে বড্ড কড় কড় আওয়াজ হতে থাকায় বন্ধ করে দিল। বই পড়তে মন বসল না। জানালায় দাঁড়িয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে। কিন্তু বড্ড কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া, তাতে বৃষ্টির মিশেল। বড় মাঠে একটা বাজ পড়ল বোধ হয়।

জানালার পাল্লা বন্ধ করতে না করতেই বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। ছোট ছোট ঢিল পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে দক্ষিণের ঘরের টিনের চালে। পুকুরের জলে জল পড়ার শব্দ একরকম, গাছপালায় বৃষ্টির শব্দ অন্যরকম।

মন-খারাপ নিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ বনশ্রী টের পায়, বাইরের বারান্দায় কাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

কে?

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে জবাব আসে, ভয় নেই, আমি কুঞ্জ, ঘরের লোক।

কুঞ্জ সকলেরই ঘরের লোক। লোকে তাকে নিজেদের ঘরের ভাবুক বা না ভাবুক কুঞ্জ নিজেকে সবার ঘরের লোক বলে মনে করে। এই ব্যাপারে তার লজ্জা সংকোচ নেই। কেউ মরলে, বিপদে পড়লে, আপনি এসে হাজির হয়। নিজেই দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কাজ উদ্ধার করে দেয়। কুঞ্জকে লোকে ভোট হয়তো এককাট্টা হয়ে দেয় না, কারণ গাঁয়ের রাজনীতি অত সরল নয়। কিন্তু তাকে পছন্দ করে সবাই। সে কারও বাড়িতে গেলে কেউ বিরক্ত হয় না।

শ্যামশ্রীর বিয়েটা ঘটিয়েছিল কুঞ্জই। রেবন্ত তার খুব বন্ধু ছিল । এখন শোনা যায়, কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর নাকি দায়ে-কুড়ুলে।

কুঞ্জকে কথাটা একটু বলতে হবে ভেবে বনশ্রী দরজা খুলে সপাট বাতাসের ধাক্কা খায়। দুটো দরজা ফটাং করে ছিটকে গিয়ে কাঁপতে থাকে। বাইরের গভীর দুর্যোগের চেহারাটা এতক্ষণে টের পায় বনশ্রী।

কুঞ্জদা, ঘরে আসুন।— চেঁচিয়ে বনশ্রী ডাকে।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তিকে বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল। দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

ডাক শুনে কুঞ্জ উঠে এসে বলে, ভিতরে আজ আর যাব না। জলটা ধরলেই রওনা হয়ে পড়ব।

জমে যাবেন ঠান্ডায়, নিউমোনিয়া হবে।

কুঞ্জ হেসে বলে, আমাদের ও সব হয় না। বারো মাস বাইরে বাইরে কাটে।

আসুন, কথা আছে।

কুঞ্জ বলে, চা খাওয়াও যদি তবে আসি। সঙ্গে কলকাতার এক বন্ধু আছে কিন্তু।

আহা, তাতে কী। আমরা কি পর্দানশিন? নিয়ে আসুন। ইস, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে গেছেন একেবারে! ডাকেননি কেন?

গেরস্তকে বিব্রত করার দরকার কী?

আসুন তো!

কুঞ্জ গিয়ে তার বন্ধুকে ডেকে আনে। দরজা নিজেই ঠেলে বন্ধ করে। বলে, ওঃ, যা ভেজাটাই ভিজেছি! ঘরের মধ্যে ভারী ওম তো! বুঝলি রাজু, এ বলতে গেলে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি।

বনশ্রী কুঞ্জর বন্ধুকে ইলেকট্রিকের আলোয় কয়েক পলক দেখে। একটু শুষ্ক চেহারা, চোখের দৃষ্টি একটু বেশি তীব্র. চোখদুটো লালও। গাল ভাঙা, লম্বাটে মুখ। তবে লোকটার মুখে চোখে একটা কঠোরতার পলেস্তারা আছে। খুব শক্ত লোক।

কুঞ্জ বলে, এ হল রাজু, আমার কলেজের বন্ধু, দু'জনে একসঙ্গে ইউনিয়ন করতাম।

গাঁ গঞ্জে পুরুষ ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়েদের এরকমভাবে পরিচয় করানো হয় না সাধারণত। তবে বনশ্রীদের বাড়ির নিয়ম অন্যরকম। বনশ্রী নিজেও ছেলেদের সঙ্গে কম মেশেনি। এখন অবশ্য কেমন একটু সংকোচ এসে গেছে। বনশ্রী মৃদুস্বরে বলল, বসুন, খুব ভিজে গেছেন, শুকনো কাপড় দিই কুঞ্জদা?

আরে না। তেমন ভিজিনি। চা খাওয়াও, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

রাজু বনশ্রীর দিকে একবারের বেশি তাকায়নি, কথাও বলেনি। এ ঘরে একটা পাটিতে ঢাকা চৌকি আর কয়েকটা কাঠের ভারী চেয়ার আছে। কুঞ্জ চৌকিতে বসল, রাজু চেয়ারে। কুঞ্জ নিঃসংকোচে, রাজু ভারী জড়সড় হয়ে।

কুঞ্জ বলল, কী কথা আছে বলছিলে?

আগে চা আনি।

ছাতা মাথায় উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত যেতেই বনশ্রী বৃষ্টি আর হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

উনুনের সামনে বসা সবিতাশ্রী ঠান্ডা কঠিন মুখটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, কে এসেছে?

কুঞ্জদা। ওকে কি জামাইবাবুর কথাটা বলব মা?

সবিতাশ্রী সামান্য সময় নিয়ে বললেন, দরকার কী? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বাইরের লোকের না যাওয়াই ভাল।

সবিতাশ্রীর মতই এ বাড়িতে আদেশ। এত বড় হয়েছে বনশ্রী, এখনও মা'র মুখের কথার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পায় না। তারা কোনও ভাইবোনই পায় না।

সবিতাশ্রীকে কিছু বলতে হল না, বড় উনুনের ওপর রান্নার কড়াইয়ের পাশে চায়ের কেটলি বসিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি যাও, কুসুমকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক'জন?

দু'জন।

মুড়ি দিয়ো চায়ের সঙ্গে।

কিন্তু মুড়িটুড়ি ছুঁলও না কেউ। বনশ্রী দ্বিতীয়বার ঘরে আসার পর রাজু তার দিকে বারকয়েক তাকাল। তারপর প্রথম যে কথাটা বলল তা কিছু অদ্ভুত।

একটু আগে আমাদের খুব ফাঁড়া গেছে। তিনটে লোক বড় মাঠে কুঞ্জকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। হাসিমুখে ঠান্ডা গলায় বলল রাজু।

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে, সে কী!

কুঞ্জ মাঝখানে পড়ে বলে, আহাঃ, ও সব কিছু নয়। রাজু, তোর আক্কেলটা কী রে?

বনশ্রী একটু বিরক্ত হয়ে বলে, লুকোচ্ছেন কেন কুঞ্জদা? এ অঞ্চলের ব্যাপার যখন আমাদেরও জানা দরকার। তিনটে লোক কারা?

অন্ধকারে দেখেছি নাকি? হবে কেউ।— কুঞ্জ উদাসী ভাব করে বলে।

কিন্তু বনশ্রীর ধারণা হয়, কুঞ্জ একেবারে না দেখেছে এমন নয়। হাতে টর্চ আছে, অন্তত এক ঝলক হলেও দেখা সম্ভব। তা ছাড়া কুঞ্জ না চেনে হেন লোক এখানে নেই। অন্ধকারেও ঠিক ঠাহর পাবে।

বনশ্রী বলে, মারতে পারেনি তা হলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, রাজু থাকায় বেঁচে গেছি। ওকে দেখে ওরা ভড়কে যায়। তিনজনকে আশা করেনি তো। ভেবেছিল রোজকার মতো আমি আর রবি ফিরব।

রবি কোথায়?— বনশ্রী জিজ্ঞেস করে।

রবির ওপরই প্রথম হামলা করে। সে টর্চ ফেলে দৌড়।

আপনার লাগে-টাগেনি তো!

না।

চা খেতে বৃষ্টির জোর কিছু মিয়োল। বনশ্রী দুটো লেডিজ ছাতা এনে দিয়ে বলল, আমার আর চিরুরটা দিয়ে দিচ্ছি। আর ভিজবেন না।

কুঞ্জ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী কথা বললে না তো!

আজ থাক।

থাকল না হয়। রেবন্ত আর শ্যামার কথা বলবে না তো?

বনশ্রী চুপ করে থাকে। কী বুঝল কুঞ্জ কে জানে, তবে কথা বাড়াল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চ, রাজু।

দু'জনে চলে গেলে বনশ্রী ভাবতে বসে।

৪

অন্ধকার উঠোন ছপ ছপ করছে জলে। বৃষ্টির জোর কমে গিয়ে এখন ঝিরিঝিরি পড়ছে। এই গুঁড়ো বৃষ্টি সহজে থামে না। সেই সঙ্গে পাথুরে ঠান্ডা একটা হাওয়া বইছে থেকে থেকে, দমকা দিয়ে। শরীরের হাজারটা রন্ধ্রপথ দিয়ে হাড়পাঁজরে ঢুকে কাঁপ ধরাচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজু আর কুঞ্জ ঘরে এসে বসেছে। এ ঘরটা বাইরের দিকে, ভিতরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এটায় কুঞ্জ থাকে। ভিতরবাড়িতে তাদের সংসারটা বেশ বড়সড়। রাজু সঠিক জানে না, কুঞ্জরা ক' ভাইবোন। আন্দাজ পাঁচ-ছ' জন হবে। নিজের বাড়ির সঙ্গে কুঞ্জর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। খায়, ঘুমোয়, এই পর্যন্ত।

গামছায় ঘষে ঘষে পায়ের জল মুছল কুঞ্জ চৌকিতে বসে। বলল, রবির বাড়িতে একটু খোঁজ নিতে হবে।

রাজু বিরক্ত হয়ে বলে, রাত বাজে ন'টা। তার ওপর এই ওয়েদার।

আরে দূর। এ আবার আমাদের রাত নাকি? তুই শুয়ে পড়। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব। বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব, তোকে উঠে দরজা খুলতে হবে না।

একটি অল্পবয়সি বউ একটু আগে এসে ঘুরঘুর করে গেছে এ ঘরে। বিছানাটা টানটান করল, আলনাটা খামোকা গোছাল। ঘোমটা ছিল একটু, তবু ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেয়েছিল রাজু। দু'খানা মস্ত চোখে কেমন একরকমের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। রাজুর মনটা বার বার রাডার যন্ত্রে কী একটা অস্ফুট তরঙ্গ টের পেয়েছিল তখন। সেই বউটাই এখন পিরিচে পান সুপারি দিয়ে গেল ঘরে। আজকাল রাজু যেন অনেক কিছু টের পায়। অনেক অদ্ভুত গন্ধ, স্পর্শ, তরঙ্গ। যেগুলো স্বাভাবিক মানুষ পায় না।

কুঞ্জ অন্য দিকে চেয়ে ছিল। বউটা চলে যেতেই বলল, ও হল কেষ্টর বউ। বাগনানের এক মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। বিয়েটা দিতে অনেক ঝামেলা গেছে।

কেষ্ট কে?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে, আমার মেজো ভাই। দেখেছিস, মনে নেই হয়তো। অল্প বয়সেই নেশা-ফেশা করে খুব খলিফা বনে গিয়েছিল। তার ওপর এই মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে। উদ্যোগী হয়ে আমিই বিয়েটা দিই। কিন্তু বাড়িতে সেই থেকে মহা অশান্তি। বউটাকে দিনরাত কথা শোনাচ্ছে, উঠতে বসতে বাপান্ত করছে।

কেন?

এরকমই হয়। বিয়ের নামে ছেলে বেচে মোটা টাকা আসে যে! এই কেসটায় তো সেটা হয়নি। বললে বিশ্বাস করবি না, কেষ্ট পর্যন্ত সেই কারণে আমার ওপর চটা।

বলে কুঞ্জ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খুব অন্যমনস্ক ভাবে বলে, এরপর আর বিয়ের ঘটকালিটা করবই না ভাবছি। কয়েকটা অভিজ্ঞতা তো হল। সত্যবাবুর বাড়িতে যে মেয়েটাকে দেখলি তার বড় বোন শ্যামার বিয়ে আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও খুব গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। আমার কপালটাই খারাপ।

রাজুর এ সব ভ্যাজর ভ্যাজর কথা ভাল লাগছিল না। সটান বিছানায় শুয়ে গায়ে মস্ত লেপটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজল। বুজতেই বনশ্রীর ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেল চোখের সামনে। কেমন স্নিগ্ধতায় ভরে গেল ভিতরটা। বড় সুন্দর মেয়ে। ও যদি আমার বউ হত।

অবশ্য এটা কোনও নতুন ভাবনা নয়। সুন্দর মেয়ে দেখলেই মনে হয়, ও যদি আমার বউ হত।

কাঠের চেয়ারে একটু কচমচ শব্দ হয়। কুঞ্জ উঠেছে, টের পায় রাজু। ওর হচ্ছে বুনো মোষের স্বভাব। যা গোঁ ধরবে তা করবেই। রবির খোঁজ কাল সকালেও নেওয়া যেত।

চোখ বুজেই রাজু বলে, কুঞ্জ, একটা কথা বলব?

বল।

যারা মাঠের মধ্যে রবিকে ধরেছিল তাদের কাউকে তুই চিনিস না?

কুঞ্জ একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলে, কী করে চিনব? দেখতেই পেলাম না ভাল করে।

আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুই চেপে যাচ্ছিস।

না রে। তবে রবি কাউকে দেখে থাকতে পারে। ওর হাতে টর্চ ছিল। যদি দেখে থাকে তবে বিপদে পড়বে। লোকগুলো ভাল নয়।

রাজু শ্বাস ফেলে বলে, রবি দেখেছে, তুইও দেখেছিস। ভাল করে না দেখলেও আবছা দেখেছিস ঠিকই। কিন্তু পলিটিকস করে করে তোর মনটা এখন খুব প্যাঁচালো হয়ে গেছে। তাই চেপে যাচ্ছিস।

কুঞ্জ নরম স্বরে বলল, সিওর না হয়ে কোনও মত দেওয়া ঠিক নয় রে। তাই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না।

তুই যে বেরোচ্ছিস, ওরা যদি ধারে কাছে ওত পেতে থেকে থাকে, তা হলে?

এই বৃষ্টি বাদলায় শেয়ালটাও বাইরে নেই, ওরা তো মানুষ।— বলে কুঞ্জ একটু হাসে।

রাজু আর কিছু বলল না। শুয়ে থেকে চোখ বুজেই টের পায় কুঞ্জ বেরোল, বাইরে শিকল টেনে তালা দিল। কেষ্টর বউয়ের চোখে ওরকম মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি কেন তা ভাবতে থাকে রাজু। বউটা কি কেষ্টকে ভালবাসে না? অন্য কাউকে বাসে?

লেপের ওম পেয়েও ঘুমটা ঘনিয়ে এল না রাজুর। ভিতরটা বড় অস্থির। বুকের মধ্যে ধমাস ধমাস করে মিলিটারির বুটজুতোর মতো তার হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে।

চারদিকে ঘনঘোর বৃষ্টির বেড়াজাল। অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। মেঘ ডেকে উঠছে দূরে বাঘের মতো। হাওয়া দাপিয়ে পড়ছে গাছপালায় জানালায় দরজায়। কেমন একা করে দেয় তাকে এই দুর্যোগ। আর যখনই একা মনে হয় নিজেকে তখনই সে সেই কালো আকাশ আর নীলাভ উজ্জ্বল রথটির কথা ভাবে। মনে পড়ে মৃত্যু।

রাজু উঠে বসে। ভেজা জামাটা একটা পেরেকে ব্রাকেটে ঝুলছে। উঠে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করে আনে। কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারে না। দেশলাইটা জলে ভিজে মিইয়ে গেছে। এ ঘরে লণ্ঠনের ব্যবস্থা নেই। কাপড়কলের পাওয়ার হাউস থেকে বিজলি আসে বলে তেঁতুলতলায় প্রায় সকলের ঘরেই বিজলিবাতি। সন্ধেবেলা আলো টিমিয়ে জ্বলে, রাত হলে আলোর তেজ বাড়ে।

রাজু সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে করে বসে রইল চুপচাপ। আর বসে থেকে সিগারেট ধরানোর কথা ভুলে গেল। ভিতরবাড়ি থেকে একটা চেঁচামেচির শব্দ আসছে। উলটোপালটা হাওয়া আর বৃষ্টিতে প্রথমটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর চেঁচানিটা চৌদুনে উঠে গেল। সেই সঙ্গে মারের শব্দ। মেয়েগলার আর্ত চিৎকার। তারপর অনেক মেয়েপুরুষের গলায় চেঁচামেচি, ছেড়ে দে! আর মারিস না! ও নিতাই, ধর না বউটাকে! কেষ্ট, এই কেষ্ট, কী হচ্ছেটা কী? ইত্যাদি। রাজু একটু চমকে গেলেও খুব যেন অবাক হল না। তার মাথায় এখন একটা রাডার যন্ত্র কাজ করে। সে বুঝতে পারে, এরকমই হওয়ার কথা। সম্পর্কের মধ্যে মৃদু বিষ মিশেছে ওদের।

মারের এইসব শব্দ যেন রাজুর ভিতরে বোমার মতো ফেটে পড়ছিল। তার চার পাশের পৃথিবী আজকাল তাকে এইভাবেই আক্রমণ করে। মারধোর, চেঁচামেচি, গালমন্দ তাকে অসম্ভব অস্থির করে তোলে। এমনকী সে আজকাল দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত পড়তে পারে না, খুনখারাপির সংবাদ এড়িয়ে যায়, মৃত্যুর খবর সইতে পারে না। অথচ তার চারপাশে অবিরল এইসবই ঘটছে।

রাজু উঠে সন্তর্পণে ভিতরবাড়ির দিকের দরজাটা খুলে অল্প ফাঁক করে। হাওয়ার চাপে দরজাটা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। পাল্লা ঠেসে ধরে রাখতে বেশ জোর খাটাতে হয় তাকে। পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখে, উঠোনের ডান পাশে কিছু তফাতে এক ঘরের বারান্দায় কিছু চাকর-বাকর শ্রেণির লোক লণ্ঠন ঘিরে উবু হয়ে বসে খাচ্ছে। সেই ঘরের বারান্দায় কিছু মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে দরজা ধাকাচ্ছে। একজন মোটা লোক চেঁচিয়ে বলে, মেরে ফেলবি নাকি রে হারামজাদা? ফাঁসিতে ঝুলবি যে! গলাটা ছেড়ে দে বলছি এখনও।

হাওয়া ভেদ করেও বন্ধ ঘর থেকে একটি মেয়ের অবরুদ্ধ গলার কোঁকানি আসছিল। হাঁফ ধরা, দম বন্ধ আর সাঙ্ঘাতিক শ্বাসকষ্ট থেকে মাঝে মাঝে ছাড়া পেয়ে গলার স্বরটা গোঙায়। একজন পুরুষের গলা প্রচণ্ড চাপা আক্রোশে বলছে, বল ড্যামনা! বাঁচতে চাস তো স্বীকার কর।

বারান্দার লোকগুলো উবু হয়ে বসে নির্বিকারে খেতেই থাকে। তাদের মাঝখানে লণ্ঠনটার আলো দাপিয়ে উঠে নিভে যেতে চায়। একজন একটা র‍্যাপার দিয়ে লণ্ঠনকে হাওয়া থেকে আড়াল করল। মস্ত একটা ছায়া পড়ল উঠোনে। হয়তো বারান্দার বিজলি আলো ফিউজ হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো চাকর-বাকর খাচ্ছে বলে বিজলি আলো জ্বালানো হয়নি। কে জানে রহস্য?

আঁচলে মাথা ঢেকে একটা মেয়ে উঠোন থেকে এ বারান্দায় উঠে এসেছে। ও বারান্দার লণ্ঠনের আলো আড়াল করে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই রাজু চমকে ওঠে এবং মেয়েটার মুখোমুখি পড়ে যায়।

মেয়েটা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা তীব্র স্বরে ডাকে, বড়দা!

রাজু দরজা ছেড়ে দিতেই পাল্লা দুটো ছিটকে খোলে। মেয়েটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাজুকে দেখেই একটু আড়ালে সরে বলে, বড়দা নেই?

একটু বেরিয়েছে।

রাজু মেয়েটাকে চেনে। কুঞ্জর তিনটে আইবুড়ো বোনের একটি। কখনও কথা-টথা বলেনি আগে।

মেয়েটা বিপন্ন গলায় বলে, কোথায় গেছে বলে যায়নি?

রবির বাড়ি। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে রাজু বলেই ফেলল—ও ঘরে কী হচ্ছে বলো তো?

মেয়েটির বয়স বেশি নয়, বছর পনেরো-ষোলো হবে। দেখতে কালো, রোগা, দাঁত উঁচু। আড়াল থেকেই জবাব দেয়, মেজদা খেপে গেছে।

কেন?

মেয়েটা জবাব দেয় না। রাজু বিরক্ত হয়ে একটু ধমকের স্বরে বলে, তুমি ভিতরে এসো তো! ব্যাপারটা খুলে বলো।

মেয়েটা বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েই ঘরে এসে দাঁড়ায়। গায়ে আধভেজা শাড়ি আর খদ্দরের নকশা-চাদর। শীতে জড়সড়। মাথা সামান্য নিচু করে ভয়ের গলায় বলে, দোষটা বউদিরই। বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ বিকেলে ভাই এসেছিল নিয়ে যেতে। এ বাড়ির কাউকে আগে জানায়নি পর্যন্ত। খবর পেয়ে মেজদা রেগে গেছে।

রাজু ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রাগে গরম হচ্ছিল। কঠিন গলায় বলে, কেষ্ট কি মদ খেয়ে এসেছে?

সে তো রোজ খেয়ে আসে।

বউটাকে তো খুনও করে ফেলতে পারে। তোমরা কী করছ?

সেই জন্যই তো বড়দাকে খুঁজছি। কেউ ঘরে ঢুকতে পারছে না যে!

রোজ মারে?

মেয়েটা একটু থতমতভাবে চেয়ে মাথাটা এক ধারে নেড়ে বলে, মারে, তবে রোজ নয়। আজ বড্ড খেপে গেছে। কী যে করছে, মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই রাজুরও। মাথার মধ্যে একটা আগুনের গোলা ঘুরছে। কথার ওজন না রেখে সে গাঁক করে উঠে বলে, কেষ্টকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি যদি বাঁদরামি বন্ধ না করে তবে আমি ওর প্রত্যেকটা দাঁত ভেঙে দেব। তারপর পুলিশে চালান করব। যাও বলো গিয়ে। বোলো, আমার নাম রাজীব ব্যানার্জি।

মেয়েটা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু রাজুর ভিতর থেকে একটা পুরনো রাজু ফুঁসছে, আঁচড়ে কামড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভিতরের সেই ছটফটানিতে সে বসে বসে কাঁপে। তারপর শান্ত অবসাদ নিয়ে বসে থাকে। ও ঘরের সামনের বারান্দায় কেউ নেই এখন। অন্ধকার দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর একটু চিকন রেখা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

ঠান্ডায় কান কনকন করছিল রাজুর। ভেজা বাতাসে ঘরটা স্যাঁতস্যাঁত করছে। ঘরের বিজলি আলো এখন টিমটিম করে জ্বলছে। খোলা দরজার সামনে বসে সে কেষ্টর ঘরের দিকে ভয়ংকর চোখে চেয়ে ছিল।

হুড়কো খোলার শব্দ হল। তারপর ও ঘরের দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। কেষ্টই হবে। বারান্দা থেকেই খুব মেজাজি গলায় ডাকল, টুসি! এই টুসি!

কোত্থেকে 'যাই মেজদা' সাড়া দিল টুসি। কেষ্ট ফের ঘরে ঢুকে পড়ে। একটু বাদে রাজু দেখে সেই কালো রোগা কিশোরী মেয়েটা দৌড় পায়ে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

একটু বাদে দরজাটা খুলে টুসি কেষ্টর বউকে ধরে ধরে বারান্দায় আনে। বউটা টুসির কাঁধে মাথা রেখে এলিয়ে রয়েছে। বারান্দার ধারে টুসি তাকে উবু করে বসায়। একটা ঘটি থেকে জল দেয় চোখে মুখে। ঘরের ভিতরে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে দেখতে পায় রাজু।

হঠাৎ তার দমকা রাগটা আবার ঘূর্ণিঝড়ের মতো উঠে আসে ভিতর তোলপাড় করে। পুরনো রাজু তার পাঁজরায় ধাক্কা মেরে বলে, ওঠো। ওই শুয়োরের বাচ্চার দাঁত ক'টা ভেঙে দাও।

এই রকমই রাগ ছিল রাজুর। গোখরোর মতো ছোবল তুলত সে। রাজু কত লোককে যে মেরেছে তার হিসেব নেই। মার খেয়েছেও বিস্তর। কিন্তু যেখানে প্রতিবাদ করা উচিত সেখানে কোনওদিন সে চুপ করে থাকেনি। একশো জন বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও নয়।

কিন্তু আজকাল এ কেমন ধারা হয়ে গেছে রাজু? একটা স্বপ্ন কি মানুষকে শেষ করে দিতে পারে এত নিঃশেষে? বসে বসেই নিজের রাগের হলকায় পুড়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুতেই উঠোনের দূরত্বটুকু পেরিয়ে গিয়ে ওই হারামজাদার চুলের মুঠি ধরে বের করে আনতে পারছে না। একদিকে

ভিতরে যেমন রাগ ফোঁস ফোঁস করছে, অন্যদিকে তেমনি বুকের মধ্যে এক ভয়ের পাতাল কুয়ো।

বউটি মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তেমনি টুসির ওপর ভর রেখে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

রাজু উঠে এসে বিছানায় আধশোয়া হয়ে গলা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয়। চোখ বুজে ঠান্ডার ছোবল খেতে থাকে চুপ করে।

হঠাৎ চোখ চেয়েই রাজু কুঞ্জর বোনকে দেখতে পায়। একটা পেতলের জলের জগ আর গেলাস রাখছে টেবিলের ওপর। রাজুকে তাকাতে দেখে কুণ্ঠিত স্বরে বলল, আর কিছু লাগবে আপনার?

রাজু উঠে বসে বলে, একটা দেশলাই দিতে পারো?

দিচ্ছি।— বলে মেয়েটা চলে যায়। রাজু টের পায়, মেয়েটা এ ঘরের বারান্দার কোনা থেকে কেষ্টর ঘরের বারান্দার কোনায় লাফিয়ে চলে গেল। দরজায় শেকল নেড়ে কেষ্টর কাছে দেশলাই চাইল।

একটু বাদে দেশলাই হাতে এসে বলে, এই যে।

মেয়েটার সামনে রাজুর লজ্জা করছে। হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে বলে, আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম তখন। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলাটা কে সহ্য করতে পারে বলো!

টুসি রাজুর দিকে অকপটে চেয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন গভীর আতঙ্কের ছাপ আছে। একটু চেয়ে থেকে বলল, বউদির কিন্তু খুব লেগেছে। কেমন এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে বার বার। কথা বলতে পারছে না। চোখ উলটে আছে। দাঁত লেগে যাচ্ছে। আর...

বলে টুসি দ্বিধা করে একটু।

রাজুর শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। ভয়ে, রাগে। বলে, আর কী?

খুব স্রাব হচ্ছে। পোয়াতি ছিল। কী জানি কী হবে!

ডাক্তার নেই আশেপাশে?

মেয়েটা ভয়-খাওয়া গলায় বলে, রাধু যাচ্ছিল ডাকতে। মেজদা তাকে বলেছে ডাক্তার ডাকলে খুন করে ফেলবে। বড়দা কোথায় যে গেল! বড়দা ছাড়া এখন কেউ কিছু করতে পারবে না।

এই বলতে বলতে টুসি চোখের জল ফস করে আঁচলে চেপে ধরে।

আজকাল একটা অক্ষম মন নিয়ে চলে রাজু। বর্ষার জলকাদায় খাপুর খুপুর করে যেমন কষ্টে চলতে হয়, রাজুর বেঁচে থাকা এবং কাজ কর্তব্য করাটাও তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কাজেই তার ভয়, সব সিদ্ধান্তেই তার নানারকম দ্বিধা।

তবু কষ্টে সে নিজের মনটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ে। বলে, একটা ছাতা দাও, আর রাধুকে ডেকে দাও।

ধরা গলায় টুসি বলে, আপনি যাবেন?

যেতেই হবে। নইলে বউটা মরে যাবে যে!

টুসি একটু ভরসা পেয়ে বলে, ঝড়-বাদলায় আপনার যেয়ে দরকার নেই। রাধু ডেকে আনতে পারবে। আপনি শুধু মেজদাকে একটু সামলাবেন। আপনি বড়দার বন্ধু তো, তার ওপর কলকাতার লোক। আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কিছু বলতে সাহস পাবে না।

রেগে গেলে রাজু সেই পুরনো রাজু। ভয়ডর থাকে না, দ্বিধা থাকে না।

রাজু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, রাধুকে দৌড়ে যেতে বলো। আমি কেষ্টর ঘরে যাচ্ছি। দড়িতে কুঞ্জর একটা খদ্দরের চাদর ঝুলছিল। সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে কেষ্টর দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, এই কেষ্ট। দরজাটা খোলো তো।

কেষ্ট দরজা খুলে বেকুবের মতো চেয়ে থাকে। বেশ আঁটসাট গড়নের লম্বাটে চেহারা। ভুরভুর করে কাঁচা দেশি মদের গন্ধ ছাড়ছে। গায়ে এই শীতেও কেবল একটা হাতওলা গেঞ্জি।

রাজু ধমক দিয়ে বলে, কী হয়েছে?

অবাক কেষ্ট গলা ঝেড়ে বলে, সাবির শরীরটা খারাপ হয়েছে। রক্ত যাচ্ছে।

ওকে এক্ষুনি একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করে রাজুর। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, কেষ্ট তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। এ ব্যাপারটা বেশ ভাল লাগে রাজুর। তাকে যে কেউ ভয় পাচ্ছে এটা ভেবে তার আত্মবিশ্বাস এসে যায়। গম্ভীর গলায় সে বলে, তার জন্য কী ব্যবস্থা করেছ এতক্ষণ? কাউকে ডাকোনি কেন?

কেষ্ট সামনের বড় বড় শুকনো দাঁতগুলোয় জিভ বুলিয়ে বলে, কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার ভিতরে এসে দেখুন না, খুব সিরিয়াস কেস কি না!

ভিতর থেকে গভীর যন্ত্রণার একটা গোঙানির শব্দ হয় এ সময়ে। রাজুর শরীর কেঁপে ওঠে। একটু আগেই বউটা পান দিয়ে এল ঘরে। আর এখন মরতে চলেছে বুঝি! সে এ সব যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করতে পারে না আজকাল। রক্তের রং দেখলে তার হাত পা মাথা অবশ হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলে, না, না! তুমি বরং লোকজন ডেকে আনো।

কেষ্টর রগচটা ভাব মরে গিয়ে এখন সত্যিকারের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মদের নেশা কেটে গেছে একেবারে। বলল, যাচ্ছি। আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, টুসি এক্ষুনি আসবে।

এই বলে কেষ্ট উঠোনে নেমে অন্ধকারে কোথায় তাড়াতাড়ি নিমেষে মিলিয়ে যায়। ওর ভাবসাব রাজুর ভাল লাগল না। তার মনে হল, কেষ্ট এই যে গেল, আর সহজে ফিরবে না। কেষ্টর যাওয়ার ভঙ্গি দেখেই রাজুর ভিতরের রাডার যন্ত্রে ব্যাপারটা ধরতে পারে রাজু। কেষ্ট বোধ হয় ধরেই নিয়েছে যে সাবি বাঁচবে না। থানাপুলিশ হবে। তাই পিটটান দিল।

৫

হাউর বাতাসে ছাতার শিক ছটকে উলটে গেছে, হাঁটুভর কাদা আর ঝড়-বাদলা ঠেলে শেয়ালের মতো ভিজতে ভিজতে রবির বাড়ি পৌঁছয় কুঞ্জ। ভেজা শরীরে বাতাস লেগে শীতে মুরগির ছানার মতো কাঁপছে।

ডাকাডাকিতে খোড়ো চালের মেটে ঘর থেকে জানালার ঝাঁপ ঠেলে সতর্ক চোখে কুঞ্জকে আগে দেখে নেয় রবি। দরজা খুলতেই কুঞ্জ দেখল রবির হাতে একটা মস্ত দা। কুঞ্জ জামাকাপড়ের জল যথাসাধ্য নিংড়ে ঘরে ঢুকতেই রবি দড়াম করে দোর দিয়ে বাঠাম লাগাল। শুকনো মুখে আর চোখের চাউনিতে কুঞ্জকে ভাল করে আর একবার দেখে নিয়ে দা'টা কুলুঙ্গিতে খাড়া করে রেখে এসে বলল, ভাবলাম বুঝি তোমার পেটি আর গাদা আলাদা করেছে শালারা।

শীতে সিঁটিয়ে গেছে কুঞ্জ। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ। চাদর নিংড়ে মাথা গা মুছতে মুছতে বলে, চিনতে পেরেছিস?

রবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, টের পেলে খুন করবে। তুমি বলেই বলছি। শালা লাফ দিয়ে সামনে পড়ে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ফেলল, হাতে অ্যাই বড় গজ। মুখটা কম্ফর্টারে ঢাকা। খুব একটা ঘড়ঘড়ে শ্বাসের শব্দ হচ্ছিল। আমি তো সব সময়ে তোমার পেছু পেছু যাই, তাই মনে হয় আমাকে তুমি ভেবে ভুল করেছিল। গজ যেই তুলেছে, অমনি পিছন থেকে আর এক শালা বলল, ওটা কুঞ্জ নয়, রবি। দুটো গাঁট্টা দিয়ে ছেড়ে দে, খুব পালাবে। তখন ছাড়ল। পেটে দুটো হাটুর গুঁতো দিয়ে বলল, রা করলে খুন হয়ে যাবি। ছাড়া পেয়ে পোঁ-পোঁ দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। পালাতে পালাতেই ঠিক পেলুম, এ হল পটল। পিছনের দু'জন কে ঠাহর পাইনি। একজন লম্বা।

কুঞ্জর গা থেকে জল গড়িয়ে ঘরে থকথকে কাদা হয়ে গেল। একদিকে বাঁশের মাচানে চ্যাটাই আর গুচ্ছের ময়লা কাঁথার বিছানা। অন্য ধারে একটা মস্ত ছাগল চটের জামা পরে একরাশ নাদির

মধ্যে বসে এই রাতেও কী চিবোচ্ছে। ঘরময় ভরভরে ছাগলের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কুঞ্জ রবির দিকে স্থির চোখে চেয়ে সবটা শুনে মৃদু স্বরে বলল, যা দেখেছিস দেখেছিস। ক্লাবে কিছু জানাসনি তো!

যখন দৌড়ুচ্ছি তখন ক্লাবের সামনে একজন জিজ্ঞেস করছিল কী হয়েছে, কেন দৌড়ুচ্ছি। কিন্তু তখন এত হাঁফ ধরেছে যে মুখে কথা এলই না। তোমাকে কী করল?

কী করবে! কিছু করেনি।

তুমি মরে ভূত হয়ে আসনি তো কুঞ্জদা! ইস, ভিজে ঢোল হয়েছ। আমার কাঁথা কম্বল গায়ে দিয়ে বোসো। ছাতাটা দাও, সুতো দিয়ে শিকগুলো বেঁধে দিই।

রবির ঘরে ছাগলের গন্ধের মধ্যে ময়লা কাঁথা আর তুলোর কম্বল গায়ে চাপিয়ে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকে কুঞ্জ। বস্তা থেকে সুতলি খুলে রবি খুব যত্নে ছাতার ডাঁটির সঙ্গে শিকের ডগাগুলো বেঁধে দিচ্ছিল, যাতে বাতাসে ফের উলটে না যায়। বলল, ক্লাবে খবর দেবে না? তোমার গায়ে ফের হাত পড়েছে শুনলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে, রক্তগঙ্গা বইবে।

কুঞ্জ জবাব দিল না। চোখ বুজে সে একটা লম্বা লোকের কথা ভাবছিল। রবির টর্চটা কেতরে পড়েছিল মাঠে। আলোটা টেরছা হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। সেই আলোতে ক্ষণেকের জন্য একটা ফরসা মুখ ঝলসে উঠেছিল। রেবন্ত।

কুঞ্জ ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ে বলল, কাউকে কিছু বলিস না। বিপদে পড়ে যাবি। যা করার আমিই করব।

রবি অবাক হয়ে বলল, তুমি একা কী করবে? ও হল খুনে পটলা। ভাল চাও তো ক্লাবে খবর দাও।

সুস্থির চোখে রবির দিকে চেয়ে কুঞ্জ বলে, কাউকে না। কাকপক্ষীতেও জানবে না। বুঝেছিস?

রবি তবু মাথা নেড়ে বলে, পাবলিসিটি হবে না বলছ? তুমিই তো বলো, এরকম সব হামলা-টামলা হলে লোকের পপুলারিটি বাড়ে, ভোট পাওয়া যায়! এমন একখানা জলজ্যান্ত কাণ্ড চেপে যাবে?

কুঞ্জর এত দুঃখেও হাসি হাসে। রবি যে রবি, সেও আজকাল পলিটিক্সের শেয়াল হয়ে উঠল। কথাটা মিথ্যেও নয়। যেবার বুকে সড়কি খেল সেবার হু-হু করে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তখন ভোট হলে কুঞ্জ জিতে যেত। কিন্তু কুঞ্জ জানে, এটা ভোটের মামলা নয়। সে যদি মরে তা হলে এখন হয়তো এ চত্বরে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রবির দিকে চেয়ে সে ঠান্ডা গলায় বলে, অনেক ব্যাপার আছে রে। তুই সব বুঝবি না।

দরজা খুলে দিয়ে রবি বলল, সাবধানে যেয়ো। তারপর একটু লজ্জার স্বরে বলে, বুঝলে কুঞ্জদা, সবসময়ে মনে হয় আমি তোমার জন্য জান দিতে পারি, কিন্তু আজ বিপদে পড়ে প্রাণটা কেন যেন পালাই-পালাই করে উঠেছিল। তুমি হয়তো ভাবছ, রবিটা নেমকহারাম। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি...

আবার জলঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। তোল্লাই বাতাস এসে হ্যাঁচকা টান মারে খোলা ছাতায়। খুব ভাল করে শিক বেঁধে দিয়েছে রবি। সহজে ওলটাবে না। বাতাসের মুখে ছররার মতো ছিটকে আসছে জলের ফোঁটা। কুঞ্জ প্রাণপণে ছাতার আড়াল রাখতে চেষ্টা করে। কাদায় পা রাখা দায়, একবার পা ফেললে দু'-তিন কিলো কাদা পায়ে আটকে উঠে আসে। ভুসভাস নরম মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে পা। বাতাস টালাচ্ছে। শীতের কম্প উঠে পেট বুক কাঁপিয়ে তুলছে। কুঞ্জ কোনওক্রমে শুধু এগিয়ে যাওয়াটা বজায় রাখতে থাকে। আর মনের মধ্যে বার বার বীজমন্ত্রের মতো পপুলারিটি শব্দটা এসে হানা দেয়।

এর আগেও কুঞ্জর ওপর বহু হামলা হয়ে গেছে। দু'বার মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু তাতে দমে

যায়নি কুঞ্জ। তখন শত্রুপক্ষ তাকে মর্যাদা দিত, প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবত, যত জখম হয়েছে তত লোকের কাছে সে হয়ে উঠেছে গুরুতর মানুষ। লোকে তো আর যাকে তাকে খুন করতে চায় না। কুঞ্জ খুব বিচক্ষণের মতোই সেইসব হামলার ঘটনাকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল রাজনীতির খুচরো লোভে। কিন্তু সে জানে, আজকের মামলা তা নয়। ধারে কাছে কোনও নির্বাচন নেই, কোনও তেমন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি। আজ তার কপালে ছিল উটকো মৃত্যু। এই মৃত্যু তাকে মহৎ করত না। লোকের গোপন বেনামী জমি ধরে দেওয়ার বিপজ্জনক কাজে নেমেই সে টের পেয়েছিল, এ হল জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো। কিংবা যখন হাবুর ঝোপড়ায় মদো মাতাল বদমাশদের আড্ডা ভাঙতে গিয়েছিল তখনই সে কি জেনেশুনে বিষ করেনি পান? কাজেই মরার ব্যাপারে তার তেমন চিন্তা নেই। কিন্তু বার বার আজ পপুলারিটি কথাটা তার বুকে হাতুড়ি মারে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার পপুলারিটির শক্ত ডাঙা জমি বড় ক্ষয় হয়ে গেছে। টর্চের আলোয় রেবন্তর মুখ দেখে চমকে যায়। কিন্তু রেবন্ত তাকে খুন করতে চায় বলে সে তত চমকায়নি। তাকে খুন করতে চাইতেও পারে রেবন্ত। তার কারণ আছে। কিন্তু খুন করলেও রেবন্ত তাকে ঘেন্না করবে না, কুঞ্জর এমন একটা ধারণা ছিল, তাই রেবন্তকে দেখে সে যত না চমকেছে তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছে রেবন্তর মুখে একটা খাঁটি নির্ভেজাল তীব্র ঘেন্নার ভাব দেখে।

পিচ রাস্তা পেয়ে কুঞ্জ একটু হাঁফ ছাড়ল। তেঁতুলতলা যুব সঙ্ঘের পাকা বারান্দায় উঠে ছাতাটা মুড়ে নিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দেয়। এত রাতেও কয়েকজন বসে তাস খেলছে। কুঞ্জকে দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই।

গোটা তেঁতুলতলাই কুঞ্জর মামাবাড়ি। জ্ঞাতিগুষ্টি মিলে তারা সংখ্যায় বড় কম নয়। তাস খেলুড়েদের মধ্যেও কুঞ্জর এক মামা, দুই মাসতুতো ভাই রয়েছে।

সতুমামা বলল, এই দুর্যোগে ব্যাপার কী রে? কোনও হাঙ্গামা নাকি?

কুঞ্জ মাথা নাড়ল।

তা হলে?

তা হলে কী তা কুঞ্জও তো জানে না। সে শুধু আজ সন্দেহভরে জানতে চায় তার বিশ্বস্ত ঘাঁটিগুলো এখনও তার দখলে আছে কি না! বোঝা বড় শক্ত। এই ক্লাবখানা তার নিজের হাতে গড়া। রাজ্যের ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে জবরদস্ত ক্লাবখানা জমিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ। পিছনের ঘরে লাঠি, সড়কি, দু'-একখানা খাঁটি তরোয়াল এখনও মজুত। কুঞ্জর বিপদ শুনলে এখনও হয়তো গোটা ক্লাব ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। গতবার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে কুঞ্জ তার এক মাসতুতো দাদার কাছে হারতে হারতে কোনওক্রমে দশ ভোটে জিতেছিল। এই কথাটা এখন বড় খোঁচাচ্ছে তাকে। পায়ের নীচে মাটি এখনও আছে বটে, কিন্তু চোখের আড়ালে পাতালের অন্ধ গহ্বর নিঃশব্দে মাটি খসিয়ে নিচ্ছে না তো? কুঞ্জর বিপদ শুনলে এক দল রুখে দাঁড়াবে ঠিক, কুঞ্জ নির্বাচনে দাঁড়ালে এক দঙ্গল তার হয়ে খাটবে ঠিক, তবু আর একটা দল নিস্পৃহ থেকেই যাবে।

মাসতুতো ভাইদের মধ্যে একজন নলিনী। সে বলল, খুব ভিজেছ কুঞ্জদা, তোমার না বুকের অসুখ! বইয়ের আলমারির ওপর আমার বর্ষাতিটা মেলে দেওয়া আছে, নিয়ে যাও।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, না রে, কিছু হবে না।

নলিনী আর কিছু বলে না। তাস বাটা হতে থাকে। বহুকাল বাদে কুঞ্জর যেন একটু অভিমান হয়। বর্ষাতিটা নিলুম না, তা আর একটু সাধতে পারলি না নলিনী?

কুঞ্জ বেরিয়ে আসে। তার আর একটা ঘাঁটি ছিল ফুটুনিমামার দোকান। জেলেপাড়ার ষাট-সত্তর ঘর রায়ত ফুটুনিমামার ভারী বশংবদ। একসময়ে পড়াশোনা ছেড়ে রাজনীতিতে নামার দরুন কুঞ্জকে তার বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল। তখন ফুটুনিমামা কুঞ্জকে আশ্রয় দেয়। বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বলে এসেছিল, আপনি না রাখেন ত্যাজ্যপুত্র করুন, কুঞ্জকে আমি পুষ্যি নেব। নির্বাচনে

ফুটুনিমামা তার রায়তদের কুঞ্জর পক্ষে কাজে নামিয়ে দিয়েছিল।

মোড়ের মাথায় ফুটুনিমামার দোকানে ঝাঁপ ঠেলে বহুদিন বাদে কুঞ্জ হানা দিল । মামা উরুর ওপর লম্বা খাতা রেখে হিসেব করছে। খোল, ভুসি, হাঁসমুরগির খাবার আর মশলাপাতির ঝাঁঝালো গন্ধটা বহুকাল ভুলে গিয়েছিল কুঞ্জ। আজকাল আসা হয় না। গন্ধটা পেয়ে একটা হারানো বয়স কুঞ্জর কাছে ফিরে এল বুঝি।

মামা মুখ তুলে দেখে বলল, কী খবর রে? বলেই ফের হিসেবে ডুব দেয়।

কুঞ্জ ঠান্ডা হচ্ছে। খুব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। পাথর হয়ে যাচ্ছে। মামা আবার মুখ তুলে বলে, দুর্যোগে বেরিয়েছিস, ঠান্ডা লাগাবি যে! তারপর খবর-টবর কী?

কুঞ্জ বলে, ভাল।

ভাল বলছিস?— ফুটুনিমামা তাকিয়ে একটু হাসে। কিন্তু তাকানোর মধ্যে দৃষ্টি নেই, হাসির মধ্যে অনেক ভেজাল। একসময়ে খুব বাবুগিরি করত বলে নামই হয়ে গিয়েছিল ফুটুনি। এখন বাবুগিরি নেই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, কাছা খুলে রোজগার করছে মামা। কোথায় যায় মানুষের দিন?

ফুটুনিমামা ভ্রু কুঁচকে বোধ হয় একটা উড়ন্ত মশার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে খবর-টবর সব ভাল?

ঝুরঝুরে মাটির ওপর দিয়ে কুঞ্জ হাঁটছে। যে কোনও একটা পদক্ষেপেই সে দেখতে পাবে সামনেই ধস। তবু কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসেব-নিকেশ থাকা ভাল।

পপুলারিটি শব্দটা রবারের বলের মতো মাথার মধ্যে ধাপাচ্ছে কে!

অন্য দিন সময় হয় না কুঞ্জর। এই দুর্যোগে আজ হঠাৎ সময় হল। বহুদিন বাদে ঝড়বাদল ঠেলে সে মেজদাদুর বাড়ির বারান্দায় উঠে এল। মেজদাদু হলেন এখন ভঞ্জদের সবচেয়ে বড় শরিক। কয়েক কোটি টাকা বোধ হয় তাঁর রোলিং ক্যাপিটাল। দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না। সাদাসিধে, গেঁয়ো।

আশির কাছাকাছি বয়স। মস্ত ঘরে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। গায়ে তুষের চাদর, পায়ে মোজা, মাথায় বাঁদুরে টুপি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেন। বললেন, এত রাতে এলে? খুব দরকার নাকি? কারও কিছু হয়নি তো?

না।

মেজদাদু শ্বাস ছেড়ে বললেন, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। আমি মরলে তোমাদের অশৌচও হয় না জানি। মাতুল বংশ, তায় জ্ঞাতি। কিন্তু আমার ভাবনা তেমনধারা নয়। আমি ভাবি, তেঁতুলতলায় সব আমার মানুষ। কখন কে মরে, কে পড়ে। ভারী দুশ্চিন্তা।

অনেকদিন দেখা করিনি, তাই এলাম।

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না মেজদাদুর। সন্দেহের চোখে কুঞ্জর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কারও কোনও বিপদ হয়নি, ঠিক বলছ? ভয়ের কিছু নেই তো!

না, মেজদাদু।

তুমি ভাল আছ তো? বাড়ির সবাই? তোমার মাকে বহুকাল দেখি না। আজকাল সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করে।

বলব।

মেজদাদু খানিক চুপ থেকে বলেন, বুদ্ধি পরামর্শ নিতে আমার কাছে কোনওদিন এলে না কুঞ্জ! এলে কি আমি তোমাকে কুপরামর্শ দিতুম! আমি তোমার কতখানি ভাল চেয়েছিলাম তা জানলে না।

কুঞ্জ খুব নিবিড় চোখে মেজদাদুকে দেখছিল। আগে দেখা হলে মেজদাদুর মুখে যে একটা খুশির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ত তা আজ আর কই? সে বুঝতে পারে, সুর কেটে যাচ্ছে। কোথায় লয়ে-তালে গোলমাল।

কুঞ্জকে জেতানোর জন্য সেবার মেজদাদু নিজের নমিনেশন উইথড্র করে নিয়ে বলেছিলেন, লোকে কুঞ্জকেই চায়। আমাদের খামোখা দাঁড়ানো। কথাটা বলেছিলেন হাসিমুখে, আত্মগৌরবের সঙ্গে । সেবার সড়কি খেয়ে কুঞ্জর জখমটা দাঁড়িয়েছিল মারাত্মক। ডাক্তার কলকাতায় পাঠাতে চেয়েছিল। মেজদাদু রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, কলকাতার হাসপাতাল! কেন, কুঞ্জ কি ভাগাড়ের মড়া? কলকাতার হাসপাতালে আজকাল মানুষের চিকিৎসা হয় নাকি? ভঞ্জদের লোকবল, অর্থবল সবটুকু ঢেলে দিয়ে মেজদাদু কুঞ্জকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। আর তার জন্যই তেঁতুলতলার ছোট হাসপাতালে হাজারও যন্ত্রপাতি আমদানি হল, ভাল একজন ডাক্তার এল চাকরি পেয়ে, এল এক্স-রে ইউনিট। কুঞ্জ যে খুব একটা কৃতজ্ঞ বোধ করেছে, তা নয়। সে তখন ভাবত, তাকে বাঁচানোর জন্য লোকে তো এ সব করবেই। সে যে নেতা।

আজ মেজদাদুর সামনে তাই একটু লজ্জা বোধ করে কুঞ্জ। মেজদাদুর জন্য তার যা করা উচিত ছিল তা তো করা হয়নি। অকৃতজ্ঞতার পাপ তাকে কিছুটা ছুঁয়ে আছে আজও।

কুঞ্জ মাথা নিচু করে বলে, আপনি আর আগের মতো ডাক খোঁজ করেন না তো দাদু! কোনও অপরাধ করিনি তো?

ভঞ্জবাবু ভারী অবাক হয়ে শশব্যস্তে বললেন, এ সব কী বলছ? অপরাধ আবার কী? বুড়ো বয়সে বাইরের ব্যাপারে বেশি যাই না। তুমিও ব্যস্ত মানুষ। তবে খোঁজখবর সবই পাই। তোমার হচ্ছে পাবলিক লাইফ, আমরা তো নিজের ধান্দা নিয়ে পড়ে আছি।

এই বলে মেজদাদু খানিক কী যেন ভেবে আস্তে করে বলেন, তবে তোমার চেহারায় আগে যেমন একটা তেজ দেখতুম এখন আর সেটা দেখি না।

আমি কি কোনও ভুল করছি? কোনও অন্যায় পথে চলছি?— কুঞ্জর গলায় চাপা ব্যাকুলতা ফোটে। টর্চের আলোয় দেখা রেবন্তর মুখটায় বড় ঘেন্না ফুটে ছিল যে! ঠোঁট বাঁকানো, চোখে আগুন, দাঁতে দাঁতে বজ্র-আঁটুনি। হিংসে নয়, সংকোচ বা দ্বিধাও নেই। যেন মাজরা-পোকা নিকেশ করতে এসেছিল।

মেজদাদু এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বলেন, ভেজা শরীরে এই হিমে কতক্ষণ থাকবে? তোমার শরীর ভাল নয়।

কুঞ্জ সংবিৎ ফিরে পায়। আজ সে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তা হঠাৎ টের পেয়ে ভারী লজ্জা করে তার। কোনওদিন কোনও মানুষের কাছে ঠিক এভাবে নিজের সম্পর্কে জানতে চায়নি কুঞ্জ। সে বরাবর নিজের সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী। নিজেকে অভ্রান্ত ভাবাই কুঞ্জর স্বভাব।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই কুঞ্জ গুটিয়ে গেল। গম্ভীর মুখখানায় হাসি এল না, তাই না হেসেই বলল, যাই মেজদাদু।

এসো গিয়ে। মাঝে মাঝে এলে ভাল লাগে। বাড়িতে তোমার কেউ যত্ন করে না নাকি তেমন? শুকিয়ে গেছ। তোমার মাকে দেখলে বলব তো।

কুঞ্জ আবার জলঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে আসে। বাতাসের মুখে ধেয়ে আসে খরশান বৃষ্টির অস্ত্রশস্ত্র। গেঁথে ফেলে তাকে বার বার। বৃষ্টির মিছিল চলে তার পিছনে পিছনে, ধিক্কার দেয়, ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া...

পিচ রাস্তায় এক নিয়নবাতির তলায় ছোট ভাই রাধানাথের সঙ্গে দেখা। ছাতার নীচে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছিল। কুঞ্জকে দেখে ভয়ার্ত মুখ তুলে বলল, বউদির বড্ড অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

কী অসুখ?

মেজদা মেরেছে। রক্ত যাচ্ছে খুব।

কুঞ্জ সামান্য কেঁপে ওঠে। হয়তো ভেজা শরীরে হঠাৎ বাতাস লাগল, কিংবা হয়তো অন্য কিছু। ভাবতে চাইল না কুঞ্জ। ভাবতে নেই।

খুব অনেক রাতে মেঘ কেটে আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাতাস থেমেছে। রুগির ঘরখানা নিরিবিলি হয়েছে এতক্ষণে। টুসি জেগে ছিল এতক্ষণ। আর পারল না। এক ধারে মাদুর পেতে তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে নেতিয়ে পড়েছে অঢেল ঘুমে।

কুঞ্জ একা হল। সাবিত্রীর অবশ্য সাড় নেই। রক্ত বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। কয়েকবারই অজ্ঞান হয়েছে, আবার জ্ঞান ফিরেছে, ফের দাঁতে দাঁত লেগে চোখ উলটে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করেছে। মেঝে ভেসে গিয়েছিল রক্তে। কুঞ্জ তখন ঘরে আসেনি। ভাসুর তো। সব ধোয়া মোছা হওয়ার পর, ভিড় পাতলা হয়ে গেলে এসে একটু দূরে চেয়ার পেতে বসে থেকেছে। এ ঘরে এভাবে বসে থাকা তার উচিত নয়। খারাপ দেখায়। তবু তার উপায়ও নেই। রাঙাকাকি আর মা থাকতে চেয়েছিল, কুঞ্জ একরকম জোর করে তাদের শুতে পাঠিয়েছে। কেবল টুসি। ডাক্তার বলে গেছে, ভয় নেই। কিন্তু কুঞ্জর ভয় অন্য জায়গায়। সে নিঃশব্দে চেয়ে থেকেছে সাড়হীন সাবিত্রীর দিকে। টের পেয়েছে ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে তার ডান বুকে জল জমছে। বাঁ বুকে ভয়।

টুসির শ্বাসের শব্দ মন দিয়ে শুনল কুঞ্জ। ঘুমন্ত শ্বাসের শব্দ চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হল একটু। আস্তে নিঃশব্দে উঠে এল বিছানার কাছে। ডাকল না, তবে বিছানার এক পাশে বসল খুব সাবধানে।

অনেক, অনেকক্ষণ বসে রইল। ঘরে একটা মৃদু নীল ঘুম-আলোর ডুম জ্বালানো। তাতে আলো হয় না। কেবল দৃশ্যগুলো জলে-ডোবা আবছায়া মতো দেখা যায়। সেই আলোয় যুবতী সাবিত্রীকে বুড়ি-ধুড়ির মতো দেখায়। দেখতে ভাল লাগে না। অনিচ্ছে হয়। চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে জাগে।

গভীর রাতের এক নিস্তব্ধ মুহূর্তে যখন সাবিত্রীর বিছানায় সসংকোচে বসে অন্যমনস্ক কুঞ্জ পপুলারিটির কথাই ভাবছিল তখন হঠাৎ খুব বড় করে চোখ মেলল সাবিত্রী। মাঝরাতে হঠাৎ সেই তাকানো চোখের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে কুঞ্জ। তারপর মুখ এগিয়ে খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন আছ?

সাবিত্রী জবাব দিল না। বড় বড় চোখে নিষ্প্রাণ প্রতিমা যেমন চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ সেইরকম চেয়ে রইল। তারপর খুব ক্ষীণ, নাকিস্বরে বলল, ও কোথায়?

কুঞ্জ গম্ভীর হয়ে বলল, পালিয়েছে।

সাবিত্রী চারদিকে চাইল। টুসিকে দেখল, কুঞ্জর দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করে বলল, টুসি?

ঘুমোচ্ছে।

সাবিত্রী গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে, আর সবাই?

ধারে কাছে কেউ নেই।

শুনে সাবিত্রী সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলে, আপনাকে কতবার বলেছি, ও আমাকে সন্দেহ করে। কিছু টের পেয়েছে।

আজ কী বলল?

সাবিত্রী কুঞ্জর দিক থেকে অন্যধারে পাশ ফেরে। বলে, ও জানে।

কুঞ্জর ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় হঠাৎ। বুক জুড়ে একটা বেলুন ফেঁপে ফুলে উঠে তার দম চেপে ধরে।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে, টের পাওয়ার কথা নয়।

সাবিত্রী মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। চোখে জল। একটু ক্ষুব্ধ গলায় বলে, কী করে জানলেন, টের পাওয়ার কথা নয়? আপনি কি কখনও আমাদের গোপন সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছেন? গত চার মাস ও আমাকে ছোঁয়নি।

বজ্রপাতের মতো আবার সেই পপুলারিটি কথাটা মাথার মধ্যে ফেটে পড়ে কুঞ্জর। তার মন অভ্যাসবশে হিসেব করে নেয়, যদি কেষ্ট সন্দেহ করে থাকে, তবে সেটা চাউর করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হাবুর ঝোপড়ায় মদের মুখে স্যাঙাতদের কাছে বলবে না কি আর? বউ আর দাদাকে

জড়িয়ে তামসিক আনন্দ পাবে। যদি কথাটা ছড়ায় তবে কুঞ্জর অনেকখানি চলে যাবে। রেবন্তও কি জানে?

বড় ছটফট করে ওঠে কুঞ্জ। বলে, ছোঁয়নি?

সাবিত্রী চেয়েই ছিল । ধীর স্বরে বলল, কখনও-সখনও চাইত। আমার ইচ্ছে হত না। ঝগড়া করতুম। তখন রাগ করে গুটিয়ে যেত।

সাবিত্রীর এই বোকামিতে হাঁ হয়ে রইল কুঞ্জ। বোকা, জেদি মেয়েটা। খুব হতাশ গলায় কুঞ্জ বলল, তা হলে আর ওর দোষ কী? যদি কথাটা আমাকে আগে বলতে তবে তোমাকে পরামর্শ দিতুম অন্তত এক-আধবার ওকে অ্যালাউ করতে। দোষটা কেটে থাকত।

সাবিত্রী জেদি গলায় বলে, আমার ইচ্ছে হত না। ঘেন্না পেতাম।

কুঞ্জ কাহিল গলায় বলে, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে যে।

সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ক্ষীণ স্বরে বলে, গেলাম তো! কিন্তু সব দোষ কি আমার? আপনার কিছু করার ছিল না?

সাবিত্রীর ওপর এই মুহূর্তে ভারী একটা ঘেন্নার মতো ভাব হল কুঞ্জর। দোষ তোমার নয় তো কার? বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই কেন তুমি আর সবাইকে ছেড়ে সুযোগ পেলেই হাঁ করে দেখতে আমাকে? বাড়ির লোক আমাকে যত্ন করে না বলে কেন অনুযোগ তুলতে সবার কাছে? কেন আমার স্নানের সময় পুকুরঘাটে গেছ? আমার ঘরে গিয়ে সোহাগ করে বিছানা টান করত, আলনা আর টেবিল গোছাত কে? কেষ্টকে মদ ছাড়ানোর চেষ্টা করোনি, রাতে ও না ফিরলে তেমন গা করোনি কখনও! সেসব কেন? যদি স্বামী হিসেবে কেষ্টকে তোমার পছন্দ নয়, তবে বিয়ের আগে নটঘটি করেছিলে কেন? ঠিক কথা, দোষ আমারও। কী করব, আমার যে সেচহীন শুকনো জীবনের চাষ। একটা বয়সের পর পুরুষ চোত মাসের খরার জমি হয়ে যায় জানো না? মেয়েমানুষ হল জলভরা কালো মেঘের মতো। আমার সেই মেঘ কেটে গেছে কবে! তনু বিয়ে করে চলে গেল। শুকনো ড্যাঙা জমি পড়ে ছিলুম। ছিলুম তো ছিলুম। কে তোমাকে মেঘ হয়ে আসতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? চনমন করতে, উচাটন হতে, সম্পর্কের বাঁধন খসিয়ে ফেলতে চাইতে। তোমার চোখমুখ দেখেই জলের মতো বোঝা যেত। আর যত সেটা বুঝতে পারলুম তত আমারও চৈত্রের জমি মেঘ দেখে ফুঁসে উঠল। সেটা দোষ বটে, কিন্তু বিবেচনা করলে, বিশ্লেষণ করলে, তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবে মেঘের ছায়া পড়েছিল বলেই খরার জমি উন্মন হয়েছিল। শরীর জিনিসটা সম্পর্ক মানতে চায় না, সমাজ মানতে চায় না, আগে পরে কী হবে ভাবতে চায় না। বোবা, কালা, অন্ধ, অবিবেচক। যখন জাগে তখন মাতালের মতো জাগে, লন্ডভন্ড করে দিতে চায় সব। হাবুর ঝোপড়ায় একরাতিয়াকে নিয়ে পড়ে থাকত কেষ্ট। তুমি এ ঘরে একা। আমি ও ঘরে একা। মেঘ ডাকত, খরার মাটিও অপেক্ষা করত। তারপর এক ঘোর নিশুত রাতে ছোট্ট করে শেকল নড়ল দরজায়। আমি যেন জানতুম, অবিকল এইভাবেই একদিন নিশুত রাতে শিকল নড়বে। আমি এত নিশ্চিতভাবে জানতুম যে শেকল কে নাড়ল তা জিজ্ঞেসও করিনি। উঠে কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলুম। মনে কোরো না যে ভেসে গিয়েছিলুম, ডুবে গিয়েছিলুম, সুখে ভরে উঠলাম। মোটেই তা নয়। শরীর নিভলে বড় ঘেন্না হয়েছিল নিজের ওপর। সমাজ, সংসার, সম্পর্ক সব বজ্রাঘাতের মতো মাথায় পড়তে লাগল এসে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম, তুমি ভারী সুখী হয়েছ, তৃপ্তি শান্তি আনন্দে ঝলমল করছে মুখ। বলেছিলে, যে মানুষ মস্ত বড় তাকে সব দেওয়া যায়। দোষ হয় না। বলোনি?

কুঞ্জ শুকনো মুখে বলল, কেষ্ট জানে বলছ! কিন্তু লোকটা যে আমিই তা ঠিক পেল কী করে?

সাবিত্রী গভীর বেদনার শব্দ করল একটু। আস্তে করে বলল, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ ব্যথা।

সাদা ঠান্ডা একটা হাত বাড়িয়ে কুঞ্জর হাতখানা ধরল সাবিত্রী। ভারী দুর্বল হাতের সেই ধরাটা যেন শালিখ পাখির পায়ের আঁকড়ের মতো। কুঞ্জর গা সামান্য ঘিনঘিন করে। অশুচি লাগে। ঘরের

কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা কাপড়চোপড়, ন্যাকড়া। ঘরের আঁশটে গন্ধটা যেন আরও ঘুলিয়ে ওঠে হঠাৎ। টুসি গভীর ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করে কী বলে ওঠে। কুঞ্জ হাত ছাড়িয়ে নেয়।

সাবিত্রী ক্লান্ত আধবোজা চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে, আপনার কথা আমিই বলেছি।

তুমি!— কুঞ্জ ভারী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

রোজ জানতে চাইত, আপনিই কি না। পেটে ছেলে এল, অথচ ওর নয়। তবে কার, তা হিসেব করে দেখত । স্বীকার করানোর জন্য মারত। কাল বলে ফেললাম।

তুমি কি পাগল?

সাবিত্রীর ক্ষীণ স্বরে যেন একটু জোয়ার লাগে, পাগল কেন হব? আমার তো সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে। ভাবতে কত সুখ হয়! গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয়, আপনার মতো মানুষ, এত বড় একটা মানুষ, যার এত নামডাক সে কিনা আমাকে এত স্নেহ করে! আমার এত আনন্দ হয়, সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে। কাল মাঝরাতে যখন ও আমাকে গলা টিপে ধরেছিল তখন চোখে চোখ রেখে একটুও ভয় না খেয়ে বলেছিলাম। একটুও ভয় করেনি। বলে এত সুখ হল, গায়ে কাঁটা দিল আনন্দে। ও যখন মারছিল তখন একটুও লাগছিল না। আমি তখনও হাসছিলুম।

আস্তে আস্তে আড়ষ্ট হয়ে যায় কুঞ্জ। ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু হয়। এ যে বদ্ধ বেহেড হয়ে গেছে। এখন যে এ আর কোনও হায়া লজ্জা মানছে না! মাথাটা টলে যায় কুঞ্জর। বিছানার ওপর হাতের ভর রেখে ঝুঁকে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ভূত দেখছে। বলে, কী করলে বলো তো! ছিঃ ছিঃ!

আমি ভয় পাই না। আমার লজ্জা নেই। এত মারল, কত কষ্ট পেলাম দেখুন তবু এখনও মনে হচ্ছে বলে দিয়ে বেশ করেছি।

কুঞ্জ কুঁকড়ে বসে হাঁটুতে থুঁতনি রেখে ক্ষীণ গলায় বলে, শুনে কেষ্ট কী করল?

খুব অবাক হল। সন্দেহ করত বটে কিন্তু আপনার মতো মানুষ এ কাজ করতে পারে তা যেন ওর বিশ্বাস হত না। তাই কথাটা শুনে কেমনধারা ভ্যাবলা হয়ে গেল। মারল আমাকে, কিন্তু কেমন পাগলাটে হয়ে গেল মুখ, মারতে মারতেই কেঁদে ফেলল। তারপর দরজা খুলে পালিয়ে গেল দৌড়ে। ফিরল আজ সন্ধেবেলায়। আবার ধরল আমাকে, বলল, দাদাকে মিথ্যে করে জড়াচ্ছ। দাদা নয়, অন্য কেউ। কে সত্যি করে বলো। আমি তেমনি চোখে চোখ রেখে বললাম। বলল, আমাদের দু'জনকেই খুন করবে। আগে কোনওদিন পেটে মারেনি, আজ মারল।— বলতে বলতে মুখ বালিশে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে সাবিত্রী।

কুঞ্জ অসাড় হয়ে বসে থাকে। পপুলারিটি কথাটা খামচে ধরে মাথা। একনাগাড়ে অনেক কথা বলে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাবিত্রী। থর থর করে কাঁপছিল, ঠোঁট সাদা। লেপ টেনে মুড়ি দিয়ে গভীর ব্যথা-বেদনার শব্দ করে বলল, আমার শরীর বড্ড খারাপ লাগছে। ভীষণ শীত আর কাঁপুনি।

কুঞ্জ টুসিকে ডেকে তোলে। রাঙাকাকি আর মাকে ডেকে আনে।

৬

এতদিনে তবে কি বুড়ো হল পটল? চোখে ছানি আসছে নাকি? একটু আলো লাগলেই চোখ বড় ঝলসে যায় যে আজকাল? নইলে কি রবিকে কুঞ্জ বলে ভুল করত? টর্চের আলোটা এমন বিশাল গোলপানা চক্করের মতো ঝলসে উঠেছিল যে ধাঁধা লেগে গেল। সে ভুলটাও শুধরে নিতে পারত। কিন্তু একটা ফাঁকা আওয়াজে, একটা উটকো লোকের হাঁকাড় শুনে মাথাটা কেন যে ঘেবড়ে গেল

আজ। হাবুর ঘরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে অফুরন্ত হাঁফের টান ভোগ করতে করতে এইসব কথা ভাবে পটল। শ্লেষ্মার পর শ্লেষ্মা উঠে আসছে কাশির সঙ্গে। হরি ডাক্তার মরে গিয়ে অবধি এই শ্লেষ্মার আর চিকিৎসা হল না। বুকের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে শ্বাসের কষ্ট। এরপর কি মরবে পটল? ঝাড়গ্রামে মামাশ্বশুর সস্তায় একটা কলাবাগান বেচে দিচ্ছে। পটলের বড় ইচ্ছে, বাগানটা কেনে। মরবার আগে ছেলেপুলে সহ বউ বাসন্তীকে ঝাড়গ্রামে বসিয়ে যেতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। বাসন্তীর ব্যাবসার মাথা আছে, কলা বেচে ঠিক সংসার চালিয়ে নেবে। আজ কুঞ্জকে খুন করতে পারলে রেবন্তবাবু বাগান কেনার টাকা দেবে, কথা ছিল। খুন পটলের কাছে নতুন জিনিস তো নয়। পলিটিক্সয়ালাদের হয়ে, জোত-মালিকের হয়ে, হরেক কারবারির হয়ে নানান রকম মানুষ মেরেছে সে। সেজন্য বড় একটা আফসোসও নেই তার। মশা মাছি, পাঁঠা ছাগল মারলে যদি পাপ না হয় তবে মানুষ মারলেও হয় না। আর যদি পাপ হয়ই তবে পাঁঠা-ছাগল মারলে যতটা হয় তার বেশি হয় না। এ তত্ত্ব পটল অনেক ভেবে ঠিক পেয়েছে। কিন্তু এখন তার সন্দেহ হয়, সত্যিকারের বুড়ো হল নাকি সে? ছানি আসছে চোখে? মাথাটা কাজের সময় ঠিক থাকছে না কেন? এমন হলে লাশটা ফেলতে পারবে না পটল, আর যদি না ফেলতে পারে তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা যে হাতছাড়া হয়ে যাবে! রেবন্তবাবু দায়ে দফায় অনেক দেখেছে তাকে, তার এই কাজটুকু করে যে দিতেই হয় পটলকে! ভাবছে আর কাশছে পটল। হাবুর দেওয়া বড় মাটির ভাঁড়টা ভরে উঠল শ্লেষ্মায়। বড় শ্বাসের কষ্ট।

চ্যাটাইয়ের অন্যধারে বসে কালিদাস তাড়ি টানছিল খুব। মাথাটা টলমলে হয়ে এসেছে। মিটি-মিটি হাসছে আর পটলের দিকে চাইছে। বিড়বিড় করে বলছে, হোমিয়োর কী গুণ বাবা! নিজের চোখে দেখলুম তো! কুঞ্জ ওই অত দূরে থাকতে পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধ খেল, আর সেই ওষুধের গুণে একশো হাত দূরে পটলার চোখে ধাঁধা লেগে গেল! শুধু তাই? হোমিয়োর গুণেই না কুঞ্জ আগেভাগে জানতে পেরেছিল যে আজ সে খুন হবে! তাই না এক বকরাক্ষসকে জুটিয়ে এনেছিল সঙ্গে। কী চেঁচাল বাবা মুশকো লোকটা! কাঁচা খেয়ে ফেলত ধরতে পারলে। পটল যে পটল সেও ভয় খেয়ে পালায় না হলে? রেবন্তবাবুও ঘাবড়ে গেছে খুব। এই জল-ঝড়ের মধ্যেই লেজ গুটিয়ে পালাল।

নারকোল বাগানের বাইরে আসতেই ধারালো বৃষ্টি ছেঁকে ধরল রেবন্তকে। পাথুরে ঠান্ডা জল। দমফাটা হুমো বাতাস খোলা মাঠের মধ্যে তাকে এলোমেলো ঘাড়ধাক্কা দিতে থাকে। দেয়ালের মতো নিরেট অন্ধকার চারদিকে, এক লহমায় ভিজে গেল রেবন্ত। গায়ের সোয়েটার, জামা গেঞ্জি ফুঁড়ে জল ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। বৃষ্টি বাতাস আর মাঠে জমা জল ঠেলে জোরে হাঁটা যায় না। তবু প্রাণপণে হাঁটে রেবন্ত। শীতে ঠকঠক করে কাঁপে সে। দুটো কানে বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝোড়ো বাতাস হাড়-পাঁজরায় ঢুকে প্রাণটুকু শুষে নিচ্ছে। তবু সে পিছন ফিরে একবার দেখে নিল, ছায়া দুটো পিছু নিয়েছে কি না, ওই দু'জনের কাছ থেকে এখন তাকে যতদূর সম্ভব তফাত হতে হবে।

শরীর অবশ করে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা আর কাঁপুনি ধরে গেল। কানের যন্ত্রণাটা মাথাময় ভোমরার ডাক ডাকতে থাকে, চিন্তার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। এই অবস্থায় কীভাবে সে শ্যামপুর পৌঁছল সেটা সে নিজেও ভাল বলতে পারবে না।

আবছা মনে পড়ে, বাজারে তেজেনের দোকান থেকে নিজের সাইকেলটা নেওয়ার সময় তেজেন বলেছিল, পাগল নাকি? এ ভাবে যেতে পারে মানুষ! থেকে যাও।

রেবন্ত কথাটা কানে নেয়নি, অন্ধকারে বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে সে প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়েছিল। কয়েকবার সাইকেল হড়কে পড়ে গেল। চাকার রিমে টাল খেয়েছে। চালানোর সময়

ফর্কের সঙ্গে টায়ার ঘষা খাচ্ছিল খ্যাস খ্যাস করে। জোরে চলতে চাইছিল না। তবু পৌঁছেও গেল রেবন্ত।

শ্যামশ্রীর সামনে কোনওদিন কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করে না, আজও করল না। যখন উত্তরের দালানের বারান্দায় সাইকেলটা হিঁচড়ে তুলল তখন তার শরীর আপনা থেকেই টলে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয়। স্রেফ মনের জোরে খাড়া রইল সে। গামছায় শরীর মুছল, জামাকাপড় পালটাল। মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে চোখ আর নাক দিয়ে অবিরল জল ঝরছে। প্রবল হাঁচি দিল কয়েকটা।

শ্যামশ্রী মুখে কিছু বলছিল না বটে, কিন্তু দরজা খুলবার পর থেকেই একদৃষ্টে লক্ষ করছিল তাকে। ছাড়া জামাকাপড়গুলোর জল নিংড়ে দড়িতে মেলে দিয়ে এল শ্যামশ্রী। নীরবে শুকনো জামাকাপড় সোয়েটার এগিয়ে দিল। রেবন্তর গা আর জামাকাপড় থেকে জল ঝরে মেঝেয় গড়িয়ে যাচ্ছিল, নিজে হাতে চট নিয়ে এসে তা চাপাও দিল শ্যামশ্রী। অস্ফুট স্বরে একবার বলল, ছাদের ঘরে এখন যেয়ো না, ঠান্ডা, কিছুক্ষণ এখানেই শুয়ে থাকো লেপ গায়ে দিয়ে।

মাসখানেকের বেশি হল, নীচের শোওয়ার ঘরে শ্যামশ্রীর সঙ্গে শোয় না রেবন্ত। ছাদে একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে শোয়। শ্যামশ্রীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্কও তার নেই বেশ কিছুদিন। কথাবার্তাও প্রায় হয়ই না।

রেবন্ত শ্যামশ্রীর কথার জবাব দিল না, কিন্তু ওর খাটের নরম বিছানায় গিয়ে বসল। ভাঁজ করা লেপটাও টেনে নিয়ে যথাসাধ্য মুড়ি দিল গায়ে। মাথা আর কান জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সহ্য করতে লাগল চোখ বুজে।

শ্যামশ্রী হয়তো বুঝতে পারল রেবন্তর অবস্থা ভাল নয়। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। একটু বাদে একটা বড় কাচের গ্লাস ভর্তি আদা-চা নিয়ে এল, সঙ্গে মুড়ি, আলুভাজা আর লঙ্কা।

গরম চা পেটে যাওয়ার পর আচ্ছন্নভাবটা কিছু কাটে। কিন্তু স্বাভাবিক বোধ করে না রেবন্ত। ভেতরে একটা ভয়ংকর অস্থিরতা।

নকশাল আমলে এ অঞ্চলে খুনখারাবি হতে পারেনি। পাঁচটা-সাতটা গাঁ জুড়ে তৈরি হয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনী। এ সব কাজে সবচেয়ে বেশি জান লড়িয়েছিল কুঞ্জই। সে ছিল অস্ত্রহীন সেনাপতি। প্রাণের দায়ে পুলিশ কুঞ্জকে সাহায্য করেছে। তখন কুঞ্জর ছায়া হয়ে ফিরত রেবন্ত। রাত জেগে সাইকেলে ঘুরে গাঁয়ের পর গাঁ চৌকি দিত দু'জনে। কুঞ্জ বুকের দোষ বলে নিজে সাইকেল চালাত না। তাকে সামনের রডে বসিয়ে নিয়ে চালাত রেবন্ত। সাইকেলেই দু'জনের রাজ্যের কথা হত। হৃদয়ের কত গভীর কথা সে সব! স্বর্গরাজ্য তৈরি করার কত অবাস্তব স্বপ্ন! কুঞ্জ কখনও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে চাইত না। অসম্ভব চাপা ছিল। কিন্তু একদিন মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় খাড়ুবেড়ের মোড় থেকে বেলপুকুর ফিরবার পথে সাইকেলের রডে বসে দুর্বল মুহূর্তে কেঠো স্বভাবের কুঞ্জও বলে ফেলেছিল তনুর কথা। রাজুর বোন তনু। আর কাউকে কখনও বলেনি কুঞ্জ, বিশ্বাস করে শুধু তাকেই বলেছিল।

সেই বিশ্বাসটা আর অবশ্য নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর তারা দু'জনে গিয়েছিল যশোর অবধি। তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তখন ছিল প্রবলতম, কিন্তু সেইটেই আবার ছিল বিচ্ছেদেরও পূর্বাভাস। যশোরযাত্রাই ছিল তাদের বন্ধুত্বেরও শেষ যাত্রা! মুক্তিযুদ্ধের পরই ইলেকশন। কংগ্রেসের হয়ে নমিনেশন পাওয়ার আশায় কুঞ্জ লড়ে গেল নানুর সঙ্গে। পারল না। পারার কথাই নয়। কুঞ্জ এ অঞ্চলের জন্য অনেক করেছে বটে, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে বিধানসভায় দাঁড়ানোর ক্ষমতাও তার এসে গেছে। সেই প্রথম রেবন্ত চটেছিল কুঞ্জর ওপর। বোকার মতোই কুঞ্জ দাঁড়াল নির্দল হয়ে। রেবন্ত খাটতে লাগল নানুর জন্য। পাঁচ-সাতটা গাঁয়ে কুঞ্জর প্রভাব বেশি, নানু পাত্তা পাবে না। কিন্তু তখন নানু হারলে দলের বেইজ্জত! নিছক জোর ছাড়া গতি ছিল না। এমনিতেই হয়তো নানু জিতত, তবু সন্দেহের অবকাশ না রাখতে রেবন্তরা বুথ দখল করল ভোটের দিন ভোরবেলায়। তখন

থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। কুঞ্জর পোলিং এজেন্ট বেলপুকুর কলেজে মার খায়। যারা মেরেছিল তাদের মধ্যে রেবন্ত ছিল। তখন রেবন্ত দরকার হলে কুঞ্জকেও মারতে পারত।

সে যাত্রা কুঞ্জ জেতেনি। ইলেকশনের পর আবার ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর। তবে কুঞ্জ আর দলে ফেরেনি। অন্য দলে ভিড়েছে। কিন্তু আজও ঝিমিয়ে যায়নি। সব সময় কিছু না কিছু করছে। দল পাকাচ্ছে, চাঁদা তুলছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, সাহায্য বা ত্রাণের কাজ করছে।

শ্যামপুরে রেবন্তদের পরিবারের প্রতাপ খুব। নামে-বেনামে তাদের বিস্তর জমি, চালের কল, বাগনানে তাদের মস্ত কাপড়ের দোকান। রেবন্তকে কাজ-কর্ম করতে হয় না। বি এসসি পাশ করে সে বহুদিন শুয়ে বসে আর পলিটিক্স করে কাটাচ্ছিল। তাঁতপুরে একটা ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করত। অলস মাথায় শয়তানের বাসা। রোজ বিকেলের দিকে একটু নেশা করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। বেলপুকুর বাজারের পিছনে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ভিতর দিকে নির্জন জায়গায় হাবুর ঝোপড়া হল নেশার আস্তানা।

কিছু বদমাশ লোক হাবুর বউয়ের নামই দিয়েছিল একরাতিয়া। আসল নাম একরত্তি। মা-বাপের আদর করে রাখা সেই নাম একরত্তি এখন বদমাশদের মুখে একরাতিয়া। অর্থাৎ এক রাতের মেয়েমানুষ। একরাতিয়া দেখতে এমন কিছু নয়। স্বাস্থ্যটা ভাল। ছেলেপুলে নেই। কিছুটা হাবুর লোভানিতে, কিছুটা একঘেয়েমি কাটাতে রেবন্ত সেই ফাঁদে পা দেয়।

একদিন রাত্রে যখন রেবন্ত ঝোপড়ার ভিতরের খুপরিতে একরাতিয়ার সঙ্গে ছিল তখন ঝাঁপ ঠেলে টর্চ হাতে আচমকা ঢুকল কুঞ্জ। তার পিছনে জনা পাঁচ-সাত ছেলে-ছোকরা সমাজরক্ষী। কুঞ্জ অবশ্য টর্চটা পট করে নিবিয়ে ঝাপটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। বলেছিল, পালিয়ে যা সামনের ঘর দিয়ে। আর কখনও আসিস না।

রেবন্ত পালিয়েছিল। তারপর লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থেকেছিল কয়েকদিন। সামাজিক নোংরামি বন্ধ করতে কুঞ্জ তখন নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে দলবল নিয়ে। যত অকাজের কাজ। কয়েকদিন বাদে একদিন শ্যামপুরে এসে রেবন্তর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বলল, সত্যবাবুর বড় মেয়েটি ভাল। তোদের স্বঘর।

রেবন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না লজ্জায়। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিল এটা ব্ল্যাকমেল। প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু কুঞ্জর উসকানিতে তার বাবা মা আর কাকারা বিয়ের জন্য পিছনে লাগল। পারিবারিক চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা তাকে করতে হয়।

বিয়েটা পুরুষের জীবনের কী সাংঘাতিক গুরুতর ব্যাপার তা আগে জানত না রেবন্ত। বিয়ের পর হাড়ে হাড়ে জানল। বিয়ের আসরে দানসামগ্রীর মধ্যে একটা চরকা দেখে বরযাত্রীরা কিছু ঠাট্টা-রসিকতা করেছিল। সে তেমন কিছু নয়। কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের সময় রেবন্ত টের পেল তার করতলে শ্যামশ্রীর হাত শক্ত, ঘোমটার মধ্যে মুখখানা গোঁজ। বিদ্রোহের সেই শুরু। রেবন্তকে শ্যামশ্রী বহুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে কালচারের দিক দিয়ে তার যোগ্য বর রেবন্ত নয়। এ কথা আরও নানা জনেও কানাঘুঁষো করে। একদিন এক বকারাজ খুড়শ্বশুর কলকাতা থেকে এসে সব দেখেশুনে মুখের ওপরেই তাকে বলেছিল, সত্যদা কলকাতায় থাকলে এ বিয়ের কথা ভাবতেই পারত না। গাঁ-ঘরে কি শ্যামাকে মানায়?

আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেল রেবন্তও। শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়। সত্যিকারের ঢলঢলে চেহারা। মস্ত মস্ত গভীর চোখ। ভারী নরম তার চলাফেরা, কথাবার্তা, কিন্তু ওই নরম চেহারার ভিতরকার স্বভাবটি অহংকারী, জেদি, নিষ্ঠুর। বিয়ের পর থেকেই এক ঘরের মধ্যে তারা দু'জন জন্মশত্রুর মতো এ ওকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজত। এখন আক্রমণ নেই। নিরুত্তাপ বিরাগ রয়েছে।

এ বাড়ির কারও সঙ্গেই শ্যামশ্রীর তেমন বনিবনা নেই, তবে সে এত গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বময়ী যে

কেউ তাকে বড় একটা ঘাঁটাতে সাহসও করে না। উঁচু গলায় শ্যামশ্রী বড় একটা কথা বলে না। তার তেজ রাগ সব ঠান্ডা ধরনের। সকালে উঠে সে রোজ চরকা কাটে, গাঁধীর বাণী পড়ে। এগুলো ওর সত্যিকারের ব্যাপার, না কি বিদ্রোহের প্রকাশ তা জানে না রেবন্ত। সে নিজে কিছু রাজনীতি করেছে বটে তবে কোনও আদর্শই তার ভিতরে গভীর হয়ে বসেনি। তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই। নিজের চারপাশেও সে বরাবর তার নিজের মতো লোকজনকেই দেখেছে। তাদের কারওরই কোনও নেতার প্রতি অবিচল ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসও নেই। তাই শ্যামশ্রীকে দেখে তার অসহ্য লাগে। গাঁধী কেন চরকা কাটতেন বা গাঁধী কী বলে গেছেন তা কখনও অনুসন্ধান করে দেখেনি রেবন্ত। সে শুধু জানে গাঁধী অহিংসবাদী ছিলেন, অসহযোগ আর ভারত ছাড়ো আন্দোলন করেছিলেন, লোককে চরকা কাটতে বলতেন, এর বেশি জানার আগ্রহ রেবন্তর নেই। উপরন্তু এখন শ্যামশ্রীর জন্যই গাঁধীকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করতে শুরু করেছে।

বিয়ের পর শ্যামশ্রীকে সে পায়নি বটে, কিন্তু পেয়েছে বনাকে। যতবার সে বনাকে দেখে ততবার মনে হয়, এই বনা তো আমার জন্যই জন্মেছিল। বনশ্রীর কথা মনে পড়লেই তার ভিতরকার অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর, মনপ্রাণ জেগে ওঠে। একাগ্র হয়ে ওঠে সে।

বড় গোপন কথা। কোনওদিন বনশ্রীকে সে কিছু বুঝতে দেয়নি, কখনও লঙ্ঘন করেনি সম্পর্কের নিয়ম। শুধু তার মন জানে। যা অন্তরে গোপন করা যায় তাই বেড়ে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে তত তার মন ভরে ওঠে বনশ্রীতে। কখনও পাগল-পাগল লাগে। অসহায় আবেগে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনশ্রীকে চিন্তা করে। মনে মনে জিয়ন্ত করে তোলে তাকে। তারপর ভালবাসার কথা বলে পাগলের মতো।

এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আবার সে যাওয়া শুরু করেছিল হাবুর ঝোপড়ায়। একরাতিয়ার সঙ্গে আবার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এখন আর সে লোক-লজ্জার ভয়ও পায় না। ভারী বেপরোয়া লাগে নিজেকে। শ্যামশ্রী তার জীবনটা নষ্ট করেছে, এবং বনশ্রীকে সে হয়তো কোনওদিনই পাবে না। তবে আর ভয় কীসের, ভাবনাই বা কী? কুঞ্জর সমাজরক্ষী দল স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে গেছে। এখন আর কেউ হামলা করে না। হাবুর ঝোপড়ায় মাইফেল জমেছে খুব। এমনকী কুঞ্জর নিজের ভাই কেষ্টও এখন হাবুর ঝোপড়ায় রোজকার খদ্দের।

বনশ্রীর কথা আর কেউ না জানুক, একদিন জেনে গেল কুঞ্জ। মাতাল অবস্থায় তাকে সেদিন তুলে এনেছিল কুঞ্জ। রিকশায় তাকে পাশে নিয়ে বসে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল রাতের বেলায়। এ সব করাই তো কুঞ্জর কাজ। মহৎ হওয়ার বড় নেশা ওর। আর সেই দিন রিকশায় ফাঁকা রাস্তায় কুঞ্জকে বহু দিন পরে একা পেয়ে রেবন্ত সামলাতে পারেনি নিজেকে। শ্যামশ্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ, সেই আক্রোশ শীতের সাপের মতো ঘুমিয়ে থাকে তার মনের মধ্যে। কুঞ্জকে পেয়ে ফুঁসে উঠল। দুর্বল হাতে কুঞ্জর জামার গলা চেপে ধরে সে বলল, কেন আমার সর্বনাশ করলি হারামি? কে তোকে দালালি করতে বলেছিল?

বার বার এই প্রশ্ন করে যাচ্ছিল সে। পারলে সেদিনই খুন করত কুঞ্জকে। কিন্তু ঠান্ডা গলায় কুঞ্জ তাকে নানা উপদেশ দিচ্ছিল। ভাল হতে বলছিল, যেমন সবাই বলে। কুঞ্জকে রিকশা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল রেবন্ত বার বার। বলেছিল, কে তোকে শ্যামার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছিল? আমি তো বনাকে ভালবাসি, আমি বনাকে ভালবাসি। শ্যামশ্রীকে খুন করে আমি বনশ্রীকে বিয়ে করব।

মাতাল অবস্থায় কী বলেছিল তা মনে ছিল না রেবন্তর। কিন্তু পরদিন সকালে কুঞ্জই এল। নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে থমথমে মুখে বলল, বনশ্রীর সঙ্গে তোর কোনও খারাপ সম্পর্ক নেই তো?

আতঙ্কে সাদা হয়ে গিয়েছিল রেবন্ত। ঘোলাটে স্মৃতি ভেদ করে গত রাত্রির কথা কিছু মনে

পড়েছিল তার। সে হাবুর ঝোপড়ায় গিয়ে মদ খায় বা একরাতিয়ার সঙ্গে শোয়, এ কথা লোকে জানলেও সে আর পরোয়া করে না। কিন্তু বনশ্রীর কথা সে কোনও পাখি-পতঙ্গের কাছেও প্রকাশ করতে পারবে না যে। কী করবে ভেবে না পেয়ে রেবন্তর মাথা গুলিয়ে গেল। ঝুপ করে কুঞ্জর দু'হাত ধরে বলল, না, না। দোহাই, বিশ্বাস কর।

কুঞ্জ বিশ্বাস করেনি। অত বোকা সে নয়। কিন্তু মুখে বলেওনি কিছু। শুধু কেমনধারা শুকনো হেসেছিল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, বনশ্রী বড় ভাল মেয়ে। নষ্ট করিস না।

তারপর থেকে কুঞ্জ এখন প্রাণপণে বনশ্রীর জন্য ভাল ভাল সম্বন্ধ জোগাড় করছে। বিয়ে হয়েও যেত এতদিনে। কিন্তু বড় মেয়ের বিয়েটা সুখের হয়নি বলে বনশ্রীর মা বাবা চট করে কোনও জায়গায় মত দিতে দ্বিধা করছেন। এবার একটু ভাল করে দেখেশুনে বিয়ে দেবেন ওঁরা।

রেবন্ত জানে, কুঞ্জ কখনও বনশ্রী সম্পর্কে তার মনের কথা কাউকে জানাবে না। মরে গেলেও না। সে স্বভাব কুঞ্জর নয়। কিন্তু রেবন্তর তবু বুকে জ্বলুনিটা যায় না। কুঞ্জ তো জানে। জেনে গেছে। পৃথিবীর একটা লোক তো জানল!

ইদানীং কুঞ্জর আর এক কাজ হয়েছে। কে তার মাথায় ঢুকিয়েছে বে-আইনি জমি ধরতে হবে। সেই থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে পাগলের মতো ঘোরে সে। বাগনান হাওড়া আর কলকাতার কাছারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলিল-দস্তাবেজের খোঁজখবর নেয়, নকল বের করে। বি ডি ও থেকে শুরু করে মহকুমা হাকিম, ল্যান্ড সেটেলমেন্ট থেকে থানা, কোথায় কোথায় না হন্যে হয়ে হানা দিচ্ছে সে? যে ব্যাপারে হাত দেয় তাতেই ওর রোখ চাপে। আগুপিছু ভাবে না।

জমির স্বত্ব মানুষের কাছে কী সাংঘাতিক তা যে জানে না কুঞ্জ এমন নয়। সরকার বাড়তি জমি ছাড়তে বললেই লোকে ছাড়ে কখনও? তবে তো সরকার একদিন এও বলতে পারে, বাড়তি ছেলেপুলে বিলিয়ে দাও।

কুঞ্জ বিপদটা বুঝেও বোঝেনি। এই জমি উদ্ধারের জন্য সে আর একবার খুন হতে হতে বেঁচে যায় বরাত জোরে। তবু বোঝেনি। রেবন্ত জানে গোটা এলাকা জুড়ে এখন সযত্নে একটি স্টেজ তৈরি হয়ে রয়েছে, যে স্টেজে কুঞ্জর জীবনের শেষ দৃশ্যটার অভিনয় হবে। আজ বেঁচে গেল বটে, কিন্তু রোজ কি বাঁচবে? তার দিন ঘনিয়ে এল। তার জন্য টাকা খাটছে, পাকা মাথার লোক রয়েছে পিছনে। এও ঠিক হয়ে আছে, কুঞ্জ মরলে পুলিশ তদন্ত করবে পলিটিক্যাল লাইন ধরে। যে কোনও দলের ঘাড়ে দোষটা চাপানো হবে। দল থেকে প্রতিবাদ উঠবে। হই-চই হবে কিছুদিন। তারপর থিতিয়ে পড়বে। কুঞ্জ মরবেই। রেবন্ত, পটল বা কালিদাসের হাতে যদি নাও মরে তবু কারও না কারও হাতে মরতেই হবে। নানা জায়গায় লোক লাগানো আছে। শুধু ইশারার অপেক্ষা। কিন্তু সেজন্য কুঞ্জকে খুন করতে চায়নি রেবন্ত। কুঞ্জ যাই করুক ওকে সত্যিকারের ঘেন্না করতে পারেনি সে কোনওদিন। ঘেন্না না হলে, খুনে রাগ না উঠলে কি মারা যায়? সেই অভাবটুকু এতদিন ছিল। আজ আর নেই। আপন মনে রেবন্ত একটু হাসে। কুঞ্জ, তোর সঙ্গে আর পাঁচজনের তফাত রইল না। তুই আর আমার চেয়ে মহৎ নোস। সাবিত্রীর কথা আমি জানি।

বাইরে একটা দমকা হাওয়া দিল। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেলটা ঘড়াং করে পড়ে গেল। একটা চাকা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে রেবন্ত। খুবই দামি সাইকেল। বিয়ের পাওয়া জিনিস। কিন্তু উঠল না সে। কানের যন্ত্রণায় অস্থির রেবন্ত লেপমুড়ি দিয়ে বোম হয়ে বসেই রইল। শ্যামশ্রী ঘরে নেই, কিন্তু চারদিকে তারই জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিয়ের সময় শ্যামশ্রীদের বাড়ি থেকে অনেক জিনিস আদায় করা হয়েছিল। এ ঘরে খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এমনকী পাপোষটা পর্যন্ত ওদের দেওয়া। ভেবে হঠাৎ গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে রেবন্তর। লেপটা ফেলে উঠে পড়ে বিছানা থেকে। আজকাল শ্বশুরবাড়ির জিনিসগুলোতে পর্যন্ত সে ঘেন্না পায়। সেই ঘেন্নায় এ ঘরে থাকার পাটই তুলে দিয়েছে।

ছাদের ঘরে যাবে বলে রেবন্ত বাইরের বারান্দার দিকে দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল শ্যামশ্রী ভিতরে দরদালানের দিককার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদৃষ্টে দেখছে তাকে।

রেবন্ত যথাসম্ভব তেতো গলায় বলে, আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

শীতল কঠিন একরকম গলায় শ্যামশ্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?

রেবন্ত শ্যামশ্রীর চোখ থেকে চট করে চোখ সরিয়ে নেয়। বলে, হ্যাঁ।

পুরুষদের শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাওয়া ঠিক নয়।

শুনে রেবন্ত জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে মুখ ঘুরিয়ে বলে, কেন, কোনও অসুবিধে হয়েছে নাকি?

শ্যামশ্রী বড় বড় চোখে অনুত্তেজিত স্বরে বলে, হয়। শুভ এসেছিল তোমার আমার ঝগড়া হয়েছে কি না তা জানতে। আমি চাই না, আমার বাপের বাড়ির লোকেরা কোনও কিছু সন্দেহ করুক। তোমার হাবভাব দেখে ওরা আজ নাকি ভেবেছে যে তুমি বাড়ি থেকে ঝগড়া করে গেছ।

মনে মনে বড় অসহায় হয়ে পড়ে রেবন্ত। শ্বশুরবাড়ি! শ্বশুরবাড়ি বলে সে সেখানে যায় নাকি? সে তো যায় বনার কাছে। না গিয়ে সে থাকবে কেমন করে? তার জীবনের একমাত্র খোলা জানালা, একমাত্র ডানায় ভর দেওয়া মুক্তি ওই বনা। বনার কাছে সে যাবে না? মুখে সে শুধু বলল, ও।

শ্যামশ্রী মৃদুস্বরে বলল, আর যেয়ো না। আমার ছোট ভাইবোনেরাও এখন বুঝতে শিখছে। তারা টের পায়।

শিউরে উঠে রেবন্ত কূট সন্দেহে বলে, কী টের পায়?

শ্যামশ্রী তেমনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, আমাদের সম্পর্কটা।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেবন্ত, শ্যামশ্রীর এই কথায় সহজ হল। বলল, টের পেলেও কিছু যায় আসে না।

তোমার যায় আসে না জানি। কিন্তু তোমার মতো গায়ের চামড়া তো সকলের পুরু নয়। আমার যায় আসে। জামাই হয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঘন ঘন যাবেই বা কেন? তোমার লজ্জা হয় না?— এ সব কথা খুবই শান্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলল শ্যামশ্রী। যেন বিশ্লেষণ করছে, বোঝাচ্ছে, জানতে চাইছে। শিক্ষয়িত্রীর মতো ভঙ্গিতে।

অনেক দিনের গভীর আক্রোশ জমে জমে তাল পাকিয়ে আছে রেবন্তর ভিতরে। বনার প্রতি গোপন ভালবাসা, কুঞ্জর প্রতি আক্রোশ, শ্যামশ্রীর প্রতি ঘৃণা। সে একদম স্বাভাবিক নেই। কান মাথা জুড়ে তীব্র যন্ত্রণা ফেটে পড়ছে। বাইরে চলমান হাওয়ায় সাইকেলের চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে অবিরল। ফ্রি হুইলের কির কির শব্দ আসছে।

শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে ভিতরে আক্রোশের পিণ্ডটা বোমার মতো ফাটল। তার ভেতরে একটা রাগে উন্মাদ পাগল চেঁচাল, প্রতিশোধ নাও, প্রত্যাঘাত করো।

দাঁতে দাঁত ঘষল রেবন্ত। সন্ধেবেলা কুঞ্জকে খুন করতে গিয়ে পারেনি, এখন সেই আক্রোশটা তার সমস্ত শরীরকে জাগিয়ে তোলে। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়, লন্ডভন্ড করে দাও ওকে। শেষ করে দাও।

শ্যামশ্রী ঘরের মাঝখানটায় ভাল মানুষের মতো অবাক চোখে চেয়ে দেখছিল রেবন্তকে। রেবন্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। মারবে? মারুক। শ্যামশ্রী মারকে ভয় খায় না। গাঁধীজিও কি মার খাননি? শ্যামশ্রী এক পাও নড়ল না।

রেবন্ত সামনে এসে দু' হাতে খামচে ধরল তার কাঁধ। তীব্র গরম শ্বাস মুখে ফেলে বলল, তুমি আমাকে শেখাবে?

বলে একটা ঝাঁকুনি দিল শরীরে। শ্যামশ্রী শরীর শক্ত করে বলল, দরকার হলে শেখাব। চোখ রাঙিয়ো না, আমি তোমাকে ভয় পাই না।

পাও না?— এক অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে অবাক গলায় বলে রেবন্ত। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়, ছিঁড়ে নাও পোশাক। মারো। ধর্ষণ করো। শেষ করো।

শ্যামশ্রীর আঁচল খসে পড়েছিল। বড় বড় চোখে ভয়হীন ঘৃণায় সে দেখে রেবন্তকে। রেবন্তও দেখে ওই নরম চেহারার অহংকারী জেদি মেয়েটাকে।

কয়েক পলক তারা এরকম রইল। তারপরই রেবন্ত হঠাৎ শ্যামশ্রীর সবুজ উলের ব্লাউজের বড় বড় বোতামগুলো হিংস্র আঙুলে খুলে ফেলতে লাগল।

প্রাণপণে বাধা দিল শ্যামশ্রী। দু' হাতে ঠেকাচ্ছে রেবন্তর হাত, বলছে, কী করছ! ছাড়ো, ছাড়ো।

প্রবল ঘৃণা, আক্রোশ আর ভীষণ খুন করার ইচ্ছেয় পাগল রেবন্ত একটা চড় কষাল শ্যামশ্রীর গালে। চাপা গলায় বলল, চুপ। খুন করে ফেলব।

শ্যামশ্রী কী করবে! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার সব আবরণ খসিয়ে ফেলে রেবন্ত। প্রায় হিঁচড়ে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে ফেলে বিছানায়। চুলের মুঠি চেপে ধরে শুইয়ে দেয়। তারপর কামড়ে ধরে ঠোঁট। দাঁতে চিবিয়ে রক্তাক্ত করে দিতে থাকে। দাঁত বসায় গাল, স্তনে, গলায়। প্রবল ব্যথায় গোঙাতে থাকে শ্যামশ্রী। চেঁচায় না। দরদালানের দরজা এখনও খোলা। চেঁচালে কেউ এসে পড়বে। তাই ভয়ে, আতঙ্কে, লজ্জায় যতদূর সম্ভব নীরবে সহ্য করার চেষ্টা করে।

রেবন্ত নয়, যেন ন্যাংটো এক পাগল হামলে পড়ে তার ওপর। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে থাকে। শ্যামশ্রী বুঝতে পারে, রেবন্তর শরীরের ভিতর থেকে যে কাঁপুনি উঠে এসে তাকেও কাঁপাচ্ছে তা ঠিক দেহমিলনের উত্তেজনা নয়, প্রেম নয়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ প্রতিশোধ নিচ্ছে মাত্র। এ হল ধর্ষণ, বলাৎকার।

শান্ত, সংযত, পাথরের মতো শক্ত শ্যামশ্রীকে প্রবল হাতে পায়ে দাঁতে থেঁতলে নিষ্পেষিত করে, নিংড়ে নিতে থাকে রেবন্ত। একদম ছোটলোক বর্বরের মতো হতে পেরে সে তীব্র আনন্দ পায়। এই শাস্তি বহু দিন হল পাওনা হয়েছে শ্যামশ্রীর। দাঁতে দাঁত চেপে আছে শ্যামশ্রী, চোখ ঊর্ধ্বমুখী, শরীর দিয়ে খানিকক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে সব। ওর মুখে গরম শ্বাস ফেলে চাপা গলায় রেবন্ত মাঝে মাঝে হুংকার দেয়, চুপ! খুন! খুন করে ফেলব। একবার অস্ফুট স্বরে শ্যামশ্রী বলেছিল, তাই করো। এর চেয়ে সেটা ভাল। রেবন্ত তক্ষুনি কনুই দিয়ে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে ওর মুখ।

দরদালানের দরজা হাট করে খোলা। বাইরের বারান্দায় প্রবল বাতাসে কিরকির করে ঘুরে যাচ্ছে সাইকেলের চাকা।

শ্যামশ্রীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে যখন উঠে বসল রেবন্ত তখন অবসাদে সে টলছে। তবু কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এসেছে তার। উঠে গিয়ে দরদালানের খোলা দরজা বন্ধ করে খিল দিল। বিছানার দিকে চেয়ে সে দেখল, শ্যামশ্রী তার শরীর ঢাকা দেয়নি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফোঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অমানুষিক গলায় গোঙানির শব্দ করছে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন কী করবে ভেবে পেল না রেবন্ত। কাউকে ডাকবে? পরমুহূর্তেই মনটা কঠিন হয়ে গেল তার। এইটেই তো সে চেয়েছিল। ঠিক এইভাবে বর্বরের মতো ওকে ধ্বংস করতে।

রেবন্ত বাইরের বারান্দার দরজা খুলল। মুখ ফিরিয়ে হিংস্র গলায় বলল, আমি যাচ্ছি। দরজাটা দিয়ে দাও।

বলতে বলতেই সে লক্ষ করে বিছানার গোলাপি ঢাকনায় রক্তের ফোঁটা পড়েছে অনেক। শ্যামশ্রীর মুখের ওপর এলো চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে। গভীর যন্ত্রণায় গুমরে মুখটা ফেরাতেই দেখা গেল তার রক্তাক্ত ঠোঁটে, গালে গভীর ক্ষত। স্থির চোখে আরও একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত ওর বুকে আর কাঁধে তার নিজের দাঁতের কামড়ে ফুলে ওঠা চাকা চাকা দাগও দেখতে পায়।

রেবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না। তার মনে হল, সে চলে গেলেও শ্যামশ্রী উঠবে না।

ঢাকবে না নিজেকে। ঠিক ওইভাবেই পড়ে থাকবে, যাতে বাড়ির লোক এসে তাকে দেখতে পায়। যদি দেখতে পায় তবে রেবন্তর কীর্তির কথাটা চাউর হয়ে যাবে। শ্যামশ্রীর গায়ের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন সাক্ষ্য দেবে তার বর্বরতার। শ্যামশ্রী ঠিক তাই চাইবে।

খাটের কাছে গিয়ে রেবন্ত লেপটা টেনে শ্যামশ্রীর শরীরটা ঢেকে দিল। স্থির দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল একটু, তারপর বলল, আমি যাচ্ছি।

জবাব নেই। শুধু গুমরে ওঠার শব্দ হয়। কান্নার একটা ঝলক তরঙ্গের মতো বয়ে যায় শ্যামশ্রীর ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই কান্নাও বড় অস্ফুট। বলতে কী শ্যামশ্রীকে কাঁদতে প্রায় কখনওই দেখেনি রেবন্ত। যত যাই হোক, শান্ত ও কঠিন শ্যামশ্রী কখনওই কাঁদে না। তাই নিজেকে একটু বোকা-বোকা লাগে রেবন্তর। তার ভিতরের গরমটা কমে গেছে। অস্বাভাবিক রাগটা আর নেই। মাথা আর কানের যন্ত্রণার সঙ্গে গভীর একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছে সে। এক-একবার মনে হচ্ছে, এ কাজটা ভাল হল না।

কিন্তু শ্যামশ্রী আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। কান্নায় ভেসে গেল না সে। কিছুক্ষণ পড়ে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে ধীরে উঠে বসল। চুলগুলো সরিয়ে দিল মুখ থেকে। মস্ত মস্ত চোখে গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখল একবার রেবন্তকে। ঠোঁটের রক্ত ঘন হয়ে থকথক করছে, ফুলে ঝুলে পড়েছে ঠোঁট। গালের দু' জায়গায় কামড়ের দাগ ঘিরে লালচে বেগনি কালশিটে। চেনা মুখটা অচেনা আর ভয়ংকর হয়ে গেছে।

আস্তে উঠে দাঁড়ায় শ্যামশ্রী। ধীরে ধীরে পোশাক পরে। রেবন্তর দিকে তাকায় না।

রেবন্ত বাইরের দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনির দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বলল, যাচ্ছি।

শ্যামশ্রী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর ওই বীভৎস ফোলা, প্রচন্ড ব্যথার ঠোঁটেও একটু হাসল। সে হাসিতে বিষ মেশানো। উত্তেজনাহীন, অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বলল, তবু যদি মুরোদ থাকত মেয়েমানুষকে ঠান্ডা করার! যদি সেই ক্ষমতাটুকুও দেখাতে পারতে!

রেবন্ত তার পাগলা রাগের চোখে চেয়ে থাকে শ্যামশ্রীর দিকে। শ্যামশ্রী তার বড় ঠান্ডা চোখে চাউনিটা ফেরত দিয়ে বলে, কত বীরত্ব তোমার!

রেবন্ত দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আর একটুক্ষণ এ ঘরে থাকলে সে শ্যামশ্রীর গলা টিপে ধরবে হয়তো।

সাইকেলের চাকাটা কির কির করে ঘুরে যাচ্ছে। রেবন্ত সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ছাদের ঘরে উঠে যায়। পিছনে মৃদু শব্দে শ্যামশ্রীর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

৭

এই যে এত সব বানিয়েছে মানুষ, বাড়িঘর আসবাবপত্তর, আর ওই যে গাছপালা, প্রকৃতির জগৎ, এ সব একটা বেড়ালের চোখে কেমন দেখায়? সে তো বোঝে না কেন এই ঘর বারান্দা, খাট, গদি, কাঠের চেয়ার। সে জানেও না এ সবের দাম বা উপযোগ। তবু সে তো দেখে। কেমন দেখে? কী বোধ করে সে? সে কি অনুভব করে আকাশের নীল, সূর্যের আলো? সে কি লজ্জা পায় মহিলার নগ্নতা দেখে?

রাজু নিবিষ্টমনে পায়ের কাছের বেড়ালটার মাথায় পায়ের চেটো ধীরে ধীরে বুলিয়ে দেয়। মনে মনে প্রশ্ন করে, কেমন রে তুই? তোর চোখ, মন, বুদ্ধি দিয়ে দেখলে কেমন দেখাবে জগৎটাকে? সে কি খুব অন্যরকম? যদি তোর চোখ দিয়ে দেখি তবে কি এই বাড়িঘর হয়ে যাবে পাগলাটে হাস্যকর এক নকশার মতো? অর্থহীন কিছু ধাঁধা? আকাশের নীল রং দেখা যাবে না? জ্যোৎস্না যে সুন্দর তা বুঝতেও পারব না নাকি?

তবে সে কেমন হবে? ভাবতে ভাবতে খুব নিবিড় হয়ে এল রাজুর চিন্তাশক্তি। অল্প অল্প করে সে নিজের ভিতরে একটা বেড়ালের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। বেড়ালের কার্যকারণ জ্ঞান নেই। সে জানে না, বীজ থেকে গাছ হয়। সে জানে না ঘরবাড়ি তৈরি করে মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি, সে বোঝে না যুক্তির বিচারে সৌন্দর্যের সার্থকতা। তার জগৎ কেবল গন্ধ, শব্দ ও জৈব বোধ দ্বারা আচ্ছন্ন। অসীম অজ্ঞানতা তার। সুতরাং বেড়ালের চোখে গোটা জগৎকে দেখতে হলে সব বোধ বুদ্ধি ও যুক্তির বিচার ভুলতে হবে। প্রাণপণে রাজু সেই চেষ্টাই করতে থাকে।

ঝোড়ো হাওয়ার মুখে মুখে কখন উড়ে গেছে মেঘ। মাঝরাতে ভাঙা ভুতুড়ে এক চাঁদের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নায় চারদিকে গহিন প্রেতরাজ্য জেগে ওঠে। সঞ্চিত জল ঝরে পড়ছে টুপটাপ টিনের চাল থেকে, গাছের পাতা থেকে। কী শব্দহীনতার শব্দ। উঠোন জুড়ে টলটলে জলের গাং।

মেঘ কেটে এক মরুণে ঠান্ডা পড়ল চারদিকে। এত শীত যে শরীর পাথর হয়ে যায়। কান-মুখ কম্বলে ঢেকে বারান্দার চেয়ারে বসে পাথর হয়েই থাকে রাজু। এখন বাতাসের শব্দ নেই, মানুষের শব্দ নেই। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সে পা দিয়ে বেড়ালটাকে ছুঁয়ে খুব ধীরে ধীরে বেড়ালের চেতনার মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

ক্ষয়া চাঁদটার দিকে চেয়ে সে ভাবে, বেড়ালের চোখে চাঁদের কোনও অর্থ নেই, নাম নেই, বস্তুজ্ঞান নেই। তা হলে কেমন? চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে রাজু। ক্রমে ক্রমে বোধ বুদ্ধি, যুক্তি বিচার ও বস্তুজ্ঞান ডুবে যেতে থাকে। হঠাৎ চমকে সে দেখে, আকাশটা এক্সরে প্লেটের মতো স্বচ্ছ, কালো। তার একধারে লাল, রাগী, আগুনের মতো আকারহীন চাঁদ। গ্রহ নক্ষত্র সবই লম্বাটে, আগুনের মতো। চারদিকে ভুসো ছাইরঙা অন্ধকার। কিন্তু তাতে পরিষ্কার বেড়ালের চোখে সে দেখতে পায় লালচে গাছ, লালচে পাতা। অনেক পোকামাকড়ও নজরে আসে তার এই অন্ধকারে।

বুদ্ধিকে আরও ত্যাগ করতে থাকে রাজু। ছেড়ে দিতে থাকে মানুষের বস্তুজ্ঞান। বেড়ালের আত্মীয় হতে থাকে। শুধু চৈতন্যটুকু জেগে থাকে তার। শুধু অনুভব। অনেকক্ষণ চোখ বুজে মনকে স্থির রাখে সে। অনেকক্ষণ। গভীরভাবে ভাবতে থাকে, আমি বেড়াল। আমি বেড়াল। আমি বেড়াল।

ভাবতে ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মানুষের বোধবুদ্ধি নিভে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, সে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী। তার গোষ্ঠী নেই, সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। চারদিকে যে রং ও রূপের ঐশ্বর্যময় জগৎ ছিল তা মুছে গেছে। তার নাকে আসে বিচিত্র সব গন্ধ যা কোনওদিন মানুষ হিসেবে সে টের পায়নি। তার সজাগ কানে এসে পৌঁছোয় অদ্ভুত সব দূর ও কাছের আওয়াজ। সামনে মস্ত গাছের মগডালে ঘুমের মধ্যে একটা পাখি একটু নড়ল বুঝি, সেই শব্দও তার কানে আসে। কোনও স্মৃতি নেই, শুধু মস্তিষ্কের কিছু নির্দেশ কাজ করে তার মধ্যে। কোনও চিন্তা নেই, শুধু ক্ষুধা ভয় ও প্রীতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তার বোধ আছে মাত্র। অবাক হয়ে সে দেখে, চারদিকে সব কিছুই আমূল বদলে গেছে। ভারী গোলমেলে সব নকশা, নানা আকার ও আকৃতি, অদ্ভুত সব রং। লাল, গাঢ় লাল, ফিকে লাল, কালো, আবছা কালো, বেগুনি। নাকের কাছে দিপ দিপ করে একটা পোকা জ্বলে আর নেভে। পোকাটাকে খুবই স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তার মুখ চোখ পাখনার গতি কিছুই নজর এড়ায় না। একদৃষ্টে চেয়ে সে একটা থাবা দেয়। পোকাটা ওপরে উঠে যায়। নিস্পৃহ লাগে তার। সামনে একটা সমতল, তারপর নিচু, তারপর আবার সমতল। ওদিকে একটা দরজা খুলে যায়। লম্বাটে এক প্রাণী বেরিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে। তার কানে গমগম করে শব্দটা। তবে সে বোঝে, এ শব্দে তাকে ডাকা হচ্ছে না। সে জানে, অদ্ভুত একটা শব্দ আছে, যে শব্দ হলেই তাকে কাছে যেতে হবে। সে খাবার পাবে, বা কোলের ওম আর আদর।

রাজু চেয়ে থেকে বুঁদ হয়ে যায়। বেড়ালের চোখে আশ্চর্য এক পৃথিবী দেখতে থাকে। এ যেন দুরূহতম ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা। একদিকে চৌকো কিউবিক সব আকৃতি। অন্যদিকে গলে পড়ছে

জ্যাবড়া রং। রঙের সঙ্গে আলোর মিশেল। খুব কাছের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায় সে। একটা পিঁপড়ে হাঁটছে তার থাবার ওপর। কেঁচো বাইছে খুঁটির গায়ে। কিন্তু কেঁচো বা পিঁপড়ে বলে সে চিনতে পারে না এদের। শুধু জানে, কিছু জিনিস চলে, কিছু স্থির থাকে। রাজু অবাক হয়ে দেখে আর দেখে। সে আর মানুষ নেই, বেড়াল হয়ে গেছে।

খুব কাছ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে অনেকক্ষণ, সেই ডাক তার বোধের ভিতরে কোনও ঢেউ তোলে না। তারপর আস্তে আস্তে এক গভীর জলের পুকুর থেকে সে ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক না। বসে আছিস কেন?

রাজু কথা বলল না। চেয়ে রইল শুধু। তার বেড়ালের বোধ এখনও সবটা কাটেনি।

কুঞ্জর হাতে একটা অচেনা জিনিস। একটু চেয়ে অবশ্য রাজু চিনতে পারে জিনিসটা। হটওয়াটার ব্যাগ।

কুঞ্জ রবারের ব্যাগটা টেনেটুনে দেখছিল। বলল, এটা একটু দ্যাখ তো, চলবে কিনা, বহুকাল পড়ে ছিল ঘরে।

রাজু ব্যাগটা হাতে নিল। বারান্দার আলো জ্বেলেছে কুঞ্জ। রাজু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, রবার গলে গেছে। গরম জল ভরলেই ভুস করে ফুটো হয়ে যাবে।

তা হলে অন্য কারও বাড়ি থেকে আনাতে হবে।

কুঞ্জর মুখ কেমন যেন সাদা, চোখে মড়ার মতো দৃষ্টি। মানুষের জগৎ বুদ্ধিতে ফিরে এসে রাজু এখন মাথা ঝাঁকিয়ে বেড়ালের বোধ সবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, কেষ্টর বউ কেমন আছে?

কুঞ্জ মৃদু স্বরে বলে, ভাল।

টুসিকে সঙ্গে নিয়ে কুঞ্জ কোন বাড়ি থেকে গরম জলের ব্যাগ আনতে যাচ্ছে। রাজু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে, চল তা হলে তোদের সঙ্গে খানিকটা ঘুরেই আসি।

খানিক পরে কুঞ্জ আর টুসির পিছু পিছু টর্চ আর ভুতুড়ে জ্যোৎস্নার আলোয় জল, এঁটেল কাদা আর গর্তে ভর্তি রাস্তা পেরিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল রাজু, তখনও তার মনের মধ্যে নানারকম অস্বাভাবিকতা। কোথায় যাচ্ছে তা বার বার ভুলে যাচ্ছিল সে। কেবলই মনে হচ্ছিল, সামনের দুটো ছায়ামূর্তি কেউ নয়। ওরা এক্ষুনি এগিয়ে যাবে, দূরে চলে গিয়ে হারিয়ে যাবে। তখন একা রাজুকে টেনে নেবে উদ্ভিদের জগৎ। টেনে ধরবে গভীর মাটি। রাজুর গতি হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো। এক জায়গায় সে গাছ হয়ে ডালপালায় বাতাস আর রোদ মাখবে সারা দিন, সারা জীবন।

রাতের আর বেশি বাকি নেই। ধোঁয়াটে কুয়াশা ও জ্যোৎস্নায় মাখা অন্ধকারে রাজু কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক উঠে আসে বুকে। ডাকে, কুঞ্জ!

সামনে কুঞ্জ টর্চের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে টুসি। কুঞ্জ বলে, আয়। বড় পিছিয়ে পড়েছিস। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

রাজু নিজের সব অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি নিপুণভাবে চাপা দিতে চেষ্টা করে আজকাল। বলে, বড্ড পিছল। আমার অভ্যেস নেই তো।

টুসি মায়াভরা গলায় বলে, ইস! আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে রাজুদা। এলেন কেন?

আগে অনেকবার কুঞ্জদের বাড়ি এসেছে রাজু। কোনওদিনই টুসি বা কুঞ্জর অন্য বোনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। ওরা বড় বাইরের পুরুষের সামনে আসে না। এবার কেষ্টর বউ যমে-মানুষে টানাটানির মধ্যে পড়ায় টুসির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। এইভাবেই ভাব হয়, ঘটনার ভিতর দিয়ে, ঘটনায় জড়িত হয়ে, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে নিতে।

রাজুও প্রাণপণে তাই চায়। পৃথিবীর কোনও-না-কোনও ঘটনার সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে

পড়তে। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক হয়ে উঠতে, দায়িত্বশীল হয়ে পড়তে। কিন্তু পারছে না। মনে মনে সে কেবলই ফিরে আসছে ভীষণ ব্যক্তিগত চিন্তায়, সমস্যায়। সে টুসিকে বলে, এলাম। ভালই লাগছে তো।

প্রাণপণে ওদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটে রাজু। টুসি সামনে থেকে বলে, রাস্তায় পা দেবেন না। পিছল। ঘাসে পা রেখে আসুন।

কুঞ্জ সামনে থেকে মাঝে মাঝেই টর্চ ঘুরিয়ে ফেলে। বলে, এই তো এসে গেছি।

ফটকে ঢুকে অনেকখানি বাগান পার হয় তারা। তারপর অন্ধকার এক বাড়ির দাওয়ায় ওঠে।

এই তো সেই সুন্দর মেয়েটার বাড়ি। না? কী যেন নাম মেয়েটার! বনশ্রী। হ্যাঁ, বনশ্রীই।

রাজুর বুক ধক ধক করে ওঠে। প্রেম নয়। এত সহজে আর আজকাল প্রেম হয় না। রাজু জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। তবু যে বুক ধ্বক করে ওঠে তার কারণ অন্য। সে ভাবে, আহা, ওই মেয়েটা যদি আমার বউ হত! ভাবে, তার কারণ আজকাল তার খুব বিয়ের ইচ্ছে হয়। প্রেম বা কাম বা গেরস্থালির জন্য নয়। সে চায়, সারা রাত তার একজন সঙ্গী থাক। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদাসতর্ক একজোড়া চোখ তাকে নজরে রাখুক। তার কথা ভাবে এমন এক ঘনিষ্ঠ হৃদয় বড় চায় সে।

টুসি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকে, মাসি! ও মাসি। এই বনাদিদি। চিরু। এই চিরু।

বনশ্রীর ঘুমই সব চাইতে পাতলা। বরাবর এক ডাকে ঘুম ভাঙে তার।

আজও ভাঙল। টুসির গলার স্বর না? এমনিতে বনশ্রীর ভয়টয় খুব কম। তবু মাঝরাতে চেনা স্বর শুনেই সাড়া দিতে নেই বা দরজাও খুলতে হয় না। তাই একটু অপেক্ষা করে বনশ্রী।

পাশের ঘর থেকে সবিতাশ্রী পরিষ্কার গলায় বলে ওঠেন, কে রে? কী হয়েছে?

বাইরে থেকে টুসি বলে, মাসিমা, আপনাদের গরম জলের ব্যাগটা নিতে এসেছি। বউদির খুব অসুখ।

দাঁড়া। দিচ্ছি।— বলে সবিতাশ্রী উঠতে যাচ্ছিলেন বোধ হয়।

বনশ্রী লেপ সরিয়ে উঠে পড়ে। বলে, মা, তুমি উঠো না। আমিই উঠেছি।

বউটার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করিস তো।— সবিতাশ্রী উদ্বেগের গলায় বললেন।

বাইরের ঘরে এসে বনশ্রী দরজা খোলে এবং একটু সংকুচিত হয়ে পড়ে। টুসির পিছনে কুঞ্জ দাঁড়ানো আর তার পিছনে বারান্দার বাইরে উঠোনের মলিন জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজু।

কপাটের আড়ালে ঘরে এসে বনশ্রী বলে, সাবির কী হয়েছে?

টুসি কলকলিয়ে মিথ্যে কথা বলল, আর বোলো না, পিছল উঠোনে পড়ে গিয়ে খুব লেগেছে।

সর্বনাশ। বনশ্রী একটু শিউরে ওঠে. তারপর চাপা গলায় বলে, পোয়াতি ছিল যে!

সেই তো। রক্ষে হল না বোধ হয়।

দাঁড়া, ব্যাগ এনে দিচ্ছি।

দ্রুতপদে বনশ্রী মায়ের ঘরে ঢোকে। দেয়ালে পুরনো ন্যাকড়ায় বাঁধা ব্যাগটা যথাস্থানে ঝুলছে। এ বাড়িতে সব জিনিস নিখুঁত গোছানো। জায়গার জিনিস সব সময়ে ঠিক জায়গায় পাবে। রবারের ব্যাগটা রাখাও হয়েছে ভারী যত্নে। জল ঝরিয়ে শুকনো করে, ফুঁ দিয়ে একটু হাওয়া ভরে ফুলিয়ে ছিপি এঁটে।

বনশ্রী সেটা এনে টুসির হাতে দিয়ে বলে, কী হবে তা হলে?

কী করে বলি?

আমি যাব?

এত রাতে আর তোমার যেয়ে দরকার নেই। সকালে যেয়ো। যা হওয়ার তো হয়েই গেছে।

সাবি বাঁচবে তো, ও কুঞ্জদা?

কুঞ্জ চুপচাপ ছিল এতক্ষণ, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল, বেঁচে যাবে।

বনশ্রী কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে, চিকিৎসা আপনি করছেন না তো?

কুঞ্জ ম্লান হেসে বলে, না না। আমার ওষুধে ওরা কেউ বিশ্বাস করে না।

টুসি তাড়া দিয়ে বলে, চলো বড়দা।

ওরা চলে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ বনশ্রী দরজা বন্ধ করল না। দু' হাতে দুই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে মেঘ ভেঙে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। অল্প কুয়াশা। প্রচণ্ড শীত। বনশ্রীর বেশ লাগছিল চেয়ে থাকতে। এমনিতে দেখার কিছু নেই। সেই রোজকার দেখা একই বাগান, গাছপালা। তবু রঙের একটা অদল বদল, দু'-একটা চৌকস তুলির টানে চেনা ছবিটা কত গভীর হয়ে গেছে। রাজু ওদের সঙ্গে এসেছিল কেন তা কিছুতেই ভেবে পায় না বনশ্রী। কেনই বা ওর মন খারাপ!

ঝরঝরে রোদ মাথায় করে ভোর হল। বনশ্রীর দিন শুরু হয় খুব ভোরে। বিছানাপাটি তুলে ঘরদোর গুছিয়ে সে যখন একটু অবসর পেয়ে ভোর দেখতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তখনও সে অন্যমনস্ক। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে দাওয়ায় বসে সে নিজের একরাশ খোলা চুলের জট ছাড়ায় আঙুলে। আর ভাবে।

বাইরের ঘরে জনা দশ-বারো ছাত্রকে বসিয়ে পড়াচ্ছেন সত্যব্রত। পড়ানোর শব্দ ভাল লাগছিল না বনশ্রীর। খানিকক্ষণ বসে সে উঠে পড়ল। বাগানের ভিতরে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেল অনেকটা। নির্জনে একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে আজ। অলস লাগছে।

সাইকেলের শব্দে বনশ্রী ফিরে দেখে, ঝকঝকে মুগার পাটভাঙা পাঞ্জাবি, ধোয়া শাল আর ধবধবে সাদা ধুতি পরা রেবন্ত সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ফটক দিয়ে সোঁ করে ঢুকে পড়ল। এত সকালেও গালের দাড়ি কামানো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল বনশ্রী। রেবন্ত অনেকটা এগিয়ে গেছে ভিতরবাগে।

পিছন থেকে বনশ্রী হঠাৎ ডাকল, রেবন্তদা!

সেই ডাকে সাইকেলটা দুটো মস্ত টাল খেল। যেন পড়ে যাবে। পড়ল না অবশ্য। রেবন্ত লম্বা পা বাড়িয়ে ঠেক দিয়ে ফিরে দেখল তাকে।

বনশ্রী হেসে বলল, এত সকালে?

সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে রেবন্ত আস্তে আস্তে কাছে আসে। মুখে হাসির একটা চেষ্টা আছে, কিন্তু আসলে ওর মনে যে হাসি নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।

হালকা হওয়ার জন্যই বনশ্রী বলল, একেবারে জামাইবাবু সেজে এসেছেন যে! ওমা। কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফরসা রেবন্তর মুখটা লাল হল একটু। গলা সামান্য ভাঙা, একটু কাশি আছে সঙ্গে। সেই গলাতে বলল, আমি একটা কথা জানতে এসেছি বনা।

কথার ধরনটা খুব ভাল লাগল না বনশ্রীর। একটু যেন ছাইচাপা আগুনের মতো রাগ ধিকিধিকি করছে ভিতরে। বনশ্রী মুখে হাসি টেনে বলল, কী কথা বলুন তো!

শ্যামা আমাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে কেন?

বনা তার মস্ত এলোচুলের ঝাপটার আড়াল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, আবার ঝগড়া করেছেন আপনারা?

কী করব? ও যে আমাকে কথায় কথায় অপমান করে। বনা, তোমরা সবাই ভারী অহংকারী।

বনশ্রী শ্বাস ফেলে বলে, হবে হয়তো। আপনি নিজেও খুব কম অহংকারী নাকি মশাই? কাল দুপুরে এসে কেমন ব্যবহারটা করে গেলেন মনে আছে?

জামগাছের নীচে রেবন্ত সাইকেলের ওপর ভর রেখে আধখানা ভেঙে দাঁড়িয়ে। মাথায় কপাল

ঢাকা মধু রঙের একরাশ ঘন চুলের ঘুরলি ফণা ধরে আছে। দুধ-সাদা শাল, ঝকমকে মুগা আর ফরসা রঙের ওপর ঝরে পড়ছে অজস্র আলো আর ছায়ার টুকরো। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওকে! যেন এই ভোরের আলো থেকে রূপ ধরে এল। কয়েক পলকের রূপমুগ্ধতায় বনশ্রী সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে রেবন্ত যদি বলে, চলো বনা, দু'জনে পালিয়ে যাই, তবে বনশ্রী একবস্ত্রে বেরিয়ে যেতে পারে।

মনের ওপর একটু ছায়া ফেলে পাপ-চিন্তাটা সরে যায়। তবু একটু শিহরন থেকে গেল, গা কাঁটা দিয়ে রইল একটু বনশ্রীর। সে কোনওদিন কাউকে ভালবাসেনি, এখনও বাসে না। তবু এ কী?

চাপা অভিমানে টলমল করছে রেবন্তর মুখ। বলল, আমি এ বাড়িতে আসি বলে তোমরা কিছু মনে করো না তো বনা?

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে, ওমা! কী মনে করব?

রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, তবে শ্যামা আমাকে এখানে আসতে বারণ করল কেন?

বনশ্রী মুখ নামিয়ে বলল, দিদিই বা কেন বারণ করবে?

রেবন্তর চোখমুখ আস্তে আস্তে অন্য একরকম হয়ে যায়। ভিতরে কী একটা তীব্র বেদনাবোধ চেপে রাখছে অতি কষ্টে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে রুদ্ধ আবেগে। নাকের ডগা লাল, ঠোঁট কাঁপছে। স্খলিত গলায় বলল, আমি কি না এসে থাকতে পারব? বনা, একদিন তোমাকে একটা ভারী গোপন কথা বলার আছে।

বিহ্বল বনশ্রী উন্মুখ চোখে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলে, বলবেন।

৮

এন সি সি-র সিনিয়র ক্যাডেট হিসেবে সে যে রাইফেল ব্যবহার করত সেরকম নয়, অথবা সম্বলপুরে শিকার করতে গিয়ে যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালিয়েছে সেরকমও নয়, রাজুর হাতের এ রাইফেলটা প্রচণ্ড ভারী, আকারে বিশাল। ব্যারেলটা কামানের মতো মোটা। একটা ডবল ডেকার বাসের দোতলার একদম সামনের সিটে বসে আছে সে, হাতের ভারী রাইফেলের নল সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাড়ানো। বাসের দোতলাটা একদম ফাঁকা। সামনে নীচে কলকাতার প্রচণ্ড ভিড়ের রাস্তা। বাসটা হরদম চলছে, স্টপ দিচ্ছে না। রাজু ঝাঁকুনিতে টাল্লা খেয়ে যাচ্ছে, রাইফেলের নল জানালার ওপর ঘড়-ঘড় করে গড়িয়ে যাচ্ছে তাতে। কিন্তু এরকম হলে চলবে না। রাজু শক্ত হতে চেষ্টা করে। সামনেই জানালা থেকে সাপের লেজের মতো একটা দড়ি দেখতে পায় এবং তাতে একটা টান দেয় সে। নীচে ড্রাইভারের কেবিনে টং করে একটা শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসটার গতি কমে আসে।

রাজু রাইফেলটা টিপ করার চেষ্টা করে। তারপর ভাবে, টিপ করার দরকার নেই। এত লোক চারদিকে, গুলি চালালে কেউ না কেউ মরবেই। আর এ কথা কে না জানে যে, সব মানুষই তার শত্রু।

ভাবতে ভাবতে ট্রিগার টেপে রাজু। রাইফেলের কুঁদো ঘোড়ার পিছনের পায়ের মতো লাথি দেয় তাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের টাইট ছিপি আচমকা খোলার মতো দম করে শব্দ হয়। রাজু দেখতে পায়, রাস্তায় একটা লম্বা লোক সটান শুয়ে আছে।

টং টং। দু'বার দড়ি টানে রাজু। বাস আবার বেটাল হয়ে প্রচণ্ড জোরে ছোটে। রাজু আবার দড়ি টেনে বাসের গতি কমায় এবং খুব লক্ষ্য স্থির করে একটা বেঁটে লোককে মারে। পরের বার মারে

একটা মস্তান গোছের ছোকরাকে। গা গরম হচ্ছে তার। টুকটাক এরকম লোক মারতে তার মন্দ লাগছে না। ভিয়েতনামের জঙ্গলে মার্কিন স্নাইপাররা এইভাবেই গাছের ডাল থেকে, ঝোপঝাড় থেকে লুকিয়ে একটা-দুটো করে ভিয়েতকং গেরিলা মারত।

কিন্তু একটা ভারী মুশকিল হল। আগে লক্ষ করেনি রাজু, রাইফেলের নলের মুখটা ফানেলের মতো ছড়ানো। এত বড় মুখ যে, পুরনো আমলের গ্রামোফোনের চোঙের মতো মনে হয়। আর আশ্চর্য এই, সেই চোঙ থেকে লাউডস্পিকারের বিকট শব্দে হিন্দি গান বাজছে। দম মারো দম। কান ঝালাপালা। মাথা গরম হয়ে গেল রাজুর। রাইফেলের ওপরে একটা ঘোড়া টেনে দিল সে। এবার রাইফেলটা হয়ে গেল অটোমেটিক। রাজু ট্রিগার টিপতেই মুষলধারে নল দিয়ে টিরিটিরি টিরিটিরি শব্দে ছুটতে থাকে বুলেট। সেই সঙ্গে পরিত্রাহি গানও বেজে যায়। তুমসে মুহব্বত...প্যার...হাম তুম...এই সব শব্দ গুলিবিদ্ধ হয়েও তার কানে আসে। আর সে দেখে সামনেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার একধার দিয়ে বয়ে চলেছে চমৎকার একটা কৃত্রিম খাল, তাতে গণ্ডোলা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর একদিকে মাইল মাইল বাগান চলেছে। কিছু অস্বাভাবিক লাগে না তার। সে ঠিকই চিনতে পারে, এটাই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার ওপর হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ছে গুলি খেয়ে। রক্ত, রক্ত আর লাশ। আর, দম মারো দম।

দৃশ্যটা পাল্টে যায়। সে দেখতে পায়, কলকাতার ঠিক মাঝখানে একটা ভীষণ উঁচু কনট্রোল টাওয়ারে সে বসে আছে। ঘরটা চক্রাকার, চারদিক স্বচ্ছ কাচে ঘেরা। চারদিকে নিচু জটিল সব যন্ত্রপাতি। সুইচ বোর্ডের সামনে কানে হেডফোন লাগানো গোমড়ামুখো কয়েকজন লোক বসে আছে। বাইরে ঝকঝকে রোদে বহু নীচে দেখা যাচ্ছে শহর। কী সুন্দর শহর! কলকাতা যে অবিকল নিউ ইয়র্কের মতো তা এত ওপর থেকে না দেখলে বোঝাই যেত না। আশি-নব্বুই তলা সব বাড়ি, হাজার হাজার, অফুরন্ত। বহু দূরে আকাশের গায়ে অতিকায় তিমি মাছের পাঁজরের মতো হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজের মাথা এত উঁচু যে তাতে মেঘ এসে ঠেকে আছে একটু। হাওড়া ব্রিজ যে এতটাই উঁচু তা তার জানা ছিল না, কিন্তু অবাকও হল না সে। এত বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মনুমেন্টটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। বহু খুঁজে দেখতে পেল মনুমেন্টটা খুবই কাছে টাওয়ারের পায়ের নীচে পড়ে আছে। গড়ের মাঠ দেখা যাচ্ছে ডানদিকে যেদিকটায় শেয়ালদা স্টেশন। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে কয়েকটা একটু হেলে আছে। এত সুন্দর শহর, অথচ মাঝখানটায় একটা কাদাগোলা জলের পুকুর। পুকুরের চারধারে কচু বন, মাটির পাড়। রোদে কয়েকটা লোক আর মেয়েমানুষ গায়ে মাটি মেখে হাপুস হুপুস স্নান করছে পুকুরে। পাশে মস্ত বটগাছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে এই পুকুরটাব কথাই বলেছিলেন বটে। আজও পুকুরটাকে বুজিয়ে ফেলা হয়নি দেখে ভারী রাগ হল রাজুর। এত সুন্দর শহরের মাঝখানে ওই নোংরা পুকুর কি মানায়? হেডফোনওয়ালা একজন বলে উঠল, নাউ, ইটস অলমোস্ট দি টাইম। এ কথায় রাজুর চৈতন্য হয়। তাই তো! এ শহরটার আয়ু তো মাত্র আর কয়েক মিনিট। কথা আছে, বেলা বারোটা পাঁচ মিনিটে কলকাতায় হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হবে। রাজু ঝুঁকে দেখে, পুকুরে স্নানরত লোকজন ছাড়া শহরটা একদম ফাঁকা। রাস্তাঘাট থম থম করছে। নিঃশব্দে প্রহর গুনছে শহর। পশ্চিম দিকে নীল আকাশে ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে একটা উড়োজাহাজকে। রুপালি মশার মতো। চোখের পলকে মশাটা মাছির মতো বড় হয়ে উঠল। মাছিটা আরও কাছে আসতেই হয়ে গেল ফড়িঙের মতো বড়। তীরের মতো চলে আসছে, পিছনে দুটো টানা ধোঁয়ার লাইন। হেডফোনওয়ালা একটা লোক মাইক্রোফোনে জিরো আওয়ার গুনতে শুরু করে। টেন...নাইন...এইট... সেভেন... সিক্স... ফাইভ... ফোর... থ্রি... টু—উড়োজাহাজ একটা ঝড়ের বাতাস তুলে পলকে মিলিয়ে যায় দিগন্তে। আর হঠাৎ বাঁ দিকে সামান্য একটু ঝলকানি দেখা দেয়। রাজু তাকিয়ে ভাবে, এই নাকি হাইড্রোজেন বোম, ধুস! কিন্তু না। হেডফোনওয়ালা একজন বলে ওঠে, পিছনে তাকান! তাকায় রাজু, আর আতঙ্কে বরফের মতো

জমে যায়। পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক অতিকায় মহাবৃক্ষের মতো জমাট কালো ধোঁয়া। দিরি দিরি করে সেই ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আরও আরও বিশাল করাল চেহারা নিচ্ছে। একটু গরম লাগছিল বটে রাজুর, কিন্তু একটা লোক একটা টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বলল, অল ভেপোরাইজড। রাজু ঘুরে দেখে শহরের বাড়ি-ঘর সব ছিটকে আকাশে উঠে কাছে বা দূরে ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে। বাষ্পীভূত অবস্থা কি একেই বলে? শুধু হাওড়া ব্রিজ এখনও আকাশ ছুঁয়ে খাড়া রয়েছে, তার ডগায় এখনও লেগে আছে ছবির মতো স্থির একটু মেঘ। একজন হেডফোনওয়ালা বলে উঠল, আমাদের টাওয়ারের সাপোর্টটা উড়ে গেছে। আমরা এখন শূন্যে, ইন অরবিট। রাজু হাইড্রোজেন বোমার ক্রিয়াকাণ্ড আগে কখনও দেখেনি। এখন খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে কিছু খারাপ লাগছে না। একদিকে ছত্রাকের মতো অতিকায় ধোঁয়ার মিশমিশে কালো মেঘ। সেই মেঘের কোলে কলকাতার সব উড়ন্ত ঘর-বাড়ি। তাদের এই কনট্রোল টাওয়ারের কেবিনটাও নাকি উড়ছে। সে অবশ্য তেমন কিছু টের পাচ্ছে না। কিন্তু সে পরিষ্কার দেখতে পেল, কলকাতার মধ্যিখানে সেই আদ্যিকালের নোংরা পুকুরটার কিছুই হয়নি। তার চারদিকে এখনও সেই কচু বন, মাটির পাড়, একধারে মস্ত বট। মেয়েপুরুষরা এখনও কাদাগোলা জলে ঝুপ ঝাপ স্নান করছে। তারা শুধু এক-আধবার অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর নির্বিকারভাবে স্নান করে যেতে লাগল।

ভীষণ বান আসছে! ভীষণ ঢেউ! কে যে চেঁচাচ্ছিল তা বুঝল না রাজু। কিন্তু বুকের ভিতরে একটা ভয় জলস্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে উঠছিল। রেডিয়োতে খুব শান্ত কঠিন গলায় একজন ঘোষক বলে ওঠে: সামুদ্রিক যে ঢেউ কলকাতার দিকে আসছে তার উচ্চতা দেড় শো থেকে দুশো ফুট হতে পারে। রাজু একটা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর সে জানে, এ বাড়িটা তাদেরই। দোতলাব ব্যালকনির নীচেই একটা নর্দমা। সে দেখে নর্দমার জল হঠাৎ উপচে পড়ে রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শুনতে পেল, তাদের কলঘরে এই অসময়ে কল দিয়ে অবিরল জল পড়ছে। বারান্দায় রাখা আধ বালতি জল হঠাৎ ফুলে উঠল, বালতি উপচে বইতে লাগল শানের ওপর। এ কি জলের বিদ্রোহ? এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলেই সে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। দিগন্তে ও কি মেঘ? আকাশের গায়ে এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে ফ্যাকাসে রঙের ওটা কী তা হলে? ভাবতে হল না। হঠাৎ সে জলের গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাতের শব্দ এক করলে যেমনটা শোনায় ঠিক তেমন গম্ভীর গভীর ভয়াল। নীচের রাস্তা থেকে একটা বুড়ো লোক হঠাৎ মুখ তুলে বলল, আগেই বলেছিলুম এ সব জায়গা সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠেছে। যাকে বলে চরজমি। অনেকদিন পই পই করে বলে আসছি এখানে শহর-টহর কোরো না। যার জিনিস একদিন সে-ই নেবে। এখন হল তো। হুঁঃ! বলে বুড়ো লোকটা রাগ করে রাস্তার জল ভেঙে চলতে লাগল। রাজু দেখল, কয়েক পলকের মধ্যেই নালা থেকে গড়ানে জল রাস্তায় হাঁটু অবধি হয়ে গেছে। দিগন্তে সেই জলের পর্দা ক্রমে আরও উঁচু হয়েছে। চলন্ত পাহাড়ের মতো আসছে। কলঘরে জলের শব্দ চৌদুনে উঠে গেল। কলের মুখ সেই তোড়ে ছিটকে মেঝেয় পড়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল বারান্দায়। রাজু নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। কলঘরে হোসপাইপের মতো জল ঘর ভাসিয়ে বারান্দায় চলে আসছে। বারান্দার বালতিটায় জলের মাতন লেগেছে। টলে টলে, নাচতে নাচতে উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। বুড়ো লোকটা কি ঠিক বলেছে? সমুদ্র তার হারানো জমি উদ্ধার করতে আসছে নাকি? কিংবা পৃথিবীর সব জলই বিদ্রোহ করেছে সৃষ্টির প্রথম যুগের মতো পৃথিবী আবার জলময় করবে বলে? এ কি জলের বিদ্রোহ? এই কি বিপ্লব? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক রাজু আচমকা চেয়ে দেখে সব পশ্চাৎভূমি মুছে তার হাতের নাগালেই চলে এল জলের প্রকাণ্ড দেয়াল। এই তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। শব্দ হচ্ছে ল—ল—ল—ল। কী প্রচণ্ড গম্ভীর গভীর শব্দ। মাটি কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে। সামনে নিচু একটা ঢেউ ডিগবাজি খেয়ে রোলারের মতো গড়িয়ে আসছে। তার

চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের যত নির্মাণ আর প্রতিরোধ। সেই রোলারের পিছনেই মহামহিম অতিকায় জলের দেয়াল। ঘোলা মেটে এবড়ো-খেবড়ো অন্ধ হৃদয়হীন ও নির্বিকার। রাজু শক্ত হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। সে ভাবল, এবার বরং আত্মহত্যা করি, এ রকম ভয় সহ্য করা যায় না। ভাবতে ভাবতে সে লাফিয়ে উঠল রেলিং-এ। ঝাঁপও দিল, কিন্তু নীচে পড়তে পারল না। তার আগেই জলের ঢেউ লুফে নিল তাকে। কোলে নিয়ে তাকে দোল দিল জল। তারপর আস্তে আস্তে তরঙ্গ থেকে তরঙ্গের মাথায় মাথায় তুলে দিতে থাকল। রাজু ওলট পালট খেতে থাকে। টের পায়, ক্রমে ক্রমে সে জলের মাথায় চড়ে এক অসম্ভব উচ্চতায় চলে যাচ্ছে। এত! এত জল! এই কি মহাপ্লাবন? তীব্র ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেয়ে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ রাজু হাতে পেয়ে গেল একটা কার্নিশ। উঠে পড়ল। দেখে, একটা ছোটমোটো ছাদে জনা কুড়ি কাকভেজা লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন বলল, খিচুড়ি হচ্ছে, চিন্তা নেই। রাজুর কথাটা ভাল লাগল। মনে হল, পৃথিবীতে কয়েকটা ভাল লোক আছে এখনও। চারদিকে চেয়ে দেখল, জল ছুটছে নক্ষত্রের বেগে। যেন একটা প্রকাণ্ড জলপ্রপাত শুয়ে পড়েছে হঠাৎ। চারদিকে কিছুই প্রায় নেই। বহু বহু দূরে এক-আধটা বাড়ির ছাদ দেখা যায়। তাতে পিঁপড়ের মতো মানুষ। যে লোকটা খিচুড়ির খবর দিয়েছিল সে এবার বলল, কিন্তু গুনতিতে মেয়েমানুষ বড় কম পড়ে গেল। জল তো কমবেই একদিন, ড্যাঙা জমিও দেখা দেবে। কিন্তু তখন দুনিয়া আবার মানুষে ভরে দিতে অনেক বছর লেগে যাবে। মেয়েমানুষ ছাড়া সে এলেম কারই বা আছে!

পাশ ফিরতেই চটকা ভেঙে রাজু তাকায়, জানালা দিয়ে সাদা ধপধপে একটা রোদের চৌখুপি এসে পড়েছে মেঝে আর খাট জুড়ে। চোখ চেয়েও সে স্পষ্টই সেই জলের শব্দ পাচ্ছিল, সেই উড়ন্ত টাওয়ার আর কলকাতার পথে পথে রক্ত আর লাশ দেখতে পাচ্ছিল স্পষ্ট। এত সত্য, এত স্পষ্ট, এত নিখুঁত কী করে স্বপ্ন হবে? লেপের ভিতরে সে নিজের গায়ে হাত দিয়ে ভেজা ভাব আছে কি না দেখে। ধাতস্থ হতে অনেক সময় লাগে তার। কোথায় সে আছে তা খুব আস্তে আস্তে মনে পড়ে।

হাতঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা। ভারী লজ্জা করতে থাকে রাজুর। অন্যের বাড়িতে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো! কে জানে কী মনে করবে এরা!

কুঞ্জর বিছানায় থাকার কথা নয়, নেইও। ঘর ফাঁকা। দোর ভেজানো। রাজু খুব স্মার্টভাবে তড়াক করে উঠে পড়ে। যতদূর সম্ভব নিজেকে চারদিকের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে কটকটে রোদের উঠোন, গাছপালা ঘেরা ঘরোয়া বাগান, কুয়ো, কিছু বিষয়কর্মে রত মানুষ। রাজু চারদিকে চেয়ে সবকিছু চিনে নিতে থাকে। হ্যাঁ, এই তো রোদ, মানুষ, গাছপালা। এই তো সব চেনা!

আজকাল প্রতিদিন রাজুকে এই লড়াইটা করতে হচ্ছে। এক কল্পনার থাবা তাকে কেড়ে নেয় মাঝে মাঝে। আবার ছেড়ে দেয় বাস্তবতার মধ্যে। রাজু ভেবে পায় না, সে কি পাগল?

এই নিয়ে তিনবার বনশ্রীর সঙ্গে দেখা হল রাজুর, বেরিয়েই সকালে প্রথম যে মানুষের মুখ দেখল সে বনশ্রী। কেষ্টর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টুসির সঙ্গে কথা বলছে। গায়ে শান্তিনিকেতনি খদ্দরের চাদর। এত সুন্দর নকশা কদাচিৎ দেখা যায়, মেয়েটার মাথার খোঁপাটা মস্ত বড়। ঘুম থেকে ওঠার পর এই সকালের দিকটায় মুখখানা আরও একটু বেশি লাবণ্য মাখানো, রাজু হাঁ করে দেখছিল। সে মোটেই মুগ্ধ হয়ে যায়নি, প্রেমে পড়েনি, কিন্তু গুলি, হাইড্রোজেন বোমা আর মহাপ্লাবনের পর এই অসম্ভব শান্ত ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখতে বেশ লাগছিল তার। যেন কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা স্বপ্ন, না ওটা।

রাজুদা, উঠেছেন!— বলে টুসি হঠাৎ তর তর করে স্রোতের মতো ধেয়ে এল, দাঁড়ান, মাজন এনে দিচ্ছি। বারান্দার কোণে বালতিতে জল রাখা আছে।

বলতে বলতে চড়াই পাখির মতো উড়ে গেল যেন ফুড়ুৎ করে।

এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা, মাঝখানে একটু উঠোনের ফাঁকা শূন্যতা। সেই শূন্যতা ভরাট করে বনশ্রী একবার তাকায় রাজুর দিকে। চোখের চাউনির মধ্যে কী দেখল রাজু কে জানে! তার ভিতরে কে যেন ফিস ফিস করে বলে ওঠে, এ মেয়েটা প্রেমে পড়েছে। পাপের ছায়া স্পর্শ করেছে ওকে।

বনশ্রী আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। কেমন যেন বিভোর ভাবভঙ্গি ওর। যেন নিজের ভিতরে কিছু প্রত্যক্ষ করছে নিবিড়ভাবে। কূট চোখে চেয়ে দেখে রাজু। বনশ্রী উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে গায়ে রোদ মেখে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে চলে গেল।

টুসি একটা সাদা মাজনের শিশি এনে বারান্দায় রেখে আবার উড়ে যেতে যেতে বলে গেল, চা আনছি।

সকালের দৈহিক কাজকর্ম বড় ক্লান্তিকর রাজুর কাছে। মুখ ধোও, কলঘরে যাও, ছোট বাইরে-বড় বাইরে সারো।

ধীরে ধীরে প্রবল অনিচ্ছের সঙ্গে সবই সেরে নেয় রাজু। এর মধ্যেই টুসির অনর্গল কথা শুনে নিতে থাকে। কেষ্ট কাল রাত থেকে হাওয়া, বউদির পেটে রাজপুত্রের মতো ছেলে ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। রাজুদা নাকি আজই চলে যাবেন? সে হবে না।

বাইরের দিকে আলাদা একটা ঘরে কুঞ্জর ডিসপেনসারি। আজ রোদ হাওয়ার দিনে একাই বেরিয়ে পড়বে বলে রাজু ঘরের বার হয়ে ডিসপেনসারির দরজায় একটু দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো কাঠের বেঞ্চে বিস্তর ছেলেছোকরা গুলতানি করছে। কয়েকজন বিমর্ষ চেহারার রুগিকেও দেখতে পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা চেয়ারে কুঞ্জ বসা, সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজের পুরিয়ায় গুনে গুনে বড়ি ফেলছে। একবার চোখ তুলে রাজুকে দেখে স্মিত হাসি হেসে বলে, উঠেছিস? আয়, বোস এসে।

রাজু বলে, আমি একটু ঘুরে আসছি।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। চলে যেতে গিয়েও রাজু মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই রাজু হঠাৎ কেমন ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে গেল। কুঞ্জ যখন তাকাল তখন রাজু কেন একটা মড়ার মুখের মতো ছাপ দেখল ওর মুখে? কেন দেখল, ওর চোখের মণি উর্ধ্বমুখী এবং স্থির? কেন ওর সাদা ঠান্ডা ঠোঁট? পাঁশুটে দাঁত? কেন মনে হল, কুঞ্জর গায়ের চামড়ার নীচে জমাট রক্তের আড়ষ্টতা?

কুঞ্জ কি মরে যাবে? আজ কিংবা কাল?

রাজু ডিসপেনসারির বারান্দা থেকে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। দুর্যোগের পর আজ চারদিকে এক পুকুর রোদ টলটল করছে। টেরিলিনের মতো মসৃণ নীল আকাশ, চারদিকে গাঢ় সবুজ গাছপালার গহিন রাজ্য। রাজু কিছু ভাল করে দেখছিল না। আজ তার কি কোনও অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? নাকি এ সব তার আবোল-তাবোল ভাবনা মাত্র?

সামনে আড়াআড়ি পথ পড়ে আছে। রাস্তায় পা দিয়ে রাজু অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারল না, কোনদিকে যাবে। ডানদিকের পথটায় ভারী সুন্দর গাছের ছায়া পড়ে আছে। লোকজন নেই। শুধু একটা একলা কুকুর ল্যাং ল্যাং করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। রাজু সেই দিকে হাঁটতে থাকে।

ফাঁকা রাস্তায় রাজু একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা ভাল না মন্দ তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে চারদিক থেকে অজস্র অদ্ভুত সব গন্ধ ভেসে আসছে। তার মধ্যে এই গন্ধটাই তাকে টানছে। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে রাজু এগোতে থাকে। অনির্দিষ্টভাবে বেড়াবে বলে বেরিয়ে এসেছে সে, কিন্তু এখন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, তার এই গন্ধটা অনুসরণ করে যাওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেতে হবে তাকে।

মাঝে মাঝে উত্তরের শুকনো ঠান্ডা বাতাসে গন্ধটা হারিয়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় রাজু। চারদিকে

চেয়ে প্রবলভাবে শ্বাস টানে। আকুলি ব্যাকুলি করে ওঠে বুক। গন্ধটা হারিয়ে গেল না তো! না, আবার পায়। রাস্তা ছেড়ে ঘাস জমিতে নেমে গাছপালার মধ্যে গন্ধটা খুঁজতে হয় তাকে। শুঁড়িপথ ধরে সে তর তর করে এগোতে থাকে। গত রাত্রির জল-কাদায় থকথকে পথটাকে সে গ্রাহ্য করে না। এগোতে হবে। কোথাও পৌঁছোতে হবে।

একটা বাঁশঝাড়ের কোণে ভারী নিস্তব্ধ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পথ ঠিক করতে চেষ্টা করছিল রাজু। সে সময়ে হঠাৎ টের পেল, কাল রাতের মতো আজও সে অন্য এক চোখে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছে। যেন পিছন দিকে তার লেজ নড়ে উঠল হঠাৎ। কান দুটো খাড়া হল। বুঝতে পারল, সে অবিকল কুকুরের চোখে চেয়ে আছে। রোদ, আলো, হাওয়া কোনওটারই আর কোনও অর্থ নেই তার কাছে। তার আছে এক গন্ধের জগৎ। অনেক বিচিত্র শব্দও পায় সে। বহু অদ্ভুত পোকামাকড় দেখে চারদিকে। মাথার মধ্যে কোনও চিন্তা নেই। আছে শুধু এক গন্ধের নিশানা। শুধু জানে, যেতে হবে। কিন্তু যেদিকেই যাক সেদিকেই পথে পথে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা হবে বলে টের পায় সে। খুবই সতর্কতা দরকার। বহু বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায় সে। আলো অন্ধকারের কোনও অর্থ নেই তার কাছে। শুধু জানে কখনও সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কখনও আবছা। চারদিকে এখন সেই স্পষ্টতা। এটা খেলার সময়। সে টের পায় তার কোনও আপনজন নেই। জন্ম বা মৃত্যুর কোনও চিন্তা নেই। অভাববোধ নেই। সে জানে, খুঁজলে খাবার পাওয়া যাবে। দেহের প্রয়োজনে আর একটা দেহ জুটে যাবে ঠিক।

রাজু এগোতে থাকে। গন্ধের রেখাটা মাটির সমান্তরাল এক অদৃশ্য সুতোর মতো চলেছে। কোনও অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে এক-আধবার ঘুরে পিছনটা দেখে নেয় সে। থমকে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনে। কে ডাকল ঘেউ! জবাব দিতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু দিল না। এখন এগোতে হবে।

শুঁড়িপথটা একটু আগেই আর একটা পথে মিশে গেছে। সেখানে গন্ধের সুতো তাকে টেনে নেয় একটা মস্ত ঘেরা বাগানের দিকে। বাগানের ফটকের ভিতরে ঢুকে পড়ে রাজু। গন্ধটা এখানে খুব গাঢ়, ঘন, পুঞ্জীভূত।

গাছপালার ভিতরে একটা নির্জন কোণে ফাঁকা সবুজ একটা মাঠের মতো জায়গা। সেখানে চুপ করে নিঝুম হয়ে বসে আছে মেয়েটি। তোলা হাঁটুতে মুখ, ডান হাতে আনমনে ঘাস ছিঁড়ছে। চেয়ে আছে, কিন্তু বাইরের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দেখছে নিজের ভিতরের নানা দৃশ্য।

গন্ধটা এইখানে মূর্তি ধরে আছে। উন্মুখ রাজু সামনে দাঁড়ায়। তার ছায়া পড়ে মেয়েটির সামনে।

বনশ্রী চমকায় না। ধীরে মুখ তুলে তাকায়। অনেকক্ষণ লাগে তার পৃথিবীতে ফিরে আসতে।

রাজুরও অনেকক্ষণ লাগে কুকুর থেকে মানুষের অনুভূতি ও বোধে জেগে উঠতে।

তারপর দু'জনেই দু'জনের দিকে ক্ষণকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বনশ্রী ধীরে উঠে দাঁড়ায়, মৃদু স্বরে বলে, আপনি!

যে গন্ধের রেখা ধরে সে এসেছে তার উৎস যে বনশ্রী তা তো রাজু জানত না। কেন সেই গন্ধ তাকে টেনে এনেছে এখানে তাও জানা নেই। কিন্তু মনের মধ্যে জল-বুদবুদের মতো অস্পষ্ট কথা ভেসে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। একে কি কিছু বলার আছে রাজুর?

এক বিচারহীন অনুভূতির জগৎ থেকে বুদ্ধির জগতে জেগে উঠেছে রাজু। শহুরে অভিজ্ঞতা আর বোধ-বুদ্ধি খেলে যাচ্ছে মাথায়। চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে সামান্য হেসে সে বলে, আপনাদের বাগানটা বেশ। বেড়াতে বেরিয়ে বাগানটা দেখে বড় লোভ হল, তাই ঢুকে পড়েছি।

বনশ্রী হেসে বলে, বাগানটা এমন কী সুন্দর! এখন আর গাছ-টাছ লাগানো হয় না। এমনি পড়ে থাকে। কত জঙ্গল হয়েছে।

রাজু মাথা নেড়ে বলে, সাজানো বাগান আমার ভাল লাগে না।

সাজানো বাগানের কথায় কী ভেবে মুখ নিচু করে একটু হাসে বনশ্রী। রাজু স্পষ্ট দেখল, বনশ্রীর

মুখ থেকে মিষ্টি হাসিটুকু ঝরে পড়ল ঘাসের সবুজে, ফুলের পরাগের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল বাতাসে, ওর গা থেকে একটা শ্যামল আলো গিয়ে রোদের সঙ্গে মিশে নরম করে দিল আলোর প্রখরতা। ভারী স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ। দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার নামী কাগজে ইংরিজি আর বাংলায় বুঝে না-বুঝে রাজু আর্ট রিভিউ লিখে আসছে। ছবির চোখ আছে বলেই আবহে ছড়িয়ে যাওয়া হাসিটাকে বুঝতে পারে রাজু। চারদিকে নিবিড় গাছপালার গাঢ় সবুজ, রুপোলি রোদ আর অনেকখানি প্রসারিত ফাঁকা জমির ওপর স্নিগ্ধ শ্যাম মেয়েটির এই ছবি যদি আঁকতে চায় কেউ তবে তাকে খুব বড় দার্শনিক হতে হবে। একটা সবুজ বাগান, কালো মেয়ে বা ফরসা রোদ এঁকে দিতে পারে যে কোনও ছেঁদো পেইন্টার। গভীর অনুভূতি ছাড়া কী করে টের পাওয়া যাবে এখানে এখন বাতাসের গায়ে রোদের কুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে? ঘাস থেকে এই যে গাঢ় সবুজ আভা উঠে এসে সবুজে ছুপিয়ে দিল বনশ্রীকে, কে দেখবে তা?

কী করে সাধারণ চোখে বোঝা যাবে, মেয়েটির অনেকখানি গলে মিশে আছে চারপাশের সঙ্গে? কে বুঝবে, পিছনে মস্ত ফাঁকা অনেকখানি ওই যে পটভূমি তা কেন্দ্রাভিগ গতিতে ছুটে আসছে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে? তারা বলছে, সরে যেয়ো না, চলে যেয়ো না। তুমি না থাকলে মূল খিলানের অভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পটভূমি। সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

বনশ্রী মুখ তুলে বলল, কাল সারা রাত আপনাদের ঘুম হয়নি, না? টুসি বলছিল।

টুসি কে মনে পড়ল না রাজুর। কাল রাতে সে কি ঘুমোয়নি? হবেও বা। যা মনে এল তাই বলে দিল রাজু, রাতটা কেটে গেছে কোনওক্রমে। অন্ধকারেই যত গণ্ডগোল। দিনটা কত ফরসা আর স্পষ্ট!

বনশ্রী মায়াভরা মুখে বলল, বেড়াতে এসে কষ্ট পেলেন। আসবেন আমাদের বাড়িতে? আসুন না, চা খেয়ে যাবেন!

সকালে যখন মেয়েটিকে দেখেছিল তখনও রাজুর মনের মধ্যে একটা কালো বেড়াল হেঁটে গিয়েছিল। এখনও গেল। মেয়েটির মুখের উজ্জ্বলতায় মিশে আছে একটু পাপ। চালচিত্রের মতো ঘিরে আছে। পেখম মেলেছে ময়ূরের মতো। এই উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নয়। দূর থেকে কে যেন আয়নার আলো ফেলার মতো বনশ্রীর মুখে অনবরত প্রক্ষেপ করে যাচ্ছে নিজেকে। কোথায় যেন জ্বালা ধরেছে বনশ্রীর। গেঁয়ো মেয়ে, খুব বেশি ভাববার মতো মাথা নয়। তবু সাজানো বাগানের কথা শুনে হেসেছিল কেন? ও কি এখন একটা সাজানো বাগান ছেয়ে ফেলতে চায় ভয়ংকর বন্যতা দিয়ে? ভাঙতে চায় কারও সাজানো সংসার?

রাজু বনশ্রীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, চলুন।

৯

উঠতে গিয়ে মাথাটা পাক মারল একটা। টেবিলটায় ভর দিয়ে সামলে নিল কুঞ্জ। শ্বাস কিছু ভারী লাগছে! বুকে অস্পষ্ট ব্যথা।

সাবিত্রীর বাবা এসেছে। ভিতরবাড়িতে একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু বড় দ্বিধা আসছে। দিনের আলো, চেনা মানুষজন, কথাবার্তা কিছুই সহ্য হচ্ছে না তার। একটা অন্ধকার ঘরে একা যদি বসে থাকতে পারত কিংবা যদি চলে যেতে পারত অনেক দূরে!

ডিসপেনসারির দরজায় তালা দিয়ে কুঞ্জ খুব ধীর পায়ে যেন হাঁটুভর জল ঠেলে ভিতর বাড়িতে আসে। মুখ তুলে কোনও দিকে চায় না।

সাবিত্রীর ঘরে অনেকের ভিড়। শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে সাবিত্রীর বাবা বসে আছে। তাকে ঘিরে মেয়েমানুষেরা একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। কুঞ্জ ঘরে ঢুকে সবার পিছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ কোনওদিকে চাইতে পারে না। কিন্তু যখন তাকাল তখন যেদিকে, যার দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছিল তার মুখের ওপর সোজা গিয়ে পড়ল চোখ।

অত ভিড়ের মধ্যেও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সাবিত্রীর অপলক চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁট সাদা, মুখ ফ্যাকাসে, বসা চোখের কোলে দুই বাটি অন্ধকার টলটল করছে। তবু সবটুকু প্রাণশক্তি দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে সাবিত্রী। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, অপরাধবোধ নেই, ধরা পড়বার ভয়ও নেই একরত্তি। কুঞ্জর কাছ থেকে ও কোনও আশ্বাস চায়নি, বিপদ থেকে বাঁচাতে বলেনি, কোনও নালিশ নেই ওর। কুঞ্জর কেমন যেন মনে হয়, সাবিত্রী মানুষকে কুঞ্জর সাথে তার সম্পর্কের কথা বলে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ওকে বোধহয় ঠেকানোও যাবে না। ও কেমন? বেহেড? মেয়েমানুষের কীই বা জানে কুঞ্জ! ওরা যখন বেহেড হয় তখন বুঝি এরকমই হয়। কই, তনু কোনওদিন কারও জন্য হয়নি তো! বরং নাড়ি টিপে, বুকের স্পন্দন শুনে, রক্তচাপ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা যেমন রুগিকে যাচাই করে তেমনি আবেগহীন ঠান্ডা মাথায় তনু তার প্রেমিকদের যাচাই করেছে। মেয়েমানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণাটা কুঞ্জর মনে গেঁথে দিয়েছিল সে-ই। ধারণাটা ভাঙল। যদি বেঁচে থাকে কুঞ্জ তবে আরও কত ধারণা ভাঙবে, আরও কত শিখবে সে।

সাবিত্রীর স্থির তাকিয়ে থাকা দেখে কুঞ্জ চমকায় না। কেবল তার ভিতরটা নিভে যায়। ঠান্ডা এক আড়ষ্টতা শরীরে আস্তে আস্তে নেমে আসে। ভালবাসা কত বিপজ্জনক হয়!

কুঞ্জ দাঁড়ায় না। বেরিয়ে আসে। পিছন থেকে এসে তার সঙ্গ ধরে সাবিত্রীর বাবা। একটু গা শিরশির করে ওঠে কুঞ্জর। ভয়-ভয় করে। বেহেড সাবিত্রী কিছু বলেনি তো! মুখে চোখে তেমন উদ্বেগ নেই, একটু চিন্তার ভ্রূ কোঁচকানো রয়েছে কেবল। বার-বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওর মা'র হার্টের ব্যামো, দেখবে কে? যেমন আছে থাক, বরং তুমিই দেখো।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে, ক'দিন ঘুরে এলে পারত।

বলতে গিয়ে সে টের পায়, কখন গলাটা যেন ধরে গেছে।

সাবিত্রীর বাবা মাথা নেড়ে বলে, বাড়িতে ওকে দেখবার কেউ তো নেই। এখানে তোমাদের বড় পরিবার, দেখার লোক আছে। আমার সবচেয়ে বড় ভরসা অবশ্য তুমি।

কুঞ্জ মুখ নিচু করে থাকে, বলে, এখন কিছুদিন বাইরে গেলে ওর মনটা ভাল হবে। শরীরটা—

সাবিত্রীর বাবা ঝাঁকি দিয়ে বলে, এ অবস্থায়? পাগল হয়েছ? ওর মা'র চিকিৎসা করাতেই আমি ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছি। ঘন ঘন ই সি জি, ওষুধ; সাবি নিজেও তো যাওয়ার কথায় তেমন গা করল না। বলল, এখানে তাকে দেখার লোক আছে।

কুঞ্জর আর কী বলার থাকতে পারে? চুপ করে রইল। সাবিত্রী যাচ্ছে না। তার মানে, সাবিত্রী রইল।

বার-বাড়িতে রওনা হওয়ার মুখে একটু দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর বাবা বলে, কেষ্টকে আজ সকালেই বাগনান স্টেশনে দেখা গেছে জানো বোধ হয়?

কেষ্টর নাম কানে আসতেই বুকটা হঠাৎ ক্ষণেকের জন্য পাথর হয়ে যায়। কথা বলতে গলাটা কেঁপে গেল, না তো!

আমার দু'জন ছাত্র দেখেছে। বলছিল। বোধহয় ট্রেন ধরে কলকাতা কি আর কোথাও পালাল। খবরটা সময়মতো পেলে ধরতাম গিয়ে।

পালিয়েছে! কেষ্ট পালিয়েছে! তা হলে কেষ্টর সঙ্গে এখন মুখোমুখি হতে হবে না তাকে! কুঞ্জর মনটায় একটা ভরসার বাতাস দোল দেয়। যদি পালিয়ে থাকে তবে এখনও খুব বেশি লোককে বলে যেতে পারেনি কেষ্ট। খুব বেশি দুর্বল করে দিয়ে যায়নি কুঞ্জর ভিত। পরমুহূর্তেই কুঞ্জর মনের মধ্যে লুকোনো কাঁটা খচ করে বেঁধে। কেষ্ট নয়, কেষ্টর চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক সাবিত্রী।

বাগনানের স্কুলমাস্টার বিদায় নিলে কুঞ্জ খুব আস্তে আস্তে একদিকে হাঁটতে থাকে। আর গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

এই যে এইখানে মস্ত পিপুল গাছ, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় এই গাছের তলায় একটা সাদা খরগোশ ধরেছিল কুঞ্জ। খরগোশটা তেমন ছুটতে পারছিল না, একটু যেন খুঁড়িয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে থিরিক থিরিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দামাল কুঞ্জ তাড়া করে করে ধরে সোজা বুকের মধ্যে জামার তলায় চালান করে দিল। আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দিয়েছিল খরগোশটা। আজও খুঁজলে ডানহাতের কড়ে আঙুলে স্পষ্ট দাগটা দেখা যাবে হয়তো। কামড় খেয়েও ছাড়েনি। বুকের মধ্যে কী নরম হয়ে লেগে ছিল খরগোশ! নরম হাড়, তুলতুলে শরীর, চিকন সাদা লোম, চুনি পাথরের মতো লাল চোখে বোতামের ফাঁক দিয়ে দেখছিল কুঞ্জকে। চেয়ে কুঞ্জ মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল, এ আমার। দিন দুই তাদের বাড়িতে ছিল খরগোশটা। রজনীগন্ধা ফুল খেতে ভালবাসত খুব, কাঠের বাক্সে ঘুমোত। তারপর খবর হল ভঞ্জবাড়ির খরগোশ পালিয়েছে। লোকে খুঁজছে। কুঞ্জর মা খবর পাঠিয়ে দিতে বড় বাড়ির চাকর এসে নিয়ে গেল একদিন। খুব কেঁদেছিল কুঞ্জ। গভীর দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝতে শিখেছিল, এ পৃথিবীতে কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়।

এই দিকটা ভারী নির্জন। ভাঁট জঙ্গলের আড়াল। পিপুলের ছায়ায় ভেজা মাটিতে বসে সামনে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে উদাস মাঠখানার দিকে চেয়ে থাকে কুঞ্জ। কী জানি কেন, আজ সেই খরগোশটার কথা তার বড় মনে পড়ছে। কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়, এ কথা ভঞ্জদের খরগোশের কাছে শিখেছিল কুঞ্জ। যখন রাত্রিবেলা সব সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়ে নিশি-পাওয়া সাবিত্রী আসত তার কাছে তখন সে কি জানত না, এ হল কেষ্টর বউ? তার নয়?

একটা নোংরা কাদামাখা রোগা ডেঁয়ো পিঁপড়ে তার গোড়ালি বেয়ে উঠে আসছে। পায়ের লোমের ভিতর দিয়ে বাইছে সুড়সুড় করে। হঠাৎ ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে কুঞ্জর গা। পিঁপড়েটা ঝেড়ে ফেলে সে ওঠে, দাঁড়ায়। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোয়নি কুঞ্জ, তার ওপর রাতে অত ভিজে ঠান্ডা বসেছে বুকে। হঠাৎ দাঁড়ালে, হাঁটতে গেলে টলমল করছে মাথা। ডান বুকে একটা ব্যথা থানা গেড়ে বসে আছে কখন থেকে। গায়ে কিছু জ্বরও থাকতে পারে।

কিন্তু শরীরের এই সব অস্বস্তি ভাল করে টেরই পাচ্ছিল না কুঞ্জ। এঁটেল কাদায় পিছল আলের রাস্তায় ভাঙা জমি আর কখনও আগাছা ভেদ করে হাঁটছে সে। এই পষ্টাপষ্টি আলোয় যতদূর দেখা যায়, এই তেঁতুলতলা বেলপুকুর শ্যামপুর জুড়ে গোটা চত্বরকে সে শিশুবয়স থেকে জেনে এসেছে নিজের জায়গা বলে। এইখানেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ চেনাচেনি। কিন্তু এখন তার কেবলই মনে হয়, এ সব তার নিজের নয়। এ বড় দূরের দেশ। এখানে বিদেশি মানুষের বাস। এ তো তার নয়।

মাথার মধ্যে বিকারের মতো অসংলগ্ন সব চিন্তা ভিড় করে কথা কইছে। একবার যেন সে তনুকে ডেকে বলল, তোমার জন্যেই তো। কোনওদিন বুঝতে দাওনি যে, তুমি আমার নও। যখন পরের জিনিস হয়ে গেলে তখনও মনে হত, তুমি আমার, অন্যের কাছে গচ্ছিত রয়েছ। ভাবতুম একদিন খুব বড় হব, নাম ডাক ফেলে দেব চারদিকে, সেদিন বুঝবে তুমি কাকে ছেড়ে কার ঘর করছ। বুঝলে তনু, আমাদের শিশুবয়স কখনও কাটে না। কোনটা আমার, কোনটা নয় তা চিনতে এখনও বড় ভুল হয়ে যায়।

নিচু একটা জমিতে জল জমে আছে এখনও। কুঞ্জ জলে নামবার মুখে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় জলে। সামান্য বাতাসে জল নড়ছে, তার ছায়াটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। এক দুই পাঁচ সাত টুকরো হয়ে যাচ্ছে কুঞ্জ। এই হচ্ছে মানুষের ঠিক প্রতিবিম্ব। কোনও মানুষই তো একটা মানুষ নয়, এক এক অবস্থায় পড়ে সে হয়ে যায় এক এক মানুষ। আর বেশি দিন নয়, কেষ্ট ফিরবে, বেহেড সাবিত্রী বিকারের ঘোরে প্রলাপের মতো গোপন কথা বিলিয়ে দেবে বাতাসে। তেঁতুলতলা, বেলপুকুর,

শ্যামপুর হয়ে বাগনান পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে কথা। লোকে জানবে জননেতা কুঞ্জনাথ আসলে কেমন মানুষ।

জলের মাঠ পার হয়ে কুঞ্জ ঢালু জমি বেয়ে উঠতে থাকে। সামনেই অনেক ক'টা নারকোল গাছের জড়ামড়ি। তার ভিতরে সাদা উঠোন। দুটো মাটির ঘর।

ভূতগ্রস্তের মতো কুঞ্জ এগোতে থাকে। উঠোনে পা দেওয়ার মুখে একবার ফিরে তাকায়। অনেক দূর অবধি ঢলে পড়েছে গভীর নীল দ্যুতিময় আকাশ। কী বিশাল ছড়ানো সবুজ। কুঞ্জ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে কেষ্টকে ডেকে বলে, এ সব কিছু নয় রে। সময় কাটতে দে। একশো বছর পর দেখবি আজকের কোনও ঘটনার চিহ্নই নেই পৃথিবীতে। কেউ মনে করে রাখেনি। সময় এসে পলিমাটির আস্তরণ ফেলে যাবে। কুঞ্জ আর সাবিত্রীর কেচ্ছা নিয়ে যেটুকু হইচই উঠবে, পৃথিবীর মস্ত মস্ত ঘটনার তলায় কোথায় চাপা পড়ে যাবে তা। মানুষ কি অত মনে রাখে!

প্রায় মাইল তিনেক একনাগাড়ে হেঁটে এসে কুঞ্জ উঠোনের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা রোদে কাঁথা মাদুর শুকোচ্ছে, একটা কালো চেহারার বাচ্চা বসে খেলছে আপনমনে। কাক ডাকছে। উত্তরের হাওয়া বইছে গাছপালায়।

কুঞ্জ ডাকল, পটল। এই পটল।

প্রথমে অনেকক্ষণ কেউ সাড়া দিল না। বাচ্চাটা হাঁ করে বোধহীন চোখে চেয়ে রইল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে উঠোনের মধ্যে এগিয়ে যায়। দাওয়ায় ওঠে। ডাকে, পটল।

নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশাল চেহারার পটল আচমকা দরজা জুড়ে দেখা দেয়। গলায় কর্ম্ফর্টার, মাথা কান ঢেকে একটা লাল কাপড়ের টুকরো জড়ানো! ক্রূর চোখ, মুখে হাসি নেই। ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, কী বলছ?

কথা আছে।— কুঞ্জ চোখে চোখে বলে, বাইরে আসবি?

আমার শরীর ভাল নয়। হাঁফের টান উঠেছে, পড়ে আছি।— পটল এক পা ঘরের মধ্যে পিছিয়ে যায়, যা বলবার এইখানে বলো।

কুঞ্জ ঠান্ডা গলায় বলে, আমার সঙ্গে লোক নেই রে। ভয় খাস না।

পটল একটু ঝোঁকে উঠে বলে, ভয় খাওয়ার কথা উঠছে কেন বলো তো?

কুঞ্জ খুব ক্লান্ত গলায় বলে, অস্তরটা নিয়ে বেরিয়ে আয়। মাঠবাগে চল, যে জায়গায় তোর খুশি। আজ কেউ ঠেকাবে না। মারবি পটল?

পটল তেরিয়া হয়ে বলে, তোমার মাথাটা খারাপ হল নাকি? ঝুটমুট এসে ঝামেলা করছ? বাড়ি যাও তো বাবু, আমার শরীর ভাল নয় বলছি।

দাঁতে দাঁত চেপে কুঞ্জ গিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, ভ্যাপসা গন্ধ। পটল পিছিয়ে অন্ধকারে সেঁধোয়। কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে, আমি কখনও মিছে বলেছি রে? বিশ্বাস কর, সঙ্গে লোক নেই, লুকোনো ছুরিছোরা নেই। মারলে একটা শব্দও করব না। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞেস করব। বাইরে আয়।

পটল বাইরে আসে। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ কাশে, গয়ের তোলে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, কী হয়েছে বাবু তোমার, বলো তো?

কুঞ্জ পাথরের মতো ঠান্ডা গলায় বলে, রেবন্ত আমাকে মারতে চায় কেন বলবি?

পটল ভারী অবাক হয়ে তাকায়। তারপর ময়লা ছ্যাতলা পড়া দাঁত বের করে হেসে বলে, বলছ কী গো! তোমায় রেবন্তবাবু মারতে চাইবে কেন? মাথাটাই বিগড়েছে। বাড়ি যাও তো বাবু।

তুই টাকার জন্য সব করতে পারিস জানি। তোর কথা ধরি না। কিন্তু রেবন্ত কেন চায় তার ঠিক কারণটা বলবি?

ঝুটমুট আমাকে ধরছ বাবু। আমি মরি নিজের জ্বালায়।

ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কি কিনে ফেলেছিস পটল?

পটল এ কথায় বিন্দুমাত্র চমকায় না। কলাবাগান কেনার জন্য সে বহুকাল ধরে চেষ্টা করছে। কথাটা সবাই জানে। পটল ঝিম ধরে চোখ বুজে থেকে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, বলল, টাকা কই?

কেন, রেবন্ত দেবে না?

পটল একটা ঝোড়ো শ্বাস ছেড়ে বলে, পটলকে সবাই দেওয়ার জন্য বসে আছে! রেবন্তবাবু দেবে কেন বলো তো?

বলে পটল মিটমিটে ক্রূর চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে।

কুঞ্জর মাথায় এখনও সঠিক যুক্তি বুদ্ধি ফিরে আসেনি। কেমন ধোঁয়াটে অসংলগ্ন চিন্তা। বলল, হাবুর ঝোপড়ায় কেষ্ট তোদের সঙ্গে রোজ বসে?

পটল একটু চুপ করে থেকে দুঃখের সঙ্গে বলল, তার আর আমরা কী করব বলো। বসে।

কিছু বলে না?

কী বলবে?

বলে না যে—

বড় ঠিক সময়ে কুঞ্জর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আমার নিন্দে করে না?

তুমি আজ ভারী উল্টোপাল্টা বকছ বাবু।— পটল বিরক্তি প্রকাশ করে মুড়ি দিয়ে বসে। উঠোনের দিকে চেয়ে বলে, নিন্দে করার কী আছে, তুমি কি মন্দ লোক?

কুঞ্জ সামান্য হেসে বলে, তবে কি ভাল? তুই কী বলিস?

পটল আবার হাসল। বলল, লোক ভাল, তবে ডাক্তার ভাল নও। বাপের এলেমদারিটা পাওনি। হরিবাবুর দু ফোঁটা ওষুধে ছ' মাস খাড়া থাকতাম। হরিবাবা গিয়ে অবধি রোগটার চিকিৎসে হল না আর। ভাল করে ভেবেচিন্তে একটা ওষুধ দিয়ো দিকি।

কুঞ্জ চেয়ে ছিল। পটল তার কাছে ওষুধ চাইছে। হঠাৎ খুব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে কুঞ্জর বুকটা অনেক হালকা লাগল। এতক্ষণ যে জ্বরটা তার মাথায় বিকারের ঘোর তৈরি করেছিল তা হঠাৎ ছেড়ে গেল বুঝি।

পটলের বউ বাসন্তী কতক কাঁথা কাপড় কেচে নিয়ে এল পুকুরঘাট থেকে। উঠোনে ঢুকে কুঞ্জকে দেখে একটু অবাক। জড়সড় হয়ে বলে, ভাল আছেন তো বাবু?

জেলেপাড়ার মেয়ে বাসন্তীকে চেনে কুঞ্জ। এর আগে আরও দু'বার বিয়ে বসেছিল। কুঞ্জ যতদূর জানে, ওর দু' নম্বর স্বামীকে শিবগঞ্জের হাটে পটলই খুন করেছিল।

বাসন্তীর পিছনে গোটা তিন-চার ছেলে মেয়ে। কুঞ্জ স্থির চোখে চেয়ে দেখে। তিন পক্ষের ছেলেপুলে নিয়েই পটলের ঘর করছে বাসন্তী। গোটা সমাজটা যদি এরকম হত তো আজ বেঁচে যেত কুঞ্জ।

পটল ধীর স্বরে বলল, বাড়ি যাও বাবু।

কুঞ্জ ওঠে। বাইরে এসে উদাস পায়ে ফের তিন মাইল পথ ভেঙে ফিরতে থাকে।

দক্ষিণে শিয়র। শিয়রে খোলা জানালা দিয়ে রোদ হাওয়ার লুটোপুটি। বেলাভর জামগাছে কোকিল ডেকেছে। সেই জানালা দিয়ে বাতাসের শব্দের মতো মৃদুস্বরে ডাক এল, সাবিত্রী।

জেগে ঘুমিয়েছিল সাবিত্রী, অথবা ঘুমিয়ে জেগে। হয়তো ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। বার বার ঢুলে পড়ছে ঘুমে, জেগে উঠছে। কখন ঘুম কখন জেগে ওঠা তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। জেগে যার কথা চিন্তা করছে, ঘুমের মধ্যে সে-ই হয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন। কাকে ভাবছে? আপনমনে মৃদু হাসে সাবিত্রী। কুঞ্জ ছাড়া কখনও আর কারু কথা তার মনেই আসে না যে। সম্পর্কের কথা তোমরা কেউ

বোলো না, বোলো না। বলি, রাধা মেনেছিল? বঙ্কিমের উপন্যাসে শৈবলিনীর বর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রতাপ কি তোমার জার? শিউরে উঠে শৈবলিনী বলেছিল, না, আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল। সাবিত্রীকে কেউ যদি প্রশ্ন করে, কুঞ্জ কি তোমার প্রেমিক? সাবিত্রী ভেবে পায় না কী বলবে। সে কখনও কুঞ্জকে আপনি থেকে তুমি বলেনি। শরীরের গাঢ়তম ভালবাসার সময়েও নয়। প্রেমিক নয়, তবে? কী দেখে মজলে সাবিত্রী? ও যে রোগাটে, কালো, ফুসফুসে জখম, ঘাড় শক্ত। কী এমন ও! তার সাবিত্রী কী জানে? কুঞ্জ সুন্দর কি না তা তো কখনও ভেবেও দেখেনি সাবিত্রী। তবে? আছে, তোমরা জানো না, আছে। ও কি যে সে? বাগনানের জনসভায় সেই প্রায়-কিশোরী বয়সে সাবিত্রী দেখেছিল কুঞ্জকে। কালো, রোগা এক মানুষ হ্যাজাকের আলোয় দাঁড়িয়ে মুঠি তুলে বক্তৃতা দিচ্ছে। সেই অদ্ভুত গম্ভীর, বিষাদময়, তীব্র ও গভীর স্বর যেন দিকদিগন্তে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। কারও মনে নেই, কুঞ্জরও না, স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রেসিডেন্ট কুঞ্জর হাত থেকে প্রাইজ নিয়েছিল সাবিত্রী। তখন কুঞ্জ দাড়ি কামায় না। অল্প নরম দাড়িতে আচ্ছন্ন শান্ত মুখ, টানা কোমল দুটি চোখে বৈরাগ্যের চাহনি। কতই বয়স তখন কুঞ্জর! তবু সেই বয়সেই সে এ অঞ্চলের প্রধান নেতা। প্রাইজ নিতে আঙুলে আঙুল ছুঁয়েছিল বুঝি। সাবিত্রীর সেই শিহরন আজও রয়ে গেছে। ও কি আমার প্রেমিক? না তো। প্রেমিক বললে যে ভারী ছোট হয়ে যায় ও। তার চেয়ে ঢের বেশি যে। ও কি আমার প্রভু দেবতা? ও সব ভারী বড় বড় কথা। ওতে ওকে মানায় না যে। তবে কী সাবিত্রী? তবে ও তোমার কে?‘সাবিত্রী মৃদু হাসি হেসে বালিশের কানে কানে বলে, ও আমার।

ঘুমিয়ে ছিল কি সাবিত্রী? নাকি জেগে ছিল? ডাক শুনে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে মৃদু ঝংকারে। কিন্তু চমকায়নি সাবিত্রী, তার সমস্ত শরীর ওর ডাকে এমনিভাবেই সাড়া দেয়। স্বপ্নোত্থিতের মতো সাবিত্রী মাথাটা তুলে বলে, বলুন।

জানালার ওপাশটা দেখা যায় না। ওপাশে রয়েছে ভাট ঘেঁটুর জঙ্গল, খেতের মাচান। জানালা দিয়ে কিছু গাছপালা, আকাশের নীল চোখে পড়ে।

মৃদু বাতাসের মতো স্বর বলে, আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। আমরা এ সব কী করলাম?

বিমুগ্ধা সাবিত্রী মৃদু একটু হাসে। বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে করতলে গাল পেতে বলে, আপনি কেন নষ্ট হবেন? পুরুষদের তো দোষ লাগে না।

কে বলল দোষ লাগে না? জানাজানি হয়ে যাবে সাবিত্রী। তখন আমার যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাবে।

সামান্য একটু ভাবে সাবিত্রী। তারপর বলে, আপনি তো সকলের মতো সাধারণ মানুষ নন। আলোর গায়ে কি ছায়া পড়ে?

ও সব বই-পড়া কথা। তোমার নিজের বিপদের কথাও কি কখনও ভাবো না সাবিত্রী?

সাবিত্রী আপনমনে অদ্ভুত একটু হেসে বলে, পোয়াতির পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গেল, আর কী বিপদ হবে?

বাইরে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। মৃদু স্বরে বলে, আমি মরে গেলে সব মিটিয়ে নিয়ো সাবিত্রী। কাউকে আমার কথা বোকার মতো বলতে যেয়ো না। আমি তোমার ভাল চাই।

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়। সচকিত হয়। কষ্টে উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলে, ও কথা কেন বলছেন? মরবেন কেন? মরা কি আপনাকে মানায়? শুনুন, আমি না হয় আর কখনও কাউকে বলব না।

কিন্তু জানালার ওপাশে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, টের পেল সাবিত্রী। নিমীলিত চোখে সে ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখল। প্রথমে দু’ ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। তারপর আবার কান্না। আমি যে মরার কথাও ভাবতে পারি না। মরলে ভালবাসব কী করে? ভালবাসা-নিদানে, পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু পেলে কোনখানে?

ভিতরের বারান্দায় কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে কোলে খাতা রেখে রাজু পেনসিলে দ্রুত হাতে চিরশ্রীর স্কেচ আঁকছে। তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়।

এ পর্যন্ত গোটা সাতেক স্কেচ এঁকে দিয়েছে রাজু। বনশ্রীর, সবিতাশ্রীর, সত্যব্রতর, শুভশ্রীর, আর কিছু পাড়া-পড়শির। তার আগে ভরাট গলায় শুনিয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। ফাঁকে ফাঁকে পলিটিক্স আর আর্ট নিয়ে দেদার কথা বলেছে। হাত দেখেছে সকলের। খেয়েছে অন্তত চার কাপ চা, ওমলেট, চালকুমড়োর পুর ভাজা। অবশেষে সবিতাশ্রী বলেছেন, আজ আর দুপুরে কুঞ্জদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। যা অঘটন ঘটল ওদের বাড়িতে। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, এ বেলা তুমি এ বাড়িতে খাবে।

এ কথা শুনে রাজু হঠাৎ মুখ তুলে বনশ্রীর দিকে চেয়ে ফেলল। তারপর প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল, কোন বইতে সে যেন ঠিক এইভাবে প্রেম হওয়ার কথা পড়েছিল। শরৎচন্দ্র? হবে। কিন্তু একসময়ে এরকম ভাবেই প্রেম হত।

তবে রাজু নেমন্তন্নটা নিয়ে নিল।

সবিতাশ্রী একটু দেরিতে হলেন, কিন্তু সত্যব্রত মুগ্ধ হয়েছেন অনেকক্ষণ আগেই। এ ছোকরা একে বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক, তার ওপর কলকাতার ছেলে। শ্যামশ্রীর বিয়ের পর সত্যব্রত মনে মনে স্থির করে রেখেছেন আর কোনও মেয়ের বিয়ে গাঁয়ের ছেলের সঙ্গে দেবেন না। কলকাতায় দেবেন। সেই ছেলেই বুঝি আজ হেঁটে এল ঘরে। কী ভাল ছেলে। কী চোখা আর চালাক। কত খবর রাখে। তার ওপর সান্যাল, বারেন্দ্র, স্বঘর। এত যোগাযোগ একসঙ্গে হয় কী করে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকে? সবিতাশ্রী রান্নাঘরে গেলে তাঁর পিছু পিছু সত্যব্রতও গেলেন। নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন দু'জনে।

সেই ফাঁকে রাজু মুখ তুলে বনশ্রীকে বলল, এভাবেও হয়।

বনশ্রী সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। এর আগে সে কোনওদিন প্রেমে পড়েনি। আজ একদিনে দু'বার পড়ল কি? সে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, কী?

রাজু ফের স্কেচ করতে করতে বলে, কোথায় যেন পড়েছিলাম। আগে এইভাবে হত। প্রথম যাতায়াত, তারপর খাওয়া-দাওয়া, তারপর—

থেমে চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে রাজু ফের বলে, এ ভাবেও হয়।

স্কেচটা শেষ করে পাতাটা ছিঁড়ে চিরশ্রীর হাতে দিল রাজু। কিশোরী মেয়েটির লাবণ্যে ঢলঢল মুখ আলোয় আলো হয়ে গেল নিজের অবিকল ছবি দেখে।

পরের পাতায় রাজু দুটো নিখুঁত বৃত্ত আঁকল পাশাপাশি। তারপর মৃদু একটু হাসল। বনশ্রী একটু ঝুঁকে এল দেখতে। বলল, এটা কী?

বলুন তো কী?

বনশ্রী তার বিশাল চুলের বোঝা সমেত মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে বলে, জানি না তো কী আছে আপনার মনে।

রাজু দুটো বৃত্তকে ভরে দিল স্পোক দিয়ে, আঁকল মাডগার্ড, হ্যান্ডেল, সিট।

বনশ্রী ভ্রু তুলে বলে, ও মা! একটা সাইকেল!

একটা সাইকেল। অনেকক্ষণ ধরে সাইকেলটাকে টের পাচ্ছে রাজু। খুব দূরে নয়। একটা সাইকেল গাছপালার আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে। ঝরে পড়া শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কখনও উঁচু নিচু খানা-খন্দে ঝাঁকুনি খেতে খেতে, অপথ কুপথ দিয়ে চলেছে অবিরাম। উৎকর্ণ হয়ে সাইকেলের শব্দ শোনে রাজু। মনের পর্দায় আবছা দেখতে পায় সাইকেলের ছায়া। চোরের মতো, ভয় দ্বিধা লজ্জায় জড়ানো তার গতি। কিন্তু ঘুরছে। অনেকক্ষণ ধরে এ বাড়ির

চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। একবার, দু'বার, তিনবার করে অসংখ্যবার। এক-একবার যেন আবর্তন পথ থেকে সরে যাবে বলে সাইকেলের মুখ ফেরাতে চাইল অন্যদিকে। পারল না। কেন্দ্রাভিগ এক আকর্ষণ টেনে রাখল তাকে।

রাজু সাইকেলের ছবিটা শেষ করে বলে, একটা সাইকেল হলে বহু দূর ঘুরে আসা যেত। একটা সাইকেল কত কাজে লাগে।

বনশ্রী খুব হেসে বলে, সাইকেল চাই বললেই তো হয়। আমাদের বাড়িতে দু'-দুটো সাইকেল।

রাজু সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভ্রু কোঁচকানো, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আপন মনে বলে, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে সাইকেলটা।

বনশ্রী সামান্য অবাক হয়ে বলে, কে ঘুরছে? কার সাইকেল?

আছে।— বলে উঠোনে নেমে পড়ে রাজু। একটা সাইকেলের ছায়া, মাটিতে চাকা গড়িয়ে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট শব্দকে লক্ষ্য করে এগোতে থাকে।

বাড়ির পিছন দিকে মস্ত খড়ের টাল, ধানের গোলা। সবজির খেত। কপিকল লাগানো একটা কুয়ো থেকে কালো একটা মেয়েছেলে জল তুলছিল, অবাক হয়ে দেখল একটু। খেত ডিঙিয়ে রাজু এগোতে থাকে। অনেকটা জমি পার হয়। সামনে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মতো এক ধরনের জঙ্গল।

পিছনে তিরতিরে পায়ে বনশ্রী এগিয়ে আসতে আসতে ডাকে, শুনুন, শুনুন, কোথায় চললেন? ও দিকে পথ নেই যে।

মানুষের ভাষা রাজু বুঝতে পারে না আর। হিলহিলে সরীসৃপের মতো পিছল গতিতে এগিয়ে যায় সে। চোখে বহু দূরবর্তী এক সাইকেলের ছায়া, কানে মৃদু সাইকেলের শব্দ। ঘাসজঙ্গল মুহূর্তে পার হয়ে যায় সে। সামনে শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল। খুব উঁচু নয়। বুকে ভর রেখে রাজু দেয়ালের ওপর ওঠে। উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে।

বনশ্রী ঘাসজঙ্গল ভেদ করে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাকছে, শুনুন, ও মশাই, পড়ে যাবেন যে। কী করছেন বলুন তো?

মাতালের মতো টলতে টলতে সাইকেলটা আসছে। বড় ধীর গতি। ডান দিক থেকে মোড় ফিরে একটা কাঁচা নর্দমা পার হল ঝকাং করে। খানিকটা উঁচু জমি বেয়ে উঠে এল কষ্টে। সাইকেলটার গা ধুলোয় ধুলোটে, পিছনের টায়ারে হাওয়া নেই, তেলহীন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে যন্ত্রপাতির।

একদৃষ্টে সাইকেলটা দেখল রাজু। এত ক্লান্ত সাইকেল সে আগে কখনও দেখেনি। সামনে সাদা ধুলোর পথের ওপর পড়ে আছে চাকার অসংখ্যবার পরিক্রমার ছাপ।

রাজু বিড়বিড় করে বলে, এ ভাবেও হয়।

ভেবে দেখলে কাজটা খুব সহজ নয়। গলায় ফাঁস আটকে টেনে ধরলে মরতে শ্যামশ্রীর দু' মিনিট লাগবে। তারপর সিলিং-এর আংটায় ঝুলিয়ে তলায় একটা টুল কাত করে ফেলে রাখলে হুবহু আত্মহত্যার মতো দেখাবে। কিন্তু সন্দেহের ঊর্ধ্বে কি তবু থাকতে পারবে রেবন্ত? পুলিশ খোঁজ করবে আত্মহত্যা কবুলের চিঠি। আর, আত্মহত্যা করার সময়ে কেউ ঘরের দরজা খুলে রেখে মরে না তো, রেবন্ত বাইরে থেকে কী করে ভিতরে দরজায় খিল দেবে?

একটা হয়, যখন পুকুরে যাবে তখন জঙ্গুলে পথটায় যদি মাথায় ইট মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। বাদবাকি রাস্তাটুকু টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিলেই হল। পরিষ্কার অ্যাকসিডেন্টের মামলা। অবশ্য শ্যামা সাঁতার জানে, সুতরাং পুলিশের সন্দেহ থেকেই যাবে। মাথার চোটটাই বা গোপন করবে কীভাবে? আর লোকের চোখে পড়ার ভয়ও থেকে যাচ্ছে না? পুকুরঘাট তো বাথরুম নয়।

যদি শ্যামাকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যায় রেবন্ত? খুব উঁচু পাহাড় হবে, খাড়াই। একদম ধারে

চলে যাবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে। শেষ সময়টায় একটু চমকে দিতে হবে ওকে। সতর্কতা হারিয়ে ফেলবে তখন। সামান্য একটু ধাক্কা মাত্র। একটু সাবধান হতে হবে রেবন্তকে, শেষ সময়ে না পড়বার মুহূর্তে তাকে আঁকড়ে ধরে। যেভাবে মারলে কাজটা অনেকখানি বিপদমুক্ত। খোঁজখবর কি আর হবে না? রেবন্ত তো হোটেলে নিজের আসল নাম-ঠিকানা লেখাবে না। খোঁজ করে হয়রান হবে পুলিশ।

খবরের কাগজে পড়েছে রেবন্ত, দিঘার সমুদ্রের ধারে কটেজে কয়েকটাই খুন হয়েছে। মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুরুষটা লোপাট। দিঘা খুব দূরেও নয়। যাবে? কিন্তু পুলিশ নয় তার খোঁজ নাই পেল, বাড়ির লোক কিছু জানতে চাইবে না? শ্যামশ্রীর বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করবে না, শ্যামাকে কোথায় রেখে এলে রেবন্ত? একটা ক্ষীণ উপায় আছে অবশ্য। রেবন্ত রটিয়ে দেবে, শ্যামা আর একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। খুব অবিশ্বাস্য হবে না। ওদের রক্তে চরিত্রহীনতার বদরক্ত কি নেই? কেন, সেই মাসি, যে বিয়ের আগে ছেলে প্রসব করেছিল?

কিন্তু যত দিক ভেবে দেখে রেবন্ত, কোনও দিকই নিরাপদ মনে হয় না। সন্দেহ থেকে যাবে, বিপদ থেকে যাবে।

কিছু করতেই হবে যে রেবন্তকে! এতদিন বনশ্রী সম্পর্কে তার কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। আজ সকালে অঝোর আলোয় স্বচ্ছ জলের মধ্যে রঙিন মাছের মতো সে দেখেছে বনশ্রীর হৃদয়। এতটুকু সন্দেহ নেই আর। বনশ্রীর এই দুর্বলতাটুকু কতদিন থাকবে তার কোনও ঠিক তো নেই। তাই দেরি করতে পারবে না রেবন্ত।

পটলকে বলবে? ভাবতে ভাবতে ব্রেক কষে রেবন্ত। সাইকেল থেমে টলে পড়ে যেতে চায়। পায়ে মাটিতে ঠেকা দিয়ে রেবন্ত একটু ভেবে মাথা নাড়ে। মেয়েছেলে মারতে চাইবে না পটল। নিজের বউকে ও বড় ভালবাসে। তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কেনার বড় ইচ্ছে ওর। রাজি হতেও পারে।

প্যাডেলে আবার ঠেলা মারে রেবন্ত। গত রাত্রির জল রোদের প্রচণ্ড তাতে টেনে গিয়ে এখন ধুলো উড়ছে। থেমে গেছে রেবন্ত। মুগার পাঞ্জাবি, সাদা শাল, কাঁচি ধুতির আর সেই জেল্লা নেই। তার মুখ শুকিয়ে চড়চড় করছে এখন। তবে চলেও যেতে পারে না সে। আর একবার বনশ্রীর গভীর দৃষ্টি দেখবে না? আর একবার শিউরে দেবে না ওকে? কী করে চলে যাবে সে? কত সহজেই ওদের বাড়িতে এতদিন হুটহাট এসে ঢুকে গেছে রেবন্ত, কিন্তু আজ সকালের দুর্বলতাটুকুর পর আর কিছুতেই ফটক পেরোতে পারছে না। এক টান-সুতোয় বাঁধা সে সম্মোহিতের মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে কেবল! কখন কোন কাঁটায় লেগে পিছনের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, উঁচুনিচু পথহীন জমি, আগাছা, খানাখন্দ দুরমুশ করে চলেছে অবিরাম সাইকেল। বড় ক্লান্ত হয়েছে শরীর। প্রতিবারই মনে হয়, এবার চলে যাব, আর ফিরব না।

চলে গিয়েওছিল রেবন্ত। তেজেনের দোকান অবধি। আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুখে মন ডাক দিল, আর একবার দেখে যাই। এরকম কয়েকবারই চলে গিয়ে ফিরে এসেছে রেবন্ত। ঘুরছে আর ঘুরছে। বাগানের অত ভিতরে গভীরে কেন বাড়ি করলে তোমরা বনা? কেন এত দুর্লভ হলে?

ভ্রু কুঁচকে আনমনে শ্যামার কথা মাঝে মাঝেই ভেবে দেখে সে। না মেরেও হয়। যদি বনশ্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাই? থাক না শ্যামা বেঁচেবর্তে!

সব দিক ভেবে দেখছে রেবন্ত। পালানোও বড় মুখের কথা নয়। চাকরির প্রশ্ন, আশ্রয়ের প্রশ্ন, টাকার প্রশ্ন নেই? ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

কাঁচা নর্দমার ওপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সাইকেলের চাকা গেল। নিচু দেয়ালের ওপর দিয়ে বার বার ভিতরবাগে চেয়ে দেখেছে রেবন্ত। শুধু গাছপালা, দূরে একটা কপিকলের মাথা, বাড়ির ছাদ। আর কিছু দেখা যায় না।

উল্টো সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখে সে। যদি শ্যামা না-ই মরে, যদি পালানোও ঘটে না-ই ওঠে, তবে একদিন নির্জনে বনশ্রীকে সম্মোহিত করবে রেবন্ত। হয়তো বাধা দেবে বনশ্রী। সব বাধা কি মানতে হয়? শরীরে শরীর ডুবিয়ে দেবে জোর করে। তখন সুখ। এতদিন এত সহজে এ সব কথা ভাবতে পারেনি সে। কাঁটা হয়ে ছিল কুঞ্জ। ঘাড় শক্ত, রোগা গড়নের তেরিয়া কুঞ্জ। নীতিবাগীশ, অসহ্য রকমের সৎ ও বিপজ্জনক রকমের সমাজ-সংস্কারক।

হেসে ওঠে রেবন্ত। বেলুন চুপসে গেল রে কুঞ্জ? শেষে ভাদ্দর-বউ? হাঃ হাঃ! হাসতে হাসতে বুঝি চোখে জল এসে যায় তার। শেষে কেষ্টর বউ? বেড়ে! বাঃ! এই তো চাই। জুজুর মতো তোকে ভয় খেতুম যে রে! অ্যাঁ, ভাবতুম যা-ই করি কুঞ্জ ঠিক টের পাবে। কুঞ্জর হাজারটা কান, হাজারও চোখ। ঠিক এসে পথ আগলে দাঁড়াবে। গুপ্ত কথা টেনে বের করবে পেট থেকে। শেষে ভাদ্দর-বউ কুঞ্জ? অ্যাঁ!

রেবন্ত মাথা নাড়ে। বড় কষ্টে প্রাণপণে প্যাডেল মেরে একটা উঁচু জমিতে ঠেলে তোলে হাওয়াহীন সাইকেল। কপালের ঘাম মুছবে বলে রুমালের জন্য পকেটে হাত দেয়। তারপরই ভীষণ চমকে যায় সে। সামনের পথের ওপর লাফিয়ে নামল, ও কে? বাজু না?

সাইকেলের হ্যান্ডেল টালমাটাল হয়ে যায়। প্রাণপণে সামনের চাকা সোজা রাখে রেবন্ত। খুব জোরে প্যাডেল মারতে থাকে। সাইকেল ধীরে ধীরে এগোয়।

রেবন্ত শক্ত করে মাথা নামিয়ে রাখে, যাতে চোখে চোখ না পড়ে যায়। হয়তো রাজুর তাকে মনে নেই, হয়তো চিনতে পারবে না। রেবন্তও চেনা দেবে না।

তবু বুক কাঁপতে থাকে তার। কাল রাতে অন্ধকারেও তাকে দেখেছিল নাকি রাজু? চিনেছিল? এ পথে ও ফাঁদ পেতে বসে ছিল না তো! দাঙ্গাবাজ ছেলে রাজু। হামলা করবে না তো?

কিন্তু রাজু কিছুই করে না। সাইকেল ওর খুব কাছ ঘেঁষে পেরিয়ে যায়। রেবন্ত মাথা তোলে না। কিন্তু খুব জোরে প্রাণপণে চালাতে থাকে তার সাইকেল। কিন্তু হাওয়াহীন চাকা এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ক্লান্ত শরীরে তেমন টানতে পারে না। ভারী ধীরে চাকা ঘুরছে।

পিছু ফিরে চোর-চোখে চায় রেবন্ত। আবার চমকে যায়। রাজু আসছে একটু লম্বা পায়ে, তার দিকে স্থির চোখ রেখে হেঁটে আসছে রাজু। মন্থর সাইকেলের সঙ্গে সমান গতিবেগ বজায় রেখে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে রেবন্ত। সিট থেকে উঠে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে ধরে প্যাডেল। নির্মম পায়ের লাথিতে দাঁতে দাঁত চেপে সাইকেলটাকে নির্যাতন করে। কিন্তু নিঃশেষ আয়ুর মতো সাইকেলের গতি ক্রমে আরও কমে আসতে থাকে। রাজু এগিয়ে আসছে। খুব জোরে নয়। প্রায় স্বাভাবিক হাঁটার গতিতে। কিন্তু রেবন্তর সাইকেল যেন আজ এক কোমর জলের মধ্যে নেমেছে। এগোয় না, পালাতে চায় না, ধরে দেবে বলে কেবলই পেছিয়ে পড়ে।

রাজু আসছে। রেবন্ত রাস্তায় উঠে মাঠের দিকে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পিচ রাস্তা ধরলে অনেকখানি পথ। অত পথ পেরোতে পারবে না। কোনাকুনি মাঠ পেরোলে খালের সাঁকো পেরিয়ে বাজারে উঠলেই সাইকেল সারাইয়ের দোকান।

রেবন্ত পিছনে তাকায়। রাজু স্থির চোখে চেয়ে সোজা চলে আসছে। আসছেই। যদি ধরতে চায় তবু একটু জোরে পা চালালেই ধরতে পারে। তা করছে না রাজু। সে সমান একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু আসছে।

বহুকাল এমন শরীরে কাঁটা দেয়নি রেবন্তর। মাঠের গড়ানে জমিতে সাইকেল ছেড়ে দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে নামতে নামতে তার মনে হল, এই নির্জন মাঠে রাজুর মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে?

আবার তাকায় রেবন্ত। একই গতিতে রাজু আসছে। তার পিছু পিছু। মাঠের ঢালু বেয়ে ওই নামল। এখনও একটু দূরে। তবে অনেকটা কমে আসছে দূরত্ব।

মাঠের মধ্যে উল্টোপাল্টা হাওয়ায় সাইকেল টাল খায়। বেঁকে যায় হাতল। এগোয় বটে, কিন্তু

বড্ড পিছনের টান। কোত্থেকে এল রাজু? কী করে টের পেল সে ওই পথ দিয়ে সাইকেলে আসবে?

রেবন্ত পিছনে আর একবার চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। জোরে চালাতে চেষ্টা করে লাভ নেই। রাজু ঠিক তার পিছনে এসে গেছে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে আলতো করে ছুঁয়ে আছে ক্যারিয়ার।

রেবন্ত ব্রেক চেপে ধরে। নামে। বলে, রাজুবাবু, কেমন আছেন?

রাজু অবাক হয়ে তার দিকে চায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তাকে। বলে, আরে! রেবন্তবাবু না?

চিনতে পারছিলেন না?— কাঠ-হাসি হেসে রেবন্ত বলে।

না তো! আপনাকে লক্ষ করিনি। আমি শুধু সাইকেলটা দেখছিলাম।

সাইকেল!— বলে বুঝতে না পেরে রেবন্ত রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কোন শহুরে চালাকি বাবা!

মায়া ভরে সাইকেলের সিটে হাত রেখে রাজু বলে, সাইকেলের মতো জিনিস হয় না। একটা সাইকেল থাকলে কত দূর চলে যাওয়া যায়!

বড্ড ঘেমে যাচ্ছে রেবন্ত। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বিপদটা কোন দিক দিয়ে আসবে। সাইকেলের প্রসঙ্গটা একদম ভাল লাগছে না তার। রুমালে ঘাড় গলা মোছে রেবন্ত। ভাববার সময় নেয়। রাজু তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় চট করে। বলে, এই সাইকেলটাই নিয়ে ঘুরে আসতে পারতেন, কিন্তু এটার পিছনের চাকাটায় হাওয়া নেই যে!

ভারী খুশি হয়ে রাজু বলে, তা হোক, তা হোক। আফটার অল সাইকেল তো!

কথাগুলো যত বুঝতে না পারে ততই মনে এক আতঙ্ক জেগে ওঠে রেবন্তর। রাজু পাগল নয়। ক্ষুরের মতো ওর বুদ্ধির ধার। ওর মুখোমুখি হলেই একটা ঝাঁজ টের পাওয়া যায়। কেমন গুটিয়ে যেতে, লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে জাগে। রেবন্ত তাই বলল, রেখে দিন তা হলে সাইকেলটা। পরে কুঞ্জর বাড়ি থেকে নিয়ে যাব।

রাজু কোনও কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের কথা বলল না। এক ঝটকায় রেবন্তর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সাইকেলটা। ঘুরিয়ে নিয়ে মহানন্দে উঠে বসল সিটে।

রেবন্ত মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখে দৃশ্যটা। কোনও মানে হয় না। রাজু হাওয়াহীন চাকার সাইকেলে মাতালের মতো টলতে টলতে ওই দূরে চলে যাচ্ছে।

রেবন্ত বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। মাথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তা খামচে ধরেছে হঠাৎ। কোনও মানে হয় না।

১১

শ্যাওলা-ধরা পিছন দেয়ালের একটা খাঁজে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর রেখে উঠে বনশ্রী অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল। ধূলিধূসর সাইকেলে হা-ক্লান্ত রেবন্ত আর তার পিছু পিছু রাজু। একটা আতা গাছ তার উজ্জ্বল সবুজ পাতা নিয়ে ঝেঁপে পড়েছে সামনে। তার আড়ালে চলে গেল ওরা।

এত অবাক বনশ্রী যে, ডাকতেও পারল না। রেবন্ত এই অবেলায় বাড়ির পিছনের ছাড়া জমিতে কী করছিল? কেনই বা রাজু বলছিল সাইকেলের কথা?

বনশ্রী পাঁচিল থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ফটকের দিকে যেতে থাকে। একটা কিছু হবে, একটা কিছু ঘটবে, তার মন বলছে।

ফটকের বাইরে এসে একই দৃশ্য দেখতে পায়। একটু দূরে খুব ধীরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে রেবন্ত। পিছনে রাজু। রেবন্ত মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে রাজুকে।

এত দূর থেকে ডাকলে রাজু শুনতে পাবে না। বনশ্রী তাই দ্রুত পায়ে এগোতে থাকে। তাড়াহুড়োয় চটি পায়ে দিয়ে আসেনি, কাঁকর ফুটছে, ব্যথা লাগছে বড্ড। তবু বনশ্রী হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় মাঠের ধারে শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঠের মাঝখানে সাইকেলের দু'দিকে দু'জন দাঁড়িয়ে। কী কথা হচ্ছে ওদের? মারামারি হবে না তো! ভাবসাব বড় ভাল লাগে না বনশ্রীর। বুকটা কেঁপে ওঠে।

মাঠে নামতে ঢালুতে পা বাড়িয়েছিল বনশ্রী, হঠাৎ দেখল রাজু সাইকেলটা কেড়ে নিয়েছে রেবন্তর কাছ থেকে। বহু দূরে মাঠের মধ্যে একা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে রেবন্ত। রাজু টলমল করে বাচ্চা ছেলের মতো চালিয়ে আসছে সাইকেল। মুখে উপচে পড়ছে হাসি। একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে হাঁটা দিল। ক্রমে মিলিয়ে গেল অজস্র ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে। ব্যাপারটা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না বনশ্রী।

রেবন্ত চলে গেলে বনশ্রী তরতর করে নেমে আসে খোলা মাঠের মধ্যে। রাজু এখনও অনেকটা দূরে। হাত তুলে বনশ্রী ডাকে, এই যে শুনুন, শুনছেন? এই যে!

রাজু টলমলে সাইকেলে আসতে আসতে খোলা মাঠের মধ্যে হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গিয়ে চক্কর খায়। আবার এগিয়ে আসে। কী ভেবে আবার উল্টোবাগে ঘুরে দূরে চলে যেতে থাকে।

আচ্ছা পাগলা! বনশ্রী ডান হাতখানা তুলে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, শুনুন, শুনুন, ও মশাই, শুনছেন? স্নান করবেন না? খিদে পায় না আপনার?

রাজু আবার ঘুরে গেল অন্য দিকে। বনশ্রী আবছা শুনতে পায় সাইকেলে বসে রাজু গান গাইছে—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বড্ড বাঁধন-ছেঁড়া, বড্ড অবাধ্য লোক তো! বনশ্রী দাঁতে দাঁত চাপে। রাগে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লঘু পায়ে ছুটে যায় সে। কোথায় পালাবে লোকটা? পালাতে দেবে কেন বনশ্রী?

ধীর সাইকেলে কিছু দূর চলে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে আসতে থাকে রাজু। যেন জীবনে প্রথম সাইকেল শিখছে।

বনশ্রীর মুখ লাল। ঘামে ভেজা, চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে কপালে। সাইকেলের পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে বলে, এটা কী হচ্ছে শুনি!

রাজু বনশ্রীর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। হঠাৎ হ্যান্ডেল ছেড়ে দু'হাত তুলে চেঁচায়—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী হ্যান্ডেল ঠেলে ধরে। সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে। রাজু ফের টেনে তোলে সাইকেল। গম্ভীর মুখে বলে, এটা নিয়ম নয়।

বনশ্রী হাসে, আমি নিয়ম মানি না।

কাতর স্বরে রাজু বলে, সবাই দুয়ো দেবে যে!

অবাক বনশ্রী বলে, কীসের জন্য দুয়ো দেবে?

রাজু মাথা নেড়ে বলে, সাইকেল থামাতে নেই! অবিরাম চলবে। অবিরাম। ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী বাধা দিতে ভুলে যায়। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাজু হাওয়াহীন চাকার ধীরগতি সাইকেলে উঠে ভারী কষ্টে প্যাডেল ঠেলতে থাকে।

মাটির নীচে প্যাচপ্যাচে জল, কাদামাখা ঘাস, পিছল জমি হাওয়াহীন চাকাটাকে টেনে ধরে বার বার। গভীর চাকার দাগ বসে যেতে থাকে মাটিতে। সাইকেল ধীরে ধীরে চক্কর দেয়।

বনশ্রীর গা শিউরে ওঠে হঠাৎ। সে দেখে, রাজুর সাইকেল তাকে মাঝখানে রেখে বার বার ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে।

নিজের রোগলক্ষণ খুব ভাল চেনে কুঞ্জ। বুকে ধীরে ধীরে জল জমছে। জ্বর বাড়ছে। অপঘাতের জন্য তাকে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। শুধু নিজেকে একটু ঠেলে দিতে হবে মৃত্যুর গড়ানে ঢালুর ওপর দিয়ে। যখন গড়িয়ে যাবে তখন কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা না করলেই হল! আজ দুপুরে খুব ঠান্ডা হিম পুকুরের জলে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে স্নান করবে সে। পেট পুরে খাবে ভাত, ডাল, অম্বল। হইহই করে জ্বর বেড়ে পড়বে বিকেলের দিকে। ভাবতে ভাবতে কুঞ্জ একটু করে হাসে, আর শুকনো ঠোঁট চিরে রক্ত গড়িয়ে নামে।

তেল মেপে পয়সা গুনে নিয়ে তেজেন ফিরে এসে চৌকিতে উবু হয়ে বসে বলে, মাতালের কথা কে ধরছে বলো! কত আগড়ম বাগড়ম বলে! বাজারের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আর ওর বউকে নিয়ে অত যে খারাপ খারাপ কথা চেঁচিয়ে বলল তা কে বিশ্বাস করছে? তারপর আমার দোকানেই তো সব এল ভিড় করে। হাসাহাসি কাণ্ড।

কাল কি পরশু রাতে ঘটনাটা আমাকে বলিসনি কেন তেজেন? সারা বাজার জানল, কিন্তু আমার কানে কেউ তুলল না।

তেজেন খুব সান্ত্বনার স্বরে বলে, ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামিয়েছে নাকি? রোজই কোনও না কোনও মাতালের মাতলামি শুনছে সবাই। গুরুত্বই দেয়নি কেউ। আর তোমাকে ও সব কথা বলতে লজ্জা না? বলে কেউ? আজ তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে বললাম। তুমি ভেবো না, ও সব কেউ মনেও রাখেনি, বিশ্বাস তো দূরের কথা।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে, মানুষ ঘেঁটে বড় হলাম রে তেজেন। মানুষের নাড়ি আমি চিনি। ভাল কথা ঢাক বাজিয়ে বললেও মনে রাখে না, মন্দ কথা ফিসফিসিয়ে বললেও মনে গেঁথে রাখে। সবাই না হোক, কিছু লোক কি ভাববে না, হতেও পারে কুঞ্জ এরকম।

দূর দূর! পাগল ছাড়া কে ভাববে অমন কথা? তোমাকে নিয়ে ও সব ভাবা যায়, বলো? কুঞ্জনাথ নামটার মানেই দাঁড়িয়ে গেছে ভদ্রলোক।

কুঞ্জ মাথা নাড়ে। সে জানে। চোখ জ্বালা করে জল আসে তার। মরতেই হবে, তাকে মরতেই হবে। মহৎ এক মৃত্যুর বড় সাধ ছিল কুঞ্জর। হাজার জন জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে যাবে তাকে শ্মশানে। দলের ফ্ল্যাগে ঢাকা থাকবে তার মৃতদেহ। চন্দন কাঠের চিতায় পুড়বে সে। কত মানুষ চোখের জল ফেলবে! রেডিয়োতে বলবে, খবরের কাগজে বেরোবে, জায়গায় জায়গায় শোকসভা হবে। এখন আর তা আশা করে না কুঞ্জ। না, মৃত্যুটা তেমন মহৎ হবে না তার। তবু মৃত্যু তো হবে। সেটা ভেবে বুক থেকে শ্বাস হয়ে একটা ভার নেমে যায়।

তেজেনের দোকান থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকটায় একটু চেয়ে থাকে কুঞ্জ। জমজমাট বাজার। দর্জিঘর, শুকনো নারকোলের ডাঁই নিয়ে বসে আছে ব্যাপারিরা, শীতের সবজির দোকানে দোকানে থলি হাতে লোক। খুব ফটফটে রোদে সব স্পষ্ট পরিষ্কার। তবু এর ভিতরে ভিতরে উইপোকার সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকারের নালি ঘা ছড়িয়ে রয়েছে। বাজার ইউনিয়নের সেক্রেটারি কুঞ্জনাথ তাকিয়ে থেকে বুকভাঙা আর একটা শ্বাস ফেলল। সেই শ্বাস বলে উঠল, ওরা জানে।

জীবনে এই প্রথম মুখ নিচু করে হাঁটে কুঞ্জ। তার শক্ত ঘাড় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তবু কুঁজো হয়ে নিজের পায়ের কাছে মাটিতে মিশে যেতে যেতে সে হাঁটতে থাকে।

মাথায় নীল রঙের ক্র্যাশ হেলমেট, চোখে মস্ত গগলস পরা মামাতো ভাই নিশীথ তার নতুন কেনা স্কুটারে বোঁ-চক্কর দিয়ে এসে খবর দিল, মেলা ঘর পড়ে গেছে। অযোধ্যা, অনন্তপুর, নারকেলদা থেকে বহু লোক বউ-বাচ্চা নিয়ে এসে বাজারে থানা গেড়েছে। যাবে না কুঞ্জদা? মাতব্বররা সব তোমার জন্য হাঁ করে বসে আছে যে!

বাইরের ঝড়ে কতটা ভাঙচুর হয়েছে তা ভাল করে দেখতে পায় না কুঞ্জ। সে সারাক্ষণ দেখছে

তার ভিতরে মূল সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে গাছ, উড়ে গেছে ঘরের চাল। ডিসপেনসারির বারান্দায় বিবশভাবে বসে নিজের ভাঙচুর দেখছিল কুঞ্জ।

চল।— বলে উঠতে গিয়ে কুঞ্জর মাথাটা আবার টাল্লা খায়। ডান বুকের ভিতরে একটা রবারের বল ভেসে উঠছে, ফের নেমে যাচ্ছে বার বার। রোগলক্ষণ চেনে কুঞ্জ। স্কুটারের পিছনে বসে বাজারের দিকে যেতে যেতে বার বার ঝিমুনি আসছিল তার। মনে হচ্ছিল, একটা ঢালুর মুখে গড়িয়ে যাচ্ছে সে।

মেলা কাদা মাখা, জলে ভেজা বিপর্যস্ত মানুষ, বাজারের পুব ধারে নিজেদের রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। শুকোচ্ছে ন্যাংটো আধন্যাংটো বাচ্চারা, কাঁথাকানি, মাদুর, চাটাই, পরনের কাপড়, শুকোচ্ছে মেয়েদের তেলহীন মাথার কটাসে রঙের চুল। তেজেনের দোকানঘরে পঞ্চায়েতের মাতব্বররা উদ্বিগ্ন মুখে বসে। কুঞ্জকে দেখে তারা শ্বাস ছাড়ে, ওই কুঞ্জ এসে গেছে! ক্লাবের ছেলেরা জড়ো হয়েছে বিস্তর, কিন্তু মাতব্বরদের তারা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। কী করতে হবে, কার হুকুমে কে চলবে তা নিয়ে কোনও মীমাংসাও হচ্ছিল না।

কুঞ্জ আর নিজের শরীরটাকে টের পেল না অনেকক্ষণ। বাজারে তোলা তুলতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেছোকরাদের নিয়ে। একদল গেল নারকেলদা, আর একদল গেল পুবপাড়া, অযোধ্যা, তেঁতুলতলা মুষ্টিভিক্ষা জোগাড় করতে।

বাজারের চালাঘর প্রায় সব ক'টাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তারই বাঁশ খুঁটি দিয়ে মস্ত উনুনে শ-দেড়েক লোকের আন্দাজ খিচুড়ি চাপাতে বেলা হয়ে গেল বেশ।

মহীনের দর্জিঘরের সামনে আতা গাছের ছায়ায় একটা টুল পেতে বসে কুঞ্জ খুব কষ্টে দম নেয়। পোড়া কাঠের ধোঁয়া আর তেল-মশলা ছাড়া খিচুড়ির ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। অনেক বেলা হবে বটে তবু লোকগুলো খেতে পাবে, এই ভেবে কুঞ্জ এক রকম তৃপ্তি পাচ্ছিল। পপুলারিটির কথাটা ক্ষণে ক্ষণে আজও হানা দিচ্ছে বুকের দরজায়। এই তো ডোল আদায় করতে গিয়ে ঘুরে দেখল, সে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষ এখনও না করতে পারে না। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কখনও করে না সে, কারও আঁতে ঘা দিয়ে বা অহংকারে আঘাত করে কথা বলে না, কাউকেই কখনও খামোখা চটিয়ে দেয় না, তোয়াজে সোহাগে সেবা দিয়ে সে মানুষকে অনেকটাই অর্জন করে রেখেছে। তাই আজও কারও কাছে গিয়ে হাত পাততে তার বাধে না। পাতলে পায়ও সে অঢেল। আর এই করে করেই সে কুঞ্জ, এক এবং অদ্বিতীয় কুঞ্জ। হয়তো এখনও তার সবটুকু শেষ হয়ে যায়নি।

ভাবতে ভাবতে দর্জিঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজেছিল কুঞ্জ। অমনি যেন কোত্থেকে কেষ্ট এসে সামনে দাঁড়াল। লাল চোখ, উলো-ঝুলো চুল, বিকট মুখ। বলল, তা বটে। তুমি হলে এ তল্লাটের মস্ত মাতব্বর কুঞ্জনাথ। তবে কী জানো বড় মানুষের দিকেই সকলের চোখ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। নজর রাখে, লোকটা দড়ির ওপর ঠিক মতো হাঁটতে পারছে কি না। নাকি টাল খাচ্ছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কিংবা পড়েই গেল নাকি। উঁচুতে উঠলে তাই সবসময়ে পড়ার ভয়। আমাদের মতো মদো মাতাল বদমাশ যত যাই করি লোকে তেমন মাথা ঘামায় না? কিন্তু তুমি হলে কুঞ্জনাথ, তুমি পড়লে লোকে ছাড়বে কেন? বড় মানুষ পড়লে লোকের ভারী আনন্দ হয়। বড় মানুষের গায়ে থুথু দেওয়ার আনন্দ, বড় মানুষের গায়ে লাথি দেওয়ার আনন্দ।

একটা বিলি-ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে মাতব্বররা যে যার রওনা দিচ্ছে। নেত্য সাঁপুই এসে কুঞ্জর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, পোয়াতি বউটা তোমার জন্যই প্রাণে বেঁচে গেল এ যাত্রা! গোপাল ডাক্তারও বলছিল, কুঞ্জ না থাকলে কেষ্টর বউয়ের হয়ে গিয়েছিল।

মড়ার চোখে কুঞ্জ তাকায়। শুকনো ঠোঁটে একটু হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে রক্তের নোনতা স্বাদ ঠেকে জিভে। সবাই জানে, নেত্য সাঁপুইয়ের পোষা ভূত আছে। এ তল্লাটের লোকের যত গুহ্য আর গুপ্ত কথা, যত কেলেঙ্কারি আছে তার সব খবর এনে দেয় নেত্যকে। নেত্য বাতাস শুঁকে টের পায়

কোথায় মানুষের পচন ধরেছে, নিশুত রাতে কার ঘরে কে যায়, কোথায় ইধার কা মাল উধার হয়।
কুঞ্জ চোখ নামিয়ে নেয়।
নেত্য আফসোসের গলায় বলে, বাড়ি যাও। কাল সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছ।
কুঞ্জ ওঠে। নেত্য সঙ্গ ধরে আসতে আসতে বলে, বউটা রক্ষে পেল সেইটেই এখন মস্ত সান্ত্বনা। তুমি বুক দিয়ে না পড়লে বাঁচত না। গলাটা খাটো করে নেত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, কাল সাঁঝবেলায় বড় মাঠে নাকি কারা হামলা করেছিল তোমার ওপর। বলোনি তো?
কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে, ও কিছু নয়। চোর-টোর হবে, আমাদের দেখে পালিয়ে যায়।
কেষ্টর কোনও খোঁজ পেলে?
খোঁজ করিনি।
নেত্য খুব রাগ দেখিয়ে বলে, খোঁজ নেওয়া উচিতও নয়। পাষণ্ড একেবারে। মুখেরও লাগাম নেই।
শীতটা হঠাৎ ভারী চেপে ধরে কুঞ্জকে। নেত্যর শেষ কথাটায় একটু ইঙ্গিত আছে না? মুখের লাগাম নেই, কথাটার মানে কী?
নেত্য সাঁপুইয়ের মুখের দিকে আর তাকাল না কুঞ্জ, বাঁ ধারে ঢালুতে নেমে যেতে যেতে বলল, চলি নেত্যদা, শরীরটা ভাল নেই।
নেত্য চেঁচিয়ে বলে, এসো গিয়ে।
খালপোলে উঠতে গিয়ে এতক্ষণ বাদে কুঞ্জ আবার তার শরীরটাকে টের পায়। গা ভরে জ্বর আসছে। বুকের ব্যথা চৌদুনে উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শ্বাসকষ্ট চেপে ধরছে কণ্ঠা। দুপুরের সাদা রোদকে হলুদ দেখাচ্ছে চোখে। পুরো রাস্তাটা হেঁটে পার হওয়া যাবে না। কুঞ্জ সাঁকোর ধারে দুর্বল মাথা চেপে উবু হয়ে বসে পড়ে। সুযোগ পেয়ে কেষ্ট যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, দাঁত কেলিয়ে হাসে, বলে, মানুষ পচলে তার গন্ধ বেরোবে না? তোমাকে যে পচায় ধরেছে তা আপনি ছড়িয়ে পড়বে। ও কি ঠেকানো যায়? আমার মুখের কথা বলে লোকে হয়তো প্রথমটায় তেমন বিশ্বাস করবে না, ভাববে কুঞ্জনাথ কি কখনও এ রকম হতে পারে? কিন্তু ধীরে ধীরে পচা গন্ধ ছড়াবে ঠিকই।
সাবিত্রীকে বলে এসেছিল কুঞ্জ, মরবে। মৃত্যুর একটা গহিন গড়ানে ঢালু উপত্যকা এখন তার সুমুখেই। যদি এখন নিজেকে একটু ঠেলে দেয় কুঞ্জ, যদি কোনও কিছু আঁকড়ে না ধরে তবে গড়াতে গড়াতে ঝম করে পড়ে যাবে নীচে, যেখানে মায়ের মতো কোল পেতে আছে শমন। নিজের রোগলক্ষণ চেনে সে। ডান বুকে জল জমছে। ব্যথা জ্বর। আজ ফিরে গিয়ে পুকুরে হিম ঠান্ডা জলে খুব ডুবে ডুবে স্নান করবে কুঞ্জ। ভাত খাবে। রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে। নিজেকে একটু ঠেলে দেওয়া মাত্র।
মুখ তুলে সে তনুকে দেখতে পায় মনের মধ্যে। ভারী জলজ্যান্ত দেখতে পায়। বলে, তনু, একদিন তুমিও তো জানতে পারবে কুঞ্জদাকে যা ভাবতে তা সে নয়!
তনু করুণ মায়াভরা চোখে চেয়ে বলে, আমি তো তোমাকে কখনও ভুলিনি কুঞ্জদা। ঘর-সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকি তবু এক মুহূর্ত আমার মন তোমাকে ছাড়া নয়। তবে তুমি কী করে ভুললে আমাকে? অন্য মেয়ে, পরের বউ, তাকে কী করে চাইলে?
কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, সাবিত্রীকে তো আমার মন চায়নি তনু, শরীর চেয়েছিল। আমার শরীর এঁটো হয়েছে, মন নয়। ঠিক তোমার যেমন।
খালধারে মজন্তালির বাড়ি। কুঞ্জকে দেখে বেরিয়ে এল, কী গো, বসে পড়লে যে! শরীর ভাল তো?
কুঞ্জ মাথা নাড়ে, ভালই।
বলে উঠে দাঁড়ায়। মাথা টলমল করছে। দুপুরের রোদে কাঁচা হলুদের রং দেখছে সে। আর

চারদিকটা কেমন যেন থিয়েটারের সিনসিনারির মতো অবাস্তব। কুঞ্জ হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, সে যেন কল্পনার রঙে ডোবানো অদ্ভুত এক স্বপ্নের মতো জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে। চারদিকটা গভীরভাবে অবাস্তব, অপ্রাকৃত পরীর রাজ্য যেন। ঝিম ঝিম নেশার ঘোরের মতো জ্বর উঠছে তার। ফিরে যাবে নাকি? রিকশা ধরে নিতে পারবে বাজার থেকে কিংবা নিদেন কারও সাইকেলে সওয়ার হতে পারবে।

একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। তারপর ভাবে, নিজেকে সেই গহিন খাদটার দিকে একটু একটু করে ঠেলে দেওয়াই ভাল। সে ফেরে না। বড় মাঠের দিকে এগোতে থাকে।

মস্ত বাঁশবন সামনে। সামনের মেঠোপথে কাঁচা হলুদ রোদে ঝলকানি তুলে কে যেন বাঁশবনের মধ্যে ঢুকে গেল কুঞ্জকে দেখে! চোখের ভুল নয় তো! এক ঝলক দেখা, তবু চেহারাটা কি চেনে না কুঞ্জ? বড় শ্বাসের কষ্ট বুকে। কুঞ্জ একবার বুকটা হাতের চেটোয় চেপে ধরে। বড় করে শ্বাস নেয়। চারদিকে এক অদ্ভুত রঙিন আলোয় অবাস্তব দৃশ্য দেখতে পায় সে। কানে ঝিমঝিম করে ঝিঁঝির ডাক বেজে যাচ্ছে। তবু বাঁশবনের অন্ধকারে ঝরা পাতার ওপর সাবধানী পা ফেলার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পায় সে।

মেঠো পথ ছেড়ে কুঞ্জ বাঁশবনের ছায়ায় ঢুকে যায়। সামনে পথ বলে কিছু নেই। রোগা রোগা অজস্র ফ্যাঁকড়া বের করে বাঁশবন পথ আটকায়। কুঞ্জ গুঁড়ি মেরে ঢোকে ভিতরে। ভিতরে চিকড়ি-মিকড়ি আলো-ছায়া। পায়ের নীচে গতকালের বৃষ্টির জল, পচা পাতা। একটা লম্বাটে ছায়া নিচু হয়ে সরে যাচ্ছে পুব দিকে।

রেবন্ত!— চাপা স্বরে ডাকে কুঞ্জ।

ছায়াটা দাঁড়ায়।

কাতর স্বরে কুঞ্জ বলে, দাঁড়া রেবন্ত। চলে যাস না।

বাঁশবনে বাতাসের শব্দ হয় হু হু করে। পচাটে কটু গন্ধ উঠছে।

রেবন্ত গম্ভীর গলায় বলে, কী বলবি?

ধীরে ধীরে বাঁশ গাছের অজস্র কুটিকাটি ডালপালা সরিয়ে এগোয় কুঞ্জ। গালে মুখে চোখে খোঁচা খায়। তার চাদর ধুতি আটকে যায় বার বার। বলে, আমি মরলে কি ভাল হয় রেবন্ত?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তার আমি কী বলব?

কুঞ্জ প্রাণপণে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে ছায়াটার দিকে এগোয়। বলে, তুই বড় নষ্ট হয়ে গেছিস রেবন্ত। আমিও। আমরা মরলে কেমন হয়?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। প্রায় হাত পনেরো তফাতে রেবন্তকে প্রায় স্পষ্ট দেখতে পায় কুঞ্জ। গায়ে শাল, মুগার পাঞ্জাবি, ধুতি। এলোমেলো চুল। বড় সুন্দর দেখতে।

কুঞ্জ বলে, দাঁড়া রেবন্ত। পালাস না।

রেবন্ত খুব অবহেলাভরে বলে, পালাব কেন? তোর ভয়ে?

কুঞ্জ হাসে। বলে, আজ আর আমাকে ভয় পাস না রেবন্ত?

না।

আগে পেতিস না?

কোনওদিনই তোকে ভয় পেতাম না।

কুঞ্জ গর্জন করে ওঠে, পেতিস না? সত্যি করে বল পেতিস না? তোর সব জানি রেবন্ত। সত্যি করে বল!

খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কুঞ্জ। রেবন্ত মুখ ঘুরিয়ে লম্বা পায়ে একটা ফাঁকা জমি পেরিয়ে আর একটা ঝোপের আড়ালে চলে যায়। বলে, ওইসব ভেবেই আনন্দে থাক। তবে জেনে রাখিস তোকে কেউ ভয় পায় না। ভয় পাওয়ার মতো কী আছে তোর?

কিছু নেই। কুঞ্জ জানে, আর কিছু নেই। থমকে দাঁড়ায় সে। সামনেই যেন কেষ্ট একটা লম্বা বাঁশ বেয়ে নেমে এসে তাকে হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখায়। বলে, তুমি তো আর দাদা নও। তুমি হচ্ছ আমার বউয়ের নাঙ। লোকে জানবে তুমি আর কিছু পেল্লাদ নও, আমরা পাঁচজন যেমন দোষে-গুণে, তুমিও তেমনি।

দাঁড়া রেবন্ত। শোন।

রেবন্ত দাঁড়ায়।

কুঞ্জ বাঁশবনের মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। ভারী নির্জনতা। খাড়া রোদ পড়েছে মুখে। ঝোপের আড়ালে রেবন্ত ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে। বলে, বল।

কুঞ্জ ক্লান্ত স্বরে বলে, আমি যদি মরি তা হলে তো দোষ কাটবে! তখনও কি আমার বদনাম করবি রেবন্ত?

রেবন্ত জবাব দেয় না।

কুঞ্জ আর এগোয় না। উবু হয়ে বসে নিজের টলমলে মাথাটা দু'হাতে ধরে থেকে বলে, আমি একটু ভালভাবে মরতে চাই। দিবি মরতে সেভাবে? একটু সম্মান নিয়ে, একটু ভালবাসা নিয়ে। সাবিত্রীর কথা রটাস না রেবন্ত। পটলকে বলিস আমি সন্ধের পর বড় মাঠে আসব। তৈরি থাকে যেন।

রেবন্ত জবাব দেয় না। বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় তার লম্বা শরীরটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। ঝরা পাতার ওপর পায়ের শব্দ হয় অস্পষ্ট।

১২

খাওয়ার পর ভিতরের বারান্দায় সাইকেলটা কাত করে ফেলে চাকার ফুটো সারাতে বসেছে রাজু। হাতের কাছে বড় কাঁচি, রবারের টুকরো, সলিউশনের টিউব, রবার ঘষে পাতলা করার জন্য ঝামা, হাওয়া ভরার পাম্প। অভ্যেস নেই বলে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। শুভশ্রী করুণাপরবশ হয়ে এসে বলেছিল, দিন না রাজুদা, আমি সারিয়ে দিচ্ছি। রোজ সারাচ্ছি, আমার অভ্যেস আছে।

রাজু রাজি হয়নি।— না, তুমি বরং দূরে বসে ডিরেকশন দাও।

বাইরের কোনও ছেলে বহুকাল ভিতরবাড়িতে ঢুকে এমন আপনজনের মতো ব্যবহার করেনি। সবিতাশ্রীর মুখে তাই মৃদু একটু স্মিত ভাব। বললেন, আমার জামাই বড় বাবু মানুষ। বিয়ের সময় এই দামি সাইকেল যৌতুক দিয়েছিলুম। বেশি দিনের কথা তো নয়, দ্যাখো কেমন দশা করেছে! একটু কিছু গোলমাল হলেই দোকানে দিয়ে আসে। গাঁধীজি চাইতেন নিজেদের কাজ নিজেরা করতে যেন আমরা লজ্জা না পাই। এই যে তুমি কলকাতার বড় ঘরের ছেলে, কেমন বসে বসে সাইকেল সারাচ্ছ, এই ছবিটাই কী সুন্দর।

রাজু মৃদু হাসে শুধু।

সত্যবাবু তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে দৃশ্যটা দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে। সবিতাশ্রী তাঁকে জলের জগ দিয়ে আসতে গেলে তিনি আনন্দের স্বরে বললেন, ছোকরার রোখ দেখেছ! এ জীবনে যে আরও কত উন্নতি করবে! কুঞ্জকে আজ বিকেলেই বলব, বনার সঙ্গে জোড় মেলাতেই হবে।

মা-বাবার মনের ভাব টের পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি বনশ্রীর। তাই আর রাজুর সামনে আসেনি লজ্জায়। ঘরে শুয়ে সে একটা খোলা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে আছে। কতবার যে পড়ল পাতাটা। একটা অক্ষরেরও মানে বুঝল না।

রবিবারের দুপুর। শুভশ্রী ক্লাবে গেল ক্রিকেট খেলতে। বাবা শুলেন। মা বসলেন সেলাই নিয়ে।

রাজুর অদূরে শুধু ডগমগ চোখে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল চিরশ্রী। সে মুগ্ধ, সম্মোহিত। অবশেষে সেও গঙ্গা-যমুনা খেলতে যায়।

দ্বিধা জড়ানো পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে বনশ্রী। বলে, হল?

রাজু মুখ তোলে। একটু হাসে। মাথা নাড়ে, না।

কী অদ্ভুত মানুষ। ওই সাইকেলটা না হলেই চলছিল না? বাড়িতে দু'-দুটো সাইকেল ছিল যে?

রাজু মৃদু হেসে বলে, এই সাইকেলটার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জেনে নেওয়ার আছে।

বনশ্রী হেসে ফেলে। বলে, মাথায় পোকা।

রাজু গম্ভীর মুখে চায়। ফের মুখ নিচু করে ঝামা দিয়ে রবার ঘষে পাতলা করতে করতে বলে, এই সাইকেলটারও কিছু বলবার আছে। শুনতে জানা চাই। সব জিনিসের মধ্যেই ঘটনাপ্রবাহ, চেতনা আর চিন্তার কিছু ছাপ থেকে যায়। নইলে গ্রামোফোনের নিষ্প্রাণ রেকর্ড কি গান ধরে রাখতে পারত?

বনশ্রী তর্ক করল না। কেনই বা করবে? সে এ রকম কথা জন্মে শোনেনি। এ সব কথার প্রতিবাদ করারও কিছু নেই তো! শুনতে বেশ লাগে। হতেও তো পারে!

বলল, আমাকে শেখাবেন?

রাজু রবারে সলিউশন লাগিয়ে টিউবের ফুটোয় চেপে ধরে বলে, কী?

কী ভাবে সাইকেলের কথা বোঝা যায়।

রাজু ঘাড় কাত করে বলে, শেখাব।

টিউবের ফুটো বন্ধ হয়ে গেল অবশেষে। রাজু সাইকেল দাঁড় করিয়ে হাওয়া ভরে। ক্রমে টনটনে হয়ে ওঠে চাকা। বড় উঠোনটায় সাইকেলটাকে একটা চক্কর দিয়ে এনে বারান্দায় পা ঠেকিয়ে দাঁড় করায় রাজু। বলে, চমৎকার।

জড়ো করা হাঁটুতে থুঁতনি রেখে চেয়ে স্মিত হাসে বনশ্রী। বলে, সাইকেল কী বলল?

রাজু হাসে একটু।

সাইকেল বলল, রাজু, আজ সকালেও আমি রেবন্তর ছিলুম, এখন তোমার।

বনশ্রী চোখ বড় করে বলে, আপনার মানে? জামাইবাবুকে সাইকেল ফেরত দেবেন না নাকি আপনি?

রাজু মৃদুস্বরে বলে, কথাটা তো আমার নয়। সাইকেলের। সাইকেল হয়তো ভুল বলছে, কিন্তু বলছে।

আর কী বলছে?

রাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সব কিছু কি সহজে বোঝা যায়? আরও অনেক কিছু বলার আছে এর। ধীরে ধীরে বলবে।

রাজু আবার ধীর গতিতে সাইকেল ছাড়ে। উঠোনে চক্কর দিতে থাকে আস্তে আস্তে।

বনশ্রী জিজ্ঞেস করে, কী বলছে?

রাজু ভ্রু কুঁচকে বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি জানতে চাই ভরদুপুরে এই সাইকেলটা কেন আপনাদের বাড়ির চারদিকে চক্কর মারছিল।

বনশ্রীর মুখে ধীরে একটা ছায়া নামে। সে মৃদুস্বরে বলে, আমি জানি না।

রাজু মৃদু হাসে, আপনার কাছে জানতে চায়ওনি কেউ। সাইকেলই বলবে।

বনশ্রী হঠাৎ তার বিশাল চোখে চেয়ে বলে, ওটা অলক্ষুনে সাইকেল। আপনি ওতে আর চড়বেন না। নামুন শিগগির। নেমে আসুন!

আত্মবিস্মৃত বনশ্রী বারান্দার প্রান্তে এগিয়ে আসে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে ঝুঁকে বলে, আর কিছুতেই না। সাইকেলের কথা বুঝবার দরকার নেই আমাদের।

রাজু চেয়ে দেখে, সকালে যে লোকটা আয়নার আলো ফেলার মতো করে নিজেকে দূর থেকে বনশ্রীর মুখে প্রক্ষেপ করছিল বার বার সে লোকটার দম ফুরিয়েছে। রূপমুগ্ধ সেই অন্যমনস্কতা কেটে গেছে বনশ্রীর।

রাজু সাইকেল থেকে নামে। একটু ভেবে বলে, আমারও তাই মনে হয়। সাইকেলের কাছ থেকে আর কিছু না জানলেও আমাদের চলে যাবে।

বেলা ঢলে পড়ছে। গাছগাছালির রূপময় ছায়া উঠোনে নকশা ফেলে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দূরে কুয়োয় বালতি ফেলার শব্দ হল ছপ। একটা কোকিল শিউরে উঠল নিজের ডাকে।

সাবিত্রী পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা। আবার ও-পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা।

ডাকল, টুসি! ও টুসি!

কেউ সাড়া দিল না।

বড় অভিমান হল, বড় একা লাগল সাবিত্রীর। শিয়রের জানালায় রোদ মরে এল। মহানিমের গাছে কুলকুল করে পাখি ডাকছে হাজারে-বিজারে।

সাবিত্রী শিয়রের জানালার দিকে তাকায়। ও পাশে কেউ নেই, জানে। তবু খুব কষ্টে উঠে বসে সাবিত্রী। জানালার দিকে চেয়ে বলে, আপনার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কোথায় আপনি?

বলে কান পেতে থাকে সাবিত্রী। পায়ের দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে বাতাস এসে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বয়ে যায়।

সাবিত্রী বলে, এরা কেবল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে আমাকে। আবার হয়তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। কোথায় আপনি?

কেউ নেই।

সাবিত্রীর চোখ ভরে জল আসে। বড় অভিমান। বলে, নিজেকে কক্ষনও খারাপ ভাববেন না। লোকে বলবে লম্পট, চরিত্রহীন! লোকে কত বলে। ওরা তো জানে না! দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি নিজে কখনও নিজেকে ভাববেন না।

উত্তর থেকে বাতাস দক্ষিণে বয়ে যায়। বড় ঠান্ডা হিম বাতাস। একটা জোলো অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। আকাশে একটা-দুটো তারা ফোটে।

সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়ার আগে চোখের জল মোছে। শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে বলে, মরে গিয়ে আমাদের কারও লাভ নেই। আছে, বলুন? রবার ঘষে ঘষে পেনসিলের দাগ তুলতুম ইস্কুলে। দাগগুলো না হয় বাদবাকি জীবন ধরে তুলে ফেলব দু'জনায়। বলছি তিন সত্যি, আর রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে নামিয়ে দেখব না আপনাকে। দূরে থাকবেন, কিন্তু বলুন বেঁচে থাকবেন!

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে জানালার দিকে। কেউ জবাব দেয় না। শুধু পাখিদের শব্দ গাঢ় হয়। বাতাস নদীর স্রোতের মতো শব্দ তুলে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে বয়ে যায়।

অবসন্ন মাথাটা বালিশে ফেলে সাবিত্রী। আবার একটা ঘুমের ঢল নেমে আসছে।

সাবিত্রী চোখ বোজে। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। চোখের কোলে জল শুকিয়ে শুকনো নদীর খাতের চিহ্ন আঁকা হয়।

কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড মাঠখানা পার হয় কুঞ্জ। কাঁচা হলুদ রঙের রোদ রক্তের মতো লাল হয়েছিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে চরাচর। আকাশে হাজারও লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। কুঞ্জ দেখে, এক মস্ত সমুদ্রের ধারে বিশাল জাহাজঘাটায় আলো জ্বলছে। সে ওইখানে যাবে।

জ্বরের ঘোর গাঢ় মদের নেশার মতো শরীর ভরে দিল। বার বার টলে পড়ে যায় কুঞ্জ। দাঁড়াতে গেলেই মাথা টলে যায়। তাই হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আবার ওঠে। ভেজা মাটির ওপর কুয়াশার মেঘ ভেসে আছে। ক্রমে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে দিগ্‌বিদিক। পরির জগৎ মুছে যায়। চারদিকে কালো স্লেটে আঁকা এক ভুতুড়ে জায়গার ছবি।

রেবন্তকে কথা দিয়েছিল, সন্ধেবেলায় এই মাঠে থাকবে। কথা রাখল কুঞ্জ। ঠিক যেইখানে রবির টর্চ পড়েছিল কাল সেইখানে এসে দাঁড়াল সে। বলল, পটল, বড় দেরি হল রে! গায়ে জ্বর নিয়ে বাঁশবনের মধ্যে পড়ে রইলুম যে অনেকক্ষণ। বেলা ঠাহর পাইনি। যখন চাইলুম তখন বেলা ফুরিয়েছে। তবু দ্যাখ, কথা রেখেছি। এই তো আমি। দ্যাখ, এই তো আমি। কাজ সেরে ফ্যাল এই বেলা। আর দেরি নয়। কোথায় কোন বাধা হয়, বিঘ্ন আসে!

শুধু বাতাস বইল। চারদিকে লম্বা লম্বা ভূতের ছায়া। আকাশে লণ্ঠন নাড়ে কালপুরুষ। সমুদ্রে অনেক জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

পটল!

কেউ সাড়া দেয় না।

অনেক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কুঞ্জ। বড় হতাশ হয়।

আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবি বাপ! একটা কোপের তো মামলা। এ তো নাটক নভেলের ভ্যানতারা নয় রে! কত জখম আমার শরীরে। টিকটিক করে বেঁচে আছি। তোর হাতও পরিষ্কার। এক কোপে কাজ হয়ে যাবে। আয় রে, তাড়াতাড়ি আয়।

কেউ আসে না। আকাশে লণ্ঠন নড়ে। সমুদ্রে জাহাজ ভেসে পড়ছে একের পর এক। কয়েকটা বাদুড় উড়ে যায় পাগলাটে ডানায়।

বিশাল ভারী মালগাড়ি টানতে যেমন হাফসে যায় পুরনো বুড়ো ইঞ্জিন, তেমনি বড় কষ্টে নিজেকে টেনে এগোয় কুঞ্জ। কোথাও পৌঁছোতে চায় না সে। শুধু একটা গড়ানে মস্ত খাদের দিকে নিয়ে যাবে সে নিজেকে। একটু ঠেলে দেবে শুধু। নীচে গভীর সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে মায়ের মতো। আজ রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে সে, কাল ভোরে পুকুরের হিম জলে ডুবে ডুবে স্নান করবে অনেকক্ষণ। নিজের রোগলক্ষণ সে চেনে।

হিমে ভিজে যাচ্ছে চাদর। মাথায় ঠান্ডা বসে যাচ্ছে। বুকের ডানধারে রবারের বলটা মস্ত হয়ে ফুলে উঠেছে এখন। বাঘের মতো থাবা দিচ্ছে ব্যথা।

কুঞ্জ বসে। হামাগুড়ি দেয়। উঠে আবার কয়েক পা করে হাঁটে। কত ভূতের ছায়া চারদিকে! আকাশে লাল নীল লণ্ঠন দোলে। কত জাহাজ আলো জ্বেলে চলেছে গাঢ় অন্ধকার সমুদ্রে!

শিরীষ গাছের বিশাল ঘন ছায়া পার হতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। খুব ভাল ঠাহর পায় না জায়গাটা। এই কি তেঁতুলতলা? ওই কি পিচ রাস্তা? ওইসব আলো কি ভঞ্জদের বাড়ির?

চারদিকে চায় কুঞ্জ। কত জোনাকি পোকা শেয়ালের চোখের মতো দেখছে তাকে! এইখানে ছেলেবেলায় একটা খরগোশ ধরেছিল না সে? সেই খরগোশ শিখিয়েছিল কিছু জিনিস তার, কিছু তার নয়। বড় ভুল শিক্ষা। আসলে আজ কুঞ্জ শিখেছে, এখানে এই প্রবাসে কিছু তার নয়। পরের ধনে জমিদারি। পরের ঘরে বাস। এই তো কুঞ্জর ঝাটি পাটি গুটিয়ে গেল। যে শরীরটা দেখে কুঞ্জ বলে চিনত লোকে তাও সাপের খোলসের মতো ছেড়ে ফেলার সময় হল। সামনেই গড়ানে ঢাল। মৃত্যুর উপত্যকা কোল পেতে আছে।

গাছের গায়ে ভর রেখে দম নেয় কুঞ্জ। শ্বাসকষ্ট গলায় ফাঁসের মতো এঁটে বসছে ক্রমে।

গাছের ভর ছেড়ে কুঞ্জ টলতে টলতে এগোয়।

ডিসপেনসারির সামনে উপুড় হয়ে থেমে আছে একটা গোরুর গাড়ি। অন্ধকারে দুটো গোরু বড় শ্বাস ফেলে ঘাস খাচ্ছে। একটা ধোঁয়ায় কালি লণ্ঠন জ্বলছে ডিসপেনসারির বারান্দায়। সবই আবছা

দেখে কুঞ্জ। কিন্তু দেখতে পায় একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া। একটা বউ তার মাথার কাছে বসে আছে।

কুঞ্জর কানে ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব শব্দই বড় ক্ষীণ মনে হয়। তবু সে শোয়ানো লোকটার ঘড়ঘড়ে শ্বাস আর ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ঘঙরঘঙ কাশির শব্দ শুনতে পায়।

আলোর চৌহদ্দিতে পা দেওয়ার আগেই বউটি উঠে দু' পা এগিয়ে এসে আর্তস্বরে ডাকল, বাবু!

কুঞ্জর ঘোলাটে মাথার মধ্যে চিৎকারটা ঢোকে। ঢুকে কিছু কুয়াশা কাটিয়ে দেয় যেন। লোকের সামনে কোনওদিন দুর্বলতা প্রকাশ করে না সে। সে যে কুঞ্জনাথ!

প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রেখে গলার ভাঙা স্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে, কে?

আমি বাসন্তী।

কে বাসন্তী?

পটলের বউ। পটল যে যায়! কখন থেকে এসে বসে আছি। গোপাল ডাক্তার জবাব দিয়েছে। বলেছে হাসপাতালে যেতে। সেখেনে নিচ্ছে না।

কুঞ্জ চেয়ে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না অনেকক্ষণ!

বাসন্তী বলে, ও বলছে, হরিবাবুর ভিটেয় নিয়ে চলো। যদি তাঁর আত্মা ভর করে তবে বাঁচব।

টলমল করছিল হাত, পা, মাথা। তবু নিজেকে সোজা রাখতে পারল কুঞ্জ। ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় বলল, কী চাস?

ওষুধ দাও। আর কী চাইব? পটল বলছে তোমার ওপর হরিবাবা মাঝে মাঝে ভর করে।

কুঞ্জ ডিসপেনসারির বারান্দায় উঠে আসে।

ধোঁয়াটে লণ্ঠনের একটুখানি আলোয় ভাল দেখা যায় না। তবু অন্ধকার থেকে যখন আলোর দিকে মুখ ফেরাল পটল তখন সেই মুখ দেখে বুকটা মোচড় দেয় কুঞ্জর। দু'খানা লাল টুকটুকে চোখ, এত লাল যে মনে হয় কেউ গেলে দিয়েছে চোখের মণি। মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মুখের নাল আর শ্লেষ্মায় মাখামাখি ঠোঁট। কম্বলে কর্ম্ফটারে জড়ানো বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ। হাঁ করে প্রাণপণে বাতাস টানার চেষ্টা করছে দমফোট বুকে। কথা ফুটছে না। তবু অতি কষ্টে বলল, হরিবাবার ছেলে তুমি...সে মড়া বাঁচাত...পারবে না?...ভর হোক...তোমার ওপর ভর হোক...

কুঞ্জ ডিসপেনসারির দরজা খোলে। বাতি জ্বালে। বাসন্তীকে বলে, ভিতরে এনে শুইয়ে দে বেঞ্চিতে।

গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান আর বাসন্তী ধরে ধরে আনে পটলকে। কুঞ্জ আর তাকায় না পটলের দিকে। তাকাতে নেই। মানুষের মন তো! হিংসে আসে, বিদ্বেষ আসে, সংকীর্ণতা আসে। বেড়া হয়ে পড়ে, গণ্ডি হয়ে পড়ে। কোনওদিন কাউকে শত্রু ভাবে না কুঞ্জ। আজই বা ভাবতে গিয়ে নিজেকে ছোট করবে কেন? সে যদি মরে তো মাথা উঁচু করে মরবে একদিন।

আলমারি খুলে হরেক ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে সে। প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে আস্তে আস্তে তার বাবা এইভাবে গুন গুন করতেন। ধীরে ধীরে ওষুধের সংখ্যা কমে আসত। তারপর ঠিক একটা অমোঘ শিশির গায়ে হাত পড়ত তাঁর।

চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না কুঞ্জ। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কোন তাকে কোন শিশির পর কোন শিশি আছে তা তার মুখস্ত। একটু দোনো-মোনো করতে করতে একটা শিশির গায়ে হাত রাখে সে।

পটল ওষুধটা খাওয়ার আগে মাথায় ঠেকাল।

ঘণ্টাখানেকের ওপর বসে রইল পটল। তারপর আর একটা ডোজ দিল কুঞ্জ। শিশিটা বাসন্তীর হাতে দিয়ে বলে, নিয়ে যা। মাঝরাতে একবার খাওয়াস।

যাওয়ার সময় পটল কারও ওপর ভর দিল না। নিজে হেঁটে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে চাইল একবার। অস্পষ্ট স্বরে বলল, হরিবাবা আজ নিজে এসেছিলেন। স্পষ্ট টের পেলুম।

চেয়ারে নেতিয়ে ঝুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে কুঞ্জ। বড় শীত। খোলা দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে ঠান্ডার ধারালো হাওয়া আসে। কুঞ্জ চোখ বুজেও টের পায়, সামনেই সেই গড়ানে উপত্যকা, কী সবুজ! কী গভীর!

বহুকাল বাদে বাবা যেন ডিসপেনসারিতে এলেন আবার। কুঞ্জর পিছনে অস্ফুট গুন গুন স্বরে ওষুধের নাম বলতে বলতে আলমারি হাতড়াচ্ছেন। বাবা? নাকি রাজু? একবার মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জকে দেখলেন, খুব হেলাফেলার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই মরতে চাস কেন কুঞ্জ?

না মরে কী হবে?

জীবনটা কি তোর?

তবে কার?

যদি জানতিস কত করে একটা মানুষ জন্মায়, কত কষ্ট, কত খেসারত, কত রহস্য থেকে যায় পিছনে! তুই কি তোর জীবনের মালিক? মানুষের একটা স্রোত, একটা ধারায় তুই একজন। কত কষ্ট হয় গাছের একটা ফল ধরাতে জানিস?

সব জানি, সব জানি। আর কিছু জানার নেই।

তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ।

কুঞ্জ ধীরে ধীরে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করে। ডানদিকে ফেরাতে পারে না, শক্ত ঘাড়। তাই অল্প শরীর ঘুরিয়ে তাকায়। ঘোলা চোখে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায় না সে। এখনও চারদিকে অবাস্তব, অপ্রাকৃত, ভুতুড়ে জগৎ। কী প্রকাণ্ড উঁচু দেখায় ওষুধের আলমারিগুলোকে। আলোটাকে মনে হয় গাঢ় হলুদগোলা জলের মতো অস্বচ্ছ। খুব অস্পষ্ট এক ছায়ার মতো মানুষকে দেখতে পায় সে। ছায়াও নয়, যেন কেউ ঘরের শূন্যতায় নিজের একটা ছাপ ফেলে রেখে চলে গেছে। ও কি বাবা? নাকি রাজু?

কুঞ্জ বলে, তুই কি রাজু? রাজু, ভোর রাতে ঘুমের মধ্যে কত ভয়ের শব্দ, যন্ত্রণার শব্দ করেছিস! কত কথা বলেছিস! তোর কীসের দুঃখ তা তো জানি না রাজু, তবে মনে হয়, কলকাতা শহর তোকে অল্প অল্প করে বিস্কুটের মতো ভেঙে ভেঙে খেয়ে নিচ্ছে। টের পাস না? তোকে যেমন খাচ্ছে শহর, আমাকেও তেমনি।

ছায়ামূর্তি গাঢ় শ্বাস ফেলে বলে, সব শহরই মানুষ খায়। সাপের মতো বাঁকানো দাঁত, একবার ধরলে আর ছাড়তে পারে না। যদি জোর করে ছিনিয়ে আনিস তবে সাপের মুখের ব্যাং যেমন বাঁচে না শহর থেকে ছিনিয়ে আনা মানুষও তেমনি বাঁচে না। কলকাতা একদিন আমাকে খাবে। কিন্তু তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ!

আমাকেও ভালবাসাই খেয়ে নিচ্ছে। তুমি কি বাবা? নাকি তুই রাজু? শোনো বাবা, আমি যে কুঞ্জনাথ! কুঞ্জনাথের কি কলঙ্ক মানায়!

রাজু নয়, যেন বাবা অলক্ষে জবাব দেয়, কিন্তু তুই যে একশো বছরের কথা বলেছিলি। মনে নেই? একশো বছর পরের কথা ভেবে দ্যাখ, কেউ মনে রাখেনি এ সব। কে কুঞ্জনাথ আর কীই বা তার কলঙ্ক।

কে লোকটা তা বুঝতে পারে না কুঞ্জ। হয়তো বাবা, হয়তো রাজু। তার কাছে এখন জীবিত বা মৃত দুই জগৎই সমান। বাবা না রাজু তা বুঝতে পারল না কুঞ্জ। অস্পষ্ট লোকটার দিকে চেয়ে বলল, বড় কষ্ট যে।

তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ। কত ভালবাসা তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, আমি বাঁচব না, বড় জ্বর, বুকে ব্যথা, ডান ফুসফুসে জল জমছে হু হু করে।

বাবা বলে, দূর বোকা, ওঠ না। ডান দিকের আলমারির দু' নম্বর তাকে খুঁজে দ্যাখ।

গড়ানে ঢালের মুখে কুঞ্জ থামে। নিজেকে ঠেলে দেওয়ার আগে একবার দেখে নেয় চারদিক। গহিন খাদ। সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে। টলতে টলতে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়।

কুঞ্জ ডানদিকের আলমারির পাল্লা খুলে হাত বাড়ায়। ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে আপনমনে।

ফজল আলী আসছে

বাপটা খায়। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। দু'দিন ফাঁক দিয়ে হয়তো তিন দিনের দিন সাঁঝবেলায় এক পেট ঝাঁ-ঝাঁ খিদে নিয়ে হাজির। সবদিন তা বলে ভরপেট দেওয়া যায় না। বায়নাক্কা নেই অবশ্য। রুটি গুড় দিল তো তা-ই সই। নইলে আধভাঙা গম আর কুত্থিক-লাইয়ের খিচুড়ি, নয়তো গম ভাজা, নিদেন কিছু আটা জলে গুলে ছাতু মাখার মতো খেয়ে ওঠে।

ছেলে হরিপদ ভাবে, বাপ আমারটা খায়। তার আগের পক্ষের বউও ভাবে, শ্বশুর আমাদেরটা খায়। ভাবলেই হল। মানুষ যা-ই ভাবে তার কাছে দুনিয়াটা সেইমতো।

বাপ হরিদেব নিজে কিন্তু ভেবে পায় না যে সে কারটা খায়। কোথায় খায়, হাগে, মোতে, কোথায় শোয়, এ তার মনেও থাকে না তেমন।

কারটা সে খায় এইটে হরিদেব আজ ভাবছিল। ভাবত না যদি না ছোট ছেলে নিত্যপদ দশ পয়সার মুড়ি লজেঞ্চুস কিনে বাপকে বলত, একটু খাবে বাবা? ভিতরে মৌরি দেওয়া আছে। ওপরের মিষ্টিটা চুষে খেলে মৌরিটা বেরিয়ে পড়ে। তখন চিবিয়ো।

হরিদেব ভারী অবাক হয়ে দেখে জিনিসটা। হাত পেতে নেয়ও। মুড়ি লজেঞ্চুশই বটে। এক্কেবারে হুবহু মুড়ির মতো দেখতে, তবে নানা রঙের। হাতে নিয়েও খেল না, নিত্যকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তুই খা। পয়সা পেলি কোথায়?

চুরি করিনি, মা দিয়েছে।

তোর মা এয়েছিল আজ?

আসবে না তো কী! আজ দাদার বিয়ে না? দুপুর থেকে এসে বসে আছে।

তা বটে, হরিদেবের মনে পড়ে গেল। তাই তো! আজ তার ছেলে হরিপদর বিয়ে। মনে থাকে না। মনের আর দোষ কী? হরিপদ এত ঘন ঘন বিয়ে করে যে তাল রাখা মুশকিল। কপালটাই খারাপ ছেলেটার। বউ থাকে না। গত চার বছরে এই নিয়ে--

কতবার হল রে নেত্য?

কী?

বিয়ে?

তিন।

কোন বউটা সবচেয়ে ভাল ছিল?

গেলবারেরটা। ফটর ফটর কথা কইত খুব, ফরসা ছিল।

সেইটেই সবচেয়ে বেশি দিন ছিল, না?

না, প্রথম মাগিটাই বেশি দিন ছিল।

ন' বছরের ছেলের মুখে মাগি শুনে হরিদেব ভাবল, একটা ধমক দেয়! তারপর ভাবে, যাক গে, যাক গে, যাক গে বাবা! মুখ ফসকে কত ওরকম বেরোয়!

এই দেখো মৌরি।— বলে নিত্য জিভ বের করে দেখায়।

হরিদেব দেখে, বাস্তবিকই ছেলের জিভে তিন চারটে চোপসানো মৌরি। ফোকলা মুখে হরিদেব হাসে। বলে— বাঃ বাঃ!

হরিদেব ভাবল, আজ আমার ছেলের বিয়ে। অ্যাঁ? ছেলের বিয়ে ভেবে সে বেশ একটু দেমাক বোধ করে। 'ছেলের বিয়ে' কথাটার মধ্যে একটা ভারভাত্তিক ব্যাপার আছে।

বিয়েতে অবশ্য হরিদেবের নেমন্তন্ন হয়নি। তা সে আগেরবারে বা তার আগেরবারেও হয়নি। প্রথমবারের বিয়েতে টুনি বালব জ্বেলে বাহার দিয়ে আসর সাজিয়েছিল ছেলে। জনা পঞ্চাশেক লোক খেল। হরিদেবকে বলেনি বলে সে গদাধরবাবুদের বাড়ির চালাঘরের গুদামে খাটিয়া বিছানায় ঘুম হয়ে পড়েছিল। অনেক রাতে হরিপদ নিজেই কলাপাতায় মুড়ে ভাত, মাংস, চাটনি আর দরবেশের একটা দলা নিয়ে বাপকে ঠেলে তুলে বলল, বলি কোনওদিন শুনেছ ছেলের বিয়েতে বাপের নেমন্তন্ন হয়? তাহলে নিজের বিয়েতেও নেমন্তন্ন না হলে যাওয়া আটকায়। খেয়ে নাও তো।

খেয়েছিল হরিদেব। ভাত, মাংস, চাটনি, দরবেশ মিশে গিয়ে খুব খারাপও লাগেনি।

দ্বিতীয় বারেরটায় অত ঘটা হয়নি। তবে কারবাইডের আলো জ্বেলে রিকশা সাজিয়ে বউ এনেছিল। সেবারে ছিল ঘুগনি, কচুরি আর একটা করে শোনপাপড়ি।

এবারে কী হবে রে? খাওয়াবে তো বিয়েতে?

ধুস! নেত্য পথের ধারে একটা টিভির দোকানের সামনে ফস্ করে দাঁড়া হয়ে বলে, নারায়ণের ভোগ লাগিয়েছে। তারই প্রসাদ পাবে সবাই! বাতাসা, নাড়ু, আমের টুকরো, শিন্নি আর মিলক পাউডারের পায়েস। এক আঁজলায় খাওয়া হয়ে যায়। বাবা, ওই যে সমীরণবাবু যাচ্ছে। তোমাকে দেখেছে কিন্তু।

হরিদেব দেখে সমীরণবাবুই বটে। ঠান্ডা, সুস্থির লোক। গদাধরবাবুদের নীচের তলায় ভাড়া থাকে। স্টোভ জ্বেলে নিজে রান্না করে খায়।

নিত্য বলে, কেরোসিনের পয়সা কী করলে? মেরে দিয়েছ?

কিছু মনে পড়ে না। হরিদেব বলে, কোন পয়সা?

পণ্ডিতের দোকান থেকে কেরোসিন আনতে গেলে যে? সমীরণবাবু পাঁচ লিটারের দাম দিল না সেদিন? কাল আমাকে বলছিল, তোর বাবা আমার টাকাও মারল, তেলের টিনটাও গেল।

ওঃ! সে টিন টাকা সব পণ্ডিতের দোকানেই পড়ে আছে। ভুলে গিয়েছিলাম।

সে জানি! পণ্ডিত বলল, তুমি ত্রিশ পয়সা কম দিয়েছ পাঁচ লিটারের দামের চেয়ে।

মারিনি। খরচ হয়ে গেছে বোধহয়।

দেবে এখন সমীরণবাবু। ওই আসছে।

নিত্যপদ দোকানের টিভি সেট-এর দিকে চেয়ে থাকে।

সমীরণ সোজা এসে হরিদেবকে বলে, তেলটা এনে দিলে না যে বড়? কোথায় থাকো, খুঁজে পাই না।

খুব মোলায়েম হেসে হরিদেব বলে, আজ আমার ছেলের বিয়ে কিনা বাবু!— বলে বেশ একটা দেমাক বোধ করে।

ভ্রু কুঁচকে সমীরণ বলে, কাল সকালে এনে দিয়ো তবে। স্টোভে যা তেল আছে তাতে আজ হয়ে যাবে। কাল কিন্তু চাই।

দেব।

সমীরণ চলে যেতেই নিত্য বলে, আর একটু হলে টাকাটা ঠিক মেরে দিতে তুমি।

হরিদেব অবাক হয়ে বলে, মেরে দিলেই হল! মেরে তখন যাব কোথায়? ধরবে না?

শিউলির মা যে গম বেচতে দিয়েছিল তা সে বিক্রির পয়সা দিয়েছ ফেরত? আমাকে দেখলেই শিউলির মা বলে, তোর চোর বাপটা কই রে?

কই রে!— হরিদেব ছেলেকে ভেঙিয়ে বলে, কাপড়ের তলায় লুকিয়ে আছি নাকি? কাকে বেচলাম সেইটেই তো মনে নেই। তা বলে কি চোর!

হরিদেব উদাস চোখে রাস্তা দেখে।

নিত্য ঠেলা দিয়ে বলে, টিভি দেখেছ বাবা? ঠিক সিনেমার মতো, না?

হুঁ।

বিকেলের দিকে শহরতলির দোকানপাট একে একে খুলছে। চালপট্টির মুখে গরম তেলে আলুর চপ ছাড়ল গণশা। বেড়াতে বেড়াতে ছেলের পিছু পিছু চলে এসেছিল হরিদেব।

নিত্যটা চুরি শিখেছে। নইলে অত পয়সা পায় কোথায়? যেখানে সেখানে ঠেক খাচ্ছে আর জিনিস কিনছে!

নিত্য তিনটে চপ কিনে একটা বাপকে দিয়ে বলল, আর চাইবে না বলে দিচ্ছি!

আমি চাই? তুই তো দিলি!

নইলে তো নজর দেবে!

নিয়ে নে না। তুই খা।

নিত্যর একটু মায়া হয় বোধহয়। বলে, আচ্ছা খাও।

বাপটা খায়। কিন্তু ভেবে পায় না, সে আসলে কারটা খায়।

দুই

রায়বাবু আর আচার্যিবাবু কেউই কলকাতায় নেই। তারা দু'জন না থাকলে সমীরণের ছুটি। কিংবা ছুটিও ঠিক নয়। আসলে কথা হয়ে আছে, রোজ অফিস খুলে বসতে হবে। পার্টি এলে কথাবার্তা বলতে হবে। গোটা পাঁচেক পার্টিকে তাগাদা দিতে বেরোতে হবে। কিন্তু এসব হল কথার কথা। নজরদার না থাকলে দিনমান ভূতের মতো কে অন্ধকার অফিসঘরটায় বসে থাকে!

নজরদার অবশ্য একজন আছে। সে হল সুখন বেয়ারা। বেয়ারা কে বেয়ারা, অফিসঘরের বাইরে একটা খুদে উনুন জ্বেলে সে আবার পাঁচটা খুদে অফিসের বাবুদের চা দেয় বলে চা-ওয়ালাও বটে, আবার সকালে সে-ই ঝাড়ু লাগিয়ে জমাদারের কাজ করে বলে জমাদার কে জমাদার। তার আরও রোজগার আছে। রাতে ফাঁকা অফিসঘরগুলোয় সে তার দেশওয়ালি ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, কুলি-মজুরদের শোওয়ার ব্যবস্থা করে, মাথা পিছু প্রতি রাতে বিশ পঞ্চাশ পয়সা নেয়। প্রথম প্রথম সুখন সমীরণের ওপর খুব মেজাজ নিত। তারপর ক্রমে এখন সুর নরম হয়েছে। কিন্তু নজর সে রাখে ঠিকই। কবে সমীরণ এল, কবে এল না, এসব টুকে রাখছে। রায়বাবু আচার্যিবাবু ফিরলেই লাগাবে।

তবে সমীরণের সুবিধে হল, তার চাকরিতে আউটডোর আছে। সিনেমার শ্যুটিং-এর মতো। মাঝে মাঝে শহরে ভোঁ চক্কর মারতে হয়। আজকাল ক'দিন সারাবেলা গড়িমসি করে কাটিয়ে বিকেলে অফিসে ফিরে সুখনকে বলে—আউটডোরে কাজ ছিল রে। চা দে বাবা। বড্ড ঘেমে গেছি।

রোজ ঠিক ঠিক মতো বাসে বা ট্রামে ভাড়া দিলে মাসে বিশ-ত্রিশ টাকার ধাক্কা। তাই সুবিধে পেলেই ট্রাম বাসের ভাড়াটা ফাঁকি দেয় সমীরণ। আজও দিল। তবে কিনা খুব ভাল ফাঁকিবাজ হতে গেলে বাস বদল করে করেই যাওয়া ভাল। সময় একটু বেশি লাগে। কিন্তু একনাগাড়ে বেশি দূর গেলে ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কম। আর অসুবিধে হয় ফাঁকা বাসে। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়ায় আজকাল আর কলকাতায় ফাঁকা বলে কিছু নেই। গড়িয়াহাটায় একবার নেমে, কিছুটা হেঁটে, তারপর ট্রামে চেপে ওয়েলিংটনের মোড়ে পৌঁছে গেল সে।

সুরেন ব্যানার্জি স্ট্রিটে তার অফিস। খানিকটা হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে উদাস চোখে আকাশটা দেখে নেয় সমীরণ। ভারী নিচু মেঘ থম ধরে আছে, ঝলসাচ্ছে মাঝে মাঝে। ঢালবে।

মোড়ে একটা ভুজাওয়ালার দোকান থেকে রোজ ত্রিশ পয়সার মুড়ি কেনে সমীরণ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে খুবই সচেতন। বাইরের আজেবাজে জিনিস, ভাজা বা বড়া, খোলা খাবার, কাটা ফল, দোকানের কাপে বা গ্লাসে জল বা চা সে কখনও খায় না। ভুজাওয়ালা তার জন্য ভেজা ছোলা, আদা, গোলমরিচের গুঁড়ো আর বাদাম দিয়ে মুড়ি বানিয়ে দেয়, তেল দেয় না। অফিসে সমীরণের নিজস্ব গ্লাশ আছে, তাইতে চা খাবে মুড়ির পর।

বলতে কী সমীরণের স্বাস্থ্য খুবই ভাল। সচরাচর এত ভাল স্বাস্থ্য দেখা যায় না। হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে পড়ার সময়েই সে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে লেখাপড়ার মাথা তার তেমন ভাল কিছু নয়। কোনওক্রমে পাশ করে সে যখন কলেজে ভরতি হল তখন তারা দু'-চারজন বন্ধু মিলে ভবিষ্যতের পরামর্শ করত। চাকরির বাজার খারাপ, ব্যাবসা হওয়ার নয়, সুতরাং লাইন ধরতে হবে। বিভাস বলেছিল, খেলোয়াড়-টেলোয়াড় হতে পারলে চাকরি বাঁধা।

সমীরণ ইস্কুলে ফুটবল খেলত। কথাটা তার মনে ধরল। আর ধরতেই সে আবার একটা ক্লাবে ভরতি হয়ে ফুটবল খেলতে লাগল। সে খেলার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল। চাকরি। তাই খেলাটা হয়ে দাঁড়াল জুয়াখেলার মতো। সব সময়ে মনে মনে ভাবত এই বুঝি মাঠের বাইরে থেকে বড়সড় কোনও ক্লাবের কর্মকর্তা তাকে দেখছে। কিংবা কোনও বড় অফিসার-টফিসার। খেলা চোখে লাগলেই নিয়ে গিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দেবে। অনবরত এসব ভাবত বলে তার খেলা ভাল হত না। বলের পিছনে ছুটে, ল্যাং মেরে আর ল্যাং খেয়ে বৃথাই বড় খেলোয়াড় হওয়ার কপট চেষ্টা করত সে। ক্লাবের বড় খেলা থাকলে তাকে বাদ দিয়ে টিম হত। ফুটবলে কিছু হল না।

বিভাস আর-একদিন বলল, স্বাস্থ্য ভাল করলে পুলিস বা সিকিউরিটিতে চাকরি হয়ে যায়। সেই পরামর্শমতো দু'জনেই ব্যায়াম করতে শুরু করে। ব্যায়ামের সুফল তো আছেই। স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল। কিন্তু স্বাস্থ্যবান বা ব্যায়ামবীরের দুর্ভিক্ষ নেই। চাকরিও সস্তা হয়নি। কাজেই ব্যায়ামই সার হল। একদিন সমীরণ হতাশ হয়ে বলল, ধুস্!

বিভাস এর পরেও হাল ছাড়েনি। সাঁতারু কুস্তিগীর এইসব হওয়ার জন্য এবং হয়ে চাকরি পাওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা চালায়।

একদিন বিভাসই এসে খবর দিল, একটা লাইন পেয়েছি, বুঝলি। রায়বাবু নামে একজন বড় ব্যাবসাদার আছে, তার একজন গুন্ডা দরকার।

গুন্ডা!— বলে খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছিল সমীরণ।

বিভাস বলল, আমিই কাজটা নিতাম। কিন্তু একটা ভাল মোটর গ্যারাজে আমি মেকানিকের কাজ পেয়ে গেছি। তিনশো পঁচিশ টাকা প্লাস টিফিনের জন্য রোজ চল্লিশ পয়সা।

সমীরণ ভীষণ অবাক হয়েছিল। বিভাস কবে যে মোটর মেকানিকের কাজ শিখল! জিজ্ঞেস করতে বিভাস দুঃখের সঙ্গে বলল, আর বলিস না ভাই। দু'বছর আগে সরকারি চাকরির বয়সটা পেরিয়ে যাওয়ার পর মরিয়া হয়ে ড্রাইভিং শিখতে থাকি। মেকানিকের কাজ জানা থাকলে সফারের চাকরিও খারাপ নয়। তাই সবটাই শিখতে লাগলাম। এখন আমি একজন খুদে এক্সপার্ট। স্বাস্থ্য ভাল বলে খাটতেও পারি অসুরের মতো।

কিন্তু আমি যে কখনও গুন্ডামি করিনি।

গুন্ডা বলতে সেরকম ব্যাপার নয়। রায়বাবুর আসলে দরকার একজন বডিগার্ড গোছের লোক। অনেক ক্যাশ টাকা নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তাছাড়া কয়েকটা ত্যাঁদড় পার্টি আছে, তাদের মাঝে মাঝে ভয় দেখানো দরকার। রিস্ক নেই। শোন সমী, ছুঁচিবায়ু-টায়ু ছাড়। শুনছিস তো দেশের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে সবাইকে তৈরি হতে বলা হচ্ছে। দেশের যখন ডাক্তার দরকার তখন বেশিরভাগ ছেলেকে ডাক্তারিতে শিক্ষিত করতে হবে, যখন উকিল দরকার তখন ওকালতি বাড়াতে হবে, যখন দেশে যেটার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন আমাদেরও সেইভাবে তৈরি হতে হবে। যখন

ইঞ্জিনিয়ার দরকার নেই তখন খামোকা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে দেশের বেকার সমস্যা বাড়ানো ঠিক নয়। কেমন, একথাটা মানছিস?

মানছি।

তবে আর বেগরবাই করছিস কেন? এখন বডিগার্ডের নেসেসিটি দেখা দিয়েছে। তোর স্বাস্থ্য ভাল। সুতরাং খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। দেশের প্রয়োজন. তুইও তৈরি।

সমীরণের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। তিন বছর হল সরকারি চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে। আর বয়স হলে কেউ বডিগার্ডও রাখবে না। তবে শুধু গায়ের জোরে যে বডিগার্ড বা গুন্ডা হওয়া যায় না এটা তার জানা ছিল।

কিন্তু রায়বাবু তাকে পছন্দ করলেন। বললেন, দেখো বাপু, মারপিট আমি পছন্দ করি না। ছোরাছুরি বা রক্তপাত এসবের প্রশ্নই ওঠে না। শুধু আওয়াজ দিয়ে কাজ সারবে।

এই বডিগার্ড রাখার ব্যাপারটা রায়বাবুর পার্টনার আচার্যিবাবু বেশি পছন্দ করেননি। বার বার রায়বাবুকে বলছিলেন, তোমার মাথাটাই খারাপ হয়েছে দেখছি।

রায়বাবু বললেন, চারদিকে কত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই দেখছ তো! নেসকো, শিবু পান্ডা, কাতুচরণ এইসব পার্টি বিল মেটাতে গোলমাল করছে, এদেরও একটু ভয় খাওয়ানো দরকার। আবার সেদিন তো দেখলে পুজোর চাঁদা বলে এ পাড়ার মস্তান ছেলেরা কেমন তিনশো টাকা আদায় করে নিয়ে গেল। কিছু করতে পেরেছিলে তার? একজন ডাকাবুকো লোক থাকলে এইসব এলিমেন্ট টিট থাকে। তবে মারপিটে নয়, শুধু হুম হাম।

আচার্যিবাবু খুশি হননি বটে তবে ব্যাবসাতে রায়বাবুর টাকাই বেশি খাটে, তাঁর প্রভাবও, সুতরাং সমীরণ বহাল হল।

দুশো টাকা মাইনে, যাতায়াত আর জলখাবার বাবদ আরও পঁচিশ টাকা। ছুটি নেই, ইনক্রিমেন্ট বা বোনাসের প্রশ্ন নেই। তবে রায়বাবু ভরসা দিয়েছিলেন, কাজে খুশি করতে পারলে প্রোমোশন দেব। কিন্তু এ অফিসে প্রোমোশনই বা কী করে হবে তা ভেবে পায় না সমীরণ। রায়বাবু আর আচার্যিবাবু, এই দু'জনকে নিয়েই বলতে গেলে ব্যাবসা। বাইরের দু'-চারজন আড়কাঠি কী সব খবর-টবর এনে দেয়, কিছু সাব কনট্রাক্টর আছে, এ ছাড়া পাকা চাকরির লোক কেউ নেই। একা সারাদিন সমীরণ অফিস আগলে থাকে। বডিগার্ড বা গুন্ডার কাজ তাকে এখনও তেমন কিছু করতে হয়নি। খুব বড় কোনও পেমেন্ট থাকলে রায়বাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকে যান। বারবার বলে দিয়েছেন, যখন আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে চলাফেরা করি তখন আমার গা শুঁকে শুঁকে চলবে। কেউ কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করে কি না খুব লক্ষ রাখবে। তেমন বুঝলে আমার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে সজাগ করে দেবে। আর কেউ ছিনতাই করবার তাল করছে দেখলে লাফিয়ে পড়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান মেরে পেড়ে ফেলবে। এই উপদেশ সমীরণ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

মুড়ি খেতে খেতে হাঁটছিল সমীরণ। কিন্তু অফিসের পথটা পেরোবার আগেই চিড়বিড়িয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ভারী পাজি বৃষ্টি। দেখতে তেমন কিছু নয়। কিন্তু দশ পা হাঁটলে ভিজিয়ে চুপসে দেবে।

সামনেই ফুটপাতের ওপর একটা ত্রিপল টাঙানো, ত্রিপলের নীচে চৌকি পেতে কারা শুয়ে বসে আছে। লাল শালুতে কী সব যেন সাদা অক্ষরে লেখা। পড়ার সময় ছিল না, সমীরণ কোলকুঁজো হয়ে ত্রিপলের তলায় ঢুকে গা বাঁচায়। হাতে মুড়ির ঠোঙা। এক গাল মুড়ি মুখে দিয়ে প্রবল চোয়ালে চিবোতে চিবোতে হঠাৎ তার বিবেকে ঘা লাগল। দেখল, ত্রিপলের গায়ে দেয়ালে খবরের কাগজের পোস্টার সাঁটা। তাতে লাল কালিতে লেখা 'চাকুরিতে পুনর্বহালের দাবিতে রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির কর্মীদের আমরণ অনশন।'

সামনের দিকে একটা চৌকি অনেকটা খালি পড়ে আছে দেখে সমীরণ বসে পড়েছিল। ছ্যাঁচড়া

বৃষ্টিটা অনেকক্ষণ চলবে। বসাই ভাল। কিন্তু বসার পর পোস্টারগুলো দেখে মুড়ি খেতে এখন তার সত্যিই লজ্জা করছে। একটা বড় সাদা কাগজে লেখা 'অনশনের আজ ৩ দিন।' তিন দিনই হবে। গত পরশুও সমীরণ এই ত্রিপলটা টাঙানো দেখেছে, তখন অত শত লক্ষ করেনি।

বড় খিদে পেয়েছিল সমীরণের। খুব লজ্জার সঙ্গে প্রায় মুখ লুকিয়ে আর এক মুঠো মুখে পুরতে গিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা বুড়ো মতো অনশনকারী খুব জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখছে। তাই মুড়িটা আবার ঠোঙার মধ্যে ছেড়ে দেয় সে। ঠোঙাটা মুড়ে হাতে ধরে রাখে।

অনশনকারীদের সংখ্যা জনা আষ্টেক হবে। তার মধ্যে পাঁচজন কাত বা উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। খুবই দুঃস্থ চেহারা সবার। যে বুড়ো মানুষটা তার দিকে চেয়ে ছিল সে খুব যত্নের সঙ্গে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে বিড়ি খেতে লাগল।

সমীরণের হাতের আঁজলায় ত্রিশ পয়সার মুড়ি হাতের ঘেমো ভাপে, ভেজা ছোলার সংস্পর্শে আর বাদলার বাতাসে মিইয়ে যাচ্ছে ক্রমে। পেট থেকে খিদেটা দু'হাত বাড়িয়ে আরও মুড়ি চাইছে, জিভটা কাঙালের মতো মুখের শূন্য অভ্যন্তরের আনাচ কানাচ থেকে এক-আধটা ছোলা মুড়ি বা বাদামের দানা খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে। কিন্তু আটজন অনশনশিল্পীর সামনে বসে সে খায় কী করে?

বাইরে একদম জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি হচ্ছে এখন। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, রাস্তা থেকে বৃষ্টির ছাঁট কাদার ছিটে নিয়ে গায়ে আসছে। ভিতরবাগে একটু সরে বসে সমীরণ। শুয়ে থাকা একটা লোকের পা তার গায়ে লাগে। লোকটা পা টেনে নেয়, তারপর একটু কোঁকানোর শব্দ করে উঠে বসে। বসেই বলে, শালার মলয়বাবু আজও এল না। ধুস! তারাপদদা, একটা বিড়ি দাও।

সেই বুড়ো লোকটা খুব কৃপণের মতো একটা বিড়ি শতরঞ্চির তলা থেকে বের করে দেয়।

সমীরণ পিছু ফিরে চেয়ে লোকটার বিড়ি ধরানো দেখছিল। লোকটা বিড়ি ধরিয়ে তার দিকে চেয়েই বলে ওঠে, সমীদা, না গো?

সমীরণও চিনতে পারে। পলাশির ফজলু। মীরাবাজারের হাইস্কুলে সমীরণ যখন নাইন টেন-এর ছাত্র ফজলু তখন সেভেন এইটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফজলু অবশ্য পড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

সমীরণ বলে, তুই কী করছিস এখানে?

ফজলু বিড়িটা লুকিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, আর কী! দেখছ তো! মলয়বাবু ছাঁটাই করেছে।

তাই বলে অনশন! মরে যাবি যে!— সমীরণ খুব চিন্তিত হয়ে বলে। সে নিজে অনশনের কথা ভাবতে পারে না। ভাল স্বাস্থ্যের দরুন তার খিদেটাও বেশি পায়। দেশের ছেলে ফজলু এরকম না খেয়ে থাকবে, সেটা সহ্য করে কী করে? বেফাঁসে সে হাতের ঠোঙাটা বাড়িয়ে দিলে বলল, দুটো খা। এখনও তেমন মিইয়ে যায়নি।

ফজল আলী আঁতকে উঠে বলল, বলো কী! খাবার এখন আমার হারাম। তাছাড়া কষ্ট হয় না। এর আগেও বারকয়েক করেছি তো! একবার টানা সাত দিন অবধি।

সমীরণ ভারী অবাক হয়ে বলে, সাত দিন!

এবার বোধ হয় আরও বেশি হয়ে যাবে। মলয়বাবু খুব বেঁকে বসেছে। কারখানাই বেচে দিতে চাইছে। এর আগেও বেচে দিয়েছিল কয়েকবার। তবে সে ছিল বেচার নামে হাত বদল। মলয়বাবু আর নিলয়বাবু দুই ভাই। দুই ভাইয়ের দুটো কারখানা। যে যখন গোলমালে পড়ে তখনই সে তার কারখানা আর একজনকে বেচে দেয়। মাঝখানে আমাদের যত দুর্দশা। কিন্তু এবার আর ভাইয়ে ভাইয়ে বেচাবেচি নয়, মারোয়াড়ি পার্টি ধরেছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। সমীরণ উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে ফজলুকে বলে গেল, তোর বাড়িতে চিঠি লিখব। চাচাকে জানানো দরকার যে তুই না খেয়ে আছিস।

ফজলু হাসল। গরিব চাষি ঘরের ছেলে। খুব একটা ভাল খাওয়া-পরা জোটেনি কোনওদিন।

তবে সানকি ভরা ভাত নুন লংকা দিয়ে হলেও পেট পুরে খেয়েছে। হাসিটা দেখে বড় কষ্ট হল সমীরণের।

তিনতলার অফিসঘরের দরজাতেই সুখন দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব। সমীরণকে দেখেই বলে ওঠে রায়বাবুর মেয়ে সব ফাইল-টাইল দেখছে। আপনার খোঁজ করছিল। সামালকে বাতচিত করবেন।

সমীরণের বুকটা একটা ডিগবাজি খেল। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। রায়বাবুর মেয়েকে সে দেখেছে। একটু রোগা, একটু শ্যামলা, দোষের মধ্যে ওইটুকুই। তাছাড়া গোটাগুটি ভারী লোভনীয় মেয়ে। বড় বড় চোখ, উড়োখুড়ো চুল, ফাঁক হয়ে থাকা দুটি আঙুলের মতো টসটসে ঠোঁট, দাঁত সাদা এবং ঝকঝকে, কথাবার্তা খুব মোলায়েম এবং গলার স্বর ইস্পাতের মতো ঠান্ডা। সে এমনভাবে সাজে যাতে তাকে একটু রোগে-ভোগা রোগে-ভোগা দেখায়। কাউকে পাত্তা দেয় না। বহু ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ঘোরে। হোটেলে গিয়ে নাচে। সারাদিন গাড়ি দাবড়ে বেড়ায়, অজস্র অদরকারি জিনিস কেনে। নাম মন্দা।

সমীরণ জানে, এ মেয়ের সঙ্গে তার ভাব ভালবাসা হওয়ার নয়। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। তার বুকটা তাই ডিগবাজি দিল।

অফিসের ঘরটা বেশ বড়। সেই বড় ঘরের মধ্যে আবার পার্টিশন করে দুটো ছোট ঘর বানানো হয়েছে। একটা রায়বাবুর, অন্যটা আচার্যিবাবুর। রায়বাবুর ঘরটাই ভাল। তাতে এয়ারকুলার আছে, কার্পেট আছে, ঘষা কাঁচের শার্সি আছে। রায়বাবু না থাকলে ঘরটা তালাবন্ধ থাকে।

সমীরণ ঘরে ঢুকে দেখে, মন্দার বাঁ হাতে ফোন, মুখে খিলখিল হাসি। কথাবার্তা সব চোখা ইংরিজিতে হচ্ছে। সেন্টের গন্ধে ম' ম' করছে বাতাস। মন্দা ছাড়া ঘরে আর একটা লোকও আছে। লম্বা, ফরসা, চালাক-চালাক চেহারা, লম্বা চুল, গোঁফ, সামান্য দাড়ি। বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে গম্ভীর মুখে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়।

মেয়েরা ফোন ধরলে সহজে ছাড়ে না। মন্দাও ছাড়ছে না। সমীরণ দাঁড়িয়ে থাকে। থেকে থেকে পা ধরে যায়। খেয়াল করে একবার সে রুমাল বের করে ঠোঁট থেকে মুড়ির গুঁড়ো মুছল, ঘাম মুছল। তাতে তাকে কতটা সুন্দর দেখাল কে জানে। মন্দা তার দিকে মাঝে মাঝে অবাক-হওয়া চোখে তাকাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে দৃষ্টি নেই। মন্দা এখন ফোনের অপর পারের লোকটিকে দেখছে। ছোকরাটা একবার ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলেছিল বটে কিন্তু সেও সমীরণকে দেখল না ভাল করে।

এই দেখা না-দেখার ব্যাপারটা সমীরণ ভালই বোঝে। তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, প্রতিদিন যারা তার দিকে তাকায় তারা সবাই তাকে সবসময়ে দেখে না। তাকানো আর দেখা দুটো আলাদা ব্যাপার।

মন্দা টেলিফোনে বলল, ওঃ, আই ফিল সো জামপি। নট দ্যাট আ'ম স্কেয়ারড... ওঃ, নোঃ হিঃ হিঃ... নটি নটি...

সমীরণ কান ভরে শোনে। কী নিখুঁত ইংরিজি উচ্চারণ! শুনতে শুনতে ঢোক গিলল সে। মনে হল চমৎকার ওইসব ইংরিজি শব্দ তার পেটের মধ্যে চলে গেল।

মন্দা একটা ছাপা তাঁতের শাড়ি পরেছে। সমীরণ বোকা নয়। সে জানে তাঁতের হলেও শাড়িটার ছাপা একসক্লুসিভ। মেরেকেটেও দু'-তিনশো টাকা দাম হবে। হালকা জাম রঙের ওপর হলুদ সবুজ সব নকশা। নানা রঙের ছিটে ছড়িয়ে আছে। ঝলমল করছে। দেখে দেখে ঢোক গেলে সমীরণ। সবটাই তার পেটে চলে যায়। শাড়ির নকশা, রং, ইংরিজি উচ্চারণ। গোটা মন্দা।

মানুষ তো শুধু শরীরটা নয়। তার শব্দ ভাব-ভঙ্গি চোখের দৃষ্টি গায়ের রং পোশাকের বাহার—এইসব মিলিয়ে এক-একটা মানুষ নিজের চারধারেও অনেকটা জায়গা দখল করে নিতে পারে।

আসলে বাহার চাই। যার বাহার যত কম সে নিজের চারধারে তত কম জায়গা দখল করতে পারে। মানুষে মানুষে এই জায়গা দখলের জব্বর লড়াই চলেছে। সমীরণ দেখতে পায়, মন্দা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ফেলেছে।

সমীরণের নিজের চারধারে জায়গাই নেই। বলতে গেলে সে নিজের শরীরটুকুতেই শেষ। তার বাইরে তার আর তেমন কোনও প্রভাব নেই।

মন্দা টেলিফোনে কি ভূতের গল্প বলছে? এমনিতেই সমীরণ ইংরিজিটি খুব ভাল বোঝে না, তাতে আবার সাহেবি উচ্চারণ। তবু আন্দাজ পায় মন্দা ভূতের কথাই বলছে, ওঃ, ইট ওয়াজ সো ঘ্যাস্টলি! আই হ্যাড আনক্যানি ফিলিং। সামওয়ান ওয়াজ শ্যাডোয়িং মি অল অ্যালং...

ভূতই। তাছাড়া কীই বা হবে। এ ব্যাপারে মন্দার সঙ্গে তার নিজের একটা মিল আছে! যখন সে পলাশিতে থাকত, তখন রাত-বিরেতে কত গাঁ গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে একা একা, রাতের মাঠ পেরিয়ে গেছে, মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় গিয়ে বসেছে দাওয়ায়, তখনও ভূতে বিশ্বাস ছিল প্রবল, কিন্তু ভয় ছিল না। তারপর কলকাতায় এসে নানাজনের পাল্লায় পড়ে সে শিখেছে যে ভূত-টুত কিছু নেই। এই বিজ্ঞানের যুগে ভূত থাকতেই পারে না। সে কথাই সে আজকাল বিশ্বাস করে। কিন্তু যত সে 'ভূত নেই' বলে বিশ্বাস করে ততই তার মধ্যে আজকাল ভূতের ভয় দেখা দেয়। এই ক'দিন আগে দিনদুপুরে একটা বোঝাই বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ে বসে সে অফিসে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হয় ভিড়ের ভিতর থেকে ইঁদুরপানা মুখের একটা লোক খুব খোঁচানো দৃষ্টিতে তাকে অপলক দেখছে। সে দেখা যেন গিলে খাওয়া, ভস্ম করে ফেলা, ঘেন্নার কাদা ছিটিয়ে দেওয়া। সমীরণ লোকটাকে যে স্পষ্ট দেখেছে তাও নয়। কেবল মনে হয়েছে রড ধরে কাটা পাঁঠার মতো ঝুলছে যেসব নরদেহ তাদেরই ভিতরে কেউ যেন! অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারেনি কে। যখন টের পেল তখন খুব ভাল করে সকলের মুখ নজর করে দেখেও কিছুতেই সেই মুখটাকে চিনতে পারল না। সেদিন ভারী কাঁটা দিয়েছিল গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে চামড়ার নীচে যেন সরষেদানা গড়িয়ে যেতে লাগল। সেই বলতে গেলে প্রথম ভূতের ভয় হল তার। গদাধরবাবুর বাড়ির একতলায় সে একটা ছোট ঘরে থাকে। পুরনো বাড়ি, নোনায় দেয়ালের পলেস্তারা পাঁচড়ার মামড়ির মতো উঠে আসছে। দগদগে ঘা বেরিয়ে আছে ঘরটার সর্বাঙ্গে। সেই ঘরে এক ছুটির দুপুরে চৌকিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এমন কিছু নির্জনও ছিল না। দুপুরটা। পাশের ঘরেই রেডিয়োতে নাটক হচ্ছে। উঠোনের কলতলায় গদাধরবাবুদের তরুণী ঝি বাসন মাজতে বসলেই ভাড়াটে সত্য গাঙ্গুলির মেজো ছেলে প্রায়দিনই হাতে আয়না আর ছোট কাঁচি নিয়ে গিয়ে রোদে বসে সাবধানে গোঁফের জঙ্গলে কাঁচির ডগা ঢুকিয়ে পাকা গোঁফ গোড়া থেকে কেটে ফেলে। মেজো ছেলে সীতাংশুর চুল দাড়ি অল্প বয়সেই পেকেছে, একটু মাথা-পাগলা মতো। বিয়ের জন্য হন্যে। গদাধরবাবুর তরুণী ঝি-র সঙ্গে নানা কথা বলে মনের দুঃখ ভোলে। সেই দুপুরে তাদের প্রেমালাপও কানে আসছিল। এর মধ্যে হঠাৎ তার মনে হল, ঘরের দেয়ালের একটা জায়গায় যেন ঠিক হুবহু একটা মানুষের আকৃতির ছাপ। যেন জলে ভেজা কোনও মানুষ খানিকক্ষণ দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। সেই দেখে আঁতকে উঠল হঠাৎ সে। কেবলই মনে হতে লাগল, নিশ্চয়ই কখনও কাউকে খুন করে ওই দেয়ালের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। এতদিন বাদে সেই লোকটার শরীর দেয়াল চুঁইয়ে ভেসে উঠেছে। ধারণাটা এমনই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল তার যে সে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। খুব ভয়ে ভয়ে ছিল ক'দিন। নিজের পয়সায় চুন কিনে এনে শেষ পর্যন্ত জায়গাটা চুনকাম করে সে। আজকাল সে ভূতের ভয় পায়।

মন্দা যখন টেলিফোন নামাল তখন সমীরণ ঘোর অন্যমনস্ক হয়ে ভূতের ভয়ের কথা ভাবছে।

মন্দা বলল, আপনি এতক্ষণ অফিসে ছিলেন না?

সমীরণ চমকে উঠে বলে, না, আউটডোরে যেতে হয়েছিল।

ও। কিন্তু অফিস ফাঁকা রেখে যাওয়াটা ঠিক নয়। আমি চারটের সময় এসে দেখেছি দু'জন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। পার্টি এসে ফিরে যাওয়া কি উচিত?

মন্দা কিছুমাত্র রাগ দেখাচ্ছে না, খুব ভালমানুষের মতো কথাটথা বলছে আর তার মুখের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ভারী ঠান্ডা আর নিষ্ঠুর চোখ মন্দার। একটু অস্বস্তি বোধ করে সমীরণ। দুপুরে টেনে ঘুম দিয়েছিল, মুখচোখ নিশ্চয়ই রসস্থ আর ভাব-ভার। দুপুরে ঘুমোলে সেটা মুখের চেহারায় ধরা পড়বেই! তাছাড়া রোদে জলে ঘোরা চেহারাও তার এখন নয়।

মন্দা অবশ্য ঘাঁটাল না। বলল, আমি যাচ্ছি। আপনি অন্তত ছ'টা পর্যন্ত দেখে অফিস বন্ধ করবেন। আই মে নিড ইউ। টেলিফোনের কাছে থাকবেন। সুব্রত, লেটস গো।

ফরসা লম্বা ছেলেটার সঙ্গে মন্দা বেরিয়ে গেল।

একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বাইরের অফিসে বসে রইল সমীরণ। রায়বাবুর ঘর বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছে মন্দা।

তিন

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুব্রত বলল, আমি আলিয়াঁস ফ্রাঁসে যাব। তুমি?

মন্দা বলল, বিকেলটা ভারী বিচ্ছিরি! বিকেলবেলাটায় আমার একদম একা থাকতে ভাল লাগে না।

এইটুকুই মন্দা বলল। কিন্তু কথাটার মধ্যে একটু হ্যাংলাপনা আছে, আর আছে আমন্ত্রণ।

সুব্রত তার সুন্দর দাঁতে আর ঠোঁটে অদ্ভুত একটু হেসে বলে, সেই বেলা বারোটা থেকে দু'জনে গা ঘষাঘষি করছি। আমার আরও একটু কমপানি দিতে আপত্তি নেই।

বলে সুব্রত তার ডান কব্জিতে ঘড়ি দেখল। ঘড়িটা একটু বিটকেল রকমের। ওপরে কেবল ঘোর লাল রঙের কাচ, একটা ছোট্ট বোতাম টিপলেই সেই লাল কাচের ভিতর আলোর অক্ষরে ঘন্টা আর মিনিট ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। ঘড়ি দেখে সুব্রত বলল, সাড়ে ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আরও ঘন্টা-দেড়েক আছে।

মন্দা অভিমান করল না। কিছুটা অসহায় ভাবে বলল, আ হ্যাভ ফিনিশড এভরিথিং। পড়াশুনো, নাচগান, ল্যাংগুয়েজ— অল সর্টস অফ থিংস। আর কী করার আছে বলো তো? কী নিয়ে এনগেজড থাকা যায়?

সুব্রতর বদ অভ্যাস হল, কথায় কথায় সে নিজের নাকটা ধরে মোচড় দেয়। এখনও দিল। মুখে সেই হাসি। বলল, গো সামহোয়্যার, বিড়লাতে বাপ্পার এগজিবিশন হচ্ছে। যাও না!

দেখা হয়ে গেছে।

তাহলে বিজিতকে একটা টেলিফোন করো। চলে আসবে।

বিজিত বড় সিরিয়াস টাইপের হয়ে গেছে। ওর রিসেন্ট প্রবলেম কী জানো?

কী?

হাউ টু বি এ মার্কসিস্ট উইদাউট বিয়িং এ কমিউনিস্ট। তাছাড়া হিজ জব ইজ ইটিং হিম। প্রায়ই সন্ধে সাতটার আগে বেরোতে পারে না।

তাহলে কী করবে?

ভাবছি গাড়িটা থাকলে হত।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে বেশ ভিড় এখন! ভেজা রাস্তা থেকে চটির সঙ্গে কাদা ছিটকে আসছে। সুব্রত গ্রাহ্য করে না। কিন্তু মন্দা পিছন দিকে পায়ের কাছে নিজের দামি শাড়িটার অবস্থা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, ন্যুইসেন্স! গাড়িটা থাকলে—

গাড়িটা কী হয়েছে?

একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মন্দা বলে, অয়েল ইজ সো ডিয়ার! সো ড্যাড ডিক্রেয়ারস, নো কার। দেখো শাড়িটার অবস্থা।

সুব্রতর গলার স্বর ভীষণ ভদ্র। সবসময় একটা বিশেষ পর্দায় বাঁধা গলা। সেই মলমের মতো গলায় বলে, সবাই সাফার করছে, তুমি একলা নয়। তোমাকে অনেক শাড়ি আছে।

তা তো বলবেই!

সর্বাণীকে টেলিফোন করলে কেন? ওর সঙ্গে তো তোমার কাট হয়ে গেছে!

ওঃ আই হেট হার সো মাচ! আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুবীরের কথা জানতে চাইছিলাম। সুবীর আমাকে ফ্রাংকফুর্ট আর লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে চিঠি দিয়েছে। ওয়াশিংটনে পৌঁছেই চিঠি দেবে লিখেছে। সর্বাণীকে শুধু লন্ডন থেকে দিয়েছে! আমি জানি সুবীর ওকে বেশি কিছু লেখেনি! ও অনেক কথা বাড়িয়ে বলল!

কী করে বুঝলে?

ট্রুথ ইজ লাইক এ ফ্র্যাগরান্ট ফ্লাওয়ার। গন্ধ পাওয়া যায়। ও বলল, সুবীর নাকি ওকে মিস করছে। উড ইউ বিলিভ?

সুব্রত হেসে বলে, নয় কেন? আমি তো সব সময়ই কাউকে না কাউকে মিস করছি বলে মনে হয়।

মন্দা খুব গম্ভীর হয়ে বড় বড় বিখ্যাত চোখে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, এখন কাকে মিস করছ?

অল দি অ্যাবসেন্টিজ। যারা কাছে নেই তাদের সবাইকে। যেমন তুমি সুবীরকে মিস করছ।

মন্দা গম্ভীর হয়ে বলে, ইউ আর জেলাস।

আরে না। জেলাসি ইজ অল বলস! ওসব নয়। ঠাট্টা করছিলাম। সুবীর হয়তো সত্যি সত্যিই সর্বাণীকে মিস করছে, তোমাকেও মিস করছে, এমন কি হতে পারে না?

হবে না কেন? আমি তো তা বলিনি। কিন্তু সর্বাণীকে কি সুবীর সিরিয়াসলি নেয়? সর্বাণী তো বোঝে না যে সুবীর ওকে কত বোকা ভাবে।

সুব্রত আর একবার বোতাম টিপে তার ঘড়িতে উদ্ভাসিত সময় দেখে নেয়। একটু উদাস হয়ে বলে, আমি যখন প্রথম জার্মানিতে যাই তখন আমি আমার বাড়ির বেড়ালটাকেও মিস করতাম। ইট্‌ হ্যাপেনস।

মন্দা জেদবশত বলে, কিন্তু আমি খুব ভাল জানি, সুবীর সর্বাণীকে মোটেই মিস করছে না।

সুব্রত মৃদুস্বরে বলে, নাউ ইউ আর বিয়িং জেলাস।

মন্দা রাগের গলায় বলে, জেলাসি ইজ অল—

বলেই হেসে ফেলে। কথাটা শেষ করে না।

সুব্রতই বলে দেয়, বলস। অল বলস। তুমি কি সুবীরকে মিস করছ মন?

এ লিটল। দিস মাচ—

বলে মন্দা ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে সরষের মাপ দেখায়।

দেন ইউ আর নট জেলাস।

থ্যাংক ইউ।

কিছু খাবে নাকি? অনেকক্ষণ হেঁটেছ।

না, ময়দানে গিয়ে বসা যেত, কিন্তু যা জল!

সুব্রত আবার তার আলো-ঘড়ি দেখে বলে, সময়ও নেই। সরি।

ইউ আর অ্যাভয়ডিং মি!

আরে না। ফাদার সাইমন কালই মাদ্রাজে চলে যাচ্ছেন। ইটস এ ফেয়ারওয়েল ডিনার। আফটার অল আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হিম। না গেলেই নয়।

যাবে যাও। কিন্তু ডোন্ট লেট মি ফিল অ্যাবানডনড! আ অ্যাম সো পজেজড বাই বোরডম।

তুমি সর্বাণীকে একটা আনক্যানি ফিলিং-এর কথা বলছিলে। ইজ ইট ট্রু অর জাস্ট এ গিমিক?

মন্দা হেসে বলে, ওসব বলতে হয়। ওকে একটু নার্ভাস করে দিচ্ছিলাম।

ইউ ডিডনট সাউন্ড লাইক জোকিং।— সুব্রত গম্ভীর হয়ে বলে।

মন্দার চোখদুটো হঠাৎ জ্বালা করে। চোখের পাতা ভিজে আসে। কান্না-টান্না নয়। খুব রাগ হলেও মন্দার এরকম হয়। সে জবাব দিল না।

সুব্রত কথা বাড়াল না। খুব সান্ত্বনার স্বরে বলল, চলো একটু কফি খাই। এখনও সময় আছে একটু।

চৌরঙ্গিতে পড়ে ওরা এদিক ওদিক একটু তাকাল। তারপর মাদ্রাজি কাফের দিকে হাঁটতে লাগল।

কাফেতে প্রচন্ড ভিড়। বসবার জায়গা নেই। ভেতরে ভ্যাপসা গরমে গায়ে গায়ে লোকের আনাগোনা। কেউ কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না।

সুব্রত মৃদুস্বরে বলল, অলওয়েজ পপুলেশন ইজ দি প্রবলেম!

মন্দা এক ঝাঁকিতে তার চুল পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলে, ইউ আসকড ফর ইট। তুমি সব সময়ে এত চিপ জিনিস খোঁজো কেন বলো তো! সেলের জিনিস কিনবে, চিপ রেস্টুরেন্টে খাবে, গাড়ির বদলে স্কুটার চড়বে!

আমি পাক্কা প্রলেতারিয়েত।

দেশের সব প্রলেতারিয়েত যদি তোমার মতো বাইশশো টাকা মাইনে পেত তাহলে কী ভালটাই না হত!

তুমি কী বুঝবে মন? তোমার ওল্ড ম্যান কিছুটা হয়তো বুঝবে হোয়্যার ট্যাকসেশন পিনচেস! শুনতে বাইশশো, কিন্তু আফটার অল ডিডাকসনস—

মন্দা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, ডোন্ট ন্যাগ। তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ পলিসি আছে, কিইমুলেটিভ ডিপোজিড আছে, আরও কী আছে কে জানে বাবা! তুমি পাক্কা অ্যালিগেটর একটি। তাও তো বিয়ে করোনি!

করব বলেই তো!

করো না! বিয়ে করে একদম বদমেজাজি খিটখিটে কৃপণ বুড়ো বনে যাও! আই উইশ ইউ গেট টেন চিলড্রেন।

সুব্রত মৃদু হাসি মাখানো মলম গলায় বলে, তাহলে গভর্নমেন্ট কাঁচি নিয়ে আমাকে সেনসর করতে তেড়ে আসবে। অ্যান্ড আ উইল লুজ এ ভাইট্যাল লিম্ব।

তোমার তাই হোক। আই উইশ—

সুব্রত মোলায়েম গলায় বলে, টেন ডিলড্রেন নয়, আ অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন টেন ওয়াইভস।

ইস রে! তাহলে বুঝি আর কাঁচি নিয়ে তেড়ে আসবে না? আর মেয়েরা কি অত সস্তা নাকি?

ধুস! তুমি ওয়ারলড পপুলেশনের স্ট্যাটিস্টিক্স জানো না। দেয়ার ইজ এ গ্রেট ইমব্যালেন্স। পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ঢের বেশি। দেখো কয়েক বছর পরে বহুবিবাহের ওপর থেকে রেসট্রিকশন তুলে নেওয়া হবে।

আই শ্যাল র‍্যাদার স্টে অ্যালোন দ্যান ম্যারি এ ম্যারেড ম্যান।

তুমি জেলাস।

আবার?

সুব্রত হাসতে হাসতে হঠাৎ মন্দার কোমর ধরে ঠেলে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, কুইক, ওই একটা টেবিল খালি হয়েছে।

বসেই মন্দা বলল, তুমি কৃপণ।

সুব্রত বলে, না, আমি প্রলেতারিয়েত। মন, বলো তো তুমি ক'টা বাচ্চার মা হতে চাও!

একটারও না, আই হেট—

সুব্রত হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, বোলো না। মেয়েরা ভীষণ মুখোশ পরে কথা বলে। আসলে তারা খুব মা হতে চায়। আমি একজনকে জানি—

তুমি আমাকে জানো না।

আই অ্যাডমিট। কিন্তু জেনারেলি মেয়েরা বাচ্চা পছন্দ করে।

মোটেই না। বাচ্চার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ন্যাগ করে ছেলেরা। বিকজ দে ডোন্ট সাফার ফ্রম দি পেইন অফ ডেলিভারিং এ চাইল্ড।

কিছু কিছু ব্যথা আছে যা খুব উপভোগ্য। প্রসবযন্ত্রণা তাদের মধ্যে পয়লা নম্বরের।

থাপ্পড় উঁচিয়ে মন্দা বলে, মারব।

গাল এগিয়ে দিয়ে সুব্রত বলে—মারো! দি পেইন উইল বি সুইট।

মন্দা মারল। চটাস শব্দ হল। সুব্রতর হালকা দাড়ির ভেতরে ফরসা গালে টকটকে রাঙা কয়েকটা লম্বা রেখে ফুটে উঠল। আশপাশের টেবল থেকে দু'-একজন ফিরে দেখল।

সুব্রত বলল, আ উইশ ইট ওয়াজ এ কিস।

মন্দা বড় বড় স্থির চোখে চেয়ে ওকে দেখছিল। তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। জোরে শ্বাস বইছে। বুকে সুস্পষ্ট ওঠা নামা।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে তার কোমর ধরল। কষির কাছে আলতো আঙুল বুলিয়ে আদর করে বলল, জেলাস মেয়েরা খুব ভাল বউ আর মা হয়। জানো?

আই অ্যাম নট জেলাস।

ইউ আর।

মন্দা হেসে ফেলল। কফি খেতে খেতে বলল, এর পর বোধহয় তুমি আমাকে বিয়েও করতে চাইবে। একই সঙ্গে একটা ভাল বউ আর বাচ্চা-কাচ্চার মা কাকে পাবে বলো।

আমি পপুলেশন বাড়াতে চাই না মন। পপুলেশন যত বাড়ছে, যত ভিড় বাড়ছে, ততই মানুষ লোনলি হয়ে যাচ্ছে।

ইউ আর নট লোনলি।

আই অ্যাম। আমার মনে হয় বিয়ে করলে আমি বোধহয় আরও লোনলি হয়ে যাব। জার্মানিতে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। আমরা মাসখানেক একসঙ্গে ছিলাম বেশ। আর তখনই আমার ভীষণ লোনলি লাগত। একসঙ্গে আছি তো, নানারকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি, লাভ মেকিং হচ্ছে, বেড়ানো হচ্ছে কিন্তু কেবলই টের পাচ্ছি যে আমার স্বাধীন ইচ্ছেগুলো সব গরাদবন্দি হয়ে গেল। সবসময়ে আর একটা লোকের ওজন যেন আমার সত্তার ওপর চেপে বসে আছে। অনেক সময় মেয়েটাকে আমার 'হারামজাদি' বলে গাল দিতে ইচ্ছে করত, গায়ে থুতু দিতে ইচ্ছে করত...ওঃ তুমি ব্যাপারটা সহ্য করতে পারতে না, না?

মন্দার চোখ স্থির, মুখ লাল, আর দাঁতে দাঁত ঘষছে। চাপা ঘেন্নার স্বরে বলল, ব্রুট!

সুব্রত হেসে বলল, আসলে অতটা নয়। কিন্তু মানুষের ভিতরে কতগুলো স্বাধীন ইচ্ছা থাকেই। কেউ হয়তো কোনও মেয়েকে জেনুইন ভালবাসে, ধরো রোমিও-জুলিয়েটের মতো, তখনও কিন্তু সেই লোকটার মেয়েটির প্রতি ঘৃণা, আক্রোশ, জিঘাংসা আসতে পারে।

দ্যাট ইজ স্যাডিজম।

অ্যান্ড দ্যাটস অলসো ভেরি মাচ দি ট্রুথ।

চুপ করো। আমি শুনতে চাইছি না।

সুব্রত তার আলোর ঘড়ি দেখে বলল, আমিও আর বেশি বলছি না। ইটস অলমোস্ট দি টাইম। উঠি। তোমার কী হবে?

আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

তুমি রেগে যাওনি তো!

মন্দার মুখভাবে রাগই ছিল। থমথম করছে।

বাইরে এসে সুব্রত সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমাকে একটু এগিয়ে দেব কোনও দিকে?

না।

তা হলে তুমি রেগেছ। আমার ওরকম করে বলা ঠিক হয়নি।

হঠাৎ ফিক করে হেসে মন্দা বলল, বোকা।

কেন?

তুমি বোকা। জানো না মেয়েরা অনেক সময় ওইসব স্যাডিজম পছন্দ করে।

আমিও তা জানি।— বলে সুব্রত দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খুব চালিয়াতের মতো হাসে।

জানো?

জানি। আর এও জানি যে তুমি হচ্ছো সেই ধরনের মেয়ে যারা ফিজিক্যাল টর্চার পছন্দ করে। দে ওয়ান্ট টু বি বিটন, সাফোকেটেড, ইভন রেপড!

রুদ্ধশ্বাসে 'ফের মার খাবে!' বলে মন্দা তেড়ে গেল।

সুব্রত হাসতে হাসতে একটা দারুণ ভিড়ের বাসে চুম্বকের মতো সেঁটে উঠে গেল চোখের পলকে।

আর তাবপর থেকে ভারী একা লাগতে লাগল মন্দার। ভীষণ একা।

একা গায়ে গায়ে ভিড়ের মধ্যে উদাস হাঁটতে হাঁটতে মন্দা ভাবে, ঠিকই বলেছিল সুব্রত। যত ভিড় বাড়ছে, তত যেন একা হয়ে যাচ্ছে মানুষ। শুধু যে একা তা-ই নয়, মন্দার সব সময়ে মনে হয় কেউ তার দিকে লক্ষ রাখছে, পিছু নিচ্ছে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

বিকেলটা বড্ড মন-খারাপের সময়। আলো মরে যায়, মন মরে যায়, শ্বাসের বাতাসে কম পড়ে। চারপাশে যেন এক অদৃশ্য গরাদ চেপে ধরে।

অস্থির মন্দা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ফোন করল। ফোন করার আগে অনেকগুলো নম্বর মনে মনে মুখস্থ বলল। নম্বরের সঙ্গে নাম। কিন্তু কারও মুখই চোখে ভেসে ওঠে না যে! বাধ্য হয়েই সে প্রথম ফোনটা করল তার বাবার অফিসে।

কে? সমীরণবাবু?

হ্যাঁ।

আপনি আর একটু অফিসে থাকুন। হয়তো আপনাকে আমার দরকার হবে। আমি আবার ফোন করব।

আচ্ছা।

এবার মন্দা ফোন করল মৃদুস্বরে অফিসে। মৃদুল ছোট কোম্পানির অ্যাকাউন্টসের বড় কর্তা। অনেকক্ষণ অফিসে থেকে কাজ করে। পাওয়া গেল।

আসবে? ফ্রি আছ?

মৃদুল হেসে বলে, আমি তো ফরগাটন মন!

কে বলল?

নই? অনেকদিন খোঁজ নাওনি।

তুমিও নাওনি।

পাল্টি দিচ্ছো?

বিরক্ত হয়ে মন্দা বলে, আসবে কি না বলো। আমার ভীষণ লোনলি লাগছে।

আমি আজকাল অফিসের পর একটু ককটেল করি। তোমার চলবে?

কেন, আমি কি খুকি নাকি? শুধু দুধ খাই বুঝি!

মৃদুল মৃদু হেসে বলে, জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে কয়েকজন লোক থাকবে, অল বিজনেস পিপল। অ্যান্ড দেয়ার উইল বি সিরিয়াস ড্রিংকিং। পারবে তো তাল রাখতে?

অপমানে মন্দার মাথা ঝাঁ করে উঠল। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় সে বলল, ইউ আর অ্যাভয়ডিং...অ্যাভয়ডিং...স্কাউন্ড্রেল।

চটছ কেন মন? জানো তো আমাদের চাকরি শুধু অফিসের মধ্যে নয়। সারাদিনই আমরা চাকরি করি—অফিসে, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় পার্টিতে, ইভন সামটাইমস ইন বেডরুমস। আমাদের চাকরি বড্ড ছড়ানো, বড্ড সর্বনেশে। আজ বিকেলের ককটেলটাও ওই চাকরিই। নইলে কি তোমার সঙ্গে একা হতে লোভ হয় না? রাগ কোরো না মন।

মন্দা উদ্যত চোখের জল গোপনে রুমালে মুছল। ফিস ফিস করে বলল, তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। প্রোপোজাল উইথড্র করে নিচ্ছি।

তোমার গলার স্বরটা পাল্টে গেল কেন মন? তুমি সিরিয়াসলি দুঃখ পাওনি তো? আরে, আমি সত্যি বলছি আজ তুমি এলে একটুও অসুবিধে হবে না। তুমি কোথায় আছো বলো, আমি গিয়ে তোমাকে তুলে নিচ্ছি।

না। আমি তোমাকে একা চেয়েছিলাম।

মৃদুল খুব দ্বিধায় পড়ে বলল, একা? সেইটিই তো গোলমাল হচ্ছে মন।

আচ্ছা, ছাড়ছি।

আমি কি ভাল লোক মন?

হঠাৎ একথা কেন?

সত্যি বলো তো আমি কেমন!

মন্দা হাসল, বলল, ভাল নও।

মৃদুল খুব দুঃখের গলায় বলে, আমারও তাই মনে হয়। আমি বোধহয় একটা স্কাউন্ড্রেল!

মন্দার খুব লজ্জা করছিল। ফোনে সে একটু আগে যে উত্তেজিতভাবে কথা বলেছিল সেটা দোকানের লোকটা লক্ষ করেছে। তাই সে সাবধান হল। বলল, না। তুমি, তোমরা সবাই বোধহয় খুব ভাল। আসলে আমিই শেমলেস।

ওকথা বোলো না মন। তোমার একটুখানি সঙ্গ পাওয়ার জন্য কত ছেলে পাগল!

তুমি তো তাদের দলে নও।

আমি তাদের দলপতি।

বাজে বোকো না। ছাড়ছি।

তা হলে কবে বলো?

কী কবে?

তোমার সঙ্গে একা!

তোমার তো সময় নেই। বেডরুমেও চাকরি করতে হয় বলছ।

একদিন চাকরি করব না। কবে বলো।

মন্দা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, জানাব। একদিন জানাব।

ফোন রেখে দিল। আবার রিসিভার তুলল। মন্দার পিছনে কে যেন সামান্য একটু বিরক্তির শব্দ

করল, ইস্‌। মন্দা ঘাড় ফিরিয়ে তার বিখ্যাত বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখল। ফোন করবে বলেই বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে পিছনে কে জানে? হয়তো শুনছিল কথাবার্তা।

মন্দার রাগ হল না। বরং খুব ভাল মানুষের মতো রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি ফোন করবেন? করে নিন না! আমার তাড়া নেই।

ছেলেটা ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলল, না না। আপনি বরং—

বেশ ছমছমে কাঁচা ছেলে। তেমন লম্বা নয়, খুব বড়লোকের ছেলেও নয়। একটু নার্ভাস প্রকৃতির কি? মন্দা চেয়ে দেখল, তারপর মৃদু হেসে বলল, নিন।

ছেলেটা আপত্তি করল না। মন্দা ততক্ষণ চারদিকে চেয়ে লোকজন দেখতে লাগল।

ছেলেটা ফোন নামিয়ে বলল, লাইন পাচ্ছি না। আপনি করে নিন।

মন্দা টেলিফোন তুলেই ভাবল, এই বিকেলে বৌধায়ন কি বাড়িতে থাকবে? বৌধায়ন অবশ্য চাকরি করে না, কিন্তু বেকাররাই তো সবচেয়ে বেশি বাইরে ঘোরে।

বৌধায়ন ছিল এবং সে-ই ফোন ধরে বলল, ডাকছ? আয় হায় রে পরান সখী, পাখি নউ তাঁর ঠাঁই উড়ি যাউ।

তার মানে?

ডানা ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই মন। গত রোববার বাস থেকে পড়ে গিয়ে ডান পায়ে সিরিয়াস স্প্রেইন। কাস্টিং করা পা নিয়ে পড়ে আছি। মাথার কাছে রেডিয়ো, পাশে টেলিফোন আর কোলের ওপর গুচ্ছের ম্যাগাজিন আর বই। দিনগুলো রবারের মতো টেনে কে যেন লম্বা করে দিয়েছে।

কী কাণ্ড! ভাবলাম তোমার সঙ্গে বিকেলটা কাটাব!

কাটাও না। চলে এসো। আমার ঘরটা তো ভারী স্যুটেবল। নির্জন, নিরিবিলি।

ধুস। এই অফিসভাঙা ভিড়ে কে যাবে বাবা মানিকতলায়!

তুমি কষ্ট করতে শেখোনি কেন বলো তো! কেষ্টদের হয়রান করতে তো খুব ওস্তাদ! এই আহত মানুষটির জন্য কি মায়া হয় না?

হয়। কিন্তু শুধু মায়াই হয়। বেচারা বলে চোখের জল মুছতে ইচ্ছে করে। ছাড়ছি।

আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এক্ষুনি ছেড়ো না। আমি কী ভীষণ একা বুঝতে পারছ না। তোমার ভয়েসটা অন্তত কিছুক্ষণ শুনতে দাও।

না বাপু, আমি এক দোকান থেকে ফোন করছি, বেশিক্ষণ রিসিভার আটকে রাখা যাবে না। তুমি বরং নয়নাকে ফোন করে তার ভয়েস শোনো। ইয়োর মিসট্রেসেস ভয়েস।

নয়নার ট্রুপ আজ চিত্রাঙ্গদা করছে মহাজাতি সদনে।

টেলিফোনে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট একটা ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ সে শব্দটা জোরালো হল।

মন্দা বলল, তাহলে মধুপর্ণীকে—

বৌধায়ন বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও! এঃ লাস্ট মোমেন্টে একটা গোল ঢুকে গেল রে!...হ্যাঁ কী বলছিলে?

মন্দা বলল, ফুটবল শুনছিলে?

হ্যাঁ। এইমাত্র খেলা শেষ হয়ে গেল।

আমাদের সবার খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে বৌধায়ন।

তার মানে?

মন্দা একটু লোকদেখানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দি গেম ইজ ওভার।

বৌধায়ন হেসে বলে, ফিলজফি হচ্ছে? মাইরি, ওসব বোলো না, খেলা শেষ হলে বাঁচব কী নিয়ে? ভয় দেখাচ্ছ অড্রে হেপবার্ন?

আমি মোটেই হেপবার্নের মতো দেখতে নই। অত রোগা নাকি আমি?

চোখদুটো অবিকল।

যাঃ!— মন্দা খুশি হয়ে বলে। বরাবর তাকে অড্রে হেপবার্ন বলে, কমপ্লিমেন্ট দেয় বৌধায়ন। রোগা বলে কি না কে জানে! তবে তার চোখ সুন্দর এটা সে নিজেও জানে।

আসবে?— বৌধায়ন চাতকের গলায় বলে।

মন্দা বলে, না গো। আজ নয় লক্ষ্মীটি। এর মধ্যে একদিন যাব।

আচ্ছা। ভাল থেকো। এখন কোথায় আছ?

চৌরঙ্গি।

ভাল জায়গা। সঙ্গে কে?

কেউ নেই। সুব্রত ছিল, কেটে পড়েছে।

আনওয়াইজ অফ হিম। তুমি একদম একা?

একদম একা। ছাড়ছি।

মন্দা ফোন ছেড়ে আবার ফোন করল। এবারও সমীরণকে।

আপনি আছেন তো?

আছি।

থাকবেন। আমার হয়তো দরকার হবে।

আচ্ছা।

মন্দা টেলিফোনের পয়সা দিয়ে বেরিয়ে আসে।

এদের কার সঙ্গে কবে পরিচয় হয়েছিল তা কিছুতেই মনে পড়ে না মন্দার। সুবীর, সুব্রত, বৌধায়ন, মৃদুল—কার সঙ্গে তার আগে বা পরে চেনা হয়েছিল? কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল? কিছু মনে পড়ে না। একজন বন্ধু থেকে আর একজন, তারপর তার থেকে আর একজন, এমনিই এক রিলে রেসের মতো পরিচয় থেকে পরিচয়। একটা সিগারেট থেকে আর একটা ধরিয়ে নেওয়ার মতো।

আজ একা বলে এই সব ভাবল মন্দা। কাউকেই সে কখনও গভীর ভাবে ভাবেনি।

আজ ভাবতে লাগল।

চার

পা সরাতে বৌধায়ন মুখখানা যথেষ্ট বিকৃত করে। না, তেমন কোনও ব্যথা নেই পায়ে, তবু ব্যথার স্মৃতি আছে, ভয় আছে। আসলে ব্যথা-বেদনার চেয়ে ব্যথা-বেদনার ভয় বা স্মৃতিই তো মানুষের বেশি।

ইনজেকশন, টিকা, স্টেথোস্কোপ বা থার্মোমিটার সে বরাবর ভয় পায়। এমনকী কেটেকুটে গেলে ডেটল লাগাতেও সে চেঁচামেচি করবেই। এই সব কিছুর সঙ্গে রোগ ও দুর্ঘটনার আবহ মিশে থাকে। আর ও দুটোকেই তার ভয়।

তা বলে কি সে চলন্ত বাসে ওঠে না? বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পেরোয় না? দাড়ি বা নখ কাটে না? আর রোগের ওপর তো হাত নেই, তাই ভোগেও। এগিয়ে আসে থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ, মাঝে মাঝে ইনজেকশনের ছুঁচ। সবই সহ্য করতে হয়, কিন্তু এসব পছন্দ করে না সে। তার মনপ্রাণ প্রত্যাখ্যান করে স্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার, ইনজেকশন এবং ডেটলকে। সে ভুগতে চায় না, আহত হতে চায় না। কিন্তু এও জানে, বেঁচে থাকতে গেলে এসব কিছু না কিছু হবেই।

খুব বিকৃত মুখে বৌধায়ন তার খাট থেকে ভাল পা-খানা বাড়ায়, কাস্টিং আর ব্যান্ডেজে বাঁধা আহত পায়ের দিকে ভয়ের চোখে খানিক চেয়ে থাকে। ব্যথা লাগবে না তো?

খাটের নীচেই একটা গ্ল্যাকসোর কৌটো রয়েছে পেচ্ছাপ করার জন্য। সেই কৌটোটার দিকে খুব ঘেন্নার চোখে চায় সে। তার পেটে প্রচুর জল জমে যায়। এত জমে যে প্রায় সময়েই ওই টিনটা ভরেও খানিক উপচে পড়ে। সে এক ঘিনঘিনে অবস্থা। ঘরের মেঝেয় সেই ঘৃণ্য তরল গড়ায়। পরে ঝি বা চাকর কিংবা মা এসে চট চাপা দেয়। সমস্যাটা একটা আরও বড় কৌটোর। কিন্তু কেউ সেই সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

খাটের ধারে ত্রিশঙ্কুর মতো বসে সে অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। এভাবে বেঁচে থাকার মানেই হয় না। গতকাল এক্স-রে হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, স্প্রেইন, তবে কিনা বেশ জটিল স্প্রেইন। পেশির কিছু তন্তু ছিঁড়েছে হয়তো, শিরা কেটে গেছে। কে জানে কী! ডাক্তাররা এক রহস্যময় জাতি, তারা কখনও স্পষ্ট করে কিছু বলে না। মন্ত্রগুপ্তিতে তাদের পাকা ট্রেনিং দেওয়া হয় বোধহয়। মন্ত্রীদের মতো তারাও কি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে তবে চিকিৎসা শুরু করে? বছরখানেক আগে জ্বর আর কাশিতে কাহিল বৌধায়ন ধরেই নিয়েছিল, টি বি। ডাক্তারকে যত বলে 'স্পষ্ট করে বলুন কী হয়েছে,' ডাক্তার ততই মৃদু হেসে বলেন, 'অত ভাবছেন কেন? আমি তো আছি।'

ডাক্তাররা ওইরকম ঈশ্বরের মতোই কথা বলে। কিন্তু স্পষ্টভাষী তারা নয়। গোটা চিকিৎসা পদ্ধতিটাই রহস্য রোমাঞ্চে ভরা। বৌধায়নের দৃঢ় ধারণা, তার গোড়ালির হাড় চুরমার হয়ে গেছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, চামড়া কাটলে হাড়গুলো ট্যালকাম পাউডারের মতো ছড়িয়ে পড়বে। গতকাল থেকে সে এক্স-রে প্লেটটা মোনালিসার ছবির মতো মনোযোগ দিয়ে দেখেছে লক্ষবার। নেগেটিভ ছবির মতো সেই গোড়ালির নকশাও বড় রহস্যময়। কিছু বুঝবার উপায় নেই। তবু তার মনে হয়েছে ছবির মধ্যে তার গোড়ালির হাড়ে বেশ কয়েকটা ফাটল আর চিড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ডাক্তার তা দেখেনি, বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলেছে, তেমন কিছু নয়। একটু ভুগবেন!

বৌধায়নের আতঙ্ক যায়নি। কখনও এক্স-রে প্লেট, কখনও ব্যান্ডেজে বাঁধা পায়ের দিকে সে কূট চোখে চেয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে সারা দিন।

খুব সাহসের সঙ্গে বাঁ পা মেঝেয় নামিয়ে দিল বৌধায়ন, তারপর আহত ডান পাটা খুব আস্তে আস্তে হাত দিয়ে তুলে ধরে শিশুর মতো খাটের ধারে আনল। আর তা করতে গিয়ে যেন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছিল সে। আসলে ব্যথা লাগছিল না। ব্যথার ভয়, ব্যথার স্মৃতি।

এ বাড়িতে একজন ভারী লজ্জার মানুষ আছে। সে হল তার মেজদার বউ। নতুন বউ। সারাদিন সারা বাড়িতে ছলবল করে ঘুরে বেড়ায়, যখন তখন তার ঘরে এসে হানা দেয়, বুধো, কেমন আছ? এঃ মা গোদা পা! বলে বসে পড়ে। মাঝে মাঝে ব্যান্ডেজের ওপর চিমটি কাটার চেষ্টা করে। ফাজিল। কিন্তু সেটা তেমন বিপজ্জনক নয়। আসল বিপদ হল নতুন বউটা যদি হুট করে তার পেচ্ছাপের সময় এসে ঘরে হাজির হয়। বৌধায়নের সাধ্য নেই উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আসে।

বৌধায়ন আতঙ্কে আর সন্দেহে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। পাতলা পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। জয়তী কি এই বিকেলে বাড়িতে আছে? বেরোয়নি?

কিন্তু ভাববার উপায় নেই। তলপেট ভারী হয়ে ঝুলে পড়ছে। যন্ত্রণার মতো। মেঝেয় ডান পাটা সটান করে রেখে বাঁ পায়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল সে। বড্ড কষ্ট হয় বসতে এইভাবে। ব্যথা-বেদনায় ভয়ংকর বিকৃত করল মুখ। কৌটোটা মুহূর্তে ভরে উঠল ঘৃণ্য তরলে। এইবার উপচে পড়বে। পড়ল... ইস ছিঃ ছিঃ...

ঘর ভাসিয়ে উঠে পড়ল বৌধায়ন। বাঁ হাঁটু ভিজে গেছে, ডান পায়ের ব্যান্ডেজেরও খানিকটা ভেজা। কিছু করার নেই।

বিছানায় ক্লান্ত ভাবে শুয়ে সে সিগারেট ধরায়। সারা ঘরের মেঝেয় গড়ানো তরল পদার্থের কথা ভুলবার জন্য সে একটা ভাল কিছু চিন্তা করবার চেষ্টা করতে যাচ্ছে। এতকাল সবচেয়ে প্রিয় চিন্তা ছিল কোনও একটি, যে কোনও একটি মেয়েকে নিয়ে। অজস্র মেয়ে, যখন যাকে ইচ্ছে ভাবতে পারত সে। একটু আগে মন ফোন করেছিল।

মন তো জানে না ওকে নিয়েও কত দিন ভেবেছে বৌধায়ন। পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে মনকে ভেবে ভালবাসার চুমু দিয়েছে তুলোয়। কিন্তু সে সব চিন্তা আজকাল ফক্কিকারী হয়ে গেছে কেন যে! ভাল কিছু ভাবতে গেলে কিছুতেই মেয়েদের কথা মনে আসে না।

চোখ বুজলেই আজকাল সে একটা ঘোলা জলের স্রোত দেখতে পায়। নদীটা খুব চওড়া নয়। দু'পাড়ে মাইল মাইল জুড়ে নির্জনতা আর গরান গাছ, বাবলা বন। একদিকে ভাঙা পাড়ের মাটির মধ্যে খাঁজে খাঁজে ইট। কোনও এক স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপ। পাখি ডাকছে। নৌকো চলেছে ধীরে, উজান ঠেলে। জোয়ারের জল তীরের ঘাসপাতা ডুবিয়ে ছলাৎ ছল শব্দে ভাঙছে। গোসাবার পর ওই নির্জনতা আর নির্জনতা ছাড়া কিছু নেই। সে এক গহিন প্রাকৃত জগৎ।

একবারই গিয়েছিল বৌধায়ন ওইখানে। আজকাল বাব বার সেই নদীটা তার মনে পড়ে। আর খুব স্নিগ্ধ হয়ে যায় মন। কে যেন মলম মাখিয়ে দেয় তার হৃদয়ের ছেঁড়া খোঁড়া ক্ষতস্থানে। মায়ার কাজল পরিয়ে দেয় চোখে।

পাশ ফিরে বালিশে অস্থিরভাবে কপাল ঘষে বৌধায়ন। সে কেন মেয়েদের কথা ভাবতে পারছে না? তার বদলে বরং তার হঠাৎ মনে পড়ে, সেবার শংকরের নতুন কেনা গাড়ির টায়ার ফাঁসল ধলভূমগড় থেকে ফেরার পথে। শংকর জ্যাক লাগিয়ে চাকা বদল করছিল। স্টেপনি লাগাতে তাকে কিছুটা সাহায্য করল বৌধায়ন, তারপর চুপচাপ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে তাকিয়েছিল একটা প্রকাণ্ড পোড়ো মাঠ আর ঢেউ ঢেউ টিলার দিকে। শীতের তখন সবে শুরু। ভোরবেলা ছিল। নীল আলোয় মাখামাখি আকাশ, লুটোপুটি অঢেল নরম রোদ। মুহূর্তের মধ্যে সে যেন গলে গেল, মিশে গেল চারধারের সঙ্গে। সেই যে স্তম্ভিত মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৌধায়ন, সেই থেকে আজও সে সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিনই পুরোপুরি ফিরে আসতে পারেনি। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, মনে হয়, দেখে, একটা বিশাল শালগাছের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে, চারদিকে ঢাউস ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে শীতের বাতাসে, আর আলোর পুকুর থেকে উঠে আসছে পৃথিবীর টিলার ঢেউ, আর অকাজের পোড়ো মাঠ চিত হয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে।

বাইরের বারান্দা থেকে একটা নকল ঘুঘুর ডাক শোনা গেল! উৎকর্ণ হয়ে শুনল বৌধায়ন। তারপর সভয়ে চেয়ে রইল ঘরের মেঝের দিকে। ওপচানো ঘৃণ্য তরলে থই থই।

একটু ভাবুক বলে বন্ধুরা তার খ্যাপানো নাম দিয়েছে, ভাবের ঘুঘু। বৌধায়নের এই নামটা কী করে যে তার বাড়িতেও জানাজানি হয়ে গেছে কে জানে। পা ভাঙার পর লম্বা-একঘেয়ে দুপুরে মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গ দিতে মা এসে পাশে শুয়ে থাকে। ক'দিন আগে দুপুরবেলায় সে শুয়ে শুয়ে মাকে বলছিল, জানো মা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আর জন্মে আমি ছিলাম লেবুগাছ। এই যে আমার হাত দেখছ, পা দেখছ, এসব ছিল ডালপালা, আর এই কনুই কবজি, কণ্ঠা, বুক পিঠ ছিল অজস্র কাঁটা। কান নাক হাতে, তেলো ছিল সবুজ সুগন্ধী পাতায় ছাওয়া। তখন আমার শরীর জুড়ে সাদা সুঘ্রাণ ফুল ফুটত। আর ফুল ঝরে গিয়ে কচি কচি সবুজ তাজা লেবু ফলত। মনে হয় কী জানো? মনে হয়, আমি যখন লেবু গাছ ছিলাম তখন তুমি ছিলে এত্তোটুকু ফুটফুটে একটা মেয়ে, আর রোজ গিয়ে লেবু ছিঁড়তে আমার ডালপালা থেকে। আমার খুব দুঃখ ছিল যে আমার ঘর নেই, দালান নেই, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক জায়গায়, কোথাও যাওয়ার জো নেই। আর তখনই তোমাকে দেখে আমি মনে মনে ভাবতাম, এবার একদিন আমি মরে যাব। তখন এই ফুটফুটে মেয়েটার বিয়ে হবে আর আমি ওর কোলে আসব ছেলে হয়ে।

এসব কথা সে তার মাকে বরাবরই বলে। মাও খুব মন দিয়ে শোনে আর চোখ ছলছল করে ওঠে। কিন্তু সেদিন মা এক গালের পান আর এক গালে নিয়ে বলল, তোর মাথায় আবার সেই ঘুঘু ডাকছে।

ভারী রাগ হয়েছিল বৌধায়নের। বলল, আজকাল তুমি এরকম খিটখিটে হয়ে গেছ কেন বলো তো?

মা হেসে বলল, তা তুই অত ভেবে মরিস কেন? তোর বাবাও তো বলে, বুধোটা বড্ড ইমপ্র্যাকটিক্যাল আর তাই ওর কোনও কাজেকর্মে মন নেই।

মায়ের এই বিশ্বাসঘাতকতায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। মাকে ছাড়া আর কাকেই বা সে বলতে যাবে এসব কথা?

তবু না হয় মায়ের ব্যাপারটা সহ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে অসহ্য বাড়ির নতুন বউটা যখন তার পিছনে লাগে। বাইরে যে ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে তা আর কারও নয়, নতুন বউ জয়তীর।

বৌধায়ন কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে তীক্ষ্ণ চোখে দরজার দিকে চেয়ে হেঁড়ে গলায় বলল, এখন এ ঘরে আসবে না বলে দিচ্ছি জয়তী!

বাইরে থেকে সরু গলা এল, আসব।

বৌধায়ন বালিশে হতাশ মাথাটা ফেলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। এসে নিজেই লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালাবার পথ পাবে না।

জয়তী এ কথার পর অবশ্য ঘরে ঢুকবার সাহস পেল না, কিন্তু বাইরে থেকে বলল, ঘুঘু পাখিটা কি ডাকছে এখন?

বৌধায়ন বিড় বিড় করে বলে, ডাকলে তোমার বাবার কী?

জয়তী বাইরে থেকে বলে, চা-টা কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

মাকে দিয়ে পাঠাও। তুমি আসবে না।

মাকে ডাকতে ডাকতে ঠান্ডা হয়ে যাবে যে!

যাক। তোমার লজ্জা করে না? কাঁচা বয়সের দেওরের ঘরে হুটহাট এসে ঢোকো যে বড়!

একশোবার ঢুকব।

তা হলে তোমার মনে পাপ আছে।

আমার নয়, তোমারই আছে। লজ্জা করে না বুড়ো ছেলে ঘর ভাসিয়ে পেচ্ছাব করেছ! অকাজ ঢাকতে চোখা চোখা কথা ছাড়া হচ্ছে!

বৌধায়নের কান-ফান গরম হয়ে গেল। সে বালিশটাকে দুমড়ে মাথা আর কান ঢেকে চোখ বুজে শক্ত হয়ে পড়ে রইল। ছিঃ ছিঃ। দেখেছে উঁকি দিয়ে। এইসব মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে...

ঠিক তার মুখটার কাছে বিছানার ওপর একটা খবরের কাগজ ঝটকা মেরে রাখল জয়তী। খবরের কাগজের বাতাসটা পর্যন্ত বৌধায়নের মুখে লাগে। খবরের কাগজের ওপর চায়ের কাপ রেখে জয়তী পায়ে করে দরজার কাছ থেকে ভাঁজ করা চট টেনে এনে ঘরের মেঝেয় বন্যা রোধ করার চেষ্টা করে। চটটা এখানে সেখানে টেনে নিয়ে বেড়ায়। বলে, আবার বলে মনে পাপ আছে। এ পাপটা কে করেছে শুনি। এ বাড়ির লোকগুলোও কিম্ভূত। একটা বড় কৌটো রাখতে পারে না!...তোমার অবশ্য কৌটোয় হবে না। একটা জালা দরকার।

বৌধায়ন রক্তচোখে চেয়ে বলে, গেট আউট।

চোখ রাঙাবে তো ভাঙা পা মুচড়ে দেব।

বৌধায়ন খুব হতাশার সঙ্গে উঠে বসে। তারপর হেসে বলে, আজকালকার মেয়েরা এত বেহায়া কেন বলো তো!

ভাল করলেও আজকাল লোকের গাল ওঠে না।

এঃ ভাল! নতুন নতুন সব বউই ভাল থাকে। কয়েকদিন পরই তাদের স্বরূপ বেরোয়। তাছাড়া নাচুনি মেয়েগুলোই বাজে।

জয়তী সুন্দরী নয় মোটেই। রং কালো তবে দীঘল এবং চাবুকের মতো নমনীয় তার শরীর। সে খুবই ভাল নাচত একসময়। একাডেমিতে সেই নাচ দেখেই মেজদা বুধাদিত্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে, কমপ্লিমেন্ট পাঠায় এবং সবশেষে বিয়েও করে। নইলে মার্কিন দেশ থেকে ইনজিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়ে আসা বুধাদিত্য অনেক ভাল পাত্রী পেয়ে যেত।

জয়তী একটা কূট কটাক্ষ হেনে বলে, নাচুনি মেয়েরা যাই হোক, তাদের পেছনে ল্যালার মতো ঘুরে বেড়ানোর লোকের অভাব নেই। তোমার নয়নাটি কী?

নয়না আমার পোষা ময়না নয়। ঠিক উড়ে যাবে।...চা-টা খুব বাজে করেছ। এই চা'য়েই বোঝা যায় কোন মেয়ে কতখানি অ্যারিসটোক্র্যাট। তোমার বাবা ভুখখা পার্টি নাকি জয়তী?

জয়তী খাটের একধারে বসে খুব আলতোভাবে ডান হাতখানা বৌধায়নের ডান পায়ের ওপর রাখে, মুখখানা করুণ করে বলে, জানোই তো আমি গরিবের মেয়ে!

উঃ! হাত সরিয়ে নাও।

লাগছে? কোনখানে বলো তো?...এইখানে?— বলে জয়তী ঠিক গোড়ালির কাছটায় আস্তে আস্তে চাপ বাড়ায়।

লাগছে...এই বউদি, মাইরি কী হচ্ছে...অ্যাই...আবার ডিজলোকেশন হয়ে যাবে...মাইরি মা কালীর দিব্যি লাগছে...

জয়তী হাত সরিয়ে নিয়ে ভাল মানুষের মতো তার বেণী ঠিক করতে করতে বলে, আভিজাত্য তুলে কথা বলা আর ছোটদের মুখে বড়দের নাম ধরে ডাকা আমি পছন্দ করি না।

বৌধায়নের হাতের কাপ থেকে চা চলকে পড়েছিল। সে কাপ রেখে জামা আর বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, মেজদা একদিন ঠিক বুঝতে পারবে কী ভুলটাই করেছে। এঁটো কাপটা নিয়ে কেটে পড়ো তো!

কেটে পড়ব কী গো! মা যে আমাকে পাঠাল তোমাকে একটু কম্প্যানি দিতে।

তোমার চেয়ে গোখরো সাপের কম্প্যানি ভাল।

ও বুঝেছি। তোমার ভাবের গাছে এখন ঘুঘু ডাকছে।...ঘু-ঘু-ঘু-ঘু-ঘু ...তবে বেশিক্ষণ তোমাকে জ্বালাব না। আমরা বেরোচ্ছি।

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে বলে, বাঁচলাম।

কোথায় যাচ্ছি জানো? চিত্রাঙ্গদা।— নয়না কার্ড দিয়েছে।

গো টু হেল।

তুমি কার্টসি জানো না। মেয়েদের সামনে 'হেল' কথাটা বলতে নেই, তোমার মেয়ে-বন্ধুরা তোমাকে কী করে সহ্য করে বলো তো?

বৌধায়ন হেসে ফেলে বলে, বরং আমি ওদের কী করে সহ্য করি সেইটেই প্রশ্ন হওয়া উচিত। নয়না তোমাদের কার্ড দিল কেন বলো তো?

চোখ বড় বড় করে জয়তী বলে, শুধু কার্ড? নিত্যি এসে শাশুড়িকে মা আর শ্বশুরকে পরিষ্কার বাবা বলে ডাকছে। তোমার ঘরেও তো দবজা বন্ধ করে প্রায়ই এক-দেড় ঘণ্টা কাটায়। কী চায় জানো না? ন্যাকা কোথাকার!

ঠোঁট উল্টে বৌধায়ন বলে, ওঃ, ওরকম অনেকেই চায়। চাইলেই পাওয়া যায় নাকি?

জয়তী সামান্য ধারালো গলায় বলে, তুমি চাও না? তা হলে এক বাড়ি লোকের সামনে একটা কুমাবী মেয়েকে নিয়ে ঘরের দরজা দাও কেন? তোমার এথিক্স নেই?

বেশি বোকো না। বিয়ের আগে তোমারও বুধাদিত্য চাটুজ্যের সঙ্গে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট ছিল। সব জানি।

জয়তী প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে, ছিল তো কী হয়েছে? আমরা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি।

বৌধায়ন হেসে বলে, সাব্বাস। দারুণ সৎ ও সতী তো তোমরা!

মানে?

তুমি তো জানো না, বুধাদিত্য চাটুজ্যে আমেরিকায় ক'টা মেয়ের সঙ্গে কী কী করেছে! আর সেও জানে না বিয়ের আগে তোমারই বা ক'জন ছেলেবন্ধু ছিল। আমাকে বেশি এথিক্স দেখিয়ো না।

জয়তী বেশি ঘাঁটাল না। ঠান্ডা গলায় বলল, তোমার মনে কী আছে জানি না। তবে যদি সত্যিই নয়নাকে রিজেক্ট করতে চাও তবে এক্ষুনি তা করো। নইলে ও কিন্তু এনট্রি নিয়ে নেবে। নেবে কেন, অলরেডি নিয়েছে।

বৌধায়ন চিত হয়ে শুয়ে উদাস গলায় বলে, মেয়েদের কথা আজকাল আমি ভাবি না। আমি বাউল হয়ে যাচ্ছি। জলে নামব, জল ছিটাব, জলে সাঁতার কেটে যাব, কিন্তু বেনি ভিজাব না। নয়না পারবে না। তুমি যাও তো, ভাল করে এক কাপ চা তৈরি করো, বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো কোরো, বস্তির ব্র্যান্ড নয়। যাও।

জয়তী তার চুল ধরে খুব জোরে একটা মোচড় দেয়। বৌধায়ন জয়তীর পিঠে একটা চড় কষায়। বলে, কেমন?

চড়টা জোর লেগেছে। জয়তীর চোখে জল এসে যায়। করুণ স্বরে বলে, মারলে তো! আচ্ছা দেখব।

বৌধায়ন পাশ ফিরে শোয়। চোখ বুজে থাকে। জয়তী কাপ তুলে নিয়ে দুম দুম করে পা ফেলে চলে যায়।

বৌধায়ন পাশ ফিরে নরম বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেয়, প্রাণপণে চেপে রাখে নিজেকে বালিশের মধ্যে। বিড়বিড় করে বলে, হ্যাকনীড, হ্যাকনীড, জঘন্য, কুৎসিত...

রাগটা কার ওপর তা বুঝতে পারে না সে। সব কিছুই ভয়ংকর কুৎসিত, জঘন্য, হ্যাকনীড। কেন মেয়েদের কথা বারবার বলে সবাই? ক্যাতক্যাতে কাদার মতো শরীর, একঘেয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, চুমু খাওয়া এবং ক্লান্তিকরভাবে ভালবাসা শেষ হওয়া—এ সবের মধ্যে কী আছে? সবচেয়ে হ্যাকনীড পোশাক খুলে মেয়েদের ব্যবহার করা। তবে ভাল কী? কিচ্ছু নয়। সবচেয়ে কুৎসিত এই পা ভেঙে পড়ে থাকা। নয় নম্বর বাস থেকে একটা লোক ঝুলছিল হাতল ধরে। এমন কেতড়ে ঝুলছিল, এত অসহায় আর নশ্বর লাগছিল লোকটাকে যে বৌধায়ন দৌড়ে গিয়ে তাকে বাসের মধ্যে গুঁজে দিতে চেষ্টা করে। আর সেইসময়ে বাসটা তাকে চিমটি দিয়ে ধরে খানিকদূর হেঁচড়ে নিয়ে যায়। প্রথম তার মনে হয়েছিল, বাসটাই তাকে চেপে ধরেছে, পরে বুঝল আসলে পাদানির ভিড়ের ভিতরে তার হাত ঢুকে গিয়ে আটকে গিয়েছিল। সেই থেকে এই অবস্থা, কিন্তু এই মুহূর্তে তার লাফিয়ে উঠে রে রে করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। বেরিয়েই সে লাফিয়ে বাসে উঠবে, বিপ্লব করবে, খোলা মাঠের মধ্যে দৌড়ে ভোঁ হয়ে যাবে।

কাতর শব্দ করে সে আবার পাশ ফেরে। চিত হয়, কাত হয়, উপুড় হয়। কোনও ভাবেই ভাল লাগে না। মাথার কাছে টেবিলের ওপর গুচ্ছের পেপারব্যাক থ্রিলার। একটা টেনে ঠিক দু'পাতা পড়ে রেখে দিল। কলিং বেল নেই, কাউকে ডাকতে হলে চেঁচিয়ে ডাকতে হবে। ডাকবেই বা কাকে! মা আর বউদি বেরোল বোধহয়, ছোট বোন শিঞ্জিনী একটা গিদধরের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে! এ সময়টায় দু'জনে কোথায় যেন আশনাই করতে যায়। কদাচিৎ দাদার খোঁজ নেয় সে।

আসলে তার কেউ নেই। এই ভেবে সে চুপচাপ দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল।

টেলিফোনটা বাজল অনেকক্ষণ বাদে। কতক্ষণ বাদে তা সঠিক জানে না বৌধায়ন। সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

টেলিফোনে একটা আর্ত স্বর বলে ওঠে, বৌধায়ন!

বলছি। কী হয়েছে?

আমি মন্দা, ভীষণ বিপদ!

কী বিপদ?

আঃ...আমি ভীষণ মুশকিলের মধ্যে...আসবে?

আমি? আমার তো পা ভাঙা! কোথায় তুমি?

আমার বাবার অফিসে। অনেক লোক আমাকে ঘিরে ধরেছে। দে আর গোয়িং টু...গোয়িং টু...রেপ...মলেস্ট...বৌধায়ন! কী করব?

কী বলছ মন?

এসো শিগগির! নইলে কাউকে খবর দাও। আমি...আমি...

পাঁচ

মন্দা সেই সন্ধেবেলায় টেলিফোন করেছিল, তারপর থেকে টেলিফোনের কাছে বসে বসে মাছি তাড়িয়েছে সমীরণ। দু'বার চা খেয়ে খিদে মেরেছে। তারপর সুখনকে দিয়ে একটা পোড়া ভুট্টা আনিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিটি সুস্বাদ দানা চিবিয়ে খেয়েছে। কিন্তু কিছুই আর করার নেই। আসলে রায়বাবু আর আচার্যিবাবুর অফিসে এমনিতেও তার করার কিছু থাকে না। প্রায়দিনই চুপচাপ বসে থাকতে হয়। টেলিফোনের দুটো এক্সটেনশন আছে, একটা রায়বাবুর ঘরে, একটা আচার্যিবাবুর ঘরে। টেলিফোন এলে দুটোই বাজে। কেউ না থাকলে সমীরণ গিয়ে ফোন ধরে। ওরা কেউ না থাকায় এখন আচার্যিবাবুর ফোনটা বাইরে রাখা আছে। সে অফিসে এসে আজকাল কেবল টেলিফোন এলে জবাব দেয়। রায়বাবু আর আচার্যিবাবু থাকলে এটুকুও তার করতে হয় না।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে মাজা রসস্থ হয়ে গেল, পিঠ টনটন করতে লাগল। রায়বাবুর মেয়ের নাকি তাকে দরকার। সেটাও চাকরি মনে করে সমীরণ বসেছিল।

যখন ভুট্টা খাচ্ছিল তখনই আবার ফজলুর মুখটা মনে পড়ে গেল। আহা, ফজলুই না খেয়ে আছে। বরাবরই গরিব ছিল ওরা। একবেলা ভাত জোটে তো অন্যবেলা মুড়ি। জমিজমা যা ছিল তারও খানিকটা ইদানীং ওর বাপ বেচে দিয়েছে। ফজলু কিছুদূর লেখাপড়া শিখে কী একটু টুকুরমুকুর মেশিনপত্রের কাজ শিখল গিয়ে বহরমপুরে। তারপর বড় শহরে বড় সুযোগের আশায় কলকাতায় চলে আসে কাঁটালের গন্ধে মাছির মতো। অনেকদিন বাদে সমীরণের সঙ্গে এই আজ দেখা।

ফজলুর জন্য মনটা বড় খারাপ লাগছিল। সমীরণ নিজে কখনও না খেয়ে থাকতে পারে না।

ঘড়িতে যখন প্রায় পৌনে আটটা তখন সমীরণ ওঠে। না উঠে উপায়ও নেই। সুখনের রাতের অতিথিরা দু'-চারজন এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে। ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, মালের কুলি, কি দেশওয়ালি ভাই। গামছা বা কাপড়ের টুকরো পেতে ঘরময় শোবে সব। আবার ভোর ভোর কাজের ধান্ধায় বেরোবে। সারাদিন কলকাতাকে খুঁটবে, হাজারও পিঁপড়ে যেমন মোয়া খোঁটে।

রায়বাবুর মেয়ের বোধহয় আজ আর তাকে দরকার হবে না। রাত তো কম হল না। এই ভেবে সে অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা ফজলুর কাছে চলে আসে।

ফজলু!

ত্রিপলের তলায় আলো নেই। রাস্তার আলোও এখানে কমজোরি। শুধু দোকান-পাটের আলোয় ভিতরটা আবছা দেখা যায়। সেই অন্ধকারে একটা বিড়ির আগুন ধিইয়ে ধিইয়ে ওঠে।

ফজলু আছিস নাকি!— বলে মাথা নিচু করে সমীরণ ভিতরে ঢুকে চৌকিতে বসে।

ভারী কষ্টের একটা শব্দ করে ফজলু শোয়া থেকে উঠে বসে বলে, সমীদা নাকি?

হ্যাঁ। কেমন লাগছে রে?

ভাল আর কী বলো! না খেলে বড় একঘেয়ে লাগে। খেলে সময়টা কেটে যায়।

দূর বুরবক! সময় কাটানোর জন্য লোকে খায় নাকি?

মাইরি বলছি, আমার আর তেমন কোনও কষ্ট নেই। এব আগেও তো অনশন করেছি। শুধু এই নাগাড়ে না খেয়ে থাকলে মনটা কেমন ম্যাদাটে মেরে যায়। সময় কাটে না। মালিক শালাও এল না। এবার ঠিক কোম্পানি হাতবদল হয়ে যাবে সমীদা।

তোর পেটের মধ্যে গোঁতলানো দিচ্ছে না?

প্রথম প্রথম দেয়। তারপর পিত্তিটিত্তি পড়ে কেমন অসাড় হয়ে যায় ভেতরটা। খুব জলতেষ্টা পায়। আবার জল খেলে বমি-বমি লাগে।

এ ভাল হচ্ছে না রে ফজলু। চাচাকে লিখে জানাই, চাচা এসে বরং তোকে নিয়ে যাক।

নিয়ে যাবে কোথায়? ডাগর ছেলে হয়ে তো ঘরে বসে খেতে পারি না। আব্বা খাওয়াবেই বা কী? আমি যা দু'-দশ টাকা পাঠাতুম তাইতে খানিক সুসার হত।

অন্য কোম্পানি তোকে নেবে না?

অন্ধকারেও ফজলুকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল। রোগা মুখে হেসে নিজের কপালটা চেপে ধরে বলল, আমার মতো এলেম নিয়ে হাজার হাজার ঘুরছে।

আরও একটু ভিতরদিকে, আরও আবছায়াতে কে যেন ককিয়ে উঠে পাশ ফিরল। বলল, ওঃ শালা উপোসি শরীরে আর কত রক্ত আছে বাবা। ছারপোকা শালারা তবু ছাড়ে না। মদনা, বিড়ি আছে?

আর একটা বিড়ি জ্বলে। লোকটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, দাদা কি খবরের কাগজের লোক?

সমীরণ বলে, না।

লোকটা বলে, খবরের কাগজে আমরা চিঠি দিয়ে এসেছি। তবু আমাদের অনশনের খবরটা ছাপছে না কেন বলুন তো? মিনিস্টার বা এম এল এ-ও কেউ এল না।

ফজলু মাথাটা টিপে রেখেই বলে, অমন কত অনশন করছে লোক, ক'জায়গায় যাবে?

সমীরণ লক্ষ করল, এদের সকলের কথাতেই একটু খোনাসুর এসে গেছে। অনেকটা ভূতের স্বরের মতো।

রাস্তা দিয়ে কিছু লোক শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে আসছে। বলছে, রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির শ্রমিক আন্দোলন জিন্দাবাদ। বে-আইনি ছাঁটাই চলবে না। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। কারখানা হাতবদলের চক্রান্ত ব্যর্থ করো।

মিছিলটা বড় নয়। রোগাভোগা দরিদ্র চেহারার জনা ত্রিশ লোক। লাল শালুর ফেস্টুন তাদের হাতে। তাতে লেখা স্বস্তিকা লক কোম্পানি শ্রমিক সংঘ। তারা এসে ফজলুদের ত্রিপলের বাইরে জড়ো হল। একজন ধুতি আর শার্ট পরা লোক মাঝখানে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় হাতের মুঠো তুলে তুলে বলতে লাগল, রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির শ্রমিক ভাইয়েদের আন্দোলন সারা ভারতের শ্রমিকদের আন্দোলন। পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের শিকার ভারতের শ্রমিকরা এ লড়াইতে মদত দেবে...ইত্যাদি।

সমীরণ অস্বস্তি বোধ করে। কারণ, তার বেরোবার রাস্তা বন্ধ। যতক্ষণ না ওদের বক্তৃতা শেষ হয় ততক্ষণ এইখানে আটক থাকতে হবে তাকে।

অন্ধকার থেকে একটা লোক সামান্য খুশির গলায় বলল, এতক্ষণে সব আসতে লেগেছে।

বিড়ি-ফোঁকা লোকটা বলে, কাল আরও আসবে। খবরটা রটেছে। কিন্তু খবরের কাগজওলারা খবরটা স্রেফ চেপে গেল।

শেষ পর্যন্ত ছাপবে।

আর মিনিস্টাররা?

আসবে।— একজন ভরসা দেয়।

ফজলু খোনাসুরে বলে, সমীদা, তোমার অফিসে কিছু হয়?

না রে। আমাকেই কবে বলবে কেটে পড়তে।

ফজলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনল। তারপর বলল, মাথাটা কেমন করছে। সমীদা, আমি বরং শুয়ে শুয়ে তোমার সঙ্গে কথা কই।

কথা কওয়ার দরকার কী? চুপচাপ শুয়ে থাক। বিড়ি-টিড়ি কিছু খাবি?

ফজলু হেসে বলে, যাঃ, তোমার সামনে খাই নাকি?

ওসব দেশের ভাই, পাড়ার দাদা সম্পর্ক রাখ তো! বিড়ি খেলে যদি শরীরটা ভাল লাগে বুঝিস তবে খা। আমি বরং মুখ ফিরিয়ে বসি।

তাই বসে সমীরণ। ফজলু বিড়ি ধরায়।

সমীরণ বসে বসে ভাবে, সে যে ভূতের ভয় পায় তা এমনি নয়। কলকাতায় আসার পর থেকেই তার ভিতরটায় নানারকম ভূত উঁকিঝুঁকি দেয়। তার মধ্যে সবচেয়ে পাজি ভূত হল চাকরি যাওয়ার ভয়। কাজকর্ম কিছু নেই, কবে যে রায়বাবু কেটে পড়তে বলবেন!

সমীরণ ভাবে, এবার থেকে যেমন করেই হোক কাজ দেখাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত বলু। একটা শেষ চেষ্টা করতে বলুর গ্যারেজে ফোন করেছিল মন্দা।

ফোনটা গমগম করে উঠে প্রায় মন্দার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিল, মন? আরে মন, তুমি তো স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছো।... যেতে বলছ? আর বোলো না, হরিয়ানা থেকে আমার চারটে ট্রাক এল এইমাত্র। গৌহাটি যাবে। দুটোর টায়ার পাংচার।...টায়ারের দাম জানো মন?

আমার চেয়ে বেশি?

আরে তুমি তো লাখপাত্তির হিরোইন। আমি শুখা গরিব, আমার মগজে এখন পাংচার টায়ার হাওয়া ছাড়ছে।...তুমি শঃ-এর দোকানে চলে যাও আমি জিপ নিয়ে তুরন্ত আসছি।

কতক্ষণ?

হাফ অ্যান আওয়ার।

বার-এ আমি একা বসতে পারব না।

তবে রেস্টুরেন্টে বসে যাও। আমি আসছি। দুটো ড্রাইভার কিছু মাল টেনেছে, দুটোকে কয়েকটা লাথ জমিয়ে আসছি।

মন্দা ফোন ছেড়ে রেস্টুরেন্টের টেবিলে গিয়ে বসল। একা এবং ভীষণ একা।

বলু অর্থাৎ বলবীরকে তার যে খুব পছন্দ তা নয়। ওর সূক্ষ্ম অনুভূতি বড্ড কম। একসময়ে যখন কলেজে পড়ত তখন দুর্দান্ত হকি খেলত, ভাল ডিবেটার ছিল, ছাত্রও খারাপ ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে পারিবারিক ব্যাবসাতে নেমে লরিওয়ালা হয়ে গেল! আজকাল লরিওয়ালাদের ভাষাতেই কথা বলে। তার গোটা দশেক হেভি ডিউটি ট্রাক হরিয়ানা, দিল্লি থেকে গৌহাটি ডিব্রুগড় ট্রিপ মারে। দেদার টাকা। প্রতি বছর দুটো-চারটে করে ট্রাক কেনে। আগে মাতৃভাষা পাঞ্জাবি বলতে পারত না, তার চেয়ে ঢের ভাল বলত বাংলা। ওর জন্ম কলকাতার ভবানীপুরে, বাঙালি পাড়ায়, বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে বড় হয়েছে। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিল। ভরাট গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারত।

কফি শেষ করার আগেই বলু চলে এল। পেল্লায় চেহারা হয়েছে। হাতে বালা, গালে কিছু দাড়ি, নাকের নীচে গোঁফ, মাথায় বাহারি মেরুন পাগড়ি। ঢুকেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিকে চাইতে লাগল। সবাই ওকে দেখছে। চেহারাটা দশাসই বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দেখবার জিনিস ওর

পোশাক। এই গরমেও বলু পুরো স্যুট পরে আছে, গলায় বিশাল চওড়া টাই। এদিক ওদিক তাকিয়ে মন্দাকে দেখে বিশাল গলায় বলল, হাই!

মন্দা ওকে ভাল করে মেপে নিচ্ছিল। কাছে এসে উলটোদিকে বসতেই বলল, ষাঁড় কোথাকার!

মোটা বলছ? কিন্তু ফ্যাট নেই। শুধু মাংসের ডায়েট। নাথিং এলস। পেটটা দ্যাখো। বলে কোটের বোতাম খুলে বলল, নাও, খিমচে ধরে দেখো, নো ফ্যাট।

এটা প্রকাশ্যে জায়গা বলু। ভালগারিটি একদম নয়।

খুব খোলা হাসি হেসে বলু বলে, ইন ক্যালকাটা এভরিবডি ইজ ডুয়িং এভরিথিং ইন পাবলিক। যাকগে মন, সন্ধের পর আমি জলীয় জিনিস বলতে একটাই বুঝি। চলো।

কোথায়?

চলো না!

মন্দা উঠল এবং গেল। লালরঙা ধূলিমলিন জিপগাড়িটা যথেষ্ট জোরে চালিয়ে এবং ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে বলু সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ওপর একটা বারে নিয়ে গিয়ে বসে। এবং তক্ষুনি মন্দা বুঝতে পারে, বিকেলটা তার নষ্টই হল আজ।

বলু বার দুই তার দুটো ট্রাকের জন্য দুশ্চিন্তার কথা বলতে শুরু করল এবং ফাঁকে ফাঁকে চার পেগ রাম খেয়ে নিল। মন্দা এক পেগ ব্ল্যাকনাইট নাড়াচাড়া করছিল। জমছিল না। বলু অনেক দূরের জগতে চলে গেছে। সবাই দূরে চলে যাচ্ছে। আজকাল মন্দার কাউকেই তেমন ভাল লাগে না। যেমন ভাল লাগছিল না চিলি চিকেন বা প্রন কাটলেট।

বলুর সঙ্গে কবে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল তা কিছুতেই মনে পড়ল না মন্দার। এমনিতেই আজকাল কিছু মনে পড়তে চায় না, তার ওপর ব্লাক নাইট পেটে গিয়েই খ্যাপা কুকুরের মতো তার মগজে কামড়ে ধরেছে।

বলু হঠাৎ বলে, আমি কি নষ্ট হয়ে গেছি মন?

নষ্ট হবে কেন? তুমি টাকা কামাচ্ছো।

সেইটেই তো নষ্ট হয়ে যাওয়া। আজকাল গলায় সুর খেলে না, লাইট ফুর্তি করতে ইচ্ছে করে, খুব টাকার নেশায় পেয়েছে।

মন্দা ক্ষীণ গলায় বলে, পুরুষে তো টাকা কামাবেই।

আই ওয়াজ নট দ্যাট টাইপ। আমার সঙ্গে তিলকের খুব জমত। আমার আর ওর টাইপ একরকমের। কিন্তু তিলক ওর টাইপ বহাল রাখল, আমি বিজনেসম্যান হয়ে গেলাম।

আর খেয়ো না, তোমার নেশা হচ্ছে।

চার পেগ আমার মাপা। এক ফোঁটা বেশি খাই না। এতে যা হওয়ার হয়। না মন, নেশা-ফেশা নয়। তিলকটা ভেগে পড়ল চাষবাস করতে। আমি পারলাম না কেন?

মন্দা চুপ করে গ্লাসের গায়ে তার লম্বাটে প্রতিবিম্ব দেখল। কেমন বিকৃত, লম্বা, শাকচুন্নির মতো ছায়া পড়েছে তার।

তিলককে তুমি ভালবাসতে মন?

মন্দা মাথা নেড়ে বলল, বলতে পারব না। বলু, আমার কিন্তু একটু নেশা হচ্ছে।

ভেবো না। পৌঁছে দেব। আর এক পেগ নেবে?

না। আমার তো সহ্য হয় না। তোমাদের মতো মাতাল বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খাই।

ঘোমটা দাও কেন বলো তো! খেলে প্রাণখুলে খাবে, কিন্তু ততক্ষণই খাবে যতক্ষণ বুঝবে যে একা বাড়ি ফিরতে পারবে।

বোকো না।

আর একটু খাও। অল্প খেলে মজাও আসে না, শরীরেও কষ্ট হয়।

সুতরাং মন্দা আর আধপেগ নিল। আসলে সে বুঝতে পারছিল, বলু নয় এই ব্ল্যাক নাইটই তাকে আজ যা কিছু সঙ্গ দিচ্ছে।

আমি কি বুড়িয়ে যাচ্ছি বলু?

বলু খুব হাসে। হোঃ হোঃ করে। বলে, আমি নষ্ট তো তুমি বুড়ি! বাঃ বাঃ।

মন্দা ধমক দিয়ে বলল, মাতলামি নয় বলু!

খামোকা ধমকাচ্ছ ভাই। মাতাল বনে কোন বেওকুফ? আমাকে গিয়ে এখন দুটো ট্রাকের তদারকি করতে হবে। আজ রাতে রওনা করিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। মাতাল হলে আমার চলবে? চিকেন খাচ্ছো না? ফ্যাট হওয়ার ভয়? আরে গোস্ত খেলে ফ্যাট হয় না। দাও বরং আমাকে।

হুইস্কিটাও নাও। ভাল লাগছে না।

দেবে? আমার ডোজের বেশি হয়ে যাবে যে! তবু পয়সার মাল নষ্ট করে কী লাভ? তোমার এঁটোও বহুকাল খাই না। দাও। তিলকের কথা তুমি আজকাল আর কিছু ভাবো না, না?

না।

আমার খুব মনে পড়ে। বড় বেশি সাত্ত্বিক হয়ে গেল শালা।

আমাদের কি অন্য কোনও কথা নেই বলু?

আছে। অনেক কথা আছে। আমি তো কথার বস্তা হয়ে আছি। কিন্তু সেসব কথা তোমার ভাল লাগবে না। টায়ার ফাঁসবার কথা, লম্বা ট্রিপের কথা, লাইট জোকস, আমি নষ্ট হয়ে গেছি মন। 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না' গানটার সব কথা মনে পড়ে না।

মন্দার চোখ ঝিকিয়ে ওঠে। বলে, আমাকে অ্যাভয়েড করছ?

তোমাকে?— হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বলবীর।

ঠিক এইসময়ে বেয়ারা এসে বলে, আপকা ফোন সাব।

বলু অস্পষ্ট 'এক্সয়ুজ মি' বলে তাড়াহুড়ো করে উঠে যায়। একটু বাদে ফিরে এসে কপালের ঘাম পাঁচটাকার রুমালে মুছে বলে, ফিট হয়ে গেছে।

মন্দা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, তুমি তোমার গ্যারাজে এখানকার ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলে?

হুঁ। দোষ হয়নি তো?

তার মানে তোমার মন আমার ওপর নেই।

বিজনেস ইজ বিজনেস মন।

মন্দা চুপসে এতটুকু হয়ে যায় অভিমানে। ব্ল্যাক নাইটও তার মনটাকে সজল করেছে, নরম কাদার মতো মেখে ফেলেছে। তাতে এখন সহজেই গভীর ছাপ পড়ে। সে গুম হয়ে বসে থাকল খানিক, তারপর বিনা নোটিশে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি যাচ্ছি।

আরে দাঁড়াও! তোমাকে পৌঁছে দেব।

না বলু। আমি একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাকে মন? নতুন কেউ?

যা ভাবছ তা নয়। আমাদের অফিসের একজন কর্মচারী। সে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তোমাকে পৌঁছে দেবে? কেন, আর ইউ ইন ডেঞ্জার?

মন্দা সামান্য অস্বস্তি বোধ করে। এতো ঠিকই যে তার পক্ষে একা বাড়ি ফেরাটা কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আজকাল তার কেন যে একটা বিচিত্র শিরশির করা ভয়ের ভাব হয়। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি কেউ পিছনে আসছে, লক্ষ করছে, সুযোগ খুঁজছে। তার ভয়, একদিন বুঝি কোনও সুযোগে ধর্ষণকারীরা ঘিরে ধরে তাকে তুলে নিয়ে যায়। কিংবা হঠাৎ কোনও খুনি ইস্পাত ভরে দেয় হৃৎপিণ্ডে। কোনও মানে নেই, তবু হয় ওরকম।

মন্দা তার খাটো চুল ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলে, বলু যাও। তোমার বিজনেস ওয়েট করছে। আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে?

ওরকম বোলো না মন। শোনো, আমি শিগগিরই জাহাজ কিনব। আই অ্যাম গোয়িং ইনটু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। আমার ইচ্ছে জাহাজের প্রথম ট্রিপে তোমাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাব।

কী সুন্দর প্রস্তাব!

বিশ্বাস করছ না?

করছি। এখন যাও।

খুবই ফাঁকা আর একা লাগছিল মন্দার। এরকম ছাইয়ের মতো বিকেল সে অনেককাল কাটায়নি। বিকেলটা কেটে গেছে। রাত হতে চলল। ব্ল্যাক নাইট অনেকটা একঘেয়েমি কাটিয়ে দিয়েছে। তবে টিপ টিপ করছে মাথাটা। বলু তাকে জিপে তুলে সুরেন ব্যানার্জি রোডের ভিতরে বাবার অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বলে গেল, জাহাজের কথাটা ভুলো না। আই অ্যাম সিরিয়াস।

মন্দা ফিরে তাকাল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠল। খুব অন্যমনস্ক। অন্যমনস্কতায় সিঁড়ির মুখে, করিডোরে ছায়া ছায়া কিছু লোককে দেখতে পেল। তাকে দেখে দু'-চারজন দ্রুত সরে গেল এদিক ওদিক।

মন্দা তার বাবার অফিসঘর পর্যন্ত উঠতে যথেষ্ট হাঁফিয়ে পড়েছিল। ব্ল্যাক নাইট রক্তে ঘোড়া ছুটিয়েছে এতক্ষণে। তার ঘাম হচ্ছে, হাঁসফাঁস লাগছে, মাথাটা বেতাল, হাঁটু অবশ, বুক সামান্য জোরে টিপ টিপ করছে চোখে একটা কুয়াশার পর্দা পড়ে দৃষ্টি অস্বচ্ছ।

বড় ঘরটায় ঢুকেই সে থমকে গেল। পর মুহূর্তেই শিউরে উঠে ভাবল, সে ভুল জায়গায় এসেছে। এ নিশ্চয়ই তার বাবার অফিস নয়। বড় ঘরের মেঝেয় অন্তত দশ-বারোজন লোক শুয়ে বা বসে আছে। প্রত্যেকের চেহারাই কালো, বেশির ভাগই আদুড় গায়ে। সামনের বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর যে লোকটা আধশোয়া হয়ে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে সে লোকটার মুখে বসন্তের দাগ, কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আর ওরকম বদমাইশের মতো মুখ জন্মে দেখেনি মন্দা। ঘরে তীব্র বিড়ির গন্ধ। না, বিড়ির সঙ্গে আরও কিছু আছে। মুখ ফেরাতেই মন্দা দেখে আচার্যিকাকুর অফিসঘরের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে বসা একটা বিশ্রী চেহারার মাঝবয়সী লোক মুখ থেকে একটা বোতল নামিয়ে গামছায় আড়াল করল। একসময়ে মন্দার পুরুষ বন্ধুদের কেউ কেউ সিগারেটের মশলা ফেলে গাঁজা ভরে খেত। গাঁজার গন্ধটা চেনে মন্দা। এত গন্ধের মধ্যে সে কি গাঁজার গন্ধও পাচ্ছে একটু?

চারদিকে পাথরের মতো স্তব্ধতা। একঘর লোক স্ট্যাচু হয়ে তাকে দেখছে। মন্দাও নড়তে পারছে না। ভুল, সম্পূর্ণ ভুল ঠিকানায় এসেছে সে। এক্ষুনি চলে যেতে হবে, পালাতে হবে। কিন্তু আবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, দুটো ছোট অফিসঘরের দবজায় প্ল্যাস্টিকের নামের ফলকে লেখা, বি রায় আর এ আচার্য। এ তো তার বাবারই অফিস। সমীরণ নেই।

সুখন! সুখন!—ডাকল মন্দা।

কেউ সাড়া দিল না। টেবিলের ওপর লোকটা ধীরে ধীরে উঠে বসে। তার চোখ জ্বলছে। মন্দা ঘরের একটু ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। শুনতে পেল, তার পিছনে দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তেলহীন কবজার ককিয়ে ওঠা শব্দ করে। চকিতে ঘাড় ঘোরায় সে। দেখে, ভেজানো দরজার গায়ে লতিয়ে আছে একটা আধন্যাংটা লম্বা কালো মানুষ।

মন্দা জানত এরকম কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই লোকগুলো কী করবে মন্দাকে? কেড়ে নেবে? সর্বনাশ করবে কিছু? খুন করবে?

কিছু একটা করবে। পাথরের মতো স্থাণুভাব ঝেড়ে ফেলে মেঝে থেকে একে একে উঠে দাঁড়াচ্ছে তারা। কালো, কুৎসিত, নোংরা মানুষ। ভয়ংকর মানুষ। কারা এরা? কোত্থেকে এল?

বুদ্ধি হারিয়ে যাচ্ছে। শরীরে ভয়ের রিমঝিম। মন্দা তবু দু' পা এগোল। আবার এক পা। বাবার অফিসের দরজাটা পেয়ে গেল হাতের নাগালে। সিঁড়িতে উঠবার সময়ে চাবি বের করে রেখেছিল হাতে। কাঁপা হাতে চাবিটা বাড়াল দরজার দিকে।

এখন একমাত্র সামনে এগোনোরই পথ আছে। কিন্তু পারবে কি মন্দা ছোট অফিসঘরটায় ঢুকতে? তার আগেই কি ওরা তাকে ধরবে না চেপে?

কিন্তু মন্দা পারল। কীভাবে পারল তা বুঝল না। কিন্তু দরজাটা খুলে গেল, গ্রাস করল তাকে, তারপর নিরাপদে বন্ধও হয়ে গেল।

রিভলভিং চেয়ারটায় বসে, হাতের নাগালে টেলিফোন পেয়ে মন্দা ভারী অবাক হয়ে যায়। ওরা যদি লুটই করবে তাকে তবে এ ঘরে ঢুকতে দিল কেন? ওরা কি জানে না এ ঘর থেকে মন্দা পুলিশ ডাকতে পারে?

টেলিফোনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে নম্বরটা প্রথম মনে পড়ে তা ডায়াল করতে থাকে। বিড়বিড় করতে থাকে, বৌধায়ন। ওর তো পা ভাঙা! তবু কেউ না কেউ তো জানবে।

ফোন করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মন্দা। কী করবে? সারা শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। শিউরে উঠছে সে। বাইরে চাপা স্বরে কথা বলছে ওরা। দরজায় ছিটকিনি দেওয়ার শব্দ হল না? অনেক পায়ের শব্দ খসখস করে ঘুরছে, ফিরছে। কে যেন বলল, মালকিন বাটে!

মন্দা ঘেমে ঘেমে অবসন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এয়ার কন্ডিশনারটা সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে চালিয়ে দেয় সে। তারপর অমোঘ নিয়তির জন্য অপেক্ষা করে।

সময় কাটে। বৌধায়ন আসবে না সে জানে। কিন্তু আর কাকে ফোন করা যায়? বাড়িতে তা হলে মা জানবে, সবাই জানবে।

খানিকক্ষণ ঠান্ডা ঘরে বসে জুড়িয়ে গেল সে। মাথাটা কিছু পরিষ্কার। উঠল। পা টিপে দরজার কাছে এল। বাইরে এখনও চাপা গলায় কথা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র? আজ রাতটা মন্দার বোধহয় কাটল না। কাল হয়তো সে সমীরণকে ছাঁটাই করবে। কেন, কোন সাহসে লোকটা অপেক্ষা করেনি?

পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎ খেলল মাথায়। যদি সমীরণকেও ওরা খুন-টুন করে থাকে? হয়তো আচার্যিকাকুর ঘরে তার লাশটা ফেলে রেখেছে।

চিন্তাটা সহ্য হল না মন্দার। এক টানে দরজাটা খুলে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলল, খবরদার! আমি পুলিশে ফোন করেছি!

সামনে আবার পাথরের মতো স্তব্ধতা। টেবিলের লোকটা উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা হতভম্ব। হঠাৎ সেই লোকটা হাতজোড় করে বলে, নমস্তে মেমসাব। মাফি মাঙে। আমরা রাতে এইখানে লেটে যাই। শুতনেকো জাঘা কুথা প্যাব, গরিব আদমি সব। মাফি মাঙে।

মন্দার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয় না। তারপর হয়। তাই তো! এরা রিকশা বা ঠেলা চালায়, সারাদিন খাটে। রাতে যাবে কোথায়? কলকাতায় তো এত লোকের শোওয়ার জায়গা নেই!

সব লোকই দাঁড়িয়ে গেছে, বেশিরভাগই জোড় হাতে বিনয় করে বলে, নমস্তে মালিক। বাকি যারা তারা কথা বলতেও সাহস পায় না। মুখ লুকিয়ে রাখে।

এরা যেতে দেবে তাকে?

মন্দা আঁচলটা ঘুরিয়ে মুখ মুছে শরীরটা ঢাকা দিয়ে নেয়। মনটা নরম লাগে। আস্তে করে বলে, আমি পুলিশে খবর দিইনি। তোমরা থাকতে পারো।

চোঁয়াড়ে লোকটা ভারী খুশি হয়ে বলে, চোরওর নেহি মালিক, গরিব গাঁওয়ার লোক সব। মাফি মাঙে।

একজন বলে, বুঢ়া কুছু নেহি মালিক। স্রেফ লেটে যাই। সবেরে ফিন মাল ঢুঁতে চলিয়ে যাব।

মন্দা আর শোনে না। তার পেটের ভিতর যেটুকু ব্ল্যাক নাইট ছিল সব করুণাধারা হয়ে গেল

এইমাত্র। চোখে জল হয়ে বয়ে এল রক্তের ভিতরে মিশে থাকা সেই ঘোড়সওয়ার।
মন্দা বলল, থাকো, থাকো। আমি কিছু মনে করিনি।
কী ভাল লোক এরা! কী সুন্দর মানুষ সব।

॥ ছয় ॥

বৌধায়ন কোনওদিনই কোনও বীরত্বের কাজ করেনি। বীরত্বের কথা দূরে থাক সারাজীবনে তাকে তেমন কোনও কাজই করতে হয়নি। বাবা দাদারা চাকরি-টাকরি করে। বড়লোক না হলেও অবস্থা খারাপ নয়। নিজেদের পুরনো বাড়ি, বাড়িতে টেলিফোন, ফ্রিজ এসব তো আছেই, একটা গাড়িও আছে। আরও কিছুদিন চাকরি-বাকবি না করলেও তার চলবে। তাকে বাজার করতে হয় না, রেশন তুলতে বা ইলেকট্রিক বিল দিতে যেতে হয় না, কোনও ফরমাশ খাটতে হয় না, বরং উলটে তাব ফরমাশেই লোকে অস্থির। বড়দা আর মেজদা মাকে বকে, ছোটটাকে একদম গুড ফর নাথিং বানিয়ে রাখলে মা! সামনের বছর তার জাপান যাওয়ার কথা আছে, সেই ভেবে মা এখন থেকেই অস্থির। বারবারই বলে, তুই কি পারবি গিয়ে থাকতে?

ব্যাপারটা আসলে তা-ই। এ বাড়ি আর মা তাকে দুর্গের মতো আড়াল করে রেখেছে। কোনওদিন কোনও ভারী কাজ করেনি বলে এখন সে এক গ্লাস জল ভরেও খেতে পারে না। দোকান থেকে একটু জিনিস বয়ে আনতে হলে সে ঘেমে জল হয়। একবার বাড়ির ওপর রাগ করে নিজের কাজ নিজে করতে গিয়ে গেঞ্জি আর রুমাল কেচেছিল। তাইতে তার বুক ব্যথা করেছিল তিনদিন।

ফোনটা যখন আসে তখন আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল বৌধায়ন। বলতে বলতেই উঠে বসে। ফোনটা রাখার পর বিড়বিড় করে 'রেপ! মলেস্টেশন' বলতে বলতে সে কই মাছের মতো দাপাতে লাগল বিছানায়। মন্দার কী হবে? এতক্ষণে কী হয়ে গেল না জানি!

বৌধায়নের এই একটা জিনিস আছে। যাকে বলা যায় ফিলিং। অসম্ভব সহানুভূতি তার। অন্যের জন্য অল্পেই অস্থির হয়ে পড়ে। নিজের জন্য যতটা হয় প্রায় ততটাই। কারও কিছু ক্ষতি হবে বা কেউ কোনও কষ্ট পাবে, মরে যাবে এ সে ভাবতেই পারে না। ছেলেবেলা থেকেই সে মাকে জিজ্ঞেস করে আসছে মা, তুমি মরে যাবে না তো? কোনওদিন মরবে না তো!

কাকে খবর দেবে তা মাথায় এলই না তার। মাথার চুল দু'হাতে মুঠো করে ধরে সে গড়াগড়ি দিতে লাগল বিছানায়। তারপর খাড়া উঠে বসল, বিড়বিড় করে বলল, আমি যাব। তারপর ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ের দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল সে। নিজের ওপর রাগে ঘেন্নায় নীল হয়ে গেল সে। ঘামতে লাগল অসম্ভব উত্তেজনায়। মন্দা কেন নিজের বাড়িতে ফোন না করে তাকেই করতে গেল? অন্য কাউকে না ডেকে তার পা ভাঙা জেনেও কেন তার কাছেই পাঠাল এস ও এস?

মন্দার বাড়িটা বড় অদ্ভুত। সে বাড়ির কেউ কাউকে দেখতে পারে না। মন্দার বাবা মা'র মধ্যে গত দশ বছর ধরে নাকি কথাবার্তা নেই। মন্দাব সঙ্গে তার বাপ-মায়ের সম্পর্কও ঝগড়ার। মন্দার দুই দাদার একজন ইটালি, অন্যজন সুইজারল্যান্ডে সেটেল করেছে। সংসারের অশান্তির জন্যই তারা আসছে না বলে মন্দার ধারণা। তার আর এক ভাইও পালানোর পথ খুঁজছে। কাকে ডাকবে মন্দা? আর বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের সঙ্গেও মন্দার তেমন বনিবনা হয় না। বৌধায়নের সঙ্গে যে হয় তাও নয়। তবু বৌধায়ন মন্দাকে পছন্দই করে বোধহয়। এখন বিপন্ন মন্দার জন্য প্রাণ আনচান করে তার।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে বৌধায়ন বাড়ির চাকরকে ডাকতে লাগল, নরেন! নরেন! ...কোথায় যে যায় রাস্কেলটা!

চেঁচানিতে নরেন এল না, এল জয়তী, সাজছিল। মেয়েদের অভ্যাস সাজের সবশেষে শাড়ি

পরবে। জয়তীর ভ্রু আঁকা, লিপস্টিক লাগানো, পাউডার বোলানো শেষ হয়েছে, শাড়ি পরার আগে ব্লাউজটা বদলাতে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু সেটা পরার সময় পায়নি। বৌধায়নের জরুরি ডাক শুনে ওই অবস্থাতেই মেঝে কাঁপিয়ে দৌড়পায়ে এসেছে। শাড়িতে গা ঢাকতে ভোলেনি, তবু পাতলা শাড়ির ভিতর দিয়ে তার কালো গায়ে সাদা ব্রেসিয়ার দেখা যাচ্ছে।

বৌধায়ন মুখ ফিরিয়ে নিল।

কী হয়েছে বুধো?

ভীষণ বিপদ। আমার এক বান্ধবী...চেনো তো মন্দাকে! এইমাত্র ফোন করে বলল, তার ভীষণ বিপদ। যেতে হবে।

তুমি যাবে?

বৌধায়ন ভয়ংকর মুখ বিকৃত করে বলল, যেতেই হবে। এবং এক্ষুনি।

তুমি যাবে কীভাবে? বরং ঠিকানা দাও, আমি যাচ্ছি।

বৌধায়ন আঁতকে উঠে বলে, না। মন্দা ইজ গোয়িং টু বি...ওঃ সে বিচ্ছিরি ব্যাপার। সেখানে একা গেলে তোমারও রেহাই নেই। গাড়িটা আছে?

না তো! বাবা না ফিরলে গাড়ি পাবে কোথায়?

তবে শিগগির ট্যাক্সি ডাকো। শিগগির! একমুহূর্ত সময় নেই।

বলতে বলতেই বৌধায়ন খাট থেকে এক পায়ে নেমে দাঁড়াল। ডান পায়ের দিকে তাকাল আবার। নিজের গায়ে তার থুথু দিতে ইচ্ছে করছে।

জয়তী খুব দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরোল, চেঁচিয়ে বলল, তৈরি হও, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। শাড়িটা পরা বাকি শুধু।

বৌধায়ন আপনমনে স্বগতোক্তি করল, শুধু শাড়ি নয়, ব্লাউজও। ছিঃ ছিঃ!

ডান পায়ে মেঝেয় ভর দেয় বৌধায়ন, খুব সাবধানে। লাগছে একটু। তবে অসহ্য নয়। খুঁড়িয়ে হাঁটা যাবে। চোট-পায়ে বেশি ভর দেওয়া যাবে না।

পায়জামার ওপর সে একটা পাঞ্জাবি চড়াল ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে। সারি সারি প্যান্ট ঝুলছে, কিন্তু গোদা পা ঢুকবে না বলে প্যান্ট পরার প্রশ্নই ওঠে না।

জয়তী দেরি করেনি। বৌধায়ন দরজার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখে জয়তী বারান্দার ওপাশের ঘর থেকে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে পাল্লা টেনে বন্ধ করল। বৌধায়নকে দেখে বলল, ট্যাক্সি এসে গেছে। যেতে পাববে তো?

পারব। শোনো, বাবার রুপো বাঁধানো বেতের লাঠিটা দাও।

ভর দেবে?

দুটোই হবে। ভর প্লাস অস্ত্র।

মারপিট কববে নাকি?—বলে বড় চোখে তাকায় জয়তী।

দরকার হলে। মন্দা ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার।

জয়তী এতক্ষণ খুব সিরিয়াস ছিল, এইবার ফিক করে হেসে ফেলে বলল, তুমি? বোলো না, বোলো না।

ভ্রুকুটি কাকে বলে তা সঠিক জানে না বৌধায়ন, তবে কথাটা বইতে পড়েছে। এখন সে খুব প্রাণপণে ভ্রুকুটি করার চেষ্টা করে। বোধহয় ভ্রুকুটিটা হয় কারণ জয়তী কথা না বাড়িয়ে পক্ষিণীর মতো নাচের পায়ে উড়ে গিয়ে লাঠিটা নিয়ে আসে।

বৌধায়ন লাঠিটা নিয়ে বলে, তুমি আবার সঙ্গ নিলে যে!

আমি না হলে কে নেবে? বাড়িতে কেউ তো নেই। নরেনও বাজারে।

কারও দরকার ছিল না।

বেশি বীরত্ব দেখিয়ো না। কচি খোকার মতো হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা, আবার কথা ঝাড়ছে। মেয়েটার কী বিপদ বললে না তো।

বৌধায়ন দেয়াল ধরে ধরে এগোয়। মুখ ভয়ংকর বিকৃত। লাগছে একটু। কিন্তু বেশি লাগতে পারে ভয়ে সে প্রতি পদক্ষেপেই কুঁচকে যাচ্ছে। তবু এগোয়। ডানদিকে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে এসে জয়তী তার বগলে কাঁধের ঠেকা দিয়ে বলে, শরীরটা ছেড়ে দাও।

পারবে?

না পারলে বলছি?

বৌধায়ন নাক কুঁচকে বলে, এত সেন্ট মাখো কেন বলো তো! ওসব গন্ধে আমার গা গুলোয়। ছাড়ো।

বেশি বোকো না। ফ্রেঞ্চ পারফিউম। কত দাম জানো?

দামটাই শিখেছ। নয়নার ফাংশনে গেলে না?

ড্রপ করছি।

মা'রও যে যাওয়ার কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মা ডিসিশন চেঞ্জ করলেন। আমি একা যাচ্ছিলাম।

যাও না।

না। তার চেয়ে এই ফাংশনটাই বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

ইয়ারকি কোরো না। লাইট ব্যাপার নয়। মন্দা সহজে বিপদে পড়ে না।

জয়তী আবার সিরিয়াস হয়ে গেল। সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে লাগল বৌধায়নকে।

মন্দার বাবার অফিসটা বৌধায়ন চেনে। কয়েকবার ছুটির দিনে মন্দা বেশ কয়েকজন বন্ধু এবং বান্ধবী নিয়ে তার বাবার ফাঁকা অফিসঘরে গিয়ে এয়ার কন্ডিশন করা ঘরে বসে আড্ডা দিয়েছে। ভারী নিরিবিলি জায়গা এবং নিরাপদও। গরমের দিনে ঠান্ডা ঘরে বসে আড্ডা খারাপ নয়। তাছাড়া অফিসটা মন্দার কাছে নেশার মতো। বাবা না থাকলে ও অফিসে গিয়ে ফাইলপত্র খুলে দেখে, ব্যাবসার অন্ধি-সন্ধি বোঝার চেষ্টা করে। মন্দা বলে, আমি হব ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

তা হবেও হয়তো মন্দা। ওর সে এলেম আছে। অনেকবার ও বন্ধুদের ব্যাবসা জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তাইতেই বৌধায়ন টের পেয়েছে যে, মন্দা সত্যিই ব্যাবসা বোঝে। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে বৌধায়নের শ্লোগান, ব্যাক টু কিচেন। আবার রান্নাঘরে ফিরে যাও। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। পুরুষেরা বহির্জগতে, মেয়েরা রান্নাঘরে।

দশাসই পশ্চিমা ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়া দিচ্ছিল বৌধায়ন, জলদি! জলদি!

জয়তী বলে, ওরকম কোরো না। কোথায় ভিড়িয়ে দেবে।

বৌধায়নের হাত-পা নিশপিশ করে। সে অস্থিরভাবে বসে বসেই একশোবার এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে অফিসবাড়িটার সামনে নামবার সময়ে বৌধায়নের হাত-পা আড়ষ্ট লাগছিল। ভয় ভয় করছে। কিন্তু পিছোনো যায় না। জয়তী কি কোনও ভরসা? ভেবে সে একবার জয়তীর দিকে তাকায়। জয়তী গম্ভীর! তাকে নামিয়ে দাঁড় করানোর পর এখন নিজের উলি শাড়ির আঁচল গোছাচ্ছে।

বৌধায়ন পকেটে হাত দিয়ে বলল, এই রে। টাকা আনতে ভুলে গেছি।

আমি ভুলিনি।—বলে জয়তী তার চামড়ার বটুয়া খুলতে থাকে।

পুরুষ সঙ্গে থাকলে মেয়েরা খরচ করে, এটা একদম পছন্দ নয় বৌধায়নের। তবু এখন তো উপায় নেই। ড্রাইভার যখন মিটার দেখে পয়সার জন্য হাত বাড়িয়েছে তখন বৌধায়ন বলল, থাক

মেজ বউদি, ট্যাক্সিটা ছেড়ো না। আমাদের বোধহয় দরকার হবে।

এই বলে সে নেংচে ড্রাইভারের জানালায় এগিয়ে গিয়ে খুব বিনীতভাবে বলে, ভাইসাব, এক লেড়কিকো বহুত খতরনাক... খতরনাক...

বলে থেমে সে জয়তীর দিকে ফিরে বলে, খতরনাক মানে কী বলো তো!

পাজি, বদমাশ।

বিপদের হিন্দি কী?

খতরা।—বলেই আবার ফিক করে হাসে জয়তী।

বৌধায়ন গম্ভীর হয়ে বলে, র‍্যালা দিয়ো না। সপ্তাহে দুটো করে হিন্দি ছবি দেখলে আমারও সব মুখস্থ থাকত!

এই বলে সে ফের ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলে, এক লেড়কি বহুত খতরামে পড়া। আপ জারা মেহেরবানি করকে হামারা সাথ আনে সে বহুত উপকার হোগা...

ড্রাইভার অবাক হয়ে গিয়েছিল, এবার বলল, বাংলায় বলুন না! আমি বুঝতে পারি।

বৌধায়ন পিছনে জয়তীর হাসির খুক শব্দ পেল। তবু মাথা ঠিক রেখে বলল, একটি মেয়ে খুব বিপদে পড়েছে। একটু যদি সঙ্গে আসেন। আমরা আপনার গাড়িতেই ফিরব!

ট্যাক্সিওয়ালা একটু ইতস্তত করে। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা সাধারণত সওয়ারির মামলায় যেতে রাজি হয় না। কিন্তু বৌধায়নের আহত পা আর মুখের পবিত্রতা দেখে এ লোকটা হঠাৎ রাজি হয়ে গেল। বলল, চলুন, দেখছি।

গাড়ি লক করে লোকটা পিছনে পিছনে উঠে আসে। বৌধায়ন এখন অনেকটা সাহসের সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। বেশ ব্যথা লাগছে পায়ে। তিরের ফলার মতো গোড়ালি থেকে খচখচ করে ব্যথা উঠে আসছে কুঁচকি পর্যন্ত। কাস্টিং আর ব্যান্ডেজ-ভারী পা তুলতে কষ্ট হচ্ছে। জয়তী তিনতলা পর্যন্ত খুব নিপুণভাবে তার ভার সামলে ঠেলে তুলল।

ওই সামনের ঘরটা।—বলে বৌধায়ন জয়তীর হাত ছাড়িয়ে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে এগোল।

পিছন থেকে জয়তী সাবধান করে দেয়, হুট করে কাউকে মেরে বোসো না। এটা প্র্যাকটিক্যাল জোকও হতে পারে মন্দার।

ঠিক ঘরের চৌকাঠেই সুখনের সঙ্গে দেখা। চেনা মুখ, বহুবার তাদের চা দিয়েছে লোকটা।

লাঠিটা দু'হাতে শক্ত মুঠোয় বাগিয়ে ধরা ছিল, সেই ভঙ্গিতেই গাঁক করে ওঠে বৌধায়ন, এই শুয়োরের বাচ্চা! মন্দা কোথায়?

সুখনের মুখটা শুকনোই ছিল। বৌধায়নের গাল শুনে আর মূর্তি দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভীষণ মিয়োনো গলায় বলল, জি, দিদিমণি তো একটু আগে চলে গেলেন। হামি ট্যাক্সি ধরে দিয়েছি।

বৌধায়ন মেঝেয় লাঠিটা একবার আছড়ে নেয়। রাগে তার গা রি-রি করে ওঠে। মাথায় আগুন। গলায় সেই আগুনের হলকা বেরোয়, ঠিক করে বলো কী হয়েছে? মন্দা আমাকে ফোন করেছিল। আমি ঘর দেখব, রাস্তা ছাড়ো।

সুখন কুণ্ঠিত পায়ে সরে গিয়ে রাস্তা দেয়।

ঘরের মধ্যে একপাল আধা-ভিখারি চেহারার মানুষ সিঁটিয়ে বসে আছে ভয়ে। প্রত্যেকে সজাগ, সতর্ক জুলজুল করছে চোখ। পালানোর ফিকির ঘুরছে তাদের মগজে। রাতে শুতে এসে বেকার এই বিপদ।

বৌধায়ন প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। এই সমাজের লোকজনকেও সে ভাল চেনে না। প্রথম নজরে মনে হয়, এরা ভয়ংকর বদমাশ, পাজি। রেপ, খুন সব করতে পারে। আবার ভাল করে দেখলে মনে সন্দেহ উশখুশ করে, পাজি হওয়ার মতো যোগ্যতাই তো এদের নেই। তেমন তেমন

পাজি হতে গেলেও তো কিছু এলেম চাই। পাইজ্যামির সেই মেধা কি এদের আছে? তবু বৌধায়ন রক্তচোখে চারিদিকে চেয়ে ফের গাঁক করে ওঠে, ওই অফিস দুটোর দরজা খোলো। আমি দেখব। আর এদের আটকে রাখো, কেউ নড়লেই মাথা ফাটিয়ে দেব।

কেউ নড়ল না।

সুখন খুব শুখো গলায় নরম সুরে বলে, চাবি তো দিদিমণি নিয়ে গেছে।

বৌধায়ন পাগলের দৃষ্টিতে সুখনের দিকে চেয়ে বলে, দু' নম্বরি কথা ছাড়ো। ঠিকসে বলো।

সুখন প্রথমটায় কথা বলতে পারে না, তারপর বলে, এরা সব গরিব গাঁওয়ার আদমি। রোজ রাতে এসে শুয়ে থাকে, সবেরে চলে যায়। দিদিমণি আজ হঠাৎ চলে এসে এদের দেখে ডর পেয়েছিল, আমি তখন ছিলাম না। কোনও হরজা হয়নি, সব ঠিক আছে। বিসোয়াশ করুন।

বৌধায়ন একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, ঠিক আছে। মন্দার বাড়িতে ফোন করো। আমি দেখতে চাই ও বাড়ি পৌঁছেছে কি না।

সুখন ডায়াল করে রিসিভার বৌধায়নকে দেয়।

মন্দা বাড়ি ফিরেছে?

না।—বলেই ওপাশের ভদ্রমহিলা ফোন নামিয়ে রাখলেন।

চূড়ান্ত অভদ্র ওরা। বরাবরই এইরকম। মন্দা বাড়ি না থাকলে বৌধায়ন ফোন করে কোনওদিন কিছু জানতে পারেনি। এমনই ওদের পারিবারিক সম্পর্ক যে, কেউ কারও নাম পর্যন্ত সইতে পারে না।

ধীর হাতে ফোন নামিয়ে রাখার সময়েই বৌধায়নের রাগের স্টিম বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ঘরের লোকগুলোর মধ্যে যার মুখে বসন্তের দাগ সেই সবচেয়ে বদমাশের মতো দেখতে। বৌধায়ন নেংচে গিয়ে লোকটার বুকে লাঠির একটা রূঢ় খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, সুখন ঠিক কথা বলছে, এই শালা?

লোকটা লাঠির গুঁতোয় 'কোঁক' করে উঠে বলে, জি।

তুই কে?

ঠেলা চালাই! রামব্রিজ দোসাদ।

বৌধায়ন প্রচণ্ড রাগের চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কিন্তু তার সেই স্টিম আর নেই। তবু গিয়ে সে অফিসঘরের দরজার ঘষা কাচে চোখ রেখে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করে। কিছু দেখা গেল না। তবে মনে হল, ঘরের ঠান্ডা মেশিনটা এখনও চলছে। দরজার কাচে ভাপ, শীতলতা।

বৌধায়ন দরজায় শব্দ করে বলল, মন্দা। মন্দা ভিতরে আছ?

সাড়া নেই।

বৌধায়ন কুটিল চোখে সুখনের দিকে চেয়ে বলে, ভিতরে এয়ারকন্ডিশনার চলছে কেন?

দিদিমণি বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

বৌধায়ন লাঠিটা তরোয়ালের মতো ধরে বলল, আমি আবার পরে মন্দাকে ফোন করব। যদি কোনও গড়বড় হয়ে থাকে তো তোমাকে ছাড়ব না বলে রাখলাম। মাটিতে পুঁতে ফেলব।

সুখনের ভয়-খাওয়া যায়নি, তবু যতদূর সম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, কোনও গড়বড় হয়নি। ঝুটমুট দিদিমণি ভয় খেলেন।

বৌধায়নের পা ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু রাগের গরমটা রয়েছে। সে ব্যথাটাকে পাত্তা দিল না।

জয়তী দরজার কাছ থেকে বলল, বুধো, চলে এসো। কিছু হয়নি।

বৌধায়ন গড়গড় করে সিংহের মতো ফিরে তাকিয়ে দেখে, দরজায় দশাসই পশ্চিমা ড্রাইভার আর জয়তী দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারটার মুখ পুরো বেকুব। জয়তী কিছু গম্ভীর কিন্তু মুখে কোনও উদ্বেগ

নেই। বৌধায়ন ফের গাঁক করে ওঠে, কী করে বুঝলে যে কিছু হয়নি?

হলে ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যেত! আর মন্দার মাথায় যে একটু ছিট আছে তা আমি ওকে প্রথম দেখেই টের পেয়েছিলাম।

বৌধায়নের রাগের স্টিম যেটুকু ছিল তাও হুশ করে বেরিয়ে গেল। ভারী অবসন্ন বোধ করে সে। আর রাগ কমতেই কুঁচকি পর্যন্ত গোটা পায়ের টাটানি টের পায়। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে দরজার দিকে এগোতেই জয়তী তাকে ধরে। খুব মৃদুস্বরে বলে, বাব্বাঃ, যা বীরত্ব দেখলাম। আজ সবাইকে বলব।

বৌধায়ন শুধু ব্যথার কাতর একটা 'ওফ্' শব্দ করে। প্রচণ্ড কষ্টে সে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

বাড়িতে ফিরে পায়ের অসহ্য ব্যথায় বিছানা নিল বৌধায়ন। ব্যথা যতটা তার চেয়ে অবশ্য সে বেশিই কাতর। সারা বিছানায় গড়ায় আর বিড় বিড় করে বলে, এ পা আর ভাল হবে না। চিরদিনের মতো গেল। ওফ্।

বাড়িতে খবরটা রটাতে জয়তী দেরি করেনি। খবর পেয়েই মা প্রায় দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে, তুই লাঠি নিয়ে মারপিট করতে গিয়েছিলি? কী সর্বনাশ।

বৌধায়ন ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে, এত কথা বলো কেন তোমরা বলো তো?

ওই জখম পা নিয়ে আমাকে একবারও না বলে কয়ে কোন আক্কেলে তুই গেলি বুধো?

বৌধায়ন কাতরাতে কাতরাতে বলে, কাছে বসে একটু হাতাপিতি করো তো! বোকো না।

হাতাপিতি ব্যাপারটা বৌধায়নের নেশার মতো। মা অবশ্য ঠাকুমার মতো পারে না। গেলবার নব্বুই পার করে ঠাকুমা বোল্ড আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছে। শেষদিন তক শক্ত-সমর্থ ছিল, সিনেমা পর্যন্ত দেখতে গেছে। বৌধায়নের বিশ্বাস ছিল, ঠাকুমা সেঞ্চুরি করবেই। পারল না। সেই ঠাকুমা এই হাতাপিতি ব্যাপারটা খুব ভাল পারত। তুলতুলে নরম তুলোর মতো হাত ছিল তার। কাছে গিয়ে বসলে বা পাশে শুলে ঠাকুরমার নরম হাত স্বয়ংক্রিয় হয়ে চলে আসত বৌধায়নের পিছে, গায়ে। পিঠ, বুক হাতিয়ে দিত, খুঁজে খুঁজে তুকুর-পুকুর করে অদৃশ্য গোটা বা ঘামাচি গেলে দিত। ঠাকুমার নখ কখনও বড় হতে পারত না, তাই ভোঁতা নখের সেই নরম আঁচড়ে আরামে গা শিউরে শিউরে উঠত। এমনই ছিল সেই হাতাপিতির গুণ যে ঘুম এসে পড়ত কখন!

মা অত ভাল না পারলেও চমৎকার নকল করেছে। ভেজা গামছা দিয়ে আগে মা তার ঘেমো গা মুছিয়ে দিল। তারপর সারা শরীর হাতিয়ে, খুঁটে চুলকে দিতে লাগল। বলল, এমন সর্বনেশে স্বভাব তো তোর ছিল না কখনও।

হচ্ছে। চিরকাল কি খোকা থাকব নাকি?

মন্দার কী হয়েছিল?

সে কথার জবাব দিল না বৌধায়ন। কাতরতার নানা শব্দ করে হঠাৎ অবসাদে চিত হয়ে শুয়ে হাল-ছাড়া গলায় বিড় বিড় করে বলল, মানুষের জন্মটাই বড় ঝামেলার। আমি যেমন গাছ ছিলাম আর-জন্মে ফের তাই হব।

কী বলছিস?

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে বলল, সবকিছুর জন্য তুমিই দায়ী।

কীসের জন্য?

কেন তুমি লেবুবনে গিয়েছিলে? তোমাকে না দেখলে তো আমি মানুষ হয়ে জন্মাতে চাইতাম না। আর জন্মালাম বলেই তো এই ঝামেলা।

আর কোনও কথার জবাব দিল না বৌধায়ন। পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

মন্দার বিপদের কথা সে আর ভাবছিল না। কিন্তু তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল অন্য এক চিন্তায়! বুকের ভিতরের বড্ড আকুলি ব্যাকুলি।

গভীর রাতেও বার বার ঘুম ছিঁড়ে যায় তার। পায়ের টাটানো ব্যথা কুমিরের কামড়ের মতো ক্রমে ক্রমে কোমর ধরে ফেলেছে। কিন্তু সে ব্যথাও তুচ্ছ মনে হয়। বুক ছিঁড়ে ভেতরে অন্যবকম এক রক্তক্ষরণ হয় তার। সে কেন সুখনকে শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দিল? সে কেন ঠেলাওয়ালাটার বুকে ওরকম ভয়ংকর লাঠির খোঁচা দিয়েছিল?

বৌধায়ন জানে সে যে অপদার্থ তার কারণ একটাই। সে কখনও কারও প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে না। কোনওদিনই সে কাউকে মারেনি, গাল দেয়নি তেমন করে। যদি বা দিয়েছে তারপর থেকেই গেছে তার মনের শান্তি, চোখের ঘুম। নিজের বা আর কারও রূঢ়তা সে একদম সহ্য করতে পারে না। কাউকে অপমান করে না সে ভয়ে। করলে সে নিজে কষ্ট পায় সব থেকে বেশি। ঠেলাওয়ালাটার মুখ তার চোখের সামনে হুবহু ভেসে উঠছে বারবার, সুখনের শুকনো গলার কথা শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। সেইসব স্মৃতি বিষ-বিছের মতো কামড়ায় তাকে এই নিশুত রাতে।

বড় হতাশায় উঠে পেচ্ছাপ করে বৌধায়ন। আবার ঘর ভাসে। ঘেন্নায় সে খাটে উঠে শোয়। পায়ের ব্যথা বাড়ে। পৃথিবীতে মানুষ জন্মের মতো খারাপ কিছু সে আর ভেবে পায় না। ভীষণ জটিল এই জীবন, কুটিলতায় ভরা। কত সরল, সুন্দর জীবন গাছের!

যারা তাকে চেনে তারা সবাই টের পেয়ে গেছে, সে কী ভীষণ অপদার্থ অকর্মণ্য। এমনকী মেজবউদি জয়তী যে ওই বিপজ্জনক ব্যাপারটায় তার সঙ্গে গিয়েছিল তার মানেও পরিষ্কার। মেজবউদি জেনে গেছে, বৌধায়নকে দিয়ে কোনও কিছু হবে না। মেয়ে হয়েও কাপুরুষ দেওরের সঙ্গে গিয়েছিল তাই।

একা ঘরে নিজের উদ্দেশে 'ছিঃ ছিঃ' করে ওঠে বৌধায়ন। না, সে এখনকার পৃথিবীর উপযুক্ত নয়।

সাত

সকালের দিকেই নিত্যপদ এসে খুব উত্তেজিতভাবে বলে, সব বাড়ির দুধ ছানা হয়ে গেছে বাবা!

হরিদেব সেটা ভাল করে জানে। তবু চোখ বড় করে ফোকলা মুখে হেসে বলে, বলিস কী?

সাত-সাতটা বাড়ি ঘুরে এলুম। যারাই বোতলের দুধ উনুনে চড়াচ্ছে তাদেরটাই ভোকাট্টা হয়ে ছানা ছেড়ে দিচ্ছে।

তো কী হবে?—বলে হরিদেব ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

নিত্যপদ মোড়লের মতো বলে, কিচ্ছু হবে না বাবা। ছানাটা বোতলে ভরে কাল সকালে ডিপোতে ফেরত দিলে ডিপোর দিদিমণিরা কার্ডে লিখে দেবে। নষ্ট দুধের বদলে আবার দুধ দেবে।

বটে?—বলে খুব আমোদে হাসে হরিদেব।

এত এত ছানা!—বলে নিত্যপদ হাতের খাবলা দেখায়।

গদাধরবাবু যে ঘরটায় তাকে থাকতে দিয়েছে তার দরজার পাল্লা নেই, জানলা হাঁ-হাঁ করছে। তবে এ ঘরে একটা পুরনো চৌকি আছে, তাতে হরিদেব খুব আরামে শোয় বসে। এখন চৌকির নীচে উবু হয়ে একটা চটের ব্যাগ টেনে এনে সে চার-চারটে বোতল বের করে।

আই বাস!— নিত্যপদ বলে।

হরিদেব ভারী ঢুলঢুলে হাসি হেসে বলে, গদাইবাবুদের দু' বোতল আর দুই ভাড়াটের দু' বোতল। ফেরত দিতে দিয়েছে আমাকে। অনেক ছানা। খাবি?

চোখ বড় করে নিত্যপদ বলে, খাব কী? ফেরত দেবে না?

সে কথায় কান দেয় না হরিদেব, বিড়বিড় করে বলে, কাল পর্যন্ত টকে গিয়ে গন্ধ ছাড়বে। জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে।

বাবুরা ধরবে যে তোমাকে!

হরিদেবকে সবাই ধরে। ঘরে, বাইরে, রাস্তায় হরবখত লোকে তাকে পাকড়াও করে বলে, এটা আনোনি, সেটা দাওনি, অমুক করেছ তমুক হারিয়েছ।

তা লন্ড্রির বিল হারিয়ে ফেলে হরিদেব, জিনিস আনলে ফেরত পয়সার গড়বড় হয়, তেজপাতার বদলে শুকনো লঙ্কা কিনে এনে দেয় লোককে। লোকের কথাতে আর তেমন গা করে না সে। ছেলেকে বলল, খাই আয় দু'জনে।

এবার নিত্যপদ খুশি হয়ে বলল, মাইরি বাবা, খাবে!

হরিদেবের আনন্দ ধরে না। একটা কলাইয়ের বাটি বের করে দুটো বোতলের নষ্ট দুধ ঢালে তাতে। পিছল পিছল কটু গন্ধের হড়কানো সাদা ক্বাথের মতো ড্যালা আর জল ঝরে পড়ে। বাটিটা চৌকির মাঝখানে রেখে দু'ধারে বসে বাপ আর ছেলে খায়! খেতে খেতে নিত্যপদ বলে, একটু গুড় বা চিনি হলে বাবা? অ্যাঁ!

এমনিও ভাল। খা।

কাল কী করবে? ছানা ফেরত না দিলে দিদিমণিরা লিখে দেবে না, তখন?

সমীরণবাবু কিছু বলবে না, ধর বউদি একটু খিটমিট করবে। গদাইবাবুদের দুটো বোতল ফেরত দেব।

দিয়ো। নইলে তোমাকে এ বাড়ি থেকে গড়িয়ে দেবে। দিলে যাবে কোথায়? নতুন বউদিটা যা খচ্চর না!

খুব খচ্চর?

মা বলে ঢ্যামনা মাগি।

হরিদেবের ছানার মুখ খুব হাসে। পা তুলে উবু হয়ে বসে বাটি ধরে ছানার জলটা চুমুক মেরে খানিক খেয়ে নিত্যপদর হাতে বাটি দিয়ে বলে, খা।

বাটি শেষ করে নামিয়ে রেখে নিত্যপদ বলে, সমীরণবাবুর ক্রাচিনের পয়সা ফেরত দিয়েছ?

কেরোসিনের পয়সা? ও! সে কথা হয়ে গেছে। বলেছে দিতে হবে না।

কবে বলেছে?

কাল পরশু কবে যেন!

নিত্যপদ সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে, কাল বিকেলেও আমাকে ধরেছিল মোড়ে। বলল, তোর বাবা কোথায়?

হরিদেব উদাস মুখে একটা বিড়ি ধরায়। সবাই ধরে তাকে। নতুন নয়।

গদাধরবাবুর বাড়ির নীচতলাটা পিঁজরাপোল। ছারপোকার মতো ভাড়াটেরা গিজগিজ করছে। ঘরেরও অন্ত নেই। দিনরাত জল নিয়ে, এঁটো কাঁটা, উনুনের ধোঁয়া, এটা সেটা নিয়ে ক্যাচম্যাচ। সেই পিঁজরাপোল থেকে রোগা একটা বউ বেরিয়ে এসে খনখনে গলায় ডাকে, অ হরিদা! হরিদা!

নিত্যপদ কান খাড়া করে শুনে বলে, বাবা, বেলামাসি ডাকছে টুসিকে ইস্কুল থেকে আনতে যাওনি আজ!

ওই যা। ভুলে গেছি। ক'টা বাজে?

দশটা বেজে গেছে কখন! দেবেখন বেলামাসি, যাও।

হরিদেব মুখখানা গম্ভীর করে বেরিয়ে গিয়ে বলে, এই যাচ্ছি বউদি।

ভুলে যাও কী করে বলো তো! কচি মেয়েটা এখন আসে কী করে? এতক্ষণে কান্না জুড়েছে বোধহয়। মাসের শেষে পাঁচ-পাঁচটা টাকা নাও কি এমনি এমনি? মেয়েটাকে ইস্কুলে দিয়ে এলে সকালে আর আনতে ভুলে গেছ, মাথাটা খেয়েছ নাকি?

কিছু বলার নেই তবু হরিদেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে রওনা হতে হতেই বলে, আমার ছেলের বউভাত ছিল কিনা!

বউটি পিছন থেকে বলে, ওমা! সে তো কবে হয়ে গেছে শুনেছি। আর তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক রে বাবা? না! বুড়োর মাথাটাই গেছে...

হন্তদন্ত হয়ে হরিদেব ইস্কুলবাগে যাচ্ছে, বাড়ির ফটকেই ধরদের বুড়ো গিন্নি ধরে ফেলল, হরি, ব্যাপারটা কী বলো তো শুনি! তোমার মেয়ে মলি বিনা নোটিশে আমার বাড়ির কাজ ছেড়ে দিল, বলে কিনা বেশি কাজ, ছুটি পাই না, সিনেমায় যেতে পারি না। ওদিকে দেখছি সরকারি কোয়ার্টারে এক ছোকরার বাসায় যথাসর্বস্ব করছে পনেরো টাকায়। কাল দেখেছি, রাত দশটার পর কোয়ার্টার থেকে বেরোচ্ছে। এইবেলা সময় পাচ্ছে? সিনেমা দেখতে পাচ্ছে?

হরিদেব তার কী জানে! সে মলির জন্মদাতা হতেও পারে, কিন্তু বাপ নয়। কটকটে কথাগুলো শুনতে শুনতেই হরিদেব হনহন করে হাঁটে। বলবেই লোকে। কত বলে।

ওই আবার মোড়ের মাথায় সমীরণবাবু। কেরোসিনের ফেরত পয়সা! ছেলের বউভাতের কথা আবার বলা ঠিক হবে কি না তা ভাবতে থাকে হরিদেব।

সমীরণবাবু তাকে ধরল বটে তবে কেরোসিনের ফেরত পয়সার কথা না তুলে গম্ভীর গলায় বলে, তোমার ছেলে নিত্যপদ কোথায়? গতকাল মুড়ি আনতে দিয়েছিলাম, কুড়িটা পয়সা ফেরত দেয়নি।

একগাল হেসে হরিদেব বলে, মহা চোর। চুপি চুপি গিয়ে আমার ঘরে ঢুকে যান। বসে বসে ছানা খাচ্ছে। হুটোপাটি করে যান, নইলে পালাবে।

সমীরণ চোটেপাটে বাড়ির দিকে ধেয়ে যায়। খুব হাসে হরিদেব। নেত্যটা আজ ঝাড় খাবে।

খুকিটা ফাঁকা স্কুলের ফটকে দাঁড়িয়ে সত্যিই কাঁদছিল। একেবারে গুয়ের গ্যাংলা একরত্তি মেয়ে। হরিদেব গিয়ে তাকে সাপটে ধরে হাত থেকে টিনের বই বাক্স আর কাঁধের জলের বোতল নিজের হাতে নিয়ে একগাল হেসে বলে, কেঁদো না খুকি, বড় ভুলে যাই যে! বুড়ো হয়েছি তো।

খুকিটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাত ধরে হাঁটে। বড় কষ্ট হয় হরির।

ঝিলের ধারে মুখোমুখি নেত্যর মায়ের সঙ্গে দেখা। দেখে ভারী আনন্দ হয় হরিদেবের। ছোটলোকের মতো নয় মোটেই তার বউ। পরিষ্কার গা হাত, ফরসা একটা ছাপা শাড়ি পরা, পায়ে স্যান্ডেল। বালিগঞ্জে বড়লোকের বাড়িতে কাজ করে। ষাট-সত্তর টাকা মাইনে, বছরে দু'-তিন জোড়া শাড়ি ব্লাউজ, এর ওপর পার্বণী পায়। ভাল অবস্থা যাকে বলে। মাঝবয়সি ভদ্রমহিলার মতো বউকে দেখে ভারী গর্ব হয়!

বিনা ভূমিকায় নেত্যর মা বলল, ছেলের তৃতীয় পক্ষের বউ দেখেছ তো!

দেখেছি।

ও বাড়ি আর যেয়ো না। ঝেঁটিয়ে খ্যাদাবে। এই আমি ও বাড়ি থেকে আসছি। পদটার কাল থেকে শরীর খারাপ, নাগাড়ে বমি করছে। বউ দেখো গে যাও ফুল-ফুল সেজে বাজারে বেরোল। আমাকে দেখে বলল কী জানো?

খুব যেন মজার ঘটনা এমনি ভাব দেখিয়ে চোখ বড় করে হরিদেব বলে, কী?

বলল, যখন তখন হুটহাট কী দেখতে আসো বলো তো! সংসার-ভাঙানো ডাইনি কোথাকার! আমি সকলের জন্য যখন তখন রাঁধতে পারব না। আরও কত কথা! শেষে বলে কী, ভালমানুষের মেয়ে হয়ে থাকো তো ছেলের বমি পরিষ্কার করে দিয়ে যাও মুরোদ দেখি, নইলে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে তো ঝাঁটা।

বলল?—খুব অবাক ভাব দেখায় হরিদেব।

নেত্যর মা 'হরি' কথাটা মুখে আনে না, তাই বড় ছেলেকে বরাবর 'পদ' বলে ডাকে। বলল,

পদটার ঘরে গিয়ে দেখি চার জায়গায় বমি থুপ হয়ে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। সেই রাত থেকে। কেউ পরিষ্কার করেনি। দেখে গা এমন বিড়িয়ে উঠল যে নাকে কাপড় চেপে পালিয়ে বাঁচি না।

ভারী আমুদে হাসি হেসে হরিদেব বলে, খুব তাড়ি টেনেছিল। আমি কাল সন্ধেয় দেখেছি বাজারের রাস্তায় উবু হয়ে বসে তাড়িওলার সঙ্গে খুব জমিয়ে খাচ্ছে। আমাকে ডেকেওছিল।

গম্ভীর হয়ে বউ বলে, ও বাড়ি আর যেয়ো না। না খেয়ে থাকো সেও ভাল।

তা ঠিক। তবে কাল দুপুরে হরির বউটা ভাজা মুগের ডালটা যা রেঁধেছিল, চার-চারটে রুটি খেয়ে নিলাম। কাঁচা লঙ্কার এমন বাস ছেড়েছিল কী বলব।

মরণ! তুমি কি মানুষ?

না।

আপনমনেই মাথা নাড়ে হরিদেব। এ কথাটা সে মানে। হুবহু মানুষ নয় সে। কোথায় কী যেন গলতি আছে একটু। বউয়ের দিকে খুব গর্বের চোখে চেয়ে সে হাসে।

গা বিড়োনো চাপতে নেত্যর মা জর্দা দিয়ে পান খেয়েছে। মুখ থেকে সুন্দর গন্ধ আসছিল। গা থেকেও। বাতাসটা শোঁকে হরিদেব।

নেত্যর মা বলে, আমি যাচ্ছি। পদকে দেখলে বোলো, আমি আর আসছি না।

আচ্ছা।

তুমিও যেয়ো না।

আচ্ছা।

নেত্যর মা উলটোবাগে চলে গেল। বারবার পিছু ফিরে সেদিকে দেখল হরিদেব। তারপর খুব অহংকারের হাসি হেসে খুকিকে নিচু হয়ে কানে কানে বলল, দেখলে তো খুকি, এই হল আমার বউ। বুঝলে! আমার বউ। আর আমার ছেলের বউ ভারী ভাল। মুগের ডাল রাঁধে, জানলে খুকি?

পোস্টারে লেখা, অনশনের আজ দশদিন।

দেখে হাঁ করে থাকে সমীরণ। দশদিন!

চৌকির ওপর সারি সারি রোগা শরীর পড়ে আছে। নড়ছেও না। বেশ মিষ্টি ফুলের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে ত্রিপলের ঘরটায়।

সমীরণ ফিসফিস করে ডাকে, ফজলু! এই ফজলু!

খুব ক্ষীণ নাকিসুরে জবাব আসে, কে? মলয়বাবু?

না। আমি সমীদা!

ফজলু পাশ ফিরে আস্তে আস্তে চোখের পাতা খোলে। একটা হাত অতি কষ্টে বাড়িয়ে ধরে বলে, একটু তুলবে আমায় সমীদা?

পারবি বসতে?

পারব। আস্তে তুলো। ঝট করে বসলে মাথায় পাক মারে।

ফজলুর হাতের চেটোটা বড্ড ঠান্ডা। সাদা। সমীরণ এক হাত দিয়ে হাত ধরল। অন্য হাতে ফজলুর মাথার নীচে ধরে যত্নে ঠেলে তুলল। ফজলু বসতেই দেখা গেল, তার গলায় একটা রজনীগন্ধার মালা। বসে থাকতেও ফজলুর বুঝি কষ্ট হয়। সমীরণ বলে, আমার গায়ে ঠেস দিয়ে বোস। কাঁধে মাথাটা রাখ।

ফজলু ক্ষীণ হেসে বলে, না। পারব। অনশন তো সবে শুরু। আরও কতদিন চলবে কে জানে! মলয়বাবু দিল্লি পালিয়েছে।

তা হলে কী হবে?

ফজলু মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে হিক্কার মতো শব্দ করে বলে, পালাবে কোথায়? এই বাড়িটাই যে ওর অফিস। একদিন না একদিন আসতেই হবে।

যদি দু' মাস পরে ফেরে?

তাও ফিরবে তো!

ততদিন কি বাঁচবি ফজলু, না খেয়ে? কেমন বুঝছিস এখন শরীরটা? কেমন লাগছে?

ফজলুর গোলগাল মুখটা এখন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। মুখের হাড়ের ছাপ ফুটে উঠেছে চামড়ায়। সেই মুখে একটু হেসে বলল, বিড়ি আছে সমীদা?

দাঁড়া, আনছি।—এই বলে সমীরণ তাড়াতাড়ি গিয়ে এক বান্ডিল বাড়ি আর দেশলাই কিনে আনল। এই একটা জিনিস ফজলু খাচ্ছে। ধোঁয়ায় কোনও পুষ্টি আছে কি না কে জানে, তবু যা হোক পেটে তো যায়।

ফজলু বিড়ি দাঁতে চেপে ধরে বটে কিন্তু দেশলাই ঠুকতে পারে না। যতবার বারুদে কাঠি মারে ততবার হাত এদিক ওদিক হয়ে যায়। কাঠিতে বাক্সে ঘষটা লাগে না।

সমীরণ বিড়িটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, মরবি যে এরকম করে!

ফজলু খুব মন দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে পিছন দিকে চেয়ে লাশের মতো পড়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখে চোখ ঘুরিয়ে বলে, বড় একঘেয়ে লাগে। তাছাড়া আমার আর কষ্ট তেমন কিছু নেই।

বাজে বকিস না, শুকিয়ে চারভাগের একভাগ হয়ে গেছিস।

তবু আমার অবস্থা অনেক ভাল। বসতে পারছি, কথাটথা বলছি। ওদের বেশিরভাগই কাল থেকে উঠছে না। আজ খবরের কাগজে ছোট করে আমাদের খবর দিয়েছে, জানো? সকালবেলা মেলা লোকজন আমাদের দেখতে এসেছিল. ফুলের মালাটালা অনেক দিয়ে গেছে। একজন খবরের কাগজ খুলে খবরটা দেখাল। কিন্তু চোখে সবাই এমন ধাঁধা দেখছি যে পড়তে পারলুম না, তখন সেই লোকটা পড়ে শোনাল। কিন্তু একটুও আনন্দ হল না, বুঝলে! অফিস টাইমের পর বিকেলেও আবার অনেক লোক আসবে, বক্তৃতা দেবে, মালা দেবে। কিন্তু আমরা আজকাল কানে শুনতে পাই না তেমন, ভোঁ ভোঁ করে! গলা বাড়িয়ে মালাটা নেওয়ার মতোও জোর নেই বেশির ভাগের। তাই শোয়া অবস্থাতেই মাথা তুলে মালা গলিয়ে দিয়ে যায়। আমি কিন্তু বসি, মালা নিই, খানিক বক্তৃতাও শুনি। না, সমীদা, আমি সে তুলনায় ভাল আছি।

সমীরণ ফজলুর পেটের খোঁদলে হাত রেখে দেখে। পেটটা কলকল শব্দ করে জানান দিল। সমীরণের দম ফোট লাগে। রুদ্ধ স্বরে বলে, মরবি যে!

ফজলু মাথা নেড়ে বলে, রমজানের মাসে রোজা রাখি। আমার অভ্যেস আছে, বলেছি না তোমায়? রোজার মাস আবার এসে গেল, না গো সমীদা?—বলে ফজলু বিড়ি ফেলে খুব দূরে চোখ মেলে বসে রইল কিছুক্ষণ।

সমীরণ ধীরে ধীরে বদ্ধ শ্বাস ছাড়ে। আর তার নাকে একটা বাঁশির মতো হয়।

ফজলু দুটো দুবলা হাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে বসেছে। হাঁটুর মাঝখানে ঝুনো নারকোলের মতো মুখ। খুব দূরের চোখে চেয়ে থাকে আনমনে বলল, আমার একটা মতলব আছে সমীদা, জানলে! যদি হাসিল হয় তবে একখানা কাণ্ডই হবে। লোকে সোনার মেডেল দিয়ে যাবে আমায়।

কী কাণ্ড?

মীরাবাজারে একবার একরাম আলি নামে এক ফকির এসেছিল, তোমার মনে নেই? তা সে ফকির বাবা ছিল নিখাগি। দিনের পর দিন অন্নজল ছাড়া দিব্যি বেঁচে ছিল। হাঁটত, চলত, কথা কইত, হাসতও। আমি দিনকতক তার পেছুতে ঘুরেছিলাম। তা সে তেমন পাত্তা দিত না আমায়। অনেক

হাতে পায়ে ধরতে সে একদিন বলল, না খেয়ে থাকাটাও একটা অভ্যেস রে। তবে বড় কঠিন সাধনা। হয় কী জানিস? অনেকটা গাছের মতো ব'নে যেতে হয়। শেষে এমন হবে যে ভূঁয়ে দাঁড়িয়ে আছিস, তো সেই মাটি থেকে তোর পা চোঁ করে খানিক রস টেনে নিল শরীরে। রোদ্দুরে হাওয়ায় দাঁড়ালি, তো তোর হাত পা তাই থেকে খানিকটা ভিটামিন ক্যালসিয়াম টেনে নিল। এই করতে করতে আর তখন খাওয়ার দরকার হয় না। আল্লার কুদরতে প্রকৃতিই শরীরের নানা অন্ধিসন্ধি দিয়ে খাদ্য ভরে দেয়।

যাঃ।

মাইরি। বিশ্বাস করো। তা আমার মাথায় আজকাল সেই ফিকিরটা খুব খেলছে। যদি কায়দাটা পাই সমীদা, তবে সব শালাকে মজা দেখাব। যত আমার মতো হাভাতে আছে সবাইকে কায়দাটা শিখিয়ে দেব। চাই কি, শেখানোর জন্য একটা ইস্কুলও খুলতে পারি। সাইনবোর্ডে লিখে দেব, না খেয়ে বেঁচে থাকার কায়দা শিক্ষা করুন। লাখ লাখ শিখতে এসে জুটবে, দেখো।

না খেয়ে খেয়ে তোর মাথাটা গড়বড়ে হয়ে গেছে।

তর্ক করার মতো তাকত নেই ফজলুর। কিন্তু ঝুম হয়ে চোখ বুজে একটা তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকে সে। তারপর ক্ষীণ, খোনাসুরে বলে, আমার যেন একটু একটু করে ব্যাপারটা হচ্ছে, জানলে সমীদা। দু'দিন যাবত টের পাচ্ছি, বাতাস থেকে আলো থেকে যেন মাঝে মাঝে আমার হাত, পা, গায়ের চামড়া চোঁ করে খানিকটা কী যেন টেনে নিচ্ছে। মনে হয় এখন যদি একবার ভেজা মাঠঘাটে গিয়ে কিছু সময় দাঁড়াতে পারতাম তা হলে ঠিক আমার পা দুটো গাছের শিকড়ের মতো রস টানত বুঁদ হয়ে। মাটি থেকেই তো গাছপালা খেয়ে বাঁচে, সেই গাছপালা খেয়ে তাবত পশুপাখি তুমি আমি বেঁচে আছি। তবে মাটি থেকে সরাসরি খেতে পারব না কেন বলো!

তাই তো! সমীরণ ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবে। দ্বিধায় পড়ে যায়।

ফজলু রোগা মুখে চওড়া হেসে বলে, এই যে সকালবেলা সুমুন্দির পোয়েরা গলায় মালা পরিয়ে গেছে বলির পাঁঠার গলায় যেমন পরায়, এই মালা কি কোনও খাবার জিনিস, বলো! তবু হল কী জানো? যেই আমার গলায় মালা দিল সেই তক্ষুনি যেন ফুলের গন্ধে আমার শরীরের ভিতরটায় লালা ঝরতে লাগল। আমার গলা, কণ্ঠা জিভ ভিজে গেল। পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, মালা থেকে আমার শরীরটা গন্ধ টেনে নিচ্ছে। সারা সকাল ধরে মালাটাকে শুষে এই দেখো এখন একেবারে তুলসী কাঠির মতো শুকিয়ে এসেছে ফুলগুলো।

ফুলগুলো শুকিয়েছে ঠিকই, সমীরণ হাত বুলিয়ে দেখে, তার শরীরটা এক অদ্ভুত অনুভূতিতে শির শির করতে থাকে। সে বলে, বলিস কী?

চোখের দিব্যি।

অবিশ্বাসই বা করে কী করে সমীরণ? তার নিজেরও যে অনেকটা ওইরকমই হয়। ভাল, সুন্দর, পছন্দসই কিছু দেখলে বা শুনলে তার চোখ, কান, গায়ের চামড়া যেন তা গিলে খেয়ে নিতে থাকে। বাস্তবিকই তার পেটের মধ্যেই চলে যায় গোটা ব্যাপারটা। ঠিক খাওয়ার অনুভূতি হয়। সমীরণ তাই খুব বেশি অবিশ্বাস করতে পারে না। তবু সন্দেহবশে বলে, পারবি?

মানুষ কী না পারে বলো! তারাপীঠের কোন এক সাধু নিজের হাগা খেত, বৃত্তান্তটা শোনোনি! ভাবলুম, হয় সেটা ভগবানের মহিমা, নয়তো গাঁজাখুরি। কিন্তু নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখলাম ক'দিন আগে, জানলে? উলটোদিকের ফুটপাথে একটা পাগল বসে থাকে প্রায়ই। হাফ প্যান্ট পরা, খালি গা, বসে বসে একটু একটু হাসে আর আপনমনে বসে বসেই বাহ্যে পেচ্ছাপ করে দেয়। এই ক'দিন আগে কী দেখলাম জানো? খাচ্ছে।

খাচ্ছে?

মাইরি! চোখের দিব্যি! নিজের মল।

ওয়াক!

ঘেন্না পেয়ো না। কথাটা হচ্ছে, লোকে না পারে কী?

গা বমি-বমি করায় সমীরণ উঠে পড়ে। বলে, সাড়ে দশটা বাজতে যায় বুঝি রে। চলি।

আবার এসো।—বলে ফজলু হাঁটু থেকে হাতের বাঁধন খুলতেই আপনা থেকে তার শরীরটা ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে পড়ে গেল চৌকিতে।

রায়বাবুর বেশ কয়েকটা কারখানা আছে, তাছাড়া চার-পাঁচরকমের ঠিকাদারির কাজে বিস্তর কুলিও খাটে। কারখানার পেমেন্টের দিন বা কুলিদের হপ্তা দেওয়ার সময়ে রায়বাবু যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে যান তখন সমীরণকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। রায়বাবুর কড়া নির্দেশ আছে, সারাক্ষণ আমার পিছু পিছু গা শুঁকে শুঁকে থাকবে। তোমার নিশ্বেসের শব্দ যেন শুনতে পাই, আমার গায়ে যেন তোমার শ্বাস টের পাই, চারদিকে খুব নজর করবে। যদি দেখো কেউ সন্দেহজনকভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে বা আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তো আমাকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে জানান দেবে। আর যদি দেখো কেপমারির দল বা ডাকাত বদমাশ গোছের কেউ কাছে ভিড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান দিয়ে পেড়ে ফেলবে।

কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সমীরণ। রায়বাবু ব্যাঙ্কে যান, টাকা তোলেন, গোনেন, ব্যাগে ভরেন, বেরিয়ে আসেন, সমীরণও রায়বাবুর পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে চলে, বড় বড় শ্বাস ফেলে রায়বাবুর ঘাড়ে, চারদিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে দেখে। অবশ্য তখনও লাফিয়ে কারও কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান দিয়ে পেড়ে ফেলার দরকার হয়নি। তবে দরকার হতে পারে ভেবে প্রতিদিন রাতে শোওয়ার সময় এবং ঘুম থেকে উঠে সকালবেলায় বিছানায় প্যাঁচটা অভ্যাস করে সমীরণ। মানুষের অভাবে বালিশটাকে বিছানার মাঝখানে একটু থুবড়ে দাঁড় করিয়ে নানাভাবে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে লাফিয়ে ডাইভ খেয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান মেরে বালিশটাকে পেড়ে ফেলে সে। অভ্যাসটা রাখা ভাল। কারণ, চারদিকে এত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই যে যে-কোনওদিন প্যাঁচটা দরকার হতে পারে।

রায়বাবু নেই, তার বদলে মন্দা আজকাল ক'দিন হল কাজকর্ম দেখছে। ভালই দেখে। তবে সমীরণ আজকাল মন্দার সামনে কিছু ভয়ে ভয়ে থাকে। সেদিন তাকে অফিসে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল মন্দা। সে থাকেনি। পরে তাকে সুখন পুরো ব্যাপারটা বলে সাবধান করে দেয়, সমীবাবু, আপনার আমার দু'জনেরই নোকরি না চলিয়ে যায়। মন্দা অবশ্য তাকে কিছু বলেনি আজ অবধি, তবু বড় ভয়ে ভয়ে থাকে সমীরণ।

বাইরের ঘরটায় সন্তর্পণে বসে সমীরণ অপেক্ষা করছিল। রায়বাবু চেম্বারে মন্দা। দরজা বন্ধ। সেদিকটায় একবার চেয়ে আপনমনে দাঁত দিয়ে নখ খোঁটে সমীরণ। খুব বেশি কিছু করার নেই।

সমীরণের মনটা বড় খারাপ। ফজলুটা দশদিন ধরে নাগাড়ে না খেয়ে আছে। বাঁচবে তো! নিত্যপদ মুড়ির ফেরত পয়সাটা দেয়নি। কেরোসিনের বিশ পয়সা মেরেছে ওর বাপটা। তার ওপর হরিণঘাটার একবোতল স্ট্যান্ডার্ড দুধ নষ্ট হয়ে গেল, সেটা ফেরত দিতে দিয়েছিল বুড়োটাকে। বুড়ো এখন বলে কিনা, নষ্ট দুধটা বেড়ালে খেয়েছে। বেড়াল নয় নিজেরাই খেয়েছে। সমীরণ জানে। মনটা বড় বিদিকিচ্ছিরি রকমের হয়ে যায় এসব ছ্যাঁচড়ামির কথা মনে হল। এক বোতল দুধ উশুল হল না, পয়মাল গেল।

এই সবই বুঁদ হয়ে ভাবছিল সমীরণ। এমন সময় টিং টিং করে বেল বাজল। তার ডাক।

চেম্বারের দরজা খুলে ভিতরের ঠান্ডায় ঢুকে দাঁড়িয়ে সমীরণ দেখল, মন্দার কানে আজও ফোন। মন্দা কাকে যেন বলছে, না, আমার সঙ্গে তোমার কোনও কথা থাকতে পারে না...শোনো, একটা লম্বা পাড়ি দিয়ে সেইলাররা যখন ডাঙায় নামে তখন তারা মেয়েদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়...আমি জানি যে তুমি সাধারণ সেইলার নও, ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আমার কাছে অল আর

দি সেম।...না না, আমি বলে দিচ্ছি রজত, আগামী তিন সপ্তাহ আমার সঙ্গে দেখা করবে না...আমার অনেক কাজ তবু...হ্যাঁ...না, আই অ্যাম লুকিং আফটার দি বিজনেস। এক্ষুনি ব্যাঙ্কে বেরোব...আজ পে ডে। দেখা হবে, কিন্তু এখন নয়... না, না প্লিজ...

মন্দা ফোন রাখল। মুখ তুলে বলল, একটু আমার সঙ্গে চলুন।

সমীরণ খাজুরে আলাপ করে মেঘটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য একগাল হেসে বলল, ব্যাঙ্কে তো?

হুঁ। একটু অ্যালার্ট থাকবেন। আজকাল ভীষণ চুরি ডাকাতি ছিনতাই হচ্ছে...

আহা, হোক। এসব যতদিন আছে ততদিনই তার চাকরি আছে।

রায়বাবুর গা শুঁকে শুঁকে চলা সমীরণের অভ্যাস আছে। রায়বাবুর নিয়ম, গায়ে শ্বাস ফেলতে হবে, শ্বাসের শব্দ শোনা যাবে। তবে বোঝা যাবে যে পাহারাদার কাছেই আছে। রায়বাবুর গায়ের গন্ধ যে খুব ভাল তা বলা যায় না। তবে কিনা চাকরি ইজ চাকরি। গা শুঁকতে বলেছে তো তা-ই সই।

আজ কিন্তু চাকরির সঙ্গে দারুণ সুগন্ধও জুটে গেল। মন্দার গায়ের গন্ধ যে এত ভাল কে জানত?

নিয়মমাফিক সমীরণ মন্দার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে চলতে থাকে। আর এই করতে গিয়ে সে বিদেশি পারফিউম, দামি পাউডার, দুর্দান্ত শ্যাম্পু, এ সবের গন্ধ পায়। সে এমন সুন্দর গন্ধ যে নাক দিয়ে সোজা তার পেটে চলে যেতে থাকে। পেটটায় একটা খাওয়ার অনুভূতি হতে থাকে।

ফজলু যে বলে কথাটা তেমন মিথ্যে নয়। বাস্তবিকই চারদিকের বায়ুস্তরে এরকম নানা খাদ্যই রয়েছে। যদি শুষে নেওয়া সম্ভব হয় তবে আর আলাদা করে খাওয়ার দরকারই হয় না। পারবে কি ফজলু? যদি পারে তবে পৃথিবীর লাখো কোটি লোকের জন্য সেটাই হবে চূড়ান্ত বিপ্লব। খাওয়ারই যদি দরকার না হয় তবে বেকারি, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজারের পরোয়া করে কে?

ব্যাঙ্কের সামনে এসে মন্দা গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করল। সমীরণ রাস্তায় নেমেই চারদিকটা তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে নিল। সবকিছুই সন্দেহজনক। উল্টোদিকের ফুটপাথে একপাল ভিখিরি বসে আছে, তাদের মধ্যে দু'জন ছোকরা, কী মতলব কে জানে! একটা ট্যাক্সি মন্দার গাড়ির পিছু পিছু এসে থামল, ভিতরে একজন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা প্যাসেঞ্জার। ট্যাক্সিটা থামল বটে, কিন্তু লোকটা নামল না, বসে বসে একটা খবরের কাগজ খুলে পড়তে লাগল। কী মতলব কে বলবে? এইরকম চারদিকে হরেক সন্দেহজনক গতিবিধি, আচার-আচরণ। রায়বাবু কি সাধে তাকে গা শুঁকে থাকতে বলে?

রায়বাবুর চেয়ে অবশ্য মন্দার গা শোঁকা অনেক বেশি আনন্দজনক ব্যাপার। আজ সকালে দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পেটটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মন্দার গায়ের গন্ধ যেন পেটে সেই দুধের জায়গাটা ভরাট করে দিচ্ছে। ফজলুটা তো মিছে বলেনি!

ব্যাঙ্কের দরজায় উঠতে উঠতে মন্দা একটু বিরক্ত হয়ে পিছু ফিরে বলল, একটু সরে হাঁটুন তো! লোকের শ্বাস গায়ে লাগলে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি।

লজ্জা পেয়ে, সমীরণ একটু পিছিয়ে যায়। গন্ধটার লোভে একটু বেশিই কাছে ঘেঁষছিল সে।

পিছিয়ে গিয়েও সে অবশ্য তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় না। চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখ রাখে। সন্দেহজনক নড়াচড়া লক্ষ করে। কাজ দেখাতে হবে। যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। নিজেকে সে রায় আচার্যির সিকিউরিটি অফিসার বলে জানে। লোককে বলেও তাই। বিভাস তাকে শিখিয়েছিল, লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবি, আমি মিস্টার রায়ের এ ডি কং। কিন্তু অতটা বলতে সাহস পায় না সমীরণ।

টোকেন নিয়ে মন্দা আলতো হাতে নিজের চুল ঠিকঠাক করছে, সুন্দর বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে রাজহাঁসের মতো গ্রীবা বাঁকিয়ে চারদিক দেখছে। খুব অলস বিশ্রামের ভঙ্গিতে কয়েক পা হেঁটে

গিয়ে দেয়ালের গায়ে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রকল্প সংক্রান্ত একটা পোস্টার আনমনে দেখতে লাগল।

কিন্তু সমীরণ অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখতে পেল, ব্যাঙ্কের সদর দরজার একপাশ দিয়ে খুব আবছাভাবে দাঁড়িয়ে একবার ভিতরে উঁকি দিল সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা ছোকরাটা। দুধসাদা জামা আর প্যান্ট পরা। চোখে একটা হালকা নীল রঙের পরকলা পরে নিয়েছে কখন। খুব নজর রাখে সমীরণ। রায়বাবু বলেন, তেমন কিছু দেখলে লাফিয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান মেরে পেড়ে ফেলবে। সমীরণের প্যাঁচটা রপ্ত আছে, তবে কোনও মানুষের ওপর এখনও ফলায়নি।

মন্দার টোকেন নাম্বার ডাকা হল। মন্দা এগিয়ে গেল। কাউন্টারের ভিতর হাত বাড়িয়ে বান্ডিল বান্ডিল টাকা বের করে আনছে সে।

আর তখন সমীরণ বিস্ময়ে হাঁ করে দেখে, আশ্চর্য সাহসী সেই ফ্রেঞ্চকাট বেড়ালের মতো পায়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। বেশ মজবুত বিশাল চেহারা শার্টের খোলা বুক দিয়ে গলায় একটা সোনার চেন দেখা যায়, হাতে ঢিলা করে বাঁধা ঘড়ি কেতরে আছে, আর মুখে একটু হাসি। লোকটার হাতে আপাতদৃষ্টিতে কোনও অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু পাকানো খবরের কাগজটা বাঁ হাতে বাগিয়ে ধরা। অসম্ভব নয় যে, ওই খবরের কাগজের ভিতরেই দোফলা ছুরি বা নল রয়েছে।

বহুকাল ধরে এরকম একটা পরিস্থিতির জন্যই অপেক্ষা করছে সমীরণ। আজ পর্যন্ত সে কাজ দেখানোর তেমন সুযোগ পায়নি। বুকটা খুব দুরদুর করছে, উত্তেজনায় শরীরে ঝিমঝিম শব্দ হচ্ছে, ভয়ও লাগছে খুব, আবার সুযোগ সামনে দেখে আনন্দও হচ্ছে খুব।

রায়বাবুর নিয়মমতো এ সময়ে সে পিছন থেকে মন্দার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিল। আজকাল মেয়েরা যে সব ব্লাউজ পরে তাতে গোটা পিঠে বুকে ব্লাউজের ন্যাকড়াটুকু খুঁজে পাওয়াই দায়। তাই সমীরণের খোঁচাটা সোজা মন্দার মেরুদণ্ডের নীচ বরাবর হাড়ে মাংসে লাগল।

ও কী!— বলে মন্দা ভীষণ বিরক্ত হয়ে ফিরে দেখে।

কিন্তু তাকে কিছু বলার বা বোঝানোর সময় পায় না সমীরণ। ফ্রেঞ্চকাট লোকজনের পিছনে মাথা নামিয়ে লুকোয়। তার পরের মুহূর্তেই সে মন্দার পিছন দিকটায় বাতাস খুঁড়ে আবির্ভূত হয় এবং হাত বাড়ায়।

সমীরণ বিড় বিড় করছিল, লাফ ... কোমর পেঁচিয়ে ধরো... বলটান মারো... পেড়ে ফেলো...

বালিশ লক্ষ করে সে এ তাবৎকাল কম লাফায়নি, কমবার কোমর পেঁচিয়ে বলটান মেরে পেড়ে ফেলেনি। এতদিনে পরিশ্রম সার্থক।

কালীঘাটের কালীকে মনে মনে স্মরণ করে সে অস্ফুট স্বরে 'জয় কালী' বলে লাফ দিল। গোলকিপারের ডাইভ দেওয়ার মতো চমৎকার নিখুঁত লাফ। লাফিয়েই দু'হাতে লোকটার কোমর পেয়ে গেল সে।

প্রবল গুঁতোয় লোকটা বেসামালভাবে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছিল। আর তক্ষুনি পায়ের নীচে জমি পেয়ে সমীরণ প্রাণপণে বলটান মেরে পেড়ে ফেলল।

একেবারে কুমড়ো গড়াগড়ি কাণ্ড। গদাম, ধপাস, ঠকাস নানারকম শব্দ হল। এবং সমীরণ টের পেল, লোকটা চিত হয়ে পড়েছে। সে নিজে লোকটার ওপর পড়ে আছে, কোমর তখনও দু'হাতে ধরা।

চারদিকে বিকট হইচই শব্দ উঠল। হড়াস করে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন পালাচ্ছে চারধারে।

সমীরণকে কেউ বাহবা দিচ্ছিল না। কিন্তু নিজের নিখুঁত লাফ, কোমর পেঁচানো এবং বলটান দিয়ে পেড়ে ফেলা দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আপমনমনে বলে উঠল, সাবাশ! চমৎকার!

কিন্তু মুশকিল হল এর পর কী করতে হবে তা রায়বাবু তাকে কোনওদিনই বলে দেননি। বলটান

মেনে পেড়ে ফেলা পর্যন্ত সে নিখুঁতভাবে করেছে, কিন্তু এর পরে কী? এইভাবেই কি পড়ে থাকতে হবে? নাকি এর পর লোকটা সম্পর্কে আর কোনও ব্যবস্থা নিতে হবে?

ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সমীরণ। আর তার দু'হাতে ধরা সা-জোয়ান লোকটা ততক্ষণে তার মাথার কুয়াশা কাটিয়ে উঠেছে, পরিস্থিতিটা আঁচ করেছে এবং তারপর সেও এক বলটান দিয়েছে!

এক বলটানেই লোকটা সমীরণের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। তার গায়ে গোরু-খাওয়া জোর। সমীরণ প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাকে ধরে রাখতে পারল না।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, আর সমীরণও হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে। লোকটা হঠাৎ সেই অবস্থায় পটাং করে ডান পায়ের একটা লাথি চালিয়ে দিল সমীরণের মুখে। সঙ্গে একটা গালাগালও দিল, কিন্তু সেটা ভাল শুনতে পেল না সে। শূন্যে আর একটা বলটান খেয়ে সে পড়ল। মেঝেতে তার হাড়গোড় আর মাংস থ্যাঁতলানোর শব্দটা স্পষ্ট শুনল সে। মাথাটা ভোম হয়ে গেল।

কিন্তু সমীরণ জানে, এখন যদি সে হাল ছেড়ে দেয় তবে তার অপদার্থতাই প্রমাণ হবে। হেরো বডিগার্ড বা ভূপাতিত সিকিউরিটি অফিসার কোনও কাজের নয়। যদি সে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায় তবে চাকরি নির্ঘাত যাবে।

ভাগ্য ভাল যে লোকটার জুতোয় খুব নরম রবার লাগানো। লাথিটা তাই তুলোর বস্তার মতো লেগেছে। অবশ্য তাই যথেষ্ট। তবু একটা-দুটো ঝাঁকি মেরে সমীরণ কাত হল এবং হাতে পায়ে ভর দিয়ে চতুষ্পদের মতো উঠে তাকাল চারপাশে।

প্রচণ্ড গোলমালে 'পুলিশ! পুলিশ!' বলে কারা যেন চেঁচাচ্ছে। সমীরণ দেখতে পায়, কাচের কাউন্টারের ওপাশে ক্যাশের লোকটা টাকার বান্ডিলের ওপর বুক দিয়ে পড়ে আছে গুলি-খাওয়া মানুষের মতো। আর কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে বুকে অন্তত বিশ হাজার টাকার নানান মাপের বান্ডিল অবহেলায় হাত দিয়ে চেপে রেখে ভারী অবাক হয়ে চেয়ে আছে মন্দা।

মন্দাকে চেয়ে থাকতে দেখেই একটা ঝাঁকি লাগল সমীরণের শরীরে। চাকরি! সে বডিগার্ড সিকিউরিটি অফিসার আর সেই ঝাঁকিতেই সে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে!

লোকটা মন্দার সামনেই দাঁড়ানো। গায়ের ধুলোময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে ইংরিজিতে গালমন্দ করছে। খুব কূটচোখে তার দিকে চায় সমীরণ। হ্যাঁ, আর একটা লাফ, কোমর পেঁচিয়ে আর একটা বলটান মেরে আবার পেড়ে ফেলতে হবে। মন্দা দেখছে। কাজ দেখানোর এই হচ্ছে সময়।

কিন্তু লাফ দেওয়ার আগেই এবার মন্দা এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, লাগেনি তো আপনার?

একগাল হাসে সমীরণ, বলে, নাঃ।— আর বলতে গিয়েই টের পায়, তার ঠোঁট কেটে দু' ফালা হয়ে গেছে লাথির চোটে। কলের মতো রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে। জামা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

মন্দা বলল, ইস!— পরমুহূর্তেই লোকটার দিকে ফিরে বলল, দ্যাট উইল টিচ ইউ এ লেসন।

লোকটা তোম্বা মুখে গাড়লের মতো হেসে বলে, হু ইজ দা গায়?

মন্দা শ্বাস ফেলে বলে, আমাদের সিকিউরিটি অফিসার। কিন্তু তোমার আক্কেলটা কী বলো তো? তোমাকে বলেছিলাম কিনা যে তিন সপ্তাহের আগে আমি কোনও জাহাজ-ফেরত লোকের সঙ্গে দেখা করি না।

লোকটা মন্দার কথার জবাব দেয় না, এগিয়ে এসে টপ করে সমীরণের হাতটা ধরে বলে, স্যরি। এক্সট্রিমলি স্যরি। আমার দোষ আমি কোনও ওয়ার্নিং দিইনি। জানতাম না তো যে মন্দার সঙ্গে আজকাল স্ট্রং ম্যান থাকে।

স্ট্র ম্যান! কথাটা নোট করে রাখার মতো। মন্দা শুনেছে কী? একপলক মন্দাকে দেখে নেয় সমীরণ। মন্দা দেখছে। কিন্তু কী দেখছে? তার ফাটা হাঁ হয়ে যাওয়া ঠোঁট আর চোট-খাওয়া নাক

থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। একটু ভয়ও হচ্ছে আবার সমীরণের। এ লোকটা মন্দার বন্ধু, একে প্যাঁচ কষাটা কি ঠিক হল? মন্দা কিছু মনে করেনি তো?

সে লোকটার হাত ধরে কী বলতে হবে ভেবে না পেয়ে বলল, না, না, কিছু হয়নি। কিছু মনে করবেন না।

চারদিকে বিস্তর লোক ভিড় করে এসেছে। ভিড় ঠেলে বন্দুক কাঁধে দারোয়ান এগিয়ে এসে বলে, খাড়া রহিয়ে। পুলিশ আ রহা হ্যায়।

মন্দা লোকটার দিকে চেয়ে বলল, দ্যাট এগেইন উইল টিচ ইউ এ লেসন। যাও এবার জাহাজের ভাত খাওয়ার পর জেলের ভাতটাও খেয়ে এসো। ছিঃ ছিঃ হোয়াট এ সিন!

রজত অবশ্য ঘাবড়ায় না। অতি দ্রুত ফটাফট ইংরিজি বাংলায় সে কথার তোড়ে ভিড় হটিয়ে দেয়। ব্যাঙ্কের বুড়ো ম্যানেজারকে কাঁধ ধরে খুব আপন করে বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে কী বলে বোঝাতে থাকে। এবং ভিড় পাতলা হতে থাকে। উত্তেজনা হ্রাস পায়। সদর দরজা খুলে যায়। ব্যাঙ্কে কাজকর্ম আবার শুরু হয়।

তারা তিনজন বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠে। সামনে রজত আর মন্দা। পিছনে রক্তঝরা মুখে সমীরণ। তার খুব খারাপ লাগছে না। তবে ব্যাপারটা ভাল হল না মন্দ হল তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। একবার তার মন বলে, ভালই হল। আবার বলে, না ততটা ভাল কিছু হল না হে। যত যাই হোক লোকটা তো মন্দার বন্ধু!

মন্দা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, সেইলাররা জাহাজ থেকে নামার পর কিছু দিন ভীষণ সেক্স হাঙ্গারে ভোগে রজত। আমি এখন তোমাকে ভয় পাই।

সা-জোয়ান রজত গ্যাল গ্যাল করে হেসে বলে, ননসেন্স। আমি কি মালের জাহাজের খালাসি? আমি প্যাসেঞ্জার লাইনারের ইঞ্জিনিয়ার, মনে রেখো। আই হ্যাড প্লেন্টি অফ গার্লস।

গড!— মন্দা হেঁচকি তুলে বলে, তবে আমার জন্য অত হ্যাংলামি করলে কেন? দেখো তো, প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে গিয়ে আমাদের সিকিউরিটি ভদ্রলোকের কী অবস্থা করেছ!

ভদ্রতা করে পিছন থেকে ফাটা ঠোঁটে অতি কষ্টে সমীরণ বলে ওঠে, না, না, কিছু হয়নি।

রজত বলল, আই অ্যাম সো সরি! কী জানো, জাহাজ ইংল্যান্ড ছাড়বার পর থেকেই তোমার কথা এত মনে হচ্ছিল!

এ কালারফুল লাই।

বোকা-হাসিটা মুখে রেখেই রজত বলে, আমি আসায় তুমি খুশি হওনি মন!

মন্দা অফিসের কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পিছন ফিরে সমীরণকে বলে, আপনি বরং কাটা জায়গাটায় একটু ওষুধ লাগিয়ে নিন এখান থেকে। একটা এ টি এস ইঞ্জেকশনও নেবেন। এটা রাখুন।— বলে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয়।

ভারী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নোটটা নিয়ে নেমে পড়ে সমীরণ। মুখটা ফুলে গেছে। ব্যথা হচ্ছে খুব।

মন্দা মুখ বাড়িয়ে বলল, আর শুনুন, অফিসে থাকবেন। আমার হয়ত আপনাকে দরকার হবে।

এই বলে মন্দা গাড়ি ছাড়ল, আর ছাড়বার মুহূর্তে চাপা গলায় রজতকে বলল, নাউ আই উইল সি হাউ মাচ ইউ মিসড মি!

রজত গ্যাল গ্যাল করে হাসছিল।

আট

গভীর রাতে লোকটা ট্রাম লাইনের ওপর পড়ে আছে। একটা হাত কাটা, একটা পা থ্যাঁতলানো, কোমর ভাঙা। কাতরাচ্ছে গভীর গভীরতম মৃত্যুযন্ত্রণায়। নিজের রক্তের পুকুরে সাঁতরাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে।

বৌধায়ন চোখ ফেরাতে পারে না, তার ঘাড় শক্ত হয়ে আছে। ফুটপাথে বসে থাকা একটা ভিখিরির মতো চেহারার লোক মুখ থেকে বিড়িটা সরিয়ে থুথু ফেলে থিকথিক করে হেসে বলল, এইমাত্তর লাস্ট ট্রামটা মেরে দিয়ে গেল। ও আর দেখতে হবে না, হয়ে গেছে।

বৌধায়ন রক্ত দেখতে পারে না, কাটা ছেঁড়া শরীরের দিকে তাকাতে পারে না। কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই এখানে সেখানে পড়ে থাকে মানুষজন। তাদের কী হয়েছে তা কখনও জানবার চেষ্টা করে না বৌধায়ন। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ও কিছু নয়, লোকটা বোধহয় ঘুমোচ্ছে। এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে যায়।

নিজের এই কাপুরুষতা বড় কষ্ট দেয় তাকে। তবু আজ সামনে এই জাজ্বল্যমান দৃশ্যটা দেখে সে পালাতে পারে না। লোকটা এখনও বেঁচে আছে। হাসপাতালে নিলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর কলেরার রুগি কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, মাদার টেরেসা আজও কুষ্ঠরোগীর সেবা করেন। সে পালাবে?

সাহস নয়, কিন্তু ভীষণ একটা মরিয়া ভাব এল তার। পারতেই হবে। যদি তার নিজের কোনওদিন এ দশা হয় তখনও তো এমনি তাকে পড়ে থাকতে হবে নির্জন রাস্তায়! হলহল করে কলখোলা জলের মতো রঙের ধারায় তৈরি হবে পুকুর।

বৌধায়ন আর ভাবে না। গোড়ালি-ডুব রক্তের পুকুর থেকে নিচু হয়ে কাটা, ভাঙা থ্যাঁতলানো শরীরটাকে তুলে নিতে চেষ্টা করে। রক্তে ভিজে পিছল শরীরটা হড়কে যায় বার বার, লোকটা গোঙায়। কী গভীর শব্দ যন্ত্রণার! বৌধায়নের সমস্ত শরীর অন্যের রক্তে, স্বেদে, শরীরের ঘামে ভিজে যেতে থাকে। ঘেন্নায়, ভয়ে তার শরীর কাঁপে রি-রি করে। কিন্তু প্রাণপণে দাঁতে দাঁত দিয়ে সে লোকটাকে কাঁধে নেয়।

কোনদিকে কত দূরে হাসপাতাল তা জানে না বৌধায়ন। ভারী নির্জন রাস্তা। ঠিক নির্জন নয়, ফুটপাথ থেকে আনাচ কানাচ থেকে কাঙাল, গরিব, বদমাশের চোরা-চোখ তাকে লক্ষ করে। শেয়ালের মতো ধূর্ত চোখ সব। চোখগুলি শ্রদ্ধায় বা বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় না, কেবল নিস্পৃহ কঠিন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকে দেখে। তারপর উদাস ভঙ্গিতে তারা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হাই তোলে।

বৌধায়ন হাঁটতে থাকে। লোকটা ঝুলছে গোঙাচ্ছে। কাটা হাতটা ফিতের মতো পাতলা একটু চামড়ার সঙ্গে লেগে ঝুলছে। থপ করে হাতটা খসে পড়ে গেল। নিচু হয়ে ঠান্ডা, শক্ত হাতটা কুড়িয়ে নেয় বৌধায়ন। হাতটা বেশ লম্বা। অনেকটা লাঠির মতো সেটাতে ভর দিয়ে দিয়ে এগোতে পারে সে।

হাসপাতালের রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না বৌধায়ন। এই বিপুল মধ্যরাতের শহরে কোনদিকে যে নিকটবর্তী হাসপাতাল তা সে জানেও না।

পিছু পিছু একটা লোক আসছে টের পেয়ে বৌধায়ন ফিরে তাকাল। বেঁটেখাটো ধূর্ত একটা লোক। আসলে শেয়াল। গোঁফের ফাঁকে হাসছে। চোখে মিটমিটে জোনাকি।

কে?

কিছু নয় স্যার।

ওর আংটিটা আর ঘড়িটা নেব স্যার?

বৌধায়নের দম বন্ধ হয়ে আসে। কাটা হাতটা তুলে সে কুকুর তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলে, হ্যাট! হ্যাট!

লোকটা সরে যায়।

কিন্তু আশ থেকে পাশ থেকে ছায়ার মতো লোকেরা আসছে। অদ্ভুত লোক সব। ঠিক মানুষ নয়। শেয়ালের মতো। তাদের একজন চাপা স্বরে বলে, লাভ নেই। ওর হয়ে গেছে। টেরিলিনের জামাটা খুলে দিন না! নইলে হাসপাতালের ধাঙড়রা তো নেবেই।

বৌধায়ন কাটা হাতটা তোলে লাঠির মতো! কিন্তু তার গায়ে রত্তি জোরও নেই। সে ঘামছে। প্রবল এক মানসিক জোরে সে চেঁচিয়ে বলে, খবরদার!

কিন্তু হাসপাতাল কোন দিকে? হাসপাতাল কত দূর?

এক-আধটা বেশি রাতের ট্যাক্সি আশপাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে। প্রাণপণে কাটা হাতটা তুলে ধরে বৌধায়ন ট্যাক্সি থামাতে বলে। আতঙ্কিত ট্যাক্সিওয়ালারা থামে না।

লোকটা গভীর স্বরে পেট থেকে গোঙানি তুলে আনে। একবার বলে 'জল', আর একবার বলে 'বাড়ি যাব'। দিগভ্রান্ত বৌধায়ন প্রাণপণে হাঁটে। কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না।

তার পিছনে লোভী শেয়াল-মানুষেরা দল বাঁধছে, জোট বাঁধছে ফিসফিস করে কথা বলছে, হাসছে খিকখিক করে। বৌধায়ন কাটা হাতটা তুলে বলে, হ্যাট! হ্যাট!

কিন্তু লোকগুলো ঘিরে আসে। মেঘের মতো ঘনিয়ে ওঠে চারদিকে। থমথম করতে থাকে চারপাশ। বিপদ!

বৌধায়ন আতঙ্কে পাগল হয়ে যায়। কাঁধ থেকে লোকটাকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু লোকটা তখন একটা হাত আর দুটো পায়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বৌধায়নের। সে চেঁচাতে থাকে, বাঁচাও! বাঁচাও!

এত ভোরে ঘুম ভাঙে না বৌধায়নের। দুঃস্বপ্নটা দেখে ভাঙল। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলে মানুষের যা যা হয় তারও তাই তাই হল। যেমন প্রথমটায় সে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না, ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে। তারপর স্বপ্ন বুঝেও অনেকক্ষণ আতঙ্ক গেল না তার। তারপর জল খেল। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল।

সারা সকালটা গুম হয়ে ছিল সে। স্বপ্নের পর প্রথম জ্যান্ত মানুষ দেখল সে, যখন জয়তী চা দিতে এল।

বিনা ভূমিকায় বৌধায়ন বলল, কলকাতায় স্বরূপটা কি জানো?

জয়তী খুব অবাক ভান করে বলে, না তো! বলবে?

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে ডান পা-টা সরিয়ে বলল, বোসো, বলছি।

তাহলে একটু অপেক্ষা করো, ঘড়িটা হাতে পরে আসি।

কেন?

ঘুঘুটা কতক্ষণ ডাকবে কে জানে। কিন্তু ঘুঘুর ডাক শুনতে গিয়ে আমার কর্তার অফিসের বেলা না বয়ে যায়।

বৌধায়ন রেগে গিয়ে বলে, এ বাড়িটা কী বলো তো? একজনও সিমপ্যাথাইজার নেই আমার! সারাদিন একা ঘরে পড়ে থাকি, একটা জ্যান্ত লোকের মুখ দেখি না। এর পর বাস্তবিক আমার ভূতের ভয় করতে শুরু করবে।

জয়তী তার ঘুম-ভাঙা মসৃণ মুখে মধুর একটু হেসে বলে, তোমার জন্য সিমপ্যাথিতে রাতে আমার ভাল ঘুম হয় না, জানো?

ওঃ! রাতে কেন ঘুম হয় না সে আমার জানা আছে। বেশি বোকো না। নিজে ঘুমোও না, বুধাদিত্য বেচারাকেও ঘুমোতে দাও না। জানি।

জয়তী ব্যথিত মুখে বলে, ছিঃ! গুরুজনদের সম্পর্কে অসভ্য ইঙ্গিত করতে নেই। কলকাতার স্বরূপটা কী বলছিলে যেন! আচ্ছা, না হয় একটু বসেই যাই।

জয়তী বসল। বৌধায়ন চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, হেসো না, সবটা শোনো। স্বপ্ন হলেও ইট ওয়াজ দা রিভিলেশন অফ ট্রুথ। কী দেখলাম জানো? আমি মাঝ রাতে একটা আহত লোককে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি... হাসপাতালে... কিন্তু রাস্তা চিনতে পারছি না... আর অবিকল শেয়ালের মতো কিছু লোক সেই উনডেড লোকটার ঘড়ি আংটি আর জামাকাপড় কেড়ে নেওয়ার জন্য তাড়া করেছে... আমি লোকটাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটা তখন আমাকে ছাড়ছে না... তাকিয়ে আছো যে।

আমার চোখে পাপ নেই।

তা না থাক, কিন্তু ব্যঙ্গ আছে। তুমি কি সিরিয়াস জয়তী?

আবার জয়তী?

সরি। বউদি। ব্যাপারটা কী জানো? আমি স্বপ্নটা অ্যানালাইজ করে দেখলাম, কলকাতা এখন একজ্যাক্টলি ওই স্বপ্নের মতো। কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের শহর কে বলেছিল বলো তো!

নেহেরু।

তোমার মাথা। বলেছিল... বলেছিল— বৌধায়ন চোখ তুলে ভাবে।

প্যাটেল।— জয়তী বলে।

বৌধায়ন হতাশ হয়ে বলে, প্যাটেল বললে কাউকেই বোঝায় না। কোন প্যাটেল? বল্লভভাই হতে পারে, আরও কত প্যাটেল আছে।

জয়তী করুণ মুখ করে বলে, তুমি কি শেষ পর্যন্ত সংসারে থাকবে বুধো? বুদ্ধের মতো গৃহত্যাগ করবে না তো!

মানে?

আজকাল যে মানুষের জন্য তোমার ভীষণ প্রাণ কাঁদছে। জেগে ঘুমিয়ে সব সময়েই যে তুমি মানুষের বিপদে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। ব্যাপারটা কী বলো তো? স্বপ্নে উনডেড লোককে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ, এই সেদিন বিনা স্বপ্নে মন্দাকে উদ্ধার করতে লাঠি নিয়ে... ছিঃ ছিঃ... বাবা রে বাবা! পারোও তুমি।

বৌধায়ন নিমীলিত চোখে চেয়ে বলে, আমি কত মহৎপ্রাণ মানুষ ছিলাম তা আজ বুঝলে না জয়তী, কোনওদিন বুঝবে। এখন যাও কর্তাকে নেকারবোকার পরিয়ে, চোখে কাজল টেনে, হামি খেয়ে অফিসে পাঠাও গে যাও। তোমরা ফিলানথ্রপির বোঝো কী? আত্মসুখী সংসারী সব।

জয়তী টপ করে বৌধায়নের ডান পা চেপে ধরে বলে, হামি খাওয়ার কথাটা উইথড্র করবে কি না বলো! না করলে...

বৌধায়ন প্রাণপণে পা-টা স্থির রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে ডান পাটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বলে, আর ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। বুঝলে? পা কমপ্লিটলি সেরে গেছে। আজ সোলো ওয়াকিং এ বেরোচ্ছি।

জয়তী পা ছেড়ে দিয়ে বলে, সাবালক হলে তাহলে! আসলে ব্যথা না আরও কিছু। ঢং করে ক'দিন অন্যদের সিমপ্যাথি আদায়ের চেষ্টা।

যা সিমপ্যাথি দেখিয়েছ আর বোলো না। যাক গে, আজ সবাইকে ক্ষমা করছি। আজ আমার মিসা থেকে মুক্তি। আজ সমস্ত পৃথিবীটা আমার। যাও বৎসে, তোমার স্ত্রী-সর্বস্ব স্বামীটাকে হামি দিয়ে অফিসে পাঠাও গে।

কাপের তলানি চা-টুকু নিখুঁত লক্ষ্যে বৌধায়নের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে জয়তী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আজ সত্যিই বেরোল বৌধায়ন। বাড়ির বাইরে পা দিয়েই তার মনে হল, কী মুক্ত এই পৃথিবী! কী বিশাল প্রসারিত চারিধার!

একটু খোঁড়াচ্ছে সে এখনও। গোড়ালির হাড়ের গভীরে একটু ব্যথা ঘাপটি মেরে আছে। তবু বড় ভাল লাগছিল তার। এখন সে একা বেরোতে পারছে। কত জায়গায় যাওয়ার আছে তার! কতজনার সঙ্গে দেখা করার আছে!

প্রথমে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে দেখা করবে তা ঠিক করতে পারছিল না সে। একবার ভাবল, রেনি পার্কে বড়দার নতুন কেনা ফ্ল্যাটে গিয়ে ওদের সঙ্গে কাটিয়ে আসে, আবার ভাবল কোনও বন্ধুর কাছে গেলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত ঠিক করল বিছানায় দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে মিসা থেকে যে মুক্তি, আজ সে বহু দূর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সেই অবারিত মুক্তিকে অনুভব করে বেড়াবে। অসুখ বা দুর্ঘটনা বা জেল না হলে বোঝাই যায় না যে বেঁচে থাকাটা কী ভীষণ ভাল!

সকাল থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে বৌধায়ন। কারণ, নতুন করে একা একা, স্বাধীনভাবে চারধার দেখবে সে এতদিন পরে। সকালের আলোটাই ভাল। সব কিছু তাতে অন্যরকম দেখায়।

সে বড় রাস্তায় একটা ট্যাক্সি পাকড়াও করল আর মানিকতলা থেকে শিয়ালদা আসতে আসতে সে তিনটে বাচ্চা ন্যাংটো ছেলেমেয়েকে ফুটপাতে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে বসে হাগতে দেখল। দেখল, রাস্তায় ম্লান চেহারার ক্ষয়া আধমরা মানুষ গিসগিস করছে। স্টেটবাসের গায়ে পুরু ধুলোর মলিন আস্তরণ। নতুন সিনেমার পোস্টারে হুমদো হুমদো নায়ক-নায়িকার বিকট চড়া রঙের ছবি ঝুলতে দেখল সে। তার নীচে রাস্তার হাইড্র্যান্টের ঘোলা জলে স্নান করছে বুড়ো বাচ্চা কিছু মানুষ। অত রঙের নীচে বড় বেমানান। দেখল, বস্তিকে আড়াল করে বিশাল আধুনিক বাড়ি উঠছে। ফরসা জামা চড়িয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি ঢাকা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ফোতোবাবু কলকাতা।

মুক্ত মিসা-বন্দির চটকা ভেঙে গেল বৌধায়নের। সে সিটে এলিয়ে থেকে চোখ বুজল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, ময়দান।

কোথাও অবশ্য নামল না, বৌধায়ন। চক্কর মারতে লাগল এদিক সেদিক। ময়দান ছাড়িয়ে চলে এল দক্ষিণে। এক জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে চা আর অমলেট খেয়ে এল। ঘুরতে ঘুরতে আবার ময়দান, চৌরঙ্গি।

ট্যাক্সির ভিতরটা নিজের শ্বাসে ভেপে উঠছে দেখে বৌধায়ন ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একটু হাঁটবে স্বাধীনভাবে। বেড়ানো যাকে বলে। মুক্তি যাকে বলে। খোলা আলো আর বাতাস নিবিড় আলিঙ্গনে ভালুকের মতো চেপে ধরুক তাকে।

আর এসপ্ল্যানেডে মেট্রোর উলটোদিকেই তার জন্য ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল দৃশ্যটা। ঘুরে ঘুরে সে এল এইখানেই।

তেমন কিছু নয়। রোজই দেখা যায়। তবু এতদিন বাদে বড় কাছ থেকে আবার দেখল বৌধায়ন। মেট্রোর উলটোদিকে গাছতলায় একটা রোগা ভিখিরি ছেলের শ্বাস উঠেছে। শুধু হাফপ্যান্ট ছাড়া তার পরনে কিছু নেই। সেই ছেঁড়া হাফপ্যান্ট দিয়েও তার নুঙ্কু দেখা যায়। তার চেয়েও অশ্লীল দৃশ্য হল, তার বুকের পাঁজরের ওপর দিয়ে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডের ঢেউ। এত রোগা মানুষ হয়? আজ পর্যন্ত যত রোগা লোক দেখেছে বৌধায়ন তার মধ্যে এ সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে। গায়ে তেলচিটে ময়লা, গাঁটে গাঁটে অজস্র মাছি-বসা ঘা। একটা ন্যাকড়ার ফালিও জোটেনি বলে সোজা পথের শানের ওপর পড়ে আছে কাত হয়ে। মুখের সামনে শুকনো বমি, মলে মাখামাখি নিম্নাঙ্গ।

চলে যাওয়াই উচিত বৌধায়নের। তবু পাঁচ হাত দূরে সে ক্ষণকালের জন্য হলেও থামল। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, পারবে বৌধায়ন, ওকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে?

না।

স্বপ্নে কাল কিন্তু একজন আহতকে নিয়েছিলে তুমি।

আমাকে আবার স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে যাও। তাহলে পারব। স্বপ্নে পারি। স্বপ্নে সব পারি।

বাস্তবে পারো না?

কিন্তু আমি মানুষের জন্য ভীষণ ফিল করি। আমি বিশ্বাস করি, এর জন্য কিছু করা দরকার। খুব দরকার। বিদ্যাসাগর পেরেছিলেন, মা টেরেসা পারেন। আমি কেন যে পারি না!

কিন্তু বুঝে দেখো বৌধায়ন, ও ছেলেটা তোমার জন্যেই পড়ে আছে না কি? তোমাকেই কি ডাকছে না? ও মরে যাচ্ছে বৌধায়ন। সারা দিন ওর পাশ দিয়ে কত লোক হেঁটে চলে যাবে। ফিরে তাকাবে, হয়তো একটু থামবে, ইতস্তত করবে কেউ কেউ। কিন্তু চলেই যাবে শেষ পর্যন্ত। তুমিও যদি তাই করো তবে তুমিও ভিড় হয়ে গেলে, সাধারণ হয়ে গেলে ইনসিগনিফিক্যান্ট হয়ে গেলে।

স্বপ্নে পারি। আমাকে আবার স্বপ্নে নিয়ে যাও।

পৃথিবীর প্রতিটি দুঃখী মানুষ তোমাকে যে ডাকছে বৌধায়ন।

আমাকে কেন? আমাকেই কেন? যা করার সরকার করুক। জানো না, আমেরিকায় এরকম হয় না? রাশিয়ায় হয় না। ইউরোপে হয় না। শুধু এই জঘন্য দেশে হয়। আমি কী করব?

বৌধায়ন আস্তে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। না, সে পারবে না। সে মহৎ নয়। সে বড় সাধারণ। আর এই বোধ তার বুক খামচে ধরে থাকে অনেকক্ষণ।

বৌধায়ন ভাবে, আজ পারল না সে। কিন্তু একদিন পারবে। একদিন সে ঠিক পারবে। পৃথিবীর আর্ত মানুষেরা তার জন্যই হয়তো অপেক্ষা করছে। একদিন সে-ই হয়তো হবে মানুষের মুক্তিদাতা?

বেলা দশটা নাগাদ বৌধায়ন মন্দার বাবার অফিসের তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল।

সেই থেকে রাগ করে বৌধায়ন আর কখনও মন্দাকে ফোন করেনি। কিছু জানতে চায়নি। আশ্চর্য এই যে মন্দাও তাকে খবর দেয়নি কিছু। যদি মন্দাকে পায় আজ তবে কিছু কথা শোনাবে সে।

সামনের ঘরটায় সমীরণ নামে সেই লোকটা বসে আছে। তাকে দেখে একটু থমকে গেল বৌধায়ন। লোকটার ওপরের ঠোঁটে একটা মস্ত স্টিকিং প্লাস্টার। প্লাস্টারের তলা দিয়েও ফোলা কাটা রক্তাক্ত মাংস দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো লাল। চুল উসকো খুসকো।

লোকটা বসে ছিল, তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়।

বৌধায়ন ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, মন্দা আসেনি?

না।

কখন আসবে?

লোকটা বিক্ষত মুখে কষ্ট করে বলে, কাল সকাল থেকে বসে আছি। বলেছিলেন ফিরবেন। ফেরেননি।

স্তম্ভিত হয়ে বৌধায়ন বলে, আপনি কাল থেকে আছেন?

লোকটা হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি বলেছিলেন, আমাকে দরকার হতে পারে। যেন থাকি।

অথচ আসেনি?

না।

রাগে আপন মনে খানিকটা গরম হয়ে গেল বৌধায়ন। বিড়বিড় করে বলল, কী চায় ও? কী চায়?

আজ্ঞে?

কিছু খেয়েছেন?

খেয়েছি। রুটি তরকারি। রাতে সুখন দিয়েছিল।

আজ?

পাউরুটি আর চা।

মন্দা কোনও খবর দেয়নি?

বেলা তিনটায়, রাত আটটায় আর সাড়ে এগারোটায় ফোন করেছিলেন।

কী বলল?

শুধু বললেন, আমি যেন থাকি। আমাকে ওঁর দরকার হবে।

আপনি তো মশাই ক্যাসাবিয়াঙ্কা। ও বলল বলেই আপনি বসে রইলেন?

কী করব? চাকরি।

বৌধায়ন লম্বা কাঠের বেঞ্চটায় বসল। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলাতে লাগল। আর বসে বসে জগতের যত কিছু অন্যায় আর অবিচারের কথা ভাবতে লাগল। এক্ষুনি কিছু একটা করা উচিত। সব কিছুর একটা আমূল ওলট পালট দরকার।

একটু বাদে রাগটা থেমে গেল খানিকটা। নরম স্বরে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, আর কিছু খাবেন? আমি খাওয়াতে পারি।

খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে লোকটা বলে, না।— তারপর একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, খাওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়। এমন দিন আসবে যখন মানুষ না খেয়েই থাকতে পারবে। খুব গোপনে একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না বৌধায়ন। আর একটু খোলসা করে বলতে বলল। কিন্তু ঠিক এ সময়ে সিঁড়িতে খুব দ্রুত লঘু পায়ের শব্দ হল। পরমুহূর্তেই ঝড়াক করে একরাশ সুগন্ধ, সৌন্দর্য আর চঞ্চলতা নিয়ে ঘরে এল মন্দা।

বৌধায়ন! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! ওঃ ওঃ বৌধায়ন, তোমার কাছে আমার একটা ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে। আই অ্যাম সরি, ভেরি ভেরি সরি ফর দ্যাট ইনসিডেন্ট।

বৌধায়ন গম্ভীর গলায় বলে, মন্দা, তুমি এই ভদ্রলোককে কাল থেকে অফিসে আটকে রেখেছ। আগে ওঁর কাছে অ্যাপোলোজাইজ করো।

সে কী!— বলে মন্দা নাগরদোলার মতো পাক খেয়ে সমীরণের মুখোমুখি হয়ে বলে, আপনি কাল বাড়ি যাননি?

না। আপনি থাকতে বলেছিলেন।

কিন্তু তা বলে বাড়ি যাবেন না কেন? থাকতে বলেছিলাম, কিন্তু সে তো সারা রাত নয়। এ মা। কী বোকামি বলুন তো! ছিঃ ছিঃ আমারই দোষ।

সমীরণ মনে মনে মন্দাকে ভালবাসে। হ্যাঁ, বাসে। কোনও ভুল নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মন্দা কি ঘটনাটা মনে রেখে রায়বাবুকে জানাবে? রায়বাবু কি বুঝতে পারবে যে সমীরণ কী ভীষণ সিনসিয়ার। কত সৎ! কাজের লোক! আর এই রকমভাবে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারলে সে কি রায় আচার্যির পার্টনার হতে পারবে না? যদি হতে পারে তাহলে মন্দা...? একদিন মন্দাকে কি সে ...? মানে মন্দা তাকে কি...?

সমীরণ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে, আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।

তা বলে বাড়ি যাবেন না কেন বলুন তো? চাকরির জন্য কে সারা রাত খামোকা থাকে বলুন? যাঃ আমার ভীষণ লজ্জা করছে। আই অ্যাম সো সরি!... জানো বৌধায়ন, ব্যাপারটা কী, আমি আজকাল ভীষণ, কী বলব আনক্যানি ফিল করি। একা হলেই মনে হয়, কী একটা বিপদ ঘটবে। মনে হয় কে যেন পিছু নিয়েছে... সেই যে তোমাকে ফোন করেছিলাম... (খিল খিল করে হাসি) ইস, বোলো না বোলো না সে যা একখানা কাণ্ড না! একদম বুদ্ধুর মতো। ... এসো এ ঘরে বসবে এসো। অনেক কথা আছে...

বলতে বলতে মন্দা গিয়ে দরজায় চাবি ঢোকায়। মুখ ঘুরিয়ে সমীরণকে বলে, আমি কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম, আপনি ঠিক চলে যাবেন। কেন গেলেন না বলুন তো? এখন যে কী ভীষণ লজ্জা করছে আমার। তার ওপর কাল রজত আপনাকে বিশ্রীভাবে উনডেড করেছে। এ টি এস নিয়েছিলেন তো?

সমীরণ ব্যগ্রভাবে বলে, না, না, ও কিছু নয়। আমার ওসব অভ্যাস আছে। কাল যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে চার টাকা বাইশ পয়সা ফিরেছে।

রাখুন তো। ফেরত আর কী!...জানো বৌধায়ন, কাল রাতের ব্যাপারটার জন্য তুমি আমাকে দোষ দেবে জানি, ইউ আর সো মাচ মরালিস্ট, কিন্তু জানো তো রজত সঙ্গে থাকলে ইউ ডোন্ট ফিল দা টাইম। ও এত টগবগে করে রাখে যে ক'টা বাজল তা খেয়ালই থাকে না। আমি যে লাস্ট ক'টার সময় সমীরণবাবুকে টেলিফোন করেছিলাম তা-ই মনে নেই। দুপুর থেকে হুল্লোড়। সুব্রত এল, বিজিত এল, লোপা এল, তারপর কেবল হুল্লোড়। একটা রেস্টুরেন্ট থেকে আমাদের খুব ভদ্রভাবে বেরিয়ে যেতেও বলেছিল, জানো? কিন্তু একটু বোর করেনি। কী যে দারুণ ডাইনামিক না রজত। আর কী ড্রিংক করতে পারে জানো? কারও অত মুরোদ নেই। দুপুর থেকে একটানা খেয়ে গেল উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আই লিড। রাত বারোটার সময়েও পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিল। এক রাতে কত খরচ করল জানো? আমরা পাঁচজন ছিলাম, পাঁচজনের জন্যে রজত বিল মেটাল দেড় হাজার টাকার কিছু বেশি।

বৌধায়ন একটু হেসে বলে, দম নাও মন্দা। দম নিতে একদম ভুলে যাচ্ছ।

যাঃ ফাজিল! খুব বেশি বকছি নাকি? কিন্তু ভেবো না এটা কালকের এফেক্ট। কাল বেশি খাইনি। আমি আর লোপা প্রথম একটু একটু জিন আর লাইম খাচ্ছিলাম, পরে রজত জোর করে একটু হুইস্কি খাইয়েছে। বেশি নয়। বেশি খেলে আমার তো মাথা ধরে।

বৌধায়ন মন্দার পিছু পিছু ভিতরের চেম্বারে ঢোকে। মন্দা এয়ারকন্ডিশনার চালু করে। কলিং বেল টিপে বলে, চা খাবে তো?

বৌধায়ন মন্দার দিকে চেয়ে ছিল। আজকাল মেয়েদের দিকে তাকালেই তার দৃষ্টি এক্সরে-র মতো হয়ে যায়। স্তন, পেট, নিতম্ব সব অনুভব করে সে। আব আর এইটে সে একদম সইতে পারে না। ক্যাতক্যাতে কিছু মাংস আর মাংস। কিছু স্বেদ, শ্লেষ্মা, শ্বাসবায়ু। অথচ মেয়েরা নিজেদের মাংস ভাবতে কত পছন্দ করে আজকাল। মন্দার দিকে চেয়ে সেই ব্যাপারটাই টের পায় বৌধায়ন। সে জানে, সুন্দর এই মন্দাকে কাল মাথামোটা রজতটা ঘেঁটেছে। ইচ্ছে মতো ঘেঁটেছে মাংসের স্তূপ। আজকাল পুরুষেরা মেয়েদের মদের মতো খায়, মাংসের মতো চিবোয়, পোশাকের মতো পরে। মেয়েরাও উপভোগ্য খাদ্য পানীয় পরিধেয়র মতো সাজিয়ে দেয় নিজেদের।

বড় একটা শ্বাস ফেলে বৌধায়ন বলে, ওই ভদ্রলোককে আজ বরং ছেড়ে দাও। ছুটি দিয়ে দাও।

জিভ কেটে মন্দা বলে, ঠিক। ইস্, কী বিশ্রী কাণ্ড বলো তো! আসলে লোকটা ভীষণ রিলায়েবল। খুব সাহসীও। ওয়াচ ডগের মতো।

দরজা খুলে সুখন উঁকি দেয়। মন্দা বলে, চা— ।

তারপর বৌধায়নের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক বলেছ। ওকে বরং ছেড়ে দিয়ে আসি। এক মিনিট।

নয়

মন্দা দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই সমীরণ দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

মন্দা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার সামনে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায়। কিছু বলে না প্রথমে। খুব অবাক ও সুন্দর চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। মুখে টেপা একটু হাসি।

সমীরণ গোপনে একবার চোখ কচলে নেয়। ভুল দেখছে না তো!

অস্ফুট আবেগের স্বরে মন্দা বলে, ইউ আর সো কারেজিয়াস!

সমীরণ ভীষণ আনন্দে লাল হতে থাকে।

মন্দা তেমনি মুগ্ধ চোখে চেয়েই ধীর স্বরে বলে, আপনার মতো একজন লোক যদি সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকে তো আমার আর কোনও ভয় থাকে না। আই নিড ইউ, আই নিড ইউ ভেরি মাচ।

বড় আফসোস হয় সমীরণের, এসব কথা রায়বাবু শুনছেন না। শুনলে ভাল হত।

মন্দা এগিয়ে এসে দুটো অসম্ভব নরম হাতে তার দু'হাত তুলে নিয়ে বলে, প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করুন। ভীষণ অন্যায় করেছি। ইচ্ছে করলে শাস্তিও দিতে পারেন। যা খুশি।

ভীষণ ব্যাকুল হয়ে ফাটা ঠোঁটে রক্ত ঝরিয়ে সমীরণ বলে ওঠে, না, না।

প্লিজ! রাগ করবেন না। আমি কাল থেকে আপনার ফ্যান হয়ে গেছি। দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট পারফরম্যানস। তাছাড়া আমার কথা ভেবে সারা রাত আপনি অফিসে কাটিয়েছেন! কী অদ্ভুত মানুষ আপনি বলুন তো?

সমীরণ শুধু বলতে পারল, না, না।

মন্দার চোখে কি একটু জলের চিকমিকি? কে জানে? কিন্তু ওর গা থেকে সেই অসম্ভব সুন্দর গন্ধটা ঝেঁপে এসে দম বন্ধ করে দিচ্ছে সমীরণের। আনন্দে আবেগে সে বধির হয়ে যাচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে।

সমীরণের মুখে নিজের সুগন্ধী, পরিষ্কার শ্বাস ফেলে গভীর স্বরে মন্দা বলে, আজ আপনি বাড়ি চলে যান।

এটার জবাবেও সমীরণ অভ্যাসবশে 'না, না' করে উঠতে মন্দা হঠাৎ তার হাত দু'খানা ছুঁয়ে বলল, প্লিজ!

একটা আনন্দের গ্যাস-বেলুনের সুতো ধরে ঝুলতে ঝুলতে সমীরণ অফিস থেকে বেরোল। তার পা মাটি ছুঁল না, সিঁড়ি ভাঙল না।

বাইরে বিরাট পোস্টারে লেখা, আজ অনশনের এগারো দিন।

আজ ফজলুদের ত্রিপলের বাইরে খুব ভিড়। কাল বিকেলে শ্রমমন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। কাগজে কাগজে আজ ফজলুদের ছবি ছাপা হয়েছে। বড় করে খবর বেরিয়েছে। লিখেছে, শ্রমমন্ত্রীর অনুরোধে অধিকাংশ অনশনব্রতী তাঁদের অনশন ভঙ্গ করলেও ফজল আলী, রাজু মিস্ত্রি এবং খগেন রায় রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির ক্লোজার, ছাঁটাই ও হস্তান্তরের বিরুদ্ধে অন্তিম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

খবরের কাগজে কাল রাতের খবর ছেপেছে। আজ সকালে আরও এগিয়ে গেছে ঘটনা। সকালবেলায় মারা গেছে খগেন রায়। রাজু মিস্ত্রির পেটের আলসার ফেটে নাকমুখ দিয়ে রক্ত ছুটছিল বলে তাকে আজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকি আছে কেবল ফজল আলী। অর্থাৎ ফজলু।

বাইরে বিশাল জমায়েত থেকে ধ্বনি উঠছিল, সংগ্রামী ফজল আলী জিন্দাবাদ। বিপ্লবী রাজু মিস্ত্রি জিন্দাবাদ। শহীদ খগেন রায় যুগ যুগ জিও।

চোখে জল এসে গেল সমীরণের। আবেগে কোঁত দিয়ে একটা কান্না গলায় উঠে আসে। ফজলুর কত নাম হয়েছে।

ঢুকবার মুখে একজন লোক পথ আটকে বলে, ভিতরে যাওয়া বারণ আছে দাদা।

সমীরণ জলভরা চোখে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলে, ও আমার গাঁয়ের ছেলে। কত নামডাক হয়েছে ফজলুর। একটু দেখে যাব।

অনিচ্ছার সঙ্গে লোকটা সরে পথ দেয়।

ভিতরে ফজলুকে প্রথমটায় দেখতেই পাওয়া গেল না। রাশি রাশি মালার স্তূপ আর ফুলের

তোড়ার মধ্যে কোথায় হারিয়ে আছে ফজলু! ছোট্ট ঘেরা জায়গাটায় তীব্র ফুলের সুবাস ঘনিয়ে উঠেছে। কী মাতলা গন্ধ!

সমীরণ ডাকল না, কিন্তু ডাকটা উঠে এল তার আত্মার গম্ভীর থেকে, ফজলু! ফজলু রে! শুনছিস?

প্রথমে কেউ সাড়া দিল না। তারপর আস্তে একটা ফুলের তোড়া পড়ল। খসে গেল একটা দুটো মালা। আর সেই সাদা তাজা রজনীগন্ধার ভিতর থেকে ফজলুর মড়ার মতো বাসি মুখ বেরিয়ে আসে অল্প একটু। ভুতুড়ে নাকি স্বরে, ক্ষীণ গলায় সে বলে, কে? মলয়বাবু?

না রে। আমি সমীদা।

বোসো।

সমীরণ বসে রুমালে মুখের ঘাম আর চোখের জল মোছে। রবারের বলের মতো কান্নাটা আটকে ছিল গলায়, সেটাকে গিলে ফেলল সে। স্পষ্টতই সেটা তার পেটে চলে গেল।

ফজলুর মাথার রুখু চুলে হাত বুলিয়ে সমীরণ বলল, পারবি না ফজলু। আজ একজন মারা গেছে।

ফজলু হাসল। ওর মুখের চামড়া শুকিয়ে খুলির সঙ্গে এমনভাবে লেপটে গেছে যে কঙ্কালের মুখ ফুটে উঠছে স্পষ্ট। ফজলু বলল, কায়দাটা না জানলে তো মরবেই। ইচ্ছে চাই বুঝলে। খুব জোরালো ইচ্ছে চাই।

কীরকম?

আলোতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাবতে হয়, এই যে আমার হাত আলো থেকে প্রোটিন নিচ্ছে। আমার চামড়া বাতাস থেকে ক্যালসিয়াম নিচ্ছে। মাটিতে পা রেখে ইচ্ছে করতে হয়, আমার পা দুটো মাটি থেকে রস শুষে নিক। ওরকম মনে করলে, খুব জোর করে ইচ্ছযুক্ত হলে তবে হয়। আমার হচ্ছে।

পারবি ফজলু?

পারব কী গো! পারছি। প্রায় পেরেই গেছি। প্রথমটায় একটু আস্তে আস্তে হয়। অনভ্যাস তো। ক'দিন পর দেখবে, না খেয়েই ক্রমে ক্রমে শরীরে জুত পাচ্ছি। তখন উঠব, হাঁটব গান গাইব। কিছু শক্ত নয়। ভেবো না।

বিড়ি খাবি ফজলু?

আছে? দাও তবে।

বিড়ি কিনেই এনেছিল সমীরণ। ফজলুর ঠোঁটে লাগিয়ে ধরিয়ে দিল যত্নে।

ফজলু বিড়িটা টানতে পারছিল না। চোয়ালের জোর নেই, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। তবু দু'-তিনটে টান দিয়ে বলল, কত ভিটামিন চারদিকে! শ্বাস দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। আর ক'দিন পরেই ইস্কুল খুলব, শেখাব। একটা বই লিখব, কী করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ঘরে ঘরে গীতা, বাইবেল, কোরানের মতো লোকে সে বই পড়বে। দেখো।

পারবি ফজলু?

পারব। পেরেই গেছি প্রায়। প্রথমটায় যা একটু কষ্ট। বড় একঘেয়ে লাগে। আমি একটু চোখ বুঁজে থাকি সমীদা?

থাক।— বলে সমীরণ ওঠে।

আবার রজনীগন্ধায় ঢেকে যায় ফজলু। বাইরে ভিড় বাড়ছে। বিশাল দুটো মিছিল এসে জড়ো হল এইমাত্র। রাস্তা জ্যাম। গাড়িঘোড়া বন্ধ।

সমীরণের যা অবস্থা তাতে রোজ আধ লিটার করে দুধ খাওয়া তার পোষায় না। তবে কিনা তার চাকরিটা স্বাস্থ্যের জন্যই। সে হল গিয়ে বডিগার্ড, এ ডি কং, সিকিউরিটি অফিসার। তাই পাঁচ কথা

ভেবে সে 'জয় কালী' বলে আধ লিটার দুধের কার্ড করেছিল। সেই মহার্ঘ দুধের এক বোতল কাল নষ্ট হয়েছে, ছানাটা মেরে দিয়েছে লোভী বুড়োটা আর তাঁদের ছেলেটা। তার ওপর আজকের দুধটা আনাই হল না, মালিকের মেয়ের খেয়ালে আটকা রইল অফিসে। পয়সাটা পয়মাল। মনটা তাই খচ খচ করে সমীরণের। আবার মন্দার কথা ভাবতে ভাবতে বুকটা বেলুন হয়ে যায়। তখন আর দুধের কথা মনে থাকে না। তখন আনন্দটাই যেন দুধ হয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে বগবগ করে চলে যেতে থাকে।

এই ভ্যাপসা গরমেও বুড়োটা উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছে আর পায়ের কড়ার চামড়া খুঁটছে এক মনে।

সমীরণ ধমকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ছেলে মুড়ির পয়সাটা ফেরত দিল না যে বড়?

বুড়ো সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে বলে, দেয়নি? মহাচোর হয়েছে মশাই। নষ্ট দুধের ছ্যানাগুলো কাল সব মেরে দিল।

সে তোমারও আশকারা আছে। ওকে বোলো, পয়সা না দিলে ছাড়ব না কিন্তু। আর কেরোসিনের ফেরত পয়সাটা?

সবিস্ময়ে বুড়ো বলে, দিইনি? বড় ভুলে যাই দাদাবাবু। কিছু মনে রাখতে পারি না। আমার বউ এসেছিল কিনা! ছেলের বিয়ে গেল।

সমীরণ গনগন করতে করতে গিয়ে ঘরের তালা খোলে। কিন্তু আজ তার মনে তেমন রাগ ওঠে না। মনটা দুধে ধোয়া। বুকটা বেলুনের মতো ফুলছে। আজ সবাইকেই তার বড় মায়া হচ্ছে। দয়া করতে ইচ্ছে করছে।

কোনও ভাল কাজ করেছে বলে তো হরিদেবের মনে পড়ে না।

তবু কী কারণে কে জানে, সমীবাবু দুপুরবেলায় ডেকে খানিকটা পাতকুড়োনো ভাত দিল কলাইয়ের থালায়। বলল, খেয়ে বাসনগুলো মেজে দিয়ো।

আজ্ঞে।— ভারী খুশি হয় হরিদেব। খিদেটা লেগেছিল বটে। কিন্তু এমন ভুল যে সেটার কথাও খেয়াল রাখতে পারে না। আজ সকালেই কি, না কি কাল বেহানে নন্দীবাড়ির রেশন তুলে দিয়ে পাঁচখানা গরম রুটি আর পটলপোস্ত খেয়েছিল?

খুব খিদে লাগলে যখন অসহ্য হয়ে পড়ে তখন সে গিয়ে হরিপদর সংসারে হামলা করে। ছেলের বউ কেমন তা দেখেওনি ভাল করে, তবে কিনা বউটা দেয়। ঝ্যাটালাথি মারে না। কিন্তু কাল হরিদেবের বউ নিজে এসে সে বাড়িতে যাওয়া বারণ করে দিয়ে গেছে। বড় কষ্ট যাবে ক'দিন। সমীবাবুর পাত কুড়োনো ভাত ক'টা পেয়ে আজ বড় ভাল হল।

ছায়ায় গেলে শীত করে। এবার জাড়টা কি তাড়াতাড়ি পড়ল? এটা কোন মাস তা মনে পড়ে না। রোদে বসে কোলের কাছে থালা নিয়ে খুব যত্ন করে ভাত ক'টা মাখতে থাকে হরিদেব। মাখতেই থাকে। অনেকক্ষণ ধরে। মুঠোভর ভাত খেলেই ফুরিয়ে যাবে। চারটে কাক চারদিকে তিনধা নাচন নাচছে। 'কক' 'কা' শব্দ করে কাছে নেচে নেচে আসে, ভয় খেয়ে আবার চার পা পিছিয়ে যায়। গা-শোঁকা বেড়াল আছে একটা, গন্ধে গন্ধে সেটা এসে উরুতে ঘষটায়।

উঠোনে বসে হরিদেব প্রথম গরাসটা মুখে দিতে না দিতেই কোত্থেকে নিত্যপদ 'বাবা' বলে ডাক দেয়। পরমুহূর্তেই অবাক গলায় বলে, খাচ্ছ?

আয়।

নিত্যপদ এসে বসে মুখোমুখি। হাতটা প্যান্টের গায়ে মুছে নিয়ে একটা গরাস রসগোল্লার মতো পাকিয়ে মুখে ফেলে বলে, আজ রান্না হয়নি।

কেন?

দাদার বউটা কেটে পড়ল যে!

কখন?

সকালবেলায়। দাদা শেষরাতে খুব ঠেঙিয়েছিল। দাদা বলেছে, আবার বিয়ে করবে।

এটা কোন পক্ষ ছিল রে? চারটে হল না?

না। এ মাগি ছিল তিন নম্বর।

হরিদেব হেসে বলে, খুব চোর হয়েছিস। সমীবাবুর মুড়ির ফেরত পয়সা দিসনি! দেবেখন সমীবাবু ধরতে পারলে।

তুমি যে কেরোসিনের পয়সা দাওনি। তার বেলা?

আমারটা নেবে না। তোকে পেলে বলেছে হাড় ভাঙবে।

ইঃ, এমন দৌড় মারব!

হরিপদ নিত্যপদর দৌড়ের কথা শুনে খুব হাসে। তার হাতের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে নিত্যপদ গরাস চুরি করছে। টের পেয়েও কিছু বলে না সে। খাক। কারটা কে যে খায়!

এঁটো হাত চেটে হরিদেব বলে, ও বাড়ি থেকে একটা কাঁথা এনে দিবি? এবারে বড় শীত পড়ে গেল।

শীত! যা ভ্যাপসা গরম পড়েছে! শীত কোথায়?

তবে আমার শীত করছে কেন?

তুমি তো এবার মরবে। মরার সময় লোকের গা ঠান্ডা হয়ে আসে কিনা।

হরিদেব খুব হাসে। চোখে জল এসে যায় হাসতে হাসতে। বলে, তোকে বলেছে!

মা বলেছে, তোর বাপের যা হাবভাব দেখছি, আর বেশিদিন নয়। এবার টেঁসে যাবে।

বউয়ের কথায় ভারী ভক্তির সঙ্গে বড় বড় চোখ করে হরিদেব বলে, বলেছে তোর মা?

হুঁ।

তবে তাই হবে। কাঁথাটা এনে দিবি?

দাদার বউটা বিছানাপত্র নিয়ে যায়নি কিচ্ছু। একটা তুলোর কম্বল আছে দেখেছি বিছানায়। চুরি করে এনে দেবোখন।

চুরির কথায় ভারী আমোদ হয় হরিদেবের। খুব হাসে। তার আঙুলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে কচি কচি আঙুল ঢুকিয়ে নিত্যপদ গরাসের ভাত চুরি করে নিচ্ছে! সব নিয়ে নিল। তারপর হরিদেবের হাতটাকে পাত থেকে তুলে যত্ন করে মাটিতে রেখে থালাটা চেঁছে চেটেপুটে খেতে লাগল। ভারী আনন্দের চোখে চেয়ে থাকে হরিদেব। তার বউ বলেছে যে, সে এবার মরবে। বড় বাড়িতে কাজ করে তার বউ, মাস গেলে ষাট-সত্তর টাকা পায়, ধোয়া শাড়ি ব্লাউজ পরে, বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো থাকে। তার কথার দামই আলাদা। সে তো আর মিথ্যে বলবে না। বউয়ের কথা ভেবে ভারী অহংকার হয় তার।

হরিদেব ভারী হাসতে হাসতে বলে, আমি ম'লে ছেরাদ্দ করবি?

নিত্যপদ মুখ ঊর্ধ্বপানে তুলে হাতের তেলো চাটতে চাটতে বলে, হ্যাঁ-অ্যাঁ। নানকুদার বাপ মরলে নানকুদা কালীঘাটে গিয়ে যেমন মন্ত্র পড়ল, মাথা কামাল, ঠিক সেরকম হবে বাবা?

সত্যি করবি?—ভারী অবাক হয়ে বলে হরিদেব।

দাদা ঠিক করবে, দেখো। করতে না চাইলে মা বকে বকে করাবে। দেখো।

হরিদেব ভারী অবাক হয়। তার জন্য হরিপদ আর নিত্যপদ কালীঘাট যাবে, মন্ত্র পড়বে, মাথা কামাবে, অ্যাঁ? তার জন্য এতটা করবে লোকে? এত কিছু করবে? ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তবে ভাবলে ভারী অহংকার হয়।

দশ

শাবানা আজমির পায়ের তলায় বসে আছে খলিলের মা।

এত সুন্দর শাবানা আজমির নাচের ভঙ্গিটি যে পোস্টারের ছবিতেও যেন নূপুরের রুনুঝুনু শোনা যায়। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে পোস্টার লাগানোর চৌকো বাক্সটা ঢিলে হয়ে নীচে নেমে পড়েছে। এখন শাবানা আজমি হাতের নাগালে। এত কাছে যে তার গায়ের সুগন্ধ পাওয়া যায় বুঝি।

পুরনো কাগজওয়ালাটা সৌন্দর্যের ভিখারি নয়। সে তাই মন দিয়ে লম্বা নোংরা নখ দিয়ে পোস্টারটা খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে থাকে।

খলিলের মা প্রাণপণে ডাকছে, ও বাবারা! ও বাবারা আমার! কিছু দিয়ে যাও!

একসময়ে তার নাম ছিল জোহরা। সে নাম ভাল করে মনেও পড়ে না। খলিলও মরে গেছে কবে! ধোঁয়ার মতো মনে পড়ে। তবে তার জোহরা নামটা আর নেই। এখন শুধু খলিলের মা। সঙ্গী সাথীরা তাই ডাকে।

খলিলের মা কাগজওয়ালার দিকে বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলে, গায়ে পা লাগছে, দেখছ না নাকি? সরে দাঁড়াও।

কাগজওয়ালাটার আঙুলে উঠে আসছে শাবানা আজমি। অমন সুন্দর নাচের বিভঙ্গ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত ফেড়ে গেল। শুধু শাবানার করুণ মুখশ্রী চেয়ে দেখে খলিলের মাকে।

আর একজনও দেখছিল খুনখুনে বুড়িটাকে। আহা রে! মরার আগে কয়েকটা দিন মাত্র বেঁচে আছে বুড়িটা। জীবনে কখনও কি পেট ভরে খেয়েছে? ভালবাসা পেয়েছে? কোনও সুখাদ্যের স্বাদ কি ওর মনে পড়ে?

খলিলের মা বিলাপ থামিয়ে নতুন লোকটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলে, কী বাবা? কোথায় নে যাবে বাবা আমাকে?

লোকটা দু' হাত বাড়িয়ে বলে, চলো বুড়ি মা, অনেক খাওয়াব তোমাকে। যাবে?

নে যাবে? ও বাবা, বলে কী! নে যাবে! তা ক্ষেতি নেই। ক্ষেতি কী? তাকে দিয়ে আর কোনও কাজ হবে? বয়সকালের মেয়েমানুষ নয় ইজ্জত কেড়ে নেবে, পয়সা কড়ি নেই যে কাড়বে। তবে ক্ষেতি কী?

কোথা যাব বাবা?

আমার বাড়ি।

একগাল হাসে খলিলের মা। বলে কী? ...পিরের থানে শিন্নি গো! ই কী? এ বাবার যে মটোর আছে গো! ই বাবা! সব সত্যি তো? খোয়াব নয় তো! নেবে আমাকে সত্যি?

তা নেয়।

শাবানা আজমির সুন্দর করুণাঘন মুখশ্রী লোপাট হয়ে যায় নোংরা নখের খাবলায়। জায়গাটা শ্রীহীন হয়ে গেল অনেকটা। আবার নোংরা খুনখুনে বুড়িটা চলে যাওয়ায় জায়গাটার কুশ্রীতাও ঘুচে গেল কিছু! একটা সাম্য এল, সমতা দেখা দিল আবহাওয়ায়।

খলিলের মা'র গায়ের ট্যানাটা হাজারও বার জলে ভিজে গায়ে গায়ে শুকিয়েছে। পরতে পরতে গায়ের ঘাম আর ময়লা সেঁধিয়ে হাকুচ হয়ে বসে গেছে। চিমসে গন্ধে টেঁকা দায়। হাতের পায়ের গাঁটে গাঁটে ময়লা জমে আছে ঘায়ের মামড়ির মতো। হাতের তেলোয় থিকথিকে নোংরা বসে চামড়ার মতো হয়ে গেছে।

একবার ওয়াক তুলল বৌধায়ন। তাড়াতাড়ি স্টার্ট দিল গাড়িতে। সে বড় একটা সিগারেট খায় না। এখন মনে হল, একটা সিগারেট ধরালে ভাল হত। বুড়িটা গাড়ির মেঝেতে বসেছে উবু হয়ে। সাহস করে তাকে আর সিটে বসতে বলল না সে। বুড়ি ভয়ে আর ভরসায় গদগদ হয়ে বলছে, ও

বাবা! কোথায় নেচ্ছ মোরে? মারধর করবে না তো? হেই বাবা! দুটো খেতে দেবে তো?

ফুঁৎ করে কাপড়ে নাক ঝাড়ে বুড়ি। তারপর থুথু ফেলে।

বৌধায়ন দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ি চালাতে থাকে। তাকে এই ঘেন্না জয় করতেই হবে। তাকে হতেই হবে মানুষের মুক্তিদাতা।

তাদের গ্যারেজঘর আর জলের পাম্পঘরের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা। বুড়িটাকে সেইখানে এনে তুলল বৌধায়ন। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে গিয়ে খুব গম্ভীর মুখে রান্নার লোককে বলল, ঠাকুর একথালা ভাত বাড়ো তো। বাইরের লোক আছে।

কয়েক মুহূর্ত সারা বাড়িতে খবর রটে গেল। আর বেঁধে গেল বিরাট হইচই। মা, বাবা, দাদা, বোন সবাই চেঁচামেচি করতে থাকে।

এটা কি লঙ্গরখানা নাকি?...দুটো ভাত দিবি তো দে, তা বলে রাখবি নাকি ওকে? কোথাকার পাগল রে?...বুধোর মাথাটা একদম গেছে মা, ওকে শিগগির বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও।...সেজদার যা কাণ্ড, আজ আমি দুপুরে খেতেই পারব না।

জয়তী কিছুই বলছিল না, শুধু মস্ত চোখে চেয়ে দেখছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল।

গা জ্বলে গেল বৌধায়নের। কিন্তু সে তো জানতই যে এসব কাজে বাধা আসে, প্রতিরোধ আসে। ভেঙে পড়লে চলে না। সে প্রাণপণে শান্ত রইল। মাকে বলল, তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি চলে যাই...

এ কথার ওপর কথা চলে না। বাড়ির গনগনে মেজাজ মিইয়ে গেল।

বুড়িটা রয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলাতেই নরেনের চেঁচানি শোনা গেল, হেগেছে! হেগেছে! ওই দেখো আবার পোঁটলায় লুকোচ্ছে।

সবাই গিয়ে দেখে বুড়ি তার মল একটা পুরনো খবরের কাগজে জড়িয়ে আঁচল চাপা দিয়ে বসে আছে। জায়গাটায় একটা তরল কিছু মুছে নেওয়ার চিহ্ন আর দুর্গন্ধ।

মা বৌধায়নের কাছে এসে বলে, এবার কী করবি?

খুব ম্লান শুকনো মুখে বৌধায়ন বলে, আমি? আচ্ছা, না হয় আমিই পরিষ্কার করব। ওর দোষ কী? ওকে তো কেউ পায়খানাটা দেখিয়ে দেয়নি।

খুবই সাহসের কথা। বীরোচিত। কিন্তু বলেই সে পেটের ভিতর গোঁতলানো টের পায়।

মা ঠোঁট উলটে বলে, দেখিয়ে দিলেই কী? ওরা যেখানে খায় সেখানেই হাগে বাবা। স্বভাব যাবে কোথায়?

নরেন মেথর খুঁজতে বেরোল। বৌধায়ন বসে ভাবতে লাগল।

পরদিনই আবার গণ্ডগোল। ধীরেনকাকুর বাড়ির সব বেড়াতে এসেছিল সন্ধেবেলায়। তারা যখন চলে যাচ্ছে তখন নীচের প্যাসেজে বুড়ি তাদেব পথ আটকে ভিক্ষে চেয়েছে, ও বাবা! বাবাগো! কিছু দেবে বুড়ো নাচারকে?

মা বলল, কী কাণ্ড!

বাবা চেঁচাতে থাকেন, বের করে দাও! বের করে দাও।

পরদিন দুপুরেই খলিলের মা নির্জন বাড়িটা একটু ঘুরে-টুরে দেখবে বলে ওপরতলায় চলে এল। এ ঘর সে ঘর বেড়িয়ে দেখল। খাওয়ার ঘরে গিয়ে ফ্রিজের দরজা খুলে ফের বন্ধ করে দিল ভয়ে। বারান্দায় অযত্নে ফেলে রাখা একজোড়া রবারের চটি দেখে বড় পছন্দ হয়ে গেল তার। এরা কত বড় মানুষ, চটিজোড়া বোধহয় ফেলে দিয়েছে ভেবে পায়ে গলিয়ে ফটাফট হেঁটে নেমে গেল নীচের তলায়।

চটি নিয়ে হইচই ঝিমিয়ে পড়ার আগেই খলিলের মা এক সন্ধেবেলা বাড়ির কেউ খাওয়ার

আগেই রান্নাঘরে হানা দিয়ে ঠাকুরকে বলল, গরম গরম রুটি সেঁকার কী বাস বেরিয়েছে গো বাবা। দাও দু'খানা খাই।

মা ধেয়ে এল রাতে বৌধায়নের ঘরে, তুই ভেবেছিসটা কী?

বৌধায়ন সব শোনে। গম্ভীর মুখে বলে, এতে অস্বাভাবিক কী আছে? এরকমই হওয়ার কথা।

এক দুপুরে খলিলের মা চুল শুকোতে দোতলার ব্যালকনিতে গেছে। জয়তী হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বলল, কী গো? তোমার কি একটা কাপড় চাই?

একগাল হেসে খলিলের মা বলে, দেবে?

জয়তী একটু পুরনো শাড়ি এনে দিয়ে বলে, একটু পাউডার-টাউডার মাখবে নাকি?

বস্তুটা কী তা ভাল বুঝতে না পেরে খলিলের মা বলে, একটু তেল থাকে তো দাও।

জয়তী দিল। এমনকী বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুতেও শেখাল। একটু ঘেন্না হল বটে তবু নিজের হাতে বুড়িকে আচ্ছা করে পাউডার মাখাল, কাজল টেনে দিল চোখে, টিপ পরাল। বুড়ি হেসে কুটিপাটি। বুড়িকে বশটশ করে বলল, তা যে-বাবু তোমাকে আদর করে নিয়ে এল তার একটু সেবা করো না কেন? যাও না। কোণের ঘরে শুয়ে আছে, গিয়ে একটু পা টিপে দিয়ে এসো। ডান পায়ের গোড়ালিতে বাতের ব্যথা, টিপলে আরাম পায়।

বুড়ি খুব রাজি! নতুন শাড়ি পেয়েছে, তেল পেয়েছে, সাবান মেখেছে, সেজেছে। হেসে বলে, সে হীরের টুকরো ছেলে। তুমি কি তার মাগ নাকি?

জয়তী মিষ্টি করে হাসল শুধু। মাগ মানে সে জানে। কিন্তু ভাঙল না।

বৌধায়ন অঘোর ঘুমে। সারা গায়ে টোপা টোপা ঘাম। ডান পা সম্পর্কে সে ঘুমের মধ্যেও সচেতন থাকে। পা খানা বিশাল একটা পাশবালিশের ওপর সাবধানে রাখা।

হঠাৎ সেই অতি অনুভূতিশীল ডান পায়ের গোড়ালির গোছের ওপর আচমকা প্রবল আক্রমণে সে আঁতকে ককিয়ে জেগে উঠল।

আর জেগে উঠে সে নির্জন দুপুরে চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভূত দেখে প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কেক্কঃ? কেঃ? কেঃ?

বুড়ি বড় আদর দেখিয়ে হেসে উঠে পা দাবাতে দাবাতেই বলল, এখন একটু আরাম হচ্ছে বাবা?

প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি বৌধায়নের যে এ লোকটা সেই নাচার বুড়ি। কিন্তু পায়ের প্রচণ্ড ব্যথায় 'ওফ' বলে চেঁচিয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরেই সে টের পেল, এই কাজল, পাউডার মাখানো টিপ পরা বুড়িটা স্বয়ং ডাইনি।

এক ঝটকায় পা টেনে নিয়ে সে বাঘা গলায় হুংকার ছাড়ল, গেট্আউট! গেট্আউট! ভাগো হিঁয়াসে! বেরোও!

বুড়ি থতমত খেয়ে বলল, কী হল বাবা, লাগল?

চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে বৌধায়ন, কে তোমাকে এ ঘরে ঢুকতে বলেছে?

বুড়ি ভালমানুষের মতো বলে, চুরি চামারি করতে ঢুকিনি বাবা। তোমার মাগমশাই যে বলল, তেনার পায়ে ব্যথা, টেপো গে যাও। কোনও দোষঘাট হলনি তো বাবা? তোমার মাগমশাইকে ডেকে পুছ করো না।

মাগমশাই! বৌধায়ন কথাটা ধরতে পারছিল না। রাগে ভিতরটা গনগন করছে। তবু গলা এক পর্দা নামিয়ে মুখ ভয়ংকর বিকৃত করে বলে, কে বলেছে বললে?

তোমার মাগমশাই গো। ওই যে সুন্দর মতো মেয়েছেলেটা।

মাগমশাই! বৌধায়ন মাগ মানে জানে, কিন্তু সঙ্গে মশাইটা কেন? তার ঠাকুমা মেয়েছেলে মার্কা পুরুষকে মাগিমশাই বলত, কিন্তু মাগমশাইটা কী?

গলা ফাটিয়ে বৌধায়ন ডাকতে লাগল, বউদি! এই মেজবউদি!
জয়তী দৌড়ে আসে।
কী হয়েছে বুধো?
একে কে ঘরে ঢুকিয়েছে? কোনও চালাকি কোরো না।
বুড়ি বলে ওঠে, এই তো গো! তোমার—
চোপ!—বলে ধমক মারে বৌধায়ন!
জয়তী থমথমে মুখ করে বলে, ছিঃ বুধো। গরিব নাচার বুড়িটাকে কখন থেকে অপমান করছ বলো তো? গরিব বলে কি সম্মান নেই? বেচারাদের কত কষ্টের জীবন!
বৌধায়ন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, মাগমশাই মানে কী?
আমি কি ডিকশনারি যে সব কথার মানে জানব?
বলবে কি না! ইজ ইট হিন্দি?
না।
তবে?
মাগ মানে বউ। আর মশাইটা বোধহয় সম্মানসূচক শব্দ হিসেবে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।
তার মানে তুমি আমার বউ?
ও তাই ভুল করে ভেবেছে।
বৌধায়ন চোখ বন্ধ করে বলে, এটাকে এক্ষুনি বের করে দাও। ইস! পাউডার! কাজল! টিপ! অ্যান্ড শি ইজ নিয়ার অ্যাবাউট এইট্টি!
ছিঃ বুধো! ও যাবে কোথায় এখন? এনেছ যখন থাক!
বৌধায়ন লাফিয়ে উঠে রাগে চেঁচাতে থাকে, বের করে দেবে কি না? না কি নরেনকে ডাকব? আই মে ইভন কল দি পলিস।
দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি। তুমি শুয়ে থাকো তো! খুব লেগেছে নাকি?
ব্যথায় নীলবর্ণ হয়ে বৌধায়ন ডান পা-টা বুকে তুলে নেয়। তারপর কাতরাতে থাকে।

আগে রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির কর্মীদের অনশনের খবর বেরোত ছোট্ট করে। কিন্তু আজকাল প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে খবর ছাপা হচ্ছে। চারদিকে চাপা গুঞ্জনে ফজল আলীর নাম শোনা যাচ্ছে।

ব্লু রুমে পার্টি দিল রজত। আর বেশিদিন সে নেই। তার জাহাজ বম্বে থেকে শিগগিরই ছাড়বে!
বৌধায়ন পার্টিতে হাজির হতে না হতেই চারপাশ থেকে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, হিয়ার কামস দা গ্রেটেস্ট সেভিয়ার অফ হিউম্যানিটি। হিয়ার কামস বৌধায়ন দা বুদ্ধ! হিয়ার কামস দা লিবারেটার।
বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে। এখনও পায়ের হাড়ে-মজ্জায় সেই ব্যথা। রক্তের প্রতিটি কণিকায় রাগের আগুন। জয়তীই খবরটা রটিয়েছে। সে মন্দাকে খলিলের মা'র খবরটা দেয়। তারপর সেটা জলের মতো ছড়িয়ে গেছে। এখন বৌধায়নের ডুবজল।
রজত তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, যে যাই বলুক আই ফিল প্রাউড অফ ইউ। এবার দেশে এসে দুটো ইভেন্ট আমাকে দারুণ ইমপ্রেস করল। একটা তোর ব্যাপারটা, অ্যাবাউট দ্যাট ওল্ড লেডি। যদিও শেষটায় অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে তোর দোষ নেই। আর দ্বিতীয়টা হল ফজল আলীর ফাস্টিং। দি নিউজ ইজ নাউ অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড। আমি পরশুদিন গিয়ে মালা দিয়ে এসেছি। ফজল ইজ স্টিল হ্যাংগিং অন ইট। আই অ্যাম প্রাউড অফ হিম।
হাউ টাইগরিশ!—মন্দা বলে, দিস ইজ দা জাস্ট টাইম আই শুড রিয়েলি বি ইন লাভ উইথ সামওয়ান। অ্যান্ড হি ইজ দি গ্রেট ফজল আলী।

সুব্রত মাথা নিচু করে বসেছিল এতক্ষণ। মুখ তুলে বলল, আমেরিকা থেকে টি ভি টিম এসেছে ফজলের ছবি নিতে। পেঙ্গুইন বই বের করছে, দি হাঙ্গার আর্টিস্ট। ওই নামে কাফকার একটা গল্পও আমি পড়েছি।

এইরকম কথাবার্তা চলতে থাকে। খুব বেঁচে যায় বৌধায়ন। ফজল আলীর অনশন না ঘটলে এতক্ষণ খলিলের মা'র প্রসঙ্গ চলত।

প্রথম রাউন্ড হুইস্কিটা সকলেই গ্লাস তুলে ফজল আলীর নামে উৎসর্গ করে। কিছুক্ষণ মদ্যপানের পরই সুব্রতর চোখ ছলছল করতে থাকে, ঠোঁট কাঁপে এবং হঠাৎ সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে, ওঃ ফজল আলী ইজ সো গ্রেট!

আরও দু'-একজনও সেই কথা বলে। এবং কাঁদে। কান্নাটা পুরো ব্লু রুমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চারদিকে লোকেরা গ্লাস তুলে ফজল আলীর স্বাস্থ্য পান করে। ফজল আলীর নামে চোখের জল ফেলে।

বৌধায়ন মদ খায় না। সারাক্ষণ সে মুখ বিকৃত করে বসে রইল আর ভাবতে লাগল, সারা দেশ যখন অভাব আর দারিদ্র্যে ডুবে যাচ্ছে, তখন হাজার হাজার টাকার মদ ..

কী ভাবছ?—মন্দা জিজ্ঞেস করে আস্তে।

বৌধায়ন তার হাতের শেরির গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ছাইদানে উপুড় করে দিয়ে বলে, লজ্জা করে না মন্দা?

মন্দা হাসল। বলল, তোমার মন এখন দয়ার দুধে ভরা।

বৌধায়ন ঘৃণাভরে বলল, আই হেট অল দিজ থিংস। আমি তোমাকেও ঘেন্না করছি মন্দা।

মন্দা অবাক হয়ে বলে, বটে! ঠিক আছে, কী করতে হবে বলো!

জবাব দেয় না বৌধায়ন। গুম হয়ে বসে থাকে। কোথাকার কে এক ফজল আলী, সামান্য শ্রমিক, গোটা দেশের মনোযোগ কেড়ে নিল। সে পারল না।

এগারো

মালিকের মেয়ে একবার তার হাত ছুঁয়েছিল, সেই স্মৃতিই সব সময়ে সমীরণকে জাগিয়ে রাখে সতর্ক রাখে। আজকাল সে কখনও ঘুমে ঢুলে পড়ে না। টেলিফোনের প্রথম রিংটা একবার টিং করে বাজতে না বাজতেই সে ফোন তুলে নেয়। কতবার ভুলও হয়। মাঝে মাঝে সুখনের চায়ের কাপে চামচে নাড়ার শব্দকে রিং ভেবে টেলিফোন তুলে নিয়েছে। আজকাল তার শরীর টেলিফোনে সমর্পিত।

রায়বাবু আর আচার্যিবাবু হয়তো কাল পরশু চলে আসবেন। তখন মন্দা এত ঘন ঘন আসবে না অফিসে। টেলিফোনে বলবে না, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আপনাকে দরকার হবে।

দরকারটা কী তা আজও জানে না সমীরণ। জানবার জন্য ভীষণ আগ্রহে তার বুকের শিরা উপশিরা টান টান হয়ে থাকে। মাথা ছিঁড়ে পড়ে। কিন্তু মন্দা কখনও স্পষ্ট করে বলেনি।

যেমন আজ বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বেরোল। যাওয়ার সময় বলে গেল, আমার লাঞ্চ আছে। আপনি কিন্তু থাকবেন। আজ হয়তো আমি সামান্য ড্রাঙ্ক থাকব। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হতে পারে। পারবেন তো?

পারবে না? সে অবাক মানে। পারবে না কেন? মন্দার জন্য সে না পারে কী? মন্দার ভাল পাহারাদার হওয়ার জন্য সে আজকাল আবার ব্যায়াম শুরু করেছে। একবার আসুক না রজত মাস্তান। খোপড়ি খুলে দেবে সমীরণ।

সে ঘাড় কাত করে মন্দাকে বলল, খুব পারব।

তারপর একটা নাগাদ একবার ফোন করল মন্দা, আছেন তো সমীরণবাবু?

আছি।

থাকবেন। আমরা খুব মজা করছি।

খুব খুশি হয় সমীরণ। আনন্দের গলায় বলে, করছেন? করুন।

কেউ আমার খোঁজ করলে বলবেন ব্লু রুম।— এই বলে মন্দা ফোন রেখে দিল।

সারা সকাল নীচের রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা মিছিল যাচ্ছে। স্লোগানে স্লোগানে কান ঝালপালা। গত হপ্তাখানেক ধরে একই স্লোগান, ফজল আলী জিন্দাবাদ। ফজল আলীর মৃত্যু নেই! ধনিকতন্ত্র নিপাত যাক! শ্রমিক নিধন চলবে না! ফজল আলী যুগ যুগ জিয়ো! ফজল আলী অমর রহে।

ফজলুর ডেরা বেশি দূরেও নয়। সেখান থেকে লাউডস্পিকারে বক্তৃতা ভেসে আসে, দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়। আগামীকাল প্রাইম মিনিস্টার ফজলুকে দেখতে আসছেন দিল্লি থেকে। দু'-চার দিনের মধ্যেই আসবেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং।

প্রতিদিন ফজলুর খবর থাকে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। বিকেলের দিকে দু'-একটা ছুটকো ছাটকা কাগজ টেলিগ্রামও বের করে।

ফজলু না খেয়ে আছে কত দিন! পারবে তো?

আজকাল আর ফজলুর কাছে হুট করে যাওয়া যায় না। চারদিকে কড়া পুলিসের পাহারা। গিসগিস করছে মানুষ। সেখানে মানুষের দেয়াল এত পুরু যে ব্যায়াম করা শরীর নিয়ে সমীরও তা ভেদ করে বেশি দূর যেতে পারে না। পলাশি গাঁয়ের ফজলু আজ কত বড় হয়ে গেছে।

ফজলুকে নিয়ে এত হইচই আর চেঁচামেচি সমীরণের খারাপ লাগার কথা নয়। বরং অহংকারে বুক বেলুন হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু মুশকিল হল সদা সর্বদা মিছিলের চেঁচামেচি শুনতে শুনতে আজকাল তার কান ভোঁ ভোঁ করে। ভয় হয়, ঠিক মতো টেলিফোনের রিং সে হয়তো শুনতে পাবে না। যখনই মিছিল যায় তখনই সে আতঙ্কিত হয়ে টেলিফোনের কাছে উপুড় হয়ে যন্ত্রটায় কান লাগিয়ে রাখে। রিং শুনতে ভারী অসুবিধে হয় তার। ফজলুটাই বাগড়া দিচ্ছে।

টেলিফোন বাজল কি? বুঝতে পারে না সে। বিশাল মিছিল যাচ্ছে আবার।

সারাদিন আন্দাজে আন্দাজে সে বহুবার টেলিফোন তুলে কানে লাগায় এবং হতাশ হয়। এবারও তুলল। বুকটা লাফিয়ে উঠল।

টেলিফোনে একটা প্রচণ্ড গোলমাল শোনা যাচ্ছে, সেই শব্দ ছিঁড়ে মন্দার তীব্র গলা শোনা গেল, সমীরণ?

আমি... আমি...!

একটু হেলপ করবেন?

নিশ্চয়ই... যা বলবেন!

গোলমাল ছিঁড়ে মন্দার কুহুস্বর আসে, ভীষণ বিপদে পড়েছি। কিছুতেই ফজল আলীর কাছে যেতে পারছি না।

স্তম্ভিত সমীরণ বলে, ফজলুর কাছে যাবেন? সে কী?

যেতেই হবে। একটা বিরাট সুন্দর মালা কিনেছি। ফজল আলীর গলায় পরাব। কিন্তু যাব কী করে? মালা দেওয়ার জন্য এক মাইল লম্বা মানুষের লাইন পড়েছে, কিন্তু সে লাইনও ভেঙে যাচ্ছে। পুলিশ লাঠিচার্জ করছে বার বার। ভীষণ ক্যাওস। এদিকে আমার মালাটাও শুকিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু হেল্প করতে পারবেন?

ফজলুকে মালা দেবেন?— অবাক হয়ে যেন নিজেকেই নিজে বলে সমীরণ।

মন্দার কুহুস্বর আসে, দিতেই হবে। প্লিজ! তাড়াতাড়ি চলে আসুন। টেলিভিশনের গাড়ি এসে গেছে। এলিট সিনেমার নীচে দাঁড়াচ্ছি।

ফোন রেখে ঝড়ের গতিতে নেমে গেল সমীরণ।

ফজলুদের পুরনো ত্রিপলের ছাউনি ভেঙে কখন যেন বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। লাল সাদা বাহারি ম্যারাপের মাথায় সব দল তাদের ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

ম্যারাপের আধ মাইল ব্যাস জুড়ে ভিড় আর ভিড়। মানুষের শরীর একটার সঙ্গে আর একটা সিমেন্টে গাঁথা ইটের মতো লেপটে আছে। হাজার হাজার গাড়ি পার্ক করা চারদিকে। এক মাইল দূরে গাড়ি রেখে হেঁটে আসছে সুন্দর পোশাকের মানুষ আর মেয়েমানুষ। কঠিন দেয়াল। পিলপিল করে আরও মিছিল আসছে আর আসছে।

কিছু চ্যাঙা চ্যাঙা ছেলে ছোকরা চেঁচাচ্ছে, গুরু! গুরু!

মানুষের মুক্তিদাতা ফজল আলী...

জিন্দাবাদ!

মহান সংগ্রামী ফজল আলী...

জিন্দাবাদ!

সর্বহারার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ফজল আলী...

জিন্দাবাদ!

স্কুল কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসছে দল বেঁধে। তারা গান গাইছে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে...

ঢ্যাঙা একটা লোক একটা টেবিলের ওপর উঠে হাতে মাইক চেপে আবৃত্তি করে, প্রতিজ্ঞা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, লেখা হয় যেন আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ!

গুরু! গুরু!

আই লাভ ফজল আলী...

আমাদের নেতা ফজল আলী...

জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

সেই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে সমীরণ পাগলের মতো সুড়ঙ্গ খুঁড়তে থাকে। তার গায়ে এখন লক্ষ হাতির জোর। মুখে চোখে বাঘের হিংস্রতা। পিছন থেকে তার একটা হাত ধরে রেখেছে মন্দা। গাঁটছড়া বেঁধে তারা এগোচ্ছে।

খানিকটা ভিতরে গিয়ে মালার লাইন পাওয়া গেল। কিন্তু সে লাইনেরও কোনও স্থিরতা নেই। ঘোড়সওয়ার পুলিশ আর ব্যাটন আপসানো সেপাইরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মুহুর্মুহু ভেঙে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে, জট পাকাচ্ছে মালার লাইন।

লাইনে যুবতী মেয়েরা মালা হাতে ঘেমে একাকার। বহু লোকের হাতে দশ আর একশো টাকার নোটের মালা ঝুলছে। একজন মারোয়াড়ি প্যাঁড়ার মালা দু' হাতের আঁজলায় ধরে টাল সামলাচ্ছে।

একজন মেয়ে আর একটা মেয়েকে বলে, তাপসী, তোর মালা কই?

আমি সোনার হারটা দেব গলা থেকে খুলে। তিন ভরির হার।

ভিড় চিরে টেলিভিশনের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। গরমে, ঘামে, টকটকে লাল হয়ে আছে একগাদা সাহেব-মেম।

দুটো বাঁশের গায়ে লটকানো মস্ত এক ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লেখা: ফজল আলীর অনশনের আজ ৪০ দিন।

বিশ্বাস হয় না। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না সমীরণের। তবে কি ফজলু পেরে গেল? পলাশি গাঁয়ের সেই ন্যালাখ্যাপা ছেলেটা কি সত্যিই পাল্টে দিল দুনিয়ার ভোল?

মন্দা হাতে মিষ্টি একটু চাপ দিয়ে বলল, মালা শুকিয়ে যাচ্ছে। প্লিজ!

হ্যাঁ, সব পারে। সব পারে সমীরণ। মিষ্টি হাতটায় নিজের হৃদয়ের তরঙ্গ পাঠিয়ে চেপে ধরে সমীরণ। বলে, এই তো এসে গেছি। আর একটু।

ফজলু যে তার বন্ধু, তার দেশের ভাই, তা মন্দাকে বলতে সাহস পায়নি সমীরণ। এখন কে না বিখ্যাত ফজল আলীর বন্ধু হতে চাইবে? সমীরণ বোকা নয়।

আওয়াজ ওঠে, জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর...

ফজল আলী আমার ভাই, তোমার ভাই...

ম্যারাপে ঢুকবার মুখে লাইনটা জট পাকিয়ে ভিড়ের চাপে ফোঁড়ার মতো ফুলে উঠছে এক জায়গায়। ফুলতে ফুলতেই ফাটবে।

সমীরণ ভিড় চেনে। তাই সে সেই ফোলা জায়গাটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। তা করতে গিয়ে অবশ্য পুলিশের ঘোড়া লালাসমেত একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলে তার ঘাড়ে। একটা সেপাই তার পেটে ব্যাটনের গুঁতো চালায়।

মন্দাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার সহ্য করে সমীরণ।

লাইনের ফোঁড়াটা গেলে দেওয়ার জন্য সমীরণ আচমকাই লাইনের একটা বেটাল লোককে হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনে।

নিখুঁত কাজ। ফোঁড়াটা গলে গিয়ে গলগল করে পুঁজের মতো মানুষজন বেরিয়ে আসে টাল বেসামাল হয়ে। গড়াতে থাকে লোকেরা, মেয়েরা। কাটা গাছের মতো পড়ে যায় জোয়ান শরীর। ধুলোয় মালায় মাখামাখি। ঘোড়সওয়াররা পর্যন্ত সেই লঙ্কাকাণ্ড দেখে পিছিয়ে যায়।

মন্দাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সমীরণ ম্যারাপের ফটকে ঢুকে পড়ে চোখের পলকে।

গদিওয়ালা একটা মস্ত পালঙ্কের ওপর কেবল ফুলের, টাকার আর খাবারের স্তূপে দেখা যায়। চারিদিকে ঘিরে আছে শক্তসমর্থ পাহারাদার এবং পুলিস।

মন্দা উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে, কোথায় ফজল আলী?

কী আকুলতা মন্দার গলায়! একবার অভিমানভরে মন্দার দিকে তাকায় সমীরণ। মিষ্টি হাতটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে মন্দা। স্বয়ম্বরার মতো দুই হাতে মালা ধরে উৎকণ্ঠ আবেগে বলছে, কোথায় ফজল আলী? কোনজন ফজল আলী?

পাহারাদারদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে বলে, মালা আমার হাতে দিন।

মন্দা তীব্র স্বরে বলে, না না! আমি নিজে দেব।

সেপাইরা চেঁচায়, ভিড় করবেন না। দাঁড়াবেন না। চলতে থাকুন। এখনও অনেকে লাইনে আছে।

বিশাল ম্যারাপের ভিতরেও হাজার লোকের ভিড়। একজন করুণ স্বরে বলে, একবার চোখের দেখা দেখব, একবার...

অবশেষে দেখা যায় ফজলুকে। ফুলের প্রতিরোধ ভেঙে মালার দেয়াল সরিয়ে ক্ষীণ একটা কঙ্কালের হাত বেরিয়ে আসে। বালিশের ওপর আস্তে পাশ ফেরে ফজল আলীর মমির মতো বিশুষ্ক মুখ।

জনতা গর্জন করে ওঠে, ফজল আলীর মৃত্যু নেই...ফজল আলী যুগ যুগ জিয়ো... গুরু! গুরু!

বাইরে থেকে আবৃত্তিকারের গভীর কণ্ঠস্বর আসতে থাকে, উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।... (আর একটা! আর একটা!)... বল বীর, চির উন্নত মম শির, শির নেহারিয়া নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির...

হঠাৎ ওভারহেড ল্যাম্প থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় সাদা ঘর সাদা ফরসা হয়ে যায়। চালু হল

টেলিভিশন ক্যামেরা। লাল সাহেবরা ছোটাছুটি করে পজিশন নেয়।

সেপাই আর পাহারাদাররা সামান্য অন্যমনস্ক ছিল, সেই মুহূর্তে হাজারটা যুবতী কিশোরী মেয়ে প্রতিরোধ ভেঙে ছুটে যায় পালঙ্কের কাছে। তাদের বিস্ময়ের কিচির মিচির শব্দ ওঠে... দেখেছিস! এখনও কী ভাইটালিটি?...আই লাভ ইউ ফজল!...ফজল ডার্লিং।...ফজল, আমার নাম মিতা, আমাকে মনে রেখো!...

একটি তরুণী সুন্দরী মেম ফজলের শুকনো ঠোঁটে নিচু হয়ে চুমু দেয়। খাটের পায়া ধরে কয়েকজন কিশোরী উবু হয়ে কেঁদে ওঠে ভালবাসায়।

সমীরণ হাঁ করে দেখে, মন্দা দু' হাতে মালাটা ধরে পরিয়ে দিচ্ছে ফজলুর গলায়।

সমীরণ চোখ বুজে ফেলে। পেছন থেকে ভিড়ের ধাক্কা খেয়ে সে উবু হয়ে পড়ে। তারপর বহু লোক তাকে নির্দয় ভাবে মাড়াতে থাকে। তাদের পায়ে পায়ে কাদার মতো ক্যাতক্যাতে হয়ে যেতে থাকে সমীরণ।

প্রাণপণে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। প্রথমে পারে না। তারপর হাজার মানুষের পায়ের গরাদ ভেদ করতে থাকে সে। অতি কষ্টে। ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে এগোতে থাকে। বুকের বেলুন চুপসে গেছে। দম পায় না। তবু ব্যায়ামের সুফলে সে মরেও যায় না তাতে। এগোয়।

এগোতে এগোতে সে এক সময় ফজল আলীর পালঙ্কের তলায় ঢুকে যায়।

খানিকক্ষণ সেখানেই ঘাপটি মেরে থাকে সে। তারপর চুপিসারে পালঙ্কের ওধার দিয়ে মুখ বার করে। এদিকটায় কেউ নেই। ফুলের পাহাড়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে সে চাপা স্বরে ডাকে, ফজলু! ফজলু রে!

ফজলু ক্ষীণ ভুতুড়ে নাকি স্বরে বলে, কে? মলয়বাবু?

না রে। আমি সমীদা।

সমীদা? কী বলেছিলাম তোমায়? দেখলে তো!

হচ্ছে ফজলু?

হচ্ছে মানে? হয়ে গেছে। বেশ তাকত পাচ্ছি এখন।

বড্ড রোগা হয়ে গেছিস যে!

তা তো হবই। তবে এইভাবেই থেকে যাব। আর কোনও কষ্ট নেই।

আর কোনওদিন কিছু খাবি না ফজলু?

খাওয়ার সঙ্গেই তো লড়াই। আমি লড়াই জিতে গেছি।

তোর কত নামডাক হয়েছে রে ফজলু! কত মেয়েরা আসছে! আমার মালিকের মেয়ে পর্যন্ত তোর গলায় মালা দিয়ে গেল!

ফজলু নাকিস্বরে আস্তে আস্তে বলে, আমার মালিক শেষ পর্যন্ত এল না সমীদা!

আর আসে? সে তোর নামডাক দেখে ভয়ে পালিয়েছে।

কারখানাটা তো তবে আর খুলবে না।

না খুলুক। তোর আর তা দিয়ে কী হবে? তুই তো বড়লোক হয়ে গেলি। কত টাকা পড়েছে দ্যাখ।

তা বটে।— বলে ফজলু পা দিয়ে একটা একশো টাকার নোটের মালা খাট থেকে ফেলে দিয়ে বলে, ফুলের মধ্যে অনেক ভিটামিন, বুঝলে? আমার শরীর ফুল থেকে চোঁ চোঁ করে ভিটামিন মেরে দিচ্ছে। কিন্তু টাকাগুলো কোনও কাজের নয়। বড্ড শুকনো।

কাগজ তো! ওর আর রসকষ কোত্থেকে আসবে!

টাকা যে কাগজ তা এই প্রথম বুঝলাম সমীদা। বড্ড শুকনো জিনিস। টাকা থেকে রস টানতে পারি না। কেন যে দেয় লোকে এগুলো!

বড্ড দুর্বল হয়ে গেছিস রে ফজলু।

না গো! এখন ফের বল পাচ্ছি। আর দু'-একদিনের মধ্যেই উঠে পড়ব। হাঁটব চলব, দৌড়ব। দেখো। উঠতে তো হবেই। বিদ্যেটা সবাইকে শেখাতে হবে যে? মস্ত ইস্কুল খুলব, ইউনিভার্সিটি খুলে ফেলব। দেখো।

বারো

এখনও কে পিছু পিছু আসে মন্দার? এখনও কে পিছু নেয় তার?

মন্দা পিছু ফিরে তাকায় না। তার সারা শরীর কণ্টকিত হয় এক রহস্যময় অনুভূতিতে। তার মনে হয়, পিছু ফিরলেই সে দেখতে পাবে ফজল আলীকে।

একা ঘরে শুয়ে ঘুমোবার আগে প্রতি রাত্রেই তার মন বলে, আজ তুমি ফজল আলীকে স্বপ্ন দেখবে মন।

মন, তুমি আজকাল কেমন হয়ে গেছ! একদম পাত্তা দাও না আমাদের!—সুব্রত এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে বলল।

মন্দা ঘাসের গোড়া চিবিয়ে বলে, কোনওদিন দিতাম কি?

তা বটে।— বলে সুব্রত হোঃ হোঃ করে হাসে।

হেসো না।

কেন?

আজ ফজল আলীর অনশনের নিরানব্বই দিন পূর্ণ হল। কাল একশো।

সুব্রত দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, ইয়েস। সমস্ত দেশের হার্টবিট থেমে আসছে।

টেলিফোনে মৃদুল ডাকে।

মন, তোমার জন্য একটা বিকেল রেখে দিয়েছি আলাদা করে। আসবে সেদিন? শুধু তুমি আর আমি?

ইচ্ছে করছে না মৃদুল।

কেন মন? আমার কি আর কোনও চার্ম নেই?

ইউ ওয়্যার অলওয়েজ সো চার্মিং।

তবে?

আমারই আর সেই চার্ম নেই।

মৃদুল দুঃখিতভাবে বলে, পৃথিবীরই আর কোনও চার্ম রইল না মন।

কেন?

দ্যাট ডেমন, দ্যাট ফজল আলী! যদি সাকসেসফুল হয় মন, ও যদি পৃথিবী থেকে ফুড প্রবলেম লোপাট করে দেয় তাহলে আর কোনও কমপিটিশন থাকবে না, প্রোডাকশন থাকবে না, টাকার দাম মাটি হয়ে যাবে। কত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে জানো? অ্যান্ড উই উইল বিকাম জবলেস!

মন্দা মৃদু স্বরে বলে, ফজল আলীর জয় হোক।

ওয়াশিংটন ডি সি থেকে সুবীরের চিঠি আসে, মন, এ নিয়ে চারখানা চিঠি গেল। জবাব দাওনি। রাগ করেছ?... ওখানে ফজল আলী নামে কে একজন অনশন করছে, দেখেছ তাকে? এখানে রোজ

টেলিভিশনে তার ছবি। কী ভীষণ কাণ্ড বলো তো। ওয়াল স্ট্রিটের কর্তাদের মাথায় হাত। তাদের ভয়, এশিয়া, আফ্রিকা আর সব গরিব দেশে তাদের ব্যাবসা ডুবে যাবে। এ কি সম্ভব?. আমাকে ভুলো না লক্ষ্মীটি।

মন্দা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

বলুকে ডাকতে হয় না। সে আপনিই আসে। শীত পড়েছে, তাই মনের সুখে এখন ওর স্যুট পরার কথা। কিন্তু পরেনি। টেরিকটনের প্যান্টে গোঁজা সাধারণ শার্ট, টাইটাও নেই।

বলে, গজব। সব গজব হয়ে গেল মন।

কী হল?

ব্যাবসা। লাখো টাকা জলে যাবে।

কেন?

তুমি ব্যাবসা বোঝো না। লোকে ভুখা না থাকলে কী জন্যে কাজ করবে? ব্যাবসা চলবে কীসে? ফজল আলী হ্যাজ গিভন দা ওয়ার্ল্ড দা বিটারেস্ট ব্লো। ...চলো, মাল খাব।

না বলু। আমি খাচ্ছি না।

ওঃ, দ্যাট হেডেক অফ ইয়োরস?

বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকে বলু। তারপর বলে, ব্যাবসা ব্যাবসা করে গান ভুলে গেছি, বই পড়া ভুলে গেছি! এখন ভাবছি কী জানো?

কী?

ব্যাবসা তো গজব। তাই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এখন থেকে প্রাণভরে রবীন্দ্রসংগীত গাইব। বই পড়ব এন্তার। আবার যৌবনটা ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে বাঁচব কী নিয়ে?

বাবা ফিরে আসবার পর থেকে মন্দা আর অফিসে যায় না।

বাবার সঙ্গে তার দেখা খুব কম। প্রায়দিনই হয় না।

একদিন রাতের বেলা সিঁড়িতে মুখোমুখি হল। সাধারণত তাদের বাক্যালাপ নেই। একে অন্যকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু বাবার চেহারাটা খুব ভাল দেখল না মন্দা। মুখে চোখে কেমন ভ্যাবলা ভাব, চামড়া ঝুলে পড়েছে। সেই হাসিখুশি আমুদে মানুষটা আর নেই।

সে থমকে দাঁড়াল। রায়বাবুও দাঁড়ালেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ কথা নেই। তারপর মন্দাই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে, তোমার শরীর খারাপ?

বড় দুশ্চিন্তা।

কেন?

রায়বাবু খানিকটা আকুল স্বরে বললেন, তোর তো ব্যাবসার খুব শখ। মাথাও আছে। দেখবি চেষ্টা করে? আমরা তো নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

কেন?

কর্মচারীরা কেউ মানছে না আজকাল। কাজ হচ্ছে না কোথাও।

মন্দা নিষ্ঠুর হেসে বলে, তাই মেয়ের ফেমিনিন চার্মকে কাজে লাগাতে চাইছ?

রায়বাবু রেগে গিয়ে বলেন, তুই গোল্লায় গেছিস। তাই যা। কিছু বলতে যাওয়াই ভুল।

মন্দা ভারী মজার হাসি হেসে বলে, প্রবলেমটা কী?

ফজল আলী।

মন্দার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। ভিতরটা ধুয়ে যায় এক রহস্যময় আনন্দে।

হঠাৎ রায়বাবু বললেন, সমীরণ নাকি তোকে খুব বিরক্ত করত?

মন্দা সমীরণকে মনে করতে না পেরে বলে, কে সমীরণ?
ওই যে বডিগার্ড ছেলেটা।
না তো! বরং হেলপ করেছে।
সুখন বলছিল।
কী?
খুব মাখামাখির চেষ্টা করত তোর সঙ্গে! যাই হোক, ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি।
বেচারা।— বলে হাসল। তারপর বলল, কিন্তু দুনিয়াশুদ্ধু ছেলেছোকরা তো তোমার কর্মচারী নয়। ক'জনকে ছাড়াবে?
রায়বাবু তা জানেন। তাই লাল মুখে মেয়ের সামনে থেকে সরে গেলেন তাড়াতাড়ি।

তেরো

বৌধায়নের অনশনের আজ দ্বিতীয় দিন।
প্রথম দিনটায় কেউ তেমন খবর পায়নি। সকালে বৌধায়ন গুল ঝাড়ল, শরীর খারাপ। খাব না।
শুনে বাবা ডাক্তার ডাকালেন। ডাক্তার এসে ঘণ্টাখানেক বসে রইলেন। অনেক ডাকাডাকিতেও বৌধায়ন বাথরুম থেকে বেরোল না। তারপর সারাদিনই মা, দাদা, বাবা খিটখিট করতে লাগল। বৌধায়ন মটকা মেরে পড়ে রইল।
বিকেলবেলা জয়তী ঘোষণা করল, বুধোর শরীর-টরীর খারাপ কিছু নয়। ফজল আলীর মতো অনশন করছে।
সেই শুনে সকলের চোখ কপালে।
আজ দ্বিতীয় দিন বেলা যত বাড়ছে তত বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন দেখতে আসছে বৌধায়নকে।
কী লজ্জা।
অবশ্য লজ্জার ভাবটা তার মুখে খেলছে না তেমন। গত রাত্রি থেকেই কান ভোঁ ভোঁ করছে। শরীর মিশে গেছে বিছানায়। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হচ্ছে।
সকালবেলাতেই এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে এল মন্দা। হেসে বলল, তোমার এক দিনের অনশন ফজলের বিশ দিনের সমান।
ঠাট্টা করছ?
না গো! ফজল তো গরিব ঘরের ছেলে, না খেয়ে অভ্যাস আছে। আর তুমি জীবনে এক বেলাও না খেয়ে থাকোনি, তাই তোমার অভ্যাস অন্য রকম।
বৌধায়ন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখনও ঠাট্টা করছ। রজনীগন্ধা ফেরত নিয়ে যাও।
লক্ষ্মীটি।
খুবই হতাশ হয় বৌধায়ন। সারা জীবন ধরে সে নানা সৎ কাজের চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত কোনওটাই হচ্ছে না। সে তো বেশি কিছু চায় না, শুধু এই মানবসমাজের কল্যাণ চায়।
সুব্রত মন্দার একটু পরেই এসে বলল, কংগ্র্যাটস বৌধায়ন।
ইয়ার্কি কোরো না।
করছি না। শুধু বলি এখন অনশন প্র্যাকটিশ করাটা বোকামি।
বৌধায়ন দুর্বলতার মধ্যেও ঝেঁঝে উঠে বলে, কেন?

বোঝো না? ফজল আলী পৃথিবী থেকে খাদ্য সমস্যা তাড়িয়ে দিল তো? এখন গরিব-গুর্বোরা কায়দাটা শিখে নিয়ে খাদ্য বর্জন করত শুরু করবে। আর তখন পৃথিবীতে রাশি রাশি খাবাব থাকবে উদ্বৃত্ত। ফসলের খেত হয়ে যাবে আগাছার জঙ্গল। খাবারে ধুলো পড়বে, খাবার পচবে। সুতরাং সে সব খাবার নিয়েও দেখা দেবে গ্রেট প্রবলেম। কে খাবে তুমি আমি ছাড়া?

বৌধায়ন চোখ বুজে বলল, তোমার রজনীগন্ধা ফেরত নিয়ে যাও।

আমি রজনীগন্ধা আনিনি যে!

তাহলে কী এনেছ?

ওনলি গুড উইশেস।

ফেরত নিয়ে যাও।

মা সারাদিন পাশে বসে হাতাপিতি করে দিচ্ছে। পিসি, মাসিরা এসেও হাতাপিতি করছে। এক কাকিমা এসে এক রাউন্ড কেঁদে গেল। মাও কাঁদছে চেপেচুপে।

রেনি পার্ক থেকে অফিস কামাই করে বড়দা এসেছে সপরিবারে। এসে তক ইংরেজিতে নানা রকম মার্জিত গালাগাল দিচ্ছে তাকে। ইররেসপনসিবল, ভ্যাগাবন্ড ফ্যানাটিক সিউডো হিরো...

দাঁতে দাঁত চেপে বৌধায়ন পড়ে রইল। কিন্তু তাইতেই কি নিস্তার আছে? নৃত্যনাট্য দলের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছিল নয়না। সেদিন সকালে ফিরে এসেই সোজা বৌধায়নের ঘরে এবং বুকের ওপরে। একরাশ চোখের জল ফেলে বলল, কেন মরতে চাইছ? আমি তো তোমাকে রিফিউজ করিনি।

বৌধায়ন বিড় বিড় করে বলে, না, আমিই করছি।

আস্তে বলা হলেও শুনতে পেল নয়না। ঝাঁজালো চোখে চেয়ে বলল, তুমি এই রকম?

আরও খারাপ।— বলে বৌধায়ন।

নয়না তারপর আবার কাঁদে! অনেকক্ষণ বসে থাকে।

দুপুরে ঘর খানিকটা ফাঁকা। জয়তী টুক করে এসে তার মাথায় হাত রেখে বলল, ওমা! জল খাচ্ছ না যে!

জল খায় নাকি?

খায় না? জল কী গো? সরবৎও চলে।

ইয়ার্কি কোরো না।

মাইরি বলছি। আমাদের পাড়ায় অনশন হয়েছিল একবার। অত কী, গাঁধীও জল খেতেন।

বৌধায়ন বিশ্বাস করে না।

কিন্তু জয়তী ঘুরঘুর করতে থাকে।

বিকেলের দিকে বৌধায়ন মাথা তুলে বলে, সত্যি জল খায়?

জয়তী ম্লান মুখে বলে, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব?

একটু ভেবে বৌধায়ন বলে, এক সিপ জল দাও তো তাহলে!

জয়তী দেয়। বৌধায়ন এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করে বলে, এত মিষ্টি কেন?

ওমা। উপোসি শরীরে জল খেলে মিষ্টি লাগবে না? বোকা আছো মাইরি! এ তো সবাই জানে!— জয়তী জবাব দেয়।

বৌধায়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে, হত্তুকি খেয়ে বা মৌরি চিবিয়ে জল খেলে মিষ্টি লাগে বটে, তা বলে উপোস করলেও লাগবে?

বড় বড় চোখে চেয়ে জয়তী বলে, আমাকে যা বলার বললে, অন্য কাউকে বোলো না যেন। লোকে হাসবে।

বৌধায়নের আর বাধা হল না। সে পুরো আধসেরি গ্লাসের জল ঢক করে খেয়ে নিল। বলল, আর একটু।

জয়তী দেয়। বৌধায়ন খেয়ে বিড় বিড় করে বলে, গ্লুকোজ! গ্লুকোজ! নিশ্চয়ই গ্লুকোজ!

সন্ধে হতে না হতেই নতুন করে ভিড় জমে বাড়িতে। আবার খিটখিট, কান্নাকাটি হাতাপিতি।

বৌধায়ন নীরবে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে তাকে জল খাইয়ে যায় জয়তী। ডাক্তার এসে প্রেসার মাপে, হার্টবিট দেখে নাড়ি পরীক্ষা করে।

রাত্রিবেলা জয়তী ঘোষণা করল, অনশনে ওষুধ বারণ নয়।

বৌধায়ন বলল, ওষুধ? আমি ওষুধ খাব কেন?

জয়তী গম্ভীর হয়ে বলে, ডাক্তার বলেছে তোমার হার্ট ভাল নয়।

যাঃ।

মাইরি, কালীর দিব্যি।

খুবই সন্দেহ হতে থাকে বৌধায়নের। কিন্তু সে অসুখকে ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়।

তাই রাত্রিবেলা জয়তী তার নাক টিপে ধরে, কৌশলে হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে মুখে ওষুধ ঢালতে থাকে।

এত বড় ডোজের ওষুধ বৌধায়ন জীবনে খায়নি। গিলছে তো গিলছেই। আর বেশ মিষ্টি ও সুস্বাদু ওষুধ।

কী খাওয়ালে বলো তো? সত্যি ওষুধ?

মাইরি, কালীর দিব্যি।

কী নাম ওষুধটার?

ভিটোলাস।

শিশিটা দেখাও তো।

জয়তী গম্ভীর মুখে একটা শিশি এনে দেখায়। ওষুধের জগতের কোনও খবরই বৌধায়ন রাখে না। তাই শিশিটা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে বলল, আমি ঘুমোব। তোমরা যাও।

বিড়বিড় করে বৌধায়ন বলে, ইউ উইল বি অ্যানাদার ফার্স। অ্যানাদার ফার্স।

জয়তী মুখ টিপে হাসে।

চৌদ্দ

অনশনের দুশো দিন পূর্ণ করে ফজল আলী উঠল।

এতই শীর্ণ যে প্রথমে তাকে ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। শুকনো হাড়ের ওপর চামড়াটা কে যেন বিছিয়ে রেখেছে অযত্নে। দুটো চোখের গুহার ভিতরে নিভন্ত ব্যাটারির টর্চবাতি জ্বলছে।

টেলিভিশন ক্যামেরায় প্রথমে তার ছবিই এল না। দর্শকরা ঘন ঘন টেলিফোন করতে লাগল, ফজল আলী কই?...গুরুকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ক্যামেরার লেন্সের জোর বাড়ানো হল অ্যাঙ্গেল বদলানো হল। অবশেষে টেলিভিশনে প্রেতশরীরের মতো, অশরীরীর মতো ভেসে উঠল ফজল আলীর ছবি।

সারা পৃথিবী ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে।

ফজল আলী সামান্য হাসে এবং সবাইকে আদাব জানিয়ে তার ভুতুড়ে নাকিস্বরে বলে, খোদার মেহেরবানি। আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকব।

সারা বিশ্বের টি ভি নেটওয়ার্কে কোটি কোটি মানুষ সেই কথা শুনে জয়ধ্বনি দেয়।

ফজল আলী উঠে দাঁড়ায়। হাত তুলে বলে, অনশন একটা শিল্প। ভাইসব পেটে পাথর ভরে নিতে হয়, পেটে দুর্গ বানিয়ে নিতে হয়। মনে রাখতে হয়, খাদ্যবস্তু আমাদের হারাম।

ফজল আলী হাঁটতে থাকে। ক্যামেরা ধাওয়া করে তাকে। মাইক্রোফোন চলে সঙ্গে সঙ্গে।

ফজল আলী ধীর স্বরে বলতে থাকে, মানুষকে আমি ঘরে ঘরে গিয়ে শেখাব কী করে খাদ্যবস্তু বর্জন করে বেঁচে থাকতে হয়। বেঁচে থাকতেই হবে, খাওয়াও জুটবে না, এ দুটো জিনিস মেলাতে পারলেই জীবন বড় সুন্দর।

ফজল আলী রাস্তায় নামে। লক্ষ লক্ষ লোক হাঁটে তার সঙ্গে। গর্জন করে জয়ধ্বনি দেয়।

ফজল আলী বলে, খোদা মেহেরবান। আমাদের তিনি ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। ভাইসব সেই ইচ্ছাশক্তিই আমাদের মূলধন, আমাদের হাতিয়ার। এই যে হাত-পা দেখছেন, এই যে গায়ের চামড়া, এই চোখ আর ওই দেখুন আল্লার আলো, বাতাস মাটি, ইচ্ছাশক্তিবলে ওই আলো বাতাস আর মাটি থেকে আপনার হাত, পা, চামড়ার প্রতিটি ছিদ্র গাছের মতো টেনে নিতে পারে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন। প্রথমে একটু অভ্যাস, কিন্তু ক্রমে ক্রমে...

ফজল আলী এগোতে থাকে।

বুড়ো হরিদেব আর নিত্যপদ ধরাধরি করে চৌকিটা রাস্তার ধারে পেতে দিয়েছে। শামিয়ানার অভাবে ওপরে মশারিটা চালি করে টাঙানো।

চৌকিতে সমীরণ শুয়ে আছে। একধারে নিত্যপদ তার শেলেটে 'অনশনের আজ দশ দিন' লিখে টাঙিয়ে দিয়েছে। দেখার জন্য বেশ ভিড় হচ্ছে আজকাল।

হরিদেব আর নিত্যপদ পালা করে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া দেয়, সমীরণকে। চৌকির আশেপাশে ঘুরঘুর করে।

নিত্যপদ জিজ্ঞেস করে, তুমি পারবে বাবা?

হরিদেব খুব হেসে বলে, তুই পারবি?

নিত্যপদ বলে, পারব না কেন! তবে দাদার চার নম্বর বউটা ভাল, বুঝলে বাবা। খেতে দেয়। এর পরের মাগিটা যদি খারাপ হয় তবে তো খেতে দেবে না। তখন করব!

হরিদেব ভেবে পায় না সে আজ খেয়েছে কি না। গতকাল কি কিছু খেয়েছিল? কিছু মনে পড়ে না।

নিত্যপদ আপনমনে মার্বেল খেলে। হরিদেব বসে বসে ঢোলে।

এক গভীর রাতে সমীরণের মাথায় কে হাত রাখল।

সমীদা গো! ও সমীদা!

কে? রায়বাবু? মন্দা!— বলে অনেক কষ্টে সমীরণ চোখ খোলে। প্রেতের মতো শীর্ণ একটা লোককে দেখে শিয়রে। চমকে ওঠে। শমন এল নাকি?

শীর্ণ লোকটা হেসে বলে, না গো! আমি ফজলু। পারছ সমীদা?

সমীরণ শীর্ণমুখে হাসে, পারছি। বুঝলি! একটু একঘেঁয়ে লাগে। তবে পারছি। হাত-পা চামড়া দিয়ে গল গল করে ভিটামিন ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। প্রোটিন আসছে। ক্যালসিয়ামও।

ফজলু বড় মায়াভরে বলে, পারবে সমীদা। একটু কষ্ট হয় প্রথমে। কিন্তু পারবে। ইচ্ছাশক্তি রেখো। দুনিয়ার গরিবদের বেঁচে থাকতেই হবে। আল্লা মেহেরবান।

ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় অনশনশিল্পীরা অপেক্ষা করছে ফজল আলীর জন্য। শেখাতে হবে। পেটে পাথর বাঁধতে শেখাতে হবে। পেটে দুর্গ গড়ে তুলতে শেখাতে হবে। গাছের মতো হয়ে উঠতে শেখাতে হবে।

ফজলুর সময় নেই। ফজলু এগিয়ে যায়।

ক্ষয়

॥ রুকু ॥

রুকু, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব?

বলবে? বলতে পারো। কিন্তু আমার নিজেরই অনেক প্রবলেম দয়ী।

দয়ী একটু হাসল টেলিফোনে। বলল, তোমার প্রবলেমের কথা আর একদিন হবে রুকু। সেদিন আমার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদো। কিন্তু আজ আমারটা শোনো। ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম।

রুকু খুব সাবধানি গলায় বলে, শোনো দয়ী, যদি বলতেই হয় তবে রেখে-ঢেকে বোলো। এই টেলিফোন কিন্তু ডাইরেকট নয়। ইচ্ছে করলে অপারেটর শুনতে পারে। তা ছাড়া আমার তো এক্সক্লুসিভ টেলিফোন নেই। যার টেবিলে টেলিফোন সে এইমাত্র বাইরে গেল, যখন তখন এসে পড়তে পারে।

এগুলোই কি তোমার প্রবলেম রুকু?

এগুলোও। তবে আরও আছে। অনেক। গরিবদের যে কতরকম থাকে।

বাজে বোকো না। তুমি এক কাঁড়ি টাকা মাইনে পাও, আমি জানি।

আমার পে-স্লিপটা তোমাকে একদিন দেখাব। দেখো, সেখানেও কত প্রবলেম।

ইয়ার্কি বন্ধ করে একটু শুনবে? খুব জরুরি কথা।

শুনছি।

তুমি মলয়কে একটু বুঝিয়ে বলবে যে, ও যা চাইছে তা হয় না।

কী হয় না দয়ী?

তুমি জানো না বুঝি? মলয় তোমাকে কিছু বলেনি?

মলয়ের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না প্রায়। কী হয়েছে?

ও আমাকে নিয়ে ভাবছে। অ্যান্ড হি ইজ সিরিয়াস।

একটু খুলে বলো। কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমিই তো খোলাখুলি কথা বলতে বারণ করলে।

আই উইথড্র।

অপারেটর শুনছে না তো।

শুনুকগে। বলো।

মলয় ইজ বিয়িং প্রিমিটিভ।

তার মানে?

ও বোধহয় বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছে।

রুকু একটু চুপ করে থাকে, তারপর শান্ত ব্যথিত স্বরে বলে, ও।

শোনো রুকু, অত নিরাসক্তভাবে ব্যাপারটা নিয়ো না। একটু সিরিয়াস হও। ও বোধহয় সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছে। আগের মতো হাসিখুশি ইয়ারবাজ নেই, দেখা হলেই গম্ভীর হয়ে যায়। ভাল করে তাকায় না।

সেটা কি প্রেমের লক্ষণ দয়ী? বরং উলটোটাই তো।

তোমাকে বলেছে।

তবে?

ও আমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে যে আজকাল। তাতে সব সেই বিয়ে-টিয়ের মতো সেকেলে বিষয় থাকে। আমি একটারও জবাব দিইনি।

দাওনি কেন?

বাঃ, চিঠি চালাচালির কী আছে বলো। প্রায়ই তো দেখা হচ্ছে। আমি একদিন ওর চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিলুম, ও গম্ভীরভাবে বলল চিঠির জবাব চিঠিতেই নাকি দিতে হবে। কী বোকামি বলো তো?

তুমি তো ওকে পছন্দই করতে দয়ী?

সে তো অনেককেই করি।

তুমি ওর সঙ্গে ধলভূমগড় বেড়াতে গিয়েছিলে। একবার কোনও ডাক-বাংলোয় ছিলেও দু'-একদিন।

এখন বুঝি অপারেটর শুনছে না রুকু? টেবিলের ভদ্রলোক বুঝি ফিরে আসেনি? শোনো রুকু, জ্যাঠামশাইয়ের মতো কথা বোলো না। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কিংবা এক সঙ্গে দু'-একদিন কাটানো মানেই কি প্রেম?

মানে তো জানি না দয়ী। ঠিক মানে হয়তো তুমি জানো। তবে ওরকমই একটা ভুল অর্থ সকলেই করে নিতে পারে।

তুমিও প্রিমিটিভ রুকু!

আমি কেবল লজিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে লজিক্যাল হতে যাওয়াটা পৃথিবীর পয়লা নম্বরের বোকামি।

তোমার লজিকটা তোমার পার্সোনাল। নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি অন্যের ওপর খাটানো কি ঠিক?

বাদ দাও। মাপ চাইছি। এবার যা বলছিলে বলো।

তুমি সিরিয়াস হ'চ্ছো না রুকু। মলয় আমার বন্ধু, তুমি যেমন বন্ধু। তোমাদের কাউকে বিয়ে করার মানে একটা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। ওরকমভাবে ভাবিনি তো তোমাদের কোনওদিন। মলয় সেটা বুঝতে চাইছে না। কী সুন্দর হুল্লোড়বাজ মজাদার ছেলেটা এখন কেমন প্যাঁচামুখো, গম্ভীর আর আনইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে। ইদানীং তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি?

রুকু শান্তস্বরে বলে, গত সপ্তাহে ও আমাকে মোটর-বাইকের পিছনে বসিয়ে ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

কোনও কথা হয়নি আমাকে নিয়ে?

না। ও আমাকে দিল্লি রোডে মোটর-বাইক চালানোর তালিম দিয়েছিল অনেকক্ষণ। আমি কিছুতেই শিখব না, কিন্তু ও শেখাবেই। আমি ওকে বললাম, মোটর-বাইক চালাতে শিখে আমার কোনও লাভ নেই, কেননা কোনওদিনই মোটর-বাইক কেনার মতো পয়সা আমার হবে না। কিন্তু ওকে তো জানো।

জানি বলেই ভাবছি। তোমরা কি ওকে ভয় পাও রুকু?

হয়তো পাই।

কেন, ও কনডেমড খুনি বলে?

আস্তে দয়ী। এসব কথা টেলিফোনে কেন?

আমার কথাটার জবাব দাও।

সম্ভবত সেটাও একটা কারণ।

আমি কিন্তু সেই কারণে চিন্তিত নই। বরং ওটাই আমার কাছে ওর যা কিছু অ্যাট্রাকশন। ও যা করেছে তা পলিটিক্যাল কারণে।

আমাদের অফিসের টেলিফোন অপারেটাররা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দেয়। আজ দিচ্ছে না কেন জানো?

ইয়ার্কি মেরো না রুকু, কেন?

কাটছে না, কারণ অনেক স্কুপ নিউজ পেয়ে যাচ্ছে।

টেবিলের ভদ্রলোক ফিরে আসেনি তো?

এখনও নয়।

শোনো রুকু, মলয়কে তুমি একটু বোঝাবে?

ও বুঝবে কেন? মলয়কে কোনওদিন কেউ কিছু বোঝাতে পারেনি।

তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ?

না দয়ী। আমি বাস্তব অসুবিধার কথা বলছি। আমার চেয়ে মলয়ের আই কিউ বেশি, বুদ্ধি বেশি, যুক্তির ধার বেশি, মলয় আমার চেয়ে ঢের বেশি সফল। ওর তিনশো সি সি-র হোন্ডা মোটর-বাইক আছে, আমার যা জন্মেও হবে না। এমনকী ওর যে আর একটা অ্যাডেড অ্যাট্রাকশনের কথা তুমি বলেছিলে তাও আমার নেই। ছেলেবেলায় আমি কৌতূহলবশে একটা কুকুরছানাকে আছাড় দিয়েছিলাম। সেটা মরে যায় তক্ষুনি। সেই অপরাধবোধ আমার আজও আছে।

তুমি সব মানুষকেই একটু বাড়িয়ে দ্যাখো রুকু। ওটা কিন্তু ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেকস। মলয় তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান হলে আমার জন্য পাগল হত না।

পাগল এখনও হয়েছে কি?

আমি ফাইন্যালি রিফিউজ করলে হবে। পুরুষদের আমি চিনি।

রিফিউজ করলে মলয় পাগল হবে এমন নরম ছেলে ও নয় দয়ী। তুমি ভুল ভাবছ।

কিন্তু রিফিউজ করাটাও ভারি অস্বস্তিকর রুকু। এতদিনের বন্ধু, এত মেলামেশা, মুখের ওপর কি বলা যায়? আমি রিফিউজ করলে ওর কিছু করার নেই জানি। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছি না। আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ও এমন কমপ্লেকস করে তুলেছে যে, আমি সব সময়ে নিজেকে নিয়ে লজ্জায় আছি। আমি চাই তুমি মিডিয়েটার হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। ওকে বোলো আমরা যথেষ্ট অ্যাডালট হয়েছি, ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না।

আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললে দয়ী। মিডিয়েটার হওয়ার মতো আর কাউকে পেলে না?

তোমার মতো ঠান্ডা মেজাজের লোক আর কেউ নেই। তোমাকে কোনওদিন রাগতে দেখিনি, উত্তেজিত হতে দেখিনি, তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করো না, কাউকে অপমান করো না। তোমার চেয়ে ভাল মিডিয়েটার কোথায় পাবো? মলয়কে যদি কেউ বোঝাতে পারে তবে সে তুমিই।

টেলিফোনে রুকু হঠাৎ চাপা স্বরে বলে, টেবিলের লোকটি এসে গেছে দয়ী। সে আবার আমার বস।

আচ্ছা, ছাড়ছি। কিন্তু একটা কথা বলি, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস! আমি গত তিনদিনে কয়েকবার তোমাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমাদের টু-থ্রি লাইন অফিস টাইমে এত বিজি থাকে যে একদিনও লাইন পাইনি। আজই পেলাম।

আমি বুঝেছি দয়ী। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।

ফোন রেখে রুক্মিণীকুমার তার দূরের টেবিলে গিয়ে বসল।

ভাগ্যক্রমে তার টেবিলটা জানালার ধারেই। কাচের বন্ধ শার্শির ওপাশে অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরতে বহুত ঝামেলা হবে। কলকাতার বৃষ্টি মানেই অনিশ্চয়তা, ভয়। তবু রুকু

আজ অনেকক্ষণ বৃষ্টি দেখল। দেখতে দেখতেই ক্যানটিন থেকে দিয়ে-যাওয়া পনেরো পয়সার চা খেল দু'বার, কলিগদের সঙ্গে খুব ভাসাভাসা অন্যমনস্ক আড্ডা দিল। বৃষ্টি দেখে সবাই পালাচ্ছে সুটসাট করে। রুকু বসে রইল। অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে মরা আলোর দিন, ভেজা, স্যাঁতানো এক শহর। বাইরে যেতে ইচ্ছে করল না।

রুক্মিণী অনেকক্ষণ মলয় আর দয়াময়ীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনটা বার বার অন্য সব দিকে ঘুরে যাচ্ছে। দয়াময়ীর তো আসলে কোনও সমস্যা নেই। তার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বাপের মস্ত কারবার। তার সব সমস্যাই তাই ভাবের ঘরে। তাকে নিয়ে ভাববে কেন রুকু? তবে মলয়ের কাছে একবার সে যাবে। বলবে, তুই না ছিলি পুরো নকশাল! কত লাশ ফেলেছিস! সেই তুই প্রেমের বাজারে হোঁচট খেলে সেটা বড় আফসোস কি বাত।

কতকাল কারও প্রেমে পড়েনি রুকু! সময় পেল কোথায়? হায়ার সেকেন্ডারির পর থেকেই টুইশানি করে পড়তে হত। এখনও অফিসের পর তাকে বাঁধা কোচিং-এ যেতে হয় সপ্তাহে তিনদিন। বড়বাজারে এক চেনা লোকের কাছ থেকে সস্তায় টেরিলিন-টেরিকটন কিনে দোকানে দোকানে বেচে বেড়ানোর একটা পুরোনো ব্যাবসাও আছে তার। সেটা এখন ছোট ভাই দেখছে। আছে জীবনবীমা আর পিয়ারলেসের এজেনসি। আগ্রাসী অভাব রয়েছে রুকুর। তারা তিন ভাই প্রাণপাত করে সংসারটা সামাল দিচ্ছিল। মেজোভাই মাত্র বাইশ বছর বয়সে পাড়ার একটা মেয়েকে হুট করে বিয়ে করে সরে পড়ল। এখন সে আর কুড়ি বছর বয়সের ছোটভাই সংসার চালায়। চার-চারটে আইবুড়ো বোনের কথা ভাবলে রুকু বরাদ্দের বেশি এক কাপও চা খেতে ভরসা পায় না। বাবা বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠাতে পারে না, কিন্তু জমি আঁকড়ে পড়ে আছে।

তবু এইসব রুকুকে বেশি স্পর্শ করে না। জন্মাবধি সে অভাবে মানুষ। ভাগ্যক্রমে তার পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল হত। যে কো-এডুকেশন কলেজে সে পড়ত সেখানে সে একগাদা বড়লোক বন্ধু আর বান্ধবী পেয়ে যায়। মলয় আর দয়ীও তাদের মধ্যে। কিন্তু মনে মনে রুকু জানে ওরা বন্ধু হলেও এক গোত্রের মানুষ নয়।

ভাগ্যই রুকুকে দেখেছে। এই বেসরকারি অফিসে হাজার খানেক টাকা মাইনের চাকরিটাও ভাগ্যই। তবু রুকু কখনও নিশ্চিত বোধ করে না, স্বস্তি পায় না। সে কোনও আশার কথা ভাবে না, স্বপ্ন দেখে না। সে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা হওয়ার কথা ভাবতে ভয় পায়।

তবু প্রেম নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। ভাবতে ভাবতে আজকাল পুরো ব্যাপারটাই ভারী কাল্পনিক বলে মনে হয়। আগের দিনে মানুষের মন এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকতে ভালবাসত। মন বন্ধক দেওয়ার সেই ভাবের ঘরে চুরিকেই মানুষ প্রেম বলে সিলমোহর মেরে দিয়েছিল।

তখনও পাকিস্তান থেকে মা বা ভাইবোনেরা কেউ আসেনি, কুচবিহারে মেজো মাসির বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত রুকু। সেই সময়ে একদিন বৈরাগী দিঘিতে স্নান করতে যাওয়ার সময় লাটিমদের বাড়ি থেকে ওদের বুড়ি ঠাকুমা ডাক দিয়ে বলল, ও ভাই রুক্মিণী, আমার দেয়ালে একটা পেরেক পুঁতে দিয়ে যা। বৈশাখ মাসই হবে সেটা। নতুন একটা বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙাতে গিয়ে বুড়ো মানুষ নাজেহাল হচ্ছে। ক্যালেন্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে রুকুও নাজেহাল হল কম নয়। তবলা ঠোকার ছোটো হাতুড়ি দিয়ে গজালের মতো বড় পেরেক গাঁথা কি সহজ কাজ! হাতুড়ি পিছলে গিয়ে আঙুল থেঁতলে দেয় বার বার। যা হোক, সেটা তো ঘটনা নয়। ঘটনা ঘটল পেরেক পোঁতার ব্যাপারটা জমে ওঠার পর। লাটিমের ছোড়দি তাপসী ঘরে আসার পর। বয়সে তাপসী হয়তো রুকুর চেয়ে বড়ই ছিল, না হলে সমান সমান! মুখশ্রী বা ফিগার কি খুব সুন্দর ছিল তাপসীর? তা রুকু আজ বলতে পারবে না। কিন্তু সেই প্রথম একটা মেয়েকে দেখে তার মনে হল একটা ঢেউ এসে যেন টলিয়ে দিল তাকে! সে ঢেউ সব কার্যকারণকে লুপ্ত করে দেয়, এক অবুঝ আবেগে মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে, বাচাল বা বোবা করে দেয়। হয়তো সেটাই প্রেম। অর্থাৎ

যুক্তিশীল নির্বুদ্ধিতা। তাপসী বলল, এঃ মা, আমার হাতুড়িটা বুঝি গেল শেষ হয়ে। লাজুক রুকু বলল, হাতুড়ির কিছু হয়নি।

মেয়েটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে তার পেরেক ঠোকা দেখল। আর তখন আরও বেশিবার আঙুল থেতলে যেতে লাগল রুকুর।

তাপসী হাসছিল মাঝে মাঝে। বলল, আমাদের বাড়িতে আর বড় হাতুড়ি নেই।

এতেই হবে।— বলল রুকু।

হচ্ছে কোথায়? পেরেকের মাথায় লাগছেই না।

একটু সময় নেবে।

তুমি বুঝি স্নানে যাচ্ছিলে? দেরি হয়ে যাবে না?

আজ ছুটির দিন। দেরি হলে কিছু হবে না।

দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

মা বাবা ভাই বোন।

বোন ক'জন?

চারজন।

সবাই তোমার ছোট? আর ভাই?

সবাই ছোট।

তোমার বয়স কত?

সতেরো হবে বোধহয়।

বোধহয় কেন? ঠিক জানো না?

আমি হিসেব রাখি না।

বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগে না?

আগে লাগত। এখন সয়ে গেছে।

মাসি খুব ভালবাসে বুঝি?

বাসে।

তোমার ডাকনাম তো রুকু, ভাল নাম কী?

রুক্মিণীকুমার।

বেশ নাম তো। এরকম নাম আজকাল শোনা যায় না। বলো তো বঙ্কিমের কোন উপন্যাসে এই নাম আছে?

রাধারানী।

ও বাবা, তুমি তো অনেক পড়েছ! মোটেই গাঁইয়া নও।

পাকিস্তানেও আমরা শহরেই থাকি। গাঁয়ে নয়।

কোন শহর?

ময়মনসিং।

কুচবিহারের মতো এমন ভাল শহর?

এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না, তবে এর চেয়ে অনেক বড়।

আমাদের কুচবিহারের মতো এত ভাল শহর কোথাও নেই, তা জানো? এত নিট অ্যান্ড ক্লিন শহর দেখেছ কখনও?

এইরকম সব কথা হয়েছিল সেদিন। অনেক কথা। খুব কথা বলতে ভালবাসত তাপসী। খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। একই ক্লাসে পড়ত তারা। রুকু জেংকিনস স্কুলে, তাপসী সুনীতি অ্যাকাডেমিতে। স্কুলের সেটা শেষ বছর। তখন উপর্যুপরি ঢেউ আসত। ঢেউয়ে টালমাটাল হয়ে

যেত রুকু। একা শুয়ে যখন ভাবত তখন টের পেত তার বুকের মধ্যে কাঁকড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। তেমনি তীক্ষ্ণ অনুভূতি, জ্বালা। মাঝে মাঝে ধক করে ওঠে বুক আনন্দে। এক-একদিন হোঃ হোঃ খুশির হররায় পাগল হয়ে যায় মাথা।

খুব বেশিদিন নয়। পরিচয় হওয়ার মাত্র দু'মাসের মাথায় একটা ভুখা মিছিল বেরোল শহরে। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট। রাজনীতির নেতারা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ফ্ল্যাগ-হাতে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই মিছিলে। সাগরদিঘির সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। মিছিল থামবে কি এগোবে তা কেউ বলে দেয়নি। সুতরাং মিছিল ধীরে ধীরে এগোল। কী কারণে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল তা কোনওদিনই জানতে পারেনি কেউ সঠিকভাবে। সেই মিছিল এগিয়ে গেলেই বা সরকারের কী ক্ষতি হত? সাগরদিঘির শান্ত, নিরালা রাস্তার ওপর মোট চারজন গুলি খেয়ে মরে গেল। আর কী আশ্চর্য! সেই চারজনের মধ্যে একজন তাপসী।

খবর পেয়ে শহর ভেঙে পড়েছিল সেখানে। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল রুকুও। দেখল, তাপসীর নতুন যৌবনে ফুটে ওঠা একটি স্তন বিদীর্ণ করে পাঁজর ফাটিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। একটা গুলিতে অত বড় ক্ষত হতে পারে তা জানা ছিল না রুকুর। ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

তাপসী কোনওদিন রাজনীতি করেনি, মিছিল-টিছিলেও যায়নি। সেবার জোর করে স্কুল থেকে কয়েকজন বড় মেয়ে তাদের কয়েক জনকে ধরে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাপসী মরে যাওয়ার পর রুকুর কয়েকদিন কাটল মানসিক অন্ধকারে। ভিতরে একটা দিশেহারা নিরালম্ব ভাব। সেটা কি গভীর শোক? নাকি সেই গুলির ক্ষত দেখে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়? আজও ভাবলে হাসি পায়, তাপসীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন সে সন্ধের পর একা থাকতে ভয় পেত। মনে হত, তাপসীর ভূত এসে দেখা দেবে। তবে কী করে সে বলবে যে তাপসীর প্রতি তার ভালবাসা ছিল?

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন বাদে তাপসীর মা এসে একদিন মাসির কাছে বলেছিল, আর তো কিছু মনে হয় না, শুধু ভাবি মেয়েটা মরার সময়ে কত না জানি ব্যথা পাচ্ছিল, হয়তো মা বলে ডেকেছিল কতবার। ওই শেষ সময়টায় ওর কাছে তো কেউ ছিল না, কে জানে তখন তেষ্টা পেয়েছিল কি না, খিদে পেয়েছিল কি না!

শুনে ভারী ছিছিক্কার বেজেছিল রুকুর মনে। কই, সে তো কখনও মায়ের মতো তাপসীর মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভাবেনি! ভাবেনি তো, শেষ সময়ে ওর জলতেষ্টা পেয়েছিল কি না! পিচের রাস্তায় এক ভিড় লোকের মধ্যে, জলজ্যান্ত দিনের আলোয় নিজের রক্তে মেখে এক বুক ক্ষতের যন্ত্রণায় হাঁফাতে হাঁফাতে মৃত্যুর মধ্যে একা ডুবে যেতে কেমন লেগেছিল তাপসীর, তা কখনও অনুভব করার চেষ্টাও করেনি রুকু। না করলে ভালবাসা কী করে হল?

বার বার ঘটনাটা ভাঁজে ভাঁজে খুলে ভেবে দেখেছে রুকু। আজও সন্দেহ রয়ে গেছে, তাপসীকে সে ভালবেসেছিল কি না। মন বলে, বেসেছিল। যুক্তি বলে, না। তাপসী যদি আজও বেঁচে থাকত তবে কী হত? নিশ্চিত বলা যায়, রুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হত না।

কারণ রুকুর বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাপসীর বিয়ের বয়স হয়ে যেত। তাছাড়া, সমানবয়সি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে বাধা আসত। কে জানে হয়তো তাপসীই রাজি হত না। আর যদি অঘটনক্রমে বিয়ে হতই তবে তাপসীকে আজ কেমন লাগত রুকুর? হয়তো ভাল নয়, হয়তো একঘেয়ে, হয়তো মনকষাকষি। এসবই তো হয়। রুকু জানে।

জুডিসিয়াল এনকোয়ারি বসল ল্যান্সডাউন হলে। রোজই সেই শুনানিতে যেত রুকু। বার বার তাপসীর নাম উঠত। রুকুর অল্পবয়সি মন চাইত, কঠোর প্রতিশোধ। কিন্তু সেই তদন্তে কিছুই হল না, কেউ শাস্তি পেল না। পুলিশের বড় অফিসারকে শুধু বদলি করে দেওয়া হল।

রুকুর জীবনে প্রেম বলতে এটুকুই। এটুকুই সে বহুবার ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে, গবেষণা

করেছে। রুকুর স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে কোনও খুঁটিনাটিই সে ভুলে যায় না। আজও তাপসীর সেই সতেরো বছরের চেহারাটা মনে আছে হুবহু। যত কথা হয়েছে তার সঙ্গে সবই প্রায় আজও মুখস্থ আছে রুকুর। আরও দিন গেলে পাছে ভুলে যায় সেই ভয়ে লিখেও রেখেছে একটা পুরনো ডায়েরিতে। মাঝে মাঝে বের করে পড়ে।

বাইরে এখনও অঝোর বৃষ্টি। আবছা হয়ে এল কলকাতা। কিন্তু আর বসে থাকার মানে হয় না। রুকু উঠল।

॥ দয়ী ॥

আর পাঁচজনের যেমন শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক বাবা থাকে, দয়াময়ীর সেরকম নয়। তার বাবা বসন্ত দস্তিদার একসময়ে বাগমারির একচ্ছত্র গুন্ডা ছিল। আজও অনেকে বসন্তবাবুকে বে-খেয়ালে বসনগুন্ডা বলে ফেলে। কিংবা ট্যারা বসন। আটষট্টি-উনসত্তর সাল পর্যন্ত বাগমারি শাসন করেছিল বসন্ত দস্তিদার। তারপর হঠাৎ তার দল ভেঙে সফি আর কালো নামে দুই ভাই আলাদা হয়ে দল করল। দিনরাত দুই পক্ষে বোমবাজি আর লাঠি ছোরা চলত। বসন্ত দস্তিদার টের পেল, শুধু কালো আর সফিই না, নতুন গোঁফ-ওঠা একদল স্কুল-কলেজের ছোকরাও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পুলিশের খাতায় তাদের নাম নেই, কেউ চুরি-ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙার মামলাতেও থাকে না। এরা শুধু শ্রেণিশত্রু খতম করতে চায় এবং তাদের লিস্টে বসন্তেরও নাম আছে।

বসন্তের তখন বয়স হয়েছে, টাকাও হয়েছে। ঝুট-ঝামেলায় না থেকে সে টালিগঞ্জের গলফ ক্লাবে একটা পুরনো বাড়ি কিনে উঠে এল। ভোল পালটে গেল।

বাবার এই পুরো ইতিহাসটাই জানে দয়াময়ী। তার বাবা আজও নিছক ভদ্রলোক নয়। এক সময়ে অসাধারণ সুপুরুষ ছিল, লম্বা জোরালো ফরসা চেহারা। এখন চেহারায় কিছু মেদসঞ্চার হলেও বসন্ত ইচ্ছে করলে চার-পাঁচ জোয়ানের মোকাবিলা করতে পারে। এখনও সঙ্গে রিভলবার থাকে বাবার। মুখ দিয়ে অনর্গল খিস্তি বেরোয়। রেগে গেলে এখনও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। নিজে গুন্ডামি না করলেও এই অঞ্চলেও তার একটা দল তৈরি হয়েছে। তাদের দাপট কম নয়। বসন্তের সঙ্গে পুলিশ-দারোগা, এম-এল-এ, মিনিস্টারদের বেশ খাতির। পাঁচ-সাতখানা ট্যাক্সি, দুটো মিনিবাস আর গোটা দশেক লরি আছে তার। এখন টাকা রোজগার করাই তার একমাত্র নেশা।

দয়াময়ীরা তিন বোন, দুই ভাই। তিন বোন বড়, ভাইয়েরা ছোট। বোনদের মধ্যে দয়াময়ী মেজো। বড় মৃন্ময়ী সেই বাগমারিতে থাকতে বয়োধর্মে বাবার দলের এক ছোকরা মস্তানের সঙ্গে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সাতদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তে তারা ধরা পড়ে, বিনা পাশপোর্টে যশোরে যাওয়ার চেষ্টা করায়। তারা জানত এ দেশে থাকলে বসন্ত গুন্ডার হাত থেকে রেহাই নেই। রেহাই পায়ওনি শেষ পর্যন্ত। বসন্তই সীমান্ত পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়েছিল দু'জনকে। তার কয়েকদিন বাদেই উলটোডিঙির রেললাইনে সেই ছোকরা প্রেমিকের কাটা মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃন্ময়ীর অতীত ইতিহাস চেপে রেখে পরে তার বিয়ে দেওয়া হয় এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়িতে সবই জানাজানি হয়ে যায়। তারা মৃন্ময়ীর ওপর বাইরে থেকে কোনও নির্যাতন করেনি ঠিকই, কিন্তু স্বামী তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

দয়াময়ী জানে, বাবা এখন আর আগের মতো নেই। এখন দয়াময়ী কাউকে বিয়ে করতে চাইলে বাবা আপত্তি করবে না। এখন বসন্ত ছেলেমেয়েদের কোনও ব্যাপারেই বাধা দেয় না। দয়াময়ীরা খুবই স্বাধীন এবং খানিকটা স্বেচ্ছাচারীও। মৃন্ময়ী ছাড়া তারা আর সব ভাইবোনই পড়াশুনো করেছে

ইংরিজি মিডিয়ামের স্কুলে, ভাল কলেজে। তারা চৌকস, চালাক, স্বার্থসচেতন। মৃন্ময়ীর মতো ভুল তারা করবে না।

সেই মৃন্ময়ী এখন দাঁড়িয়ে আছে সাততলার ফ্ল্যাটের উত্তর দিকের ব্যালকনিতে। সদর দরজা খোলা। বাচ্চা চাকরটা স্কুল-ফেরত বাবুনকে খেতে দিচ্ছে ডাইনিং টেবিলে। দয়ী ঘরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখল। একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটের মধ্যে নিজেকে কী করে আঁটিয়ে নেয় মানুষ কে জানে! দয়ী কোনওদিন কারও ঘরকন্না করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাবুন মুখ তুলে হাসল, হাই দয়ী আন্টি।

দয়ী চোখ টিপে বলে, হাই।

মৃন্ময়ীর এলোচুলে শুকনো ঝোড়ো বাতাস লাগছে। ভারী আনমনে তাকিয়ে আছে বাইরে। দয়ী নিঃশব্দে গিয়ে পাশে দাঁড়াল। বলল, কী গরম আজ!

মৃন্ময়ী মুখ ফিরিয়ে হাসল, এই এলি? কখন থেকে তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সাততলায় বড্ড বাতাস। দয়ীর গলা আর বুকের ঘামে বাতাস লাগতেই শিরশির করে উঠল গা। বলল, বিশুকে ফ্রিজ থেকে জল দিতে বল তো।

ঠান্ডা খাস না। আমি মিশিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময়ী চলে গেল।

একবার দিদির দিকে ফিরে তাকায় দয়াময়ী। সবই স্বাভাবিক মৃন্ময়ীর। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, ওর জীবনে কোনও সুখ নেই।

কিংবা সুখের ধারণা হয়তো দয়াময়ীর ভিন্ন রকমের। কার মনে সুখ আছে, কার মনে দুঃখ, তা কে জানে বাবা! তবে মৃন্ময়ী সুখে নেই মনে করে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝে চলে আসে দয়াময়ী। এসে দেখতে পায় এই ফ্ল্যাটের ছিমছাম সংসারে অবধারিত এক জেনারেশন গ্যাপ। তার সঙ্গে মৃন্ময়ীর। মৃন্ময়ীর সঙ্গে তার ছেলে বাবুনের। মৃন্ময়ীর কোনও বোধ, ধারণা, বিশ্বাস বা জ্ঞানগম্যির সঙ্গেই মেলে না দয়াময়ীর। তবু তাদের ভাইবোনদের মধ্যে যদি কারও সঙ্গে কিছু ভালবাসা থেকে থাকে দয়ীর তবে তা আছে এই দিদির সঙ্গেই। মৃন্ময়ী তার চেয়ে বছর পাঁচেক বা তারও বেশি বড়। মাঝখানে আরও দুটো বোন হয়েছিল, বাঁচেনি।

মৃন্ময়ী ঠান্ডা আর সাদা জল খুব নিপুণভাবে মিশিয়ে এনেছে। কষে একটা পোকা দাঁত আছে দয়ীর। খুব ঠান্ডা খেলে চিনচিন ব্যথা করে। এখন সেই ব্যথাটা তেমন হল না। গলা বুক ঠান্ডায় জ্বলে গেল না। অথচ ঠান্ডা হল। খুব ছোট ছোট চুমুকে জলটা খেতে খেতে দয়ী বলে, তুই কী করে যে পারিস!

কী পারি?

বড্ড বাতাস। এত বাতাসে চেঁচিয়ে না বললে কিছু শোনা যায় না। কিন্তু দয়াময়ীর চেঁচাতে ইচ্ছে হল না বলে জবাব দিল না। অদূরের গড়িয়াহাটার দিকে চেয়ে রইল।

মৃন্ময়ী রেলিং দিয়ে ঝুঁকে নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে বলে, কতক্ষণ ধরে তোর গাড়িটা দেখতে পাব বলে দাঁড়িয়ে আছি। কই, দেখতে পেলাম না তো! আজ গাড়ি আনিসনি?

দয়াময়ী তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, ওই তো নীল ফিয়াটটা।

রং করালি বুঝি? আগে তো সবুজ ছিল।

দয়াময়ীর মনটা করুণ হয়ে যায়। মৃন্ময়ী যখন যুবতী তখন বসন গুন্ডার টাকা হয়নি এত। মৃন্ময়ী তাই নিজের গাড়ি চালিয়ে দাবড়ে বেড়ানোর আনন্দ ভোগ করেনি কখনও। যার সঙ্গে বিয়ে হল তার টাকা আছে বটে, ভালবাসা নেই। তবু মৃন্ময়ী কখনও ভাইবোনকে হিংসে করে না; বরং তারা গাড়ি চালায়, বড়লোকের মতো থাকে আর স্বাধীনতা ভোগ করে বলে মৃন্ময়ীর একটু গৌরববোধ আছে।

দয়ী কথার জবাব না দিয়ে বলল, তোর অতিথি কখন আসবে?

বিকেলে।

মুরগি আনিয়ে রেখেছিস?

মাথা নেড়ে মৃন্ময়ী বলে, তোর জামাইবাবু কাল নিউ মার্কেট থেকে এনে রেখেছে। জ্যান্ত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি জ্যান্ত পাখি কাটতে পারি না, বড্ড মায়া হয়। বিশু বলছে সেও পারবে না। তুই কি পারবি?

ভ্রু কুঁচকে দয়ী বলে, পারব না কেন? আমার অত মায়াদয়া নেই। খেতে যখন পারব তখন কাটবার বেলায় কেন ঘোমটা টানা বাবা, চল দেখি কেমন মুরগি।

মৃন্ময়ীর পিছু পিছু রান্নাঘরে আসে দয়াময়ী। ধামাটা খুব সাবধানে ফাঁক করে উঁকি মেরে দ্যাখে। অন্তত গোটা পাঁচেক মুরগিছানা কুক কুক করে ওঠে মুক্তির অপেক্ষায়।

দয়াময়ী ধামা ফেলে ওপরে ভারী নোড়া ফের চাপা দিয়ে বলে, এ বেলা কী রেঁধেছিস বল তো! বড্ড খিদে পেয়েছে।

কেউ খেতে চাইলে মৃন্ময়ী খুশি হয়। উজ্জ্বল মুখে বলে, চল খাবি। ভাল চিংড়ি আছে। গলদা।

বাবুন ডাইনিং টেবিলে নেই। উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে উইকলি টেস্টের জন্য তৈরি হতে। দয়ীকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে মৃন্ময়ী বলে, বাবুনের যে কত পড়া! ছেলেটা নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। আমি বলি একটু বিশ্রাম কর। তা শোনে না।

দয়ী তাকাল। মা ছেলের সম্পর্কটা জানে সে। এ বাড়িতে মৃন্ময়ীর কোনও মতামত নেই, কোনও কর্তৃত্ব নেই। বাবুন কখনও মৃন্ময়ীকে পাত্তা দেয় না।

মৃন্ময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, বাবুন সেই বাবা-ভক্তই হল। আগে ভাবতাম, অন্তত বাবুনটা আমার দিক নেবে। কিন্তু এখন কেমন একটা নতুন হাওয়া এসেছে। বেশির ভাগ বাচ্চা-কাচ্চাই এখন মায়ের চেয়ে বাপের বেশি ভক্ত।

এসব তত্ত্ব জানার ইচ্ছে দয়ীর নেই। তাদের বাড়িতে কেউই তেমন বাপ-ভক্ত নয়। একটু ঠাট্টা করার জন্যই দয়াময়ী হঠাৎ বলল, তুইও কি তাই?

আচমকা মৃন্ময়ীর মুখ থেকে রক্তের রং সরে গেল। কিছুটা স্থির হয়ে গেল সে। কোনও জবাব দিল না।

দয়ী চোখ সরিয়ে নেয়। এই একটা প্রসঙ্গেই মৃন্ময়ীর যত অস্বাভাবিকতা। আজও বাবার সামনে গেলে বা বাবার প্রসঙ্গ উঠলেও মৃন্ময়ী কেমন একরকম হয়ে যায়। মৃন্ময়ীকে যদি কেউ কখনও বলে, তোমার বাবা তোমাকে এই সাততলার বারান্দা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে বলেছে, মৃন্ময়ী ঠিক এমনি সাদা মুখে, শুকনো চোখে একবার চারদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখবে, তারপর নিয়তির নির্দেশে চালিত হওয়ার মতো গিয়ে ঠিক লাফিয়ে পড়বে।

দয়াময়ী গম্ভীর হয়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, বাবাকে তোর এত ভয় কেন বল তো! আমরা তো কেউ ভয় পাই না। ইন ফ্যাক্ট বাবাই আমাদের সমীহ করে চলে।

মৃন্ময়ী জবাব না দিয়ে উঠে গেল। রান্নাঘরে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরে এসে বসল চোরের মতো। খুব চাপা স্বরে ফিসফিস করার মতো বলল, আমি সবাইকে ভয় পাই। তোর জামাইবাবুকে, বাবুনকে, বাবাকেও।

দয়ী দিদির দিকে চেয়ে দেখল। মনটা রাগ আর বিরক্তিতে ভরা। এই মেয়েটার ওপর সবাই এত নির্যাতন করে কেন? বয়সের দোষে বোকা মৃন্ময়ী যখন ছোকরা গুন্ডাটার সঙ্গে পালিয়েছিল তখন থেকেই তার লাগাতার নির্যাতনের শুরু। পালিয়ে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে তারা ভয়ংকর বসন গুন্ডার হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ছায়া দেখেও চমকে উঠত। মরিয়া হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানে। মাফিয়াদের মতোই অমোঘ ট্যারা বসনের দল সেইখানে সীমান্ত পুলিশের হেফাজতে যখন তাদের নাগাল পেল তখনই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়ী। পরে রেল লাইনের ধারে তার

প্রেমিকের কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ তাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ট্যারা বসন। বলেছিল, দেখে রাখ। ভবিষ্যতে মনে রাখিস। সেই লজ্জা আর ভয় ভুলবার আগেই এক চকচকে ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেল মৃন্ময়ীর। যখন পেটে বাবুন এল তখনই একদিন তার স্বামী সরিৎ তার অতীতের সেই লজ্জার কথা জানতে পারে। বসন্ত দস্তিদারের শত্রুর অভাব নেই, তাদেরই কেউ জানিয়েছিল। মৃন্ময়ী ভয়ে লজ্জায় আর-একদফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। যেন কেউ তাকে সম্পূর্ণ ন্যাংটো করে ফ্লাড লাইটের সামনে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিছুই গোপন নেই। লজ্জার সেটাই শেষ নয়। সরিৎ রাগে দুঃখে তার সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, আত্মীয়দের কাছে বলে দিয়েছিল সেইসব কথা। তারপরও মৃন্ময়ী যে পাগল হয়ে যায়নি সেইটেই যথেষ্ট। আজও মৃন্ময়ী এক অস্বাভাবিক অবস্থায় বড় অনাদরের জীবন যাপন করে যাচ্ছে। অবিরল নিরাবরণ অবস্থায় পাদপ্রদীপের আলোয় দর্শকদের সামনে সে দাঁড়িয়ে। আজ আর লজ্জা নেই, তবে এক হীনমন্যতায় ডুবে সে নিজের সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে ক্রমে। বয়ঃসন্ধির সেই বোবা ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, বাবার ভয়ংকর চেহারা আজও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাকে নিরন্তর লজ্জা ও অনাদরের যন্ত্রণা দেয় তার স্বামী আর ছেলে।

মৃন্ময়ীকে এই গহ্বর থেকে কোনওদিনই বোধহয় আর টেনে তোলা যাবে না।

সেই ঘটনাটার কথা সঙ্কোচবশে কখনও দিদিকে জিজ্ঞেস করেনি দয়ী। তখন দয়ী খুব ছোট। দিদিকে ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একটা তালাদেওয়া ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকত সারা দিন। কাঁদত না, গোঙানোর মতো একরকম বোবা শব্দ করত। সারা গায়ে মারের দাগ। চুল ছেঁড়া, ঠোঁট রক্তাক্ত। বিভীষিকার মতো দিন গেছে সেসব।

আজ দয়ী কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বলল, দিদি, একটা কথা বলবি? লাটুকে তুই কেমন বাসতিস?

লাটু! লাটুটা আবার কে?— মৃন্ময়ী ভারী অবাক হয়।

সেই যে। যার সঙ্গে তুই চলে গিয়েছিলি!

মৃন্ময়ীর বিস্মিত মুখ হঠাৎ-স্মৃতিতে সিঁদুরে হয়ে গেল। দিশেহারার মতো চারদিকে একবার তাকাল, বোকার মতো হাসল, শ্বাস ফেলল। তারপর মাথা নিচু করে বলল, খুব তেজি ছিল। বেঁচে থাকলে বাবাকে হয়তো ও-ই জব্দ করত একদিন।

খুব তেজি?

সাংঘাতিক। বিশ বছরও বয়স হবে না, তার মধ্যেই পাঁচ-ছ'টা খুন করেছিল।

তোর খুনিকে পছন্দ হল কেন?

ওই বয়সটাই ওরকম। মনে করতাম, খুনটা খুব বাহাদুরির কাজ।

তাকে খুব ভালবাসতিস?

আমি?

বলে চমকে ওঠে মৃন্ময়ী। ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলে, আমি নয়। ওই তো আমাকে সব বলত। বিয়ে করি চলো, বসনদাকে বলি চলো।

তুই কিছু বলিসনি?

আমি বারণ করতাম। জানি তো, শুনতে পেলে বাবা মেরে ফেলবে।

তারপর?

কিন্তু ও খুব তেজি ছিল। ভীষণ সাহস। বলত, বসনদা রাজি না-হলেও কুছ পরোয়া নেই। চলো, ভাগব। সেই সাহস দেখেই আমি কেমন যেন সাহসী হয়েছিলাম। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু বুঝেছিলাম, বাবার হাত থেকে বাঁচব না। সব জায়গায় বাবার লোক। ও আমাকে কালীঘাটে নিয়ে যায় বিয়ে করবে বলে। বাবা তো ভীষণ বুদ্ধিমান। বাবা ঠিক জানত আমরা কালীঘাটে যাব। সেখানে নারায়ণ

নামে বাবার একজন লোক আমাদের ধরে। ট্যাক্সি করে যখন আমাদের বাগমারি নিয়ে যাচ্ছিল তখন মানিকতলা ব্রিজ পেরিয়ে নির্জন একটা রাস্তায় লাটু নারায়ণদাকে মারল। ট্যাক্সির মধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে তক্কে তক্কে ছিল। কিন্তু নারায়ণদাও তো কম নয়। সেই সময়টা সামনে ঝুঁকে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে রাস্তা চেনাচ্ছিল, লাটু আচমকা পিঠে ছোরা ঢুকিয়ে দিল। আমার কোল ভরে গেল রক্তে। দু'হাতে রক্ত। কী গরম! লাটু একটুও ঘাবড়ায়নি। নারায়ণদার লাশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে সেই ট্যাক্সি করেই আমরা পালাই। একটা বস্তিতে দু'দিন, কসবায় এক রাত্রি, এক বন্ধুর বাড়িতে এক রাত্রি কাটে। স্ট্র্যান্ড রোডে মস্ত মস্ত যেসব কংক্রিটের পাইপ আছে, তার মধ্যেও ভিখিরিদের সঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়েছি। বাবা তখন তুলকালাম করছে আমাদের খোঁজে। লাটু কখনও ভয় পেত না তাতে। তাই খুব সাহস পেতাম। লাটু যেরকম ছিল সেরকমটা এখন দেখি না।

তার মানে তুই লাটুকে ভালবাসতিস দিদি।

না না!

আর্তস্বরে বলে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপরই নিজের গলার স্বরে চমকে ওঠে। চারদিকে চায়।

মৃন্ময়ীর স্বরটা কিছু ওপরে উঠেছিল। কাশ্মীরী কাঠের নকশা করা পারটিশনের ওপাশ থেকে বাবুন মুখ বাড়িয়ে বিরক্ত গলায় বলে, দয়ী আন্টি, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? এনিথিং রং?

নাথিং ডার্লিং!— দয়ী বিস্ময়ের ভান করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, জাস্ট টকিং ওভার সাম ফানি থিংস।

মৃন্ময়ী বাবুনের দিকে চেয়ে ছিল। ভয়ে সম্মোহিত তার দৃষ্টি।

বাবুন টেবিল থেকে একটা চিংড়িমাছ তুলে নিয়ে চলে যায়। দয়ী সামান্য খেয়ে উঠে পড়ে। কাজ আছে।

জওহরলাল নেহরু চিকেন রয়্যাল খেতেন। রান্নাটা কলেজের এক বান্ধবীর কছে শিখেছিল দয়ী। মাঝে মাঝে রাঁধে। পরশুদিন মৃন্ময়ী টেলিফোন করেছিল। তার কোনও এক মাসতুতো না পিসতুতো দেওর বারো বছর ফিলাডেলফিয়ায় থেকে সদ্য এসেছে। মাত্র পাঁচ মাসের ছুটি তার। এর মধ্যেই সে পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিয়ে সেরে বউ নিয়ে আবার ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাবে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে নেমন্তন্ন করে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছে খুব।

মৃন্ময়ী ফোনে বলেছিল, তোর সেই চিকেন রয়্যাল ওকে খাওয়াতে চাই।

দয়ী বলল, ওসব করতে যাবি কেন? বিদেশে ওরা ওসব কত খায়। তুই বরং শুক্তো মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়াস।

মৃন্ময়ী তাতে রাজি নয়। বলল, তা হয় না। তোকে আসতেই হবে। চিকেনও রাঁধতে হবে।

কেন? আমাকে আসতেই হবে কেন?

সব কথার অত খতেন নিস কেন? বলছি আসবি।

মনে মনে হেসেছিল দয়ী। মৃন্ময়ীর দেওরভায়া পাত্রী দেখতে আমেরিকা থেকে এতদূর এসেছে সেটা সে ভুলে যায়নি। তবে দয়ীর একবার পরীক্ষাটা দিতে আপত্তি নেই। যদি লোকটাকে তার পছন্দ হয় এবং তাকেও লোকটার, তবে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে ঘরসংসার করতে দোষ কী? শুনেছে লোকটা সেখানে বহু টাকা রোজগার করে, একটা বাড়ি আর দু'-দুটো গাড়ি আছে। দোষের মধ্যে বয়সটা ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। হিসেবে দয়ীর চেয়ে দশ-এগারো বছরের বড়। তা হোক।

খেয়ে উঠে দয়ী আঁচল কোমরে বেঁধে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে মুরগি কাটতে বসল। সঙ্গে বাবুন। বাইরে থেকে মৃন্ময়ী দরজায় টোকা দিয়ে বলে, এগুলোকে বেশি কষ্ট দিস না দয়ী। টপ করে কেটে ফ্যাল।

একটা মস্ত ভোজালি হাতে বাবুন পাশেই দাঁড়িয়ে খুব তড়পাচ্ছিল, আই অলসো ক্যান ডু ইট আন্টি। গিভ মি ওয়ান।

বাবুন ভুল করে ধামা তুলতেই মুরগির ছানাগুলো কুক-কুক করে ডাকতে ডাকতে উল্টোপাল্টা দৌড় লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু বন্ধ ঘর থেকে পালানোর পথ না পেয়ে দেয়ালে দরজার গ্যাস সিলিন্ডারে ধাক্কা খেয়ে ছটফটিয়ে ঘুরছে, একটাকে ধরে ফেলেছিল দয়ী। মস্ত ধারালো বঁটিতে গলাটা চোখের পলকে ছিন্ন করে দিল সে। টিপে ধরে রইল নলি, যাতে খুব বেশি রক্ত না পড়ে। তবু পড়ল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল সাদা মেঝেয়।

বাবুনের মুখ সাদা হয়ে গেছে দৃশ্যটা দেখে। তবু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে বলল, ইউ আর এ ব্র্যান্ডেড কাটথ্রোট দয়ী আন্টি!

রিয়েলি?— বলে দয়ী ভ্রু তুলে হাসে। তারপর বলে, তুই বোকার মতো ধামাটা হড়াস করে তুলে ফেললি কেন রে? আমি হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে ধরে বের করতাম। নাউ হেলপ মি টু ক্যাচ দেম।

ঝটাপটি করে দু'জনে মিলে আরও পাঁচটা মুরগি ধরল। ভীষণ চেঁচাচ্ছিল মুরগিগুলো। চোখের সামনে বন্ধুদের রক্তমাখা লাশ দেখে কিছু বুঝে নিয়েছিল তারা। ছ' নম্বরটায় সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ছিল। একটা তাকের ওপর উঠে বসেছিল সেটা। বাবুন আলু ছুঁড়ে সেটাকে ওড়াল তো বসল গিয়ে আলোর শেডের ওপর। আলু ছুঁড়তে গিয়ে বালবটা ভাঙল বাবুন। কাচে হাত কাটল দয়ী। ঘেমে চুমে একাকার হল। মুরগিটা কোঁক-কোঁক করে আতঙ্কিত চিৎকারে ঘর ভরে দিল, তারপর প্রাণভয়ে ঘুরতে লাগল চারপাশে।

বাবুন ফ্যাকাসে মুখে বলে, লিভ ইট আন্টি। লেট ইউ গো।

দয়া বলে, লাভ নেই রে বাবুন। আমরা ছেড়ে দিলেও আর কেউ ধরে খাবে। কিপটে বাপের পয়সা নষ্ট করবি কেন? আয় ধরে ফেলি।

ড্যাড ইজ নো মাইজার।— বাবুন বলে।

হি ইজ।

বলে একটা জলচৌকির ওপর উঠে খুব সাবধানে কাপপ্লেটের র‍্যাকের ওপর বসে থাকা মুরগিটার দিকে হাত বাড়ায় দয়ী।

পিছন থেকে বাবুন মৃদু স্বরে বলে, ইউ হ্যাভ এ নাইস ফিগার আন্টি। থার্টি সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স।

হাসতে গিয়ে মুরগিটা উড়ে পালাল। দয়ী বলে, খুব পাকা হয়েছিস বাবুন। স্কুলে এসব শেখাচ্ছে বুঝি!

সিওর। উই ইভন ডেট দি গার্লস।

মাই গড!

মুরগিটা গ্যাস সিলিন্ডারের পিছনে লুকোতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ল। নড়তে পারল না। দয়ী হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে আনল সেটাকে। বলল, আমরা যখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তাম তখন এত পাকা ছিলাম না।

আই নো ইউ হ্যাড এ বানচ অফ লাভারস।

মারব থাপ্পড়।— বলে হাসিমুখেই দয়ী মুরগিটার গলা নামিয়ে দিল।

কাট থ্রোট।— বাবুন বলে।

দরজায় টোকা দিয়ে মৃন্ময়ী সভয়ে বলে, কী করছিস তোরা ভিতরে? কী ভাঙলি ও বাবুন? মুরগিগুলো অমন চেঁচাচ্ছিল কেন রে? আমি বাথরুমে পর্যন্ত থাকতে পারছিলাম না চেঁচানিতে।

বাবুন মৃদুস্বরে বলে, শি ইজ এ মেন্টাল কেস।

দয়ী বলে, ওরকম বলতে নেই বাবুন।

শি হ্যাড অলসো এ লাভার ইউ নো। এ ব্যাড গাই।

দয়ী স্তম্ভিত হয়ে যায়। জামাইবাবু কি ছেলের কাছেও মৃন্ময়ীর অতীত ঘটনা খুলে বলেছে! লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে। কঠিন চোখে বাবুনের দিকে চেয়ে বলে, হু টোল্ড ইউ?

বাবুন চাউনি দেখে একটু ভয় পেয়ে অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলে, আই নো। এভরিওয়ান নোজ।

দয়ী বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে বলল, আয় দিদি, হয়ে গেছে।

মৃন্ময়ী দরজার কাছ থেকেই দৃশ্যটা দেখে শিঁউরে ওঠে। ভাঙা ডানা, ছেঁড়া পালক, রক্ত মাখামাখি। ছ'টা বিচ্ছিন্ন মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে একধারে, অন্য ধারে স্তূপাকার মুরগির শবদেহ। মৃন্ময়ী বলল, আহা রে! কষ্ট দিসনি তো ওগুলোকে দয়ী?

কষ্ট কী? মরে বেঁচেছে।

বাবুন তার ছুরি বন্ধ করে পড়ার টেবিলে ফিরে গেছে।

দয়ী মুরগির পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, বাবুনটাকে তোরা কি শাসন করিস না দিদি? ও কীসব যেন বলছিল!

মৃন্ময়ী তার ভেজা এলোচুলে গামছার ঝটকা দিচ্ছিল দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে। থেমে গিয়ে বলল, কী বলছিল?

তোর লাভারের কথা।

মৃন্ময়ী উদাস মুখে বলে, সবাই বলে, ও-ই বা বলবে না কেন?

দয়াময়ী মুখ তুলে কঠিন স্বরে বলে, না, বলবে না। বললে ওর মুখ থেঁতো করে দিবি। তোর ভয় কীসের?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, পেটে ধরলে তো হয় না, বাবুন তো আমার নয়। ওর বাবার।

দয়ী কথা বাড়ায় না। অনেক কাজ।

বিকেল হয়ে আসতে না আসতেই মৃন্ময়ী তাড়া দেয়, রান্না তাড়াতাড়ি শেষ কর। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আয়। আমি শাড়ি বের করে রেখেছি।

আমি সাজব না দিদি। রান্না করতে ডেকেছিলি, করে দিয়ে গেলাম।

শুধু তাই বুঝি? বোকা কোথাকার!— মৃন্ময়ী খুব ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, কত ভাল ছেলে জানিস না তো! এরকম আর কপালে জুটবে না।

জুটে দরকার নেই।

বলে বটে দয়ী, আবার সাজেও।

বেলা থাকতেই সরিৎ অফিস থেকে ফিরল। মোটা-সোটা নাড়ুগোপালের মতো চেহারা, কিন্তু কঠিন এক বোকা ব্যক্তিত্ব। দেখলেই মনে হয় এ লোকটা তেমন বুদ্ধিমান নয়, তবে জেদি এবং গোঁয়ার। সব সময়ে মুখে একটা অহংকারী গম্ভীর ভাব। হাসি ঠাট্টা করে না, গল্প জমাতে বা আড্ডা মারতে ভালবাসে না, গান গায় না, বই পড়ে না। তার সব মনোযোগ ছেলের ওপর। অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধোয়ার আগেই ছেলের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে, সেদিনকার স্কুলের পড়া দ্যাখে। বিকেল হলে ছেলেকে খেলতে নিয়ে যায় পার্কে। রাত্রিবেলা ফের ছেলেকে পড়াতে বসে। এ জীবনে আর কোনও আনন্দ বা অবকাশের তোয়াক্কা করে না। মৃন্ময়ীর সঙ্গে কদাচিৎ কেউ তাকে কথা বলতে শুনেছে। তবে এও সত্য যে, মৃন্ময়ী সম্পর্কে নোংরা কৌতূহলেরও তার অভাব নেই। এখনও সে মৃন্ময়ী সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়, অতীতের আরও কোনও গুপ্ত ইতিহাস আছে কি না জানার চেষ্টা করে। লোকটাকে আদপেই পছন্দ করে না দয়ী।

সরিৎ ঘরে ঢুকে তোম্বা মুখ করে অবজ্ঞার চোখে একবার দয়ীকে দেখে বলে, কখন এলে?

দয়ী বলল, অনেকক্ষণ।
ভাল।— বলে সরিৎ শোওয়ার ঘরে চলে গেল।
সরিতের চলে যাওয়ার দিকে একরকম ঘৃণা ও আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইল দয়ী।

॥ সরিৎ ॥

বাবুন আজকাল স্কুলের সাপ্তাহিক পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করছে। খাতায় কোনওখানে একটুও দাগ পড়ে না। তার স্কুলটি খুবই ভাল, কলকাতার একেবারে শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির একটি। সেখানে ছেলে ভর্তি করতে লোককে মাথা কুটতে হয়। সেখানকার বেশির ভাগ ছেলেই ব্রিলিয়ান্ট। তাদের মধ্যেও বাবুন আলাদা রকমের ব্রিলিয়ান্ট। স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার দিকে বিশেষ নজর রাখছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সে কোনও দারুণ ঘটনা ঘটাতে পারে।

সরিৎ খুব মন দিয়ে বাবুনের স্কুলের খাতাপত্র দেখল। দু'-একটা প্রশ্ন করল। ছেলের সঙ্গে সে কখনও বাংলায় কথা বলে না। বাপ আর ছেলে কেবল ইংরিজিতেই বাক্যালাপ করে। তাতে অভ্যাস ভাল থাকে। তা বলে বাবুন বাংলায় কাঁচা নয়। খাতা দেখে গভীর তৃপ্তির একটা শ্বাস ফেলে বাবুনের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল। তখন বাবুন আস্তে করে ইংরিজিতে বলল, আজ মা কাঁদছিল দয়ী আন্টির কাছে।

সরিৎ খুব নিচু গম্ভীব গলায় বলল, কেন?

ঠিক শুনতে পাইনি। বোধহয় বলছিল সবাইকে সে ভয় পায়।

সেটাই পাওয়া উচিত।

দয়ী আন্টি মায়ের পক্ষে।

আমি জানি।

আন্টি বলছিল আমাকে নাকি মারা উচিত।

সাহস থাকে তো মারুক না। বাড়ি থেকে দু'জনকেই বের করে দেব।

সরিৎ রাগে ফুঁসে ওঠে। সমস্ত শরীর জ্বলে যায় তার। এত সাহস কোত্থেকে পায় এরা? এরা তো কোনও দিক দিয়েই তার বা বাবুনের সমকক্ষ নয়। মার্কামারা গুন্ডার মেয়ে। একটা এক মস্তানের সঙ্গে ভেগেছিল, অন্যটা পুরুষ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। দয়ীর ইতিহাস বেশ কিছুটা জানে সরিৎ। ওদের পাড়ার একটা ছেলে সরিতের ডিপার্টমেন্টে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। মাঝে মাঝে সে অনেক খবর দেয়। আগে ভয়ে মুখ খুলত না। কিন্তু তার ভয় ভেঙে দিয়ে মুখ খুলিয়েছে সরিৎই।

গা গরম হয়ে আছে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, তার ওপর রাগ। সরিৎ বাথরুমে আজ অনেকক্ষণ শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করল। স্নান করতে করতেই ক্ষীণ কলিং বেলের আওয়াজ পেল। বিনয় এল বুঝি!

দয়ীকে আজ এ বাড়িতে ডেকে পাঠানোর মূলে যে একটা ষড়যন্ত্র আছে তা সরিৎ আন্দাজ করেছে। পরশু মৃন্ময়ী যখন টেলিফোন করছিল দয়ীকে তখন বাবুন সবটা শোনে এবং পরে বাবাকে বলে দেয়।

তখনই সরিৎ বলেছিল, চিকেন রয়্যাল মাই ফুট। দে হ্যাভ আদার মোটিভস।

এমনকী বিনয়কে নেমন্তন্ন করার ইচ্ছেও সরিতের ছিল না। সে সামাজিক ভদ্রতা সৌজন্যর ধার ধারে না। বরং বাইরের কোনও লোক বাড়িতে এলে সে বিরক্তি আর অস্বস্তি বোধ করে। সে চায় সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে থাকতে। এই উটকো ঝামেলা জুটিয়েছে মৃন্ময়ী। একদিন বলল, বিনয়কে আমাদেরও নেমন্তন্ন করা উচিত। প্রেস্টিজের ব্যাপার।

মৃন্ময়ী সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। তবে আকাশ বাতাসকে উদ্দেশ করে যা বলার বলে।

শুনে প্রথমে পাত্তা দেয়নি সরিৎ। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, মৃন্ময়ী কিছু অন্যায় বলেনি। বিনয় মৃন্ময়ীর জন্য দামি সিনথেটিক শাড়ি আর সেন্ট এনেছে আমেরিকা থেকে, বাবুনকে ভিউ মাস্টার আর সরিৎকে স্যুটের কাপড় দিয়েছে। বিনয় তার পিসতুতো ভাই হলেও তাদের পরিবারেরই মানুষ। পিসিমা ছেলে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা, বাবা তাকে নিজের পরিবারে এনে রাখেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতাবশে বিনয় এটুকু দিতেও পারে। কিন্তু সরিৎ আর একটা কথাও ভেবেছে। তার ইচ্ছে স্কুলের পড়া শেষ করেই বাবুনকে বিদেশ পাঠিয়ে দেবে। বিনয়ের সঙ্গে একটা এ ধরনের কথাও হয়েছে। সুতরাং বিনয়কে একদিন নেমন্তন্ন খাওয়ালে মন্দ হয় না। বাবুন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও কিছুর ওপর তার তেমন আকর্ষণ নেই। তার যা কিছু স্বার্থ তা বাবুনকে ঘিরে। বাবুনের জন্য সে সব কিছু করতে পারে।

আর একটুক্ষণ জলের ধারার নীচে দাঁড়ালে ভাল লাগত। কিন্তু দেরি করতে মন সরল না। ওদিকে এতক্ষণে বিনয়ের সঙ্গে দয়ীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই মৃন্ময়ী। কিছু বলা যায় না, এলেমদার মেয়ে দয়ী হয়তো প্রথম দর্শনটাই কাজে লাগিয়ে দেবে। ব্যাপারটায় বাধা দেওয়া খুব জরুরি। মৃন্ময়ীর বাড়ি থেকে কোনও মেয়েই আর তাদের বাড়ির বউ করে আনা ঠিক নয়।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে সরিৎ বাইরের ঘরে এসে একটু অবাক হয়। বিনয় সোফায় বসে কেবল মৃন্ময়ীর সঙ্গে কথা বলছে। দয়ী কাছে-পিঠে নেই।

বিনয় তার বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমি তো এমনিতে স্মোক করো না। এটা একটা খেয়ে দেখবে নাকি? নরম টোব্যাকো।

খুব শখ হলে এক আধটা কখনও-কখনও খায় সরিৎ। তবে ধোঁয়াটা কখনও গেলে না। তাছাড়া ছেলের সামনে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে তার ভারী সঙ্কোচ। তবু আজ একটা ধরাল। বলল, পাত্রী পছন্দ করেছিস?

কই পাত্রী? কত দেখলাম।

একজনও পাশমার্ক পেল না?

খুঁজে দাও না। আমার তো বেশি সময়ও নেই।

মৃন্ময়ী সরিতের সামনে খুবই অপ্রতিভভাবে বসে ছিল। হঠাৎ বলল, পাত্রী ঠিক পাবে। চিন্তা কোরো না।

হাতে আছে নাকি?— বিনয় জিজ্ঞেস করে। তারপর বলে, রোজ দু'-দশটা করে চুল পেকে উঠছে। থাকলে আর বেশি দেরি কোরো না বউদি। এটাই ইন্ডিয়ান মেয়েদের শেষ চান্স। এখানে পছন্দমতো না পেলে ফিরে গিয়ে একজন আমেরিকানকেই বিয়ে করব।

না না!— খুব সিরিয়াস গলায় প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপর সরল মনে বলে দেয়, আমার মেজো বোনকে দেখে যাও। খারাপ লাগবে না।

কই সে?— জিজ্ঞেস করে বিনয়।

আছে। আজ ওর হাতেব রান্নাই তো খাবে।

বিনয় অবাক হয় না। বোধহয় নিমন্ত্রণের ছলে এরকম আরও বেশ কয়েকবার তাকে পাত্রী দেখতে হয়েছে। দুটো পা সামনে টান করে মেলে দিয়ে পিছনে হেলে বসে বলে, যাক বাবা বাঁচা গেল। তোমার বোন তো, সে নিশ্চয়ই তোমার মতো ভাল স্বভাবের হবে। না দেখেই ফিফটি পারসেন্ট পছন্দ করছি। এবার ডাকো।

চা নিয়ে আসছে। এই দয়ী।— বলে ডাক দিয়ে উঠে যায় মৃন্ময়ী।

বিশ-বাইশ বছর বয়সে অনেক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে প্রথম জার্মানিতে গিয়েছিল বিনয়।

দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ শিখেছে সেখানে। তারপর সুযোগ বুঝে চলে গেছে আমেরিকায়। সাত ঘাটের জল খেয়ে এখন সে প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত। মেদহীন রুক্ষ চেহারা, চালচলনে খুব চটপটে, প্রচণ্ড সময়নিষ্ঠ, সরল ও সৎ। জীবনে কোনও কাজে ফাঁকি দেয়নি বিনয়। মস্ত কোনও ডিগ্রি নেই, কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করার মহার্ঘ্যতম অভিজ্ঞতা আছে। সরিৎ নিজে ইঞ্জিনিয়ার, সে অভিজ্ঞতার মূল্য বোঝে। সাহেবরা আরও বোঝে। এই খাঁটি ছেলেটির গলার দয়ীকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলা এমনিতেই সহজে ফুরোতে চায় না, তার ওপর সাততলায় যেন আরও কিছুক্ষণ আলোর রেশ থেকে যায়। সাড়ে ছ'টা বেজে যাওয়ার পরও ঘরের আলো জ্বালাবার তেমন দরকার পড়ছে না। কিন্তু মৃন্ময়ী আলো জ্বালল। দপদপ করে লাফিয়ে জ্বলে ওঠে দু'-দুটো স্টিক লাইট আর একটা একশো পাওয়ারের বালব।

অপ্রতিভ হাসিমুখে মৃন্ময়ী বলে, এই আমার বোন দয়াময়ী।

ট্রে হাতে দয়াময়ী এগিয়ে আসে লঘু পায়ে। খুব যে সেজেছে তা নয়। চালাক মেয়ে, সাজতে জানে। হালকার ওপর প্রসাধনের সামান্যতম প্রলেপ দিয়েছে মাত্র। পরনে তাঁদের সাদা খোলের শাড়ি। কিন্তু শাড়িটার নকশাওয়ালা পাড় এতই চওড়া যে জমি প্রায় ছাড়ই পায়নি। তাছাড়া আছে সুন্দর মস্ত মস্ত বুটির কাজ। ব্লাউজটা খুবই তুচ্ছ একটা ন্যাকড়া মাত্র। এত ছড়িয়ে কাটা যে পুরো কাঁধ, পিঠ এবং স্তনের ঢেউ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। আদুড় রয়েছে পেটের অনেকটা অংশ। দেখে চোখ সরিয়ে নেয় সরিৎ। সিগারেটে মৃদু টান দেয় এবং আনাড়ির মতো ধোঁয়া ছাড়ে।

দয়াময়ীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল বিনয়। দু'হাত জড়ো করে খুব গভীর আন্তরিকতায় ভরা নমস্কার জানিয়ে বলে, ভারী খুশি হলাম পরিচয় হয়ে।

দয়ী খুব চমৎকার একটা স্মার্ট হাসি হেসে বলে, ওটা তো গ্ল্যাড টু মিট ইউ-এর অনুবাদ। আমাকে দেখে খুশি হওয়ার কিচ্ছু নেই। আমি একদম খারাপ। জামাইবাবুর কাছে হয়তো আমার অনেক নিন্দা শুনবেন।

কথাটা বলে একঝলক তাকায় দয়ী। সেই দৃষ্টিটা বুলেটের মতো লাগে সরিতের বুকে। এটা কি দয়ীর খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ? খুবই চালাক মেয়ে। মৃন্ময়ীর মতো বোকা আর সরল নয়। ও আঁচ করে নিয়েছে, জামাইবাবু এ বিয়ে আটকানোর চেষ্টা করবে।

বিনয় মৃদু হাসছিল। বলল, বুধোদার মুখে বড় একটা নিন্দে শুনিনি কারও। তাছাড়া আপনি তো অনিন্দ্য।

সরিতের ভিতরে মৃদু দহন শুরু হয়। খুব ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। খুব আনাড়ির মতো আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে করেই বলে, আমিও তাই বলি। ওর নিন্দে করবে কে? দয়ীর কত অ্যাডমায়ারার!

বিনয় হাসিমুখে দয়ীকে বলে, আপনার অ্যাডমায়ারারদের লিস্টে আজ থেকে আমাকেও ধরে রাখুন।

সরিৎ চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্ট্যাটিজিটা ভেবে নিল। তারপর আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল, দয়ীর অ্যাডমায়ারারদের মধ্যে হাজার রকমের ভ্যারাইটিও আছে। প্রায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্র, অধ্যাপক, রাজনীতির মস্তান, পাড়ার গুন্ডা, বুড়ো কামুক, কে নয়? ও প্রায় কাউকেই হতাশ করে না।

বলে কথাটার প্রতিক্রিয়া দয়ীর মুখে খুঁজে দ্যাখে সরিৎ। দয়ী তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাতে ভয় নেই, অপ্রতিভতা নেই, আছে ভীষণ রকমের একটা ঘেন্না। সরিৎ আপনমনে হাসল। খুশি হল সে। এরকমটাই সে চায়।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তির হাওয়া বইছে। বিনয় যতদূর সম্ভব নির্বিকার মুখে আস্তে করে বলে, বাবুনকে দেখছি না।

ডাইনিং টেবিলের পাশে কাঠের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী। প্রবল হতাশায় নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতে কামড়ে ধরছে মাঝে মাঝে। সে আজকাল রাগ করতে ভয় পায়। তার আছে কেবল হতাশা।

দয়ী সবশেষে নিজের কাপে চা ছেঁকে নিচ্ছিল মাথা নিচু করে। বিনয়ের কথার জবাবে বলল, বাবুন বোধ হয় ছাদে। দাঁড়ান, ডেকে আনছি।

তার দরকার কী? খেলছে খেলুক। চলুন বরং আমরাই একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি। গরমে বসতে ইচ্ছে করছে না এখানে।— বলে বিনয় একটু নড়ে বসে।

এই কথায় সরিৎ নিজের ভিতরে একটা পরাজয় টের পায়। ওরা ছাদে যাবে? তার মানে তো অনেকখানি। সে একবার দয়ীর দিকে তাকায়। দয়ীও ঠোঁটে ধরে থাকা পেয়ালার কানার ওপর দিয়ে একঝলক তাকায় সরিতের দিকে। সেই চোখে জয়ের ঝিকিমিকি।

যেন কিছুই ঘটেনি এমন শান্তস্বরে সরিৎ বলল, দয়ী, তোমার সেই অ্যাডমায়ারারটির কী যেন নাম! মলয় না? ওঃ বিনয়, সে ছেলেটা দয়ীর জন্য যা পাগল না! যে কাউকে খুন করতে পারে ছোকরা। ছেলেটা কিলার টাইপেরই। নকশাল ছিল। ছোকরার দোষও নেই। দয়ীর সঙ্গে নাকি ডাকবাংলো-টাংলোয় রাত-টাতও কাটিয়েছে। কাজেই এখন তার অধিকারবোধ জন্মেছে।

সিনেমা থিয়েটারে যেমন ফ্রিজ শট বা দৃশ্যের চলন হয়েছে আজকাল, সরিৎ লক্ষ করল, ঘরের তিনটে প্রাণী তেমনি নিথর শিলীভূত হয়ে গেল।

সেই অনড় দৃশ্যের মধ্যে প্রথম নড়ল বিনয়। আস্তে করে বলল, বুধোদা ইউ শুড নট...

কথাটা শেষ করল না বিনয়। সরিৎ আর একটা সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, আমি জাস্ট সিচুয়েশনটা জানিয়ে রাখছি। আমি কিছু ভুল বলিনি তো দয়ী?— বলে সরিৎ দয়ীর দিকে তাকায়।

দয়ীর হাত সামান্য কাঁপছে। চলকাচ্ছে কাপের চা। বুদ্ধিমতী দয়ী কাপটা রেখে দিল টি-পয়ে।

তারপরই হঠাৎ হাসিমুখ তুলে বিনয়কে বলল, ছাদে যাওয়ার কথা ছিল যে! যাবেন না?

বিনয় খেয়ে-পেয়ে উঠে পড়ে। বলে, নিশ্চয়ই।

দয়ী চিমটি কাটা হাসি হেসে বলে, এ ঘরটা বড্ডই গরম।

দু'জনে প্রায় ঘরবন্দি পাখির মতো হঠাৎ একটু ফোকর পেয়ে প্রাণপণ পাখা ঝাপটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সরিৎ জানে, আজ রাতে দয়ী কাঁদবে। মেয়েরা অপমানিত হলে কাঁদে, দোষ ধরা পড়লে কাঁদে। ও কাঁদবে।

সরিৎ তৃপ্ত মনে চায়ের তলানি শেষ করে পট থেকে আরও এক কাপ ঢেলে নেয়। চা-টা এবার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু লিকার আরও গাঢ়, চনমনে।

ঘরে যে আর কেউ আছে তা গ্রাহ্যই করেনি সে। কিন্তু না থেকেও মৃন্ময়ী আজ ছিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বলল, দয়ীর অত খবর তুমি জানলে কী করে?

সরিৎ তার স্ত্রীর দিকে পারতপক্ষে তাকায় না। তার সামনেই বিশাল দেওয়ালজোড়া দরজাটা খোলা। বাইরে আকাশে তখনও খানিকটা পাঁশুটে আলো। সে তাই দেখছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, প্রমাণ আছে।

মৃন্ময়ী অবাক হয়ে বলে, কীসের প্রমাণ? দয়ী আমার মতো নয়।

তোমরা সবাই সমান। এখন বেশি কথা বোলো না, আমার ভাল লাগছে না।

মৃন্ময়ী হয়তো ভয় পেল, তবু আজ ছাড়ল না। দয়ীর পরিত্যক্ত সোফায় বসে বলে, বিয়েটা তো ভেঙেই দিলে, তাহলে আর বলতে দোষ কী?

সরিৎ বহুকাল বাদে মৃন্ময়ীর দিকে একবার তাকায়। পরমুহূর্তেই ফিরিয়ে নেয় চোখ। আজকাল তার কী যে হয়েছে, কারো চোখেই দু' দণ্ড চোখ রাখতে পারে না। আপনা থেকেই চোখ ফিরে

আসে। সরিৎ অন্যদিকে তাকিয়ে টবের মানিপ্ল্যান্ট দেখতে দেখতে বলে, মলয়ের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে এসেছে।

মৃন্ময়ী বলল, কী করে এল?

তাতে তোমার দরকার কী? এসেছে যেভাবেই হোক।

মৃন্ময়ী একটুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, মলয়কে আমি চিনি। দয়ীর বন্ধু। আজকাল বন্ধুদের মধ্যে ওসব হয় না।

সবই হয়।

চিঠিটা আমাকে দেখাবে?

সরিতের এবার বুঝি একটু লজ্জা করে। বলে, দেখার কিছু নেই। যা বলেছি তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারো।

মৃন্ময়ী খুব নিবিড় চোখে লক্ষ করছে সরিৎকে। বলে, অবিশ্বাস করিনি। শুধু দেখতে চাইছি। একটা কারণ আছে।

কী কারণ?

ক'দিন আগে বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বাবুন সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। তখন পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করে পড়ছিল দেখেছি। আমি কিছু বুঝতে পারিনি তখন। মলয়ের চিঠি কি বাবুনই তোমাকে এনে দিয়েছে?

সরিৎ আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এবার তাকাতেই পারল না। তবে গলায় প্রচণ্ড ঝাঁঝ তুলে বলল, দিলে কী করবে? মারবে?

তা কেন? বাবুনকে মারব সে সাধ্যি কি আমার আছে?

সাধ্যি না থাকাই মঙ্গল। দয়ীকেও সেটা বুঝিয়ে দিয়ো। ও নাকি আজ বাবুনকে মারার কথা তোমাকে বলছিল। ওকে বলে দিও ওর বাপ যত বড় গুন্ডাই হোক আমার বাবুনের গায়ে যদি কেউ হাত তোলে তার হাতখানা আমি কেটে দেব।

মৃন্ময়ী খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এ কথার কোনও জবাব দিল না। সরিতের হঠাৎ চাগিয়ে-ওঠা রাগটা পড়ে যাওয়ার জন্য সময় দিল। তারপর বলল, বাবুনকে কেউ মারবে না। এখন বলো তো, চিঠিটা কি বাবুন তোমাকে চুরি করে এনে দিয়েছিল?

চুরি করতে যাবে কেন? সাম হাউ অর আদার চিঠিটা ওর হাতে এসে গিয়েছিল, ও পকেটে করে নিয়ে এসে আমাকে দেয়।

অন্যের চিঠি জেনেও সেটা আনা কি বাবুনের উচিত হয়েছে?

সে বিচার আমি করব। বাবুন কিছু অন্যায় করেনি। চিঠিটা সে আমার হাতেই এনে দিয়েছে।

তা হোক, তবু সেটা অন্যায়। তুমিই বা দয়ীর চিঠি পড়তে গেলে কেন? কেন বাবুনকে শাসন করলে না?

সরিৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে, দয়ী যা করে বেড়াচ্ছে সেটা বেশি অন্যায়, না চিঠি পড়াটা বেশি অন্যায়? এই বাজে ক্যারেকটারের মেয়েটাকে আমার ভাইয়ের গলায় ঝোলাতে চাইছ, সেটাও কি অন্যায় নয়?

সরিতের চিৎকারে মৃন্ময়ী মিইয়ে গেল। সরিৎ লাল হয়ে যাচ্ছে রাগে, ঠোঁটে ফেনা জমছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মৃন্ময়ী। তারপর আস্তে করেই বলল, দয়ীর কথা নাই বা ভাবলে। ও খারাপ ভাল যাই হোক, তোমার বা বাবুনের দিকটা তো ভাববে! ও কেন চিঠিটা পড়ল? কত বাজে কথা থাকে প্রেম ভালবাসার চিঠিতে! ও সেগুলো পড়েছে ভাবতেই যে গা ঘিনঘিন করে।

সরিতের একটু লজ্জা করছিল। ভিতরে বেলুন চোপসানোর মতো একটা ক্লান্তিকর হতাশা। এদিকটা সে কখনও ভেবে দ্যাখেনি। চিঠিটা পেয়ে একটা মস্ত যুদ্ধাস্ত্র পেয়ে যাওয়ার আনন্দে সরিৎ সেটা নিয়ে সোজা এক ফোটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ছ'খানা ফোটোটাস্ট কপি করায়। চিঠিখানা সযত্নে রেখে দেয় স্টিলের আলমারিতে। ইচ্ছে ছিল দয়ী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে এগুলোকে সে কাজে লাগাবে।

সরিৎ কোনও জবাব দিল না দেখে মৃন্ময়ী বলে, তুমিও কাজটা পুরুষের মতো করোনি।

সরিৎ ধমকে উঠল না বটে কিন্তু বিষ মেশানো শ্লেষের হাসি হেসে বলল, তাই নাকি? তোমাদের রক্তে যে দোষ রয়েছে সেটা বললেই বুঝি পুরুষত্বের অপমান হবে?

মৃন্ময়ী আর কথা বলল না, উঠে চলে গেল।

বাইরে অন্ধকার ঘনাল। ঘরটা হয়ে উঠল আরও উজ্জ্বল। সরিৎ বিনয়ের রেখে-যাওয়া প্যাকেট থেকে অনভ্যাসের হাতে আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। ছাদে ওরা কী করছে?— ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে সরিৎ।

॥ মলয় ॥

যেখানেই কিম্ভূত মোটর-সাইকেলটা দাঁড় করায় মলয় সেইখানেই লোকের ভিড় জমে যায়। এত বিশাল চেহারা আর জটিল যন্ত্রপাতিওলা মোটর-সাইকেল কলকাতার লোক খুব বেশি দেখেনি।

হরিয়ানার এক সম্পন্ন চাষি-ঘরের ছেলে এই যন্তরটা কিনে এনেছিল আমেরিকা থেকে। তাদের জমিতে একর প্রতি যে গমের ফলন হয় তা নাকি বিশ্বরেকর্ড। সেই সূত্রেই সে সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় বছরভোর। অফিসের কাজে দিল্লিতে গিয়ে ছোকরার সঙ্গে এক হোটেলে ভাব জমে গেল মলয়ের। কথায় কথায় ছোকরা জানাল, সে আর কয়েক দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চাষিদের গমের চাষ শেখাতে যাচ্ছে। অনেকদিনের প্রোগ্রাম। কাজেই মোটর-সাইকেলটা তার কোনও কাজে লাগবে না এখন। তার ইচ্ছে আরও আধুনিক, আরও বেশি শক্তির একটা যন্ত্র কেনা। শুনে মলয় তক্ষুনি রফা করে ফেলল। ট্র্যাভেলারস চেক ভাঙিয়ে কিনে ফেলল বিকট যানটা। আনকোরা নতুন জিনিস নয়, তা ছাড়া হরিয়ানার চাষি ছোকরা জোরে চালাতে গিয়ে বারকয়েক অ্যাকসিডেন্ট করায় মোটর-সাইকেলটা তুবড়ে-তাবড়েও গেছে অনেকটা। তবু এই জাহাজের মতো বিশাল যন্ত্রযানটির এখনও যা আছে তা তাক ধরিয়ে দেওয়ার মতো।

অফিসটা মলয়ের নিজের। তার বাবার মস্ত একটা রঙের কারবার আছে। অঢেল পয়সা। মলয়দের সাত ভাইয়ের মধ্যে চার ভাই বাবার ব্যাবসায় খাটছে। বাকি তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন রেলের ডাক্তার, মলয় হচ্ছে ছ' নম্বর। পরের ভাই সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। বাবার ব্যাবসাকে মলয় বরাবর বলে, এ রং বিজনেস। কলেজে পড়ার সময় নকশাল রাজনীতিতে মেতে যাওয়ার ফলে মলয়ের লেখাপড়া খুব বেশি দূর এগোয়নি। বি এসসির শেষ বছরে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয়। পড়ে পরীক্ষা দিলে একটা দারুণ রেজাল্ট করতে পারত। পড়াশুনোর মতো তাদের আন্দোলনটাও হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়। তখন মলয়ের হাতে অনেক রক্তের দাগ এবং ভিতরে অতৃপ্ত ফোঁসফোঁসানি। পিছনে পুলিশ এবং প্রতিপক্ষের নজর ঘুরে বেড়ায় সব সময়। তাই কিছুদিন একদম একা চুপচাপ নিজেদের খিদিরপুরের বাড়ির চিলেকোঠায় অন্তরীণ হয়ে রইল সে। তারপর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সার এবং কীটনাশকের ব্যাবসা খুলে বসল।

ব্যাবসার যে এ রকম রবরবা হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রথমে দুটো-তিনটে অনামী কোম্পানির ডিলারশিপ নিয়ে বসেছিল, পরে নামীদামি বহু কোম্পানি তাকে এজেন্সি গছানোর জন্য

ঝুলোঝুলি শুরু করে। বড় বড় কোম্পানি এখন এজেন্ট আর ডিলারদের টি ভি সেট থেকে শুরু করে দামি দামি গিফট আর প্রাইজ দিচ্ছে। প্রচুর কমিশন। টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মলয়। আজকাল প্রায়ই তাকে দূর-দুরান্তে গ্রামে-গঞ্জে চলে যেতে হয়। কেবল কলকাতায় বসে বসে মাল বেচে যাওয়ার পাত্র সে নয়। মলয় জানে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষিদের সঠিক প্রয়োজনগুলো বোঝা যায়, বোঝা যায় কোন সার বা কোন কীটনাশক কেমন কাজ দিচ্ছে। কোনটার চাহিদা বেশি বা কোনটার চাহিদা বাড়ানো উচিত। এই সব মার্কেট রিসার্চ করা থাকলে লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হওয়া কঠিন নয়। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জানাশুনো আর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে অঢেল সুবিধে। তার ইচ্ছে আছে কয়েকটা কীটনাশক সে নিজেই তৈরি করবে, বানাবে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি। প্রোডাকশন হাতে থাকলে বাজারটা হাতের মুঠোয় চলে আসে। কিন্তু এই প্রোডাকশনে নামার কথাটা সে মনে মনে ভাবতে না ভাবতেই একজন ছোকরা মারোয়াড়ি ঘোরাফেরা শুরু করেছে। সে টাকা খাটাতে চায়। মলয় ল্যাবরেটরি বানালে সে টাকা দেবে। তা ছাড়া, ডিলারশিপেও সে টাকা ঢালতে ইচ্ছুক। চাই কি গোটা ব্যাবসাটাই মোটা টাকায় কিনে নিতে পারে। মলয় এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আজকাল খুব চিন্তিত। গোটা কলকাতাটাই এখন মারোয়াড়ি আর বেশ কিছু অবাঙালি ব্যাবসাদারদের হাতে। বাঙালির যে ব্যাবসাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেটাই প্রায় অবিশ্বাস্য দাম হেঁকে কিনে নেয় কেউ না কেউ। কিনে যে ব্যাবসাটাকে হাতে রাখে সব সময় তাও নয়। অনেক সময়েই বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তারা অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতাকে গলা টিপে নিকেশ করে। মলয় ছেলেটাকে সাফ জবাব দেয়নি বটে, কিন্তু তার মনটা খাট্টা হয়ে আছে। আগে মারোয়াড়িরা মদ-মাংস খেত না, আজকালকার নব্য মারোয়াড়িরা সব খায়। এই ছোকরা একদিন মলয়কে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় অনেক টাকা ওড়াল, প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গেল এবং তারপর মলয়কে সোজাসুজি বলল, তোমরা তো বুদ্ধুর জাত। বাঙালি বলতেই আমরা বুঝি বোকা লোক। যে টাকা কামাতে পারে না সে আবার চালাক কীসের?

হক কথা। মলয়ের রক্ত গরম হলেও কথাটা সে মনে রেখেছে। এখন তার ধ্যান জ্ঞান একটাই— টাকা কামাতে হবে। তাদের পরিবারের প্রায় সকলেরই ব্যাবসার ধাত। মলয় ব্যাবসাটা ভালই বোঝে। তাই খুব অল্প সময়ে কোনও রকম লোকসান না খেয়ে সে দু' হাতে টাকা কামাই করেছে এবং করছে। চমৎকার গুড উইল দাঁড়িয়ে গেছে বাজারে। স্থায়ী ক্রেতার সংখ্যা এখন অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। আগে চাষের মরশুমেই যা কিছু ব্যাবসা হত, অন্য সময়টা মন্দা। আজকাল আধুনিক কৃষির কল্যাণে সারা বছরই প্রায় কাজ হচ্ছে। মলয়ের তাই মন্দা সময় বলে কিছু নেই।

কিন্তু সব সময়েই এই একঘেয়ে ব্যাবসা এবং টাকা রোজগার করে যাওয়া মলয়ের কাছে প্রচণ্ড বিরক্তিকর। তার ভিতরে একটা রোখা চোখা তেজি অবাধ্য মলয় রয়েছে। সেই মলয় সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করার কাজে নেমে এক নদী রক্ত ঝরিয়েছিল। এই টাকা আয়কারী মলয়ের সঙ্গে তার আজও খটাখটি। মলয় তাই সব সময়েই কেমন রাগ নিয়ে থাকে, অল্পেই ফুঁসে ওঠে। সে মারকুট্টা, বদমেজাজি এবং অনেকটাই বেপরোয়া। বন্ধুরা তাকে ভয় খায়। খদ্দেররা তাকে সমঝে চলে।

এই খর ধুন্ধুমার গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়ার সোনামুখীতে সাত সাতটা দিন কাটিয়ে এল মলয়। গায়ের চামড়া এ ক'দিনেই রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে, কিছু রোগাও হয়ে গেছে সে। বড় চুল রুখু হয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে। সকালে স্নানের সময় কলঘরের আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখল সে। কিন্তু চেহারা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বরাবরই টান টান ধারালো ইস্পাতের মতো চেহারা তার। মুখখানা হয়তো নিটোল নয়, কিন্তু হনুর বড় হাড়, ভাঙা গাল এবং একটু বসা সত্ত্বেও সে অতীব আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ। লোকে তাকে দেখলেই বোঝে. এ লোকটা জোর খাটাতে জানে। খুবই আত্মবিশ্বাসময় তার চলাফেরা, হাবভাব। কথাবার্তায় সে অহংকার প্রকাশ করে না, কিন্তু তার মর্যাদাবোধ যে টনটনে এটা সবাই বুঝে নেয়। কথা খুব কমই বলে, ঠাট্টা বা রসিকতা বেশি পছন্দ নয়।

স্নান করে খেয়ে অফিসে বেরোনোর সময়ে সে আকাশের পশ্চিম ধারে পিঙ্গল ঝোড়ো মেঘ দেখতে পেল। বাতাস কিছু জোরালো, খুব ধুলো উড়ছে। কয়েকদিনই পর পর বৃষ্টি হয়ে গেছে কলকাতায়। যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে অর্থাৎ গ্রামে-গঞ্জে তেমন হচ্ছে না।

ভ্রু কুঁচকে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে তাদের বড় গ্যারাজে ঢুকে মোটর-সাইকেলটা হিঁচড়ে বের করল। প্রচণ্ড ভারী আর বিপুল চেহারার এই জগদ্দলটা যে প্রাণ পেলে কী ভীষণ গতিতে ছুটতে পারে তার ধারণাই অনেকের নেই; মোটর-সাইকেলে স্টার্টারে পা রেখেই সে প্রশান্ত আত্মতৃপ্তি বোধ করে।

ঝোড়ো হাওয়া আসছে, বৃষ্টির গন্ধে মাখামাখি বাতাস। পারবে কি সে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেরিটিবাজারের অফিসঘরে পৌঁছোতে?

ক্র্যাশ হেলমেটটা মাথায় এঁটে নিয়ে স্টার্টারে লাথি মারে মলয়। খিদিরপুরের ঘিঞ্জি পেরিয়ে রেসকোর্সের গা ঘেঁষে অর্ধবৃত্তাকার চওড়া ফাঁকা রাস্তার ওপর হোন্ডা পৃথিবীর সব গতিকে যেন ছাড়িয়ে গেল। আইনস্টাইন বলেছেন, আলোর গতি প্রাপ্ত হলে যে-কোনও বস্তুই পর্যবসিত হয়। মলয় তেমনি এই বিদ্যুতের গতিতে যেতে যেতে তড়িতায়ত হয়ে গেল। সে আর তার মোটর-সাইকেল দু'য়ে মিলে যেন একটিই প্রাণ এক সত্তা। অবশ্য কলকাতার রাস্তায় গতির সুখ বড়ই ক্ষণিক। ডালহৌসি ঘুরে লালবাজার স্ট্রিট দিয়ে এসে সে ধরল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট। নাজ সিনেমার কাছাকাছি বাঁ হাতের গলিতে খানিক গিয়ে এক মস্ত পুরনো বাড়ি। ভিতরে এক বাঁধানো চত্বর ঘিরে বড় বড় টিনের গুদামঘর। সামনের দিকে পাঁচতলা বাড়ির তেতলায় তার অফিসঘর চত্বরে মোটর-সাইকেল রেখে ওপরে ওঠে মলয়।

সে না থাকলে অফিস সামলাবার দায়িত্ব পুণ্যর।

তাকে দেখে পুণ্যর সদাবিষণ্ণ মুখে ভাব একটুও বদলাল না। রোগা কালো ছোটখাটো নিরীহ পুণ্য লোহার চেয়ারে পা তুলে বসেছিল। মলয়কে দেখে শুধু পা দুটো নামিয়ে বসল।

মলয় জিজ্ঞেস করে, সব খবর ভাল তো?

হুঁ।

কে কে এসেছিল লিস্ট করে রেখেছ?

হুঁ।

দেখি।

পুণ্য একটা বাঁধানো একসারসাইজ বুক এগিয়ে দেয়। মলয় দেখতে থাকে। শেষ পৃষ্ঠায় নামের বদলে ছোট একটু লেখা: তোর সঙ্গে দরকার ছিল। আজ বিকেলে অফিসে থাকিস। রুকু।

মলয় তার হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে সস্তায় কেনা রিভলভিং চেয়ারে বসল। বলল, জল।

বশংবদ পুণ্য নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বারান্দায় রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনে কাচের গ্লাসে। জল খেয়ে মলয় বারোয়ারি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বসে এবং পুণ্যর দিকে কয়েকপলক তাকায়। কী করে পুণ্য এক হাতে গ্লাস ধরে সেই হাতেই জল গড়িয়ে আনে তা কখনও দেখেনি মলয়। তবে দরকার হলে মানুষ সবই পারে। কিছুকাল আগেও সে দেখেছিল কনুই থেকে দু' হাত কাটা একটা লোক দূরপাল্লার ট্রেনে সোডা লেমনেড ফেরি করছে। মস্ত ভারী লেমনেড বোঝাই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে চলন্ত গাড়ির এ কামরা থেকে ও কামরায় অনায়াসে যাতায়াত করত, ওই দুটো ঠুঁটো হাতেই বোতলের ঢাকনা খুলে স্ট্র ভরে লেমনেডের বোতল ধরত খদ্দেরের মুখের সামনে, পয়সা গুনে নিয়ে গেঁজেতে ভরে রাখত। পুণ্যর তো তবু একটামাত্র হাত নেই।

যে-সব গাঁয়ের ছেলে ভাল করে না বুঝেই পলিটিকসে নেমেছিল, পুণ্য তাদের একজন। খড়্গপুর-কাঁথি রাস্তায় নারায়ণগড়ে তার বাড়ি। বেশ ভাল ছবি আঁকত, তবলা বাজানোর হাত ছিল,

কমার্স স্ট্রিমে সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কাঁথি কলেজে ভর্তিও হয়েছিল সে। একদিন ভাবের বশে দশক মুক্তির আন্দোলনে নেমে পড়ল। প্রতিপক্ষের বোমায় ডান হাতটা উড়ে যাওয়ার পর থামল এবং টের পেল, ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেছে তার ছবি আঁকা, তবলা বাজানো, লেখাপড়া এবং রাজনীতি। ক্ষত শুকিয়ে ওঠার পরও বেশ কয়েক মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল পুণ্য। বেশ কয়েক বছর আগে আহত পুণ্যকে কাঁথি হাসপাতালে দেখে এসেছিল মলয়। পরে যখন সার আর কীটনাশকের ব্যবসাদার হয়ে সে আবার নারায়ণগড়ে যায় তখন দেখে, আধপাগলা পুণ্য বসে থাকে সারাদিন রাস্তার ধারের এক চায়ের দোকানের বেঞ্চে। কথা বলে না, বিড়বিড় করে আর লোক দেখলেই মাথা নিচু করে মুখ লুকোয়।

মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলেই মলয় গলে পড়ে না বা বিমর্ষ হয় না। তার মন অত নরম তো নয়ই, বরং সে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বোমা মেরে কমিয়ে ফেলারই পক্ষপাতী। পুণ্যর অবস্থা দেখে তার মোটেই দুঃখটুঃখ হয়নি। তবে তার কেমন মনে হয়েছিল আধ-পাগলা লোকেরা বড় একটা অসৎ হয় না। তাই পুণ্যকে তুলে আনল মলয়। একশো টাকা মাইনে দিত। এমনিতে পুণ্য তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। হিসেবে ভুল করে, অনেক কথা ভুলে যায়, অন্যমনস্ক থাকে। তবে পুণ্যর ধ্যানজ্ঞান এই অফিসটাই। একদিন সে মলয়কে বলল, আপনাদের বেয়ারাটাকে ছাড়িয়ে দিন না, জল চা আমিই দিতে পারব। মাইনে কিছু বেশি দিতে হবে। মলয়ের তাতে আপত্তি হয়নি। আগে বাইরে থেকে চা আসত। পুণ্য এখন সে পাট তুলে দিয়ে একটা জনতা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম কিনে নিয়েছে। বাইরের দিককার বারান্দার কোণে একটু টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গা করে এক হাতে দিব্যি চা বানায়। তার জন্য আলাদা পয়সা নেয়। মলয়ের কোনও আপত্তি নেই। এই অফিসেই চব্বিশ ঘণ্টা থাকে পুণ্য। লোহার আলমারির পিছনে চটে জড়ানো তার একটা বিছানা আছে। রাতে হাফ সেক্রেটারিয়েটের ওপর বিছানাটা পেতে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। দুশো টাকার মতো আয় করে। তা থেকে অর্ধেক বাড়িতে পাঠায়। অপদার্থ পুণ্যর এটাই ঢের সাফল্য।

নামের লিস্ট ধরে ধরে মলয় কয়েকটা টেলিফোন করে। বেশির ভাগই কাজ-কারবারের কথা। সবশেষে ফোনটা করল রুকুকে। বার চারেক ডায়াল করার পর পেল।

রুকু, তুই এসেছিলি?

হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল।

কী দরকার?

গিয়ে বলব।

বিকেলে আমি হয়তো অফিসে থাকব না। দিন সাতেক ছিলাম না, অনেকগুলো অর্ডার পিছিয়ে আছে।

কিন্তু টেলিফোনে তো বলা যাবে না।

কথাটা কী নিয়ে তা তো বলবি?

দয়ী।

দৈ? কীসের দৈ?

দয়ী দয়ী। দয়াময়ী।

ওঃ। দয়ীর আবার কী হল?

সেটাই তো বলতে আসব।

ধ্যাৎ। সিরিয়াস কিছু থাকলে বল। মেয়েছেলে নিয়ে কথা বলার কী আছে! ইজ এনিথিং রং?

একটু দ্বিধা করে রুকু বলে, তেমন কিছু নয়। আমি আসছি আজ। তুই থাকিস।

বলছি তো, থাকার অসুবিধে আছে।

রুকু একটু হাসল। বলল, অসুবিধে হলেও বোধহয় তোকে থাকতেই হবে। বাইরের দিকে চেয়ে দ্যাখ কী ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে।

বাস্তবিকই মলয় চোখ তুলে দেখল বাইরে পাঁশুটে আলো। ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে এইমাত্র বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি এল। মলয় বলল, ইডিয়েট। বৃষ্টি হলে আমি না হয় বেরোতে পারব না, কিন্তু তুই-ই বা বেরোবি কী করে? আমার অফিসে তোকে তো আসতে হবে।

রুকু একটু চুপ করে থেকে বলে, সেটাও কথা। তবু তুই থাকিস। দয়ী আমাকে ওর পক্ষের উকিল হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। মক্কেলকে ফেরাতে পারিনি।

কিন্তু মামলাটা কীসের?

গিয়ে বলব। জানিস তো অফিসের টেলিফোন খুব সেফ নয়।

জ্বালালি। আচ্ছা আয়।

বলে ফোন রাখল মলয়। বস্তুত বন্ধুদের মধ্যে রুকু তার সবচেয়ে প্রিয়। তার প্রিয় হওয়ার মতো কোনও কারণ রুকুর নেই। কোনও বিষয়েই তাদের মেলে না। রুকু শান্ত, চিন্তাশীল, রাজনীতি থেকে শত হাত দূরের লোক, হীনমন্যতায় ভোগে। তবু প্রিয়। বোধহয় অসহায় বলেই প্রিয়।

ঝড়বৃষ্টির দামাল ঝাপটা থেকে ঘর বাঁচাতে পুণ্য গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করল। ঘরের পাখাটা মলয় না বলতেই চালিয়ে দিল। কিন্তু পাখা ঘুরল না। কারেন্ট নেই। কিন্তু সেটা লক্ষ করল না মলয়।

মলয় ভ্রু কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে। আজ আর কাজ কিছু হবে না। বৃষ্টিতে কোনও পার্টিই আসবে না। একঘেয়ে অফিসঘরে বন্দি থাকার মতো শাস্তি তার কাছে আর কিছু নেই।

না বলতেই খুব বিনীত ভঙ্গিতে চা করে নিয়ে এল পুণ্য। মলয় ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকায়। পুণ্যর সঙ্গে আড্ডা মারার চেষ্টা বৃথা। কথা বললে অর্ধেকের জবাব দেয় না, বাকি অর্ধেকের জবাব দেয় হুঁ হ্যাঁ না করে। বেশ বোকাও আছে পুণ্য, তার ওপর পাগল। মলয় কথা বলার চেষ্টা করে না ওর সঙ্গে, শুধু কী করতে হবে তা বলে দেয়। পুণ্য সব সময়েই আদেশটা পালন করে। ও শুধু হুকুম তামিল করতে জানে।

মলয় চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

জ্বালানোই আছে। কারেন্ট নেই। পুণ্য মাথা নিচু করে বলে।

এই ঝড়বৃষ্টির দুপুরে আর কেউ না আসুক, যে মারোয়াড়ি ছোকরা তার ব্যবসায় টাকা খাটাতে চাইছে সেই সইকুমার এসে হাজির। বর্ষাতিটা দরজার কোনায় টাঙিয়ে ঘরে এল। 'হাই' বলে মারকিন কায়দায় উইশ করে চেয়ার টেনে বসল। খুবই দামি ঝকঝকে হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজারস পরনে। বৃষ্টিতে একটু ভিজেছে। সইকুমার বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাই জানে, কিন্তু কথা বলে ইংরিজিতে। কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরা যেমন বদহজমের মতো গোল্লা গোল্লা ইংরিজিতে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে কথা বলে তেমনি তার ইংরিজি। বলা বাহুল্য, সইকুমারও মধ্য কলকাতার এক নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছিল। তবে পরবর্তীকালে সে কয়েকবার বিদেশেও ঘুরে এসেছে। সে প্যারিস আর টোকিয়োর মেয়েমানুষদের কথা বলতে ভালবাসে।

সইকুমার বসেই বলল, আই ওয়েন্ট টু ব্যান্ডেল লাস্ট উইক। গট এ গুড সাইট ফর ইয়োর ল্যাবরেটরি। এ লিটল ওভার ফিফটিন থাউস্যান্ড অ্যান্ড এক্সপেনসেস।

মলয় কথা বলল না। তাকিয়ে রইল।

সইকুমার টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে মলয়ের দিকে খুব বন্ধুর মতো তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। তারপর বলে, ইউ আর গেটিং কোয়াইট বিগ অর্ডার্স। হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক সাম এফিসিয়েন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস? দ্যাট হাফ উইট অব ইয়োরস, দ্যাট বাস্টার্ড পুণ্য ইজ গুড ফর নাথিং। আই কেম

লাস্ট ইভনিং টু আস্ক অ্যাবাউট ইউ অ্যান্ড দ্যাট ইডিয়ট অফ এ ম্যান জাস্ট কেপট মাম।

ইংলিশ মিডিয়ামের কৃপায় গোল্লা ইংরিজিতে মলয়ও একসময়েও কথা বলতে ভালবাসত। তারপর গাঁ গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষিবাসীর সঙ্গে কথা বলে বলে সে রোগটা গেছে। সে পরিষ্কার বাংলায় বলল, দ্যাখো সইকুমার, পুণ্য কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, ইংরিজি বোঝে। একদিন তোমার না থেঁতো করে দেবে।

সরি সরি। নো হার্ড ফিলিং!— বলে সইকুমার সোজা হয়ে বসে। ফরসা টকটকে তার রং, ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ। খুবই স্মার্ট। হেসে বলল, নাউ টু বিজনেস। ব্যান্ডেলের সাইটটা কবে দেখতে যাবেন?

মলয় উদাস হয়ে বলে, তাড়া কী?

তাড়া আছে। ব্যান্ডেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেলটের মধ্যে। ওখানে জমি বেশিদিন পড়ে থাকবে না। ইন ফ্যাক্ট জায়গাটা আমার এত পছন্দ হয়েছে যে, আমি ফাইভ থাউস্যান্ড অ্যাডভান্সও করে এসেছি।

এই সব বদান্যতার পিছনে কী কূটকৌশল আছে তা নিজে ব্যাবসাদারের ছেলে হয়েও ঠিক বুঝতে পারছে না মলয়। দিনকাল যত এগোচ্ছে ততই মানুষ নানারকম নতুন প্যাঁচ বের করছে মাথা থেকে। সইকুমার নিজে টাকা ঢেলে তাকে প্রোডাকশনে নামাতে চায়, সেটা নিশ্চয়ই তাকে শিল্পপতি বানানোর জন্য নয়। পুরো ফিনান্সটা থাকবে ওর হাতে, মলয় হবে শিখণ্ডী— এরকমটাই ভেবেছে কি সইকুমার! নাকি মলয় নিজে থেকে প্রোডাকশনে নেমে একটা কিছু করে বসে সেই ভয়ে সইকুমার সেফটি ভালভ হিসেবে নিজে ওর ভিতরে ঢুকে বসতে চাইছে?

ভাবতে ভাবতে মলয় বলল, জায়গাটা তো আমার পছন্দ নাও হতে পারে।

কোনও ডিফিকালটি নেই। পছন্দ না হলে ছেড়ে দেব। ফাইভ থাউস্যান্ড ইজ নাথিং। না হয় তো জায়গাটা কিনে ফের বেচে দেওয়া যাবে। কাস্টমারের কমতি নেই। আজকাল লোক সব কিছু কেনে। জমি, বাড়ি, এনি সর্টস অব গুডস। বিজনেসম্যানরা বেচতে বেচতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

মলয় হাসল না, কিন্তু মজা পেল। চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক্রেতাদের ভিড় দিনরাত সেও তো দেখছে। বাজার গরম। সে বলল, এখনও আমি কিছু ঠিক করিনি সইকুমার। এজেন্সির জন্যই মেলা খাটতে হচ্ছে। প্রোডাকশনে গেলে আরও খাটুনি।

পয়সার জন্য খাটতে তো হবেই। কিন্তু প্রোডাকশনে আমি আছি, আপনার চিন্তা কি? এক্সপেরিয়েন্সড লোক রেখে দেব। এ লিমিটেড কোম্পানি ওয়ান্স এস্টাব্লিশড গোজ অন ইটসেলফ।

তারপর কী হবে সইকুমার? লিমিটেড কোম্পানি হবে, নিজে থেকে চলবে, প্রোডাকশন হবে, মাল বিক্রি হবে, কিন্তু তারপর কী হবে?

সইকুমার হাসল। ঝকঝকে দাঁত। বলল, ইট গোজ বিগার অ্যান্ড বিগার।

তারপর?

মার্কেট পেয়ে যাবেন, প্রোডাকশন বাড়তে থাকবে, এর মধ্যে কোনও তারপর নেই। এজেন্সির চেয়ে প্রোডাকশনের ইজ্জত বেশি।

মলয় তা জানে। তবু মনশ্চক্ষে সে একটা দাবার ছক দেখতে পায়। প্রতিপক্ষ খুব ভাল মানুষের মতো আপাততুচ্ছ চাল দিচ্ছে। সেই চাল কতটা বিপজ্জনক তা তাকে ভেবে দেখতে হবে। সইকুমারকে সোজাসুজি না বলতেও সে পারছে না। কারণ, ইচ্ছে করলে ও নিজের টাকাতেই প্রোডাকশনে নামতে পারে। কিন্তু যেহেতু মলয়কে টানতে চাইছে সেইজন্যই মলয়ের লোভ এবং সন্দেহ।

নিঃশব্দে পুণ্য এসে সইকুমারকে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

সইকুমার তার ডান হাতের ঢিলা ব্যান্ডে বাঁধা মস্ত ঘড়িটার দিকে চাইল। বিদখুটে ঘড়ি।

ডায়ালের মধ্যে ছোট ছোট আরও গোটা কয়েক ডায়াল। একগুচ্ছের টাকা গেছে। সইকুমার বলল, দি ওয়েদার ইজ হেল। আজ গাড়ি নিয়ে ফেঁসে যাব।

চা খেয়ে সইকুমার উঠল। বলল, তা হলে ব্যান্ডেল কবে যাবেন? গাড়িতে ম্যাকসিমাম ওয়ান আওয়ারস জার্নি। একটু আউটিংও হবে। হাউ অ্যাবাউট নেক্সট সানডে?

দেখছি। আমি তোমাকে ফোনে জানাব।

সইকুমার চলে গেলে মলয় ধৈর্যভরে টেলিফোন করে করে বিভিন্ন কোম্পানিতে নতুন মালের অর্ডার দিল। বাঁকুড়ার বহু এজেন্ট তার হাতে এসে গেছে। সঙ্গে করে সে প্রায় দু' লাখ টাকার অর্ডার অনেছে, অনেক কাজ। আবহাওয়া এরকম না হলে সে নিজে গিয়ে কয়েকটা সাপ্লায়ারের সঙ্গে দেখা করত। বাইরে ঝড় কমেছে বটে, কিন্তু চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। দরজার কাচে জল জমে আছে। অন্ধকার এবং বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গরম আটকে আছে ঘরের মধ্যে। আগে বৃষ্টিকে সে বৃষ্টি হিসেবেই দেখত। আকাশ থেকে জল পড়ছে আজকাল রোদ বা বৃষ্টির সঙ্গে চাষবাস এবং তার নিজের ব্যাবসাকে জড়িয়ে সে হিসেব করে।

চিঠিপত্রের একটা ছোটখাটো ডাঁই জমেছে। মলয় আবছা আলোয় কয়েকটা খুলে দেখল। ভাল পড়া যায় না। তাই আর চেষ্টা করল না। বসে বসে রুকুর কথা ভাবতে লাগল। রুকুর এমন কী জরুরি দরকার?

ভাবতে ভাবতে পাঁচ মিনিটও যায়নি, রুকু এসে হাজির। ছাতাটা মুড়ে দরজায় ঠেসান দিয়ে রাখতেই সেটা থেকে অঝোর জল ঝরে পড়তে থাকে। রুকুর জামাকাপড়ও সপসপে ভেজা। ছাতায় বৃষ্টি তেমন আটকায়নি বোঝা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই বলল, আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না দেখছি। রাস্তায় গোড়ালি সমান জল জমে গেছে। ট্র্যাফিক জ্যাম। ট্রাম বন্ধ।

মলয় স্থির চোখে চেয়ে দেখছিল রুকুকে। কোনও কথা বলল না। বৃষ্টিতে কলকাতার কী দুর্দশা হতে পারে তা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে?

রুকু এক গাল হেসে বলল, সারা পথ ভিজতে ভিজতে এলাম, আর যেই তোর অফিসের দোরগোড়ায় এসেছি অমনি বৃষ্টি থামল।

থেমেছে!— বলে লাফিয়ে ওঠে মলয়। গিয়ে এক ঝটকায় বারান্দার দরজা খুলে ফেলে। হা হা করে ঠান্ডা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে ঘরে ঢোকে। দু'-একটা জলকণাও সঙ্গে আসে বটে, তবে বৃষ্টি বাস্তবিকই থেমেছে।

মলয় ঘড়ি দেখে বলল, এখনও সময় আছে। দু'-একটা অফিসে ঢুঁ মারতে পারা যায়। তোর কথাটা চটপট সেরে ফেল।

রুকু দুঃখিত মুখ করে বলে, পুরনো বন্ধুকে এভাবে ঘাড়ধাক্কা দিতে হয়! দয়ী ঠিকই বলে, তুই আর আগের মতো নেই।

আগের মতোই চিরকাল যারা থেকে যায় তারা ইম্যাচুয়োরড। আমার কাজ-কারবার সবার আগে, তারপর সময় থাকলে ফ্রেন্ডশিপ। এখন গা তোল তো বাপ।

কোথায় যাবি?

চল তো।

রুকু ওঠে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতে কিছু দূর হেঁটে মলয় তাকে একটা দেড় তলার রেস্তরাঁয় নিয়ে আসে। টেরিটিবাজারে এমন চমৎকার ছিমছাম রেস্তরাঁ আছে তা যারা না জানে তারা ভাবতেও পারবে না।

মলয় টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে বলল, বল এবার।

রুকু কোনও ভণিতা করার সময় পেল না। চিরকালই মলয় কাঠখোট্টা গোছের। সোজা কথা বলতে এবং শুনতে পছন্দ করে। রুকু তাই চোখ বুজে বলে ফেলল, তুই দয়ীর পিছনে লেগেছিস কেন?

তোকে কি দয়ী একথা বলেছে?

বলেছে এবং বলছে। প্রায় রোজই টেলিফোন করে।

কী বলছে?

বলছে তুই ওকে বিয়ে করতে চাস। ও রাজি নয়।

তুই কি ওর সেভিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছিস? আমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে তুই ঠেকাতে পারবি?

রুকু সামান্য অবাক হয়ে বলে, এটা গুহামানবদের যুগ নয় মলয়। নেগোশিয়েশনের যুগ। গা-জোয়ারি করছিস কেন? চাইলে বিয়ে করবি। তাতে কী? কিন্তু দয়ীরও তো মতামত আছে!

এবার মলয় সামান্য হাসল। টেবিলের কাছে একটা বেয়ারা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আলুর চপ, ঘুগনি আর চায়ের কথা বলে মলয় কিছুক্ষণ পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে সোজা হয়ে রুকুর দিকে চেয়ে বলল, সারাদিন দয়ীর কথা আমি পাঁচ মিনিটও ভাবি না। আমি কস্মিনকালেও দয়ীর প্রেমে পড়িনি। তবু আমি মনে করি দয়ীর আমাকেই বিয়ে করা উচিত।

কেন?

কারণ দয়ী আমার সঙ্গে একাধিকবার শুয়েছে।

শুনে রুকু কিছুক্ষণ কথাটার নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বলল, সেটাই কি যথেষ্ট কারণ?

সেটাই একমাত্র কারণ রুকু।

দয়ী তো এই কারণকে আমল দিচ্ছে না।

দেওয়া উচিত। শরীরটা তো ফ্যালনা নয় যে শরীরের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিতে হবে।

রুকু করুণ একটু হেসে বলল, দয়ী তোকে শরীর হয়তো দিয়েছে, কিন্তু মন বলেও তো একটা কথা আছে!

মলয় মাথা নেড়ে বলে, মন বলে দয়ীর কিছু নেই। দয়ী কেন, দয়ীর জেনারেশনের কারও নেই। ওসব বস্তা-পচা শব্দ। ইউজলেস। আমি যদি দয়ীকে বিয়ে করি তবে সেটা ওরই সৌভাগ্য।

রুকু মোলায়েম স্বরে বলে, তুই হঠাৎ দয়ীর জন্য খেপে গেলি কেন বল তো!

খেপেছি কে বলল?

তুই নাকি ওকে প্রেমপত্র লিখিস? আর তাতে নাকি সব ভাবের কথা থাকে!

মলয় মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, প্রেমপত্র লিখি বটে তবে কথাগুলো আমার নয়। চৌরঙ্গীর এক বুকস্টল থেকে 'ফেমাস লাভ লেটার্স' নামে একটা বই কিনেছিলাম। সেটা থেকে অনুবাদ করে দিই। প্রেমপত্র লেখার এলেম আমার কই? সময়ও পাই না।

রুকুর হাসি পেল না। গম্ভীর মুখে বলল, দয়ীকে ছেড়ে দে না মলয়। বেচারা এ বিয়ে চাইছে না। রিসেন্টলি ও নাকি একজন স্যুটেবল লোককে পেয়ে গেছে। সে বিয়ে করে দয়ীকে আমেরিকা নিয়ে যাবে। কিন্তু দয়ীর ভয়, তুই নাকি ঠিক সেই সময়ে বাগড়া দিবি। আফটার অল তুই যে ঘ্যাম নকশাল ছিলি সেটা ও ভুলতে পারছে না।

নকশাল ইজ এ ডেড পাস্ট। ওসব কথা ওঠে না। নকশাল ছাড়া কি ভয়ংকর লোক নেই? আমি নকশাল না হলেও ওর সুবিধে হত না।

তুই কী করতে চাস?

কিছু করব তো বটেই। তবে সেটা যে কী তা এখনও ঠিক করিনি। দয়ীকে কিডন্যাপ করলে কেমন হয়?

ইয়ার্কি মারিস না। কিডন্যাপ করলে পুলিশ-কেস।

বেয়ারা চপ আর ঘুগনি রেখে গেল। দারুণ ভাল গন্ধ ছাড়ছে। রুকু আর মলয় খেতে লাগল। খেতে খেতেই মলয় মুখ তুলে বলল, আমার চেহারাটা কেমন রে?

রুকু এক ঝলক চেয়ে দেখে গম্ভীর মুখেই বলে, চোঁয়াড়ের মতো। ইয়েট খানিকটা অ্যাপিল আছে।

অ্যাপিলটা কীসের? সেক্স?

ননা!

তবে?

খুব শক্তপোক্ত চেহারা। বোধহয় তোর মতো মানুষের ওপর মেয়েরা নির্ভর করতে পারে।

তবে দয়ী নির্ভর করতে চাইছে না কেন?

দয়ীও যে খুব শক্ত মেয়ে। ও চায় এমন পুরুষ যে ওর ওপরই নির্ভর করে।

ভ্রূ কুঁচকে মলয় বলে, তা হলে আমাদের ম্যাচ করে না বলছিস?

বোধ হয় না।

তা হলে আমেরিকা থেকে দয়ীর ভাল পাত্তর এসেছে!

তাই তো বলছে।

খামোখা একটা গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল মলয়। বলল, দয়ী আমাকে চায় না কেন জানিস?

আমাকে খুব একটা ভেঙে কিছু বলেনি। তবে বলছিল বন্ধুকে কি বিয়ে করা যায়!

সেটা কোনও কথা নয়। আমি একটা জিনিস মানি। ও যখন আমাকে শরীরটা দিয়েছে তখন বাকিটাও দেওয়া উচিত।

রুকু সহজে বিরক্ত হয় না। এবার হল। বলল, শরীরের কথা বার বার তুলছিস কেন? দয়ী হয়তো তোকে ছাড়াও আর কাউকে শরীর দিয়েছে। তা বলে সবাইকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

খুব চোখা নজরে রুকুকে দেখল মলয়। তারপর বলল, তোর ধৈর্য কমে যাচ্ছে রুকু। আগের মতো তোর সহনশীলতা নেই।

রুকু লজ্জা পেল। তবে স্বীকার করল না।

বলল, তুই অত শরীর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

মলয় স্থির চোখে চেয়ে বলে, তোর একটা সুবিধে আছে রুকু। তোর শরীর লাগে না। তুই বোধহয় এখনও সেই কবেকার গুলি খেয়ে মরা তাপসীকে ভেবে মাসটারবেট করে যাচ্ছিস।

এই অপমানে রুকুর মুখের সুস্বাদু ঘুগনি ছাইয়ের মতো বিস্বাদ হয়ে গেল। চামচটা নামিয়ে রেখে কিছু সময় মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর প্রবল মানসিক চেষ্টায় মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মলয় সামান্য তেরছা হাসি হেসে বলল, কথাটা উড়িয়ে দিস না। মাসটারবেট যারা করে তাদের চেহারায় লাবণ্য থাকে না, চোখ গর্তে ঢুকে যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের চিন্তাশক্তি, নার্ভের জোর আর মানসিক ভারসাম্য কমে আসে। তোর মধ্যে সব ক'টা লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি।

রুকু সাদা মুখে মড়ার মতো হাসে একটু। কথাটা অপমানকরই শুধু নয়, সত্যও। তাই তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় উপর্যুপরি গুলি খেয়ে। কোনও কথাই আসে না মুখে।

মলয় তেমনি শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলে, আমি তোকে থরোলি জানি রুকু। তোর বোর্ডিং-এ এক বিছানায় আমি অনেক রাত কাটিয়েছি। তোকে খামোকা অপমান করার জন্য তাপসীর কথা তুলিনি। আমি জানি তুই এখনও সেই মরা মেয়েটাকে নিয়ে ঘুমোতে যাস। আমি ষোলো বছর বয়স থেকে রক্তমাংসের তরতাজা মেয়েমানুষ ঘাঁটছি। আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই। তবু আমি দয়ীকে বিয়ে করার কথা কেন ভাবছি জানিস?

রুকু নিজের ভিতরের শূন্যতায় ডুবে বসেছিল। একটা কথাও তার কানে ঢুকছিল না। তবু মলয় কিছু জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পেরে মুখ তুলল।

মলয় বলে, বেশ কয়েক বছর আগে দয়ী আমার দারুণ অ্যাডমায়ারার ছিল। তখন আমি বিপ্লবী ছাত্রনেতা। দয়ী প্রায়ই বলত, তোমার মতো ভয়ংকর পুরুষকেই আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিছু মনে করিস না, দয়ীর হয়তো খানিকটা ফাদার অবসেশনও ছিল। ওর বাবা ছিল ফোর্থ গ্রেড গুন্ডা। যাই হোক, সে সময়ে একদিন দয়ী খুব সাহস করে আমাকে বলল, চলো বাইরে কোথাও ক'দিন বেরিয়ে আসি। আমি ইঙ্গিতটা বুঝলাম। দয়ী শরীরের সম্পর্ক চাইছে! আনইউজুয়াল কিছু নয়। ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে গিধনি নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার এক বন্ধু রেলে চাকরি করে। প্রায়ই যেতাম। রেল কোয়ার্টারের দু'-একটা সব সময়েই খালি পড়ে থাকে। কোনও অসুবিধে ছিল না, একদিন দয়ীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলাম। কিন্তু প্রথম দিনই শালবনে বেড়াতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেল। কয়েকটা ছেলে-ছোকরা আমাদের পিছনে লেগেছিল একটু। সেটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কলকাতায় এরকম তো কত হচ্ছে। আমি মাইন্ড করিনি। ওরা তেমন খারাপ কিছু বলেওনি। একজন বলে উঠেছিল, দ্যাখ দ্যাখ, কলকাতার মাল দ্যাখ। শালা গিধনিতে মজা লুটতে এসেছে। কিন্তু দয়ী ব্যাপারটা উড়িয়ে না দিয়ে ভীষণ ফুঁসে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে ইডিয়েট, গ্রাম্য, কোনওদিন মহিলা দ্যাখেনি, ব্লান্ট হেডেড ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে লাগল। ছেলেগুলোও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ওটা ওদেরই তো জায়গা। তারাও রুখে উঠে বলতে লাগল, কেরদানি বের করে দেব, গিধনিতে মজা করতে আর আসতে হবে না। কলকাতার ফুটানি কলকাতায় গিয়ে দেখাবেন। আমি মাঝখানে পড়ে থামানোর চেষ্টা করি, কিন্তু দয়ী ছাড়বার পাত্রী নয়। যে ছোকরাটা দু' কদম এগিয়ে এসে বেশি তেজ দেখাচ্ছিল, দয়ী ছুটে গিয়ে পায়ের স্লিপার খুলে তার গালে ঠাস করে বসিয়ে দিল। তারপর যা হয়। ছোকরারা আমাদের ঘিরে ফেলল চোখের পলকে। কিল ঘুসি লাথি চলতে লাগল সমানে। আমি এসব ছোটখাটো ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করি না। তবু দয়ীর সম্মান রাখতে অনিচ্ছের সঙ্গেও লড়তে হল। ছেলেগুলো কিছুক্ষণ খামচাখামচি করে হাঁফাতে থাকে। তারপর শাসায়। আমি তখন তাদের গায়ে-টায়ে হাত বুলিয়ে ঠান্ডা করি। ব্যাপারটা মিটেও যায়। কিন্তু সেই থেকে দয়ী বেঁকে বসল। সেই রাত্রেই আমাদের প্রথম একসঙ্গে শোওয়ার কথা। কিন্তু দয়ী কিছুতেই রাজি নয়। কেবল কাঁদে আর বলে, ওই বদমাশরা আমার শরীরের লজ্জার জায়গায় হাত দিয়েছে, মেরেছে, আর তুমি ওদের তোয়াজ করলে! তুমি কি পুরুষ মানুষ? আমি এতদিন তোমাকে নিয়ে অন্য স্বপ্ন দেখতুম। সারা রাত চোখের জল আর খোঁচানো কথা দিয়ে দয়ী আমাকে যথেষ্ট তাতিয়ে তুলল। এ কথা সত্যি যে, আমি পলিটিকসের জন্য কয়েকটা খুন করেছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও কারণে মানুষকে মেরে ফেলার কথা আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু সেই রাতে দয়ী শরীর দেয়নি বলে কামে ব্যর্থ হয়ে আমি খেপে উঠেছিলাম। দয়ী আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, ছোকরাদের পালের গোদাকে ফিনিশ করব। পরদিন একটু খোঁজ নিতেই ছোকরার পাত্তা মিলল। পশ্চিমধারে মস্ত একটা মাঠের গায়ে নির্জন জায়গায় তার বাড়ি। সন্ধের মুখে একটু গা ঢাকা দিয়ে দয়ী আর আমি গিয়ে বাড়ির কাছাকাছি ঝোপ জঙ্গলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর দয়ীর তখন কী উত্তেজনা! বার বার আমার হাত চেপে ধরছে, এমনকী চুমুও খাচ্ছে। কখনও পাগলের মতো হাসছে, কখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটু পরেই একটা খুন করতে হবে ভেবে আমি দয়ীর দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। তবু আমার একটা চোখ সারাক্ষণ দয়ীকে লক্ষ করছিল। আমার মন বলছিল, এ খুনটা কেবলমাত্র দয়ীর শরীরের জন্যই আমাকে করতে হচ্ছে না তো! যদি তাই হয় তবে দয়ীর শরীরের জন্য আমাকে অনেকটাই মূল্য দিতে হল। ভাববার বেশি সময় ছিল না। আচমকা দেখলাম, নির্জন মাঠের পথ ধরে একা হেঁটে আসছে একটা ছেলে। খুবই আবছা দেখাচ্ছিল তাকে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম। এক হাতে রিভলভার,

অন্য হাতে টর্চ। একেবারে কাছাকাছি এসে ছোকরা আমাকে দেখে হয়তো থমকে গিয়েছিল। দপ করে টর্চের আলো মুখে ফেলে মুখটা চিনে নিয়েই একদম পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করলাম। ফাঁকা মাঠে গুলির শব্দটা প্রায় শোনাই গেল না। ছোকরা কোঁস করে একটা শব্দ করে কুঁকড়ে পড়ে গেল। আর দেখার কিছু ছিল না। মুখ ফেরাতেই দেখি আমার পিঠ ঘেষে দয়ী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির-চোখে কিছুক্ষণ ছোকরার মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানি দেখল, তারপর আমার দিকে মুখ ফেরাল। শান্ত মুখ, চোখে সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টি। আমার ভয় ছিল, দয়ী হয়তো চেঁচামেচি করবে, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাবে। আশ্চর্য, তার কিছুই হল না। আমি স্পট থেকে কখনও দৌড়ে পালাই না। তাতে বেশি বিপদ ঘটে। খুব স্বাভাবিক চালে একটু ঘুরপথ হয়ে আমরা বড় রাস্তায় উঠলাম এবং যেন বেড়িয়ে ফিরছি ঠিক এমনভাবে বাজারের ভিতর দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। পথে একটা চায়ের দোকানে বসে চাও খেলাম। কপাল ভাল বলতে হবে। খুনটা নিয়ে হই-চই হলেও আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি। করার কারণও ছিল না। গিধনিতেও তখন দু' দঙ্গলে ঝগড়াঝাঁটি মারপিট চলছিল কী নিয়ে। সন্দেহ গিয়ে পড়ল বোধহয় সেই ছোকরার উলটো দলের ওপর। সে যাকগে। সেই রাতে দয়ী আমাকে শরীর দিয়েছিল। কিন্তু আমার সেদিন একরত্তি ইচ্ছেও ছিল না। মনটা ভার ছিল। এই প্রথম আমি নন-পলিটিক্যাল কারণে, কেবলমাত্র একটা মেয়েকে খুশি করতে একজনকে মারলাম। কিন্তু দয়ীর হল উলটোরকম। সেই রাতের মতো খুশি, আনন্দিত এবং উত্তেজিত দয়ীকে আমি আর কখনও দেখিনি। মনে মনে সেইদিনই ঠিক করি, দয়ীর পুরো সাইকোলজিটা আমাকে জানতে হবে। সারাজীবন ধরে বিশ্লেষণ করে, গবেষণা করে আমি দেখব দয়ীর জেনারেশনের মেয়েরা কতখানি নষ্ট হয়ে গেছে। রুকু, দয়ীকে আমার ছাড়া চলে না। আমার কাছে ওর অনেক ঋণ। আমি ওকে ভালবাসি বা না বাসি দয়ীকে আমি অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়তো তুই ঠিক বুঝতে পারবি না। ইউ আর এ ব্র্যান্ডেড রোমান্টিক মাস্টারবেটার।

এবার রুকু আর ততটা অপমান বোধ করল না। কানটা লাল হল, মাথা নুয়ে এল ঠিকই, তবু মনে হল, মলয় তাকে এরকম অপমান করার অধিকার রাখে।

॥ রুকু ॥

রাতে রুকুর ভাল ঘুম হল না। শেষ রাতে সে একেবারেই জেগে গেল। এই এজমালি বাড়িতে ছাদে ওঠা বারণ, বারান্দা নেই। ফলে বাইরেটা দেখতে হলে সদর খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়।

ঘামে ভেজা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রুকু। মাথাটা বড্ড গরম। পাগলের মাথায় যেমন হাজারও ছেঁড়া টুকরো স্মৃতি ও কথা ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে বেড়ায় তার মাথাটাও আজ অমনি। আধো-ঘুমে বারবার একটা সুরে বাঁধা গানের লাইন ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাথায়— ধুলায় হয়েছে ধূলি। ধুলায় হয়েছে ধূলি। কোন গানের লাইন তাও ঠিক মনে নেই। এখন জেগেও সে টের পাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত তার মাথা ভাঙা রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মতো গানের সেই কলিটা জপ করছে, ধুলায় হয়েছে ধূলি।

মলয়ের মতো রুকুর কোনও যৌন-জীবন নেই। সে কখনও মেয়ে-মানুষের স্বাদ পায়নি। বরাবরই সে ভিতু, লাজুক। কলকাতায় এসে তার মেয়ে বন্ধু জুটেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কারও খুবই ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু কী এক আশ্চর্যজনক কারণে তার ব্যক্তিগত যৌনক্ষুধাকে আজও অধিকার করে আছে সেই কবেকার সামান্য একটি মৃত মেয়ে তাপসী। এই অস্বাভাবিকতার কোনও ব্যাখ্যাও সে খুঁজে পায় না। কিন্তু বুঝতে পারে, এটা এক ঘোর বিকৃতি। বুদ্ধিমান মলয় সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

নিজেকে নিয়ে আজ ভারী মুশকিল হল রুকুর। এই ভোরের পরিষ্কার সুন্দর পরিবেশে সদর খুলে সে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে কেবলই চাইছে রুকুর সঙ্গে সহাবস্থান ছিন্ন করতে। নিজেকে সে সহ্য করতে পারছে না মোটেই। বড্ড ছোট লাগছে, তুচ্ছ লাগছে, হাস্যকর মনে হচ্ছে।

সকাল হলে রুকু যখন দাড়ি কামাতে বসল তখন ছোট আয়নায় আজ বড় শীর্ণ ও লাবণ্যহীন দেখল নিজেকে। চোখ কোটরাগত, গাল বসা, দৃষ্টিতে দীপ্তি নেই।

কিছুই ভাল লাগল না আজ।

অফিসে এসে সে ফোন করল দয়ীকে।

দয়ী, আমি রুকু।

বলো।

মলয়ের সঙ্গে দেখা করেছি।

দয়ী খুব সিরিয়াস গলায় বলল, মলয় কিছু বলল?

সে অনেক কথা। এ কাজটার ভার আমাকে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। মলয় কাল আমাকে খুব অপমান করেছে।

তোমাকে? তোমাকে অপমান করবে কেন? তুমি তো কিছু করোনি!

রুকু আচমকা জিজ্ঞেস করে, তুমি কোনওদিন মলয়ের সঙ্গে গিধনি গিয়েছিলে দয়ী?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় দয়ী বোধহয় একটু থতমত খায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, শুধু গিধনি কেন, আরও অনেক জায়গায় গেছি।

রুকু সামান্য ধৈর্য হারায়। বিরক্তির স্বরে বলে, কথাটা এড়িয়ে যেয়ো না দয়ী। তুমি যে মলয়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় গেছ সে আমি জানি, তুমিও বহুবার বলেছ। তবু আমি পার্টিকুলারলি গিধনির কথাটা জানতে চাই।

দয়ী সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনও কারণে রেগে আছ রুকু? তোমাকে আমি কখনও রাগতে দেখিনি, মাইরি বলছি।

রুকু একটু লজ্জা পায়। গলা নামিয়ে বলে, রেগেছি কে বলল?

গলা শুনে মনে হচ্ছিল। মলয় কি তোমাকে খুব অপমান করেছে? দেখা হলে ওকে বলব তো।

কিছু বোলো না দয়ী, প্লিজ।— কাতর স্বরে বলে রুকু।

দয়ী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি গিধনির কথা কী জানতে চাইছিলে?

রুকু সতর্কভাবে তার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ফোনের কাছাকাছি কেউ নেই। কেউ শুনছে না। একটু চাপা গলায় সে বলে, গিধনিতে তোমাকে খুশি করার জন্য মলয় একটা মার্ডার করেছিল দয়ী, মনে পড়ে?

মার্ডার!— দয়ী আকাশ থেকে পড়া গলায় বলে ওঠে, মার্ডার? কী বলছ তুমি?

রুকু একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর মিনমিন করে বলে, সেখানে শালবনে নাকি তোমাদের সঙ্গে একদল ছেলের গণ্ডগোল হয়েছিল?

দয়ী অবাক গলায় বলে, তা তো হয়েছিলই। ছেলেগুলো আমাকে আওয়াজ দেওয়ায় ঝগড়া লাগে। আমি একটা ছেলেকে চটিপেটা করেছিলাম। ওরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল।

তারপর কী হয়েছিল দয়ী?

কী আবার হবে! সেই রাত্রে অপমানে আমি খুব কেঁদেছিলাম।

মলয়কে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলোনি?

বলেছি। তাতে কী?

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় মলয় কি ছেলেদের সর্দারকে গুলি করে মারেনি?

দয়ী হঠাৎ হাসতে থাকে। বলে, তোমাকে বোকা পেয়ে গুল ঝেড়েছে মলয়। গুলি করবে কী? ওর কাছে তো আর্মস ছিল না। তা ছাড়া আমরা সেখানে নতুন জায়গায় গেছি, কিছুই তেমন জানি না। মার্ডার কি অত সোজা রুকু? পুরো গুল।

সত্যি বলছ?

তুমি কী করে ভাবলে আমাকে খুশি করতে মলয় খুন করতে যাবে? মলয় কি অত বোকা? আমি ছাড়াও ওর তখন ডজনখানেক বান্ধবী ছিল। কাউকেই কোনওদিন খুশি করার দায়িত্ব নেয়নি মলয়। বরং আমরাই ওকে খুশি করতে চাইতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, গিধনিতে মলয় কাউকে খুন করেনি।

রুকু লক্ষ করে, যার টেবিলে ফোন সেই পালবাবু বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মস্ত হলঘরটা পার হতে যেটুকু দেরি। সে তড়িঘড়ি চাপা-স্বরে বলে, ফোনে আর বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না দয়ী, অসুবিধে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল।

পরে হবে দয়ী।

রুকু ফোন রেখে নিজের টেবিলে ফিরে আসে এবং চুপ করে বসে থাকে। সে কতদূর নির্বোধ তা ভেবে থই পাচ্ছিল না। মলয় যে তাকে মাস্টারবেশনের কথা তুলে লজ্জা দিয়েছিল তা আসলে একটা অতিশয় কূটবুদ্ধির চালাকি। কথাটা তুললে রুকু যে সংকুচিত হয়ে নিজের ভিতরে লজ্জায় গুটিয়ে যাবে তা খুব ভালভাবে জেনেই মলয় চালটা দিয়েছে। আর তারপর এমনভাবে গিধনির খুনের বানানো গল্পটা ঝেড়েছে যা রুকু সেই মানসিক অবস্থায় বিশ্লেষণ করে দেখেনি। ইংরিজিতে যাকে বলে কট ইন দি রং ফুট। কিন্তু খুনের ঘটনাটা বলার পিছনে মলয়ের আর কোনও কূটবুদ্ধি কাজ করছে তা ভেবে পায় না রুকু। তাই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। মলয় কাল বলেছিল দয়ীদের জেনারেশন কতদূর নষ্ট হয়ে গেছে তা সে জানতে চায়। কথাটা ভেবে আজ হাসি পাচ্ছে রুকুর। মলয় কোনওদিনই মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বরং একসময়ে এ নিয়ে রুকুই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিত। তার ছিল মফস্‌সলের গেঁয়ো মানসিকতা। মেয়েদের শরীরের পবিত্রতা ছিল তার অতিশয় শ্রদ্ধার জিনিস। মলয় কি সেটারই পালটি দিল কাল? ওটা কি নিছক রুকুকে ঠাট্টা করার জন্যই বলা?

বেলা পাঁচটা পর্যন্ত রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল।

অফিস থেকে বেরোবার মুখে জানলা দিয়ে আজও বাইরে বর্ষার মেঘ দেখতে পায় রুকু। আজও বৃষ্টি হবে। বড় বেশি দেরিও নেই। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে বৃষ্টির গন্ধ মাখা। অফিসের পর আজকাল রুকুর কোথাও যাওয়ার নেই। তার বন্ধুরা বেশিরভাগই বড়সড় চাকরি করে। কারও হাতে ফালতু সময় নেই। রুকু নিজেও আড্ডা দেওয়ার সময় পায় না। চাকরি ছাড়াও টিউশানি আছে। তবু আজ তার একটু হালকা সময় কাটানোর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। দীর্ঘদিন বিরামহীন কাজ ও একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি মাথাটাকে ভার করে রেখেছে। আর সে কিছুতেই মলয়ের অপমানটাকে ভুলতে পারছে না। বারবার একটা আয়না কে যেন তার মুখের সামনে তুলে ধরছে, আর সে নিজের কোটরগত চোখ, ভাঙা চোয়াল, লাবণ্যহীন শুষ্ক মুখশ্রী দেখছে। তার বোধহয় কিছু ভিটামিন-টিন খাওয়ার দরকার। আর দরকার বিশ্রী আত্মমৈথুনের পুরনো অভ্যাস থেকে মুক্তি। সংসারের দায়িত্বের কথা ভেবে এতকাল সে বিয়ের কথায় কান পাতেনি। আজ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে ভাবছিল, বিয়ে করলে কেমন হবে? ভাবছিল, মা সন্তোষপুরে যে উকিলের মেয়েটির কথা প্রায়ই বলে, তাকে একবার গিয়ে দেখে আসবে। পছন্দ হলে এবার বিয়ের সম্মতি দিয়ে দেবে। ভাল হোক, মন্দ হোক, জীবনের একটা খাত বদল এবার দরকার।

অফিসের বড় দরজার মুখেই সে থমকে গিয়ে এক গাল হাসল, বলল, তুমি?

মাস দুই দয়ীর সঙ্গে দেখা হয়নি। ফোনে কথা হয়েছে মাত্র। দয়ী এই দুই মাসে কিছু রোগা হয়েছে। নাকি এই রুগ্নতাকেই স্লিমনেস বলে আজকাল? খুবই সাধারণ ম্যাটম্যাটে রঙের একটা বাদামি তাঁতের শাড়ি পরনে, সাদা ব্লাউজ। মুখে কোনওদিনই তেমন প্রসাধন মাখে না দয়ী। আজ প্রসাধনহীন মুখখানা বেশ ঘামতেলে মাখা। একটু হেসে বলল, কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে চমকে দেব বলে।

চমকে একটু দিয়েছ ঠিকই। জানিয়ে রাখলে অফিস থেকে কিছু আগে বেরিয়ে আসতাম।

দয়ী মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিংবা জানালে হয়তো আমাকে এড়ানোর জন্য অফিস থেকে আগে ভাগেই কেটে পড়তে। তুমি যা ভিতু!

না, না। লজ্জা!— বলে একটু হাসে রুকু।

ফুটপাথ ঘেঁষে দয়ীর ফিয়াট দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে দয়ী বলল, ওঠো।

চুপি চুপি একটু আরামের শ্বাস ছাড়ে রুকু। আজকের দিনটা অন্তত বাসের ভিড়ে চিংড়ি লাদাই হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। দয়ী লিফট দেবে।

পাশে ড্রাইভিং সিটে বসে দয়ী গাড়ি চালু করে বলে, তোমাকে আমার পার্সোনাল প্রবলেমের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ভাল কাজ করিনি রুকু। কাল মলয় তোমাকে কেন অপমান করল খুব জানতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য খুব সেনসিটিভ ব্যাপার হলে বোলো না।

রুকুর মুখ চোখ লজ্জায় নরম হয়ে যায়। সে চোখ নিচু করে কোলের ওপর নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে।

দয়ী ময়দানের দিকে গাড়ি চালায়। আড়চোখে একবার রুকুর মুখের ভাব লক্ষ করে বলে, তোমাকে মলয় কতটুকু অপমান করেছে জানি না। কিন্তু আমাকে ওর কাছে বহুবার হাজারো অপমান সইতে হয়েছে। আমার বাবার পাস্ট হিস্টরি খুব ভাল নয়, জানো তো! কথায় কথায় ও আমার বাবা তুলে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে। তোমাকে তো আমার লুকোনোর কিছু নেই রুকু। আমি সতীত্ব-টতীত্ব মানি না। স্কুল লাইফ থেকেই ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রিলি মিশি। সেই জন্যও মলয়ের রাগ। ও যখন নিজে আমার সঙ্গে লাইফ এনজয় করেছে তখনও আমাকে প্রস-ট্রস বলে গালাগাল করেছে। মাইথনে গিয়ে একবার আমাকে মলয় মেরেছিল। তখন ওকে ভালবাসতাম বলে সব সহ্য করেছি। ইন ফ্যাক্ট তখন ও আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই আমি রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু আফটার অল দিজ ইয়ারস আমি এখন অনেক ম্যাচিওরড। আমি জানি মলয় কেমন লোক।— বলে চুপ করে থাকে দয়ী।

মলয় কেমন লোক দয়ী?— রুকু জিজ্ঞেস করে।

রেস্টলেস, ক্রুয়েল অ্যান্ড রেকলেস। খুব শিগগিরই একদিন ওর পাগলামি দেখা দেবে! পলিটিকস ছেড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু সেই সব আক্রোশ আর রাগ এখনও জমে আছে ওর ভিতর। ও আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন জানো?

বোধহয় তোমাকে নিয়ে ওর কিছু এক্সপেরিমেন্ট এখনও বাকি।

ঠিক তাই। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন ওর বিষের থলিতে যত বিষ জমা হয়ে টনটন করে তা উজাড় করার জন্য ঠিক আমার মতো একজনকে ওর দরকার। ও আমার বাবার ইতিহাস জানে, আমার সমস্ত দুর্বলতাকে জানে। ও জানে কতভাবে আমাকে নির্যাতন আর অপমান করা যায়।

রুকু একটু হাসল। বলল, কত করুণ ছবি আঁকছ দয়ী! কিন্তু আমি জানি মেয়েরা মোটেই অত অসহায় নয়। খুব সাদামাটা নিরীহ মেয়েও কিন্তু আর কিছু না পারুক স্বামীকে শাসনে রাখতে জানে। সে তুলনায় তুমি তো অনেক বেশি অ্যাডভান্সড মেয়ে।

দয়ী রঞ্জি স্টেডিয়াম পেরিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। গাড়িটা ফুরফুরে হাওয়ায় দাঁড় করিয়ে বলল, মিথ্যে বলোনি। কিন্তু মলয় অ্যাভারেজ পুরুষদের মতো তো নয়। ও অনেক বেশি হিংস্র,

অনেক বেশি ঠান্ডা রক্তের মানুষ। ও কত অকপটে হাসিমুখে আমাকে বেশ্যা বলে গাল দেয় তা তুমি জানো না। মাইথনে সেবার আমাদের প্রচণ্ড ঝগড়া হলে আমি রেগে গিয়ে ওকে বলেছিলাম তুমি আসলে হোমোসেকসুয়াল, তাই মেয়েদের নিয়ে তোমার সুখ হয় না। তাইতে ভীষণ রেগে গিয়ে ও আমাকে প্রচণ্ড মেরেছিল। পরে ভেবে দেখেছি, কথাটা আমি রাগের মাথায় হয়তো খুব মিথ্যে বলিনি। মে বি হি ইজ হোমোসেকসুয়াল। নইলে অত খেপে উঠবে কেন কথাটা শুনে?

রুকুর ভিতরে টিকটিক করে কিছু নড়ে উঠল। কাল মলয় তাকে খুব লজ্জা দিয়েছিল, আজ মলয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে; কিন্তু অস্ত্রটা কোনওদিনই ব্যবহার করতে পারবে না রুকু। সে কাউকে সামনা সামনি অপমান করতে পেরে ওঠে না। শুধু চিন্তিতভাবে বসে রইল সে। দয়ী আর মলয়ের অপবিত্র কাম ও ঘৃণার সম্পর্কের কথা ভাবতে লাগল!

দয়ী তাকে কনুইয়ের একটা ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, কোনও কথা বলছ না কেন রুকু?

রুকু ম্লান হেসে বলে, কী বলব বলো তো। আমি অনেকটাই গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এই আধুনিক মানসিকতা কিছু বুঝতে পারি না। কেনই বা তুমি মলয়কে শরীর দিতে যাও, আর কেনই বা মলয় তোমাকে ঘেন্না করে, এসব খুব রহস্যময় আমার কাছে।

দয়ী একটু ধৈর্য হারিয়ে বলে, অত বোকা সেজো না রুকু। শরীরের ব্যাপারে কোনও রহস্য নেই। শরীর তো কোনও দর্শন নয়, কোনও ধর্মটর্মও নয়, তার কোনও গভীরতা নেই। নিতান্তই পেটের খিদের মতো একটা মোটা দাগের ব্যাপার। তার আবার রহস্যই কী, শুচিবাইয়েরই বা কী?

রুকু মাথা নেড়ে বলে, তুমি হয়তো জানো না দয়ী, তোমার প্রবলেমটাও শরীর নিয়েই। শরীরের গভীরতা না থাক, হ্যাজার্ডস আছে। মলয় আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, শরীরের জন্যই ও তোমাকে ছাড়তে নারাজ।

মিথ্যে কথা রুকু। যে ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে তার কখনও একটা বিশেষ মেয়ের জন্য পাগল হওয়ার কারণ নেই। সে যেমন তোমাকে গিধনির খুনের গল্প বানিয়ে বলেছে এটাও তেমনি আব একটা বানানো কথা।

রুকু বিষণ্ণভাবে বলে, কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই দয়ী। তোমার জন্য মলয়কে খুন করতে তো আমি পেরে উঠব না।

দয়ী গম্ভীর মুখ করে বলল, খুনের প্রশ্ন ওঠে না।

তবে তুমি ওকে নিয়ে অত ভাবছ কেন দয়ী? ও ভাংচি দেবে ভয়ে?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, ভাংচি-টাংচি সেকেলে ব্যাপার। যে লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে সে অনেক বেশি মডার্ন। আমার জামাইবাবুর সম্পর্কে ভাই। তার সঙ্গে যাতে আমার বিয়েটা না হয় সেজন্য জামাইবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কোনও কাজ হয়নি। আমাকে লেখা মলয়ের একটা চিঠি পর্যন্ত জামাইবাবু তাকে দেখিয়েছেন। লোকটা তাতেও দমেনি। বিয়ে সে আমাকে করবেই।

তবে আটকাচ্ছে কোথায় দয়ী?

দয়ী অবাক হয়ে বলে, কোথাও আটকাচ্ছে না তো! বিয়েটাও খুব নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষদের আমি খুব চিনি রুকু। লোকটা বিয়ে করবে বটে কিন্তু তার কমপ্লেকস শুরু হবে বিয়ের পর থেকে। মলয়ের ব্যাপারটা সে খুব ভালভাবে জানে না। একটা প্রেমপত্র থেকে খুব বেশি কিছু আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। স্পোর্টসম্যানের মতো সে তাই এখন ব্যাপারটা গায়ে মাখছে না। কিন্তু বিয়ের পর সামান্য খটাখটি লাগলেই তার মনে নানারকম কমপ্লেকস দেখা দেবে। জানতে চাইবে মলয়ের সঙ্গে আমার কতদূর কী হয়েছিল। লোকটা এমনিতে ভাল, কিন্তু ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। কোনও কিছুকেই সাবলিমেট করতে জানে না।

রুকু নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, ওঃ দয়ী, আমার বোকা মাথায় এই সব শক্ত কথা একদম ঢুকছে না। সরল করে বলো।

দয়ী হাসল। বলল, সোজা কথায় লোকটাকে বিয়ে করতে আমার ভয় হচ্ছে। আমেরিকা তো এখানে নয়। সেই দূর দেশে যদি কখনও আমার কান্না পায় তবে সম্পূর্ণ একা একা কাঁদতে হবে। কাউকে কিছু বলার থাকবে না। আমার বড় ভয় করছে রুকু।

রুকু মহান গলায় বলে, তার জন্য তুমিই দায়ী দয়ী। এখন কী করতে চাও?

সেইজন্যই তোমার কাছে আসা। বলো তো কী খবর? আজও বিনয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ক্যালকাটা ক্লাবে ওর এক বন্ধু পার্টি দিচ্ছে। রোজই আমরা একটু একটু করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসছি। এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

রুকু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবে। তারপর বলে, ভবিষ্যতে কী হবে তা কেই বা জানে? আমি বলি তুমি বরং লোকটাকে বিয়ে করে আমেরিকাতেই চলে যাও। হয়তো লোকটা সবই ক্ষমা করে নেবে।

দয়ী মাথা নেড়ে ঝুঁকে স্টিয়ারিং হুইলে মাথাটা নামিয়ে রাখে। মৃদুস্বরে বলে, জামাইবাবুও ওর কানে অনেক বিষ ঢেলেছে তো। যতদূর খবর পেয়েছি জামাইবাবু মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিনয়ের মুখোমুখি ওকে দাঁড় করাবে। অবশ্য তাতেও বিয়ে আটকাবে না আমি জানি। বিনয় অসম্ভব গোঁয়ার। কিন্তু বিষটা থেকে যাবে যে রুকু।

।। দয়ী ।।

বিনয় খুব সামান্যই মদ খায়। সিগারেটেও তার তেমন নেশা নেই। তার আসল নেশা হল কাজ। পার্টি শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। পার্টিতে আজ তেমন হুল্লোড় ছিল না, লোকজনও ছিল কম। মদের ঢল নামেনি, মাতলামির বাড়াবাড়ি হয়নি। যে আজ পার্টি দিয়েছিল বিনয়ের সেই বন্ধু অজিত ঘোষ দয়ীর হাতে এক গ্লাস শেরি ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটাতে একটা বা দুটো চুমুক হয়তো দিয়েছিল দয়ী, এমন সময় বিনয় খুব নিরীহভাবে কাছে এসে তার কানে অস্ফুট কী একটু বলে হাত থেকে সুকৌশলে গ্লাসটা নিয়ে এক গ্লাস সফট ড্রিংক ধরিয়ে দিয়ে গেল। অবাক হলেও দয়ী প্রতিবাদও করেনি। সামান্য একটু অপমান অবশ্য বোধ করেছিল সে। কচি খুকি তো সে নয় যে, অন্য কেউ তাকে ইচ্ছেমতো চালাবে। মনটা বিরূপ ছিল বলেই বাদবাকি সময়টা সে পার্টির আনন্দটুকু মোটেই উপভোগ করেনি। দায়সারা কথাবার্তা বলল, একটা মাত্র মুরগির ঠ্যাং নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল।

পার্টি শেষ হলে দয়ীর গাড়িতেই এসে উঠল বিনয়। ওঠার কথা নয়। কারণ বিনয় দয়ীর উলটোদিকে থাকে। নর্থে। বিনয় খুব নরম গলায় বলল, অনেকটা রাত হয়েছে। এত রাত্রে তোমাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি তোমার বাড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরব।

দয়ী ভ্রু কুঁচকে বলল, আমার বেশি রাতে ফেরা অভ্যাস আছে।

কথাটা বলে দয়ী অপেক্ষা করল। কিন্তু বিনয় গাড়ি থেকে নামার লক্ষণ দেখাল না। দয়ী তাই গাড়ি চালু করে বলে, কলকাতা শহরে কিন্তু ইচ্ছেমতো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

বাস আছে।— বিনয় শান্ত স্বরে বলে, না হয় কিছু একটা ঠিক জুটে যাবে।

আমার কোনও পাহারাদারের দরকার নেই। একা আমি বেশ চলতে পারি।

বিনয়ের মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নেই। কথা একটু কম বলে। চুপচাপ নির্লজ্জের মতো বসে রয়েছে। দয়ী ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল বিনা সংলাপে। তারপর বিনয় হঠাৎ বলল, আমি পিউরিটান নই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেউ মদ খেলে আমার ভাল লাগে না। তুমি কিছু মাইন্ড করলে নাকি?

দয়ী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ভাল মন্দ বুঝবার বয়স আমার হয়েছে।

বিনয় মৃদুস্বরে বলে, আই অ্যাম সরি। আমি ভাবলাম, অতটা শেরি খেয়ে গাড়ি চালাতে তোমার কষ্ট হবে। তাছাড়া এই গরমে কোনওরকম অ্যালকোহলই শরীরের পক্ষে স্বস্তিকর নয়।

আমি মোটেই অতটা খেতাম না। গাড়ি চালাতে হবে সেটা কি আমার খেয়াল ছিল না? ভদ্রলোক দিলেন, ভদ্রতা করে নিতে হয় বলে নিলাম। খেতাম না।

ব্যাপারটা ভুলে যাও দয়ী। আমার ভুল হয়েছিল।

দয়ী কিছুটা স্বস্তিবোধ করে। লোকটাকে তার কখনও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সে বলল, সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে গেলে আগে থেকেই একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা ভাল বিনয়।

বিনয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, আগে থেকে কখনও কোনও বোঝাপড়া হয় না। বোঝাপড়ার জন্যই তো একসঙ্গে থাকা।

দয়ী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি ডোমিনেটিং হাজব্যান্ড পছন্দ করি না।

বিনয় সামান্য হাসল। বলল, আমাকে গত দশদিনে কি তোমার তাই মনে হল?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। আমি আমার কথা বলছি।

বলার মতো কিছু তো ঘটেনি। শেরির গ্লাসটাকে তুমি এখনও ভোলোনি দেখছি।

দয়ী থমথমে গলায় বলল, পার্টিতে কেউ কেউ হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। তারা ধরে নিয়েছে, তুমি আমাকে নভিস হিসেবে গাইডেন্স দিচ্ছ।

ওরকম আর হবে না, কথা দিচ্ছি।

দয়ী হঠাৎ কালীঘাট পার্কের কাছে গাড়ি পার্ক করল। মুখ ফিরিয়ে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার সবকিছুই মেনে নিচ্ছ কেন বলো তো?

বিনয় একটু থতমত খেয়ে বলে, সেটা কি দোষের?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, দোষের নয়। বরং খুবই উদারতার পরিচয়। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন আছে বিনয়। আমার জামাইবাবু কি তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা বলেনি?

বিনয় ভ্রু কুঁচকে চিন্তান্বিত মুখে খুব ধীর হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, ওটা নিয়ে তুমি অনর্থক চিন্তা কোরো না। বুধোদা আগে যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। টোটাল ফ্রাস্ট্রেশন থেকে মানুষ কতটা অন্যরকম হয়ে যায় তা আমি জীবনে কম দেখিনি। তাই বুধোদার কথার আমি মূল্য দিই না।

কথাটা বলে বিনয় অকপটে দয়ীর দিকে তাকায় এবং অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে বলে, বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট। তোমার বয়সকে তো কিছুটা কনসেশন দিতেই হবে। বুধোদা সেটা না মানলেও আমি মানি।

দয়ী বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ওটা মার্কিন মানসিকতার কথা।

বিনয় ধীর স্বরে বলে, ধরতে গেলে আমি তো একজন মার্কিনই।

বলে সে খুব সুন্দর হাসি হাসে। বিশুদ্ধ আনন্দের হাসি।

দয়ী চোখ নামায় না। স্থির দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলে, দিদির কাছে শুনলাম জামাইবাবু নাকি মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তার সঙ্গে তোমার একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি কি মলয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

বিনয়ও চোখ সরাল না। বলল, দেখা করা বা না করায় কোনও অর্থ নেই। তুমি না চাইলে দেখা করব না। চাইলে করব। কিন্তু দেখা করলেও আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

সে আমি জানি। কিন্তু তুমি একথা মনে কোরো না যে, আমি বিয়ের জন্য বা আমেরিকায় যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছি। আমার কাছে ওগুলো কোনও ফ্যাক্টর নয়।

আমি তা মনে করি না।

দয়ী কী যে বলতে চাইছে তা সে নিজেই ভাল বুঝতে পারছিল না। মাথাটায় কেমন ওলট-পালট। বুকে কেমন রাগ আর অভিমানের ঝড়। সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে সে চুপ করে বসে রইল। সহজে কখনও তার কান্না আসে না। আজ আসছিল। প্রাণপণে সে কান্নাটাকে চাপবার চেষ্টা করছিল।

বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিবিষ্টমনে প্রায় অন্ধকার পার্কটার দিকে চেয়ে ছিল বিনয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, পার্কে ওরা কারা বসে আছে বলো তো? অনেকগুলো কাপল দেখছি। প্রেমিক-প্রেমিকা নাকি?

দয়ী মৃদু একটু হুঁ দিল।

বিনয় বলল, এত রাত পর্যন্ত কী অত কথা ওদের?

দয়ী হেসে বলে, তুমি তো প্রেমে পড়োনি। পড়লে বুঝতে।

বিনয় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সে কথা ঠিক। তবে কিনা আমেরিকায় এত ফালতু সময় কারও হাতেই থাকে না। কলকাতায় তোমরা বড় বেশি সময় নষ্ট করো দেখেছি। পাঁচটা মিনিট সময়ও যে কত মূল্যবান তা কলকাতার লোক বুঝবেই না।

গত দশদিনে বিনয় এই প্রথম আমেরিকার কথা তুলল। অন্যসব বাঙালি ছেলে বিদেশ ঘুরে এসে যে বিদেশি গল্পের ঝুড়ি খুলে বসে বিনয় সেরকম নয় মোটেই। আমেরিকা নিয়ে দয়ীকে সে কোনওদিনই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

বিনয় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, সময়ের মূল্য তুমিও খুব একটা বোঝো না দয়ী। গাড়ি দাঁড় করিয়ে খামোখা রাত বাড়াচ্ছো।

দয়ী গাড়ি চালু করল। বলল, তুমি সত্যিই আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে?

আর একটু যাই। ফাঁড়িতে নামিয়ে দিও।

মলয়ের সঙ্গে তোমার কবে দেখা হবে?

বিনয় শব্দ করে হাসল। বলল, অবসেশনটা কাটিয়ে ওঠো দয়ী। দেখা হলেও কিছু নয়, না হলেও কিছু নয়।

আমাকে তবে তুমি বিয়ে করবেই?

তুমি রাজি থাকলে।

কোনও কিছুতেই আটকাবে না?

বিনয় মৃদু হেসে বলে, আমি অদৃষ্টবাদী। আটকাবে না তা কী করে বলি? কত অঘটন আছে।

কেন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে চাও? তুমি তো আমার প্রেমে পড়োনি।

বিনয় মাথা নেড়ে বলে, না। প্রেমে পড়া অ্যাডোলেসেন্ট মানসিকতা। আমি তা কাটিয়ে উঠেছি। তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হল কমপ্যাটিবিলিটি। এই বয়সে অনেক ডেবিট ক্রেডিট কষে তবে বিয়ের মতো গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আমাকে নিয়ে তুমি হিসেব নিকেশ করছ?

হুঁ। রেজাল্টটা খারাপ নাও হতে পারে।

তুমি কীরকম মেয়ে চেয়েছিলে?

তোমার মতো।

ভেঙে বলো।

ধরো, যে-মেয়ে অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে, অতি দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে, যে মোটামুটি বুদ্ধিমতী এবং সাহসী।

আর কিছু নয়?

বিনয় হেসে বলে, বয়স যখন অল্প ছিল তখন আরও অনেক বেশি চাইতাম। দারুণ সুন্দরী, বিমুগ্ধ

প্রেমিকা, কট্টর সতী। অভিজ্ঞতা বাড়ার পর আর স্বপ্ন দেখি না।

তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়োনি?

একাধিকবার।— বলে কৌতুকে মিটমিটে চোখে বিনয় দয়ীর দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু এসব আজ কী জিজ্ঞেস করছ তুমি দয়ী? আজ কি তুমি খুব নার্ভাস? এসব তো তোমার প্রশ্ন নয়।

দয়ী দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। বাস্তবিক আজ তার মাথা বড় ওলট-পালট। বুকে অভিমানের ঝড়। আজ সে কিছুই তার নিজের মতো করছে না। এক অচেনা দয়ী আজ তার মাথায় ভর করেছে।

ফাঁড়িতে নেমে গেল বিনয়। রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফুটপাথে। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে ট্যাক্সির জন্য। ততক্ষণ দয়ীও গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল। ওপাশ থেকে বিনয় মাঝে মাঝে মৃদু হেসে হাত নাড়ছিল, এপাশ থেকে দয়ীও। কলকাতার এইসব মধ্যবিত্ত পাড়ায় এত রাতে দৃশ্যটা খুব নিরাপদ নয়। লোকে তাকাচ্ছিল, লক্ষ রাখছিল। অবশেষে বিনয় একটা ট্যাক্সি ধরতে পারল।

বাড়িতে ফিরতে রাত হলে দয়ীকে কিছু বলার কেউ নেই। ট্যারা বসন এখন পারতপক্ষে ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি হতে চায় না। দয়ীর মা ছিল বড়লোকের ঘরে শিক্ষিতা মেয়ে। একটা অশিক্ষিত গুন্ডার প্রেমে পড়ার মাশুল দিচ্ছে সারাজীবন। অনেক চুরি, ডাকাতি, লোক ঠকানো, জুয়া, রক্তপাত দেখে কেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গেছে। এখন তার কিছু শুচিবাই এবং পুজোআর্চার বাতিক হয়েছে। মা নিজের মনে থাকে। কারও তেমন কোনও খবর নেয় না।

গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাড়ি ঢুকতেই দয়ী দেখল, বৈঠকখানায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। বেশ একটু উঁচু স্বরে কথাবার্তা হচ্ছে ভিতরে। একটা গলা বাবার, অন্যটা সরিতের।

বহুকাল সরিৎ এ বাড়িতে আসে না। আজ কেন এসেছে সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না দয়ীর। সরিতের বা বাবার মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না দয়ীর। সে চুপি চুপি দোতলায় উঠে যেতে পারত। কিন্তু হল না পোষা অ্যালসেশিয়ানটার জন্য। দোতলার বারান্দা থেকে সেটা 'হাউফ হাউফ' করে প্রচণ্ড ধমক চমক শুরু করল।

বৈঠকখানা থেকে বাবার বুলেটের মতো স্বর ছিটকে এল, কে?

গেটে দারোয়ান থাকে, বাড়িতে কুকুর আছে, প্রচুর লোকজন, তবু ট্যারা বসন এখনও সন্দিহান, সতর্ক। এসব লোক জীবনে কখনও নিশ্চিন্তে সময় কাটাতে পারে না।

দয়ী খুব উদাস গলায় জবাব দিল, আমি দয়ী।

অ।— ট্যারা বসন যেন নিশ্চিন্ত হল। সরিতের গলা শোনা গেল, ওকে ডাকুন না। ডেকে সামনা-সামনি জেনে নিন।

ট্যারা বসন মৃদু স্বরে বলে, থাকগে। যেতে দাও। কাল সকালে বললেই হবে।

সরিৎ হঠাৎ ধমকে উঠে বলল, ইট মে বি টু লেট দেন। আপনার ছেলেমেয়েরা কে কী করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের পরিবার ইনভলভ্ড হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

সিঁড়ির গোড়ায় দয়ী একটু দাঁড়াল। একবার ভাবল, ওপরে উঠে যাবে। তারপর খুব ঘেন্না হল পালিয়ে যেতে। সে আস্তে অত্যন্ত সতেজ পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় বৈঠকখানার পরদাটা সরিয়ে ঢুকল।

কীভাবে সাজালে ভাল হবে তা বুঝতে না পেরে ট্যারা বসন বৈঠকখানাটাকে প্রায় একটা জাদুঘর বানিয়ে তুলেছে। বিশাল বিশাল কয়েকটা সোফা, মেঝেয় লাল নীল ফুলকাটা কার্পেট, সামনের দেয়ালে একটা হরিণের মাথার নীচে একটা ঢালের সঙ্গে দুটো ক্রশ করা তরোয়াল, পাশে ছোট্ট মাদুরের ওপর যামিনী রায়ের ঢঙে আঁকা ছবি, রবি ঠাকুরের কাস্টিং, অন্য দেয়ালে শিলং থেকে আনা ঘর সাজানো তিরধনুক, অন্তত গোটা ছয়েক ক্যালেন্ডার, ভোজালি, ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মূর্তি,

দেয়াল কুলুঙ্গিতে একটা গণেশ, ঢাউস বুককেসে রাজ্যের ইংরিজি বাংলা বই। ঘরে একই সঙ্গে চিনে লণ্ঠন, মস্ত ঘোমটার মতো ঢাকনা পরানো স্ট্যান্ডওলা আলো, স্টিক লাইট এবং মার্কারি ল্যাম্পের ব্যবস্থা। আছে পেতলের বিশাল ফুলদানি, পাথরের ন্যাংটো পরি, একটা কাশ্মীরি কাঠের জালিকাটা পার্টিশন পর্যন্ত। কী ভেবে বৈঠকখানার এক কোণে একটা নীলচে রঙের হাল-ফ্যাশানের মুখ ধোওয়ার বেসিন পর্যন্ত লাগিয়েছে বসন। পারতপক্ষে এ ঘরে দয়ী বা তার ভাইবোনেরা ঢোকে না। তাদের আলাদা আড্ডাঘর আছে। এ ঘরে সভা শোভন করে বসনই বসে রোজ।

আগে চেককাটা লুঙ্গি পরত, আজকাল সাদা পায়জামা পরার অভ্যাস করেছে ট্যারা বসন। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি লেপটে আছে। একটু আগেও বোধহয় লোডশেডিং ছিল। ঘরে নেভানো মোমের পোড়া গন্ধ। ট্যারা বসনের মলমলের পাঞ্জাবি এখনও ঘামে ভেজা। খোলা বুকে সোনার চেনে আঁটা বাঘের নখ। টকটকে লালচে ফরসা রং, মাথায় চুল পাতলা, মজবুত চেহারা। এখনও চোখের নজর যেন উড়ন্ত ছুরির মতো এসে বেঁধে। খুব গম্ভীরভাবে দয়ীর দিকে চাইল।

দয়ী কোনওদিনই বাপকে গ্রাহ্য করে না, আজও করল না। ট্যারা বসনের ডানদিকের মস্ত সোফায় সরিৎ বসা। তার চোখমুখ থমথম কছে। দয়ীর দিকে একবার চেয়েই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে পেছনে হেলে ডোন্টকেয়ার ভঙ্গিতে মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগল। ঠোঁটে একটু বিদ্রুপের হাসি।

দয়ী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেও প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। রাগে শরীর কাঁপছিল। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল মাথা। বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ সরিতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর পাড়া-জানানো তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি কাউকে বিয়ে করতে চাই না। আপনি যান, গিয়ে আপনার ভাইয়ের কান বসে বসে ভারী করুন গে। এতদিন তো তাই করছিলেন, সুবিধে হয়নি বুঝে কি আজ এ বাড়িতে হানা দিয়েছেন?

সরিৎ বোধহয় এতটা আশা করেনি। দয়ীর চিল-চেঁচানি শুনে বোধহয় খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেল। তোম্বা মুখ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

কিন্তু দয়ীর মাথার ঠিক নেই। সে প্রাণপণে চিৎকার করে বলছিল, লজ্জা করে না আপনার? দিদিকে সারাটা জীবন স্লো পয়জন করে যাচ্ছেন। নিজের ছেলেকে দিয়ে আমার গোপন চিঠি চুরি করাচ্ছেন। মেয়েমানুষের মতো চুকলি করে বেড়াচ্ছেন। আপনি কি ভাবেন আপনার ভাইয়ের মতো পাত্র আর হয় না, আর আমি জলে পড়েছি? আমাদের ভাল-মন্দ বোঝবার জন্য আমার বাবা মা আছে, আপনি গার্জিয়ানি ফলাতে আসেন কেন? মর‍্যালিটি গিয়ে নিজের ছেলেকে শেখান আর বউকে গিয়ে বীরত্ব দেখান।

বলতে বলতে দয়ী উদভ্রান্তের মতো গিয়ে সেন্টার টেবিল থেকে পেতলের ছাইদানিটা তুলে নিল হাতে। তারপর সেটা মাথার ওপর তুলে আক্রোশে বীভৎস চেরা গলায় চেঁচাল, যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান। নইলে শেষ করে ফেলব।

চারদিক থেকে পায়ের শব্দ ছুটে আসছিল, টের পায়নি দয়ী। মুহূর্তে ঘর ভিড়ে ভিড়াক্কার। বহুকাল বাদে ট্যারা বসন তার শারীরিক সক্ষমতার পরিচয় দিল এক লাফে উঠে দয়ীর হাত থেকে দ্রুত হাতে অ্যাশট্রেটা ছিনিয়ে নিয়ে। তারপর জামাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, এইসব লুল্লুভুল্লু আমার ভাল লাগে না। রাত হয়েছে, তুমি বাড়ি যাও।

সরিৎ গুম হয়ে বসে অপমানটা হজম করার চেষ্টা করছিল।

বাড়ির লোকেরা দয়ীকে টেনে নিয়ে গেল অন্দরমহলে। ভারী ক্লান্তবোধ করছিল দয়ী। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মাথাটা আজ বড় ওলট-পালট। আজ দয়ী আর দয়ী নেই।

॥ সরিৎ ॥

বহুকাল হল মৃত্যুর ফাঁদের মধ্যে বসবাস করছে মৃন্ময়ী। শুধু একটু ইচ্ছের অপেক্ষা। ইচ্ছে যে হয় না তা নয়। কিন্তু ভয় করে, সব পাপের চিহ্ন এই জীবনে ধুয়ে মুছে দিয়ে যেতে না পারলে সে সোজা নরকে যাবে। গতি হবে না, মুক্তি হবে না কোনওদিন। নইলে মরার সহজ উপায় থরে থরে তার হাতের নাগালে সাজানো। সরিৎ বহুকাল হল এই ফাঁদ সযত্নে পেতে রেখেছে তার জন্য।

ঘটনাটা ঘটেছিল সব জানাজানি হওয়ার পর। সরিৎ আলাদা শুত। একা ঘরে শুয়ে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত মৃন্ময়ী। বড় বীভৎস সব স্বপ্ন। তারপর ভয়ে আর ঘুম আসতে চাইত না। এইভাবেই তার ইনসোমনিয়ার সূত্রপাত। না ঘুমোনোর বুকছেঁড়া কষ্ট তাকে পাগল করত। কর্তব্যবোধেই সরিৎ ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার দিল ঘুমের ওষুধ।

সরিৎ কয়েকদিনের মধ্যেই নানান ধরনের ট্র্যাঙ্কুইলাইজার আর কড়া জাতের ঘুমের ওষুধ সাজিয়ে দিল তার ঘরে। মৃন্ময়ী তখনও আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেনি। বোধহয় ভাবত, সময়কালে সব ঠিক হয়ে যাবে। রোজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোত। একদিন শোওয়ার সময় দ্যাখে টেবিলে একটাও ঘুমের ওষুধ নেই। কে যেন সরিয়ে নিয়েছে। খুব সংকোচের সঙ্গে সে গিয়ে সরিৎকে জিজ্ঞেস করল, আমার ঘুমের বড়িগুলো পাচ্ছি না।

সরিৎ টেবিলল্যাম্প জ্বেলে কী যেন লেখাজোখা করছিল। মুখ না তুলেই বলল, আমি সরিয়ে নিয়েছি।

কেন?

সরিৎ খুব গম্ভীর গলায় বলল, অতগুলো ঘুমের ওষুধ হাতের কাছে পেয়ে তুমি যদি কোনও অঘটন ঘটাও?

মৃন্ময়ীর মাথায় সেই প্রথম বিদ্যুৎ খেলে গেল। কী বোকা সে! হাতের এত কাছে মুক্তির উপায় ছিল। সে অসহায় গলায় বলল, তা হলে কী করব?

তা জানি না। তবে বিপদের ঝুঁকিও নিতে পারি না।

আমি মরলে কি তোমার খুব ক্ষতি হবে?

সরিৎ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা তো হবেই। পুলিশ আসবে। সন্দেহ করবে। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো ভাল নয়, মার্ডার চার্জ ঘাড়ে চাপালে দোষ কী?

শুধু সেই ভয়?

শুধু সেই ভয়।

মৃন্ময়ী সরিতের আলোছায়াময় মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বেলে খুব অকপট একটা সুইসাইডাল নোট লিখে নিয়ে গিয়ে সরিতের হাতে দিয়ে বলল, এটা হলে চলবে?

সরিৎ খুব মনোযোগ দিয়ে কাগজটা পড়ল। একটু ইতস্তত করল। তারপর টেবিলের তালা খুলে টানা থেকে নিঃশব্দে সব ঘুমের ওষুধ বের করে দিয়ে দিল।

মৃন্ময়ী জানে নিজস্ব গোদরেজের আলমারির লকারে সযত্নে সেই কাগজখানা রেখে দিয়েছে সরিৎ। কাগজে কোনও তারিখ দেওয়া নেই। যেদিন ঘটনাটা ঘটবে সেদিন দরকারমতো তারিখ বসিয়ে দেবে সরিৎ।

এইভাবেই মৃন্ময়ীর মৃত্যুর ফাঁদ তৈরি হয়ে আছে আজ বহুদিন। সরিৎ আজও ঘুমের ওষুধ এনে দেয় ফুরোবার আগেই। হয়তো প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে সরিৎ। কিন্তু আজও মৃন্ময়ী তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। বড় নরকের ভয় তার। বড় ভয়, মৃত্যুর পর হয়তো সে এক সীমাহীন ঘোর অন্ধকার জগতে ডুবে যাবে। মৃন্ময়ী তাই এই জন্মে তার পাপের স্খালন করার চেষ্টা করে। কীভাবে

পাপ যাবে তা তো সে জানে না। তাই সে ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা ঠোকে, ভিখিরিদের খাওয়ায়, সাধু সজ্জন দেখলেই পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

তার প্রশ্রয় পেয়েই এই সাততলার ফ্ল্যাটেও ভিখিরিরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসত। আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা আপত্তি তোলায় এবং সরিৎ জানতে পারায় দারোয়ানদের ওপর কড়া হুকুম জারি হয়েছে। তবু মৃন্ময়ীর গোপন বন্দোবস্তে রোজ দুপুরে তার ফ্ল্যাটের তলায় ভিখিরিরা মজুত থাকে। ওপর থেকে মৃন্ময়ী প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে রুটি ভাত তরকারি ছুঁড়ে দেয় নীচে, ঠিক যেভাবে বন্যাদুর্গত এলাকায় এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার থেকে খাবার ফেলে দেওয়া হয়। অনেকরকম উপোস করে মৃন্ময়ী, হরেক ব্রত পালন করে। বহু আশ্রমে মন্দিরে গোপনে টাকা পাঠায়। পাপ স্খালন হয়েছে কি না তা অবশ্য বুঝতে পারে না। যেদিন বুঝবে সেদিন আর এক মুহূর্তও দেরি করবে না। তবে আত্মহত্যাও নাকি ভীষণ পাপ। আত্মহত্যা করলে আত্মা অন্ধকার গ্রহসমূহে ঘুরে বেড়ায়, কোনওদিন আলোর মুখ দেখে না। সেই পাপটুকুর জন্যই যা কিছু ভয়। তবু সেই পাপটুকু স্বীকার করতেই হবে। নইলে সরিতের মুক্তি হবে কী করে? বেচারা সরিৎ! মৃন্ময়ী তো জানে সরিৎ কত ভাল! মৃন্ময়ীকে ঘৃণা করলেও সরিৎ আজও অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়নি। ছেলে-অন্ত প্রাণ সরিতের। সেই ছেলের যে মৃন্ময়ীর দূষিত রক্ত থেকে জন্ম তাও ক্ষমা করেছে। যে যত নিন্দে করুক সরিতের, মৃন্ময়ীই একমাত্র জানে, সরিতের মধ্যে এক মহান চরিত্রের বাস। তাকে মুক্তি দিয়ে যাবে মৃন্ময়ী। হয়তো মৃন্ময়ী মরলে সরিৎ আবার বিয়ে করবে। বেঁচে যাবে বেচারা।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে মৃন্ময়ী ঢলে পড়ে ছিল বিছানায় মাতালের মতো। গভীর রাত্রে হঠাৎ সেই ঘুম ভাঙল। আবছা ঘরে বিছানার ধার ঘেঁষে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পায় মৃন্ময়ী। ভয় বা চমকের আগেই ছায়ামূর্তি চাপাস্বরে বলে, আমি সরিৎ। ভয় পেয়ো না।

ঘুমচোখে মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হল, সরিৎ হয়তো শেষ বোঝাপড়া করতে এসেছে। হয়তো বলবে, মৃন্ময়ী, তোমার সেই স্বীকারোক্তির কাগজখানা পুরনো হয়ে হলদে হয়ে এল। এবার কিছু করো। মৃন্ময়ী তাই কাতর স্বরে বলল, এখনও কিছু কাজ বাকি আছে যে! এত তাড়াতাড়ি কোরো না। আর কয়েকটা দিন সময় দাও।

কী বলছ মৃন্ময়ী?

এই বলে সরিৎ বহুকালের মধ্যে যা করেনি আজ তাই করল। খুব কাছাকাছি বিছানায় বসল।

এত বেশি অবাক হয় মৃন্ময়ী যে, চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেল দূর রাজ্যে। সচেতন হয়ে উঠে বসল সে, সরিতের গায়ে হাঁটু লাগছিল, সরিয়ে নিল।

সরিৎ বলল, বেডসুইচ টিপো না মৃন্ময়ী। অন্ধকারই ভাল।

হ্যাঁ, অন্ধকারই ভাল। এই পোড়ামুখ দেখতে হবে না।— মৃন্ময়ী বলে।

সরিৎ কথাটা গায়ে মাখল না। বলল, আমি বিয়েটা আটকাতে চাই মৃন্ময়ী। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

মৃন্ময়ী মোটামুটি সবই জানে। ক'দিন আগে বাপের বাড়ি গিয়ে ভাসা ভাসা শুনে এসেছে, সরিৎ নাকি সপ্তাহখানেক আগে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল দয়ী আর বিনয়ের বিয়ে আটকাতে। দয়ীর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে। মৃন্ময়ীর দুঃখের বোঝা বাড়াতে চায় না বলে বাপের বাড়ির লোক খুব ভেঙে কিছু বলেনি। কিন্তু ক'দিন ধরে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে সরিৎ, এর ওর তার কাছে যাচ্ছে। খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে এবং খুব গম্ভীর। মলয় নামে সেই ছেলেটিকে বারবার টেলিফোন করার চেষ্টা করেছে সকালে এবং রাত্রে। অনেক চেষ্টায় এক রাত্রে বুঝি লাইন পেয়েছিল। কিন্তু মলয় সরিতের নাম শুনেই বোধহয় অপমানজনক কিছু বলে ফোন নামিয়ে রাখে।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার কী করার আছে?

সরিৎ অধৈর্যের গলায় বলে, তা আমিও জানি না। শুধু জানি যেমন করে হোক এ বিয়ে আটকাতে হবে।

কেন বলো তো! ওদের যদি দু'জনের দু'জনকে পছন্দ হয়ে থাকে তা হলে তোমার আমার কী এসে যায়?

দয়ী কতটা খারাপ মেয়ে তা কি জানো মৃন্ময়ী?

মৃন্ময়ী একথায় চুপ করে থাকে।

সরিৎ একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, তোমার মোটে একবার পদস্খলন হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনও তোমাকে বেচাল দেখিনি। তোমাকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি মৃন্ময়ী, কেন তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু ভাল না বাসলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি আমার সিমপ্যাথি বেড়েছে, বাড়ছে। কিন্তু দয়ী তোমার মতো নয়। বহু পুরুষের সঙ্গ করেছে, এখনও করে। কলকাতার কোনও হোটেলে বা বাইরে কোথাও গিয়ে রাত কাটিয়ে আসে। একে পদস্খলন বলে না মৃন্ময়ী, এ প্রায় বেশ্যাবৃত্তি। তুমি কি চাও জেনেশুনে ওকে আমাদের ফ্যামিলিতে বউ করে আনা উচিত?

মৃন্ময়ী মাথা তুলল না, কিন্তু প্রশ্ন করল, তুমি অত জানলে কী করে?

কানে আসে।

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, কানে আসে না। তুমি ওর সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ।

একটু কি থতমত খেল সরিৎ? তারপর খুব স্পোর্টসম্যানের মতো বলল, নিলে নিয়েছি। বিয়ের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া দোষের নয়।

মৃন্ময়ী তবু বলে, বিয়ের কথা হওয়ার আগেও নিয়েছ। আমি জানি, তুমি আমার সম্পর্কেও খোঁজ নাও। বাবুন তোমার স্পাই।

বিরক্ত সরিৎ পট করে উঠে দাঁড়াল। রোখা গলায় বলল, আমার জীবনটা তুমি নষ্ট করেছ। যার বউ ভাল নয় তার মতো হতভাগা দুনিয়ায় দুটো হয় না। আমার জ্বালা তুমি আজও টের পাও না মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী প্রায় নিঃশব্দে বলল, পাই। দয়ী খারাপ তাও জানি। কিন্তু বিনয় ঠাকুরপো যদি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করে তা হলে সে কি দয়ীর চেয়ে ভাল চরিত্রের মেয়ে হবে?

সেটা আমার ভাববার কথা নয়। আমেরিকা আমার নাগালের বাইরে।

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, এটাও তাই। ওরা বিয়ে করতে চাইলে আমাদের কিচ্ছু করার নেই।

তুমি পারো মৃন্ময়ী। তুমি দয়ীকে বোঝাতে পারো।

দয়ী কোনওদিন কারও কথায় চলে না। বাবাও পারেনি ওকে বশে আনতে।

সরিৎ আবার নরম হয়ে বেড়ালের মতো কাছে বসে বলে, তুমি জানো না, সেদিন ওদের বাড়িতে আমাকে অ্যাশট্রে ছুঁড়ে মারতে এসেছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। আমি তোমার ভালবাসার পাত্র না হলেও আমার অপমানে কিন্তু তোমারও অপমান।

মৃন্ময়ী মৃদু স্বরে বলে, আমার অপমান? আমার তো আর কোনও অপমান নেই!

রাগ কোরো না মৃন্ময়ী। মাথা ঠান্ডা রাখো। বহুদিন বাদে আমি তোমার কাছে এসেছি।

সরিৎ একটা হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর হাত চেপে ধরল। একটু বেশিই চাপ দিল কি? খানিক আগে সরিৎ যে 'পদস্খলন' কথাটা বলেছিল সেইটে মনে পড়ল মৃন্ময়ীর। পদস্খলন! পদস্খলন! কীরকম সাধু ভাষা না? শুনলে হাসি পায়।

হাতটা একটু নিজের দিকে টানল কি সরিৎ? খুব নিবিড় গলায় বলল, বলো রাগ করোনি?

মৃন্ময়ী রাগ করেনি। তাই মাথা নাড়ল।

আমাকে সাহায্য করবে?

বলে সরিৎ আরও একটু টেনে নিল মৃন্ময়ীকে। মৃন্ময়ীর অদ্ভুত অবস্থা। টানের ফলে সে বসা অবস্থা থেকে প্রায় নীলডাউন অবস্থায় এল। সরিৎ তখনও টানছে। তাই একটু ভেঙে পড়ল মৃন্ময়ী। আর ঠিক সেই অবস্থায় সরিৎ তাকে জড়িয়ে ধরে।

হয়তো আটকাতে পারত মৃন্ময়ী। কিন্তু ভাবল, হয়তো পাপ কেটে গেছে।

সরিৎ অবরুদ্ধ গলায় বলল, জানো, কীভাবে নিজেকে এতকাল সংযত রেখেছি? কী করে ভুলে থাকি?

জানি।

জানো না, কিছুই জানো না।

বলে সরিৎ তার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। বহুকালের অনভ্যাস, অনেক মানসিক বাধা। তবু অন্ধ বোবা কালা দুই দেহ কিছুই মানল না।

আশ্চর্য ঘটনাটা শেষ হওয়ার পর সরিতের মাথার চুল আদরে মুঠি করে ধরে মৃন্ময়ী বলে, তুমি কিন্তু প্রোটেকশন নাওনি।

ইচ্ছে করেই নিইনি।

মৃদু স্বরে বলে সরিৎ। তারপর উঠে ছেলের ঘরে চলে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করে, কথা দিলে তো যে, দয়ীকে বুঝিয়ে বলবে।

দিলাম।— বলে পাশ ফিরে শোয় মৃন্ময়ী। আজ সে ঘুমোবে না। আজ জেগে থাকতে তার কেমন লাগবে?

অফিস কামাই করে সে যখন টেরিটিবাজারে খুঁজে খুঁজে ম্লান ও মলিন অফিসঘরটায় পৌঁছল তখন ভারী হতাশ হল সরিৎ। একটা হাতকাটা গোমড়ামুখো ছেলে ছাড়া অফিসে কেউ নেই। ছেলেটা প্রশ্নের জবাবে বলল, ওঁর আসার কোনও টাইম নেই।

একটু বসব?

বসুন।

সরিৎ বসে থাকে। সে নিজে বিরাট চাকরি করে। ঝকঝকে তকতকে তার নিজের সাহেবি অফিস। এই ঘরটার মতো নোংরা ময়লা দমবন্ধ করা পরিবেশে সে বহুকাল ঢোকেনি। ঘরটাই যেন তার হতাশাকে দ্বিগুণ করে দিল। মন বলছে, এখানে তেমন কিছু সুবিধে হবে না।

কিন্তু সরিৎও সহজে ছাড়বে না। দয়ী আর বিনয় হয়তো কাল পরশুই রেজিস্ট্রি করবে। বিনয় কিছুতেই শুনল না। এবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে সরিৎ। মলয়কে নিয়ে সে হাজির করবে বিনয়ের মায়ের কাছে।

ফোনে তাকে মলয় বলেছিল, আপনি এত স্টুপিড কেন? বলেই ফোন রেখে দিয়েছিল। কথাটা কেন বলেছিল তা এখনও ভাল বুঝতে পারছে না সরিৎ।

মনের ধর্মই হল সে এক জায়গায় স্থির থাকে না। এক চিন্তা থেকে অদ্ভুত গলিঘুঁজি দিয়ে অন্যসব চিন্তায় ঘুরে বেড়ায়। সরিৎ ভাবতে ভাবতে গত রাত্রির অদ্ভুত ঘটনাটিতে নিবদ্ধ হল। সহজে নড়ল না সেখান থেকে। একবিন্দু ভালবাসাও সে কাল বোধ করেনি মৃন্ময়ীর জন্য। আগে থেকেই ঘটনাটা ছক করে রেখেছিল। বহুকাল ধরে শরীরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত মৃন্ময়ীকে সেই দুর্লভ আনন্দ দিয়ে বশ করবে। ঠিক ছক মতোই ঘটেছিল সব। ঘামে ভেজা সেই দেহের নোনতাস্বাদ জিভে লাগতেই ঘেন্নায় রি-রি করেছিল শরীর, মনে হয়েছিল অপরের উচ্ছিষ্ট এই শরীর, অন্যকে দেওয়া এর হৃদয়। তবু যখন দুটি দেহ আনন্দের চূড়ায় ক্ষণেক অবস্থান করেছিল তখন ইতিহাস মুছে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনও একটু উত্তপ্ত করে তোলে তাকে। এক সময়ে তার ধারণাই জন্মেছিল, তার আর

কামস্পৃহা নেই। ছিলও না। সে ভেবেছিল, বার্ধক্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। জড়ভরত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা তো নয়। এই নোংরা অফিসঘরে বসে সে সিদ্ধান্ত নিল, ভাল নাই বা বাসলাম, মাঝে মাঝে ভোগ করতে দোষ কী?

খুব আচমকাই একটা দীর্ঘ মানুষ সামনে এসে দাঁড়াল। কোনও শব্দ করেনি, করলেও শুনতে পায়নি সরিৎ। রুঠা লাবণ্যবর্জিত মেদহীন শক্ত চেহারা, বাঁপাশে ফাইবার গ্লাসের ক্র্যাশ হেলমেট ধরে আছে, কোমরে চওড়া বেল্ট, পরনে জিনস, কোমরে গোঁজা নীল রঙের গেঞ্জি শার্ট। হুট করে দেখলে মনে হবে বুঝি কোনও ইজরায়েলি কম্যান্ডো।

সরিৎ সামান্য চমকে উঠেছিল। লোকটা ক্রুর এবং স্থির দৃষ্টিতে মেপে নিচ্ছিল তাকে। তারপর ভারী ও ভাঙা ভীষণ পুরুষ গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি?

আমি দয়াময়ীর জামাইবাবু। সরিৎ।

ওঃ।— বলে হেলমেটটা সাবধানে টেবিলে রেখে ওপাশের চেয়ারে বসল মলয়। হাতকাটা লোকটাকে হুকুমের স্বরে বলল, পুণ্য দু' কাপ চা।

সরিৎ খুব ভাল করে মলয়কে দেখছিল। বাঙালি মেয়েরা আজকাল এরকম খুনে ডাকাতদের মতো চেহারার লোককেই বেশি পছন্দ করে নাকি?

মলয় হাঁটু তুলে টেবিলের কানায় ঠেস দিয়ে রাখল। তারপর বিনা ভূমিকায় বলল, আপনার ভাইকেই দয়ী বিয়ে করতে চাইছে বুঝি?

হ্যাঁ।

ফোনে আপনাকে স্টুপিড বলেছিলাম বলে দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। গত কয়েকদিন বিজনেসের ব্যাপারে খুব ডিস্টার্বড আছি। আমি আবাব একটু শর্ট টেম্পারড।

সরিৎ মৃদু স্বরে বলল, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। কারণ, আমি স্টুপিড নই। দ্বিতীয় কথা আমার প্রবলেমটা এত বেশি ইম্পর্ট্যান্ট যে এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

মলয় ভ্রু কোঁচকাল বটে কিন্তু মাথা নেড়ে জানাল যে, সে বুঝেছে।

সরিৎ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, আমি ফোনে আপনাকে সেই প্রবলেমটার কথাই বারবার বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন, আমার তবু না বলে উপায় নেই।

মলয় হাত তুলে বলল, ব্যস ব্যস। প্রবলেমের কথা শুরু হলে সহজে শেষ হবে না। আমার হাতে অত সময় নেই। সরি।

পুণ্য খুব অল্প সময়েই চা করে নিয়ে এল। ভাল চা। সরিৎ চুমুক না দিয়েও গন্ধ পাচ্ছিল। শান্ত স্বরেই সে বলল, আমি তবু আপনার কো-অপারেশন চাই।

ভ্রু কুঁচকে মলয় বলে, ওদের বিয়ে আটকানোর জন্য আপনি কত দূর যেতে রাজি?

যতদূর যাওয়া যায়।

মলয় টেবিলের ওপর তার চওড়া হাড়ের মজবুত হাতখানা বাড়িয়ে বলল, তা হলে ফিফটি থাউস্যান্ড রুপিজ ডাউন করুন। বিয়ে আমি আটকে দেব।

টাকা?— সরিৎ খুব অবাক হয়। সে এতটা আশা করেনি।

মলয় সামান্য হেসে বলে, ব্ল্যাকমেল নয়। এই টাকায় আপনি একটা বাঙালি প্রোডাকশনের শেয়ার কিনছেন। ডিভিডেন্ড পাবেন। শুনুন মশাই, দয়ী বা আপনার প্রবলেম নিয়ে ভাববার সময় আমার সত্যিই নেই। আই অ্যাম এ বিজি ম্যান। আপনার মতো মস্ত ইঞ্জিনিয়াররা যেমন মাসকাবারে মোটা মাইনে পায় আমি তেমন পাই না। এই টেরিটি বাজারে আমাকে মস্ত বড় বড় মহাজনদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। বিগ গানস আর আফটার মি। আমাকে তাই সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়। একচুল ভুল হলে ওরা ডুবিয়ে দেবে। সুতরাং, আপনার জন্য কিছু করতে হলে আপনাকেও আমার জন্য কিছু করতে হবে।

বক্তৃতাটা শান্তভাবেই শোনে সরিৎ। চায়ে চুমুক দেয় এবং মুখ তুলে বলে, আমার অত টাকা নেই।

মলয় মাথাটা একেবারে কাত করে বলে, আপনি দেড় লাখ টাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন না? সব খবর রাখি।

দেড় লাখ নয়, সোয়া লাখ। মাত্র থার্টি পার্সেন্ট ক্যাশ ডাউন করতে হয়েছে। তবু তাইতেই আমি প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট।

মলয় চা শেষ করে আখাম্বা দীর্ঘ শরীরটাকে পাক খুলে দাঁড় করায়। ক্র্যাশ হেলমেটটা বগলে নিয়ে বলে, তা হলে আমার কিছু করার নেই জামাইবাবু। আমি হঠাৎ বুঝতে পেরেছি কলকাতার ইকনমিটা আমাদের হাতে নেই। সেটা ফিরিয়ে আনাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। কাজটা আমাকে করতেই হবে।

সরিৎ লোকটার ওপর বিরক্ত হয়। বাস্তবিক একে প্রথম দর্শনে ইজরায়েলি কম্যান্ডো ভাবাটা ভুলই হয়েছিল। সেও ভ্রু কুঁচকে বলল, এগুলো কোনও সিরিয়াস কথা নয় মলয়বাবু। পঞ্চাশ হাজার টাকাটাও কোনও প্রবলেম নয়। টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক আছে, অজস্র মানিটারি ফান্ড আছে। আজকাল টাকার সোর্সের কোনও অভাব নেই। আপনি চাইলে আমি গ্যারান্টার দাঁড়িয়ে টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। নাটক করার কোনও দরকার নেই।

মলয় খুব ধীরে ধীরে বসল। তারপর খুব ধীর এবং গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক আছে। বলুন।

॥ রুকু ॥

সন্তোষপুরের মেয়েটিকে এক রবিবারে গিয়ে দেখে এল রুকু। দেখার অবশ্য কোনও মানেই হয় না। সঙ্গে বড়মামা ছিল, পিসেমশাই ছিল, পিসতুতো এক দিদি ছিল। আসলে দেখল তারাই। রুকু সেকেলে মানসিকতায় ভোগে। লজ্জায় সে মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকায়নি। এক আধ পলক দেখেছিল। মনে হল, ঢ্যাবঢেবে ফরসা বোকা চেহারা। মুখখানা মন্দ নয়, তবে বেশ বয়সের ছাপ আছে। এটুকু দেখেই জানালা দিয়ে বাইরে সারাক্ষণ চেয়ে ছিল সে। মেয়েটিকে অবশেষে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হল, আর তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা নগদের কথা পেড়ে ফেলল বড়মামা। সেই সঙ্গে একটা স্কুটারের দামও। তবে স্কুটারটাকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ধরলে পাঁচ হাজার রইল অনড় অটল হয়ে। রুকুর কোনও মতই চাওয়া হয়নি আগাগোড়া।

রুকু কেবলই ক'দিন ধরে ভাবছে, সে কি বাস্তবিক ব্যক্তিত্বহীন? ন্যায়-অন্যায়ের জোরালো মতামত কি নেই তার? সে নগদের ব্যাপারটাও কিন্তু কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। বউভাতের বিপুল একটা খরচ আছে। সেটা আসবে কোত্থেকে? বোনের বিয়ের ধারও শোধ হয়নি এখনও। নগদ নিলে আর কোনও অসুবিধে থাকে না। মেয়ের উকিল বাপ তাতে অরাজিও নয়। স্কুটারের কথাও ও পক্ষ ভাবছে। চারশো সি সি হোন্ডা মোটর-সাইকেলের কথা দূরে থাক তার যা রোজগার তাতে নিজের পয়সায় স্কুটার কেনার কথাও সে ভাবতে পারে না। শ্বশুর যদি দেয় তো কলকাতার এই অসহ্য ট্রাম বাস এড়িয়ে অফিস আর টিউশনিগুলো নির্বিঘ্নে সারতে পারবে। তা ছাড়া, নিজস্ব যে কোনওরকম স্বয়ংক্রিয় একটা যান থাকা খানিকটা সমৃদ্ধির পরিচয় তো! রুকু বহুকাল ধরে বড় গরীব। মানুষকে দেখানোর মতো কিছু নেই তার। মনটা মাঝে মাঝে লোভী হয়ে উঠছে।

এইসব টানাপোড়েনের মধ্যেই সে একদিন দয়ীর টেলিফোন পেল, শোনো, কাল আমাদের বিয়ে।

তোমার বিয়ে?

তবে কার?

না, জিজ্ঞেস করছি, কার সঙ্গে?

দয়ী খুব হাসল। বলল, ভয় পেয়ো না। ঠিক লোকের সঙ্গেই বিয়ে। বিনয়। আপাতত রেজিস্ট্রি হচ্ছে। সপ্তাহখানেক বাদে সোস্যাল ম্যারেজ। তুমি সাক্ষী দিতে আসতে পারবে?

আসব দয়ী।

অফিসের পর তা হলে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে এসো। কাউকে ব্যাপারটা বোলো না।

কাউকে বলতে কাকে বোঝাচ্ছ? মলয় কি?

দয়ী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, মলয় বা আর কাউকেই নয়।

বলব না দয়ী।

পরদিন একটু সেজেগুজেই অফিসে গেল রুকু। কিন্তু মনটা ভাল ছিল না। দয়ীর জন্যই মনটা খারাপ। বেচারা বড্ড কর্মফল ভোগ করছে। ভয় দুশ্চিন্তা অনিশ্চয়তা কত কী ওর পিছনে লেগেছে।

অফিসের পর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মিনিবাসে উঠে পড়ল সে। সাধারণত ওঠে না। বেশি পয়সা লাগে এমন যানবাহন তার কাছে অস্পৃশ্য। তবু আজ দয়ীর বিয়ে বলেই বেহিসেবি হওয়া গেল।

বাইরে থেকেই আজ দয়ীদের বাড়িটাকে শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। কেমন বিবর্ণ, রংচটা, বিকেলের পাঁশুটে আলোয় কিছুটা ম্লান। দয়ীকে আজ সে বলবে, বাড়িটার কলি ফেরাও না কেন? তোমার বাবার তো কত টাকা!

দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে সে একনাগাড়ে দয়ীদের প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ানটার বীভৎস ডাক শুনল। আজ যেন বড় হিংস্র হয়ে ডাকছে। এ বাড়ির সে প্রায় চেনা লোক। আগে প্রায়ই আড্ডা মারতে আসত, আজকাল আসা-যাওয়ায় ভাঁটা পড়েছে কিছুটা।

দয়ীদের একটি অল্পবয়সী ঝকঝকে চেহারার স্মার্ট চাকর আছে। ঘাটাল থেকে সে কলকাতায় এসেছিল ফিলমে নামবার জন্য। চান্স পায়নি বলে ট্যারা বসনের সাগরেদি করছে। কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে সে বম্বে যাবে বলে ঠিক ছিল। সেই যাওয়াটা এখনও হয়ে ওঠেনি। দোতলার বারান্দায় উঠতেই সেই চাকর সুমন্তকুমাবের সঙ্গে দেখা। সুমন্তকুমার নামটা বোধহয় সে নিজেই রেখেছে। এ বাড়ির সবাই তাকে ফ্যালা না কী যেন একটা নাম ধরে ডাকে। সে কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করলেই বলে, শ্রীসুমন্তকুমার। পদবি বলে না, কারণ ফিলম স্টারদের নাকি পদবি বলার রেওয়াজ নেই।

সুমন্তকুমার রুকুকে দেখেই হাসল। যখন তখন হাসে। বোধহয় ওর সাদা পোর্সিলিনের মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো লোককে দেখানোর জন্যই ওই দেখনহাসি। বলল, যান মেজদি ঘরেই আছেন।

ঘরেই ছিল দয়ী। তবে বিষণ্নবদনা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা টুলে বসা। উলটোদিকে একটা বেতের চেয়ারে কর্মঠ চেহারার এক ভদ্রলোক।

দয়ী মুখ তুলে বলল, তোমাকে আজ ফোন করতে ভুলে গেছি। আসলে রেজিস্ট্রিটা আজ হচ্ছে না। তুমি কষ্ট করে এলে।

রুকু অচেনা মানুষ দেখে অস্বস্তিকর কোনও প্রশ্ন করতে গেল না। শুধু বলল, তাতে কী? আসাটা তো হল। অনেকদিন আসা হয়নি।

বোসো রুকু। এই হচ্ছে বিনয়।

নমস্কার-টমস্কার সেরে রুকু আর একটা বেতের চেয়ারে বসে বলল, আজ হচ্ছে না তো হচ্ছে কবে?

দয়ী মাথা নেড়ে বলল, কিছু ঠিক নেই। রুকু, তুমি একবার মলয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

নিশ্চয়ই।

অস্বস্তি বোধ করলে যেয়ো না। এবার হয়তো ও তোমাকে আরও অপমান করবে।

রুকু মৃদু হেসে বলে, ওসব আমার অভ্যাস আছে। মলয় আমার অনেক পুরনো বন্ধু। কিন্তু ও কী করেছে বলো তো!

দয়ী একটু হাসল। বিষণ্ণতা মাখানো হাসি। তারপর বলল, সে এক ভারী ছেলেমানুষি কাণ্ড। বোধহয় জামাইবাবুই ওকে এ বুদ্ধি দিয়েছে। মলয় শয়তান হলেও মিন ছিল না কখনও। ও একটা ফল্‌স ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রোডিউস করেছে। তাতে আমার আর ওর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সই। মনে হয়, কাউকে আমি বলে সাজিয়ে নিয়ে গেছে রেজিস্ট্রারের কাছে।

ফল্‌স সার্টিফিকেট? তাতে তোমার বিয়ে আটকায় কীসে?

দয়ী অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে, আটকায় না সে তো জানি। কিন্তু ও আবার পুলিশ-টুলিশকে ইনফর্ম করেছিল। তারা এনকোয়ারিও করে গেছে। সইটা যে আমার নয় সেটা প্রমাণ হবে আদালতে। অনেকটা সময় নেবে। বুঝতেই তো পারছ, আমার পাসপোর্টের ঝামেলা আছে। আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটে কোনওরকম গোলমাল থাকলে চলবে না। তাই আজ রেজিস্ট্রি করা যাচ্ছে না।

রুকু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। খুব অবাক হল না। মলয়কে দয়ী মিন বলে গাল দিল। হয়তো কথাটা ঠিক নয়। মলয়কে কোনওদিনই খুব ক্ষুদ্র হতে দেখেনি রুকু। এ কাজটা হয়তো করেছে দয়ীকে আটকানোর অন্য কোনও উপায় নেই দেখে।

বিনয় নামক মানুষটি যদিও এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি তবু দু'-একবার তাকিয়েই রুকু লোকটাকে পছন্দ করে ফেলল। ধীর গম্ভীর বিবেচক মানুষ। কোনও উত্তেজনা রাগ বা হতাশার ভাব নেই। পোড় খেয়ে খেয়ে ভাবাবেগ কমে গেছে।

বিনয় কী একটু ভাবছিল। রুকুর দিকে চেয়ে বলল, আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। হাতে একদমই সময় নেই।

রুকু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি আজই মলয়ের কাছে যাচ্ছি।

দয়ী ধমক দিয়ে বলে, চা খেয়ে যাও। অফিস থেকে এসেছ না?

রুকু বসে পড়ে।

বিনয় নরম স্বরে বলে, মলয়বাবুকে তাঁর অফিসে পাওয়া যায়নি। আজ সারাদিন আমরা ফোনে চেষ্টা করেছি।

রুকু সংক্ষেপে বলে, আমি ওর বাড়ি চিনি।

চা আর খাবারের একটা ট্রলি ঠেলে ঘরে আনল সুমন্তকুমার। সঙ্গে দয়ীর দিদি মৃন্ময়ী। এই মহিলাকে আগেও কয়েকবার দেখেছে রুকু। খুবই অসুখী চেহারা। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক। কখনও বাইরের লোকের সামনে বেরোতেন না। রুকু শুনেছিল মহিলা মানসিক অপ্রেশনে ভুগছেন। আজ কিন্তু সেই বিমর্ষতা বা অস্বাভাবিকতা কিছুই দেখতে পেল না রুকু। বরং বেশ সুন্দর ও চটপটে দেখাচ্ছিল। সুমন্তকে বললেন, তুই যা, আমি দিচ্ছি।

বলে চটপটে হাতে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন, চা বানালেন। রুকু অবাক। যাওয়ার সময় উনি দয়ীর কানে কানে কী যেন একটু বললেন। দয়ী বিরক্তি প্রকাশ করল তাতে।

মৃন্ময়ী চলে গেলে দয়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, জানো রুকু, এই বিয়েটার মূলেই ছিল দিদি। এখন কী করে যেন জামাইবাবু দিদিকেও হাত করে ফেলেছে। দিদি আমাকে রাতদিন বোঝাচ্ছে, এই বিয়ে করা আমাব উচিত নয়। কী বিরক্তিকর বলো তো!

রুকু কথা খুঁজে পায় না। যত যাই হোক এসব তো দয়ীর পারিবারিক ব্যাপার।

চা খেয়ে রুকু ওঠে এবং অনভিপ্রেত কাজটি করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

ট্রাম পালটে পালটে খিদিরপুরে আসতে অনেকটা সময় গেল। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। মলয়দের বিশাল পুরনো বাড়িতে পৌঁছে ভিতরে ঢুকবার আগে সে গ্যারাজ ঘরটায় উঁকি

দিল এবং আবছায়ায় বিশাল ভয়ংকর চেহারার মোটর-সাইকেলটা দেখতে পেল। এত দামি জিনিস তার হবে না বটে, কিন্তু শ্বশুরের দৌলতে স্কুটারটা হতে পারে। কলকাতার রাস্তায় ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবে রুকু। বড় লোভ।

মলয় বাথরুমে। স্নান করছে। চাকর বসবার ঘর খুলে পাখা চালিয়ে বসিয়ে রেখে গেল তাকে। মলয়ের এই নিজস্ব বসবার ঘরে সময় কাটানোর মতো কোনও রঙিন ছবিওলা ম্যাগাজিন নেই। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে খুব সিরিয়াস ধরনের রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা। গূঢ় দর্শন শক্ত সামাজিক প্রবন্ধ বা অর্থনৈতিক বই। মলয় কোনওদিনই হালকা পলকা কিছু পড়ে না। কথা বললেই বোঝা যায়, ওর পড়াশুনো অতীব গভীর। মলয় বন্দুক পিস্তল নাড়াচাড়া করেছে বটে, কিন্তু রুকু জানে মলয়ের আসল জোর এইখানে। পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব তাকে বন্ধুমহলে প্রায় অপরাজেয় করে রেখেছে। মলয় কোনও বিষয়েই কখনও কারও কাছে হারেনি।

বসে বসে রুকু বড় হতাশাবোধ করছিল। সে জানে, মলয়কে কোনও বিষয় বোঝানো কত শক্ত। বরং মলয়ই মানুষের পুরনো বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা ভেঙে দিয়ে নতুন কিছুর বীজ বুনে দেওয়ার কাজ করে এসেছে এতকাল। একসময়ে তারাও কি মলয়ের প্রভাবে খানিকটা নকশাল হয়ে যায়নি?

খুবই দামি এক সাবানের গন্ধ ছড়িয়ে আচমকা ঘরে এল মলয়। পরনে পাজামা, খালি গা। চুলগুলো হাত দিয়ে পাট করা। রুকুকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে বলল, হ্যালো মাস্টারবেটার।

রুকুর মাথা আজ খুব ঠান্ডা। সে জানে অপমানিত বোধ করে নিজেকে নিয়ে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে মলয়ের সঙ্গে যুক্তির লড়াইয়ে এঁটে ওঠা অসম্ভব। কূট দাবার লড়াইয়ে প্রথম চালটার কথাই ভাবছিল রুকু। কীভাবে ওপেন করা যায়।

মলয় সোফায় বসে সেন্টার টেবিলের ওপর লম্বা পা দু'খানা মেলে দিয়ে বলল, সোজা দয়ীর বাড়ি থেকে আসছিস তো! মুখ-চোখ অত চোরের মতো কেন? বলতে ভয় পাচ্ছিস?

গভীর একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে রুকু। আর যাই হোক দয়ীর ব্যাপারটা মলয়ের মনের মধ্যে খুব যে গভীর নয় তা এক ঝলকেই বুঝতে পারে সে।

সতর্কভাবে রুকু বলে, যে ফলস ম্যারেজ সার্টিফিকেটে সই করেছে সেই মেয়েটা কে?

মলয় একটু পা নাচিয়ে বলে, তার কাছে এখুনি ছুটবি বুঝি? লাভ নেই। সে মরে গেলেও স্বীকার করবে না যে, তারই এই কাজ।

রুকু মলয়কে নরম করার জন্যই বলল, দ্যাখ মলয়, আমি জানি তোর সঙ্গে লড়া মানে পাহাড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আমার ক্ষমতা অত নয়।

মলয় হেসে বলে, অয়েল মাস্টার।

রুকু একটু থতিয়ে যায়। তারপর বলে, তোকে অয়েল দিয়ে যে লাভ নেই তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে? বিশ্বাস কর, অয়েল দিচ্ছি না।

মলয় ছাদের দিকে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে বলে, অয়েল বা কমপ্লিমেন্ট যাই হোক, তোর আদত কথাটা ঝড়াক করে বলে ফেল।

দয়ীকে ছেড়ে দে মলয়। ও তো গিনিপিগ নয় যে, ওর ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাবি। বিনয়কে বিয়ে করতে না পারলেও ও অন্য কাউকে বিয়ে করবে। তোকে করবে না।

মলয় শান্ত কিন্তু গভীর এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলে, সেই অন্য কেউটা কে? তুই নয় তো?

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে রুকু। বুকটা হঠাৎ উথাল পাথাল করে ওঠে অভিমানে। সে কোনওদিন এই অসম্ভব কথাটা ভাবেওনি। যদিও ঠাট্টা তবু তার দুর্বল জায়গায় বড় ঘা লাগল। এই ঠাট্টাটা মলয়ের অন্তত করা উচিত হয়নি। সে যে গরীব তা অহরহ ঢের বেশি টের পায় সে নিজেই। ধনী বান্ধবীরা যাতে কোনওদিন তাকে ল্যালা না ভাবে তার জন্য কত গা বাঁচিয়ে চলেছে সে। আসলে

তো এইসব পয়সাওলা ঘরের ছেলেমেয়েরা তার প্রকৃত বন্ধু নয়। এরা একদিন নিজেদের সমাজে চলে যাবে, সে পড়ে থাকবে মধ্যবিত্তের গন্ডিতে।

রুকু মৃদু স্বরে বলে, আমাকে এখনও রেশনের মাপা খাবারে সংসার চালাতে হয় মলয়। টিউশনি করে টাকা আনতে হয়। আমি স্বপ্ন দেখি না।

মলয় তেমনি হাসিমুখে বলে, অল মাস্টারবেটোরস আর ড্রিমারস।

রুকু আরক্ত মুখে চেয়ে থাকে। চালে ভুল হচ্ছে। তাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে মলয়।

মলয় আবার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ট্যারা বসনের অনেক টাকা হয়েছে, না? উঁচুতলার সমাজে ঢোকার পাসপোর্ট পেয়ে গেছে বুঝি?

ট্যারা বসন যে দয়ীর বাবার নাম তা জানত না রুকু। অবাক হয়ে বলে, ট্যারা কী বললি? কার কথা বলছিস?

দয়ীর বাবা। বাগমারির থার্ড গ্রেড গুন্ডা ছিল। তোকে তো বলেছি। ওয়াগন ভাঙত, ডাকাতি করত। ভয়ে পালিয়ে এসে টালিগঞ্জে ঢুকেছে। তার মেয়েকে যদি তুই বিয়ে করিস তবে সেটা ওর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্যি, বুঝলি গাড়ল? নিজেকে অত গরিব গরিব ভাবাটা আর এক ধরনের মাস্টারবেশন, তা জানিস?

রুকু আবার নিজের মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে। তারপর খুব স্বাভাবিক স্বরে বলে, তা হতে পারে। তবে দয়ীর জন্য আমার কোনও ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট নেই।

মলয় হঠাৎ লম্বা পা দু'খানা টেবিল থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে রুকুর দিকে চেয়ে বলে, কেন নেই? দয়ীর বাবা কি তোকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর একটা স্কুটার দিতে পারবে না? চেয়ে দেখিস, ঠিক পারবে।

রুকুর প্রথমটায় মনে হল সে ভুল শুনছে। তারপরই বুঝতে পারল তা নয়। বিস্ময়ে পাথর হয়ে যাওয়া যাকে বলে তাই হয়ে গেল রুকু। এসব কী বলছে মলয়? পাঁচ হাজার টাকা! স্কুটার!

বাড়ির চাকর ট্রেতে দু' গ্লাস ঠান্ডা বিয়ার নিয়ে এল। সঙ্গে নোনতা বিস্কুট। মলয় একটা গ্লাস তুলে একটা চুমুক দিল। বিয়ারের ফেনা ঠোঁট থেকে জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বলল, সন্তোষপুরের মেয়েটির বাবা তোকে যা দিতে পারে দয়ীর বাবা তার চেয়ে ঢের বেশি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে ট্যারা বসনকে ঝেঁকে নিতে জানা চাই। অ্যাপ্রোচ করে দ্যাখ না।

রুকু বড় একটা মদ খায় না। একটু নীতিবোধের বাঁধন ছিল। তবে আসল কারণ অর্থনৈতিক। মদের বড় দাম! অভ্যাস হয়ে গেলে বড় কষ্ট পেতে হবে। এখন অবশ্য বিয়ারের গ্লাসটা সে গভীর তেষ্টায় তুলে নিয়ে এক চুমুকে অর্ধেকটা মেরে দিল। তারপর তোম্বা মুখ করে বসে রইল চুপচাপ। কিছু বলার নেই। তার পরিবারের বাইরে কাকপক্ষীও এই খবর জানে না। কিন্তু মলয় জানল কী করে? মলয়ের চোখ কেন সবসময়ে তার সবকিছু দেখতে পায়?

মলয় বিয়ারটা খুব সামান্য খেয়ে রেখে দিল। তারপর বলল, আমি ডিটেকটিভ বা থটরিডার নই রুকু। তোর বড়মামার সঙ্গে একদিন ডালহৌসিতে দেখা হয়েছিল। উনিই খুব আনন্দের সঙ্গে খবরটা দিলেন। বললেন, মাইয়াডাও চমৎকার, ফেমিলি চমৎকার, দিব থুইব অনেক। পাঁচ হাজার নগদ, স্কুটার, আরও কত কী!

রুকু লজ্জায় কিছুক্ষণ তাকাতে পারল না। তারপর কথা বলতে গিয়ে দেখল গলাটা ফ্যাসফ্যাস করছে। বলল, ওসব দাবিদাওয়া আমি করিনি।

মলয় ডান পা-টা তুলে চাপা গলায় বলল, এক লাথি মারব শালা! দাবিদাওয়া তোমার নয় তো কার? ভূতের পিসির? সব শালাই বিয়ের পণের ব্যাপারে রেসপনসিবিলিটি শিফট করতে চায়।

রুকু বিয়ারের তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে খেয়ে নেয়।

মলয় ক্রূর চোখে চেয়ে ছিল। বলল, যে-ক'টা ইকনমিক ক্রাইম আছে পণ নেওয়াটা তার মধ্যে

একটা, তা তুই জানিস? ক্রাইম করছিস কর, কিন্তু ফের কোনওদিন মর‍্যালিটির কথা যদি বলবি তবে মুখ ভেঙে দেব।

মলয় তার চাকরকে ডেকে রুকুকে আর এক গ্লাস বিয়ার দিতে বলে। রুকু আপত্তি করে না।

মলয় ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, দয়ী কী বলল?

রুকুকে মলয় অতি দক্ষতার সঙ্গে আবার রংফুটে ফেলে দিয়েছে। আত্মগ্লানিতে ডুবে বসেছিল সে। দয়ীকে নিয়ে একফোঁটাও ভাবছে না। প্রশ্নটার আলগা জবাব দিল, খুব ভেঙে পড়েছে।

মলয় হেসে বলে, আমিও তাই চাইছি।

তুই কি মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাস মলয়?

মলয় মাথা নেড়ে বলে, আই অ্যাম নট এ স্যাডিস্ট।

বলে একটু ফিচেল হাসি হেসে ফের বলল, দয়ী তোকে কখনও বলেনি যে, আমি হোমোসেকসুয়াল?

রুকু নাড়া খায়। একটু চমকে ওঠে। বলে, না তো!

হয়তো বলেছে, কিন্তু সেটা আমাকে বলার সাহস তোর নেই।

মলয় সবই জানে। তাই রুকুর কিছু বলার ছিল না। চুপ করে রইল। মলয় জিব আর টাকরায় চুক চুক করে একটা আফসোসের শব্দ তুলে বলে, তুই এত কমজোরি, তবু দয়ী যে কেন তোকেই তার রক্ষাকর্তা বলে ঠাউরেছে সেটাই রহস্য।

রুকু মাথা নেড়ে বলে, আমি দয়ীর রক্ষাকর্তা নই। দয়ী মোটেই আমাকে তা মনে করে না।

কথাটায় কান না দিয়ে নিজের কথারই জের টেনে মলয় বলে, আর তুইও কেন যে ওর হয়ে লড়ে যাচ্ছিস তাই বা কে বলবে! আর ইউ ইন লাভ?

রুকু দ্বিতীয় বিয়ারের গ্লাসও শেষ করেছে। একটু রিমঝিম করছে মাথা। তবু কথাটা মাথায় সেঁধোল, খুব ভদ্র গলায় সে বলল, ওসব কেন বলছিস? দয়ী বিনয়বাবুর সঙ্গে অলরেডি এনগেজড।

এনগেজমেন্ট আর ভালবাসা তো এক জিনিস নয়। যদি দয়ীর প্রতি তোর দুর্বলতা থেকে থাকে তো বল তোর জন্য আমি দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিতে রাজি। যদিও জানি দয়ী একটা অত্যন্ত বাজে ফ্যামিলির থার্ড গ্রেড মেয়ে তবু তোর মামলা হলে আমি ছেড়ে দেব।

রুকু একটু রুখে উঠে বলে, বাজে কথা বলবি না।

তুই তো চিরকালের গাড়ল, তাই হয়তো বুঝতে পারছিস না যে, দয়ীকে তুই ভালবাসিস। কিংবা হয়তো পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর স্কুটারের লোভে তোর মাথা বিগড়ে গেছে বলে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিস না।

অস্ফুট স্বরে আর এক গ্লাস বিয়ার চাইল রুকু। সে জানে পৃথিবীজোড়া লক্ষ লক্ষ মাস্টারবেটার আছে, হাজার হাজার লোক পণ নিয়ে বিয়ে করছে। তারা সবাই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভোগে না। কিন্তু রুকু ভোগে। প্রতি মুহূর্তে সে কেন নিজেকে নিয়ে এত সংকোচের সঙ্গে বেঁচে আছে? যদি সে এসব ব্যাপারকে গ্রাহ্য না করত তা হলে মলয় এ লড়াই এত সহজে জিততে পারত না।

অনভ্যাস এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধতার দরুণ উত্তেজনায় রুকু তৃতীয় গ্লাসটাও প্রায় এক চুমুকে শেষ করল। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, পৃথিবীতে যাই ঘটুক তাতে তার কিছু এসে যায় না। সে মুখ তুলে সোজাসুজি মলয়ের দিকে চেয়ে বলে, ফলস ম্যারেজ সার্টিফিকেট ধুয়ে তুই বরং জল খা। আমি উঠি।

খুব হো-হো করে হাসে মলয়। বলে, সাবাস। এই তো কথা ফুটেছে।

রুকু দাঁড়ায় এবং বেশ তেজের গলায় বলে, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে মলয়, কিন্তু আমি তোর মতো ক্রিমিন্যাল নই। তোর মতো ইতরও নই। একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে তুই কত দূর নেমেছিস! দয়ীর ওই মেরুদণ্ডহীন জামাইবাবু কত টাকা দিয়েছে তোকে?

চুকচুক করে আবার সেই আফসোসের শব্দ করে মলয়। তারপর বলে, থার্ড গ্রেড মেয়ে হলেও দয়ী দেখতে বেশ ভাল। আমি সুন্দরী মেয়েদের বিদেশে রফতানি পছন্দ করি না। আর সর্বনাশের কথা বলছিস রুকু? দয়ীর সর্বনাশ করতে পারে এমন বদমাশ আজও জন্মায়নি! বরং সর্বনাশ তার, যে ওর পাল্লায় পড়বে। বোস, একটু হুইস্কি খা। ভাল স্কচ আছে।

না।

রুকু গোঁয়ারের মতো মাথা নাড়ে। তবে বসেও যায়।

মলয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তুই গাড়ল হলেও তোর প্রতি আমার দুর্বলতা বড় বেশি। কোনওদিন তুই কারও ক্ষতি করিসনি। দয়ীর জামাইবাবু আমাকে কত টাকা দিতে পারে বলে তোর ধারণা?

বলে চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ নজরে রুকুকে খানিক দেখল মলয়। তারপর বলে, তুই গাড়ল না হলে এটা বুঝতে পারতিস যে, আমার বাবারও কিছু কম টাকা নেই। দয়ীর জামাইবাবু যা মাইনে পায় আমার নিজের মাসের রোজগার তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। আমি আমার ল্যাবরেটরি আর প্রোডাকশন ইউনিটের জন্য জামাইবাবুকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে বলেছিলাম। লোকটা তাইতেই মাইনাস হয়ে গেল। তবে লোকটির সঙ্গে আমাব অন্যরকম একটা সমঝোতা হয়েছে বটে। মস্ত ফার্মের বড় ইঞ্জিনিয়ার। লোকটাকে হাতে রাখলে আমার কাজ হবে।

রুকু গম্ভীর মুখে বলে, সমঝোতাটা কী ধরনের?

মলয় রসিকতার ভাবটা ঝেড়ে ফেলল। থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, আমার মিশন হল ধীরে ধীরে কলকাতার ইকনমিটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া। ইট ইজ এ ড্যাম ডিফিকালট জব। অর্গানাইজড রাইভ্যালরি রয়েছে। আছে হাজারো বাধা। আমি একটা প্রোডাকশনে নামতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই দেয়ার আর বিগ অফারস ফ্রম রাইভ্যাল গ্রুপ। সইকুমার নামে একটি ছেলে টাকার ফোয়ারা খুলে দিতে চাইছে। কিন্তু আমি জানি ওর সঙ্গে কোলাবরেশনে গেলে একদিন আমি হয়ে যাব স্লিপিং অ্যান্ড সাইলেন্ট পার্টনার। প্রোডাকশন কন্ট্রোল করবে ও। পাছে বাগড়া দেয় সেই ভয়ে ওকে আমি রিফিউজ করিনি। জানি সইকুমার একা নয়, ওর পিছনে রয়েছে অর্গানাইজড গ্রুপ। স্টেপিং-এ একটু ভুল হলেই ওরা আমার হাত থেকে সব ছিনিয়ে নেবে। তাই তলে তলে আমাকে প্রোডাকশনে নামার কাজে এগোতে হচ্ছে। জামাইবাবু হয়তো একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক। কিন্তু হি ইজ এ ভেরি কমপিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইতিমধ্যেই আমার প্রোডাকশন ইউনিটের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে দিয়েছে। বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিচ্ছে লোন হিসেবে। ওর নিজের ফার্ম থেকেও বিস্তর জিনিস দেবে। তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। সইকুমার তো একা নয়, স্বয়ং রাজ্য সরকারই সাইফার। আমার বাবা একবার প্রোডাকশনে নামবে বলে মস্ত কারখানা খোলার প্ল্যান নিয়েছিল। সরকার পুরো ব্যাপারটা ভাল করে দেখেটেখে একদিন জানাল, এত বড় প্রোডাকশনে নামবার মতো যথেষ্ট টাকার জোর তোমার নেই। সেই একই স্পটে, প্রায় একই প্ল্যানিং-এ এক মারোয়াড়ি লেটার অফ ইনটেন্ট পেয়ে গেল। তার এখন রোরিং বিজনেস।

রুকু মাথাটা টিপে ধরে বসে ছিল। মলয়ের এই সব বড় বড় কথা সে বহুকাল ধরে শুনছে। কিছুতেই যে কিছু হবে না তা সে ভালই জানে। জানে না শুধু মলয়। সে বলল, ওসব আমি ভাল বুঝি না মলয়। আমি দয়ীর ব্যাপারটার একটা মীমাংসা চেয়েছিলাম।

মলয় যেন এক স্বপ্নের রাজ্য থেকে ফিরে এসে প্রথমটায় প্রসঙ্গটা বুঝতেই পারল না। তারপর মাথা নেড়ে বলল, দয়ী! ওঃ দয়ী! শোন রুকু, আমি যে বিপুল সমস্যা ঠেলে চলেছি সেখানে রোমান্সের নামগন্ধ নেই। একটা ফালতু মেয়ে কাকে বিয়ে করল বা না করল তাতে বয়েই গেল আমার। ক'দিন আগেও আমি ভাবছিলাম তোকে ফোনে ডেকে বলে দিই, দয়ীকে মুক্তি দিলাম। ও

যা খুশি করুক। কিন্তু হঠাৎ এল জামাইবাবু। লোকটা দুনিয়াতে আর কিছুই চায় না, শুধু নিজের শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের সর্বনাশ চায়। বিশেষ করে দয়ীর। বেচারা! এরকম অবসেশন আমি আর কারও দেখিনি। কিন্তু লোকটাকে আমার হাতে রাখতে হল। তাতে ভালই হয়েছে। হি হ্যাজ বিকাম দি গ্রেটেস্ট হেলপ টু মি। আমার মস্ত বড় প্রোজেকটের জন্য আমি কয়েক ডজন দয়ীকে কোতল করতে পারি, সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি।

তুই কি আজকাল মেয়েদের ভুলে যাচ্ছিস মলয়?

মলয় ভ্রু কুঁচকে শানানো একখানা হাসি হেসে বলে, ভুলতে দিচ্ছে কই? দে আর কনস্ট্যান্ট হ্যাজার্ডস, যে জায়গায় মেয়েরা কাজ করে সেখানেই ভণ্ডুল। সেজেগুজে কামেশ্বরী হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে ডামির মতো। ব্রেনলেস, কোয়ারলসাম, সেলফিস একটা স্পেসিস। যে বিষয়ে যোগ্যতা নেই সেই বিষয়েই কথা বলবে। আজকাল আমি মেয়েদের বাস্তবিক পুরুষের পথের বাধা বলে মনে করি। কোনওদিন ক্ষমতা হাতে পেলে আমি মেয়েদের সিধে বলে দেব, ব্যাক টু কিচেন।

রুকু জিজ্ঞেস করে, তা হলে দয়ীর কী হবে?

মলয় মাথা নেড়ে বলে, কিছু হবে না। আপাতত জিয়ল মাছের মতো দয়ী থেকে যাবে। ওর জামাইবাবুকে আমার দরকার। দেশের জন্য, দশের জন্য দয়ীর মতো মেয়েদের কোনও স্যাক্রিফাইস নেই, এমনকী নিজেদের পরিবারের জন্যও ওরা এক বিন্দু দায়িত্ব বোধ করে না। এবার দয়ীকে সেই স্যাক্রিফাইসটুকু করতে হবে।

উদ্ভট! উদ্ভট!— বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে রুকু। তারপর বিয়ারে ঝিমঝিম করা মাথা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মলয়ের দিকে তর্জনী তুলে বলে, তোর মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। দয়ী ঠিকই বলেছিল, দেখো ওর একদিন পাগলামি দেখা দেবে।

খুব শান্তভাবে কথাটা নিল মলয়। তারপর বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, এ কথাটা দয়ী হয়তো মিথ্যে বলেনি। খানিকটা পাগলামি না থাকলে বড় কিছু করার কথা ভাবা যায় না। পাগলামি ছাড়া যে সব মানুষ আছে তাদের মনটাও নিতান্ত মধ্যবিত্ত। তারা বিজ্ঞের মতো দুনিয়ার সব বড় প্রচেষ্টাকেই পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে শেখে। সেটা না শিখলে আয়নায় নিজের মুখ দেখবে কোন লজ্জায়?

অনভ্যাসের বিয়ার রুকুর মাথাটা কোলে নিয়ে মগজে হাত ঢুকিয়ে সব ভাবনা চিন্তা ও যুক্তির বোধকে সস্নেহে এলোমেলো করে দিচ্ছে। রুকু তাই একটু নাটুকে হাসি হেসে বলে, বড় কিছু বলতে তো ফোর্থ গ্রেড ব্যাবসা। আর ব্যাবসা মানেই চোরের ওপর বাটপাড়ি, কালো টাকা আর লোক ঠকানো। তুই আর বড় কিছুর কথা ভাবতে পারলি না মলয়?

মলয় উঠে এসে পিঠ চাপড়ে দিল রুকুর। আদর করে বলল, দারুণ বলেছিস। দারুণ। তবু আবার বলি তোর সব ভাল। তবে একটু সাবালক হওয়া দরকার। মাস্টারবেটার, সাবালক হতে হলে একটু মেয়েমানুষ ঘাঁটতে হয়। দয়ীর হয়ে ওকালতি করছিস, ফিজ বাবদ একদিন চেখে দ্যাখ না। বিয়ের আগে নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে থাকবে। দয়ী কোনও পুরুষকেই রিফিউজ করে না। সেই যে ওদের বাড়ির হ্যান্ডসাম চাকরটা, ফ্যালা না কী যেন নাম, সেও ওর ক্লায়েন্ট।

রুকুর মাথাটা ঝুলে পড়ল, ছি ছি।

॥ দয়ী ॥

লুল্লুভুল্লু আমি একদম পছন্দ করি না। এসব হচ্ছেটা কী?

ট্যারা বসনের গলার স্বর অনেক নিচু, অনেক ভদ্র। তবু তা ট্যারা বসনেরই গলা বলে চেনা যায়।

দয়ীর শরীরটা ভাল নেই। সকালবেলায় নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে আছে। আটটা বেজে গেছে। চড়চড়ে রোদ উঠেছে বাইরে। মোটা পর্দা টানা আছে জানালায় দরজায়, তাই বেলা বোঝা যায় না। তবু ভ্যাপসা গরম টের পাচ্ছে সে। সকাল থেকে লোডশেডিং। দয়ীর মাথা ধরে আছে রাত থেকে। অল্প জ্বর। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা। তার চেয়েও যন্ত্রণা হঠাৎ এই সকালে ট্যারা বসনের এই হানাদারি। কোনওদিনই লোকটা এত সাহস পায়নি।

দয়ী খুব কৌতূহল বোধ করে দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। নিজের মেয়ে হলেও বয়সের মেয়ে, তাই ট্যারা বসন তার শোওয়ার ঘরে ঢোকেনি। পর্দার আড়াল থেকে ডাক দিয়ে তবে দরজার পর্দা সরিয়ে এপাশে এসে চৌকাঠেই আলিসান দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোমরে হাত। চোখ অত্যন্ত বিঘূর্ণিত।

দয়ী ঠান্ডা গলায় বলে, কী বলছ?

বলছি লুল্লুভুল্লু আমি পছন্দ করি না। এসব দু'নম্বরি মেয়েছেলের মতো কী করে বেড়াচ্ছ? লোকে যাচ্ছেতাই বলে! দেশে ছেলের অভাব নেই, বিয়ে বসলেই তো হয়।

হঠাৎ কী হল তোমার? সাতসকালে আজেবাজে কথা বলছ কেন?

তোমাদের সঙ্গে কথা বলা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি। বাধ্য হলে বলতে আসি। কাল রাতে একটা ছোকরা ফোনে তোমার নামে খিস্তি দিচ্ছিল। প্রায়ই দেয়। কাল খুব অসহ্য লাগল। এর আগে জামাই এসে কীর্তন গেয়ে গেছে। এসব তো আগে শুনিনি। কী হচ্ছে সব?

কাল রাতে কে ফোন করেছিল?

তার আমি কী জানি? বরুণ না কী যেন নাম।

দয়ী সামান্য হাসল। বলল, ও বরুণ-টরুণ কেউ নয়। জামাইবাবুই মাঝে মাঝে নাম ভাঁড়িয়ে ফোন করে আজকাল।

জামাই!— খুব অবাক হয় ট্যারা বসন। ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে ওঠে। চাপা গলায় বলে, ইতর।

দয়ী উঠে বসল। নাইটি হাঁটু পর্যন্ত উঠে ছিল, তা টেনে নামাল অলস হাতে। এলো চুল গোছা করে খোঁপা বাঁধল। বলল, দিদি আর খুব বেশি দিন বাঁচবে না। ওই জানোয়ার ওকে তিল তিল করে মারছে, তুমি দেখতে পাও না? দিদিকে না তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসতে?

ট্যারা বসন খর দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, সে তার বউকে কী করবে না করবে তার এক্তিয়ার। কিন্তু কুমারী মেয়েদের পিছনে লাগবে কেন এভাবে? লোকটা তো মরদ নয় দেখছি।

দয়ী উঠল। বলল, আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না।

ট্যারা বসন একটু রুখে উঠে বলে, ভাবতে চাই না বলেই সাবধান করে দেওয়া। বাতচিত যা করবে সিধে করবে। আমি সিধে কথার মানুষ। সেই আমেরিকার ছোকরাটা কী বলছে?

কী বলবে?

শুনলাম তোমাদের রেজিস্ট্রি সেদিন হয়নি। কেন হল না তাও আমাকে জানানো দরকার মনে করোনি তোমরা। শুধু ভদ্রতা করে জানিয়েছিলে যে, ওই ছোকরার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে।

সব কথা কি তোমার শোনা দরকার?

যতদিন তোমার বিয়ে না হচ্ছে ততদিন আলবত দরকার। আমি মূর্খ হলেও তোমার গার্জিয়ান। বিয়ের পর তোমাদের কোনও ব্যাপারে নাক গলাতে যাব না। সে তোমার গলা কেটে ফেললেও না। আমি কতগুলো নিয়ম মেনে চলি।

দয়ীর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বলে, জামাইবাবুর অত্যাচারে যদি দিদি কোনওদিন মরে যায় তা হলেও তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে! কিছু করবে না?

বসন মাথা নাড়ে, না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে বাইরের লোকের কিছু করার নেই।

তার মানে দিদিকে তুমি আসলে ভালবাসো না।

ট্যারা বসনের চোখদুটো প্রচণ্ড জ্বলছিল। বলল, ওসব কথা ছাড়ো। আমেরিকার ছোকরাটার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে না হয় তবে আমাকে বোলো। আমি সাত দিনের মধ্যে পাত্র ঠিক করে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। দু'নম্বরি মেয়েছেলের মতো যা খুশি করে বেড়ানো আর চলবে না। লুল্লুভুল্লু একদম পছন্দ করি না।

তোমার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করতে যাব কেন? আমি কি খুকি?

বেশ ঠান্ডা গলাতেই বলে দয়ী। যদিও তার ভিতরে রাগের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

না যদি করো তবে সিধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। নিজের ইজ্জত নষ্ট করবে করো, কিন্তু বাড়ির ইজ্জত নষ্ট কোরো না।

ট্যারা বসন পায়ের দাপে বাড়ি কাঁপিয়ে বিদেয় হয়ে যায়। দয়ী ড্রেসিংটেবিলের সামনে গিয়ে অবশ হয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ বসে থাকে।

তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। হুড়মুড় করে বাথরুমের কাজ সেরে লঘু একটু বাইরের সাজ করে নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়ে! অফিসে বেরিয়ে পড়ার আগেই মলয়কে ধরতে হবে! মুখোমুখি হওয়াটা দরকার।

ভয়ংকর চেহারার মোটর-সাইকেলটা সবে স্টার্ট দিয়েছে মলয়, ঠিক সে সময়ে দয়ীর গাড়ি এসে পিছনে দাঁড়াল। দয়ী ডাকল, শোনো মলয়।

মলয় ফিরে তাকায়। ঝকঝকে নীল ক্র্যাশ হেলমেট আর মস্ত রোদচশমায় একেবারেই অচেনা দেখাচ্ছে মলয়কে। হিংস্র, ভয়ংকর, শক্তিমান, রহস্যময় চেহারা। দয়ীর দিকে কয়েক পলক চেয়ে যেন চিনতে সময় নিল। তারপর বলল, হ্যালো দয়ী।

দয়ী গাড়ি থেকে নামে না। হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে, গাড়িতে এসো।

মলয় মোটর-সাইকেলটা হিঁচড়ে আবার স্ট্যান্ডে তোলে, ক্র্যাশ হেলমেটটা খুলে লম্বা চুল পাট করতে করতে গাড়ির জানালায় হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে, কী খবর?

দয়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, আক্রোশে। থমথমে গলায় বলে, গাড়িতে ওঠো। যেখানে যেতে চাও পৌঁছে দেব।

পেট্রলের অনেক দাম দয়ী।

ইয়ার্কি কোরো না মলয়। আমার সিরিয়াস কিছু কথা আছে।

আর আমার আছে খুব সিরিয়াসতর কাজ। হৃদয়বেদনার ব্যাপার নিয়ে কথা বলার মতো সস্তা সময় কোথায় দয়ী?— খুবই ভদ্র ও নরম গলায় বলে মলয়। তেমনি জানলায় ঝুঁকে, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

আমি খুব বেশি সময় নেব না।— দয়ী অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে।

হৃদয়ের ব্যথার কথা কি সংক্ষেপে হয় দয়ী? বলতে বলতে কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বেড়ে যায়। তোমার কাছে মাথা ধরার ট্যাবলেট আছে তো!

দয়ী গাড়ির ইনজিন চালু করে বলে, প্লিজ মলয়।

তবে দাঁড়াও।

বলে মলয় গিয়ে তার ক্র্যাশ হেলমেট রেখে চাকরকে মোটর-সাইকেল গ্যারেজে তুলতে বলে দিয়ে আসে।

দয়ী গাড়ি ছাড়তেই মলয় বলে, সোজা টেরিটিবাজার।

দয়ী গাড়ি চালাতে চালাতে কী ভেবে একবার দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। তারপর আড়চোখে মলয়ের মুখখানা একবার দেখে নেয়। খুবই ভাবলেশহীন কঠোর মুখ। কোনও ভাবাবেগ নেই, কোনও নরম রেখা নেই ওর মুখে। কাঠের মতো শক্ত ও নীরস মানুষ।

দয়ী যে-তেজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল এখন তা অনেক নিভে গেছে। যখন কথা বলল তখন করুণ শোনাল গলা। বলল, তুমি কথা রাখোনি।

মলয় জবাব দিল না।

শুনছ?— দয়ী একটু স্বর তুলে বলে, তুমি কথা রাখোনি। কথা ছিল, আমরা কোনওদিন রেজিস্ট্রির কথা প্রকাশ করব না। আমরা কোনও দিন ব্যাপারটা স্বীকার করব না। তুমি কথা রাখলে না কেন মলয়?

মলয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বাঁয়ে কেটে...বাঁয়ে কেটে!

দয়ী এক থামন্ত মিনিবাসকে ধাক্কা দিতে দিতে বাঁয়ে কেটে এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। মিনিবাসের কন্ডাক্টর দরজা দিয়ে বিস্ময়কর ভাবে ঝুঁকে পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, শালার এগারো হাতে কাছা হয় না আবার গাড়ি চালাচ্ছে।

রেসকোর্সের ধারে গাড়ি দাঁড় করাতে বলে মলয়, তারপর দয়ীর সঙ্গে জায়গা বদল করে নিয়ে হুইল ধরে। বলে, হৃদয়ে কি খুব বেদনা দয়ী? আজ খুব লুল্লুভুল্লু হয়ে যাচ্ছে তোমার।

লুল্লুভুল্লু কথাটা ট্যারা বসনের পেটেন্ট। কবে কোন ফাঁকে মলয় সেটা সংগ্রহ করে রেখেছে। তার মুখে কথাটা শুনে এত সিরিয়াস অবস্থাতেও ফিক করে হেসে ফেলল দয়ী। আর হাসতেই কোনও এক অদৃশ্য ম্যাজিকে মনের ভাব নেমে গেল হঠাৎ। একটা শ্বাস ফেলে বলল, তুমি আজকাল খুব কাজের লোক হয়েছ শুনতে পাই। মারোয়াড়িদের হাত থেকে ব্যাবসা কেড়ে নেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছ কাঁধে। সেইজন্যেই কি দেখা করারও সময় পাও না?

সময় পেলেও দেখা করার কী আছে?

কিছু নেই?

কিছু নেই।

মানছি।— দয়ী মৃদু স্বরে বলে, কিন্তু আমার ওপর দাবি-দাওয়া তবে ছাড়ছ না কেন? কেন আজকাল প্রেমপত্র লেখো আমাকে? আমি তো জানি ওগুলো মোটেই প্রেমপত্র নয়, থ্রেটেনিং লেটার। ছেড়ে দিয়ে ফের কেন তেড়ে ধরছ? ছেলেমানুষি ইমোশনে রেজিস্ট্রি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে দু'জনেই তো আলোচনা করে দেখেছি, এই বিয়ের কোনও মানে হয় না।

সবই ঠিক দয়ী।

তবে? কেন এই অদ্ভুত কাজ করছ তুমি?

মলয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ভ্রুকুটি ফুটে ওঠে কপালে। বলে, সবই ঠিক, তবু কথা আছে দয়ী। আমার মনে হয় তোমার মতো মেয়ে যে ঘরে যাবে, যে পুরুষের বউ হবে সে, সেই ঘর এবং পুরুষ সারা জীবন ধরে জ্বলবে। তোমার বেসিক ফেইথফুলনেস নেই। তোমার মনের কোনও গভীরতা নেই। তাই তুমি যাতে সমাজ ও মানুষের খুব বেশি ক্ষতি করতে না পারো সেইজন্য আমি তোমাকে আটকাতে চেয়েছিলাম।

বাঃ! চমৎকার কথা! কবে থেকে এত বড় মানবদরদী হয়েছ মলয়?

আজকাল একটু একটু ব্রডনেস আসছে দয়ী।

এটা ব্রডনেস নয় মলয়, মিননেস। আমি যতখানি খারাপ তুমি ততখানিই খারাপ। তুমি সেলফিস, ক্রুয়েল, কিলার, মিন।

মলয় মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা। আমাকেও আটকানো দরকার। সে ভারটা তুমিই নাও না।

আমি তোমাকে ভীষণ ঘেন্না পাই।

উত্তেজিত হোয়ো না দয়ী, আমি জানি তুমি বিনয়কে ভালবাসোনি, কোনওদিন কাউকেই বাসতে পারবে না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। যাকেই তুমি বিয়ে করবে তারই সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হবে নেহাত ফিজিক্যাল অ্যান্ড ফিনানসিয়াল। কিছুদিন পর তাকেও তুমি ঘেন্না করবে। এ সবই রুটিন।

তোমারও কি তাই নয়?

বটেই তো! তাই ভাবছিলাম ফল যখন একই তখন তোমাকে খামোকা আমেরিকায় একসপোরট করে লাভ কী? আমি হয়তো-বা তোমাকে সামলাতে পারব, কিন্তু যে তোমাকে চেনে না বা জানে না সে বেচারা ডুবজলে পড়বে। মেয়েদের লুল্লুভুল্লু আমি পছন্দ করি না দয়ী।

দয়ী হাসল না। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে অনন্ত ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। অসহনীয় রোদের তেজ। গাড়ির ভিতরটা বয়লারের মতো তাতা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দয়ীর অস্থির লাগছিল। মলয় ধীর, স্থির, অবিচল। ঘাড় সোজা রেখে সামনে চেয়ে আছে।

দয়ী বলল, তুমি সিরিয়াসলি আমাকে বিয়ে করার কথা ভাবছ?

মলয় মাথা নেড়ে বলে, না। ক'দিন আগেও ওরকম একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এসেছিল বটে। কিন্তু এখন সেটা কেটে গেছে। আমি চাই, তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো।

জামাইবাবু কি তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে?

না। বরং আমিই জামাইবাবুকে পরামর্শটা দিয়েছি।

আমাকে চিরকাল ঠুঁটো করে রাখতে চাও?

একজ্যাক্টলি। ভুলে যেয়ো না, প্রথম একসঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব তুমিই করেছিলে। রেজিস্ট্রির আইডিয়াও প্রথম তোমার মাথাতেই এসেছিল। নিজের কবর তুমি নিজেই খুঁড়েছ দয়ী। আমাকে তার জন্য দায়ী করাটা ঠিক হবে না।

তুমি ব্ল্যাকমেল করছ।

আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ব্ল্যাকমেল তাকেই করা যায় যার কিছু লুপহোল থাকে।

দয়ী চুপচাপ কিছুক্ষণ রুমাল কামড়ায়। তারপর বলে, বিনয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে তুমি খুব সাকসেসফুলি আটকেছ মলয়। কিন্তু এর পরের বার তা আর পারবে না। আমি ডিভোর্সের মামলা আনব।

সেটাই তো উচিত ছিল।

তখন তো আটকাতে পারবে না।

হয়তো পারব না। কোনও মানুষকে খুন না করে পুরোটা দখল করা যায় না। খুন আমি ছেড়ে দিয়েছি। তুমিও একদিন মুক্তি পাবে।

দয়ী কথা বলল না। এসপ্ল্যানেডের ট্র্যাফিকের জট ছেড়ে গাড়ি শামুকের মতো বেন্টিংক স্ট্রিটের মুখে এসে পড়ল। লালবাজারে আবার জ্যাম। গরমে ভেপে উঠছে ছোট গাড়ির ভিতরটা।

দয়ী রুমাল কামড়ায়। তারপর আক্রোশে ফোঁসফোঁসানির মতো শব্দ করে বলে, বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে।

মলয় ধীর স্বরে বলে, সেটাও কোনও প্রবলেম নয়। তোমার অনেক পথ আছে।

জানি, তুমি চাকরি করতে বলবে। মেয়েদের হসটেল বা মেসে গিয়ে থাকতে বলবে।

কিংবা কোনও আশ্রমে। গিধনিতেই তো সৎসঙ্গের একটা চমৎকার আশ্রম রয়েছে।

মলয়ের মুখে গিধনির উল্লেখ শুনে একটু চমকে ওঠে দয়ী। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা সাইরেন বেজে ওঠে। একবার মলয়ের দিকে তাকায় সে।

মলয় সামনের দিকে চেয়ে থেকেই মৃদুস্বরে বলে, জায়গাটা তোমার খারাপ লাগবে না। সেখানে তোমার জন্যই একটা ছেলে খুন হয়েছিল।

বহুকাল ধরে এই একটা প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে দয়ী। পারছে না। ঘুরে-ফিরে সেই স্মৃতি এসে হানা দেয়। মলয় তাকে কেন এত ঘেন্না করে তা কি সত্যিকারের জানে না দয়ী? জানে। রুকু যেদিন ফোনে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল সেদিনও আপাদমস্তক জুড়ে একটা স্টিমারেব ভোঁ বেজে উঠেছিল। নাকি সাইরেন? সে চাপা স্বরে বলল, বোলো না, তোমার পায়ে পড়ি।

কেন, শুনলে কি ভয় পাও? নাকি অনুশোচনা আসে?

কিছু একটা হয়।

খুব ভাল, খুব ভাল। কিছু একটা অন্তত হচ্ছে। সেটাই আশার কথা!

দয়ী থম্ ধরে থাকে কিছুক্ষণ। এই নরকের মতো ভ্যাপসা গরমে তার মাথা তেতে উঠছে। বশে থাকছে না তার মাথা। অভিমানভরে সে বলল, এসব তুমি রুকুকেও বলেছ মলয়। কাজটা ঠিক করোনি।

আমার কিছু গোপন করার নেই। তোমার হয়তো আছে।

দয়ী মাথা নত করে থাকে।

অনন্ত, জটিল, ভয়ংকর এক জ্যামে গাড়ি আটকে থাকে। গাড়ির ছোট্ট কুঠুরি আরও ভেপে যায়, চনচনে গরম হয়ে ওঠে ধাতব যন্ত্রপাতি। ক্রমান্বয়ে চারদিককার গাড়ির হর্ন আর মানুষের অসহ্য চিৎকার চেঁচামেচি আক্রমণ করে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে। জ্যামে আটক মানুষ ক্লান্তিতে আধোঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে খোলা অবারিত পথ, সবুজ ঘাসের দেশ আর নিস্তব্ধতাব স্বপ্ন দেখতে থাকে।

দয়ীর বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। এই ভরদুপুরেও সে জেগে থেকে এক দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠল ভয়ে। মাথা ঠিক থাকল না। মলয়ের স্টিয়ারিং-এ রাখা একখানা হাত চেপে ধরে বলল, তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

কোন কৌশলে মলয় গাড়িখানাকে উলটোদিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল তা বুঝতেই পারল না দয়ী। তারপর দয়ীর দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে খামোকা এই জ্যামে আর বেশিদূর টেনে নেব না। আমার অফিস আর খুব দূরে নয়। তুমি এখান থেকেই ফিরে যাও দয়ী।

দয়ী বেখেয়ালে মলয়ের হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল। এখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তুলে আনল হাতখানা। দেখল, তার নরম করতল মলয়ের পুরুষ শরীরের ঘামে ভিজে আছে। কিন্তু তাতে ঘেন্না পেল না দয়ী।

॥ সরিৎ ॥

বারান্দায় ফুলের টবে চারাগাছ বসাচ্ছিল সরিৎ। এমন সময়ে বর্ষার জলভারনত মেঘ এল আকাশ ভরে। সময় ছিল না, কয়েকটা ঝিলিক হেনে বড় বড় পদক্ষেপে হেঁটে চলে এল বৃষ্টি। মুহূর্তেই গ্রাস করে নিল চরাচর।

ঘরেব ভিতরে এসে দরজাটা দিয়ে সরিৎ। বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখল, সোফায় বসে মৃন্ময়ী নিজের মাথা টিপে ধরে চোখ বুজে আছে। একটু আগেই অনেক বমি করল। বারান্দা থেকেও শব্দ পাচ্ছিল সরিৎ।

থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে?

ভাল না।— মৃন্ময়ী বলে।

মৃন্ময়ীর গর্ভসঞ্চারে সরিৎ কি খুশি? বাথরুমের বাইরে বেসিনে মাটিমাখা হাত ধুতে ধুতে দেয়ালের আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে সরিৎ। তার গোলগাল মেদবহুল মুখে কোনও ভাবান্তর বোঝা যায় না।

আজ বাবুন বিকেলে ওর স্কুলের একটা ফাংশনে গেছে। ফাংশনের শেষে স্কুলের গাড়ি এসে দিয়ে যাবে। বাড়িটা তাই বড় ফাঁকা। বাবুনকে ছাড়া সরিতের প্রতিটি মুহূর্তেই একটা অভাব বোধ হয়।

সে নিঃশব্দে গিয়ে বাবুনের পড়ার টেবিলে বসে বইপত্র খুলে দেখছিল কিন্তু মন দিতে পারল না। ওঘরে কি মৃন্ময়ী ওয়াক তুলল একবার?

সরিৎ বিড় বিড় করে বলল, হবে না? অত ঘুমের বড়ি খেলে এ অবস্থায় বমি-টমি হতেই পারে।

নিঃশব্দে মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকে সে টেবিল থেকে সমস্ত ঘুমের ওষুধগুলো তুলে আনে। নিজের লকারে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। একটু ইতস্তত করে সে। তারপর গোদরেজের আলমারি খুলে মৃন্ময়ীর সেই আত্মহত্যার চিরকুটটা বের করে। কোনও মানে নেই এটার। এই চিরকুট তাকে প্রতি মুহূর্তেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে দিচ্ছে। কাগজটা ছিঁড়ে জানালা দিয়ে বৃষ্টিতে বিসর্জন দেয় সরিৎ।

তারপর সোফায় মৃন্ময়ীর পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে।

মৃন্ময়ী টের পায়। একটা হাত বাড়িয়ে তার কোলে রাখে। চোখ খুলে খুব ম্লান একটু হেসে বলে, খুব ক্রেডিট, না?

কীসের ক্রেডিট?

এই যে আবার বাচ্চার বাবা হতে চলেছ!

বাইরে বৃষ্টির তাণ্ডব। ফাঁকা বাড়ি। বহুদিন হয় ভুলে যাওয়া শরীরের আবার জেগে ওঠা। সব শপথ ভেসে যায় সরিতের। কাঁপা হাতে সে মৃন্ময়ীর মুখটা ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে নির্লজ্জের মতো চুমু খায়। তারপর টেনে নেয় নিজের দিকে। অস্ফুট স্বরে বলে, আজ রাত থেকে আমরা একসঙ্গে শোব।

অনেকক্ষণ বাদে আদর শেষ হলে মৃন্ময়ী ঝকমকে চোখে সরিতের দিকে তাকায়। ঠোঁটে সরল একটা আনন্দের হাসি। তারপরই একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সামনের সপ্তাহে বিনয় ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে। দয়ীর কী হবে?

সরিৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, কী হবে তার আমি কী জানি!

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, আমি জানি তোমার মন কত বড়। তুমি ইচ্ছে করলেই ওদের মিলিয়ে দিতে পারো।

পারি না মৃন্ময়ী।

কেন পারো না? তুমি বললেই মলয় সরে দাঁড়াবে।

সরিৎ মুখখানা তোম্বা করে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর আস্তে করে বলে, মলয় বা দয়ীর প্রবলেম আমরা ঠিক বুঝব না। ও নিয়ে কিছু ভেবো না মৃন্ময়ী। মনে কোরো না যে, আমি বাধা দিয়েছিলাম বলেই জট এত পাকিয়েছে। জট পাকিয়েই ছিল। ওদের সময় দাও। হয়তো নিজেরাই একদিন সলভ করতে পারবে।

যদি না পারে? দয়ী যদি আত্মহত্যা করে?

সরিৎ আবার তোম্বা মুখে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর একটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে। বলে, বিশ্বাস করো, সেই আত্মহত্যার জন্য আমি দায়ী নই।

আপনি লেটার অফ ইনটেন্ট পেয়ে গেছেন মলয়বাবু! ভেরি গুড। আমার সঙ্গে আপনি ট্রেচারি করলেন, কিন্তু আমি মাইন্ড করি না। আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান। প্রোডাকশনে নামতে যাচ্ছেন, সেও খুব ভাল কথা। কিন্তু মনে রাখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাওয়ার শর্টেজ, র মেটেরিয়াল বোমবাইয়ের হাতে। ইট উইল নট বি অ্যান ইজি জব।

মলয় সইকুমারের মুখের দিকে খুনির চোখে চেয়ে ছিল। কিন্তু বাস্তবিক সইকুমারকে সে দেখছেও না বা তার কথা নিয়ে ভাবছেও না। সে বেশ বুঝতে পারছে এখন, সমস্যাবহুল এই পশ্চিমবঙ্গে তার প্রোডাকশন ইউনিট বেধড়ক মার খাবে।

সইকুমার একটু ঝুঁকে বন্ধুর মতো বলে, লেবার ট্রাবলের কথাটাও ভুলে যাবেন না। এই স্টেটের মতো ডিসওবিডিয়েন্ট, ইনসিনসিয়ার অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ লেবারার আর কোথাও নেই। গভর্নমেন্ট আপনাকে লেটার অফ ইনটেন্ট দিয়েছে ওনলি টু ফিনিশ ইউ। যারা ক্লেভার তারা অন্য জায়গায় বেস করার চেষ্টা করছে। আমি এখনও বলছি হরিয়ানা চলুন। দেয়ার আর সো মেনি পসিবিলিটিজ। দিস স্টেট ইজ ইন দি হ্যান্ডস অফ কমিউনিস্টস।

মলয় জ্বালাধরা চোখদুটো দিয়ে সইকুমারকে ছাই করে দিতে পারত। কিন্তু তা করল না। বলল, আমি ভেবে দেখব সইকুমার। কত আর ভাববেন? বাঙালি বেশি ভাবে বলেই তো কাজ হয় না। আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। আফটার সেভেন ডেজ দিস অফার উইল নট বি ভ্যালিড।

সইকুমার উঠে চলে যায়।

পুণ্য তার টিনের চেয়ারে পাথরের মতো বসে ছিল। এখন একটু নড়ল। তারপর হঠাৎ বলল, তাই চলুন।

মলয় একটু অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

পুণ্য গম্ভীর মুখে বলে, আপনি যা ভাবছেন তা হওয়ার নয়। সকাল থেকে কারেন্ট নেই। সইবাবু মিথ্যে বলছেন না।

মলয় কথাটার জবাব দেয় না। ভাবতে থাকে। সইকুমার কেমন লোক তা বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, লোকটা মিথ্যে বলেনি। সে যে স্বপ্ন দেখছিল এতদিন, তা হওয়ার নয়। সে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ল। পুণ্যকে চা দিতে বলল।

চা খেয়ে ক্র্যাশ হেলমেট বগলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে মলয়।

চারশো সি-সির ভয়ংকর হোন্ডা মোটর-সাইকেলটা গজরাতে থাকে বাঘের মতো। কলকাতার ঘিঞ্জি জটপাকানো রাস্তায় তার তীব্র গতিকে বার বার সংযমে বেঁধে রাখতে হয় বলেই কি তার রাগ?

মলয় আজ এই ভরা মেঘের দুপুরে মোটর-সাইকেলটাকে বলল, আজ খেল দেখানোর চানস্ দিচ্ছি তোকে। আজ মন ভাল নেই।

ভাল লাগে না, কিছুতেই ভাল লাগে না কলকাতার এই জট। তার কেবলই মনে পড়ে বীরভূমের খোয়াই, বাঁকুড়ার রোদে-পোড়া মাঠ, জলহীন দুঃখী গাঁ, চাষি মানুষের এবড়ো-খেবড়ো মুখ। বুড়ি কলকাতার যৌবনহীন দেহ আর কত ভোগ করবে মানুষ? প্রকৃতিহীন, শুষ্ক ছিবড়ে এই শহর তার মুমূর্ষু শরীরে শেষ ধর্ষণের ক্লেশ সহ্য করেছে মাত্র। তার শ্বাস ওঠার শব্দ পায় মলয়। কলকাতাকে কেউ কোনওদিন ভালবাসতে পারেনি। হয়তো সেই প্রেমহীনতাই তার মৃত্যুর কারণ হবে একদিন। সেদিনের বেশি দেরিও নেই। নিভে যাচ্ছে আলো, রাস্তার জ্যামে অনির্দিষ্টকাল থেমে আছে গাড়ি, জল ফুরিয়ে আসছে, বন্দর অচল হয়ে এল, এসপ্ল্যানেডে পাশাপাশি পড়ে আছে মানুষের মল ও মৃতদেহ।

কলকাতার জট ছাড়িয়ে অবারিত বম্বে রোডে পড়ে হোন্ডা তার ঘুমন্ত গতিকে জাগিয়ে তোলে। দাঁতে দাঁত চাপে মলয়। একশো ছাড়িয়ে দেড়শো কিলোমিটারে লাফিয়ে চলে গেল কাঁটা। নাক আর ঢাকা কানের ফুটো দিয়ে বাতাসের তীব্র ঝড় ঢুকে তার মাথা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল লেটার অফ ইনটেন্ট, প্রোডাকশন, কলকাতার অর্থনীতির লাগাম ধরার শপথ। দূরপাল্লার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ট্রাককে বাঁয়ে ফেলে ফেলে ভৌতিক গতিতে ছুটে যাচ্ছে হোন্ডা। এত জোরে মলয় কখনও চালায়নি আগে। দুই শক্ত হাতে হ্যানডেল চেপে ধরে উপুড় হয়ে আছে সে। কোথায় যাচ্ছে?

সামনেই একটা ব্রিজ। স্পিড ব্রেকারের সতর্কবাণী চোখে পড়ল না মলয়ের। কেন পড়ল না তা কে জানে। মলয়ও জানত না। তবে মনের গভীরতম প্রদেশে সে ঠিকই টের পেয়েছিল আজ শুধু যাওয়ার দিন, ফেরার নয়। নইলে সব ব্রিজেরই আগে স্পিড ব্রেকার থাকে একথা সে ভোলে কী করে? যখন সময় হয় তখন রন্ধ্রপথেই কালনাগিনী এসে ঢোকে। কেউ কেউ তা টের পায়।

মলয় হঠাৎ দেখল একটা ধাক্কা খেয়ে তার বিশ্বস্ত মোটর-সাইকেল অনেকটা আকাশে উঠে গেল। ভারী অবাক হল মলয় যখন দেখল, মোটর-সাইকেল নামছে অন্তত দশফুট শূন্য থেকে। নীচে ব্রিজের লোহার কাঠামো, ঢালু গড়ানো জমি, অনেক নীচে চিকমিক করছে খানিকটা জল।

শেষ মুহূর্তেও মোটর-সাইকেলটার রাশ টেনে রাখার চেষ্টা করল সে। একটুও ভয় করল না। মোটর-সাইকেলে এত উঁচুতে শূন্যে কোনও দিন ওঠেনি সে। ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করল। তারপর পড়ল।

কিছুই তেমন টের পেল না মলয়। শুধু দেখল একটা মস্ত খরার মাঠে প্রথম বৃষ্টির ঢল নেমেছে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! মৃদু একটু হাসলও সে বোধ হয়।

॥ রুকু ॥

বম্বে ফ্লাইটের যাত্রীদের সিকিউরিটি চেক-এর জন্য ডাকা হচ্ছিল। লাউঞ্জে এক-ভিড় লোকের মধ্যে দয়ী বসে কাঁদছে। সিঁথি সিঁদুরে ভর্তি। কত পবিত্র দেখাচ্ছে ওকে। রুকু মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ট্যারা বসন সস্নেহে পিঠে হাত দিয়ে বলল, ওঠো মা।

দয়ী ওঠে।

রুকু এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে দয়ীর নাগাল পায়নি। এবার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, একা যাচ্ছ, সাবধানে যেয়ো দয়ী।

দয়ী মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, আজকাল ভয়ের কিছু নেই।

তবু অনেক দূরের পথ তো। বিদেশ।

আমার ভয় করছে না রুকু। কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে চিঠি দিয়ো। ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছে আবার।

দেব।

তারপর গলা একটু খাটো করে রুকু বলে, টেপরেকর্ডারের কথা মনে আছে তো!

হেসে দয়ী মাথা নাড়ে, আছে রুকু। ঠিক পাঠাব। সবার আগে তোমারটা।

রুকু সিকিউরিটি এনক্লোজার পর্যন্ত এগিয়ে দেয় দয়ীকে। এক-ভিড় লোক ঘিরে ধরে ফের। ট্যারা বসন, মৃন্ময়ী, সরিৎ, দয়ীর আরও ভাইবোন, আত্মীয়, বন্ধু এবং বান্ধবী। সকলেই কথা বলতে চাইছে।

রুকু একটু সরে আসে। এবার কলকাতায় বড় শীত পড়েছে। নিউ ইয়র্কে হয়তো বরফ পড়ছে। কোনওদিন সেই বরফ দেখা হবে না রুকুর।

সকলের অলক্ষে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাউঞ্জের ঠিকরে আসা আলোয় ঝকঝক করছে তার নতুন স্কুটার। সে ভারী তৃপ্তি ও অহংকারের সঙ্গে সিটে উঠে স্টার্ট দেয়।

বেরনোর সময় তার বউ মঞ্জুলা রোজ বলে দেয়, সাবধানে স্কুটার চালাবে। আজকাল ভীষণ অ্যাকসিডেন্ট হয় কিন্তু।

সেটা জানে রুকু। একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তাকে মাস্টারবেটার বলার আর কেউ নেই। কেউ আর তাকে বিয়ের পণ বা যৌতুক নিয়ে খোঁটা দেবে না। বিনয়ের সঙ্গে দয়ীর বিবাহিত জীবন ফিলাডেলফিয়ায় নির্বিঘ্ন হবে বলেই মনে হয়।

রুকু জানে সে কোনওদিন বিপ্লব করবে না, খুন করবে না, বন্দুক পিস্তল ছোঁবে না, সে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিজের হাতে নেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠবে না। কোনওদিন চারশো সি সি-র ভয়ংকর হোন্ডাও চালাবে না সে। তার কাছে কোনও মেয়ের নেই অপরিশোধ্য শরীরের ঋণ। রুকুকে বেঁচে থাকতে হবে। রোজ বাড়ি ফিরতে হবে নিরাপদে। কতগুলো প্রাণী তাকিয়ে আছে তার দিকে।

খুবই সাবধানে রুকু স্কুটার চালাতে থাকে।

নীলু হাজরার হত্যারহস্য

নির্জন এক নদী সারাদিন এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে মৃত্যুর করুণ গান গায়। চারদিকে নিস্তব্ধ এক উপত্যকা, দু'ধারে কালো পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে আকাশে। এই বিরলে শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মতো হু হু বাতাস বয়ে যায়। অজস্র সাদা ছোট বড় নুড়ি পাথর চারদিকে অনড় হয়ে পড়ে আছে। খুব সাদা, নীরব, হিম, অসাড় সব পাথরের মাঝখান দিয়ে সেই নদী—উৎস নেই, মোহনা নেই। সারাদিন এখানে শুধু তার করুণ গান, মৃদু বিলাপের মতো। কিছু নেই, কেউ নেই। শুধু হাড়ের মতো সাদা পাথর পড়ে থাকে নিথর হয়ে। উপত্যকা জুড়ে এক মৃত্যুর সম্মোহন। এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে নদী অবিরল গান গেয়ে যায়।

আনমনা আঙুল থেকে আস্ত সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল ফুটপাথে। সিগারেটের আজকাল বড্ড দাম। তার ওপর এটা বেশ দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট। শখ করে কিনে ফেলেছে বৈশম্পায়ন। আনমনেই বৈশম্পায়ন সেটা কুড়োতে নিচু হয়েছিল। শর্মিষ্ঠা দশ পা পেছনে, ছেলের বায়না মেটাতে ফুটপাথের দোকান থেকে মোজা বা গেঞ্জি কিনছে, আর অনবরত মৃদুস্বরে ধমকাচ্ছে ছেলেকে। দশ পা এগিয়ে এসেছে বৈশম্পায়ন। দশ পায়ের বিচ্ছিন্নতা। সিগারেটটা কুড়োতে হাত বাড়িয়েও সে ফিস ফিস করে বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

কুড়োনো হল না। নতুন একটা যে ধরাবে তাও হল না। এরিয়ালে এসে লাগল সেই মৃত্যুনদীর গান। সাদা নিথর হিম পাথর সব মনে পড়ে গেল।

ডুমকি এখন অনেক দূরে। কারশিয়াং-এ। ডুমকির জন্য বড় হু-হু করে ওঠে বুক। মানুষ তো পাখি নয় যে, উড়ে যাবে। ডুমকির সঙ্গে এই অনেকটা অসহায় দূরত্ব এই মুহূর্তে ভীষণ টের পায় বৈশম্পায়ন।

দশ পায়ের দূরত্বে শর্মিষ্ঠা এখনও কী যে কিনছে। কই এসো, বলে তাকে এখন একবার তাগাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সেরকম কোনও ইচ্ছেই হল না বৈশম্পায়নের। থাক, কিনুক। ছেলে বুবুম একবার ফিরে দেখল বাবাকে। তারপর ঝুঁকে পড়ল দোকানের জিনিসপত্রের ওপর।

বৈশম্পায়নের পকেটে গোদরেজের চাবি। পকেটে হাত পুরে চাবির রিংটা মুঠো করে ধরে থাকে সে কিছুক্ষণ। তার ফ্ল্যাট মোটামুটি নিরাপদ। প্যান্টের চোরা পকেটে বোনাসের দেড় হাজার টাকা। চাবির রিং ধরার ছলে সে দেড় হাজার টাকার ফোলা অংশটাকেও স্পর্শ করে আছে। কিন্তু এরিয়ালে নির্ভুল গানের তরঙ্গ ভেসে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে গোদরেজের চাবির নিরাপত্তা, টাকার মূল্য। বৈশম্পায়ন আর একটা সিগারেট বের করে।

সিগারেটটা ধরানো হল না কিছুতেই। আকাশ এখন কেমন? ছেঁড়া মেঘের তুলো গড়িয়ে যাচ্ছে নীল বেডকভারে। এখনও বৃষ্টির স্যাঁতা ভাব উবে যায়নি ফুটপাথের শান থেকে। শরৎ সবচেয়ে প্রিয় ঋতু বৈশম্পায়নের। তার প্রিয় হল টাকা, প্রিয় ডুমকি আর বুবুম। প্রিয় হোক বা না হোক অবিচ্ছেদ্য হল ওই শর্মিষ্ঠা। তার আরও কিছু প্রিয় আছে, তবে সবসময়ে একরকম নয়। তার প্রিয় রং সাদা। প্রিয় রাগ হংসধ্বনি। প্রিয় অভ্যাস বসে থাকা বা ঘুম। এই শরতের প্রিয় রোদে বউ আর ছেলেকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে তার আগাগোড়া ভারী ভাল লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ...

শর্মিষ্ঠা দোকান থেকে জরদা পান মুখে দিয়ে তবে এল। হাতের জালের ব্যাগে দুটো ছোট

প্যাকেট। আস্তে আস্তে প্যাকেট বাড়বে। জালের ব্যাগ উপচে পড়বে। আজ তারা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবে। সারাদিনের প্রোগ্রাম।

কিন্তু এখন বৈশম্পায়নের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি একটু অবিন্যস্ত, অস্থির। সে বলল, বাড়ি যাবে?

শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে বলল, বাড়ি যাব? এখনও তো কেনাকাটা শুরুই হল না!

বলতে বলতেই সে বৈশম্পায়নকে ভাল করে লক্ষ করে এবং গলার স্বর পালটে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

ভরা প্যাকেট ঢোকাতে গিয়ে সিগারেটটা দুমড়ে ফেলল বৈশম্পায়ন। চিন্তিত মুখে বলল, খারাপ লাগছে।

তাহলে চলো। ট্যাকসি ডাকি।

ডাকো।

বলে বুবুমের হাত ধরে বৈশম্পায়ন। পরক্ষণেই মনে হয়, ব্যাপারটা অত্যধিক নাটুকে হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর তেমন খারাপ নয় যে, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু বাসায় ফিরলে অন্তত শর্মিষ্ঠার কাছে মুখ রাখতে তাকে অসুস্থতার থিয়েটার করতেই হবে। তা পারবে না বৈশম্পায়ন। বড় অস্থির লাগছে তার, ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দেবে।

শর্মিষ্ঠা ট্যাকসি ডাকতে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈশম্পায়ন বলল, শোনো।

কিছু বলছ?

কেয়াতলা চলো। মাধবদের বাসায় একটু বসি। হয়তো সেরে যাবে।

শরীর কেমন লাগছে বলো তো!

অস্থির। বোধহয় পেটে গ্যাস-ট্যাস হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা জানে, আজকাল স্ট্রোকের কোনও বয়স নেই, এবং মানুষ যখন তখন মরে যায়। দু' চোখে ঘনীভূত সংশয় আর ভয় নিয়ে সে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, বরং কোনও ডাক্তারের চেম্বারে চলো। দেখিয়ে নিয়ে যাই।

বুবুম মুখে আঙুল পুরে ঊর্ধ্বমুখে বাবাকে দেখছিল। বাবাকে হাতের নাগালে পেলেই বায়না করা তার স্বভাব। কিন্তু এখন সেও কিছু টের পেয়ে গেছে। তিন বছরের বুদ্ধি আজকাল কিছু কম পাকে না। সে চুপ করে চেয়ে ছিল।

বৈশম্পায়ন বলল, ডাক্তার দেখানোর মতো কিছু নয়। একটু রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ গেল না। তবে সে আপত্তিও করল না।

গড়িয়াহাটা থেকে সামান্য হাঁটতেই কেয়াতলার মোড়। মাধবদের বাসা মোড়ের কাছেই।

দরজা খুলল মাধবদের বাচ্চা ঝি। বাসায় আর কেউ নেই।

শর্মিষ্ঠা এই অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সে বলল, ওরা তো ফিরবে। আমরা বরং একটু বসি।

ঝি শর্মিষ্ঠা এবং বৈশম্পায়নকে চেনে। মৃদু হেসে বলল, বসুন না!

বাইরের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে ডবল সোফা রয়েছে। বৈশম্পায়ন লম্বা মানুষ। শর্মিষ্ঠা একটু চিন্তিত হয়ে বলে, তুমি বেডরুমেই চলো। শোবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নেড়ে বলে, আর না। পাখা খুলে দাও। একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জল খাবে?

খাব।

শর্মিষ্ঠা নিজেই ডাইনিং স্পেস থেকে ফ্রিজের জল নিয়ে এল। বলল, আস্তে আস্তে খেয়ো। ভীষণ ঠান্ডা।

বৈশম্পায়নের ফ্রিজ নেই। কিনবে কিনবে করছে। খুব সাবধানে সে একটু একটু করে অল্প জল

খেল। শরীরটা যে কোথায় খারাপ, কেন খারাপ তা ভেবে দেখতে লাগল সে।

বুবুমকে হিসি করাতে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। ফিরে এসে বলল, এদের সবকিছুই এত ঝকঝকে পরিষ্কার! বাথরুমটায় শুয়ে থাকা যায়।

বৈশম্পায়ন এসব কথা নতুন শুনছে না। মাধব আর তার বউ ভালই থাকে। গুছিয়ে থাকে। সাজিয়ে থাকে। কিন্তু এই থাকা না-থাকার কোনও অর্থ আজ সে খুঁজে পাচ্ছে না। সোফায় ঘাড় হেলিয়ে সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে সে পাখার বাতাস শুষে নিচ্ছিল। সেইভাবেই রইল।

শর্মিষ্ঠা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুধের বোতল আর সন্দেহের বাক্স বের করে ছেলেকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। সারাদিনই তাকে অক্লান্ত চেষ্টা করে যেতে হয়। ছেলে খেতে চায় না। প্রথমে কাকুতি মিনতি "বুবুম লক্ষ্মীসোনা। এই একটুখানি... আচ্ছা সেই ছড়াটা বলছি, হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাহলে সেইটে বলি... চলে মস মস মস মস বাঁ ডান মস মস সবচেয়ে ভাল পা গাড়ি, উঃ... সেই সকালে কখন একটু দুধ খেয়েছে, এত বেলা হল, কিচ্ছুটি নয়! খাও বলছি। খাও। দাঁড়া তো... দেব? দেব পিঠে একটা দুম করে?"

এসবই মুখস্থ বৈশম্পায়নের। এরপর মৃদু একটা থাপ্পড় এবং বুবুমের কান্না। সে চোখ না খুলেই বলল, আমার শরীর ভাল লাগছে না। একটু চুপ করো।

শর্মিষ্ঠা আর শব্দ করল না। কিন্তু তার এই নীরবতা রাগে ভরা তাও বৈশম্পায়ন জানে। শর্মিষ্ঠা ছেলেকে নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেল।

চোখ খুলল এবং প্যাকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটটা বের করে সযত্নে সোজা ধরিয়ে ফেলল।

চার বেডরুমের এই ফ্ল্যাটটা মাধব কিনেছে বছর দশেক আগে। তখন ফ্ল্যাটের দাম দু' লাখের কাছাকাছিই হবে বোধহয়। বাইরের ঘরটা দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বুককেস দিয়ে সাজানো। কিছু পেতল আর পোড়ামাটির বাছাই কাজ রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটা তেলের ছবি, কিছু ওরিজিন্যাল প্রিন্ট। মেঝেয় একটা সত্যিকারের উলেন কার্পেট। খুব বড় নয়, তবে বসার জায়গাটুকু ঢাকা দিয়েছে। কার্পেটটির বাইরে ছিট ছিট লাল-কালো-সাদা মোজাইক করা মেঝে আয়নার মতো ঝকঝকে। মাধব আর ঝিনুকের ছেলেপুলে নেই।

"আমাকে পুষ্যি নে না" বলে ঠাট্টা করেছে একসময়ে বৈশম্পায়ন। কখনও আর একটু ফাজিল হয়েছে "তোর কর্ম নয়, ঝিনুককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।" কিন্তু এখন আর কিছু বলা যায় না। ওদের আর হবে না তা বোঝা গেছে। তাই আর ঠাট্টা চলে না।

বৈশম্পায়ন খুব বড় একটা শ্বাস ফেলল। গোদরেজের তিন-চারটে চাবির গোছা পকেটে থাকায় ফুটছিল। গোছাটা বের করে শর্মিষ্ঠার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখল সে।

আবার চোখ বুজল। তার কি শরীর খারাপ? তার কি মন খারাপ?

খাবার ঘর থেকে বুবুমের অল্পস্বল্প কান্না আসছে। শর্মিষ্ঠা বেশ জোর গলায় ধমক মারল দুটো। বৈশম্পায়ন গ্লাসটা তুলে আবার একটু জল খায়। এখন আর জলটা তেমন ঠান্ডা নয়।

মাধবের সঙ্গে আগে যত ভাব ভালবাসা ছিল আজ আর তা নেই। এই পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে থেকে বৈশম্পায়ন দূরত্বটা টের পায়। কবে কখন যে আস্তে আস্তে তারা দূরে সরে গেছে তা টেরও পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজকাল মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীটাই এমন হয়ে গেছে যে, কেউ আর নিকট হয় না কেবলই দূরে সরে যায়।

বৈশম্পায়ন জলের গ্লাসটা নাড়ে। জল ঘুরপাক খায় গ্লাসের মধ্যে। ঠান্ডা ভাবটা আরও কমে গেছে। আরও একটু জল খায় বৈশম্পায়ন।

মাধবের বাসায় আসতে তবু ইচ্ছে করে কেন তার? সে রহস্যটা জানে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঝিনুকও কি জানে?

বৈশম্পায়ন নিঃশব্দে ওঠে। পর্দা সরালেই ওদের সুন্দর শোওয়ার ঘরটি। বারো বাই চোদ্দো ফুট হবে। চার দেয়ালে চার রকম মোলায়েম রং। দুটো সিঙ্গল খাট। মাঝখানে এক চিলতে কার্পেট। ছোট একটা ক্যাবিনেটের ওপর ফুলের ভাস। তাতে টাটকা রজনীগন্ধাও। ক্যাবিনেটের ওপর স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো স্বামী-স্ত্রীর ফোটো। বাঁ ধারে ঝিনুক। কী সুন্দর! ঝিনুকের একটা ফোটো বৈশম্পায়নের কাছেও আছে। কেউ তা জানে না। স্বয়ং ঝিনুকও নয়। সেই ফোটোগ্রাফ আমৃত্যু গোপন থেকে যাবে বৈশম্পায়নের কাছে। যেদিন টের পাবে মৃত্যু আসছে, সেদিন ফোটোটা নষ্ট করে দিয়ে যাবে সে।

দরজার বাঁ ধারে একটা চমৎকার শো-কেস। তার ওপর গাররেডের রেকর্ড চেঞ্জার। তার পাশে নীলুর ছবি। মাধবের কিশোর ভাই। খুন হয়ে গেছে।

নীলুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঝিনুককে বহুক্ষণ ধরে দেখে নেয় বৈশম্পায়ন। এই এক মুখ। দেখতে দেখতে মৃত্যু ভুল হয়ে যায়, জীবনের তুচ্ছতাগুলির কথা মনে পড়ে না, দুঃখবোধ থাকে না। বুক ভরে ওঠে আনন্দে।

সে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, এ কি কাম? এ কি পাপ? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা?

মাধবের যখন বিয়ে হয় তখন বৈশম্পায়ন ডবলিউ বি সি এস পাশ করে বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করছে। আজও সেই চাকরি করে যেতে পারলে ভাল হত। ঝিনুকের সঙ্গে ফিরে দেখা হত না।

কিন্তু এ কেবল ইচ্ছাযুক্ত চিন্তা। দেখা হতই। দেখা না হলে হত কী করে? আরও কয়েকটা জেলা মহকুমা ঘুরে প্রমোশন পেয়ে এই কলকাতাতেই আসতে হত তাকে। তার আগেই অবশ্য সে এল। আলিপুরদুয়ার কোর্টে গণধোলাইয়ের পর কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে ভাঙা হাত আর জখমে শক্ত হয়ে ওঠা ঘাড় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল পাকাপাকি। একটা ব্যাংকে বরাতজোরে চাকরি জুটে গেল। এ সবই নিয়তিনির্দিষ্ট, আগে থেকে ছক বাঁধা।

শর্মিষ্ঠা এসে বলল, শরীর কেমন লাগছে?

ভাল। অনেকটা ভাল।

আর একটু বসবে?

বসলে ভাল হয়। ওরা কি ফিরবে?

ঝি তো বলছে ফিরবে।

একটু বসি। ওরা ফিরলে উঠব।

বুবুমের ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাড়িয়ে দাও।

আজ আর পুজোর বাজার হবে না মনে হচ্ছে।

তুমি একা গিয়ে কিনে আনো না!

এতে একটু সতেজ হয়ে শর্মিষ্ঠা বলে, যাব? বুবুমকে কে দেখবে?

দেখার কী? আমি বসে থাকব, ও ঘুমোবে।

দোনোমোনো করে শর্মিষ্ঠা বলে, তোমার মায়ের কাপড় যদি তোমার পছন্দমতো কিনতে না পারি?

পারবে।

ঠকে আসলে বকবে না?

মেয়েরা একটু তো ঠকেই। আজ কিছু বলব না। যাও।

কার জন্য কী যেন?

জয়ের জন্য একটা ভাল প্যান্টের পিস আর শার্টের কাপড়।

প্রতিবারই জয়কে দিচ্ছ। এখন তো চাকরি করে।

ও চাকরিতে কি হয়! এনো। সংসারে যখন থাকি না তখন তার কমপেনসেশনও কিছু দিতে হয়।

সংসারের সঙ্গে আজকাল কেউ থাকে না। ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো।

ওঃ শর্মিষ্ঠা!

টাকা দাও।

কত লাগবে?

হাজার খানেক দিয়ে রাখো।

বুবুমকে ঘুম পাড়িয়ে যাও।— বলে চোরা পকেট থেকে টাকা বের করে বৈশম্পায়ন।

শর্মিষ্ঠা ব্যাগে টাকা রেখে ছেলের কাছে যেতে গিয়ে ফিরে বলে, চা খাবে?

ওরা ফিরুক।

ওদের সঙ্গে তোমার কী? ঝি করে দেবে।

তাহলে করতে বলো।

শর্মিষ্ঠা চলে গেলে বৈশম্পায়ন চোখ বোজে। সাদা হিম নুড়ি-পাথর ছড়ানো উপত্যকায় বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর নদী। কী অদ্ভুত গান!

শর্মিষ্ঠা চলে যাওয়ার পর বেডরুমের পাশের লিভিং রুমে ফোনটা বাজল।

উঠে গিয়ে ধরে বৈশম্পায়ন।

মাধব আছে?

না।

আপনি কে?

আমি ওর এক বন্ধু!

আমি মাধবের বন্ধু। আপনি কে বলুন তো? নামটা কী?

আমি বৈশম্পায়ন।

যাঃ বাব্বা! না মশাই হল না, আমরা কমন ফ্রেন্ড নই।

এরকম হতেই পারে।— বৈশম্পায়ন খুব ভদ্র গলায় বলে।

ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হবে?

হতে পারে। আমি ওর জন্যেই বসে আছি।

একটু কাইন্ডলি বলবেন কাল সকালে ওর বন্ধু মদন আসছে। ও চিনবে। মদন এম পি।

মদনকে আমিও চিনি।

যা বাব্বা! তবু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না কেন?

ফোনের ভিতর দিয়েই ওপাশ থেকে একটু মদের গন্ধ পায় বৈশম্পায়ন।

॥ ২ ॥

শিয়ালদা মেন স্টেশনের ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মে গেটের বাইরে ফরসা মতো একটা লোক খুব মাতব্বরি চালে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছিল। টিকিট নেওয়ার কালো কোট দু'জন থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের ঠেলায় যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে বেনোজলের মতো, কে কাকে টিকিট দেয়! এই লোকটা সেই ছিটকে আসা যাত্রীদের দু'-চারজনের দিকে হাত বাড়িয়ে টুকটাক টিকিট নিয়ে পকেটে ভরছে।

দার্জিলিং মেল লেটে আসছে। অনেকক্ষণ বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ

করল জয়। তার প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিল কালো কোট খুলে রেলের টিকিটবাবুই টিকিট নিচ্ছে। খানিকক্ষণ দেখে-টেখে সন্দেহ হল, করাপশন।

জয়ের বড় জামাইবাবু বলেছিলেন, অন্যায় দেখলেই ফরম্যালি হলেও একটা প্রতিবাদ সবসময়ই করে রেখো। কাজ হোক বা না হোক বড় জামাইবাবু সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাতে যে বড় জামাইবাবুর খুব ভাল হয়েছে তা নয়। বরং প্রোমোশন হয়নি, মেয়েরা যে যার ইচ্ছে মতো বিয়ে করেছে, তিন ছেলেই আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত, বড়দির সঙ্গেও বড় জামাইবাবুর বনিবনা নেই। তবু জয় বড় জামাইবাবুর এই একটা কথা মেনে চলার চেষ্টা করে।

দু'-দুটো লোকাল ট্রেনের পর প্ল্যাটফর্ম এখন ফাঁকা। করাপটেড লোকটা সাত নম্বরের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছে।

ও মশাই, শুনুন।— জয় লোকটাকে ডাকে।

লোকটা নিমীলিত চোখে চায়। চোখ দু'খানা বড় বড়, ডাগর, মুখও ভদ্রলোকের মতো, রং ফরসা তবে গায়ের জামাপ্যান্ট ময়লা। লোকটা ঠোঁট থেকে একটা মাছিকে উড়িয়ে বলল, কিছু বলছেন?

আপনি কি টিকিট কালেক্টর?

আজ্ঞে না।

তবে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছেন যে!

লোকটা এ কথায় সুড়ুক করে কাছে সরে আসে, তখুনি এই সাত সকালেও লোকটার মুখ থেকে ভক করে মদের গন্ধ পায় জয়। লোকটা গলাটা ছোট করে বলে, চুরি ছিনতাই করি না। টিকিটে চার আনা করে হয়। খারাপ কিছু করছি দাদা? মনে কিছু করলেন?

জয় কঠিন হওয়ার চেষ্টা করেও পারে না। সে ভারতবর্ষের একটি বড় পার্টির দক্ষিণ কলকাতার একজন মেম্বার। সে দুর্নীতি রুখতে অনেক কিছুই করতে পারে বলে তার ধারণা। যদিও এই রাজ্যে তার দলের কোমরের জোর তেমন নেই, তবু তামাম দেশে তো তার দলই এখন খেলছে। এই লোকটাকে ইচ্ছে করলেই সে ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটু মায়া হল। বয়সও বেশি নয়। ত্রিশের নীচেই।

জয় বলল, মদ খেয়েছেন?

একটু। সেও কাল রাতে। কিছু মনে করলেন দাদা?

আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।

আজ্ঞে না। তবে কিনা পেটের দায়ে করতে হয়। কত লোকে আরও কত খারাপ কাজ করে। চারদিকে করাপশন অ্যান্ড করাপশন।

চার নম্বরে আর একটা লোকাল ঢুকতেই লোকটা সুট করে গেটের বাইরে গিয়ে গোলকিপারের মতো পজিশন নিয়ে নিল।

লোকটাকে ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা জয় দমন করল। করাপশন কোথায় নয়? এই যে প্ল্যাটফর্মে ছানাপোনা নিয়ে কুঁদো কুঁদো সব মেয়েছেলে শুয়ে থাকে রাত্রিবেলা, সেটাও বেআইনি। আবার সকালে চাতাল ধোয়ার সময় ভিস্তিওলা যখন ওই ঘুমন্ত মেয়ে আর শিশুর গায়ে নির্বিকারে জল ছিটিয়ে উঠিয়ে দিতে লাগল তখন সেটাকেও খুব ন্যায় মনে হয়নি তার। মুশকিল হল, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার কোনো বাঁধাবাঁধি ধারণা সে আজও করে উঠতে পারেনি। গোটা দেশটায় কী যে সব ঘটছে!

দলের কিছু ছেলে-ছোকরা মদনদাকে রিসিভ করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে জয় ভেড়েনি। মদনদার সঙ্গে তো তার ভিড়ের সম্পর্ক নয়। বহুকাল আগে হালতু থেকে পালবাজার অবধি মদনদা তাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে ডবল ক্যারি করেছিল। আর তার সেজদির সঙ্গে মদনদার একটা

সম্পর্ক তো ছিলই। সুতরাং জয়ের দাবি অন্যরকম। এম পি হয়েও মদনদা তার সঙ্গে ফাঁট দেখায় না কখনও। অবশ্য মদনদার ফাঁট বলতেও কিছু নেই।

লাউডস্পিকারে বার বার বলছে, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন দার্জিলিং মেল আসতে পারছে না। সোয়া সাতটায় আসার কথা, এখন বাজছে ন'টা। দাঁড়িয়ে আর পায়চারি করে করে জয়ের হাঁটু দুটো ধরে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হল বলে কিছু খেয়েও আসেনি। স্টেশনের খচ্চরের পেচ্ছাপের চেয়েও খারাপ এক কাপ চা খেয়েছে ত্রিশ পয়সায়। তার মধ্যে পনেরো পয়সাই ফেলা গেছে। ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক বা খচ্চরের ইয়ের মতো চা, এই সবকিছুর মধ্যেই এই দেশটার পচনশীলতা লক্ষ করা যায়। কিছুই ঠিকমতো চলছে না, কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। একজন এম পি সহ দার্জিলিং মেল আটকে আছে ডানকুনিতে, ভাবা যায়?

টেকো হরি গোঁসাই এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে টানা মারছিল। অধৈর্য হয়ে এবার বেরিয়ে এসে জয়কে বলল, গাড়ি এত লেট! এরপর তো আমার অফিস কামাই হয়ে যাবে!

জয়ের মেজাজ খারাপ ছিল। একটু তেরিয়া হয়ে বলল, দেরির কথা রাখো। বারোটার আগে কোনও দিন দফতরে গেছ?

হরি গোঁসাইকে রসিক মানুষ বলে সবাই জানে। ফিচেল হেসে বলে, তা বারোটার সময়েও তো যেতে হবে নাকি? এখানেই ন'টা বাজল।

দেরি হয়ে থাকলে চলে যাও।

সে না হয় গেলাম। কিন্তু তাহলে বিশুকে মেডিকেলে ভর্তি করার কী হবে?

করাপশন! করাপশন! মদনদাকে এই লোকগুলোই খারাপ করে ফেলবে। ভারী বিরক্ত হয় জয়। স্টেশনে যে ক'টা লোক এসেছে সব ক'টা ফেরেব্বাজ, মতলববাজ। মুখে জয় বিরক্তির রেশটা ধরে রেখেই বলল, ও কথা তো মদনদা মালদায় যাওয়ার আগেই হয়ে গেছে।

দূর পাগল! এম পি-দের মন হচ্ছে পদ্মপাতার মতো। কিছু থাকে না, গড়িয়ে পড়ে যায়। বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়।

ফের বললে চটে যাবে।

চটলেও ভাল। তাতে মনে দাগ থেকে যাবে। চ', চা খেয়ে আসি। ডানকুনি থেকে গাড়ি ছাড়লে চল্লিশ মিনিট লাগবে। সময় আছে।

স্টেশনের চা? ও বাব্বা!

না, বাইরে থেকে খাব। চল, হ্যারিসন রোডে ঢুকে একটা ভাল দোকান আছে।

লাউডস্পিকারে গমগমে গলা বলে উঠল, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন...

দু'জনে বেরিয়ে আসে।

হরিদা!

উঁ।

একটু আগে একটা লোককে ধরেছিলাম। প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছে। চার আনায় বেচবে। সারাদিন একটাই টিকিট কতবার যে হাতবদল হবে।

ও তো বহু পুরনো ব্যাপার।

লোকটাকে পুলিশে দিলে কেমন হত?

তোর মাথা খারাপ? ওদের সব সাঁট আছে। ধরিয়ে যদিও বা দিলি গ্যাং এসে মেরে পাট করে দিয়ে যাবে। যা কিছু হচ্ছে হোক, চোখ বুজে থাকবি।

জয় কথাটা মেনে নিতে পারে না। বলে, এরকম করে করেই তো আমরা দেশটার—

সর্বনাশ করছি।— জয়ের কথাটা টেনে শেষ করে হরি গোঁসাই হাসে, উঠতি বয়সে ওরকম হয়।

বৃষ্টির জলে রাস্তায় থিকথিকে কাদা। তার ওপর খোঁড়াখুঁড়ির দরুন হাঁটা-চলাই দায়। হ্যারিসন রোডের চায়ের দোকানটায় পৌঁছতে গর্দিশ কিছু কম গেল না।

দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। মিনিট পাঁচ-সাত দাঁড়িয়ে থেকে যদি বা বসার জায়গা পেল অতি কষ্টে, কিন্তু চা-ওয়ালা ছোকরারা পাত্তাই দেয় না। হরি গোঁসাই দু'জনকে চায়ের কথা বলতে গেল, তারা অর্ধেক শুনেই অন্য কাজে ছুটে চলে গেল।

কিছু লোক আছে বুঝলে হরিদা, যাদের দেখলেই সবাই খাতির করতে থাকে। মদনদার কথাই ধরো, গঁড়ে বাজারে যেবার সত্যবাবুকে বাইরের দোকানিরা পেটাল, মদনদা গিয়ে দাঁড়াতেই সব জল।

পারসোনালিটি, বুঝলি!

সেই কথাই তো বলছি। আমরা রেশন অফিসে গেলে কেউ পাত্তা দেবে, বলো? মদনদাকে দেখেছি, খুব কড়াকড়ি তখন, গিয়ে দু' দিনে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস থেকে মেজদাদের রেশন কার্ড বের করে দিল। আগে থেকে কেউ চেনাজানাও ছিল না, কিন্তু গিয়ে এমন খাতির করে নিল যে, সবাই কিছু করতে পারলে যেন বর্তে যায়।

ও হল অন্য ধাত। বিশুটাকে মেডিকেলে ভর্তি করাতে যদি কেউ পারে তো মদনদা।

এবার কেন যে খুব উদার গলায় জয় বলে, হয়ে যাবে। ভেবো না। তবে কথাটা ঠিক, আজকাল মদনদা খুব ভুলে যায়।

এম পি-দের ঠেলা তো জানিস না। সকাল থেকে মাছি পড়ে। ক'টা মনে রাখবে?

জয় দূরের দিকে চেয়ে ভারী ভালবাসার গলায় বলল, কিন্তু আগে মদনদার সব মনে থাকত। এমন সব কথা মনে থাকত যা ভাবলে অবাক হতে হয়।

হরি গোঁসাই খপ করে এক চা-ওলা ছোকরার কব্জি চেপে ধরে বলল, আমাদের যে গাড়ির তাড়া, দু' কাপ চা টপ করে দেবে ভাই?

তাড়া তো সবার।— ছোকরা হেসে বলে, শুধু চা?

শুধু চা। একটু দুধ চিনি বেশি করে—

তা অত কথা শোনার সময় ছোকরার নেই, হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

জয় বলে, নীলু হাজরার খুনের কেসটা মনে আছে? মদনদা সাক্ষী দিয়েছিল! খুনের সময় নীলুর জামার রংটা পর্যন্ত হুবহু বলে দিয়েছিল। মদনদার সাক্ষীতেই তো নব হাটির চৌদ্দ বছর মেয়াদ হল।

মুখটা চোখা করে হরি গোঁসাই বলে, খুনটা কিন্তু নব করেনি।

তবে কে করেছে?— তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ঝুঁকে বসল জয়।

হরি গোঁসাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাল মানুষের মতো বলে. সে-সব কথা যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

তারপর আরও এক পর্দা গলাটা নামিয়ে নিজেকেই নিজে যেন বলল, এখন বিশুটা মেডিকেলে চান্স পেলেই হয়।

চা এসে যায়। বেশ ভাল চা।

নোনতা বিস্কুট খাবি?

হরি গোঁসাই জিজ্ঞেস করে।

আনমনে চায়ে চুমুক দিয়ে জয় বলে. না। তুমি খাও।

দার্জিলিং মেল আট নম্বরে ঢুকল ঠিক পৌনে দশটায়। এর মধ্যে আরও কিছু লোক জুটে গেছে মদনদাকে রিসিভ করতে। জনা দুই রিপোর্টার, দু'-চারজন মহাজন, আরও কিছু ছেলে-ছোকরা ক্যাডার।

শুধু একটা মাঝারি মাপের ভি আই পি স্যুটকেস হাতে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরা মদনদা ফার্স্ট ক্লাস একটা কামরার দরজাতেই বিরক্তমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল। ভিড়ের প্রথম হুড়োহুড়িটা কাটানোর জন্য একটু সরে দাঁড়াল। লোকগুলো গিয়ে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছে মদনদাকে। কে যেন একটা মালা পর্যন্ত পরিয়ে দিল।

দিক। ওসব বাইরের মাখামাখিই তো আর আসল নয়। মদনদার সঙ্গে সত্যিকারের ঘনিষ্ঠতা তো জয়ের। এক সাইকেলে তাকে ডবল ক্যারি করেছিল মদনদা। তারই সেজদির সঙ্গে ভাব ছিল। আর কারও সঙ্গে তো অত গভীর সম্পর্ক নয়। মদনদার বয়স পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো টেনেমেনে। এখনও বেশ টান ফরসা টনটনে চেহারা। দেখলেই সম্ভ্রম জাগে।

ট্রেন লেট ছিল বলে ব্যস্ত এম পি মানুষটার সময়ে টান পড়েছে। ভিড় কাটিয়ে জোর কদমে এগুচ্ছে। ওই হরি গোঁসাইয়ের ছেলেটা দড়াম করে পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম ঠুকল! দেখো কাণ্ড! আর একটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যেত লোকটা।

কিন্তু মদনদা পড়ল না। মদনদারা পড়ে না অত সহজে। এমনকী অসন্তুষ্টও হল না। লোক নিয়ে কারবার, লোকের ওপর বিরক্ত হলে চলবে কেন?

জয় দেখল, সে পিছনে পড়ে থাকছে। মদনদা তাকে দেখতে পায়নি! গা ঘষাঘষি সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু জানান দেওয়ার জন্য একবার বেশ জোর গলায় ডাকল, মদনদা!

মদনদা পিছু ফিরে দেখে একটু হাসল।

দেখেছে! যাক, নিশ্চিন্তি। জয়ের সকালটা সার্থক।

॥ ৩ ॥

খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা মোটেই ভাল চোখে দেখে না মণীশ! কিন্তু সংকোচবশে শালা মদনকে কথাটা বলতেও পারে না। মণীশরা চিরকাল এঁটোকাঁটা, শুদ্ধাচার, বাথরুমে যাওয়ার অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন মেনে এসেছে। তার বাসার সবাই মানে।

খবরের কাগজটার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিল মণীশ। সকালের দিকে অফিসের তাড়ায় ভাল করে পড়া হয় না, তাই বিকেলে এসে পড়ে। আজ আর খবরের কাগজটা পড়া যাবে না। এম পি শালাকে কিছু বলাও যায় না।

মণীশ খেতে বসেছে। একটু দেরিতেই অফিস যাচ্ছে আজ। ডালের মুখে একটু আলু ভেজে দেবে বলে চিরু তাকে আস্তে খেতে বলেছে। আস্তেই খাচ্ছে সে, কিন্তু ভাজাটা সময়মতো পাবে বলে মনে হচ্ছে না। মদনকে যারা স্টেশনে রিসিভ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আট-দশজন সঙ্গেই এসেছে! বাইরের ঘরে জোর গলা পাওয়া যাচ্ছে। চা না দেওয়াটা অভদ্রতা, তার ওপর এরা কেউই খুব এলেবেলে লোক নয়। চিরু এখন আলুভাজার কড়াই নামিয়ে চায়ের জল বসিয়েছে। সময় লাগবে।

আস্তে আস্তে খেয়েও মণীশের পাতের ডালভাত শেষ হয়ে এল। রান্নাঘর আর বাথরুমের মাঝামাঝি ছোট্ট এক চিলতে একটু ঢাকা জায়গায় অতিকষ্টে তিন ফুট একটা টেবিল আর দুটি চেয়ার পেতে তাদের খাওয়ার জায়গা। ডানদিকে একটা জানালা। জানালার পাশে গলি। সেদিক থেকে সূর্যালোকহীন স্যাঁতস্যাঁতে গলির সোঁদা গন্ধ আসে। জানালা দিয়ে সিনারি বলতে দেখা যায় শুধু পাশের বাড়ির দেয়াল এবং রেন পাইপ। ইদানীং রেইন পাইপ ঘেঁষে একটা অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছে। ভারী সবুজ, ভারী সতেজ। রোজ ওই সবুজটুকুর দিকে চেয়ে ভাত খায় মণীশ। আজ দেখছিল বড় বড় তিনটে পাতার আড়ালে আর একটা কচি পাতা উঠেছে।

আর একটু বোসো, হয়ে এল।— চিরু শোয়ার ঘরে তোলা কাপ প্লেট আনতে যাওয়ার পথে বলে গেল।

মণীশ শেষ গ্রাসটার দিকে চেয়ে রইল। চিরু আবার ভাত দেবে জোর করে, কিন্তু আজ আর তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

কাপ প্লেটের পাঁজা নিয়ে চিরু যখন ফের রান্নাঘরে ঢুকছে তখন মণীশ বলল, শোনো, আমার পেট ভরে গেছে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে।

সামনের জিনিসটা না খেয়ে চলে যাবে? বোসো না। হয়ে গেছে তো।

কেন ঝামেলায় জড়াচ্ছ? থাক না, রাতেও তো খেতে পারব।

শুধু তো ডাল ভাত খেলে!

হোক না, ডালে ঝিঙে আর লাউ দিয়েছিলে যে। শুধু ডাল ভাতের দোষ কেটে গেছে।

এ কথায় চিরু একটু হাসল। রুক্ষ চুল, না-সাজা চেহারায় চিরুকে এই ক্লান্তিতে ভরা হাসি দিয়ে চেনা যায়। কুড়ি বছর ধরে মণীশের সব দুঃখের ভার বহন করছে। এই দু' ঘরের বাসার বাইরের পৃথিবীকে খুব একটা দেখেনি। ভাই এম পি হওয়ার পর একবার দিন দশেকের জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিল। ব্যস।

রান্নাঘরে কাপ প্লেট ধুতে ধুতে চিরু বলে, বাসন্তীকে কখন বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছি এখনও এল না।

আসবে।— বলে শেষ গ্রাসটা মুখে দিয়ে মণীশ জল খেল।

আসবে তো। চা যে ঠান্ডা হবে ততক্ষণে। সরকারদের বাড়ির থেকে নাকি ভাঙানি দিচ্ছে। আজকাল কাজে একদম মন নেই। চলে গেলে কী যে করব!— চিরুর গলায় অসহায়তা ফোটে বটে, কিন্তু রাগ বা বিদ্বেষ নেই।

বাসন্তী গেলেও লোক পাওয়া যাবে।

চিরু চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলে, এ চা-পাতাটার কত দাম গো?

মদন আসবে বলে কাল একটু ভাল চা এনেছে মণীশ। বলল, ত্রিশ টাকা।

ভীষণ দাম।

পাঁচ বছর আগেও এই কোয়ালিটির চা ষোলো টাকায় কিনেছি।

দাম নিলেও গন্ধটা বেশ।

লোকজনের সামনে বাইরের ঘর দিয়ে খাবার আনাটা অভদ্রতা বলে চিরু বাসন্তীকে শিখিয়েছে, গলির জানালা দিয়ে খাবারের ঠোঙা গলিয়ে দিতে। মণীশ জলের গ্লাস রেখে যখন উঠতে যাচ্ছে তখন জানালা দিয়ে ঠোঙাসুদ্ধ কচি হাত ঢোকাল বাসন্তী।

মামাবাবু, ধরো।

মণীশ বাঁ হাতে বিস্কুটের ঠোঙাটা নেয়। বলে, এসে গেছে।

চিরু বলে, আজ কি ফিরতে দেরি হবে?

না। রোজ যেমন ফিরি। কেন?

ভাবছিলাম, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে একবার দমদমে কণাকে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে পারবে কি না।

কেন বলো তো! হঠাৎ কণাকে কেন?

মদনকে ওর সব কথা এসে বলুক। যদি মদন কিছু করতে পারে।

একজন এম পি কী কী পারে তা খুব ভাল করে জানা নেই মণীশের। তবে হয়তো অনেক কিছুই পারে। হুট করে কিছু না বলে সে একটু ভাবল, ভেবে বলল, এ তো অত্যন্ত পারসোনাল প্রবলেম চিরু। মদন কী করবে?

আর কিছু না পারুক, সুভাষকে ভয় দেখাতে তো পারবে। কণা গত রবিবারে এসেও কত কান্নাকাটি করে গেল। বোম্বেতে বদলি হয়ে সেই যে চার মাস আগে গেছে সুভাষ, এখনও একবারটিও আসেনি। মাত্র তিনখানা চিঠি দিয়েছে। টাকা পাঠাচ্ছে খুব সামান্য। তার মানে তো বুঝতেই পারছ। ওখানে আবার কোনও মেয়েকে জুটিয়ে নিয়ে ফুর্তি করছে।

মণীশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, সুভাষ চিকিৎসার বাইরে। কারও কারও রক্তই ওরকম খারাপ। মদন ইন্টারফিয়ার করলে যদি আরও খেপে ওঠে তবে কণার ওপর টর্চার করবে।

টর্চার কি এখনই কম করছে? কণার জন্য আমাদের কিছু করাও তো দরকার। মদনকে বলি, তারপর ও যা ভাল বুঝবে, করবে।

ঠিক আছে।

তাহলে যাবে?

যাব।

গিয়ে বেশি দেরি কোরো না।

দমদম থেকে এই মনোহরপুকুর আসতে একটু সময় তো লাগবেই। চিন্তা কোরো না।

বাথরুম থেকে মদনের কাশির শব্দ আসছে। সঙ্গে জলের শব্দ। এবার বেরোবে। কিন্তু আজকের খবরের কাগজটা আর ভাল করে পড়া হবে না মণীশের।

মণীশ যখন পোশাক পরছে তখন মদন এসে ঘরে ঢুকল। কাঁধে তোয়ালে। হাতে জলের ছোপ লাগা খবরের কাগজ। পায়খানার কাপড়ও ছাড়েনি বোধহয়। ব্যস্ত এম পি, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নষ্ট করার মতো সময় নেই।

জামাইবাবু কি অফিসে বেরোচ্ছেন?

আর কী করি বলো?

আমার অনারে আজ অফিসটা কামাই দিতে পারতেন!

কামাই দিলেও লাভ নেই। তোমাকে পাব কোথায়? এক্ষুনি বাইরের ঘরের ভক্তরা তোমাকে দখল করে নেবে। তারপর প্রেস কনফারেন্স আছে, রাইটার্স আছে, আরও কত কী!

মদনের চেহারাটা ভালই। লম্বা, একহারা, ফরসার দিকেই রং। মুখশ্রীতে একটু বেপরোয়াভাব আছে। একটু চাপা নিষ্ঠুরতাও। মদনের ভয়ডর বরাবরই কম। কোনও ব্যাপারেই লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। অবিশ্রাম কাজ করে যেতে পারে, সহজে ক্লান্ত হয় না। কাজ করতে করতে এ যাবৎ বিয়ে করে উঠতে পারেনি। গায়ে একটা গুরু পাঞ্জাবি চড়াতে চড়াতে বলল, বাইরে হালদারের গাড়ি আছে। বলে দিচ্ছি, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

প্রস্তাবটি লোভনীয়। এখন এই দেরিতে বেরিয়েও বাসে উঠতে দারুণ কষ্ট হবে মণীশের। তবু সে মাথা নেড়ে বলে, ওবলিগেশনে যাবে কেন? আমাকে তো রোজই অফিসে যেতে হবে। রোজ তো হালদারের গাড়ি পাব না। তাছাড়া অফিসের লোক গাড়ি দেখলে বলবে, এম পি শালার খুঁটির জোরে গাড়ি দাবড়াচ্ছি।

আপনাকে আর মানুষ করা গেল না।

চিরু চায়ের ট্রে হাতেই ঘরে ঢুকে বলে, মদন, তুই এখন কিছু খাবি না?

মদন ভ্রু কুঁচকে বলে, বাইরের ঘরে চা দিচ্ছিস নাকি?

চিরু লজ্জা পেয়ে বলে, দিই একটু।

ডিসগাস্টিং। সারাদিন লোক এলে সারাদিনই চা দিবি নাকি? ওসব ভদ্রতা খবরদার করতে যাবি না। ওদের দরকারেই ওরা আসে, আতিথেয়তার কিছু নেই।

তুই চুপ কর তো। আমার মোটেই কষ্ট হয়নি।

কষ্টের কথা নয়। ফতুর হয়ে যাবি।

তোকে এখন খাবার দেব তো!

না, একটু বাদে ভাত খেয়ে বেরোব।

চিরু চলে যেতে মদন চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলে, খাঁদু বুঁচি সব কই?

ইস্কুলে।— মণীশ বলে, সারা সকাল তোমার জন্য হাঁ করে পথ চেয়েছিল। ট্রেন লেট বলে আর থাকতে পারল না।

ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকায় আটকে গেল গাড়ি। সকালে একটা ইমপরট্যান্ট এনগেজমেন্ট ছিল, রাখা গেল না।

মদন চারদিকে চেয়ে বলে, এ ঘরটায় কী করে যে এতকাল আছেন আপনারা। একে একতলা, তাতে ছোট ঘরে গাদা জিনিসপত্র। এতদিনে একটা বাড়ি করার মতো টাকা আপনার হয়েছে জামাইবাবু।

সতীনের ছেলেকে সবাই মোটা দেখে। টাকা হত, যদি রাখা যেত।

মদন মাথা নেড়ে বলে, আপনার কিছু হবে না জামাইবাবু।

যা বলেছ।

তবু আপনি ভীষণ হ্যাপি।

আবার সেই সতীনপো-এর বৃত্তান্ত! পরের সুখই সকলের চোখে পড়ে।

চুল আঁচড়ে মদন ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার দিল। বলল, আর কিছু না করুন, এবার একটা টেলিফোন লাগান। নইলে আমার ভারী অসুবিধে।

ঠিক আছে, অ্যাপ্লাই করব।

আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করবখন।

॥ ৪ ॥

ভুলে যাওয়ার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আছে মদনের। আবার মনে রাখার ক্ষমতাও তার তুলনারহিত। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে সে জীবনের ফালতু ঘটনা, মানুষ বা কথাকে ভুলে যেতে পারে। যা তার প্রয়োজন তা প্রখরভাবে মনে রাখে।

ফিটফাট হয়ে যখন সে বাইরের ঘরে ঢুকল তখন সকালের অনেক ঘটনাই ভুলে গেছে। আবার বেশ কিছু ঘটনা তার মনেও আছে।

মনে রাখার মধ্যে আছে দু'জন সাংবাদিক। আগাগোড়া দুই রিপোর্টার তার সঙ্গে লেগে আছে।

ঘরে ঢুকেই সে বলল, শচী, বলো খবর কী?

শচী লম্বা কালো রোগা এবং ধূর্ত। চারদিকে মিটমিটে চোখে চেয়ে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলে, খবর তো আপনার কাছে দাদা।

ঘরের কথাবার্তা থেমে গেছে। সকলে এম পি-র দিকে তাকিয়ে। প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

মদন চারদিকের মনোযোগটাকে খুব উপভোগ করে। দরজার কাছে রোগা ও অল্পবয়সি জয় তার চা এখনও শেষ করতে পারেনি। এবার এক চুমুকে শেষ আধপেয়ালা মেরে দিল।

মদন বলল, গত জুলাইয়ে মনসুন সেশনে আমি পার্লামেন্টে একটা বিলের ওপর খুব গুরুতর একটা প্রশ্ন তুলি। দিল্লি, এলাহাবাদ, বোম্বের কাগজে সেটা ফার্স্ট পেজে ফ্ল্যাশ করে। তোমাদের কাগজে তার সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। কেন শচী! বাঙালি এম পি বলেই কি তোমাদের এরকম মনোভাব?

শচী জিব কেটে বলে, ছি ছি। কে না জানে, আমরা বাঙালি লিডারদের সবচেয়ে বেশি কভারেজ দিই।

আমাকে দাওনি। কভারেজ আমি চাইও না। দি ইসু ওয়াজ ইমপরট্যান্ট। সেটা অন্তত কভার করা উচিত ছিল।

এজেন্সি আমাদের খবর দেয়নি তাহলে।

নিশ্চয়ই দিয়েছিল। পি টি আই, ইউ এন আই সকলে কভার করেছে। দেয়নি তোমাদের দিল্লির করেসপন্ডেন্ট। আই হেট হিজ গাটস। তবে সনাতন মুখার্জিকে আমি চিনি। ওয়ান ডে উই উইল হ্যাভ এ শো-ডাউন।

সনাতনদার হয়তো দোষ নেই! খবরটা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, নিউজ ডেস্কে বাদ হয়ে গেছে।

তাই বা কেন হবে? নিউজ ডেস্ক কি ঘাস খায়? খবরের ইমপরট্যান্স বোঝে না?

আমি জেনে আপনাকে বলব মদনদা।

মদন দেখেছে, কনফ্রনটেশন দিয়ে দিন শুরু করলে তার দিনটা ভালই যায়। এইজন্য সে সকালের দিকে একটা ঝগড়া বা চেঁচামেচি বাঁধিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আজ শচীকে ধমকে তার বউনি বোধহয় ভালই হল।

ভোটেব সময় মদনের পক্ষে পান্ডা ছিল শ্রীমন্ত। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিল দু'-তিনজনে মিলে। মদন বাইরের ঘরে এসেছে টের পেয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে একধারে একটা গদিআঁটা বড় সোফা, দুটো ছোট সোফা, কয়েকটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের পলিথিনের চেয়ার। সবটাতেই ঠাসাঠাসি ভিড়।

শ্রীমন্ত এসে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কানে কানে বলে, হালদারের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবেন। সবার হয়ে গেলে। প্রাইভেট।

শ্রীমন্তের কথা মানতেই হয় মদনকে। শ্রীমন্ত তার ডান হাত। মদন নিচু গলায় বলে, ফালতু লোক কিছু কাটিয়ে দে।

হরিদা তার ছেলেকে মেডিকেলে ভর্তি করানোর কথা বলতে এসেছে। কাল আসতে বলে দিই?

দে।

আর জয়?

ও কী চায়?

কিছু বলেনি। তবে কিছু চায় নিশ্চয়ই।

কাটিয়ে দে।

তাহলে ওদেব নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি! দুপুরে কি প্রেস ক্লাবে আসতে হবে?

আসিস।

শ্রীমন্ত ওঠে। পেটানো বিশাল চওড়া তার শরীর। একবার তাকালেই তার পেশা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। সে গিয়ে দরজার ভিড়টাকে প্রায় কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

একটা চেনামুখের দিকে চেয়ে মদন হাসে, কী খবর?

আধবুড়ো সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোকটি কিছু তটস্থ হয়ে বলেন, রেলবোর্ডে আমার কেসটার কথা তুলবেন বলেছিলেন।

কাগজপত্র কিছু দিয়েছিলেন আমাকে?

দিয়েছিলাম। গত জানুয়ারিতে।

ওঃ, তাহলে হারিয়ে ফেলেছি। মাঝখানে ফিলিপিনস মালয়েশিয়া সব যেতে হয়েছিল ডেলিগেশনে। ফিরে এসে দেখি, ফাইলে অনেক কাগজপত্র নেই।

তাহলে?

একটা চিঠি করে দিয়ে দেবেন আমার কাছে। দেখব।

কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই বাঁ ধারের বুককেসের কাছে দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন, বাবা, আমার কথাটা একটু শুনে নেবে? বাড়িতে ছোট বাচ্চা রেখে এসেছি। দূরও অনেক, সেই বোড়াল।

বলুন।

আমি মন্টু হাটির মা।

ও। মন্টু কে যেন?

আমার ছেলে। ওই বড়। মেজো নব।

নব?

নীলু হাজরার খুনের দায়ে যে ছেলে জেল খাটছে।

মদন একটু নড়ে বসে, ও, তা কী চাই আপনার? নবর জন্য তো আর কিছু করার নেই।

তার বউ-বাচ্চা সব আমার ঘাড়ে। মন্টু এক পয়সাও দেয় না। নব জেলে। আমি কী করে চালাই?

আর্নিং মেম্বার নেই?

না। নবর বউ একটা সেলাই স্কুলে কাজ করে। কিছু পায়। তাতে হয় না।

আমাকে কী করতে বলেন?

নবর অফিসে যদি ওর বউয়ের একটা চাকরি হয়।

কোন অফিস?

বেহালায়। সি সি পি কারখানা। বউ অনেক ধরাধরি করেছে, হয়নি।

কী বলে ওরা?

খুনের বউকে চাকরিতে নেবে না।

সি সি পি না কী বললেন?

সি সি পিই হবে বোধহয়। তাই তো শুনি।

আচ্ছা, বাইরে শ্রীমন্ত আছে। ওকে ডেকে ডায়েরিতে নামটা লিখিয়ে যান। দেখব।

দেখো বাবা।

একটা কথা বলব মাসিমা? নীলু হাজরা ছিল আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। আমরা সবাই ভালবাসতাম তাকে। ভারী ভাল ছেলে ছিল।

নব হাটির বিধবা মায়ের চেহারাটা খুব নিরীহ ধরনের নয়। বয়স হলেও ডাকসাইটে স্বভাবের ছাপ আছে। কথাবার্তায় কোনও জড়তা নেই, ভয়ডর নেই। যে কোনও জায়গা থেকে কাজ আদায় করে আনার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মদনের এই শেষ কথাটায় বুড়ি একটু কেমনধারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সন্দিহান চোখে মদনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাহলে কি ওর বউয়ের জন্য একটু বলবে না বাবা?

মদন হাসল, খুন তো করেছে নব, ওর বউ তো নয়। বলব। তবু আমি দিল্লি হলে যতটা পারতাম এখানে ততটা তো পারি না। তবু বলে দেখব। কারখানার মালিক কে জানেন?

কানোয়ার না কী যেন।

এই যে লম্বা-চওড়া ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ও-ই শ্রীমন্ত। রাস্তায় আছে, একটু খুঁজে নিয়ে তার কাছে সব লিখিয়ে দিয়ে যান। আপনার বউমার নামও।

আচ্ছা।

প্রেস ক্লাব থেকে দুপুরে একটা ফোন করল মদন।

মাধব?

আরে মদনা? কোত্থেকে?

মালদার ইনটিরিয়ারে বান দেখতে গিয়েছিলাম।

দেখলি?

দেখলাম। মেলা জল।

ফি বছরই অক্রুর সংবাদ। এখানে জল, সেখানে জল, মরছে ভাসছে গৃহহারা হচ্ছে। তোরা করছিস কী?

দিল্লিতে বসে মোচ তাওড়াচ্ছি। কী করার আছে? ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

দে ভাসিয়ে তবে শালা, দে ভাসিয়ে। কোথায় উঠেছিস?

আবার কোথায় উঠব? মনোহরপুকুর।

দিদির হাত ছাড়িয়ে আমার গাড্ডায় চলে আয়! ক'দিন আছিস?

পুজোটা থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। হচ্ছে না। দিল্লি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে, আবার এক ডেলিগেশনে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে।

ভ্যানতারা রাখ। তোর ডেলিগেশনও চিনি, তোর অস্ট্রেলিয়াও চিনি। ক'দিন আছিস তাই বল।

আমি নেই রে। পরশুদিন চলে যাচ্ছি।

তাহলে আজ চলে আয়।

পাগল! আজ দিদি ত্রিশ টাকা কিলোর চিংড়ি আনিয়েছে।

তাহলে কাল?

দেখি। ঝিনুক কেমন আছে?

ঝিনুক ঠিক ঝিনুকের মতো আছে। ক্যাপটিভ ইন হার ওন শেল।

আমি বাবা তোদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলো একদম বুঝি না। মানুষের খাওয়া পরার সমস্যা আছে, আধিব্যাধি আছে, দুঃখ-টুঃখও আছে, তবে তোদের সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার।

তোর সব কিছু বোঝার দরকার কী? তুই যেমন দেশ কি নেতা মদনকুমার হয়ে আছিস তাই থাক না।

মদন খুব হো হো করে হেসে বলে, ইয়েস, মদন ইজ দেশ কি ন্যাতা। মদনাকে খুব সমঝে চলবি, বুঝলি!

আর সমঝাতে হবে না বাবা। ন্যাতাদের খুব ভক্তিমান্যি করি। ভাত কাপড় না দিক, কিলটাও আবার না বসায়।

বটেই তো।— মদন গম্ভীর হয়ে বলে। তারপর গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলে, আরে শোন। নব হাটির মা এসেছিল আজ। ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায়।

ওপাশ থেকে মাধবের সাড়াশব্দ কিছুক্ষণ পাওয়া গেল না। বেশ একটু ফাঁক দিয়ে আস্তে করে বলল, ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায়? নবর বউ সেই গৌরী না?

হ্যাঁ।— মদন একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, খুব টেঁটিয়া বুড়ি। নব জেলে যাওয়ায় ওর বউ-বাচ্চা নিয়ে বুড়ি বিপদে পড়েছে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যা পারিস করিস। ওদের দোষ কী?

পাগল নাকি? অনেক ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার?

পলিটিকস করতে গেলে সব দিক বিবেচনা করে ডিসিশন নিতে হয়।

তুই কি নবর বউকে চাকরি দেওয়ার মধ্যে পলিটিক্যাল গেইন খুঁজছিস নাকি?

আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু প্লে ইট সেফ, দেখতে হবে মতলবখানা কী। আমাকে ফাঁসাতে চায় কি না।

ধুস শালা। খেতে পাচ্ছে না, তাই তোকে মাতব্বর ধরেছে। এর মধ্যে অন্য মতলবের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

পাবলিকের মন সবসময়েই ভারী সরল। আমাদের বুদ্ধি একটু প্যাঁচালো।

এই যে একটু আগে বললি মানুষের মনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝিস না!

একেবারেই যে বুঝি না তা নয়। একটু একটু বুঝি, তবে তোর বা ঝিনুকের কথা আলাদা, তোদের তো কোনও বাস্তব সমস্যা নেই। তোরা কুঁথে কুঁথে সমস্যা তৈরি করছিস।

আমাদের ঘোরতর একটা বাস্তব সমস্যা রয়েছে। আমাদের কোনও বাচ্চা নেই।

আঃ হাঃ, সে তো আমারও নেই।

তোর নেই কে বলল?

তাহলে আছে বলছিস?

থাকতেই পারে। লেজিটিমেট না তো ইললেজিটিমেট, বিয়ে তো করলি না স্রেফ ভয়ে। পাছে বউ এসে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার তৈরি করায় বাগড়া দেয়।

বিয়ের বয়স যায়নি ব্রাদার। নাউ আই অ্যাম এ মোর এলিজিবল ব্যাচেলর।

ধুস শালা। এম পি একটা পাত্তর নাকি? আজ আছে, কাল নেই।

কেন, লোকের মুখে শুনিসনি, পাঁচ বছর এম পি থাকতে পারলে সাত পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে চলে যায়।

তা বটে। তাহলে কাল তোকে এক্সপেক্ট করছি।

দেখা যাক।

দেখা যাক নয়। আমি আর ঝিনুক কাল বাসায় থাকব তোর জন্য।

খুব চেষ্টা করব, না পারলে ফোন করব, তোর বাসার ফোন ঠিক আছে তো?

কপালজোরে আছে। গত মাসেও পনেরো দিন বিকল ছিল, কালও যে থাকবে না তা বলা যায় না।

জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই আমাদের ভাবা উচিত।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তোর মতো গাড়লরা গদিতে বসলে কী করে মানুষ উজ্জ্বল দিক নিয়ে ভাববে?

খুব হেসে মদন বলল, আচ্ছা, আজ এ পর্যন্ত।

বলে ফোন রেখে দেয়।

॥ ৫ ॥

বাবা আধো অন্ধকার সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বসে আছেন। মুখটা অস্পষ্ট, গায়ে একটা সাদা হাফশার্ট, পরনে খাকি রঙের প্যান্ট। টেবিলে কনুই, হাতের তেলোয় থুতনির ভর। একটু কুঁজো হয়ে চুপ করে চেয়ে আছেন। ভারী নির্জন চারদিক। শুধু পাখিরা ডাকাডাকি করছিল খুব। আর ঝিঁঝি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল ঝিনুক। সে তখন ছোট, বছর দশেকের মেয়ে। দৃশ্যটা আজও সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মনে আছে।

বরাবরই বাবা চুপচাপ মানুষ! কঠিন, কর্তব্যপরায়ণ, কম কথার মানুষ। চেহারাটা লম্বা, মজবুত হাড়ের চওড়া কাঠামো, কালো, কর্কশ মুখশ্রী। তবু বাবার তুল্য পুরুষ ঝিনুক কখনও দেখেনি।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার। কিন্তু সে স্পষ্টই দেখল, বাবা

সেই ঘরে ঠিক বসে নেই। শুধু শরীরটা পড়ে আছে, আসল বাবা অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছে বুঝি।

ঝিনুক আস্তে আস্তে সাহস করে এগিয়ে গেল কাছে।

বাবা, তোমার কী হয়েছে?

বাবা আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে ঝিনুকের চুলগুলো এলো করে দিল, হাঁটুর কাছে বুক চেপে ঊর্ধ্বমুখে ঝিনুক বাবার অস্পষ্ট মুখ দেখছিল। ভারী দুঃখী মুখ।

বাবা, তোমার মন খারাপ?

না তো। এই একটু ভাবছি।

কী ভাবছ?

তোমাদের কথা।

কেন বাবা?

এমনি। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের কথা ভাবি।

ব্যস, এর বেশি আর কথা হয়নি, তবু কত গভীর কত স্পষ্টভাবে দৃশ্যটা তার কালের চিহ্ন এঁকে রেখেছে আজও মনে মধ্যে!

তুমি বড্ড বেশি বাবা-বাবা করো ঝিনুক, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই একটু অনুযোগের সুরে কথাটা বলেছিল মাধব। তেমন কিছু নয় তবু তক্ষৎণাৎ নতুন স্বামীকে মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল সে। কোনও জবাব দেয়নি, ঝগড়া করেনি।

ঝিনুক ভাবে, আমার বাবার মতো যে তোমরা কেউ নও!

পুরুষরা ঝিনুককে কী চোখে দেখে তা সে জানে। পথে ঘাটে যেসব পুরুষ তার দিকে তাকায় তাদের কাছে সে স্রেফ গোলাপি মাংস। মাধবের কাছে সে ভারী একঘেয়ে, বিরক্তিকর, খিটখিটে মেয়েমানুষ। তার যদি ছেলে থাকত তবে সব অন্যরকম হত, পুরুষমানুষের প্রতি এত ঘেন্না থাকত না।

ঘেন্না? না, তাই বা বলে কী করে? পুরুষমানুষকে ঘেন্না পেলে সে কি বাবাকে অত ভালবাসতে পারত?

বাবার কথা ভেবে আজ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ঝিনুকের।

উদাসিনী ঝিনুক তার বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে ভারী আনমনে হাঁটছিল, একজনের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা, হয়তো এক্ষুনি, হয়তো একশো বছর পর। কিন্তু হবে, সে মানুষ কেমন হবে তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে তার, স্পষ্ট কিছু জানে না। তবে এটুকু জানে, তার অনেকখানিই থাকবে এক প্রদোষের অন্ধকারের মতো রহস্যে ঢাকা। খানিকটা চেনা যাবে, অনেকখানি থাকবে অচেনা।

গড়িয়াহাটা ব্রিজের একদম মাঝখানে অনেকটা উঁচুতে উঠে ঝিনুক একটু ধীর হল। এপাশ ওপাশ দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল। কত দূর! কত দূর! পৃথিবীর অন্ত নেই। দুরন্ত বাতাস এসে লাগছে নাকে মুখে। উজ্জ্বল আলো, নীল আকাশ। মানুষ পাছে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা-টত্যা কিছু করে সেই ভয়েই বোধহয় ব্রিজের মাঝ বরাবর দু'ধারের রেলিং-এর সঙ্গে মস্ত উঁচু জালের বেড়া। জালের ধারে দাঁড়িয়ে একটু দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু রাস্তার লোকজন তাকাবে, ভাববে। ঝিনুক দাঁড়াল না। কিন্তু খুব ধীর পায়ে ঢালু বেয়ে নামতে লাগল। নীচে একটা নদী থাকলে এই ব্রিজটা আরও কত ভাল লাগত। ঢালুর মুখেই তার মনে পড়ল, মোগলসরাই! মোগলসরাই! সে এক অদ্ভুত ভাল জায়গা। সেইখানে থাকার সময় মাঝে মাঝে জিপ জোগাড় করে তারা পুরো পরিবার বোঝাই হয়ে যেত বারাণসী। মাঝপথে মস্ত ব্রিজ, নীচে গঙ্গা। বাবা সেখানে জিপ দাঁড় করাবেই। আর তখন ওই বয়সে ঝিনুক সেই ব্রিজ থেকে গঙ্গার প্রবহমানতার দিকে চেয়ে মূক হয়ে যেত ভয়ে

বিস্ময়ে। শক্ত করে বাবার হাত ধরে থাকত সে। নইলে যে ভীষণভাবে গঙ্গা টানত তাকে। কেবলই মনে হত, অনিচ্ছে সত্ত্বেও হয়তো সে লাফিয়ে পড়বে। আজও উঁচু জায়গা থেকে নীচে জল দেখলে হাত পা কেমন শুলশুল করে তার। সম্মোহিত হয়ে যায়। মনে হয় জল তাকে ডাকে। জল কি প্রেমিক!

আপনমনে একটু হেসে ফেলে ঝিনুক। কী অদ্ভুত সে! জল কি প্রেমিক? এ কথাটা মাথায় এল কী করে? মনটা বড় উড়ে উড়ে থাকে আজকাল, কোথাও বসতে চায় না। বড্ড বেশি কবিতা পড়ছে বলে নাকি?

ব্রিজ থেকে নেমে ডান ধারে পঞ্চাননতলায় একটু ভিতর দিকে শুক্তির বাসা। অনেক ঘাটের জল খেয়ে কয়েক মাস হল এক কাঁড়ি টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে একতালর ছোট একটা বাসা নিয়েছে। বোন কাছাকাছি আসায় ঝিনুক প্রায়ই ঢুঁ মেরে যায়। বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট শুক্তি জমাট সংসারি। দুটি ছেলের মা। অজস্র সমস্যায় কণ্টকিত। সবসময়েই মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভয় পাওয়া ভাব।

ঝিনুক ঘরে ঢুকতেই সুক্তি বলে উঠল, উঃ দিদি রে, ঝিয়ের অভাবে মরে গেলাম। দে না একটা ভাল দেখে ঝি। আজও আমাদেরটা কামাই করেছে। এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, এত বাসি জামাকাপড় জমে আছে, ঘর মোছা হয়নি, কী যে করি।

ডানার ভর ছেড়ে ঝিনুক মাটিতে নামল। জাগল। চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, একটুও টিপটপ থাকতে পারছিস না। কী যে করে রেখেছিস ঘরখানা।

ছেলে দুটো যে হাড় বজ্জাত। সারাদিন গোছাচ্ছি, সারাদিন লন্ডভন্ড করছে।

ঝিনুক সামনের ঘরে সোফা কাম বেডের বিছানায় বসে হাঁফ ছেড়ে বলল, ঠিক আছে, আমি গিয়ে পুনমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকের মতো ঘরদোর সেরে দিয়ে যাক।

ও বাবা!—চোখ বড় করে শুক্তি বলে, পুনমকে দিয়ে কী হবে। ও মুসলমান যে!

ঝিনুক আর একটু জেগে ওঠে। তাই তো, মনে ছিল না। মানুষের কতরকম সমস্যা থাকে, যা তার নেই। ঝিনুকের একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শুক্তির অবস্থা দেখে আর খেতে চাইল না। উঠতে উঠতে বলল, আচ্ছা, দেখব।

শুক্তি বাইরের ঘরেই বঁটি পেতে আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছে। গলা একটু নামিয়ে বলল, এ বাসাও ছাড়তে হবে। পিছন দিকে রেল লাইনের আশেপাশে গুন্ডা বদমাশ ওয়াগন ব্রেকারদের আড্ডা। কালও একটা ছেলেকে তাড়া করে ওই ভিতর দিকে নিয়ে গেল। মেরেই ফেলেছে বোধহয়, আর কী বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গালাগাল, শোনা যায় না।

ঝিনুক চোখ বড় করে চেয়ে থাকে। পৃথিবীতে এসবও ঘটে! কত কী ঘটে! মানুষ কতরকমভাবে বেঁচে আছে। সে নিজে অবশ্য এতসব টেরও পায় না। বালিগঞ্জের অত্যন্ত নির্জন সুন্দর পাড়ায় চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকে সে। নিজস্ব ফ্ল্যাট, কোনওদিন ছাড়তে হবে না। তার কাজের লোকের অভাব কদাচিৎ হয়, কারণ সে প্রচুর টাকা মাইনে দিতে পারে। তবে কি শুক্তির চেয়ে সে সুখী?

শুক্তির দিকে একটু চেয়ে থেকে নিজের সঙ্গে মেলাল সে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। এভাবে মেলানো যায় না। সুখ দুঃখের তুলনা কিছুতেই হয় না কখনও। শুক্তির বাসায় পা দিলেই তার এক ধরনের কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে যায়। সে নিজে নিঃসন্তান আর শুক্তি দু'টি ছেলের মা বলে তার কখনও হিংসে হয় না। শুক্তির ছেলেদুটোকে সে ভালবাসে। মাঝে মাঝে তার শুধু মনে হয়, একটা ছেলে থাকলে বেশ হত।

ঝিনুক অনেকটা জেগেছে। একটু ভেবেচিন্তে বলে, এবার তোরা একটা ফ্ল্যাট কিনে নে না।

টাকা কই? ফ্ল্যাটের যা দাম! এই তো দেখ, দেড় ঘরের ফ্ল্যাটের জন্য মাসে থোক চারশো টাকার মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে কী থাকে বল! আমাদের ওসব হবে-টবে না। চিরকাল ভাড়াবাড়িতেই পচে মরব।

বাদবাকি সময় অনেক কথা হল, কিন্তু ঝিনুক তখন মাটি ছেড়ে উড়েছে আবার, ভারী আনমনা। শুধু উঠবার মুখে শুক্তি বলল, একটা খবর শুনেছিস দিদি?

কী রে?

নীলুকে যে খুন করেছিল, সেই নব গুন্ডা নাকি জেল থেকে পালিয়েছে।

ঝিনুক খুব আনমনে বলে, তাই নাকি?

বলেই হঠাৎ চমকে উঠল সে। নীলু! নীলুকে কে খুন করেছে?

তোর ভগ্নীপতি কোথা থেকে শুনে এসে কাল রাতে বলল।

ঝিনুকের ভারী মুশকিল। শত চেষ্টাতেও সে মনটাকে কোনও একটা জায়গায় রাখতে পারে না। কত কথা শোনে, ভুলে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে নব গুন্ডার কথাও সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু হঠাৎ রুমঝুম নুপূর বাজিয়ে শরতের কিশোরী বৃষ্টি এল। দু' মিনিট। একটা সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল ঝিনুক। আর তখনই ওই সাদা রোদে মাখামাখি এক অপরূপ রূপালি বৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে মনে পড়ল তার। নব হাটি। নব হাটি কী অদ্ভুত নাম। লোকটা জেল থেকে ছাড়া পেল কেন? না, ছাড়া পায়নি তো! পালিয়েছে। তাই তো বলছিল শুক্তি! রুপোলি বৃষ্টির নাচ দেখে কেন কথাটা মনে হল? একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু নবর কথা নয়, বারবার নীলু এসে হানা দিচ্ছে মনের মধ্যে. যেন এক পাগলা বাতাস। ঝিনুকের ভিতরে উড়ে যাচ্ছে কাগজের টুকরো, উড়ছে পরদা, ভেঙে পড়ছে কাচের শার্শি। ওলট পালট। ওলট পালট।

বৃষ্টি থামল। মেঘভাঙা রোদ অজস্র গয়নার মতো পড়ে আছে চারপাশে। গলির মুখে এসে একটা রিকশা নিল ঝিনুক। নইলে চটি থেকে কাদা ছিটকে দামি শিফনের শাড়িটায় দাগ ধরাবে।

বাড়িতে ফিরে ঝিনুক বাইরের ঘরে পাখাটা চালিয়ে একটু বসে। এ তার বহুদিনের অভ্যাস। সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে একটা দামি সিগারেটের খালি প্যাকেট।

ঝিনুক ভ্রু কোঁচকায়। মনে পড়ে না। কার প্যাকেট? কে ফেলে গেল? মাধব তো এ সিগারেট খায় না!

নিচু হয়ে প্যাকেটটা তুলে নেয় ঝিনুক। দু' হাতে ধরে চেয়ে থাকে যত্নে। কোনও মানে হয় না। মনে পড়বে না।

কিন্তু চোখ তুলতেই মনে পড়ল। ঠিক এই সোফায় বসে কাল দুপুরে অনেক সিগারেট খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। কী অদ্ভুত ওর সেই বসে থাকা! ওর বউ শর্মিষ্ঠা গেছে পুজোর বাজার করতে! ওর ছোট ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। আর ও বাইরের ঘরে অদ্ভুত মুখ করে বসে আছে।

ঝিনুক সব জানে। সব জানে। বৈশম্পায়ন কেন আসে ফিরে ফিরে। ঈশ্বর!

বারবার উঠি উঠি করছিল বৈশম্পায়ন। বাইরে গিয়ে ঘড়ি দেখছিল শর্মিষ্ঠা ফিরছে কি না। আসলে তো তা নয়। এই একা বাড়িতে ঝিনুকের মুখোমুখি বসে থাকা তার কাছে অস্বস্তিকর। বড় অস্বস্তিকর!

মনে মনে ভারী হাসে ঝিনুক। অত যদি লজ্জা তবে ফোটো তুলেছিলে কেন?

ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। এমনকী বৈশম্পায়নও জানে না যে, ঝিনুক জানে। বৈশম্পায়নের কাছে কথাটা কখনও বলেনি সে। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে যেমন প্রথম পরিচয় এবং তারপর কিছু ঘনিষ্ঠতা হয় তার বেশি কিছুই করেনি ঝিনুক। কিন্তু তার এই একটা ঘটনার স্মৃতি আছে। বৈশম্পায়নকে এই তার প্রথম দেখা নয়, বৈশম্পায়নেরও নয় ঝিনুককে প্রথম দেখা।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতে বলাই সিংহী লেন ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে যেত ঝিনুক। আর তখন ডানদিকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে রামমোহন রায় হোস্টেল থেকে কয়েকটা ছেলে রোজ লক্ষ করত তাকে।

ঝিনুক শুধু একজনকেই লক্ষ করেছে। অনুগত, বিশ্বাসী ভক্তের মতো, দোতলার এক জানালায়

তার কামাই ছিল না কখনও। তবে সে মাঝে মাঝে নেমে আসত, পিছু নিত। বহু দূর ঘুরে উলটোদিক দিয়ে এসে মুখোমুখি হত। তবে সাহসের অভাবে কখনও কথা বলেনি। সেই নীরব ভালবাসা কিশোরী ঝিনুকের সর্বাঙ্গে বকুলের মতো ঝরেছে তখন। এক বছর গড়িয়ে যাওয়ার মুখে একদিন ঝিনুক দোতলায় ছেলেটিকে খুঁজে পেল না। একটু অবাক হয়েছিল সে। ছেলেটা গেল কোথায়?

ছেলেটা আসলে কোথাও যায়নি, শুধু জায়গা বদল করেছিল। নীচের তলায় হোস্টেলের কমনরুমে টুকটাক টেবিল টেনিসের আওয়াজ পেয়েছে ঝিনুক। সেই কমনরুমের খোলা জানালায় চোখের কাছে ক্যামেরা তুলে তাক করে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা। ঝিনুক তাকাতেই শাটার টিপল। তারপর খুব ভয়-পাওয়া ক্ষীণ গলায় বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না।

ঝিনুক জবাব দেয়নি। আজকালকার ছেলেমেয়ে হলে কবে লটর-পটর করে ফেলত। কিন্তু তারা পারেনি। শুধু একটু মনখারাপ হয়েছিল ঝিনুকের। আর দেখা হবে না?

অবশ্য না হলেই বা কী? উঠতি বয়সের সুন্দরী ঝিনুক তার পরেও কত পুরুষের দৃষ্টিতে স্নান করেছে।

কিন্তু বৈশম্পায়ন ঠিক বলেনি। দেখা তো হল। কেউ কাউকে চেনা দিল না। কিন্তু চিনতে পারল ঠিকই। ঘটনাটা মনেই থাকত না ঝিনুকের, যদি সেদিন বৈশম্পায়ন ছবি না তুলত। বড় জানতে ইচ্ছে করে, সেই ছবিটা আজও বৈশম্পায়নের কাছে আছে কি না।

সিগারেটের প্যাকেটটা ঝিনুক আরও কিছুক্ষণ দেখল চেয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ট্র্যাশ বিন-এ ফেলে দিয়ে আসবার সময় শুনল, ফোন বাজছে।

ঝিনি?

হ্যাঁ।

একটা খবর আছে।

কী খবর?

মদনা এসেছে।

মদনাটা আবার কে?

আরে মদনা, আমাদের মদনা। এম পি।

তাতে কী হল?

না বলছিলাম, ওকে কাল খেতে বললে কেমন হয়।

সে তুমি বুঝবে। আমি কী বলব?

না, না, মানে বাড়িতে তেমন কোনও ঝামেলা কোরো না। ভাবছিলাম, চিনে রেস্টুরেন্টের খাবার নিয়ে যাব।

ভয়টা তো খাবার নিয়ে নয়।

ও হো হো, তুমি যা পাজি হয়েছ না! আচ্ছা, এবার খুব ছোট একটা বোতল খোলা হবে।

সে তুমি খোলো গিয়ে। কাল আমি শুক্তির বাসায় গিয়ে বসে থাকব বিকেলে।

আরে, কী যে মুশকিল। এবার ঝামেলা হবে না, ঠিক দেখো। আরে, আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে। আগের মতো বেহদ্দ ছেলেমানুষ আছি নাকি?

তোমার ফ্ল্যাট, তাতে তুমি যা খুশি করবে। আমার কী? আমি থাকব না।

এই কি প্রেম ঝিনি?

সেটাও তুমি বুঝে দ্যাখো।

এটা প্রেম নয়।

আমি তো প্রেম চাই না।

তা বটে। তুমি সত্যিই প্রেম চাও না।—মাধবের একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা হলে ড্রাই হোক?

সে তোমার খুশি।

বিয়ারে আপত্তি নেই তো! ওটা তো মদের ক্যাটাগোরিতে পড়ে না।

ওসব আমি জানি না। মদনার গলা জড়িয়ে ধরে তুমি বদনা বদনা খাও। আমি সং সেজে বসে থাকতে পারব না।

না হয় তুমিও একটু খাবে। স্বাদটা জেনে রাখা ভাল;

আমার স্বাদের দরকার নেই।

আচ্ছা তা হলে ড্রাই। এক্সট্রিমলি ড্রাই। ও কে?

কী একটা জরুরি কথা বলা দরকার যেন মাধবকে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ বলা দরকার। ভীষণ দরকার।

শোনো, একটু ধরে থাকো। জরুরি কথা আছে।

মনে পড়ছে না?

না। তবে পড়বে।

ধরে আছি। তুমি বরং কথাটা মনে করার চেষ্টা না করে বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে জল দাও। গুনগুন করে একটু রবীন্দ্রসংগীত গাও। মনটাকে অনাদিকে ব্যস্ত রাখো। তা হলে হঠাৎ মনে পড়বে।

আঃ, একটু চুপ করো না! এক্ষুনি মনে পড়বে।

চুপ করছি। কিন্তু তুমি একটু অন্য কথা ভাবো না ঝিনি! মনে করো আমরা সেই উশ্রী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। তুমি উঠতে ভয় পেয়েছিলে বলে ওঠা হল না। মনে পড়ে?

মোটেই ভয় পাইনি। এক সাধু আমাদের উঠতে বারণ করেছিল।

ওই হল। সাধু ভয় দেখিয়েছিল, আর তুমি ভয় পেয়েছিলে।

সাধু ভয় দেখায়নি। সাবধান করেছিল।

এবার মনে পড়েছে?

কী?

জরুরি কথাটা?

না, কিন্তু মনে পড়বে।

মনে করার চেষ্টা কোরো না। খবরদার। বরং আমাদের সেই বীভৎস মধুচন্দ্রিমার কথাটা মনে করো। নিছক বাঙালি বলে কিছু ছেলে সেবার সমুদ্রের ধারে আমাদের কীরকম হেকেল করেছিল। নতুন বউয়ের সামনে আমি একটু রুস্তম হতে গিয়ে কীরকম...

আঃ, চুপ করো না। ওসব কথা বলে আরও সব গুলিয়ে দিচ্ছ আমার। দাঁড়াও আসছি।

এই বলে ক্র্যাডলের পাশে রিসিভার রেখে দ্রুত পায়ে শোওয়ার ঘরে ঢোকে ঝিনুক। খুব ভাল সুগন্ধ মাখলে তার মন স্বচ্ছ হয়ে যায়। নিউ মার্কেট থেকে কেনা দুর্দান্ত একটা জার্মান সেন্ট আছে। ক্যাবিনেট খুলে বুকে সেইটে দু'বার স্প্রে করে ঝিনুক। সম্মোহনের মতো গন্ধ। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

শিশি জায়গা মতো রেখে উঠে আসতে গিয়ে নীলুর ছবিটা চোখে পড়ল। ভাগ্যিস!

ফোন তুলে ঝিনুক বলে, নীলুকে যে খুন করেছিল তাকে মনে আছে?

একটু চুপ করে থেকে মাধব যখন কথা বলল ফের, তখন সে অন্য মানুষ। এতটুকু রস-রসিকতা নেই গলায়। ধীর স্বরে বলল, আছে। কেন?

তার নামটা কী?

নব হাটি।

সেই নব জেল থেকে পালিয়েছে।

এবার এতক্ষণ চুপ করে থাকে মাধব যে, ঝিনুকের একবার সন্দেহ হয় ওপারে কেউ নেই।

শুনছ?

শুনছি। তোমাকে কে বলল?

শুক্তি।

শুক্তি জানল কী করে?

ওকে বলেছে বিনায়ক।

বিনায়ক কার কাছে খবর পেল?

অত শত জিজ্ঞেস করিনি। তবে মনে হল, খবরটা জরুরি। তোমাকে জানানো দরকার।

খবরটা খুবই জরুরি। ভীষণ জরুরি। তোমাকে ধন্যবাদ ঝিনি।

॥ ৬ ॥

কাল থেকে শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে বৈশম্পায়ন। ডাক্তার বলেছে, রেস্ট নিন। কিন্তু মনে অস্থিরতা থাকলে কী করে মানুষ বিশ্রাম করবে কে জানে।

কালীঝোরার ডাকবাংলো থেকে সেই কবে তিস্তার উপত্যকা দেখেছিল বৈশম্পায়ন! সেই উপত্যকা আর নদী কী কবে আস্তে আস্তে হয়ে গেল মৃত্যুর উপত্যকা, মৃত্যুনদী! এত সুন্দর একটি নিসর্গ দৃশ্যকে মৃত্যুর রং মাখিয়েছে কে? সে নিজেই কি? নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বৈশম্পায়ন।

আলিপুরদুয়ার কোর্টে সে বেশ মনের সুখে রাজত্ব করছিল। বাঁশবনে শেয়াল রাজা, বখেরা বাঁধল মানুষের ভাল করতে গিয়েই। বছুরে বন্যার পর সেবার গা গঞ্জে যখন ভীষণ অসুখ বিসুখ দেখা দিল তখন সরকারি ডাক্তারদের অনেক বলে কয়েও সে গ্রামে যেতে রাজি করাতে পারেনি। নতুন চাকরিতে তখন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে টগবগ করছে। একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই সে ডাক্তারদের গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছিল। প্রথম রাউন্ডে জিতেই গিয়েছিল সে। ডাক্তাররা গ্রেফতার হল, জামিন পেল, তাদের বিরুদ্ধে কেস তৈরি করতে লাগল পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গেল কলকাতায়। কাগজে খবর বেরোল। প্রতিক্রিয়াটা হল বিশাল রকমের। আলিপুরদুয়ারের ডাক্তাররা এই ঘটনার প্রতিবাদে রুগি দেখা বন্ধ করে দিল। সে এক বিশাল হইচই। পুরো ব্যাপারটাই তার হাতের বাইরে চলে গেল, যখন একটি বড় রাজনৈতিক দল লেগে গেল পিছনে। রোজই তার অফিসে আর বাড়িতে মিছিল আসতে লাগল। গদি ছাড়ো, গো ব্যাক ইত্যাদি ধ্বনি দিত তারা। দু' দফায় আটচল্লিশ ঘণ্টা করে ঘেরাও থাকল সে। চিতু নামে একটা ছোকরা প্রায়দিনই মিছিলে বক্তৃতা দিতে উঠে যা খুশি বলত তার উদ্দেশে। তখন বৈশম্পায়নের পাশে পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, একটা লোকও তার পক্ষে নয়। কলকাতা থেকে বড় অফিসার তদন্তে এসে খুব সন্তোষ দেখালেন না বৈশম্পায়নের প্রতি। বৈশম্পায়ন একবার তার নিরাপত্তার কথা তুলেছিল। অফিসার বললেন, পুলিশ প্রোটেকশন তো আছে।

এ অবস্থায় পুলিশ কী করবে? ওরা কো-অপারেট করছে না।

তা হলে কলকাতা চলে যান। ছুটি নিন।

তে-এঁটে, গেঁতো বৈশম্পায়ন তবু ছিল। তখন ডুমকি হবে, তাই শর্মিষ্ঠা ছিল কলকাতায় বাপের বাড়িতে।। হঠাৎ টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, শর্মিষ্ঠা সিরিয়াস। কাম শার্প।

বৈশম্পায়ন টেলিগ্রাম পেয়ে পাগলের মতো কলকাতায় রওনা হচ্ছিল। বাধা পেল ঘেরাওয়ে।

চিতু মধ্যমণি। বৈশম্পায়ন টেলিগ্রামটা তাকে দেখিয়ে মিনতি করল, বড্ড বিপদ আমার। এ সময়টায় যদি কনসিডার করেন।

চিতু মৃদু হেসে বলল, এটা পুরো ফল্স টেলিগ্রাম। চালাকি করবেন না। এ সব কায়দা অনেক পুরনো।

তখন শর্মিষ্ঠা ছিল ভীষণ প্রিয়, অকল্পনীয় আপন। সেই শর্মিষ্ঠা বাঁচে কি মরে ঠিক নেই, আর কতগুলো ইঁদুর তাকে আটকে রাখবে? বৈশম্পায়ন মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। লাফিয়ে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরেছিল চিতুর, তোকে আজ খুন করে ফেলব শুয়োরের বাচ্চা...

হাসপাতালে যখন সংজ্ঞাহীনতা থেকে আধো-চেতনায় ফিরে আসছিল বৈশম্পায়ন তখনই সে জীবনে প্রথম শুনেছিল মৃত্যুনদীর গান। চারদিকে হিম সাদা অনড় পাথর, নির্জন উপত্যকা আর উৎস ও মোহনাহীন এক নদী। সেই থেকে নদী সঙ্গে আছে। দপ করে চেতনা জুড়ে জেগে ওঠে। তখন সংসারের সবকিছুই অর্থ হারিয়ে ফেলে।

চিতু মিথ্যে বলেনি। টেলিগ্রামটা ফল্সই ছিল বটে। সে যখন আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুব সন্ধিক্ষণে, তখন কলকাতার এক নার্সিং হোমে নিরাপদে শর্মিষ্ঠা আট পাউন্ডের স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে প্রসব করেছে। ডুমকির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এল বৈশম্পায়নের জীবনে পরিবর্তন। ডুমকি লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।

রাতে দুটো কামপোজ খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। তবু যে খুব ভাল ঘুম হয়েছে এমন নয়। শরীরে গভীর ক্লান্তি, মনে হাজার বছরের স্মৃতির ভার। ডাক্তার বলেছে, ওভারওয়ার্ক, টেনশন, প্রেসাব একটু কম।

কিন্তু আসলে তা তো নয়।

শর্মিষ্ঠা আজও বেরোচ্ছে পুজোর বাজার করতে। কাল একা একা তেমন সুবিধে করতে পারেনি। বুবুম থাকবে বাচ্চা ঝি সাবিত্রীর কাছে। বৈশম্পায়নও একটু একা হতে চাইছে। জীবনে একার জন্য একটু সময় করে নেওয়া যে কত প্রয়োজন।

শোওয়ার ঘরে কাপড় বদলাতে এসে শর্মিষ্ঠা বলে, আজ আর একদম সিগারেট খাবে না।

হুঁ।—বালিশে মুখ ঢুকিয়ে রেখে বৈশম্পায়ন জবাব দেয়।

হুঁ নয়, একদম খাবে না।

আচ্ছা।

আমার যদি দেরি হয় তবে সাবিত্রী তোমাকে খেতে দেবে। খেয়ে নিয়ো।

আচ্ছা।

শর্মিষ্ঠা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের প্রসাধন সেরে নিল। এবার শাড়ি পরবে। স্টিলের আলমারির দরজা ঘড়াম করে খুলে শাড়ি বাছতে বাছতে বলল, ঝিনুক একটু অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। না?

বৈশম্পায়ন জবাব দেয় না।

কাল অতক্ষণ ওদের বাড়িতে বসে থাকলাম ও কিন্তু একদম পাত্তা দিতে চাইছিল না! অথচ এক-একদিন দেখলে এমন করে যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে!

বৈশম্পায়ন এবারও জবাব দেয় না।

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ওদের সম্পর্ক কেমন গো?

কাদের?

ঝিনুক আর মাধববাবুর?

খুব ভাল। দু'জন দু'জনকে চোখে হারায়।

শর্মিষ্ঠা মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয় না।
নাই-বা হল, তাতে ওদের কিছু যায় আসে না।
তুমি তো সব ভাল দেখো। আমার মনে হয় ওদের সম্পর্কটা খুব কোল্ড।
তুমি জানো না।
ওরা স্বামী-স্ত্রী আলাদা খাটে শোয়। জানো?
জানি। ওটাই আজকালকার ফ্যাশন।
একসঙ্গে না শুলে আবার স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কী? আমি তা কিছুতেই পারব না।
একসঙ্গে শোওয়াটাই কি ভালবাসা?
তা নয়। তবে ভালবাসা থাকলে আলাদা শোওয়ার কথা ভাবাই যায় না।
তোমার সব অদ্ভুত যুক্তি। বৈশম্পায়ন একটু হাসে, খাট আলাদা বলেই কি মনও আলাদা?
শর্মিষ্ঠা রেগে গিয়ে বলে, তোমরা পুরুষরা কিছু বোঝো না। কেবল তত্ত্ব দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করো। মানুষ তো থিয়োরি নয়। তার অনেক ব্যাপার আছে। আমি কাল পুনমের সঙ্গে কথা বলেও বুঝলাম, ওদের সম্পর্ক তেমন ভাল নয়।
গোয়েন্দাগিরি করছিলে?
একে গোয়েন্দাগিরি বলে না। ওদের ফ্ল্যাটটা অত সুন্দর, অত সাজানো, ওদের অত টাকা, দেখলে মনে হয় ভাগ্য যেন ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি ভাল তো ভাল নয়। তাই ভাবছিলাম কোথাও একটু গোলমাল আছেই।
তাই ঝিয়ের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলে?
খোঁজ আবার কী? কথা বলছিলাম। বলতে বলতে অনেক কথা ফাঁস হয়ে গেল।
কী কথা ফাঁস হল?
মাধববাবু নাকি আজকাল খুব মদ খায়।
বরাবরই খেত।
আজকাল বেশি খায়।
না, বরং ঝিনুকের শাসনে আজকাল কমিয়েছে।
তুমি জানো না।
আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।
শর্মিষ্ঠা আপস করে বলল, আচ্ছা সে না হয় মানলাম। কিন্তু ঝিনুক নাকি একদম বাসায় থাকতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
তাতে কী?
বোঝো না কেন? অত সুন্দর ফ্ল্যাটেও ওর মন বসে না কেন এটা তো ভাববে?
ও বরাবরই উড়নচণ্ডী।
আচ্ছা বাবা। তুমি যে ঝিনুকের পক্ষ নেবে তা জানতাম। যা ড্যাব ড্যাব করে দেখছিলে ওকে।
বৈশম্পায়ন একটা ধমক দেয়, বাজে বোকো না। কাল আমার যা শরীরের অবস্থা ছিল তাতে মেরিলিন মনরোর দিকেও তাকানোর মেজাজ ছিল না।
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রীকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
একা হয়ে বৈশম্পায়ন উঠল। স্টিলের আলমারির মাথায় একটা অব্যবহৃত অ্যাটাচি কেস আছে তার। সব সময়ে চাবি দেওয়া থাকে। সেইটে নামিয়ে খুলল বৈশম্পায়ন। একটা পুরনো মনিব্যাগের খোপ থেকে সোয়া দুই ইঞ্চি বর্গ মাপের ফোটোটা বের করে।
ঝিনুক! কী সুন্দর!
যে ভইগল্যান্ডার ক্যামেরায় ছবিটা তোলা সেটাও বহুকাল আগে চুরি হয়ে গেছে। ঝিনুক পরস্ত্রী।

ছবিটা তবু কত জীবন্ত! সাদা ফ্রক পরা ঝিনুক ডান হাতটা তুলে কোমরের বেল্টটা ঠিক করছে। বাঁ ধারে ঝুলছে বইয়ের ব্যাগ। বব করা চুলে রিবন বাঁধা। পিছনে লাহা বাড়ির দেওয়ালে ইটের খাঁজে খাঁজে সকালের রোদ আর ছায়ার চৌখুপি। একটা অশ্বত্থ চারা। এই তো যেন গত কালকের কথা।

মেজদা!

একটু চমকে বৈশম্পায়ন তাকিয়ে দেখে, ঘরের দরজায় জয়। ভারী লজ্জা পেয়ে ছবিটা বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলতে গিয়ে আরও ধরা পড়ে যায় সে। জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে তার সবটুকু অপকর্ম লক্ষ করল। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

কী খবর? আজ অফিসে যাসনি?

তুমিও তো যাওনি।

আমার শরীরটা ভাল নেই।

পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি-পরা জয় ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে বলে, কাল মদনদা এসেছে।

জানি।

কাল থেকে মদনদার সঙ্গে ঘুরছি। ওঃ, কত মিটিং, কত কনফারেন্স, আর কী সব লোক!—জয়ের চোখে একটা সম্মোহিত ভাব!

জয় যে মদনের একজন চামচা তা বৈশম্পায়ন জানে এবং মোটেই ভাল চোখে দেখে না। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, ওর পিছনে ঘুরছিস কেন?

মদনদাই বলল, জয় আমার সঙ্গে একটু থাক!

তাই থাকলি? তোর কাজকর্ম নেই?

কাজকর্ম আবার কী? অফিস তো? তা সেই অফিসের চাকরিও তো মদনদাই করে দিয়েছে। ও চাকরি যাবে না। মদনদার সঙ্গে ঘুরলে খুব তাড়াতাড়ি ফিল্ড ক্রিয়েট হয়।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, কীসের ফিল্ড?

পলিটিক্যাল ফিল্ড! গতকাল স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা হল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের পার্টি আবার বেশ শক্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য অপোজিশনও আছে। নিত্য ঘোষ মদনদার লিডারশিপ মানতে চাইছে না!

জয় হয়তো ভবিষ্যতে এম পি বা মিনিস্টার হতে চায়। ভেবে বৈশম্পায়ন একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাইদের মধ্যে এই জয়টাই সবচেয়ে গবেট। মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন নয়। তবু ওই হয়তো একদিন মন্ত্রীটন্ত্রী হয়ে বসবে। কিছুই অসম্ভব নয়। বৈশম্পায়ন কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে গম্ভীর মুখে ভ্রু কুঁচকে বলল, ভাল।

তোমাকে বলতে এলাম, মদনদা তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চেয়েছে।

কেন?

বলল, কী দরকার আছে। বহুকাল দেখা হয় না। আজ বিকেলে কেয়াতলায় মাধবদার বাড়িতে রাত্রে তোমার খাওয়ার নেমন্তন্ন। ওখানে মদনদাও আসবে।

মাধবের বাড়িতে!—বলে আবার ভ্রু কোঁচকায় বৈশম্পায়ন। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ধক ধক করে ধাক্কা লাগে। ঝিনুক! কী সুন্দর!

একটা খবর শুনেছ মেজদা?

কী খবর?

নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে!

সামান্য চমকে উঠে বৈশম্পায়ন বলে, সেই ডেঞ্জারাস ছেলেটা না? যে নীলুকে খুন করেছিল?

হ্যাঁ, একসময় মদনদার হয়ে খুব খাটত। পরে বিট্রে করে।

কী করে পালাল?

জেলখানার লোকদের হাত করেছিল বোধহয়। মামলার সময় কোর্টেই বলেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেককে দেখে নেবে।

কাকে দেখে নেবে?

যারা ওকে খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে।—বলে জয় একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে বলে, কেউ কেউ বলে বটে যে, নব খুনটা করেনি। তবে আমি জানি, করেছিল।

তুই কী করে জানলি?

মদনদা বলেছে।

মামলার সময় তুই কোর্টে যেতিস?

রোজ। সব সওয়াল জবাব মনে আছে।

নব দোষ কবুল করেছিল?

না। বারবার শুধু বলত, দোস্তকে দোস্ত কখনও খুন করতে পারে? নীলু আমার জিগির দোস্ত ছিল।

বৈশম্পায়ন মুখ বিকৃত করে বলে, এ খুনটা না করলেও নব আরও বহু খুন করেছে। সে সবের জন্য ওর সাতবার ফাঁসি হওয়া উচিত।

জয় মাথা নেড়ে বলে, সে ঠিক কথা। কিন্তু নীলুর কেসটায় ওর খুব প্রেস্টিজে লেগেছিল। ও জজকে বলেছিল, আমার হাতে অনেক লাশ পড়েছে। সেসব কেসে আমাকে জেল দিন, ফাঁসি দিন, কোই বাত নেহি। কিন্তু নীলুর কেসে আমাকে ঝোলাবেন না। আমি আমার দোস্তকে খুন করিনি।

এখন নব জেল থেকে বেরিয়ে কি শোধ তুলবে নাকি?

জয়ের মুখটা একটু বিবর্ণ দেখায়। তবে গলায় জোর এনে বলে, অতটা কি করবে? কে জানে! তবে নব খেপে গেলে অনেক কিছু করতে পারে। আজ সকালে খবরটা শোনার পর থেকে মদনদাও একটু ভাবনায় পড়েছে। আর মজা দেখো, গতকালই নবর মা এসেছিল নবর বউয়ের জন্য মদনদার কাছে চাকরি চাইতে।

মদন কি চাকরি দেবে?

মদনদা তো কাউকে না বলে না। চেষ্টা করবে বলে বুড়িকে কাটিয়ে দিয়েছে। পরে আমাকে বলেছে, নবর বউকে চাকরি দিলে পলিটিক্যাল রি-অ্যাকশন খারাপ হবে। কিন্তু আজ সকালে খবরটা পাওয়ার পর মদনদা ডিসিশন চেঞ্জ করেছে।

চাকরি দেবে?

চেষ্টা করবে।

রাতারাতি মত পালটে ফেলল?

পালটানোই ভাল। নব বেরিয়েছে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। জানের পরোয়া নেই তো।

মদন তা হলে ভয় পেয়েছে?

না না। মদনদা অত ডরায় না। কত খুন জখম পার হয়ে এসেছে।

বৈশম্পায়ন মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো এম পি ছিল না।

জয় কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। বলল, তাছাড়া মদনদার নাগাল পাওয়া কি সোজা? শ্রীমন্তদা আছে, আমরা আছি, ভি আই পি বলে কথা! চাইলেই পুলিশ এসে যাবে। দু'দিন বাদেই যাচ্ছে দিল্লি হয়ে অস্ট্রেলিয়া। নব মদনদাকে পাবে কোথায়?

বৈশম্পায়ন চিন্তিত মুখে বলে, শুধু মদনই তো নয়, আরও অনেকের ওপর নবর রাগ আছে।

সবচেয়ে বেশি রাগ মাধবদার ওপর। মাধবদার চোখের সামনেই তো খুনটা হয়। নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে তো মাধবদা মিথ্যে সাক্ষী দেবে না!

বৈশম্পায়ন মাধব আর নীলুর সম্পর্কটা জানে। কিন্তু সে কিছু বলল না। ব্যাপারটা মাধবও চাপা রাখতে চায়। বাইরের কেউ তেমন জানে না। বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে, মামলায় তুইও ছিলি না?

না। আমি কোর্টে যেতাম।

নব তোকে চিনে রাখেনি তো?

জয় হাসে, নব আমাকে এমনিতেই চেনে। তবে নীলু হাজরার ব্যাপারে নয়।

তবু সাবধানে থাকিস।

আমার কোনও ভয় নেই। আজ উঠি। তুমি কিন্তু বিকেল-বিকেল মাধবদার বাড়ি চলে যেয়ো।

জয় চলে গেলে বৈশম্পায়ন কিছুক্ষণ নব হাটি, মাধব আর মদনের কথা ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁধভাঙ্গা ঢেউয়ের মতো এল একটাই চিন্তা, আজ আবার ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হবে।

॥ ৭ ॥

একজন এম পি-র উচিত খুব ভোরবেলা উঠে সূর্যোদয় দেখা। একজন এম পি-র উচিত কিছুক্ষণ পাখির গান শোনা। একজন এম পি-র উচিত ভোরবেলা কিছুক্ষণ নিরুদ্বেগ চিত্তে বেড়ানো। গুনগুন করে একটু গানও তার করা উচিত। আর উচিত দিনের মধ্যে কিছুটা সময় একা একা থাকা এবং সেই সময় যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করা। একজন এম পি-ব পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে কিছুক্ষণ তার ভুলে যাওয়া উচিত যে, সে একজন এম পি। যদি সে তা পারে তবে একজন এম পি-র উচিত সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের মুখ ভেঙানো।

মদন সাধারণত সকালে উঠতে পারে না। অনেক রাত জেগে কিছু লেখাপড়া করা তার স্বভাব। বস্তুত চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে একমাত্র রাত বারোটার পর ছাড়া সে এসব করার সময় পায় না। ফলে ভোরবেলা উঠতে প্রায় দেরি হয়ে যায় খুব।

আজ ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘুম ভেঙেই মদন একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। রোজ ঘুম ভাঙার দেড় দুই মিনিটের মধ্যেই তার মনে পড়ে যায় যে, সে একজন এম পি। আজ তা পড়ল না। দিদির বাইরের ঘরেব জানালা দিয়ে ভোরের একটু বাতাস আসছিল। কাছে-পিঠে রুগ্ন কিছু গাছপালা এখনও আছে। বাতাসে তারই নির্ভুল গন্ধ। রাতে কোনও সময়ে একটু বৃষ্টিও হয়ে গিয়ে থাকবে। ভেজা ভাবটা বাতাসে এখনও রয়ে গেছে। ফলে ভোরবেলাটি খুবই চমৎকার মনে হচ্ছিল মদনের।

সে উঠে টক করে বেসিনে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা মারল কিছুক্ষণ। চোখ কট করে উঠল জ্বালায়। এখনও শরীরে যথেষ্ট ঘুম দরকার। পায়ের দিকে সোফার ওপর কালকের ছেড়ে রাখা ধুতি আর পাঞ্জাবি অভ্যস্ত হাতে এক মিনিটে পরে নেয় মদন। সময় নেই। এই ভোরবেলাটা বৃথা যেতে দেওয়া যায় না।

দিদি!— বলে একটা ডাক দিতেই চিরু সাড়া দেয়, কী রে? বেরোচ্ছিস নাকি?

পার্ক থেকে আসছি একটু ঘুরে। দরজাটা দিয়ে দাও।

বলেই আর দাঁড়ায় না মদন। বেরিয়ে হন হন করে কালীঘাট পার্কের দিকে হাঁটতে থাকে।

আকাশে বাদলার মেঘ কেটে যাচ্ছে। ওই শুকতারা। মদন একটু চেয়ে দেখল। এবার দেরিতে বড় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরে আর পুবে। ভেসে যাচ্ছে, সব ভেসে যাচ্ছে। প্রতিবারই ভাসে এবং তার জন্য কেউ কিছু করে না।

আমি একজন এম পি, এ কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল মদনের। নির্জন রাস্তায় সে একটু শব্দ করেই বলে ওঠে, দ্যাখ শালা মদনাকে দ্যাখ। শালা নাকি এম পি! হোঃ হোঃ!

সতীশ মুখার্জি রোডের পুরনো মসজিদের হাতায় গাছে গাছে পাখি ডাকছে। ডাকে রে পাখি, না ছাড়ে বাসা...খনার বচন না? বাকিটা মনে নেই মদনের। তবে ওইটুকু মনে আছে, ডাকে রে পাখি, না ছাড়ে বাসা।

হ্যাঁ বৃষ্টি। খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবার। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমি কী করতে পারি? মদনা তো ভগবান নয় বাপ, একজন বুরবক এম পি মাত্র। হ্যাঁ, মানছি এম পি-রা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তা বলে বানভাসি দেশে ডাঙাজমি বের করার মতো এলেম তার নেই। তবে মদনা ফিল করে বাপ। ফিল করে। পাখিরা খুব ডাকছে। মদন একবার পুরনো মসজিদটার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখে নে শালারা এক আস্ত এম পিকে। তোরা হতভাগারা জামাকাপড় পরতে শিখলি না, পার্লামেন্ট বানাতে পারলি না, হোল লাইফ কেবল কিচমিচ!

মদন গুনগুন করে উ হু হু, উ হু হু করে গাইতে লাগল। তার গলায় সুর নেই। তার জন্য পরোয়াও করে না সে। উ হু হু, উ হু হু করেই যেতে থাকে।

ডানদিকে পার্ক। ঢুকতে গিয়ে মদন একটু দাঁড়ায়। শালারা গাছগুলো কেটেছে। বাচ্চাদের জন্য দোলনা ছিল, স্লিপ ছিল, সেগুলো লোপাট করেছে। ঘাসজমিতে টাক ফেলেছে। খানিক জায়গা কেটে নিয়ে রঙ্গশালা বানিয়েছে। কারও কিছু করার নেই। ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

মদন পার্কে ঢুকে পড়ে। ভোর-ভোর হয়ে এসেছে। পার্কে কিছু ভুতুড়ে চেহারার আবছা লোক মর্নিং ওয়াক সেরে নিচ্ছে। মদন তাদের কক্ষপথে নিজেকে ভিড়িয়ে দেয়। উ হু হু গানটাও চলতে থাকে। এই ভোরবেলা পার্কে বেড়াতে তার বেশ আনন্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব আনন্দ হচ্ছে। দারুণ আনন্দ। নিজেকে এম পি বলে একেবারেই মনে হচ্ছে না তার।

কিন্তু মনে না পড়ে উপায় আছে? ব্যাটারা পড়িয়ে ছাড়ে। ক্যাংলা চেহারার টেকো একটা লোক গাদি খেলার মতো পথ আটকে একগাল হেসে বলল, দাদা মর্নিং ওয়াক-এ বেরিয়েছেন বুঝি?

মদন চিনল। তবে নামটা মনে পড়ল না। বলল, এই একটু। তা কী খবর?

আমাকে চিনতে পারছেন তো! আমি হরি গোঁসাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। কী খবর?

আজ্ঞে কালকে স্টেশনে যে সেই কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে?

কোন কথাটা?

আমার বিশুকে যদি একটু মেডিকেলে চান্স করে দেন।

মদন টেকো হরি গোঁসাইয়ের মাথার উপর দিয়ে উদাস চোখে পুবের আকাশের দিকে চেয়ে বলে, কী সুন্দর দেখেছেন?

ব্যস্ত হয়ে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে কোনটার কথা বলছেন?

এই ভোরবেলাটা?

আজ্ঞে তা আর বলতে! খুব সুন্দর।

এই ভোরবেলায় আপনার মনটা উদাস হয়ে যায় না?

খুব যায়। খুব যায়। আমাদের ওদিকটা তো প্রায় গ্রামের মতোই। সেখানে যা একখানা করে ভোর হয় না রোজ, কী বলব দাদা! মনটাকে একদম বৈরাগী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। ফার্স্ট বাস ধরে আসতে আসতে আজও খুব উদাস লাগছিল।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তবু দেখুন বিশুরা আমাদের পিসু ছাড়ে না। উদাস হওয়ার স্কোপ থাকলেও কেউ আমরা উদাস হচ্ছি না, বৈরাগীও না।

হরি গোঁসাই মাথা চুলকে বলে, পিসু কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদা। পিসু পোকা নাকি?

না, না। পিসু মানে পিছু। বিশুর সঙ্গে মিলে যায় বলে পিসু কথাটা বেরিয়ে গেল।

হরি গোঁসাই চিমটিটা ধরল না। গদগদ হয়ে বলল, আপনার পিসু ছাড়লে আমাদের চলবে কেন? আমরা হচ্ছি একেবারে আনরিকগনাইজড জনসাধারণ। আমার কথাই ধরুন না। সারা জীবনে একজন মাত্র ভি আই পি-র কাছে কিছুটা ঘেঁষতে পেরেছি। সেই ভি আই পি হলেন আপনি। আত্মীয়স্বজনের কাছে বড় মুখ করে আপনার কথা কত বলি। অফিসেও একটু আধটু খাতির পাই।

এই পার্কে আমাকে ধরলেন কী করে?

বাসায় গিয়েছিলাম। দিদি বলল, পার্কে এসেছেন।

মদন ধৈর্যশীল লোকটার মুখের দিকে চেয়ে ভোরের স্বচ্ছ হয়ে আসা আলোয় জনসাধারণকেই দেখতে পায়। এই সেই জনসাধারণ যাদের নিয়ে তার বহু কালের কারবার। এই সেই বিশুর বাবা যাদের পিছু পিছু একদিন সে ঘুরেছে, আর যারা এখন তার পিছু পিছু ঘোরে।

মদন একটা শ্বাস ফেলে বলে. শ্রীমন্তর কাছে একটা ডায়েরি আছে। তাতে—

তাতে লেখানো হয়ে গেছে। হেঁ হেঁ।

ঠিক আছে, দেখব'খন।

দেখবেন। সারাজীবন বড় দুঃখে কষ্টে কেটেছে। বিশুটা যদি ডাক্তার হয় তবে শেষ জীবনটা—

মদন হাসে। বাপদের ছেলেপুলে নিয়ে কত আশাই থাকে! গম্ভীর হয়ে বলে, ও আশা না করাই ভাল।

হরি গোঁসাই হঠাৎ নিভে গেল। মদন উদাসভাবে চারদিকে চেয়ে হাঁটছে। পিছনে হরি গোঁসাই বলে, সে কথাটা অবশ্য ঠিক।

মদন প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে। ভাল মানুষের মতো বলে, কোন কথাটা?

ধন্য আশা কুহকিনী।

ওঃ। হ্যাঁ—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মদন হরি গোঁসাইকে ভুলে গিয়ে উদাস পায়ে হাঁটতে থাকে। এখন আর খুব একটা আনন্দ হচ্ছে না তাব। তবে ভালই লাগছে।

পিছন থেকে হরি গোঁসাই গলা খাঁকারি দিয়ে জানান দিল যে, সে আছে।

দাদার সঙ্গে যে আজ বড় শ্রীমন্ত নেই!

পাখিরা অনেকক্ষণ বাসা ছেড়েছে! এখন ঝোপে ঝাড়ে চিড়িক মিড়িক করে ঘুরছে তারা। সূর্য মসজিদ ছাড়িয়ে উঠে পড়ল প্রায়। কলকাতার সব ম্লান কুশ্রীতা প্রকট হল। দেখতে দেখতে মদন আনমনে জিজ্ঞেস করে, কে শ্রীমন্ত?

আপনার বডিগার্ডের কথা বলছিলাম। দিনকাল তো ভাল না। কালকের খবর শুনেছেন তো?

কীসের খবর?—মদনের গলায় এখনও অন্যমনস্কতা।

নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে?

মদন এবার সচেতন হয়। কিন্তু ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার মুখোশটা পরে থেকে বলে, কে নব হাটি?

দাদা সব ভুলে গেছেন। নব হাটি মানে যে লোকটা নীলুকে খুন করল। আর যার মা এসেছিল কাল আপনার কাছে ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চাইতে।

ওঃ! হ্যাঁ।

এ সময়টায় শ্রীমন্তকে একটু কাছে কাছে রাখবেন। নব লোক ভাল নয়। অবিশ্যি—

মদন উদাস গলায় জিজ্ঞেস করে, অবিশ্যি—

অবিশ্যি নবর এখন আর সেই তেজ নেই নিশ্চয়ই। পুলিশের তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা। তবু...

তবু?

তবু সাবধান থাকা ভাল। আমি কি আর একটুক্ষণ সঙ্গে থাকব দাদা?

নব যদি এ সময়ে আসে তবে ঠেকাতে পারবেন?

টেকো হরি গোঁসাই অপ্রতিভ হেসে বলে, আজ্ঞে আমি ওসব লাইনের লোক তো নই। তবে চেঁচাতে পারব। খুব চেঁচাব—

পারবেন? তবে একটু চেঁচিয়ে শোনান তো! দেখি কেমন পারেন।

লজ্জা পেয়ে হরি গোঁসাই বলে, দাদা কী যে বলেন!

তা হলে কী করে বুঝব যে, চেঁচাতে পারেন?

হরি গোঁসাই মাথা নিচু করে লজ্জার গলায় বলে, পারি কিন্তু।

দেখি কেমন পারেন। চেঁচান, খুব জোরে চেঁচিয়ে বলুন, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন, খুন করে ফেললে! চেঁচান, চেঁচান।—বলে মদন এক পা পিছিয়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল হরি গোঁসাইকে।

হরি গোঁসাই বলল, তা হলে বিশুর মেডিকেলে ভর্তি ব্যাপারটা হবে তো!

হবে, হবে। ওর বাপ হবে। নইলে কি আর বিশু আমার পিসু ছাড়বে? এখন চেঁচান দেখি!

হরি গোঁসাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল! চোখ বুজে মাথায় আর বুকে বার কয়েক হাত ঠেকিয়ে কোনও দেব-দেবীকে প্রণাম করে নিল। তারপর বুক ভরে দম নিয়ে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচাতে লাগল, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন করে ফেললে—এ—এ—এ—এ—এ—

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কাক ডাকতে লাগল, পাখিরা ঝোপ ছেড়ে প্রাণভয়ে উড়ল, প্রাতঃভ্রমণকারীরা সটাসট দৌড়ে গিয়ে রেলিং টপকাতে লাগল, সামনের এক বাড়িতে দড়াম করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। হরি গোঁসাইয়ের যে এত আওয়াজ তা দেখলে বোঝাই যায় না।

মদন অবাক হয়ে বলল, বাঃ। আপনার গলা তো অ্যাসেট।

বিনীত হাসি হেসে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে খুব জোর আওয়াজ হয়। একবার ভিড়ের ট্রেনে শুধু চেঁচিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলাম।

হুঁ।—মদন গম্ভীর হয়ে বলে।

আর কি চেঁচাতে হবে দাদা?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না। এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। যা চেঁচিয়েছেন।

আমি তা হলে আসি?

আসুন। একটু পা চালিয়েই আসুন গিয়ে।

বিশুর তা হলে?

পিসু পিসু থাকবে।

বলে মদনও একটু পা চালিয়েই পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে। কারণ, প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে ব্যাপারটা কী তা দেখতে। মদনকে একজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে দাদা? খুন নাকি? মদন এমনভাবে মাথা নাড়ল যাতে 'হ্যাঁ'ও হয়, 'না'ও হয়।

একটু বাদে যখন সে জামাইবাবুর মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছিল তখন আর তার মুখে উদাসীনতা ছিল না। জামাইবাবু মণীশ অখণ্ড মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছে।

জামাইবাবু।

বলো ব্রাদার।

আপনার চেয়ে খবরের কাগজটা দেখা আমার বেশি দরকার। এবার ছাড়ুন।

তুমি তো এখন পায়খানায় যাবে।
তা গেলেই বা। খবরের কাগজ নিয়ে যাব।
যেয়ো। তার আগে যতটা পারি দেখে দিচ্ছি। তোমার ওটা ভারী ব্যাড হ্যাবিট।
কোনটা? খবরের কাগজ পড়াটা?
না, এই খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা।
ব্যাড হ্যাবিট কেন হবে? আমি বরাবর যাই। খবরের কাগজ না হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।
দো ইউ আর অ্যান এম পি এবং তোমার সময়ও কম, তবু বলি এটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট।
তা হোক। এবার ছাড়ুন।
ছাড়ছি। চা-টা খাও না।
চা ফিনিশ।
তবে চিরু না হয় আর এক কাপ করে দিক। ও চিরু! শুনেছ!
কী অত মন দিয়ে পড়ছেন?
পড়ার কিছু নেই ব্রাদার। সব ছাতামাথায় ভর্তি কাগজ। সেই ছাতামাথাই দেখছি।
আমার প্রেস কনফারেন্সটা দিয়েছে?
দিয়েছে একটুখানি। পাঁচের পাতার তলার দিকে।
হেডিং কী করেছে?
মালদহের অবস্থা ভয়াবহ। তারপর কোলন দিয়ে তোমার নাম।
দূর! পলিটিক্যাল ব্যাপারগুলো দেয়নি তা হলে। আপনি যে কেন এত কিপটে!
কেন বলো তো! ত্রিশ টাকা কিলোর চা খাওয়াচ্ছি।
লোকে আরও দামি চা আমাকে খাওয়ায়। চায়ের খোঁটা দেবেন না। বলছি, মোটে একটা খবরের কাগজ রাখেন কেন?
একটাই পড়ার সময় পাই না।
তা ছাড়া সেই একটাও আবার বাংলা। বাংলা কাগজে খবর কম থাকে জানেন না?
তোমার দিদিও একটু পড়ে যে। ও তো ইংরিজি বোঝে না।
এবার থেকে দুটো করে রাখবেন। ইংরিজিটার দাম আমি প্রতি মাসে মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।
এম পি-দের প্রতিশ্রুতির দাম নেই, সবাই জানে। রিস্ক নেওয়াটা কি ঠিক হবে?
চিরু চা নিয়ে এসে মণীশের দিকে চেয়ে বলে, বড় গলায় চায়ের হুকুম দেওয়ার দরকার ছিল না। আমি তো চা করছিলামই।
মণীশ এক গাল হেসে বলে, তা জানতাম। তবু শালার কাছে নিজেকে উদার প্রমাণ করার জন্যই ওটুকু করতে হল।
মদন মুখ গম্ভীর করে বলে, এই বয়সে আর কি নতুন করে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টাতে পারবেন? আমি যে প্রথম থেকে জানি আপনি ক্রনিক মাইজার।
অথচ দেখো পাড়াপ্রতিবেশিরা সবাই আলোচনা করে, মণীশবাবু টাকা জমাতে জানেন না। কেবল খরচ করেন, কাছা খুলে খরচ করেন।
আপনার পাড়াপ্রতিবেশীরা স্বপ্ন দেখে। এবার খবরের কাগজটা ছাড়ুন।
বড্ড জ্বালাচ্ছ হে। যাও না, বাইরের ঘরে সেই কাকভোরে এসে সব বসে আছে, গিয়ে তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলে এসো না। ততক্ষণে...
ওরা বসে থাকার জন্যই এসেছে। তাড়া নেই।
তোমরা লিডাররা বাপু বড্ড গেরামভারি।

আমি গেরামভারি?

নয়তো কী? লোকেরা বশংবদ হয়ে বসে থাকে, আর তোমরা পায়খানায় বসে খবরের কাগজ পড়ো।

লিডারদের নিয়মই তাই।

এই নাও ব্রাদার!—বলে মণীশ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে দেয়, যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ শান্তিতে চা-টুকু খেতে পারব না।

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে বলে, জামাইবাবু।

উঁ।

আমি যদি মরে যাই তা হলে কী হবে বলুন তো?

কেউ বিধবা হবে না।

আর কী হবে?

আমার টেলিফোনটাও হবে না।

আঃ, কী হবে না তা জিজ্ঞেস করিনি। কী হবে তাই জানতে চাইছি।

আসলে তুমি মরবে না।

কী করে বুঝলেন?

তোমারই-বা মরার কথা মনে হচ্ছে কেন? কোনওকালে তো এসব বলোনি! আমরা জানি তুমি হচ্ছো পজিটিভ লোক। এম পি-রা এমনিতেই একটু বেশিরকম আশাবাদী হয়। আজ হঠাৎ তোমার হল কী?

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে মৃদু হেসে বলে, মৃত্যুর একটা রোমান্টিক দিক আছে, তাই আজকাল মাঝে মাঝে ভাবি মরলে কেমন হয়?

কিছুই হয় না হে।—মণীশ মাথা নাড়ে, মরার মধ্যে রোমান্টিক কিছু নেই, মহৎ কিছু নেই। একেবারে মোটা দাগের ক্যাবলা একটা ব্যাপার। আমাদের দেশে গবা পাগলা বলে একটা লোক ছিল। সে গাইত, মনু রে, বাপের খবর রাখলা না, হ্যায় যে মইরা ভ্যাটকাইয়া রইছে পাছায় পড়ছে জোছনা।

অশ্লীল! অশ্লীল!

মোটেই নয়।—মণীশ মাথা নাড়ে, একদম অশ্লীল নয়। পাছায় জোছনা পড়ার ব্যাপারটা বরং খুবই করুণ। মরা-টরার কথা হলেই আমার গানটা মনে পড়ে।

আপনি যা একখানা জিনিস না জামাইবাবু!

মণীশ উঠতে উঠতে বলে, তুমি পেপার দেখো, আমি বরং ততক্ষণে বাথরুমের দখল নিই গে। তুমি পত্রিকা হাতে ঢুকলে তো পাক্কা দেড় ঘণ্টা।

মণীশ বাথরুমে গেলে কিছুক্ষণ একা বসে আপন মনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে হাসল মদন। দিনটা আজ ভালই যাবে। সকালে একটা চেঁচামেচি শুনেছে। বউনিটা ভালই বলতে হবে। তারপর এই জোছনার ব্যাপারটা। দুপুরে আজ রাইটার্সে দু'জন মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং আছে। তখন যদি কথাটা মনে পড়ে যায় তা হলে ঠিক ফুড়ুক করে হেসে ফেলবে সে। বিকেলে আছে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তখনও কি মনে পড়বে?

পত্রিকায় কয়েদি পালানোর কোনও খবর নেই। বাংলা কাগজে এমনিতেই খবর কম থাকে, তার ওপর এসব খবরের এমনিতেই তেমন গুরুত্ব নেই। তবে যারা নবকে জানে তারাই বুঝবে খবরটা কতখানি গুরুতর।

বাইরের ঘর থেকে পরদা সরিয়ে ভিতরের বারান্দায় উঁকি দিল শ্রীমন্ত, দাদা, আপনার বন্ধু এসেছে।

আমি জগবন্ধু। কে এসেছে? নামটা কী?

মাধব হাজরা। ওই যে গোলপার্কের কাছে—

আর বলতে হবে না। মাধব দুনিয়ায় একটাই হয়। আসতে বলো।

মাধব বোধহয় বাইরের ঘরে ফিতে বাঁধা জুতো খুলতে খানিক সময় নিল। তারপর ভিতরের বারান্দায় আসতেই তার মুখে উদভ্রান্তিটা প্রথম লক্ষ করে মদন।

তবু মদন সব সময়ে নিজে খোশ থাকতে এবং অন্যকে খোশ রাখতে চেষ্টা করে। হালকা গলায় বলল, মুরগা পেয়েছিস?

কীসের মুরগা?

তোর বাসায় আজ রাতে একটা আস্ত এম পি-র নেমন্তন্ন যে।

ওঃ! আচ্ছা, মুরগি হবে। কিন্তু খবর শুনেছিস?

খবর শোনাই আমার কাজ। নব হাটি পালিয়েছে, এই খবর তো? তা অত ঘাবড়ানোর কী আছে? বোস।

মণীশের পরিত্যক্ত চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে মাধব। তারপর হাঁফ ধরা গলায় বলে, এটা ইয়ারকির ব্যাপার নয়।

এ কথায় সকালের হাসিখুশি ভাবটা মদনের মুখ থেকে মুছে গেল বটে, কিন্তু তার মুখে কোনও ভয় বা ভাবনা ফুটল না। মুখটা আস্তে আস্তে গম্ভীর ও নিষ্ঠুর হয়ে গেল। সে শুধু বলল, হুঁ।

মাধবের চেহারাখানা সুন্দর। দারুণ ফরসা, জোড়া ভ্রু, খুব লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। সুন্দর ছেলেদের সুন্দর বউ জোটে না, সুন্দর মেয়েদের জোটে না সুন্দর বর। মাধবের বউ ঝিনুক কিন্তু সুন্দর। দু'জনেই সুন্দর, দু'জনের সংসার সুন্দর, ফ্ল্যাট সুন্দর। কিন্তু তবুও কোথায় যে ওদের খিঁচ তা আজও মদন বুঝতে পারল না।

মাধবের চেহারায় আজ তেমন জলুস নেই। সকালে দাড়ি কামায়নি, লম্বা চুলগুলো পাট করা নেই, মুখে বেশ উত্তেজিত ভাব, উৎকণ্ঠা। ডান হাতের মধ্যমায় গোমেদের আংটিটা বারবার ব্যস্ত আঙুলে ঘোরাচ্ছে। বলল, ইউ মাস্ট ডু সামথিং।

মদন ধীরে-সুস্থে কাগজের শেষ পাতাটা উলটে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, চা খাবি?

চা!—যেন প্রস্তাবটায় কিছু অস্বাভাবিকতা আছে এমনভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল মাধব। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, হ্যাঁ খাব। দিদি কই?

ঘরে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করে দিচ্ছে।

মাধব কিছুক্ষণ চুপ করে বসে একবার আংটি ঘোরায়, একবার চুলে আঙুল চালায়। হঠাৎ একটু ঝুঁকে বলল, পেপারে কিছু দিয়েছে?

মদন চোখ তুলে বলে, কী দেবে?

নবর ব্যাপারটা?

মদন মাথা নেড়ে পত্রিকাটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে বলে, একজন তৃতীয় শ্রেণির কয়েদির পালানোর খবর তেমন কিছু গুরুতর নয়।

মাধব পিছন দিকে হেলে বসে কয়েক পলক চোখ বুজে থাকে। তারপর বলে, তা বটে। বাট ইট ইজ এ সিরিয়াস নিউজ ফর আস।

মদন মৃদু স্বরে বলে, আস নয়, বল মি। তুইই ভয় খেয়েছিস, আমি নয়।

মাধব চোখ খুলে মদনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, তোকে কি নব স্পেয়ার করবে?

মদন মৃদু হেসে বলে, তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা ভাল, হোয়েদার আই উইল স্পেয়ার হিম।

মাধবের স্বাভাবিক চোখা চালাক ভাবটা আজ ছুটি নিয়েছে। তবু সে বলল, আমি তোর মতো হিরো নই। অ্যান্টিহিরো।

মদনের মুখে কথা ফুটল না। কিন্তু চাপা নিষ্ঠুরতাটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। মাধব জানে, মদনের মধ্যে একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কী তা এত বছরেও বুঝতে পারল না। ছেলেবেলায় আসানসোলে কলিয়ারির এলাকায় তারা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। লোকে বলত, মদনমাধব। এত গলাগলি ছিল, তবু মদনের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত একস্ট্রা ফাউ জিনিসটার জোরেই না ব্যাটা এম পি। আর সেই ফাউ জিনিসটা যা মাধবের নেই, সেটা এখন মদনের মুখে চোখে ঢেউ দিচ্ছে।

মাধব তার খড়খড়ে দাড়িওলা গাল চুলকোল। তারপর একটু মিয়োনো গলায় বলল, তুই কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নব জেল ভেঙে পালাল, এর মধ্যে একটু অদ্ভুত যোগাযোগ আছে না? ব্যাপারটা ভেবে দেখেছিস?

মদন মাথা নাড়ে, না। অত ভাববার সময় নেই। ভেবে লাভও নেই। গোটা দুই মুরগা কিনে নিয়ে বাড়ি যা। ঝিনুককে ভাল করে রাঁধতে বলিস।

ঝিনুক গত বছর পাঁচেক রান্নাবান্না করেনি।

বলিস কী?

ঝিনুক না রাঁধলেও আমরা না খেয়ে থাকি না। রান্নার লোক আছে, চিন্তা নেই।

তবে মুরগা কিনে বাড়ি যা। একটু বেশি করে বান্না করতে বলিস। আমি তোদের না জানিয়েই বৈশম্পায়নকেও নেমন্তন্ন করে দিয়েছি।

বৈশম্পায়ন!—বলে একটু হাসে মাধব, কিন্তু কোনও মন্তব্য করে না।

মদন অবশ্য তীক্ষ্ণ চোখে হাসিটা দেখল। বলল, হাসলি কেন? এনিথিং রং?

না, নাথিং রং!

ওকে নেমন্তন্ন করায় তোরা অসুবিধেয় পড়বি না তো!

মাধব মাথা নেড়ে বলে, অসুবিধে তো তোকে নিয়ে! ঝিনুক বলে দিয়েছে ড্রিংক করলে বাড়ি থাকবে না।

হোঃ হোঃ করে হাসে মদন। তারপর গলা নামিয়ে বলে, ড্রিংকস কি বাদ যাচ্ছে নাকি?

না। তবে ছোট করে হবে।

ঝিনুক বাড়ি থাকবে?

মাধব এবার খুব অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি হেসে বলে, বোধহয় থাকবে। বৈশম্পায়ন আসছে জানলে থাকবেই মনে হয়।

তীক্ষ্ণধার চোখে মাধবের মুখটা দেখে নিচ্ছিল মদন। ঝুঁকে আস্তে করে বলল, ইজ দেয়ার এনি অ্যাফেয়ার?

সিরিয়াস কিছু নয়। দু'জনেই দু'জনের প্রতি একটু সফট। ব্যাপারটা আমি খুব এনজয় করি।

মদন হতাশার গলায় বলে, তোরা একেবারে হোপলেস। বউ অন্যের সঙ্গে প্রেম করলেও সেটা তোরা এনজয় করিস কী করে?

আস্তে মদনা, আস্তে।—মাধব গলা আর-এক পরদা নামিয়ে বলে, দুনিয়াটাই তো রঙ্গশালা। কে কার বউ? কে কার প্রেমিকা? আমি পজেসিভ নেচারের লোক নই। আমি শুধু দেখি, শেষযৌবনা এক মহিলা মধ্যবয়স্ক একজনের প্রেমে পড়ে কেমন বয়ঃসন্ধির ছুকরি হয়ে যাচ্ছে। ঘ্যাম নাটক মাইরি।

সেই নাটকে তোর ভূমিকা কী? পরদা টানা?

না। আমার ভূমিকা ছিল ভিলেনের। কিন্তু আমি মাইরি ফিলজফার হয়ে গেছি। তবে রেফারির মতো নজরও রাখছি। বাড়াবাড়ি দেখলেই ফাউল বা অফসাইড বলে চেঁচিয়ে বাঁশি বাজাব।

এই সময়ে শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে চিরু আসে। মাধবের দিকে চেয়ে বলে, বন্ধু এসেছে বলে তোর টিকি দেখা গেল। নইলে দিদি মরল কি বাঁচল সে খবরও তো নিস না।

মাধব এক গাল হেসে বলে, তোমার মরার কী? দিব্যি গায়ে-গতরে হয়েছ।

মোটা হয়েছি বলছিস?

মোটা নয়, মোটা নয়। পরিপূর্ণ হয়েছ।

ফাজিল। চা খাবি?

মদন একটু ধমক দিয়ে বলে, আরে তুই দুনিয়াসুদ্ধু লোককে চা খাওয়াতে গিয়ে যে পতিদেবতাটিকে ভাত খাইয়ে অফিসে পাঠাতে পারবি না।

না। না খেয়ে যাবে না, ডাল ভাত নেমে গেছে। সেই ভোর রাতে তুই যখন বেরলি তখনই উঠে সব সেরে ফেলেছি।

মাধব একটা শ্বাস ফেলে বলে, তা হলে চিরুদি, গরিব ভাইকে একটু চা খাওয়াও।

তুই গরিব? কেয়াতলায় ফ্ল্যাট কিনেছিস, তুই যদি গরিব তো আমরা কী?

তোমরা সবাই শুধু আমার ফ্ল্যাটটাই দেখলে! আর আমি যে দিনকে-দিন শুকিয়ে যাচ্ছি।

তুই আবার শুকোলি কোথায়?—চিরু অবাক হয়ে বলে, বেশ তো চেহারাটা দেখাচ্ছে। একটু এলোমেলো অবশ্য। রাতে ঘুমোসনি নাকি?

না, সেসব নয়। মাঞ্জা দেওয়ার সময় পাইনি।

ঝিনুক কেমন? বেশি মোটা হয়ে যায়নি তো?

না, না। রেগুলার যোগাসন করে, কম খায়, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজকর্ম নেই, মোটা হবে কেন? ভাল আছে।

বউয়ের কথা উঠলেই তোরা অমন বেঁকিয়ে কথা বলিস কেন বল তো? বউগুলো কি মানুষ নয় নাকি?

বেঁকিয়ে বললাম কোথায়?—মাধব অবাক হওয়ার ভান করে।

ওই যে বললি, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজ করে না, আরও সব কী যেন।

তোমার মনটাই বাঁকা। একজন মহিলা নিজের শরীরের যত্ন নেয় এটা তো প্রশংসার কথাই। তুমি যে নাও না, তার জন্য আড়ালে আমরা তোমার নিন্দে করি।

চিরু হেসে ফেলে বলে, ইয়ারবাজ। বোস, চা করি আনি।

হ্যাঁ, যাও। রান্নাঘর ছাড়া তোমাকে কোথাও মানায় না।

সেটা তোর জামাইবাবুও খুব ভাল বুঝেছে।

এতক্ষণ মদন একটাও কথা বলেনি। কোনও কথা তার কানেও যায়নি। নিজের নখগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবছিল।

মণীশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, যাও ব্রাদার, খবরের কাগজ নিয়ে আধবেলার জন্য ঢুকে পড়ো।

কোঁচকানো ভ্রু সটান হল, একটু হেসে মদন বলে, অত সময় যদি হাতে থাকত জামাইবাবু! এক্ষুনি রাইটার্সে যেতে হবে।

মণীশ মাধবকে দেখে খুশি হয়ে বলে, এই যে ব্রাদার! মদন না এলে মাধবের দেখা পাওয়া যায় না, আমাদের হয়েছে বিপদ। তোমার ফোন নম্বরটা চিরুকে দিয়ে যেয়ো তো।

যাব, কিন্তু আপনি জন্মেও ফোন করবেন না, জানি।

আহা, কখন কী দরকার হয় তার কি ঠিক আছে? তবে পয়সা দিয়ে করতে একটু গায়ে লাগে আজকাল। ফোনের চার্জ যা বেড়েছে।

কেন, অফিস থেকে করবেন!

মণীশ ম্লান একটু হাসে, অফিস থেকে! অফিস থেকে প্রাইভেট ফোন করতে একটু কিন্তু-কিন্তু লাগে।

মদন মাথা নেড়ে মাধবকে বলে, জামাইবাবু একটা হোপলেস কেস, বুঝলি মাধব? হি ইজ হেলপলেসলি অনেস্ট। এ রোগের চিকিৎসা নেই।

মাধব হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল, জামাইবাবুর অনেস্টি সম্পর্কে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা যে শুচিবায়ু হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

মণীশ খুব দুর্বলভাবে একটু হাসে।

॥ ৮ ॥

তুই ভয় পেয়েছিস?—মদন জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্তর মুখ করুণ গম্ভীর। কোনও বিপদ বা ঝামেলা পাকালে শ্রীমন্তর মুখ ওইরকম হয়ে যায়। তাকাতে ভয় করে। সে মদনের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলে, না। তবে কেয়ারফুল থাকা ভাল।

মদন আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, তা থাক। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শ্রীমন্ত মুখে কিছু বলল না। তবে মনে মনে বোধহয় মদনকে একটা খিস্তি দিল। তার কারণ নব জেল থেকে বেরিয়েও মদনের নাগাল পাবে না। তার আগেই চিড়িয়া ভেগে যাবে দিল্লি। তারপর বিদেশে। কলকাতার ঘুণচক্করে নবর পাল্লা টানতে পড়ে থাকবে শ্রীমন্ত আর তার সাকরেদরা। কাজটা খুব সহজ নয়। যারা নবকে চেনে তারাই জানে।

কথা হচ্ছিল একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে বসে। সকালবেলা। গাড়ি যাদবপুর পেরিয়ে বাঘাযতীনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই বোড়াল।

দিল্লিতে আমার জন্য একটা চেষ্টা করবে বলেছিলে মদনদা।

হবে।—মদন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, এখানেও তো বেশ আছিস!

একে থাকা বলো! ভদ্রলোকের মতো থাকতে গেলে কলকাতায় কিছু হবে না। দিল্লিতে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কী করবি?

যা হোক। একটা দোকান, না হয় বাস বা ট্যাক্সির পারমিট।

ওখানে পারবি না। শক্ত কাজ। তবু যদি যেতে চাস তো চেষ্টা করব।

করো।

তুই একটু ভয় খেয়েছিস শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত জানে, মদনদা এই যে দিল্লি যাবে, গিয়েই ভুলে মেরে দেবে তার কথা। ভি আই পি-রা সব একরকম। মদনের ওপর নানা কারণেই একটু চটে আছে সে। লোকটা কথা দিয়ে কথা রাখে না। তার ওপর ভয়ের খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। শ্রীমন্ত ঠান্ডা গলাতেই পালটি দিল, ভয় একটু তুমিও খেয়েছ মদনদা। নইলে এই সাতসকালে জরুরি কাজ ফেলে বোড়াল রওনা হতে না।

মদন হাসে। একটু অপ্রতিভ বোধ করে না। বলে, কাল নবর মাকে কথা দিয়েছিলাম। কানোয়ারকে সকালে ফোন করতেই রাজি হয়ে গেল। খবরটা দিয়ে আসা কি খারাপ?

খারাপ বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, নবর মাকে তুমি কাটিয়ে দেওয়ার জন্য ওকথা বলেছ।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, শত হলেও এক সময়ে নব আমার জন্য অনেক করেছে।

শ্রীমন্ত কথা বাড়াল না। কিছুদিন যাবৎ মদনদার সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না এটা সে নিজেই টের পাচ্ছে। মদনদাও কি আর টের পাচ্ছে না?

মদন একটা সিনেমা হলের হোর্ডিং দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে। মুখ ফিরিয়ে বলল, এ কথাটা যেন চাপা থাকে!

নবর বউয়ের চাকরি তো? ও নিয়ে ভেবো না।

দিল্লি সত্যিই যেতে চাস?

চাই। কলকাতায় কী হবে বলো। হুজ্জতি করা আমার রক্তে নেই। ওসব মেলা হয়েছে। এইবার সেটল করতে চাই।

তুই বি কম পাশ না?

টুকে মুকে। ওসব বিদ্যে ধোরো না। ধ্যাড়াব!

না, তোকে দিয়ে চাকরি হবে না সে আমি জানি!

চাকরিটাও রক্তে নেই কিনা। আমার বাপ পুরুত ছিল। মেলা যজমান। আমিও নাকি অনেকের কুলগুরু। রাস্তাঘাটে মাঝে মাঝে বেশ বুড়ো বয়স্ক মানুষও দুম করে পেন্নাম ঠুকে দেয়। কতক বাড়ি আছে যেখানে গেলে আমার জামাই আদর।

মদন হাসে, লাইনটা তো ভালই।

হ্যাঁ, ভাল না হলে আমার বাবা চিরকাল ও কাজ করবে কেন? চাকরি আমাদের বংশে কম লোকই করেছে।

নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে হয়ে তুই খুনখারাপি করিস কী করে?

মাইরি মদনদা, ঠুকো না। খুনখারাপি আমার সয় না। একটু হাঁকডাকের লোক ছিলাম বটে বরাবর। কিন্তু এতটা হয়ে যাব ভাবিনি।

মদন শ্রীমন্তর হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলল, তুই একটু নরম আছিস।

আছি মদনদা। স্বীকার করছি।

নবর মতো তুই কেঠো মানুষ নোস।

তাও নই।

নবর সঙ্গে যদি পাল্লা টানতে হয়, পারবি?

শ্রীমন্ত একগাল হাসে, পারব। তাতে আটকাবে না। তবে আমি ওর মতো নীচে নামতে পারি না। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো?

পারছি। আমার লোক নিয়েই কারবার। তোর মুশকিল হল, তুই যে ভদ্রলোক তা ভুলতে পারিস না। আর, কিছু লোক যে তোকে দেখলে প্রণাম করে সেটাও তোকে কাছা ধরে টানে মাঝে মাঝে।

শ্রীমন্ত হাসল। বলল, সবই তো বোঝো দাদা।

আমি তোরটা বুঝি। কিন্তু তুই আমারটা বুঝিস না।

কেন বলছ ওকথা?

এই যে বললি, ভয় পেয়েছি বলেই নাকি আমি নবর বউয়ের চাকরি করে দিচ্ছি।

ওটা একটা ফালতু কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মদন চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমন্তরও বুকটা একটু গুড় গুড় করে ওঠে। তার গায়ে জোর আছে, পকেটে লোডেড রিভলভার আছে, সাহসও আছে, তবু সে জানে মদনদার মতো লোক তার মতো হাজারজনাকে নাচিয়ে বেড়াতে পারে। বে-খেয়ালে বেচাল বলে ফেলেছে।

শ্রীমন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, মদনদা, রেগে আছ মাইরি?

মদন জবাব দিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

বোড়ালে বড় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মদন নামল। শ্রীমন্ত নামতে যাচ্ছিল, মদন হাত তুলে বলে, না। তুই থাক।

শ্রীমন্ত অবাক হয়ে বলল, একা যাবে?

একাই যেতে হবে।

তোমার কাছে আর্মস নেই!

তাতে কী? আমি কোনওকালে আর্মস নিয়ে চলি না। ভয় নেই, আর্মস ছাড়াও আমার অন্য কিছু আছে সেটা তুই বুঝবি না।

কাজটা ঠিক করছ না মদনদা। নব এখন ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে. বাড়িতে একবার ঢুঁ দেবেই।

দূর বোকা! নব তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। ও জানে,পুলিশ ওর বাড়ির চারদিকে জাল পেতে আছে।

তা অবশ্য ঠিক।

শ্রীমন্ত মাথা চুলকায়। একটু কেমন লাগে শ্রীমন্তর। মদনদা তাকে সঙ্গে নিচ্ছে না। মদনদা গম্ভীর। কোথাও একটা তাল কেটে যাচ্ছে।

ভয় নেই।—বলে মদন একটা ভাঙাচোরা মেটে রাস্তা ধরে এগোতে থাকে।

এদিকে অনেক নিবিড় গাছপালা, পুকুর, ফাঁকা জমি। একেবারেই হদ্দ গ্রাম। বেশির ভাগ নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস বলে বাড়িঘরগুলোর তেমন বাহার নেই। ম্যাড়ম্যাড়ে, শ্রীহীন। মদনের খুব খারাপ লাগছিল না। সে একবার ঘুড়ি দেখল। প্রায় এগারোটা। বেলা একটায় রাইটার্সে মিটিং। সময় আছে। তবু সে একটু পা চালিয়ে হাঁটে।

আধ মাইলের মতো হেঁটে একটা শ্রীহীন, ভারী গরিব চেহারার চালাঘরের সামনে উঠোনে পা দেয় মদন। নব টাকা কামাই করেছিল মন্দ নয়, কিন্তু ঘর-সংসারের পিছনে কিছুই ঢালেনি। কেবল অন্য সব ফূর্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে। এই কাঠা তিনেক জমিও ওকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি। ঝোপজঙ্গলে ভরা এই তিন কাঠা এক মুসলমানকে ভোগা দিয়ে দখল করেছিল সে। সেই জমি আর চালাঘরটাই এখন নবর আত্মীয়দের একমাত্র আশ্রয়।

মদন উঠোনে পা দিয়ে একবার ফিরে চাইল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা ঘাড়েগর্দানে চেহারার লোক তাকে দেখছে। গায়ে হাফ-হাতা নীল রঙা একটা শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি। সাদা পোশাকের পুলিশকে চিনতে এক লহমাও লাগে না মদনের। সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ডাকে, গৌরী! গৌরী!

এত ভদ্র গলায় বোধহয় বহুকাল কেউ গৌরীকে ডাকেনি। খোলা দরজায় গৌরী এসে অবাক চোখে তাকায়।

গৌরী ফরসা নয়। তবে ভারী মিঠে মোলায়েম একটা শ্যামলা রং ছিল তার। ছিল অফুরন্ত স্বাস্থ্যের শরীর। ছিল অকূল দু'খানা চোখ। মুখে উপচে পড়ত শ্রী।

এখন তার কিছুই প্রায় নেই। শরীর শুকিয়ে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। রং কালো হয়ে গেছে। এখনও শুধু চোখ দুখানা আছে। তাকালে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে আজও।

আমি মদনদা। চিনতে পারছ?

গৌরীর শুকনো হাড্ডিসার মুখে একটু হাসি ফুটল। খুব অবিশ্বাসের হাসি। প্রথমটায় বুঝি কথা সরল না। তারপর মৃদু লাজুক স্বরে বলল, এলেন তা হলে! আসুন।

বেশিক্ষণ বসার সময় নেই।

গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল, এই কথায় হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল পুরনো গৌরী। বলল. একটু বসে না গেলে লোককে কী করে বিশ্বাস করাব যে, একজন এম পি আমাদের বাড়িতে এসেছিল?

মদন মৃদু হেসে নামমাত্র দাওয়ায় উঠে চটি ছেড়ে রাখে। বলে, ঘরে নয়। এইখানেই একটা মাদুর-টাদুর পেতে দাও।

গৌরী বলে, না। এখানে আব্রু নেই। ঘরে আসুন। গরম লাগবে একটু. তা আমি পাখার বাতাস দেব'খন।

অগত্যা মদন ঘরে ঢোকে। যেমনটি আশা করা যায়, ঘরটি ঠিক তেমনিই। বেড়ার গায়ে গুটি তিনেক ছোট জানলা বসানো। রোদে তাতা টিনের গরমে ভেপসে আছে ভিতরটা। দু' ধারে দুটো সস্তা চৌকিতে অত্যন্ত নোংরা বিছানা। কয়েকটা ফুটপাথে কেনা র‍্যাকে রাজ্যের কৌটো-টৌটো রাখা। তবে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে, লক্ষ করে মদন।

তোমার শাশুড়ি কই?

উনি একটা বিড়ির কারখানায় যান।

ছেলেমেয়ে?

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে।

লেখাপড়া করে না?

নাম লেখানো আছে ইস্কুলে। যায় বলে তো মনে হয় না।

দু'জন। বড়টা ছেলে। ছোটটা মেয়ে। তোমার ক'টি?

গৌরীর হাতপাখাটা নড়বড়ে। মচাৎ মচাৎ শব্দ হচ্ছে। মদন বলল, থাক গে। পাখা রেখে দাও।

গৌরী রাখল না। বলল, কেমন আছেন?

ভাল নেই গৌরী।

আপনি ভাল নেই? তবে আমরা কোথায় যাব!

তোমার শাশুড়ি গতকাল আমার কাছে গিয়েছিল।

জানি। আমি বারণ করেছিলাম, শোনেনি।

বারণ করেছিলে কেন?

গৌরী একটু উদাস হয়ে বলে, কী হবে গিয়ে? আমার জীবনে তো আর ভাল কিছু হবে না।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে. তোমার চাকরিটা হয়ে গেছে।

কোথায়?

নবর কারখানায়।

খবরটা শুনে গৌরী গা করল না। বলল, ও।

কারখানায় ওদের অফিসও আছে। সেই অফিসে।

গৌরী জবাব দিল না। হাতপাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ হতে লাগল।

মদন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, নবর কারখানায় কি তুমি চাকরি করতে চাও না?

গৌরী মৃদু স্বরে বলল, এই প্রশ্নটাই আপনার আগে করা উচিত ছিল মদনদা।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, কাল তোমার শাশুড়ি গিয়ে নবর কারখানায় তোমাকে একটা চাকরি দেওয়ার কথা বলল, তখনও ভেবে দেখিনি যে, তোমার কাছে চাকরিটা কতখানি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক আপনার বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি দেখছি। একটু দেরিতে হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।

মদন মাথা নেড়ে বলে, বুদ্ধির ধার কমেও যাচ্ছে। আগের চেয়ে মাথা এখন অনেক কম খেলে।

গৌরী একটু ক্লান্ত স্বরে বলল, নবর মাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে,ওর কারখানায় আমার কাজ করা বিপজ্জনক। ওর শত্রু অনেক। তার ওপর ওর উল্টো ইউনিয়ন এখন কারখানা দখল করেছে। ওখানে চাকরি করা কি সম্ভব! কিন্তু নবর মা তা মানতে চায় না।

কী বলে?

অনেক কিছু বলে। সব তো আপনাকে বলা যায় না। এমনকী বেশ্যাগিরি করেও টাকা আনতে বলে। আর শুনবেন?

মদন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, বুড়ি তার উপযুক্ত কথাই বলে। তাতে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।

আমি উত্তেজিত হই না তো!

নবর সঙ্গে কি জেলখানায় মাঝে মাঝে দেখা করতে যাও?

না। ওর মা যায়। ছেলেমেয়েও কখনও-সখনও যায়।

তুমি যাও না কেন?

কেন যাব?

মদন একটু হাসল, রাগটা কি নবর ওপর? না আমার ওপর?

আপনার ওপর রাগ করব! ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!

ঠাট্টা করছ?

আপনি ঠাট্টা-ইয়ার্কির অতীত হয়ে গেছেন মদনদা।

শোনো, তোমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন তো কম করিনি। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে যাই, এখানে আর থেকো না।

গৌরী অবাক হয়ে বলে, থাকব না? কেন?

কারণ আছে! তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?

গৌরী বিহ্বল মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। কোথায় যাব?

বাপের বাড়ি এখনও কি ম্যানেজ হয়নি?

না! কোনওকালে হবেও না।

তাহলে?

আমার যে কোনও জায়গা নেই, সে তো আপনি জানেন!

চিন্তিত মুখে মদন একটা হুঁ দিল। তারপর আরও খানিকক্ষণ ভেবে বলে, দূরে যেতে হলে পারবে?

কোথায়?

ধরো যদি দিল্লি যেতে হয়?

আমার জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন? আমি বেশ আছি। এব চেয়ে বেশি বিপদ আর কী হবে?

একটু দ্বিধা করে মদন বলে, কাল নব জেল থেকে পালিয়েছে। জানো?

এতক্ষণ ভাঙা পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল মদনের। এখন হঠাৎ পাখার শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তব্ধতাটা খুব বড় করে শোনা গেল।

অবশ্য কয়েক সেকেন্ড বাদেই আবার পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ দ্বিগুণ জোরে হতে লাগল। গৌরী বলল, আপনি ঘরে ভীষণ ঘেমে যাচ্ছেন। দাওযাটাতেও রোদ পড়েছে।

আমার জন্যে ভেবো না। আমি এক্ষুনি চলে যাব। হাতে অনেক কাজ।

সে তো জানি। এত বড় দেশের দণ্ড-মুণ্ডের একজন কর্তা তো আপনিও।

তোমার মুখে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না গৌরী।

কেন মদনদা? আমি কি আলাদা কিছু?

আলাদাই তো ছিলে। এখন কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছ। কেবল কি ঠেস দিয়ে কথা বলতে হয়?

আমার আজকাল স্বাভাবিক কথা আসতে চায় না। মনটা খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে বোধ হয়। হওয়ারই কথা।

না গৌরী, আমাকে দেখলেই তোমার প্রতিহিংসা জেগে ওঠে।

প্রতিহিংসা কেন হবে? কী যে বলেন।—বলে গৌরী হঠাৎ হাতপাখাটা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী শুনল, তারপর বলল, নবর মা আসছে।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, বুড়ি খুব খান্ডার না?

গৌরীও হাসে, নবর মা তো, একটু তেজি তো হবেই।

তোমার সঙ্গে খুব লাগে?

গৌরী মাথা নাড়ে, লাগে, তবে একতরফা। আমি জবাব দিই না।

সে কী!—মদন অবাক হয়ে বলে, জবাব দাও না কেন? এক সময়ে তো তুমি দারুণ ভাল ঝগড়াটি ছিলে! যাকে তাকে ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাতে!

গৌরী অবসন্ন মুখে বলে, আপনি তো আমার দোষ ছাড়া গুণ কখনও দেখেননি।

হাত নেড়ে মদন বলে, ওসব কথা রাখো। আমি তোমাকে ভাল চিনি। কথা হচ্ছে শাশুড়ির সঙ্গে একটু ঝগড়া-টগড়া করো না কেন? তাতে তো সময়টাও ভাল কাটে।

কী যে বলেন মদনদা।—গৌরী বিরক্ত মুখে জবাব দেয়।

কেন, ঝগড়া কি খারাপ?

সে আপনিই জানেন। আমার ভাল লাগে না।

বুড়ির মুখ কেমন? খুব খারাপ কথা বলে?

গৌরী হেসে ফেলে। বলে, কেমন আবার! আঁস্তাকুড়।

তাহলে তো তোফা।

আপনি আবার ঝগড়া-প্রিয় হলেন কবে থেকে?

আহা, পার্লামেন্টে তো আমরা ঝগড়াই করি। দারুণ ঝগড়া। তবে সেখানে গালাগাল চলে না, পয়েন্টে পয়েন্টে ল্যাঙ্গালেঙ্গি হয়। আমার অবশ্য ওরকম বাবু-ঝগড়া ভাল লাগে না। বহুকাল বস্তিমার্কা ঝগড়া শুনিনি, একটু শোনাবে?

গৌরী ভ্রুকুটি করে তেতো গলায় বলে, আমি কি বস্তির মেয়ে?

আরে না। তুমি আবার ঘুরিয়ে ধরলে। আমি নবর মা'র কথা বলছিলাম। একটু খুঁচিয়ে দিলে একেবারে ভাগীরথীর উৎস খুলে যাবে। দাও না একটু খুঁচিয়ে।

গৌরী উদাস হয়ে বলে, আপনি খোঁচান গিয়ে। আমি নিত্যি শুনছি। ওই আসছে। উল্টোদিকের বাড়ির বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ। কথা থেমেছে।

বুড়িকে খবরটা দেবে নাকি?

কোন খবর?

নব যে পালিয়েছে।

উদাস মুখে গৌরী বলে, আপনিই দিন।

তুমি এত উদাস ভাব দেখাচ্ছ কেন বলো তো! নবকে খুঁজতে পুলিশ সব দিকে ঘুরছে। এ বাড়িও তাদের নজরবন্দি। নবকে ধরার জন্য দরকার হলে গুলিও চলবে। আমার নিজের ধারণা, নব মরতেও পারে।

তার আমি কী করব?

নব মরলে তুমি বিধবা হবে, জানো না?

খুব জানি। তবে আমার বিধবা হওয়ার আর বাকি কী? বিয়ের দিন থেকেই তো আমি বিধবা।

নবর ওপর তোমার খুব রাগ।

রাগের স্টেজ পার হয়ে গেছে। এখন শুধু ঘেন্না।

তুমি যা পষ্টাপষ্টি কথা বলো। কিন্তু নবর সঙ্গে তো তোমাকে কেউ ঝোলায়নি। তুমি নিজেই ঝুলেছ।

গৌরী একটু থতমত খেয়ে বলে, আমি ঝুলব কেন? আমি নবকে কোনওকালে চাইনি তো।

মদন গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তখন লিডার ছিলাম না গৌরী। এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় একটু-আধটু সোশ্যাল ওয়ার্ক করতাম। নবর মতো ফেরোসাস গুন্ডা বা নীলুর মতো ভাল ওয়ার্কারকে তখন আমার খুব দবকার হত। যদিও আমরা তিনজন ছিলাম তিনরকম, কিন্তু কাজ করতাম একসঙ্গে। আর একটি জায়গায় আমাদের মিল ছিল। আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম।

গৌরীর মুখ সাদা দেখাচ্ছিল।

মদন একটু চোখের ইশারা করে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, বুড়ি কদ্দুর? এল নাকি?

গৌরী মাথা নেড়ে বলে, পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছে। এক্ষুনি আসবে।

মদন বলে, হ্যাঁ, আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম। তাই না?

নীলুর কথা থাক। তবে আপনারা দু'জন করতেন। মানছি।

কিন্তু তুমি নবকেই দেহ-মন দিয়েছিলে, আমাদের পাত্তা দাওনি।

নবকে আমি মন দিইনি।—খুব ক্ষীণ গলায় গৌরী বলল।

শুধু দেহ?

সেটাও ও জোর করে নিত!

আর মনটা? সেটা কাকে দিয়েছিলে? আমাকে, না নীলুকে?

তা জেনে কী হবে? আপনি তো আগে কখনও জানতে চাননি।

তা ঠিক। তবে জানতে চাইতে হবে কেন বলো তো। মন দিলে তো এমনিতেও টের পাওয়ার কথা।

বহু মেয়েই আপনাকে মন দিয়েছিল, তাদের দিকে তাকানোর সময় আপনার ছিল না।

সময় ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে টেরও পেতাম না ভেবেছ? শুধু তোমারটাই টের পাইনি কোনওদিন। তবে নীলু টের পেত কি না জানি না।

কান্নার আগে যেমন মুখ হয়, গৌরীর মুখ এমন ঠিক সেইরকম। চোখ স্থির, লাল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবেগটাকে ঠেকাচ্ছে। পাখাটা রেখে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় দবজায় নবর মা উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে আবছায়াতেও বুড়ির নজর মদনকে চিনে ফেলেছে। চোখে ভারী অবাক ভাব। মুখখানা হাঁ করা।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, এই যে মাসি! আপনার বউমার চাকরির একটা খবর আছে। তাই দিতে এলাম।

নিজে এলে! কী ভাগ্যি! আমি ভাবছিলাম, বড় মানুষ, বোধহয় গরিবের কথা ভুলেই গেছ।

বুড়ির গলাটা টনটনে। স্বাভাবিক স্বরটাও সাতবাড়িতে শোনা যায়।

মদন বলল, নব আমার সাকরেদ ছিল। তার জন্য এটুকু করা কিছু না।

তা ঠিক।—নবর মা একগাল হেসে বলে, তা কাল থেকেই কি যাবে বউমা?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না মাসি। চাকরি এখানে নয়, দিল্লিতে।

দিল্লি? ও বাবা, তা হলে এখানে কী হবে?

এখানে আপনি তো রইলেন।

বুড়ি গলাজলে আঁকুপাকু খেতে থাকে। কথা ফোটে না মুখে। এই সময়ে বুড়ির পাশ কাটিয়ে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মদন চোখ টিপে বলে, চাকরি তো এখানেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নবর বউ করতে চাইছে না। বলে, নবব কারখানায় চাকরি করতে নাকি ঘেন্না করে।

বলল?—বুড়ির গলা সাত বাড়ি ছেড়ে সাতটা গাঁয়ে পৌঁছে যায়।

মদন উঠে পড়ে। ভাগীরথীর মুখ খুলে গেছে। এবার খেউড়ের বেনোজল নেমে আসবে। খুব ইচ্ছে ছিল মদনের, বসে থেকে শুনে যায়। কিন্তু ঘড়ি ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে। বাইটার্সে মিটিং। বিকেলে পার্টির জরুরি সভা।

মদন দাঁড়িয়ে বলল, আমি দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করছি। নবর বউ যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়। সম্ভব হলে আজই।

গিয়ে কোথায় উঠবে?

সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চলি।

বলে মদন বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পড়ে কয়েক কদম গিয়ে একটু দাঁড়ায়। ওই শোনা যাচ্ছে সারা এলাকা মাত করে নবর মায়ের গলা চৌদুনে পৌঁছল, গেছো মাগি... অমুকভাতারি... তমুকভাতারি ..

মদন আর দাঁড়াল না। মৃদু একটু হেসে হাঁটতে লাগল। লাগ ভেলকি লাগ! নারদ নারদ!

॥ ৯ ॥

সময়ের একটু আগেই পৌঁছে গেল বৈশম্পায়ন। ভারী লজ্জা লজ্জা করছিল তার। রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন, কিন্তু এখনও ভাল করে দিনের আলোটাও মরেনি।

কিন্তু না পৌঁছে উপায়ই বা কী? কাল থেকে ঘরে শুয়ে শুয়ে শরীরে জড়তা এসে গেছে। আর মনটা পাগল-পাগল করছে কেয়াতলার এই বাড়িটার কথা ভেবে। উদ্দাম এক হাওয়া এসে পালে লাগছে বার বার। বন্দর ছাড়তে বলছে। ভেসে পড়ো। ভেসে পড়ো। সামনে অকূল দরিয়া। মৃত্যুশাসিত এই পৃথিবীতে মানুষের সময় বড় কম। লাভালাভ, ভোগ-উপভোগ সব সেরে নাও বেলাবেলি।

আজও দরজা খুলল কিশোরী ঝি পুনম। বাইরের ঘর আজ আরও পরিপাটি সাজানো। চন্দনের গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি জ্বলছে। অন্তত চার ডজন রজনীগন্ধা। ঘরে কেউ নেই।

ইতস্তত করে বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে, মাধব আসেনি?

না, মামাবাবুর তো অফিস।

এ কথায় আরও লজ্জা পায় বৈশম্পায়ন।

বড্ড বেশি আগে আগে চলে এসেছে। এখন কিছু করার নেই। সে সোফার এক কোণে বসে সিগারেট ধরাল। ভিতরে ভিতরে একটা কামনা শেয়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করছে, উঁকি মারছে এদিক-সেদিক।

কিন্তু এই নিরিবিলি ঘরটিতে বসে, ঠুলি পরানো আলোয় কিছুক্ষণ চারদিকের ভৌতিককে অনুভব করতে করতেই দূর, বহু দূর থেকে মৃত্যুনদীর করুণ গান ভেসে এল। সাদা পাথর, বিশাল উপত্যকা, অন্তহীন নদী, অবিরল তার গান।

জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল আঙুল থেকে। নিচু হয়ে তুলবার সময় সে দুর্দান্ত সুগন্ধটা পেল বাতাসে। এইসব সুবাস মাখে একজন। মাত্র একজনই। সে ঘরে এসেছে নিঃশব্দে। সিগারেটটা কুড়োতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিল বৈশম্পায়ন।

সামনে সোফায় ততক্ষণে মুখোমুখি স্থির হয়ে বসেছে ঝিনুক।

বৈশম্পায়ন মুখ তুলে বলল, কী খবর?

ঝিনুকের পরনে বেরোনোর পোশাক। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে চটি, চোখে ভ্রূকুটি।

ঝিনুক মৃদু কিন্তু রাগের গলায় বলে, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, সে কী? কেন?

কেন তা আপনাদের বোঝা উচিত।

বৈশম্পায়ন ঝিনুকের অসহনীয় সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে মনে মনে ভীষণ হতাশা বোধ করে। এত রূপ যার সে কি কখনও সহজলভ্য হতে পারে? বড় দূর, বড় দুর্লভ ঝিনুক।

সে বলল, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই নাকি?

আপনার জন্য! ও মা, কী কথা বলে লোকটা! আপনার জন্য বাড়ি থেকে পালাব কেন?

বৈশম্পায়ন আবার লজ্জা পেয়ে বলে, তা হলে?

বাড়ি থেকে পালাচ্ছি আপনার বন্ধুর জন্য। কাউকে খেতে বললেই কি সঙ্গে একটা ককটেলেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে? এত বিরক্তিকর। দেখবেন আয়োজনটা?

বলে ঝিনুক উঠে লিভিংরুমে চলে যায়। একটু বাদে দু' হাতে গোটা চারেক বড় বোতল নিয়ে আসে। বলে, শুধু এতেই শেষ নয়। আরও ছ'টা বিয়ারের বোতলও আছে। ফ্রিজে সব ঠান্ডা হচ্ছে। কার না মাথা গরম হয় বলুন তো?

বৈশম্পায়ন স্কচ দেখে এবং বিয়ারের কথা শুনে শুকনো জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ঠিকই তো।

ঝিনুক ঝংকার দিয়ে বলে, আর ভাল মানুষ সাজতে হবে না। মদ দেখলেই আজকাল পুরুষগুলো এমন হ্যাংলামি করে। এতে আপনারা কী আনন্দ পান বলুন তো!

আনন্দ! ওঃ, না ঠিক আনন্দ নয় বটে।

ঝিনুক ভীষণ জোর ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটুও আনন্দ নেই। মদ খেয়ে ভুল বকে, আনবিকামিং বিহেভ করে, তারপর বমি আছে, হুল্লোড় আছে। কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো। তবু গুচ্ছের পয়সা খরচ করে সেই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চাই!

সেই জন্যই আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন?

ঝিনুক পুনমকে ডেকে বোতলগুলো আবার ফ্রিজে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, বোতলের গা থেকে মেঝেয় জল পড়েছে, মুছে নিয়ে যা তো!

ঘর মুছে পুনম চলে যাওয়ার পর ঝিনুক বলল, আমার কথার একটুও দাম দেয় না। এম পি বন্ধু এসেছে তো কী হয়েছে? তাই বলে বাড়িটাকে শুঁড়িখানা বানাতে হবে? আর আজকালকার এম পি-রাই বা কীরকম? যখন তখন তারা মদ খাবে কেন?

মদের সপক্ষে কেউ বলার নেই দেখে বৈশম্পায়ন খানিক ভেবে এবং খানিক সাহস সঞ্চয় করে মৃদু করে বলল, ঠিক মদ খাওয়া নয়। স্টিমুল্যান্ট হিসেবে একটু খাওয়া খারাপ নয়। অনেক বড় বড় লিডারও খেতেন।

স্টিমুল্যান্ট!—বলে ঝিনুক ব্যঙ্গের হাসি হাসল। বলল, তা হলে তো বলার কিছুই ছিল না। আমি আপনার বন্ধুকেও চিনি, মদনকেও চিনি। মদ পেলে এমন হামলে পড়বে যে, দেখলে মনে হয় এটা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনও ইমপরট্যান্ট জিনিস নেই। হোটেল থেকে এক কাঁড়ি দামি খাবার নিয়ে আসবে, তার কিছুই শেষ পর্যন্ত খেতে পারবে না। বহুবার এরকম ঘটেছে।

তা হলে তো— বলে বৈশম্পায়ন সংশয় প্রকাশ করে।

সেই জন্যেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মাতালদের আমি দু' চোখে দেখতে পারি না।

সব কথা যে বৈশম্পায়ন শুনতে পাচ্ছে বা বুঝতে পারছে তা নয়। সে চেয়ে আছে, বুঝবার চেষ্টাও করছে, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য থেকে একটা সম্মোহন ওর গায়ের সুগন্ধের মতোই বার বার উড়ে এসে আচ্ছন্ন করছে তাকে। ঝিনুক! কী সুন্দর!

বৈশম্পায়ন সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুজে রেখে বলল, আপনি যদি বেরিয়ে যান তা হলে আমারও খালি বাড়িতে বসে থাকার মানে হয় না।

এই বলে বৈশম্পায়ন উঠতে যাচ্ছিল, ঝিনুক ভারী নরম মায়াবী গলায় বলল, আপনি তো ওদের

মতো একস্ট্রোভারট নন, তবে আপনি খান কেন বলুন তো। যারা সিরিয়াস মানুষ, যাদের মনের গভীরতা আছে তারা কেন এসব বাজে ফুর্তি করবে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন অপরাধী মুখ করে লাজুক গলায় বলে, আমার মদে কোনও নেশা নেই, তবে প্রেজুডিসও নেই।

নেশা মাধবেরও নেই। কিন্তু কোনও অকেশন পেলেই মদের চৌবাচ্চায় লাফিয়ে পড়বে। আজকাল লোকে এত মদ খায় কেন তা আমি একদম বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন সম্মোহনের আর একটা ঘোর কাটাল।ঝিনুক! কী সুন্দর!

মৃত্যুনদীর কলরোল কানে ভেসে আসছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে আয়ু। জীবনে সময় বড় কম। বড় কম। তুমি কি জানো, ঝিনুক, কিশোরী বয়স থেকে আমি তোমার প্রেমিক।

বৈশম্পায়ন যে হাসিটা হাসল তা সম্মোহিতের হাসি। বলল, কেন যে খায় তা আমিও জানি না! মদের দামও আজকাল ভীষণ, তবু তো খাচ্ছে।

ঝিনুক ভ্রু কুঁচকে বলল, মদের দাম কি খুবই বেশি?

খুব বেশি। প্রতি বছর বাজেটে ট্যাকস বসে আর দাম ওঠে।

ওই বোতলগুলোর দাম কত হবে জানেন?

মাথা নেড়ে বৈশম্পায়ন বলে, আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তবে পঞ্চাশ-ষাট টাকা বা তারও বেশি।

চোখ কপালে তুলে ঝিনুক বলে, একেকটা বোতলের অত দাম?

খুব কম করে ধরেও।

ইসস!—বলে ঝিনুক তার চমৎকার হাতখানা ছোট কপালে রেখে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

মদ খুবই একসপেনসিভ নেশা। বৈশম্পায়ন মৃদুস্বরে বলে, আপনি কি জানতেন না?

ঝিনুক ভ্রুকুটি করে বৈশম্পায়নের দিকে চেয়ে বলে, আমার মদের দাম জানার কথা নাকি?

বৈশম্পায়ন ঢোক গিলে বলে, ঠিক তা মিন করিনি। তবে আজকাল সবাই সব খবর রাখে।

ঝিনুক বিরক্ত গলায় বলে, আমি সকলের মতো নই।

বৈশম্পায়নের ভিতর থেকে কে যেন সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে, তা ঠিক। আপনি অন্যরকম।

ঝিনুক আবার ভ্রুকুটি করতে গিয়ে হেসে ফেলে বলে, আমি কীরকম বলুন তো?

বৈশম্পায়নের ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মরে যায়। আর একটা সম্মোহনের ঢেউ এসে আচ্ছন্ন করে তাকে। ঝিনুক! কী সুন্দর! তুমি যেখান দিয়ে হেঁটে যাও সেই পথে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে থাকে। যেদিকে তাকাও, আলো হয়ে যায়। তোমার জন্যই সেতু বন্ধন। তোমার জন্যই ট্রয়ের যুদ্ধ। তোমার জন্যই বেঁচে থাকা মরে যাওয়া। তুমি কীরকম তা কি বলে শেষ করা যায়? কথার অত ক্ষমতা নেই ঝিনুক।

ঝিনুক এই অসহায় লোকটিকে রেহাই দিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমি ভীষণ খারাপ, জানি।

না, না।—বৈশম্পায়ন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

ঝিনুক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার বন্ধুর ফিরতে দেরি হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাবে খাবার আনতে।আপনি কি ততক্ষণ একা বসে থাকতে চান?

না।—বৈশম্পায়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বরং একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন?

বিশেষ কোথাও না।

ঝিনুক মৃদু একটু হাসে। বলে, তা হলে আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায়?

আমার বোন থাকে কাছেই, গোলপার্কের ওদিকটায়। ওর জন্য একটা ঝি ঠিক করেছি, বলে আসি।

বৈশম্পায়ন এত সৌভাগ্যের কল্পনা করেনি। একটু অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থেকে বলল, চলুন।

॥ ১০ ॥

গড়িয়া স্টেশনের খানিকটা আগেই চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরা থেকে একটা লোক লাইনের ধারে লাফিয়ে নামল। কাজটা খুব সহজ নয়। ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরায় নামবার সিঁড়ি নেই, পাটাতনও বেশ উঁচু আর লাইনের ধারে অতি সংকীর্ণ জায়গায় নুড়ি পাথর ছড়ানো, যমদূতের মতো গা-ঘেঁষা লোহার পোস্ট। কিন্তু লোকটা নামল অনায়াসে, যেন প্রতিদিন এইভাবে নামা তার অভ্যাস। কামরার কিছু লোক তাকে বহুক্ষণ লক্ষ করছিল, এখন তারা মুখ বের করে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখছে। কেউ অবশ্য কিছু বলল না। তার চেহারাটাই এমন যে, লোকে কিছু বলতে সাহস পায় না, কাছে এগোতে চায় না।

ট্রেনটা এগিয়ে গিয়ে থামল। কয়েকশো গজ দূরেই স্টেশন। স্পষ্ট বিকেলের আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। বহু লোক। গিজগিজে ভিড়। সে এখন যতদূর সম্ভব ভিড় এড়াতে চায়।

নামবার সময় উপুড় হয়ে মাটিতে হাতের ভর দিয়েছিল সে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ঘষাঘষি করে ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলল।

চারিদিকে শরতের ভারী সুন্দর এক বিকেল। বাঁয়ে গড়িয়ার বাজারে বোধহয় আজ হাট বসেছে। খালে একমাথা ভর ভরন্ত জল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। গাছপালা গভীর সবুজ। মেঠো গন্ধ। অবারিত মুক্ত মাঠঘাটে অগাধ বাতাস। গরম না, ঠান্ডাও না। লোকটা অবশ্য প্রকৃতির এই সাজগোজ লক্ষ করল না। তার সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখ চারিদিকে ঝেঁটিয়ে পরিস্থিতিটা দেখে নিচ্ছিল। যা দেখল তাতে নিশ্চিন্ত হল সে।অবশ্য এই নিশ্চিন্ত অবস্থাটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। বহু চোখ তাকে খুঁজছে। খুঁজে পেলে যে আবার ধরে জেলে পুরবে, তা নাও হতে পারে। বেকায়দা দেখলেই গুলি চালাবে। তার অবস্থাটা খুব সুখের নয়। সুখে সে কোনওকালে ছিলও না। একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোয়নি বড় হওয়ার পর থেকে। কোনও পথেই সাবধান না হয়ে হাঁটেনি কখনও। খুব ঘনিষ্ঠ লোককেও আগাপাশতলা বিশ্বাস করেনি।

ইশারা ছিল অনেক আগে থেকেই। দিন পনেরো আগে একজন পলিটিক্যাল আড়কাঠি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করে যায়। বেশি ধানাই-পানাই করেনি, সোজা বলেছে, আমাদের হয়ে কাজ করবে?

সে বরাবরই এ দলের বা সে দলের হয়ে কাজ করেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব দিতে ভাবতে হয়নি, করব।

ব্যস, কথা ওইটুকুই। কিন্তু তার মধ্যেই ইশারাটা ছিল। পরশু বিকেলে একজন কয়েদির মারাত্মক পেট ব্যথা। তাকে পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার ডাক পড়ল স্ট্রেচার ধরতে। হাসপাতাল পর্যন্ত রুগির সঙ্গে ছিল সে। বেডে তুলে দিল। আর তারপরই দেখল, পালানোর জন্য কসরতের দরকার নেই। শুধু ইচ্ছে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সে পেচ্ছাপখানা হয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কয়েদির পোশাকটাই ছিল সবচেয়ে বেখাপ্পা জিনিস, কিন্তু কলকাতার লোক আজকাল এতরকম বিচিত্র পোশাক পরে যে, লোকে তেমন মাথা ঘামায় না।

লোকটার বুদ্ধি তেমন বেশি নয়, লোকটার মনে খুব একটা জটিলতা নেই, দুনিয়া সম্পর্কে তার

ধারণা খুবই স্পষ্ট এবং মোটা দাগের। তার বেশির ভাগ অনুভূতিই শারীরিক। যেমন যৌনতা এবং ক্ষুধাবোধ। তবে শরীরের ব্যথা-বেদনার বোধ তার খুবই কম। তার মানসিক অনুভূতি এক আঙুলে গোনা যায়। কোনও ফালতু দুঃখ-টুঃখ আর তার নেই। শুধু আছে একটা প্রচণ্ড একরোখা আগুনে রাগ, আছে ভয়ংকর রকমের টাকার লোভ, দুনিয়ায় প্রায় কারও প্রতিই তার কোনও গভীর ভালবাসা নেই, মানুষকে খুন করতে তার দুঃখ হয় না বটে, কিন্তু খুন করার পর সে বহুক্ষণ খুব অস্থির থাকে, তার একটা পশুসুলভ ভয়ও আছে, কিন্তু সেটা খুব কমই সে টের পায়। তবে একটা অনুভূতি তার প্রখর, সে আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

পরশু রাতে কলকাতার ভিড়ে ছাড়া পেয়ে তার প্রথম জেগেছিল এক হিংস্র প্রচণ্ড কাম। সেই তাড়নায় তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। আজকাল দুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাল্টায়, দোস্তরা রং বদলে ফেলে, দল ভেঙে যায়। সে জেলখানায় থাকতে কী কী হয়ে গেছে তা না জানলে সে লাইনটা ধরতে পারবে না। লাইন ধরতে না পারলে বেরিয়েও লাভ নেই। খাবি খেয়ে মরতে হবে। তাই কোনও ঝুঁকি নেওয়া তার উচিত ছিল না। কিন্তু সেই কাম তাকে তাড়া করে আনল কসবা পর্যন্ত। নীতু বরাবর তার বাধ্য ছিল, বাঁধাও ছিল। সে নীলু হাজরার ফুঁকো খুনের মামলায় ঘানি টানতে যাওয়ার পর নীতু বিয়ে করেছে। বেশিদিন নয়, মাত্রই। নীতুকে নিয়ে মাঝে মাঝে থাকবে বলে সে রথতলার দিকে বস্তির যে ঘরটা ভাড়া নিয়ে রেখেছিল সেই ঘরেই সংসার পেতে বসেছে।

সেই সদ্য-পাতা সংসারে সে রাত ন'টায় হানা দিল।

কী রে নীতু! জমিয়ে নিয়েছিস?

যে নীতু তাকে দেখলে গলে পড়ত সে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। অদ্ভুত এক নাকিসুরে বলে উঠল, তুমি পালিয়েছ! অ্যাঁ!

কেন, তাতে তোর অসুবিধে হল?

বিয়ের জল পড়ে নীতুর রুক্ষ চেহারাটা কিছু ফিরেছে। বেড়ার সঙ্গে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ও এইমাত্র ম্যাচিস কিনতে মোড়ে গেল, এক্ষুনি আসবে।

লোকটা কে?

তুমি চিনবে না।

কী করে?

আটা চাকি আছে।

তা তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? কিছু খেতে-মেতে দিবি?

নীতু রুটি সেঁকছিল জনতা স্টোভে। ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। এ কথায় একটু সহজ হয়ে বলল, দিচ্ছি। বোসো। এই পোশাকে এলে, লোকে দেখেনি?

দেখেছে।

পুলিশও দেখেছে তা হলে!

দেখলে দেখেছে। ভয় পাচ্ছিস?

নীতু একটু হাসল। একেবারে মড়ার হাসি। মৃদুস্বরে বলল, পুলিশ এলে তো মুশকিল।

তোর মুশকিল কী? মুশকিল তো আমার!

তোমার কথাই ভাবছি।

তোর লোকটার জামা প্যান্ট আছে কিছু?

নীতু মুখ নিচু করে বলল, আছে, তবে তোমার গায়ে হবে না।

দেখি। বের কর।

নীতু খুব দ্বিধা আর অনিচ্ছের সঙ্গে ঘরের একধারে রাখা একটা সস্তা আলনা থেকে একটা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট নিয়ে আসে। লোকটা দেখে, দিব্যি ফিট করবে তাকে। কোমরটা একটু ঢিলে হতে

পারে, ঝুল একটু-বা বেশি। তা হোক, এই অবস্থায় ওটুকু কিছু না।

জামা প্যান্ট পাশে রেখে লোকটা মাটি ওঠা ঠান্ডা মেঝের ওপর বসে বলল, দে।

নীতু খুব আস্তে ধীরে এবং অনিচ্ছের সঙ্গে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় রুটি আর কুমড়োর তরকারি বেড়ে দিয়ে বলে, ডাল আছে।

কাঁচা লঙ্কা দে, আর পেঁয়াজ থাকে তো পেঁয়াজ। হাতটা কোনওরকমে গ্লাসের জলে একটু ধুয়ে সে দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রথম কয়েক গ্রাস খাওয়ার পরই সচেতন হল। দরজার দিকে মুখ করেই বসেছিল, কিন্তু পাতের দিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি। দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে চেয়ে আছে।

চোখ তুলে সে লঘু স্বরে বলে, এসো নটবর। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

লোকটার চেহারা দেখলেই মালুম হয়, একে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, ঘাড়টা একটু তুলে কামানো, রোগা, তামাটে রং, মুখটা ভালমানুষের মতো। খেটে খাওয়া লোকের মতো মজবুত চেহারা। বয়স চল্লিশের কিছু নীচে হবে। সে চোখ পাকিয়ে তাকালে পেচ্ছাপ করে দেবে। লোকটা তাকে একটুক্ষণ দেখেই বুঝে গেছে। ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে বসল। নীতু টুঁ শব্দটি করল না।

কয়েক চোপাটে রুটি উড়িয়ে ভরপেট জল খেয়ে লোকটা উঠল। এবার আর একটা কাজ। নীতুকে চাই।

চাই বটে কিন্তু সমস্যা এই ফালতু লোকটাকে নিয়ে মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এ লোকটা ভিতু, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি ঘর থেকে একে বের করে দেওয়া যায় তবে বাইরে গিয়ে বস্তি আর পাড়ার লোক জুটিয়ে আনতে পারে। আর ঘরে থাকলে নীতুর অসুবিধে। শত হলেও এর সঙ্গেই তো সে ঘর করছে।

তবে এসব সমস্যা নিয়ে ফালতু মাথা ঘামাতেও সে রাজি নয়। এতকাল সে নীতুকে যেমন ইচ্ছে কাজে লাগিয়েছে। দু'দিন চোখের আড়াল হয়েছিল, সেই ফাঁকে এই ট্রেচারি। সুতরাং নীতুর যদি কিছু অসুবিধে হয় তবে সেটা ওর পাওনা।

লোকটা তার হাফপ্যান্টে হাত মুছে বলল, তারপর কাপ্তান! কী খবর? নীতু তোমার দেখভাল ঠিকমতো করছে তো?

লোকটা হাঁ করে চেয়েছিল। হাতে একটা বিড়ির বান্ডিল আর একটা দেশলাই তখনও ধরা। কথার জবাব দিতে গিয়ে দু'বার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

জেলখানার কামিজটা গা থেকে খুলে ফেলে সেইটে ঘুরিয়েই লোকটা একটু হাওয়া খেয়ে পরিস্থিতিটা ঠিকমতো বুঝে নিল। নীতু তাকে জানে, সুতরাং নীতু ঝামেলা করবে না। কিন্তু এই লোকটা করতে পারে। আর কিছু না হোক, ভয়ে চেঁচাতে পারে। এই ঘরটার সুবিধে যে, এটা কোনার ঘর। উত্তর দিকে আর ঘর নেই, উঠোন। কিন্তু দক্ষিণের ঘরে লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বস্তি জুড়েই নানারকম কথাবার্তা, চেঁচানি, চ্যাঁ ভ্যাঁ, চেঁচানোমাত্রই লোক জুটে যাবে।

লোকটা খুব ঠান্ডা গলায় নীতুর মানুষকে বলল, তুমি যাকে নিয়ে ঘর করছ সে আমার রাখা মেয়েমানুষ, তা জানো কাপ্তান?

লোকটা আবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, একটু-আধটু শুনেছিলাম।

নীতু আসলে আমার মেয়েমানুষ। তুমি ফালতু লোক। তাই না?

লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়ে ভয় খাওয়া গলায় বলে, আমি ঝামেলায় যেতে চাইনি। কিন্তু নীতু বলল—লোকটা থেমে যায়।

কী বলল?—সে ধমক দেয়।

বলল আপনার অনেকদিনের মেয়াদ। ওকেও দেখাশোনার কেউ নেই। তাই—

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই কাপ্তান। আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নীতুকে আমি ফেরত চাই। তুমি কী করবে?

আমি!—বলে লোকটা অগাধ জলে পড়ে চারদিকে তাকাল।

এতক্ষণ নীতু কথা বলেনি। কিন্তু এইবার আটা মাখা হাত শব্দ করে ঝেড়ে বলল, নবদা, আমি ওকে বিয়ে করেছি। তুমি এখন ওসব কথা বোলো না।

তোরও বিয়ে হয় নীতু? ঘাঁটাপড়া মেয়েমানুষের বিয়ে? ওপরের ওই বাঁশ দেখছিস? ওর সঙ্গে তোর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব। বলে সে নীতুর দিকে চেয়ে থাকে।

নীতু চোখ নামায় বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার ফোঁপানির শব্দ পাওয়া যায়।

নব নীতুর মানুষটার দিকে চেয়ে বলে, কী করবে কাপ্তান? যাবে? না থাকবে?

লোকটা নীতুর দিকে চেয়ে শুকনো মুখে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, নীতু ছাড়া কি আপনার চলবে না? আমরা অনেক ভেবেচিন্তে গুছিয়ে সংসার পেতেছিলাম।

ওসব বাত ছাড়ো। আজ রাতের মতো নীতুকে আমার চাই। তুমি বসে বসে দেখবে? না যাবে?

লোকটা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল। প্রাণের ভয় বড় ভয়। তবে তলানি সাহসটুকু উপুড় করে ঢেলে সে বলল, নীতুকে আমার খুব পছন্দ ছিল। ওকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে দাদা। বলতে বলতে তার চোখে টলটল করে জল ভরে এল।

নীতু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, তোমারও তো বউ আছে নবদা? গৌরীদিকে জিজ্ঞেস কোরো তো, পারে কিনা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে—

এ কথায় নব আর একটু গরম হল। চাপা হিংস্র গলায় বলল, মুখ ভেঙে দেব বেশি কথা বললে।

লোকটার সাহসের তলানি আরও কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট আছে দেখা গেল। সে বিড়ি আর দেশলাই বারবার এ হাত ও হাত করতে করতে বলল, নীতুকে কি আপনি বরাবরের জন্য চান দাদা? না কি আজ রাতটা হলেই চলে?

লোকটা ব্যবসা জানে। নব কামিজটা দূরের আলনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, অত সব ভেবে দেখিনি। এখন চাই, এটুকু বলতে পারি। লোকটা শুকনো মুখে বলল, আমাদের একটা সিস্টেম না কী যেন বলে তাই তৈরি হয়ে গেছে তো! তাই বলছিলাম—

কী বলছিলে কাপ্তান?

বলছিলাম নীতুকে ছাড়া যদি আপনার না চলে তা হলে আজ রাতের মতো আমি বরং আমার এক পিসি আছে বাঘাযতীনে, তার কাছে গিয়ে থেকে আসি। কাল পরশু আমরা অন্য জায়গায় উঠে যাব।

এই সময় নীতু হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, না, তুমি যাবে না! কিছুতেই যাবে না! বলে উঠতে যাচ্ছিল নীতু।

নব তখন মারল। বেশি জোরে নয়, ডান পা সামান্য তুলে মাজার একটু ওপরে। নীতু আবার বসে পড়ল। কিন্তু চেঁচাল না। প্রাণের ভয়।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে বলল, মারবেন না। আমি যাচ্ছি নীতু। কাল বেলাবেলি চলে আসব। ভেবো না।

নীতু বিহ্বল মুখে বসে শূন্য চোখে চেয়ে ছিল। লোকটার কথায় একটু নড়ল। তারপর ধীরে আটা মাখার কানা উঁচু কলাই করা বাটিটা সরিয়ে রাখল।

নব লোকটার দিকে চেয়ে বলে, বাইরে গিয়ে কোনওরকম গোলমাল করবে না তো?

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। আমি তেমন মানুষ নই। আর নীতু তো আপনার হাতেই রইল।

লোকটা নিঃশব্দে চলে গেলে নব গিয়ে দরজা দিল। তারপর এক ঝটকায় নীতুকে তুলে আনল বিছানায়।

তবে এরকম কাঠের মতো শক্ত, বিস্বাদ মেয়েমানুষ সে জীবনে ভোগ করেনি।

রাতে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও দু'বার নীতুর গায়ে হাত তুলতে হয়েছিল নবকে। তবে খবর বিশেষ কিছু পেল না। হয় নীতু খবর চেপে যাচ্ছিল, নয়তো জানেই না।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ লোকটা আবার এল। মুখ শুকনো, চোখ লাল, বারবার ঢোক গিলছে। নীতু নবর জন্য স্টোব জ্বেলে দ্বিতীয় দফা চা করছিল। শক্ত মুখে একবার তাকাল লোকটার দিকে। কিছু বলল না। লোকটাও না।

শুধু নব খুব আদর দেখিয়ে বলল, কী খবর কাপ্তান? সারা রাত নীতুর কথা ভেবে মেয়েমানুষের মতো কান্নাকাটি করেছ নাকি? তুমি সতী বটে হে?

লোকটা তার দিকে চাইল না। মাথা নিচু করে উবু হয়ে ঘরের মাঝখানটায় বসে রইল।

লোকটার ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাল নব, লোকটার তোলা জলে স্নান করল, লোকটার পয়সায় কেনা চালের ভাত খেল, তারপর লোকটার জামা আর প্যান্ট পরে এবং লোকটার কাছ থেকেই গোটা ত্রিশেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নীতুটা অন্যের হয়ে গেছে। ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না ভেবে একটু গা জ্বালা করল তার। কিন্তু এসব গায়ে মাখার মতো সময় নেই। নীতু আর কাপ্তান আজই এ জায়গার পাট ওঠাবে ভেবে রওনা দেবার আগে বলে গেল, ঘরটা আমার নামে নেওয়া আছে হে কাপ্তান, বাড়িওলাকে আবার ছেড়ে দিয়ে যেয়ো না। একটা তালা লাগিয়ে মোড়ে মান্তুর দোকানে আমার নাম করে চাবিটা রেখে যেয়ো।

পালালেই যে মুক্তি পাওয়া যাবে না তা জানে নব। কিছুদিন আগে যে পলিটিক্সওয়ালা দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে পরশু দিনের ঘটনাটা দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। সকলের নাকের ডগার উপর দিয়ে সে খুনের আসামি নইলে বেরিয়ে এল কী করে? পিছনে একটা মতলব কাজ করছে। সেই মতলবটা বুঝতে লাইন ধরতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একবার বেরিয়ে আসতে দিয়েছে বলেই যে পুলিশ জামাই-আদর করবে তা নয়। বিস্তর পুলিশ মতলবটার খবর জানে না।

দিনের বেলা লোকালয়ে তাই একটু গা ছমছম করছিল নবর। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে সেই পলিটিক্সওয়ালার সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে। কিন্তু লাইনটা জানে না নব। লাইনটা জানতে সে দু'-চার জায়গায় ঢুঁ দিল। খুব সুবিধে হল না। তবে বিকেলের দিকে বালিগঞ্জে এক পাঞ্জাবির দোকানে রুটি তড়কা খেতে খেতে ক্ষীণভাবে মনে পড়ল, ওই পলিটিক্সওয়ালা যে পার্টির লোক সেই পার্টির একটা ছোকরাকে সে চেনে। নাম জয়দ্রথ। তার দাদা এক ব্যাঙ্কের অফিসার, তারও একটা শক্ত যেন কী নাম! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই একই গ্রুপের লোক মদনদাও। আর কে না জানে মদন ফোর টুয়েন্টি তাকে পুরো ফল্স কেসে ঘানি গাছে জুড়ে দিয়েছিল!

লাইন থেকে নেমে ডান হাতে পিচ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নবর গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে।

জয়ের বাড়িটা খুঁজে বের করতে খুব সময় লাগল না নবর। জয় বাড়িতে নেই, তার মা বলল।

কখন আসবে জানেন?

কী জানি বাবা। এম পি মদন কলকাতায় এসেছে, তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন।

মদন এসেছে! নবর গায়ের রোঁয়া আর একবার দাঁড়াল। গা-জ্বালা করল তার।

দুনিয়ার রং এ বেলা ও বেলা পালটে যায়। যারা তার পালানোর পথ করে দিয়েছে তাদের রং পালটাবে। কিন্তু একসময়ে যার হয়ে সে খুনখারাপি মারদাঙ্গা করেছে, বিস্তর ঝামেলা থেকে তাকে নিজের জান দিয়ে বাঁচিয়েছে তার বেইমানির শোধ নেওয়ার মওকা আর পাবে না।

নব বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা তেমাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রথম থেকেই মিটিং-এ বেড়াল কুকুরের ডাক আর টেবিল চাপড়ানি চলছিল। কর্মী বৈঠকে এরকম মাঝে মাঝে হয়ও। কিন্তু আজকের মিটিংয়ের টেম্পো প্রথম থেকেই অ্যায়সা চড়েছিল যে, কারও কোনও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। দলের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার থেকে শুরু করে জনা দশ-বারো নেতা পার্টি অফিসের বড় ঘরের মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে শতরঞ্চিতে অসহায়ভাবে বসা। তার মধ্যে মদনদাও। সবাই কথা বলার চেষ্টা করে হেদিয়ে পড়েছে! সেক্রেটারি বার তিন চার চেষ্টা করেছিলেন, একবার একটা গোল করে পাকানো সিগারেটের প্যাকেট এসে তাঁর কপালে লাগল, সেই সঙ্গে চিৎকার, বসে পড়ো চাঁদু। সেক্রেটারি সেই যে বসে পড়েছেন আর ওঠেননি। ট্রেজারার একবার বাথরুমে যেতে চেয়েছিলেন, তিন-চারটে ষণ্ডা ছোকরা কাঁধ চেপে বসিয়ে দিল ওসব হবে না। গুরুপবাজির হিল্লে করে নাও আগে, তারপর হিসি টিসি।

জয় খুব ভিতরে সেঁধোতে পারেনি, দরজা দিয়ে ঢুকে প্রচণ্ড ভিড়ে দেয়ালে সেঁটে গেছে। পাশে হরি গোঁসাই, জয় ফিসফিস করে একবার বলল, বড় বড় নেতারা এভাবে হেকেল হচ্ছে, এ খুব অন্যায়।

হরি খিক করে হেসে বলে, চেপে যা। হচ্ছে হোক। একটু হওয়া দরকার।

মদনটা কোনও ইনিসিয়েটিভ নিচ্ছে না, দেখেছ?

চালাক লোক। পাবলিকের চোখে ইমেজ রাখছে।

কিন্তু মদনদা দাঁড়ালে সব সমাধান হয়ে যাবে।

হলে এতক্ষণে মদনদা দাঁড়াত রে। তা নয়। কালকের ক্লোজডোর মিটিং-এ বসে নেতারা এককাট্টা হতে পারেনি।

বিমর্ষ মুখে জয় বলল, আজকাল নেতারা একদম এককাট্টা হতে পারছে না হরিদা। কী হবে বলো তো?

দল ভাঙবে। আবার কী? বাঁ কোণে নিত্য ঘোষ বসে আছে কেমন বেড়ালের মতো মুখ করে দেখছিস?

জয় একটা শ্বাস ফেলে বলল, দেখেছি। কিন্তু নিত্যদা আলাদা দল করতে চাইলেই কি হবে? নিত্যদার যে সেই ইয়েটা, কী যেন বলে, সেইটে নেই।

কিয়েটা?

ওই যে!—জয় সহজ ইংরিজি শব্দটা হাতড়াতে হাতড়াতে বলে, ওই যে ইনফ্লুয়েন্স না কী যেন!

তোর মাথা। এই মিটিং-এ বারো আনাই নিত্য ঘোষের লোক!

সে বুঝেছি। কিন্তু কী করে হয় বলো তো হরিদা। নিত্যদা তিনবার অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে হেরে গেছে। ওকে কে পোঁছে?

সবাই কি ভোটে জেতে? জিতলেই যে তাকে সবাই পোঁছে এমনও নয়।

আমি বলছি হরিদা, একবার মদনদা যদি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে তা হলে—

কী বোঝাবে?

এটা যে নিত্য ঘোষের চক্রান্ত সেই কথাটা।

বিপদ আছে রে।

কী বিপদ?

তখন নিত্য ঘোষও উঠে দাঁড়িয়ে মদনদার আর-একটা চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। ওরা কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চাইছে না এখন। দল ভাগ হলে তখন কোমর বেঁধে লড়বে। এখন ক্যাডার কালেকশন।

মদনদার চক্রান্তের কথা নিত্য ঘোষ কী বলবে? মদনদার আবার চক্রান্ত কী? তুমি যে কী বলো হরিদা।

হরি গোঁসাই কী একটু বলার জন্য চুলবুল করেও সামলে গেল, বলার তো ট্যাকসো লাগে না। পাবলিকের সামনে একটা কিছু টক ঝাল বললেই পাবলিক খেয়ে নেয়। আর পলিটিক্সওয়ালাদের ক'টা কথা সত্যি? চক্রান্ত না থাকে তো বানিয়ে একটা বলে দেবে।

লোকে বিশ্বাস করবে না।

চেঁচামেচি বাড়ছিল। আগের দিকে খুব একটা ঠেলাঠেলি চলেছে। একটা ছোকরা কী একটা বলছিল চেঁচিয়ে, তিন-চারজন তাকে ধরে খুব ঝাঁকাচ্ছে। ধাক্কা মেরে মেরে ভিড় ঠেলে বের করে আনছে। হরি গোঁসাই আর জয় দু'জনেই ছোকরাকে চিনল। মদনদার বডিগার্ড শ্রীমন্ত।

জয় উত্তেজিত হয়ে বলে, স্টেট আর সেন্ট্রাল লিডারদের সামনে কী হচ্ছে দেখো হরিদা!

কিছু করার নেই। দেখে যা।—বলে হরি গোঁসাই জয়ের হাতে একটু চাপ দেয়।

এরপর কি পার্টি মিটিং-এও পুলিশ ডাকতে হবে নাকি? প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকল না।

গলা উঁচুতে তুলিস না। লোকে তাকাচ্ছে।—চাপা গলায় হরি গোঁসাই বলে।

মদনদা তবু কিছু করছে না, দেখেছ?

কী করবে? এতগুলো অ্যান্টি লোক।

সবাই অ্যান্টি? পার্টি ভাগ হলে মদনদা কোনদিকে থাকবে তা জানো?

হরি গোঁসাই ঠোঁট উলটে বলে, কে জানবে? নিত্য ঘোষ ডিসিডেন্ট, একটু জানি। দিল্লির একটা ফ্যাকশন নিত্য ঘোষকে অ্যাপ্রুভ্যালও দিয়েছে। যে গ্রুপ স্ট্রং হবে মদনদা সেই দিকেই থাকবে মনে হয়।

জয় কথাটা শুনে খুশি হল না। একটু টেরিয়া হয়ে বলল, মদনদা কি সেই ধাঁচের লোক? যেদিকে আগুন দেখবে সেদিকেই হাত সেঁকবে?

দূর বোকা! উলটো বুঝেছিস। বলতে চেয়েছিলাম, মদনদা যেদিকে জয়েন করবে সেদিকটাই আলটিমেটলি স্ট্রং হবে। চল, বাইরে গিয়ে শ্রীমন্তকে ধরি। ব্যাপারটা একটু বোঝা যাবে।

জয়ের ইচ্ছে ছিল না। সে এই মিটিং-এর শেষটা দেখতে চায়। কিন্তু সামনের দিকে হুড়োহুড়ি বাড়ছে। ঠেলাঠেলি চলছে ভীষণ। দেখা যাচ্ছে না ভাল, তবে বোঝা যাচ্ছে সামনে আর-একটা মারপিট লেগেছে। মদনদার কিছু হবে না তো?

হরি গোঁসাইয়ের পিছু পিছু জয় বেরিয়ে আসে।

পার্টি অফিসের সামনে বারান্দা। বারান্দার নীচে একটু বাঁধানো জায়গা। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বিস্তর চেনা অচেনা আধচেনা পার্টি ওয়ার্কার দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীমন্ত ভিড় ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই একটা জিপ। একটা লোক জিপের সামনের সিটের ওপর একটা খোলা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে তুলোয় কী একটা ওষুধ তুলে শ্রীমন্তর কবজিতে লাগাচ্ছে।

শ্রীমন্ত! কী ব্যাপার?—হরি গোঁসাই খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্ত একবার বাঘা-চোখে তাকায়। বাবারে, কী চোখ! লাল, জ্বলজ্বলে আগুনে। শ্রীমন্ত বিগড়োলে খুব গড়বড়, সবাই জানে। হরি গোঁসাই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

জিপের লোকটা শ্রীমন্তর হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, একটা সিকুইল খেয়ে নিস। এখন বাড়ি গিয়ে বসে থাক। সন্ধের পর যাব।

জিপের লোকটাকে জয় আবছা চেনে। কালো, পেটানো চেহারা, মাথায় টাক, বছর চল্লিশেক বয়স। পরনে খুব ঝা চকচকে প্যান্ট আর দামি হাওয়াই শার্ট। শ্রীমন্তর হাতে ব্যান্ডেজ করে দেওয়ার পর সে একবার খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চাউনিতে জয় আর হরি গোঁসাইকেও দেখল।

শ্রীমন্ত রাগে ফুঁসছে। গলার শিরা ফুলে আছে, চোখে সেই খ্যাপা দৃষ্টি। বলল, মা কালীর দিব্যি বলছি নদুয়াদা, হেলোর লাশ আমি নামাব। না হলে নাম পালটে রেখো।

নদুয়া নামের লোকটা সাপের মতো একটা হিস্‌স্ শব্দ করে গালের পানটা একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, রি-অরগানাইজেশন হচ্ছে। তখন দেখা যাবে। এখন বাড়ি যা।

শ্রীমন্ত একবার পার্টি অফিসের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে।

পিছনে সঙ্গ ধরে হরি গোঁসাই। জয় এগোয় না। কয়েক পা সরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। নদুয়াকে সে চেনে। এর গোডাউন থেকে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় মদনদা গম বের করেছিল। গমের মাপ নিয়ে খুব লেগেছিল মদনদার সঙ্গে। নদুয়া বলেছিল, রিলিফের জিনিস আর মাপব কী, ওরকম নিয়ম নেই। যে মাপ বলে দেব সেইটেই ঠিক মাপ। কিন্তু মদনদা ছাড়েনি। বলেছে সরকার যখন দাম দেবে তখন গুনে নেবেন না? তখন চোখ বুজে থাকবেন? শেষ পর্যন্ত দলের ছেলেরা গুদাম ঘেরাও করার ভয় দেখানোয় সব মাল মাপা হয়েছিল। বিস্তর কম ছিল ওজনে। এ সেই লোক। সম্পূর্ণ করাপটেড। তবে পলিটিক্যাল লাইন আছে, টাকা আছে, জিপ গাড়ি আছে, গুন্ডা আছে। শিয়ালদার যে করাপটেড লোকটা যাত্রীদের কাছ থেকে ভড়কি দিয়ে টিকিট নিচ্ছিল তাকে ধমকানো যত সোজা একে ধমকানো তত সোজা নয়। লোকটা বুকে হাত রেখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ রাখছে। জিপে ড্রাইভার বসা। প্রস্তুত। মনে হচ্ছে কাউকে তুলে নিয়েই হাওয়া হবে। কাকে তা অবশ্য জয় জানে না।

এত গোলমালে জয়ের মাথা ধরে গেছে; মনটা বড় ভার। মাত্রই সে বিভিন্ন জায়গায় পার্টির বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেতে শুরু করেছে। হিঙ্গলগঞ্জে দলের সংগঠনে তাকে পাঠানোর কথা হচ্ছিল। দু'-চার বছর পরেই সে অ্যাসেমব্লির টিকিট পেয়ে যেত। মদনদার মতো করেই নিজেকে তৈরি করছিল সে। আয়না দেখে দেখে বক্তৃতা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে নানারকম এক্সপ্রেশন দেওয়া প্র্যাকটিস করছিল। গলার ওঠা-নামা, হাততালির জন্য ঠিক জায়গায় জুতসই আবেগকম্পিত ভাবালু কথা লাগিয়ে তুঙ্গে উঠে যাওয়া, এ সবই অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল তার। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ক'বার পিঠ চাপড়ে বলেছেন, তুমি বেশ তৈরি হচ্ছ। কিন্তু হঠাৎ এ হল কী? পার্টি যে ভাঙবে তা সে নিজে দু' মাস আগেও কেন জানতে পারেনি?

হরি গোঁসাই ফিরে এসে বলল, চল।

শ্রীমন্তদার সঙ্গে কথা হল?

হল। চল, বলছি।

একটু এগিয়ে গিয়ে হরি গোঁসাই বলে, শ্রীমন্ত মদনদার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

কেন?

তা বলল না। শুধু বলল, অনেক ব্যাপার আছে।

কবে ছাড়ল? কালও তো আঠা হয়ে লেগে ছিল সঙ্গে।

কবে ছাড়ল জেনে কী হবে? আজকাল হকে নকে এ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জয় গম্ভীর মুখে একটু ভাবল। তারপর বলল, শ্রীমন্তদা ছাড়বে জানতাম।

কী করে জানলি?

হাবভাব দেখে। ক'দিন আগে আমাকে একবার কথায় কথায় বলেছিল, মদনদার বেস ওয়ার্ক ভাল হচ্ছে না। স্টেট লিডাররা নাকি মদনদার ওপর খুশি নয়। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, শ্রীমন্তদা গোপনে অন্যদিকে তাল দিচ্ছে। শ্রীমন্তকে যারা ম্যানহ্যান্ডেল করল তারা কারা জানো? মদনদার লোক নয় কিন্তু।

না, মদনদার লোক হবে কেন? হেলোর নাম শুনলি না? হেলো হচ্ছে নিত্য ঘোষের—

জানি জানি।—ধৈর্য হারিয়ে জয় বলে, কিন্তু তাই বা হয় কী করে? শ্রীমন্তদা মদনদাকে ছেড়ে

দিলে আর একটা গ্রুপে তো তাকে ভিড়তে হবে। সেই গ্রুপটা তো নিত্যদার। তা হলে নিত্যদার লোক ওকে মিটিং থেকে বের করে দেবে কেন?

বুঝতে পারছি না। এখন বাড়ি চল।

গিয়ে?

গিয়ে আবার কী? এখন কেটে পড়াই ভাল।

মদনদা একা রইল যে! যদি কিছু হয়?

কিছু হবে না।

আমাদের দেখা উচিত।

দেখে লাভ নেই। মদনদাকে দেখার লোক আছে। চলো।

হরি গোঁসাইয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জয় বলে, আমার মনে হয় কী জানো? দলে ভাল লোক কেউ থাকবে না।

হরি গোঁসাই চিন্তিত মুখে বলে, তাই তো দেখছি। মদনদা যদি পাওয়ারে না থাকে তবে বিশুটাকে মেডিক্যালে দেওয়া হয়ে গেল। ওদিকে এই সময়ে নবটাও জেল থেকে বেরিয়েছে। কী যে হবে!

সারা পথ জয় সেই অতীতের সুদিনের কথা ভাবতে ভাবতে এল। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। তার মধ্যে রড ধরে তেড়াবেঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, সেই কবে পালবাজার অবধি একটা সাইকেলে ডবলক্যারি করেছিল তাকে মদনদা। একটা মিটিং সেরে ফিরছিল তারা। রডে বসে মদনদার শ্বাস নিজের ঘাড়ে টের পেতে পেতে, আর এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে বারবার মনে হয়েছিল, মদনদা একদিন খুব ওপরে উঠবে! সেজদিকে খুব পছন্দ ছিল মদনদার। সেজদিরও মদনদাকে। বাড়িতে এলেই সেজদির সঙ্গে ছাদে গিয়ে পুটর পুটর কথা বলত। জয় টের পেয়ে আনন্দে কণ্টকিত হয়েছে কতবার। মদনদা যদি সেজদিকে বিয়ে করে তো কী দারুণ হয়! হয়নি কেন তা জানে না জয়। একদিন এক পলিটেকনিক পাশ সরকারি চাকরের সঙ্গে সেজদির বিয়ে হয়ে গেল! মদনদা তার বছর চারেক বাদে এম পি হয়।

বাস থেকে নেমে জয় আনমনে মোড়টা পেরিয়ে গলিতে ঢুকল। এ পাড়া দারুণ নির্জন। একধারে জলা, পুকুর জঙ্গল অন্য ধারে কিছু ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। তবে এরকম থাকবে না। নতুন প্ল্যানিং-এ চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তা হবে। জমজম করবে জায়গাটা।

ঝুপসি একটা গাছতলা থেকে সরু একটা শিস শোনা গেল। তারপর চাপা গলায় কে ডাকল, জয়দ্রথ!

কে?

এদিকে শোন। ভয় নেই।

কে বলো তো?—জয় এগোতে সাহস পেল না। তবে দাঁড়াল।

আমি!—বলে ছায়া থেকে রাস্তায় একটা লোক এগিয়ে আসে।

শরতের রোদ অল্প বেলাতেই মরে গেছে। চারদিকটা ঘোর ঘোর। বেশ ঠাহর করে চিনতে হয়। তবু এক নজরেই চিনল জয়!

নব?

কসবায় পিলু নামে একটি নকশাল ছেলেকে খুন করেছিল নব! পিলুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ইয়ারকি ঠাট্টা করতে করতে, ঠোঁটে সেই সিগারেট নিয়েই আচমকা কোমর থেকে দোধার ছোরা টেনে এনে খুব স্নেহের সঙ্গে তলপেটটা ফাঁক করে দিল সাঁঝবেলায়। পিলু যখন মাটিতে পড়ে বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠল তখন শান্তভাবে তার হাঁ মুখে হকিবুটসুদ্ধ পা চেপে ধরে সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিল নব। তারপর খুব হিসেব-নিকেশ করে আর-একবার ছোরা চালিয়ে পাঁজরার ফাঁক দিয়ে

হৃৎপিণ্ডটা ফুঁড়ে দিল। তখনও সিগারেটটা জ্বলছে ঠোঁটে। পিলুরই দেওয়া সিগারেট। পিলু নিথর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সিগারেটটা জ্বলছে নবর ঠোঁটে। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছিল হাসিম, তার কাছ থেকে জয়ের শোনা। নবর ওই 'ভয় নেই' কথাটাকে জয় তাই বিশ্বাস করে না।

এখনও নবর ঠোঁটে একটা সিগারেট জ্বলছে। সেটা নামিয়ে নব আর এক হাতে জয়ের একখানা হাত ধরে বলল, আড়ালে আয়। কথা আছে।

জয় জানে ভয় পেয়ে লাভ নেই, সাহস দেখিয়েও লাভ নেই। নব যা ভেবে এসেছে তাই করবে। এক ধরনের খারাপ রক্ত নিয়ে নবর মতো লোক দুনিয়ায় জন্মায়। যেখানে থাকে সেই জায়গা জ্বালিয়ে দেয়, যাদের সঙ্গে কাজ-কারবার করে তাদের সুখ শান্তি বলে কিছু থাকে না।

গাছতলার ছায়ায় জয়কে টেনে এনে নব বলে, বোস। ঘাস একটু ভেজা আছে।

জয় চারদিকে চেয়ে বলে, এ জায়গায় পরশু দিনও কেউটে সাপ বেরিয়েছে। এই গাছটার ফাঁপা শেকড়ের মধ্যে আস্তানা।

নব কথাটা কানে না তুলে বলে, শোন, ক'দিন আগে একজন লোক জেলখানায় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিল! নাম বলেছিল গোপাল বিশ্বাস। চিনিস?

চিনি।

কোথায় থাকে?

ঠিকানা জানি না। পার্টি অফিসে আসে।

ঠিকানা জোগাড় করে আজই তার সঙ্গে লাইন করতে হবে। চল।

বলে নব আবার জয়ের হাতটা ধরে।

জয় দোনোমোনো করে বলে, এখনই?

এখনই।—বলে নব একটু হাসে।

জয় বলল, চলো।

॥ ১২ ॥

মদন আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছিল। ব্যাপারটা এমন মজার!

রাজ্য শাখার সেক্রেটারি মানুষটা ভাল। দলের কাজে মেতে থাকায় বিয়েটা পর্যন্ত করেননি। বিমর্ষ মুখে হলঘরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে ছিলেন। মদনের দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললেন, হাসছ? হাসো, খুব হাসো। আজ হাসারই দিন। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মারধোর খেয়ে জেল খেটে চল্লিশ বছর ধরে যে স্যাক্রিফাইস করলাম তা কার জন্য? ভেবে আমারও হাসিই আসার কথা, কিন্তু আসছে না কেন বলো তো?

আপনার বয়স কত বলুন তো সুহৃদদা? ষাট-বাষট্টি হবে?

পঁয়ষট্টি চলছে। কেন বলো তো?

তা হলে এখনও বিয়ের বয়স আছে। এবার একটা বিয়ে করুন।

ইয়ারকি করছ? এটা কি ইয়ারকির সময়?—ভারী হতাশা মাখানো মুখে সুহৃদ চৌধুরী বললেন।

বিয়ে না করলে কে আপনাকে দেখবে?

যম দেখবে হে। আর কে দেখবে? এইসব ছেলে-ছোকরারা রাজনীতিতে ঢোকার পর থেকে যে ভূতের নৃত্য শুরু হয়েছে তা আর চোখে দেখা যায় না। শিশুপাল, সব শিশুপাল।

মদন হাসতেই থাকে, ফিক ফিক। সেক্রেটারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তাই ভাবছিলাম কার জন্য এই স্যাক্রিফাইস! বিয়াল্লিশে পুলিশ এমন মেরেছিল গোড়ালিতে, আজও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে

হয়। জেলে থেকেই গ্যাসট্রিক। বনগ্রামের যে বাড়িটা পার্টির নামে লিখে দিয়েছিলাম বিশ বছর আগে, বাজার যাচাই করে দেখেছি সেটার দাম এখন লাখখানেক টাকা।

মদন হাসছিল ফিক ফিক।

হলঘরে তুমুল কাণ্ড হয়েই যাচ্ছে। এক ছোকরা আর একটা ষণ্ডামার্কার কাঁধে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার বাঁধানো ছবি নামিয়ে ঝপাৎ করে আছাড় মারল। কয়েকবারই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো এসে নেতাদের শতরঞ্চিতে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট তাঁর চটি দিয়ে সেগুলো নিভিয়েছেন। এবারও আর একটা জ্বলন্ত সিগারেট উড়ে এসে ট্রেজারারের কোঁচায় পড়ল। উনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কোঁচাটা টেনে নিলেন, প্রেসিডেন্ট হাতে চটি নিয়েই বসে আছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সিগারেটটার মুখ ভোঁতা করে দিলেন এক বাড়ি মেরে। ট্রেজারার বললেন, শতরঞ্চিটা বাহাত্তর টাকায় কেনা সেই বিশ বছর আগে। আর কি এ দামে পাওয়া যাবে প্রকাশদা?

প্রেসিডেন্ট প্রকাশ চাটুজ্জে গম্ভীরমুখে বললেন, সবই গেল, আর শতরঞ্চি! তোমার যে বাথরুম পেয়েছিল তার কী করলে?

ট্রেজারার ব্যথিত মুখে বললেন, কী করব? চেপে বসে আছি। পুরনো ডায়াবেটিসের রুগি, বেশিক্ষণ চেপে রাখাও যাবে না। এক সময়ে হয়ে যাবে আপনা থেকেই। শতরঞ্চিটা—

মদন মৃদু স্বরে বলে, ভেসে যাক, ভেসে যাক, বেগটা ছেড়ে দিন।

ট্রেজারার বেদনায় নীল হয়ে বলেন, কী যে বলো ঠিক নেই। এই শতরঞ্চিতে কত বড় বড় নেতা বসে গেছেন জানো? তার ওপর এটা ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট, আধ ইঞ্চি পুরু। একবার ধোয়া হয়েছিল, চড়া রোদেই শুকোতে লেগেছিল পনেরো-ষোলো দিন।

দু' গোছা রজনীগন্ধা রাখা ছিল মাঝখানে। দুটো ছেলে এসে পটাপট তুলে নিয়ে গেল। দেখা গেল অদূরেই তিন-চারজন রজনীগন্ধার ডাঁটি বাগিয়ে ধরে তলোয়ার খেলছে।

কী হচ্ছে বলুন তো মদনদা!—একজন মফস্‌সলের এম এল এ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

বলতে না বলতেই ফুলশূন্য দুটো ডাঁটি তীরবেগে উড়ে এসে পড়ল নেতাদের মাঝখানে। প্রবীণ সদস্য যদুবাবু হাত দিয়ে মুখ আড়াল না করলে তাঁর চশমায় লাগত।

জমেছে। মদন আপন মনে বলে উঠল।

নেতাদের মধ্যে একমাত্র নিত্য ঘোষই একটু আলাদা হয়ে বসে আছে। কথা বলছে না। একটার পর একটা পান মুখে দিচ্ছে। পিকদানির অভাবে একটা অ্যাশট্রেতে পিক ফেলছিল এতক্ষণ। সেই অ্যাশট্রেটাও ভরে এল প্রায়।

মদন শূন্য ফুলদানি দুটোর একটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নিত্যদা, এটাতে ফেলুন।

ট্রেজারার দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, ওটা খাঁটি জয়পুরি জিনিস। বিশেষ অকেশনে বের করা হয়।

মদন ঠান্ডা গলায় বলে, কতক্ষণ থাকতে হবে তার ঠিক নেই। দেরি হলে নিত্যদার পানের পিক আপনার শতরঞ্চি ভাসাবে যে!

ট্রেজারার উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, কতক্ষণ থাকতে হবে মানে? মিটিং শেষ করে দিলেই চলে যাব।

মিটিং অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বেরোতে পারছি না।

ওরা কি আমাদের আটকে রেখেছে?

আটকেই রেখেছে।

ঘেরাও নাকি?

অনেকটা তাই।

ট্রেজারার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, ঘেরাও করে লাভ কী? আমরা সাতদিন বসে ডিসিশনে আসতে পারব না।

এই সময়ে সারা ঘরের হুলস্থুল হঠাৎ একটু মিইয়ে গেল। কয়েকটা ছেলে বেশ সুসংগঠিতভাবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে কয়েকটা কাগজ, মুখ চোখ সিরিয়াস!

সবার আগে যে ছেলেটি, তার চেহারা খুবই চোখা চালাক, সপ্রতিভ। সে কাছে এসে নেতাদের দিকে চেয়ে নরম গলায় বলে, আপনারা যাঁরা আমাদের পক্ষে নন তাঁরা দয়া করে দল থেকে পদত্যাগ করুন। যাঁরা পদত্যাগ করবেন তাঁদের আমরা আটকাতে চাই না। যাঁরা দলে থেকেও আলাদা ফ্যাকশন করতে চান আমরা তাঁদের কনফ্রন্ট করব। আমাদের কাছে টাইপ করা পদত্যাগপত্র আছে। কার চাই বলুন!

কেউ কিছু বলতে চায় না। ভাবছে। দিল্লিতে দলে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সুতরাং এখানেও ভাঙবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ডামাডোলে কেউ আগে নিজের রং চেনাতে চায় না। অবশ্য নিজের রং যে কী তাও অনেকে বুঝতে পারছে না!

মদন হাত বাড়িয়ে বলল, আমাকে দাও একখানা।

আপনি পদত্যাগ করবেন মদনদা?—ছেলেটা যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না।

করব। কারণ আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। দাও।

বলে ছোকরার হাত থেকে কাগজ নিয়ে মদন তলায় সই করে ফেরত দিল। দেখাদেখি ট্রেজারার, প্রেসিডেন্ট, গেঁয়ো এম এল এ এবং আরও কয়েকজন হাত বাড়াল।

পাশের দরজা দিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়ে মদন। পদত্যাগ করেছে বলেই বোধহয় কেউ আটকায় না। পিছন দিকে একটা সরু গলি আছে, সেইটে খুঁজতে একটু সময় লাগে। তারপর বড় রাস্তা।

চারদিকে মরা আলোর ভারী নরম একটা বিকেল। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস টানে মদন। বাইরে এসে সে এমনই মোহিত হয়ে পড়ে যে, লক্ষই করে না পার্টি অফিস থেকে একশো-দেড়শো গজ দূরে একটা জিপ গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কালো ষণ্ডামার্কা টেকো একটা লোক ক্রূর চোখে তাকে দেখছে। হালদারের যে গাড়িতে সে এসেছে তা পার্টি অফিসের উলটোদিকে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করানো। কিন্তু মদন গাড়িটার কাছে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করে না। পার্টি অফিসের সামনে এখন অগুন্তি লোক। ওদিকে গেলেই ঘিরে ফেলবে। মদন কালীঘাটের ট্রাম ধরতে এসপ্লানেডের দিকে হাঁটতে থাকে।

ফুটপাথে থিকথিক করছে হকার, বে-আইনি দোকানপাট, ফুটপাথের বাসিন্দাদের সংসার। ট্যানা-পড়া এক মেয়েছেলে কাঠের জ্বালে তরকারির খোসা দিয়ে রান্না চাপিয়েছে। গন্ধে গা গুলোয়। বাস মোটর গাড়ির চলন্ত চাকা থেকে দু'-তিন হাত দূরেই হামা টানছে তার কোলের বাচ্চা।

রিজাইন করেছেন শুনলাম!—একদম কানের কাছে মুখ এনে প্রেমিকার মতো মোলায়েম করে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

মদন চোখের কোনা দিয়ে শচীকে একটু মেপে নিয়ে বলল, ওই একরকম বলতে পারো।

তা হলে আপনারাই নতুন দল করবেন?

ঠিক নেই।

শচী শেয়ালের মতো হাসল, কথা দিচ্ছি দাদা, কাল আপনার স্টেটমেন্ট আমাদের কাগজের ফ্রন্ট পেজে বেরোবে।

তোমাদের ফ্রন্ট পেজ ক'টা?

কী যে বলেন?—শচী মাথা চুলকে হাসল, ফ্রন্ট পেজ একটাই, এবার আপনাকে আমরা বড় কভারেজ দেবই।

একটা সত্যি কথা বলবে শচী?

কী, বলুন দাদা!

তোমরা কার দলে?

আমাদের আবার দল কী?

মদন শান্ত স্বরেই বলে, কালকের কাগজে তোমরা আমার স্টেটমেন্ট ছাপবে ঠিকই, কিন্তু মাথার ওপর নিত্য ঘোষের বিবৃতি বসাবে। এ সবই আমি জানি। এখন নিত্য ঘোষেব পালেই হাওয়া। তোমাদের দোষ নেই।

শচী এ নিয়ে কচলাল না। বলল, আপনাদের নতুন দলের কী নাম হবে ভেবেছেন?

একটা কিছু হবে। অল ইন্ডিয়া বেসিসেই হবে। আমরা ডিসিশন নেওয়ার কে?

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি তো পার্টির অল ইন্ডিয়া লিডার। আমরা জানি হাই কমান্ডই আপনাকে হেস্তনেস্ত করতে দিল্লি থেকে এখানে পাঠিয়েছে। আমরা জানি আপনি মালদা মুর্শিদাবাদ বীরভূমের ক্যাডারদের সাপোর্ট পেয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে দল ভাগ হতে শুরু হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনে এসেছেন।

ধর্মতলার মোড়ে অফিসভাঙা ভিড়ে দাঁড়িয়ে মদন তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল এবং শচীকে অফার না করেই নিজে একটা ধরাল। অভ্যাসবশে শচী হাত বাড়িয়েছিল। মাঝপথে হাতটা ফেরত নিয়ে বলল, আপনাদের ক্যাডাররাই কি মেজরিটি?

জানি না।

শচী ভিড়ের মধ্যে কানের কাছে মুখ এনে বলল, একটা কথা বলি দাদা। নিত্য ঘোষ যতই লাফাক, আপনি যেদিকে থাকবেন সেদিকেই পাল্লা ঝুঁকবে। আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।

কত কথাই যে জানো তোমরা!

দেখে নেবেন। বলে দিলাম।—বলে শচী আবার হাতটা বাড়ায়।

মদন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওর হাতে দিয়ে দেয়। বলে, কত কায়দাই যে জানো শচী। কিন্তু এবার নিজের পয়সায় সিগারেটটা খেতে শেখো, তাতে খানিকটা সেল্‌ফ-রেসপেক্ট আসবে।

কথাটা গায়ে না মেখে শচী বলে, আপনি যে ফোরফ্রন্টে চলে এসেছেন তা সবাই টের পাচ্ছে। নইলে আপনি আসার পর এই গণ্ডগোলটা হল কেন? নিত্য ঘোষ যেটা করছে সেটা পাওয়ার পলিটিক্স। কিন্তু আলটিমেটলি—

কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটি ছাড়িয়ে, রাজভবনের গাছপালার ডগার ওপর দিয়ে, রঞ্জি স্টেডিয়ামের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এসপ্লানেড ইস্টে আজও নিত্যকার মতো কারা ধর্না দিয়ে বসে আছে, সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। একটা ফেরেব্বাজ কলমওয়ালা চোরাই কলম বেচার ভাবভঙ্গি করে কানের কাছে এসে বলে গেল, চাইনি-ই-জ।

মদন ভুলে গেল যে, সে এম পি বা পলিটিক্সওয়ালা। হঠাৎ বলল, ফুচকা খাবে শচী? ওই লেনিন স্ট্যাচুর নীচে একটা ফুচকাওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে। চলো।

বলতে বলতেই শচীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রাস্তা পেরোয় মদন।

একজন ভি আই পি হয়ে কী যে করেন মদনদা!—হাত ছাড়িয়ে শচী হাসল, আর একটু হলে নীল রঙের অ্যামবাসাডারটার মুখে পড়ে যেতাম দু'জনে।

পলিটিশিয়ান আর রিপোর্টাররা কখনও টাইমলি মরে না হে শচী। মরলে দেশটা সোনার দেশ হত। ওহে ফুচকাওলা, শুরু করো, শুরু করো! জলদি!

দক্ষিণগামী বাসের দোতলায় এক ছোকরা হঠাৎ বলে উঠল, এই যে দাদারা! এত তাড়াতাড়ি সব বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন? শুনেছেন কি, কাল রাতে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে? বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, তবু মরিবার হল তার সাধ। অথচ দেখুন কবি গেয়ে গেছেন, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। আজ নিজের জীবনের একটা গল্প বলব বলে আপনাদের কাছে এসেছি। গল্প নয়, ঘটনা, বুঝলেন দাদা, বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে আমরা দুই ভাই ব্যাবসা করতে গিয়েছিলাম। বাঙালি ব্যাবসা করতে জানে না এই বদনাম ঘোচাতে দাদা, শ্যামবাজারের মোড়ে আমি আর আমার দাদা একটা দোকানঘর ভাড়া নিতে গেলাম। পেয়েও গেলাম একটা। কিন্তু দাদা, বাড়িওলা পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামি চায়। সেই শুনে আমরা পালিয়ে আসি। কিন্তু বাঁচতে তো হবে! মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তাই দাদা বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা দুই ভাই অল্প পুঁজি নিয়ে একটা ব্যাবসা শুরু করলাম। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই করতে গিয়ে আমরা তৈরি করেছি একটি ধূপকাঠি। এই বাসে আমাকে প্রায়ই দেখতে পান আপনারা। রেগুলার অনেকেই এই ধূপ ব্যবহার করেছেন। যাঁরা করেছেন তাঁদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। যাঁরা জানেন না তাঁরা জেনে রাখুন, একটি স্টিক জ্বলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, কাঠি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এক ঘণ্টা ঘরে তার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। আমার হাতে যে স্টিক জ্বলছে সেই একই স্টিক সব প্যাকেটে পাবেন। দোকানে বাজারে কিনতে যান, একটি প্যাকেটের দাম পড়বে পঁয়ত্রিশ পয়সা। কিন্তু বাসে কনসেশন রেটে এক প্যাকেট চার আনা, দু' প্যাকেট আট আনা, চার প্যাকেট এক টাকা। এক টাকা! এক টাকা! এক টাকা।...

মদনের নাকের ডগায় চারটে প্যাকেট ধরে বার কয়েক নাড়ে ছোকরা, এক টাকা! এক টাকা!

মদন অলস চোখে চেয়ে বলে, গল্পটা পালটাও। এ পর্যন্ত দশজনের মুখে শুনেছি একই গল্প।

ছোকরা প্যাকেটগুলো ঝট করে টেনে নিয়ে পরের সিটের এক যাত্রীর নাকের ডগায় ধরল, এক টাকা! এক টাকা!

মদনের পাশের লোকটা খিক খিক করে হেসে বলল, বেশ বলেছেন! এরপর লজেন্সওয়ালা উঠেও একই গল্প ঝাড়বে; শুধু কি তাই? গুপিযন্ত্র নিয়ে এক বাচ্চা ছোকরা উঠে ধরবে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে। রোজ ওই 'বাবুর বাগানে' কাঁহাতক শোনা যায় বলুন দেখি! কিছু বলাও যায় না, দেশে বেকার সমস্যা। ভাবি, দুটো করে খাচ্ছে খাক। নেতারা তো আর এদের জন্য কিছু করবে না...

তা ঠিক, তা ঠিক।—মদন তাড়াতাড়ি বলল এবং পলিটিক্স এড়াতে দু' স্টপেজ আগে নেমে পড়ল। হাজরার কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করল মাধবকে, একটু দেরি হবে রে!

সে বুঝতেই পারছি।

তুই একা একা স্কচ চালাচ্ছিস নাকি?

না মাইরি।—একটা হেঁচকি তুলে মাধব বলে, ঝিনুক কেটে পড়েছে, জানিস!

চিরতরে নাকি?

বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে আনপ্রেডিকটেবল মহিলা। সঙ্গে বৈশম্পায়ন।

বলিস কী?

দে আর হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ।

দুস শালা! তুই খাচ্ছিস।

একটুখানি। এই মোটে খুললাম।

কত নম্বর বোতল?

এক নম্বর মাইরি বিশ্বাস কর।

তোকে বিশ্বাসের কী? গিয়ে যদি দেখি সব ফাঁক করেছ তা হলে—

আরে না না। অনেক আছে। চলে আয়।

অনেক নেই রে মাধব, অনেক নেই। তুই অন্তত হাফ পাঁইট সাফ করেছিস।

অতটা হবে না। কী জানিস, ঝিনুকটা তো আজ পালিয়ে গেল, দুঃখে দুঃখে খানিকটা খেয়ে ফেললাম।

পালিয়ে গেছে আর ইউ শিয়োর?

তা ছাড়া আর কী হবে? সঙ্গে বৈশম্পায়ন। দুইয়ে দুইয়ে চার।

তা হলে দুঃখের কী? সেলিব্রেট কর।

তাই করছি আসলে। দুঃখ প্লাস সেলিব্রেশন। তবে বড় একা লাগছে। চলে আয়। আর কত দেরি করবি?

স্নান করে জামাকাপড় পালটেই আসছি।

॥ ১৪ ॥

গড়িয়াহাটে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দু'জনে সূর্যাস্ত দেখল।

আপনার কোনও ডাকনাম নেই?—ঝিনুক আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

বৈশম্পায়ন ফিসফিস করে বলে, আছে। মণ্টু।

আমার এক ভাইয়ের নামও মণ্টু। ভারী মিষ্টি নাম।

আপনার ভাল লাগলেই ভাল।

কিন্তু আপনি ভারী অদ্ভুত। ওর কোনও বন্ধুই আমাকে আপনি করে বলে না। শুধু আপনি বলেন। কেন বলুন তো!

বৈশম্পায়ন একটু লাল হয়ে বলে, এমনি।

না। আমার ওসব আপনি-আজ্ঞে ভাল লাগে না। বলুন তুমি! বলুন শিগগির।

তু-তুমি।

শুধু তুমি বললেই হবে না। পুরো একটা বাক্য বলুন।

বলব?

বলতেই তো বলছি।

ঝিনুক! তুমি কী সুন্দর!

বাঃ, বেশ বলেছেন!—ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আবেগ ভরা গলায় বলে, কতকাল আমাকে কেউ সুন্দর কথা বলেনি। আমি যে সুন্দর সে কথা মনে করিয়ে দেয়নি।

মাধব? মাধবও নয়।

মাধব! মাধব আমাকে একটুও ভালবাসে না। বউকে ভালবাসলে কেউ মদ খায় বলুন!

যুক্তিটা ঠিক বুঝতে পারে না বৈশম্পায়ন, তবে এ নিয়ে আর কথা বাড়াতেও সে আগ্রহ বোধ করে না। তার মুখ গরম, চোখ জ্বালা করছে, গা ঘামছে। অদ্ভুত এক ভালবাসাই এসব ঘটাচ্ছে। সে ঢোক গিলে বলল, ঝিনুক, আমাদের তো খুব বেশি সময় নেই। একটা কথা বলে নেব?

ঝিনুক খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকায় বৈশম্পায়নের দিকে, সময় নেই! কীসের সময় নেই বলুন তো!

আয়ুর সময় যে কেটে যাচ্ছে ঝিনুক। যৌবন যায়, বয়স যায়, লগ্ন যায়।

আপনি যে কী সুন্দর কথা বলেন! আমিও ঠিক এসব কথাই ভাবি। আমরা বোধহয় খুব বেশিদিন বাঁচব না, না? আমার তো এমনিতেই মাঝে মাঝে খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন ঝিনুক?

কেবল মনে হয়, একদিন খুব বন্যা হয়ে আমরা সবাই ডুবে যাব। কিংবা কেউ আকাশ থেকে অ্যাটম বোমা ফেলবে। না হয় তো ওই যে কী একটা রোগ হচ্ছে বাঁকুড়ায়, এনকেফেলাইটিস না কী যেন, সেই রোগটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়বে আর আমরা সবাই মাথায় রক্ত উঠে মরে যাব। এত ভয় নিয়ে বাঁচা যায়, বলুন তো! তার ওপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যেতে পারে, ভূমিকম্প হতে পারে, গুন্ডা বদমাশ ডাকাত এসে ঘরে ঢুকে খুন করে যেতে পারে, বলুন!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈশম্পায়ন বলে, তা ঠিক। তবে ওসব কিছু না হলেও এমনিতেই আমরা আস্তে আস্তে বয়স্ক বুড়ো হয়ে যাব ঝিনুক।

আপনার বয়স কত?

বত্রিশ-তেত্রিশ।

যা গম্ভীর হয়ে থাকেন, আপনাকে আরও বেশি দেখায়।

আমি আর মাধব একবয়সি।

জানি জানি। আপনাকে আমি মোটেই বুড়ো বলিনি।

কিন্তু বুড়ো তো একদিন হব ঝিনুক। তুমি হবে, আমি হব, মাধব হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছ না?

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, বয়স নিয়ে আর ভয় দেখাতে হবে না।

তুমি কি ভয় পাও ঝিনুক!

বুড়ো হতে, মরতে কে না ভয় পায় বলুন! কিন্তু কী একটা কথা বলতে চাইছিলেন যে! হাবিজাবি কথায় সেটা হারিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা হারিয়ে গেলেই হয়তো ভাল ছিল ঝিনুক। বলব?

ঝিনুক মৃদু একটু লজ্জার পরাগে মাখা মুখটি মিষ্টি করে নামায়, তারপর মৃদুস্বরে বলে, বলুন না।

কিন্তু বলবে কী করে বৈশম্পায়ন? খুব কাছ ঘেঁষে একটা পায়জামা পরা লোক কখন এসে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে পাছা চুলকোচ্ছে। কিছু লোকের কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব!

বৈশম্পায়ন একটু বিরক্তির গলায় বলে, চলো আর কয়েক পা দূরে গিয়ে দাঁড়াই।

কয়েক পা হেঁটে তারা লোকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই যে একটা বাধা পড়ল এতেই মুডটা একদম নষ্ট হয়ে গেল বৈশম্পায়নের। সে অনেকক্ষণ রেলিং-এ ভর রেখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অনেকদিন আগে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে শেষবারের মতো দেখা, বলাই সিংহী লেনে লাহাবাড়ির দেয়ালের পটভূমিতে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা সেই মেয়েটিকে তো আর কখনও পৃথিবীতে দেখা যাবে না। কিছুতেই ফিরবে না বয়স। কিছুতেই উজানে যাবে না তো নদী! নদী শুধু বয়ে যেতে জানে একমুখে। তার কলধ্বনিতে শুধু মৃত্যুর গান। তার ফাঁকা শূন্য উপত্যকায় সাদা আর নিশ্চল হিম পাথরেরা পড়ে থাকে।

খুব হাওয়া দিচ্ছিল আজ। বজবজের একটা ট্রেন প্রায় নিঃশব্দে পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন বলল, ঝিনুক?

উঁ!

কী ভাবছ?

কত কী! এইমাত্র ইচ্ছে করছিল ওই ট্রেনটায় উঠে অনেক দূর চলে যাই।

কিন্তু ট্রেনটা তো বেশি দূর যাবে না। মাত্র বজবজ পর্যন্ত।

বজবজ কি সমুদ্রের কাছে?

না। গঙ্গার কাছে।

সমুদ্রের কাছে কোনও ট্রেন যায় না?

যাবে না কেন! অনেক ট্রেন যায়। তুমি কি সমুদ্র দেখোনি?

বহুবার। শুধু পুরীতেই গেছি পাঁচবার; ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, বম্বে, ঘরের কাছে দিঘা—

তবু যেতে ইচ্ছে করে?

করে। কে যে আমার নাম ঝিনুক রেখেছিল! আমার কেবলই মনে হয় সমুদ্রের কাছে আমার অনেক ঋণ!

তোমাকে ডাকে সমুদ্র, আর আমাকে ডাকে এক নদী।

তাই নাকি?

তবে সে এক মৃত্যুর নদী। এক নির্জন উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে সাদা পাথর। আর কী যে করুণ সেই নদীর গান!

ঝিনুক ছলছলে চোখ তুলে বলে, সত্যি?

বৈশম্পায়ন একটু থমকাল। ঝিনুক যেভাবে চেয়ে আছে তাতে মনে হয় সে বৈশম্পায়নের নদীটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা পরিণত-বুদ্ধির মহিলার পক্ষে যেটা খুব স্বাভাবিক নয়।

একটু থেমে বৈশম্পায়ন বলে, দু'ধারে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়। ভীষণ সাদা, শূন্য এক উপত্যকা, সেইখানে এলোচুল বিছিয়ে নদী সারাদিন গুনগুন করে গায়। সাদা সাদা ঠান্ডা পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। অদ্ভুত না ঝিনুক? শুনলে লোকে আমাকে পাগল ভাববে!

ঝিনুক মাথা নেড়ে বলে, মোটেই না।

বৈশম্পায়ন একটু হতাশ হয়। এত সহজে আর কেউ নদীটাকে মেনে নেবে এরকম আশা সে করেনি। সে বলল, তোমার অদ্ভুত লাগছে না?

না তো! এরকম হতেই পারে।

বৈশম্পায়ন খুবই অবাক হয়ে বলে, হতে পারে?

নীলু যখন মারা গেল তখন কিছুদিন আমারও মৃত্যুর হাওয়া লেগেছিল।—বলে একটু আনমনা হয়ে গেল ঝিনুক। একটু চুপ করে থেকে গলাটা এক পরদা নামিয়ে বলল, জানেন তো, নীলুকে আর আমাকে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি কথা রটেছিল!

বৈশম্পায়ন একটু চমকে উঠে বলে, তাই নাকি?

খুব বিচ্ছিরি। যতদূর নোংরা হতে হয়। সেটা রটিয়েছিল আমার এক দূর সম্পর্কের ননদ।

কী রটিয়েছিল ঝিনুক?

ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েকে জড়িয়ে যা রটানো যায়। অবশ্য নীলুর সঙ্গে আমার খুব বনত। বিয়ের পর নতুন নতুন শ্বশুরবাড়িতে কাউকেই তেমন ভাল লাগত না। একমাত্র নীলু, কী নরম, কী ভদ্র, কী বুদ্ধি! বেঁচে থাকলে নীলু সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। এক এক সময়ে তো আমার মনে হত, নীলু একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রীও হবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নাড়াল, নীলু ছিল এক্সেপশনাল, আমি জানি।

তা হলেই বলুন! নীলুকে ভাল না বেসে পারা যায়? কিন্তু ভালবাসা মানেই কি খারাপ কিছু? আমি নীলুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গেছি, ছবির একজিবিশন দেখেছি, সারা রাত ক্লাসিকাল গানের আসরে গান শুনেছি, এতে কি দোষ? অথচ—

এতদিন বাদেও অভিমানে একবার ঠোঁটদুটো ফুলে উঠল ঝিনুকের। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো ভীষণ অদ্ভুত। আমাকে একদম সহ্য করতে পারত না, আমি

সুন্দর বলে। আর নীলুকেও সহ্য করতে পারত না। কেন জানেন? নীলু ভীষণ ব্রাইট বলে। ওদের ধারণা ছিল নীলু সম্পর্কে সবাই নাকি বাড়িয়ে বলে।

মাধব নীলুকে খুব ভালবাসত।—বৈশম্পায়ন বলে।

বাসত কি না কে বলবে! আসলে নীলুর যেটুকু সম্পর্ক ছিল বাড়ির সঙ্গে তা আমার জন্যেই। নইলে নীলুর তখন অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা। ও আমাকে প্রায়ই বলত, পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে শহরে ঘুরে বেড়াবে। বলত, দেশের প্রবলেমগুলো ধরতে হবে বউদি, অনেক মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে, এই বুকের মধ্যে সব মানুষকে আমার টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

বৈশম্পায়ন চুপ করে থাকে। প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর।

ঝিনুক রেলিং-এ আর একটু ঝুঁকে বলে, আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই নীলু খুন হল সন্ধেবেলায়। উঃ, সে কী সাংঘাতিক কাণ্ড! তরতাজা, ছটফটে, ভীষণরকমের জ্যান্ত নীলু মরে গেছে, ভাবা যায়! তিনদিন আমি একদম বোবা হয়ে ছিলাম। কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে কেবল বুবু শব্দ বেরোত। তারপর থেকেই একটা মৃত্যুর হাওয়া এল। ঘরে বসে থাকতাম, মনে হত বাইরে হঠাৎ একটা হাওয়া ছেড়েছে। আর সেই হাওয়া কী যেন বলতে চাইছে আমাকে। দৌড়ে যেতাম বাইরে। ছাদে বসে আছি, হঠাৎ মনে হল আমার চারদিকে যেন বাতাসটা ভারী হয়ে ঘুরছে, কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। এক এক সময়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত, মনে হত, একটা হাওয়া এসে আমার দরজায় জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকছে, বউদি! বউদি!

এ কি ভৌতিক কিছু ঝিনুক?

না, না, একদম তা নয়। আসলে আপনার ওই নদীর মতোই এও এক মৃত্যুর হাওয়া। বেঁচে থাকতে আর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে অত ভালবাসত নীলু, অথচ সে-ই তো মরে গেল! তাই বোধহয় এই হাওয়াটা এসে আমাকে বলতে চাইত, তোমরা কেন বেঁচে আছ? তোমাদের বেঁচে থাকার কী অধিকার? যে পৃথিবীতে নীলু থাকতে পারল না, সেই পৃথিবীতে তোমরাই বা থাকবে কেন? জানেন, সেই সময়ে আমার বেশ কয়েকবার সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়েছে।

বৈশম্পায়ন আস্তে জিজ্ঞেস করল, নীলু সম্পর্কে তুমি কি সবটুকু জানো ঝিনুক?

ঝিনুক স্থির হয়ে সামনের নির্মীয়মান একটি ফ্ল্যাটবাড়ির কাঠামোর মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, নীলুর সবটুকু কে-ই বা জানে! তবে ও মরে যাওয়ার পর আমার যখন ওরকম মানসিক অবস্থা, তখন একদিন খুব বিরক্ত হয়ে মাধব বলেছিল, নীলু ওর ভাই নয়।

বৈশম্পায়ন একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ঝিনুক জানে।

ঝিনুক মাথা নুইয়ে বলে, জানলাম নীলু ওদের বাড়িতে সেই ছোট্টবেলায় এসেছিল। চাকরের কাজ করত। বাপের পদবি জানা ছিল না বলে মাধবদের পদবি নেয়। একটু বড় হওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, সে অত্যন্ত মেধাবী আর বুদ্ধিমান তখন মাধবদের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়ির ছেলে হিসেবে পরিচয় দিত। পরে সে বাড়ির ছেলেই হয়ে ওঠে। মাধব আজও নীলুকে ভাই বলে মানে। এসব জানি মণ্টু।

দিদির বাসার সামনে ফুটপাথে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, টিনের সুটকেসটা পাশে নামানো।

মদনকে দেখে দু' পা এগিয়ে এসে ম্লান একটু হেসে বলল, দু' ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

ভিতরে গিয়েই তো বসতে পারতে।

ভিতরে অনেক লোক। জায়গা নেই। আমি আজই দিল্লি রওনা হচ্ছি।

গৌরীর আজ দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মদন সে কথা জিজ্ঞেস করল না। গৌরী কেন পালাচ্ছে তা সে খানিকটা জানে। শুধু বলল, একা পারবে?

পারব। গরিবরা সব পারে।

গিয়ে কোথায় উঠবে?

আমার এক দূর সম্পর্কের দিদি থাকে কলকাজির কাছে। সেখানে উঠব।

বাচ্চারা?

নিচ্ছি না। দিদির বাসায় কীরকম রিসেপশন পাব জানি না তো! বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে অসুবিধে।

মা ছাড়া ওদের অসুবিধে হবে না?

ওরা মাকে থোড়াই কেয়ার করে।

তোমার কষ্ট হবে না?

গৌরী একটু হাসল, মানুষ তো! একটু হবে! তবে সেটা সহ্য করা যাবে। ওসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে আপনি ভাবলেন না। আমি এখন পালাতে চাই। পরে সুযোগ-সুবিধে বুঝে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যাব।

চারদিকে আজকাল খুব বউ পালাচ্ছে। খুব দুশ্চিন্তার কথা। মদন ফিচেল হাসি হেসে বলে, আর নবর জন্য মন কেমন করবে না? নব যদি বাড়ি ফিরে দেখে, তুমি নেই, তা হলে?

গৌরী কেমন বিবশ হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কার জন্য এতকাল মন কেমন করেছে তা কি এম পি সাহেব জানেন?

না। কার জন্য গৌরী?

দিল্লিতে গিয়ে বলব।

নবর কাছে আর কখনও ফিরে আসবে না গৌরী?

নব আমার কে? ওর কাছে ফিরে আসব কেন?

নব যদি ভাবে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছ?

আমি কার সঙ্গে পালালাম তাতে ওর বড় বয়েই গেল।

তা ঠিক। তবে প্রেস্টিজের ব্যাপারও তো আছে। বউ পালালে কোনও পুরুষ খুশি হয়?

আমি তো চাকরি করতে যাচ্ছি। পালাচ্ছি কে বলল?

তুমিই তো এইমাত্র বললে!

সে আপনার কাছে সত্যি কথাটা বললাম, ওর বাড়ির লোক অন্যরকম জানে।

মদন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গেল।

গৌরী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কিচ্ছু জটিল হয়নি মদনদা। এটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আপনি চলে আসার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম।

মদন ফিচিক করে হেসে বলে, বুড়ি তোমাকে খুব ধোয়াচ্ছিল।

আপনিই তো দুষ্টুমি করে লাগিয়ে দিয়ে এলেন। তবে ওসব শুনতে শুনতে আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ সব অন্যরকম হয়ে গেল।

পাষাণী অহল্যাকে জাগাতে রামচন্দ্র এলেন। আজ আপনি যেই গেলেন অমনি ভিতরে সব ঘুমন্ত বোধ জেগে উঠল। দুঃখ, অপমান, হতাশা, সেইসঙ্গে ভালভাবে বাঁচার ইচ্ছে। অন্ধকারে থেকে থেকে আলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ আলো দেখে বুঝতে পারলাম, কী অন্ধকারেই না পড়ে আছি।

আমি কি তোমার আলো গৌরী? আবার রামচন্দ্রও?

গৌরী এই প্রকাশ্য ফুটপাতে, চারদিকে চলন্ত লোকজনের ভিড়েও কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। আবেগে ঠোঁট কাঁপল, গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনওক্রমে বলল, আলো! আপনি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও আলো নেই।

এ কথায় খুব হোঃ হোঃ করে হাসতে ইচ্ছে করছিল মদনের। বদলে সে আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার জীবনে আর একটা আলো ছিল গৌরী। আমি জানি।

গৌরীর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ থেকে স্বপ্নের ক্রিমটুকু কে মুছে নিল। একটা ঢোক গিলল সে। মাটির দিকে চেয়ে বলল, আপনি কখনও অতীতকে ভোলেন না কেন এম পি সাহেব?

মদন তেতো একটু হেসে বলে, ভুলতে পারি না গৌরী। আমার যে কেন সব মনে থাকে! আর তার জন্যই মাঝে মাঝে কষ্ট পাই।

গৌরী যখন মুখ তুলল তখন তার চোখ ছলছল করছে। একটু ধরা গলায় বলল, আপনি কি এখনও নীলুকে হিংসে করেন? আমার জন্য?

মদন গম্ভীর গলায় বলে, নীলুকে হিংসে করব কেন গৌরী? নীলুর এমন কী ছিল যাকে হিংসে করা যায়?

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, আমিও তো তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। নীলু কোনওদিন আমাকে ফিরেও দেখেনি। নীলুকে কেন আপনি হিংসে করবেন?

মদন মাথা নেড়ে বলে, নীলুকে হিংসে করি না গৌরী, শুধু জীবনের সত্য দিকগুলির দিকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিতে চাই। তোমার জীবনের আলো ছিল নীলু। বিয়ে করার জন্য তাকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ। বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়েছ। নীলুর ওপর শোধ নিতেই কি তুমি নবর সঙ্গে ঝুলেছিলে? নীলু অন্তত তাই বলত।

ওসব কথা থাক মদনদা। আজ থাক। নীলু তো বেঁচে নেই।

মদন একটু হাসল, আস্তে করে বলল, কিংবা হয়তো খুব বেশি বেঁচে আছে!

নীলুর জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে মদনদা, সে আমার আলো হবে কেন?

মদন চুপ করে রইল। মুখটা গম্ভীর।

গৌরী হঠাৎ নিচু হয়ে তাকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে। আমি আসি।

টিনের সুটকেসটা তুলে নিয়ে গৌরী নিরাশ্রয় অসহায়ের মতো যখন রাস্তাটা পেরিয়ে গেল তখন মদনের ভারী কষ্ট হল গৌরীর জন্য।

এতক্ষণ এম পি ছিল না মদন, দিদির বাসার বাইরের ঘরে পা দিয়েই হল। কণা নামে একজন মহিলা বসে আছেন। স্বামী দুশ্চরিত্র। ঘ্যানর ঘ্যানর অনেক কথা শুনে যেতে হল তাকে। আশ্বাস দিল গিয়েই ব্যবস্থা করবে।

সারাক্ষণ ভারী ক্লান্ত লাগছে তার। স্কচের বোতল খুলে বসে আছে মাধব। গিয়ে এক্ষুনি ডুব দিতে হবে। সব ভুলে যেতে হবে, ভাসিয়ে দিতে হবে। সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর জামাকাপড় পালটে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরল একটা।

সহদেব বিশ্বাস তার ওকালতির চেম্বারে চেয়ারে হাঁটু তুলে বসা, মাথায় টাক, মুখে ক্ষুরধার

বিষয়বুদ্ধি। খুব পসারের সময়েই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছে। এখন কালেভদ্রে উপরোধে বা পার্টির দরকারে কেস করে। তার চেয়ারের দু'ধারে কেঁদো বাঘের মতো দুই রুস্তম বসে আছে। তাদের গায়ের টি শার্ট ছিঁড়ে শরীরের মাসল ঠিকরে বেরোচ্ছে, মুগুরের মতো হাত, খোলা জামা দিয়ে বুকের ঘন লোম দেখা যাচ্ছে। দু'জনেরই চোখ নবর দিকে স্থির। দু'জনকেই চেনে নব। বেলেঘাটার বিখ্যাত মস্তান যমজ দুই ভাই কেলো আর বিশে। দিনকাল পালটে গেছে, এখন মস্তানরা লিডারদের দেখে, লিডাররা দেখে মস্তানদের। কিন্তু ফালতু ব্যাপারে নবর মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই। তিন জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে সে সহদেব বিশ্বাসের কাছে আসতে পেরেছে।

সহদেব মৃদু স্বরে কথা বলছিল। শোকতাপা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো গলায়। নব অবশ্য সান্ত্বনা পাচ্ছে না। সহদেব বলল, এ সময়ে পলিটিক্যাল শেলটার দেওয়ার অনেক ঝুঁকি আছে হে নব। আজই পার্টির মিটিং-এ বিরাট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজ হোক, কাল হোক, দল ভাঙছে। স্টেট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, আরও অনেক লিডার রেজিগনেশন দিয়েছে। এখন আমরা রিস্ক নিতে চাই না।

রিস্ক কীসের?

তুমি কনডেমনড খুনি। শেলটার দিলে হাজার রকমের প্রশ্ন উঠবে।

কিন্তু পুলিশ তা হলে আমাকে পালাতে দিল কেন?

সহদেব বিচক্ষণ একটু হেসে বলে, কথাটা দু'বার বললে, ওটা তোমার ভুল ধারণা। পুলিশ তোমাকে পালাতে দেয়নি। কোনও কারণে গার্ডরা অন্যমনস্ক ছিল। তুমি সেই সুযোগটাকেই মনে করছ গটআপ ব্যাপার।

নব কথা না বাড়িয়ে অধৈর্যভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি কী করব?

গা ঢাকা দিয়ে থাকো যদি পারো।

কতদিন?

যতদিন না ভাঙচুরটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে।

নিত্যদার কাছে গেলে কিছু হবে?

নিত্যদা খুব ব্যস্ত। আজ রাতেই বোধহয় উনি পার্টির সেক্রেটারি হচ্ছেন। মিটিং চলছে। তোমাকে সময় দিতে পারবেন না।

আমার সঙ্গে পার্টির যে লোক দেখা করেছিল জেলখানায়, যে বলেছিল—

সহদেব সহজে ধৈর্য হারায় না। এখনও হারাল না, মৃদু হাসি হেসে বলে, সে কেন দেখা করেছে তা সে-ই জানে। দল থেকে তাকে পাঠানো হয়নি।

নব টেবিলে ভর রেখে ঠান্ডা গলায় বলে, আপনি তো জানেন পলিটিক্যাল শেলটার না পেলে পুলিশ আমাকে কুকুরের মতো খুঁজে বের করবেই। এ বাজারে পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া কেউ আমাকে কোনও প্রোটেকশন দিতে পারবে না। আপনি এও তো জানেন সহদেবদা, আমি মাগনা প্রোটেকশন চাইছি না। কোনও শালা কখনও আমার জন্য মাগনা কিছু করেওনি। প্রোটেকশন দিলে কাজ করে দেব, দরকার হলে লাইফের রিস্ক নিয়েই।

কেলো আর বিশে তাকাতাকি করে নেয়। তারপর আবার নবর দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে।

সহদেব হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, সবই জানি। কিন্তু শেলটার বা প্রোটেকশন কোনওটাই দেওয়া এখন সহজ নয়। আমাদের সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

নব ধৈর্য হারাচ্ছিল। সে বেশিক্ষণ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। বেশি কথা বলার দমও তার নেই। একটু গরম হয়ে বলে, নীলু হাজরার কেসটায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল, আপনি জানেন? নীলুকে আমি মারিনি।

কেলো আর বিশে আর-একবার তাকাতাকি করে, চোখের কোণ দিয়ে সেটা লক্ষ করে নব।

সহদেব নির্বিকারভাবে জিজ্ঞেস করে, কে তোমাকে ফাঁসিয়েছিল?

নাম বলে লাভ কী? আপনারা তো জানেন।

সহদেব বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তাতেও আমাদের কিছু করার নেই।

নব একটু হেসে বলে, করার অনেক আছে, কিন্তু আপনারা করবেন না। ঠিক আছে, আমি আমার রাস্তা করে নেব।

বলে নব ওঠে। সহদেব নিজের হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরা জয় তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে ক্লান্তি, চোখে ভয়। ইচ্ছে করলে সে নবর হাত এড়িয়ে এতক্ষণে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে এও জানে, পালিয়ে কোনও লাভ নেই। নব তাকে খুঁজে বের করবেই।

জয় বলল, কিছু হল?

নব রক্তঝরা চোখে চেয়ে বলল, খানকির ছেলেরা ফোঁটা কেটে বোষ্টম সাজছে।

তোমার সঙ্গে জেলখানায় যে দেখা করেছিল তাকে তুমি ঠিক চেনো?

আলবত। শালা কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল!

দু'জনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই পেছন থেকে কেলো বেরিয়ে এসে সোডার বোতল খোলার মতো শিসটানা গলায় ডাকল, নব।

নব ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ায়।

কেলো পাহাড়ের মতো দরজায় দাঁড়ানো। কোমরে হাত, এরকম বিশাল চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, শোন।

নব সতর্কভাবে কাছে এগিয়ে যায়, কী বলছ?

কথা আছে।—বলে নবর একটা হাত শক্ত করে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়।

ঘরে এখন সহদেব নেই। শুধু কেলো আর বিশে। বিশের হাতে খোলা ছ'ঘরা রিভলবার।

কেলো রুমাল দিয়ে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, একটা কাজ আছে। কিন্তু এর মধ্যে পার্টি নেই।

প্যাঁচ মেরো না। কেস করতে হবে তো? বলো। কিন্তু তার আগে বলো, শেলটার দেবে কি না।

কেসটা কর। দেখা যাবে।

তোমাদের কথায় হবে না। আমাকে কোনও লিডারের সঙ্গে লাইন করে দাও।

লিডাররা এর মধ্যে নেই।

সহদেবদা নিজের মুখে বলুক তা হলে।

সহদেবদা বলবে না। আমরাই বলছি। রাজি থাকলে বল, না হয় তো কেটে পড়।

নব করাল চোখে দুই যমজ ভাইকে দেখে নিল। আপাতত তার কিছু করার নেই। তারা উভয়পক্ষই যে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় তাতে কেউ কাউকে ফালতু ভয় খেয়ে সময় বা শরীর নষ্ট করে না: কাটে কাটে পড়ে গেলে কে কার লাশ নামাবে তার কোনও ঠিক নেই। তবে নব একটু টাইট জায়গায় আছে বটে। সে বলল, ফালতু বাত ছাড়ো কেলোদা, কেস আমি করে দেব, সে তোমরা জানো। কিন্তু তারপর কী?

কেলো নির্বিকারভাবে বলে, কেস হয়ে গেলে বাড়ি গিয়ে বসে থাকবি।

বাড়িতে লালবাজারের খোঁচড়েরা নেই?

অন্য জায়গায় তোর ঠেক আছে?

আছে।

তা হলে সেইখানেই চলে যা। পরশু পার্টি অফিসে দুপুরের পর দেখা করিস।

কিছু মালকড়ি ছাড়ো কেলোদা।

কেলো একটু হাসল, তুই মালকড়ি ছাড়া নড়বি না তা জানি। বোস, ব্যাপারটা বুঝে নে। সঙ্গের ছোকরাটা কে?

ফালতু।

কেলো একটু গম্ভীর মুখ করে মোটা আঙুল মুখে পুরে দাঁতের ফাঁক থেকে বোধহয় দুপুরের খাওয়া মাংসের আঁশ বের করে আনল। তারপর চোখ ছোট করে বলল, বিশে বলবে। শুনে নে।

॥ ১৬ ॥

অনেক দুঃখের কথা বলে কণা বিদায় নেওয়ার পর চিরু মণীশের কাছে এসে বলে, তোমার কি মনে হয়, মদন কিছু করতে পারবে কণার জন্য?

মণীশ নিবিষ্টমনে সিনথেটিক আঠা দিয়ে একটা ভাঙা কাপ জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিল ভিতরের বারান্দায়। বলল, একটা চরিত্রহীন মানুষকে চরিত্রবান করার সাধ্য তো আর ওর নেই। তবে ভয় দেখাতে পারে বটে। চাকরিরও ক্ষতি করতে পারে হয়তো।

তাতে কিছু হবে?

ঠোঁট উলটে মণীশ বলে, আমার মনে হয় না। তা ছাড়া মদনও যে কিছু করবেই এমন ভাবছ কেন? হয়তো দিল্লি গিয়ে ভুলে যাবে। তেমন গা করছিল না।

একটু আনমনা ছিল, আমিও লক্ষ করেছি। ওদের পার্টিতে কী সব গোলমাল চলছে না?

তা চলছে। কাপটা জোড়া দিয়ে দুহাতে জোরসে চেপে ধরল মণীশ, তারপর ওই অবস্থাতেই বলল, শালাবাবু আজ একটু তরল জিনিস চালিয়ে আসবে। মাধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন যখন।

কত মাথার কাজ করতে হয়, কত ঝামেলা ওর। একটু খায় খাক। কখনও মাতলামি করে না তো।— চিরু ভালমানুষি গলায় বলে।

মণীশ কাপটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে। সিনথেটিক আঠার নিয়মে লেখা আছে, অ্যাপলাই ম্যাকসিমাম প্রেশার। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, আমি এক-আধদিন খেয়ে এলে কী করবে?

এসো না! নতুন অভিজ্ঞতা হোক, আমিও মরার আগে নিজের চোখেই দেখে যাই। বলে চিরু চোখ পাকিয়ে তাকায়।

মণীশ মৃদু হেসে বলে, তোমার স্বামী না হয়ে যদি ভাই হতাম চিরু, অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যেত।

চাপটা একটু বেশি হয়ে যাওয়াতেই বোধহয়, কাপের ভাঙা টুকরো দুটো পিছলে খুলে গেল। মণীশ বলল, এঃ। আজকাল কিছুই সহজে জোড়া লাগতে চায় না কেন বলো তো?

ওই ভাঙা কাপ জুড়ে আমার কোন শ্রাদ্ধে ভুজ্যি সাজাবে শুনি?

আহা, কত সময় দাড়ি-টাড়ি কামানোর জল নিতেও তো লাগে। থাক না জিনিসটা। এই কাপের এখন চুয়ান্ন টাকা ডজন।

বলে মণীশ আবার আঠা লাগিয়ে ভাঙা টুকরো দুটো জুড়তে থাকে।

চিরু বলে, এ হল পেতনামি। দিন দিন তোমার নজর ভারী ছোট হচ্ছে।

দিন দিন দেশের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে যে। তোমার এম পি ভাইও কথাটা স্বীকার করে। বাজারহাট তো কখনও করলে না মিস্টার, তাই টেরও পেলে না।

চিরু যেন একটু রাগ করেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। স্টোভে ভাত ফুটছে, সেইদিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। ছেলেমেয়েরা শোওয়ার ঘরে গুনগুন করে পড়ছে। শব্দটা শুনতে শুনতে কত কী ভাবতে থাকে।

কাপটা অধ্যবসায়ের বলে জুড়তে পেরে যায় মণীশ। বেসিনে আঠা লাগানো হাত ধুয়ে লুঙ্গিতে মুছতে মুছতে খুব সাবধানে রান্নাঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকে, চিরু।

চিরু ঠান্ডা গলায় বলে, বলো।

একটা কথা বলব?

শুনতে পাচ্ছি। বললেই হয়।

তুমি কি রাগ করেছ?

রাগ করা কি আমার সাজে?

রাগের তো সাজগোজ লাগে না মিস্টার।

তবু বাঁদিদের রাগ তো মানায় না।

সেই পুরনো শব্দ। নতুন কিছু ভেবে বার করতে পারো না?

আমার অত মাথা নেই, জানোই তো?

মণীশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে, শুধু ইয়ার্কি করে এই গাঢ় মেঘ কাটানো যাবে না। চিরুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া চমৎকার তবু মাঝে মাঝে চিরুর একরকম গভীর অভিমান হয়। খুব সামান্য কারণেই হয়। সহজে ভাঙে না।

আবার যখন 'চিরু' বলে ডাকল মণীশ তখন তার গলার স্বর পালটে গেছে।

চিরু তবু তাকায় না। গোঁজ হয়ে স্টোভের দিকে চেয়ে থাকে।

মণীশ অত্যন্ত ঘন হয়ে ওঠা গভীর মৃদু স্বরে বলে, যা তোমাকে কখনও বলতে ইচ্ছে করে না আজ তার কয়েকটা কথা বলব?

চিরুর মনোভাব বোঝা গেল না। কিন্তু সে জবাবও দিল না।

মণীশ মৃদু স্বরেই বলল, এত বয়স পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। না একটা বাড়িঘর, না স্থায়ী নিরাপত্তার কিছু, না কোনও শখ-শৌখিনতার জিনিস। আশেপাশে সব বাড়িতেই যা যা আছে, তার কিছুই আমার নেই।

চিরু এবার বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলে, এসব কথা উঠছে কেন?

উঠছে তোমার জন্য নয়। আমি আজকাল নিজেই ভেবে দেখি, অনেস্ট থাকার চেষ্টা করে আমি পাঁঠার মতো কাজ করলাম কি না। আমি আজ মরে গেলে কাল যে তোমাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না।

চুপ করো।

মণীশ একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, এ রাগ বা অভিমান থেকে বলছি না চিরু। যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারি না, এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা টেনে চলাই উচিত ছিল কি না।

চিরু নরম হয়েছে। জলচৌকিতে বসে মণীশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তাবপর বলল, তুমি অনেস্ট বলে আমি কখনও কিছু বলেছি? না চেয়েছি?

চাওনি। বলোনি। তবু মনে মনে তো মানুষের কত প্রত্যাশা থাকে। তেমন বেশি প্রত্যাশাও নয়। একটু জমি, ছোট বাড়ি, কিছু টাকা, কয়েকটা শৌখিন জিনিস।

চিরু অন্যমনস্ক হয়ে মৃদু স্বরে বলল, মাঝে মাঝে এসব নিয়েও ভাবি, কিন্তু তোমার ওপর রাগ করি না তাই বলে। এই যে কণা এসেছিল, আমার বাড়িঘর দেখেটেখে আজ বলল, তোর বর কাস্টমসের অফিসার, অথচ তোর ঘরে একটাও ফরেন জিনিস নেই। ভারী আশ্চর্য। একটা রেডিয়ো না, টেপ রেকর্ডার না, বিদেশি শাড়ি, সেন্ট ঘড়ি কিচ্ছু না। অথচ পাবলিক কত ফরেন জিনিস কিনছে চারদিকে!

শুনে তোমার মন কীরকম হল?

একটু খারাপ লাগল। কথাটা তো মিথ্যে নয়।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, মিথ্যে নয়। তাই ভাবি, অপদার্থতার আর এক নামই সততা কি না।

তা কেন হবে? তবে মদনও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, জামাইবাবুর সততা আর শুচিবাইতে তফাত নেই। সৎ কেন থাকবে না? তা বলে ভাঙা কাপ জোড়া লাগানোর মতো গরিবও তুমি নও।

মণীশ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে হাসল, ও, ওই ব্যাপারটায় তুমি এত রেগে আছ?

চিরু ছলছলে চোখ করে বলে, তোমাকে ওসব উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলে আমার এমন কষ্ট হয়!

আরে দূর! কাপটা না হয় এক্ষুনি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।

কাপটা তো বড় কথা নয়। মনটাকে ছুড়ে ফেলতে পারবে কি?

মণীশ মলিন একটু হাসল। বলল, উঁচু দরের সাহিত্যের ডায়ালগ দিলে মিস্টার।

ইয়ার্কি কোরো না। আমি তোমাকে জব্দ করার জন্য কথাটা বলিনি। আজ আমার মনটা খারাপ।

বুঝেছি চিরু। মনটা আমারও ভাল নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, সংসার আমার কাছে আরও কিছু চেয়েছিল। মুখ ফুটে চায়নি ঠিকই কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সংসার যা চাইছে তা হয়তো আমার দেওয়াও উচিত। কিন্তু একটা ভ্রান্ত উচিত-অনুচিত সৎ-অসতের বোধ সব গোলমাল করে দেয়। বুঝি এর কোনও দাম নেই...

চিরুর আঁচল-চাপা অবরুদ্ধ কান্নার শব্দে থামে মণীশ। গলার কাছে তারও একটা কান্নার দলা ঠেকে আছে বহুদিন। কিন্তু সে তো পুরুষমানুষ! তাই কাঁদল না। একটু হাসল মাত্র। কিন্তু ঠিক করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন দেখাল তার মুখশ্রী।

রান্নাঘরে চৌকাঠে দুই হাত রেখে সে ঝুঁকে পড়ল ভিতরে। চাপা গলায় বলল, বাচ্চারা শুনতে পাবে। কেঁদো না। কান্নার মতো কিছু তো হয়নি।

চিরু কান্না আর আক্রোশে চাপা গলায় ফেটে পড়ল, কথায় কথায় তুমি আজকাল মরার কথা বলো কেন?

বলি আর কিছু করার নেই বলে চিরু। সৎ থাকার চেষ্টা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরের পয়সায় একটা পান খেতে গেলেও দু'বার ভেবে দেখি, এর মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না। অথচ এই নিরন্তর সৎ থেকে থেকেও আজকাল কেমন সততার মধ্যে কোনও শক্তি পাই না।

তোমাকে কেউ অসৎ হতে বলেছে?

মণীশ মাথা নাড়ে, বলেনি, অন্তত তুমি কোনওদিন বলোনি। সে কথা নয়। আমি বলছিলাম সততা, সচ্চরিত্র এগুলোই তো মানুষের শক্তির উৎস। তবু আজকাল আমি সততা থেকে কোনও জোর পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করেছি। সৎ বলে সারাজীবন মানুষের ঠাট্টা বিদ্রুপ তো কম সহ্য করিনি। আগে গায়ে লাগত না। আজকাল লাগে।

সৎ থেকেও কেউ ভাল নেই?

আছে নিশ্চয়ই। কে খুঁজে দেখেছে বলো? আমার প্রশ্ন তাও নয়। আমি আজকাল সততা জিনিসটা কতদূর প্রয়োজন তাই নিয়ে ভাবি।

ইচ্ছে করলে মদন তোমাকে অনেক কিছু করে দিতে পারে। ওর অনেক ক্ষমতা। তোমাকে সততা বিসর্জন দিতে হবে না।

জানি চিরু। একজন এম পি যে অনেক কিছু পারে তা না বুঝবার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। ভেবে দেখো, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ও একটুখানি ছেলে। আমাদের বিয়ের পর ওর পইতে হল। সেই শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে পইতেয় ওকে গায়ত্রীমন্ত্র দিয়েছিলাম আমি। বলতে কী আমিই ওর আচার্য। এখন ও হয়তো গলায় পইতেই রাখে না, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ভুলি কী করে? সেই মদন এখন এম পি, হাজারজনা এসে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে, সবই জানি। কিন্তু উমেদারদের দলে নিজের নামটা লেখাতে রুচিতে বাধে।

চিরুর কান্না থেমেছে। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

তারপর বলল, আমি তোমাকে আর কখনও কিছু বলব না। বাইরের ঘরে সোফার নীচে বাসন্তী ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে দাও তো। একটু পোস্ত বেটে দেবে।

মণীশ নড়ল না। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আজ তোমার অভিমান ভাঙিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না চিরু। বিবাহিত জীবনের এই প্রথম ফেইলিওর। আমাদের চোখের সামনে মদন এক মস্ত প্রলোভনের মতো। কেবলই মনে হয়, হাতের মুঠোয় একজন ক্ষমতাবান এম পি, ইচ্ছে করলেই কত কাজ আদায় করে নিতে পারি। মনে হয় না চিরু?

চিরু জবাব দিল না। হাতায় করে ভাত তুলে টিপে দেখল।

মণীশ বাইরের ঘরে এসে বাসন্তীকে ঠেলে তুলে দেয়।

জোড়া-দেওয়া কাপটা এখনও তার হাতে। বাতিটা নিভিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে সোফায়। পোষা বেড়ালের গায়ে লোকে যেমন হাত বোলায় তেমনি আদর করে সে কাপটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। একেবারে আস্ত কাপের মতো জোড়া মিলে গেছে। তবু ঠাহর করে আঙুল বোলালে জোড়ের জায়গাটা বোঝা যায়। খুব ঠাহর করলে, নইলে না।

সাবধানে মণীশ কাপটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

অন্ধকারে বসে মণীশ ভাবল, আজ রাতে যদি আমি মরে যাই তা হলে কি সংসার ভেসে যাবে? আমার বাচ্চারা কোনওদিন দাঁড়াবে না? পরের দয়ায় বাঁচতে হবে সবাইকে? যদি তাই হয় তা হলেই বা কী করতে পারে মণীশ? চিরু বা বাচ্চারা তারই বউবাচ্চা বটে, কিন্তু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন। তারপর এই প্রকৃতি, এই দেশ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এই সমাজ থাকবে। কী হবে তা মণীশ জানে না, কী হবে তা স্থির করার মালিক সে তো নয়। তবে সে এটুকু বোঝে পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়। তাকে ছাড়াও চলবে হয়তো, কিন্তু চলবে। কোনও শূন্যস্থান অপূরণ থাকে না।

মণীশ জানে, মদন হচ্ছে তার হাতের নাগালে এক আশ্চর্য প্রদীপ, যাতে ঘষা মারলেই এক বিশাল দেনেওয়ালা দৈত্য এসে হাজির হবে। কোনওদিনই প্রদীপটাকে ঘষবে না মণীশ। কিন্তু সংসার চাইছে, সে প্রদীপটাকে ঘষুক। একটু ঘষুক।

মণীশ অন্ধকার ঘরে বসে ভাবল, আজ রাতে যদি মরে যাই?

ভেবে একা একা একটু হাসল মণীশ। সেই করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন এক হাসি। আজ রাতে তার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

॥ ১৭ ॥

মাধব দরজা খুলতেই মদন প্রথম প্রশ্ন করল, ঝিনুক ফিরেছে?

মাধব আধো-মাতাল গলায় বলল, আয়, আয়। ঝিনুক? না, ঝিনুক ফিরবে না। ঝিনুক কেন ফিরবে বল তো?

মাধব ঘরে ঢুকে দেখে, সেন্টার টেবিলের ওপর একটা বোতল খালি পড়ে আছে, আর একটার সিকিভাগও উড়ে গেছে।

বোস। খা।— বলে মাধব একটা গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে বরফের বার থেকে চিমটে দিয়ে তুলে বরফ মেশাল। বলল, দেখ, কী সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছিল ঝিনুক। কত খুঁজে খুঁজে সব জিনিস কিনেছে, কত যত্নে সাজায়, ধোয় মোছে। কিন্তু তবু ঘর ভেঙে দেওয়া কী সোজা দেখলি? এক মিনিটও লাগে না।

মদন গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে 'আঃ' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,

ঘর ভাঙা যে কত সোজা সে কি তুই আমাকে শেখাবি রে মাধব? আমার চেয়ে ভাল তা আর কে জানে? আজ আমি পার্টিতে রেজিগনেশন দিয়েছি, জানিস?

দিলি? অ্যাঁ!

দিলাম! কেন দিতে হল জানিস? আমার খুব খিদে পেয়েছিল বলে। বাচ্চা ছেলেরা ঘেরাও করেছিল, বেরোতে পারছিলাম না। ওরা বললে, রেজিগনেশন লেটারে সই করলে বেরোতে দেবে। আমি তাই দিয়ে দিলাম। অথচ এই পার্টির সঙ্গে কতকাল আছি! শূন্য গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মদন বলে, দে।

অত তাড়াতাড়ি খাস না। হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক।

সো আর অল ড্রিংকস। কিন্তু অত সব প্রোটোকল মানার মেজাজ নেই রে। দে।

আগের বারের বরফের টুকরোগুলো গলবার সময় পায়নি মদনের গ্লাসে। তার ওপরেই আবার হুইস্কি ঢেলে দিল মাধব। মদন উঁকি মেরে দেখল, সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে আরও দুটো বোতল বরফের ট্রেতে শোয়ানো। দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বলে, তুই তো বলেছিলি, ছোট করে হবে। কিন্তু এ যে দেখছি, পুরো শুঁড়িখানা খুলে বসেছিস।

ছোট করেই কথা ছিল। কিন্তু কথা কি রাখা যায়. বল? কথা কি ছিল, এই বয়সে আমাকে একা ফেলে ঝিনি চলে যাবে? বল, দুনিয়ায় কোনও কথা থাকে?

মদন হাত বাড়িয়ে বলে, চিঠিটা দে।

মাধব একটু পিছন দিকে হেলে সভয়ে বলে, কীসের চিঠি?

কেন, ঝিনুক কোনও চিঠি লিখে রেখে যায়নি?

না তো? চিঠি লিখবে কেন? অ্যাঁ! চিঠি লেখার কোনও মানে হয়?

চিঠি লিখে রেখে যায়নি তো কী করে বুঝলি যে, ও পালিয়েছে?

বোঝা যায়। দেখছিস না, ঘরদোর কেমন খাঁ খাঁ করছে। অবশ্য তুই ঠিক বুঝবি না। ঝিনির সঙ্গে থাকলে বুঝতিস। আমি তো ঘরে পা দিয়েই—

তোদের ঝি-টাকে ডাক।

ঝি? তাকে কেন?

ডাক না।

ওঃ, জ্বালালি। পুনম। এই পুনম।

পুনম দৌড়ে আসে, মামাবাবু, ডাকছ?

মদন জিজ্ঞেস করে, ঝিনুক কখন বেরিয়েছে?

চারটে-পাঁচটা হবে। তখনও রোদ ছিল।

কোথায় গেছে বলে যায়নি?

জি। বোনের বাড়ি। কাছেই।

সঙ্গে কেউ ছিল?

ওই এক মামাবাবু এসেছিল, কী যেন শক্ত নামটা—

বৈশম্পায়ন?

জি। আর একটা নতুন কাজের মেয়েও ছিল।

কেন?

বোনের বাড়ি মেয়েটাকে দেওয়ার কথা।

আচ্ছা, তুমি যাও। — বলে মদন মাধবের দিকে চেয়ে বলে, একটি লাথি কষাব তোমাকে শালা।

মাধব মাথা নাড়ে, তুই বুঝবি না। ঝি, বোনের বাড়ি, সব ঠিক। কিন্তু তবে বাড়িটা এত খাঁ খাঁ করছে কেন? তুই টের পাচ্ছিস না?

খাঁ খাঁ নয়। বাড়িটা তোকে বলছে, খা খা আরও হুইস্কি খা।

দূর! এ বাড়ির একটা অদ্ভুত বাতাবরণ আছে! যাকে বলে অ্যাটমোসফিয়ার। আজ সেটা অ্যাবসেন্ট। ভীষণরকম ভাবে অ্যাবসেন্ট। আমি অনেক চেষ্টা করলাম খুঁজতে। অ্যাটমোসফিয়ারটা কিছুতেই রেসপন্ড করছে না। ইট ইজ নট হিয়ার।

মদন গ্লাস নামিয়ে বলল, দে।

এবারও তার প্রথমবারের বরফ গলার সময় পায়নি। মাধব চোখ বড় বড় করে বলে, এরকম টানতে কোথায় শিখলে গুরু? আচ্ছা খা। আজ তোরও দুঃখের দিন। আজ থেকে তুইও তো আর এম পি নোস। শুধু মদনা।

চোখ ছোট করে চেয়ে মদন বলে, আমি মদনা সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি আর এম পি নই এ কথা তোকে কে বলল?

কেন, এই যে বললি রেজিগনেশন দিয়েছিস?

রেজিগনেশন দিয়েছি পার্টি থেকে, কিন্তু তাতে আমার পার্লামেন্টের মেম্বারশিপ যায় না। আই অ্যাম স্টিল ভেরি মাচ অ্যান এম পি।

মাধব খুব অবাক হয়ে বলে, ইউ আর স্টিল অ্যান এম পি? বাঃ বাঃ। হোঃ হোঃ, আফটার ইভন রেজিগনেশন ইউ স্টিল রিমেন এম পি! বাহবা।

দূর গাড়ল! সংবিধানে আটকায় না।

মাধব উচ্চ স্বরে বলে, আলবত আটকায়। আলবত আটকায়। নিশ্চয় আটকায়।

কোথায় আটকায়?

মাধব মিইয়ে গিয়ে বলে, কোথাও নিশ্চয়ই আটকায়। কিন্তু এক্ষুনি সেটা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আফটার অল আমার বউ পালিয়ে গেছে, এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

কোথাও আটকায় না। আই অ্যাম স্টিল অ্যান এম পি।

মাধব চোখ বুজে মাথা নাড়ে। বলে, তুই এখনও এম পি কী করে? তা হলে এ ম্যান ক্যান বি ভেরি মাচ অ্যালাইভ আফটার হিজ ডেথ! অ্যাঁ। এ ডেড ম্যান মে বি কলড অ্যান অ্যালাইভ ম্যান! না কি লজিকটা হচ্ছে না?

তীক্ষ্ণ কূট চোখে চেয়ে ছিল মদন। বলল, দেয়ার ইজ সাম ট্রুথ ইন ইট।

তার মানে?

মরার পরও কেউ কেউ বেঁচে থাকে। দে।

মাধব বোতলটা তুলে দেখে বলে, ফিনিশ? অ্যাঁ। তুই অত ধড়াধ্বড় খাস না। আর একটা খুলছি, এবার সোডা মিশিয়ে খা।

মদন গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

মাধব নতুন বোতল খুলে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলে, কী বলছিলি? মড়া না জ্যান্ত, কী যেন!

বলছিলাম কেউ কেউ মরেও বেঁচে থাকে।

মাধব হঠাৎ সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, যাঃ মাইরি। এমনিতেই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। তার ওপর ঝিনি নেই!

মদন এবার সত্যিই খুব আস্তে খায়। ছোট করে একটিমাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর বলে, তোর এত ভয় কবে থেকে মাধব? আর কীসেরই বা ভয়!

ভূত। মেলা ভূত চারদিকে।

কার ভূত রে মাধব?

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফার পিছন দিকে মাথা রেখে পড়ে থাকে। চোখ বোজা, আস্তে আস্তে কখন, কীভাবে তার চোখের কোল ভরে যায় জলে। ঠোঁট একটু কাঁপে। একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সে।

মাধব!

উঁ।

এটা তো শোকসভা নয় রে। কিছু বল। নইলে জমছে না।

মাধব বিড়বিড় করে বলে, তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি মানুষের লাশে...

দূর শালা মাতাল!

মদনা, একটা কথা বলবি? লিডার হতে গিয়ে তোকে মোট ক'টা খুন করাতে হয়েছে?

এবার সত্যি লাথি খাবি। যা বাথরুমে গিয়ে পেচ্ছাপ করে ঘাড়ে মুখে ঠান্ডা জল দিয়ে আয়।

মাধব বেকুবের মতো অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, শোওয়ার ঘর থেকে নীলুর ছবিটা আমি সরিয়ে দিয়েছি।

মদন কিছু বলে না। কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখে চেয়ে থাকে।

মাধব রুমালে চোখ মুছে বলে, আফটার অল বাড়ির চাকরের ছবি শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।

মদন গ্লাস তুলে ছোট চুমুক দেয়। চেয়ে থাকে স্থিরভাবে।

মাধব বলে, ঠিক করিনি? বল! আফটার অল হি ওয়াজ এ ডোমেস্টিক সারভেন্ট! বাসন মাজত, ঘর ঝ্যাটাত, আমাদের পাত কুড়িয়ে খেত, আমাদের পুরনো জামা-কাপড় পরে বড় হয়েছিল। ঠিক করিনি ছবিটা সরিয়ে দিয়ে? চুপ করে আছিস কেন?

শুনছি। বলে যা।

নীলু যত যাই হোক, ছিল আসলে চাকর। এইটুকু—

মাধব হাত দিয়ে একটা মাপ দেখিয়ে বলে, এইটুকু থাকতে এসেছিল। শীতকালে কুঁকড়ে শুয়ে থাকত পাপোশে। একদম পোষা কুকুরের মতো। এঁটোকাঁটা খেত। হি ওয়াজ এ সারভেন্ট! সারভেন্ট!

চেঁচাচ্ছিস কেন?

চেঁচাচ্ছিস নাকি? ও!— বলে মাধব চোখ বোজে। আবার চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। ঠোঁট নড়ে। তারপর বলে, চাকরের আস্পদ্দা! অ্যাঁ, চাকরের এত বড় আস্পদ্দা!

গ্লাস নামিয়ে রেখে মদন তেতো মুখে বিরক্তির সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া হুস করে ছাড়ে। কিছু বলে না।

মাধব চোখ বুজেই বলে, আস্পদ্দা নয়! তুই-ই বল! হি ওয়াজ ক্লাইমবিং আপ দি ট্রি অফ সাকসেস লাইক এ মাংকি। যেটায় হাত দেয় সেটাতেই ব্রিলিয়ান্ট। পাড়ার এঁদো স্কুল থেকে কেমন ফার্স্ট ডিভিশন পেল। মাইরি, ভগবান কেন এত ছপ্পড় ফুঁড়ে দিল ওকে বল তো! ভরাট গলায় যখন রবীন্দ্রসংগীত গাইত ঠিক মনে হত হেমন্ত। আর কী সাহস! কী ইন্টিগ্রিটি! মদনা, কথা বলছিস না কেন? আমি কিছু ভুল বলছি?

মদন গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে বলল, আর একটা কথা এখনও বলিসনি।

কী বল তো!

নীলু ছিল ঝিনুকের প্রেমিক। ভুলে গেছিস?

হাঃ হাঃ, তাই ভুলি রে পাগল?

তোর বউ বড্ড অন্যের প্রেমে পড়ে যায়।

হাঃ হাঃ। যা বলেছিস! ঝিনি ভীষণ প্রেমে পড়তে ভালবাসে। ভীষণ। তবে—

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মাধব বলে, ঝিনি কখনও তোর প্রেমে পড়ল না কেন বল তো! ইউ ওয়্যার দি মোস্ট এলিজিবল পসিবল লাভার। কিন্তু তোর প্রেমে পড়ল না কেন! অ্যাঁ!

ঝিনুক তো তোর প্রেমেও কখনও পড়েনি!

হাঃ হাঃ! দি জোক অফ দি ইয়ার। কিন্তু কথা হল— কী বলছিলাম বল তো! হ্যাঁ, একটা চাকরের কথা। অজ্ঞাতকুলশীল। নিজের পদবিটা পর্যন্ত ছিল না, আমাদের পদবি ধার নিয়ে তবে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পেরেছিল।

মদন গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বলে, আজ তোকে নীলুতে পেয়েছে কেন বল তো!

মাধব আবার চোখ বোজে। তার অসাধারণ সুন্দর মুখশ্রী বার বার বিকৃত হয়ে যায় এক অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায়। চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। বলে, আজ নয়। সেই কবে থেকে নীলু আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শোওয়ার ঘরে নীলুর ছবিটা টাঙিয়েছিল ঝিনি। আমি কতবার বলেছি ওটা সরিয়ে দিতে। দেয়নি। মাধব একবার চোখ চেয়ে চারদিক দেখে নেয়, তারপর আবার চোখ বুজে বলে, রাত্রিবেলায়, বুঝলি, রাত্রিবেলায় রোজ নীলু ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে আসে। বুঝলি। দ্যাট সারভেন্ট কামস আউট! বাট হি ডাজনট বিহেভ লাইক এ সারভেন্ট! হাঃ হি বিহেভস লাইক এ-এ...

মদন ধীর ও দীর্ঘ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে নিজেই বোতল থেকে ঢেলে নেয়।

মাধবের বোজা চোখ থেকে অবিরল জল ঝরছে। মাঝে মাঝে বিকট হেঁচকি তুলছে সে। ক্লান্ত মাথা সোফার কানায় রেখে দুর্দান্ত একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কিন্তু চাকরটার আস্পদ্দা আমি বহুবার রেজিস্ট করার চেষ্টা করেছি। আমার দোষ ছিল না। আই ট্রায়েড মাই বেস্ট। ও যখন কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তখন একবার আমি ওকে দিয়ে আমার তিন জোড়া জুতো পালিশ করিয়েছি, আন্ডারওয়্যার কাচিয়েছি, ইভন একদিন-দু'দিন বাসন পর্যন্ত মেজে দিতে বাধ্য করেছি। আমি ওকে ভুলতে দিতাম না যে, আফটার অল ও চাকর, অজ্ঞাতকুলশীল অ্যান্ড এ ননএনটিটি।

কিন্তু পারিসনি।

মাধব মাথা নাড়ল, না। ও তো সব হাসিমুখেই মেনে নিত। কোনও ফলস ভ্যানিটি ছিল না। একদিন ও আমাকে বলেছিল, তোমাদের বাড়িতে চাকর খেটে আমার একটা উপকার হয়েছে কি জানো? আমার অহং বোধটা বাড়তে পারেনি। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল কমপ্লেক্স, চাকর খেটে আমার সেই কমপ্লেক্সগুলো কেটে গেছে।

মদনের একটুও নেশা হচ্ছে না। একটা তীক্ষ্ণধার অনুভূতি তাকে টান টান সচেতন রাখছে, নেশা ধরতে দিচ্ছে না। তবু হুইস্কির প্রতিক্রিয়া তো আছেই। তার সমস্ত শরীর অসহ্য গরম হয়ে উঠছে। জ্বালা করছে কান, নাক, চোখ, মুখ। সে উঠে পাখাটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে আসে।

মাধব তার হাতের সোডা মেশানো হুইস্কির গ্লাসে অনেকক্ষণ চুমুক দেয়নি। একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, অ্যান্ড দাস হি বিকেম ডেনজারাস। এক্সট্রিমলি ডেনজারাস ফর এনিবডিজ কমফোরট। ব্রিলিয়ান্ট বলে নয়, ব্রিলিয়ান্ট তো কত আছে।

তা হলে কেন?— মদন অনেকক্ষণ বাদে কথা বলল।

মাধব তাকায়। চোখ ঘোর লাল। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। বলে, রাতে মাঝে মাঝে ফোটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে এসে নীলু সেই কথাটাই বলে। তোমরা আমাকে ভয় পেতে কেন জানো? আমার কোনও কমপ্লেক্স ছিল না বলে, অহং ছিল না বলে। তোমরা বুঝতে পেরেছিলে, আমি সহজেই মানুষকে জয় করতে পারি। বলে, তোমার বউকেও আমি কত সহজে জয় করে নিয়েছিলাম দেখোনি! অথচ তোমার চেহারা কার্তিক ঠাকুরের মতো, আমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর তুমি। তবু তোমার বউ কেন নীলুতে মজল? কেন হদ্দমদ্দ মেয়েপুরুষ বালবাচ্চা সবাই নীলুতে মজত? অ্যান্ড দাস নীলু ওয়াজ ইন দি মেকিং অফ এ লিডার। নীলু ওয়াজ এ ন্যাচারাল লিডার।

মদন মৃদু একটু হাসল। তারপর পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিয়ে খোলা বুকে ফুঁ দিতে লাগল জোরে জোরে।

দু'চোখে অঝোর জলের ধারার ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল মাধব। হাতের গ্লাসটা এতক্ষণে শেষ করে ঠক করে নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। তারপর চাপা তীব্র গলায় বলল, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন নীলু হ্যাড টু ডাই।

ঘরের থম ধরা বাতাসকে সামান্য শিউরে দিয়ে এই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল, টুং টাং টুং টাং টুং টাং...

খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থেকে শব্দটা শোনে মাধব। তারপর অতি কষ্টে ওঠে। দরজা খোলার আগে সেফটি চেনটা আটকে নেয়। স্পাই হোল-এ চোখ রেখে দেখে জয়।

খুবই বিরক্ত হয় মাধব। দরজাটা ফাঁক করে বলে, কী চাই?

মাধবদা, আমি জয়দ্রথ।

জানি। কী চাই?

মদনা আছে?

আছে। কেন বলো তো? আমরা একটু বিজি আছি!

ভীষণ দরকার মাধবদা। কোশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আমাকে একটু ভিতরে আসতে দিন।

মাধব লক্ষ করে জয়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা।

মাধব চেনটা খুলে দিতেই দরজাটা হাট করে খুলে জয় চৌকাঠে দাঁড়ায়। উদ্‌ভ্রান্ত, ভয়ার্ত।

কী হয়েছে?— মাধব জিজ্ঞেস করে।

জয় শুধু বিড়বিড় করে বলে, মাধবদা! মাধবদা!

পিছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে জয় ছিটকে আসে ঘরের মধ্যে। দরজার চৌকাঠে নিঃশব্দে একটা লোক এসে দাঁড়ায়।

মাধব প্রথমটায় হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ তার অনিয়ন্ত্রিত স্বরযন্ত্র থেকে দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরোয়, ই— ই-ই-ই—

॥ ১৮ ॥

আমি সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করব। সারাদিন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকব। সঙ্গে কাউকে রাখব না। সারাদিন ঢেউ আর ঢেউ, আর ওই আকাশ পর্যন্ত জল। বিশাল, বিপুল। মানুষ এত ছোট, এত অসম্পূর্ণ যে আমার আর কিছুতেই সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না।

তোমার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর ঝিনুক! কী নিশ্চিন্ত তোমার জীবন! তবু ভাল লাগে না?

আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। আমার জীবনে একবিন্দু সুখ নেই। আমার ভালবাসার কেউ নেই যে! ঘড়িটা দেখুন তো, আমারটা বোধহয় বন্ধ হয়ে আছে!

সোয়া ন'টা, ঝিনুক।

ইস, রাত হয়ে গেছে। এবার চলুন।

তোমাকে আজ কথাটা বলা হল না।

ঝিনুক ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বলে, কথাটা বললেই যদি ফুরিয়ে যায় তবে থাক না। আমিও আছি, আপনিও রইলেন।

বৈশম্পায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্রিজের ওপর পাশাপাশি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও ঝিনুক যতটা দূরে ছিল ততটাই দূরে রয়ে গেল।

শোনো ঝিনুক। আমার মনে হয়, কোনও পুরুষকেই তুমি কখনও ভালবাসোনি।

ঝিনুক আচমকা এই কথায় একটু থমকে দাঁড়ায়। ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, এতক্ষণ ধরে স্টাডি করে এই বুঝি মনে হল?

ঠিক বলিনি?

পুরুষরা যে কেন এত ভালবাসা-ভালবাসা করে মরে!— বলে ঝিনুক একটা কপট শ্বাস ছাড়ে। পুরুষ বলতেই তার মনে পড়ে পোড়-খাওয়া শক্তসমর্থ লড়িয়ে একজন মানুষকে। খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট তার পরনে। গম্ভীর, শান্ত, মুখে অনেক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা গভীর হলকর্ষণের দাগ রেখে গেছে। আজও তার বাবাকে কোনও পুরুষই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। জীবনে আর একজন দুঃখী ও লড়িয়ে মানুষকে দেখেছিল ঝিনুক। নীলু। তারও মুখে ছিল ওই নির্বিকার লড়াইয়ের ছাপ। সুখ চায়নি, দুঃখেও নারাজ ছিল না, যে কখনও ভালবাসা-ভালবাসা করে মরেনি।

কিন্তু বৈশম্পায়ন তাকে কিছু বলতে চায়। সে কি ভালবাসার কথা? ঝিনুককে ভালবাসার কথা যে অনেকেই বলেছে! আসলে ভালবাসেনি কেউ। বৈশম্পায়ন কথাটা বলে ফেললে আর ওকে ভাল লাগবে না ঝিনুকের। তাই সে গোলপার্ক ছাড়িয়ে কেয়াতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাড়িতে গিয়ে এখন কী দেখব বলুন তো! দুই মাতাল ব্যোম হয়ে বসে আছে। মানুষ যে কেন মদ খায়!

বৈশম্পায়ন জ্বলে যাচ্ছে। জীবনে সময় বেশি নয়। মাঝে মাঝে মৃত্যুনদীর গান এসে লাগে এরিয়েলে। ঝিনুকের ফটোগ্রাফ পুরনো হয়ে এল। সময়ের ঢেউ এসে একদিন ঝিনুকের ওই সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে যাবে। সময় নেই। একদম সময় নেই।

এইখানে অভিজাত কেয়াতলার জনবিরল রাস্তা। অনেক কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার ঝুপসি ছায়া। কিছু মনোরম অন্ধকার। এইখানে একবার দুঃসাহসী হতে ইচ্ছে হল বৈশম্পায়নের। দু'পা আগে হাঁটছে ঝিনুক। সেই অসহনীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কেন মাতলা ওই সুগন্ধ মাখো তবে? কেন সাজো? কেন 'তুমি' বলে ডাকতে বললে? কেন? জ্বলন্ত বৈশম্পায়ন জ্বরগ্রস্তের মতো আচমকা হাত বাড়াল। পরমুহূর্তে সুগন্ধী, নরম ও অসহনীয় সুন্দর ঝিনুককে টেনে আনল বুকের মধ্যে।

ঝুপসি ছায়ার নীচে, বহু দূরের অস্পষ্ট ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝিনুকের অবাক দু'খানা চোখের দিকে মাত্র একপলক চেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। তারপরই কাণ্ডজ্ঞানহীন তার ঠোঁট নেমে যেতে থাকে ঝিনুকের ঠোঁটের দিকে।

কিন্তু কোটি কোটি মাইলের সেই দূরত্ব কী করে পেরোবে বৈশম্পায়ন? ঝিনুক বাধা দেয়নি, চেঁচায়নি, শুধু চেয়ে ছিল। কিন্তু সেই অবাক চোখের ভিতর থেকে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে মহাসমুদ্র। বৈশম্পায়ন দেখে, করাল বিশাল আদিগন্ত এক সমুদ্রের পাকানো ঢেউ গড়িয়ে আসছে চরাচর গ্রাস করতে। বিপুল গর্জনে ফিরে যাচ্ছে আবার। ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে, নেমে যাচ্ছে পাতালে।

কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। সে সেই দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা আর করে না।

ফিস ফিস করে বৈশম্পায়ন বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

ঝিনুক খুব আস্তে, প্রায় বিনা আয়াসে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, চলুন। খাবার ঠান্ডা হচ্ছে।

আবার দু'পা এগিয়ে ঝিনুক। দু'পা পিছনে বৈশম্পায়ন। আলোছায়াময় এক অপরূপ নির্জনতা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। দু'জনেই চুপচাপ। বৈশম্পায়ন কোনওদিনই আর সেই ফটো তোলার কথা বলতে পারবে না ঝিনুককে। ঝিনুক কোনওদিনই আর পারবে না বৈশম্পায়নকে মনে করিয়ে দিতে।

ঠিক সময়ে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পেরেছিল মদন। এক পাটা কাঠের মজবুত দরজা, পেতলের হুড়কো। সহজে ভাঙবে না।

অসহ্য গরমে ভেপে আছে বাথরুম। অসহ্য গরমে ভেপে ঘেমে গলে যাচ্ছে মদন। নেশা হয়নি, কিন্তু তা বলে হুইস্কি তার কাজ করতেও ছাড়ে না তো।

বেসিনে উপুড় হয়ে গলায় আঙুল দিল মদন। হড় হড় করে টাটকা হুইস্কির স্রোত নেমে গেল নল বেয়ে। মদন শাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে তলায় দাঁড়ায়। বুলেটের মতো এক ঝাঁক ঠান্ডা জল নেমে আসে। সম্পূর্ণ পোশাক পরা অবস্থায় মদন দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তীব্র তীক্ষ্ণ জলকণার নির্দয় আক্রমণ সে সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে থাকে।

দেয়ালে মস্ত একটা চওড়া আয়না মুখোমুখি। সেটার গায়ে অজস্র জলের ছিটে গিয়ে লেগে আছে। তবু অস্পষ্ট নিজের প্রতিবিম্ব তাতে দেখতে পাচ্ছে মদন। খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। লোকসভার এক মাননীয় সদস্য শাওয়ারের তলায় জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তার মুখটা হাঁ হয়ে আছে। কয়েকবারই চেষ্টা করে দেখল মদন, হাঁ মুখটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না। যতবার বন্ধ করে ততবার দুর্বল চোয়ালের খিল আলগা হয়ে মুখ হাঁ হয়ে যায়।

বসবার ঘরে চোয়াল নিয়ে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে মাধবেরও। তবে সে যে হাঁ করে আছে তা সে বুঝতে পারছিল না। তাই সে হাঁ মুখ বন্ধ করার কোনও চেষ্টাও করেনি।

দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্বাসঘাতক জয় দাঁড়িয়ে। সন্দেহ নেই, ওরা বিশ্বাসঘাতকের বংশ। এক ভাই তার বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর এক ভাই ডেকে এনেছে তার নিয়তিকে।

নব পাপোশে তার চপ্পলজোড়া মুছে আসেনি। ধুলোটে চপ্পলের ছাপ পড়ল কার্পেটে। নব সোফার হাতলে একটা চপ্পলসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বলল, মাল খাচ্ছ?

বলে নব হাত বাড়িয়ে একটা খালি বোতল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, বাঃ! ফরেন জিনিস! বোতল কত করে নেয় বলো তো আজকাল।

মাধব হাতের পিঠ দিয়ে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল, তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। নবর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সে একটু কমিয়ে বলল, আশি টাকা।

নব অবশ্য মদের দাম জানতে আসেনি। বোতলটা আবার জায়গামতো রেখে সে বলল, আমাকে দেখে ওরকম চেঁচালে কেন বলো তো মাধবদা! ভয় খেয়েছিলে? আমাকে তোমার ভয় কেন বলো তো? কোনওদিন তো তোমার সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি ছিল না।

তোর সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি নেই নব।

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নব একটু হাসল, আগে ছিল না মাধবদা। কিন্তু এখন আছে।

তোর সঙ্গে খাড়াখাড়ি! অ্যাঁ!— খুব হাসবার চেষ্টা করে মাধব।— তোর সঙ্গে কীসের খাড়াখাড়ি রে? কী যে বলিস!

মদনদা কোথায় বলো তো। লুকিয়েছে?

মদন, ওঃ, তুই মদনকে খুঁজছিস? মদন চলে গেছে ক-খ-ন।

মদনদার পাখা নেই মাধবদা। আর তোমার ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর দুসরা দরজাও নেই।

তা হলে কোথায়? বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখ।

খুঁজতে হবে না।— বলে নব সোফা থেকে পা নামায় এবং মাধব সোফার হাতলে ওর চটির ছাপ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে। ঝিনুক থাকলে সোফায় দাগ দেখে এমন চেঁচাত।

নব সোফায় বসে বলল, আজ সারাদিন আরাম করে কোথাও বসিনি, জানো?

বোস, বোস, ভাল করে বোস। একটু হুইস্কি খাবি?

নব একটু হাসল, জেলখানায় আমাকে কী খাওয়াত জানো?

মাধব ঢোক গিলল।

নব ক্রূর চোখে চেয়ে বলল, মাজাকি রাখো।

তোর সঙ্গে মাজাকি কী রে? তুই আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু।

কে তোমার ভাইয়ের বন্ধু?

কেন, তুই। তুই নীলুর বন্ধু না?

তুমি সিধে কথার লোক নও মাধবদা। নীলু তোমার ভাই ছিল? না চাকর?

কী যে বলিস! সেই কবে ছেলেবেলায় ঘরের কাজ করত। কিন্তু আমরা ওকে কখনও চাকরের মতো ট্রিট করেছি, বল?

ফালতু বাত ছাড়ো মাধবদা। একটা সিধে কথা বলবে? আরও তো মেলা লোক ছিল, তবু নীলুর কেসে আমাকে ফাঁসালে কেন?

আমি কেন ফাঁসাব? মার্ডারের সময় তুই ওর সঙ্গে ছিলি।

আলবাত ছিলাম। তাতে কী? নীলু আমার দোস্ত ছিল, লিডার ছিল।

দুঃখের গলায় মাধব বলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় নীলুকে বোধহয় তুই মারিসনি।

কথাটা গ্রাহ্য না করে নব ঠান্ডা গলায় বলে, আমি নীলু তোমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। সন্ধেবেলা। বকুলতলার মোড় পার হওয়ার সময় বোম চার্জ হয়। কী হয়েছিল আমি জানি না, আমি ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাই। এক ঘণ্টা আমার জ্ঞান ছিল না।

এখনও হাঁ করে আছে মাধব। হাতের পিঠে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল। সোফায় মুখোমুখি নব। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা, জেলের ভাতেও চেহারা ভেঙে যায়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওর ঠান্ডা চোখ। তাকালেই গুড় গুড় করে বুক কাঁপে। মাধব বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে নব, এখন কী করতে চাস তুই? নীলুর জন্য আমাদের আর কী করার আছে বল!

যারা টিকিট কেটেছে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাই না। টিকিট না কাটলে নীলু ভি লিডার হত। আর শালা কে না জানে, লিডার হলে নীলু আর নীলু থাকত না। যেমন মদনদা নেই। যেমন কেউ নেই। অনেকক্ষণ ধরে তোমার শাওয়ারের জল পড়ে যাচ্ছে মাধবদা। বাথরুমে কে বলো তো?

বাথরুমে জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে মদনেরও মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হারিয়ে গেছে। চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন সে খালি হাতে যে কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। তার দিকে চেয়ে কেউ তাকে অমান্য করার সাহস পেত না কখনও।

আর একবার বমি করল মদন। হুইস্কির শেষ তলানিটুকুও তুলে দিল পেট থেকে। ঠান্ডা জলে এখন একটু শীত শীত করছে তার। তবু সে শাওয়ার বন্ধ করল না। মাথায় ডুগডুগি বাজিয়ে জল পড়ছে। জাগ্রত হচ্ছে বিবেক, আত্মসচেতনতা, প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, একটু উল্টোপাল্টা হয়ে অবশ্য।

কিন্তু কী যে হারিয়ে গেছে তা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে হারিয়েছে ঠিকই। নইলে এতক্ষণে সে দরজা খুলে নবর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত।

বাথরুমের দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে, মদনদা! মদনদা!

মদন শাওয়ার বন্ধ করে দেয়, কে?

আমি জয়।

ও। কী চাও?

একবার বাইরে আসুন।

মদন মুখটা বিকৃত করে। তারপর বলে, আসছি।

স্নানের পর অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে মাথা। মদন বিশাল তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মাথা আর গা মোছে। জামাকাপড় ভেজা, বাথরুমে বিকল্প কিছু পরারও নেই। মদন আবার মুখ বিকৃত করে।

তোয়ালে দিয়ে আয়নাটা মুছে সে নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নেয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নব পলিটিক্যাল প্রোটেকশন পেয়ে গেছে। না হলে জেল-পালানো কয়েদি প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে

বেড়াত না, বা এত সহজে নাগাল পেত না মদনের। কারা নবকে প্রোটেকশন দিয়েছে তা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। তবে স্বচ্ছ মাথায় মদন বুঝতে পারছে, নবর নিশ্চয়ই আরও কিছু চাওয়ার আছে। চাওয়াই তো মানুষের সবচেয়ে সহজ রন্ধ্র।

মদন তোয়ালে জড়িয়ে নেয় কোমরে। একটু ফ্যাট হচ্ছে পেটে, এই সংকটের সময়েও লক্ষ করল সে। কমাতে হবে।

বাথরুমের দরজা খুলে মদন বাইরে পা দেয়। কাজটা হয়তো ঠিক হল না। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

ডাইনিং হলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। বসবার ঘরে সোফায় বসে বিবর্ণ হাঁফাচ্ছে মাধব। ছাইয়ের মতো সাদা মুখ নিয়ে জয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। সিংগল সোফায় নব! বুকটা একটু কেঁপে উঠল মদনের। কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়ল না। পার্লামেন্ট অ্যাড্রেস করা গম্ভীর গমগমে গলায় হাঁক দিল, পুনম! কফি।

ডাইনিং হলের দেয়ালের একটা খাঁজে স্টিরিও সহ রেকর্ড প্লেয়ার। রেকর্ড একটা চাপানোও আছে। মদন শিস দিতে দিতে গিয়ে সেইটে চালু করল। কী গান বাজবে তা জানে না সে। ঘষটানো একটু আওয়াজের পর হঠাৎ দেবব্রতর গলা তাকে জিজ্ঞেস করল, পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়...। মদন রসিক আছে। দু'হাতের ঝাপটায় লম্বা চুল থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে সে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় সম্ভাব্য মৃত্যুর দিকেই। কিন্তু থমকায় না। অনেকদিন বাদে নবর সঙ্গে এই মুখোমুখি।

আঃ!— বলে একটা আরামের আওয়াজ করে সোফায় বসে মদন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নবর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, খবর পেয়েছি।

নব কথা বলল না। ক্রূর কুটিল এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। (মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়...)

মদন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, পার্টির সব খবর পেয়েছিস তো?

কীসের খবর? (হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়— আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়...)

নিত্য ঘোষ আলাদা দল করছে এখানে। তোকে প্রোটেকশন দিয়েছে, তাও জানি।

তুমি আমাকে ফাঁসিয়েছিলে, আর নিত্য ঘোষ আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। তোমার আর আমার সম্পর্কটা এখন একটু অন্যরকম মদনদা।

মদন হাত তুলে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে নবকে চুপ করিয়ে দেয়। তারপর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে নবর চোখে চোখ রেখে বলে, কাজ করতে চাস? (আয় আর-একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়...)

নব চেয়েই থাকে।

মৃদু হেসে মদন বলে, তোর বউকে চাকরি দিয়ে আজই দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে খামোকা পুলিশ গিয়ে মেয়েটার ওপর হুজ্জতি করত। তুইও যাবি?

কোথায়?

দিল্লি?

রেকর্ড শেষ হয়ে স্টিরিওতে একটা ঘষটানির শব্দ বাজছে। বেজেই যাচ্ছে। আড়চোখে মদন লক্ষ করল। কার কাছে আর্মস আছে বা নেই তা সে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায়। নবর কাছে আছে। থাকারই কথা।

দিল্লি শব্দটা মদন আর নবর মাঝখানে লাট্টুর মতো ঘুরছে।

নবর একটা হাত জামার তলায়। কোথায় তা মদন আন্দাজে ধরে। কিন্তু ভাল করে তাকায় না।

দু'জনের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে 'দিল্লি' শব্দটার দম ফুরিয়ে গেল। কোমর নেতিয়ে সেটা ঢলে পড়ছে। নব শব্দটাকে ক্যাচ করবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

বিরক্ত মুখে মদন তার গমগমে গলা আর একটু তুলে হাঁক দিল, পুনম, কফি।

তারপর যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে নবর দিকে তাকায় সে। তুই কি বিশ্বাস করিস না আমি কল্পতরু? আমি কামধেনু? সারা ভারতবর্ষে ক'টা এমপি আছে খুঁজে দেখে আয়। সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন আমি। আমি ঘুরিয়ে দিতে পারি তোর ভাগ্যের চাকা। মরা মানুষ জ্যান্ত করি রোজ। জ্যান্ত মানুষ মারি। আমি বললে নদী উজানে বয়, রাতের বেলা রোদ ওঠে। ক্যাচ কর নব, দিল্লি শব্দটা ক্যাচ কর। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে, দেখবি চল। দিল্লিতে আছে লালকেল্লা। আছে পার্লামেন্ট। আছে ইচ্ছাপূরণ। ক্যাচ কর নব।

ঘুরতে ঘুরতে দিল্লির লাট্টু যখন মাটি ছুঁই ছুঁই তখন নব হঠাৎ ক্যাচ করল।

দিল্লিতে গিয়ে কী হবে?— খুব ঠান্ডা হিসেবি গলায় সে প্রশ্ন করে।

আর একটা সিগারেট ধরানোর সময় মদন ভাল করে লক্ষ করে, তার হাত কাঁপছে কি না। না, কাঁপছে না, এখনও সব ঠিক আছে। কেউ উঠে গিয়ে স্টিরিওটা বন্ধ করছে না। মদন, তোয়ালে পরা মদনই, উঠে গিয়ে রেকর্ডটা পালটে দিয়ে এল। ভরাট একটা গলা গাইছে, সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা... 'বহোৎ আচ্ছা বহোৎ আচ্ছা' বলে মনে মনে হাসল মদন।

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে চিত হয়ে ওপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে মদন বলে, কী আর হবে! এখানে থাকলেও কিছু হবে না।— বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসে মদন নবর দিকে তাকায়, আমি কখনও সঙ্গে আর্মস নিয়ে চলেছি, দেখেছিস? (সেই স্মৃতিটুকু কভু খণে খণে যেন জাগে মনে ভুলো না...)

জামার তলায় নবর হাত একটু কঠিন হয়। ভ্রু-র ছায়ায় তার চোখের মণি মারবেলের মতো স্থির।

মদন গলাটা বেস-এ নামিয়ে আনে। খুব আস্তের ওপর গলাটা রোল করিয়ে বলে, আমার আর্মস লাগে না। লাগে নাকি রে নব? (সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো, আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা...)

নব চুপ। কিন্তু এখনও কথাটা তোলা, দুলছে।

আর্মসের চেয়েও বেশি কিছু থাকলে আর্মসের দরকার পড়ে না। নিত্য ঘোষের ক'জন বডিগার্ড তা জানিস?

ফালতু বাত ছাড়ো মদনদা। আমি জানতে চাই, নীলুকে কে মেরেছিল, আর কেন তোমরা আমাকে নীলুর কেসে ফাঁসিয়েছিলে!... (ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না...)

একটু ফ্যাকাসে মেরে গেল কি মুখটা? নিজের মুখ তো মানুষ এমনিতে দেখতে পায় না। মদন তাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। (এখন আমার বেলা নাহি আর...) গলাটাকে আর একটা পর্দায় বেঁধে উদাস আনমনা স্বরে বলে, দিল্লি থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, এলিমিনেট নিত্য ঘোষ।

বলে একটু ফাঁক দিয়ে মদন গলার স্বরটা একদম খাদে ফেলে দিয়ে বলে, দি জব ইজ ডান। যে সব ভূতপ্রেত আজ নিত্য ঘোষের হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে কাল থেকে তারা ওর গলায় দাঁত বসাতে শুরু করবে। দি জব ইজ পারফেক্টলি ডান।

জামার তলায় নবর হাত একটু কি শ্লথ? কিন্তু সেদিকে সরাসরি তাকায় না মদন। পিছন দিকে হেলে আধবোজা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে সে নিজের সিগারেটটাকে দেখে। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলাতেই বলে, তোর প্রোটেকশন নেই। কিন্তু সেটা তুই এখনও জানিস না।

কিন্তু ওসব কথায় কান দেয় না নব। ঠান্ডা গলাতে জিজ্ঞেস করে, দোস্তকে কি দোস্ত খুন করে মদনদা? বলো তুমি! আমি কি আমার দোস্তকে মেরেছি?

শুনতে হয় না, সব কথা শুনতে হয় না।— মদনও এক পরিচ্ছন্ন অন্যমনস্কতায় কথাটাকে পাশ কাটিয়ে উদাস গলায় বলে, শ্রীমন্তও ঠিক এই ভুলটা করল। ভাবল মদনের দিন শেষ, এবার নিত্য ঘোষ আসছে। তোকেও কেউ কি তাই বুঝিয়েছে নাকি রে নব?

তুমি আমার কথাটার জবাব দিচ্ছ না মদনদা?

মদন স্টিরিয়োর স্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে, বাঁধিনু যে রাখি পরানে তোমার সে রাখি খুলো না...

পুনম কফির ট্রে নিঃশব্দে রেখে চলে যায়। মদন কফির ওপর ঝুঁকে পড়ে। এ সময়ে ড্রিংকসের মাঝখানে হঠাৎ কফির এই আকস্মিক আগমন ঘটার কথা নয়! তবু ঘটিয়েছে মদন। ডাইভারসন, একটু ডাইভারসন দরকার। একটু ফাঁক, একটু শ্বাস ফেলার অবসর, একটু ঝটিতি চিন্তার অবকাশ।

কফি?— বলে মদন নবর দিকে ভ্রু তুলে তাকায়।

কফি শব্দটা আবার লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে দু'জনের মাঝখানে, ক্যাচ করবে কি নব? (এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার...)

জামার তলা থেকে হাতটা বের করে আনে নব। হাতটা ফাঁকা। সেই হাতটাই কফির কাপের দিকে এগিয়ে আসে।

স্টিরিয়ো থেকে ঘষটানির শব্দ আসছে আবার। বিকৃত মুখ করে মদন ওঠে। আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে আসে। আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

হাসলে নবকে ভালই দেখায়। নব হাসল। স্বরটা নিচু করে বলল, নীলুর কথাটা তুমি তুলতে চাও না, না মদনদা?

ঠিন করে প্লেটের ওপর চামচ রাখে মদন। 'আঃ' বলে একটা আরামের শ্বাস ছাড়ে। গুন গুন করে গায়কের সঙ্গে গায়, চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি... গাইতে গাইতে আড়চোখে নবকে এক পলক দেখে নেয়। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে। লালকেল্লা আছে। আছে প্রোটেকশন। কলকাতার পুলিশ নেই সেখানে। বাচ্চেলোক, দেখো দিল্লি, দিল্লি দেখো। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ...

শূন্য কফির কাপটা নিঃশব্দে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ায় নব, কথা দিচ্ছ মদনদা?

দিচ্ছি।

তা হলে যাব দিল্লি?

বিরক্তির ভঙ্গিতে হাত তুলে মদন গায়কের সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

নব নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ভিতরে গান তখনও চলছে, চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি-ই...

বাইরে কেয়াতলায় ছায়াচ্ছন্ন পথে আর একটা ছায়া হঠাৎ সবল হয়। সে দিল্লির স্বপ্ন দেখছে তখন।

লেকের কাছ বরাবর পিছন থেকে টাকমাথার মস্ত কালো চেহারাটা হঠাৎ খুব কাছে চলে আসে তার। হাতে নাঙ্গা রিভলভার। লোকটা জানে, নব হারামি বিট্রে করেছে। লোকটার নিশানা খুবই ভাল, তা ছাড়া এত কাছ থেকে নিশানা ভুল হওয়ারও নয়।

অনেক দূরে যখন গুলির শব্দ হয়, তখন মাধবের বসবার ঘরে গানের শব্দ হঠাৎ চৌদুনে উঠে যায়। আনন্দধারা চারদিকে গমগম করতে থাকে। স্টিরিয়োর শব্দটা বাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ডাইনিং-এর পর্দার ফাঁক দিয়ে মদনের দিকে একবার তাকায় মাধব। একটু হাসে। ছেলেবেলা থেকেই সে জানে মদনের মধ্যে বাড়তি কিছু জিনিস দেওয়া আছে। সেটা ফাউ। সকলের থাকে না।

ঝিনুক যখন ঘরে ঢুকল তখন মদন মাধবের পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসা। হাতে সোডা মেশানো পাতলা হুইস্কি। মাধব একটা ফ্রাই চিবোচ্ছে।

ঝিনি!— বলে লাফিয়ে উঠল মাধব।

মদন চাপা গলায় ধমক দিল, মারব শালার পাছায় লাথ।

মাধব এক গাল হেসে বলল, দেখ মদন, দেখ! অ্যাটমসফিয়ারটা ফিরে এসেছে। আই অ্যাম ফিলিং ইট নাউ, ইট ইজ হিয়ার।

ঝিনুক ভ্রু কুঁচকে বলল, আপনাদের ওসব গেলা হয়েছে তো? এবার দয়া করে খেতে বসুন।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল জয়। বৈশম্পায়ন এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, তোবও আসার কথা ছিল নাকি? সকালে বলিসনি তো!

জয় সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মদনের দিকে। একটু হেসে বলল, সে অনেক কথা।

মাধব ফ্রাইয়ের প্লেটটা মদনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, জয় আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে। বৈশম্পায়ন, ছোট করে একটা মেরে নে। স্কচ।

বৈশম্পায়ন জানে, ঝিনুক কোটি কোটি মাইল দূরে। হয়তো নীহারিকার মতো দূরে। সে বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, ছোট নয়। বড় করে একটা দে।

ঝিনুক কথাটা শুনতে পেল না। কাপড় ছাড়তে শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দেয়ালে নীলুর ছবিটা দেখতে না পেয়ে অবাক। গেল কোথায় ছবিটা? নীলুর যে বেশি ছবি নেই! মাত্রই দু'-তিনটে। চারদিকে হাতড়ে সে নীলুর ছবি খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল ছবিটা? ছবি ছাড়া স্মৃতি ছাড়া নীলুর যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বসবার ঘরে বৈশম্পায়ন গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক মেরে বলে, মদনা, কেমন আছিস?

মদন? মদনা যে মইরা ভ্যাটকাইয়া আছে, পাছায় পড়ছে জ্যোছনা। —বলে ফিড়িক ফিড়িক হাসে মদন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে জয় ওদের হাসি-ঠাট্টা শুনতে পাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট করে কিছু শোনার মতো মানসিক অবস্থাও তার নয়। সে দেখছে একজন লিডারকে। লিডার হতে হয় তো এরকম! কী ঠান্ডা! কী সাহস! কী ব্যক্তিত্ব!

এই লোকটাই একদিন তাকে পালবাজার অবধি সাইকেলে ডবল ক্যারি করেছিল। এই মানুষের সঙ্গেই ছিল তার সেজদির গোপন প্রণয়। গর্বে তার বুক ভরে ওঠে।

ফুলচোর
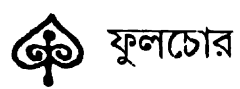
হারমোনিয়াম সম্পর্কে আমি কতটুকুই বা জানি! তবু এদের বাড়ির পুরনো হারমোনিয়ামটা দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, শুধু রিড নয়, এর গায়ের কাঠের কাঠামোটাও নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলার বয়স খুব বেশি হবে না। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রোগা, ফরসা। এবং মুখের হাড় প্রকট হওয়ায় একটু খিটখিটে চেহারার। বললেন, রিডগুলো জার্মান।

পাশের ঘরে একটা বাচ্চা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পশুপতি আমাকে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিল। সম্ভবত কোনও ইশারা। কিন্তু কীসের ইশারা তা আমি ধরতে পারলাম না। এই হারমোনিয়াম কেনার ব্যাপারে সে-ই অবশ্য দালালি করছে।

আমি মাদুরের ওপর রাখা হারমোনিয়ামটার সামনেই বসে আছি। আমার সামনে চায়ের কাপ, ডিশে দুটো থিন এরারুট বিস্কুট। আমি ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললাম, ও।

কিন্তু আসলে আমি তখন হারমোনিয়ামের রিডের চেয়ে থিন এরারুট বিস্কুট সম্পর্কেই বেশি ভাবছি। হঠাৎ আমার খেয়াল হয়েছে, এরারুট দিয়ে সম্ভবত এই বিস্কুট তৈরি হয় না। যতদূর মনে পড়ে, ছেলেবেলা থেকেই থিন এরারুট বিস্কুট কথাটা শুনে আসছি। অথচ কোনও দিনই থিন কথাটা বা এরারুট ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি। আজ পুরনো হারমোনিয়াম কিনতে এসে ভাবতে লাগলাম।

যথেষ্টই আপ্যায়ন করছেন এরা। কেউ পুরনো হারমোনিয়াম কিনতে এলে তাকে হাতপাখার বাতাস বা চা বিস্কুট দেওয়ার নিয়ম আছে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু চা বিস্কুট দেওয়াতে আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি কনে দেখতে এসেছি! এক্ষুনি ও-ঘর থেকে পরদা সরিয়ে কনে ঢুকবে। নিযমমাফিক নমস্কার করবে এবং হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি গাইবে।

ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামটার ওধারে বসে আছেন। মুখ চোখ যথেষ্ট ধূর্ত এবং সচেতন। হাতের পাখাটা জোরে নাড়তে নাড়তে একটু ঝুঁকে বললেন, চা ঠান্ডা হচ্ছে যে!

ঠান্ডা হওয়াটাই দরকার ছিল। এবার বড় প্যাঁচপ্যাচে গরম পড়েছে। ঘরে ইলেকট্রিক পাখা নেই। হাতপাখায় তেমন জুতও হচ্ছে না। এর মধ্যে গরম চা পেটে গেলে আরও অস্বস্তি।

ভদ্রতাবশে আমি চায়ে চুমুক দিলাম। এবং সেই সময়ে বেটাইমে পশুপতি আমাকে কনুই দিয়ে আর একটা ঠেলা দিল। খুব সাবধানেই দিল। চা চলকায়নি। কিন্তু আমি দ্বিতীয়বারও ইঙ্গিতটা ধরতে না পেরে ভাবী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। পাশের ঘরে কাঁদুনে মেয়েটাকে কে এক জন ফিসফিস করে মন-ভোলানো কথা বলছে। গলাটা পুরুষের বলেই মনে হচ্ছিল। অথচ ভদ্রমহিলা বলেছেন, তাঁর স্বামী বাড়ি নেই। অবশ্য পাকা ঘর হলে পাশের ঘরের কথা এ-ঘর থেকে শুনতে পাওয়া যায় না। মাঝখানের দরজাটা শক্ত করে আঁটা রয়েছে। কিন্তু বাঁশের বেড়ার ঘরে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই মুশকিল।

পাশের ঘরে মেয়েটা বলছে, ছাই দেবে তুমি। কত কিছু তো কিনে দেবে বলো। দাও?

ফিসফিস স্বরে বলে, আস্তে। শুনতে পেলে কী মনে করবে। ডবল রিডের ভাল হারমোনিয়াম দেখে এসেছি। কী আওয়াজ!

চাই না। পুরনোই আমার ভাল।

এটা তো পচা জিনিস ছিল, তাই বেচে দিচ্ছি।

সব জানি। মিথ্যে কথা।

আমাকে কানখাড়া করে শুনতে দেখেই বোধ হয় ভদ্রমহিলা সতর্ক হলেন। খুব জোর দু' ঝাপটা হাওয়া মেরে আমার কান থেকে কথাগুলো তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে-করতে বললেন, কত লোক আসে। দেখেই বলে, এমন জিনিস আজকাল পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। বেচে দেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না, কিন্তু আমার বড় মেয়ে এখন সংগীত প্রভাকর পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তো, তাই স্কেল চেঞ্জার না হলে ভারী অসুবিধে।

আমি বললাম, ঠিক কথাই তো।

হারমোনিয়ামের একটা রিডের তলায় একটা দেশলাইয়ের কাঠি গোঁজা দেখে আমি কৌতূহলবশে এবং সম্ভবত কান চুলকোনোর জন্যই আনমনে দু' আঙুলে সেটা টেনে আনলাম। সঙ্গে সঙ্গে রিডটা নড়া দাঁতের মতো ডেবে গেল। অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ রকমই হওয়ার কথা।

রিডটার নেমকহারামি লক্ষ করেই কিনা কে জানে, ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বললেন, চা-টা কিন্তু সত্যিই জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি চা খেতে থাকি। কিন্তু কেবলই মন বলছে, কনে কোথায়? কনে কোথায়?

আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। গ্রীষ্মের শেষ বেলার আলোটা বেশ মোলায়েম লালচে হয়ে পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। ভারী কিম্ভূত আলো! সামনে হারমোনিয়াম। পরিবেশটা একদম হুবহু কনে দেখার। পবদা সরিয়ে কনে ঘরে এলেই হয়।

এল না। পশুপতি এবার হাঁটু দিয়ে আমার হাঁটুতে চাপ দিল। আমি ধীরে সুস্থে চা শেষ করি।

বিস্কুটটা খেলেন না যে!— ভদ্রমহিলা খুবই আকুল হয়ে বললেন।

ডিশে চা পড়ে বিস্কুটটা ভিজে নেতিয়ে গেছে। ওই ক্যাতক্যাতে বিস্কুট খেতে আমার ভারী ঘেন্না হয়। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না। তাই আমি বললাম, চায়ের সঙ্গে কিছু খাই না!

পশুপতি এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিল! এবার হঠাৎ বলে উঠল, বউদি, আপনার গানের গলা কিন্তু দারুণ ছিল।

আর গলা! — বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা।

আমি যে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড হারমোনিয়াম কিনতে এসেছি সেটা ভুলে গিয়ে কখন যে খোলা দরজার সরে যাওয়া পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেছি তা খেয়ালই ছিল না। অদ্ভুত লালচে গাঢ় আলোয় সামনের বাগানটা মাখামাখি। এইমাত্র কয়েকটা বেলকুঁড়ি বুঝি ফুল হয়ে ফুটল। একটা দমকা বাতাসে চেনা দুরন্ত গন্ধটা এসে মাতাল করে দিয়ে গেল ঘর। আমরা নিচু ভিটের মেঝেয় মাদুরে বসা। ঘরের একধারে একটা সরু বেঞ্চির মতো চৌকিতে রং-ওঠা নীল বেডকভারে ঢাকা বিছানা। একটা সস্তা কাঠের আলমারি। একটা পড়ার টেবিল আর লোহার চেয়ার। বেড়ার বাঁখারির ফাঁকে ফাঁকে চিরুনি, কাঠের তাক, নতুন কাপড় থেকে তুলে নেওয়া ছবিওলা লেবেল, সিগারেটের প্যাকেট কেটে তৈরি করা মালা, কাজললতা এবং আরও বহু কিছু গোঁজা রয়েছে। ঘরের কোণে একটা কাঠের মই রয়েছে যা বেয়ে পাটাতনে ওঠা যায়। এ সব তেমন দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। তবু ওই বেলফুলের গন্ধ, এক চিলতে বাগান আর লালে লাল আলো পুরো 'হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়' ভাব। মন বার বার বিয়ে-পাগলা বরের মতো জিজ্ঞেস করছে, কনে কোথায়? কনে কোথায়?

আমার অন্যমনস্কতাব ফাঁকে পশুপতি আর ভদ্রমহিলার মধ্যে বেশ কিছু কথা চালাচালি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। না হলে হঠাৎ কেনই বা ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে প্যাঁ প্যাঁ করে বাজাতে থাকবেন, আর কেনই বা মিনিট পাঁচেক খামোকা হারমোনিয়ামে নানা গৎ খেলিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলবেন, এই করেছ ভাল নিঠুর হে...

গান শেষ হলে কিছু বলতে হয় বলে বললাম, বেশ।

ভদ্রমহিলা ঝুঁকে বললেন, ভাল না আওয়াজটা?

আমার দুটো আওয়াজই বেশ স্পষ্ট ও জোরালো লেগেছিল। তাই বললাম, ভালই তো। এখনও আপনার গলা বেশ রেওয়াজি।

সময় কোথায় পাই বলুন! সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, সেই থেকে সংসার আর সংসার। এখন মেয়েদের শেখানোর জন্য যা একটু বসি টসি মাঝে-মাঝে। আমার উনি একদম গান বাজনা ভালবাসতেন না। ঘরের লোক মুখ ফিরিয়ে থাকলে কি চর্চা রাখা যায় বলুন!

ঠিকই তো।

পশুপতি খুব হাসছিল। হাসি ওর রোগ বিশেষ। তবে হঠাৎ হাসিটা সামলে বলে উঠতে পারল, তা হলে এবার কাজের কথা হোক।

ভদ্রমহিলা ভীষণ গম্ভীর হয়ে মুখ নামিয়ে পাখার উঁচু-নিচু শিঁরগুলোয় আঙুল বোলাতে-বোলাতে বললেন, আপনারাই বলুন। জার্মান রিড, পুরনো সাবেকি জিনিস। দেখতে তেমন কিছু নয় বটে, কিন্তু এখনও কী রকম সুরেলা আওয়াজ, শুনলেন তো!

এবার সেই বিপজ্জনক দরাদরির ব্যাপারটা এগিয়ে আসছে। আমি তাই প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। ফুলের গন্ধ ও কনে দেখা আলোর স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মৃদু মৃদু হাসতে থাকি। তবু দুনিয়ার যত ছিদ্র আমার চোখে পড়বেই। ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামের বেলোটা চেপে বন্ধ করেননি। ফলে আমি স্পষ্ট দেখলাম বেলোর ভিতরে দু' জায়গায় ব্ল্যাক টেপের পট্টি সাঁটা রয়েছে।

দরাদরির সময় পশুপতি কোন পক্ষ নেবে তা বলা মুশকিল। হারমোনিয়ামটা কিনতে সেই আমাকে রাজি করিয়েছে। বলেছে, জিনিসটা ভাল, পরে বেশি দামে বেচে দেওয়া যাবে। আমার টাকা থাকলে আমিই কিনতুম। আর আপনি যদি কেনেন তবে আমি পরে দশ-বিশ টাকা বেশি দিয়ে আপনার কাছ থেকেই নিয়ে নেব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পশুপতি বিক্রেতাদের কাছ থেকেই কমিশন পায়, ক্রেতাদের কাছ থেকে বড় একটা নয়। সুতরাং ভদ্রমহিলার পক্ষ নেওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকই যদি হারমোনিয়ামটা বাগানোই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে দর কমানোতেই তার স্বার্থ। কিন্তু পশুপতিকে ঠিক মতো আঁচ করা খুবই শক্ত।

ভদ্রমহিলা নতমুখ ফের তুলে আমার দিকে পাগলকরা এক দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আর একটা গান শুনব।

কথাটা মাথায় আসতে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দরাদরি জিনিসটা আমি একদম পছন্দ করি না।

গানের কথায় ভদ্রমহিলা একটু খুশিই হলেন কি! মুখটা যেন জ্যোৎস্নায় ভিজে গেল। বললেন, আমার গান আর কী শুনবেন! আমার বড় মেয়ে বাড়িতে থাকলে তার গান শুনিয়ে দিতাম। দারুণ গায়।

আমি নির্লজ্জের মতো জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বড় মেয়ে কোথায়?

রবিবারে ওর গানের ক্লাস থাকে।

পাশের ঘরে কান্না থেমেছে। তবে একটা কচি মেয়ের গলা আর একটা ধেড়ে পুরুষের গলা খুব জোর ফিসফিসিয়ে গল্প করছে। আমার মনে হল, আজ রবিবারে ভদ্রমহিলার স্বামী বোধ হয় বাড়িতেই আছেন। তবে সম্ভবত উনি আমার সেজোকাকার মতোই মেনিমুখো এবং স্ত্রীর অধীন। বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজওয়ালা, শিশিবোতলওয়ালা, ছুরি কাঁচি শানওয়ালা, শিলোকোটাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা বা শালওয়ালা এলে কাকিমা কক্ষনও কাকাকে তাদের সামনে বেরোতে দেন না। কারণ ভালমানুষ কাকা সকলের সব কথাই বিশ্বাস করে বসেন, দর তুলতে বা

নামাতে পারেন না এবং ঝগড়া-টগড়া লাগলে ভীষণভাবে ল্যাজেগোবরে হয়ে যান। এমনকী আমার খুড়তুতো বোনকে যখন পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল তখনও কাকাকে ঠিক এইভাবে পাশের ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যেমনভাবে এই ভদ্রমহিলার স্বামীকে রাখা হয়েছে। পাত্রপক্ষ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কাকা পাশের ঘরে বসে প্লাস পাওয়ারের চশমা এঁটে প্রায় তিন কিলো চালের ধান আর কাঁকর বেছে ফেলেছিলেন। এই ভদ্রলোককে তেমন কোনও কাজ দেওয়া হয়েছে কি না কে জানে!

তবে ভদ্রলোকের জন্য আমার বেশ মায়া হচ্ছিল। ওঁর করুণ অবস্থাটা আমি এত স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যে বেখেয়ালে হঠাৎ বলেই ফেললাম, আপনার স্বামীকেও এই ঘরে ডাকুন না।

ভদ্রমহিলা ফরসা এবং ফ্যাকাসে। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি রক্তাল্পতায় ভুগছেন। কিন্তু আমার কথা শুনে হঠাৎ এমন রাঙা হয়ে উঠলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমার ধারণা ভুল। ওঁর রক্তাল্পতা থাকতেই পারে না।

উনি ফের মুখ নত করলেন এবং আবার মুখ তুলে বললেন, উনি তো বাড়িতে নেই। তবে হয়তো ফিরে আসতেও পারেন। লাজুক মানুষ লোকজন দেখে হয়তো পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। ও ঘরে কথাও শুনছি বেশ।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। মাঝখানের দরজা এতক্ষণ দমবন্ধ করে এঁটে ছিল। এবার হঠাৎ খুলে যাওয়ায় অবারিত শ্বাসবায়ুতে সারা বাড়িটা খোলামেলা, হাসিখুশি হয়ে গেল হঠাৎ। আর ঘরে কনে-দেখা আলোয় ভদ্রমহিলা অবিকল কনের মতোই লুঙ্গি পরা আদুড়ে গায়ের মাঝবয়সি মজবুত চেহারার লাজুক স্বামীটিকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করাল। খুব হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছিলাম। দেখুন, চুপি চুপি এসে পাশের ঘরে মেয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। মেয়ে অন্ত প্রাণ একেবারে।

ভদ্রলোক মাথা চুলকোতে চুলকোতে খুব বিনয় ও লজ্জার সঙ্গে হাসছেন। জীবনে অসফল ভদ্রলোকেরা ঠিক এইভাবেই হাসেন এবং নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন। অবিকল আমার সেজোকাকা।

বসুন।— আমি বললাম।

মাদুরে আর জায়গা ছিল না। উনি অবশ্য মাদুর-টাদুরের তোয়াক্কা করেন বলে মনে হল না। খুব অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেঝেয় বাবু হয়ে বসে পড়লেন।

এই সময়ে পশুপতি খুব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে, কাজের কথাটা তুলুন না।

কনে কই? আমার মন তার দাবি আবার পেশ করল। আমি বললাম, মেয়েদেরও ডাকুন।

পরদার ফাঁক দিয়ে একটা কচিমুখ উঁকি দিয়েই ছিল, সে-ই জবাব দিল, দিদি সুধাদির বাড়িতে আছে। ডেকে আনব?

ভদ্রমহিলার রক্তাল্পতা কেটে গিয়ে রক্তাধিক্যই দেখা যাচ্ছে এখন! কিন্তু তুখোড় চালাক বলে পলকে হেসে ফেলে বললেন, ওমা! তাই বুঝি! আমাকে তো বলে গেল গানের ক্লাসে যাচ্ছে। তা আন না ডেকে।

মেয়েটা ঘরের ভিতর দিয়েই এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল! পশুপতি ঘাম মুছছে। ভদ্রমহিলা করুণ চোখে চেয়ে বললেন, দেরি হয়ে গেছে বলে বোধ হয় আজ আর গানের ক্লাসে যায়নি।

পশুপতি ঘামভেজা রুমালটা শুকোনোর জন্য মাদুরের ওপর পেতে দিয়ে বলল, এবার কাজের কথাটা হয়ে যাক।

আপনারাই বলুন।— ভদ্রমহিলা বললেন, জিনিসটা ঘরের বার করার ইচ্ছে কারও নেই। মেয়েরা তো সারাক্ষণ কিটমিট করছে। কিন্তু আমি বলি, স্কেল চেঞ্জার যখন কেনা হচ্ছেই তখন আর একটা হারমোনিয়াম ঘরে রেখে জঞ্জাল বাড়ানো কেন!

এ সবই দরের ইংগিত। কিন্তু পুরনো বা নতুন কোনও হারমোনিয়ামের দর সম্পর্কেই আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে পশুপতি বলেছিল, প্রথমে পঞ্চাশ বলবেন। ধীরে ধীরে পঁচাত্তর অবধি উঠে একদম থেমে যাবেন।

কিন্তু হারমোনিয়ামটার দিকে না তাকিয়ে কেবল ঘরদোর এবং লোকজনের দিকে চেয়েই পঞ্চাশ টাকা বলতে আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকছে।

এ সময়ে ভদ্রমহিলা ডুবন্ত মানুষের দিকে একটা লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচশো টাকায় কেনা জিনিস।

দরাদরিতে দালালের কথা বলার নিয়ম নেই। তা হলে তার পক্ষপাত প্রকাশ পাবে। পশুপতি শুধু শ্বাস নেওয়া আর ছাড়াটা বন্ধ করে ছিল। ফলে ঘরে একটা গর্ভিনী নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হল। প্রচণ্ড টেনশন। দামের কথাটা এখন কে তুলবে?

নিস্তব্ধতা ভেঙে আমি হঠাৎ বললাম, আমি গান জানি না।

ভদ্রমহিলা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। কথাটার অর্থ বুঝলেন না বোধ হয়।

আমি তাই মৃদু হেসে বললাম, গান না জানলেও হারমোনিয়াম ঘরে রাখার নিশ্চয়ই কিছু-কিছু উপকারিতা আছে।

ভদ্রমহিলা তুখোড় হলেও এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত নন। কনে দেখতে এসে কেউ যদি বলে, আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, তবে যেমনটা হয় আর কি।

উনি তাই বললেন, গান না জানলে হারমোনিয়াম দিয়ে কী করবেন? কিন্তু তা হলে কিনছেনই বা কেন?

যদি শিখি?

ভদ্রমহিলা একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। শিখতে গেলে হারমোনিয়াম ছাড়া কিছুতেই হবে না।

কিন্তু কে শেখাবে সেইটেই সমস্যা। আমি মুখ চুন করে বলি, একদম বিগিনারকে শেখানোর তো অনেক ঝামেলা। তা ছাড়া আমাব কোনও সুরজ্ঞান নেই।

ভদ্রমহিলা ডগমগ হয়ে বলেন, ও নিয়ে আপনাকে মোটেই ভাবতে হবে না। আমিই শেখাব।

আপনি? আপনার তো সংসার করে বাড়তি সময়ই নেই।

সপ্তাহে এক দিন বা দু' দিন শেখালেই যথেষ্ট। বাদ বাকি দিনগুলোয় আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন!

বাইরের দরজার পরদা সরিয়ে এ সময়ে ম্লানমুখী একটি মেয়ে ঢুকল। আর সে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটার যা কিছু খাঁকতি ছিল, তার পূরণ হয়ে গেল। কনে-দেখা আলো, পুষ্পগন্ধ, রঙ্গমঞ্চের সব সাজ এবং একা ও দুঃখী হারমোনিয়াম সবই সজীব ও অর্থবহ হয়ে উঠল। মন বলল, এইজন্যই তো এতক্ষণ বসে থাকা। অবশেষে কনে এল।

কাটুসোনা

কাল রাতে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। মাগো! ভাবতেই ভয় করে। গায়ে কাঁটা দেয়। সবচেয়ে বেশি ভয় ভূতকে আর চোরকে।

আমাদের একটা লোমওয়ালা সুন্দর ভুটিয়া কুকুর ছিল। তার নাম পপি। ছোটখাটো, ভুসকো রঙের, ভারী মিষ্টি দেখতে। ভুক ভুক করে যখন ডাকত তখন ডাকটাও মিষ্টি শোনাত। সেই ছোট্ট একটু কুকুরছানা অবস্থায় আমাদের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাকে। আমিও তখন ছোট্ট একটুখানি।

টানা বারো বছর আমাদের সঙ্গেই সে বড় হল, বুড়ো হল। তারপর এই তো গেলবার শীতের শেষ টানে মরে গেল একদিন। পপির জন্য আজও বুকের কান্না সব শেষ হয়নি। ভাবলেই কান্না পায়। কেন যে কুকুরের পরমায়ু এত কম! আমি তো এখনও ভাল করে যুবতীও হয়ে উঠিনি, এর মধ্যেই পপি বুড়ো হয়ে মরে গেল!

তা যাই হোক, পপির মতো এত নিরীহ কুকুর হয় না। কোনও দিন কাউকে কামড়ায়নি, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে মারপিট করেনি। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকতে ভালবাসত। তবে ভুক ভুক করে ডাক ছাড়ত ঠিকই। আর তার ভয়েই গত বারো বছরে কোনও দিন আমাদের বাড়িতে চোর আসেনি। পপি মরবার পর এ পর্যন্ত কম করেও দশ-বারো বার চোর হানা দিয়েছে।

কাল রাতের চোরটাকে বাঁটুল দেখেছে। ঠাকুমার কাছে বাঁটুল আর চিনি শোয়। বাঁটুলের ভয়ংকর কৃমির উৎপাত। সারা রাত দাঁত কড়মড় করে। গতবারেও তার গলা দিয়ে এত বড় কেঁচো বেরিয়েছিল। মাঝে-মাঝে সে বিছানায় ছোট-বাইরে করে ফেলে। সেও নাকি কৃমির জন্যই। কাল মাঝরাতে ছোট-বাইরে পাওয়ায় কোন ভাগ্যিতে তার ঘুম ভেঙেছিল। সলতে কমানো হ্যারিকেনের অল্প আলোয় সে দেখতে পায় একটা লম্বা বাঁখারি জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে আলনা থেকে ঠাকুমার থানধুতিটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁটুল ভয়ে আধমরা অবস্থায় চোখ মিটমিটিয়ে জানালার দিকে চেয়ে দ্যাখে, একটা লোক। কেমন লোক, রোগা না মোটা, কালো না ফরসা, লম্বা না বেঁটে তার কিছুই বলতে পারেনি। শুধু একটা লোককে সে দেখেছে। ওই অবস্থায় আমি হলে ভয়ে জানালার দিকে চাইতামই না। কড়াক্কর করে চোখ বন্ধ করে রাখতাম। বাঁটুল লোকটাকে দেখে ঠাকুমাকে চিমটি দিয়ে জাগিয়ে দেয়।

ঠাকুমা তো বুঝতে পারেনি কেন বাঁটুল চিমটি কেটেছে। ফলে ঠাকুমা উঃ বলে জেগে উঠে বাঁটুলকে বকে উঠেছে, এ ছেলেটার সঙ্গে শোওয়াই যায় না। এই হাঁটু দিয়ে গুঁতোচ্ছে, এই গায়ে পা তুলে দিচ্ছে, এই দাঁত কড়মড় করছে, এখন আবার চিমটিও দিতে শুরু করেছে।

সাড়াশব্দে বাইরের ঘরে ভৈরবকাকা জেগে উঠে গম্ভীর গলায় বলল, কে রে?

চোর কি আর তখন ত্রিসীমানায় থাকে? চোর ধরতে হলে কখনও আওয়াজ দিতে নেই। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে নাকি হঠাৎ সাপটে ধরতে হয়। কিন্তু সে সাহস এ বাড়ির কারও আছে বলে মনে হয় না। তবে মাঝরাতে বেশ একটা হই-হই হল আমাদের বাড়িতে। বাঁটুল চোর কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে ঠাকুমা, তারপর ভৈরবকাকা এবং তারপর ঘুম ভেঙে বাড়ির প্রায় সবাই আতঙ্কে বিকট গলায় চোর! চোর! চোর! চোর! করে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু কেউ দরজা খুলে বেরোয় না। পাড়ার লোক যখন জড়ো হল তখন চোর তার বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে।

কিন্তু আমরা বাড়িসুদ্ধ লোক সেই যে জেগে গেলাম তারপর আর সহজে কেউ ঘুমোতে গেল না। আলনা থেকে ঠাকুমার থানধুতি ছাড়া চিনির একটা সোয়েটার আর ভৈরবকাকার একটা পুরনো পাজামা চুরি গেছে। পুরনো পাজামাটার জন্য দুঃখের কিছু নেই, ওটা ঠাকুমা ন্যাতা করবে বলে এনে রেখেছিল। কিন্তু তবু এই চুরি উপলক্ষ করেই বাড়িতে মাঝরাতে সিরিয়াস আলোচনাসভা বসে গেল। এমনকী এক রাউন্ড চা পর্যন্ত হয়ে গেল। সেই চা করতে রান্নাঘরে যেতে হল আমাকেই, সঙ্গে অবশ্য পিসি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভৈরবকাকা বললেন, চোরেদের নিয়ম হল, চুরি করে গেরস্তবাড়িতে পায়খানা করে যায়।

বাবা বললেন, দূর! ও সব সেকেলে চোরদের নিয়ম।

তবু দেখা যাক।

বলে ভৈরবকাকা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর বিরাট লাঠি হাতে বেরোলেন। সঙ্গে আমাকে আর বাঁটুলকে নিলেন। বললেন, আমার চোখ তো আর অত বেশি তেজি নয়। তোরা একটু নজর করতে পারবি।

ভয়ে আমার হাত পা হিম হয়ে আসছিল। বাঁটুল তার এয়ারগান বগলদাবা করে আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, কোনও ভয় নেই রে মেজদি, এয়ারগানের সামনে পড়লে চোরকে উড়িয়ে দেব।

আমি বললাম, হুঁ! খুব বীর!

টর্চ জ্বেলে ভিতরের মস্ত উঠোন আর বাইরের বাগান খুঁজে দেখা হল। কোথাও সে রকম কিছু পাওয়া গেল না।

তখন ভোর হয়ে আসছে। ভৈরবকাকা বললেন, আর শুয়ে কাজ নেই। চল, মর্নিং ওয়াকটা সেরে আসি।

বেড়িয়ে ফেরার পথে মল্লিকদের বাড়ির বাগানে অনেক বেলফুল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। ওদের বাড়িতে কুকুর নেই। তাই নিশ্চিন্তে ফটক খুলে ঢুকে এক কোঁচড় বেলকুঁড়ি তুলে ফেললাম। ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা দিয়ে রাখলে বিকেলে ফুটে মউ মউ করবে গন্ধে। ফুল তুলছি আপনমনে, এমন সময় হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে একটা বিদঘুটে হারমোনিয়ামের শব্দ উঠল। খুব অবাক হয়েছি। এ বাড়িতে গানাদার কেউ নেই হারমোনিয়ামও নেই জানি। তবে?

সারেগামার কোনও রিডেই সুর লাগছে না। সেই সঙ্গে আচমকা একজন পুরুষের গলা বেসুরে মা ধরল। এমন হাসি পেয়েছিল, কী বলব!

ভৈরবকাকা কাকভোরে জাম্বুবানের মতো ফটকের বাইরে লাঠি আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে। হারমোনিয়াম শুনে তিনি বললেন, কাটুসোনা, চলে আয়। বাঁটুল ফুল চুরিতে আগ্রহী নয় বলে একটু এগিয়ে গেছে।

এ বাড়িতে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেও আমার ভয় নেই। বলতে কী এ বাড়িতে আমার কিছু অধিকারও আছে। এ বাড়ির ছোট ছেলে অমিতের সঙ্গে বহুকাল হল আমার বিয়ের কথা ঠিকঠাক। সে আমেরিকা থেকে এক ফাঁকে এসে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। আমিও তৈরি।

ভৈরবকাকা অবশ্য ফুল চুরির ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না। কারণ হবু বউ ভাবী শ্বশুরবাড়িতে ফুল চুরি করতে এসে ধরা পড়লে ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়। তাই উনি তাড়া দিয়ে বললেন, সব জেগে পড়েছে। পালিয়ে আয়। অত ফুল তোর কোন কাজে লাগবে শুনি?

মনে মনে বললাম, মালা গাঁথব।

মুখে বললাম, একটু দাঁড়াও না। এ বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে কে?

কে জানে! তবে ওদের একটা মাথা-পাগলা গোছের ভাই এসেছে কলকাতা থেকে শুনেছি। সে-ই বোধ হয়।

কী রকম ভাই?

সে কত রকম হতে পারে। পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, জ্ঞাতির কি শেষ আছে! কে জানে?

আমি খুশি হতে পারি না।

হারমোনিয়ামটা তারস্বরে বিকট আওয়াজ ছাড়ছে। সঙ্গে গলাটা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য সুরে। যাকে বলে বেসুরের সঙ্গে বেসুরের লড়াই।

আমি কোঁচড় ভরতি ফুল নিয়ে চলে আসি। ভৈরবকাকাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি দেখেছ লোকটাকে?

লোকটা নয়, ছেলেটা। একেবারে পুঁচকে ছোকরা। টাউন ডেভেলপমেন্টের চাকরি নিয়ে এসেছে কিছু দিন হল। সে দিন দেখি প্রকাণ্ড একটা পাকা কাঁঠাল নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। পিছনে-পিছনে দুটো গোরু তাড়া করাতে মালগুদামের রাস্তা দিয়ে দৌড় দিচ্ছিল। তাই দেখে সকলে কী হাসাহাসি।

মল্লিকবাড়ি এখন অবশ্য ফাঁকাই থাকে। ছেলেরা সবাই বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে বুড়ো আর বুড়ি। অবশ্য বুড়োবুড়ি বলতে সাঙ্ঘাতিক বুড়োবুড়ি তাঁরা

নন। আমার হবু শাশুড়ির চেহারায় এখনও যৌবনের ঢল আছে। হবু শ্বশুরমশাই এখনও বাহান্ন ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে দিনে চার মাইল করে হেঁটে আসেন। দরকার হলে সাইকেলও চালান।

হারমোনিয়ামের শব্দটা বহু দূর পর্যন্ত আমাদের তাড়া করল।

রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়েছিল বাঁটুল। ভৈরবকাকাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে আমি আর বাঁটুল পাশাপাশি হাঁটছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে বাঁটুল, মল্লিকবাড়িতে কে নাকি এসেছে?

হ্যাঁ। পাগলা দাশু।

তার মানে?

অমিতদার ভাই। সবাই তাকে পাগলা দাশু বলে ডাকে।

কেন?

কী জানি? লোকটার একটু ট্যানজিস্টার শর্ট আছে।

বাঁটুলের সব কথাই অমনি। ভাল বোঝা যায় না। তবে একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ঠিকই। বললাম, সত্যিকারের পাগল নাকি?

না, না। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রোজ বাঘাযতীন পার্কে ফুটবল খেলতে যায় সে। গোলকিপিং করে। কিন্তু একদম পারে না। বল হয়তো ডান দিক দিয়ে গোলে ঢুকছে, সে বাঁ দিকে ডাইভ দেয়। আমরা হেসে বাঁচি না।

তবে খেলায় নিস কেন?

বাঁটুল গম্ভীর হয়ে বলে, না নিয়ে উপায় আছে? এ পর্যন্ত তিনটে রাশিয়ান টাইপের ফুটবল কিনে দিয়েছে তা জানিস? এক-একটার দাম ষাট-সত্তর টাকা।

ভূত বা চোরের মতো পাগল আর মাতালদেরও আমার ভীষণ ভয়। কিন্তু যারা পুরো পাগল নয়, যারা আধপাগলা খ্যাপাটে ধরনের তাদের আমার কিন্তু মন্দ লাগে না। এই যেমন ভৈরবকাকা। খুঁজে দেখতে গেলে ভৈরবকাকা আমাদের রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়। জ্ঞাতি মাত্র। বিয়ে শাদি করেনি, একা-একা একটা জীবন দিব্যি কাটিয়ে দিল। সাত ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে গত পনেরো-ষোলো বছর আমাদের পরিবারে ঠাঁই নিয়েছে। বিয়ে না করলে একটা বাই-বাতিক হয় মানুষের। সব সময়েই উদ্ভট সব চিন্তা আসে মাথায়। ভৈরবকাকাও তাই। খামখেয়ালি, রাগী, অভিমানী আবার জলের মতো মানুষ। এমন লোককে কার না ভাল লাগে? আমার তো বেশ লাগে। খ্যাপামি না থাকলে মানুষের মধ্যে মজা কই? আমার বাপু বেশি ভাবগম্ভীর হিসেবি লোক তেমন ভাল লাগে না। রবি ঠাকুরের বিশু পাগলা বা ঠাকুরদার মতো চরিত্র আমার বেশি পছন্দ।

আমি বাঁটুলকে জিজ্ঞেস করি, পাগলা দাশু আর কী কী করে?

বাঁটুল বলে, সে অনেক কাণ্ড। ছুটির দিনে নতুন পাহাড় আবিষ্কার করতে একা-একা চলে যায়। নতুন-নতুন গাছ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া সাইকেলে চড়া শিখতে গিয়ে রোজ দড়াম-দড়াম করে আছাড় খায়। গান শিখবে বলে লিচুদিদের পুরনো হারমোনিয়ামটা দুশো টাকায় কিনে এনেছে।

দুশো টাকা?— বলে আমি চোখ কপালে তুলি।

লোকটা বোকা আছে মাইরি রে!

ফের মাইরি বলছিস?

বাঁটুল জিব কাটল।

আমি ভাবছি একটা লোক আমার ভাবী শ্বশুরবাড়িতে এসে খানা গেড়েছে, বাঁটুলদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, লিচুদের হারমোনিয়াম কিনেছে, আর আমি লোকটার কোনও খবরই রাখতুম না!

সকালে আজ অনেক বেশি কাপ চা ছাঁকতে হল। চোরের খবর নিতে পাড়ার লোকজন এল। দারোগা কাকা নিজে তদন্তে এলেন। ভারী হাসিখুশি ভুঁড়িওলা প্রকাণ্ড মানুষ। চুরির বিবরণ শুনে

বাঙাল টানে বললেন, চোরের ইজ্জত নাই, নিতে নিল ভৈরবদার পাজামাখান? ইস্। কপাল ভাল যে ভৈরবদারে দিগম্বর কইরা পরনের লুঙ্গিখানা লইয়া যায় নাই।

বলতে বলতে নিজেই হেসে অস্থির। চোখে জল পর্যন্ত চলে এল হাসতে হাসতে।

ভৈরবকাকা রেগে গিয়ে বলেন, তোমাদের অ্যাডমিনস্ট্রেশন দিনে দিনে যা হচ্ছে তাতে পরনের লুঙ্গিও টেনে নেবে একদিন ঠিকই। তার আর বেশি দেরিও নেই। ঘরের বউ, বেটাবেটিকেও টেনে নিয়ে যাবে।

দারোগাকাকা রাগবার মানুষ নন। তাঁর দুই প্রিয় জিনিস হল শ্যামাসংগীত আর জর্দাপান। একটা শুনলে আর অন্যটা খেলে তাঁর দুই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। চায়ের পর জর্দাপান খেয়ে এখনও তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু করছিল। বলেন, অ্যাডমিনস্ট্রেশন তো আমরা চালাই না, চালায় গবর্নমেন্ট। যদি গবর্নমেন্টটা কে চালায় তয় কইতে হয় ভূতে।

ভৈরবকাকা চেঁচিয়ে বলেন, আলবত ভূতে। তোমাদের গোটা অ্যাডমিনস্ট্রেশনটাই আগাগোড়া ভূতের নৃত্য। চুরি বাটপারি, রেপ রাহাজানি এভরিথিং তোমাদের নলেজে হচ্ছে। প্রত্যেকটা সমাজবিরোধীর কাছ থেকে তোমরা রেগুলার ঘুষ খাও।

দারোগাকাকা অবাক হওয়ার ভান করে বলেন, ঘুষ খামু না ক্যান? ঘুষের মধ্যে কোন পোক পড়ছে?

ভৈরবকাকা উত্তেজিতভাবে বলেন, না ঘুষে পোকা পড়বে কেন? পোকা পড়েছে আমাদের কপালে।

দারোগাকাকা আবার ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে বলেন, আপনের গেছে তো একখান ছিঁড়া পায়জামা, হেইটার লিগ্যাই এই চিল্লা-চিল্লি? তা হইলে সোনাদানা গেলে কী করতেন?

ছেঁড়া পায়জামাই বা যাবে কেন? ইফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ গুড দেন হোয়াই ছেঁড়া পায়জামা—

ভৈরবকাকা ইংরিজিতে আর থই না পেয়ে থেমে যান। আমরা হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ি।

ভৈরবকাকা উত্তেজনা সামলে নিয়ে আবার বলেন, ছেঁড়া পায়জামাটা কোনও ফ্যাকটর নয়, ফ্যাকটর হল চুরিটা। আমার প্রশ্ন, চুরি হবে কেন?

দারোগাকাকা বলেন, কুত্তা পোষেন।

কুকুরই বা পুষতে হবে কেন?

তা হইলে চুরিও হইব।

আর তোমাদের যে পুষেছি। এত দারোগা পুলিশ যে সরকার রেখেছে আমাদের ট্যাঁক থেকে নিয়ে?

কই আর পুষলেন। ভাবছিলাম চাকরি ছাইড়া দিয়া আপনের পুষ্যিপুত্তুর হমু। কিন্তু আপনে তো কথাটা কানেই লন না।

কথায়-কথায় পলিটিকস এসে গেল এবং তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। আরও দু' রাউন্ড চা করতে হল। পরে দারোগাকাকা উঠতে উঠতে বললেন, চোরটারে ধরতে পারলে এমন শিক্ষা দিমু যে আর কওনের না। হারামজাদায় জানে না, ভৈরবদার ছিঁড়া পাজামা আমাগো ন্যাশনাল প্রপার্টি।

এ সব গোলমাল মিটলে বাড়িটা একটু ঠান্ডা হল। ভৈরবকাকার বদলে আজ দাদা বাজার করে এনেছে। ফলে রান্নাঘরে আমরা সবাই ব্যস্ত। এক প্রস্থ জলখাবার হবে, সেই সঙ্গে বাবার আর দাদার অফিসের ভাতও।

জলখাবারের চচ্চড়ির আলু ধুতে গিয়ে কুয়োর পাড়ে দেখি, চিনি বাড়ির মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে পড়তে উঠে এসে পুতুল স্নান করাচ্ছে।

বললাম, অ্যাই, মাস্টারমশাই বসে আছেন না?

ছোড়দার অঙ্ক দেখছেন তো!

তা বলে তুই এই সাতসকালে পুতুল খেলবি? যা।

সে গুটি-গুটি চলে যায়। ওর সোয়েটারটা গেছে আমার দোষেই। সামনের শীতের জন্য প্যাটার্ন তুলতে ওটা নিয়েছিল লিচু। কালই ফেরত দিয়ে গেছে। আলিস্যির জন্য আমি ওটা তুলে না রেখে ঠাকুমার ঘরে আলনায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

কালও কই হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটা কথাও তো বলেনি লিচু। আচ্ছা সেয়ানা মেয়ে যা হোক। ওদের বাড়িতে কখনও গান তুলতে গেলে ওই হারমোনিয়াম দেখলেই আমার হাসি পায়। মাগনা দিলেও নেওয়ার নয়। পাগলা দাশুকে খুব জক দিয়েছে ওরা।

গোমড়ামুখো দাদা কুয়োর পাড়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছে। বাথরুমে যাবে। দেশলাইটা কুয়োর কার্নিশে রেখে বলল, ঘরে নিয়ে যাস তো। নইলে কাক ঠোঁটে করে তুলে পালায়।

পাগলা দাশুকে চিনিস দাদা?

কোন পাগলা দাশু?

মল্লিকদের বাড়িতে যে এসেছে।

ও, অসিতের ভাই। পাগলা নয় তো। পাগলা হতে যাবে কেন?

কথাটা তুলেই আমার লজ্জা করছিল। ব্যাপারটা এত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ওই হারমোনিয়াম কেনার কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে! লিচুরা আচ্ছা ছোটলোক তো! কী বলতে ওই অখাদ্য হারমোনিয়ামটার জন্য দুশো টাকা নিল?

বাইরের ঘরে একটা বাজখাই গলা শুনে কুয়োতলা থেকেও বুঝতে পারলাম, মল্লিকবুড়ো অর্থাৎ আমার হবু শ্বশুর এসেছেন। চোর আসার খবর পেয়েই আসছে সবাই।

চচ্চড়ির আলু ধুয়ে রান্নাঘরে যেতেই মা বলল, বীরেনবাবুর চা-টা তুই-ই কর।

বীরেনবাবু অর্থাৎ মল্লিকবুড়োর চায়ে বায়নাক্কা আছে। দুধ বা চিনি চলবে না, লিকারে শুধু পাতিনেবুর রস মেশাতে হবে তাও টক চা হলে চলবে না। লিকারে শুধু একটু গন্ধ হবে।

আমি বাগানে পাতিলেবু আনতে যাওয়ার সময় বৈঠকখানার দরজায় পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম মল্লিকবুড়ো বলছেন, শেষ রাতে তো শুনলাম আমার বাগানেও চোর ঢুকেছিল। আমার ভাইপো কানু দেখেছে, ছুকরি একটা চোর বেলফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সাড়াশব্দ পেয়ে পালিয়ে যায়।

বাবা বললেন, ও। সে তো ফুলচোর!

আমি রাঙা হয়ে উঠলাম লজ্জায়।

পাগলা দাশু

দুনিয়ার কোনও কাজই বড় সহজ নয়। গান শেখা, সাইকেলে চড়া বা পাহাড়ে ওঠা। সহজ সুরের রামপ্রসাদী আমায় দাও মা তবিলদারি গানটা কতবার গলায় খেলানোর চেষ্টা করলাম। কিছুতেই হল না। অথচ সুরটা কানে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সহজ, অতি সহজ গান। কিন্তু আমার কান শুনলেও গলা সেই সুর মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। যে সুরটা কানে বাজছে কিন্তু গলায় আসছে না তাকে গলায় আনতে গেলে কী করা দরকার তা জানবার জন্য আমি সিভিল হাসপাতালের ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে একদিন হানা দিলাম।

খুবই ভিড় ছিল আউটডোরে। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় অবশেষে তার চেম্বারে ঢুকতে পেরেছি।

নমস্কার ডাক্তারবাবু।

নমস্কার। বলুন তো কী হয়েছে?

আমার কানের সঙ্গে গলার কোনও সমঝোতা হচ্ছে না।

তার মানে কী?

অর্থাৎ কানে যে গানটা শুনতে পাচ্ছি, কিছুতেই সেটা গলায় তুলতে পারছি না।

আপনি কি গায়ক?

না, তবে চেষ্টা করছি।

হাঁ করুন।

করলাম হাঁ। মস্ত হাঁ। ডাক্তার গলা দেখলেন, কপালে আটা গোল একটা আয়না থেকে আলো ফেলে নাক এবং কানও তদন্ত করলেন। তারপর মস্ত একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, হুঁ।

ডিফেক্টটা ধরতে পারলেন?

ডান কানে একটা তেকোনা হাড় উঁচু হয়ে আছে। নাকের চ্যানেলে ভাঙা হাড় আর পলিপাস। গলায় ফ্যারিনজাইটিস। সব ক'টারই ট্রিটমেন্ট দরকার। নাক আর কান দুটোই অপারেশন করালে ভাল হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এত কিছুর পর গান গলায় আসবে?

আশা তো করি।— বলে ডাক্তার মৃদু হাসলেন। চাপা স্বরে বললেন, এ সব কি হাসপাতালে হয়? বিকেলের দিকে আমার হাকিমপাড়ার বাসায় যে চেম্বার আছে সেখানে চলে আসবেন।

আমি চলে আসি।

আমার গলায় যে সুর খেলছে না সেটা আমাকে প্রথম ধরে দেয় পশুপতি। লিচুর মা কিন্তু রোজই ভরসা দিচ্ছেন যে, একটু-একটু করে আমার হচ্ছে। একদিন মা লাগাতে পারছি অন্যদিন রে-ও লাগছে।

পশুপতি আমার ওপর খুবই রেগে ছিল। হারমোনিয়াম কেনার পর দু' দিন আমার সঙ্গে দেখা করেনি। তিন দিনের দিন এসে ফালতু কথা ছেড়ে সহজ ভাষায় বলল, আপনার মতো আহাম্মক দেখিনি। ওই গর্দা মালের জন্য কেউ দুশো টাকা দেয়? টাকা কি ফ্যালনা নাকি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, পশুপতি, কোন জিনিসের আসলে কী দাম তা তুমিও জানো না আমিও জানি না। ঠকেছি না জিতেছি সে বিচারও বড় সহজ নয়।

আর আমি যে একশো টাকার খদ্দের ঠিক করে রেখেছি তার কী হবে? সে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। আমি তো আপনাকে পইপই করে বলে রেখেছিলাম পঁচাত্তর টাকার ওপরে উঠবেন না। আপনি মাল না চিনলেও আমি তো চিনি।

এ কথার কোনও জবাব হয় না। পশুপতিকে কী করে বোঝানো যাবে যে, লিচুদের বাড়িতে সেদিন এক মোহময় বিকেল এসেছিল। ছিল কনে দেখা আলো, ফুলের গন্ধ, হারমোনিয়ামের একাকিত্ব। মন বলছিল, কনে কই? কনে কই? সেই সময়ে কেউ টাকার কথা বলতে পারে? আমি তবু দুশো টাকা বলেছিলাম। এবং বলেই মনে হয়েছিল খুব কম বলা হয়ে গেল। লিচু, লিচুর মা বাবা বোন অবশ্য খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। হতভম্ব হয়ে গেল পশুপতিও। কিন্তু ওই দামের নীচে সেদিন যে হারমোনিয়ামটা কেনা ঠিক হত না তা কেউ বুঝবে না।

পশুপতি হঠাৎ খুব গরম হয়ে বলল, ওটা তো আপনার কোনও কাজেই আসত না। আমাকে একশো টাকায় দিয়ে দিন।

আমি বললাম, আমি একটু-আধটু গানের চর্চা করছি পশুপতি। এটা দেওয়া যাবে না।

পশুপতি ধৈর্য হারাল না। সে দিন চলে গেল বটে কিন্তু ফের একদিন এল। আমার গলা সাধা শুনল। বলল, এ জন্মে আপনার গান হবে না কানুবাবু। আপনার গলায় সুরের স-ও নেই।

অথচ সপ্তাহে দু' দিন সন্ধেবেলা আমি রিকশায় হারমোনিয়াম চাপিয়ে লিচুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হই। লিচুর মা শত কাজ থাকলেও সব ফেলে রেখে আমাকে গান শেখাতে বসেন, কাছে লিচুও বসে থাকে। আমার সা রে গা মা শুনে কেউ হাসে না, এবং উৎসাহ দেয়। গান শিখবার জন্য আমি লিচুর মাকে মাসে-মাসে পঁচিশ টাকা করে দেব বলেছি।

সকালের দিকে বাঘাযতীন পার্কে আমি সাইকেলে চড়া প্র্যাকটিস করি। দুটো সরু চাকার ওপর সাইকেলে কী ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কী ভাবেই বা চলে তা নিয়ে আমার মনে বহুকাল ধরে প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমি আগাগোড়া মধ্য কলকাতায় মানুষ। সেখানে সাইকেল আরোহীর সংখ্যা বেশি নয়, তা ছাড়া অঢেল ট্রাম বাস থাকায় সাইকেল চড়ারও দরকার পড়েনি। এই উত্তরবাংলার শহরে এসে দেখি, প্রচুর সাইকেলবাজ লোক চারদিকে। কাকার বাড়িতে তিন-তিনটে সাইকেল। একটা কাকা চালান, আর দুটো সাইকেল পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। কাকা বললেন, খামোকা রোজ অফিস যেতে আসতে রিকশা-ভাড়া দিস কেন? সাইকেলে যাবি আসবি। দুটো পয়সা বাঁচাতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সেই থেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সাইকেল কিছুতেই আমাকে সমেত খাড়া থাকতে চায় না। আসলে সাইকেলটা পড়ে যাবে আশংকা করে আমি নিজেও ডান বা বাঁদিকে একটু কেতরে থাকি। ফলে সাইকেল আরও তাড়াতাড়ি পড়ে যায়।

পশুপতি এই সব লক্ষ করে একদিন বলল, সাইকেল হল গরিবদের গাড়ি। আসল বাবুরা চলাফেরা করে রিকশা বা মোটরে। বীরেনবাবুকে কত বার বলেছি, আপনাদের তিন-তিনটে সাইকেল তার গোটা দুই আমাকে বেচে দিন। কিছুতেই রাজি হয় না। একবার বলে দেখবেন নাকি আপনার কাকাকে? ভাল দর দেব।

পশুপতি এ সব কথা ছাড়া দ্বিতীয় কথা জানে না। হয় কেনার কথা বলে, নয়তো বেচার কথা। হারমোনিয়ামটার আশা সে এখনও ছাড়েনি। আমি গানের আশা ছাড়লেই সে হারমোনিয়ামটা অর্ধেক দরে কিনতে পারবে বলে আশা করে আছে। সাইকেলের আশাও তার আছে।

কিন্তু আমি সাইকেল বা গান কোনওটার আশাই ছাড়িনি, আমার জীবনের মূলমন্ত্রই হল, চেষ্টা।

একদিন বিকেলে হঠাৎ লিচু এল।

তার চেহারাটা বেশ লাবণ্যে ভরা। একটু চাপা রং, চোখ দুটো বড় বড়, মুখখানা একটু লম্বাটে, থুতনির খাঁজটি বেশ গভীর। খুব লম্বা নয় লিচু, তবে হালকা গড়ন বলে বেঁটেও মনে হয় না। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব আছে শরীরে।

বলল, আপনি কি সত্যিই গান শিখবেন? নাকি ইয়ার্কি করছেন?

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

লিচু আমার নির্জন ঘরে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই চৌকির বিছানায় বসে বলল, আমরা খুব লজ্জায় পড়ে গেছি।

কেন, কী হয়েছে?

শুনছি, আমরা নাকি আপনাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে হারমোনিয়ামটা বেশি দামে বেচেছি।

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা কেন? দাম তো তোমরা বলোনি। আমি বলেছি।

সে কথা লোকে বিশ্বাস করলে তো? আপনি হারমোনিয়ামটা আমাদের ফেরত দিন, আপনার টাকা আমরা দিয়ে দেব।

কথাগুলো আমার একদম ভাল লাগছিল না। কলকাতায় হলে কে কার হারমোনিয়াম কত টাকায় কিনল এ নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা থাকত না। কিন্তু মফস্‌সল শহরগুলোয় ব্যক্তিস্বাধীনতা খুবই কম।

আমি লিচুকে বললাম, ফেরত দেওয়ার জন্য তো কিনিনি। আমি সিরিয়াসলি গান শেখার চেষ্টা করছি।

গান আপনার হবে না।

কে বলল?

আমি গলা চিনি, তা ছাড়া গান শেখার আগ্রহ আপনার নেই।

কে বলল?

আমিই বলছি। আমার মনে হয় আপনি ইচ্ছে করেই হারমোনিয়ামটা বেশি দামে কিনেছেন।

লোকে কি ইচ্ছে করে ঠকতে চায়?

আপনি হয়তো আমাদের গরিব দেখে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। কথাটা কেউ বুঝবে না, কেন আমি হারমোনিয়ামটার দুশো টাকা দাম বলেছিলাম। আমার তো মনে হয়, দুশো টাকাও বেশ কমই বলা হয়েছিল। কোন জিনিসের কত দাম তা আজও ঠিক-ঠিক কেউ বলতে পারে না।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, তা নয়। তোমরা তো তত গরিব নও।

আমরা খুবই গরিব।— উদাস স্বরে লিচু বলে, এতটাই গরিব যে, আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি যদি সকলের কাছে স্বীকার করি যে হারমোনিয়ামটার দর আমিই দিয়েছিলাম।

তাতেও লাভ নেই এখন। লোকে অন্যরকম সন্দেহ করবে। ভাববে, পুরনো জিনিস বেশি দামে কেনার পিছনে আপনার অন্য মতলব আছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। আমার অন্য কোনও মতলবই হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খারাপ কিছু নয়।

লিচু অবাক হয়ে বলে, কী মতলব?

আমি মৃদু হেসে বললাম, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, এই হারমোনিয়ামটা হাতছাড়া করতে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার বোন কাঁদছিল, তুমিও বাড়ি থেকে বোধ হয় রাগ করেই চলে গিয়ে অন্য বাড়িতে বসে ছিলে। এই হারমোনিয়ামটার ওপর তোমাদের মায়া মমতা দেখে আমার মনে হল, শুধু জিনিসটার দাম যাই হোক, এটার ওপর তোমাদের টান ভালবাসারও তো একটা আলাদা দাম আছে। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটার কথা ভেবে দ্যাখো। যে কসাইটা মহেশকে কিনতে এসেছিল তার কাছে শুধু চামড়াটুকুর যা দাম, কিন্তু গফুরের কাছে তো তা নয়। শোনো লিচু, আমি কসাই নই। আমি ভালবাসার দাম বুঝি।

শুনে লিচু কেমন কেঁপে উঠল একটু। চোখে জল ভরে এল বুঝি। মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, আমাদের বাড়িতে তেমন কোনও আনন্দের ব্যাপার হয় না, জানেন। বাবার একটা সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছে, তেমন চলে না। অভাবের সংসারে সুখ আর কী বলুন। তবু ওই হারমোনিয়ামটা ছিল, আমরা ওটাকে আঁকড়ে ধরেই বড় হয়েছি। যখন মন খারাপ হত, খিদে পেত কি রাগ হত তখন হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গান গাইতে বসে যেতাম। আমাদের কাছে ওটা যে কতখানি ছিল কেউ বুঝবে না।

তা হলে বিক্রি করলে কেন?

কী করব? বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আমাদের অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল। মা আমাদের অনেক বুঝিয়েছিল, হারমোনিয়ামটা বিক্রি করে এখন ধার কিছু শোধ করা হবে, পরে অবস্থা ফিরলে আমরা একটা স্কেল চেঞ্জার কিনবই। তখনই আমরা দুই বোন বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের একমাত্র আনন্দের জিনিসটাও আর থাকছে না। বাড়িটা একদম ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে এরপর।

তোমরা কত দাম আশা করেছিলে?

একশো টাকার বেশি কিছুতেই নয়। পশুপতিবাবুকে তো আমরা চিনি। উনিই আমাদের বাড়ির

বাসন কোসন, গয়না, পুরনো আসবাবপত্র সবই কিনেছেন বা বন্ধক রেখেছেন, এমনকী বাবার সাইকেলের দোকানটা পর্যন্ত ওঁর কাছে বাঁধা আছে। উনি কখনও বেশি দাম দেন না। তবে অভাব অনটন বা দরকারের সময় উনিই যে-কোনও জিনিস বাঁধা রেখে টাকা দেন বা পুরনো জিনিস কিনে নেন। আপনি দুশো টাকা দাম বলায় আমরা সবাই ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। পশুপতিবাবু অত বেশি দাম হাঁকার লোক নন।

আমাকে বোকা ভেবেছিলে বোধ হয়?

লিচু মাথা নেড়ে বলল, অনেকটা তাই। তবে আমার মনে হয়েছিল আপনি একটু পাগলাটে, ভাল মানুষ আর টাকাওয়ালা লোক।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলি, কথাটা ঠিক নয় লিচু। আমার কখনও মনে হয়নি যে, হারমোনিয়ামটা কিনে আমি ঠকে গেছি।

লিচু খুব অদ্ভুত অবাক-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আপনি সত্যিই ঠকেছেন। খুব ঠকেছেন। আমাদের খুব নিন্দে হচ্ছে। আপনার পায়ে পড়ি, হারমোনিয়ামটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। বাবা আপনার টাকা শোধ করে দেবে।

আমি তা জানি লিচু। তবু আমাকে কয়েকদিন ভেবে দেখতে দাও।

লিচু যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠল তখন জানালা দিয়ে কিছু রোদ ওর মুখে এসে পড়েছিল কি না ঠিক বলতে পারছি না, তবে মুখখানায় হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা গিয়েছিল।

রাত হলে রোজই আমি খাওয়ার আগে একটু সামনের বাগানে বেড়াই। আজ পূর্ণিমার ভর ভরন্ত চাঁদ যেন উদ্বৃত্ত জ্যোৎস্নায় ফেটে পড়েছে। গবগব করে নেমে আসছে জ্যোৎস্না। মাঠ ঘাট রাস্তা ভাসিয়ে ড্রেন বেয়ে যাচ্ছে। ছাদ থেকে রেনপাইপ বেয়ে নেমে আসছে। তেমন গরম নেই। বেলফুল ফুটেছে, তার মাতাল গন্ধে বাতাস মন্থর এবং ভারী। এত গন্ধে মাথা ধরে যায়। শ্বাসকষ্ট হয়। বুক কেমন করে। কলকাতায় আমি কখনও এতটা জায়গা পাইনি। এমন বিনা পয়সায় ফুলের গন্ধের হরির লুট ঘটে না সেখানে। চাঁদের আলো যে এত তীব্র হতে পারে তাও কলকাতায় কখনও খেয়াল করিনি। এ সবই আমার কাছে ভয়ংকর বাড়াবাড়ি। এত বেশি আমার পছন্দ নয় কিছুই।

খোলা রাস্তায় জ্যোৎস্নায় তাড়া খেয়ে একজন মানুষ মাথা বাঁচাতে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে কোলকুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কে ও? কর্ণবাবু নাকি?

জগদীশ মাস্টারমশাইকে এই জ্যোৎস্নায় একদম অন্যরকম লাগে। মুখের বুড়োটে খাঁজগুলোয় চোখের ঘোলাটে মণিতে কাঁচাপাকা দাড়িতে জ্যোৎস্নার ফোঁটা পড়েছে। নবীন যুবকের মতো তাজা কবি হয়ে গেছে মুখখানা। পরনে ধুতি, গায়ে হাফ হাতা শার্ট, হাতে ছাতা।

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছেন?

এই পথেই রোজ টিউশানি সেরে ফিরি। যাতায়াতের সময় রোজই শুনতে পাই আপনি গান করছেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে। বেশ লাগে। দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড গান শুনতেও ইচ্ছে করে। তবে সময় হয় না। রোজই ভাবি একদিন সামনে বসে শুনে যাব।

লজ্জা পেয়ে বলি, গান করছি বললে ভুল হবে। শিখছি।

ভেরি গুড, শেখা জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে। কোয়ালিফিকেশন যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। দুনিয়ায় কোয়ালিফিকেশনের মতো জিনিস হয় না। যত কোয়ালিফিকেশন তত অপরচুনিটি, যত অপরচুনিটি তত ফ্রিডম, যত ফ্রিডম তত মর‍্যাল কারেজ। কোয়ালিফিকেশন আরও বাড়াতে থাকুন। ছবি আঁকুন আর্টিকেল লিখুন. ল পড়ুন। কোয়ালিফিকেশনের অভাবেই দেখুন না, মোটে পাঁচটা টিউশানি করছি মেরে কেটে। সায়েন্স জানলে ডজনখানেক করতাম।

তা ঠিক।— আমি বলি।

জগদীশ মাস্টারমশাই এই জ্যোৎস্নায় কিছু মাতাল হয়েছেন। কোনওদিন এত কথা বলেন না। আজ ফটকের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, অবশ্য এখানে এই এঁদো জায়গায় কোয়ালিফিকেশন বাড়ানো খুবই কঠিন। আমার এক ছাত্রী শান্তিনিকেতনে নাচ শিখত। এখন তার খুব নামডাক।

জগদীশ মাস্টারমশাই কখনও ছাত্রীকে ছাত্রা ছাড়া বললেন না। ছাত্রী শব্দটা নাকি ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ নয়। আমি বললাম, তাই নাকি? খুব ভাল।

তার ওপর এম এ পাশ, গান জানে, ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। রং কালো হলে কী হয়, শুনছি খুব বড় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে। স্রেফ কোয়ালিফিকেশনের জোরে। এই জোরটা যে কত বড় তা অনেকেই বুঝতে চায় না। বললে ভাবে জগদীশ মাস্টার মাথা পাগলা লোক, আগড়ম বাগড়ম বকে।

বলতে কী জগদীশ মাস্টারমশাইয়ের কথাকে আমি মোটেই আগড়ম বাগড়ম মনে করছিলাম না, আমার মনে হচ্ছিল, কথাগুলো বেশ ভেবে দেখার মতো।

আমি ছাত্রদের নিচু ক্লাসেই শিখিয়ে দিই, কখনও কাম হিয়ার বলবে না, কাম একটা চলিষ্ণু শব্দ, হিয়ার একটা স্থান শব্দ। এই দুইয়ে মিল খায় না। তাই কাম হিয়ার বলতে নেই, বলতে হয় কাম হিদার। আমার এক ছাত্র নাইনটিন ফিফটিতে এক সাহেব কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল কাম হিদার কথাটা বলে।

আমি বেশ মন দিয়ে শুনি এবং অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বলি, তাই নাকি?

দুঃখের সঙ্গে জগদীশবাবু বলেন, দিনকাল আর আগের মতো নেই। ছেলেমেয়েরা আজকাল মাস্টারমশাইয়ের কথা গ্রাহ্য করে কই? এখানকার ফার্স্ট বয়ের খাতাতেও দেখবেন নিখুঁত বাঁধা উত্তর। উদ্ভাবনা নেই, মাথা খাটানো নেই, চিন্তাশীলতা নেই, নাইনটিন ফর্টিনাইনে কিংবা কাছাকাছি কোনও বছরে ম্যাট্রিক রচনা এসেছিল—কোনও এক মহাপুরুষের জীবনী, মেদিনীপুরের এক ছাত্র সেই রচনায় নিজের বাবার কথা লিখেছিল। লিখেছিল—দীনদরিদ্র পাঠশালার অল্প বেতনের পণ্ডিত আমার বাবা। কোন ভোর থাকতে উঠে উনি পুজোপাঠ সেরে বাড়ির সামনে তেঁতুলের ছায়ায় শতরঞ্চি পেতে বসেন। তাঁর ছাত্ররা আসে, পুত্রবৎ স্নেহের সঙ্গে তাঁদের বিবিধ বিদ্যা শেখান তিনি। বিদ্যা বিক্রয় পাপ বলে কারও কাছ থেকে কোনও টাকা নেন না। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরেন, কিন্তু আমাদের সর্বদাই তিনি চরিত্রবান হতে বলেন। বড়ই অভাবের সংসার আমাদের, তবু আমার বাবাকে আমি কখনও উদ্বিগ্ন হতে দেখি না। তিনি শান্ত, নিরুদ্বেগ আত্মবিশ্বাসী। ক্লাসে যেতে কখনও এক মিনিটও দেরি হয় না তাঁর। আমাদের বাড়িতে কোনও ঘড়ি নেই, তবু বাবাকে দেখি সর্বদাই সময়নিষ্ঠ। সাহায্যের জন্য কেউ এসে দাঁড়ালে কখনও তাকে বিমুখ করেন না। কোথায় কোন মানুষের কী বিপদ ঘটল তাই খুঁজে খুঁজে বেড়ান। পরোপকার কথাটা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি বলেন, পৃথিবীতে পর বলে কেউ নেই। এইরকমভাবে নিজের বাবার কথা লিখে গেছে আগাগোড়া। শেষ করে বলেছে, আমার জীবনে দেখা এত বড় মহাপুরুষ আর নেই। রচনাটা পড়তে পড়তে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ির লোক আর পাড়াপড়শিকে ডেকে ডেকে পড়িয়েছি, চেঁচিয়ে বলেছি, আমার সোনার ছেলে রে। আমার গোপাল রে। পঁচিশের মধ্যে তাকে চব্বিশ দিয়েছিলাম, মনে আছে। সেই সব ছেলেরা কোথায় গেল বলুন তো!

বলে জগদীশ মাস্টারমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তাঁর দেখাদেখি আমিও। জগদীশবাবুর দুঃখ হতেই পারে। কারণ তাঁর একমাত্র সন্তান পশুপতি তাঁকে দ্যাখে না। একই বাড়িতে ছেলে আর ছেলের বউয়ের আলাদা সংসার, ভিন্ন হাঁড়ি। ছেলের প্রসঙ্গ উঠলে জগদীশবাবু শ্বাস ছেড়ে শুধু বলেন, কুপুত্র। কুপুত্র। যতদূর মনে হয়, পশুপতিকে কোনও মহাপুরুষের জীবনী লিখতে দিলে সে কোনওকালেই জগদীশবাবুর কথা লিখবে না।

হঠাৎ জগদীশবাবু গলার স্বরটা নিচু করে বললেন, দামড়াটা আপনার কাছে খুব আনাগোনা করে বলে শুনেছি।

আমি ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলি, আসেন টাসেন, মাঝে মাঝে।

জগদীশবাবু ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিসিয়ে বলেন, খুব সাবধান। একদম বিশ্বাস করবেন না। নিজের ছেলে, তাও বলছি।

আমি পশুপতির হয়ে একটু ওকালতি করে বলি, কেন? এমনিতে লোক তো খারাপ নন।

জগদীশবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, লোক খারাপ নয়! বলেন কী? কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে। দামড়াটার জন্য সমাজে আমার মুখ দেখানোর উপায় নেই, সর্বদা তাই সঙ্গে ছাতা রাখি।

আমি আনমনে বললাম, ছাতা অনেক কাজে লাগে।

যথার্থই বলেছেন। ছাতার কাজ হয়, লাঠির কাজ হয়, আমি অনেক সময় বাজারের থলি না থাকলে ছাতায় ভরে আনাজপাতিও আনি, কিন্তু মুখ লুকোবার জন্য যে জগদীশমাস্টারকে একদিন ছাতার আশ্রয় নিতে হবে তা কখনও কল্পনা করিনি। কুপুত্র! কুপুত্র! ওর সংস্পর্শে আমার পর্যন্ত মর‍্যালিটি নষ্ট হয়ে গেছে, তা জানেন? ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমিই তো ওর হলে গার্ড ছিলাম। আমার চোখের সামনে দামড়াটা বই খুলে টুকছিল। দেখেও দেখলাম না। ধরলে আর-এ হয়ে যাবে। নিজের বিদ্যের জোরে পাশ করার মুরোদ নেই। শত হলেও নিজের ছেলে তো! দুর্বল হয়ে পড়লাম। এমনকী বাংলা পরীক্ষার দিন ব্যাকরণে মধ্যপদলোপীকে মধ্যপদলোভী লিখেছিল বলে সেটা পর্যন্ত কারেক্ট করে দিয়েছিলাম মনে আছে। তারপর থেকে আমি চাকরিতে মাস্টার হলেও জাতে আর মাস্টার নেই।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, ছেলেপুলের জন্য বাপ-মায়েদের অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, চরিত্র পর্যন্ত।— জগদীশবাবু বিষাক্ত গলায় বললেন, তবু কি হারামজাদার মন পেয়েছি নাকি? পাঁচটা পয়সা পর্যন্ত হাতে ধরে দেয় না কখনও। নাকের ডগায় বসে রোজ মাছ মাংস আর ভাল ভাল সব পদ বউ ছেলেপুলে নিয়ে খায়, কোনওদিন বাবা-মাকে একটু দিয়ে পর্যন্ত খায় না। সারাটা জীবন মাস্টারির আয়ে সংসার চালিয়েছি, ভালমন্দ তো বড় একটা জোটেনি। এই বয়সে একটু খেতে-টেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু খাব তার জো কী? গতকাল ডালনা খাব বলে এক জোড়া হাঁসের ডিম এনেছিলাম। আমার গিন্নি সে-দুটো সেদ্দ করে খোলা ছাড়িয়ে রেখেছেন ডালনা রাঁধবেন। এমন সময় বউমা বোধ হয় আবডালে থেকে ছোট নাতনিটাকে লেলিয়ে দিল। সে হাঁটি হাঁটি পায়ে এসে ঠাকুমার সামনেই থাবিয়ে ডিমদুটো খেয়ে চলে গেল। কিছু বলার নেই। নাতনি খেয়েছে। বুড়োবুড়ি রাতে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে ভাত গিললাম শুকনো মুখে। বড় ছেলে তাকিয়ে সবই দেখল, তবু একটা আহা উহু পর্যন্ত করল না। রোজই এমন হয়। ভালমন্দ রেঁধে খেতেই পারি না। নাতি নাতনিদের লেলিয়ে দেয়।

জগদীশবাবু খুব সন্তর্পণে ছাতাটা একটু ফাঁক করে দেখালেন, ভিতরে কাগজে মোড়া বড় মাছের দুটো টুকরো রয়েছে। বললেন, কালবোশ খুব তেলালো মাছ। গিন্নিকে বলা আছে মশলা-টশলা করে রাখবে। একটু বেশি রাত হলে নাতি নাতনিরা যখন অঘোরে ঘুমোবে তখন রেঁধে দু'জনে খাব।

বলে মৃদু মৃদু হাসলেন জগদীশবাবু। জ্যোৎস্নায় তাঁর চোখে ভারী স্বপ্নের মতো একটা আচ্ছন্নতা দেখা গেল। মাছের কথা বলার পরই দাঁড়ালেন না, বিদায় না জানিয়েই কেমন যেন সম্মোহিতের মতো হেঁটে চলে গেলেন।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের একটেরে নির্জন ঘরটায় বসে বসে বাইরের প্রবল জ্যোৎস্নার বাড়াবাড়ি কাণ্ড দেখতে দেখতে আমি অনেকক্ষণ কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম।

কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি তা খেয়াল নেই। গভীর রাতে লিচুদের হারমোনিয়ামটা যেন নিজে

নিজেই বেজে উঠল। খুব করুণ একটা গৎ ঘুরেফিরে বাজছে। মাঝে-মাঝে ফুটো বেলো দিয়ে হাঁফির টানের মতো ভুসভুসে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে বটে, তেমন মিঠে আওয়াজও হচ্ছে না। তবু সুরটা যে করুণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘুমের মধ্যেই আমি বললাম, কিছু বলছ?

আমি যে গান গেয়েছিলেম।

তাতে কী? সব হারমোনিয়ামই গান গায়। আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান তার বদলে তুমি...

প্রতিদান? তাও দিয়েছি তো! দুশো টাকা।

অর্ধেক ধরা দিয়েছি গো, অর্ধেক আছে বাকি...হারমোনিয়াম গাইতে লাগল।

কাটুসোনা

অনেকে মনে করে, অমিতের সঙ্গে আমার বুঝি ভাব-ভালবাসা আছে। তা মোটেই নয়।

এই শহরে কাছাকাছি থাকা হলে অনেকেই অনেকের চেনা হয়। তারপর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমাদের দুই পরিবারেও অনেকটা তেমনি। তা বলে অমিতের সঙ্গে আমার তেমন গাঢ় ভাব কোনওকালেই ছিল না। কথা হয়েছে খুবই কম। আমার দাদার বন্ধু বলে কখনও-সখনও অমিতদা বলে ডেকেছি মাত্র। অমিতও আমাকে তেমন করে আলাদাভাবে লক্ষ করত না।

অমিত খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলে, দারুণ ছাত্র, সব বিষয়েই সে ভীষণ সিরিয়াস, কথাবার্তা বেশি না, যেটুকু বলে তা খুব ওজন করে। এখান থেকে সে স্কলারশিপ নিয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে শিবপুরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়। সেখানেও আবার দারুণ রেজাল্ট করে। তারপর যায় আমেরিকায়। সেখানেও সে আরও পড়েছে, এখন বড় চাকরি করছে টেকসাসে। আমেরিকায় যাওয়ার কথা যখন হচ্ছিল তখনই আমার হবু শাশুড়ি আর শ্বশুর একদিন খুব সাজগোজ করে মিষ্টির বাক্স নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন।

গিন্নি গিয়ে সোজা শোওয়ার ঘরে ঢুকে মাকে বললেন, তোমার কাটুকে আমার অমিতের জন্যে রিজার্ভ করে রাখলাম।

প্রস্তাব নয়, সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবটা খুবই আচমকা, সৃষ্টিছাড়া। কেন না আমি তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি, ঢ্যাঙা রোগাটে চেহারা। সুন্দরী কি না তা সেই খোলস বদলের বয়সে অতটা বোঝাও যেত না। এখন যায়।

আমার হবু শ্বশুর বাইরের ঘরে বাবাকে প্রায় হুকুম করে বললেন, ও মেয়েটার আর অন্য জায়গায় সম্বন্ধ দেখবেন না।

বাবা অবশ্য তেড়িয়া মানুষ, নিজের পছন্দ-অপছন্দটা খুব জোরালো। গম্ভীর হয়ে বললেন, কেন?

আমার অমিত কি ছেলে খারাপ?

অমিতের কথায় বাবা ভিজলেন। চরিত্রবান, তুখোড়, গুণী অমিতকে কে না জামাই হিসেবে চায়? বাবা গলাটলা ঝেড়ে বললেন, খুব ভাল। তবে কিনা আমেরিকায় যাচ্ছে শুনছি!

তা তো ঠিকই।

সেখানে গিয়ে যদি মেম বিয়ে করে!

হবু শ্বশুর খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা কি আগের দিনের মতো বোকা? এখন আর মেম দেখে তারা ল্যালায় না, বুঝলেন! হাজার-হাজার বাঙালি

ছেলে বিদেশে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে ক'টা মেম বিয়ে করছে আজকাল?

বাবা ঠোঁটকাটা লোক। বলেই ফেললেন, আহা, শুধু বিয়েটাই কি আর কথা! ও দেশে গেলে চরিত্রও বড় একটা থাকে না। বড্ড বেশি সেক্স যে ওখানে!

হবু শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন ভায়া, তা যদি বলেন তবে গ্যারান্টি দিতে পারি না। অমিত ফুর্তি মারবার ছেলে নয়। যদি বা কারও সঙ্গে ফুর্তি মারে তবে তাকে শেষতক বিয়েও করবে। ছ্যাবলা নয় তো। তাই ওকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিন্তু অঘটনের সম্ভাবনা খুব কম পারসেন্ট। আর যদি কাটুকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে যায় তবে চন্দ্র সূর্য ভেঙে পড়লেও করবেই!

বাবা ভেবেচিন্তে বললেন, টোপটা বড় জব্বর। না গিলে করিই বা কী! তা গিললাম।

ভাল করে গিলুন, যেন বড়শি খসে না যায়।

বাবার জেরা হল উকিলের জেরা। পরের মুহূর্তেই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কাটুকে আপনাদের পছন্দই বা কেন?

মেয়ের বাপের তো এ প্রশ্ন করার কথা নয়। তারা বলবে, মেয়ে আমাদের অপছন্দ করলেন কেন? এ তো উলটো গেরো।

আফটার অল, ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকা ভাল।

হবু শ্বশুর একটু বিপাকে পড়ে বললেন, আসলে কী জানেন, মেয়েটিকে বোধ হয় আমি ভাল করে দেখিওনি, পছন্দের প্রশ্ন তাই ওঠে না। তবে আমার গিন্নির ভীষণ পছন্দ।

বাবা হেসে উঠে বললেন, এ তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

হবু শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, কথাটা ঠিকই। তবে খেতে খারাপ লাগে না। তা ছাড়া আমার মত হল, বিয়ের পর তো ঝগড়া করবে শাশুড়ি আর বউতে, তাই শাশুড়িরই বউ পছন্দ করা ভাল।

তবু কাটুকে আপনার নিজের চোখে একবার দেখা উচিত।

আহা, তার কী দরকার? ওসব ফর্মালিটি রাখুন। দেখার দরকার হলে রাস্তায় ঘাটেই দেখে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া ভাল করে দেখিনি বলে কি আর একেবারেই দেখিনি! শ্রীময়ী মেয়ে, অমিতের সঙ্গে মানাবে।

বাবা বিনয়ের ধার না ধেরে বললেন, আর একটা প্রশ্ন। ওকে যদি আপনাদের পছন্দই তবে অমিত আমেরিকায় যাওয়ার আগেই বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

শ্বশুরমশাই এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, সেটা কি উচিত হত? নিজের ছেলে সম্পর্কে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বলছি, অনেক দূর দেশে যাচ্ছে, সেখানে কী হয় না হয়, ভাল ভাবে ফিরতে পারে কি না কে বলবে! সেক্ষেত্রে একটা মেয়েকে দুর্ভোগে ফেলা কেন? আরও একটা কথা হল, বিয়ে হয়ে থাকলে দু'জনেরই মন টনটন করবে, উড়ু উড়ু হবে, বিরহ-টিরহ এসে ভার হয়ে বসবে বুকের ওপর। তাতে দু' জনেরই ক্ষতি।

বাবা এই দ্বিতীয় পয়েন্টটা খুব উপভোগ করলেন, হেসে বললেন, সে অবশ্য খুব ঠিক। আমি ওকালতি পরীক্ষার আগে বিয়ে করায় তিন বারে পাশ করেছিলাম।

শ্বশুরমশাই চিমটি কেটে বললেন, নইলে হয়তো ছয় বার লাগত।

এ সব কথা শুনে আমি সেদিন অবাক, কাঁদো কাঁদো। রেগেও যাচ্ছি। এ মা! আমার বিয়ে! আমি তো মোটে এইটুকু, সেদিন ফ্রক ছেড়েছি, এর মধ্যেই এরা কেন বিয়ের কথা বলছে? মাথা-টাথা কেমন ওলটপালট লাগছিল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব। মনে হয়েছিল, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই কোথাও।

বাইরের ঘরের পরদার আড়াল থেকে বাবা আর হবু শ্বশুরের কথা শুনে যখন চোখের জল মুছছি তখন চিনি এসে খবর দিল, মা ডাকছে।

গেলাম। শোওয়ার ঘরে বিছানায় দুই গিন্নি বসে। শাশুড়ি একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে

বসালেন। বললেন, পেট ভরে খাবে দু'বেলা। শরীর সারলে তোমার রাজরানির মতো চেহারা হবে।

এইটুকু হয়ে আছে আজ ক' বছর হল। বলতে নেই আমার শরীর সেরেছে। লোকে সুন্দরীই বলে। বাপের বাড়িতে আমার জীবনটা যেমন সুখে কাটছে শ্বশুরবাড়িতেও তেমনি বা হয়তো তার চেয়েও সুখে কাটবে।

তবে দুঃখও কি নেই? এই যেমন বাপি মরে যাওয়ার দুঃখ, পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ার দুঃখ, বিনা কারণে মন খারাপ হওয়ার দুঃখ। তবে এ সব তো আর সত্যিকারের দুঃখ নয়! আমি বেশ বুঝে গেছি, এই বয়সে আমার চেয়ে সুখের জীবন খুব বেশি মেয়ের নেই। সেইজন্যই আমার ওপর হিংসেও লোকের বড় কম নয়।

গরিব হলেও লিচুদের খুব দেমাক। ভাঙে তো মচকায় না। আমার সুখে ওর বুকটা যদি জ্বলত তবে এক রকম সুখ ছিল আমার। কিন্তু তা হওয়ার নয়। আজ পর্যন্ত ও অমিত আর আমার বিয়ে নিয়ে তেমন কিছু বলেনি। অমিতের মতো এত ভাল পাত্র যে হয় না তাও স্বীকার করেনি কোনওদিন।

বলতে নেই, লিচু দারুণ গান গায়। এই শহরে যত ফাংশন হয়, ও তার বাঁধা আর্টিস্ট। শিলিগুড়ি রেডিয়ো স্টেশনে বহুবার ওর গান হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শিগগির কলকাতা থেকেও ডাক আসবে। প্র্যাকটিস করার জন্য ওর স্কেল চেঞ্জারের দরকার ছিল। কিন্তু সেটা হল না। পুরনো হারমোনিয়ামটা পাগলা দাশুকে দুশো টাকায় গছিয়েও স্কেল চেঞ্জারের দামের কানাকড়িও ওঠেনি।

আমিও ছাড়িনি। সে দিন নিউ মার্কেটে দেখা। এ কথা সেকথার পর বললাম, তোরা নাকি পুরনো হারমোনিয়ামটা বেচে দিয়েছিস?

শুনে মুখ চুন হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ, বীরেনবাবুর এক ভাইপো এসেছে কলকাতা থেকে, সে জোর করে কিনে নিল।

জোর করে কেন? তোদের বেচার ইচ্ছে ছিল না নাকি?

আমার ছিল না। মা তবু বেচে দিল।

কততে বেচলি?

দুশো টাকায়।

বাঃ, বেশ ভাল দাম পেয়েছিস তো!

আমরা দাম-টামের কথা বলিনি, উনিই ওই দাম দিলেন।

লোকটা বেশ সরল আর বোকা বোধ হয়!

কে জানে? তোর হবু দেওর, তোরই বেশি জানার কথা।

আমি ও বাড়িতে যাই বুঝি? লোকটাকে চোখেই দেখিনি।

লিচু এবার খুব একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল, দেখে নিস। দেখতে খারাপ নয়।

আমিও খোঁচা দিতে ছাড়িনি, যার ইন্টারেস্ট আছে সেই বুঝুকগে খারাপ কি ভাল। আমার দরকার নেই।

লিচু বেশ অহংকারের সঙ্গেই বলল, তবে আমি ঠিক করেছি হারমোনিয়ামটা নিয়ে ওঁর টাকাটা ফেরত দেব।

কেন? আরও বেশি দাম পাবি নাকি?

মোটেই না। বরং দামটা উনি বেশি দিয়েছেন বলেই ফেরত দেব।

তাতে লাভ কী?

সব ব্যাপারেই লাভ চাইলে চলবে কেন?

আমি একটু শ্লেষের হাসি হাসলাম। যাদের ঘটিবাটি বিক্রি করে খাওয়া জোটাতে হয় তাদের

মুখে দেমাকের কথা মানায় না। বললাম, তাই নাকি? শুনলেও ভাল লাগে।

লিচুর মুখ আবার চুন হল। মৃদুস্বরে বলল, উনি গান গাইতেও জানেন না। হারমোনিয়ামটা শুধু শুধুই কিনেছেন।

আমি তো শুনেছি, তোরা ওঁকে গান শেখাচ্ছিস!

সেটাও ওঁর মরজি। আমরা তো সাধতে যাইনি।

তবু শেখাচ্ছিস তো?

শিখতে চাইলে কী করব?

শেখাবি।— উদাস ভাব করে বললাম।

লিচু একটু রেগে গিয়ে বলল, আমরা শেখালে যদি দোষ হয়ে থাকে তবে তুই-ই শেখা না!

এটা আমাকে গায়ে পড়ে অপমান। আমি বাথরুমে একটু-আধটু গুনগুন করি বটে, কিন্তু সত্যিকারের গান জানি না। এই গান না জানা নিয়ে মল্লিকবাড়ির কর্তা গিন্নির একটু দুঃখ আছে। বীরেনবাবু এককালে এ শহরের নামকরা তবলচি ছিলেন। অমিত কিছুকাল কলকাতায় ক্ল্যাসিকাল শিখেছিল, তবে এখন আর গান গাইবার সময় পায় না।

তবে গান না জানায় আমার জীবনে তো কোনও বাধা হয়নি। একটু দুঃখ মাঝে-মাঝে হয় বটে কিন্তু সেটিও সত্যিকারের দুঃখ কিছু নয়। গান না জানাটাকেও আমি আমার অহংকারের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। সকলের তো গান জানার দরকার হয় না।

তাই আমি দেমাক করে বললাম, আমি শেখাতে যাব কেন? গানের মাস্টারি করে তো আমাকে পেট চালাতে হবে না। গান শেখা বা শেখানোর দরকারই হয় না আমার। আমাদের বাড়িতে বাইজিবাড়ির মতো সব সময়ে গান বাজনা হয়ও না।

লিচু কতটা অপমান বোধ করল জানি না। তবে মুখটা আরও একটু কালো হয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল, কর্ণবাবুকে আমরা আর গান শেখাব না বলেও দিয়েছি।

পাগলা দাশুর নাম যে কর্ণ তা এই প্রথম জানলাম। কেউ তো বলেনি নামটা আমাকে। তবু সেই অচেনা মানুষটা যেহেতু আমার শ্বশুরবাড়ির দিককার লোক সেই জন্য ওঁর হারমোনিয়াম কেনা নিয়ে মনে মনে লিচুদের ওপর একটা আক্রোশ তৈরি হয়েছিল আমার। লিচুকে খানিকটা অপমান করতে পেরে জ্বালাটা জুড়োল।

আমি ভোরবেলায় উঠি বটে কিন্তু ভৈরবকাকার মতো ব্রাহ্মমুহূর্তে নয়। সেদিন মাকে বললাম, এবার থেকে আমি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠব, আমাকে ডেকে দিয়ো তো।

উঠে কী করবি?

গলা সাধব।

মা একটু অবাক হলেও কিছু বলল না।

বাবাকে গিয়ে বললাম, আমার একটা স্কেল চেঞ্জার চাই।

বাবাও অবাক হয়ে বলল, কী করবি?

গান গাইব।

বাবা শুনে খুশিই হলেন। বাবা মানুষের কর্মব্যস্ততা পছন্দ করেন। কাজ না থাকে তো যা হোক কিছু করো, পরের কাজ টেনে নাও নিজের ঘাড়ে। সময় যেন বৃথা না যায়।

বাবা বললেন, কিন্তু তোকে শেখাবে কে?

কালীবাবুর কাছে শিখব। ওঁকে তুমি রাজি করাও।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্কেল চেঞ্জার এসে গেল। কালীবাবুও রাজি হলেন। উনি অবশ্য অ্যাডভান্সড ছাত্রছাত্রী ছাড়া নেন না, কিন্তু টাকা এবং প্রভাবে কী না হয়!

আমার গলা শুনে কালীবাবু খুব হতাশও হলেন না। বললেন, গলায় প্রচ্ছন্ন সুর আছে। শান দিলে

বেরিয়ে আসবে। সকালে আর বিকেলে কম করেও দু' ঘণ্টা করে গলা সেধো।

তা সাধতে লাগলাম। প্রথম দিকে বুকের জ্বালা, আক্রোশ, টেক্কা মারার প্রবল ইচ্ছেয় দু' ঘণ্টার জায়গায় তিন-চার ঘণ্টাও সাধতে লাগলাম।

কিন্তু গলায় প্রচ্ছন্ন সুর থাকলেও আমার ভিতরে গানের প্রতি গভীর ভালবাসা নেই। তাই গলা সাধার পর খুব ক্লান্তি লাগে। তবু ছেড়েও দিচ্ছি না।

খবর পেয়ে মল্লিকবাড়ির কর্তা একদিন এসে হাজির। বললেন, তবলাডুগি কোথায়? তবলচি ছাড়া কি গান হয়? দাঁড়াও আমিই পাঠিয়ে দেবখন। আমারটা তো পড়েই আছে।

ভাবী বউমা গান শিখছে জেনে ভারী খুশি হয়েছেন, ওঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। চিনি ছাড়া চা করে দিলাম। চুমুক দিয়ে বললেন. চমৎকার! সবই চমৎকার। কী চমৎকার তা অবশ্য ভেঙে বললেন না।

সেই দিনই ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে ডুগি তবলা এল। রিকশা থেকে চামড়ার ওপর গদির ঢাকনা দেওয়া পেতলের ডুগি আর তবলা নিয়ে ও বাড়ির চাকর নামল। তবলার সঙ্গে শাড়ির পাড় দিয়ে জড়ানো বিড়ে পর্যন্ত।

দেখে এমন লজ্জা পেলাম!

মল্লিকবাড়ির চাকর সর্বেশ্বর বলল, বাবু তো শিকদার তবলচিকে দিদিমণির জন্য ঠিক করেছেন। কালী গায়েনের সঙ্গে তিনিও আসবেন।

শুনে আমার হাত পা হিম হওয়ার জোগাড়। একেই কালীবাবুর কাছে গান শেখাটাই আমার আস্পদ্দা, তার ওপর শিকদার তবলচি। শিকদার হলেন এ জেলার সবচেয়ে ওস্তাদ লোক। কলকাতার সদারঙ্গ আর বঙ্গ সংস্কৃতিতেও বাজিয়েছেন। শোনা যায় কণ্ঠে মহারাজের কাছে শিখেছিলেন। দুই বাঘা ওস্তাদ আমার মতো আনাড়িকে শেখাতে আসবেন শুনে আমার গান সম্পর্কে ভয় বরং আরও বাড়ল।

বাড়ির লোকও আয়োজন দেখে কিন্তু-কিন্তু করছে। ব্যাপারটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তা আমিও টের পাচ্ছি। কিন্তু বড়শি গিললে আর কি ওগরানো যায়?

আমার রাশভারী দাদা বলল, এ যে একেবারে মাথা ধরিয়ে ছাড়লি রে কাটু!

বাঁটুল আর চিনিকে পড়াতে আসেন জগদীশ মাস্টারমশাই। এ বাড়ির বাঁধা প্রাইভেট টিউটর। ওঁর কাছে দাদা পড়েছে, আমিও পড়েছি। গান বাজনা শুনে উনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, এই তো চাই। কোয়ালিফিকেশন যত বাড়ানো যায় ততই মানুষের শক্তি বাড়ে। খুব গাও, গেয়ে একেবারে ঝড় তুলে দাও। সঙ্গে নাচও শিখে ফেলো। ছবি আঁকা, হোমিওপ্যাথি, ইলেকট্রিকের কাজ যা শিখবে তাই জীবনে কাজে লাগবে।

আমি হাসি চাপবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঁটুল আর চিনি এমন বদমাশ যে, হি হি করে ওঁর মুখের সামনেই হেসে ফেলল। সেই দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়েও আমি হাসি সামলাতে পারলাম না।

জগদীশবাবু সরল মানুষ। হাসি দেখে নিজেও হাসলেন। বললেন, ইদানীং একটা গানের হাওয়া এসেছে মনে হচ্ছে। বীরেনবাবুর ভাইপোও গান শিখছে। চারদিকেই গান আর গান। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকেই গানের শব্দ কানে আসে।

আড়চোখে লক্ষ করি, জগদীশবাবুর জামার পকেট থেকে কাগজে মোড়া লটকা মাছের শুঁটকি উঁকি দিচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শহরের সব বাড়িতে সবাই গান গাইলে আমার আর গান শেখার মানে হয় না।

একদিন সকালে উঠে গলা সাধতে বসে হারমোনিয়ামটার দিকে ক্লান্তভাবে চেয়ে রইলাম। একদম ইচ্ছে করছে না গলা সাধতে।

ভৈরবকাকা প্রাতঃভ্রমণে বেরোচ্ছিলেন। আমি বললাম, আমিও যাব।

গলা সাধবি না?

একদিন না সাধলে কিছু হবে না। ফিরে এসে সাধবখন।

চল তা হলে।

এক-একটা সময় আসে যখন ঘাড়ে ভূত চাপে। মাথাটা পাগল-পাগল লাগে। সারা শরীরে খুসখুস একটা ভাব। তখন বেহেড একটা কিছু করতে ইচ্ছে যায়। মনে হয় ঢিল মারি, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আবোল-তাবোল বলি, ছন্নছাড়া উন্মাদের মতো খুব নাচি, হঠাৎ গিয়ে রাস্তার লোকের কান মলে দিই, হোঃ হোঃ করে হাসি কিংবা হাউমাউ করে কাঁদি।

কোনও মানে হয় না, তবু এ রকম হয়। আজ সকালে আমার এ রকম হচ্ছিল।

ভৈরবকাকাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে আমি সত্যিই রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে এ বাড়ি সে বাড়ির ছাদে ছুড়ে মারতে লাগলাম। টিনের চাল না হলে শব্দ হয় না। কী করব, ধারে কাছে টিনের চালই নেই। তখন কাকভোরের মায়াবী অন্ধকারে আমি খোঁপা খুলে চুল এলো করে দিই, কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়াই, তারপর চৌপথিতে দাঁড়িয়ে ধিন ধিন করে খানিকটা বেতালা নেচে নিই।

শুলশুল ভাবটা তবু যায় না।

মনের মধ্যে লুকোনো দুষ্টামি ছিলই। নইলে খামোকা আবার মল্লিকবাড়ির ফটক খুলে বাগানে ঢুকব কেন? ধরা পড়লে লজ্জার একশেষ। বাড়ির ভাবী বউয়ের কোমরে আঁচলবাঁধা এলোকেশী মূর্তি দেখলে কর্তা গিন্নি মূর্ছা যাবেন।

তবু কেন যে মনের মধ্যে এমন পাগল-পাগল! আমি গাছ মুড়িয়ে ফুল ছিঁড়তে থাকি। কোঁচড় ভরে ওঠে। তবু ছাড়ি না। ওদিকে আকাশ ফরসা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন জেগে উঠছে। ফুল ছেড়ে আমি কয়েকটা গাছের নরম ডাল শব্দ করে ভেঙে দিলাম।

ধরা পড়ব? পড়েই দেখি না!

পাগলা দাশু

মেয়েটা যে চোর নয় তা আমি জানি। এর আগেও ওকে একদিন ফুল চুরি করতে দেখেছি। তবে ফুল চুরি সত্যিকারের চুরির মধ্যে পড়ে না বলে আমি ওকে ধরিনি।

লিচুদের হারমোনিয়াম ফেরত দিয়েছি। লিচুর বাবা আমাকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলেছেন বাকিটা পরে দেবেন।

পশুপতি সব খবরই রাখে। হারমোনিয়াম ফেরত দেওয়ার পরের দিন এসে এক গাল হেসে বলল, ও টাকা আর পেয়েছেন!

আমি বললাম, ওরা লোক খারাপ নয়।

আপনি ওদের কতটুকু চেনেন? আমি বহুকাল ধরে ওদের জানি।

কী জানেন?

জানি যে হারমোনিয়ামের টাকা আপনি ফেরত পাবেন না। ওই যে পঁচিশটা টাকা ঠেকিয়েছে ওই ঢের। বরং আমাকে অর্ধেক দামে দিলেও আপনার শতখানেক টাকা উসুল হত।

আমি একটু সন্দিহান হই। কেন যেন মনে হচ্ছে, টাকাটা আমি সত্যিই পাব না। তবু দৃঢ়স্বরে বলি, ওদের আত্মমর্যাদার বোধ বেশ টনটনে।

আপনি সবাইকেই ভাল দ্যাখেন। অভ্যেসটা খারাপ নয়। কিন্তু এটা ভালমানুষীর যুগ নয় কিনা।— বলেই পশুপতি আচমকা জিজ্ঞেস করে, লিচুকে আপনার কেমন লাগে?

আমি একটু থতমত খেয়ে বলি, হঠাৎ একথা কেন?

কারণ আছে বলেই জানতে চাইছি।— পশুপতি মিটিমিটি হাসে।

আমি পশুপতির মতলবটা বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করে বলি, খারাপ কী? ভালই তো।

কচু বুঝেছেন।

তার মানে?

পশুপতি একটা শ্বাস ফেলে বলে, বেশি ভেঙে বলতে চাই না তবে এবার থেকে লিচু বোধহয় আপনার কাছে একটু ঘন ঘন যাতায়াত করবে।

কেন?

যুবতী মেয়েদের দিয়ে অনেক কাজ উদ্ধার হয় কিনা। আপনি পাত্র হিসেবেও ভাল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, খোলসা করে বলুন তো। কাজ উদ্ধারের কথাটা কী?

দূর মশাই! এ তো আজকাল বাচ্চারাও বোঝে।

আমি বাচ্চাদেরও অধম।

পশুপতি কথাটা স্বীকার করে মাথা নাড়ল, সেটা মিথ্যে বলেননি। নইলে কেউ ভাঙা হারমোনিয়ামের জন্য দুশো টাকা দেয়! সে তো না হয় টাকার ওপর দিয়ে গেছে, কিন্তু এখন যে আপনার জীবন নিয়ে টানাটানি।

তার মানে?— আমি অবাক হই, একটু চমকেও যাই।

লিচুকে আপনার সঙ্গে ভজানোর তাল করেছে। লিচুর বাবা একটু গবেট বটে, কিন্তু মা অতি ঘড়েল। মতলবটা তারই।

বাজে কথা। ওরা ওরকম নয়।

পশুপতি মিটিমিটি হাসে। বলে, লিচুর মা লোক চেনে, যে মানুষ ভাঙা হারমোনিয়াম দুশো টাকায় কিনতে পারে সে কালো কুচ্ছিত মেয়েকেও বিনা পণে ঘরে তুলতে পারে। দুনিয়ায় কিছু বোকা লোক না থাকলে চালাকদের পেট চলত কী ভাবে?

আমি কথা খুঁজে না পেয়ে বলি, লিচু মোটেই কালো কুচ্ছিত নয়।

ও বাবা! তাহলে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। পশুপতি খুব আহ্লাদের হাসি হেসে বলে, বলে কী! লিচু কালো কুচ্ছিত নয়? লিচুর মা সত্যিই লোক চেনে দেখছি!

আমি শ্লেষের হাসি হেসে বলি, আমি অত বোকা লোক নই।

না হলেই ভাল। সুপাত্ররা হচ্ছে উঁচু গাছের ফল। পাড়তে আঁকশি লাগে। মেহনত লাগে। শুধু লক্ষ রাখবেন যেন নজরটা ছোট করতে না হয়।

আপনার সন্দেহটা অমূলক। লিচু আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেনি।

পশুপতি বলল, এবার করবে, যাতে আপনি টাকার তাগাদাটা না করতে পারেন। আপনি মল্লিকবাবুর ভাইপো, তায় ভাল চাকরি করেন। লিচু যদি আপনাকে ভজাতে পারে তো হারমোনিয়ামের ফেরত-টাকাটাও ঘরে রইল। ভাল জামাইও জুটল।

যাঃ!

পশুপতি নিচু স্বরে বলল, আমি ওদের হারমোনিয়ামটার জন্য গতকালই পঁচাত্তর টাকা অফার দিয়ে এসেছি। কিন্তু ওদের নজর আপনি উঁচু করে দিয়ে এসেছেন। পঁচাত্তর শুনে বাড়িশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। লিচুর মা এখন পৌনে দুশো হাঁকছে। যাক সে কথা। কাল ওই দরাদরির ফাঁকেই লিচুর মা বলে ফেলল, কর্ণবাবুর সঙ্গে লিচুকে বেশ মানায়। মনে হয় কর্ণবাবুরও লিচুকে পছন্দ।

আমি কথাটার মধ্যে খারাপ কিছু খুঁজে না পেয়ে বলি, তাতে কী হল?

এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে সাবধান করে দিলাম। উঁচু গাছের ফল উঁচুতেই ঝুলে থাকবার

চেষ্টা করবেন। টুক করে যার তার কোঁচড়ে খসে পড়বেন না। আর একটা কথা।

কী?

টাকাটা যদিও ওরা দেবে না, তবু আপনি তাগাদা দিতেও ছাড়বেন না। আমার এক চেনা লোককে একবার পঁচিশটা টাকা ধার দিয়েছিলাম। মহা ধুরন্ধর লোক, ছ' মাস ঘুরিয়ে কুড়িটা টাকা শোধ দিল, পাঁচটা টাকা আর দেয় না। ভেবেছিল কুড়ি টাকা পেয়ে ওই পাঁচটা টাকা বোধহয় আমি ছেড়ে দেব। আমি কিন্তু ছাড়িনি। প্রতি সপ্তাহে গিয়ে তার দোকানে দেখা করেছি, চা খেয়েছি, গল্প করেছি, উঠে আসবার সময় বলেছি, আমার সেই পাঁচটা টাকা কবে দেবেন? মনে মনে জানতাম, দেওয়ার মতলব নেই, তবু তাগাদা দেওয়াটা ধর্ম হিসেবে নিয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর পরে লোকটা তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ পাঁচটা টাকা একদিন ঝপ করে দিয়ে ফেলল। তাই বলছি, লোককে তাগাদা দিতে ছাড়বেন না। দেনাদারকে তার দেনার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দিতে নেই। সবসময়ে তাগাদায় রাখলে সে তার অন্যমনস্কতা বা কুমতলব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, সে আমি পারব না।

পশুপতি খুব আন্তরিকভাবে বলে, কথাটা অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখুন। যদি আপনার টাকাটা ওরা মেরেই দেয় তবে সেটা তো ওদের পাপই হল? জেনেশুনে একটা লোককে পাপের ভাগী হতে দেওয়াটা কি ভাল? শক্ত কাজ কিছু তো নয়!

তাগাদা দিতে আমার লজ্জা করবে। থাকগে টাকা।

পশুপতি স্নেহের সঙ্গে বলে, আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। একটু শক্ত-পোক্ত না হলে, চক্ষুলজ্জা-টজ্জা বাদ না দিলে এই মতলববাজদের দুনিয়ার টিঁকে থাকবেন কী করে? কী করতে হবে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে হিলকার্ট রোডে লিচুর বাবার সাইকেলের দোকানে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হবেন। বৃষ্টি-বাদলার কথা বলবেন, বাজার দরের কথা বলবেন, চলে আসবার সময় খুব আলতো করে বলে আসবেন, সেই হারমোনিয়ামের টাকাটার কথা মনে আছে তো? ব্যস, ওতেই হবে। শুধু মনে করিয়ে দেবেন মাঝে মাঝে।

আমি চুপ করে আছি দেখে পশুপতি মিটিমিটি হেসে বলল, দাসীর কথা বাসি হলে কাজে লাগে। একটা পরামর্শ দিয়ে রাখি। লিচু যদি বেশি মাখামাখি করতে আসে, আর আপনিও যদি ভজে যান, আর তারপর যদি কখনও ওর হাত থেকে বাঁচবার জন্য আঁকুপাঁকু করেন তাহলে মাঝে মাঝে লিচুকেও টাকার কথাটা বলবেন। প্রেম কাটানোর এমন ওষুধ আর নেই। টাকার তাগাদা হল হাতুড়ির ঘা, আর প্রেম হল ঠুনঠুন পেয়ালা।

ব্যাপারটা এই পর্যন্ত হয়ে থেমে আছে। পশুপতির কথায় আমি গুরুত্ব দিইনি বটে কিন্তু ভাবী একটা অস্বস্তি হচ্ছে সেই থেকে। গতকাল সকালেই লিচুর বাবা এসে ওঁদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর নেমন্তন্ন করে গিয়েছিল। আমি যাইনি অস্বস্তিতে। নিজের ওপর আমার কোনও বিশ্বাস নেই। এই সেদিনও হারমোনিয়ামটা কিনতে গিয়ে আমার মন 'কনে কই, কনে কই' বলে নাচানাচি জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমার কনে তো ঠিক হয়েই আছে, কতকাল ধরে। কলকাতার হিদারাম বাঁড়ুজ্জে লেনের সায়ন্তনীই আমার সেই ভাবী কনে। তবু যে আমার মন মাঝে মাঝে দুর্বল হয় তার কারণ বোধ হয়, সায়ন্তনী আর আমার মাঝখানে কয়েকশো মাইলের মাঠ-ঘাট, জল-জঙ্গল, নদী-নালার দূরত্ব। তারপর উত্তরের এই হিমালয়-ঘেঁষা জায়গাটার দোষ আছে। প্রথম প্রথম এখানে এসে আমার কলকাতার জন্য মন কেমন করলেও ধীরে ধীরে এ জায়গার বাতাসে একটা গভীর বনজঙ্গলের মাতলা গন্ধ, উত্তরে ভোরের ব্রোঞ্জ-রঙা পাহাড়ের ধীরে ধীরে রং পালটানো, উদাস আকাশ আমাকে নানা ব্যঞ্জন দিয়ে ধীরে ধীরে মেখে ফেলেছে। ছুটির দিনে নতুন নতুন পাহাড় আর জঙ্গল খুঁজতে গিয়ে এমন গভীর নির্জনতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তাই ধীরে ধীরে কলকাতার কথা ভুলে যাচ্ছি। কলকাতার কথা মনে না পড়লে

কিছুতেই সায়ন্তনীর কথাও মনে পড়ে না। আর যত সায়ন্তনীর কথা মনে না পড়ে তত আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

আজকাল আমি নিয়ম করে রোজ সকাল বিকেল দু' ঘণ্টা করে কলকাতা আর সায়ন্তনীর কথা ভাবতে চেষ্টা করি। ঠিক পরীক্ষার পড়ার মতো করে। কিন্তু খারাপ পড়ুয়া যেমন বারবার ঘ্যান ঘ্যান করে মুখস্থ করেও পড়া ভুলে যায়, আমারও অবিকল সেই অবস্থা।

আজও ভোরবেলা উঠে আমি জানালা দিয়ে ব্রোঞ্জ রঙের পাহাড়ের দিকে চেয়েই বুঝলাম, ওই চুম্বক পাহাড় রোজই একটু একটু করে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মগজ ধোলাই করছে। কলকাতাকে মনে হয় পিকিং বা আডেলেডের মতো দূরের শহর।

ফলে আজ সকালে আমি উঠে প্রথমে কিছুক্ষণ কলকাতার অলিগলি, আবর্জনা, ডবলডেকার, ট্রাম, মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া আর হাওড়ার ব্রিজের ছবি ধ্যান করলাম। খুবই অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া দেখাল। এরপর কিছুক্ষণ সায়ন্তনীর কথা ভাবতে গিয়ে আতঙ্কে আমার বুক হিম হয়ে গেল। কালও সায়ন্তনীর ছোট কপাল, থুতনি আর কানের বড় বড় লতি ধ্যানে দেখতে পেয়েছিলাম। আজ শুধু কপালটা ধ্যানে এল, বাকিটা একদম মনে পড়ল না। আগামীকাল যদি ধ্যানে সেই কপালটুকুও না আসে!

প্রাণপণে সেই কপালটাকেই যখন স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছি তখনই ফটকে শব্দ। ফুলচোরের আগমন।

এই মেয়েটাকে আমি আগেও একবার ফুল চুরি করতে দেখেছি। কিছু বলিনি। আজও ভাবলাম কিছু বলব না। বাগান থেকে কিছু ফুল চুরি গেলে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমার মনের বাগানের সব ফুলই যে চুরি হয়ে গেল! কলকাতা নেই, সায়ন্তনী নেই! তবু যে কী করে বেঁচে আছি!

জানালাটা ভেজিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে রইলাম চোখ বুজে।

কিন্তু ফুলচোরের সাহস আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে। আমার জানালার নীচে দোলনচাঁপার গাছের নরম ডগাগুলো ভাঙছে মটমট করে, গন্ধরাজের গাছে প্রায় ঝড় তুলল কিছুক্ষণ, তারপর চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ মাড়িয়ে বাগানের পশ্চিমধারে কলাবতীর বনে ঢুকল মত্ত হাতির মতো।

এতটা সহ্য করা যায় না। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

বাগানে যখন পা দিয়েছি তখন চারদিক বেশ ফরসা। সবই প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গন্ধরাজ গাছের পাশে ফুলচোরকেও জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এবং আশ্চর্যের কথা, ফুলচোরও আমাকে বড় বড় চোখে দেখছে। ভয় পাচ্ছে না, পালাচ্ছেও না।

চোর যদি চোরের মতো আচরণ না করে তবে যারা চোর ধরতে যায় তাদের বড় মুশকিল।

চোরের সঙ্গে চোখাচোখি হলে কী বলতে হয় তা ভেবে না পেয়ে আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম! যেন দেখিনি। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বুঝতে দিলাম যে, সে এখন চলে গেলে আমি কিছু বলব না।

কিন্তু ফুলচোর গেল না। বরং পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ফুলচোর যথেষ্ট কাছে এসে গেছে।

ফুলচোর আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি পাগলা দাশু?

সত্য বটে, এখানকার চ্যাংড়া ছেলেরা আমার খ্যাপানো নাম রেখেছে পাগলা দাশু।

ফাজিল মেয়েটার দিকে আমি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি, আপনাকে এর আগেও আমি একদিন এই বাগান থেকে ফুল চুরি করতে দেখেছি। কী ব্যাপার বলুন তো!

ফুলচোর যথেষ্ট সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী। গন্ধরাজের বাগানে সে দাঁড়িয়ে। পিছনে ব্রোঞ্জ-রঙা পাহাড়, ফিরোজা আকাশ, গাছপালার চালচিত্র নিয়ে খুব ঢিলাঢালা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন গোটা দুনিয়াটাই ওর। ডোনট কেয়ার গলায় বলল, ফুল দেখলেই আমার তুলতে ইচ্ছে করে যে! কী করব বলুন।

তা কথাটা মেয়েটার মুখে মানিয়েও গেল। সুন্দরীদের হয়তো সবই মানায়। বলতে নেই, ফুলচোর দেখতে বেশ। পেট-কোঁচড়ে এক কাঁড়ি ফুল থাকায় গর্ভিণীর মতো দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু সেই সামান্য অপ্রাসঙ্গিক জিনিসটা উপেক্ষা করলে ফুলচোরের যথেষ্ট ফরসা রং, লম্বাটে প্রখর শরীর, নরুন দিয়ে চাঁছা তীব্র সুন্দর মুখখানা রীতিমতো আক্রমণ করে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ওর দৃষ্টিতে দুঃখহীন অকারণ আনন্দের উজ্জ্বলতা। হয়তো ফুলচোর রোজ ভাল খায় এবং হজম করে। হয়তো বড় ঘরের মেয়ে। সম্ভবত কোনওদিনই ও রাতে দুঃস্বপ্ন দ্যাখে না। ভাল বরও ঠিক হয়ে গেছে কি? নইলে এমন উজ্জ্বলতা চোখে আসার কোনও কারণ নেই। আমার মন বেহায়া বেশরম রকমে নেচে উঠে বলতে লাগল, এই কি কনে? এই কি কনে?

ফুল তোলা নিয়ে বার্নার্ড শ-এর একটা বেশ জুতসই কথা আছে। এই মওকায় কথাটা লাগাতে পারলে হত। কিন্তু আমার কখনও ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি মনে পড়ে না। এ বারেও পড়ল না। গম্ভীর হলে আমাকে চারলি চ্যাপলিনের মতো দেখায় জেনেও আমি যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বললাম, ও।

মেয়েটা খুব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, রাগ করলেন?

বঙ্কিমের বিড়াল প্রবন্ধে একটা কথা আছে না: দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই। সুতরাং রাগ করিতে পারি না। এই ব্যাপারেও তাই। ফুল গাছের, তুলেছে ফুলচোর। এ ফুলে আমার বা কাকার যে অধিকার, ফুলচোরেরও তাই।

বললাম, না, রাগ করার কী?

মনে মনে ভাবলাম, কোনও খেঁদি-পেঁচি এরকম চোখের সামনে দিনেদুপুরে পুকুরচুরির মতো ফুল চুরি করতে এলে এত সহজে আমি কঠিন থেকে তরল হতে পারতাম না। মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যটা চোরদের একটা বাড়তি সুবিধে। ভাবলে, সৌন্দর্যটা সকলের পক্ষেই বেশ সুবিধাজনক। আদতে ওটা একটা ফালতু উপরি জিনিস। কেউ কেউ ওই ফালতু জিনিসটা নিয়েই জন্মায়, আর তারাই দুনিয়ার বেশির ভাগ পুরুষের মনোযোগ কব্জা করে রাখে। যারা সমান অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে বিস্তর মারদাঙ্গা, হামলা, আন্দোলন চালাচ্ছে তারা এ ব্যাপারটা বুঝতে চায় না। একজন সুন্দরীর যে অধিকার, একজন খেঁদি বা পেঁচি কোনওকালে সে অধিকার অর্জন করতে পারে না, প্রকৃতির নিয়মেই সমান অধিকার বলে কিছু নেই।

ফুলচোর করুণ মুখ করে বলল, তা হলে মাঝে মাঝে এ বাগানে ফুল তুলতে আসব তো! কিছু মনে করবেন না?

আমি বললাম, না, মনে করার কী?

বারবারই আমার মনে কী যেন পড়িপড়ি করেও পড়ছে না। সুন্দর বলে নয়, আমি ফুলচোরকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে বার বার দেখছি অন্য কারণে। মুখটা চেনা। ভীষণ চেনা। এক্ষুনি চিনে ফেলব বলে মনে হচ্ছে, অথচ স্পষ্ট মনে পড়ছে না।

মেয়েটি বলল, পাগলা দাশু বলেছি বলে কিছু মনে করেননি তো! আপনার একটা পোশাকি নামও যেন শুনেছিলাম কার কাছে! লিচু? হ্যাঁ লিচুই বলছিল সেদিন। কী যেন! কানমলা না ওরকমই শুনতে অনেকটা—কী যেন!

আমি ফাজিল মেয়েদের ভালই চিনি। কোনও কোনও মেয়ে এ ব্যাপারটাও নিয়েই জন্মায়। ফাজলামিতে তাদের ক্ষমতা এতই উঁচু দরের যে টক্কর দিতে যাওয়াটা বোকামি।

আমি বললাম, অনেকটা ওরকমই শুনতে। কর্ণ মল্লিক।

মেয়েটা আবার করুণ মুখ করল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। কী যে ভুল হয় না মানুষের। লিচুকে আপনি চেনেন? আমার বন্ধু। খুব বন্ধু আমার। আপনি লিচুদের হারমোনিয়াম কিনেছিলেন, তাও জানি।

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, হারমোনিয়াম ফেরত দিয়েছি।

তাই নাকি? ও মাঃ, ফুলচোর তার চোখ কপালে তুলে বলল, তা হলে কী হবে! গান শেখা ছেড়ে দিলেন বুঝি?

মাথা নেড়ে বলি, ঠিক তা নয়। তবে অনেকটা ওরকমই। আসলে গান বোধ হয় আমার লাইন নয়।

করুণ মুখ করে ফুলচোর বলে, আমারও নয়। তবু শিখতে হচ্ছে, জানেন!

কেন?

বিয়ের জন্য!— ফুলচোর খুব হেসে বলল, গান না জানলে বিয়েই হবে না যে!

ফাজলামি বুঝে আমি গম্ভীর হয়ে বলি. কারও কারও বিয়ের জন্য না ভাবলেও চলে।

হাতে ভাল পাত্র আছে বুঝি?

ব্যথিত হয়ে বলি, থাকলেই বা কী? সুন্দরীরা সুপাত্রের হাতে বড় একটা পড়ে না।

ফুলচোর হেসে ফেলে এবং গজদন্ত সমেত তাব অসমান দাঁত দেখে আবার মন উথাল পাথাল করতে থাকে। একে আমি কোথায় দেখেছি! ভীষণ চেনা মুখ যে!

ফুলচোর বলল, আমার কিন্তু ভীষণ সুপাত্রের হাতে পড়ার ইচ্ছে। সেইজন্যই কোয়ালিফিকেশন বাড়াচ্ছি। সুপাত্রের খোঁজ পেলে আমার জন্য দেখবেন তো!

সেজোকাকা উঠে পড়েছেন, টের পাচ্ছি! ভিতরবাড়িতে তাঁর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কাকিমা কাল রাতে বোধ হয় ত্রিফলার জল দিতে ভুলে গেছেন। সেজোকাকা চেঁচিয়ে বলছেন, এখন সকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে কী করে? কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে দিনটাই যে মাটি!

সুন্দরীদের এইসব প্রসঙ্গ না শোনাই ভাল। তারা আলো আর বুলবুলির মতো জীবনের গাছে ডালে ডালে খেলা করবে। কোষ্ঠ পরিষ্কারের মতো বস্তুগত বিষয়ে তাদের না থাকাই উচিত।

আমি বললাম, আপনি এবার চলে যান। বেলা হয়েছে। আমার কাকা-কাকিমা উঠে পড়েছে।

ফুলচোর একটু ফিচকে হাসি হেসে কোঁচড়টা আগলে ফটকের দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, আবার দেখা হবে কিন্তু!

হবেই তো। আমি জানি, দেখা হবে! বললাম, নিশ্চয়ই, রোজ আসবেন!

কাটুসোনা

সকালে কাক ডাকল কা, অমনি ফটকের কাছে ভিখিরিও ডাকল, মা!

বলতে কী সকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে ভিখিরির আনাগোনা। প্রথম আসে রামশংকর। আমার জন্মের আগে থেকে আজ পর্যন্ত সে সপ্তাহে ক্যালেন্ডার ধরে তিন দিন আসবেই। সে এলেই বুঝতে পারি, আজ হয় সোম, নয়তো বুধ, না হয়তো শনিবার। রামশংকরকে সবাই চেনে হাঁটুভাঙা রামা বলে। দিব্যি স্বাস্থ্য। দোষের মধ্যে তার হাঁটু সোজা হয় না। বাঁকা হাঁটু নিয়ে খানিক নিলডাউন হয়ে সে হাঁটে। বেশ জোরেই। রামার আবার তাড়া থাকে। একবার-দু'বার ডাকবে, মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ভিক্ষে না পেলে সে ভারী রাগারাগি শুরু করে দেয়, আরে, এইসন হোলে আমার চলবে? আমারও তো পাঁচঠো বাড়ি যেতে হোবে, তার পোরে তো পেট ভোরবে! এ হো দিদি, ও মাইজি, এ বুড্ঢা মাইজি, আরে ও খোকাবাবু...

ভিক্ষের চাল আলাদা একটা লোহার ড্রামে থাকে। তাতে জারমান সিলভারের একটা কৌটো।

ভরভরন্ত এক কৌটো চাল পেয়ে রামশংকর গেল তো এল অন্নদা বুড়ি। তার নাম অবশ্য অন্নদা নয়। ম্যাট্রিকুলেশন বেঙ্গলি সিলেকশনে ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা ছিল, অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলনা। অন্নদা যে বুড়ির বেশ ধরে ব্যাসদেবকে ছলনা করে নতুন কাশীকে ব্যাসকাশী বানিয়েছিলেন এই বুড়ি হুবহু সেইরকম। ফটকের কাছে বসে মাথার উকুন চুলকোবে, ঘ্যানর ঘ্যানর করে সংসারের দুঃখের কথা বলবে, ভিক্ষেটা বড় কথা নয় তার কাছে, কথা বলতে পারলে বাঁচে। ভৈরবকাকা তার নাম দিয়েছেন অন্নদা বুড়ি।

বোবা মুকুন্দ আসে রোববার আর ছুটির দিনে। লোকে বলে সে ফাঁসিদেওয়ায় এক ইস্কুলে দফতরির কাজ করে। ছুটিতে ভিক্ষে করতে বেরোয়। সেও এক কৌটো চাল নেয়। আর আসে ছেলে কোলে নিয়ে মানময়ী। বলতে কী মানময়ীও তার নাম নয়। বছরের পর বছর সে একটা বছরখানেক বয়সের ছেলে কোলে নিয়ে আসছে দেখে একদিন ঠাকুমার সন্দেহ হয়। ঠাকুমা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, বলি ও মেয়ে, তোমার কোলের বাচ্চাটি কি সেই আগেরটাই? না কি একে আবার নতুন জোগাড় করেছো? এই শুনে মানময়ী কেঁদে আকুল, আমার পুয়ে পাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে এত কথা কীসের তোমাদের? না হয় ভিক্ষেই দেবে, তা বলে কি আমাদের মান নেই? সেই থেকে মানময়ী। তবে আমরাও জানি মানময়ীর কোলের বাচ্চার বয়স বাড়ে না। একজন একটু বড় হয় তো ঠিক সেই বয়সী আর একটাকে কোত্থেকে জোগাড় করে আনে। কিন্তু সে কথা বলবে এত বুকের পাটা কার?

বাঁধা ভিখিরি দশ-বারোজন। তাছাড়া উটকো ছুটকো আরও জনা বিশেক। কেউ শুধু হাতে ফিরবে না, মায়ের আর ঠাকুমার এই নিয়ম। পপি বেঁচে থাকতে সেও ভিখিরি দেখলে ঘেউ-ঘেউ করত না, বরং দৌড়ে এসে ভিতরবাড়ির খবর দিত।

ভিখিরি নানারকমের আছে। কেউ ফটকের ওপাশ থেকে হাত বাড়ায়, কেউ বা ভিতরবাড়িতেও আসে ভিখিরিপানা করতে। আমি বয়সে পা দিতে না দিতেই এরকম কয়েকজন ভিখিরির আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।

একবার আমাদের পুরনো রেডিয়োটা খারাপ হওয়াতে হিলকার্ট রোড থেকে দাদা পল্টুদাকে নিয়ে এল।

পল্টুদা রেডিয়ো দেখবে কী, আমাকে দেখে আর চোখই সরাতে চায় না। সেদিনই মা'র সঙ্গে মাসিমা পাতিয়ে বাবাকে মেসো ডেকে ভিত তৈরি করে রেখে গেল। তারপর প্রায়ই সাইকেলে চলে আসে। পল্টুদার রেডিয়ো সারাই ছাড়া আর তেমন কোনও গুণ আছে বলে কেউ জানে না। বেশ মোটা থলথলে চেহারা। কথা বলার সময় শ্বাসের জোরালো শব্দ হয়। হাসিয়ে দিলে হেসে বেদম হয়ে পড়ে।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পল্টুদা বিস্তর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেচারা! কী দিয়ে চোখ টানবে তা বুঝতে না পেরে তার যে আর একটা মাত্র বাহাদুরি ছিল সেইটেই আমাকে দেখাতে চাইত। সেই বাহাদুরিটা হল খাওয়া। বকরাক্ষসের মতো এমন খেতে আমি আর কাউকে দেখিনি। মা আর ঠাকুমা লোককে খাওয়াতে ভালবাসে। পল্টুদা রোজ খাওয়ার গল্প ফাঁদে দেখে একদিন তাকে নেমন্তন্ন করা হল। দেড় সের মাংস আর সেরটাক চালের ভাত ঘপাৎ ঘপাৎ করে খেল পল্টুদা, আগাগোড়া আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে আর মৃদু মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে। খাওয়ার শেষে আমাকেই বলল, দেখলে তো কাটু, পারবে আজকালকার ছেলেরা এরকম? পঁচিশ খানা রুটি আর দুটো মুরগি আমি রোজ রাতে খাই।

মেয়েরা যে খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করে না এটা পল্টুদাকে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। তাই এর পর থেকে পল্টুদা প্রায়ই বাইরে থেকে পাঁচ দশ টাকার তেলেভাজা কি পঞ্চাশটা চপ কিংবা পাঁচ সের রসগোল্লা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসত। এ বাড়ির কেউ তেমন খাউন্তি নয়। দু'-চারখানা সবাই

মিলে হয়তো খেল, বাকিটা পল্টুদা। খেয়ে উদগার তুলে বলত, এখনও যতটা খেয়েছি ততটা আরও পারি। বুঝলে কাটু! খাওয়াটা একটা আর্ট।

পুরুষগুলো কী বোকা! কী বোকা! এরকম খেয়ে খেয়ে বছর দুইয়ের মধ্যে পল্টুদার প্রেসার বেড়ে দুশো ছাড়াল। রক্তে ধরা পড়ল ডায়াবেটিসের লক্ষণ। মাথার চুল পড়ে পাতলা হয়ে গেল। গায়ের মাংস দুল-দুল করে ঝুলতে লাগল। মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গেল। ডাক্তারের বারণে খাওয়া দাওয়া একদম বাঁধাবাঁধি হল।

যখন আমি ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি তখন হঠাৎ একদিন অবনী রায় এসে হাজির। অবনীবাবু এ শহরের নামকরা পণ্ডিত লোক, ভাল কবিতা লেখেন, নিরীহ রোগা চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়, তবে নিশ্চয়ই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। উদাস এবং অন্যমনস্ক মানুষ। চোখদুটো স্বপ্নে ভরা। এসে বাবার সঙ্গে বসে অনেক কথা-টথা বললেন। তারপর আমাকে আর চিনিকে ডাকিয়ে নিয়ে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলেন। নিজে থেকেই আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকলেন, বইপত্র ঘাঁটলেন, দু'-চারটে পড়া জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বাবাকে বললেন, আপনার মেয়েরা ইংরিজিতে কাঁচা। ঠিক আছে, কাল থেকে আমি ওদের পড়াব।

বলতে কী সেই প্রস্তাবে বাড়ির লোক হাতে চাঁদ পেল। অবনী রায় প্রাইভেট টিউশানি খুব অল্পই করেন। কারণ তাঁর পয়সার অভাব নেই। ওঁর বাবা শহরের মস্ত টিম্বার মার্চেন্ট। তবু মাঝে মধ্যে লোকে ধরলে উনি ছেলেমেয়েদের পড়ান। কিন্তু যাদের পড়ান তারা দুর্দান্ত রেজাল্ট করবেই। এই জন্য অবনী রায়ের চাহিদা ভীষণ। মারোয়াড়িরা দুশো আড়াইশো টাকা পর্যন্ত দিতে চায় ছেলেমেয়েদের জন্য ওঁকে প্রাইভেট টিউটর রাখতে।

বাড়ির সবাই এই প্রস্তাবে খুশি হলেও আমি আড়ালে আপন মনে জ্বালাভরা হাসি হেসে ঠোঁট কামড়েছি। অবনী রায় আমার দিকে এক আধ ঝলকের বেশি তাকাননি। কিন্তু আমি তো কিশোরী মেয়ে। আমি পুরুষের দৃষ্টি বুঝতে পারি।

তখনও ফ্রকই পরি। কখনও-সখনও শাড়ি। অবনী রায় এসে সকালবেলা অনেকক্ষণ পড়াতেন। কখনও কোনও বেচাল কথা বলেননি, চোখের ইশারা করেননি বা প্রয়োজনের চেয়ে এক পলকও বেশি তাকাননি মুখের দিকে। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে বগড়ি পাখি ডাকত। টের পেতাম।

মাসের শেষে টাকার কথা তুলল বাবা। অবনী রায় মৃদু হেসে বললেন, হি হি! কাটু আর চিনিকে টাকার জন্য পড়াই নাকি?

অবনী রায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আর কথা চলে না। অমন সম্মানিত লোককে টাকার কথা বলাটাও অন্যায়।

এইট থেকে আমি সেকেন্ড হয়ে নাইনে উঠলাম। চিনি তার ক্লাসে ফার্স্ট হল। জগদীশবাবু তখনও বিকেলে আমাদের পড়াতেন। খুব দেমাক করে বলে বেড়ালেন, দেখলে তো! গাধা পিটিয়ে কেমন ঘোড়া করেছি! কিন্তু আমরা সবাই বুঝলাম কার জন্য আমাদের এত ভাল রেজাল্ট। জীবনে কখনও সেকেন্ড থার্ড হইনি আমি। সেই প্রথম।

ফাইনাল পর্যন্ত অবনী রায় আমাকে টানা পড়ালেন। আমি ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পেরোলাম। বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল। বাবা একটা খুব দামি শাল কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, অবনীর বাড়িতে গিয়ে এটা দিয়ে প্রণাম করে আয়।

সেই সন্ধেটা বেশ মনে আছে। অবনীবাবু তাঁর ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। সব সময় বই-ই পড়তেন। শালটা পায়ের ওপর রেখে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম। বরাবরই আমি একটু ফিচেল। বললাম, আমি নয়, আপনিই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছেন।

অবনীবাবু হাসিমুখে বললেন, কথাটার মানে কী দাঁড়াল?

আমি বললাম, আমার তো এত গুণ ছিল না। আপনিই করিয়েছেন।

অবনীবাবু হাসছিলেন মৃদু মৃদু। নিজের ভ্রু-র চুল টানার একটা মুদ্রাদোষ ছিল। দু' আঙুলে ডান দিকের ঘন ভ্রু-র চুল টানতে টানতে বললেন, তা হলে তোমার আর আমার মিলিত প্রচেষ্টারই এই ফল।

নিশ্চয়ই।

এই প্রথম অবনী রায় প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, এই মিলিত প্রচেষ্টা যদি বজায় রাখতে চাই তা হলে কি তুমি রাজি হবে?

আমি তো প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। দু'-আড়াই বছর ধরে ওঁর কাছে পড়বার সময় মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মন বলত অন্য কোনও ব্যাপার আছে। কাজেই অবাক হইনি। তবু মুখটা বোকার মতো করে বললাম, কলেজের পড়াও পড়াবেন? খুব ভাল হয় তা হলে।

আমি সে কথা বলিনি। আমি তোমাকে পড়াব না। কিন্তু পড়ানো ছাড়াও কি অন্য সম্পর্ক হতে নেই? আরও ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়তা!

এ কথার জবাব হয় না। আমি তখন সতেরো বছরের যুবতী। উনি চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। বিয়ে করেননি বটে, তা বলে তো আর খোকাটি নন। আমি কথা না বলে আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি।

পরদিন সকালেই শহরের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ ভদ্রলোক মন্মথবাবু এসে হাজির। বাবার সঙ্গে হরেক কথা ফেঁদে বসলেন। তারপর বললেন, অবনী কাটুকে পড়াত। তা বলতে নেই, কাটু একরকম অবনীরই সৃষ্টি। পাত্রও চমৎকার। এমন পাত্র পাওয়া বিরাট ভাগ্য। আপনার ভাগ্য খুবই ভাল যে, অবনী এত মেয়ে থাকতে কাটুকেই পছন্দ করেছে। কাটুরও বোধ হয় অপছন্দ নয়। এখন আপনাদের মত হলেই শুভকাজ হয়ে যেতে পারে।

এই প্রস্তাবে বাড়ির সবাই একটু অবাক হল বটে, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় যে অবনী রায়ের মতো পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথাই। শোনা যাচ্ছে, অবনী অক্সফোর্ডে রিসার্চ করতে যাচ্ছেন, বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবেন। বাড়িতে সেই রাত্রে আলোচনা সভা বসল। অবনী রায়ের বয়স নিয়ে একটু খুঁতখুঁতুনি থাকলেও প্রস্তাবটা কারও অপছন্দ হল না। বয়সটাই তো বড় কথা নয়, অমন গুণের ছেলে ক'টা আছে?

বাড়ির সকলের মত হলেও আমি রাজি নই। যতবার অবনী রায়কে স্বামী হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করেছি ততবার কেন যেন গা চিড়বিড়িয়ে উঠেছে। মনটা আক্রোশে ভরে গেছে। কেন লোকটা আমাকে বিয়ে করতে চায়? কেনই বা লোভের বশে আমাকে বিনা পয়সায় পড়াতে এসেছিল? দু'-আড়াই বছরের ঘটনা যত ভাবলাম ততই মনটা বিরুদ্ধে দাঁড়াল। গা ঘিন ঘিন করল।

আমি স্পষ্ট করেই বাড়ির লোককে বলে দিলাম, না।

আমার বাবা মা কেউই আমার মতের ওপর মত চাপাল না। বাবা পরের দিন মন্মথবাবুকে একটু নরম সরম করে, প্রলেপ মাখিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমাদের অমত ছিল না, কিন্তু কাটুরও তো একটা মত আছে। ও এত শিগগির বিয়েতে রাজি নয়। সবে তো ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। তা ছাড়া পড়াশুনোরও ইচ্ছে খুব।

মন্মথবাবু বাবার কথাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন, আরে ওটুকু মেয়ের আবার মতামত কী? এ সুযোগ কি আবার আসবে? অবনীরও তো আর আইবুড়ো থাকা চলে না। পড়াশুনো করবে বেশ ভাল কথা। সে তো অবনীও চায়। বিলেতে গিয়ে পড়াবেই তো। ঠেকছে কোথায় তা হলে?

বাবা এ কথায় খুব ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। কিছু বলার ছিল না। কয়েকদিন বাদে অবনী রায়ের মা বাবা আমাকে দেখতেও এলেন। দু'জনেই কিছু গম্ভীর। আমি সামনে যেতে চাইনি, কিন্তু বাড়ির সম্মান এবং ওঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ভেবে যেতে হল। সামনে গিয়ে বুঝলাম, অবনী রায়ের

মা বাবাও এই সম্বন্ধ তেমন পছন্দ করছেন না। ভদ্রলোক চুপ করেই রইলেন, ভদ্রমহিলা দু'-চারটে কাটা ছাঁটা কথা বললেন, অবনীর তো কত ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে সব মেয়েই তো যেতে চায়। ছেলের মতিগতি কিছু বুঝতে পারি না বাবা...ইত্যাদি। একটু ফাঁকাভাবে উনি আমাকেই জানিয়েই দিচ্ছিলেন যে, অবনী রায়ের মাথা খেয়ে কাজটা আমি ভাল করিনি।

অবনী অবশ্য আর কখনও আমাদের বাড়িতে আসতেন না। আমার সঙ্গে দেখা করারও কোনও চেষ্টা করতেন না, সেদিক দিয়ে খুব ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু মন্মথবাবু রোজ আসতেন তাগাদা দিতে, বলতেন, কই মশাই, আপনারা এমন নিস্তেজ হয়ে থাকলে চলবে কেন? উদ্‌যোগ নেই কেন? পাকা কথার দিন স্থির করুন। আশীর্বাদ হয়ে যাক।

আমি বাড়ির লোককে আবার বললাম, না।

অবশেষে বাবা মন্মথবাবুকে বলতে বাধ্য হলেন, কাটু রাজি নয়। তবে আমাদের অমত নেই। আপনারা কাটুকে রাজি করাতে পাবলে আমরাও রাজি। মেয়ের অমতে কিছু করতে পারব না।

সেই থেকে শুরু হল মন্মথবাবুর আমাকে রাজি করানোর প্রাণপণ চেষ্টা। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রবীণ মানুষও এসে জুটলেন। কলেজে, পাড়ায় গোটা শহরেই রটে গিয়েছিল, অবনী রায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। রাগে, আক্রোশে আমার হাত-পা নিশপিশ করত। কারা রটিয়েছিল জানি না, কিন্তু তাদের মতলব ছিল। সেই সময় অবনী মন্মথবাবুর হাত দিয়ে আমাকে প্রথম একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা না পড়েই আমি মন্মথবাবুর চোখের সামনে ছিঁড়ে ফেলে দিই।

অবনী বুঝলেন, আমি সত্যিই রাজি নই। চিঠি ছিঁড়ে ফেলার এক মাসের মধ্যেই অবনী বিয়ে করলেন গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী অমিতাদিকে। যেমন কালো, তেমনি মোটা। তার ওপর দাঁত উঁচু, ঠোঁট পুরু এবং যথেষ্ট বয়স্কা। অমিতাদিকে বেছে বের করে অবনী বিয়ে করেছিলেন বোধ হয় আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই। নইলে ওরকম কুচ্ছিত মেয়েকে বিয়ে করার অন্য কোনও মানেই হয় না।

বিয়ের নেমন্তন্নে আমরা বাড়িসুদ্ধু সবাই গিয়েছিলাম। অবনীবাবু আমাকে ভিতরের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে একগোছা রজনীগন্ধা হাতে দিয়ে বললেন, কার সঙ্গে আমার বিয়ে হল জানো তো!

জানি। অমিতাদি।

অবনীবাবু হাসছিলেন। সেই মৃদু অদ্ভুত হাসি। বললেন, মোটেই নয়। বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখো।

ভেবে দেখার কিছু ছিল না। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বিরক্ত হয়েছিলাম মাত্র।

অবনীবাবু অমিতাদিকে নিয়ে বিলেত যাননি। কালিম্পং-এর একটা মিশনারি স্কুলে দু'জনে চাকরি করেন।

এইরকম ভিখিরির হাত বার বার আমাকে চেয়েছে। সব কথা বলতে নেই। বলা যায়ও না। কারণ আমি তো সব ভিখিরিকেই ফিরিয়ে দিইনি। এক একটা ডাকাত ভিখিরি আসে। হম্বিতম্বি করে কেড়ে নিয়ে যায়।

বাইরে থেকে আমাকে যতই সুখী আর শান্ত দেখাক, ভিতরে ভিতরে আমার অসহ্য ছটফটানি। যতই ভিতরের উতরোল সেই ঢেউ চেপে রাখি ততই আমি বদমেজাজি হতে থাকি, মন তত খিচড়ে থাকে। এই ছটফটানি কোনও কাম নয়, প্রেমও নয়। শুধু এই বাঁধানো সুন্দর জীবন থেকে একটু বাইরে যাওয়া, একটু বেনিয়মে পা দেওয়ার ইচ্ছে।

আমার ভিতরে এক বদ্ধ পাগলির বাস। সারাদিন হোঃ হোঃ করে হাসতে চায়, হাউমাউ করে কাঁদতে চায়। তার ইচ্ছে একদিন রাস্তার ধুলো খামচে তুলে সারা গায়ে মাখে। মাঝে মাঝে সে ভাবে, যাই গিয়ে নাপিতের কাছে বসে ন্যাড়া হয়ে আসি। রাস্তার ওই যে নাক উঁচু একটা লোক যাচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ওর নাকটা একটু ঘেঁটে দিলে কেমন হয়? নিজের গায়ে চিমটি দিলে খুব লাগে? দিয়ে দেখি তো একটু! উঃ বাবা! জ্বলে গেল! মদ খেয়ে যদি মাতাল হই একবার! যদি সাতজন

বা-জোয়ান মিলিটারি আমাকে তাদের ব্যারাকে টেনে নিয়ে যায়!

এইসব নিয়মভাঙা কথা সেই পাগলি সব সময়ে ভাবছে। যত ভাবে তত গা নিশপিশ করে, হাত-পা শুলশুল করে, মন গলায় দড়ি বাঁধা হনুমানের মতো নাচতে থাকে।

মল্লিকবাড়ি থেকে সকালে যে একরাশ ফুল চুরি করে এনেছিলাম তা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই ছিঁড়েছি, ছিটিয়েছি। চুরির কোনও মানেই হয় না।

পাগলা দাশু একদম স্মার্ট নয়, কে বলবে কলকাতার ছেলে! জলজ্যান্ত আমাকে সামনে দেখে একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল! পুরুষের চোখ আমার ভীষণ চেনা, ওর নজর দেখেই বুঝে গেছি ও আর একটা ভিখিরি। পাগলা দাশু জানে না যে, ও আমার ভাবী দেওর। জানলে হয়তো আজ সকালে একটা প্রমাণই পেয়ে যেতাম।

আমাদের বাড়িতে এতকাল প্রেশার কুকার ছিল না। মা আর ঠাকুমা দু'জনেরই ওসব আধুনিক জিনিস অপছন্দ। তাঁরা সাবেকি ঠাটেই বেশি স্বস্তি পায়। তবু কাল রাতে বাবা একটা বিরাট প্রেশার কুকার কিনে এনে বলল, সকলেই বলছে, এ হল একটা স্ট্যাটাস সিম্বল। রান্নাও নাকি চমৎকার হয়, খাদ্যগুণ বজায় থাকে, সময় কম লাগে।

শুনে ভৈরবকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, সব জোচ্চোর! তোমাকে যাচ্ছেতাই বুঝিয়ে, কৃত্রিম অভাববোধ তৈরি করেছে। এটাই হল এখনকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি। মনোহারী বিপণিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি রোজ দেখি, গাড়ল মানুষগুলো এসে যত আননেসেসারি জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফটার শেভ লোশন, টুথপিক, মাস্টার্ড, কর্নফ্লেক্স, আইব্রো পেনসিল, লিপস্টিক, লোমনাশক, শ্যাম্পু, মাথা-মুন্ডু। পকেটের পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। ফিটকিরি দিয়ে যে কাজ হয়ে যায়, তার জন্য গুচ্ছের টাকা দিয়ে গাড়ল ছাড়া আর কেউ আফটার শেভ কেনে? সোজা কথা তোমার প্রয়োজন থাক বা না থাক তোমার প্রয়োজনের বোধটা জাগিয়ে দিতে পারলে ইউ বিকাম এ পারফেক্ট গাড়ল।

ভৈরবকাকা আমাদের কাকা নয়, আত্মীয়ও নয়, বাবার চেয়ে বয়সে অন্তত দশ বছরের বড়। তবে অনাশ্রিত ভালমানুষ ভৈরবকাকা বহুকাল আমাদের সংসারে আছেন। আমাদের আপন কাকাদের চেয়ে ভৈরবকাকা কম আপন নন। যশোরে কিছু জমিজমা ছিল। সম্পত্তি বদল করে আমবাড়ি ফালাকাটায় বেশ অনেকটা চাষের জমি পেয়েছেন। খানিকটা বাস্তুভিটেও। সেই আয়ে তাঁর চলে, আমাদের সংসারেও অনেক দেন। বিয়ে-টিয়ে কোনওকালে করেননি। এক জমিদারের মেয়েকে সে আমলে ভালবেসে ফেলেছিলেন কিন্তু বিয়ে না হওয়ায় সতেরোবার দেবদাস পড়ে মদ খাওয়া ধরলেন। মদ সহ্য হল না, আমাশা হয়ে গেল। তারপর নামলেন দেশের কাজে। বিস্তর বেগার খেটে কখনও মশানাশিনী ক্লাব, কখনও কখনও কচুরিপানা উদ্ধার সমিতি, কখনও ম্যালেরিয়া অভিযান সংঘ, কখনও সর্বধর্ম সৎকার সমিতি বা কখনও নিখিল ভারত শীতলপাটি শিল্পী মহাসংঘ তৈরি করেছেন। কোনওটাই টিকে নেই। তবে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করেন। তাঁর ভয়ে এখনও এ বাড়ির কেউ টুথপেস্ট বা টুথব্রাশ ব্যবহার করে না। দাঁতন বা ঘুঁটের ছাই দিয়ে আমরা দাঁত মাজি। লিপস্টিক পারতপক্ষে মাখি না! তবে লুকনো একটা থাকে, বিয়েবাড়ি-টাড়ি যেতে গোপনে লাগিয়ে যাই।

আজ সকাল থেকে ভৈরবকাকা আবার প্রেশার কুকারের পিছনে লেগেছেন। তার অবশ্য কারণও আছে। প্রেশার কুকারে রান্না হবে বলে বাবা আজ বাজার থেকে দুই কেজি খাসির মাংস এনেছে। অত মাংস আমরা দু'দিনেও খেয়ে ফুরোতে পারব না। মাংসের পরিমাণ দেখে মাও চেঁচামেচি করছে। বাবা কিছু অপ্রতিভ।

ভৈরবকাকা বললেন, ওই যে গল্প আছে না, এক সাধু লেংটি বাঁচাতে বেড়াল পুষল, বেড়াল খাওয়াতে গোরু কিনল, আর ওই করতে করতে ঘোর সংসারী হল! এ হল সেই প্রস্তাব। প্রেশার

কুকার কিনলে তো মাংস আনতে হল। এই কাঁড়ি মাংস বাঁচাতে এরপর না আবার তুমি ফ্রিজ কিনতে ছোটো!

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে, ফ্যাদরা প্যাঁচাল পেড়ো না তো ভৈরবদা। প্রেশার কুকারটা বেশ বড় বলেই আমি একটু বেশি মাংস কিনে ফেলেছি। না হয় নিজেরা আজ একটু বেশি করেই খাব। বেয়াই বাড়িতেও পাঠানো যাবে।

ভৈরবকাকা চটে উঠে বললেন, তোমার খুব টাকা হয়েছে, না? তাই ওড়াচ্ছো? কেন প্রেশার কুকার ছাড়া এতদিন কি আধসেদ্ধ ডাল আর আধকাঁচা মাংস খেয়ে এসেছ!

এসব কথায় মা ঠাকুমা ভৈরবকাকার পক্ষে।

বাবাকে একা দেখে আমি তার পক্ষ নিয়ে বললাম, মানুষের শখ বলেও তো একটা জিনিস আছে! টেকনোলজি যত ডেভেলপ করবে তত আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন চাই।

হুঁঃ।— ভৈরবকাকা রাগে গরগর করতে করতে বলে, ওসব হচ্ছে বিজ্ঞাপনের শেখানো কথা। আরও কত কথা আছে! বলে কিনা, প্রেশার কুকার হল নারীদেব রান্নাঘর থেকে মুক্তি। ফ্রিজ মানে জিনিসের সাশ্রয়। এসব হচ্ছে অটোসাজেশন। মানুষের মগজে কথাগুলো ক্রমে ক্রমে সেট করে দেওয়া। উন্মাদের মতো কাছা খুলে মানুষ জিনিসও কিনছে বাপ!

প্রেশার কুকার হুইসিল দিতেই মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, ও বাবা, এ আবার ফেটে-ফুটে না যায়। কাটু তুই বরং দ্যাখ। আমার অভ্যেস নেই।

মাংস রাঁধতে গিয়ে কী করে যে মনটা আবার ভাল হয়ে গেল কে জানে!

পাগলা দাশু

আমি একটা পাথরের চাতালে বসে আছি। বহু নীচে বাগরাকোটে যাওয়ার পিচের রাস্তার একটা বাঁক মাত্র চোখে পড়ে। তারও হাজার ফুট নীচে কোনও শাখানদীর জল সরু সুতোর মতো দেখা যায়। কিছুক্ষণ আগে বাগরাকোটমুখো এক লরি থেকে নেমে আমি যখন এই পাহাড়টা আবিষ্কার করতে শুরু করেছিলাম তখন এক কাঠুরে, পাহাড় থেকে নামবার মুখে আমাকে বলল, সাবধানে যাবেন। ওপরে একটু আগেই আমি মস্ত এক সাপ দেখেছি। সাপের ভয়ে আমি থেমে থাকিনি। বর্ষায় পিছল সরু একটু পথের আভাস মাত্র পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। আলগা মাটি আর নুড়ি পাথরে কেডসে রবার শোল কামড়ে ধরে না বলে বারবার পা হড়কে যায়। ক্রমশ ভার হয়ে ওঠে চায়ের ফ্লাস্ক, জলের বোতল আর পাউরুটি এবং কলা বওয়ার ঝোলা ব্যাগ। লোহার নাল বসানো লাঠিখানা পর্যন্ত বোঝা বলে মনে হয়। মেঘভাঙা চড়া রোদের গরমে সারা গা ঘামে সপসপে ভেজা। শ্বাস ঘন ও গরম। বুকে হাঁফ।

অনেকটা উঠে এই পাথরের জিভ বের করা ব্যালকনি পাওয়া গেল। বেশির ভাগ গাছ লতা বা ঝোপ আমি চিনি না, বহু ফুল জন্মেও দেখিনি, বহু নতুন রকমের পাখির ডাক কানে আসছে। তাই যে কোনও পাহাড়ে ওঠাই আমার কাছে আবিষ্কারের মতো। পাহাড়ের চূড়া ঘন জঙ্গলে ঢাকা। তাই আর কতটা আমাকে উঠতে হবে তা বুঝতে পারছি না। তবে উঠব। উঠবই।

ফ্লাস্কের ঢাকনায় চা ঢেলে চুমুক দিই। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। উঁচু থেকে আমি দক্ষিণের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকি। দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের খাঁড়ির ভিতর দিয়ে বহুদূরে এক ফালি সমতল দেখা যায়। রোদে ধু ধু করা, দিগন্ত পর্যন্ত গড়ানো। এদিকে কলকাতা, যেখানে আমার জন্ম, যেখানে আমি এতকাল বেড়ে উঠেছি একটানা। হায়, আজ সকালে কলকাতার স্মৃতি আরও আবছা হয়েছে মনে করতে গিয়ে দেখি, ধর্মতলা দিয়ে মহানন্দা বয়ে যাচ্ছে। হাওড়ার পোলের ওপর

গন্ধরাজের বাগান। শ্যামবাজারের দিকে বিশাল, নীলবর্ণ পাহাড় উঁচু হয়ে আছে। সায়ন্তনীর কপালটাও আজ মনে পড়ল না। যতবার ভেবেছি ততবারই দেখি, খুব ফরসা চেহারার একটা মেয়ে, লম্বাটে চেহারা, চোখদুটো ভীষণ উজ্জ্বল। সায়ন্তনী ওরকম নয় মোটেই। সে ছোটখাটো রোগা, শ্যামলা এবং সাধারণ। জোর করে আবার মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে যে শ্যামলা এবং ছোটখাটো মেয়েটিকে দেখতে পেলাম সেও সায়ন্তনী নয়। ভাল করে লক্ষ করলে হয়তো লিচুর মুখের আদল আসত। আমি তাই ভয়ে চোখ খুলে ফেলি।

কাল লিচুদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর নেমন্তন্ন ছিল। হারমোনিয়াম ফেরত দেওয়ার পর এই প্রথম ওদের বাড়ি যাওয়া। বাড়িতে কাল অনেক এন্ডিগেন্ডি কাচ্চা-বাচ্চা আর গ্রাম্য মহিলাদের ভিড় হয়েছিল। দু' বাটি শিন্নি খাওয়ার পর লিচু আমাকে এসে চোখ পাকিয়ে বলল, কী হচ্ছেটা কী? কাঁচা আটার শিন্নি অত খেলে পেট খারাপ করবে যে।

আমি জীবনে কখনও শিন্নি খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কলকাতার বাড়িতে বা আশেপাশে কখনও সত্যনারায়ণ পুজোও হয়নি, বললাম, খেতে বড় ভাল তো!

ভাল বলেই কী? শিন্নি অত খেতে নেই।

আমি হতাশ হয়ে বাটিটা ফেরত দিই। কাঁঠাল, আম আর নারকেল মেশানো চমৎকার জিনিসটা আমি আরও দু' বাটি খেতে পারতাম। বললাম, তাহলে থাক।

অমনি আমার ওপর মায়া হল লিচুর। বলল, আহা রে, কিন্তু কী করি বলুন তো? এ জিনিস আপনাকে বেশি খাওয়াতে পারি না।

লিচু গিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই আবার ফিরে এল।

বলল, সত্যিই আরও খেতে ইচ্ছে করছে?

আমি লাজুক মুখে বললাম, না, থাকগে!

দেখুন তো, আপনার আরও শিন্নি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, অথচ আমি আপনাকে খেতে দিইনি শুনে মা খুব রাগ করছে।

খচ্ করে একটা অম্বলের ঢেঁকুড় উঠল। পেটটাও বেশ ভরা ভরা লাগছিল ততক্ষণে। আমি বললাম, আমি আর খাবও না।

লিচু আমার মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অম্বল হয়নি তো! দাঁড়ান জোয়ান এনে দিই।

আবার দৌড়ে চলে গেল। জোয়ান নিয়ে ফিরে এল।

কিছুক্ষণ বাদে এসে আবার জিজ্ঞেস করল, এখন একটু ভাল লাগছে? বড় বাটির দু' বাটি শিন্নি. যা ভয় হচ্ছে না আমার!

এক ঘর লোকের মধ্যেই এইসব করল লিচু।

মাঝখানে একবার ওর বাবা এসে খুব হেঁঃ হেঁঃ করে গেল খানিকক্ষণ। বলল, ঘরদোর আজ সব লিচুই সাজিয়েছে। বড় কাজের মেয়ে।

ঘরদোরে অবশ্য সাজানোর কোনও লক্ষণ ছিল না। তবু আমি মাথা নেড়ে হুঁ দিলাম।

এক ফাঁকে লিচুর মাও এসে দেখা করে গেলেন। বললেন, নিজে সবাইকে যত্ন আত্তি করতে পারছি না বাবা, কিছু মনে কোরো না। লিচুর ওপরেই সব ছেড়ে দিয়েছি। সে তোমার যত্ন আত্তি করেছে তো? তুমি অবশ্য ঘরের লোক।

এই সব কথাবার্তা এবং হাবভাবের মধ্যে আমি সুস্পষ্টই একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাই। পশুপতি খুব মিথ্যে বলেনি হয়তো।

সত্যি কথা বলতে কী, লিচুকে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু কেন খারাপ লাগে না তাই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে আজকাল। নিজের ওপরে ক্রমে রেগে যাই। লিচুকে খারাপ লাগাই তো উচিত, তবে কেন খারাপ লাগছে না আমার! চোরা নদীর স্রোতে তবে কি

তলে তলে ভূমিক্ষয় হল আমার! এরপর একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ব?

জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল কাল। ফিরে আসার সময় লিচু আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিল।

এখানকার জ্যোৎস্নাও কী সাংঘাতিক! সার্চ লাইটের মতো এমন স্পষ্ট ও তীব্র জ্যোৎস্না আমি খুব বেশি দেখিনি। এ যেন চাঁদের বিস্ফোরণ। আদিগন্ত পাহাড় পর্বত জ্যোৎস্নার মলমে মাখা। সেই জ্যোৎস্নায় পরির ছদ্মবেশ ধরেছিল লিচু। বলল, আপনার জন্য আমাকে সেদিন কাটুর কাছে কথা শুনতে হল।

আমি অবাক হয়ে বলি, কাটু আবার কে?

ও মা! অমিতদার ভাবী বউ, রায়বাড়ির মেয়ে। চেনেন না?

না তো। কেউ আমাকে বলেনি। অমিতদার কি বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?

কবে!— লিচু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয়ও নেই! সত্যি বললেন?

আমি মিথ্যে বড় একটা বলি না।

লিচু খুব চোখ টেরে বলল, কিন্তু আপনার জন্য খুব দরদ দেখলাম যে। আপনি না চিনলেও কাটু আপনাকে ঠিকই চেনে। কত কথা শোনাল আপনার হয়ে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার হয়ে তোমাকে কথা শোনানোর কী? কেনই বা শোনাচ্ছে?

সেই হারমোনিয়াম।

হারমোনিয়ামের পাট তো চুকে গেছে। আমি গান গাওয়া ছেড়েও দিয়েছি। আর এ হল আমার নিজের ব্যাপার, এতে অন্য কারও মাথা ঘামানোর কথা নয়।

কাটু হয়তো ভাবী দেওরের স্বার্থ ভেবেই বলেছে।

মেয়েটাকে চিনিয়ে দিয়ো। বকে দেব।

ও বাবা!— লিচু ভয়-খাওয়া হাসি হেসে বলল, কাটুকে বকার সাহস কারও নেই। যা দেমাক!

খুব দেমাক নাকি?

ভীষণ। অবনী রায়ের মতো পাত্রকেই পাত্তা দেয়নি।

দেমাক তোমারও আছে। আমি মেয়েদের দেমাক পছন্দ করি।

আহা, আমার দেমাক দেখলেন কোথায়?

দেখেছি। যার আছে সে বোঝে না। অবনী রায়টা কে?

শচীবাবুর ছেলে। বিরাট বড়লোক। তার ওপর খুব শিক্ষিতও বটে। কাটু হায়ার সেকেন্ডারিতে ফাস্ট ডিভিশন পেয়েছিল ওঁর জন্যই তো! সেই কৃতজ্ঞতাবোধটুকু পর্যন্ত কাটুর নেই। বয়সের অবশ্য একটু তফাত ছিল, কিন্তু তাতে কী?

কাটুর জায়গায় তুমি হলে অবনী রায়কে বিয়ে করতে?

লিচু মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে চোখের ছোবল মারল। বলতে নেই লিচুর চোখদুটি বিশাল। বলল, হঠাৎ আমার কথা কেন?

সব জিনিস নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভাবতে হয়, তবে বোঝা যায় অন্যে কেন কোন কাজটা করল বা করল না।

লিচু হেসে বলল, কাটুর মতো কপাল কি আমার! আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বিয়েই করতে চায়নি। তাহলে কী করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভাবব বলুন!

আমি বললাম, এ কথাটা সত্যি নয় লিচু।

লিচু মাথা নিচু করল হঠাৎ। তারপর মাথা তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আমরা একটা মাঠের ভিতর পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। সকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাঠে অল্প-স্বল্প কাদা ছিল। দু'ধারে দুটো সাদা বাঁকাচোরা গোলপোস্ট। জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছিল চারিধার।

লিচু ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ, চেয়েছিল। তাতে কী?

তুমি কি তাদের পাত্তা দিয়েছ?

লিচু মাথা নেড়ে হেসে বলে, পাত্তা দেওয়ার মতো নয়।

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, দেমাক কারও কম নয় লিচু।

দুই গোলপোস্টের মাঝামাঝি জ্যোৎস্নার কুহকে আমাদের মতিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। লিচু টলটলে জ্যোৎস্নায় ধোয়া স্বপ্নাতুর দুই চোখ তুলে তাকাল। জাদুকর পি সি সরকার করাত দিয়ে মেয়ে কাটার আগে যেভাবে তাকে সম্মোহিত করতেন অবিকল সেই সম্মোহন আমার ওপর কাজ করছিল।

লিচু ধরা গলায় বলল, দেমাক। আমাদের আবার দেমাক! কী আছে বলুন তো আমার দেমাক করার মতো?

দেমাকের জন্য কিছু থাকার দরকার হয় না। শুধু দেমাক থাকলেই হয়। দেমাক থাকা ভাল লিচু, তাহলে আজেবাজে আমার মতো লোক কাছ ঘেঁষতে পারে না।

ভুল হয়েছিল, বড় ভুল হয়েছিল ওই কথা বলা। জ্যোৎস্না ঢুকে গিয়েছিল মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে। চোখের সম্মোহন ছিল বড়ই গভীর। মাথায় ছিল বিভ্রম।

লিচু ঠিক সেন্টার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তুলে স্পষ্ট করে চাইল আমার দিকে। বলল, তাই বুঝি?

আমি একটা সাদা গোলপোস্টের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। ওই গোলপোস্টে আমার হাত ফসকে কতবার গোলে বল ঢুকে গেছে। ছেলেরা বলে, পাগলা দাশু এত গোল খায় যে বাড়িতে গিয়ে আর ভাত খেতে হয় না।

আমি বললাম, তাই নয় বুঝি?

লিচু মাথা নত করে বলল, আমি বুঝি তোমাকে ঘেঁষতে দিই না? আর কীভাবে বোঝাব বলো তো? বোকা কোথাকার!

এত সুন্দর গলায় বলল যে, জ্যোৎস্না আর একটু ফরসা হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, আকাশ থেকে চাঁদটা গড়িয়ে পড়ল মাঠের মধ্যে। পড়ে লাফাল বার কয়েক। কে যে চাঁদটাকে ফুটবলের মতো শট করল তা বোঝা গেল না। কিন্তু পশ্চিম ধারের গোলপোস্টে সেটা কোনাকুনি ঢুকে গেল বিনা বাধায়। আমি হাত বাড়িয়েও গোল আটকাতে পারলাম না।

কিন্তু নেপথ্যে একটা গলার স্বর বারবার আমাকে কী যেন প্রম্পট করছিল। ফিসফিস করে খুব জরুরি গলায় বলছিল, বলুন। বলুন। এই বেলা বলে ফেলুন।

লিচু নতমুখ তুলে একটু হাসল।

আমি হাত বাড়িয়ে লিচুর একটা হাত ধরলাম। গলা আমারও ধরে এসেছে। বুকের মধ্যে ঘন শ্বাস। বললাম, লিচু, আমি যে তোমাকে...

ঠিক এই সময়ে আমার মাথার মধ্যে লাউড স্পিকারের ভিতর দিয়ে প্রম্পটার বলে উঠল, না! না! মনে নেই কী শিখিয়ে দিয়েছিলাম!

আমি চিনলাম। আমার মাথার মধ্যে প্রম্পট করছে পশুপতি। পশুপতি তাড়া দিয়ে বলল, আহাঃ! টাকার কথাটা বলুন। বলুন!

আমি লিচুর দিকে চেয়ে যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা গিলে ফেলে নতুন করে বললাম, লিচু, তোমার বাবার কাছে আমি এখনও একশো পঁচাত্তর টাকা পাই!

লিচুর হাত চমকে উঠে খসে গেল আমার মুঠো থেকে।

আমি ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করি এবং পাথরের চাতাল ছেড়ে আবার পাহাড়ে ওঠা শুরু করি। এর চূড়ায় আমাকে উঠতেই হবে।

রাস্তাটা আর দেখতে পাই না। গাছের গোড়ায়, পাথরে বহুকালের পুরোনো শ্যাওলা।

লতাপাতায় জড়ানো ঘন গাছের জঙ্গল। পথ নেই। ডাইনে বাঁয়ে খুঁজে অবশেষে আমি একটা ঝোরার সন্ধান পেয়ে যাই। এখনও তেমন বর্ষা শুরু হয়নি বলে জলধারা প্রবল নয়। ঝিরঝির করে কয়েকটা সরু ধারা নেমে যাচ্ছে। খাত বেয়ে আমি উঠতে থাকি। বড্ড খাড়াই। পা রাখার জায়গা পাই না। ফলে আবার জঙ্গলে ঢুকে যেতে হয়। আদাড় বাদাড়ি ভেঙে প্রাণপণে শুধু উঁচুতে ওঠা বজায় রাখি।

কিন্তু না উঠলেই বা কী?

পায়ের ডিম আর কুঁচকিতে অসহ্য শিরার টান টের পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবি। উপরে উঠে আমি কিছু পাব না। না পাহাড় জয়ের আনন্দ, না ব্যায়ামের সুফল।

উপর থেকে একটা ঘন্টানাড়া পাখির ডাক আসছিল। তীব্র, উঁচু একটানা, অবিকল পুজোর ঘণ্টার মতো। সেই ধ্বনির মধ্যে বারবার একটা 'না না না না' শব্দ বেজে যাচ্ছে। জীবন কিছু না, প্রেম কিছু না, অর্থ কিছু না, মায়া মোহ কিছুই কিছু না।

আমি মাটিতে রাখা কেডস জোড়ার দিকে চেয়ে থাকি নতমুখে। কিছুই নেই, তবু জীবন তো যাপন করে যেতেই হয়। আমি একটু দম নিই, তারপর ধীরে ধীরে আবার উঠতে থাকি।

যখন চড়াই শেষ হল তখন বুঝতে পারলাম, আমি চূড়ায় উঠেছি। একরত্তি দম নেই বুকে, শরীরে এক ফোঁটা জোরও নেই আর। কপাল থেকে বৃষ্টির মতো ঘাম নামছে, পিঠ বুক বেয়ে ঘামের পাগলা ঝোরা। চারদিকে ঘন কালচে সবুজ জঙ্গল। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। এতদূর উঠে কোনও তৃপ্তি বা আনন্দও বোধ করি না। কেবল শরীর আর মন ভরা বিরক্তিকর এক ক্লান্তি।

ছোট একটা চৌকো পাথর হয়ে তার ওপর বসলাম। মনের মধ্যে ঘোর এক বৈরাগ্য ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে লাগল। বুঝতে পারছি, আমি আর কলকাতার কেউ নই, কলকাতাও আমার কেউ নয়। বুঝতে পারি, আমি সায়ন্তনীকে ভালবাসি না, লিচুকেও না।

ভাবতে ভাবতে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ি।

দিন সাতেক বাদে আবার ফুলবাগানে চোর এল। আমি আজকাল সকালে উঠে কলকাতা বা সায়ন্তনীর কথা ভাববার চেষ্টা করি না। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলে জানালার কাছে বসে ব্রোঞ্জ রঙের পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকি। ঘোর অন্ধকার থেকে ক্রমে ফিকে অন্ধকার। আকাশের গায়ে পাহাড় হঠাৎ আবছা জাহাজের মতো জেগে ওঠে। আমার সমস্ত শরীরে ভয় আর শিহরন খেলে যায়।

আস্তে আস্তে ব্রোঞ্জ সোনা হয়, তারপর রুপোর রং ধরে।

আজ অবশ্য দেখার কিছুই ছিল না। গত সাতদিন এক আদিম হিংস্র বৃষ্টি গিলে রেখেছিল শহরটাকে। এই শহর যথেষ্ট উঁচু বলে বন্যা হয় না। তবু রাস্তায় ঘাটে জল জমে আছে। আশপাশ থেকে পাহাড়ি নদীতে ভয়াবহ বানের খবর আসছে। শহর ডুবছে, গাঁ ডুবছে, চাষের জমিতে গলা বা মাথা ছাড়িয়ে জল।

কাল রাতে বৃষ্টি ছেড়েছে। তবু ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা, উত্তরে পাহাড় বলে যে কিছু ছিল তা আর বোঝাই যায় না। তবু অভ্যাসবশে আমি রোজই উঠে বসে থাকি ভোরে।

আজও যেমন, মেঘলা দিনের মলিন ভোরের আলো কষ্টেসৃষ্টে অনেক চেষ্টায় যখন চারদিক সামান্য ভাসিয়ে তুলেছে তখনই ফুলচোর এল। আগের বারের মতোই ডাকাবুকো হাবভাব। শব্দ করে ফটক খুলল, চোরদের মতো ঢাক গুড়গুড় নেই। ভয় ভীতি নেই। এ কেমন চোর?

ধরা পড়ার ভয়ে বরং আমিই দেয়ালের দিকে সরে দাঁড়িয়ে চুপিসারে দেখতে থাকি। আজ কীই-বা চুরি করবে ফুলচোর? বাগানে গোড়ালি-ডুব জল, জলের নীচে থকথকে কাদা। হিংস্র বৃষ্টিতে একটাও আস্ত ফুল টিঁকে থাকতে পারেনি গাছে। বহু গাছ শুয়ে পড়েছে মাটিতে। জলে আধাডোবা, কাদায় মাখামাখি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ফুলচোর আমার জানালার ধারের ঝুমকো লতার ঝোপের মধ্যে মাথা নিচু করে ঢুকে আসে যে! চুপি চুপি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

শুনছেন?

সেই ডাকে আমার হাত পা কেঁপে ওঠে। ধরা পড়ে যাই। জানালার সামনে সরে এসে বলি, শুনছি! বলুন।

আপনি জেগে ছিলেন?

আমি খুব ভোরে উঠি। এ সময়টায় রোজ আমি পাহাড় দেখি।

তবে আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কেন?

চোর ধরার জন্যই লুকোতে হয়।

ফুলচোর হাসল একটু। বলল, কিন্তু আমি তো ধরা পড়তে ভয় পাই না, পালিয়েও যাই না। আমাকে ধরতে লুকোতে হবে কেন?

কথাটা ভেবে দেখার মতো। বাস্তবিকই তো আমি চোর ধরার জন্য লুকোইনি, লুকিয়েছি চোরেরই ভয়ে। কিন্তু সেটা কবুল করি কী করে? এ চোরও আলাদা ধাতের। কোথায় আমি চোরকে জেরা করব, তা নয় চোরই উল্টে আমার নিকেশ নিচ্ছে। আমি একটু দুর্বল গলায় বলি, কথাটা ঠিক, আপনি পালান না। তার মানে, হয়তো আমার কাকা কাকিমার সঙ্গে আপনার চেনা আছে।

বাব্বাঃ, ভীষণ বুদ্ধি তো আপনার। এতই যদি বুদ্ধি তবে বলুন লুকোলেন কেন?

সেটা বলা শক্ত। হঠাৎ আপনাকে দেখে কেন যেন লুকোতে ইচ্ছে হল।

ফুলচোর হি হি করে হাসে। বলে, সাধে কি লোকে নাম দিয়েছে পাগলা দাশু!

আমি কথাটা শুনি না শুনি না করে পাশ কাটিয়ে বলি, আজ কী চুরি করবেন? দেখুন, বাগানটার দুর্দশা!

আপনার সাজানো বাগান কি শুকিয়ে গেল?— ফুলচোর এখনও হাসছে।

একটা বড় শ্বাস হঠাৎ বেরিয়ে যায় বুক থেকে। জবাব দিই না। কোনও জবাব মাথায় আসছেও না। ফাজিল মেয়েদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়াটাই বোকামি।

ফুলচোর গলা একটু মাখো মাখো করে বলে, গান শেখা ছেড়েছেন, ফুটবলের মাঠে যান না, সাইকেলেও চড়তে দেখা যায় না আজকাল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো!

আমি ফুলচোরের ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছি আজ! তবে কি ফুলচোর আমার প্রেমে পড়েছে! এই ভোরে সেই ভালবাসাই জানাতে এল! আমার মাথার ভিতরে হঠাৎ পশুপতির গলার স্বর প্রম্পট করতে থাকে, বলে ফেলুন! বলে ফেলুন! ভালবাসা একেবারে ছানার মতো ছেড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই বলার নেই আমার। ফুলচোরের বাবাকে আমি টাকা ধার দিইনি। ওর বাবা কে তাই জানি না। পশুপতি ভুল পার্ট প্রম্পট করছে।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, আজ আপনি ফুল চুরি করতে আসেননি।

তবে কী করতে এসেছি?

আপনার অন্য মতলব আছে।

আছেই তো!

আমার সম্পর্কে এত খবর আপনাকে কে দিল?

খবর জোগাড় করতে হয়।

কেন জোগাড় করতে হচ্ছে?

আমার মতলব আছে যে।

আপনি একটু বেশিরকম ডেসপারেট।

সেটাও সবাই বলে। নতুন কথা কিছু আছে?— ফুলচোর মুখে ভালমানুষি মাখিয়ে বলে।

আছে।— আমি গম্ভীর ভাবে বলি, এর আগে আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি।

ফুলচোর হি হি করে হেসে বলে, আমারও তাই মনে হয়,জানেন! মনে হয় যেন, কত কালের চেনা।

আমার গা জ্বলে যায়। বলি, কী বলতে এসেছেন বলুন তো!

রাগ করলেন?

না, সাবধান হচ্ছি। আমার কাকা কাকিমাও আরলি রাইজার। যে কোনও সময়ে এদিকে এসে পড়তে পারেন।

ও বাবা!

বলে ফুলচোর চকিতে একবার চারদিক দেখে নেয়। এখনও যথেষ্ট আলো ফোটেনি। আবছা আলোর মধ্যে এখনও ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গাছপালা, ঘরবাড়ি। ফুলচোর আমার দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে বলে, লিচুর সঙ্গে কি আপনার ঝগড়া হয়েছে?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার?

লিচু ভীষণ কাঁদছে যে!

কাঁদছে! কেন কাঁদছে?

তার আমি কী জানি? পাড়ার লোকে বলছে, আপনার সঙ্গে নাকি ওর ভাব ছিল।

মোটেই নয়।

ফুলচোর আচমকা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ন্যাপথালিন খেলে কি লোকে মরে?

আমি জানি না। কেন?

লিচু ন্যাপথালিন খেয়ে মরার চেষ্টা করেছিল। হাসপাতালে পর্যন্ত নিতে হয়।

উদ্বেগের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করি, বেঁচে আছে তো!

আছে। কিচ্ছু হয়নি। বেশি খায়ওনি। হাসপাতালে পেটে নল ঢুকিয়ে সব বের করে দিয়েছে।

মরতে চেয়েছিল কেন?

বোধহয় আপনার জন্য। অবশ্য ভেঙে কিছু বলছে না।

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, এতক্ষণ ইয়ার্কি না করে এই সিরিয়াস খবরটা অনেক আগেই আপনার দেওয়া উচিত ছিল।

আপনার সঙ্গে যে আমার ইয়ার্কিরও একটা সম্পর্ক আছে।

তার মানে?

পালাই, আপনার অত ভয়ের কিছু নেই। লিচু ভাল আছে।

কিন্তু ইয়ার্কির সম্পর্ক না কী যেন বলছিলেন।

না, বলছিলাম যে, আমি ভীষণ ইয়ার্কি করি। বাড়িতে তার জন্য অনেক বকুনিও খাই। বলে ফুলচোর আবার হি হি করে হাসে। তারপর বলে, লিচু কিন্তু খুব কাঁদছে।

তার আমি কী করতে পারি?

আপনি কি ওকে রিফিউজ করেছেন?

রিফিউজের প্রশ্ন ওঠে না। ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আমি একজনকে অলরেডি ভালবাসি!

তাই বলুন! বাব্বা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

কেন?

আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি লিচুকেই বুঝি বিয়ে করবেন!

বিয়ে অত সস্তা নয়।

আপনার লাভার কি কলকাতার মেয়ে?

হ্যাঁ।

খুব স্মার্ট?
তা জেনে কী হবে?
বলুন না! আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।
স্মার্ট বটে, তবে আপনার মতো নয়।
দেখতে?
তাও আপনার মতো নয়। রূপটাই কি সব?
সে অবশ্য ঠিক। গায়ের রং কেমন? খুব ফরসা?
না। শ্যামলা। আপনার পাশে দাঁড়ালে কালোই বলবে লোকে।
লম্বা?
লম্বা আপনার মতো নয়। অ্যাভারেজ।
রোগা?
হ্যাঁ, বেশ রোগা!
বোধ হয় পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট?
একদম নয়। তবে গ্র্যাজুয়েট।
বয়স?
আমার প্রায় সমান। আপনার তুলনায় বুড়ি।
বারবার আমার সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন কেন?
খুশি করার জন্য! মেয়েরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দেখতে ভালবাসে।
আচ্ছা, আচ্ছা। এবার বলুন তার নাম কী?
সায়ন্তনী। আপনার নামটা কি তার চেয়ে ভাল?
চালাকি করে নাম জেনে নেবেন, আমি তত বোকা নই।
নামটা বলতে দোষ কী?
চোরেরা নাম বলে না।
না কি অন্য কোনও কারণ আছে?
থাকতে পারে। সকাল হয়ে এল, আমি যাই!
আবার কবে আসছেন?
নিচু হয়ে ঝোপ পেরোতে পেরোতে একবার ফিরে তাকায় ফুলচোর। চাপা স্বরে বলে, এলে খুশি হবেন?
বোধ হয় খারাপ লাগবে না। আজ তো বেশ লাগল!
ফুলচোর হি হি করে হাসে, তাহলে আসব।
বলে ঝোপটা জোর পায়ে পেরিয়ে চলে গেল ফুলচোর। ওকে বলা হল না যে, সব কথা আমি সত্যি বলিনি। কী করে বলব? সায়ন্তনীর চেহারাটা আমার মনে পড়ছে না যে।

কাটুসোনা

আজ দুপুরে হাউ-হাউ করে হঠাৎ পপির জন্য খানিকটা কাঁদলাম।

দুপুরে এক বাঁদরনাচওলাকে ধরে এনেছিল বাঁটুল, দড়ি বাঁধা দুটো বাঁদর ডুগডুগির তালে নাচল, ডিগবাজি খেল, পরস্পরকে পছন্দ করল, বিয়ে করল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে পুটুর পুটুর চেয়ে দেখল ভিড়ের মানুষদের। বসে বসে আমাদের দেওয়া কলা ছাড়িয়ে খেল।

বড় কষ্ট বাঁদরগুলোর। খেলা দেখতে দেখতে অবোলা জীবের কষ্টে যখন বুকে মোচড় দিল একটু তখনই পপির কথাও মনে পড়ে গেল। কাজল-পরানো মায়াবী একজোড়া চোখ ছিল পপির। কী মায়া ছিল ওর দৃষ্টিতে! তাকিয়ে থাকত ঠিক যেন আপনজনের মতো। কথাটাই শুধু বলত না, কিন্তু আর সবই বোঝাতে পারত হাবেভাবে। এসব মনে পড়তেই বুকের মোচড় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসলাম।

কাঁদতে যে কী সুখ! কাঁদতে কাঁদতে পপিকে ছেড়ে আরও কত কী ভাবতে ভাবতে আরও কাঁদতে থাকি।

গতবারই কলকাতায় একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল। ভৈরবকাকার সঙ্গে মা আর আমরা ভাইবোনেরা মামাবাড়ি বেড়াতে গেলাম। মা'র বাপের বাড়ি যাওয়া আর সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে পুজোর বাজার করে আনা, দুই-ই হবে। মামারা কেউ এক জায়গায় থাকে না। তাছাড়া কারওরই বাসা খুব বড় নয়। ফলে আমরা এক এক বাসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম। আমাকে নিয়ে গেল হাতিবাগানের বড়মামা।

বলতে কী মামাবাড়িতে আমাদের বড় একটা যাওয়া হয় না। কলকাতা শহরটা আমাদের কাছে বড় ভয়ের। সে এক সাংঘাতিক ভিড়ে ভরা শহর। মাথা গুলিয়ে দেওয়া ধাঁধার মতো রাস্তাঘাট। তার ওপর আত্মীয়দের কারও বাড়িতেই হাত পা ছড়িয়ে থাকার মতো জায়গা হয় না! আমরা সেখানে গেলে একা বেরোতে পারি না, রাস্তা পেরোতে বুক টিপ টিপ করে। ফলে আমরা কলকাতায় কালেভদ্রে যাই। হয়তো তিন চার বা পাঁচ বছর পর। ততদিনে কলকাতার আত্মীয়দের সঙ্গে আবার একটু অচেনার পর্দা পড়ে যায়।

বড়মামার মেয়ে মঞ্জু আমার বয়সী, ছেলে শঙ্কু তিন-চার বছরের বড়। সেই বাড়িতে পা দিতে না দিতেই আমি টের পেলাম আমার মামাতো দাদা শঙ্কুর মাথা আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি। বলতে নেই, ব্যাপারটা আমি উপভোগই করেছিলাম। কাছাকাছি একটা কাঁচা বয়সের ছেলে রয়েছে, অথচ আমাকে দেখে সে হাঁ করে চেয়ে থাকছে না, নিজের কেরদানি দেখানোর জন্য নানা বোকা-বোকা কাণ্ড করছে না বা নিজের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে আগড়ম বাগড়ম বকছে না—সেটা আমার অহংকারে লাগে।

তবু হয়তো আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। একে তো আমার বিয়ে একজনের সঙ্গে পাকা হয়ে আছে, তার ওপর শঙ্কুদা আমার আপন মামাতো ভাই। কিন্তু বয়সটাই এমন যে, আত্মীয়তার বেড়া বাঁধ মানতে চায় না। যাতায়াত কম বলে আত্মীয়তাটা তেমন জোরালোও হয়ে ওঠেনি। ভাই বোন বলে জানি, কিন্তু সেরকম কিছু একটা দায়িত্ব বোধ করি না। আরও একটা কথা আছে। সেটা হল কিছু কিছু মানুষ বোধ হয় এরকম অসামাজিক, বাঁধভাঙা কাণ্ড করতে বেশি আনন্দ পায়।

লম্বার ওপর শঙ্কুদার চেহারাটা খারাপ নয়। একটু মস্তানের মতো হাবভাব। এ জি বেঙ্গলে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে এবং বিয়ে-টিয়ের কথাও ভাবছে। দ্বিতীয় দিন অফিস থেকে ফিরেই আমাকে বলল, সাত দিনের ছুটি নিলাম। তোকে কলকাতা শহরটা খুব ঘুরিয়ে দেখাব বলে।

আমি মুখেও হাসলাম, মনে মনেও হাসলাম। দুটো অবশ্য দু'রকম হাসি। মুখে বললাম, খুব ভাল করেছ। কলকাতাকে যা ভয় আমার! মনে মনে বললাম, সব জানি গো, সব বুঝি!

ছেলে নতুন চাকরিতে ঢুকে ছুটি নেওয়ায় মামা মামি খুশি হননি তা তাদের মুখ দেখেই বুঝলাম। মঞ্জু তো মুখের ওপরেই বলল, তোকে দরকার কী? কলকাতা তো কাটুকে আমিই দেখাতে পারি।

কিন্তু শুধু আমিই মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিলাম কলকাতা দেখানো না হাতি!

শঙ্কুদা পরদিনই গুচ্ছের ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে আমাকে আর মঞ্জুকে নিয়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিট দেখাল, রেস্টুরেন্টে খাওয়াল, সিনেমায় নিয়ে গেল। মঞ্জু বারবার আমার কানে কানে বলছিল, ইস্! কী পরিমাণ টাকা ওড়াচ্ছে দেখেছিস!

শুনে আমার একটু লজ্জা হল। বেচারা শঙ্কুদা ! এখন তো ওর মাথার ঠিক নেই! পরদিনই বাড়িশুদ্ধু সবাইকে স্টারে থিয়েটার দেখাল। মামি বলল, যাক, কাটুর কল্যাণে শঙ্কুর পয়সায় থিয়েটার দেখা গেল।

এমনি দু'-তিন দিন যাওয়ার পরই বাড়ির লোক কিছু ক্লান্তি বোধ করে ক্ষ্যামা দিল। তখন শঙ্কুদা আমাকে নিয়ে একা বেড়াতে বেরোল। চার দিনের দিন ট্যাকসিতে আমার হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, পুজোর আগে কিন্তু ছাড়ছি না। কলকাতার পুজো দেখে যাও এবার।

তুই থেকে তুমিতে প্রোমোশন পেয়ে আমি আবার মুখে আর মনে দু'রকম হাসি হাসলাম। বললাম, যাঃ, তাই হয় নাকি?

কেন হবে না? ইচ্ছে থাকলেই হয়। আমি পিসিকে বলে পারমিশন নেব।

মা আমাকে রেখে যাবেই না।

খুব যাবে।

উঁহু। পুজোর পরেই আমার পরীক্ষা।

পরীক্ষা-টরিক্ষা রাখো তো! পুজোর পর কেন, সারা জীবনই যদি আর যেতে না দিই?

কথাটা বড় সোজাসুজি বলে ফেলে বোধ হয় নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিল শঙ্কুদা। তাড়াতাড়ি বলল, সাবিরের রেজালা খেয়েছ? চলো আজ খাওয়াব।

বাঁধ ভাঙতে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু তার একটা মাত্রা আছে। দিন পাঁচেকের মধ্যেই বুঝলাম, শঙ্কুদাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে আমি বিপদ ডেকে এনেছি। ভাড়াটে বাড়ির ছাদে ওঠার এজমালি সিঁড়িতে শঙ্কুদা আমাকে সেদিন চুমু খাওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। দু' দিনের দিন সকালে ওর ঘোর লাল চোখ দেখে বুঝলাম, সারা রাত ঘুমোয়নি। আমার কথা ভেবেছে।

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল। পুরুষরা জন্মসূত্রেই বোকা, মেয়েরা তো তা নয়। আমি সাবধান হই। মামাকে সেদিনই বললাম, আজ খিদিরপুরে মেজোমামার বাড়িতে যাব। মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মামার মাথায় তো ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলল, তা আমার তো অফিস, তোকে বরং শঙ্কু গিয়ে রেখে আসুক। প্রস্তাব শুনে শঙ্কুদা আমার দিকে নিষ্পলক অদ্ভুত পাগলা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে যাব। বলেই বেরিয়ে গেল। দুপুরে বেশ দেরিতে ফিরে এসেই বলল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

আমি তৈরিই ছিলাম। ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। রাস্তায় পা দিয়েই শঙ্কুদা বলল, কাটু, আমাকে বিট্রে করবে না তো? তাহলে কিন্তু মারা যাব।

বলতে নেই, আমি বুদ্ধিমতী। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, এখন যদি কোনও কড়া কথা বলি তাহলে একদম খেপে যাবে। তাই মুখে হাসি মাখিয়ে বললাম, তুমি এরকম করছ কেন বলো তো! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?

আমেরিকার ছেলেটাকে চিঠি লিখে দাও যে, তুমি তাকে বিয়ে কববে না।

আমার বুক তখন ধুকপুক করছে। বললাম, ওরম কোরো না। তোমাকে ভীষণ অন্যরকম দেখাচ্ছে।

পুরুষেরা বোকা বটে, কিন্তু কখনও-সখনও ভারী বিপজ্জনকও। বিশেষ করে প্রেমট্রেমে পড়লে!

সেটা বুঝলাম যখন আমাদের ট্যাক্সি খিদিরপুরে না গিয়ে বিচিত্র সব পথে চলতে লাগল।

শঙ্কুদা পাগলের মতো কখনও আমার হাত চেপে ধরে, কখনও কাঁধে হাত রেখে, কখনও গলা পেঁচিয়ে ধরে কেবল ভালবাসার কথা বলে যেতে লাগল। সেদিন শঙ্কুদার সব বাঁধ ভেঙে গেছে, কোনও আব্রু নেই, লুকোছাপা নেই, লজ্জা নেই, ভয় ভীতি নেই। বলে, বিশ্বাস করো আমার মা বাবা কিছু মনে করবে না...আমি আলাদা বাসা করব...বিয়ে করেই দ্যাখো, প্রথমে একটু সবাই হয়তো রাগ টাগ করবে, কিন্তু দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে...কলকাতায় এরকম ভাইবোনে কত বিয়ে হয়, এটাই আজকাল ফ্যাশান...আমি আলাদা বাসা নেব, না হয় খুব দূরে বদলি হয়ে চলে যাব...

শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা। মাথা চক্কর দিচ্ছে। লজ্জাও হচ্ছিল খুব!

ট্যাকসিতেই অবশ্য শেষ হয়নি। ট্যাকসিওয়ালা স্পষ্টই সব শুনছে।

আমরা ময়দানে বসলাম, রেস্টুরেন্টেও খেলাম, রাস্তাতেও হাঁটলাম।

বেলা পড়ে এলে বললাম, শঙ্কুদা, এবার আমাকে দিয়ে এসো। আমি না গেলে মা আর ভৈরবকাকা পুজোর বাজার করতে বেরোবে না।

ও! পুজোর বাজার এখন রাখো। তার আগে আমাদের বিয়ের বাজার তো হোক।

শঙ্কুদা সত্যিই নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা দেড়শো টাকার শাড়ি কিনে দিল জোর করে। এত খারাপ লাগছিল কী বলব!

সন্ধে হয়ে এল, তবু শঙ্কুদা আমাকে রেখে আসার নাম করে না। বরং বলল, চলো, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এক জায়গায় আমার বন্ধুরা আসবে।

আমি ভয়ে কেঁপে উঠে বললাম, না না।

চলো না। তারপর ঠিক রেখে আসব।

ডাক ছেড়ে তখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। শঙ্কুদা যত পাগলামি করছে তত ওর ওপর বিতৃষ্ণা আসছে আমার। পারলে তখন ছুটে পালাই। কিন্তু চারদিকেই তো বিপজ্জনক অচেনা কলকাতা। কোথায় যাব?

ধর্মতলার কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে সত্যিই নিয়ে গেল আমাকে শঙ্কুদা। সেখানে পাঁচ-ছ'জন ছোকরা বসে আছে। শঙ্কুদা আমাকে তাদের সামনে হাজির করে বলল, এই আমার ভাবী ওয়াইফ। তারপরই একটু হেসে বলল, ভাবীও নয়। শুধু ওয়াইফ!

আমার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে এখন। রাগে দুঃখে ছিঁড়ে যাচ্ছে বুক। কিন্তু অত লোকের সামনে কী করব? হেসে বরং ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কথা-টথাও বলতে হল। বন্ধুগুলো খারাপ নয়। তবে এক-আধজন একটু মোটা ইঙ্গিত করছিল। আমি তাদের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছি বন্ধুদের কাছে আমাকে নিজের বউ পরিচয় দিয়ে শঙ্কুদা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সাক্ষী রাখতে চাইছে। বেঁধে ফেলতে চাইছে।

একবার পালাতে পারলে জীবনে আব কোনওদিন ওর ছায়া মাড়াব না, মনে মনে তখন ঠিক করেছি। তাই দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে যাচ্ছিলাম। জানি, আর একটু পরেই মুক্তি পাব।

কিন্তু খুব ভুল ভেবেছিলাম! আমি মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছিলাম। তবু বন্ধুদের সঙ্গে অনেক রাত করে ফেলল শঙ্কুদা।

রাত ন'টা নাগাদ বন্ধুদের বিদায় দিয়ে শঙ্কুদা রাস্তায় নেমে বলল, এত রাতে আর কোথায় যাবে কাটু?

আমি চমকে উঠে বলি, তার মানে?

এখন বাস ট্রামের অবস্থা খুব খারাপ! ট্যাকসিও খিদিরপুর যেতে চাইবে না।

তাহলে?

শঙ্কুদা হেসে বললে, আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারো, কিন্তু সেটা হয়তো খারাপ দেখাবে!

তুমি কী বলতে চাইছ?

ভয় পেয়ো না কাটু। আমি একটা খুব ভাল পথ ভেবে বের করেছি। আজকের রাতটা আমরা একটা হোটেলে কাটাব!

শুনে আতঙ্কে কেমন হাত পা ছেড়ে দিল আমার। বুক ঠেলে কান্না এল। কোনও বাধা মানল না। সেই কান্না আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম, এসব তুমি কী বলছ?

শঙ্কুদা অনেক সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ক্ষমা চাইছিল। বলল, বুঝছ না কেন, কেউ টের পাবে না। বরং এত রাতে কোনও বাড়িতে গিয়ে উঠলেই সন্দেহ করবে বেশি। কোনও ভয় নেই।

পুরুষরা যখন পাগল হয় তখন বোকামির মধ্যেও তাদের শয়তানি বুদ্ধি কাজ করে। আমার তখন পাগলের মতো এলোমেলো মাথা। তবু আমি বুঝতে পারলাম, আমি যে ওকে কাটাতে চাইছি তা ও বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে এঁটো করে রাখতে চায়, যাতে আমি বাধ্য হই মাথা নোয়াতে।

কোথায় সেই হোটেলটা ছিল তা আমি আজও বলতে পারব না। তবে কলকাতার মাঝামাঝি কোথাও। হোটেলটার নামও আমি লক্ষ করিনি। কিছুই লক্ষ করার মতো অবস্থা নয়। তবে মনে হচ্ছিল, আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল সব।

দোতলার একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে তুলল শঙ্কুদা। সে ঘরে একটা মাত্র ডবল খাটের বিছানা। টেবিলে দু'জনের খাবার দিয়ে গেল বেয়ারা, কিছু না বলতেই। শঙ্কুদা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, ঘাবড়ে যেয়ো না। ওসব কিছুই কেউ জানবে না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো।

বিপদের অনুভূতির প্রথম প্রবল ভাবটা কেটে গেল তখন। বাথরুমে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। মাথা বশে এল একটু। বুকে ঢিপিঢিপিনি কমে গেল।

মানুষের মনে কত কী থাকে তার হিসেব নেই। সেই হোটেলের ঘরে আবার যখন ঢুকছিলাম তখন খুব খারাপ লাগল না। বরং মনে হল, দোষ কী? কে জানবে? আমার জীবনটা বড় বাঁধা পথে চলছে। একটু এদিক ওদিক হোক না।

এমনকী আমি তখন ভাতও খেতে পারলাম। হয়তো খাওয়ার পর বিছানাতেও চলে যেতাম কিছু পরে।

কিন্তু শঙ্কুদা যখন দরজার ছিটকিনি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তখন সমস্ত প্রস্তুতিটা কেটে গেল।

ছেলেদের মুখে ওরকম কাঙালপনা দেখতে আমার এমন ঘেন্না হয়।

শঙ্কুদা আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে এসে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল।

কেন নয় কাটু? একটুখানি। একবার। কেউ জানবে না।

তা হয় না। মেয়েরা ও জিনিসটা এত সহজে দিতে পারে না।

প্লিজ কাটু। আজ থেকে তুমি তো আমার স্ত্রী।

আমি চেয়ারে বসে রইলাম বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে, দৃঢ়ভাবে।

তারপর সারা রাত চলল অনুনয় বিনয়, পায়ে ধরা, মাথা কোটা, কান্না হাসি। আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। একটা রাত যে কত লম্বা হতে পারে তার কোনও ধারণা ছিল না আমার। তবে একটা কথা আমি জানতাম। কোনও মেয়ে যদি ইচ্ছে না করে তবে দশটা পুরুষেরও সাধ্য নেই তাকে রেপ করে। মেয়েদের তেমনই ক্ষমতা প্রকৃতি দিয়ে রেখেছে। মেয়েরা যে ভোগের জিনিস তা কি ভগবানের মতো চালাক লোক জানেন না! ভৈরবকাকাও একবার দারোগা কাকার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বলেছিল, যে সব মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়, তারা হয় নিজের ইচ্ছেতেই বশ মানে, না হলে ভয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

কথাটা ঠিক। শঙ্কুদা রাজি করাতে না পেরে শেষরাতে জোর খাটাতে লাগল। সে এক বীভৎস

লড়াই। কিন্তু সে লড়াই শেষ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে গেল। আমার গায়ে কয়েকটা আঁচড়-কামড়ের দাগ বসে গিয়েছিল শুধু। আর কিছু নয়।

মা আর বড়মামা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। যুক্তি করে খুব বুদ্ধির সঙ্গে তারা ঘটনাটা চেপে দেয়। বড়মামি আর মঞ্জুও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল, কেননা সেই রাতে শক্কুদা বাসায় ফেরেনি। কিন্তু কতখানি টের পেয়েছিল তা আমি জানি না! ওদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

অনেকক্ষণ কাঁদলে মনের ভার কমে যায়। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ কেঁদেও কেন যে আমার মনটা তবু ভার হয়ে রইল!

এ শহরের স্কুল কলেজ গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ। আশপাশের নিচু জায়গা বানে ভেসে যাওয়ায় বহু লোক এসে উঠেছে সেখানে। লঙ্গরখানা চালু হয়েছে। বৃষ্টির জন্য সাত দিন বাড়িতে আটকে আছি। বিকেলে রোদ ফুটল। ভাবলাম, যাই লিচুকে দেখে আসি।

লিচু আমাকে দেখে খুশি হল না। গোমড়া মুখ করে রইল।

ওর মা বলল, এসো এসো। বড়লোকের মেয়ে এসেছে আমাদের ঘর আলো করতে।

কথাটায় খোঁচা ছিল কি না কে বলবে! তবে অত ভাববার সময় নেই।

কেমন আছিস?— লিচুকে জিজ্ঞেস করি।

ভাল। খুব ভাল। বেঁচেই আছি, মরে যাইনি।

আজ তোকে ভাল দেখাচ্ছে।

ভাল দেখাবে না কেন? ভালই আছি তো।

বাব্বাঃ। অত মেজাজ করছিস কেন বল তো?

কোথায় মেজাজ! আমাদের মেজাজ বলে কিছু থাকতে আছে নাকি?

কমও তো দেখছি না।

এ কথাতে হঠাৎ লিচু হু-হু করে কেঁদে উঠল হাঁটুতে মুখ গুঁজে।

ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, কাঁদছিস কেন? আজকাল ওসব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?

লিচু জবাব দিল না। অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে কেঁদে তারপর একটু শান্ত হয়ে মুখ তুলল। আস্তে করে বলল, আমি কাঁদছি হারমোনিয়ামটার জন্য।

আবার হারমোনিয়াম? সেটার কী হল?

কর্ণবাবুর টাকা শোধ দেওয়ার জন্য এবার সেটা মা বেচে দিচ্ছে পশুপতিবাবুর কাছে। আমার তবে আর কী থাকল বল?

টাকা শোধ দেওয়ার তাড়া কী? সময় নে না। না হয় আমিই বলে দেবখন কর্ণবাবুকে।

ছিঃ!— লিচু জ্বলে উঠে বলে, কক্ষনও নয়। ওঁর কাছে আমরা একদিনও ঋণী থাকতে চাই না।

পাগলা দাশুর ওপর তুই খুব রেগে গেছিস।

ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো তক্ষুনি বাড়ি ফিরে গলায় দড়ি দিত। কলকাতার ছেলেরা যে এরকমই হয় তা অবশ্য জানতাম। তোর দেওর, তাই বেশি কিছু বলতে চাই না।

দেওর তো কী?

তুই হয়তো ভাববি, দোষটা আমারই।

মোটেই না। তবে তোর আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল। শুনেছি কর্ণর কলকাতায় একজন লাভার আছে।

আছে!— বলে লিচু চোখ কপালে তুলল, কী শয়তান!

তুই যেটা ধরিস সেটাকেই বড় সিরিয়াস ভাবে ধরিস। আজকাল এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেউ ভাবে নাকি?

আমি তো তুই নই।

কেন, আমি কীরকম?

তোর সবই মানায়। আমার তো তোর মতো রূপ, গুণ বা টাকা নেই যে একজনকে ছেড়ে দিলেও আর একজন জুটবে। আমাদের সব কিছু হিসেব কষে করতে হয়।

আমি বুঝি প্রায়ই একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ধরি?

তা তো বলিনি। বললাম, রূপ গুণ থাকলে ওরকম করা যায়। নিজের গায়ে টানিস না। রাগ করলি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, তোর কথা ভেবেই আমি কর্ণর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছি।

কী বলল?

বলল, ওর লাভার খুব স্মার্ট। খুব সুন্দর।

মুখখানা কালো হয়ে গেল লিচুর। বলল, তা হলে তো ভালই, আমাকে কখনও অবশ্য লাভারের কথা বলেনি।

তুই হয়তো জানতে চাসনি। কোনও ছেলের সঙ্গে আলাপ হলে ওটাই প্রথম জেনে নিতে হয়।

জেনে রাখলাম। তুই বুঝি তাই করিস?

নিশ্চয়ই। তবে আমার ইন্টারেস্টটা অ্যাকাডেমিক। তোর তো তা নয়। আবার একজনকে হাতের কাছে পেলেই হয়তো হুড়মুড়িয়ে প্রেমে পড়বি। তাই জানিয়ে দিলাম।

লিচু থমথমে মুখে বলে, আমার জেনে দরকার নেই। যে ছেলেদের মাথা চিবিয়ে বেড়ায় তারই ওটা বেশি জানা দরকার।

আমার মনের মধ্যে তখন থেকে কী যেন একটা ধিক ধিক করছে। কী যেন একটা মনে পড়ি-পড়ি করছে। পড়ছে না। মনটাও ভীষণ ভার। কিছুতেই কাটাতে পারছি না। তাই কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করছিল না। তবু একটু মোলায়েম বিষমেশানো গলায় বললাম, ছেলেরা কাউকে কাউকে মাথা চিবোতে দেয়। সুযোগ পেলে চিবোতে কেউ ছাড়ে না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। উঠব উঠব করছি, এমন সময়ে পাগলা দাশু বাইরে থেকে ডাকল, লিচু!

আমি টুক করে উঠে পড়লাম।

ডাক শুনে লিচু এত চমকে উঠে, শিহরিত হয়ে, স্তম্ভিত মুখে বসে রইল যে আমার সরে পড়াটা লক্ষই করল না। ওর মুখে ভয়, চোখে অবিশ্বাস, মুখে স্বপ্নের আস্তরণ। বেচারা!

আমি উঠোনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসার সময় একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। কর্ণর চেহারাটা সত্যিই বেশ। লম্বা চওড়া, পুরুষোচিত। কিন্তু সাজগোজ অত্যন্ত ক্যাবলার মতো। মুখে অন্যমনস্কতা।

হঠাৎ মনের মধ্যে টিকটিকিটা খুব জোর ডেকে উঠল। এমনকী দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। পায়ের নীচে মাটিও কেঁপে গেল যেন। আশ্চর্য! কর্ণ মল্লিককে যে আমিও আগে কোথায় দেখেছি!

একদিনই মাত্র রোদ উঠেছিল কিছুক্ষণ। তারপর আবার ঘনঘোর মেঘ করে এল। গরাদের মতো বৃষ্টি ঘিরে ধরল আমাদের। এই যেন পৃথিবীর শেষ বৃষ্টিপাত। এত তেজ সেই বৃষ্টির যে মাটিতে পড়ে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে জলের ছাঁট। বুঝি বা ফুটো করে দেয় মাটি। আমার ভয় হয়, বৃষ্টি থামলে বুঝি দেখব গোটা শহরটাই একটা চালুনির মতো অজস্র ছ্যাঁদায় ভরে আছে।

প্রথম বর্ষায় কিছু জায়গা ডুবেছিল। এই দ্বিতীয় বর্ষায় পাহাড়ি ঢল নেমে ভেসে যেতে লাগল গাঁ গঞ্জ। শহরের আশেপাশে নিচু জায়গায় জল ঢুকছে। ট্রেন বন্ধ, সড়ক বন্ধ, এরোপ্লেন উড়ছে না।

কখনও আমি লঙ্গরখানায় ধুন্ধুমার জ্বলন্ত উনুনে জাহাজের মতো বিশাল কড়াইয়ে খিচুড়িতে হান্ডা মারছি। ঘামে চুবচুবে শরীর। কখনও দলবল নিয়ে বাজার ঢুঁড়ে ব্যাবসাদারদের গদি থেকে চাল ডাল তুলে আনছি। কখনও পার্কে ময়দানে বাঁশ পুঁতে খাড়া করছি ত্রিপলের আশ্রয় শিবির। প্রতিদিন শহরের বাইরে ভেসে-যাওয়া গাঁ গঞ্জ থেকে যে হাজার হাজার লোক আসছে তাদের মাথা গুনতি করে বেড়াচ্ছি। মিলিটারির এক বাঙালি ক্যাপটেনের সঙ্গে ভাব করে ডিফেন্সের নৌকোয় চলে যাচ্ছি লোক উদ্ধার করতে। আমি কোথায় তা কাকা-কাকিমা টের পায় না, এমনকী অফিস টের পায় না, আমি নিজে পর্যন্ত টের পাই না। কখন খাচ্ছি, কখন ঘুমোচ্ছি তার কোনও ঠিক ঠিকানা জানি না। মাঝে মাঝে টের পাচ্ছি গায়ের ভেজা জামাকাপড় গায়েই শুকিয়ে যাচ্ছে। চিমসে গন্ধ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। দাড়ি যৌবনের রবি ঠাকুরকে ধরে ফেলেছে প্রায়। চুলে জট। গায়ে আঙুল দিয়ে একটু ঘষলেই পুরু মাটির স্তর উঠে আসে। গায়ে গায়ে অনেক ক্ষত ওষুধের অভাবে, এমনিই শুকিয়ে আসছে। আমবাড়িতে একবার জলের তোড়ে নৌকো উল্টে ভেসে গেলাম। ফাঁসিদেওয়ায় অল্পের জন্য সাপের ছোবল থেকে বেঁচে যাই। ডামাডোলে আমার ঘড়িটা হারিয়ে গেছে, জুতোজোড়া ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় ফেলে দিয়েছি, শার্টটা বদান্যতাবশে এক রিফিউজিকে দিয়ে দিলাম। এখন আছে শুধু গেঞ্জি ছেঁড়া প্যান্ট, আর আছি আমি। গুরুং বস্তির অন্তত শ দুয়েক লোক নিখোঁজ। মাইল পাঁচেক দূরে খরস্রোতা নদী বেয়ে গিয়ে গাছ থেকে আমরা জনা দশেক আধমরা মানুষকে উদ্ধার করলাম। তিস্তার জলের তোড়ে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া এক দুর্গম শহরে ঢুকে লাশ আর জিয়ন্ত মানুষ বাছতে হিমশিম খেতে হল। আমি কী করে এখনও বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য লাগে খুব।

কলকাতাতেও বৃষ্টি পড়ছে কি? কীরকম হয়েছে এখন কলকাতার অবস্থা? চোখ বুজে ভাবতে গিয়ে দেখি, গোটা কলকাতাকেই উপড়ে নিয়ে কে যেন একটা উঁচু পাহাড়ের ঢালে যত্ন করে সাজিয়েছে। ভারী সুন্দরদেখাচ্ছে।

বাচ্চাদের জন্য মস্ত লোহার ড্রামে খাবলে খাবলে গরম জলে গুঁড়ো দুধ গুলতে গুলতে আমি একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কলকাতাকে নিয়ে ভাববার এর পর কোনও মানেই হয় না। সময়ও নেই। রিলিফের কাজ করতে করতে কখন যে সবাই আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে কে জানে। চেনা অচেনা, ছেলে বুড়ো অফিসার পাবলিক হাজারটা লোক মুহুর্মুহু এসে এ কাজে সে কাজে পরামর্শ চাইছে। কর্ণদা, কর্ণবাবু, কর্ণ ভায়া, মল্লিক মশাই, মিস্টার মল্লিক, মল্লিক শুনতে শুনতে কান ঝালপালা। সব কাজই আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু একটা আমি যেন দশটা হয়ে উঠি। এবং দশ থেকে ক্রমে এগারোটা, বারোটা ছাড়িয়ে একশোর দিকে এগোই।

কে যেন এসে খবর দিল, কর্ণদা, আপনার অফিসের পিয়োন আপনাকে খুঁজতে এসেছে।

অফিস!— আমি লজ্জায় জিব কাটি। এতদিনে অফিসের কথা একদম খেয়াল ছিল না। পিয়োন আমাকে দেখে চোখ কপালে তোলে, আপনিই কি আমাদের জুনিয়ার অফিসার কর্ণ মল্লিক? একদম পাল্টে গেছেন স্যার!

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করলাম মাত্র। পিয়োন আমাকে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেল। আজ

ফ্লাড সিচুয়েশন নিয়ে অফিসারদের জরুরি মিটিং। বেলা বারোটায়।

আজকাল কোথাও বসে একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলেই আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই, সেই ভয়ে এক মুহূর্তও আমি বসি না। কিন্তু জেলা অফিসারের ঘরের মিটিং-এ গদি আঁটা চেয়ারে বসে ফ্লাড সিচুয়েশন সম্পর্কে তাঁর কথা শুনতে শুনতে বার বার আমার চোখ চুম্বকের মতো সেঁটে যাচ্ছিল. জেলা অফিসার প্রথমে আমাকে চিনতে পারেননি। তারপর বলেছেন, ইউ লুক ভেরি সিক। তারপর নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেছেন, ইউ স্টিংক।

সবই সত্য। তবে আমার কীই-বা করার আছে?

মিটিং-এর শুরুতেই জেলা অফিসার বললেন, ফ্লাডের যা অবস্থা তাতে আমাদের ইমিডিয়েটলি রিলিফ ওয়ার্ক শুরু করতে হবে। আপনারা এক একজন এক একটা রিলিফ ওয়ার্কের চার্জ নেবেন। সরকারি অর্ডার, সব অফিসারকেই রিলিফ ওয়ার্কে নামতে হবে।

আমি হাই তোলায় জেলা অফিসার আমার দিকে কঠিন চোখে একবার তাকালেন। বললেন, ডোন্ট ইউ অ্যাগ্রি?

ইয়েস স্যার।

আমি ওপর নীচে মাথা নাড়লাম। বাড়ি যাওয়ার সময় পাইনি। ক্যাম্প থেকে একজন ভলান্টিয়ারের আধময়লা জামা চেয়ে পরে এসেছি। একজোড়া হাওয়াই চটি ধার দিয়েছে আর একজন। আমাকে নিশ্চয়ই খুব বিশ্বস্ত অফিসারের মতো দেখাচ্ছে না!

জেলা অফিসার সবাইকে কাজ ভাগ করে দিচ্ছিলেন। আমি অতি কষ্টে বার বার ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও জেগে থাকার চেষ্টা করছি।

মিস্টার মল্লিক!

ইয়েস স্যার।

আপনি কীসের চার্জ নেবেন?

আমি ঘুমকাতর গলায় বলি, আমি জীবনে কখনও রিলিফ ওয়ার্ক করিনি। আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

হিমশীতল গলায় জেলা অফিসার বললেন, কথাটা সত্যি নয় মল্লিক। আপনি গত কয়েকদিন অফিসের কাজ ফেলে রেখে বিস্তর রিলিফের কাজ করছেন। কিন্তু তার একটাও সরকারি নীতিবিধি মেনে করেননি। একজন সরকারি অফিসারের দায়িত্ব যা হতে পারে তার একটাও পালন করেননি।

ক্রমে তাঁর গলা একটু একটু করে উঁচুতে উঠতে থাকে, উইদাউট ইকুইপড উইথ প্রপার ক্রেডেনসিয়ালস অ্যাজ এ পাবলিক সারভেন্ট আপনি ডিফেনস-এর রিলিফ টিমের সঙ্গে বহু জায়গায় গেছেন এবং সেটাও গেছেন উইদাউট প্রায়র অ্যাপরুভ্যাল। আপনি সবকারি গোডাউন থেকে সমস্ত প্রোটোকল অগ্রাহ্য করে ফুডগ্রেন বের করে দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কমপ্লেন করেছেন, আপনি গাঁধী ময়দানে তাঁবু খাটাতে গিয়ে ত্রিপলের এক কোনার দড়ি গাঁধীর স্ট্যাচুর গলায় বেঁধেছিলেন। দেয়ার ইজ এ ভেরি সিরিয়াস চার্জ এগেনস্ট ইউ। আমার প্রশ্ন, এগুলো আপনি কেন করেছেন? পাবলিকের চোখে হিরো হওয়ার জন্য?

আমি অতল ঘুম থেকে নিজেকে টেনে তুলে বলি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার।

আপনি যখন রাইটার্স বিল্ডিংসে ছিলেন তখনও এই ধরনের কিছু কিছু কাজ করেছেন। আপনার সি আর-এ তার উল্লেখ আছে। স্বয়ং মিনিস্টারও আপনার ওপর খুশি নন। গত ইলেকশনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি একটা বুথ সিল হয়ে যাওয়ার পরও রিওপেন করেছিলেন। ব্যালটের বদলে লোককে নিজে সই করে সাদা কাগজ দিয়েছিলেন ব্যালট হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আপনি পরে রিপোর্টে বলেছিলেন, ওই বুথ ওপেন করার আগেই সব ভোট জমা পড়ে যাওয়ায় আপনি ওই কাণ্ড করেন। সেটা হতেও পারে। কিন্তু কেউ কারচুপি করে যদি বুথ দখল করেই থাকে তার জন্য

প্রপার প্রসিডিওর আছে। সাদা কাগজকে ব্যালট হিসেবে ব্যবহার করার নজির আপনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন। সেখানেও পাবলিক আপনাকে ম্যানহ্যান্ডেল করায় আপনাকে প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। উই নো এভরিথিং অ্যাবাউট ইউ।

এ সবই সত্য। আমার কিছু বলার থাকে না আর। বসে বসে আমি এক বিকট চেহারার ঘুম-রাক্ষসের সঙ্গে আমার দুর্বল লড়াই চালাতে থাকি।

জেলা অফিসার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি পাগল?

না, স্যার।— আমি দুর্বল গলায় বলি!

আপনার মেডিক্যাল রিপোর্টও খুব ফেবারেবল নয় মিস্টার মল্লিক। হাসপাতালের ডাক্তারদের অভিমত হল, সেই বুথ নিয়ে গণ্ডগোলের সময় আপনার ব্রেন ড্যামেজ হয়েছিল। যাকগে, এইসব নানা কারণেই আপনাকে নর্থ বেঙ্গলে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বোধ হয় আপনিও সেটা জানেন।

আমি চকিতে ঘুমিয়ে কয়েক সেকেন্ড একটা স্বপ্ন দেখে ফেলি। দেখতে পাই, ফুলচোরের সঙ্গে আমি একটা জাহাজের ডেক-এ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। চোখ খুলে আমি বলি, কিন্তু তার পরেও আমি সরকারি কাজে আরও কয়েকবার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছি স্যার। তবে আমার ধারণা প্রত্যেকবারই আমাকে পিটিয়েছিল হয় কোনও পলিটিক্যাল পার্টির লোক, নয়তো সাদা পোশাকের পুলিশ। পাবলিক নয়। এনিওয়ে আমার ব্রেন ড্যামেজের কথাটা আমি অস্বীকার করছি না।

জেলা অফিসার ঘড়ি দেখছিলেন। বললেন, পুরো এক মিনিট পর আপনি আমার কথার জবাব দিলেন। যাকগে, ইউ আর টায়ার্ড, আই নো। আপনাকে রিলিফ ওয়ার্ক থেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম।

জেলা অফিসার বললেন, শুনুন! আপনি ফ্লাডে এখানে যা করেছেন তার জন্য সরকারিভাবে আপনি হিরো তো ননই, বরং ইউ আর এ সিরিয়াস ডিফলটার! তাই সরকারিভাবে আমি আপনাকে ধন্যবাদও দিচ্ছি না! কিন্তু—

কিন্তু?— আমি অবসন্নভাবে চেয়ে থাকি।

জেলা অফিসারের থমথমে মুখে হঠাৎ হাসির বজ্রপাত হল। হো হো হো করে হেসে বললেন, কিন্তু বেসরকারিভাবে আই র‍্যাদার লাইক ইউ।

ফিরে এসে আমি আবার লঙ্গরখানায় খিচুড়ি হাড়িতে হাতা মারতে থাকি। জীবনে আমার আর কী করার আছে বা ছিল তা আমার ঘুমে আর ক্লান্তিতে ভোম্বল হয়ে যাওয়া মাথায় কিছুতেই খেলে না। ভাবছি নিজের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টটা চুরি করে একবার দেখতে হবে। কলকাতায় আমি আর কী কী কাণ্ড করেছিলাম তা জানা দরকার। জানলে যদি আবার কলকাতার কথা আমার মনে পড়ে।

কে একজন এসে জরুরি গলায় বলল, কর্ণবাবু! আপনার কাকা।

ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই কাকা এসে আমার হাত থেকে হান্ডা কেড়ে নিয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে! এবার বাড়ি চল, চল শিগগির।

বাড়ি ফিরে কী করেছি তা মনে নেই। এক মাতালের মতো গভীর ঘুমের কুয়ো আমাকে টেনে নিয়েছিল।

ক'দিন পর ঘুম থেকে উঠলাম তা বলতে পারব না, কিন্তু যখন উঠলাম তখন আমার সারা গায়ে এক হাজার রকমের ব্যথা। হাড়ের জোড়ে জোড়ে খিল ধরে আছে, কান ভোঁ ভোঁ করছে। একজন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করছেন। কাকা চেয়ারে এবং কাকিমা আমার বিছানায় গম্ভীর মুখে বসা।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার কী হয়েছে?

ডাক্তার চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন, তেমন কিছু তো দেখছি না।

কাকা গম্ভীর গলায় বললেন, খুবই আশ্চর্যের কথা। আমার তো মনে হয়েছিল, ও আর বাঁচবেই না। চেহারাটা দেখুন, চেনা যায় ওকে? গাড়লটাকে সবাই মিলে খাটিয়েই প্রায় মেরে ফেলেছিল। আমি যখন গিয়ে ওকে ধরে আনলাম তখন ওর কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

কাকিমা কথা বলছেন না তবে আমার গায়ে হাত রেখে বসে আছেন চুপচাপ।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, একজসন, একসট্রিম একজসন। ফুল রেস্টে রাখবেন।

আমি দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আমার সময়ের কোনও জ্ঞান থাকে না। ঘুম ও জাগরণের মধ্যে পার্থক্যও লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

শুনছেন?

বলুন।

আপনি কেমন আছেন?

ভাল।

আপনাকে দেখতে এলাম।

আপনি কি ভোরের পাখি? ভোর ছাড়া আসেন না তো।

আমি ফুলচোর। আমার এইটেই সময়।

আমি জানি আপনি আজকাল ফুল চুরি করতে আসেন না।

আপনার বাগানে যে ফুলই নেই। শুধু কাদা আর জল।

ফুল যখন নেই তখন কেন এলেন?

বললাম যে! আপনাকে দেখতে।

আমার কি কোনও অসুখ করেছে?

সে তো আপনারই ভাল জানার কথা। লোকে বলছে আপনি বন্যার সময় খুব খেটেছেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার দিকে চেয়ে থাকি। জানালার বাইরে কাকভোরের আবছা অন্ধকারে ফুলচোর দাঁড়িয়ে। আজ গলায় কোনও ইয়ার্কির ভাব নেই।

আমি বিছানায় উঠে বসি। বলি, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমার অসুখ অন্য।

সেটা কী?

যে শহরে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, কিছুতেই তার কথা মনে পড়ছে না। কী যে যন্ত্রণা!

জানি। লিচুও আমাকে এরকম একটা কথা বলছিল। আপনার নাকি সায়ন্তনীর কথাও মনে পড়ছে না।

না। কী করি বলুন তো!

ফুলচোর এবার একটু ফাজিল স্বরে বলল, সিনেমায় এরকম ঘটনা কত ঘটে! অ্যাকসিডেন্টে স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ফের আর একটা অ্যাকসিডেন্টে স্মৃতি ফিরে আসে। ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক। ভয় পাচ্ছেন কেন?

আমি মাথা নেড়ে বলি, এটা স্মৃতিভ্রংশ নয়।

তবে কী?

মানুষ কিছু জিনিস ভুলতে চায় বলেই ভুলে যায়। কিন্তু আমি কেন কলকাতার কথা ভুলতে চাইছি?

ভুললেন আর কোথায়?— ফুলচোর অন্ধকারেই একটু শব্দ করে হাসে, সেদিন তো নিজের ভালবাসার মহিলাটির কথা অনেক বললেন।

আমি অন্ধকারেই বসে বসে আপনমনে মাথা নাড়ি। বলি, কবে যেন, আজ না কাল, স্বপ্ন

দেখছিলাম, আমি একটা লুপ্ত শহর আর একটা লাশ খুঁজতে বেরিয়েছি। দেখি, যেখানে কলকাতা ছিল, সেখানে মস্ত নিষ্ফলা মাঠ। একটা টিনের পাতে আলকাতরা দিয়ে কে লিখে রেখেছে, হিয়ার লাইজ ক্যালকাটা।

লাশটা কার?

বোধ হয় সায়ন্তনীর।

যাঃ।

আমি বললাম, সেই জন্যই আমি কিছুদিন কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে চাই।

ফুলচোর চুপ করে রইল। বহুক্ষণ বাদে বলল, যাবেন কী করে? এখনও ট্রেন চলছে না যে।

প্লেন চলছে। আমাকে যেতেই হবে।

আপনার শরীর তো এখনও দুর্বল।

আপনি আমাকে নিয়ে খুব ভাবেন তো!

কোনও জবাব এল না।

আধো ঘুমে, আধো জাগরণে আমি টের পাই, ফুলচোর এসেছিল। চলে গেছে।

কাটুসোনা

আমার সর্বনাশ চৌকাঠের ওপাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে ঘরে ঢুকবে। বুকের মধ্যে অলক্ষনে টিকটিকি ডাকছে সব সময় টিক টিক টিক টিক।

আমার জন্ম এই শহরে। আমি এখানে রাজহাঁসের মতো অহংকারে মাথা উঁচু করে হাঁটি। রাজ্যের মেয়ে আমাকে হিংসে করে। আমার বড় সুখের বাঁধানো জীবন ছিল। সেই সব কিছু লন্ডভন্ড করতে কেন এল পাগলা দাশু?

শঙ্কুদার রেস্টুরেন্টের বন্ধুদের কারও মুখই আমি ভাল করে দেখিনি। এতদিনে কারও মুখই মনে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, এই একটা মুখ কী করে যেন খুব অস্পষ্ট জলছাপের মতো থেকে গিয়েছিল মনের মধ্যে। লিচুদের বাড়িতে সেদিন পাগলা দাশু গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে না গেলে হয়তো-বা কোনওদিনই মনে পড়ত না।

অমিতের সঙ্গে বিয়ে না হলেও আমার তেমন কিছু যাবে আসবে না, ওর সঙ্গে তো আমার ভাব ভালবাসা ছিল না। শুধু জানি লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। মনটাকে সেইভাবে তৈরি রেখেছি। কিন্তু সেই মন ভেঙে আবার গড়ে নিতে কষ্ট হবে না তেমন, যেটা সবচেয়ে ভয়ের কথা তা হল শঙ্কুদার সঙ্গে আমার সেই ঘনিষ্ঠতা যা আজ পর্যন্ত খুব কম লোক জানে। বলতে গেলে দু'জন, মা আর বড়মামা।

বহুদিন বাদে শঙ্কুদার সঙ্গে সেই ঘটনাটার গা ঘিনঘিনে স্মৃতি, তার লজ্জা তার ভয় নিয়ে ফিরে এল। পরিষ্কার মনে পড়ছে টেবিলের বাঁ ধারে মুখোমুখি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল পাগলা দাশু। কথা বলছিল খুব কম। তবে মাঝে-মাঝে খুব বড় বড় চোখে চেয়ে দেখছিল আমাকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা।

আর কিছু মনে নেই। শুধু ওইটুকু।

পাগলা দাশুরও তেমন করে মনে রাখার কথা নয় আমাকে, কিন্তু তবু কী করে যেন মনে রেখেছে ও। একটু আলোছায়া রয়েছে এখনও, কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে পড়বে হয়তো, তক্ষুনি লাফিয়ে উঠবে। বলবে, আরে! সেই মেয়েটা না?

কী লজ্জা!

বড় বেশি পাগল হয়েছিল শঙ্কুদা। রাত্রে হোটেলের ঘরে যখন আমাদের মরণপণ লড়াই চলছে তখন একবার পাগলের মতো হেসে উঠেছিল, আমার বন্ধুরা জানে যে তুমি আজ আমার সঙ্গে হোটেলে রাত কাটাবে। এই হোটেলের মালিকও ওদেরই একজন। সব জানাজানি হয়ে গেছে কাটু। এখন পিছিয়ে গিয়ে লাভ নেই।

সেই কথাটা এত দিন গুরুতর হয়ে দেখা দেয়নি, আজ বিষ বিছের হুল হয়ে ফিরে এল। তার মানে পাগলা দাশুও সব জানে। জানে, কিন্তু মনে পড়ছে না। যতক্ষণ মনে না পড়ে ততক্ষণ সর্বনাশ চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ইদানীং আমাদের সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে রক্তকরবীর নন্দিনী আর রাজার মতো। আমি খুব ভোরে উঠে পড়ি। রাতে ঘুমই হয় না। সারা রাত বুকে টিকটিকির ডাক! ঘুমোই কী করে?

প্রায়ই সন্তর্পণে গিয়ে মল্লিকবাড়ির জানলার ধারে দাঁড়াই।

শুনছেন?

পাগলা দাশুও জেগে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে জানলার ধারে, মুখে বিষণ্ণ হাসি, বলে, ফুলচোর!

ও হয়তো ভাবে, আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। ভাবুক, যা খুশি ভাবুক, শুধু যেন মনে না পড়ে আমাকে। আমি ওর মাথা আরও গুলিয়ে দেব। মেয়েরা তো পারে ওই সব। আমি কিছু বেশিই পারি।

একদিন মৃদু মোলায়েম স্বরে বলে ফেলি, চুরি করতে নয়, আমি আজকাল ধরা দিতে আসি।

ঠাট্টা করছেন?

কেন, আমি সব সময়ে কি শুধু ঠাট্টাই করি? আমার মন বলে কিছু নেই?

ফাজিল মেয়েরা কতভাবে পুরুষকে নাচায়!

আপনি আর নাচছেন কই?

আমার কথা আলাদা। আমি আর স্বাভাবিক নই। কিছু মনে পড়ছে না। যতদিন না সব ঠিকঠাক মনে পড়ে, ততদিন আমি আর স্বাভাবিক নই।

মনে করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। খামোকা চেষ্টা করছেন কেন? ওতে মাথা আরও গুলিয়ে যায়।

পাগলা দাশু ইদানিং বড় অস্থির, দু' হাতে মাথার চুল খামচে বড় বড় আনমনা চোখে দূরের অন্ধকার পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, মানুষ আসলে কিছুই ভোলে না, সব তার মস্তিষ্কের কোষে সাজানো থাকে থরে থরে। কিন্তু সব কথা সে মনে রাখতে চায় না। কিছু ঘটনাকে সে বাতিল করে দেয়, ভুলতে চায়। তাই ভুলে যায়। কিন্তু আমি কেন ভুলতে চাইছি?

আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিই। জিজ্ঞেস করি, আপনি কলকাতায় কবে যাবেন?

শিগগিরই যাব। অফিস ছুটি দিতে চাইছে না। যেদিন দেবে সেদিনই রওনা হব।

সায়ন্তনী আপনাকে চিঠি দেয় না?

দেয়। খুব ভাল চিঠি লেখে সায়ন্তনী।

আপনাদের বিয়ে কবে?

আসছে শীতে।

আমি করুণ মুখ করে বলি, আপনি কলকাতায় গেলে এই জানলাটা আমার কাছে একদম ফাঁকা লাগবে ক'দিন।

পাগলা দাশু হাসে। বলে, চিরকালের জন্যও ফাঁকা লাগতে পারে, আমি কলকাতায় বদলি চেয়ে দরখাস্ত করেছি।

শুনে আমার মনে খুশির জোয়ার এল। জানলার গ্রিল প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেলি, কবে?

পাগলা দাশু একটু যেন অবাক হয় আমার উৎসাহ দ্যাখে, বলে কে জানে! হয়তো হবেই না, ইনএফিসিয়েন্সি আর ডিসওবিডিয়েন্স-এর জন্য আমাকে কলকাতা থেকে ট্রানসফার করা হয়েছিল, ওরা আমাকে হয়তো ফেরত নেবে না।

আমি নিভে যাই। বলি, ও।

খুশি হলেন না তো।

আমি আবার কথা ঘোরানোর জন্য বলি, সায়ন্তনী আপনাকে চিঠিতে কী লেখে?

কী আর লিখবে? আমরা প্রায় ছেলেবেলা থেকে দু'জনে দু'জনকে ভালবাসি। তাই দু'জনের মধ্যে নতুন কথা তো কিছু নেই। আমাকে ও ভাল থাকতে লেখে, সাবধানে চলতে বলে, মন দিয়ে চাকরি করতে হুকুম দেয়, ঠিক প্রেমের চিঠি নয়। কিন্তু ভাল চিঠি।

সায়ন্তনী আপনাকে কখনও সন্দেহ করে না?

না, কেন করবে? আমি তো অবিশ্বাসের কিছু করিনি!— বলেই হঠাৎ থমকে যায় পাগলা দাশু। সঙ্গে সঙ্গে বলে, না, করেছি, নিশ্চয়ই করেছি। নইলে আমি ভুলতে চাইছি কেন?

আমিও অনেক কিছু ভুলে যেতে চাই। আপনার মতো যদি ভুলতে পারতাম।

কী ভুলতে চান আপনি?

ধরুন এই জানলাটা, এই বাগান, এই কয়েকটা ভোরবেলার কথা। সবচেয়ে বেশি ভুলতে চাই আপনাকে।

ফাজিল।— বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় পাগলা দাশু।

আমি গম্ভীর স্বরে বলি, সত্যি। বিশ্বাস করুন ফুলচোর, এটা ইয়ারকির কথা নয়। আমার সমস্যা অনেক জটিল।

আমি অভিমান করে বলি, লিচুর জন্য আপনার যে দরদ সেটুকুও কি আমার জন্য নেই?

পাগলা দাশু কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে যায়, হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে। তারপর একটু হেসে বলে, লিচু আপনার মতো ফাজিল নয়।

আমি অভিমানের সুরটা বজায় রেখে বলি, এ বাগানে সাপ আছে পোকামাকড় আছে। এই অন্ধকার ভোরে সাপখোপের ভয়কে তুচ্ছ করে শুধু ফাজলামির জন্য কেউ আসে?

ইচ্ছে হয় বলি, রাধা কি কৃষ্ণের কাছে ফাজলামি করতে যেত? কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে, আর পাগলা দাশু সেটাকে আরও ফাজলামি ভাববে বলে চেপে যাই।

পাগলা দাশু সাপের কথায় ভয় পেয়ে বলল, একটা টর্চ নিয়ে আসতে পারেন না!

ও বাবা! তা হলে দরদও তো আছে দেখছি।

আছে। বোধ হয় আছে। কিন্তু আমি জানি আপনি অভিসারে মোটেই আসেন না ফুলচোর, আপনার অন্য কোনও মতলব আছে।

কী করে বুঝলেন?

আপনার মুখ অনেক কথা বলে, চোখ বলে না, আপনি আমাকে জ্বালাতে আসেন। আজও তাই আমাকে আপনার নামটাও বলেননি।

আমার নাম কৃষ্ণা।

হতে পারে। নাও হতে পারে।

বিশ্বাস হয় না আমাকে?

না। কী করে বোঝাই বলুন তো!

এ সব বোঝাতে হয় না ফুলচোর। আপনা থেকেই বোঝা যায়।

ভোর হয়ে আসে। আমি পালিয়ে আসি।

খেলাটা খুবই বিপজ্জনক, এই মফস্‌সল শহরে একবার যদি পাগলা দাশুর সঙ্গে আমার জানালার আড্ডার কথা লোকে জেনে যায় তবে সারা শহরে টি টি পড়ে যাবে। এ তো কলকাতা নয় যে, কারও খবর কেউ রাখে না। তবু আমি ঝুঁকিটা নিই বড় আর এক সর্বনাশ ঠেকাতে।

মা একদিন জিজ্ঞেসই করল, সকালে আজকাল গলা সাধতে বসিস না?

ইচ্ছে করে না!

কত দামি হারমোনিয়ামটা কেনালি, কালীবাবু গুচ্ছের টাকা নিচ্ছেন, তবলচিকে দিতে হচ্ছে। এ তোর কেমন উড়নচণ্ডী স্বভাব?

ভাল লাগে না, কী করব?

তা হলে রোজ ভোরবেলায় উঠে করিস কী?

মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই।

মা মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলে না।

আমি আবার একদিন পাগলা দাশুর জানলায় হানা দিয়ে বলি, আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন?

গ্রে স্ট্রিট।

সেটা কোথায়?

উত্তর কলকাতায়। কেন, গ্রে স্ট্রিট চেনেন না? বিখ্যাত জায়গা।

আমি এবার সন্তর্পণে একটা টোপ ফেলি। বলি, আমি কখনও কলকাতায় যাইনি।

যাননি।— বলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে লোকটা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলে, তা হলে আগে আমি আপনাকে কোথায় দেখেছি? কলকাতায় নয়? তবে কোথায়?

আপনি আমাকে আগে কখনও দ্যাখেননি।

পাগলা দাশু মাথা নাড়ে, দেখেছি। ভীষণ চেনা মুখ। ভেবেছিলাম কলকাতায় গেলেই আপনাকে আমার ঠিক মনে পড়ে যাবে। তা নয় তা হলে?

না। আমি কলকাতায় যাইনি। যেতে খুব ইচ্ছে করে।— বলতে বলতেও টের পাই, আমার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঢিবঢিব করছে। কলকাতায় গেলে মনে পড়বে? তা হলে আমার সর্বনাশ যে চৌকাঠ ডিঙোবে!

পাগলা দাশু বলে, কখনও কলকাতায় যাননি? সত্যি?

না।— আমি গম্ভীর মুখে বলি, আপনি কবে যাচ্ছেন?

ছুটি পেলেই।

পাননি এখনও?

না, দিচ্ছে না। বন্যার সময় আমি বিনা নোটিসে কামাই করায় খুব গণ্ডগোল চলছে।

তা হলে?

যেতে পারছি না। কিন্তু যাওয়াটা দরকার।

একদিন দুপুরে ম্লানমুখী লিচু এসে বলল, আমাদের হারমোনিয়ামটা আজ পশুপতিবাবু নিয়ে গেল। মাত্র পঁচাত্তর টাকায়।

বলেই আমার নির্জন ঘরের বিছানায় বসে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বড় কষ্ট হল বুকের মধ্যে। পুরনো ভাঙা একটা হারমোনিয়াম নিয়েই ওর কত সাধ আহ্লাদ!

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কাঁদছিস কেন? আমার নতুন স্কেল চেঞ্জারটা পড়েই থাকে। তুই যখন খুশি এসে গান গাস।

একটু কেঁদে ও চোখ মুছে বলল, সে কি হয়?

কেন হয় না? এ বাড়িতে তোর কোন ভাসুর থাকে?

তা নয় রে! নিজের হাতের কাছে একটা জিনিস থাকা, ভাঙা হোক, পুরনো হোক, সেটা তবু আমাদের নিজস্ব ছিল।

মাসিমাই বা কেন হারমোনিয়ামটা বিক্রি করেই ছাড়লেন? এটা অন্যায়।— আমি রাগ করে বলি।

লিচু বলে, কর্ণবাবু হারমোনিয়ামটা কেনায় আমাদের বদনাম হয়েছিল। সেই থেকে ওটার ওপর মায়ের রাগ। তা ছাড়া টাকাটাও শোধ দিতে হবে।

লিচুর সমস্যা আমি কোনও দিনই ঠিক বুঝতে পারব না। ওর এক রকম, আমার লড়াই আর এক রকম।

পর দিন ভোরবেলা আমি গিয়ে পাগলা দাশুর জানালায় হানা দিই।

শুনেছেন লিচুদের হারমোনিয়ামটা বিক্রি হয়ে গেল?

শুনেছি।

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, মাত্র পঁচাত্তর টাকায়। আপনি কত ঠকে গিয়েছিলেন এবার ভেবে দেখুন।

পাগলা দাশু খুব অপ্রতিভ হেসে বলল, তা বটে। তবে দ্বিতীয়বার দামটা আরও বেশি পড়ে গেল আমার।

তার মানে?

ঘটনাটা ভারী মজার। কাল রাতে পশুপতি এসে হঠাৎ বলল, বলেছিলাম কি না পঁচাত্তর টাকাতেই দেবে! আমি অবাক হয়ে বললাম, কী! পশুপতি বলল, সেই যে লিচুদের হারমোনিয়ামটা! আপনি তো না-হক দুশো টাকা দিয়ে বাজারটাই খারাপ করে দিয়েছিলেন। সেই হারমোনিয়াম আজ আমি পঁচাত্তর টাকায় রফা করে নিয়ে এলাম। শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। লিচুরা হারমোনিয়ামটাকে বড় ভালবাসে। তাই আমি তখন পশুপতিকে বললাম হারমোনিয়ামটা আমি আবার কিনতে চাই। শুনে পশুপতি আকাশ থেকে পড়ে বলল, আবার! আমি বললাম, হ্যাঁ আবার! তখন পশুপতি মাথা চুলকে বলল, আপনার তো দেখছি হারমোনিয়ামটার জন্য বিস্তর খরচা পড়ে যাচ্ছে! আমি দর জিজ্ঞেস করায় পশুপতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, আপনি কিনবেন জানলে কেনা-দামটা আপনাকে বলতাম না। তা কী আর করা যাবে, ওই দুশোই দেবেন, যা ওদের দিয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, আবার কিনলেন?

আবার কিনলাম।

কিন্তু লিচুরা কিছুতেই ওই হারমোনিয়াম আপনার কাছ থেকে নেবে না।

জানি! তাই পশুপতিকে সেই ভার দিয়েছি। সে হারমোনিয়ামটা ওদের বাসায় দিয়ে বলে আসবে যে ওর বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না, জায়গা হলে হারমোনিয়াম নিয়ে যাবে।

আমি খুশি হতে পারলাম না কেন কে জানে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, লিচুকে আপনি খুব ভালবাসেন?

বাসলে কি আপনার হিংসে হবে?

জানি না।— আমি থমথমে মুখে বলি।

খুব হাসে পাগলা দাশু। বলে, খুব ভাল পার্ট করছেন আপনি। একদম আসলের মতো। ভীষণ হিংসুটে দেখাচ্ছে আপনাকে।

জবাব না দিয়ে চলে আসি। বুকের মধ্যে বার বার আক্রোশে হুল বিঁধিয়ে দিচ্ছে একটা কাঁকড়াবিছে, এমন জ্বালা।

পাগলা দাশু পিছন থেকে বলল, শুনুন। আমার সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। কাল কলকাতা যাচ্ছি।

ফটকের কাছ বরাবর এসে পড়েছিলাম। হঠাৎ এই বজ্রাঘাতে থমকে দাঁড়াই, তারপর পাথর বাঁধা দুই পা ঠেলে ঠেলে ফিরে আসি নিজের ঘরে।

কাঁদতে বড় সুখ। তাই বালিশে মুখ গুঁজে ভিতরকার পাগলা ঝোরা খুলে দিই।

পাগলা দাশু

মেঘ ফুঁড়ে প্লেন নামছে। পায়ের নীচে বিশাল সেই শহর। এত উঁচু থেকেও তার বুঝি শেষ দেখা যায় না। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ে থাকি। ক্রমে শহরটা ছুটে চলে আসে আমাকে লক্ষ করে। তারপর আর দেখা যায়। না তাকে। খানিক বড় ঘাসের মাঠ জানালার বাইরে উলটোদিকে ছুটে যায়। ঝম ক'রে দমদম এয়ারপোর্টের কংক্রিটে পা রাখল প্লেন। হু হু করে কলকাতা ঢুকে যাচ্ছে আমার মধ্যে। অত্যন্ত দ্রুত আমার মগজের মধ্যে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়।

মনে পড়ে গেল। সব মনে পড়ে গেল! ভারী লজ্জা করছিল কলকাতার মুখোমুখি হতে। ভুলে গিয়ে অপরাধী হয়ে আছি। আড়ষ্ট লাগছে একটু। দীর্ঘ প্রবাসের পর ফেরার মতো।

সায়ন!

ডাক শুনে শ্যামলা রোগা, ছোটখাটো মেয়েটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা নিয়ন আলোর মতো জ্বলে উঠল না তো! তবে স্বাভাবিক খুশিই দেখাল ওকে।

বলল, তুমি! কত ভাবছিলাম তোমার কথা! কই চিঠিতে আসবে বলে লেখোনি তো!

হঠাৎ এলাম।

কেমন ছিলে? কেমন জায়গা?

সে অনেক কথা সায়ন। চলো, কলকাতাটা ঘুরে দেখি।

ঠিক আগের মতো আমরা ট্রামে, বাসে উঠে উঠে চলে যাই এখানে সেখানে। ময়দানে, পার্কে, গঙ্গার ধারে, রেস্টুরেন্টে, থিয়েটারে, সিনেমায়। কথা ফুরোতে চায় না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে পড়ে এ কথাটা ওকে বলা হল না। কাল বলব। পরদিন নতুন কথা মনে পড়ে।

আমাদের পুরনো ভাড়াটে বাড়িটার সেই শ্যাওলাধরা কলতলার আঁশটে গন্ধ বুক ভরে নিই। মায়ের আঁচলের গন্ধ নিয়ে রাখি। রাত জেগে আড্ডা দিই ভাইবোনেদের সঙ্গে।

চারদিনের দিন কাকভোরে জানালা দিয়ে সেই স্বর এল।

শুনছেন!

ফুলচোর!— আমি মৃদু হেসে মুখ তুলি।

যাক, চিনতে পারলেন!

পারব না কেন?

চোখের আড়াল হলেই তো আপনি মানুষকে ভুলে যান। তবে এখন এই কলকাতায় কী করে মনে পড়ল আমাকে?

কী জানি! হয়তো আপনাকে ভুলতে চাই না।

কলকাতা কি ফিরে এল আপনার মনে?

এল।

সায়ন্তনী?

সেও।

তা হলে আমি বরং যাই।

শুনুন!

কী?

আমার আর একটা কথাও মনে পড়ছে যে।

কী কথা?

আপনাকে আমি আগে কোথায় দেখেছি।

পলকে মিলিয়ে গেল ফুলচোর।

ঘুম ভেঙে আমি হঠাৎ টানটান হয়ে বিছানায় উঠে বসি। মাথার ঘুমোনো কোনও বন্ধ ঘর থেকে ফুলচোরের জলজ্যান্ত স্মৃতি বেরিয়ে এসেছে। বেশি দিনের কথা তো নয়, মাত্র বছরখানেক।

পরদিনই শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করি। সব শুনে শঙ্কু খুব অপরাধী-হাসি হেসে বলে, সে সময়টায় মাথার ঠিক ছিল না। তোকে বলেই বলছি। ওই শহরে যখন আছিস, তখন সবই তো জানতে পারবি। কাটু আমার আপন পিসতুতো বোন।

কাটু!— আমি ছ্যাঁকা খেয়ে চমকে উঠি। লিচুর মুখে কাটুর কথা শুনেছি না! অমিতদার ভাবী বউ।

শঙ্কু বিষণ্ণ গলায় বলে, দোষটা আমারই। ও রাজি ছিল না।

তারা হোটেলে রাত কাটিয়েছিলি না সেদিন?

কাটিয়েছিলাম। কিন্তু কাটু নরম হয়নি। হলে আজ আমাদের ফ্যামিলিতে একটা বিরাট গণ্ডগোল হয়ে যেত। প্লিজ, এ ব্যাপারটা কাউকে বলিস না।

আমি মাথা নাড়লাম। বলব না।

সায়ন, আমাকে তোমার একটা ফোটো দেবে? আমি নিয়ে যাব।

ফোটো!— সায়ন্তনী একটু অবাক হয়ে বলে, ফোটো তো নেই। তোলানো হয়নি।

আমার যে দরকার।

সায়ন হাসে, তুমি এমন নতুন প্রেমিকের মতো করছ! ফোটো চাই তো আগে বলোনি কেন? তা হলে তুলিয়ে রাখতাম।

আমি ওর হাত ধরে টেনে নিতে নিতে বলি, চলো আজই দু' জনে ছবি তুলিয়ে রাখি।

সায়ন্তনী বাধা দেয় না, তবে বলে, আজ ফোটো তোলালে কি কাল দিতে পারবে? তুমি তো কালই চলে যাচ্ছ।

আমি ওর কথায় কান দিই না।

স্টুডিয়োয় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সায়ন্তনী আমার কানে কানে বলল, আমার ছবি ভাল ওঠে না।

ভালর দরকার নেই।

কেন চাইছ ছবি? শীতকালেই তো বিয়ে। আর ক'টা মাস।

হোক সায়ন। এই ক'টা মাসই হয়তো বিপজ্জনক।

কীসের বিপদ?

ফোটোগ্রাফার দৃঢ় স্বরে বলল, আঃ! কথা বলবেন না। আর একটু ক্লোজ হয়ে দাঁড়ান দু' জনে।...আর একটু...নড়বেন না...রেডি...

সায়ন্তনী খুক করে হেসে ফেলে। ক্যামেরার একটা প্লেট নষ্ট হয়। ফোটোগ্রাফার রেগে যায়। আবার তোলে।

বেরিয়ে এসে সায়ন্তনী বলে, বাব্বা! ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে যা বুক ঢিবঢিপ করে!
কেন বুক ঢিবঢিব করে সায়ন?
কী জানি বাবা! মনে হয় একচোখো যন্ত্রটা আমার কী না জানি দেখে নিচ্ছে।
কী দেখবে! ক্যামেরাকে আমরা যা দেখাই তাই দ্যাখে। তার বেশি দ্যাখার সাধ্যই ওর নেই।
তবু ভয় করে।
মানুষের চোখ ক্যামেরার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পারে, মানুষের চোখকে ভয় পাও না?
তোমার সব উদ্ভট প্রশ্ন, জানি না যাও। শোনো, তুমি কেন বললে এই ক'টা মাসই বিপজ্জনক?
ও এমনি।
তা নয়। তুমি কিছু মিন করেছিলে।
আমি ওর হাত ধরে মৃদু ভাবে চেপে রাখি মুঠোয়। বলি, আমার সব কিছুই কেন অন্য রকম বলো তো!
কী রকম?
অন্য রকম। আমার জানালা দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। সে ভীষণ উঁচু পাহাড়, অদ্ভুত তার রং। যেখানে ভয়ংকর জোরে বৃষ্টি নামে। গাছপালা ভীষণ ঝাঁঝালো।
সায়ন্তনী সামান্য রুক্ষ স্বরে বলে, ও জায়গাটা তো আর রূপকথার দেশ নয়। ওরকমভাবে বলছ কেন?
তা ঠিক। তবু আমার যেন কী রকম হয়।
কী হয়, বলবে?
আমার কিছুতেই কলকাতার কথা মনে পড়ে না। তোমার কথাও না।
তাই ফোটো তুলে নিলে?
হ্যাঁ।
সায়ন্তনী ম্লান মুখে হেসে বলল, জানলা দিয়ে পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না তো?
আর কী?
কোনও মহিলাকে?
যাঃ, কী যে বলো!
লোকে এমনি-এমনি তো ভুলে যায় না! পাহাড়, প্রকৃতি, বৃষ্টি এগুলো কি ভুলে যাওয়ার কারণ হতে পারে?
না, তা হয়তো নয়।
তবে কী?
আমি ক্লিষ্ট হেসে বলি, বোধ হয় মাথায় সেই চোট হওয়ার পর থেকে আমার ব্রেনটা একটু ডিফেকটিভ হয়ে আছে সায়ন!
সায়ন্তনী ভ্রু কোঁচকায়। বলে, তোমার ব্রেন খারাপ হলে আমি সবচেয়ে আগে টের পেতাম। তোমার মাথায় কোনও দিন কোনও গোলমাল হয়নি।
তবে ভুলে যাচ্ছি কেন?
একদিন তুমিই তা বলতে পারবে।
তুমি পারো না?
না।— সায়ন্তনী মাথা নাড়ে, আমি তোমার কী-ই বা জানি বলো? ওখানে গিয়ে তোমার কী হল তা এতদূর থেকে বলব কী করে? তবে মনে হচ্ছে তুমি ফিরে গিয়ে আবার আমাকে ভুলে যাবে।
না না।— বলে আমি ওর হাত চেপে ধরি! তারপর শিথিল অবশ গলায় বলি, আমি তো ভুলতে চাই না।

বলেই মনে হয়, মিথ্যে বললাম নাকি?

পরদিনই আমি দার্জিলিং মেল ধরি। সঙ্গে সদ্যতোলা সায়ন্তনীর ছবি। বারবার নিজেকে আমি বোঝাই, ভুলব না। এবার ভুলব না।

বাংকে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্রি ভেদ করে ট্রেন চলেছে। ভোর হবে এক আশ্চর্য সুন্দর অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকায়। শরৎকাল আসছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ উপুড় করে দেবে তার রোদ। সে ভারী সুন্দর জায়গা। আমি সেখানে যাচ্ছি।

কে যেন গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকল, শুনছেন?

উঁ!

আপনার জলের ফ্লাস্কটা একটু নেব? আমাদেরটায় জল নেই।

নিন না। ওই তো রয়েছে।

বলে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তে থাকি। ঘুমচোখে অস্পষ্ট দেখতে পাই, আমার ফ্লাস্ক খুলে নীচের সিটে একটা বাচ্চা ছেলেকে চুকচুক করে জল খাওয়াচ্ছে তার মা, আর তার বাবা মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখছে।

আহা, দৃশ্যটা বড় সুন্দর। দেখতে দেখতে আমি ঘুমে ঢলে পড়ি। কাল আমি আবার সেই মহান পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে পাব। অন্ধকারে হঠাৎ জাহাজের মতো ভেসে ওঠে ভোরের পাহাড়, ব্রোঞ্জের রং ধরে। ব্রোঞ্জ ক্রমে সোনা হয়।

কাকভোরে ফুলচোর আসবে ঠিক। ডাকবে, শুনছেন!

আপনার ঘড়িটা! ও মশাই!

আমি ঘুমের টিকিট আঁটা চোখ খুলে বলি, উঁ!

ঘড়িটা দিয়ে দিন।

আমি বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলে লোকটার হাতে দিয়ে দিই। চোখ বুজেই দেখি, পাহাড়ের গায়ে সেই পাথরটায় বসে আছি। ঘণ্টানাড়া একটা পাখি ডাকছে। ঝোরার শব্দ।

পেটে একটা খোঁচা লাগে। ককিয়ে উঠে আবার চোখ মেলি। প্রবল হাহাকারের শব্দ তুলে উন্মত্ত ট্রেন ছুটছে। প্রচণ্ড তার দুলুনি। মুখের সামনে আর একটা কাঠখোট্টা মুখ ঝুঁকে আছে।

আপনার মানিব্যাগটা?

হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগটা ঘুমন্ত হাতে বের করে দিয়ে দিই। তারপর ঘুমে তলিয়ে যাই আবার। ঘুমের মধ্যে লিচুদের হারমোনিয়ামটা প্যাঁ-পোঁ করে বাজতে থাকে। বারবার বাজে। বেজে বেজে বলে, সখি ভালবাসা কারে কয়, সে কি শুধুই যাতনাময়...

কে যেন একটা লোক বিকট চেঁচিয়ে বলছে, শব্দ করলে জানে মেরে দেব! চোওপ শালা! জানে মেরে দেব! কেউ শব্দ করবে না। জান নিয়ে নেব!

ফের আমাকে কে যেন ধাক্কা দেয়, আর কী আছে? ও মশাই আর কী আছে?

কে যেন কাকে একটা ঘুসি বা লাথি মারল পাশের কিউবিকলে। 'বাবা রে!' বলে ককিয়ে উঠে একটা লোক পড়ে যায়। তারপর ভয়ে বীভৎস রকমের বিকৃত গলায় বলে, মেরো না! মেরো না! দিচ্ছি!

আর একটা শব্দ করলে মাল ভরে দেব! চোওপ শুয়োরের বাচ্চা।

একটা হাত আমার কোমর, পকেট, জামার নীচে হাতড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে চাইতেই মুখের সামনেকার হলুদ আলোটা কটকট করে চোখে লাগল।

কী চাই?— আমি কাঠখোট্টা মুখটার দিকে তাকিয়ে বললাম।

আর কী আছে?

আমি চোখ বুজে বলি, কিছু নেই।

হয়তো আবার ঘুমের ঝোঁক এসেছিল। আবার কে যেন ডাকল, শুনছেন?

ফুলচোর! আমি মাথা তুলে শিয়রের জানলাটা দেখতে চেষ্টা করি।

শুনছেন! শুনছেন!— খুব চাপা জরুরি গলায় আমাকে ডাকছে কেউ! নীচের সিটে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল।

শুনুন না। শুনছেন না কেন?— বলতে বলতে কেঁদে ওঠেন একজন মহিলা।

আমি চোখ চাই।

কী হয়েছে?

সেই বাচ্চার মা মুখ তুলে চেয়ে আছে আমার দিকে। মুখে আতঙ্ক, চোখে জল।

ওরা আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। কী হবে?

কারা?— আমি বিরক্তির গলায় বলি।

ডাকাতরা। এতক্ষণ ধরে কী কাণ্ড করল টের পাননি? প্লিজ! কেউ কিছু বলছে না ওদের।

শুনতে শুনতেই আমি নেমে পড়তে থাকি বাংক থেকে।

আপনার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল কেন?

বাচ্চার হাত থেকে বালা নিতে চেয়েছিল, আমার হাজব্যান্ড নিতে দিচ্ছিল না। ওই শুনুন।

বাথরুমের দিক থেকে একটা কান ফাটানো আওয়াজ আসে। বোধ হয় চড়ের আওয়াজ।

কামরার সব লোক চোখ চেয়ে স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। নড়ছে না।

আমি বরাবর দেখেছি, আমি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই আমার শরীর তার কাজে নেমে পড়ে। এ দুইয়ের মধ্যে বোধ হয় একটা যোগাযোগের অভাব আছে।

বাথরুমের গলিতে অল্প আলোয় একটা লোককে গাড়ির দেয়ালে ঠেসে ধরে আছে চার মস্তান। হাতে ছোরা, রিভলভারও।

একবার দু'বার মার খাওয়ার পর আর মারের ভয় থাকে না। আমার ভয় অবশ্য প্রথম থেকেই ছিল না। আমি বহুবার মার খেয়েছি। আমার মাথার একটা অংশ বোধ হয় আজও ফাঁকা।

আমি কিছু ভাবি না। পিছন থেকে চুল ধেরে দুটো লোককে সরিয়ে দিই হ্যাঁচকা টান মেরে। রিভলবারওয়ালা ফিরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আমার লাথি জমে যায় তার পেটে।

কমিকসের বীরপুরুষরা একাই কত লোককে ঘায়েল করে দেয়। জেমস বন্ড আরও কত বিপজ্জনক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সিনেমার হিরোরা অবিরল ক্লান্তিহীন মারপিট করে যেতে পারে।

হায়! আমি তাদের মতো নই।

তবু প্রথম ঝটকায় ভারী চমৎকার কাজ হয়ে যায়। একটা লোক বসে কোঁকাচ্ছে, বাকি তিনটে ভ্যাবাচ্যাকা। কিন্তু সেটা পলকের জন্য মাত্র।

আমি আর একবার হাত তুলেছিলাম। সে হাত কোথাও পৌঁছোয় না। একজন চাপা ভয়ংকর গলায় বলল, ছেড়ে দে। আমি দেখছি।

পিঠের দিক থেকে একটা ধাক্কা খাই। একবার, দু'বার।

ধাক্কাগুলো সাধারণ নয়! কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। পেটটা গুলিয়ে ওঠে। মাথাটা চক্কর মারতে থাকে।

কে যেন বলল, আর একটু ওপরে আর একবার চালা!

চালাল। তৃতীয়বার ছড়াৎ করে খানিকটা রক্ত ছিটকে আসে সামনের দিকে।

আমি মুখ তুলি। দেয়ালে ঠেস দেওয়া বাচ্চার বাবা আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে।

আমি তাকেই জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে আমার?

লোকটা হতভম্বের মতো মাথা নেড়ে জানাল, না।

আমি অবাক হই। কিছু হয়নি? তবে আমার দুটো হাতের আঙুল কেন কুঁকড়ে আসে? কেন উঠতে পারছি না? পায়ের কাছে কেন এক পুকুর রক্ত জমা হচ্ছে?

চারটে লোক সরে যায় দু' দিকে দরজার কাছে। উপুড় হয়ে আমি বসে আছি। কিন্তু বসে থাকতে পারছি না। বড় ঘুম। বমি পাচ্ছে। শরীরটা চমকে চমকে উঠছে।

পিছন থেকে বাচ্চার মা ডাকছে, চলে এসো। কী বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ওখানে?

বাচ্চার বাবা চমকে ওঠে। তারপর সাবধানে রক্তের পুকুরটা ডিঙিয়ে বাচ্চার মায়ের কাছে যায়। তারপর তারা বোধ হয় ফিরে গেল তাদের বাচ্চাটার কাছে। যাবেই তো! বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদছে।

ট্রেন হুইসিল দিচ্ছে বার বার। কুক কুক কু—উ। কুক কুক কু—উ! থেমে আসছে গাড়ি। দু' দিকের দরজা খুলে যায়। চারটে লোক নেমে গেল।

আমার গলা দিয়ে ঘরর ঘরর করে একটা শব্দ হয়। জিভে সামান্য ফেনা। ধোঁয়াটে চোখেও আমি দেখতে পাই, মুখের ফেনার রং লাল।

হঠাৎ কামরায় তুমুল হট্টরোল ফেটে পড়ল। কারা চেঁচাচ্ছে, খুন! খুন! ডাকাত! বাঁচাও! খুবই ক্ষীণ শোনায় সেই শব্দ। আমার কানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ঘন, তীব্র, একটানা।

কয়েকজন আমাকে তুলছে মেঝে থেকে। চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। লাভ নেই।

সায়ন!

তুমি আমার কেউ না।

আঃ সায়ন!

আমি তোমাকে ভুলে গেছি।

উঃ সায়ন!

ছবিটা ফেরত দেবে? আমাদের জোড়া ছবি কারও হাতে পড়লে কী ভাববে বলো তো! তুমি বেঁচে থাকলে এক কথা ছিল। তা যখন হচ্ছে না তখন কেন ওটা রাখবে? দাও নষ্ট করে ফেলি।

আমি ওর কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝতে পারি। ছবিটা বের করে ওর হাতে দিই। ও বসে বসে ছিঁড়তে থাকে।

লিচু!

ওঃ দারুণ মজা! দারুণ মজা!

কেন লিচু?

দেখুন, কত বার হাতবদল হয়ে আমাদের হারমোনিয়াম আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

খুশি তো লিচু?

ভীষণ। হারমোনিয়াম থাকলে আর কিছু চাই না। ঘর না, বর না, টাকা পয়সা না।

একদিন জ্যোৎস্নারাতে তুমি কিন্তু আমাকে চেয়েছিলে লিচু!

উঃ!— লিচু লজ্জায় মুখ ঢাকে। বলে, তা ঠিক। তবে গরিবরা সব সময়ই এটা চায়, ওটা চায়। না পেলেও দুঃখ হয় না আমাদের। আপনি কিছু ভাববেন না। হারমোনিয়াম আমাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

শিয়রের জানালায় ফুলচোর ডাক দেয়, শুনছেন!

ফুলচোর!

কলকাতায় কী হল?

সে অনেক কথা।

ম্লান মুখে বিষণ্ণ গলায় ফুলচোর বলল, আমাকে চিনতে পারলেন শেষমেষ?

না, ফুলচোর।

বললেন যে সেদিন।

ওটা মিথ্যে কথা। আপনি তো কোনওদিন কলকাতায় যাননি।

ফুলচোর জানালার গ্রিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে, আপনি সব জানেন, আপনি সব জানেন। এখন আমার কী হবে?

কিছু হবে না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আমি কাউকে বলিনি। কোনওদিন বলব না। ভুলে যাব। দেখবেন।

ফুলচোর চোখের জল মুছে হাসে, আমি জানতাম, আপনি কখনও অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আপনার মন বড় সুন্দর। লিচুদের হারমোনিয়ামটা নইলে আপনি কিনতেন না।

পশুপতিকে বলবেন লিচুদের হারমোনিয়ামটা যেন দিয়ে দেয়।

বলব।

এই জানলাটা এখন কি খুব ফাঁকা লাগবে আপনার?

ওমা! লাগবে না? আমি তো রোজ আসি। যখন আপনি ছিলেন না তখনও। ফাঁকা জানলায় একা একা কত কথা কয়ে যাই।

ফাজিল।

ফুলচোর তাকায়। চোখে করুণ দৃষ্টি।

কোনওদিন বোঝেননি আপনি।— বলতে বলতে ফুলচোরের সুন্দর ঠোঁটজোড়া কেঁপে ওঠে।

কী বুঝব?

আমি বুঝি শুধু আপনার সেই আমাকে মনে পড়ার ভয়ে আসতাম?

তবে?

আমি আসতাম ফুল তুলতে।— স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলে ফুলচোর।

আমি চেয়ে থাকি। বুকের মধ্যে ডুগডুগির শব্দ।

ফুলচোর অকপটে চেয়ে থেকে বলে, একটা সাদা ফুল। ছোট্ট, সুন্দর।

ফাজিল।

দেবেন সেই ফুলটা আজ? দিন না!

ফুলচোর হাত বাড়ায়। গভীর গাঢ় স্বরে বলে, সাদা সুন্দর ফুলের মতো ওই হৃদয়। দেবেন?

আমি চোখ মেলি। হাসপাতালের ঘর নয়? তাই হবে। উপুড় করা রক্তের বোতল থেকে শিরায় ড্রিপ নেমে আসছে। নাকে নল।

একটা কালো ঢেউ আসে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, গাড়ি বদল! গাড়ি বদল!

মাঝরাতে অন্ধকার এক জংশনে গাড়ি থেকে নামি। ঘোর অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওপাশে এক অন্ধকার ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠি। একা।

জানলার ধারে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে থাকি।

ট্রেন ছাড়ে। দুলে দুলে চলে। কোথায় যাচ্ছি তা প্রশ্ন করতে নেই। কেউ জবাব দেবে না।

তা ছাড়া কোথায় যাচ্ছি তা তো আমি জানি।

কিন্তু জানালায় তবু ফুলচোবের মুখ ভেসে আসে। করুণ, তীব্র এক স্বরে সে বলে, পৃথিবী আর সুন্দর থাকবে না যে। ফুল ফুটবে না আর! ভোর আসবে না। আপনি যাবেন না, আমাকে দয়া করুন।

আপনাকে দয়া, ফুলচোর? হাসালেন!

কেন যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? আমাদের কাছে থাকতে আপনার একটুও ইচ্ছে করে না?

আমি একটু হাসবার চেষ্টা কবি। বলি, বড় মারে এরা। বড় ভুল বোঝে। প্রত্যাখ্যান করে। তার চেয়ে এই লম্বা ঘুমই ভাল। অনেক দিন ধরে আমি এই রকম ঘুমিয়ে পড়তে চাইছি ফুলচোর।

আমি যে রোজ একটা ফুলই তুলতে আসতাম তা কি জানেন?

জানি।

আজও সেই ফুল তোলা হল না আমার। পৃথিবীতে তো সেই ফুল আর ফুটবে না কোনও দিন। প্লিজ!

আমি ক্লান্ত বোধ করি। বলি, আপনি বাগদত্তা, ফুলচোর।

খুব জানেন। বোকা কোথাকার!

নন?

নই।

আর সায়ন?

পৃথিবীতে আর কেউ আমার মতো অপেক্ষা করছে না আপনার জন্য। শুধু আমি। শুধু একা আমি।

কেন ফুলচোর?

ওই সুন্দর সাদা ছোট্ট ফুল, ওটা আমার চাই।

আস্তে আস্তে গাড়ি থামে। পিছু হাঁটে। আবার জংশন। আবার গাড়ি-বদল।

চোখের পাতায় হিমালয়ের ভার। তবু আমি আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাই।

শিউলির গন্ধ
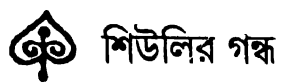
১। পারিজাত

হে দরিদ্র ভারতবাসী, মুর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, তোমরা আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার একান্ত আপনার জন্য। আমি তোমাদেরই লোক। আমি যখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতাম তখন যেমন, এখন দারিদ্র্যসীমার কিছু ওপরে বাস করার সময়েও তেমনই আমি তোমাদেরই লোক হয়ে গেছি। দারিদ্র্যসীমা হল একটা রেললাইনের মতো। মাঝখানে উঁচু রেলবাঁধ, তার দু'ধারেই লোকালয়। ওধারে তোমরা, এধারে আমরা। তবু আমি সেই রেলবাঁধ পেরিয়ে মাঝে-মাঝেই গিয়ে দেখে আসি ওপারের ভারতবর্ষকে। দারিদ্র্যসীমার নীচেকার ওই ভারতবর্ষই তো আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, কৈশোরের চারণভূমি, যৌবনের উপবন। দারিদ্র্যসীমা বা রেলের ওই বাঁধটা এমন কিছু পাকাপোক্ত বাধাও নয়। এ ধারের লোক প্রায়ই ওধারে যায়, ও ধারের লোক আসে এধারে। কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। দারিদ্র্যসীমার নীচেকার ওই ভারতবর্ষে এখনও আমার বিস্তর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু রয়ে গেছে।

বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ ঠিক কয় ভাগে বিভক্ত তা আমি জানি না। তবে গুণেনবাবু জানেন। তিনি এ বিষয়ে যে গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করছেন তা শিগগিরই থিসিস হিসেবে পাঠাবেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে ধর্ম, অর্থনীতি ও ভাষার দিক দিয়ে অন্তত চোদ্দোটি ভাগ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, বেসরকারি ভাবে সেই ভাগ হয়েও গেছে, শুধু সরকারিভাবে তা স্বীকার করা হয় না।

স্বীকার আমিও করি না। আমার রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি মনে পড়ে। ওই যে কবিতাটি যার মধ্যে আছে "এক দেহে হল লীন।" আমার ছাই কিছুই ভাল মনে থাকে না। তবু আমি এক দেহে লীন হওয়ার তত্ত্বটা খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু তা নিয়ে গুণেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করতেও আমি যাই না।

তাঁর সব কথা মেনে নিই বলে গুণেনবাবু যে খুশি হন তা মোটেই নয়। উনি সর্বদাই কিছু-না-কিছু নিয়ে তর্ক এবং তাতে জয়লাভ করতে ভালবাসেন। বলতে কী এইটেই ওঁর হবি। সারাদিন উনি প্রতিপক্ষ খোঁজেন এবং যে কোনও লোকের সঙ্গেই যে কোনও বিষয়ে একটা তর্ক বাধানোর চেষ্টা করেন। ওঁর ভিতরে তর্কের বিষদাঁত সর্বদাই শুলশুল করে। গুণেনবাবুর সঙ্গে আমার তর্ক না করার আর একটা কারণ হল, তাঁর বোন অসীমার সঙ্গে আমার বিয়ের একটা কথা চলছে। অসীমা রোগা, কালো এবং অসুন্দরী হলে কী হয়, সে একটা ভাল জাতের কো-এডুকেশন স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস, ডবল এম এ এবং বি এড-এ ফার্স্ট ক্লাস।

অসীমা একদিন আমার ঘরে একখানা বই ফেলে যায়। ইস্কুলের পাঠ্য বাংলা বই। তাতে আমি রবীন্দ্রনাথের সেই "এক দেহে হল লীন" কবিতাটি পেয়ে যাই। সেইদিনই গুণেনবাবুকে কবিতাটি শুনিয়ে বে-খেয়ালে বলে ফেলেছিলাম আপনি ভারতবর্ষকে যে চোদ্দোটা ভাগে বিভক্ত করেছেনতা আসলে ইমাজিনেশন।

তর্কের গন্ধ এবং প্রতিপক্ষ পেয়ে গুণেনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হল, তিনি খুব ঠান্ডা গলায় শুরু

করলেন, ইমাজিনেশন? ইমাজিনেশন? আপনি কি জানেন বিষুবরেখাও ইমাজিনেশন! হায়ার ম্যাথম্যাটিকসও ইমাজিনেশন! আপেক্ষিক তত্ত্বও ইমাজিনেশন! যারা এইসব ইমাজিন করেছে তারা কি ঘাস খায়?

বন্ধুগণ, এই ঘাস খাওয়ার কথায় আমি ভিতরে ভিতরে লজ্জা ও হীনমন্যতায় অধোবদন হয়ে যাই। কারণ আমাকে একবার বাস্তবিকই ঘাস খেতে হয়েছিল। তখন আমি দারিদ্র্যসীমার নীচে, অনেক নীচে বাস করতাম। আমার বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের সামান্য স্ট্যাম্প ভেন্ডর। তার ওপর দুরন্ত এক হাঁপানি রোগে এমন কাহিল যে বছরের ছ'মাস বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। সেবার ভারী বর্ষায় আমাদের এলাকাটা বানে ভাসছে। জলে ভিজে আমরা স্যাঁতা ও সাদা হয়ে গেছি। টানা তিন দিন আমাদের ভদ্রগোছের কোনও খাওয়া জোটেনি। একদিন মা আমাদের গমের সঙ্গে মিহি করে কুঁচোনো ঘাস ও অন্যান্য লতাপাতা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে দেয়। খুব আনন্দের সঙ্গে না হলেও আমরা ভাইবোনেরা তা বেশ পেট ভরেই খেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ঘাস খাওয়ার ফলে আমার মগজ তৃণভোজীদের মতো হয়ে গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

ঘাস খাওয়ার সেই স্মৃতি আমাকে এতটাই অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ করে তুলল যে, গুণেনবাবুর যাবতীয় যুক্তিতর্কে আমি কেবল হুঁ দিয়ে গেলাম। উনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন।

আমার প্রতিবেশী জহরবাবু প্রায়ই বলেন, আপনার অতীতের সেইসব সাফারিংস নিয়ে একটা বই লিখুন না। এসব লোকের জানা দরকার। ইস্কুলেও পাঠ্য হতে পারে।

আমি বিনীতভাবে চুপ করে থাকি। জীবনী লেখার মতো বয়স বা সফলতা আমি এখনও অর্জন করিনি। তবু জহরবাবু কেন আমাকে জীবনী লেখার কথা বলেন তা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। উনি জানেন, নিজের অতীত জীবনের দারিদ্র্য সম্পর্কে আমার একটা রোমান্টিক ভাবাবেগ আছে। আমি কত কষ্ট করেছি সেটা লোককে আমি জানাতে ভালবাসি। দ্বিতীয় আর একটা কারণ হল, আমি ইচ্ছে করলে ওঁর মেজো মেয়ের একটা চাকরি অসীমাদের স্কুলে করে দিতে পারি। কারণ আমি ওই স্কুলের সেক্রেটারি।

জহরবাবু তাই আমার কাছে যাতায়াত বজায় রাখেন। কিন্তু মুশকিল হল জহরবাবু যথেষ্ট কথা জানেন না, বেশিক্ষণ বাক্যালাপ চালানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর এবং তেল দেওয়ার সঠিক পদ্ধতিও তিনি শেখেননি। তবু আমাকে ভিজিয়ে রাখার জন্য তিনি আমার কাছেই আমাকে একজন মহৎ মানুষ বলে প্রতিপন্ন করা চেষ্টা করে যান। তাঁর মতে দরিদ্র অবস্থা থেকে আমার এই উন্নতি যুদ্ধজয়ের মতো। আজকালকার যুগে এরকমটা নাকি দেখা যায় না।

কেন দেখা যায় না? আমি একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম।

বলাবাহুল্য জহরবাবু জবাবটা খুঁজে পাননি।

কিন্তু গুণেনবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন, জহরবাবু ঠিকই বলেছেন। আজকালকার যুগে হৃতদরিদ্র অবস্থা থেকে কেউই কোটিপতি হতে পারে না। এখানকার অরগানাইজড ক্যাপিট্যাল এমন একটা সিস্টেম তৈরি করেছে যে, আগের দিনের মতো পঞ্চাশ টাকার ক্যাপিট্যাল নিয়ে ব্যাবসা শুরু করে নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের গুণে পাঁচ কোটি টাকার মালিক হওয়া এখন অসম্ভব। ছোট ব্যবসায়ীদের উন্নতিরও একটা অদৃশ্য এবং অঘোষিত সিলিং আছে। তার ওপরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চ্যানেলেই রোড ব্লক আছে।

জহরবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, সেইজন্যই বলছিলাম, পারিজাতবাবু অসামান্য লোক। এই অরগানাইজড ক্যাপিট্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে উনি সামান্য অবস্থা থেকে কত বড় হতে পেরেছেন। এ যুগে দেখা যায় না।

গুণেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, পারিজাতের কথা আলাদা। ওকে কখনও অরগানাইজড

ক্যাপিটালকে ফেস করতে হয়নি। ও এমন কিছু বড়ও হয়নি।

গুণেনবাবু অবশ্য তাঁর মন্তব্যটিকে আর ব্যাখ্যা করলেন না। বরং হবু ভগ্নিপতি সম্পর্কে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলার লজ্জায় তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলেন।

জহরবাবু বোকা-বোকা মুখ করে বসে ছিলেন। আমি বোকা নই। আমার জানা আছে, বাইরে আমার সম্পর্কে নানা ধরনের গুজব জন্ম নেয় এবং বিস্তার লাভ করে।জহরবাবুর কানেও সেইসব গুজব গিয়ে থাকবে। উনি হয়তো সেগুলি বিশ্বাসও করেন। কিন্তু তবু আমাকে একজন মহৎ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা ছাড়া ওঁর আপাতত অন্য উপায় নেই।

আমি ওঁকে আমার দরিদ্র জীবনের একটা গল্প শোনালাম। সে একটা করুণ পায়জামার গল্প। বহুদিন বাদে পুজোর সময় বাবা আমাদের ভাইবোনকে নতুন জামাকাপড় দিলেন একবার। তেমন কিছুই না। ভাইরা পেলাম খুব মোটা কাপড়ের একটা পায়জামা। বোনেরা পেল মোটা ছিটকাপড়ের ফ্রক। সে কী আনন্দ আমাদের। পায়জামা দেখি, শুঁকি, সারাদিন শতেকবার খুলি, আবার ভাঁজ করে রাখি।

সাদামাটা এই গল্পটা শুনে জহরবাবুর চোখ ছলছল করতে লাগল। খুবই কোমল-হৃদয় মানুষ বলতে হবে। ফিসফিস করে বললেন, লিখে ফেলুন, এসব লিখে ফেলুন, একটা মহৎ জীবনীগ্রন্থ হবে।

কিন্তু আমি বুঝি না, দারিদ্র্যের কথা লিখে কী লাভ? দারিদ্র্য জিনিসটা কেমন তা আমার জীবনী পড়েই বা কেন জানতে হবে লোককে? তারা কি জানে না? জহরবাবু নিজেও ভালই জানেন। কারণ ওই দারিদ্র্যসীমার খুব কাছেই ওঁর বাস। মেজো মেয়েটার চাকরি না হলে গ্রাসাচ্ছাদনের খুবই অসুবিধে দেখা দেবে। তবু উনি এমনভাবে আমার কাছে দারিদ্র্যের কথা জানতে চান যেন সেটা কোন দূরের অচেনা রাক্ষসপুরীর গল্প।

অবশ্য জহরবাবুকে দোষ দিই না। আমি নিজেও আমার অতীত দারিদ্র্যের কথা লোকের কাছে গল্প করতে ভালবাসি। জহরবাবুর মতো দু'-চারজন লোক তা শোনেন এবং নানারকম সহানুভূতি প্রকাশ করেন। আমার পুরুষকারেরও প্রশংসা করেন কেউ কেউ।

কিন্তু নিন্দুক এবং রটনাকারীরও অভাব নেই। আমার সম্পর্কে অনেকরকম গল্প ও গুজব প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাজবাড়ির আলমারির গল্প।

এক সময় একটা শহরে আমি ছিলাম। সেটা ছিল এক করদ রাজ্যের রাজধানী। ছোটখাটো ছিমছাম শহর। রাজাদের সেই আগেকার রবরবা নেই। ক্রমে ক্রমে অবস্থা পড়তে পড়তে এমন তলানিতে এসে ঠেকল যে, রাজবাড়ি থেকে নানারকম পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দেওয়া হতে লাগল।

লোকে বলে, আমি নাকি জলের দরে রাজার একটা পুরনো কাঠের আলমারি কিনে নিই। বহুকাল খোলা হয় না এবং চাবিও বেপাত্তা বলে আলমারির ভিতরে কী আছে তা আর দেখে নেওয়ার সময় বা সুযোগ রাজার হয়নি। সেই বন্ধ আলমারির ভিতর নাকি আমি কয়েক লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর বাসন পেয়ে যাই। ফলে অরগানাইজড ক্যাপিটালের সমস্ত অবরোধ পার হয়ে রাতারাতি পুঁজিপতিদের এলাকায় ঢুকে যেতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি।

বলাবাহুল্য এ গল্প আদপেই সত্য নয়। রাজবাড়ি থেকে একটা বিলিতি ওক কাঠের আলমারি আমি কিনেছিলাম বটে, কিন্তু তার ভিতরে তেমন সাংঘাতিক কিছু ছিল না। কিন্তু সেকথা আমি বললেই বা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? লোকে বিশ্বাস করে সেটাই যেটা তারা বিশ্বাস করতে চায়। সুতরাং আমার সম্পর্কে প্রচলিত গুজবগুলির প্রতিবাদ আমি কখনও করি না। বরং আমার চারদিকে

যে অবাস্তব রহস্যময় একটা কল্পকুহেলি গড়ে উঠেছে সেটাকে আমি গড়ে উঠতে দিচ্ছি।

আজকাল বিকেলের দিকে প্রায়ই অসীমা আমার বাড়িতে আসে। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। অসীমাদের পরিবার খুবই রক্ষণশীল। বিয়ের আগে মেলামেশার ব্যাপারটা তারা আদপেই পছন্দ করে না। কিন্তু সময়টা সেই পুরনো আমলে বসে নেই। সব রীতিনীতি ও মূল্যবোধই পাল্টে গেছে। সুতরাং অসীমা আসে এবং তার বাড়ির লোক দেখি-না দেখি-না ভাব করে থাকে।

তবে একথাও ঠিক যে, অসীমা আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য মোটেই আসে না। তার আসার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু সে যখন আসে তার আসাটা আমি রোজ লক্ষ করি।

আমার বাড়ির সামনে অনেকটাই জমি ছাড় দেওয়া আছে। সিংহবাবুরা একসময়ে এই জমিতে খুব সুন্দর বাগান করেছিলেন। কিন্তু সাজানো বাগান আমি ভালবাসি না। বরং একটা বন্য ধরনের অনিয়মিত এবং অসজ্জিত গাছপালা আমার বেশি পছন্দ। সেইজন্য বাগানে আমি মালি লাগাইনি। যত্রতত্র গাছ গজাচ্ছে এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছে। একটা লাল মোরামের স্নিগ্ধ পথ ফটক থেকে বাঁকা হয়ে এসেছে বাড়ির সদর পর্যন্ত। এই পথটির দু'ধারে বেঁটে বেঁটে লিচু আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। চমৎকার ছায়া পড়ে থাকে পথে। লতানে গোলাপগাছও মেলা। খুব ফুল ফোটে। এই চমৎকার পথটি দিয়ে বিকেলের দিকে, প্রায় সন্ধের কাছাকাছি সময়ে ক্লান্ত অসীমা যখন আসতে থাকে তখন তাকে লক্ষ করতে আমার বেশ ভাল লাগে। না, ওই পথ আর ছায়া আর গাছপালার চালচিত্রে অসুন্দরী যে অপরূপ হয়ে ওঠে তা নয়। বরং তাকে আরও রোগা আরও কালো, আরও লাবণ্যহীন দেখায়। খুব রোগা বলেই বোধহয় ইদানীং একটু কুঁজোমতোও হয়ে গেছে সে। কড়া মেজাজের দিদিমণি বলে তার মুখচোখেও একটা অতিরিক্ত রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। সে খোঁপা বাঁধে এবং সাদা খোলের শাড়ি পরে। হাতে একটা ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনও গয়না নেই। তার মতে পুরুষরা ডিসিপ্লিন মানে না, বোকার মতো কথা বলে এবং প্রায় সময়েই অসভ্যের মতো আচরণ করে। পুরুষদের প্রতি সেই বিরাগও তার মুখে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। এই কুৎসিত, লাবণ্যহীন অসীমাকে তবু আমি লক্ষ করি। খুব লক্ষ করি।

আমি থাকি নীচের তলায় সামনের দিককার ডানহাতি ঘরখানায়। মাঝারি মাপের ঘরখানা মোটামুটি একটা অফিসের ধাঁচে সাজানো। মাঝখানে একটা বড় ডেস্ক ও চেয়ার, ফাইল ক্যাবিনেট, টাইপরাইটার, টেলিফোন ইত্যাদি। ঘরের এক কোণে একটা লম্বা সরু চৌকিতে বিছানা পাতা থাকে। আমি রাতে প্রায় সময়েই ওই বিছানায় শুই। কারণ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করার পর প্রায়দিনই আমার আর ভিতর-বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না।

অসীমা এই ঘরেই এসে আমার মুখোমুখি বসে। ছোট্ট একটা রুমালে মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মোছে। প্রথমেই আমরা কথা শুরু করি না। আমার বা অসীমার কারওরই তেমন কোনও প্রগল্‌ভতা নেই। তাছাড়া কথা বলার অসুবিধেও থাকে। আমার টাইপিস্ট ছেলেটি সন্ধে সাতটার আগে ছুটি পায় না। বিকেলের দিকে অনেক পার্টিও আসে। সুতরাং অসীমাকে অপেক্ষা করতে হয়।

প্রায়দিনই আমরা কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বাগানে বসি। সিংহবাবুদের শখ ছিল। বাগানে তাঁরা চমৎকার কয়েকটা বেঞ্চি বসিয়ে গেছেন। কোনও কোনও বেঞ্চির চারধারে ঘনবদ্ধ কুঞ্জবন। প্রেম করার আদর্শ জায়গা।

আমরা এরকম একটা কুঞ্জবনেই গিয়ে বসি। খুব সাদামাটা ভাবেই আমাদের কথা শুরু হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, অডিটে আর কোনও কিছু ধরা পড়ল?

হ্যাঁ। ফারনিচার অ্যাকাউন্ট, বুক পারচেজ, রিনোভেশন সবটাতেই গণ্ডগোল।

ইস্কুলে নিশ্চয়ই বেশ উত্তেজনা!

হ্যাঁ।

কী রিঅ্যাকশন দেখলে?

খুব ডিসটার্ব বোধ করছেন সবাই।

আমি একটুও চিন্তিত হই না। বলি, আর কী খবর?

কমলাদি খুব ডেসপারেট হয়ে উঠছে।

কীরকম?

অধরবাবু আজ স্কুলে এসেছিলেন।

বলো কী? দিনের বেলায়?

তাই তো দেখলাম। কী বিশ্রী ব্যাপার বলো তো।

কেন এসেছিল?

নিজে থেকে আসেনি। দপ্তরির কাছে শুনলাম কমলাদিই নাকি তাকে চিরকুট দিয়ে অধরবাবুর কাছে পাঠিয়েছিল।

কেন, তা জানতে পারোনি?

না, তবে সেকেন্ড পিরিয়ড থেকে ফোর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত অধরবাবু কমলাদির চেম্বারে ছিলেন। বোধহয় গারজিয়ানস মিটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল।

আমি একটু ভাবলাম। কমলা সেন অসীমাদের হেডমিসট্রেস। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স এবং এখনও কুমারী। অধরবাবু এই শহরের মোটামুটি নামকরা একজন ঠিকাদার। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বিবাহিত এবং চার-পাঁচটি ছেলেপুলের বাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক বহুকাল ধরে চালু আছে বলে গুজব। তবে সম্পর্কটা দেহগত না শুধুই ভাবগত সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়। কমলা সেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক, তাঁর আমলে স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রেজাল্টও দারুণ। কাজেই তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার যা-ই থাক সেটা তেমন গুরুত্ব পায় না। অপরপক্ষে অধরবাবু অত্যন্ত ডাকাবুকো লোক। শোনা যায় তিনিও দারিদ্র্যসীমার তলা থেকে উঠে এসেছেন। একসময়ে ভাল খেলোয়াড় এবং দুর্দান্ত গুন্ডা ছিলেন। তাঁর একটা বেশ বড়সড় দল আছে। অধরবাবুর দানধ্যান এবং পরোপকারেরও যথেষ্ট সুনাম। কমলা সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যে রকমই হোক সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার মতো লোকবল ও অর্থবলের অভাব তাঁর নেই।

কিন্তু এরকম একটা অনৈতিক ব্যাপারকে চলতে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করিনি। জনসাধারণের ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাপারটা তাদের গোচরে আনতে আমি প্রথমে শহরে কয়েকটা পোস্টার দিই। তাতে একটু গুঞ্জন উঠলে পরে অভিভাবকদের একটা মিটিং ধারণ করে। অভিভাবকদের মিটিং-এ দু'জন রাজনৈতিক নেতাও ভাষণ দেন। বিস্ময়ের কথা হল, কমলা সেন তাঁর বিরুদ্ধে রটনাটাকে অস্বীকার করেননি। স্বীকারও করেননি। অর্থাৎ তিনি মুখ খুলতে চাননি।

আমি বললাম, নজর রেখো।

রাখছি। তবে, কমলাদি খুব রেগে আছেন।

তাই নাকি?

অসীমা একটা ক্লান্তির বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আমার সঙ্গে আজ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

কেন?

আমি অডিটারদের কাছে রোজ যাই এবং কথা বলি বলে।

তাতে দোষ কী?

দোষ তো নেই-ই। কিন্তু উনি ঝগড়া করার একটা পয়েন্ট খুঁজছিলেন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, কিছু বললে ছেড়ে দিয়ো না।

আমি উচিত কথা বলতে ছাড়ি না।

খুব ভাল।—আমি উদার গলায় বলি।

অসীমা একটু চুপ করে থেকে সামান্য বুঝি-বা বিষণ্ণ গলায় বলল, কিন্তু আমি কমলাদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করায় কলিগরা কেউ খুশি হয়নি।

না হওয়ারই কথা। কমলা সেন সম্পর্কে প্রচার যাই থাকুক, উনি অসম্ভব জনপ্রিয়। সহকর্মীরা ওঁকে বড় বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সুতরাং অসীমা উচিত কথা বললেও সেটা ওদের কাছে অনুচিত শোনাবে। তাই আমি অসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, খুশি হয়নি কী করে বুঝলে?

সবাই অ্যাভয়েড করছিল আমাকে।

আমি কুঞ্জবনের আলো-আঁধার অসীমার শুষ্ক রুক্ষ মুখখানা লক্ষ করছিলাম। বোধহয় সুন্দরের মতো কুৎসিতের মধ্যেও একধরনের আকর্ষণ আছে। আসলে হয়তো সেটা বিকর্ষণই। জটিল এক মানসিক প্রক্রিয়ায় সেইটেই আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি অসীমার মধ্যে সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যের অভাব লক্ষ করছিলাম না। আমি বরং ওর মুখে অতি সম্প্রতি যে গভীর ক্লান্তির ছাপ পড়েছে তার কারণটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম।

অসীমা তার স্কুলটিকে বোধহয় ভালবাসে। খুব গভীরভাবেই বাসে। এই স্কুলে কোনও কারচুপি বা হিসেবের গোলমাল ধরা পড়লে সে নিশ্চয়ই খুশি হয় না। কিন্তু তার কিছু করারও নেই। সম্ভবত খুব শিগগিরই সে এই স্কুলের হেডমিসট্রেস হবে। এবং তা হবে কমলা সেনকে সরিয়েই। একসময়ে কমলা সেন সম্পর্কে অসীমার অন্ধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। আজ নেই। এই সবের মূলে হয়তো আমার অবদানের কথাই সে ভাবে। আর তাই তার ক্লান্তি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অসীমাও তা জানে। তাই জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বাদে শুধু বলল, স্কুলে আমি খুব আনপপুলার হয়ে গেছি।

কেন, ছাত্রছাত্রীরাও কি তোমাকে অপছন্দ করে?

তাই তো মনে হয়।

কেউ ওদের উসকে দিচ্ছে না তো?

কী করে বলব?

খোঁজ নাও। যদি দেখো দিচ্ছে তাহলে আমাকে জানিয়ো।

অসীমা খুব করুণ বোবা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। সে দৃষ্টির ভাষা আমি পড়তে পারলাম না। তবু মনে হল, অসীমার চোখ আমাকে বলছে, ক্ষ্যামা দাও, আর আমার ভাল তোমাকে করতে হবে না।

ছাত্রছাত্রীদের কাছে অসীমা কেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। তবে সে কোনওকালেই ওদের তেমন প্রিয় দিদিমণি ছিল না। সবাই তাকে ভয় করত এবং মেনে চলত, এই যা।

আকাশ মেঘলা করেছে। কুঞ্জবন আঁধার হয়ে এল। আমি ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, চলো, উঠি।

চলো।

এইভাবেই রোজ আমাদের প্রেমপর্ব শেষ হয়। আমরা উঠে পড়ি এবং যে যার কাজে চলে যাই। অসীমা সম্ভবত এইরকম উত্তাপহীন প্রেমই পছন্দ করে। সে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করছে। ফলে তার একটা কঠোর নীতিবোধ জন্ম নিয়েছে। তাকে স্পর্শ করলে বা আরও ঘনিষ্ঠ কিছু করতে গেলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করবে। আমি জানি বিয়ের পরেও এই সংকোচ কাটাতে তার সময় নেবে। আমারও তাড়া নেই। অসীমাই তো আমার জীবনে প্রথম মহিলা নয়। এমনকী সে আমার প্রথম স্ত্রীও হবে না।

এর আগে আমি আর একবার বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সেই স্ত্রী মণিমালা আত্মহত্যা করে।

২। অভিজিৎ

বেশিদিন বেঁচে থাকলে মানুষকে ভারী একা হয়ে যেতে হয়। সমান বয়সের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি-বা খুঁজে পাওয়া যায় তো যোগাযোগ হয় না।

আমার দাদুকে দেখে সেইটে খুব স্পষ্টভাবে বুঝলাম আমি।

আমার ঠাকুমা অবশ্য দীর্ঘদিন বেঁচে দাদুকে সঙ্গ দিয়ে গেছেন। তবু শেষ অবধি বয়সের কমপিটিশনে তিনি পেরে ওঠেননি। বছর পাঁচ-ছয় আগে আশি বছর পার হওয়ার বেশ কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। দাদু নব্বই পেরিয়েছেন। খুব বহাল তবিয়তে আছেন বলা যায় না কিন্তু আছেন।

আমাদের বাড়িটা খুবই খাঁ খাঁ করে আজকাল। বাসযোগ্য দু'খানা ঘর আছে। পাকা ভিত, ইটের দেওয়াল, ওপরে টিনের চাল। আর উঠোনের দু'দিকে আর-দুটো মাটির ঘর। ঠিকমতো লেপা পোঁছা এবং মেরামতি না হলে মাটির ঘর টিঁকিয়ে বাখা যায় না। এখানে-সেখানে খোঁদল দেখা দেয়, মেঝেয় বড় বড় গর্ত হতে থাকে, রোদে জলে ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণের ফলে ফাটল ধরে। আমাদের মেটে ঘর দু'খানার দুর্দশা চোখে দেখলে কষ্ট হয়। ওরই একখানা ঘরে আমি চব্বিশ বছর আগে ভূমিষ্ঠ হই।

পাকা ঘর দু'খানা নিয়ে দাদুর বাস। যত রাজ্যের বাজে জিনিসে ঘরদুটো ঠাসা। পুবনো কৌটো, শিশি, খবরের কাগজ, ভাঙা একখানা সাইকেল, কিছু ঘুণে ধরা তক্তা, অকাজের বাঁশের খুঁটি। দাদু কিছুই ফেলে দেননি। বরাবরই তাঁর সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক। তবু সঞ্চয়ের মধ্যে বাড়তি কিছুই তিনি হাতের কাছে পাননি কোনওদিন। যা পেরেছেন রেখেছেন। বাড়িতে মোট এগারোটা নারকোল গাছে সারা বছর অফুরন্ত ফলন। কে খাবে? দাদু নারকোল বেচে দেন। বাঁধা লোক আছে। সে এসে নারকোল ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ছোবড়াগুলো দাদু বস্তা-বোঝাই করে সঞ্চয়ের ঘরে তুলে রাখেন। তাঁর খুব ইচ্ছে রেলে বোঝাই করে আমরা ছোবড়াগুলো কলকাতায় নিয়ে যাই। নারকোলের ছোবড়া নিশ্চয়ই গৃহস্থের কোনও-না-কোনও কাজে লাগে। এ বাড়িতেই একসময়ে ছোবড়ার কত কদর ছিল। গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হত, সন্ধেবেলায় ধূপ জ্বালানো হত, দড়িদড়াও তৈরি হয়েছে একসময়ে। ওই একই মানসিকতার দরুন দাদু গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর যাবতীয় পুরনো জুতো জমিয়ে রেখেছেন। অব্যবহার্য রকমের ছেঁড়া, বেঁকে যাওয়া সেইসব জুতো কোনওদিনই কারও কাজে আসবে না। তবু আছে।

স্মৃতি তাঁর সঙ্গে বড় লুকোচুরি খেলে আজকাল। সেও এই বয়সেরই গুণে। আর যেটা হয়, কেমন যেন আপনজনদের প্রতি ঠিক আগেকার মতো বুকছেঁড়া টান ভালবাসা থাকে না। বয়সের ইঁদুর এসে মায়ামোহের সুতোগুলো কুটকুট করে কেটে দিয়ে যায়। গাঁয়ের বাড়িতে দাদু এখন একা। নির্ভেজাল একা। তবু তাঁর কোনও হাহাকার নেই। ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের কেউ এলে খুব যে খুশি হন তা নয়। এলে আসুক। গেলে যাক।

এক মাঝবয়সি মেয়েছেলে আসে রোজ। ঝাঁটপাট দেয়। বিছানা তোলে, পেচ্ছাপের কৌটো ধুয়ে দেয়। সে-ই রান্না করে দিয়ে যায় একবেলা। দুপুরে তার যুবতী মেয়ে এসে বাসন মাজে। সন্ধেবেলা দাদু নিজেই উঠোনে কাঠকুটো জ্বেলে দুধ গরম করে নেন। খই দুধ খেয়ে শুয়ে থাকেন। বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এইভাবে।

নকশাল আন্দোলনের সময় আমাকে একবার পালিয়ে আসতে হয়েছিল দাদুর কাছে। তখন

থেকেই আমি তাঁর জীবনযাপনের ধারাটা ভাল করে জানতে থাকি।

সেবার আমাকে দাদুর কাছে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ঠাকুমা তখনও বেঁচে ছিলেন। অনেকদিন আমি কলকাতায় ফিরছি না দেখে দাদু আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। আমি পরীক্ষায় ফেল করিনি তো? কোনও মেয়ের সঙ্গে লটঘট করে আসিনি তো? ঠাকুমা ধমক দিতেন, নাতিটা এসেছে, অত খতেন কীসের?

আমি দাদুকে আন্দোলনের সোজা কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কেন আন্দোলনটা হচ্ছে বা কেন হওয়া দরকার। দাদু সেসব বোঝেননি। আসলে সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে তিনি আর ওতপ্রোত জড়িত নন। কোথায় একটা পার্থক্য ঘটেই গেছে। যেন জেটির থেকে তফাত হওয়া স্টিমার। দেশ কাল আত্মীয়তা সময় সবই এক অস্পষ্টতায় মাখা।

যদিও এই বাড়িতেই আমার জন্ম এবং এই গ্রামটাই আমার জন্মভূমি, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা আমাদের দেশ নয়। এই বাড়ি ছিল গণি মিয়ার। আমরা ঢাকা জেলার লোক। দেশভাগের পর আমাদের ঢাকার গাঁয়ের বাড়ির সঙ্গে গণি মিয়ার এই বাড়ি দাদু বদল করে নেন। পাড়াগাঁয়ে বসতি স্থাপনে দাদুর ছেলেমেয়েদের আপত্তি ছিল। কিন্তু দাদু শহরে যেতে চাননি। ভূমি এবং আশ্রয়ের সংজ্ঞা তাঁর কাছে আলাদা। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এটা তোমাদের দেশের বাড়ি হিসেবে রইল। তোমরা পালে-পার্বণে আসবে।

সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছিল কি না বলতে পারি না। ছেলেমেয়েরা একে একে বড় হল এবং একে একে চলে গেল। পালে-পার্বণেও বড় একটা কেউ আসে না। দাদু আজ একা বটে, কিন্তু খুব অসুখী তো নন।

জায়গাটা গ্রামের মতো হলেও শহর থেকে খুব দূরে নয়। শহরের স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মাত্র দু'মাইলের মতো বাসে বা রিকশায় আসতে হয়। তারপর কিছুটা হাঁটাপথ। রাস্তাটা যে খুব ক্লান্তিকর তা নয়। অন্তত বছরে এক-আধবার আসতে খারাপ লাগে না। শহরের ভিড়ভাট্টা ছেড়ে প্রকৃতির নির্জনতায় পা দিলে, খারাপ লাগবেই বা কেন?

তবে প্রকৃতি ক্রমে নিকেশ হয়ে আসছে। বাস যেখানে থামে সেই বড় রাস্তায় আগে দোকানপাট তেমন ছিল না। আজকাল হয়েছে। এক-আধটা নয়। সারি সারি বেড়া আর টিনের ঘরে হরেক পসরা। বসতিও বাড়ছে। নির্জনতা সরে যাচ্ছে। গ্রামকে ত্রাণ করতে এগিয়ে আসছে শহরের থাবা। হাঁটা পথটুকু আগে এত নির্জন ছিল যে, দিনের বেলাতেও গা ছমছম করত। এখন কাঁচা রাস্তাটা পাকা হয়েছে। পাকা বাড়ি উঠেছে কয়েকটা। একটা ইস্কুল এবং দুটো সরকারি দফতর বসে গেছে। সুতরাং পুরনো দিনের তুলনায় বেশ জমজমাট অবস্থা বলতে হবে।

আমাদের কিছু চাষের জমি ছিল। নতুন ধান উঠলে বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। কিন্তু ক্রমে ফসলের খেত নিয়ে বড় গণ্ডগোল দেখা দেয়। ধানকাটা নিয়ে মারপিট, জোর করে ফসল কাটা বা চুরি এমন একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল যা দাদুর পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। কাজেই উনি জমি বেচে দিলেন। মোট তিন বিঘা জমি নিয়ে আমাদের বাড়ি। এখন ওই তিন বিঘাই সম্বল। কিছু মরশুমি সবজির চাষ হয় মাত্র। শুনতে পাচ্ছি আমাদের ওই তিন বিঘা জমি কেনার জন্যও লোক ঘোরাঘুরি করছে। শহর খুব এগিয়ে আসছে।

আমি পৌঁছলাম ঠিক দুপুরবেলা। তখন দাদুর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশের নীচে একটা গাঢ় ছায়া পড়ে আছে চারধারে। হাওয়া নেই। এখানে-সেখানে জল জমে আছে। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকবার পথটায় ভীষণ কাদা। জোড়া জোড়া ইট পাতা হয়েছিল সেই কবে। আজও বর্ষায় বাড়ি ঢুকতে সেই পুরনো ইটে পা ফেলে যেতে হয়। সাবধানে ইটের ওপর পা ফেলে টাল সামলাতে সামলাতে বাড়িতে ঢুকবার সময় দেখলাম দাদু সামনের দাওয়ায় কাঠের চেয়ারটায় বসে খুব সন্দিহান চোখে আমাকে দেখছেন।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, খেয়ে এসেছ তো?

তাঁর উদ্বেগের কারণটা বুঝি। রান্নার লোক চলে গেছে। বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই যে রেঁধে দেবে। এ সময়ে উটকো লোক এলে তাঁর ঝামেলা।

বললাম, পারুলদের বাড়িতে খেয়ে নেব।

নিশ্চিন্ত হয়ে মুখের হরতুকিটা এ গাল থেকে ও গালে নিলেন। কারও কথা জিজ্ঞেস করলেন না, কলকাতার খবর জানতে চাইলেন না। যেন-বা সেসবের আর প্রয়োজন নেই। তিনি নিরুদ্বেগ ও নির্বিকার থাকতে চান। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিন থাকবে?

আমি বললাম, দেখি।

কুয়োর জলে অঢেল স্নান করে আমি পারুলদের বাড়ি খেতে গেলাম।

আগে থেকে খবর দেওয়ার কোনও দরকার হয় না পারুলদের বাড়িতে। কিছু মুখ ফুটে বলতেও হয় না। অসময়ে গিয়ে হাজির হলেই আপনা থেকেই সব টরেটক্কা হয়ে যায়।

বলাই বাহুল্য পারুল আমার বাল্যসখী এবং প্রেমিকা। আমার বাল্যকাল তো বেশি দূরে ফেলে আসিনি। আমার বয়স মাত্র চব্বিশ। পারুলেরও ওরকমই।

প্রেম কীরকম তা আমি জানি না। পারুলের সঙ্গে আমার সত্যিই প্রেম ছিল কি না তা আজ সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। অনেক তর্ক, অনেক বিচার এসে পড়ে। আমি তেমনভাবে কোনওদিন ওর অঙ্গ স্পর্শ করিনি, চুমু খাইনি, ভালবাসার একটি কথাও বলিনি। ইচ্ছেও হয়নি কখনও। তবে প্রেম বলি কী করে? যখন ওর বিয়ে হয়ে যায় তখন খুব ফাঁকা ঠেকেছিল কয়েকদিন। শুধু সেটুকুই কি প্রেম?

প্রথম কবে দু'জনের দেখা তা বলতে পারব না। বোধহয় তখন দু'জনেই হামা দিই, বিছানায় হিসি করি এবং পরস্পরের সামনে উদোম হতে লজ্জা বোধ করি না। আমরা এক দঙ্গল ছেলেপুলে ঝাঁক বেঁধে এক সঙ্গে বড় হয়েছি। তার ভিতর থেকে আমি আর পারুল কী করে যে আলাদা দু'জন হয়ে উঠি সেও স্পষ্ট মনে নেই। তবে খুব শুদ্ধ ও সুন্দর ছিল আমাদের সম্পর্ক। আমি ওদের বাড়ি গেলে পারুল খুশি হত, ও এলে আমি। নিঃশব্দে দুটি হৃদয়ের স্রোত পাশাপাশি বইছিল। জল একটু চলকালেই হয়ে যেত একাকার।

স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়েই আমি কলকাতায় দৌড়ালাম। পারুল রয়ে গেল। আমার কাছে আজও পারুলের বিস্তর চিঠি জমে আছে। ভুল বানান, খারাপ হাতের লেখা, তবু নিজের হৃদয়কে সে প্রকাশ করত ঠিকই। লিখত কলকাতা বুঝি খুব ভাল? আর আমি খারাপ? যেন কলকাতার সঙ্গেই ছিল তার অসম লড়াই।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর তাঁর শ্রাদ্ধে যখন আমরা আসি তখনই শেষবারের মতো কুমারী পারুলের সঙ্গে দেখা।

একদিন আমতলায় খড়ের গাদির পিছনে নিরিবিলি কথা হল।

পারুল বলল, আমি তোমার ওপর রাগ করেছি।

কেন?

করেছি ইচ্ছে হয়েছে। আসতে চাও না কেন এখানে?

এখানে এসে কী হবে? আমি পড়ছি যে কলকাতায়।

আর কত পড়বে?

অনেক পড়া।

আমি বুঝি কেবল হাঁ করে বসে থাকব?

আমি কী করব বলো তো?

এত লম্বা হয়েছ কেন? তোমাকে চেনাই যায় না।

লম্বা হওয়ারই তো কথা।

তা বলে এতটা ভাল নয়। ভীষণ অন্যরকম হয়ে গেছ।

মানুষ তো বয়স হলে বদলে যায়।

আমি বদলেছি?

খুব।

কীরকম বদলেছি?

তুমিও লম্বা হয়েছ।

সুন্দর হইনি তো?

বাঃ, তুমি তো দেখতে ভালই।

তোমার চেহারাটা খুব চালাক-চালাক হয়ে গেছে কেন বলো তো!

তবে কি বোকা-বোকা হওয়ার কথা ছিল?

তা নয়।— বলে একটু লজ্জা পেল পারুল। যুবতী বয়সের একটা চটক প্রায় সব মেয়েরই থাকে। পারুলেরও আছে। কিন্তু তা বলে পারুলকে সুন্দর বললে ভুল হবে। যদি কলকাতায় না হয়ে এই গ্রামেই থাকতাম তাহলে পারুলকে আরও অনেক বেশি সুন্দর মনে হত। কিন্তু আমি যে শহরে নিত্যদিন বহু সত্যিকারের সুন্দর মেয়ে দেখি।

অবশ্য শুধু সৌন্দর্যটাই কোনও বড় কথা নয়। পারুল বড় ভাল মেয়ে। শান্ত, ধীর, লাজুক, বুদ্ধিমতী। তার হৃদয়টি নরম। আজকাল মনে হয়, তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখীই হতাম। কিন্তু আমাকে বিয়ের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যদি আদপেই করি। পারুল ততদিন অপেক্ষা করতে পারত না! তার বয়স হয়ে যাচ্ছিল।

তবু আশা করেছিল পারুল। খুব আশা করেছিল। কিন্তু আমি কোনও অসম্ভব প্রস্তাব তো করতে পারি না। আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয়। আমার তখন মাত্র আঠারো-উনিশ বছর বয়স। স্বপ্ন দেখার পক্ষে সুন্দর বয়স, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স সেটা নয়। তার ওপর বর্ণ আলাদা। সেটা নিয়েও কিছু ঝামেলা হতে পারত। শহরে বাস করার ফলে আমার বাস্তব বুদ্ধি কিছু বেড়ে থাকবে।

পারুলদের অবস্থা বেশ ভাল। ওরা জাতে গোপ। বংশগত বৃত্তি ওরা কখনও ছাড়েনি। বাড়ির পিছন দিকে সেই আমতলার ধারেই মস্ত উঠোন ঘিরে টানা গোশালা। অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা গোরু মোষ। দুধ বিক্রি তো আছেই, উপরন্তু শহরের বাজারে এবং রেল স্টেশনে রমরম করে চলছে দুটো মিষ্টির দোকান। আমাদেব মতো ওরাও এসেছিল তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। কিছু কষ্টেও পড়েছিল বটে, কিন্তু সামলে গেছে। এখনও ওদের বাড়িতে ঢুকলে সচ্ছলতার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মস্ত জমি নিয়ে বসত। অন্তত গোটা তিনেক একতলা এবং দোতলা কোঠাবাড়ি। একান্নবর্তী পরিবার অবশ্য ভাঙছে ভিতরে ভিতরে। তবে বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না।

পারুলেব মাকে আমি ফুলমাসি বলে ডাকি। ফরসা গোলগাল আহ্লাদি চেহারা। একটু বেঁটে।

খবর পেয়েই বেরিয়ে এসে বললেন, আয়। কালও তোদের কথা ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলে?

এমনি ভাবছিলাম না। রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম তোর মাকে নিয়ে। শানুদি ভাল আছে তো?

আছে। স্বপ্নের কোনও মানে হয় না কিন্তু।

সে হয়তো হয় না। তবে মনটা কেমন করে যেন।

পারুল কি শ্বশুরবাড়ি?

তাছাড়া আর কোথায়?

বারফট্টাই নেই বলে এদের ঘরে আসবাবপত্র বেশি থাকে না। যা আছে তাও তেমন চেকনাইদার নয়। সাদামাটা সাবেকি খাট, চৌকি, চেয়ার, আলমারি, দেয়াল-আয়না, সস্তা বুক-র‍্যাক।

পারুলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দু'বাড়ির সকলেই জানত। ফুলমাসির সমর্থনও ছিল। সম্ভাব্য জামাই হিসেবে উনি আমাকে একটু বাড়াবাড়ি রকমের যত্নআত্তি করতেন। সেই অভ্যাসটা আজও যায়নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ বড় রকমের আয়োজন করে ফেললেন।

আমি মৃদু হেসে বললাম, ফুলমাসি, যাদের ভাল করে খাওয়া জোটে না তাদের ভাল খাইয়ে অভ্যাস খারাপ করে দেওয়াটা খুব অন্যায়।

খুব পাকা হয়েছিস, অ্যাঁ? পেট ভরে খা তো।

পেট ভরে খাব না কেন? আমার তো চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। তবে ভাল ভাত বা তেঁতুল পান্তা দিলেও পেট ভরেই খেতাম, এত আয়োজন করার দরকার ছিল না।

আচ্ছা, এর পর পান্তাই দেব। এখন খা। তুই নাকি শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে চাকরি পেয়েছিস?

কে বললে?

পারুলের বাবা বলছিল।

গণেশকাকা? গণেশকাকাই তো আমাকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে লোক নেবে খবর দিয়ে।

তুই ওর চিঠি পেয়ে এসেছিস? দেখ কাণ্ড! আমাকে বলল অভির চাকরি হয়েই গেছে।

না গো মাসি। শহরে নেমেই আগে স্টেশনের কাছের দোকানটায় গিয়ে গণেশকাকার সঙ্গে দেখা করেছি। শুনলাম দু'জন লোক নেবে, অ্যাপলিক্যান্ট ছ'শোরও বেশি।

বলিস কী?

গণেশকাকা আমাকে চিঠি লিখে আনিয়ে এখন ভারী অস্বস্তিতে পড়েছেন।

তোর কি তাহলে হবে না?

হওয়ার কথা তো নয়। তবে গণেশকাকা একজনকে মুরুব্বি ধরেছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস। অসীমা না কী যেন নাম।

ও, সেই শুঁটকি! ওকে ধরলে কি কাজ হবে? ওর বরটা বরং করে দিতে পারে।

ও বাবা, আমি অত ধরাধরিতে নেই।

তা সে তুই কেন ধরতে যাবি! যে তোকে আনিয়েছে সেই ধরবে।

শুঁটকির বরটা কে?

ফুলমাসি মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, বর আসলে নয়। বিয়ের কথা চলছে। লোকটা ভাল নয়। আগের বউটাকে গলা টিপে মেরেছে।

তবে তো শাহেনশা লোক।

লোক খারাপ, তবে চাকরিটা করে দিতে পারে।

কলকাতা ছেড়ে আসার ইচ্ছে আমার খুব একটা নেই। সেখানে কর্মহীন দিন আমার অকাজে কাটে বটে, কিন্তু রোজ মনে হয়, চারদিকে এই যে এক অন্তহীন শহর, এত অফিসবাড়ি, এত দোকানপাট, এত ব্যাবসা-বাণিজ্য, হয়তো একদিন এ শহর দুম করে একটা সিংহদুয়ার খুলে দেবে সৌভাগ্যের। কলকাতায় কত ভিখিরি রাজা বনে গেছে। কলকাতায় থাকলে এই সুখস্বপ্নটা দেখতে পারি। কিন্তু মফস্‌সল শহরে স্বপ্নের কোনও সুযোগ নেই। মনমরা, চোখবোজা হয়ে পড়ে আছে লক্ষ্মীছাড়া এইসব শহর। এদের রসকষ সব টেনে নিয়েছে কলকাতা। এগুলো শুধু বকলমে শহর। মানুষ আর বসতি বাড়ছে বটে, কিন্তু বাড়ছে না অর্থনীতি। তাই এখানে মাস্টারির চাকরিতে আমার তেমন আগ্রহ নেই। হলে ভাল, না হলে ফের স্বপ্ন দেখার শহরে ফিরে যাব।

আমি তাই ফুলমাসিকে বললাম, অত কিছু করতে হবে না। লোকটাকে নিশ্চয়ই আরও অনেক

ক্যান্ডিডেট ধরাধরি করছে। তারা হয়তো স্থানীয় লোক। চাকরি তাদেরই কারও হয়ে যাবে। আমাকে দেবে না। খামোকা এর জন্য একটা বাজে লোককে ধরাধরি করতে গিয়ে গণেশকাকা নিজের প্রেস্টিজ নষ্ট করবেন কেন?

বাজে লোক তো ঠিকই। কিন্তু ভাল লোকই বা পাচ্ছিস কোথায়! সব জায়গায় খারাপ লোকগুলোই মাথার ওপর বসে আছে।

সেই জন্যই আমাদের হচ্ছে না। হবেও না।

নাই যদি হয় তবে পারুলের বাবাকে আমি খুব বকব। খামোকা তোকে ভরসা দিয়ে টেনে আনল কেন?

সে তো তুমি সবকিছুর জন্যই সবসময়ে গণেশকাকাকে বকো। তোমাদের কোনও গাই এঁড়ে বিয়োলেও নাকি গণেশকাকার দোষ হয়।

ফুলমাসি একটু হেসে করুণ গলায় বললেন, তা আমি আর কাকে বকব? আর কেউ তো আমার বকুনিকে পাত্তা দেয় না।

সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর। তাই না? মেয়েদের একটা দোষ কী জানো ফুলমাসি? যত রাগ আর ঝাল ঝাড়বার জন্য তারা স্বামী বেচারাকে ঠিক করে রাখে। আমার মাকেও তো দেখেছি। একবার কোনও বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে ঝড় বৃষ্টিতে মা আটকে পড়েছিল। ফিরতে খুব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হল। বাড়িতে পা দিয়েই বাবাকে নিয়ে পড়ল, সব তোমার দোষ। আমরা তো অবাক। ঝড়-বৃষ্টি বাবা নামায়নি, সিনেমাতেও বাবা সঙ্গে যায়নি, তবে বাবার দোষ মা কী করে বের করবে! আমরা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে ঝগড়া শুনতে লাগলাম। আশ্চর্য কী জানো? মা কিন্তু ঠিক মিলিয়ে দিল। গোঁজামিল অবশ্য, কিন্তু ওই ঝড়-বৃষ্টি, দেরি হওয়া সব কিছুর দায়ভাগ বাবার কাঁধে চাপান দিয়েও ছিল। বাবাও তেমন উচ্চবাচ্য করল না।

ফুলমাসি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, আর পুরুষরাই ছেড়ে কথা কয় কিনা। রামকৃষ্ণ ঠাকুর নাকি মাঝে মাঝে ফোঁস করার কথা বলেছেন। তা সেইটে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়ে আজকাল সর্বদাই কেবল ফোঁস ফোঁস করে যাচ্ছেন।

হাসাহাসি দিয়ে খাওয়াটা শেষ হল।

আজকাল হাসি বড় একটা আসতে চায় না। চব্বিশ বছর বয়সেই আমি কি একটু বেশি গোমড়ামুখো হয়ে গেছি?

বাড়ি ফিরতেই দাদু জিজ্ঞেস করলেন, খেলে?

হ্যাঁ।

কী রান্না করেছিল?

ইলিশ মাছ।

দাদুর স্তিমিত চোখ একটু চকচক করে উঠল, ইলিশ ওঠে বুঝি বাজারে?

তা আমি কী করে বলব? ওঠে নিশ্চয়ই, নইলে ওরা পেল কোথা থেকে?

দাদু মাথা নেড়ে বললেন, এখানকার বাজারে ওঠে না। গণেশ শহর থেকে আনে।

কেন, তুমি খাবে? খেলে বোলো, এনে দেব।

না, এখানকার ইলিশ খেতে মাটি-মাটি লাগে। দেশের ইলিশের মতো স্বাদ না। ইলিশের ডিমভাজা করেছিল নাকি?

না।

ইলিশের ডিমভাজা একটা অপূর্ব জিনিস। মুখের হরতুকিটা এ গাল ও গাল করতে করতে দাদু মনে মনে বহু বছরের পথ উজিয়ে ফিরে যাচ্ছেন দেশে। ভজালী নৌকোর পালে আজ হাওয়া লেগেছে। চোখদুটো কেমন ঘোলাটে, আনমনা।

দুপুরে আমার ঘুম হয় না। পশ্চিমের ঘরের চৌকিতে শুয়ে বুক বরাবর জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়েছিলাম।

একটা নারকেল গাছ ঝুপসি মাথা নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে। ভারী একা দেখাচ্ছে তাকে। কালো মেঘের একটা ঘনঘোর স্তর থমথমিয়ে উঠছে দিগন্তে। নিজেকে ভারী দুঃখী, ভারী কাতর বলে মনে হয়।

বাইরে একটা সাইকেল এসে থামল। শব্দ পেলাম। দাদুর সঙ্গে কে একজন কথা বলছে। আস্তে বললেও শোনা যাচ্ছিল।

আগন্তুক বলল, কিছু ঠিক করলেন নাকি দাদা?

কী আর ঠিক করব বলো।

পনেরো হাজার নগদ আগাম দিয়ে দিচ্ছি। লেখাপড়া থাকবে। আপনি যতদিন বাঁচবেন এই ঘর দু'খানা, উঠোন আর কুয়োতলায় আমরা হাত দেব না। আপনি মরার পর আমরা পুরোটা দখল নেব।

দাদু একটু চটে উঠে বললেন, রোজ এসে আমাকে মরার কথা বলো কেন?

লোকটা বোধহয় একটু থতমত খেয়ে বলে, আজ্ঞে না। মরার কথা ঠিক বলি না। থাকুন না বেঁচে যতদিন খুশি। তবে মরতে তো একদিন সকালেই হবে। তখনকার কথা বলছিলাম আর কী।

তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি মরার জন্য হুড়ো দিচ্ছ।

কী যে বলেন দাদা! এই বয়সেও আপনার চমৎকার স্বাস্থ্য। অনেকদিন বাঁচবেন।

এ জমি নিয়ে তোমরা করবে কী?

আজ্ঞে সে পারিজাতবাবু জানেন। করবেন কিছুমিছু। এক লপ্তে একটু বেশি জমি তো পাওয়া মুশকিল।

দাদু বললেন, আমি শুনেছি এদিকে নাকি সরকারের তরফ থেকে কী সব উন্নতি-টুন্নতি হবে। তাই এখন আর কেউ জমি বেচছে না। দাম বাড়ার আশায় চেপে বসে আছে।

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, সে এদিকে না। রাস্তার ওধারটায় শুনেছি সরকারের কী সব করার প্ল্যান আছে!

দাদু এই বয়সেও কূটনৈতিক বুদ্ধি হারাননি। বললেন, তা ওদিকটা হলে কি আর এদিকটাও বাকি থাকবে?

তা বলতে পারি না। তবে দু'চার হাজার টাকা বেশি দাম দিতে বোধহয় পারিজাতবাবু পিছোবেন না। কিন্তু আপনি তো দরই বলছেন না।

দাঁড়াও, আগে বেচব কি না ভেবে দেখি।

সে তো অনেকদিন ধরে বলছি আপনাকে। একটু ভেবে ঠিক করে ফেলুন।

দাদু বোধহয় হরতুকির টুকরোটাকে আবার অন্য গালে নিলেন। তারপর বললেন, ব্যাপার কী জানো, এ জমিটুকু বেচে দিলে আমার ছেলেগুলো আর নাতি-নাতনিদের আর দেশের বাড়ি বলে কিছু থাকবে না।

সে তো এমনিতেও নেই। তারা সব কলকাতায় বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছে, আর আপনি বুড়ো মানুষ একলাটি পড়ে আছেন এখানে। আপনি চোখ বুজলে তো এখানে ভূতের নেত্য হবে।

দাদু হতাশ গলায় বললেন, নাঃ, তুমি দেখছি আমাকে না মেরেই ছাড়বে না। লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, মরার কথা বলিনি, বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে চাইছিলাম।

দাদু বললেন, বাস্তব অবস্থাটা আমিও কি আর বুঝি না? এ বাড়িতে আর কেউ না থাক গাছপালাগুলো তো আছে। সেগুলোর মায়াই কি কম! চট করে বেহাত হতে দিই কী করে?

গাছপালায় কেউ হাত দেবে না। যেমন আছে তেমনই থাকবে না হয়।

সে তুমি এখন বলছ। জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই অন্যরকম। যে টাকা ফেলে জমি কিনছে সে

কি আর বুড়ো মানুষের মুখ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? পারিজাত অত ভাল মানুষ নয়।

আচ্ছা, বায়নানামাটা অন্তত করে রাখতে দিন।

তুমি বরং সামনের শুক্কুরবার এসো।

কতবার তো ঘুরে আসতে বললেন। আমিও এসে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি। শুক্কুরবার কিন্তু দাদা কথা দিতে হবে।

এত তাড়া কীসের বলো তো! একটু রয়ে বয়ে হোক না।

লোকটা বলল, দেরি করলে আবার সব কেটে যাবে যে। জমি আপনার নামে। কিন্তু আপনার অবর্তমানে আপনার তিন ছেলে আর দুই মেয়ে ওয়ারিশান। তখন আবার সকলে এককাট্টা না হলে জমি হস্তান্তর হবে না। ঝামেলাও বিস্তর।

দাদু এবার একটু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, শুক্কুরবার অবধি আমি বর্তমানই থাকব।

লোকটা শশব্যস্ত বলল, না, না, সে তো ঠিকই। তাহলে ওই পাকা কথা বলে ধরে নিচ্ছি। শুক্কুরবার না হয় বায়নার টাকাটাও নিয়ে আসব।

আবার সাইকেলের শব্দ পেয়ে আমি ঘাড় উঁচু করে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। মুখটা দেখা গেল না। তবে বেশ দশাসই চেহারা।

উঠে দাদুর কাছে এসে বসলাম সামনের বারান্দায়।

লোকটা কেন এসেছিল দাদু? বাড়িটা কি তুমি বেচে দেবে?

দাদু একটু বিব্রতভাবে বললেন, না বেচেই বা কী হবে?

আমার এখানে একটা চাকরি হওয়ার কথা চলছে। যদি হয় তবে আমার ইচ্ছে ছিল এ বাড়িতে থেকেই চাকরি করি।

চাকরি? কীসের চাকরি?

মাস্টারি।

ও।— বলে দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেন, সত্যিই থাকবি নাকি?

যদি চাকরি পাই।

দাদু যেন কথাটায় বেশি ভরসা পেলেন না। বললেন, রোজই লোক আসে। তবে আমি কাউকে কথা দিইনি।

বিকেলে পারুলদের বাড়ি থেকে একটা সাইকেল চেয়ে নিয়ে শহরে রওনা হলাম। আজ বিকেলেই অসীমা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করার কথা। গণেশকাকা নিয়ে যাবেন।

পথে ঝিরঝিরে একটু বৃষ্টি হয়ে গেল। ভিজলাম। আকাশ জমাট মেঘে থম ধরে আছে। রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে পারে।

গণেশকাকার দোকানে সাইকেল রেখে দু'জনে রিকশা নিলাম। যেতে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের গাঁয়ের ওদিকে স্যাটেলাইট টাউনশিপ হচ্ছে বলে কিছু শুনেছেন?

গণেশকাকা বললেন, কত কিছুই তো হবো-হবো হয়। দেখা যাক শেষ অবধি। তবে শুনেছি হচ্ছে।

আজ একজন লোক আমাদের বাড়িটা কিনবার জন্য এসেছিল।

কে বল তো!

তা জানি না। শুনলাম পারিজাতবাবুর লোক।

গণেশকাকা সরল সোজা মানুষ। নামটা শুনেই জিব কেটে বললেন, ও বাবা, সেই তো স্কুলের সেক্রেটারি।

শুনে বুকটা হঠাৎ দমে গেল। বললাম, লোকটা কেমন?

ভাল তো কেউ বলে না। তবে টাকা আছে, ক্ষমতা আছে। আজকাল ওসব যার আছে সেই ভাল।

এ লোকটাই কি তার বউকে খুন করেছিল?

লোকে তো তাই বলে। তোকে কে বলল?

ফুলমাসি।

গণেশকাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, পারিজাত অনেকদিন ধরেই তোদের বাড়ি কিনতে চাইছে। তোর দাদু অবশ্য রাজি হয়নি।

আমার মনটা খারাপ লাগছিল। স্কুলের চাকরিটা আমার হবে না জানি। তবু তো আশার বিরুদ্ধেও মানুষ আশা করে। এখন পারিজাতবাবু যদি জানতে পারেন যে জমিটা আমাদের এবং আমরা বেচতে রাজি নই তবে হয়তো চটে যাবেন, আর আমার চাকরিটাও হবে না।

বিচিত্র এই কার্যকারণের কথা ভাবতে ভাবতে আমি বললাম, অসীমা দিদিমণির কি চাকরির ব্যাপারে সত্যিই হাত আছে?

দেখাই যাক না।

পারিজাতবাবু লোকটা কে? আগে নাম শুনিনি তো।

এখানকার লোক নয়। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

অসীমা দিদিমণির জন্য তাঁদের বাইরের ঘরে আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। উনি এখনও ফেরেননি। আমার হাই উঠছিল। গণেশকাকা কেমন যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে জবুথবু হয়ে বসেছিলেন। যেন এইসব শিক্ষিতজনের ঘরবাড়ি আসবাবপত্রকেও সমীহ করতে হয়।

গণেশকাকাকে আমি কাকা ডাকি, অথচ তার বউকে মাসি। কেন ডাকি তা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। কোনও সূত্র পেলাম না। ছেলেবেলা থেকেই ডেকে আসছি, এইমাত্র। পারুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে অবশ্য সম্পর্ক এবং ডাক পালটে যেত। ফুলমাসিকে মা বলে ডাকতে অসুবিধে হত না, কিন্তু গণেশকাকাকে গাল ভরে বাবা ডাকতে পারতাম না নিশ্চয়ই। পারুলের শ্বশুরবাড়ি এই শহরেই। আমি কখনও যাইনি। কালেভদ্রে দেশের বাড়িতে এলেও আমি পারুলের শ্বশুরবাড়িতে যাই না ভয়ে। যদি ওরা কিছু মনে করে?

এইসব ভাবতে ভাবতেই অসীমা দিদিমণি ঘরে ঢুকলেন। তটস্থ গণেশকাকা উঠে হাত কচলাতে লাগলেন। মুখে একটু নীরব হেঁ-হেঁ ভাব।

অসীমা দিদিমণির মতো এরকম বিষণ্ণ চেহারার মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। চেহারাটা রুক্ষ এবং শুকনো। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ওঁর চোখমুখ যেন গভীর হতাশা, গভীর ক্লান্তি এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে মাখা। একটুও হাসির চিহ্ন নেই কোথাও।

আমার পরিচয় পেয়ে গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আমাকে নয়, উনি মনের মধ্যে অন্য কোনও দৃশ্য দেখছেন।

৩। পারিজাত

লোকটা চেঁচাচ্ছে ফটকের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, গলায় প্রগাঢ় মাতলামি। আমার ঘর থেকে অত দূরের চেঁচানি শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাল বোঝা যায় না। তবে আমি জানি, লোকটা আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। খুবই অশ্লীল, অসাংবিধানিক ভাষায়। ওর কথায় কান বা গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। কারণ আমার ধারণা, যে কোনও গরিব দেশেই এরকম দৃশ্য হামেশাই দেখা যায়। কিছু লোকের বদ্ধমূল ধারণা, তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্য কিছু লোক দায়ী। এদের যত রাগ সব সেই অন্যদের

বিরুদ্ধে। যারা জোট বেঁধে মিছিলে সামিল হয়ে অন্যের বিরুদ্ধে তারস্বরে নালিশ জানায় তারাও এরকমই। দারিদ্র্যসীমা নামক যে রেলবাঁধটা আমি দেখতে পাই এরা হচ্ছে তার ওপারের লোক।

অরিন্দমবাবু একটু সচকিত হয়ে বললেন, বাইরে একটা লোক খুব চেঁচাচ্ছে না?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বলছে বলুন তো?

আমি সত্য গোপন না করে আরও বিনীতভাবে বলি, আমাকে গালগাল দিচ্ছে।

আপনাকে। কেন?

ওর ধারণা ওর দুর্ভাগ্যের জন্য আমিই দায়ী।

সে কী! আপনি ওর কী করেছেন?

আমি নাটকীয়ভাবে একটু চুপ করে থাকি। গল্পটা খুবই সাধারণ এবং এরকম ঘটনা আকছার ঘটছেও। অক্ষয় নামে ওই লোকটির একটি ছোট্ট ওয়ার্কশপ ছিল। বেশিরভাগই গ্যাস আর ইলেকট্রিক ওয়েলডিং-এর কাজ হত তাতে। লাভ মন্দ হত না একসময়ে। কিন্তু লোকটা দুর্দান্ত মালখোর, তেমনি সাংঘাতিক মেয়েমানুষের প্রতি লোভ। খালপাড়ের এক সেয়ানা ছুঁড়ি অক্ষয়ের রসকষ টেনে নিচ্ছিল। এসব লোকের যা হয়, হঠাৎ একদিন নগদ টাকায় টান পড়ে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই অবস্থায় একদিন কারখানাটা আমাকে বিশ হাজারে বেচে দেয়, দাম যে খুব খারাপ পেয়েছে তা নয়। কিন্তু মুশকিল হল, টাকাটা নিয়েই ফুঁকে দিয়েছে। এদিকে আমার লক্ষ্মীমন্ত হাতে পড়ে কারখানাটা এখন দিব্যি চলছে। সাত-আটজন লোক খাটে। লোকটার সেই থেকে রাগ। কিন্তু আমি ওর ওপর রাগ করতে পারি না। মূর্খ, অজ্ঞ, দরিদ্র ভারতবাসীরই ও একজন।

ঘটনাটা যতদূর সম্ভব নিরলঙ্কার এবং সরলভাবে আমি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দমবাবুকে শোনালাম।

উনি একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু লোকটা এরকম চেঁচায় আর আপনিও সহ্য করে যান? স্টেপ নেন না কেন?

আমি বিনীতভাবে চুপ করে থাকি। অরিন্দমবাবুর মাথা নিশ্চয়ই অতি পরিষ্কার এবং ঝকঝকে। নইলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতেন না। আমার মাথা তত পরিষ্কার নয়। অনেক কুটিলতা-জটিলতার রাস্তা আমাকে পেরোতে হয়। তবে পাবলিসিটির ব্যাপারটা আমি অরিন্দমবাবুর চেয়ে ভাল বুঝি। ওই যে অক্ষয় চেঁচায় এবং আমি ওকে তাড়িয়ে দিই না এটাও লোকে লক্ষ করে। চেঁচাতে চেঁচাতে, গালাগাল দিতে দিতে অক্ষয় একসময় ক্লান্ত হয়ে চলে যায়, লোকেও রোজ শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা আর অক্ষয়ের কথায় গুরুত্ব দেয় না, বরং আমি যে অক্ষয়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিই না এটাই ক্রমে ক্রমে গুরুত্ব পেতে থাকে। উপরন্তু অক্ষয়ের কোনও গালাগালিই আমাকে স্পর্শ করে না। আমি যখন দারিদ্র্যসীমার ওপাশে ছিলাম তখন এর চেয়ে বহুগুণ খারাপ গালাগাল আমি নিত্যদিন শুনেছি।

আমি অরিন্দমবাবুকে তাঁর জিপগাড়িতে তুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যাই এবং অক্ষয়ের মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে সামনে দেখে অক্ষয়ের উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে যায়। সে সোল্লাসে লাফাতে লাফাতে বলতে থাকে, এই সেই হারামির বাচ্চা, এই সেই শুয়োরের বাচ্চা, এই ব্যাটা খানকির পুত আমার কারখানা হাতিয়ে নিয়েছে, আমার বউকে বিধবা করেছে...ইত্যাদি। শেষ কথাটা অবশ্য ডাহা মিথ্যে। অক্ষয়ের বউ বহুদিন আগে মারা গেছে, কাজেই তার বউয়ের বিধবা হওয়াব প্রশ্ন আসে না। যদি বউ বেঁচে থাকতও তাহলেই বা অক্ষয় বেঁচে থাকতে কীভাবে তাকে আমি বিধবা করতাম সেটা আমার মাথায় এল না।

অক্ষয়ের এই আস্ফালন ও গালমন্দ কিন্তু বাস্তবিকই আমি উপভোগ করি। ভিতরে ভিতরে আমার একধরনের শিহরণ হতে থাকে। পৃথিবীকে আমি কতখানি ডিসটার্ব করতে পেরেছি অক্ষয়

তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। দারিদ্র্যসীমার ওপাশে থাকার সময় আমি প্রায়ই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতাম না। আমরা আছি কি নেই তা নিয়ে বহুবার সংশয় দেখা দিত। আমাদের বাঁচা বা মরা কোনওটাই টের পেত না বিশ্ববাসী, আমাদের খিদে লজ্জা ভয় সবই ছিল আমাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই যখন অক্ষয় বা তার মতো কেউ আমাকে গালমন্দ করে, আমার বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, লোকজনকে ধরে ধরে আমার কুৎসা গেয়ে বেড়ায় তখন আমি আমার ব্যাপক অস্তিত্বটাকে টের পাই। আমার অস্তিত্ব চারদিকে নাড়াচাড়া ফেলছে, আমাকে ঘিরে ঘটছে ঘটনাবলী। আমি আর উপেক্ষার বস্তু নই। আমি যে আছি তো লোকে টের পাচ্ছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। গাঢ় মেঘ ছিল আকাশে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আমি ঘরে ফিরে আসি।

চতুর্ভুজের সাইকেল এসে থামল বাইরে। ভেজা গা বারান্দায় একটু ঝেড়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে বলল, বাঁকা বাঁশ আজও সোজা হল না।

আমি বললাম, বুড়ো যদি রাজি না হয়েই থাকে তবে তুমি আর শিগগির ওর কাছে যেয়ো না, বরং তার যে ছেলে কলকাতায় থাকে তার পাত্তা লাগাও। শুনেছি তার অবস্থা ভাল নয়। ভাল দাম পাওয়া যাবে শুনলে সেই এসে বুড়োকে রাজি করাবে।

চতুর্ভুজ একটু হতাশার গলায় বলল, সরকার যে ওদিকে ডেভেলপমেন্ট করবে তা বুড়ো জেনে গেছে।

আমি শান্ত স্বরেই বললাম, এসব খবর কি আর চাপা থাকে? কেউ না কেউ রটাবেই।

চতুর্ভুজ যে ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। অথচ জমিটা ও কিনবে না, কিনব আমি। তবে ওর দুঃখ কীসের? আমার মনে হয়, অন্য লোকে যদি লটারি পায় তবে মানুষ যে সব সময়ে তাকে হিংসে করে তা নয়। অনেক সময়ে মানুষ সেই লোকটার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে এক ধরনের আত্মরতি করতে থাকে। এও হল তাই। এ জমি কিনে আমি যদি মোটারকম একটা দাঁও মারতে পারি তবে চতুর্ভুজ খুশি হবে।

কিন্তু মোটারকম দাঁও মারার ব্যাপারটা এখনও অনিশ্চিত। গভর্নমেন্ট যে ঠিক ওই জায়গাতেই ডেভেলপমেন্ট করবে তা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়নি। তবে এই অঞ্চলে কিছু কৃষিনির্ভর, শিল্প বা অ্যাগ্রো ইনডাসট্রি গড়ে তোলার একটা কথা চলছে। মউডুবির বঙ্কিম গাঙ্গুলির জমিটা কিনতে পারলেও সেটা আমার পক্ষে একটা জুয়া খেলার সামিলই হবে। যদি শেষ অবধি ওদিকে ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে টাকাগুলো আটকে রইল। তবে অরিন্দমবাবু এবং অন্যান্য জানবুঝওলা অফিসাররা আমাকে গোপনে জানিয়েছেন, মউডুবিই সেই চিহ্নিত জায়গা।

আমি সহজে হতাশ হই না। কারণ আমি বড় হয়েছি এক মস্ত অন্ধকার বুকের মধ্যে নিয়ে। আমার জীবনটাও নানারকম জুয়া খেলার সাফল্যের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আচমকাই চতুর্ভুজকে জিজ্ঞেস করলাম, নারকোল ডিহাইড্রেট করা যায় না?

চতুর্ভুজ ক্যাবলার মতো মুখ করে বলল, তা তো জানি না।

মউডুবিতে খুব নারকোল হয়।

তা হয়। তবে লোকে টাটকা নারকোল পেলে কি আর নারকোলের গুঁড়ো কিনবে?

আমি টপ করে বললাম, আদাও তো বাজারে টাটকা পাওয়া যায় তবে আদার গুঁড়ো বিক্রি হয় কেন?

চতুর্ভুজ অবাক হয়ে বলে, হয় নাকি?

না হলে বললাম কেন? গুঁড়ো নারকোলের অনেকগুলো প্লাস পয়েন্ট আছে। আজকালকার বউ-ঝিরা ঘরের কাজ বেশি করতে চায় না। নারকোল কোরানোও এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। ডিহাইড্রেটেড নারকোল পেলে তারা খুশিই হবে। তাছাড়া উত্তর ভারতের একটা মস্ত এলাকায়

নারকোল হয় না। দক্ষিণ ভারত বা এদিক থেকে যা যায় তার দাম সাঙ্ঘাতিক। সুতরাং ডিহাইড্রেটেড নারকোলের বাজার আছে। অবশ্য যদি করা যায়।

চতুর্ভুজ এ কথাতেও বেশ উত্তেজিত হয় এবং বোধহয় স্বপ্ন দেখতে থাকে। যদিও ডিহাইড্রেটেড নারকোল বেঁচে আমি আরও বড়লোক হলেও তার এক পয়সা লাভ নেই। তবু সে আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে একটা গোলাপি ভাবীকালের কথা ভাবতে থাকে, তার চোখেমুখে একটা সশ্রদ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব ফুটে ওঠে। সে বলে, মউডুবিতে এক সাহেবের একটা পেল্লায় নারকোলবাগান আছে। ইজারা নেওয়ার চেষ্টা করব?

দাঁড়াও, আগে খোঁজ নিই নারকোলের ডিহাইড্রেশন সম্ভব কি না।

চতুর্ভুজ সে কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলে, বঙ্কিম গাঙ্গুলিরও মেলা নারকোল গাছ। ফাঁকা জমিতে কেরালার কিছু জলদি জাতের আরও চারা লাগিয়ে দিলে পাঁচ বছরের মধ্যে ফলন পেয়ে যাবেন।

আমি তাকে আর থামানোর চেষ্টা করি না। গরিবের তো স্বপ্নই সম্বল, হোক না তা অন্যকে নিয়ে। চতুর্ভুজ নারকোল গাছের বাই-প্রোডাক্টগুলোর কথাও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দড়ি, পাপোশ, হুঁকোর খেলো, পুতুল, অ্যাশট্রে, ছাইদানি, আরও কত কী!

আজ একটু দেরি করে অসীমা এল। দেরি হওয়ারই কথা। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের খুব জরুরি একটা মিটিং হয়ে গেল স্কুলে আজ। প্রসঙ্গ ছিল, করাপশন। স্কুলের বেশ কিছু টাকা নয়-ছয় হয়েছে, হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না, অডিটার অসন্তুষ্ট। এ সবই আমি আগে থেকে জানতাম।

আজ সন্ধে হয়ে গেছে এবং বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কাজেই আজ আমাদের কুঞ্জবনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অসীমা তাব বেঁটে ছাতাটা দরজার পাশে রেখে আধভেজা শরীরে ঘরে ঢুকতেই চতুর্ভুজ সবেগে বেরিয়ে গেল। প্রেমিক-প্রেমিকাকে ডিস্টার্ব করতে নেই।

অসীমার মুখ চোখের চেহারা আজ আরও খারাপ। ওর ভিতরকার সব আলোই যেন নিভে গেছে। উপমাটা কারও কারও অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু আমি মানুষকে মাঝে মাঝে বাড়ি হিসেবেও দেখি। এক-একটা মানুষকে দেখে মনে হয়, সব ঘরে আলো জ্বলছে, জানলা দরজা খোলা, পর্দা উড়ছে হাওয়ায়, এইসব মানুষেরা হা হা করে হাসে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, এদের জীবনে দুঃখ বড় ক্ষণস্থায়ী। কিছু কিছু মানুষের দু'-একটা ঘরে আলো জ্বলে, বেশিরভাগ জানালা কবাটটাই থাকে বন্ধ। আর কিছু মানুষ জন্মদুঃখী। ওদের বড়জোর বাথরুমে একটুখানি আলো জ্বলে। জানান দেয় যে, লোকটা আছে। অসীমার আলোর জোর নেই, জানালা কপাট সবই প্রায় বন্ধ। তবু এক চিলতে কপাটের ফাঁক দিয়ে একটু যে আলো দেখা যেত তাও যেন কে আজ এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছে।

সে বসলে আমি জিজ্ঞেস করি, আজ মিটিং-এ কী হল?

অসীমা মাথা নেড়ে বলল, কিছু হয়নি। খুব গণ্ডগোল হয়ে মিটিং ভেঙে গেল।

সেরকমই কথা। তবু আমি মুখখানা নির্বিকার রেখে বললাম, কী নিয়ে গণ্ডগোল?

কমলাদি তোমার এগেনস্টে চার্জ আনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কয়েকজন কমলাদির এগেনস্টে কথা বলতে শুরু করে দিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

অস্বাভাবিক কেন?

টিচাররা এতকাল কেউ কমলাদির বিরুদ্ধে একটিও কথা বলত না, দু'-একজন ছাড়া। আজ অনেকেই দেখলাম কমলাদির বিরুদ্ধে। তবে তারা যা বলছিল তা আমাদের আজকের এজেন্ডায় ছিল না।

আজ তো করাপশান নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তোমাদের।

হ্যাঁ, স্কুল ফান্ড এবং অডিট রিপোর্ট নিয়ে সে আলোচনা ভন্ডুল হয়ে গেছে।

কমলাদির রি-অ্যাকশন কী?

প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর যখন ওঁর বিরুদ্ধে খোলাখুলি বলতে লাগল কয়েকজন তখন একদম পাথরের মতো চুপ করে গেলেন। সারাক্ষণ একটিও কথা বলেননি।

আমি অসীমার মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম। বুঝতে পারছি, অসীমা আজকের মিটিং ভন্ডুল হওয়ায় খুশি হয়নি। কমলা সেন জব্দ হওয়াতেও আহ্লাদিত হয়নি। অথচ হওয়া উচিত ছিল। আমার মন বলছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই কমলা সেনকে রেজিগনেশন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অসীমার হেডমিসট্রেস হওয়া আটকানোর কেউ নেই। তবু অসীমা খুশি নয়। আশ্চর্য!

আমি মৃদু স্নেহসিক্ত স্বরে বললাম, তোমার কি শরীর ভাল নেই অসীমা?

কেন বলো তো!

তোমাকে ভাল দেখছি না।

মনটা ভাল নেই। স্কুলটার কী হবে তাই ভাবছি।

কী আর হবে, উঠে যাবে না। ভয় নেই।

তা নয়। কমলাদি চলে গেলে স্কুলটার আর সেই গুডউইল থাকবে না। এই স্কুলের জন্য উনি একসময়ে নিজে বাহান্ন ভরি সোনার গয়না দিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা তো জানো।

জানি।

স্কুল স্কুল করে পাগল। এখনও ঘুরে ঘুরে দেখেন কোথাও ঝুল জমছে কি না, কোথাও ঘাস বড় হয়েছে কি না, কোনও বেঞ্চির পেরেক উঠে আছে কি না। ওঁর মতো এরকম আর কে করবে?

আমি নিরীহ মুখ করে বললাম, পৃথিবীতে কেউ তো অপরিহার্য নয়।

অসীমা আমার দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু লক্ষ করলাম ওর দৃষ্টি আমাকে ভেদ করে বহু দূরের এক আভাসিত রহস্যময় অন্ধকারকেই দেখছে বুঝি।

আমি জানি কথা ও নীরবতা এই দুইয়ের আনুপাতিক ও যথাযোগ্য সংমিশ্রণের দ্বারাই মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়। কেবল কথা বলে গেলেই হয় না, আবার শুধু চুপ করে থাকলেও হয় না। কখন কথা বলতে হবে এবং কখন নয় তা বোঝা চাই।

পরিস্থিতি বিচার করে আমি বুঝলাম, এখন চুপ করে থাকাটা ঠিক হবে না। তাই আমি খুব মোলায়েম গলায় বললাম, একসময়ে পণ্ডিত নেহরু যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আমরা ভাবতাম নেহরু মারা গেলে বুঝি দেশ অচল হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হয়নি। রাশিয়ায় স্ট্যালিনের পরও দেশ চলেছে, মাওকে ছাড়াও চলছে চিন।

অসীমার দৃষ্টি দূর দর্শন থেকে নিবৃত্ত হল না। তবে সে মৃদুকণ্ঠে বলল, কমলাদির জায়গায় আমি হেডমিসট্রেস হলে কেউ আমাকে পছন্দ করবে না।

কথাটা নির্মম সত্যি। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলাম। মুখটা একটু হাসি-হাসি করে বললাম, কমলাদির অবদান তো কম নয়। এতকাল তিনিই তো একচ্ছত্র আধিপত্য করেছেন। কিন্তু আমরা যেমন নেহরুর পর ইন্দিরা গাঁধীকে মেনে নিয়েছি, তেমনি তোমাকেও সবাই একদিন মেনে নেবে।

তুলনাটা অসীমাকে স্পর্শ করল না। খুব সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। সহজে ওকে প্রভাবিত করা যায় না। একটু ধরা গলায় বলল, স্কুলকে আমিও ভালবাসি। কিন্তু কমলাদি অন্যরকম। স্কুলটাই ওঁর প্রাণ। আমার তো মনে হয় চাকরি ছাড়লে উনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

আমি একটু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে বললাম, আমাদের তো কিছু করার নেই।

জানি।— বলে চুপ করে রইল অসীমা।

আমি অসীমার মনোভাব যে সঠিক বুঝি তাও নয়। কমলা সেন চাকরি ছেড়ে দিলে অসীমা হেডমিস্ট্রেস হবে, কিন্তু ওই লোভনীয় পদ ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ওকে আকর্ষণ করে না। কেন করে না তা ভেবে আমি বিস্মিত হতে পারতাম। কিন্তু আমার বিস্ময়বোধটা বিচিত্র ধরনের মানুষ দেখে দেখে লুপ্ত হয়ে গেছে। বিচিত্র, বহুমুখী ও বিটকেল চরিত্রের লোকে দুনিয়াটা

ভরা। একজন বিচিত্র মানুষের কথা আমি জানি। খুবই বিচিত্র চরিত্রের লোক। গাঁয়ের কয়েকজন কামার্ত পুরুষ একবার একজন সুন্দরী যুবতীর প্রতি লোভ করেছিল। মেয়েটা যেখানে যেত সেই পথেরই আশেপাশে ঘাপটি মেরে থাকত তারা। মেয়েটা ভ্রুক্ষেপও করত না। লোকগুলো নানা রকম ফাঁদ পেতে পেতে যখন হয়রান হয়ে পড়ল তখন সেই বিচিত্র লোকটি একদিন এসে জুটল তাদের দলে। জিজ্ঞেস করল, তোদের মতলবখানা কী বল তো? লোকগুলো কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ঠাকুর ভাই, ওই মেয়েটা যে আমাদের পাত্তাই দেয় না, তার একটা ব্যবস্থা করে দাও। তুমি তো শুনি বিস্তর লোকের হরেকরকম সমস্যার সমাধান করে বেড়াও। আমাদের এটুকু করে দাও দেখি। লোকটা বলল, এ আর কথা কী! মেয়েটা পুকুর থেকে কলসিতে জল ভরে ফিরছিল। লোকটা গিয়ে পিছন থেকে ডাক দিল, মা, ওমা! কেমন আছিস মা? মেয়েটা ওই মা ডাকে এমন উজ্জ্বল, এমন আলোকিত, এত লজ্জারুণ হয়ে উঠল যে, বহুগুণ সুন্দর দেখাল তাকে। মিষ্টি হেসে বলল, ভাল আছি বাবা, তুমিও ভাল থেকো। লোকটা একগাল হেসে কামার্ত সেই লোকগুলোর কাছে এসে বলল, দেখলি! ভারী সোজা মেয়েদের বশ করা। একবার মা যদি ডেকে ফেলতে পারিস তাহলেই কেল্লা ফতে। মেয়েটাও বশ হল, ভিতরকার শত্রুটাও বশ হল। এরপর থেকে সেই লোকটা রোজ সেই লোকগুলোকে তাড়া দিত, ডাক, মেয়েটাকে মা বলে ডাক। ডেকেই দেখ না, কী হয়। তা সেই লোকগুলো অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ডেকেই বসল, মা। আর সেই মা ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ভূতটা নেমে গেল।

বলতে কী, এইসব বিচিত্র ও বিটকেল লোককে আমি ভয় খাই। কাঁধ থেকে ভূত নামানো আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং কাঁধে কিছু কিছু ভূত সর্বদা বসে ঠ্যাং দোলাতে থাকুক। তাতে দুনিয়াটা অনেক স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী হয়। হেডমিসট্রেস হওয়ার সম্ভাবনায় অসীমার আনন্দ না হওয়াটা আমার চোখে ভূতের অভাব বলেই ঠেকল। তবু আমি বিস্মিত হলাম না। কারণ এরকম আমার দেখা আছে।

অত্যন্ত সৌহার্দ্যের গলায় আমি বললাম, কমলা সেন যতই এফিসিয়েন্ট হোক অসীমা, একটি স্কুলের হেডমিসট্রেসের পক্ষে চরিত্রটা মস্ত বড় কথা।

অসীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উঠল।

বলতে কী, আজ আমাদের প্রেমপর্বটা বেশ দীর্ঘক্ষণই চলেছে। অন্যান্য দিন এতক্ষণ আমরা প্রেম করি না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষাকালের ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। সহজে থামবে না, তাই অসীমাকে যেতে নিষেধ করে লাভ নেই। এই বৃষ্টিতে ওর তেমন কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

অসীমা ছাতা খুলে বারান্দা থেকে নামতে গিয়েও কী ভেবে ফিরে এল।

শোনো।

বলো।

আমাদের স্কুলে ম্যাথমেটিকসের ভ্যাকেনসিতে কি ক্যান্ডিডেট ঠিক হয়ে গেছে?

মোটামুটি। কেন বলো তো?

আমাকে একজন খুব ধরেছে একটা ছেলেকে ওই চাকরিটা দেওয়ার জন্য।

ছেলেটা কে?

তুমি চিনবে না। কলকাতায় থাকে।

আমরা তো ঠিকই করেছি, লোকাল ক্যানডিডেটকে প্রেফারেনস দেব।

এই ছেলেটিও লোকাল। মউডুবিতে বাড়ি।

ওর হয়ে কে তোমাকে ধরেছে?

সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গণেশবাবু। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ছেলেটা আমার কাছে এসেছিল। খুব স্মার্ট আর সিরিয়াস ছেলে।

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম। জহরবাবুর মেয়েও অঙ্কে অনার্স। গতকাল রাতে আমি একরকম ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে, জহরবাবুর মেয়েকেই এই চাকরিতে বহাল করা হবে। এখন অসীমার ক্যানডিডেট আবার গোলমাল পাকাল।

বললাম, ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিও তো একবার। দেখব। মউডুবিতে বাড়ি বলছ? কোন বাড়ির ছেলে?

অত খোঁজ নিইনি। কেন বলো তো?

এমনি। অঙ্কের পোস্টটার জন্য জহরবাবুর মেয়েও ক্যানডিডেট। বি এসসি বি এড।

জানি।

এই ছেলেটার কোয়ালিফিকেশন কী?

অঙ্কে অনার্স, তবে বি এড নয়।

তা হলে তো মুশকিল।

অসীমা একটু ধৈর্যহারা গলায় বলল, তোমাকে অত ভাবনা করতে হবে না। যদি পারো দেখো। চাকরি দিতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। ছেলেটাকে আমি ভাল করে চিনিও না। তবে একবার দেখেই বেশ ভাল লেগেছিল, এই যা। খুব স্পিরিটেড ছেলে।

আমি চুপ করে রইলাম। স্পিরিটেড ছেলেদের সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতা নেই। কোনও মানুষের বাড়তি স্পিরিট থাকলে অন্যদের ভারী মুশকিল। বাড়তি স্পিরিট যাদের থাকে তারা সর্বদাই সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ব্যাপারে অন্যদের গুঁতিয়ে ফেরে। কাছাকাছি কোনও স্পিরিটেড লোক থাকলে বরং সাধারণ মানুষের কাজকর্মের অসুবিধেই বেশি।

অসীমা চলে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ আমার চেয়ারে বসে রইলাম। বাইরে বৃষ্টির তেজ বাড়ল। হুংকার দিয়ে একটা বাতাসও বয়ে গেল সেইসঙ্গে। আরও মেঘ নিয়ে এল বুঝি। এক ঘন ছেদহীন আদিম বৃষ্টিতে ছেয়ে গেল চারধার। বৃষ্টির দুটো দিক আছে। একটা তার সৌন্দর্যের দিক, যা নিয়ে মেঘদূত বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি, অন্যদিকে বন্যা, দুর্গতি এবং তথা অর্থনীতি। আমি দ্বিতীয় দিকটা নিয়েই ভাবি। এবারের বর্ষার চেহারা তেমন ভাল নয়।

এফ সি আইকে আমার তিনটে গুদাম ভাড়া দেওয়া আছে। ম্যানেজার শুভ্রাংশু সেন আমার বন্ধু-লোক। ফুড করপোরেশনে নতুন ঢুকেছে। বৃষ্টিটার আদিম হিংস্রতা টের পেয়েই আমি তাঁকে ফোন করি।

কী করছেন সেন সাহেব?

শুভ্রাংশু কিছু একটা খাচ্ছে। পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম। ইলিশ ভাজা কি? হতে পারে। আজ বিকেলেই দুটো ইলিশ আমি নিজেই পাঠিয়েছি। দুটোর দরকার ছিল না। শুভ্রাংশুরা মোটে সাড়ে তিনজন লোক। স্বামী স্ত্রী আর একটা পাঁচ আর একটা সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা। চিবোতে চিবোতেই শুভ্রাংশু বলে, এই ঘরে বসে হাল্লাগুল্লা হচ্ছে আর কী। বৃষ্টির দিন, কিছু করার নেই।

হাল্লাগুল্লাটা কী জিনিস?

শুভ্রাংশুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বলে, এই গ্যাঞ্জাম আর কী। বাচ্চারা আর আমি মিলে মিসেসকে একটু টিজ করছিলাম।

ইলিশটা কেমন ছিল?

দারুণ! দারুণ! মিসেস ভাজছেন আর আমরা খাচ্ছি। খেতে খেতেই হাল্লাগুল্লা হচ্ছে। মিসেস আবার ইলিশের গন্ধ সইতে পারেন না। নাকে ওডিকোলোন মাখানো রুমাল চাপা দিয়ে ভাজছেন।

বলেন কী? মিসেস সেন ইলিশ পছন্দ করেন না জানতাম না তো!

চূড়ান্ত বেরসিক আর কী। ইলিশ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিউলি ফুল এসব যার ভাল না লাগে সে মানুষ নয়, পাথর।

আমি সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, চিংড়ি কেমন বাসেন উনি?
বাসেন। চিংড়িটা বাসেন। তবে সে আমরাও বাসি মশাই।
ঠিক আছে। আর একটা কথা, আপনার মিসেস কেন মাছ ভাজছেন? আপনাদের তো একজন রাঁধুনি আছে।
আছে। কিন্তু সে দেশে গেছে। আর একবার দেশে গেলে ওরা একেবারেই যায়।
খুব অসুবিধে তো তা হলে!
আর বলেন কেন? মিসেস একদম ফরটি নাইন।
আমি একটু হেসে বললাম. আমার ইটের ভাঁটি থেকে একটা কামিনকে পাঠিয়ে দেবোখন কাল।
পাঠাবেন? আঃ, বাঁচলাম।
গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, সেনসাহেব, গোডাউনে স্টক কেমন?
কেন বলুন তো! যতদূর জানি, ভালই।
এবারকার বর্ষাটা আমার ভাল লাগছে না। যদি ফ্লাড হয় তবে দু'বছর আগেকার মতো জায়গাটা ফের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। সেবার টানা কুড়ি দিন কোনও সাপলাই আসতে পারেনি।
হ্যাঁ, জানি।
এবারও যদি সেই বৃত্তান্ত হয়, তা হলে? সেবার গোডাউন লুট হয়েছিল।
শুভ্রাংশু একটু চিন্তিত গলায় বলে, আমাদের সিকিউরিটি খুব ভাল নয়। এমনিতেও খুচখাচ চুরিচামারি হচ্ছে। কী করা যায় বলুন তো!
আমি বিনীতভাবে বললাম, দেশের সব গুদাম থেকেই অল্পবিস্তর চুরি হয়, এমনকী ডিফেন্সের গুদাম থেকেও। ওটা কথা নয়। কথা হল লুট নিয়ে।
শুভ্রাংশু চিন্তিতভাবে বলে, আগের লুটটা আমার আমলে হয়নি। তখন মিস্টার রায় ছিলেন। ঘটনার ডিটেলস জানি না।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি জানি।
এখানকার লোকেরা কি একটু হোসটাইল ধরনের?
আমি হাসলাম। বললাম, সাধারণ মানুষেরা কখনওই হোসটাইল নয় সেন সাহেব। তবে তাদের হোসটাইল করে তোলা যায়। এখানে এমন কয়েকজন লোক আছে যারা কাজটা খুব সুন্দর পারে।
তারা কারা?
জানলেই বা তাদের আপনি কী করবেন?
কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না?
আমি নিরেট গলায় বললাম, না। কারণ তারা নেতা বা নেতা-স্থানীয় লোক।
ওঃ!— খুব হতাশ শোনাল শুভ্রাংশুর গলা। বলল, তা হলে অবশ্য কিছু করার নেই।
না। কিছু করার নেই সেন সাহেব। সরকারি মাল জনসাধারণ লুট করবে, এতে কার কী করার আছে? তবে ঘটনাটা যদি ঘটেই যায় তা হলে আপনাকে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে, চাকরির ক্ষেত্রেও কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে একটা দাগ থেকে যাবে। আপনি ইয়ং ম্যান।
কিন্তু কিছু করারও তো নেই। আরও ফোর্স চেয়ে পাঠাতে পারি।
তাতে লাভ হবে না।
সেটা জানি। আর কী করব?
ভাবুন সেন সাহেব, ভাবুন, দুর্যোগ আসছে। ডার্ক ডেজ আর অ্যাহেড।
শুভ্রাংশু হতাশ গলায় বলল, এঃ, সন্ধেটাই মাটি করে দিলেন মশাই। দিব্যি হাল্লাগুল্লা করছিলাম। কেন ঝামেলা মাচালেন বলুন তো?
বৃহত্তর ঝামেলা অ্যাভয়েড করার জন্য।

কিন্তু অ্যাভয়েড করব কী করে তা তো বললেন না।

অত উতলা হবেন না। অনেক 'কিন্তু' আছে। ধরুন বন্যা যদি না হয় বা নেতারা যদি ভুখা জনসাধারণকে না খ্যাপায় তা হলে ঝামেলা হবে না। আমি শুধু বৃষ্টির রকমটা দেখে আগাম আপনাকে সাবধান করে দিলাম।

এমনিতেই তো ফুড ব্যাপারটা সাংঘাতিক সেনসিটিভ। তার ওপর ফ্লাড-প্রোন এরিয়া। নাঃ, আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন, ইলিশটার কোনও টেস্ট পাচ্ছি না আর।

দোষ ইলিশের নয় সেন সাহেব। দোষ আপনার মনের। অত সহজে ঘাবড়ে যান কেন?

ঘাবড়ে যাই সাধে নয়। আমি এফ সি আই-এর লোক নই। সেনট্রাল অ্যাকাউনটসে দিব্যি দশটা-পাঁচটা নিরাপদ চাকরি করতাম। দুম করে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় সিলেকটেড হওয়ার পর ফুডে ঠেলে দিল। বিচ্ছিরি ডিপার্টমেন্ট। রোজ ঘেরাও, রোজ লেবার ট্রাবল। অফিসটা একেবারে নরক। ক্লাস ফোর স্টাফদের পর্যন্ত ধমকানো যায় না। তার ওপর যদি গুদাম লুট হয় তো সোনায় সোহাগা। আপনার কী মনে হয়, ফ্লাড কি হবেই?

বৃষ্টির ধরনটা তো সেইরকমই। দুটো নদীর জল ডেনজার লেভেলের ওপরে উঠেছে।

ফ্লাড জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই।

আমি আবেগমথিত গলায় বললাম, ফ্লাডের আপনি কী জানেন সেনসাহেব? আমার কত কী ভেসে গেছে বন্যায়। খরায় জ্বলে গেছে কত কী। তখন আমারও সব লুটপাট করতে ইচ্ছে করত। আমি, আমরা বড় গরিব ছিলাম।

জানি। আপনার মুখেই শুনেছি।

সেইজন্যই বৃষ্টি দেখলে আমার মেঘদূতের কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে, আমার হাঁপানির রুগি বাবাকে যতবার কাঁথাকানি দিয়ে ঢাকতে যাচ্ছেন মা, ততবার দেখছেন, সব ভেজা। সপসপে ভেজা। ঘরের মধ্যে অবাধ ঘোলা জল, তাতে কেঁচো, ব্যাং, ঢোঁড়া সাপ, উচ্চিংড়ে, কত কী। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি সেন সাহেব?

না, শুনছি। ভারী প্যাথেটিক।

ভীষণ। আপনার কি কখনও লুটপাট করার ইচ্ছে হয়েছে সেন সাহেব?

না, কখনও নয়।

স্বাভাবিক। আপনি তো কখনও দারিদ্র্যসীমার ওপাশে থাকেননি। ওপাশে যারা থাকে তাদের মধ্যে সর্বদাই ওরকম একটা ইচ্ছে কাজ করে। তবে ভয় পাবেন না। সাধারণত দারিদ্র্যসীমার নীচেকার মানুষেরা নিরীহ, বোকা, সংহতিহীন এবং ভিতু। দাদা বা নেতা গোছের কেউ এসে যদি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে বিশেষ একটি লক্ষ্যে চালনা করে তা হলেই বিপদ।

সে তো বটেই।— খুব পাঁশুটে গলায় শুভ্রাংশু বলে।

আমি মোলায়েম গলায় বললাম, জনসাধারণকে ভয়ের কিছু নেই সেন সাহেব, শুধু দাদা বা নেতাদের দিকে নজর রাখুন।

সেই কাজটাই কি খুব সোজা?

না। কোনও কাজই বড় সোজা নয় সেনসাহেব। আমি শুধু সাবধান করে দিচ্ছি। আর কিছু করার নেই আমার। তবে আমার আরও দুটো গুদাম আছে। যদি বিপদ বোঝেন তা হলে নতুন স্টক যা আসবে তা আমার গুদামে তুলে দেবেন।

কোনও রিস্ক নেই তো!

আমি একটু হেসে বললাম, সব কাজেই রিস্ক থাকে সেনসাহেব। তবু যদি রিস্ক অ্যাভয়েড করতে চান তা হলে না হয় আমার লোকজন আর লরি দিয়ে আমি মাল খালাস করিয়ে আনব।

আচ্ছা। ভেবে দেখি।

টেলিফোনটা আমি নামিয়ে রাখি। শুভ্রাংশুকে টেলিফোনে কথাটা বলার উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্টভাবে আমিও জানি না। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আমার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর কাজ করে যায়। সেই ক্যালকুলেটর কখনও ভুল করেছে বলে নজির নেই। আমার মন বলছে এবারও আবার এই শহরে এবং আশেপাশে বন্যা হবে। অজস্র মানুষ এসে জড়ো হবে শহরে। ভরে যাবে ইস্কুলবাড়ি, কলেজ, কাছারি, অফিস। যথারীতি রিলিফ আসবে দেরীতে। লোকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠবে পুঞ্জীভূত ক্রোধ। কেউ একজন সেই বারুদে খুব দক্ষতার সঙ্গে একটি দেশলাই কাঠির আগুন ধরিয়ে দেবে। গত বছরের আগের বছর এই কাজটি করেছিল অধর।

স্পিরিটেড বলতে যা বোঝায় অধরও অনেকটা তা-ই। কমলা সেনের সঙ্গে তার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটি বাদ দিলে তার আর কোনও রন্ধ্র বা দুর্বলতা নেই। অধরকে তাই আমি কিছুটা ভয় পাই। আমার ধারণা অধর আমাকে ছোবল দেওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছে। বন্যা হলে সে সুযোগ অধর পেয়েও যাবে। এই অঞ্চলে রিলিফের চাল ও গম সাধারণত আমাকেই সাপলাই দিতে দেওয়া হয়। মোটামুটি পাকা চুক্তি। আমার নিজস্ব দুটো গুদাম আছে শহরের এক ধারে। আমার ধারণা অধর এবার সেখানে চড়াও হবে। জনতার ঢেউয়ে ভেসে যাবে দুটো গুদাম। যাক, তাতে ক্ষতি নেই। তার আগেই আমি গুদামের মাল সরিয়ে নেব। তা বলে দরিদ্র, মূর্খ, বঞ্চিত ভারতবাসীকে হতাশও করব না আমি। তারা যদি লুট করে তো করবে। তবে লুট করবে সরকারি জিনিস যা লুট করার অসাংবিধানিক অধিকার তাদের আছে।

জানালা দিয়ে আমি আরও খানিকক্ষণ বৃষ্টি দেখলাম। চমৎকার বৃষ্টি, হিংস্র, আদিম, ভয়ংকর।

সিংহীবাবুদের এই বাড়িটা বেশ বড়সড়। এর স্থাপত্যে নানা জায়গায় বেশ কারুকাজ আছে। অবশ্য সময়ের খাজনাও দিতে হয়েছে বাড়িটাকে। মেঝে ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে কয়েকটা ঘরে। দোতলায় দুটো ঘরে জল চোঁয়ায়। আমি সেগুলো মেরামত করিনি। কারণ এই প্রকাণ্ড বাড়িটায় থাকি মাত্র আমরা দু'টি ভাইবোন এবং কয়েকজন দাসদাসী ও দুটো কুকুর, আর আছে হাঁস, মুরগি, খাঁচার পাখি ও গোটা দুই জারসি গরু। অন্যান্য বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কেউ সুখে, কেউ দুঃখে আছে। আমার দু'টি ভাই কলকাতা এবং দিল্লিতে চাকরি করে। সম্পর্ক খুব ক্ষীণ, নেই বললেই হয়।

আমার বোন রুমা যদিও আমার কাছেই থাকে তবু তার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। প্রায়ই সে কলকাতায় খোঁপা বাঁধতে বা চুল ছাঁটতে বা ফাংশন করতে চলে যায়। যতদূর জানি সে সাইকেল, স্কুটার এবং মোটরগাড়ি চালাতে পারে। স্কুলে পড়ার সময় সে জিমনাস্টিকস করত। ভাল গান গাইতে এবং নাচতেও পারত। দেখতে সে মোটামুটি ভাল, মুখশ্রী তেমন সুন্দর না হলেও ফিগার অসাধারণ। ইদানীং সে কারাটে বা ওই জাতীয় কিছু শিখছে বলে শুনেছি। অতিরিক্ত শরীরচর্চার ফলেই বোধহয় সে তেমন মস্তিষ্কের চর্চা করতে পারেনি। কম্পার্টমেন্টাল হায়ার সেকেন্ডারি টপকেই সে মোটামুটি লেখাপড়া শেষ করে। তারপর সে মন দেয় পুরুষজাতির প্রতি। বলতে নেই পুরুষজাতির মধ্যে প্রবেশ করেই রুমা একটা ঝড় তুলেছিল, তার জনপ্রিয়তায় আমিও চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং তাকে ঠারেঠোরে বোঝাতে থাকি যে, মহিলারা সাধারণত একগামিনীই হয়ে থাকে। বহুগামিনী হওয়া মেয়েদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্যাপারটা রুমাও বুঝতে পারত। তবে কোন পুরুষটি তার উপযুক্ত হবে তা বেছে বার করতে হিমশিম খাচ্ছিল সে। শাড়ির দোকানে ঢুকলে মেয়েদের যে অবস্থা হয় আর কি। কোনওটাই পছন্দ হয় না বা একসঙ্গে অনেকগুলো হয়।

গন্ধর্ব নামটা জনগণের কেমন লাগে আমি জানি না। কিন্তু এই নামের লোকদের আমি সন্দেহের চোখে দেখি। গন্ধর্ব নামটার মধ্যেই একটা ধোঁকাবাজি আছে বলে আমার ধারণা। অবশ্য এ নামের একটা লোককেই আজ অবধি আমি চিনি। রুমা অনেক বেছেগুছে এই গন্ধর্বকেই বিয়ে করেছিল।

নামটা যেমনই হোক, গন্ধর্ব ছেলেটা বোধহয় তেমন খারাপ নয়। রোগা, ফরসা ও সুদর্শন এই ছেলেটি ছিল অধ্যাপক। ছিল কেন, এখনও আছে। জাতি হিসেবে অধ্যাপকদেরও আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। দেদার ছুটি ভোগ করে করে এরা অল্প দিনেই ভীষণ কুঁড়ে হয়ে পড়ে! উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিসটা একদম হারিয়ে ফেলে। বইপোকা হওয়ার ফলে এদের অধিকাংশেরই বাস্তববুদ্ধি কিছু কম হয়ে থাকে। গন্ধর্বর মধ্যে অধ্যাপকোচিত সব অপগুণই ছিল! ফলে বিয়ের দু'বছরের মাথায় রুমা তাকে ডিভোর্স করে আমার কাছে ফিরে আসে। শোকে গন্ধর্ব মদ ধরে। মাতাল অবস্থাতেই সে একদিন আমার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, দাদা আমাকে বাঁচান। রুমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

রুমাকে আমি জানি। আমাকে সে সামান্যতমও সমীহ করে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলেই সে আমার দিকে অত্যন্ত শীতল ও কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। রুমা দাদা হিসেবে আমাকে স্বীকার করলেও মানুষ হিসেবে সে আমাকে শ্রদ্ধা করে না তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই। সম্ভবত রুমা আমার উত্থানের গোপন ইতিহাসটিও জানে। তাই রুমাকে আমি ঘাঁটাতে সাহস পাই না। গন্ধর্বর কাতর আবেদনে সাড়া দেওয়া আমাব পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আমি তাকে একটি সুপরামর্শ দিয়ে বলি, গন্ধর্ব, রুমা একটু ফিজিক সেনট্রিক। যাকে শরীর-সর্বস্ব বলা যায় আর কি। হুট করে তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছে বটে ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু আমি জানি, ওর বিয়ে করা উচিত ছিল কোনও ব্যায়ামবীরকে। যদি রুমার মন পেতে চাও তবে ব্যায়াম করতে থাকো। তোমার বয়স এমন কিছু হয়নি, এখন শুরু করলেও পারবে।

বাস্তবিকই গন্ধর্ব ব্যায়াম শুরু করে দেয়। একটা জিমনাসিয়ামে ভর্তি হয়ে সে বছর দুই একতানমনপ্রাণে শরীরচর্চা করে যেতে থাকে। ফলও পায় হাতে হাতে। দু'বছর বাদে তার ঘাড়ে গর্দানে দিব্যি পেশীবহুল স্বাস্থ্য হয়। ততদিনে অবশ্য রুমার আরও বহু গুণগ্রাহী জুটে গেছে। যে কোনওদিন সে দ্বিতীয় স্বামী নির্বাচন করে বসবে, সেইসময়ে একদিন আমারই প্ররোচনায় গন্ধর্ব এসে হাজির হয় এবং প্রায় জোর করেই রুমাকে তুলে নিয়ে যায়।

আমার ধারণা গন্ধর্বর সেই জোর খাটানোর ব্যাপারটা রুমা বেশ উপভোগ করেছিল। তাই বিশেষ চেঁচামেচি করেনি, সুড়সুড় করেই চলে গিয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় দফার বিয়েটা টিকল মাত্র বছরখানেক। গন্ধর্বকে আবার ডিভোর্স করার মামলা ঠুকে ফিরে এসে রুমা আমাকে বলল, গন্ধর্ব ভীষণ আনকালচার্ড, একটা জংলি, ব্রুট।

আমি অবাক হলেও, মুখে কিছু বলার সাহস পেলাম না।

গন্ধর্ব একদিন অপরাধী মুখ করে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দাদা, আজকাল আমার শরীরের সবরকম খিদে বেড়ে গেছে। গায়ের জোরও হয়েছে সাংঘাতিক। ফাইনার সেনসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমার এই শারীরিক তেজ রুমা ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। এবার কী করব বলুন!

আমি বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, সব কিছুরই একটা প্রোপোরশন রাখতে হয় গন্ধর্ব। শরীরটা তোমার সাংঘাতিক হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দিকগুলো ডেভেলপ করেনি। আমার অ্যাডভাইস হল, একটু-আধটু নাচ আর গান শেখো। তাতে স্ট্রেংথের সঙ্গে পেলবতা যুক্ত হবে। বজ্রের কাঠিন্যের সঙ্গে যোগ হবে ফুলের কোমলতা।

বছরখানেক যাবৎ গন্ধর্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নাচ ও গান শিখছে। কী হবে তা জানি না। তবে খবর রাখি, নাচ-গানেও গন্ধর্ব খারাপ করছে না।

আমি সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠলাম। পারতপক্ষে আমি দোতলায় আসি না। শুধু দোতলায় খাওয়ার সময় ছাড়া। এই অঞ্চলটা রুমার। আসানসোল না কোথায় যেন ফাংশন করে আজ সকালেই রুমা ফিরেছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। খবরটা পেয়েছি মাত্র।

খুব পা টিপে টিপেই আমি ওপরে উঠলাম। রুমা হয়তো বিশ্রাম-টিশ্রাম করছে। সাড়া শব্দ করা ঠিক নয়।

খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই কিন্তু রুমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা বাংলা সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে বসে বসে। আমার দিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। আমার ভিতরটা সংকুচিত হয়ে গেল হঠাৎ।

আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে খেতে বসি এবং ঘরের অন্য জিনিস দেখতে থাকি। টেবিলের দু'ধারে দু'জনে বসলেও রুমার সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব বহু যোজনের।

রুমা সশব্দে সাপ্তাহিকটা টেবিলে আছড়ে ফেলে বলল, অসহ্য!

আমি বললাম, কী?

রুমা আমার দিকে চেয়ে তেতো গলায় বলে, তুমি ধারণা করতে পারো, গন্ধর্ব ফাংশনে গান গাইছে?

আমি যথেষ্ট অবাক হয়ে বলি, তাই নাকি?

তা নয় তো কী? আসানসোলে গিয়েছি ফাংশনে। দেখি মূর্তিমান হাজির। মুখটা খুব গম্ভীর। তখনও বুঝতে পারিনি। ফাংশনের শুরুতেই দু'-একজন আর্টিস্টের পর শুনি গন্ধর্বর নাম অ্যানাউনস করা হচ্ছে।

আমি সাগ্রহে বলি, তারপর?

তারপর আর কী শুনতে চাও? দেখি দিব্যি এসে স্টেজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে লাগল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, কেমন গাইছে?

রুমা কটকট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানি না।

রাগ করছিস কেন? কেমন গাইল?

রুমা একটা হাই তুলে ক্লান্তিসূচক দু'-একটা শব্দ করে বলল, খুব খারাপ গাইছিল না। কিন্তু হঠাৎ ও গান ধরল কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।

হুঁঃ!— বলে রুমা টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল।

৪। অভিজিৎ

রিকশায় ফিরতে ফিরতে গণেশকাকা আমাকে স্তোকবাক্য শোনাচ্ছিলেন, ইস্কুলে একটা গণ্ডগোল চলছে। পুরনো হেডমিসট্রেস নাকি রিজাইন করবে। যদি করে তবে হেডমিসট্রেস হবেন অসীমা দিদিমণি। চাকরিটা তোরই হবে। পারিজাতবাবু হচ্ছেন অসীমা দিদিমণির হাতের মুঠোর লোক। ওঁর সঙ্গে বিয়ে কিনা।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, অসীমা দিদিমণির বিয়ে নাকি?

হ্যাঁ। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলাম। অসীমা দিদিমণি দেখতে ভাল নয়, বড্ড রোগাও। বিয়ের ব্যাপারে সেটা হয়তো কোনও বাধা হবে না। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখে যে গভীর বিষণ্ণতা সেটা ওর হবু স্বামী সহ্য করবে কী করে!

আমি গণেশকাকাকে বললাম, চাকরি হলে হল, আপনি বেশি ধরাধরি করতে যাবেন না।

গণেশকাকার এই দোষটা আছে। দোকানদারি করে করে কেমন যেন আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। সকলের সঙ্গেই বড্ড বেশি হাত কচলে কথা বলেন। সরকারি অফিসার-টফিসারদের একেবারে দেবতার মতো খাতির দেন। এতটা বিনয় ব্যক্তিত্বহীনতারই

নামান্তর। আর এত সব তেল-টেল দিয়ে চাকরি পেতেও আমার ঘেন্না করে।

গণেশকাকা বললেন, আরে যুগটাই তো পড়েছে ওরকম। ধরাধরি না করলে কি কিছু হয়? ধরাধরি, ঘুষ এসবই তো আজকাল আইন হয়ে গেছে।

আমি সন্দিহান হয়ে বললাম, ঘুষও দিচ্ছেন নাকি?

গণেশকাকা অপ্রতিভ হেসে বললেন, আরে না, না। ঘুষ দিতে হয়নি। মাঝে মাঝে একটু দই কি মিষ্টি দিয়ে পয়সা নিইনি আর কি।

কবে দিয়েছেন?

গণেশকাকার একটা সুবিধে, কথা চেপে রাখতে পারেন না। খুব লজ্জা পেয়ে মাথাটাথা চুলকে বললেন, গতকালই দু'সের দই আর পঁচিশটা রসগোল্লা পাঠিয়েছিলাম।

অসীমাদি নিলেন?

নিয়েছে। তবে বলেছে দাম নিতে হবে। তা সে দেখা যাবেখন। তোর চাকরিটা যদি হয়ে যায় তো ওটুকু খরচ কি আর গায়ে লাগবে?

আমি একটু হেসে বললাম, আমাকে এখানে চাকরিতে ঢুকিয়ে আপনার লাভ কী?

গণেশকাকা এ কথার জবাব দিলেন না। বললেন, পারিজাতবাবুকে হাত করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু লোকটা মহা ধুরন্ধর।

আমি আর কথা বললাম না। দোকানে নেমে সাইকেলটা নিয়ে শহরে চক্কর দিতে বেরিয়ে পড়লাম। গণেশকাকা মিষ্টি খেয়ে যেতে বললেন। খেলাম না।

এ শহর আমার অনেক দিনের চেনা। রাস্তাগুলো সরু এবং ভাঙা। মলিন ও জীর্ণ সব বাড়িঘর। কোথাও বেশ ঘন কচুবন, আগাছা বা জঙ্গল। সরকারি দফতর কয়েকটা হয়েছে বটে, আর কিছু সরকারি কোয়ার্টার। আর তেমন কোনও উন্নতি বা পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যদি চাকরি পাই তা হলে এই শহরে এসে চাকরি করতে আমার কেমন লাগবে? কেমন লাগবে মউডুবিতে দাদুর কাছে থাকতে? বোধহয় খুব ভাল লাগবে না।

শহর ছাড়িয়ে আমি গাঁয়ের পথ ধরলাম। জলভারনত মেঘ গুমগুম করছে। চড়াৎ চড়াৎ করে আকাশ ঝলসে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। আমি সাইকেলের স্পিড বাড়িয়ে দিলাম। বহুকাল সাইকেল চালিয়ে অভ্যাস নেই। রাস্তাও খারাপ। পায়ের ডিম আর কুঁচকিতে টান লাগছে। তবু বৃষ্টিকে হারিয়ে পৌঁছে গেলাম বাড়িতে। আমি দাওয়ায় উঠতে না উঠতেই ঝপাং করে নেমে এল বিস্ফোরিত মেঘ থেকে জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি।

দাদু দরজা খুলে দিলেন মুখে বিরক্তি নিয়ে।

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এখানে কেরোসিন পাওয়া যায় না। বাতিটাতি বেশি জ্বেলো না। রাতেও কি ও-বাড়ি খাবে?

আমি সামান্য একটু ভিজেছি। রুমালে মাথা মুছতে মুছতে বললাম, এখন তো সবে সন্ধে। দেখা যাক।

পারুলের মা এসেছিল। বলে গেল তুমি এলেই যেন পাঠিয়ে দিই।

আচ্ছা। দুপুরে একটু ঘুম হয়েছে?

আমার? না, আমার আর ঘুম কই?

জামাকাপড় পাল্টে আমি চৌকিতে বসি। টিনের চালে বৃষ্টির কান ঝালাপালা শব্দ। এক সময়ে হয়তো এই শব্দ আমার প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন নেই। এখন ভয় করে। মনে হয়, বুঝি সব ভেঙে পড়ে যাবে।

একটু চায়ের জন্য ভিতরটা আঁকুপাঁকু করছে। কিন্তু দাদুর চায়ের কোনও পাট নেই। পারুলদের বাড়ি গেলে হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিতে বেরোলেই ভিজে যাব।

চুপচাপ শুয়ে চোখ বুজে রইলাম। চোখ বুজতেই অসীমা দিদিমণির মুখটা মনে পড়ল। কীসের এত দুঃখ ভদ্রমহিলার? যে লোকটা ওকে বিয়ে করবে সেই পারিজাতই বা কেমন লোক? শুনেছি, লোকটার মেলা টাকা, অনেক ক্ষমতা! সে কেন একে বিয়ে করতে চায়?

হঠাৎ চড়াক করে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের ভিটে কিনতে যে লোকটা এসেছিল সে না পারিজাতবাবুরই লোক!

আমি উঠে দাদুর ঘরে গেলাম।

দাদু একটা কাঁথা চাপা দিয়ে বসে আছেন। ঘরটা অন্ধকার। একটা সরু মোম জ্বলছে কুলুঙ্গিতে। সেই আলোয় দাদু একটা কাগজের পুরিয়া খুলে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন মন দিয়ে।

আচ্ছা দাদু, এই জমিটা যে কিনতে চায় তার নাম পারিজাত না?

হ্যাঁ। কেন?

লোকটা শিবপ্রসাদ স্কুলের সেক্রেটারি।

তা হবে।

সেই স্কুলেই আমার চাকরি হওয়ার কথা চলছে।

দাদু তার পুরিয়া থেকে চোখ না তুলেই বলেন, তাই নাকি? চাকরি কি হয়ে গেছে?

না, কথা চলছে।

দাদু পুরিয়াটার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, আগের দিনে আর কোনও চাকরি না হোক মাস্টারিটা পাওয়া যেত। আজকাল শুনি, মাস্টারি পেতেও নাকি অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

তুমি কি জমিটা ওকে বেচবে বলে কথা দিয়েছ?

না। তুমিই তো বিকেলে বলে গেলে, এখানে থেকে মাস্টারি করতে তোমার সুবিধে হবে।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলি, বলেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না যে, পারিজাতবাবুই সেক্রেটারি।

দাদু পুরিয়া থেকে চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাতে তফাতটা কী হল?

ভাবছিলাম পারিজাতবাবুর সঙ্গে একটা ডিল করা যায় কি না।

কীসের ডিল?

ধরো যদি বলা যায় যে, জমিটা তুমি ওঁকেই বেচবে যদি চাকরিটা আমার হয়।

দাদুর চোখে মোমবাতির আলোতেও সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলাম। বললেন, তাতে আমার লাভ কী? তোমাকে চাকরি দিলে ও কি বাজার-দরে জমি কিনবে ভেবেছ? এক মোচড়ে দাম অর্ধেকে নামিয়ে দেবে।

তা বটে।— আমি হতাশ গলায় বলি।

পারিজাতকে তুমি চেনো না। বরং কাউকে মুরুব্বি ধরো।

ধরাধরি করতে পারব না। তার চেয়ে বিজনেস ডিল করা অনেক সম্মানজনক।

মাইনে কত দেবে খোঁজ করেছ?

না। তবে আজকাল মাস্টারির মাইনে খারাপ নয়।

কত শুনি।

সাত-আটশো হবে।

দাদু চোখ কপালে তুলে বলেন, বলো কী! মাস্টাররা তো তা হলে জাতে উঠে গেছে।

তা উঠেছে। কিন্তু টাকার দাম পড়ে গেছে দাদু।

দাদু একটু চুপ করে থেকে গালের হরতুকি মাড়িতে চিবোলেন। লালায় অনেকক্ষণ ভিজে হরতুকিটার এতক্ষণে কাদার মতো নরম হয়ে যাওয়ার কথা। চিবোতে চিবোতে বললেন, জমি বেচলে তোমার চাকরি হবে। এ বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা। চাকরি না হয় হল, কিন্তু আমি থাকব কোথায়?

বাসা ভাড়া নেব।

ফের ভাড়া বাসা? জন্মে ভাড়াটে থাকিনি বাপু, এই শেষ বয়সে পারব না।

ওরা তো বলেছে, আপনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন ঘরটুকু আর কুয়োতলা নেবে না।

সেটা কথার কথা। একবার রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে তখন কে কার কড়ি ধারে? লোক-লস্কর নিয়ে এসে পাঁজাকোলা করে তুলে বের করে দিলেই বা মারে কে?

লোকটা কি খারাপ নাকি?

ভাল লোক আর কোথায় পাবে একালে? সব পাজি!

আমি একটু দমে গেলাম। বললাম, চাকরি একটা আমার দরকার দাদু। বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ।

খারাপ তো হবেই। পেটের ভাতের যোগাড় রেখে তার পরই বাবুগিরি করতে তোমাদের কলকাতায় যাওয়া উচিত ছিল। তা তো করলে না। আমি একা মানুষ, জমি-জিরেত সামলাতে পারলাম না। লোকবল থাকলে আজ খেতের ধান কটা গোলায় তোলা যেত।

পুরনো তর্ক। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে একসময়ে আমি একটা উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে একটা জিনিস শিখেছি। ভূমির সঙ্গে, কর্ষণের সঙ্গে যে মানুষের গভীর সংযোগ নেই সে কখনও দেশকে ভালবাসতে পারে না।

মউডুবিকে এখন আর গ্রাম বলা ঠিক হবে না। শহরের কাছ-ঘেঁষা গঞ্জ। কিন্তু আমি এমন এমন লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম দেখেছি যেখানে পানীয় জল নেই, ডাক্তার ওষুধ হেলথ সেন্টার নেই, রাস্তা নেই, খাবার নেই। কিছু লোক ধুঁকছে আর ধুঁকছে। অথচ, গোটা দেশটারই শক্তির উৎস ওই গ্রাম, ওইসব কৃষিক্ষেত্র ও গোচারণভূমি। কিন্তু এই আজব রাজনীতির দেশের শাসকরা যে ডালে বসে আছে সেই ডালটিই বে-খেয়ালে কেটে ফেলছে।

আমি আর দেশোদ্ধারের কথা ভাবি না। এখন আমার সম্মানজনক শর্তে একটা চাকরি চাই।

কড়ে আঙুলের চেয়েও সরু এবং মাত্র দু'আঙুল লম্বা একটা মোম আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, জ্বেলে নাও গে। বর্ষার দিন, পোকামাকড় ঘরে ঢোকে। একটু দেখেশুনে নিয়ো ঘরখানা। কেউ থাকেও না, সাপখোপ বাসা করেছে কি না তাই বা কে জানে!

ঘরে এসে মোমটা না জ্বালিয়ে আমি অন্ধকারেই বসে রইলাম। বাইরের মাঠে জল জমে গেছে, বৃষ্টির শব্দ থেকেই বুঝতে পারছি। প্রবল স্বরে ব্যাং ডাকছে। রাত সাড়ে ন'টার দিকে বৃষ্টি থেমে গেল এবং গণেশকাকা লণ্ঠন হাতে আমাকে নিতে এলেন।

চল, তোর মাসি ভাত নিয়ে বসে আছে।

আমি একটু রাগ করে বললাম, রোজ কি দু'বেলাই ও-বাড়ি পাত পাড়তে হবে নাকি?

সে তোর মাসির সঙ্গে বোঝ গিয়ে।

জল ভেঙে ছপ ছপ করে হাঁটতে হাঁটতে গণেশকাকা মৃদু স্বরে বললেন, একটা খবর আছে।

কী খবর?

দোকান থেকে আসবার সময় অসীমা দিদিমণির বাড়ি হয়ে এলাম।

আবার গেলেন কেন?

সন্ধেবেলায় যে দু'জনে কথা হয় রোজ।

কাদের কথা হয়?

অসীমা দিদিমণি আর পারিজাতবাবুর।

ও। আমাকে নিয়েও কথা হয়েছে নাকি?

হয়েছে। তবে জহরবাবুর মেয়ে প্রতিমাও ওই পোস্টের একজন ক্যানডিডেট। প্রতিমাকেই প্রায় সিলেক্ট করে রেখেছিলেন পারিজাতবাবু। অসীমা দিদিমণি তোর কথা বলাতে উনি ভেবে দেখবেন বলেছেন।

তা হলে ভেবে দেখতে থাকুন।

তোকে কাল একবার পারিজাতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

জহরবাবু কে?

তুই চিনবি না।

খুব নিড়ি লোক নাকি?

নিড়ি কে নয় এই বাজারে? যার লাখ টাকা আছে সেও ঘ্যান ঘ্যান করে।

জহরবাবু কি সে ধরনের লোক?

তা বলছি না। ছা-পোষা লোকই। সামান্য মাস-মাইনে, গোটা চারেক মেয়ে।

তা হলে তো মেয়ের চাকরিটা ওঁর দরকার।

তা বটে, তবে তোর দরকার আরও বেশি।

সেও ঠিক কথা। তবু আমি বলব, জহববাবুর মেয়ের চাকরি হওয়াটা যদি বেশি দরকার বলে মনে করেন তবে আমি সরে দাঁড়াব।

তোকে বেশি পাকামি করতে হবে না তো।

আমি চুপ করে গেলাম।

সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। সকালবেলাটাও মেঘলা, ম্লান, নিস্তেজ। তবে বৃষ্টি নেই। জলকাদায় রাস্তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। সেই অদৃশ্য রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে শহরে চলেছি। পদে পদে সাইকেল গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠছে। হ্যান্ডেল বেঁকে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। কয়েক জায়গায় রাস্তার ওপর দিয়ে তোড়ে বয়ে যাচ্ছে জল। এত জল কোথা থেকে আসছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। রাস্তার দু'দিকে মাটি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। জলে জলময়।

বড় একটা গর্তে পড়ে সাইকেল কাত হয়ে গেল। ঝপ করে আমার পা পড়ল হাঁটুভর ঘোলা জলে। উঁচু রাস্তা আর দূরে নয়। জলে সাইকেল চালানোর ঝুঁকি না নিয়ে আমি সাইকেল ঠেলে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে পড়লাম। দরমার বেড়ওয়ালা দোকানগুলো খুব অল্পই আজ খুলেছে। অন্তত দুটো দোকান মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিছু লোক পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে জড়ো হয়েছে বড় রাস্তার ওপর। দূরে আরও কিছু লোককে জল ভেঙে মাঠের ওপর দিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। তাদের মাথায় বাক্স-প্যাঁটরা।

বৃষ্টিটা এবার বেশ জোরালো। আমাদের উঠোন কাল রাত থেকেই জলে ডুবে আছে। সামনের বাগানটুকুতেও ঘাস দেখা যাচ্ছে না।

গণেশকাকার দোকানে পৌঁছোতেই উনি বললেন, দিদিমণির আজ শরীরটা ভাল নেই। খবর পাঠিয়েছেন। তুই একা গিয়ে পারিজাতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবি না?

আমি একটু হেসে বললাম, পারব না কেন? লোকটা তো আর বাঘ ভাল্লুক নয়।

গণেশকাকা একটা ভাঁজকরা কাগজ পকেট থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই হাতচিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন অসীমা দিদিমণি। এটা নিয়ে পারিজাতবাবুর হাতে দিস। সিংহীবাবুদের বাড়ি, চিনিস তো?

চিনি। ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যাস।

সিংহীবাবুদের বাড়ি আমি শুধু চিনিই নয়, ও-বাড়ির একটি ছেলে সুশীলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। পুরো সামন্ততান্ত্রিক পরিবার। এক সময়ে খুবই বড় অবস্থা ছিল। আমরা জ্ঞানবয়সে যখন সিংহীবাবুদের বাগানে ফল পাড়তে যেতাম তখনই টের পেতাম ওদের অবস্থা পড়তির দিকে। বাড়িতে কলি ফেরানো হয় না, বাগানের শ্রীছাঁদ নেই, চাকর-বাকরের সংখ্যা কমে আসছে এবং সিংহীবাড়ির বাবুরা রিক্সা-টিক্সাতেও চড়ছে। আগে ওদের গাড়িটাড়ি ছিল। মস্ত এই বাড়িটার

মেরামত এবং রক্ষার খরচ ওরা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। সামন্তদের হটিয়ে অর্থনীতি নিজেদের হাতে নিতে তখন এগিয়ে আসছে নয়া পুঁজিপতিরা। এরা ব্যবসায়ী, ঠিকাদার বা ছোটখাটো শিল্পপতি। সামন্তরা সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধরনটা বুঝতে পারেনি। আলস্য, আত্মসুখ ও পরিবেশ-উদাসীন হওয়ায় তাদের পতন অনিবার্য ছিলই। একদল শোষণকারীর হাত থেকে অর্থনীতি গেল অন্য একদল শোষণকারীর হাতে।

সিংহীবাবুদের বাড়ি এখন পারিজাতবাবু কিনে নিয়েছে। নেওয়াটাই স্বাভাবিক। যতদূর জানি পারিজাতবাবু নয়া ধনতন্ত্রের শরিক। তিনি সিংহী ম্যানসন কেনায় বোধহয় সিংহীবাবুরাও বেঁচেছে। অতবড় জগদ্দল বাড়িটা ছিল তাদের বুকে জগদ্দল এক ভারের মতো।

আমি আশা করেছিলাম নয়া ধনতন্ত্রের এই প্রতিনিধি সিংহীবাড়িকে আবার নতুন করে ঘষে মেজে চকচকে করে তুলেছেন। কিন্তু তা নয়। অবাক হয়ে দেখি বাড়িটা যেমন ছিল তেমনই আছে। বাগান আগাছায় ভর্তি। বাড়ির কলি ফেরানো হয়নি। ফাটা ভাঙা অংশগুলি যেমনকে তেমন রয়ে গেছে। ফটক হাঁ হাঁ করছে খোলা।

ভিতরে মোরামের রাস্তায় পড়তেই ভিতর থেকে দুটো অভিজাত কুকুরের গমগমে ডাক শুনতে পেলাম। একটু ভয় হল, ছাড়া নেই তো কুকুর দুটো?

রাস্তার ওপরে এসে পড়েছে কাঞ্চন গাছের শাখাপ্রশাখা। সাদা ফুলে ঝেঁপে আছে গাছটা। রাস্তার দু'ধারে ফুলের কিছু গাছ নজরে পড়ল। ফটক খোলা, গরু ছাগল ঢুকে খেয়ে যেতে পারে তো! নাকি বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে গরু ছাগলও ভয় পায় আজকাল?

গাড়িবারান্দার তলায় সাইকেল থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলাম। কেউ কোথাও নেই। কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না। শুধু ভিতরবাড়িতে কুকুরের গমগমে গলা আর একবার শোনা গেল।

বড়লোকদের মুখোমুখি হতে আমার কোনও অস্বস্তি কাজ করে না। কারণ আমি এ দেশের বড়লোকদের আকণ্ঠ ঘৃণা করি। একটু নেড়েচেড়ে দেখার জন্য পারিজাতবাবু যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন এতে আমি মজাই পাচ্ছি। আমি ওর সামনে অবশ্যই ভাল মানুষ সেজে থাকব এবং শিক্ষকোচিত 'গুডি গুডি" আচরণ করব। কিন্তু লোকটা জানবেও না, আমাকে চাকরি দেওয়া মানে নিজের চেয়ারের নীচে একটি টাইম বোমা স্থাপন করা। চাকরি পেলে আমি ধৈর্য ধরে কনফার্মেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর তারপর আমার যাবতীয় শানানো ঘৃণা ও আক্রোশ নানা আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদি হয়ে ফেটে পড়বে। শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে গণ্ডগোল চলছে, আমি জানি। কীরকম গণ্ডগোল তা জানি না। আর গণেশকাকার কাছে শুনেছি, পারিজাত লোক ভাল নয়। দাদুও সেই কথাই বলেন। সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা মোটামুটি ঠিকই হয়ে গেছে।

সদর দরজায় খানিকক্ষণ কড়া নাড়লাম। দরজা হাট করে খোলা, কিন্তু লোক নেই। আহাম্মকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বাগানের দক্ষিণ দিকে একটা দোলনা ছিল। লোহার স্ট্যান্ডে লাগানো শেকলের দোলনা। ছেলেবেলায় অনেক চড়েছি সেটায়। এখন আর দোলনাটা নেই। পাথরে তৈরি একটা ছোট্ট ফোয়ারা ছিল গাড়ি-বারান্দার সামনেই। সেটা আছে বটে, কিন্তু লতানো গাছে এমন ঢেকে গেছে যে, বোঝাই যায় না। উত্তর দিকে একটা কাশীর পেয়ারাগাছ ছিল। কিন্তু বারান্দা থেকে বোঝা গেল না, গাছটা আছে কি নেই। কারণ ওদিকটায় আরও বড় বড় গাছ কয়েকটা হয়েছে।

বুরবকের মতো খানিকক্ষণ হাঁ করে এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ পিছনে একটা মৃদু চটির শব্দে মুখ ঘোরালাম। খুব চমকিলি চেহারার একটা মেয়ে। বেশ চটক আছে চেহারায়, যেমনটা বড়লোকদের থাকেই। জন্মগত চেহারা তেমন দেখনসই না হলেও বড়লোকের মেয়েরা সেটাকেই মেজে ঘসে কতটা সুন্দর করে তুলতে পারে।

মেয়েটা আমার দিকে খুব ভ্রু কুঁচকে এবং অবহেলার দৃষ্টিতে তাকাল বলে আমার মনে হল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। বারান্দা পর্যন্ত এলও না মেয়েটা। বাইরের হলঘর থেকে ডানহাতি আর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি একটু বেশি সকালে পৌঁছে গেছি। আর একটু পরে আসাই বোধহয় উচিত ছিল। কিন্তু এরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও আমার ভাল লাগার কথা নয়।

আমি সোজা হলঘরে ঢুকে পড়লাম এবং মেয়েটা যে ঘরে ঢুকেছে সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, শুনছেন?

মেয়েটা একটা ডেসকের ড্রয়ার খুলে নিচু হয়ে কিছু একটা দেখছিল। সেই অবস্থাতেই আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দাদা এখনও ফেরেনি। বারান্দায় বেঞ্চ আছে, অপেক্ষা করুন।

আমার একটু রাগ হল। তা গরিবদের তো চট করে রাগ হয়েই থাকে। সেটা চাপা দিয়ে বললাম, উনি কোথায় গেছেন?

মর্নিং ওয়াক করতে।

কখন ফিরবেন তার কি কোনও ঠিক নেই?

আমি অত জানি না। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মেয়েটার কথাবার্তা অভদ্র, আচরণে অহংকার। আমি বললাম, দারোয়ানকে তো দেখলাম না।

আছে। খুঁজে দেখুন।

মেয়েটা যা খুঁজছিল তা বোধহয় পেয়ে গেল। সটান এগিয়ে এসে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটা বেশ সুগন্ধ পেলাম তার গা থেকে। নাভির নীচে পরা শাড়ি, খুব সংক্ষিপ্ত ব্লাউজে মেয়েটিকে বেশ দেখাল। আমাকে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল বটে, কিন্তু বউনিটা খুব খারাপ হয়েছে বলে মনে হল না আমার। সকালবেলাতেই একটা সুন্দর মুখ বা একটা সুন্দর ফিগার দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

ভিতরে ভিতরে সবসময়ে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে বলেই বোধহয় আমি আজকাল মেয়েদের নিয়ে বেশি কল্পনা করি না। পারুলের সঙ্গে একটা প্রেম-ট্রেম ঘটেনি আমার। প্রেম-ট্রেম করেও তো লাভ নেই। বেকার মানুষ, বাড়িতে হাঁড়ির হাল, সুতরাং একটা মেয়েকে তুলে আনলে তাকেও কষ্ট দেওয়া, নিজেরাও কষ্ট পাওয়া। তবে প্রেম না করলেও কোনও মেয়ে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে আজও মন খিচড়ে যায়। বহুদিন বাদে এই মেয়েটা আমার মনে একটা খিচ ধরাল। তবু বউনিটা খারাপ হয়নি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িবারান্দার তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অগত্যা আমার সাইকেলের বেলটা ক্রিং ক্রিং করে বাজাতে লাগলাম। এভাবে যদি খানিকটা ডিসটার্ব করা যায় এদের এবং নিজের উপস্থিতির জানান দেওয়া যায়।

কাজ হল। সিংহীদের বাগানে কয়েকটা কুঞ্জবন আছে। তার ভিতরে লোহার বেঞ্চি পাতা। বড়লোকদের কত খেয়ালই না থাকে। এরকমই একটা কুঞ্জবন থেকে হঠাৎ খাকি পোশাক পরা একটা লোক বেরিয়ে আমার দিকে আসতে লাগল।

লোকটা দারোয়ান সন্দেহ নেই। বুঝলাম, পারিজাতবাবুর বাগানে গোরু ছাগল ঢোকে না কেন। প্রকাশ্যে দারোয়ান না থাকলেও আড়ালে বসে নজরদারি করার লোক ঠিকই আছে।

লোকটা আমার কাছে এসে বলল, কাকে চাইছেন?

পারিজাতবাবু কোথায়?

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, উনি এখন জগিং করছেন। আপনি একটু পরে আসুন।

কখন আসবেন তার কিছু ঠিক আছে?

উনি বাগানেই জগিং করছেন।

এই বাগানেই?
হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখা হবে না।
দারোয়ানরা যদিও আমার প্রায় সমশ্রেণির লোক তবু কেন জানি এই শ্রেণিটাকে আমি পছন্দ করি না। দারোয়ান মানেই তো বড়লোকের ধনমানের প্রহরী। তার মানে কর্তাভজা। মালিক হাসলে এরাও হাসে, মালিক গম্ভীর হলে এদের মন খারাপ হয়ে যায়।
আমি নির্বিকার মুখে বললাম, উনি আমার আত্মীয়।
লোকটা খুব ইমপ্রেসড হল না। বড়লোকদের গরিব আত্মীয় থাকতেই পারে, কিন্তু তাদের বেশি লাই দেওয়ার নিয়ম নেই। আমার আকার এবং প্রকার লোকটার পছন্দও হচ্ছিল না। বলল, অপেক্ষা করুন। উনি এসে যাবেন।
লোকটা আবার কুঞ্জবনে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল।
সিংহীদের বাগানটা বিরাট। হেসেখেলে বিঘা চারেক জমি হবে। আমি পায়ে পায়ে ঘাসজমি ধরে হাঁটতে লাগলাম।
প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল, সিংহীদের বাগান বা বাড়ির কোনওরকম সংস্কারই বুঝি পারিজাতবাবু করেননি। কিন্তু তা ঠিক নয়। অন্তত একটা সংস্কার তিনি করেছেন। সংস্কার কিংবা সংযোজন। বাগানের চারধারে পাঁচিল ঘেঁষে একটা সরু মোরামের রাস্তা তিনি বানিয়েছেন। সম্ভবত জগিং করার জন্যই।
ধৈর্য ধরে সেই মোরামের রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই লোকটাকে দেখা গেল। পিছনের পুকুরের ধারে কলাঝোপের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে লোকটা এগিয়ে আসছিল। সাদা হাঁফ প্যান্ট আর তোয়ালের গেঞ্জি পরা, পায়ে কেডস। বেশ পাকানো শক্ত চেহারা। সন্দেহ নেই লোকটা স্বাস্থ্য-সচেতন। তা হবে নাই বা কেন? দেদার টাকা, দেদার ভোগ্যবস্তু, দেদার স্তাবক। এত সব ভোগ করতে হলে স্বাস্থ্য তো চাই-ই।
লোকটা কাছাকাছি আসতেই আমি মোরামের রাস্তায় উঠে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথ আটকালাম।
কিন্তু লোকটা ভারী একগুঁয়ে। দাড়িয়াবান্দা খেলার খেলুড়ির মতো সাঁ করে আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল এবং হাঁফধরা গলায় চেঁচাল, চলে আসুন। রান বয়, রান।
বুঝলাম এই স্বাস্থ্য-পাগল, দৌড়-মাতাল লোকটাকে নাগালে পেতে হলে ওটাই একমাত্র উপায়। কী যেন হয়ে গেল আমার মধ্যে। বোধহয় সেটা সাময়িক পাগলামিই। আমি লোকটার পিছু পিছু দৌড়তে লাগলাম।
অবশ্য জগিং জিনিসটা ঠিক দৌড় নয়। দৌড় এবং হাঁটার মাঝামাঝি। দৌড়-পায়ে হাঁটা আর কি।
লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম?
অভিজিৎ গাঙ্গুলি।
কী দরকার?
ইস্কুলের অঙ্কের ভেকেন্সিটার জন্য অসীমা দিদিমণি আমাকে পাঠিয়েছেন।
ও হোঃ, তুমিই অসীমার লোক তা হলে?
হ্যাঁ।
অসীমা বলেছিল আমাকে। মাস্টারি করতে চাও কেন?
চাকরি দরকার তাই।
এই অল্প বয়সে মাস্টারি করতে ভাল লাগবে?
আর কী করব?
মাস্টারির চাকরিতে অ্যাডভেঞ্চার নেই, থ্রিল নেই, টাকা নেই।
জানি।

অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না?
আর কী?
বিপ্লব করো, তছনছ করো, ওলটপালট করে দাও সব কিছু।
স্কোপ নেই। পুলিশে ধরবে।
ধরুক না। সেটাও তো একটা অভিজ্ঞতা।
আমার বাড়িতে বড় অভাব।
কীরকম অভাব?
খুব অভাব।
ভাতের বদলে কখনও আটাগোলা খেয়েছ?
না তো?
ঘাস খেয়েছ কখনও?
না।
মেটে আলু খেতে কীরকম হয় জানো?
না।
কাপড় নেই বলে কোনওদিন গায়ে মাদুর জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছে?
না।
খড়ের বিছানায় শুয়েছ কখনও?
না।
তা হলে কেমন অভাব তোমাদের?
এ ছাড়াও তো অভাব আছে।
তুমি দারিদ্র্যের স্বরূপই এখনও দেখোনি।
আপনি দেখেছেন?

আমি দারিদ্র্যসীমার ওপারের লোক। একেবারের শেকড়ের কাছাকাছি থেকে উঠে আসতে হয়েছে। বড় কষ্ট।

আপনি হাঁফাচ্ছেন। এবার থামুন।
আরও দু' রাউন্ড। তারপর থামব। ভেবো না আমি হাঁফিয়ে পড়েছি।
কিন্তু আপনি তো হাঁফাচ্ছেন।
ওটা কিছু নয়। দৌড়োতে তোমার কেমন লাগে?
ভাল নয়। আমি বহুকাল দৌড়োইনি।
আর আমি চিরটাকাল কেবল দৌড়োচ্ছি।
তাই নাকি? দৌড়োচ্ছেন কেন?
দৌড়ে আসলে পালাচ্ছি।
আমি অবাক হয়ে বললাম, পালাচ্ছেন কেন?

পালাচ্ছি দারিদ্র্য থেকে, ক্ষুদ্রতা থেকে। রানিং বিয়ন্ড টাইম, বিয়ন্ড পভারটি, বিয়ন্ড এভরিবডি এল্‌স। বুঝলে?

না, ভাল বুঝলাম না।
তুমি যথেষ্ট গরিব নও। যথার্থ গরিবও নও। হলে বুঝতে।
পালানোই কি গরিবের ধর্ম?

গরিবদের কোনও ধর্ম নেই, কোনও নিয়ম নেই। কেউ পালায়, কেউ নেতিয়ে পড়ে থাকে, কেউ রুখে উঠতে চায়।

সুন্দর একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় এসে পড়ি আমরা। বন্য একটি গোলাপ গাছের ডাল আমার জামা টেনে ধরে এবং ছেড়ে দেয়। লোকটাকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার একটা লোভ সংবরণ করে আমি বললাম, আপনি কি পলাতক?

লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে আর একবার আমাকে দেখে বলল, সামনে একটা নালা আছে। সাবধান।

নালাটা আমরা দু'জনেই সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করার পর লোকটা বলে, আমি দৌড়োতে ভালবাসি। ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে, দৌড়োতে দৌড়োতে নিজেকেও ছাড়িয়ে যাই। বুঝলে?

না। এসব বোধহয় দার্শনিক কথাবার্তা!

লোকটা উদাস গলায় বলল, তা বলতে পারো। দার্শনিকতা তোমার ভাল লাগে না?

লাগে। তবে উদ্ভট দার্শনিকতা নয়।

উদ্ভট হবে কেন? বরং খুব সাধারণ দার্শনিকতা।

কীরকম?

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মানে গ্রেট সাকসেসেস অ্যান্ড গ্রেটার সাকসেসেস। নিজের যতটা সামর্থ্য আছে বলে তুমি ভাবো তার চেয়েও ঢের বেশি সামর্থ্য অর্জন করতে থাকাই হচ্ছে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

আমি খুব সাবধানে একটা ফুলগাছের কাঁটাওলা ডাল এড়িয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বললাম, তাও বুঝলাম না।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল। হাঁফাতে হাঁফাতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া খুব শক্ত কাজ। কেননা হাঁফানোর সময় সবক'টা শ্বাসই দীর্ঘ হতে বাধ্য। কিন্তু লোকটা তার মধ্যেও একটা দীর্ঘতর শ্বাসের শব্দ কী করে বের করল সেইটেই রহস্য।

আমরা একটা পুকুরের ধার ধরে দৌড়োচ্ছি। চমৎকার কচুবন। মেলা ঢেঁকিশাক হয়ে আছে। জলের কাছ ঘেঁষে কলমির জঙ্গল। জলে শাপলাফুল। বাঁধানো ঘাট শ্যাওলায় ছেয়ে গেছে। বর্ষার জল কোথাও কোথাও পুকুরের পাড় উপচে মোরামের রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে। লোকটা এবং আমি তার ওপর দিয়ে ছপ ছপ করে দৌড়োতে থাকি।

দৌড়োতে দৌড়োতে লোকটা বলে, পোস্টটার জন্য আর একজন ক্যান্ডিডেট আছে। তোমার কোয়ালিফিকেশন কী?

বি এসসি অনার্স।

মেয়েটারও বোধহয় তাই। তবে সে আবার বি এড।

বি এড হওয়া কিছু শক্ত নয়।

তাই নাকি?— বলে লোকটা ফের ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একটু দেখে নিয়ে বলে, পৃথিবীর কোন কাজটা তোমার কাছে সবচেয়ে শক্ত মনে হয়?

বেঁচে থাকা।

তুমিও তো দেখছি দার্শনিক কিছু কম নও।

এটা দর্শন-টর্শন নয়। বেঁচে থাকাটাই ভারী শক্ত, বিশেষত আমাদের মতো গরিবদের পক্ষে।

কিন্তু আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি জেনুইন গরিব নও।

লোকটাকে পেছন থেকে ল্যাং মারার আর একটা লোভ সংবরণ করে আমি বললাম, কীরকম গরিব আপনার পছন্দ?

গরিবদের আমি পছন্দ করি কে বলল?

করেন না?

তাও বলছি না। তবে একটা লোক গরিব বলেই তাকে পছন্দ করতে হবে এমন কোনও শর্ত আমি মানি না। গরিব হওয়া খুব খারাপ।

আমার হাত পা রাগে একটু নিশপিশ করে উঠল। বললাম, আপনিও তো একদিন গরিব ছিলেন বলছেন। তাদের প্রতি আপনার সিমপ্যাথি থাকা উচিত।

লোকটা কলাগাছের ঝোপটা ডাইনে ফেলে এগোতে এগোতে বলল, আমি গরিব অবস্থায় চোর, মিথ্যেবাদী, নিমকহারাম, পরশ্রীকাতর এবং ধান্দাবাজ ছিলাম।

আমার একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, এখনও কি তাই নন? চেপে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা নিজেই বলল, হয়তো এখনও আমি তাই-ই আছি। তবে এসব দোষের উৎস ওই দারিদ্র্য।

আমি বললাম, বড়লোকেরা আরও বেশি মিথ্যেবাদী, আরও বড় চোর, আরও পরশ্রীকাতর এবং ধান্দাবাজ হয়।

এটাই শেষ রাউন্ড, বুঝলে! এই রাউন্ডে আমি একটু জোরে দৌড়োই।

আমি ধৈর্য হারিয়ে বলি, আপনি রাউন্ডটা শেষ করুন, আমি বরং গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আরে না, না। তুমি তো জানো না দূরপাল্লার দৌড়বাজরা কীরকম নিঃসঙ্গ আর একা। তাদের আনন্দ নেই, উপভোগ নেই, বিশ্রাম নেই, বন্ধু নেই, প্রেম নেই, আছে শুধু দৌড় আর দৌড়।

আপনি এত দৌড়োন কেন? অলিম্পিক যাবেন নাকি?

দূর বোকা ছেলে। দৌড়ের অর্থ এখানে অন্য। আমি যে জীবনযাপন করি সেটাই এক দূরপাল্লার দৌড়।

তা না হয় হল, কিন্তু আনন্দ, বিশ্রাম, বন্ধু বা প্রেম নেই কেন?

খসে পড়ে যে। যতই তুমি দৌড়োতে থাকবে ততই ওসব খসে পড়তে থাকবে। কোনও কিছুই তোমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে না। ক্রমে তুমি একা হয়ে যাবে, ভীষণ একা। ভারী ক্লান্ত বোধ হবে, কিন্তু থামলে চলবে না।

ও, ফের সেই দার্শনিকতা!

লোকটা ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল।

ধন্যবাদ।

তোমাকেও ধন্যবাদ। শেষ দুটো রাউন্ড আমাকে সঙ্গ দিয়েছ বলে।

আজকাল চাকরির জন্য লোকে সব কিছু করতে পারে।

সামান্য একটা মাস্টারির জন্য?

মাস্টারি আপনার কাছে সামান্য মনে হলেও, আমার কাছে অসামান্য।

আমারও এক সময়ে মনে হত আখের গুড়ের চেয়ে ভাল খাদ্য বুঝি আর কিছু নেই। এসো, এবার একটু জোরে দৌড়েই।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি গোঁয়ার লোকটার সঙ্গে প্রায় সমান তালে দৌড়োতে লাগলাম। হ্যাঁ, লোকটা গোঁয়ার, একরোখা, খ্যাপাটে, নিষ্ঠুর ও উচ্চাভিলাষী। তবু লোকটাকে আমার খুব খারাপ লাগছিল না।

শেষ রাউন্ডটা জোরে দৌড়োতে হল বলে লোকটার দমে টান পড়েছিল বোধহয়। বেশি কথাটথা বলল না। দমে আমারও টান পড়েছিল। লোকটা কথা না বলায় বাঁচলাম।

ঘেমে হেদিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে যখন দু'জনে গাড়ি-বারান্দার তলায় পৌঁছোলাম তখন দেখি বারান্দায় একজন ভদ্রলোক ও একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রলোক বিগলিত হাসি হেসে বলল, সকালে উঠে দৌড়োনো খুব ভাল অভ্যাস। সেই জন্যই না আপনার স্বাস্থ্যটি এমন ডগমগে!

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই আমাকে চোখ টিপে চাপা গলায় বলল, এসে গেছে। কমপিটিটার।

মেয়েদের দিকে তাকানোর কোনও মানেই আজকাল আর আমি খুঁজে পাই না। তবে অভ্যাসবশে তাকাই। গোরু কি পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করে? যতদূর জানি করে না। তবে তাকায়, আমিও আজকাল গোরুর মতো নির্বিকার চোখে মেয়েদের দেখি। তবে লোকটা "কমপিটিটার" বলায় আমি গোরুর চেয়ে আর একটু তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকালাম।

আগের দিনে গল্প উপন্যাসে নায়িকা বা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনার একটা রীতি ছিল। আর তাতে কী বাড়াবাড়িই না থাকত! আজও পৃথিবীতে মেয়েদের রূপ একটা মস্ত বড় আলোচ্য বিষয়। এ থেকেই বোঝা যায়, মেয়েদের অস্তিত্বটা এখনও অনেকটাই শরীরকেন্দ্রিক। তাদের অন্যবিধ গুণাবলীকে এখনও পুরুষশাসিত সমাজ তেমন আমল দিচ্ছে না। তা এই মেয়েটির রূপ তেমন কিছু নয়। ফ্যালনাও বলছি না। একটু শ্যামলা ঘেঁষা রং। মুখখানায় লাবণ্য আছে। বেশ ঢলঢলে মাঝারি গড়ন, মাঝারি দৈর্ঘ্য। পরনে একটা সবুজ ডুরে শাড়ি। গলায় বড় বড় লাল পাথরের মালা, দুল, কপালে টিপ। হাতে দু' গাছা বালা। সাজপোশাক থেকেই মনে হয়, তেমন আধুনিক স্বভাবের নয়। মুখ-চোখও ভারী লাজুক আর সপ্রতিভ। একটু ভয়-ভয় ভাবও আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকাল। এইসব মেয়ের কাছে অপরিচিত যুবা মানেই সম্ভাব্য ধর্ষণকারী বা মহিলালোভী পেশাদার প্রেমিক।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, আরে সাতসকালেই জহরবাবু যে!

প্রতিমাকে নিয়ে এলাম। আপনি বলেছিলেন একবার নিয়ে আসতে।

ভালই করেছেন। ঘরে গিয়ে বসুন। আমি ধরাচূড়া ছেড়ে আসছি।— বলেই লোকটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বলল, তুমিও যাও। কমপিটিটারটিকে ভাল করে মাপজোক করে দেখো। হাই কমপিটিশন।

লোকটা দৌড়োতে দৌড়োতে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

না, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি পারিজাত নামক এই ধনতান্ত্রিক, শ্রেণিশত্রু শোষক ও উচ্চাভিলাষী লোকটিকে আমি তেমন অপছন্দ করতে পারছি না। লোকটি পাজি সন্দেহ নেই। শয়তান তো বটেই। অসাধুও নিশ্চয়ই। তবু লোকটার মধ্যে বেঁচে থাকার একটা স্পন্দন আছে। সেই স্পন্দন স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

জহরবাবু হাত কচলে বললেন, আপনি কি ওঁর কেউ হন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। দেখে মনে হল খুব ঘনিষ্ঠ।

আমিও যে চাকরিটার একজন উমেদার সেটা ওঁকে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে একটু দোনোমোনো করলাম। তবে লুকিয়ে লাভও নেই। বলে দিলেই বরং ল্যাঠা চুকে যায়। তাই একটু হেসে বললাম, প্রাতঃভ্রমণ করছিলাম না। দৌড়োতে দৌড়োতে উনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন।

বলেন কী! কীসের ইন্টারভিউ?

শিবপ্রসাদ স্কুলে অঙ্কের মাস্টারির।

ওঃ।— বলে বিনীত, অমায়িক ও হাস্যময় জহরবাবু সহসা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমিও চাকরির ক্যান্ডিডেট জেনে প্রতিমা চকিতে আমার দিকে একটু দৃকপাত করল। সুযোগ পেলে সেও হয়তো তার এই কমপিটিটারকে একটু মাপজোক করত, কিন্তু জহরবাবু মেয়েকে সেই সুযোগ দিলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত মুখে তিনি মেয়েকে "চল, চল, বসিগে। যত সব উটকো ঝামেলা..." বলে প্রায় হাত ধরে টেনে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়লেন। লক্ষ করলাম, জহরবাবু মাঝে মাঝে ঘর থেকে খুনির চোখে আমাকে দেখছেন এবং মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে নিচু স্বরে একটা জরুরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আলোচ্য বিষয় যে আমি তাতে সন্দেহ নেই।

বিপজ্জনক ঘরটিতে আর ঢুকলাম না। দৌড়োনোর পর আমার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল।

আমি সিংহীদের বাগানটায় পায়চারি করতে করতে পাখির ডাক শুনতে লাগলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পর পারিজাত নামল। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, ঠোঁটে একটু বেসুরো শিস। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিচুস্বরে বলল, কমপিটিটারকে দেখলে?

দেখলাম। তবে আলাপ হয়নি।

কী মনে হল? পারবে কমপিটিশনে?

শুধু চোখে দেখেই কি তা বলা যায়?

তা হলে চলো। ফেস হার। মুখোমুখি বসে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করো। হাই কমপিটিশন।

লোকটা মজার সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি, লোকটাকে আমি তেমন অপছন্দ করতে পারছি না। কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে কমপিটিশনে নামতেও আমার রুচিতে বাঁধছে। আমি চাকরিটার উমেদার শুনে ওর বাবা এমন রিঅ্যাক্ট করল যে, পুরো ব্যাপারটার ওপরেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

আমি বিরসমুখে বললাম, হাই কমপিটিশন যে তা বেশ টের পাচ্ছি। তবে সেই কমপিটিশনে আমার নামবার ইচ্ছে নেই। চাকরি আপনি ওকেই দিন।

কেন বলো তো? মেয়েটাকে দেখে কি তোমার মন নরম হয়ে গেছে?

আমি একটু রাগের গলায় বলি, মোটেই নয়। আমি ক্যান্ডিডেট শুনে মেয়েটার বাবা আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

লোকটা হাসল। বলল, আরে দূর! তুমি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল। আসলে জহরবাবু খুব সরল লোক। সরল লোকেরা নিজেদের মনের ভাব গোপন করতে পারে না। তোমাকে কী বলেছে?

আমি বললাম, কিছু বলেনি। কিন্তু অপমানজনক ভাবভঙ্গি করেছে।

ওঃ, এই কথা?— লোকটা খুব উদারভাবে হেসে বলে, আমি যে সমাজে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি সেই সমাজে মিনিমাম গালাগালি কী ছিল জানো? শুয়োরের বাচ্চা। লোকের সঙ্গে লোকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরুই হত শুয়োরের বাচ্চা দিয়ে। সেই থেকেই অপমান-টপমানের বোধ আমার নষ্ট হয়ে গেছে। অপমানবোধ থাকা মানেই একটা ল্যাঠা, ওটা যত শিগগির চুকিয়ে ফেলতে পারো ততই মঙ্গল।

আমি তো আপনার সমাজে মানুষ হইনি।

সেই জন্যই তো বলছিলাম তুমি যথেষ্ট গরিব নও। এসো, এসো, ছেলেমানুষি কোরো না।

বেশ গম্ভীর মুখে এবং যথেষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে আমি লোকটার পিছু পিছু ঘরে ঢুকি। জহরবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক যেভাবে ক্লাসে মাস্টারমশাই ঢুকলে ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়। অবিকল মাস্টারমশাইয়ের গলায় লোকটা জহরবাবুকে বলল, বসুন, বসুন।

জহরবাবু বসলেন। আমার দিকে না তাকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু কৌতূহল যাবে কোথায়? কাজেই মাঝে মাঝে আমার চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার খুনির চোখ। প্রতিমার চোখেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা, সংশয় ও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

জহরবাবু খুব বিগলিত মুখে লোকটাকে বলতে লাগলেন, আপনাকে বহুদিন ধরেই জীবনীটা লিখে ফেলতে বলছি, একদম গা করছেন না।

লোকটা উদাস গলায় বলে, কী হবে লিখে?

জহরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হবে হবে। আমার মতো গরিবরা দেশের সর্বহারারা আপনার জীবনী পড়ে লড়াই করতে শিখবে। আশা পাবে, ভরসা পাবে, শক্তি পাবে।

আমার তো অত সময় নেই।

জহরবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, তা জানি। আর সেইজন্যই প্রতিমাকে নিয়ে এলাম, ওর হাতের লেখা খুবই সুন্দর। গোটা গোটা ছাপার অক্ষরের মতো, বানান-টানান ভুল করে না, লেখেও

তাড়াতাড়ি। তাই বলছিলাম, ইস্কুলের কাজটুকু করেই চলে আসবেখন। আপান নিজের জীবনের কথা বলে যাবেন, ও বসে বসে ডিকটেশন নেবে।

লোকটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। একটু চাপা গলায় বলল, হাই কমপিটিশন। বিডিং শুরু হয়ে গেছে। বি অ্যালার্ট।

আমি কুঁচকে রইলাম।

লোকটা জহরবাবুর দিকে চেয়ে বলল, জীবনীটা ছাপবে কে?

আমরাই ছাপব, দরকার হলে চাঁদা তুলব।

লোকটা হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, কিন্তু একটা মুশকিল আছে। আমি যে সমাজে মানুষ সে সমাজে অনেক নোংরামি, অনেক কলঙ্ক, অনেক লজ্জা। জীবনী লিখতে গেলে সেসব কথাও এসে পড়বে। খুবই খারাপ খারাপ কথা, সেসব লিখতে প্রতিমার মতো ভদ্র এবং যুবতী একটি মেয়ের অসুবিধে হবে না?

জহরবাবু একটা ঢোঁক গিলে আমার দিকে তাকালেন। নারদীয় চোখ। যেন-বা কথাটা আমিই পারিজাতকে প্রম্পট করেছি। তারপর বললেন, তাতে কী? পারবে। পারবি না প্রতিমা?

প্রতিমা পারবে কি না বোঝা গেল না। বাইরে হঠাৎ আবার তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। প্রতিমা সেই দিকে চেয়ে ছিল।

৫। পারিজাত

স্কুলের ঘণ্টা শুনলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ছেলেবেলায় একটা অবৈতনিক উদ্বাস্তু বিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। সেই স্কুলটার অবস্থা ছিল আমাদেরই মতো, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। পেতলের ঘণ্টা কেনার পয়সা ছিল না বলে রেল ইয়ার্ড থেকে কুড়িয়ে আনা একটা লোহার টুকরো আওয়াজ তোলা হত। সে আওয়াজের কোনও জোর ছিল না। স্কুলে বেশিদিন পড়া হয়ওনি আমার। পরিবেশের অমোঘ নির্দেশে আমরা ক্রমে ক্রমে রাস্তার ছেলে হয়ে যাচ্ছিলাম। পরবর্তীকালে আমার জীবনের গতিকে আমি পরিবর্তিত করি বটে, কিন্তু স্কুলের জন্য আজও আমার বুকে কিছু দীর্ঘশ্বাস সঞ্চিত আছে।

আজ ছুটির দিন বলে শিবপ্রসাদ স্কুলে কোনও ঘণ্টার শব্দ নেই। অবশ্য এই সাতসকালে ঘণ্টা বাজেও না। খুব সম্প্রতি আমি ছুটির দিনে স্কুলটায় আসি এবং কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই বা বসে থাকি।

না, আমি কবি, ভাবুক বা আবেগপ্রবণ লোক নই। আমি যা করি তার পিছনে সবদাই অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ কারণ থাকে। ছুটির দিনে শিবপ্রসাদ স্কুলে আমার এই আগমনকে লোকে কী চোখে দেখবে জানি না। কিন্তু কারণটা আমার ব্যক্তিগত।

তটস্থ দারোয়ান ও দফতরিকে হাতের ইশারায় আমার অনুগমন করা থেকে নিবৃত্ত করে আমি প্রকাণ্ড স্কুলটা লম্বা ও প্রায় অন্ত বারান্দা করে বহু দূর পর্যন্ত হাঁটতে থাকি। ক্লাসঘরগুলোর দরজা বন্ধ। ভূতের বাড়ির মতো নিস্তব্ধ পরিবেশ। স্কুলের মাঝখানে মস্ত মাঠ, মাঠের ধারে ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া চমৎকার বাগান। কমলা সেনের রুচি আছে। স্কুলে ঢুকলেই বোঝা যায়, ভারী ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন এর পরিবেশ। দেওয়ালে কোনও লেখা নেই, বারান্দা বা বারান্দার নীচের ঘাসে কোনও নোংরা নেই। থামের ধারে ধারে ময়লা ফেলার বাক্স সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এসব দেখতে আমি আসিনি। ক্লাস ফাইভের সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে আমি বিশাল স্কুল-বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকি। মাঠের তিন দিক ঘেরা ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো মস্ত দোতলা বাড়ি। আমি এই স্কুলের সেক্রেটারি বটে, কিন্তু স্কুলটার সঙ্গে আমার কোনও ভাবগত

যোগাযোগ নেই। আমি এই জায়গার লোক নই, এই স্কুলে কখনও পড়িনি। তাই এই স্কুলকে নিয়ে আমার কোনও সুখস্মৃতি নেই। সম্ভবত এই স্কুল বা পৃথিবীর অন্য কোনও স্কুলের প্রতি আমার তেমন কোনও দুর্বলতা বা ভালবাসাও নেই।

আমার না থাক, অসীমার আছে। আর সেই ভালবাসা কতটা গভীর এবং কতটা একনিষ্ঠ তা আমার জানা দরকার।

অসীমার আচরণের মধ্যে সম্প্রতি আমি কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি। যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের কাছেই পদোন্নতি একটি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। বিশেষ করে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হওয়াটা তো যে কোনও শিক্ষয়িত্রীর কাছেই শিকে ছেঁড়ার মতো ঘটনা। এই অত্যন্ত ভাল জাতের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়ার স্বপ্ন অনেকেরই দেখার কথা। কিন্তু অসীমার মধ্যে সেই দুর্লভ ইচ্ছাপূরণজনিত কোনও আনন্দের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না।

কমলা সেনকে অসীমা বোধহয় একসময় খুবই শ্রদ্ধা করত এবং ভালও বাসত। কিন্তু সম্প্রতি কমলা সেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। না যাওয়ারই কথা। কমলা সেন আমাকে পছন্দ করেন না, আমার ভাবী স্ত্রীকেও তাঁর পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তবু এই কমলা সেনের পদত্যাগের কথায় অসীমা যেন তেমন স্বস্তি পাচ্ছে না। তার বদ্ধমূল ধারণা, কমলা চলে গেলে স্কুলের অবনতি ঘটবে। এমনকী সে ধরেই নিয়েছে, তার পক্ষে স্কুলের প্রশাসন ঠিক মতো চালানো সম্ভব নয়।

আমার সমস্যা অসীমাকে নিয়ে। আমি তাকে আর একটু জানতে চাই। আমার ভিতরে যে ক্যালকুলেটর যন্ত্রটি সব সময়েই নির্ভুল নির্দেশ দেয় সে যেন বলছে, অসীমার ভাবগতিক ভাল নয়। তার ভিতরে একটা বিদ্রোহের অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। যদিও আমার ধারণা সেই অঙ্কুরটি সম্পর্কে অসীমা নিজেও সচেতন নয়।

বস্তুত এই স্কুলে এসে এর পরিবেশটিকে আমি হৃদয়ঙ্গম করারই চেষ্টা করি। বুঝতে চেষ্টা করি, অসীমার প্রকৃত মনোভাবটি কী।

চিন্তাটা অবশ্য ঘরে বসেও করা যায়। কিন্তু স্কুলে এলে এমনটা এই পরিবেশে আরও সুনিশ্চিয়তার সঙ্গে তার ক্যালকুলেশন চালাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

ক্লাস ফাইভের সামনে সিঁড়িতে বসে আমি অসীমার শুষ্ক ও রুক্ষ মুখখানা স্পষ্টই মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, অসীমা ক্লাসের শেষে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আনমনে বাগানের একটা দোলনচাঁপা গাছের দিকে চেয়ে দেখল একটু। সাদা সুন্দর নিষ্পাপ ফুল। তারপর একটু শিউরে উঠল সে। কুসুমে যে কীটও আছে। শিবপ্রসাদ স্কুলের হিসাবনিকাশ অন্তত সেইরকমই একটা আভাস দিচ্ছে। এই শুচিশুভ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটছে নেপথ্যের লোভী হস্তাবলেপ। তার হয়তো সন্দেহ, সে হেডমিস্ট্রেস হওয়ার পর তার ভাবী স্বামী তাকে সামনে শিখণ্ডীর মতো রেখে তলায় তলায় স্কুলের ভিত ক্ষয় করে ফেলবে। কিন্তু তা হতে দেয় কী করে সে? এই স্কুলকে যে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। প্রারম্ভিক প্রার্থনাসংগীত থেকে শেষ পিরিয়ডের ড্রিল পর্যন্ত তার কাছে যেন এক বিশুদ্ধ সংগীতেরই বিস্তার ও পরিণতি।

শিবপ্রসাদ স্কুলের প্রতিটি ইট কমলা সেনের মতোই তার কাছেও বুকের পাঁজর।

চোখ বুজে অসীমার মানসিকতার মধ্যে আমি এমন ডুবে ছিলাম যে আকস্মিক একটা আর্ত চিৎকারে প্রায় লাফিয়ে উঠতে হল।

পরমুহূর্তেই অবশ্য ভুল ভাঙল। চিৎকার নয়, গান। মনে ছিল না যে, রবিবার সকালে এই স্কুলে একটা গানবাজনার স্কুলের ক্লাস হয়।

আমি উঠে পড়লাম, উঠতে উঠতেই সিদ্ধান্ত নিলাম, অসীমার ওপর নজর রাখতে হবে। খুবই সতর্ক নজর রাখতে হবে। তার মানসিকতা এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই।

বেরিয়ে আসবার মুখে ফটকের কাছে একজন তানপুরাধারী লোক আমার পথ আটকাল।

দাদা! আমি হাল ছাড়িনি।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি। মস্ত বাবরি চুল, গালে মাইকেলের মতো জুলপি, পরনে চুস্ত পায়জামা আর গায়ে দারুণ চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি। একটু ঠাহর করে দেখে তবে গন্ধর্বকে চিনতে হল।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বললাম, না গন্ধর্ব, হাল ছাড়াটা ঠিকও হবে না। লেগে থাকো। গান কেমন হচ্ছে?

দারুণ! আজকাল কথা পর্যন্ত গান হয়ে বেরোতে চায়।

বাঃ! আর নাচ?

দুর্দান্ত। আজকাল আমার হাঁটাচলায় পর্যন্ত নাচের ছন্দ।

তোমার হবে গন্ধর্ব।

আপনার আশীর্বাদ।— বলে গন্ধর্ব আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, রুমার সঙ্গে আসানসোলের একটা ফাংশনে দেখা হয়েছিল।

তাই নাকি? কেমন বুঝলে?

পাত্তা দিচ্ছে না।

একদম না?

না, তবে আড়ে আড়ে দেখছে বলে মনে হল।

তুমিও লক্ষ রেখো, রুমা পাঁকাল মাছের মতো পিছল মেয়ে।

লক্ষ রাখার সময় কোথায়? খুব ভোরে গলা সাধি। সকালে যোগব্যায়ামের ক্লাসে যাই। দুপুরে কলেজ। বিকেলে জিমনাসিয়াম। সন্ধেবেলায় নাচের প্র্যাকটিস। ঠাসা প্রোগ্রাম।

আমি সভয়ে বলি, তুমি কি রুমাকে ভুলে যাচ্ছ গন্ধর্ব?

গন্ধর্ব একটু লজ্জা পেয়ে জিব কেটে বলে, তা নয়। তবে আগের মতো সব সময়ে রুমাকে নিয়ে ভাবার মতো সময় হয় না।

কিন্তু মনে পড়ে তো?

একটু-আধটু কি আর পড়ে না!

আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলি, বিরহের ভাবটা কেটে যাচ্ছে না তো গন্ধর্ব?

গন্ধর্ব আমতা আমতা করে বলে, তা কাটছে না। তবে আগের মতো তীব্রতা নেই।

সর্বনাশ! গন্ধর্বের কথা শুনে ও হাবভাব দেখে প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা হয় আমার। রুমার বিরহ যদি ও হজম করে বসে থাকে তা হলে হয় রুমাকে অন্যপাত্র দেখতে হবে, নয়তো পাকাপাকিভাবেই আমার কাঁধে ভর করতে হবে। কোনওটাই অভিপ্রেত নয়। আমি ভীষণ উদ্বেগে ওর হাত দুটো ধরে ফেলার চেষ্টা করি। তবে ওর এক হাতে তানপুরা থাকার জন্য মোটে একটা হাতই নাগালে আসে আমার, অতি করুণ স্বরে আমি প্রশ্ন করি, গন্ধর্ব, রুমার জন্য তোমার বিরহের তীব্রতা কেন কমে যাচ্ছে? রুমাকে কি সুন্দর বলে মনে হয় না তোমার? বিবাহিত জীবনের স্মৃতিও কি তোমাকে হন্ট করে না?

গন্ধর্ব খুবই লজ্জা পেয়ে বলে, না না, ওসব ঠিকই আছে। তবে বিরহটা একটু ভোঁতা হয়ে গেছে বটে। আমার মনে হয় দাদা, দুনিয়ার অধিকাংশ বিরহের গল্পই বোগাস। ঠিক মতো ব্যায়াম করলে, গানটান গাইলে বা নাচলে এবং আসন করলে বেশিরভাগ বিরহই কেটে যেতে থাকে!

আমি তার সবল পেশিবহুল হাতখানা জড়িয়ে ধরে রেখেই মিনতির স্বরে বলি, তা হলে তুমি ব্যায়াম বা আসন কমিয়ে দাও গন্ধর্ব, অত নাচগানেরই বা দরকার কী পুরুষমানুষের?

গন্ধর্ব ম্লান একটু হেসে বলে, তা আর হয় না দাদা। ব্যায়াম আমার চোখের সামনে থেকে একটা কূপমণ্ডূকতার পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। নাচ আর গান খুলে দিয়েছে অন্য এক জগতের দরজা, জীবনটা কী যে ভাল লাগে আজকাল! পৃথিবীকে কত সুন্দর লাগে!

রুমাকে ছাড়াও?— করুণতর স্বরে আমি জিজ্ঞেস করি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গন্ধর্ব বলে, রুমাকে ছাড়াও।

কিন্তু এ তো ভাল কথা নয় গন্ধর্ব!

কিন্তু এ পথ আপনিই দেখিয়েছিলেন দাদা। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ব্যায়াম, নাচ বা গানে বিরহের ব্যথা সত্যিই কমে যায় বলে যদি জানতাম তা হলে কি আর সেই পথ দেখাতাম গন্ধর্বকে? মনে হচ্ছে, আমার অভ্যন্তরে স্থাপিত ক্যালকুলেটর মেশিনটা এই প্রথম একটা ঠিকে ভুল করে ফেলেছে।

আশপাশ দিয়ে গান ও নাচের ক্লাসের মেয়েরা যাচ্ছে। বেশ সুন্দরী সব মেয়ে। যেতে যেতে গন্ধর্বের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে। হাসছেও কেউ কেউ চেনার হাসি। আমি তাদের চোখে গন্ধর্বের প্রতি একধরনের সপ্রশংস গুণমুগ্ধতার ভাব লক্ষ করে শিউরে উঠি। ব্যায়াম করে গন্ধর্বর চেহারা খুলেছে। গানও বোধহয় সে খুবই ভাল গাইছে আজকাল। নাচও হয়তো মন্দ নাচছে না। মেয়েরা যদি গন্ধর্বকে পাত্তা দিতে থাকে তবে বোকা এবং আহাম্মক রুমাটা তো একেবারেই বেপাত্তা হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতেই একটি সুন্দরী মেয়ে এসে গন্ধর্বকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

খুবই বেকুবের মতো আমি বাসায় ফিরে আসি এবং ভাবতে থাকি।

আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্নই ছিল। হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। অঝোর বৃষ্টি। আমার চিন্তা রুমা থেকে দাঁড় বদল করে বৃষ্টির ঘরে গিয়ে বসল। বৃষ্টির লক্ষণ ভাল নয়। বন্যা হবেই। হবে কেন, বন্যা শুরুও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গাঁ গঞ্জে কিছু কিছু নিচু জায়গা ডুবে যাওয়ায় ছোটখাটো ইভ্যাকুয়েশনও শুরু হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই স্কুল-কলেজ বন্যার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে! বন্যার্তরা এসে ভিড় করবে সেখানে। সবকারি রিলিফ পৌঁছোতে দেরি হবে আর তা করতে জনগণের নেতারা ছিঁড়ে খাবে প্রশাসনকে। তখন অবশ্যম্ভাবী ডাক পড়বে আমার। আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি। আমার কাছে গম, চাল, চিনি, জামাকাপড় সবই মজুত আছে রিলিফের জন্য। তবু একটু খিঁচ থেকেই যাচ্ছে। রিলিফ নিয়ে গোলমাল বেঁধেছিল গেলবারের আগেরবার। সরকারি গুদাম লুট হয়েছিল অধরের নেতৃত্বে। আমার ক্যালকুলেটর বলছে, নেতৃত্ব অধর এবারও দেবে। তবে এবার আর সরকারি গুদাম নয়। তার লক্ষ্য হবে আমার নিজস্ব গুদাম।

প্রতিপক্ষ হিসেবে অধব চমৎকার। শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান। বলতে কী, এই অঞ্চলে আমার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তার জন্যই খানিকটা আটকে আছে। আমাদের মধ্যে একটা শেষ লড়াই হওয়া দরকার। সেটা আসন্ন বলেই আমার অনুমান। এক আকাশে যেমন দুই সূর্যের স্থান নেই তেমনিই এই জায়গার পক্ষে দু'-দু'জন ধুরন্ধর একটা বিশাল বাহুল্য মাত্র। হয় তাকে উচ্ছেদ হতে হবে, নয়তো আমাকে।

অনেকেরই ধারণা অধরের প্রেস্টিজে হাত দেওয়া আর জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো একই ব্যাপার। আমি অবশ্য এরকম কোনও বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই। দারিদ্র্যসীমার ওই রেলবাঁধটা ডিঙোতে গিয়ে আমাকে বহু উঁচু ও নিচুতে ঠোক্কর খেতে হয়েছে এবং বিবিধ জাতসাপের লেজ দিয়ে বে-খেয়ালে বহুবারই আমি কান চুলকে ফেলেছি। সেই জাতসাপগুলো এখনও বেঁচে আছে কি না আমি তা সঠিক জানি না। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আসল কথা হল, সাপ যেমন মানুষের শত্রু, তেমনি মানুষও সাপের শত্রু। অন্যের দাঁত নখ দেখে অধিকাংশ মানুষই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, ভগবান তাদেরও যথেষ্ট দাঁত নখ দিয়েছেন।

সন্ধেবেলায় আমি একথাটাই গুণেনবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। গুণেনবাবু খুব মনোযোগী শ্রোতা নন। সাধারণত পণ্ডিত ও বক্তারা অন্যের কথা শুনতে ভালও বাসেন না। কিন্তু

আজ গুণেনবাবুকে খুবই অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। উনি আমার সব কথাতেই 'হুঁ' দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর বললেন, দাঁত নখের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। আবহমানকাল ধরেই মানুষ ও অন্যান্য পশু দাঁত নখ ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলেও একটা কথা আছে পারিজাত।

আমি মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ওরকম একটা কথা প্রায়ই আমার কানে আসে।

গুণেনবাবু একটু চিন্তিত মুখে বলেন, কানে তো আসে, কিন্তু কথাটার মানে জানো?

খুব ভাল জানি না।

সোজা কথা হল, দাঁত নখ যদি কোনওদিন ঈশ্বরের কৃপায় লোপাট হয়ে যায় তবে অন্য কথা। কিন্তু যতদিন মানুষের দাঁত নখ থাকবে ততদিন তারা সেটা ব্যবহার করতেও ছাড়বে না। আমাদের শুধু দেখতে হবে, মানুষ যেন অপ্রয়োজনে বা সামান্য কারণেই তা ব্যবহার না করে! শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল একটা আপসরফা মাত্র। দুর্বল ও সবলের মধ্যে একটা নড়বড়ে সাঁকো বাঁধার চেষ্টা। তবু সেই চেষ্টাটাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

আমি একটা হাই গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললাম, তা হবে।

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অধরের সঙ্গে তোমার যদি একটা শো-ডাউন হয়ই তবে সেটা হবে দুটো বিগ পাওয়ারের লড়াই আমাদের তাতে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। কিন্তু মনে রেখো, দুটো বড় শক্তির লড়াই যখন লাগে তখন কিছু উলুখাগড়ারও প্রাণ যায়। আমার ভয় সেখানেই।

আমি ভ্রু কুঁচকে নিজের নখ দেখতে লাগলাম।

উনি বললেন, অধর লোকটা খুব খারাপ নয় পারিজাত। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি তো। একটু মাথাগরম গা জোয়ারি ভাব আছে বটে, কিন্তু মানুষের দায়ে দফায় ও সবার আগে গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। এই তো সেদিনও মেথরপট্টির একটা মড়া পোড়ানোর টাকা দিল, নিজে কাঁধে করে মড়া বইল পর্যন্ত। একসময়ে ওর নামই হয়ে গিয়েছিল এ শহরের রবিন হুড।

আমি বিনীতভাবেই বললাম, আমি জানি।

গুণেনবাবু একটু চাপা স্বরে বললেন, আমি বলছিলাম কি ওর সঙ্গে একটা মিটমাট করে নাও।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তো?

ধরো তাই!

তা হলে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারটা আপনি অধরবাবুকেও একটু বুঝিয়ে বলুন না।

গুণেনবাবু অসহায়ের মতো মুখ করে বললেন, মুশকিল হল, তুমি আমার হবু ভগ্নীপতি। তাই অধর ধরেই নিয়েছে যে, আমি তোমার পক্ষে। কাজেই সে আমার কথা কানে তুলছে না। কমলার ব্যাপারটাতেও সে খুব পারটারবড়।

তা হলে আর কী করা যায় বলুন!

কমলা আর অধরের ব্যাপারটাকে আমি সাপোর্ট করছি না পারিজাত। আমি মানি, কোনও স্কুলের হেডমিসট্রেসের ব্যক্তিগত জীবনে কোনও কলঙ্ক থাকা উচিত নয়। তবু এতকাল এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য যখন করেনি তখন তুমিই বা হঠাৎ ময়লার গামলায় খোঁচা দিতে গেলে কেন?

আপনারা এতকাল ধরে একটা দুর্নীতি ও ব্যভিচারকে সমর্থন করে আসছেন কেন সেটা আমি আজও বুঝতে পারি না। হয়তো অধরকে আপনারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভয় পান এবং কমলা সেনের যোগ্যতা সম্পর্কে আপনাদের ধারণাও অনেকটাই অতিরঞ্জিত।

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। আজ উনি তর্ক করার মুডে নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। তবু বলি, তুমি যদি কিছু মনে না করো তবে আমি তোমার সঙ্গে অধরের একটা মিটমাট ঘটানোর শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

গুণেনবাবু মরা মাছের চোখের মতো এক ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, অধরের হাতে অনেক লোক আছে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমি জানি অধরবাবুর হাতে অনেক লোক এবং গুন্ডাও আছে। তদুপরি তিনি হলেন লোকাল লোক, যাকে বলে ভূমিপুত্র। তিনি এখানকার রবিনহুডও বটে। শহরের বেশিরভাগ লোকেরই সমর্থন অধরের দিকে। এ সবই আমি জানি। আমি তাঁর সঙ্গে লাগতেও চাই না। কিন্তু একটা অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া উচিত বলে মনে করি।

গুণেনবাবু চুপ করে গেলেন। অবশ্য এবার চুপ করার অন্য একটা কারণ ছিল। ঘরের বাইরে ভেজা ছাতাটা বারান্দায় রেখে জহরবাবু গায়ের জল ঝাড়ছেন। মুখে বিগলিত হাসি।

এই একজন লোক যিনি এখনও নিরঙ্কুশভাবে আমার দলে। অবশ্য কতদিন ইনি আমার দলে থাকবেন তা বলা শক্ত। প্রতিমার চাকরিটা না হলে হয়তো চট করে দল বদলে ফেলবেন। এই যুগে দল বদলের একটা বীজাণু এসে গেছে।

জহরবাবু ঘরে ঢুকতেই গুণেনবাবু "চলি হে পারিজাত" বলে উঠে পড়লেন। আমি লক্ষ করলাম, গুণেনবাবু যাওয়ার সময় ভুল করে নিজের ছাতাটার বদলে জহরবাবুর ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছুই বললাম না। এই ছাতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে যদি দু'জনের মানসিকতারও একটু বদল হয়? হতেও তো পারে! দুনিয়ায় কি অঘটন আজও ঘটে না?

জহরবাবু বসে রুমাল দিয়ে ভাল করে মাথা মুছে বললেন, ওঃ! প্রতিমা তো সেই থেকে কেবলই আপনার কথা বলছে। যেমন সুন্দর চেহারাখানা, তেমনি অমায়িক ব্যবহার, প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

কথাটায় সত্যতা কত পারসেন্ট তা হিসেব করতে করতেও আমি বেশ খুশিই বোধ করলাম। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের আমি তেমন করে আকর্ষণ করার চেষ্টা কখনও করিনি বটে, কিন্তু কেউ আকৃষ্ট হয়ে থাকলে ভালই লাগে।

বললাম, তাই নাকি?

আর বলবেন না। দিনরাত শুধু আপনার কথা। আজ দুপুরে ওর মাকেও বলছিল, পারিজাতবাবু দরিদ্র অবস্থা থেকে যেভাবে ওপরে উঠে এসেছেন তা নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা যায়। আপনাব জীবনী লেখার জন্য তো ও একেবারে মুখিয়ে আছে।

জহরবাবু সেই জীবনীপ্রসঙ্গেই আটকে আছেন। ওঁর মনটা হল খারাপ গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। যেখানে পিন আটকায় ঘুরেফিরে সেই জায়গাটাই বাজতে থাকে।

তবু এইসব কথাতেও আমি কেন যেন খুশি হচ্ছি। স্তাবকতা যে মানুষের কত বড় শত্রু! বেশ খোশ গলায় বললাম, তাই নাকি?

জহরবাবু হঠাৎ টেবিলে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বললেন, ওই ছোকরাটাকে আপনি জোটালেন কোথা থেকে বলুন তো!

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোন ছোকরা?

ওই যে অভিজিৎ গাঙ্গুলি না কী যেন নাম।

আমিও চাপা গলায় বললাম, কেন বলুন তো!

আরে দূর! দূর! ও মাস্টারি করবে কী মশাই? ও তো ডেনজারাস নকশাল।

তাই নাকি?

আরে হ্যাঁ, বলছি কী তা হলে? মউডুবির বঙ্কিম গাঙ্গুলির নাতি। বংশটাই গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপের। এ ছোকরা তো শুনি খুনটুনও করেছে।

কোথা থেকে শুনলেন?

খবর নিয়েছি আর কি! ও ছোকরা স্কুলে ঢুকলে স্কুল লাটে তুলে দেবে।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, তা হতে পারে। তবে ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। হায়ার সেকেন্ডারিতে তিন বিষয়ে লেটার পেয়েছিল।

নির্বিকার মুখে মিথ্যে কথাটা বলে আমি জহরবাবুর রিঅ্যাকশন লক্ষ করতে লাগলাম। জহরবাবু অসহায়ভাবে নিজের ঠোঁট দুটো গিলে ফেলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, তিনটে লেটার!

তিনটে বলেই তো জানি।

টুকেছে তা হলে। বোমা বন্দুক বানিয়ে আর মানুষ খুন করে পড়াশুনোর সময়টা পেল কখন বলুন।

এই একটা ব্যাপার সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুব গভীর। তাই আমি খুব গম্ভীর হয়ে জহরবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনও পরীক্ষায় টুকেছেন?

আমি!— জহরবাবু থতমত খেয়ে বললেন, কী যে বলেন!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তা হলে আপনার একটা জিনিস জানা নেই। টুকে পাশ করা যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই লেটার পাওয়া যায় না। কারণ চোথা দেখে দেখে খাতায় তুলতে ডবল সময় লাগে। তার ওপর গার্ডের দিকেও নজর রাখতে হয়। যদি টোকার অভিজ্ঞতা থাকত তা হলে বুঝতেন, তিন ঘণ্টায় মেরেকেটে ত্রিশ-চল্লিশ নম্বরের ব্যবস্থা করা যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই লেটার পাওয়া যায় না। তা যদি যেত তা হলে আমিও হায়ার সেকেন্ডারিতে সব ক'টা বিষয়ে লেটার পেতাম।

জহরবাবু আমার স্বীকারোক্তিতে ভারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আবার নিজের ঠোঁট দুটো গিলে ফেলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, তাই বুঝি?

আমি গলায় যতদূর সম্ভব বিষাদ মাখিয়ে বললাম, হ্যাঁ জহরবাবু, আমিও টুকেই পাশ করেছি। সবক'টা বিষয়ে।

জহরবাবু সজোরে গলা খাঁকারি দিয়ে চট করে লাইন পালটে বললেন, আপনার কথা আলাদা। একদিকে তীব্র দারিদ্র্য, অন্যদিকে সাঙ্ঘাতিক জীবন-সংগ্রাম। মরণপণ লড়াই। হয়তো ঘরে বাতি জ্বালাবার মতো কেরোসিন নেই, বই নেই, খাতা নেই, পেনসিল নেই। অথচ পাশ করতেই হবে। ওরকম কনডিশনে মশাই, আমার তো মনে হয় না টোকা অপরাধ।

আমি মোলায়েম গলায় বললাম, কথাটা প্রতিমাকে বলবেন।

কোন কথাটা?

আমি যে পরীক্ষায় টুকে পাশ করেছি সেই কথাটা। ও তো আমার জীবনী লিখবে, ওর এসব জানা দরকার।

খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জহরবাবু বললেন, বলব। কিন্তু দেখবেন, ও আপনাকে ভুল বুঝবে না। আপনার ওপর ওর শ্রদ্ধা এতই বেশি যে, আপনার প্রতিটি কাজের মধ্যেই ও একটা মহত্ত্ব দেখতে পায়। কিন্তু ওই অভিজিৎ ছোঁড়া সম্পর্কে আমার একটু খিচ থেকেই গেল। অতগুলো লেটার ও বাগালে কী করে? ওর হয়ে অন্য কেউ পরীক্ষা দেয়নি তো?

তা কী করে বলব? দিতেও পারে।

লেটার প্রতিমাও গোটাকয় পেত, বুঝলেন পারিজাতবাবু! কিন্তু আচমকা টাইফয়েড হয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। টাইফয়েড বড় সাংঘাতিক জিনিস। পরীক্ষার আগে মাস দুয়েক তো প্রতিমা বই খুলতেই পারত না। অক্ষরের দিকে তাকালেই মাথা ঝিমঝিম করত।

বটে! তারপর?

সে আর বলেন কেন? আমি গরিব মানুষ, তবু কষ্টেসৃষ্টে একজন ভাল মাস্টার রাখলাম। মাস্টার

পড়ত, প্রতিমা শুনত। কিন্তু ব্রেনটা ভাল বলে শুনেই মনে রাখতে পারত।

ওভাবেই পরীক্ষা দিল?

পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না সেবার মেয়েটার। বলেও ছিল, এক বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর পরীক্ষা দিলে গোটা তিন-চার লেটার পাবেই। তা আমি রাজি হলাম না। আবার বছরটাকের ধাক্কা।

আমি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, গরিবদের বড় কষ্ট।

বড় কষ্ট। — প্রতিধ্বনি করে জহরবাবু বলেন, একবছর নষ্ট করা কি আমাদের পোষায়? তবে মাস্টারটি পেয়েছিলাম চমৎকার। চালাকচতুর ছোকরা। সে ভরসা দিল, সব ম্যানেজ করে দেবে।

দিয়েছিল?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে জহরবাবু বললেন, তা দিয়েছিল বটে।

কীভাবে?

জহরবাবু ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বলেন, ওই আর কি।

আমি বুঝলাম এবং আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

জহরবাবু করুণ স্বরে বললেন, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। চোথা দেখে লিখলে পাশ করা যায় ঠিকই, কিন্তু লেটার পাওয়া যায় না। আপনি অতিশয় বিজ্ঞ মানুষ।

অভিজ্ঞও।— আমি বললাম।

প্রতিমার সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই আপনার আশ্চর্য মিল।

তাই নাকি?

প্রতিমাও বলছিল। আপনার ডান গালে একটা তিল আছে। ওরও তাই।

আমি ডান গালে হাত বুলিয়ে বললাম, আছে নাকি? লক্ষ করিনি তো!

জহরবাবু একটু হেসে বললেন, নিজেকে আর আপনি কতটুকু লক্ষ করেন? আপনার হচ্ছে হাতির মতো দশা। হাতি যদি বুঝতে পারত যে সে কত বড় তা হলে তুলকালাম বাঁধিয়ে দিত। কিন্তু নিজেকে তো সে দেখে না। তাই বলছিলাম, আপনার দেখাশোনারও একজন লোক দরকার।

জহরবাবুর ইঙ্গিতটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। কিন্তু মনে হল, উনি কিছু বলতে চাইছেন। গভীর ও গোপনীয় কিছু।

আমি বিনীতভাবে বললাম, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

উনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, বিপত্নীকদের ভারী অসুবিধে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

গুণেনবাবুর বোন অবশ্য ভাল মেয়ে। তবে বড্ড রুগ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জহরবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, প্রতিমা নিজেই আপনার কাছে আসবে। আপনার জীবনের কথা জানতে খুবই আগ্রহ ওর। বলছিল, পারিজাতবাবুর কাছে গিয়ে বসে থাকলেও জ্ঞানলাভ হয়।

আমি বিনীতভাবে চুপ করে রইলাম। অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই অন্যমনস্ক এবং উত্তেজিত জহরবাবু ভুল ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে নিষেধ করলাম না।

ঘরে বসে আমি বাইরের বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে অনেক কিছু ভাবলাম। আমার মন পাখির মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে যায়, কিছুক্ষণ বসে, আবার ওড়ে। গুণেনবাবু, অধর, প্রতিমা... বৃষ্টি..

রাতে খাওয়ার টেবিলে রুমার সঙ্গে দেখা। খুবই সন্তর্পণে দূরত্ব বজায় রেখে আমি বসলাম এবং অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমাদের দারিদ্র্যের দিনে বাস্তবিকই আমরা প্রকৃত অর্থে ছোটলোক হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অল্প বয়সেই আমরা সবরকম খারাপ কথা ও গালাগাল শিখি এবং তা প্রয়োগ করতে শুরু করি। একথাও

ঠিক যে, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরুই হত “শুয়োরের বাচ্চা” দিয়ে। কালক্রমে অবশ্য আমি সেইসব শব্দকে সংযত ও সংহতভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে প্রয়োগ করি না। অনভ্যাসে বহু তীক্ষ্ণ গালাগাল ভুলেও গেছি। কিন্তু রুমা কেন যেন ভোলেনি। যথেষ্ট সংস্কৃতির চর্চা করা সত্ত্বেও ওর মধ্যে সেই নর্দমার বস্তিযুগের ঘরানা এখনও বেঁচে আছে। রেগে গেলেই রুমা সেই নর্দমার মুখটি খুলে দেয়। তখন আর ভদ্রতার লেশমাত্র থাকে না। সেই ভয়ে আমি কোনও সময়েই ওকে চটাই না। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওকে এবার একটু সাবধান করে দেওয়াও দরকার। গন্ধর্ব যদি সত্যিই ওর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হলে আমার বিপদ।

আমি অন্যদিকে চেয়ে থেকেও ওর মুড বুঝবার চেষ্টা করলাম। মনে হল, মুড খুবই ভাল। এত বৃষ্টিতে তা-ই হওয়ার কথা।

সাবধানে বললাম, গন্ধর্বর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

রুমা একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। পাতাটা ঝটাং শব্দে উলটে দিয়ে বলল, দেখা হতেই পারে।

আমি একটু ফাঁক দিয়ে বললাম, ওর অনেক ফ্যান হয়েছে দেখলাম।

রুমা ঝটাং করে আর একটা পাতা উলটে দিল। বলল, তাই নাকি? কীসের ফ্যান, নাচ না গান না ব্যায়াম?

তা কে জানে! মনে হল তিন রকমেরই।

ঠোঁট উলটে রুমা বলল, দু' চোখে দেখতে পারি না। মাগো! গায়ে গিল গিল করছে গোল গোল মাংসপিণ্ড! তার ওপর আবার পুরুষ হয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচ, গলা কাঁপিয়ে গান! ওয়াক!

আমি ভারী অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলাম। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, তোর পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু বেশ সুন্দরী সব মেয়ে জুটে গেছে ওর চারধারে।

রুমা সশব্দে ম্যাগাজিনটা টেবিলে ফেলে দিয়ে, চেয়ারটা এক ধাক্কায় ছিটকে ঘর থেকে পটাং পটাং চটির শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল।

রেগে গেছে। হয়তো রাতে খাবেও না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করি।

৬। অভিজিৎ

দাদুর সঙ্গে বসবাস করতে গেলে যে মনোভাব এবং চালচলনে অভ্যস্ত হতে হয় তা আমার সহজে হবে না। সন্ধের এবং বিশেষ করে রাতের দিকে একটু বইপত্র না পড়লে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু দাদুর ঘরে বাতির জোগাড় নেই। সরু অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মোম সম্বল। তাতে না হয় আলো, না হয় তার আয়ু বেশিক্ষণ।

দাদুর কাণ্ড শুনে ফুলমাসি হেসে গড়াগড়ি খেলেন কিছুক্ষণ। তারপর তেল ভরে প্রায়-নতুন একটা হ্যারিকেন দিয়ে বললেন, এটা জ্বালিয়ে নিস। কাল যখন আসবি নিয়ে আসিস, আবার তেল ভরে চিমনি মুছে দেব।

দাদুর ঘরের অন্ধকারটা সেই হ্যারিকেনের দাপটে পিছু হটল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা কাচের আলমারি-বন্দি পুরনো কিছু বই আছে। প্রায় সবই পড়া। বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল থেকে অনেকেই আছেন। আমি পুরনো প্রবাসীর একটা বাঁধানো খণ্ড নিয়ে বসে গেলাম।

দাদু বার দুই এসে হ্যারিকেনটা দেখলেন। তারপর থাকতে না পেরে বললেন, কে দিল? গণেশের বউ নাকি?

হ্যাঁ।

তেল পাচ্ছে কোথায়? মহিমের দোকানে এসেছে বুঝি?

কেন, আপনার লাগবে? গণেশকাকাকে বললেই এনে দেবে।

দাদু ঠোঁট উলটে বললেন, তেল দিয়ে কী করব? হ্যারিকেনই নেই। পুরনো দু'-তিনটে যা-ও ছিল সব ভেঙে গেছে।

তা হলে তো কথাই নেই।

হ্যারিকেনটা তো বেশ মজবুত দেখছি। ব্রিটিশ আমলে জার্মান হ্যারিকেন পাওয়া যেত। ছেঁচা জিনিস, বহুদিন চলত। এখনকার দিশিগুলো বড্ড হালকা পলকা।

সে জিনিস আর কোথায় পাবেন?

আজকাল হ্যারিকেনের দাম কত হয়েছে বলো তো!

যেমন জিনিস তেমন দাম। তবে পনেরো-ষোলো টাকার নীচে বোধহয় পাওয়া যায় না।

ও বাবা! এত? দিনে-কালে হল কী?

সেই কথাই তো সবাই বলাবলি করে আজকাল।

একটু আগে ধুপ করে একটা শব্দ হল শুনেছ?

না তো।

হয়েছে। পুরনো পাকঘরের পিছনের গাছটা থেকে নারকোল পড়ল।

ও।

একবার যাও না। নিয়ে এসো।

এত রাতে!

রাত কোথায়? হ্যারিকেনটা নিয়ে যাও। নইলে সকালে ফুলকুড়ুনিরা এসে নিয়ে যাবে। রোজ নিয়ে যায়।

যাক না। একটা নারকোল গেলে যাবে।

রোজ একটা দুটো করে গেলে বছরে কতগুলো যায় হিসেব করেছ?

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, বাইরে তো এখন এক হাঁটু জল।

তোমাকে বলতাম না। আমি নিজে রাতবিরেতে চোখে দেখি না। পড়ে-টড়ে গেলে মুশকিল।

একটা টর্চ দিন।

টর্চ কীসে লাগবে! হ্যারিকেনটা নিয়ে যাও।

গত দু'দিনে দাদুকে আমি প্রায় চার বস্তা নারকোল বিক্রি করতে দেখেছি। গড়পরতা এক-একটার দর পাঁচ সিকে। চার বস্তায় কম করেও শত খানেক নারকোল হবে। দাদুর আয় সে হিসেবে মন্দ নয়। তবু একটা টর্চ কিনবেন না। কিংবা হয়তো আছে, বের করবেন না।

অগত্যা হ্যারিকেনটা নিয়ে বেরোতে হল। একটু আগেই বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু আকাশ গোঁ গোঁ করছে। দাপটের সঙ্গে বইছে বাতাস। হ্যারিকেনের শিখা লাফাতে লাগল।

দাদু তাঁর মোটা বেতের লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা সঙ্গে নিয়ে যাও। লতা-টতা অবশ্য এই দুর্যোগে বেরোয় না। তবে হেলে ঢোঁড়া আছে। সঙ্গে লাঠি রাখা ভাল।

দাদুর অনুমান যে নির্ভুল তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। এই বাড়ির সঙ্গে দাদুর সমস্ত সত্তা এমন জড়িয়ে গেছে যে, ঘরে বসে থেকেও একটা অদৃশ্য অ্যানটেনা দিয়ে কোথায় কী ঘটছে তা টের পান।

পুরনো রান্নাঘরের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে বাস্তবিকই নারকোলটা পাওয়া গেল। সেটা বগলদাবা করে ফেরার সময় আমার কিন্তু বিরক্তিটা রইল না। কেমন যেন একটা মায়া জন্মাল। নিজের বাড়ি, নিজের জমি, নিজেদের দখলি গাছপালা, এর একটা আলাদা ব্যাপার আছে। সব কিছুই পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না, কলকাতায় আমরা এরকমটা ভাবতেই পারি না। সেখানে কান চুলকোনোর জন্যও পয়সা দিতে হয়।

ঘরে এসে দাদুর হাতে নারকোলটা দিতেই উনি নেড়ে দেখলেন, জলের শব্দ হচ্ছে কি না। তারপর চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার চাকরির কী হল?

এখনও কিছু হয়নি।

হবে মনে হয়?

না হওয়ারই কথা। আর একজন লোকাল ক্যান্ডিডেট আছে।

কে বলো তো!

জহরবাবু নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ে।

জহর বাঁড়ুজ্জে নাকি?

হতে পারে। পদবিটা জানি না।

ইরিগেশনে এক জহর আছে জানি। তার মেয়ে কি তোমার চেয়ে বেশি পাশ?

হ্যাঁ। বি এড।

দাদু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তা তুমি এতদিন ঘরে বসে কোন ভেরেন্ডা ভাজছিলে? বি এডটা পাশ করতে পারোনি?

তখন কি জানতাম যে মাস্টারি করব?

তা বলে একটা মেয়ে তোমাকে লেখাপড়ায় ডিঙিয়ে বসে থাকবে, এ কেমন কথা?

ডিঙিয়ে বেশিদূর যায়নি। তবে একটা পাশ বেশি করেছে বটে।

তবে?

আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? পারিজাতবাবু এখনও আমাকে না করেননি।

কী বলেছে?

গণেশকাকা খোঁজ রাখছেন। যা বলার ওঁকেই বলবে।

আবার ডেকে পাঠাবে বলছ?

পাঠাতেও পারে।

চাকরি তোমার একটা হওয়া দরকার। যদি এখানে থাকতে পারো তো খুব ভাল।

দেখছি কী হয়।

ঘরে বসে সময় না কাটিয়ে একটু পারিজাতের কাছে যাতায়াত করলেও তো পারো।

তদবির করতে বলছেন?

উপায় কী? তদবির বরাবরই করতে হত। এখনও হয়।

ওসব আমি ভাল পারি না।

পারতে হয়। তুমি এখানে থেকে চাকরি করলে শেষ বয়সে আমাকে আর বাস্তুভিটে বিক্রি করতে হয় না। তুমিই সব দেখেশুনে রাখতে পারবে।

চেষ্টা তো করছি।

তুমি চেষ্টা করছ না। একে কি চেষ্টা বলে?

আমার হয়ে গণেশকাকা করছেন।

গণেশটা এমনিতে ভাল লোক, কিন্তু কথায়-বার্তায় পোক্ত নয়। ও কি পারবে? তুমি নিজেই কাল একবার যাও। রোজই যাও। ওতে ব্যাপারটা ভুল পড়বে না। তোমাকে দেখলে মনে পড়বে।

মেয়েটার বাবা খুব তেল দিচ্ছে।

দেবেই। চাকরির যা বাজার। তুমি কাল সকালেই যাও। একটা মেয়ের কাছে হেরে এসো না।

দাদু কথাটা ভুললেন না। ভোর না হতেই আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন, ওঠো, ওঠো, বেলা হয়ে যাবে। এইবেলা বেরিয়ে পড়ো।

জ্বালাতন আর কাকে বলে। তবে উঠতেও হল।

পারিজাতবাবুকে গিয়ে আমি কী বলব তা আমার মাথায় এল না। অনিচ্ছুকভাবে ধীরে ধীরে চারদিক দেখতে দেখতে আমি সাইকেল চালাতে থাকি।

চারদিকে আজ অবশ্য জল ছাড়া প্রায় কিছুই দেখার নেই। সাইকেলের চাকা সিকিভাগ জলের তলায়। খানা-খন্দে পড়ে ঝফাং ঝফাং করে লাফিয়ে উঠছে। কোথাও থকথকে আঠালো কাদায় পড়ে থেমে যাচ্ছে ঘচাৎ করে। আমার প্যান্টের নিম্নাংশ গুটিয়ে রাখা সত্ত্বেও কাদায় মাখামাখি হল। একজোড়া হাওয়াই চপ্পল ধার দিয়েছে ফুলমাসি। সেও কাদা থেকে টেনে তুলতে গিয়ে একটা স্ট্র্যাপ ফচাক করে খুলে গেল।

এসব আমার অভ্যাস নেই বটে, তা বলে খুব খারাপও লাগছে না। এই গাঁয়ে আমার জন্ম। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এক দুরারোগ্য আকর্ষণ থাকবেই। তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাক বা না থাক। এই গাঁয়ের আরও একটা আকর্ষণ ফুলমাসি। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ যুক্তিসিদ্ধ নয়। আমি তাঁর জামাই হতে পারতাম। কিন্তু হইনি। তবু আমার প্রতি তাঁর এক দুর্জয় দুর্বলতা। কারণটা আমি কখনও খুঁজে দেখিনি। যাকগে, কিছু জিনিস না জানলেও চলে যায়। হয়তো না জানাই ভাল।

সকালে যখন সাইকেলটা চাইতে গেলাম তখন ফুলমাসি চা আর তার সঙ্গে রুটি বেগুনভাজা খাওয়ালেন। খেতে খেতে একসময়ে বলেই ফেললাম, খুব তো আদর দিয়ে মাথায় তুলছ। পরে বুঝবে।

কী বুঝব রে?

যদি চাকরি পাই তো পাকাপাকি আস্তানা গাড়তে হবে এখানে। তখন রোজ জ্বালাতন হয়ে বলবে, অভীটা গেলে বাঁচি।

তাই বুঝি! তুই তো হাত গুনতে জানিস।

আমি মাথা নেড়ে বলি, পাকাপাকিভাবে থাকলে দাম কমে যাবে।

মাসি ঝগড়ার গলায় বলল, সে যদি কমেই তা হলে বরং তোর কাছেই আমার দাম কমবে। তখন বন্ধু হবে, বান্ধব হবে, আড্ডা হবে, মাসি মরল কি বাঁচল কে তার খোঁজ করে। আর যদি বিয়ে করিস তবে তো আর কথাই নেই। বছর ঘুরলেও বাছা আর এমুখো হবেন না।

এসব অবশ্য কথার কথা। সবকিছুই নির্ভর করছে একটা জিনিসের ওপর, চাকরিটা আমার হবে কি হবে না। জহরবাবু তাঁর মেয়েকে ঢোকানোর জন্য যে পন্থা নিয়েছেন তা যদি সফল হয় তবে আমার হওয়ার চান্স নেই। কিন্তু পারিজাত লোকটিকে আমার বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে। লোকটা জহরবাবুর ফাঁদে পা দেবে বলে মনে হয় না। যদি প্রতিমা আর আমার মধ্যে ওপেন কমপিটিশন হয় তবে আমার চান্স কিছু বেশিই। প্রতিমা বি এড, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার রেজাল্টটা একটু ভাল। চাকরিতে এই পরীক্ষাটার রেজাল্টই গুরুত্ব পায় বেশি।

বড় রাস্তায় উঠে দেখি, বহু লোকজন জড়ো হয়েছে। রাস্তার উল্টোদিকের মাঠেও বহু লোক। চাংড়াপোঁতার বাঁধের ওপর সারসার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে লাঠি সোটা। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব চারদিকে।

একজন চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে মোড়ল, গণ্ডগোল নাকি?

লোকটা আমায় চেনে। বলল, চাংড়াপোঁতার লোকেরা বাঁধ কেটে দিতে এয়েছিল। তাই সবাই বাঁধ পাহারা দিচ্ছে।

ইরিগেশনের খালের ওপাশে চাংড়াপোঁতা। জায়গাটা আমি চিনি। ওখানকার ঝিঙে খুব বিখ্যাত। বললাম, বাঁধ কাটতে চায় কেন? ওপাশে জল নাকি?

খুব জল। চাংড়াপোঁতায় শুধু বাড়িঘরের চালটুকু দেখা যাচ্ছে, আর সব জলের তলায়।

আমি একটু শিউরে উঠলাম। বাঁধ কেটে দিলে মউডুবি চোখের পলকে সাগরদিঘি হয়ে যাবে। ঘরে বুড়ো দাদু।

আমি দোকানিকে বললাম, মারদাঙ্গা লাগলে আমাকে খবর দিয়ো। আমিও জুটে যাব'খন। পাহারা দিতে হলে তাও দেব।

লোকটা হেসে বলল, দরকার হবে না। আমরা তো আছি। সকলেরই জান কবুল।

লাশ-টাশ পড়েছে নাকি?

আজ্ঞে না।

আমি খানিকটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে রওনা হলাম। মনে মনে একটু হাসিও পাচ্ছে। আমরা কত না স্বার্থপর! চাংড়াপোঁতা ডুবুক, মউডুবি না ডুবলেই হয়! অন্যে মরছে মরুক, আমরা বেঁচে থাকলেই হয়। এই স্বার্থপরতাই এখন ভারতবর্ষের জীবন-বেদ। আমরা তার মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছি। আমাদের জ্যেষ্ঠরা এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের শেখাতে পারেননি।

অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চাংড়াপোঁতা থেকে খাল পার হয়ে একটা ছেলে স্কুলে পড়তে আসত। তখনও চাংড়াপোঁতায় স্কুল হয়নি। সেই ছেলেটা ছিল বিশু। আমার খুব বন্ধু। একবার তার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম।

কে জানে বিশু এখনও বেঁচে আছে কি না। না থাকার কথা নয়। কিন্তু আজকাল আমার বয়সি ছেলেদেরও বেঁচে থাকা সম্পর্কে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। অবশ্য বিশু বেঁচে থাকলেও যে চাংড়াপোঁতাতেই আছে এমন নয়। আবার থাকতেও তো পারে।

একবার ইচ্ছে হল, সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে চাংড়াপোঁতার দিকটা দেখে আসি। তারপর ভাবলাম, থাক। কী দরকার? কিছু ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকাই ভাল।

আজ বৃষ্টি নেই। মেঘ-ভাঙা একটু রোদও উঠেছে। গাছপালা আর ভেজা মাটির গন্ধ ম ম করছে। আমি বুক ভরে দম নিলাম। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে কিছু লোক গাছতলায় বসে গেছে। ইটের উনুনে রান্না চাপিয়েছে কেউ কেউ। কিছু লোক পায়ে হেঁটে চলেছে শহরের দিকে। বুঝতে অসুবিধে নেই, আশপাশের নিচু জায়গাগুলো জলে ডুবেছে।

ডুববেই। বহুকাল ধরে এ দেশের নদীগুলির কোনও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার হয়নি। অধিকাংশ নদীখাতই পলি পড়ে পড়ে অগভীর হয়ে এসেছে। এক ঢল বর্ষার জলও বইতে পারে না। নিকাশি খাল সংখ্যায় অপ্রতুল। প্রতিবছর তাই কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর অবধি প্রায় সব জেলাই ভাসে। বছরওয়ারি এই বন্যা সামাল দেওয়া কিছু শক্ত ছিল না। চাংড়াপোঁতার দিককার বাঁধ যদি যথেষ্ট শক্ত-পোক্ত হত তা হলে গ্রামটা ভেসে যেত না। আমি জানি, খরার সময় ওই সেচখাল শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। আর ভারী বর্ষা হলে সেই খালই হয় বানভাসি।

সাইকেল নিয়ে আমি সারা শহর কয়েকবার টহল দিলাম। বলতে কি পারিজাতের বাড়ি হানা দিতে আমার একটু লজ্জা-লজ্জাই করছে।

গণেশকাকার দোকানে নামতেই গণেশকাকা বলেন, পারিজাতবাবুর বাড়ি হয়ে এলি?

না। এখনও যাইনি।

সর্বনাশ! উনি যে একটু আগে জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হেসে বললাম, তাড়া কীসের?

গণেশকাকা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেন, তাড়া নেই মানে! জহরবাবু পিছনে জোঁকের মতো লেগে আছে তা জানিস? কাল রাতেও গিয়েছিল পারিজাতবাবুর কাছে। আজ সকালে অসীমা দিদিমণির দাদা শুনে এসে বলে গেল। এই দেখ, জহরবাবুর ছাতা।

গণেশকাকা কাচের আলমারির তলা থেকে একটা বাঁশের ডাঁটওলা পুরনো ছাতা বের করে বিজয়গর্বে আমাকে দেখালেন।

কিন্তু জহরবাবুর ছাতা দেখেও আমি উত্তেজিত হলাম না। শুধু নিরুৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ওটা পেলেন কোথায়?

কাল পারিজাতবাবুর ওখানে গুণেনবাবুর সঙ্গে জহরবাবুর দেখা হয়েছিল কিনা। ভুল করে গুণেনবাবু জহরবাবুর ছাতাটা নিয়ে এসেছিল। আমাকে দিয়ে গেলেন ফেরত দেওয়ার জন্য।

আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বলি, আপনি ফেরত দেবেন কেন? অন্যের ফাই-ফরমাশ খাটা কি আপনার কাজ?

গণেশকাকা অতি উদার একটু হাসলেন। বললেন, এটুকু করা কি আর ফাই-ফরমাশ খাটা রে? ফেরার সময় জহরবাবুর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাব, পথেই পড়বে। গুণেনবাবুর সময় ছিল না।

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, বরং আমাকেই দিন। দিয়ে আসি।

তুই দিবি? তা ভাল কথা।

ছাতা ফেরত দেওয়াটা আমার ছুতো মাত্র। জহরবাবু বা তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার আর একবার মুখোমুখি হওয়া দরকার। মেয়েটার চাকরি কতখানি দরকার তা আমি জানতে চাই। যদি বুঝি ওদের প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশি তা হলে আমি চাকরিটা ছোঁব না।

গণেশকাকার নির্দেশমতো জহরবাবুর বাড়ি পৌঁছোতে আমার সময় লাগল সাইকেলে মিনিট দেড়েক। বাড়িটা খুবই পুরনো, জীর্ণ এবং ছোট। বাগানের বেড়া ভেঙে পড়েছে বৃষ্টিতে। প্রকাণ্ড একটা গোরু ঢুকে ফুলগাছ খেয়ে নিচ্ছে আর প্রতিমা একটা ছাতা নিয়ে সেটাকে তাড়ানোর অক্ষম একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। বাড়ির সামনে আমাকে নামতে দেখেই সভ য়ে ছাতাটা পিছনে লুকিয়ে ফেলে একদম স্ট্যাচু হয়ে গেল।

আমি বললাম, চিনতে পারছেন? আমি আপনার প্রতিপক্ষ।

প্রতিমা ভারী লজ্জা পেল। আটপৌরে পোশাকে তাকে আজ মন্দ লাগছে না দেখতে। সাজগোজ বেশি না করলেই যে মেয়েদের বেশি সুন্দর লাগে এই সত্যটা মেয়েরা কখনওই বোঝে না।

প্রতিমা সামান্য একটু হেসে বলল, চিনব না কেন? আসুন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন?

না। বাবা অফিসে গেছেন।

আমি ছাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলি, এটা উনি কাল পারিজাতবাবুর বাড়িতে ফেলে এসেছেন। নিন।

প্রতিমা তার পিছনে লুকনো ছাতাটা বের করে চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! তাই আমি ভাবছি, বাবার ছাতায় আমি যে নামের আদ্যক্ষর সাদা সুতো দিয়ে তুলে দিয়েছিলাম সেটা কোথায় গেল।

আমার ছাতা বিনিময় করলাম। সেইসঙ্গে হৃদয় বিনিময়ও হয়ে গেল কি না বলতে পারব না। তবে এই সময়ে প্রকাণ্ড গোরুটা একটা কলাবতী ফুলের গাছ মুড়িয়ে মসমস করে খাচ্ছিল। আমরা সেটা দেখেও দেখলাম না।

হাঁস যেমন গা থেকে জল ঝাড়ে প্রতিমা তেমনি লজ্জাটা ঝেড়ে ফেলে খুব স্মার্ট হয়ে গেল। বলল, আসুন, গরিবের বাড়ি চা খেয়ে যান। কষ্ট করে এসেছেন।

প্রতিমারা বাস্তবিকই গরিব। ঘরের দেয়ালে বহুকাল কলি ফেরানো হয়নি। বর্ষায় নোনা ধরে গেছে। বাইরের ঘরে তিনটে টিংটিঙে বেতের চেয়ার আর একটা ছোট্ট চৌকি। দেয়ালে কিছু সূচিশিল্প, একটা নেতাজির ছবিওলা ক্যালেন্ডার আর গোবরের চাপড়ার ওপর তিনটে কড়ি লাগানো। দরজা জানলা বড়ই নড়বড়ে। একটা জানলার পাল্লায় ছিটকিনি নেই, তার বদলে পাটের দড়ি লাগানো।

কারা বেশি গরিব, প্রতিমারা না আমরা, তা ভাবতে ভাবতেই প্রতিমা ভিতরবাড়ি থেকে এক পাক ঘুরে এসে আমার মুখোমুখি চৌকিতে বসল।

চাকরিটা আপনারই হবে।— বলল সে।

কেন?

আমার তেমন ইচ্ছে নেই।

তাই বা কেন?

আমি পারিজাতবাবুর জীবনী-টীবনী লিখতে পারব না। বাবা ভীষণ বোকা। কেবলই আমাকে খোঁচাচ্ছে, পারিজাতবাবুর জীবনী লিখতে। বলুন তো, এসব করতে সম্মানে লাগে না?

আমি বললাম, জীবনী লেখার কথাটা আমিও সেদিন শুনেছি। ব্যাপারটা কী বলুন তো! এত লোক থাকতে হঠাৎ পারিজতাবাবুর জীবনী লেখার কী দরকার পড়ল?

আমারও তো সেই প্রশ্ন। বাবাকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু বাবা কেবল বলে, লোকটা অহংকারী। জীবনী লেখার কথা শুনলে খুশি হয়।

হয় নাকি?

তা কে জানে। আমি লোকটাকে ভাল চিনি না। তবে শুনেছি, পারিজাতবাবু ভাল লোক নন।

আমিও ওরকমই শুনেছি। তবে লোকটাকে আমার খুব খারাপ লাগেনি।

কিন্তু লোকটা খারাপই। ওর বউ আত্মহত্যা করেছিল জানেন?

তাই নাকি?

বিষ খেয়ে। সবাই বলে ওটা খুন।

তদন্ত হয়নি?

কে জানে! হলেও পারিজাতবাবুকে ধরা সহজ কাজ নয়।

আপনি জানেন, খুন?

তা-ই তো সবাই বলে।

যাঃ। ওসব গুজব! বুদ্ধিমান লোকেরা কখনও বউকে খুন করে না।

তা হলে কী করে?

ডিভোর্স করতে পারে। খামোকা খুন করতে যাবে কেন?

খামোকা মোটেই নয়। ওর বউ অনেক গোপন খবর রাখত। সেগুলো ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল বলেই একদিন বেচারার জলের গেলাসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাঝরাতে ঘুমের চোখে সেই জল খেয়ে মেয়েটা মরে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপন খবরটা কী রাখত ওর বউ?

পারিজাতবাবুর অনেকরকম বে-আইনি কারবার আছে তো। সেইসব।

আমি পা নাচিয়ে লঘু স্বরে বললাম, তা হলে আর পারিজাতের দোষ কী? গোপন খবর ফাঁস করতে চাওয়াই তো অন্যায়। আইনে ওটাকে বলে ব্ল্যাকমেল।

প্রতিমা বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে, আপনি ওকে সাপোর্ট করছেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ওকেও করছি না, ওর বউকেও করছি না। মনে হয় ব্যাপারটা হয়েছিল শঠে শাঠ্যং।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, পারিজাত খুন করতে পারে না এমন নয়। অতিশয় উচ্চাশাসম্পন্ন, অহংকারী ও যশপ্রতিষ্ঠালোভী লোকের পক্ষে কাজটা অসম্ভবও নয়। কিন্তু পারিজাতকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় না যে, সে খুন-টুন করেছে। লোকটার ক্ষুরধার বুদ্ধি। এ যদি কখনও খুন করে তবে এমন সূক্ষ্ম পন্থায় করবে যাতে তার ওপর লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে না।

প্রতিমা অবশ্য তর্কের গলায় বলল, মোটেই শঠে শাঠ্যং নয়। পারিজাতবাবুর বউ ছিল দারুণ সুন্দরী আর খুব শিক্ষিতা।

আমি প্রতিমাকে একটু জ্বালাতন করার জন্যই বললাম, তাতে কী? সুন্দরীই তো গণ্ডগোল করে বেশি। হয়তো তার গোপন প্রেমিক ছিল।

মোটেই নয়।

খুনটা কি এখানে হয়েছিল?

না। কলকাতায়।

তা হলে এত ডিটেলস জানলেন কী করে?

শুনেছি।

শোনা কথার ফিফটি পারসেন্ট বাদ দিতে হয়।

চা নিয়ে এলেন প্রতিমার মা। ভারী রোগা-ভোগা মানুষ। পরনে মলিন একখানা শাড়ি। প্রণাম করার সময় ওঁর পায়ে হাজা লক্ষ করলাম। লাজুক মানুষ। চা দিয়ে শুধু বললেন, তোমরা বসে গল্প করো। বলেই চলে গেলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুঝলাম, প্রতিমারা বাস্তবিকই গরিব। অত্যন্ত বাজে সস্তা চা-পাতায় তৈরি কাথটি আমি প্রতিমার সুশ্রী মুখখানা দেখতে দেখতে খেয়ে নিলাম। ওই অনুপানটুকু না থাকলে চা গলা দিয়ে নামত না।

পারিজাতের বউকে ছেড়ে প্রতিমা অন্য প্রসঙ্গ তুলল, আচ্ছা, হায়ার সেকেন্ডারিতে আপনি নাকি দারুণ রেজাল্ট করেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে বলল?

সব জানি। চারটে লেটার। আপনি কি নকশাল ছিলেন?

ও বাবা। অনেক জানেন দেখছি!

জানিই তো। লোকে বলে আপনি ডেনজারাস ছেলে ছিলেন।

আমি বললাম, ডেনজারাস জেনেও বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াচ্ছেন?

আপনাকে দেখে মোটেই ডেনজারাস মনে হয় না।

তা হলে কী মনে হয়?

বললাম তো, ডেনজারাস মনে হয় না।

সেটা তো নেতিবাচক গুণ। অস্তিবাচক কিছু বলুন।

মোটে তো আলাপ হল। ক'দিন দেখি, তারপর বলব।

আমি একটু হতাশার গলায় বললাম, দেখবেন কী করে? আমি তো কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাব।

কেন, ফিরে যাওয়ার কী হল? চাকরি তো পাচ্ছেনই।

চাকরিটা বরং আপনিই করুন। স্কুলের চাকরির সঙ্গে পারিজাতের জীবনী লেখার পার্টটাইম জব। ভালই হবে।

হঠাৎ প্রতিমার মুখখানা ফ্যাকাসে দেখাল। কথাটা বলা হয়তো ঠিক হয়নি। প্রতিমা কিছুক্ষণ মন দিয়ে নিজের হাতের পাতা দেখল। তারপর বলল, একটা মেয়ে বেকার থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা ছেলে বেকার থাকলে ভারী কষ্ট।

কথাটা শুনে মেয়েটাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লেগে গেল। সুস্থির চিন্তা ও স্নিগ্ধ মন ছাড়া এরকম সিদ্ধান্তে আসা বড় সহজ নয়। বিশেষ করে তেমন মেয়ের পক্ষে, যে দরিদ্র পরিবারে মানুষ হয়েছে এবং সংসারের প্রয়োজনেই যার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে চাকরিটা পাওয়া দরকার। আজকাল অনেক বড়লোকের বউ বা মেয়ে স্কুল, কলেজ, অফিসের নানা চাকরি দখল করে বসে আছে। তাদের অর্থকরী প্রয়োজন নেই। নিতান্ত সময় কাটানো বা গৃহ থেকে মুক্তিই তাদের উদ্দেশ্য। এরা যদি জায়গা ছেড়ে দিত তা হলে এই গরিব দেশের অনেকগুলো পরিবার বেঁচে যেত।

প্রতিমার এই কথায় ভিতরে ভিতরে একটা আবেগের চঞ্চলতা অনুভব করছিলাম। সেটার রাশ টেনে একটু উদাস গলায় বললাম, আপনার মতো করে তো সবাই ভাবে না।

প্রতিমা মাথা নিচু করে হাসিমুখে বলল, আমার এমনিতেও চাকরিটা হত না। আমার হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট ভাল নয়।

কিন্তু আপনি যে বি এড, নতুন আইনে বি এড ছাড়া নাকি কাউকে চাকরি দিচ্ছেই না।

আপনাকে দেবে। শুনেছি আপনি অসীমাদির ক্যান্ডিডেট।

আপনি অনেক কিছু শোনেন তো!

প্রতিমা সরল হাসিমুখে বলে, আমার চাকরির জন্য বাবা এত বেশি অ্যাংশাস যে, আপনার সম্পর্কে সব খোঁজ খবর নিয়েছেন। আজ ভোরবেলা কোথা থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললেন, তোর হবে না রে। ওই ছেলেটা অসীমার ক্যান্ডিডেট।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনি যা শোনেন তার ফিফটি পারসেন্ট বাদ দেবেন। আমি অসীমাদির ক্যান্ডিডেট নই। উনি আমাকে ভাল করে চেনেনও না। তবে একজন মিডলম্যান কিছু তদবির করেছিল। তাতে তেমন কিছু কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ অসীমাদি খুবই অন্যমনস্ক আর বিমর্ষ ছিলেন সেদিন। আমার হয়ে উনি খুব একটা লড়ালড়ি করবেন না। ওঁর বোধহয় মুড নেই।

লড়ালড়ি করতে হবে না। উনি একবার বললেই হবে। পারিজাতবাবুর কাছে অসীমাদির প্রেস্টিজই আলাদা।

আপনি তা হলে আমার কাছে হেরেই বসে আছেন।

হারতেই যখন হবে তখন আগে থেকে হার মেনে নেওয়াই ভাল।

আমি একটা বড় শ্বাস ফেলে বললাম, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

কী আন্দাজ করেছিলেন?

আপনি একটু সেকেলে। এখনকার মেয়েরা চাকরির জন্য জান লড়িয়ে দেয়।

জান লড়িয়েও আমার লাভ নেই। অসীমাদির ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে পারব কেন!

আপনার বাবাও কি হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনার মতো?

এ কথায় প্রতিমা খুব লজ্জার হাসি হেসে বলল, বাবা একটু কীরকম যেন আছে। কে যেন বাবার মাথায় আইডিয়া দিয়েছে যে, চাকুরে মেয়েদের ভাল বর জুটে যায়।

আমি বললাম, কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। বিবাহযোগ্য যুবকেরা এখন ওয়ার্কিং গার্লই প্রেফার করছে। এখনও ভেবে দেখুন লড়বেন কি না।

লড়ার ইচ্ছে থাকলে আর এতক্ষণ বসে আছি! বাবা বলে গেছে, আজ সকালে যেন পারিজাতবাবুর কাছে একবার যাই। উনি নাকি ডেকেছেন। কিন্তু আমি যাইনি।

গিয়ে কী হত?

তা কে জানে! পারিজাতবাবুর হয়তো কিছু জানার ছিল।

প্রতিমার জন্য আমার একটু দুশ্চিন্তা হতে লাগল। পারিজাতের বাড়িতে ওকে পাঠানোর পিছনে জহরবাবুর কোনও অদ্ভুত উদ্দেশ্য নেই তো! থাকলেও অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। প্রতিমা আমার কেউ নয়, জহরবাবুরই আত্মজা। ওর ভালমন্দ উনিই বুঝবেন। তবু মনটায় একটা খিচ থেকেই গেল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, পারিজাতের সঙ্গে অসীমা দিদিমণির বিয়ের কথা কি একদম পাকা?

ওমা! পাকা নয়তো কী?— খুব অবাক হয়ে প্রতিমা বলে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, বিয়েটা যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ কিছুই বলা যায় না। হয়তো কোনও কারণে বিয়েটা ভেঙে গেল।

কী কারণ?

ধরুন যদি সে কারণ আপনিই হন!

আমি?— প্রতিমা আকাশ থেকে পড়ে বলে, আমি কীসের কারণ? যাঃ!

কথাটা হঠকারিতাবশে বলে ফেলে আমি একটু বিপদেই পড়লাম। প্রতিমা সিধে-সরল মানুষ। বোধহয় সহজেই ঘাবড়েও যায়। মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি সাহস করে বললাম, আপনিই বলেছিলেন পারিজাত ভাল লোক নয়, খুন করারও অভ্যাস আছে। ওর কাছে কোনও যুবতী এবং সুন্দরী মেয়ের কি একা যাওয়া ভাল?

প্রতিমার মুখের আহত ভাবটা রয়েই গেল। বলল, কিন্তু আপনি তো সে ইঙ্গিত করেননি। একটা খুব বাজে কথা বলেছেন। কেন বললেন?

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, মনে হল, তাই বললাম।

প্রতিমা অত্যন্ত অকপটে বলল, আপনি খুব খারাপ।

আমার চেয়েও খারাপ লোক আছে।

প্রতিমা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। ওর চোখে টলটল করছে জল। তবু আমার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে আমি ওর উপকারই করেছি। সরল মেয়ে, হয়তো দুনিয়ার প্যাঁচ খোঁচ তেমন ভাল জানে না। যদি আমাব কথায় সচেতন ও সতর্ক হয় তবে ভালই হবে।

কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে বাইরে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার চাকরির আর দরকার নেই। তাই পারিজাতবাবুর কাছে যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু পারিজাতবাবুর কাছে গেলেই যে মেয়েরা বিপদে পড়ে একথা আপনাকে কে বলল? ওঁর কাছে নানা কাজে কত মেয়ে যাচ্ছে।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আহা, কথাটা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন?

কথাটা আপনি বললেন কেন তা হলে?

আর বলব না।

আপনি ভীষণ খারাপ।— বলতে বলতে প্রতিমা উঠে দাঁড়াল এবং কোনও কথা না বলেই ভিতরবাড়িতে চলে গেল হঠাৎ।

কী আর করা! বেকুবের মতো মিনিটখানেক বসে থেকে আমি ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রতিমাকে একটা কথা বলে আসার সুযোগ হল না। নইলে আমি বলতাম, আমি খারাপ বটে, কিন্তু আপনি ভাল। বেশ ভাল। এরকম ভাল থাকারই চেষ্টা করবেন।

সিংহীবাড়িটা পেরোনোর সময় খোলা ফটক দিয়ে দূরে গাড়িবারান্দার কাছে একটা জিপগাড়ির মুখ দেখতে পেয়ে আমি ব্রেক কষি। পারিজাত হয়তো কোথাও গিয়েছিল, ফিরেছে। নয়তো কোথাও যাবে। আমি খুব কিছু চিন্তাভাবনা না করে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে খোলা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

ভিতরে ঢুকে দেখি, একটা নয়, দুটো জিপ এবং একটা অ্যামবাসাডর গাড়িবারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গাড়িতেই ত্রিসিংহ মার্কা দেখলাম। অর্থাৎ সরকারি গাড়ি।

আজ সিঁড়ির মুখেই দারোয়ান। আমি সাইকেল গাড়িবারান্দার তলায় থামাতেই সে বলল, এখন দেখা হবে না। জরুরি মিটিং হচ্ছে।

বাইরের ঘরের দরজা আঁট করে বন্ধ। বেশ হাই লেভেলের গুরুতর সলাপরামর্শ হচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি একটু উগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ভিতরে কে কে আছে?

দারোয়ানটা এমনিতে হয়তো আমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেদিন সে বোধহয় সকালে আমাকে পারিজাতের সঙ্গে দৌড়োতে দেখেছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কতটা তা আন্দাজ করা তার পক্ষে মুশকিল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আর ফুড অফিসার। আরও কয়েকজন আছে।

আমি সাইকেলটা গাড়িবারান্দার ধারে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বললাম, ঠিক আছে, মিটিং শেষ হোক। আমি বাগানে অপেক্ষা করছি।

দারোয়ান কিছু বলল না।

সিংহীদের বাগান বরাবর আমাকে আকর্ষণ করত। আজও করে। পারিজাতকে ধন্যবাদ যে, বাগানটায় সে হাত দেয়নি। যেমন ছিল প্রায় তেমনই রেখে দিয়েছে। অলস পায়ে আমি বাগানটায় ঘুরতে লাগলাম। সিংহীরা কাঁকর বালি আর কী কী সব মিশিয়ে বাগানের তলায় জলনিকাশি ব্যবস্থা করেছিল। এই ভারী বর্ষাতেও তাই বাগানে তেমন জল দাঁড়ায়নি। তবু চটিজোড়া ভিজে যাচ্ছিল। হাওয়াই চটি ভিজলেই পিছল হয়ে যায়। হাঁটতে অসুবিধে বোধ করে আমি একটা কুঞ্জবনে ঢুকে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। রোদটাও বড্ড চড়চড় করছে।

হাতের কাছে যে কুঞ্জবনটা পাওয়া গেল সেটায় ঢুকেই থমকে যাই। ভিতরের আবছায়ায় একটা মেয়ে বসে আছে। সেই মেয়েটিই, যে আমাকে সেদিন মোটেই আমল দেয়নি। কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন গা ছেড়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে। চোখদুটো বোজা। আমাকে টের পায়নি। কুঞ্জবনে ঢুকবার মুখটায় দাঁড়িয়ে আবছায়াতেই আমি মেয়েটিকে লক্ষ করি। সম্ভবত ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। মুখে এক ধরনের লালসা ও নিষ্ঠুরতা আছে। স্বভাব যে উগ্রতা ওর মুখের ছাঁটকাট দেখেই বোঝা যায়। এসব মেয়েরা শরীরকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি সম্পর্কে পর পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিই। আমার একটুও ভয় করছিল না। কারণ ভয় জিনিসটা আমার সহজে হয় না। মেয়েদের সম্পর্কেও আমার অনাবশ্যক ও বাহুল্য কোনও স্পর্শকাতরতা বা সংকোচ নেই। কেউ আমাকে অপমান করতে পারে ভেবেও আমি অস্বস্তি বোধ করি না। এক কথা, আমি বিস্তর অপমান হজম করতে পারি। দ্বিতীয়ত, পালটা অপমান করতেও আমি পিছপা নই।

মেয়েটি তাকাল, কিন্তু চমকাল না। সম্ভবত খুব গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। সেই ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে পুরোপুরি ফিরে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। তারপর আমাকে দেখল মেয়েটি এবং কিছুক্ষণ চেনার চেষ্টা করল। তারপর অত্যন্ত নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল, এখানে কী চাই?

এই প্রশ্নটার জবাব তৈরি করার জন্য আমি অনেকটা সময় পেয়েছি। কিন্তু জবাবটা তৈরি হয়নি। সাদামাটা জবাব দিয়ে লাভও নেই। মেয়েটি কিছু অদ্ভুত। সাধারণ মেয়েরা এরকম পরিবেশে অচেনা কাউকে আচমকা দেখলে চমকায় এবং ‘কে’ বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এ মেয়েটা একটুও চমকায়নি বা ‘কে’ বলে চেঁচায়নি। বরং অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করেছে ‘এখানে কী চাই।’ এই প্রশ্নের মধ্যেই দুটো বক্তব্য রয়েছে। এক হল, এটা তোমার জায়গা নয়। দ্বিতীয় হল, এখানে এসে তুমি অন্যায় করেছ, কেটে পড়ো।

এসব অভদ্র মেয়ের কাছে বিনীত হওয়ার কোনও মানেই হয় না। আমি পালটি দেওয়ার জন্যই কুঞ্জবনটায় ঢুকে চারধারে খুব কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আরিব্বাস! দারুণ জায়গা তো! একেবারে কুঞ্জবন!

মেয়েটা নিশ্চয়ই এরকম ব্যবহার আশা করেনি। বড় বড় চোখ করে অপলকে আমাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, এটা বাইরের লোকেদের জন্য নয়। আপনি বারান্দার বেঞ্চে গিয়ে বসুন।

আমি বোকার মতো বললাম, কেন, এখানেও তো দিব্যি বেঞ্চ আছে! এখানে বসা যায় না!

মেয়েটা যথেষ্ট রেগে যাচ্ছে। কিন্তু দুম করে কোনও বোমা ফাটল না। খুব হিসেবি চোখে আমাকে মাপজোক করল কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা গলাতেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পাগল? দেখছেন তো, আমি এখানে বসে আছি।

আমি বোকা ও সরল সেজে বললাম, আপনি কি এ বাড়ির লোক?

হ্যাঁ। কেন?— ভ্রু কুঁচকে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

আমি ক্যাবলার মতো হেসে বললাম, ও, তাই বলুন। নইলে অত চোটপাট করবেনই বা কেন? আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম, আপনিও বুঝি আমার মতো কোনও কাজে এসেছেন পারিজাতবাবুর কাছে।

আমার বোকা ও সরল ভাবটা বোধহয় বিশ্বাস করল মেয়েটা। একটু ভিজলও মনে হয়। গলা এক পর্দা নামিয়ে বলল, উনি আমার দাদা। আপনার ওপর কি আমি খুব চোটপাট করেছি?

আমি ক্যাবলা ভাবটা ধরে থেকেই ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, তাতে কিছু না। যেখানেই যাই সেখানেই লোকে ধমক চমক করে কথা বলে আজকাল। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

আপনাকে সবাই ধমকায় বুঝি?— মেয়েটা এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসে।

আমি হেঁ হেঁ করতে করতে বলি, আজকালকার যুগটাই পড়েছি অমনি। কারও মেজাজ ঠিক নেই।

মেয়েটা একটু সরে বসে পাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে বলল, বসুন।

আমি বসলাম।

আগের দিন মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি। আজ বসবার সময় কাছাকাছি হতে আচমকা মনে হল, সিঁথিতে লালমতো কী যেন একটু দেখা গেল। সিঁদুরও হতে পারে, বা লিপস্টিক কিংবা কুমকুম জাতীয় কিছু, যা আজকালকার বিবাহিতা মেয়েরা সিঁদুরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে ভালবাসে।

সরল এবং বোকা সাজার কতগুলো সুবিধে আছে। মেয়েটা যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকে যে, আমি নিতান্তই হাবাগোবা গোছের, তা হলে আমি যতই অনভিপ্রেত প্রশ্ন করি না কেন, চটবে না।

আমি বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ফেলে বললাম, আপনি কি এ বাড়িতেই থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনার বিয়ে হয়নি?

মেয়েটা শব্দ করে হাসল। তারপর বলল, কেন, হাতে পাত্র আছে নাকি?

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। মেয়েটা চটছে না। বোকা বলেই ধরে নিয়েছে। অপ্রতিভ ভাব করে বললাম, আজ্ঞে না। কত বড় মানুষ আপনারা! বড় বড় সব পাত্র আসবে আপনাদের জন্য।

মেয়েটা চুপ করে কুঞ্জবনের আবছায়ায় আমাকে একটু দেখল। তারপর বলল, আপনাকে দেখে তো খুব বোকা মনে হয় না!

আমি জিব কেটে বললাম, কী যে বলেন! গাঁয়ের লোক, বোকা ছাড়া আর কী?

আপনার কোন গাঁ?

মউডুবি আজ্ঞে। বেশি দূর নয়।— বলেই মনে মনে ভাবলাম, অতি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে না তো! এত আজ্ঞে আজ্ঞে করে যারা কথা বলে তারা আমার মতো পোশাক পরে না।

দাদার কাছে আপনার কীসের কাজ?

আমি মাস্টারির কথাটা চেপে গেলাম। কারণ সেটা বললে আবার লেখাপড়ার কথাটাও উঠে পড়বে। বললাম, এই ছোটখাটো যা হোক একটা কিছু কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছি। পারিজাতবাবুর তো মেলা জানাশুনো।

গাঁয়ের ছেলে, চাষবাস করেন না কেন?

জমিই নেই।

কী হল?

বিক্রিবাটা, জবর দখল এসব নানারকম হয়ে বেহাত হয়ে গেছে।

চলে কী করে?

চলছে না বলেই তো হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছি।

লেখাপড়া কতদূর?

ওই স্কুলটা কোনওরকম ডিঙিয়েছিলাম।

বয়স তো বেশি নয়। পড়লেই তো পারেন।

আর পড়ে কী হবে? শুধু পয়সা খরচ। পড়ে কাজও পাওয়া যায় না।

মেয়েটা আলস্যের বশে একটা হাই তুলে বলল, বেশি লেখাপড়া অবশ্য আমিও পছন্দ করি না। তবে গ্র্যাজুয়েটটা হলে চাকরির অনেক সুযোগ আসে।

আমি হেসে বললাম, গ্র্যাজুয়েট হতে একটু এলেম লাগে।

আপনার সেটা নেই?

না। আমার মাথাটা চিরকালই একটু মোটা।

মেয়েটা খুশিয়াল একটা খিকখিক হাসি হেসে বলল, আমারও তো মাথা মোটা। লেখাপড়া আমারও বেশিদূর হয়নি।

আমি উদাস গলায় বললাম, আপনাদের তো দরকার করে না। টাকা আছে।

মেয়েটা বড় বড় চোখে অবাক ভাব ফুটিয়ে বলে, কে বলল দরকার করে না? লেখাপড়া না শিখলে ভাল বর জোটে না তা জানেন?

আমি নিশ্চিন্তির গলায় বললাম, আপনার মতো সুন্দর মেয়েদের আবার বরের ভাবনা!

ও বাব্বা! কমপ্লিমেন্ট দিতেও জানেন দেখছি! খুব বোকা তো নন।

ঠিক বোকা নয়, তবে গেঁয়ো বটি। রাগ করলেন না তো!

ওমা! প্রশংসার কথায় রাগ করব কেন?

আমি উদাস গলায় বলি, আজকাল ভাল কথাতেও অনেক মেয়ে চটে যায়। গেলবার শীতকালে একবার বাসে বাসেরগঞ্জে যাচ্ছিলাম। একটা সুন্দরমতো মেয়ে দেখি হাতকাটা ব্লাউজ পরে জানলার ধারে বসা। বেশ ঠান্ডা হাওয়াও মারছিল সেদিন। অনেকক্ষণ দেখে থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, দিদি, আপনার শীত করছে না? ও বাবা, এমন রেগে গেল এই মারে কি সেই মারে!

বানিয়ে বলা। মেয়েটা তবু ক্ষীণ একটু হাসল। বলল, ছেলেদেরও অনেক দোষ আছে। মেয়েদের চোখে পড়ার জন্য তারা অনেক বোকা-বোকা কাণ্ড করে।

ইঙ্গিতটা আমার প্রতিই কি না তা বুঝতে না পেরে আমি সরলভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, আজ্ঞে, কথাটা আমাকে মনে করেই বলছেন না তো!

মেয়েটা আমাকে একবার তেরছা চোখে দেখে নিয়ে বলে, আপনি একটু গায়ে পড়া বটে, কিন্তু এখনও তেমন কিছু কাণ্ড করেননি। আমি আর একটা ছেলের কথা জানি। প্রফেসর। লেখাপড়া নিয়ে দিব্যি ছিল। হঠাৎ একটা মেয়েকে খুশি করতে ব্যায়াম শুরু করল। তাতে তার গায়ে ইয়া ইয়া গুসি ফুটে উঠল বটে, কিন্তু মাথাটা গেল মোটা হয়ে। মেয়েটাও পালোয়ান প্রফেসরকে তেমন পছন্দ করতে পারছিল না। তারপর সে কী করল জানেন? গান আর নাচ শিখতে লাগল।

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, বলেন কী? একটা মেয়ের জন্য এত মেহনত? লোকটা মাইরি আমার চেয়েও বোকা আছে। কে বলুন তো?

মেয়েটা মাথা নেড়ে মুখ টিপে হেসে বললে, সব ছেলেই ওইরকম। কিছু কম আর বেশি।

আমি বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, আমার অত মেহনত কিছুতেই পোষাত না।

মেয়েটা একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, কেন? মেয়েরা কি ফেলনা যে তাদের খুশি করার জন্য কিছু করতে নেই পুরুষদের!

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক তা বলিনি। তবে যার কথা বললেন সে আদত পুরুষই

তো নয়। একটা মেয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছে, আর লোকটা বাঁদরের মতো নেচে যাচ্ছে।

মেয়েটা এবার আর একটু রেগে গেল যেন। ঝামরে উঠে বলল, বেশ করছে নাচছে। ভালবাসার জন্য সবকিছু করা যায়।

আমি বললাম, এই যে বললেন বোকা-বোকা কাণ্ড!

মেয়েটা তেজের সঙ্গে বলে, মোটেই বোকা-বোকা কাণ্ড নয়। লোকটা সত্যিকারের পুরুষ বলেই পেরেছে। সে অলস নয়, অকর্মা নয়, অক্ষম নয়। একজন মেয়ের প্রেমে তার সুপ্ত সব প্রতিভা জেগে উঠেছে।

এবার আমি হাঁ করে রইলাম। গোলমালটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না। আবছা মনে হচ্ছিল, সেই বোকা লোকটার নায়িকা বোধহয় এ মেয়েটা নিজেই। তাই চট করে স্ট্র্যাটেজি পালটে নিয়ে বললাম, অবশ্য আপনার মতো একজন মেয়ের জন্য অনেক কিছু করা যায়। ব্যায়াম, নাচ, গান, সব কিছু।

মেয়েটা আমার কথা শুনল বলে মনে হয় না। কেমন ভ্রুকুটিকুটিল এবং চিন্তান্বিত মুখে সামনের দিকে চেয়ে আছে। বেশ কিছুটা সময় চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কিছু পেতনি আর শাকচুন্নি সেই ছেলেটার পিছনে লেগেছে। কেন যে মেয়েগুলো এমন হ্যাংলা।

বলেই মেয়েটা একটু সচকিতভাবে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বলল, কিছু মেয়ে এরকম থাকেই। তাই না? তবে জেনারেলি ছেলেরাই হ্যাংলামো বেশি করে। পেতনি আর শাকচুন্নিগুলোকে কী করা যায় বলুন তো!

আমি একগাল হেসে বললাম, ঝাঁটাপেটা করুন। কষে ঝাঁটা মারুন।

মেয়েটা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, তাই মারব। খবর পেয়েছি গন্ধর্ব এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছে। যাওয়াচ্ছি! এমন কুরুক্ষেত্র করব এবার।

বলতে বলতে মেয়েটা আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ঝটকায় উঠে ঝম করে চলে গেল।

আমি বসে বসে কিছুক্ষণ আমার বিদীর্ণ মস্তিষ্কের টুকরোগুলো জোড়া দিলাম। একটা ছক ধরা পড়ল। খুব একটা জটিল ছক নয়।

বসে আছি, হঠাৎ দারোয়ান এসে এত্তেলা দিল, বাবু ডাকছেন।

আমি একটু অবাক হলাম। বাবু অর্থাৎ পারিজাতের আমাকে ডাকার কথাই নয়। কারণ, আমি যে এসেছি তা সে জানে না। উপরন্তু আমি উমেদার। আমাকে এড়ানোর চেষ্টাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লাম।

পারিজাত বাইরের ঘরে বসে আছে। আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে বলে ওঠে, আরে তুমি!

আমিও আকাশ থেকে পড়ে বললাম, কেন, আপনিই তো দারোয়ান দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন!

পারিজাত হেসে ফেলল। বলল, তুমিই এতক্ষণ রুমার সঙ্গে কুঞ্জবনে বসে ছিলে? কী আশ্চর্য!

এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

পারিজাত আমার দিকে নতুন এক আবিষ্কারকের চোখে তাকিয়ে বলে, তুমি তো দেখছি মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ। রুমা আমাকে কী বলে গেল জানো?

না। কী করে জানব?

বলে গেল, কুঞ্জবনে একটা ছেলে বসে আছে। ভারী ভাল ছেলে। একটু বোকা, কিন্তু খুব সরল। ও যে কাজের জন্য এসেছে সেটা যেন ওর হয়।

আমি বললাম, তাই নাকি?

শুধু তাই নয়। এইমাত্র জহরবাবুর ছোট ছেলে প্রতিমার একটা চিরকুট দিয়ে গেল। পড়বে সেটা? পড়ো।—বলে পারিজাত একটা রুলটানা এক্সারসাইজ বুকের ভাঁজ করা পাতা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি চিঠিটা খুলি। প্রতিমার হাতের লেখা ভালই। লিখেছে, "পারিজাতবাবু, আমার চাকরির দরকার নেই। দয়া করে চাকরিটা অভিজিৎবাবুকেই দেবেন। উনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আমাব বাবা হয়তো ব্যাপারটা সহজে বুঝতে চাইবেন না। আমাদের তো অভাবের সংসার। তবু আমার মনের ইচ্ছেটা আপনাকে অসংকোচে জানালাম।

প্রণাম জানবেন। প্রতিমা।"

পারিজাত আমার মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। চিঠি পড়া শেষ হতেই একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তিন-তিনটে জোরালো রেকমেনডেশন। অসীমা, রুমা, প্রতিমা। মেয়েদের সাইকোলজি তুমি বোধহয় খুব ভাল বোঝো।

আমি একটু লজ্জা পেলাম। বাস্তবিক গোটা ব্যাপারটা যে এইভাবে আমার অনুকূলে এসে যাবে তা আমি আশা করিনি। আমি মিনমিন করে বললাম, কিন্তু এতে আমার কোনও হাত নেই।

পারিজাত অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? যারা রেকমেনড করেছে তারা কারা জানো? একজন আমার ভাবী স্ত্রী, একজন আমার মায়ের পেটের বোন এবং তৃতীয় জন তোমার সবচেয়ে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী। এই তিনজন মহিলাকে হাত করা খুব সহজ ব্যাপার তো নয়।

আমি কোনও জবাব খুঁজে পেলাম না। শুধু হাসলাম।

পারিজাত বলে, রুমা তোমার সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট দিয়ে গেল সেটাও অদ্ভুত। তুমি নাকি খুব বোকা এবং সরল। ওকে এই টুপিটা কী করে পরালে? তোমাকে দেখে তো বোকা বা সরল কিছুই মনে হয় না।

উনি নিজে ভাল বলেই বোধহয় আমাকে ভাল বলেছেন।

রুমা ভাল?—এই প্রশ্ন করে পারিজাত ওপরে তুলে আমাকে নিরীক্ষণ করে বলে, ওরকম গেছো মেয়ে খুব কম আছে। নিজের পছন্দ করা বরকে দু'-দুবার ডিভোর্স করেছে, তা জানো?

না। অতটা জানি না। তবে উনি গন্ধর্ব নামে কে একজন অধ্যাপকের কথা বলছিলেন।

সেই গন্ধর্বই। বেচারা হয়রান হয়ে গেল মেয়েটার জন্য। গন্ধর্ব সম্পর্কে কী বলছিল তোমাকে?

কয়েকজন পেতনি আর শাকচুন্নি নাকি গন্ধর্বর পিছনে লেগেছে। উনি খুব জেলাসি ফিল করছেন।

করছে?—পারিজাতের মুখ উজ্জ্বল হল, যাক বাবা। ইট ইজ এ ড্যাম গুড নিউজ। কোনও প্ল্যান করছে বলে বলল নাকি?

না। উনি আমার সাজেশন চাইছিলেন। আমি সাজেস্ট করেছি পেতনি আর শাকচুন্নিদের ঝাঁটা মেরে তাড়াতে।

খুব হাসল পারিজাত। হোঃ হোঃ ক'রে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, তাই বোধহয় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ভাবগতিক দেখেই বুঝতে পেরেছি একটা কিছু ঘটিয়ে আসবে। যাক, বাঁচা গেল। তা তুমি এখনও এই মাস্টারির চাকরিটা চাও?

আমি অবাক হয়ে বলি, চাইব না কেন?

পারিজাত মাথা নেড়ে বলে, তোমার যা প্রতিভা তা এই সামান্য চাকরিতে নষ্ট করবে কেন? ইচ্ছে করলে নিজের যোগ্যতায় অনেক ওপরে উঠে যেতে পারবে। এমনকী, আমার তো মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়াও তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আমি নির্লিপ্ত গলায় বলি, আগে তো মাস্টারিটাই হোক।

হোক মানে! এরপরও না হলে আমাকে কেউ আস্ত রাখবে নাকি! কিন্তু ভাই, আমার ওপর এই ত্রিমুখী আক্রমণ চালানোর কোনও দরকার ছিল না। তিন-তিনটে ভাইটাল রেকমেনডেশন কি সোজা কথা!

৭। পারিজাত

সংকীর্ণ পার্বত্যপথে দু'দিক থেকে দু'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী ছুটে আসছে। সামনেই এক উপত্যকা। সেইখানে দু'জনের দেখা হবে। শুরু হবে দ্বৈরথ। দু'জনের মধ্যে যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু হয় ততক্ষণ চলবে মরণপণ লড়াই। অস্ত্রে অস্ত্রে ধুন্ধুমার শব্দ উঠবে। অশ্বক্ষুরের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে চারদিক। ঝরে পড়বে রক্ত ও স্বেদ। না, লড়াই এখনও শুরু হয়নি। তবে অমোঘ লক্ষ্যে এখন ছুটে যাচ্ছে নিয়তিনির্দিষ্ট দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

বলাই বাহুল্য এই দুই অশ্বারোহীর একজন আমি, অন্যজন অধর। আমাদের দু'জনের কারওরই ঘোড়া নেই, তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। তরোয়াল নেই, টাকা আছে। দ্বৈরথ ঘটবার সম্ভাবনা নেই। আজকাল লড়াই হয় কূটনৈতিক চালে। কিন্তু লড়াই আসন্ন।

চাংড়াপোঁতার বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার কাগজে ছোট করে বেরিয়েছে সংবাদ। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। বর্ষাকালে ফি বছরই এই রাজ্যের কয়েকটা জেলা ও অঞ্চল ভাসে। কথা হল, চাংড়াপোঁতার দিককার বাঁধ মেরামতির ঠিকা গতবছর অধরকেই দেওয়া হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়তো পুরনো রেকর্ড ঘাঁটতে চাইবেন না, তাই আমি তথ্যটি যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে তার গোচরে এনেছি। যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয় তাহলে ঘটনাটিকে সাধারণ্যে রটনার একটি প্রচ্ছন্ন হুমকিও তাঁকে আমি যথাযথ বিনয় সহকারে দিয়ে দিতে ভুলিনি। বাঁধ মেরামতি বাবদ খরচ হয়েছিল আট লক্ষ টাকার কাছাকাছি। খুব কম নয়। জনসাধারণের টাকা। কিন্তু জনসাধারণ তাদের টাকা কোথায় কীভাবে নয়ছয় হচ্ছে সে বিষয়ে খুবই নির্বিকার। সুতরাং আমাকেই তাদের প্রতিনিধি হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে।

জাতসাপটা পছন্দ করছে না, তবু আমি বারবারই তার লেজ দিয়ে কান চুলকোচ্ছি। সাপটা রাগছে, ফুঁসছে। এবার ছোবল তুলবে। অধর।

একটা রিকশা এসে থামল আমার গাড়িবারান্দার তলায়। কমলা সেন নামলেন। ভোরের কোমল আলোয় তাঁকে নম্র দেখাচ্ছিল। যৌবনে শ্রীময়ী ছিলেন, সন্দেহ নেই। এখন কিছু মেদ ও মেচেতার সঞ্চারে চটকটা ঢাকা পড়েছে। তার মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ বরাবর ছিল। এখনও আছে। স্বভাবে গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বময়ী এই মহিলাকে আজ কিছু শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরনে কমলা রঙের একখানা শাড়ি, চওড়া বাসন্তী রঙের পাড়। ওই রঙেরই মানানসই ব্লাউজ। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। এখনও অগাধ ও গভীর, বন্যার মতো এক ঢল চুল তাঁর মাথায়। এলোখোঁপায় বাঁধা। হাতে একটা বড়সড় ফোলিও ব্যাগ।

পর্দা সরিয়ে চৌকাঠে তিনি দেখা দিতেই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললাম, আসুন, আসুন।

এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে কোনও অবিনয় বা কৃত্রিমতা নেই। খাঁটি লোকদের আমি বরাবরই শ্রদ্ধা করি। দেশে এরকম লোকের সংখ্যা বড়ই কম। কমলা সেন শিবপ্রসাদ হাইস্কুলের জন্য যা করেছেন তা এখন প্রায় কিংবদন্তী।

দরজা থেকে টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে কমলার অনেকটা সময় লাগল। পদক্ষেপ ধীর, অবিন্যস্ত, কুণ্ঠিত। যেন বা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। কেন এখানে এসেছেন। ওঁর চোখের দৃষ্টিতেও সেরকম একটা অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল, যা ওঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়।

উনি যতক্ষণ কাছে এসে না বসলেন ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

দু'জনেই বসলাম মুখোমুখি। কিন্তু কেউ কারওদিকে সহজভাবে তাকাতে পারছিলাম না। কমলা সেন নীরবে তাঁর কোলের ওপর রাখা ফোলিও ব্যাগ এবং তার ওপর রাখা তাঁর হাত দু'খানি কিংবা মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। আমি ওঁর সিঁথির ওপর দিয়ে, খোঁপার কিনারা ছুঁয়ে দৃষ্টিটাকে মোটামুটি স্থির রাখলাম দরজার দিকে।

ঘর ফাঁকা। শব্দ নেই। বাইরে শুধু পাখির ডাক।

আমরা দু'জন অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করছি। আমাদের আন্ডারস্ট্যানডিং খুবই ভাল। যতদূর জানি আমাকে উনি সেক্রেটারি হিসেবে পছন্দই করতেন, যেমন আমি করতাম ওঁকে হেডমিসট্রেস হিসেবে। কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠানই চিরকাল একভাবে চলে না। চলতে নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও বিবর্তন ঘটে। ঘটা দরকারও। পরিবর্তন যদি না ঘটত তা হলে আমি দারিদ্র্যসীমার ওপাশ থেকে চিরকাল এপাশে আসার স্বপ্নই দেখতাম। সত্যিকারের আসা হত না কখনও।

মৃদুস্বরে বললাম, ভাল তো?

চশমার কাচ ও ফ্রেমে একটু আলো ঝিকিয়ে উঠল, হ্যাঁ। আপনি?

চলে যাচ্ছে।

আবার নিস্তব্ধতা। শুধু অজস্র পাখির ডাকে ভরে উঠল ঘর। সকালের কোমল আলোর এক মায়া ঘরের মধ্যে সম্মোহন বিস্তার করে দিচ্ছে। আমরা কেউ কখনও কাউকে তেমন অপছন্দ করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ছিল না। শত্রুতা নয়। আজও কি অপছন্দ হবে না পরস্পরকে?

কমলা সেন মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। মুখ তুললেন না। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, খুব খাটুনি যাচ্ছে তো, আগেকার মতো?

খাটতে তো হয়ই। আপনিও তো বিশ্রাম নেন না।

আমার তো ছোট্ট জায়গা নিয়ে কাজ। আপনার তো তা নয়। টেনশন হয় না?

হয়।

বলে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করি। কমলা আমাকে ঘৃণা করতে পারছেন না। সেটা ঘটে ওঠা সম্ভব বলে আমারও মনে হয়নি কখনও। তবু আশা করেছিলাম, শেষ অবধি আমাকে উনি ঘৃণা করতে পারবেন। পারেননি। মৃদুস্বরে বললাম, ডানহাতে একটা সোনার বালা ছিল বরাবর। আজ দেখছি না।

কমলা চকিতে একবার তাকালেন। চোখ নামিয়ে নিজের শূন্য ডান হাতখানি ঘুরিয়ে দেখলেন একটু। বললেন, পুরনো হয়ে গিয়েছিল।

ভেঙে গড়তে দিয়েছেন?

উনি মাথা নাড়লেন, না। রেখে দিয়েছি।

একটু হাসলাম। ডান হাতখানা বড় শূন্য দেখাচ্ছে। বৈধব্য যেমন দীর্ঘ ও সাদা।

চা?

চশমার কাচ ও ফ্রেমে আবার একটু ঝিলিক, হুঁ।

ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করলাম ওঁর কাছে। ওই হুঁ-টুকুর বড় প্রয়োজন ছিল আজ। টেবিলের গায়ে লাগানো কলিং বেল-এ ওপরের রান্নাঘরে চায়ের সংকেত পাঠিয়ে দিই। ওরাই দেখে যাবে ক'জন এবং ক' কাপ। আমি মুখে উদাস ভাব মেখে বসে থাকি। একটু পিছনে হেলে, গা ছেড়ে।

নীরবতা। পাখির ডাক। কোমল আলো।

চা আসে। দু'জনেই মৃদু চুমুক দিই। কমলা একটু এদিকে তাকান, একটু ওদিকে। কিছু দেখছেন না, জানি। নিজেকে স্থির করছেন। আমাকে ঘৃণা করতে পারলে ওঁর পক্ষে কাজটা সহজ হয়ে যেত। সোজা তাকাতে পারতেন আমার চোখের দিকে। সহজে বলতে পারতেন কিছু কঠিন কথা। পারছেন না।

ঠিক কথা, স্কুলটার জন্য আমার বিশেষ কোনও দরদ নেই। আমার ভাবপ্রবণতা কম। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিছুতেই আমার কাছে জিয়ন্ত ও শরীরী কোনও সত্তা হয়ে ওঠে না। স্কুলের প্রতিটি ইটের প্রতি ওঁর যেরকম ভালবাসা আমার তা কোটি বছরেও হওয়ার নয়। তবু আমরা কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে খেটেছি, যখন যেমন দরকার। এও ঠিক আমার আরও পাঁচ রকমের কারবার আছে। স্কুলের পিছনে আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় দিইনি। কিন্তু কমলা সেন তাঁর অবকাশটিও স্কুলের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলেছিলেন। এই স্কুলের জন্য আমার ব্যক্তিগত ত্যাগ বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ওঁর অনেক আছে। বিদ্যায়তনে নাচগানের ক্লাস বসানোতে ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন তিনি, আমি সেই সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দিইনি। এই নিয়ে খটাখটিও হয়েছে। শেষ অবধি আমার বাস্তববুদ্ধিকে তিনি গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে করেননি। লেখাপড়া জিনিসটার প্রতি আমার বিরাগ চিরকালের। স্কুল-কলেজের নামে আমার এলার্জি হয়। অভিজ্ঞতাবলে আমি জানি কিছুটা লেখাপড়া ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে পেটভাতের জোগাড় করার মতো যোগ্যতা অর্জন আরও ঢের ভাল। তাই আমি স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই চাষবাস, গোপালন, ইলেকট্রিক, বা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, ট্যানারি, মৌমাছির চাষ, হ্যান্ডমেড পেপার তৈরি, বাঁশ বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ঘর গেরস্থালির জিনিস বানানো ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা করার পক্ষপাতি ছিলাম। সবচেয়ে জোরালো বাধা দিয়েছেন উনি। তাতে নাকি ছেলেমেয়েরা বইয়ের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়বে। তাছাড়া ওসব তো কোর্সেও নেই। বহুবার বহু ব্যাপার নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার মতান্তর হয়েছে, বিতর্ক ঘটেছে। তবু কীভাবে যেন একটা গভীর আস্থাবোধও জন্ম নিয়েছিল।

কমলা সেন আমার কাছে হেরে গেছেন বা আমি জয়ী হয়েছি এমন কিছু আমার মনে হয় না। আমি জয়ী হলেও সেই জয়ের স্বাদ আমি উপভোগ করছি না। আমি ওঁরই জয় চেয়েছিলাম। উনি পারলেন না। সেটা হয়তো আমার পরাজয়ও।

চা শেষ হল। দুটি শূন্য পাত্র ও আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে রইলাম। শব্দ নেই। শুধু পাখি ডাকছে। আজ যে কোথা থেকে এত পাখি এল! না কি রোজই আসে, আমি হয়তো রোজ তাদের ডাক শুনতে পাই না। আজ পাচ্ছি।

কমলা সেন নতমুখে খুব ধীরে ধীরে, শব্দ না করে তাঁর ফোলিও ব্যাগের চেন খুলছিলেন। কেন তা আমি জানি। ব্যাগের মধ্যে একটি চিঠি আছে। টাইপ করা এবং বেশি বড় নয়। ওঁর পদত্যাগপত্র।

আমি ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে আলোর কিছু প্রতিফলন লক্ষ করছিলাম। গত দু'দিন বৃষ্টি নেই। চনমনে রোদ উঠেছে। চাংড়াপোঁতার বাঁধ ভাঙা ছাড়া কি এবারের বর্ষা আর কোনও দুর্দৈবের সৃষ্টি করতে পারল না? বন্যা হবে না তা হলে?

আমি ওপরের দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করি, কোথাও যাচ্ছেন নাকি বাইরে?

উনি চেনটা আধখোলা রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, যাচ্ছি। প্রথমে কলকাতায়। তারপর কাছেপিঠে কোথাও।

আমি মাথা নাড়লাম, অনেকদিন কোথাও যাননি। এবার একটু ঘুরে আসুন।

কথাটার মধ্যে কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নেই। সমবেদনা আছে। কমলা চুপ করে আমার টেবিলের সবুজ কাচে একটা নকশাদার পেপারওয়েটের প্রতিবিম্ব দেখলেন। তারপর বললেন, বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

আমি হাসলাম। বললাম, কাজ ছাড়া আপনার আর কবে কীই বা ভাল লাগল!

উনি সলজ্জ, হেসে খুব মৃদু স্বরে, প্রায় শ্বাসবায়ুর শব্দে বললেন, এবার ছুটি।

আমি ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ওঁর খোঁপার সীমানা ছুঁয়ে দরজা দেখতে দেখতে বললাম, আমি শুনেছি, অনেকগুলো স্কুল থেকে অফার এসেছে আপনার কাছে।

উনি মাথা নাড়লেন, মুখে দুষ্টুমির ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু করব না।

কেন করবেন না?

করা উচিত নয় বলে।—হাসিমুখেই বললেন কমলা, কেন তা তো আপনি জানেন।

জানি। সবই জানি। আমি কমলার চরিত্র বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছি তা তো থেকেই যাচ্ছে। এই

সুদক্ষ প্রশাসক ও মহান শিক্ষিকার চাকরির কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই অসাধারণ মহিলার সমস্যা তিনি নিজেই। নৈতিক অধঃপতনের জন্যই যদি তাঁর একটা চাকরি যায় তবে অধঃপতিত তিনি আবার অন্য চাকরিতে যাবেন কেন? কমলা সেনের জীবনদর্শন যা-ই হোক তা বেশ কঠোর। অধরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেমনই হোক, আমাদের শ্রদ্ধা তিনি অকারণে পাননি।

আজ বড় কোমল আলোর দিন। তারের বাজনার মতো বেজে চলেছে পাখিদের আবহসংগীত। দিনটা বড় লাবণ্যময়, বড় গভীর। পৃথিবীর পাত্রটি বুঝি উপচে পড়ছে অধরা মাধুরীতে আজ। এটা কাজের দিন নয়। এইসব দিন আসে মানুষকে খেয়ালখুশিতে পাগল করতে মাঝে মাঝে।

আমি খুব সন্তর্পণে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ আমাকে কিছু বলুন। শুনতে ইচ্ছে করছে।

কমলা হাসলেন। মাস্টারির নির্মোক খসে যাওয়ায় ভিতরকার লাজুক ও অপ্রতিভ এক কমলা সেন আজ জাদুবলে বেরিয়ে এসেছেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, বলতেই আসা।

বেলা বাড়ছে। কাজের লোকেরা ভিড় করে আসবে। ঘরটা হয়ে যাবে হট্টমালার দেশ। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তা হলে বাগানে যাই।

কমলা চোখ না তুলে মাথা নাড়লেন, চলুন।

বাগানের সবচেয়ে দূরবর্তী কোণে অবস্থিত কুঞ্জবনটি এই বর্ষার জলে, আরও ঘন হয়েছে। লতানে গাছ ঝেঁপে উঠেছে চারদিকে। ভিতরে নিবিড় ছায়া। আমরা দু'জন বসি, মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক রেখে। মৌমাছির গুনগুন আনাগোনা চারদিকে। দোলনচাঁপার গন্ধে বাতাস ভারী।

কমলা একটু সময় নিলেন। আমি অপেক্ষা করলাম।

উনি মৃদুস্বরে বললেন, আপনাকেই বলা যায়। বলব?

অপেক্ষা করছি।

আমি বহুদিন আগে মরে গেছি। সেই কিশোরীবেলায়। আজকের ঘটনা তো নয়। তখন দুই বেণী বেঁধে স্কুলে যাই, ফ্রক পরি। অধর কী সুন্দর সাইকেল চালাত আপনি জানেন না। এ উইজার্ড অন এ সাইকেল। তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে যেতে পারত। সাইকেলে চেপে সেটাকে স্থির দাঁড় করিয়ে রাখতে পারত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চমৎকার ছিল তার বন্দুকের টিপ। খুব শরীরী ছিল অধর। চমৎকার গড়ন। উদাত্ত গলায় গান গাইতে পারত। কোন কিশোরীই না তার জন্য? এসব সেই সময়কার কথা। বিয়ে হয়নি, সবসময় তো হয়ে ওঠে না। কিন্তু রেশটা রয়ে গেল কেন তা বুঝি না। অভ্যাসই হবে। মেয়েরা সহজে সম্পর্ক ভাঙতে পারে না।

আমি এসব বুঝি কমলা। আমি ছাড়া কে বুঝবে?

কমলা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। লৌহমানবীরও বুঝি স্পর্শকাতর কোনও জায়গা থাকে। আঁচলটা তুলে রেখেছিলেন মুখের কাছে আগে থেকেই। বুঝি জানতেন, আজ তাঁর কান্না আসবে।

কিন্তু আর সকলের মতো তো তাঁর কাঁদতে নেই। খুব আলগোছে চোখটা একটু ঢাকলেন আঁচলে। সরিয়ে নিলেন। সামান্য ভারী গলায় বললেন, সবাই জানত, কিন্তু বুঝত না। বিয়ে করলাম না বলে বাড়িতে কত অশান্তি পোয়াতে হয়েছে। মেয়েদের যে কত কিছুর জন্য দাম দিতে হয়, কত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা পুরুষেরা বোঝে না। মেয়েরা হয়তো বোঝে। কিন্তু তারা গা করে না।

যার জন্য এত ভোগান্তি সে বোঝে?

কমলা চমৎকার করে হাসলেন। শিশুর মতো। আগে এমন হাসতেন না। মাথা নেড়ে বললেন, না।

আমি ধীরে ধীরে স্বভাববিরুদ্ধ স্মৃতিভারে আক্রান্ত হচ্ছিলাম। স্মৃতি বড় ভারী। বড় মন্থর করে দেয় মানুষের গতি। কিন্তু স্মৃতি কীসের? আমার জীবনে তেমন কোনও প্রেম নেই, হৃদয়দৌর্বল্য

নেই। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনি, পিছনটা এক রৌদ্রতপ্ত খাঁখাঁ বালিয়াড়ি। সেই বালিয়াড়ি ভেঙে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক পাগল ঘোড়সওয়ার। তাকে একটা সীমারেখা ডিঙোতেই হবে। দারিদ্র্যসীমা। নারীপ্রেম নেই, স্নেহ নেই, অবকাশ নেই। তার স্ত্রী ছিল সুন্দরী। তার স্ত্রী ছিল প্রণয়ভিক্ষু। তার তখন সময় ছিল না। স্ত্রী অপেক্ষা করতে পারত আর একটু। করল না। চলে গেল। ঘোড়সওয়ার তার দারিদ্র্যসীমা ডিঙিয়েছে শেষ অবধি। সে জানে, সেইটেই আসল কথা।

আমি অনুচ্চ স্বগতোক্তির মতো বলি, স্কুল ছাড়া আপনি আর কোনও কিছুর কথাই ভাবেননি বহু বছর ধরে। শুধু স্কুল আর স্কুল। স্কুলটাই সর্বস্ব ছিল আপনার। আমি আপনার সেই সর্বস্বই কি কেড়ে নিচ্ছি?

কমলার ঘাড় নোয়ানো, ঘড়ির স্ট্র্যাপ নিয়ে খেলা করতে করতে মৃদু একটু হাসলেন। জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, এবার অন্য দিকগুলোয় মন দিতে পারবেন।

কমলা আমার দিকে একটু তাকালেন, পট করে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, ঠিক জানেন, পারব?

পারবেন না?

কমলা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, কী জানি! মনে হয় না। আমার সবদিকই হারিয়ে গেছে।

বহুদিন। আমি বহুদিন ধরে লক্ষ করছি এক অসম লড়াই। একদিকে স্কুল, অন্যদিকে অধর। একজন বিবাহিত প্রায়-মধ্যবয়স্ক পুরুষ, যে আর সাইকেলের জাদু দেখায় না, কিংবা দেখালেও তাতে আর কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে একটা বিশাল স্কুল, যা গড়ে উঠছে, গড়ে তুলছে। প্রাণবন্ত, স্পন্দনশীল। অধরের কিছু দেওয়ার নেই আর। কিন্তু স্কুল অসংখ্য কচি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছে কমলাকে। ব্যগ্র, আকুল হাত। অধর পারবে কেন? কমলার মনের মধ্যে কবেই তো মরে গেছে সে। তবু তার একটা প্রেতচ্ছায়া আছে। সেটাকেই সে বলে ভুল হয় বারবার। আমি জানতাম।

কমলা নতমুখে হাসলেন। কেন হাসছেন? এ তো হাসির সময় নয়!

কমলা আচমকা মুখ তুললেন। স্পষ্ট ও সহজ ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে। মুখে এখনও স্মিত ভাব। বললেন, স্কুলের হিসেবে অনেক কারচুপি ধরা পড়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম, জানি।

কমলা আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, স্কুলের মেন্টেনেন্সের জন্য আমরা কনট্রাক্ট দিয়েছিলাম অধর বিশ্বাসকে। বহু টাকার কনট্রাক্ট। স্কুলের নতুন দুটো উইং তারই তৈরি। তাকে যেসব পেমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তার অনেকগুলো ভাউচার নেই। আপনি কখনও আমাকে প্রশ্ন করেননি, ভাউচারগুলো কী হল।

আমি মৃদু হেসে বললাম, না। কারণ আমি জানতাম সেগুলো আপনি সরিয়ে নিয়েছেন। হয়তো অধর আপনাকে সরাতে বলেছে।

হ্যাঁ। মানুষকে যখন নিশিতে পায় তখন সে অনেক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে। আপনার কাছে কি ক্ষমা চাইতে হবে?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। কারণ আমার কাছে প্রত্যেকটা ভাউচারের ফটোকপি আছে। আমি বিপদে পড়তে ভালবাসি না।

স্নিগ্ধ এক দৃষ্টিতে আমাকে অকপটে কমলা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুখে দুষ্টুমির একটু হাসি মেখে নিয়ে বললেন, আমিও জানতাম, আপনাকে বিপদে ফেলা সহজ নয়। আর সেই ভরসাতেই চুরি করেছিলাম।

আমার ভিতরকার সেই আশ্চর্য ক্যালকুলেটরটির কথা ওঁকে বললাম না। সর্বদাই সে হিসেব কষে, সর্বদাই সে টের পায়, সর্বদাই সে দেয় নির্ভুল বিপদ-সংকেত। কিন্তু সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। স্কুলের কাগজপত্রে যে অদৃশ্য হাত পড়ছে তা অনেক আগেই অসীমা মারফত আমি জানতে পারি। ঘটনাটা আমার ভিতরকার ক্যালকুলেটরকে জানাই এবং প্রশ্ন করি, হাতটা কার হতে পারে বলো তো! ক্যালকুলেটর অল্প সময়েই তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছিল, হাতটা কমলা সেনের। কিন্তু মুশকিল হল, কমলা সেনকে আমি জানি। এই কঠোর প্রশাসন ও নীতিপরায়ণা মহিলার পক্ষে এ কাজ করা প্রায় অসম্ভব। তবে ওঁর একটি রন্ধ্র আছে। সেই রন্ধ্র দিয়েই লোহার বাসরে মাঝে মাঝে হানা দেয় কালনাগিনী। অধর। পুরো একটা দিন আমি ক্যালকুলেটরে অনেক হিসেব-নিকেশ করি। বারবার প্রশ্ন করতে থাকি ক্যালকুলেটরকে, কী করব? কমলাকে হাতে-নাতে ধরব, না কি একটা বিকট গণ্ডগোল পাকিয়ে বসব?

না, আমি ওসব করিনি। বরাবর আমার যুদ্ধ ছিল অন্যরকম। অনেক আধুনিক ও বৈপ্লবিক সেই যুদ্ধাস্ত্র। আমি জানতাম, কমলা সেন নিজের দ্বারা চালিত হয়ে এ কাজ করছেন না। এ কাজ তাঁকে দিয়ে করাচ্ছে একটা ভূত। একটা প্রেতচ্ছায়া। একটা মৃত প্রেমের স্মৃতি। একদিন কমলা সেন জেগে উঠবেনই। একদিন সচকিত হয়ে তিনি আত্মধিক্কারে বলে উঠবেন, ছিঃ ছিঃ! এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি অধরকে ঘৃণা করতে শুরু করবেন। এর চেয়ে বড় কাউন্টার অ্যাটাক আর কী হতে পারে আমার পক্ষে?

তাই আমি শুধু নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য কাগজপত্রগুলির ফোটোকপি গোপনে তৈরি করে রেখেছিলাম মাত্র। মুখে কিছুই বলিনি। আজ কমলা সেনের মুখ দেখে বুঝতে আর কষ্ট নেই তাঁর কৈশোর থেকে বহন করে আনা প্রেমের শবদেহটিতে পচন শুরু হয়েছে। তিনি তা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। স্নান করেছেন। শুদ্ধও হননি কি?

আমার দিকে চেয়ে থাকা কমলা সেনের শেষ হচ্ছে না যেন। চেয়ে থেকেই বললেন, কেউ কথাটা জানবে না, না?

না। জানার দরকার নেই।

কিন্তু লোকে চিরকাল আপনাকে অপবাদ দেবে, এমন একজন ভাল হেডমিসট্রেসকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেছেন বলে।

মৃদু হেসে বলি, দিক। লোকে আমার আরও অনেক গুরুতর অন্যায়ের কথা জানে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

কমলা সেন মুখ টিপে হেসে বললেন, অথচ পাবলিকের কাছে আমাকে কত ছোট করে দিতে পারতেন আপনি। করলে আর কেউ আপনাকে দায়ী করত না।

আপনি ছোট নন।

কমলা সেন আবার হাসলেন। ভারী শিশুর মতো হাসছেন আজ। শিশুর মতোই সরলভাবে চেয়ে থাকছেন। মৃদুস্বরে বললেন, তাই বুঝি?

আমি একটু আনমনা হয়ে যাই। আমার অস্ত্র শুধু কমলাকে আঘাত করেই যে ক্ষান্ত হয়েছে এমন নয়। অস্ত্রটি হয়তো এখনও ক্রিয়াশীল এবং হয়তো একদিন তা আমাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসবে। অধর যেমন কমলাকে কাজে লাগিয়েছিল, তেমনি কাউন্টার-অ্যাটাকে আমার দাবার ঘুঁটি ছিল অসীমা। জাগ্রতবিবেক কমলা যেমন করে ঘৃণা করছেন অধরকে, তেমনি একদিন অসীমাও কি করবে না আমাকে?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি ছোট হলে আমিও ছোট। কিন্তু নিজেকে ছোট ভাবতে নেই।

কমলা ধীরে ধীরে উঠলেন। বললেন, চলুন চিঠিটা আপনার হাতে তুলে দিই।

চলুন।—আমিও উঠলাম।

আমরা ঘরে ফিরে আসি। টাইপিস্ট ছেলেটা এসে গেছে। বাইরের বেঞ্চে এসে বসে আছে নানা অর্থীপ্রার্থী। কোমল আলোর লাবণ্য মুছে গেছে ঘর থেকে। পাখিদের সেই নির্ঝরিণীর মতো কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না আর। শুরু হয়ে গেছে কাজের দিন।

কমলা চেনটা খুলে ব্যাগ থেকে খামে আঁটা চিঠিটা বের করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আসি তাহলে?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

রিকশাটা দাঁড়িয়েই ছিল। কমলা লঘু, ভারহীন পায়ে গিয়ে উঠে বসলেন। মুখে সেই স্মিত ভাবটুকু শেষ মুহূর্ত অবধি লক্ষ করলাম। মনে হল, কমলা এখন সত্যিই ভারহীন। এখন তিনি স্কুলের বাচ্চা এক ছাত্রীর মতোই হঠাৎ হাফছুটি পেয়ে অবাক আনন্দে ভরে আছেন।

রিকশা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি মহৎ বা আমি সৎ এমন কথা আমি বলছি না। কারণ আমি তা নইও। দারিদ্র্যসীমা পার হওয়া যে শুধুমাত্র কর্মদক্ষতা নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার ওপর নির্ভর করে না তা অভিজ্ঞ মাত্রই জানেন। তবু লোকে আমাকে যতটা অসৎ বা অমহৎ বলে জানে আমি বোধহয় ততটা নই। আমি আমার স্ত্রীর হত্যাকারী বলে গণ-দরবার রায় দিয়েই রেখেছে। হায়, তাদের ফাঁসি দেওয়ার অধিকার নেই। ফলে আমার নিষ্ঠুরতার কথা কেই বা না জানে! অন্যের কথা বাদই দিলাম, কেউ যদি আমার বোন রুমাকে জিজ্ঞেস করে আমি অর্থাৎ তার দাদা আমার স্ত্রী অর্থাৎ তার বউদিকে বিষ দিয়ে মেরেছি কি না তা হলে সে খুব আত্মবিশ্বাসেব সঙ্গে 'না' কথাটা বলতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে একটা দ্বিধা বা সন্দেহ তারও আছে।

এইসব অখ্যাতি ও কিংবদন্তী মানুষের অদৃশ্য শত্রু। এদের বিরুদ্ধে লড়াই চলে না। আমি সেই বৃথা যুদ্ধ কখনও করিনি। বরং একটা কিংবদন্তী গড়ে উঠতে দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যা কিংবদন্তী নয়, যা বহু মানুষের চোখের সামনে নিত্য ধীরে ধীরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কেউ কোনওদিন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। বেশিরভাগ মানুষই যদি বোকা ও কিয়ৎ পরিমাণে অন্ধ না হত তা হলে তারা আমার ও কমলার সম্পর্কে একটা মুখরোচক কাহিনি রটনা করতে পারত। সেটা মিথ্যেও হত না।

কিন্তু তারা তা করেনি।

আমি সারাদিন আজ জনসাধারণের বিচিত্র মানসিকতা নিয়ে ভাবলাম। তাদের সকলের চোখের সামনেই তো ঘটেছিল সবকিছু। একটা স্কুলকে গড়ে তোলার জন্য কমলা প্রাণপাত করছিলেন। আমি তাঁর কাছাকাছিই ছিলাম। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তেন, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, রেগে যেতেন। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রী বেশি হত না। রেজাল্ট ছিল খারাপ। অর্থকরী অবস্থা বিপন্ন। নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত ছিল না। সব ধীরে ধীরে অতি কষ্টে হল। আমি তত পুরনো সেক্রেটারি নই। মাত্র শেষ তিনটে টার্মে আমি কমলার কাছাকাছি আসতে পারি। কো-এডুকেশন আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু কমলা জেদ ধরলেন, শুধু গার্লস স্কুলে ছাত্রী হয় না তেমন। বিশেষ করে একটা সরকারি গার্লস স্কুল যখন শহরে রয়েছে। ওঁর জেদ জয়ী হল। আমি হারলাম। এইসব নানা তুচ্ছ জয়-পরাজয় আমাদের মধ্যে তৃতীয় আর একটা সম্পর্কের দরজা খুলে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে। কমলা মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, ধমক দিয়েই বলতেন, টাকা দিন। ধার নয়, ডোনেশন। আমি দিতাম। কমলা একদিন বলেছিলেন, শুনুন পারিজাতবাবু, কেবলমাত্র টাকা আছে বলেই আপনি স্কুলের সেক্রেটারি হতে পেরেছেন, আর কোনও গুণে নয়। আমি মৃদু হেসে কথাটা মেনে নিয়েছিলাম। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ সব ঘটনা। তবু জানি, আর কেউ নয়, একমাত্র আমার কাছেই তিনি স্কুলের জন্য নিঃসংকোচে হাত পাততে পারতেন। সেই হাত আমি কখনও শূন্য ফেরাতে পারিনি। না, এর বেশি কিছু নয়। তবু এর চেয়ে গভীর আর কীই বা হতে পারে? কমলার

মনের মধ্যে অধরকে আমি তো কবেই হত্যা করেছি। কিন্তু কেউ বোঝেনি। বোধহয় অধর নিজেও নয়।

ক'দিন হল বৃষ্টি নেই। শুকনো খটখটে দিন। অ্যাকটিং হেডমিসট্রেস হিসেবে দুটো ব্যস্ত দিন কাটিয়ে অবশেষে এক বিকেলে অসীমা এল। আরও জীর্ণ, আরও শীর্ণ, মুখে চোখে গভীর উদ্বেগের ছাপ।

আমার দিকে পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, রোজ স্কুলে কারা গোলমাল করতে আসে বলো তো!

ঘটনাটা আমিও জানি। তবু নির্বিকার মুখে বললাম, কীসের গোলমাল?

স্কুলের সারা দেওয়ালে পোস্টার। ব্রিং ব্যাক কমলা সেন, অসীমা দিদিমণি গদি ছাড়ো, পারিজাতের মুন্ডু চাই, এইসব। স্কুলে দু'দিনই ঢিল পড়েছে। শ্লোগান দিয়েছে কিছু লোক। শোনা যাচ্ছে, স্ট্রাইকও হবে।

আর স্কুলের ভিতরে কী হচ্ছে অসীমা?

অসীমা একটা শুকনো ঢোঁক গিলল। গভীর এক হতাশা মাখানো মুখে বলল, স্কুলের ভিতর? ভীষণ থমথমে। কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলে না। টিচার্স রুমে খুব উত্তেজিত আলোচনা চলে সারাদিন।

তুমি ভয় পাচ্ছ না তো অসীমা?

ভয়?—অসীমা অনিশ্চয় মুখে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, একটা ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি পারব না।

কেন পারবে না অসীমা? একটা স্কুল চালানো কি খুব শক্ত?

অসীমা আজ চোখের পলক ফেলছে খুবই কম। আমার দিকে সেই চোখে আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এটা যেন কমলাদিরই স্কুল। আমাকে তো কেউ চাইছে না। এরকম সিচুয়েশনে কি কাজ করা যায় বলো!

আমি তো আছি।

অসীমা ওপর নীচে মাথা নেড়ে চিন্তিতভাবে বলল, হ্যাঁ, তুমি আছ। সেটা অবশ্য ঠিক।

কিন্তু আমি আছি জেনেও অসীমার চোখ মুখ বিন্দুমাত্র উজ্জ্বল হল না। একটুও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল না সে। আজ যেন ও সেই বাড়ি, যার বাথরুমের আলোটাও নিভে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

আমার অসীমাকে একবার বলতে ইচ্ছে হল, বিপদের ভয় তোমার কতটুকু অসীমা? স্কুলে পোস্টার দেখোনি? পারিজাতের মুন্ডু চাই! কই একবারও আমার বিপদের কথা বললে না তো!

একটা নির্জন উপত্যকায় দু'জন অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে। দেখা হবে। আমার ক্যালকুলেটর বলছে, লগ্ন আসন্ন। আর বড় একটা দেরি নেই।

অসীমাকে আমি ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে অনেকক্ষণ অন্ধকার কুঞ্জবনে বসে রইলাম চুপ করে। কুঞ্জে কোনও রাধা আসবে না। চিরকাল অপেক্ষা করলেও না। তার বদলে ঝাঁক বেঁধে এল মশা। কিন্তু আজ তাদের হুল আমি তেমন টের পেলাম না।

৮। অভিজিৎ

বুড়ো মানুষদের সঙ্গে থাকার একটা দোষ হল, কখন তাদের কী হয় তা নিয়ে ভাবনা থাকে।

সকালবেলায় দেখি, দাদুর মশারি গোটানো। কেমন কেতরে শুয়ে আছেন। মাথাটা পড়ে গেছে বালিশ থেকে। মুখটা হাঁ-করা। একটা মাছিও ভনভন করছে মুখের সামনে।

পরিষ্কার ডেথ-সিন। সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন। স্ট্রোক। মৃত্যু।

পরের দৃশ্যগুলো পরপর ভেসে যাচ্ছিল চোখের সামনে। লোক ডাকো। কাঁদো, যদি সম্ভব হয়। কাঁধ দাও, পোড়াও।

ডাকলাম, দাদু! দাদু!

পট করে চোখ মেললেন, কী ব্যাপার?

শুয়ে আছেন যে বেলা অবধি?

ও।—বলে উঠে বসলেন। কোমরের আলগা কষিটা ঠিক করতে করতে বললেন, আজকাল এটা হয়েছে। মাঝে মাঝে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাতে ভাল ঘুম হয় না তো! কাজের মেয়েটা আসেনি?

না।

তা হলে আজ হরিমটর। রাঁধবে কে?

আমার বুকটা এখনও ধুক ধুক করছে। বললাম, দরকার হলে আমি রাঁধব। চিন্তার কিছু নেই।

তুমি রাঁধবে? তুমি রাঁধবে কেন? ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে না?

না। স্কুল এগারোটায় বসে।

দাদু প্রগাঢ় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কাল অনেক রাত অবধি আমার ঘুম হয়নি। তোমার নতুন কেনা হ্যারিকেনটায় খুব আলো হয়। চোখে লাগছিল। অভ্যেস নেই কিনা, অত আলো সহ্য হয় না।

বললেন না কেন, নিবিয়ে দিতাম!

তা কেন, পড়াশুনো করছিলে বোধহয়। নতুন চাকরি, তার ওপর মাস্টারি, একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকারও। তাই কিছু বলিনি।

আমি বললাম, দু' ঘরের মাঝখানের দরজাটায় কপাট নেই। থাকলে লাগিয়ে দিতাম।

কপাট দুটো ঘুণে ধরে পচে গেল। আমি আর লাগাইনি। কী দরকার? ও ঘরটায় তো কেউ থাকে না।

এখন আমি থাকব। কপাট আমিই লাগিয়ে নেবখন।

দাদু মাথা নেড়ে বলেন, তারও দরকার নেই। তুমি থাকবে, আমিই হয়তো থাকব না। কপাট দিয়ে তখন কী করবে?

কথাটা ভেবে দেখার মতো। আমি আর কী বলব?

দাদু বললেন, সাইকেলও তো বোধহয় একটা কেনা দরকার। গণেশেরটা বোধহয় আর বেশিদিন দেবে না, না?

চাইলে দেবে, কিন্তু তার দরকার কী? কিনেই ফেলব একটা।

নতুন চাকরি। টাকা পয়সা হাতে আসতে না আসতেই মোটা খরচ। সামলাতে পারবে?

হয়ে যাবে কোনওরকম।

মা-বাবাকেও কিছু পাঠাতে হবে তো।

ও নিয়ে ভাববেন না।—বলে আমি রান্নাবান্নার জন্য রওনা হচ্ছিলাম।

দাদু বললেন, এক কাজ করো। আমার তেমন খিদে নেই। আজ বোধহয় একাদশীও। ছোট পঞ্জিকাটা দেখো তো।

আমি দেখলাম। একাদশীই।

দাদু বললেন, তা হলে এ বেলা গণেশের বাড়িতেই খেয়ে স্কুলে রওনা হয়ে যাও। প্রথম প্রথম পাংচুয়াল হওয়া ভাল। দেরি হলে কে কী বলবে।

রোজ ওদের বাসায় খাচ্ছি।

আদর করেই তো খাওয়ায়।

তা অবশ্য করে। তবু রোজ খাওয়া ভাল নয়।

রোজ না হয় নাই খেলে, আজকের দিনটা চালিয়ে দাও। কাল কাজের মেয়েটাও এসে যাবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, মেয়েটা কি এমনি কামাই মাঝে মাঝে করে?

করে। তা আমার অসুবিধে হয় না। চালিয়ে নিই। অসুবিধে তোমাদের।

তাই দেখছি।

যতটা বীরত্বের সঙ্গে রান্না করতে রাজি হয়েছিলাম, কাঠের উনুন ধরাতে গিয়ে তা ফানটুস হয়ে গেল। স্টোভ এ বাড়িতে নেই, দাদু তা কিনবেনও না। বাড়িতে শুকনো ডালপালা, পাতানাতার অভাব নেই। এসব ইন্ধন থাকতে পয়সা দিয়ে জ্বালানি কেনে কোন আহাম্মক!

মোটামুটি একটা ডাল ভাত নামাতেই আমার দম বেরিয়ে গেল, স্কুলেরও বেলা প্রায় যায় যায়।

দাদু দূর থেকে সবই লক্ষ করছেন। আমি খেতে বসার পর বললেন, আজ পারলে বটে, কিন্তু রোজ পারবে না। কাজের মেয়েটা আজকাল ঘরের কাজ করতে চায় না। ঠিকাদারের মজুর খাটলে অনেক বেশি পায়। কাজের লোকের খুব অভাব।

আমি গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বললাম, কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে ঝি চাকর বলে কেউ থাকে না। উন্নত দেশগুলিতেও নেই।

তাই নাকি?—দাদু চিন্তিতভাবে বললেন।

আমি বললাম, ভাববেন না। দু'দিনে এসব অভ্যাস হয়ে যাবে। কাল আমি একটা স্টোভ কিনে আনব।

স্টোভ!—দাদু চোখ কপালে তুললেন, আবার স্টোভ কেন?

ভয় পাবেন না। রোজ জ্বালাব না, যেদিন কাজের মেয়ে আসবে না, শুধু সেদিন।

খুব খরচের হাত তোমার। এটা ভাল নয়।

যা দরকার তা তো কিনতেই হবে।

তা বলে একসঙ্গে এত! এই তো হ্যারিকেন কিনলে, সাইকেলও কিনবে বলছ, আবার স্টোভ!

খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বললাম, আপনার আজ খেতে কষ্ট হবে। শুধু ডাল ভাত আর সেদ্ধ।

যথেষ্ট। আমি তো শুধু সেদ্ধ দিয়ে খাই। আজ তবু ডাল হয়েছে।

আমি গণেশকাকার কাছ থেকে ধার করে আনা সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেশি সময় নেই।

নতুন চাকরির একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। নিতান্তই মাস্টারি যদিও। তবু এই প্রথম নিজেকে খানিকটা মূল্য দেওয়া যাচ্ছে। একেবারে ফালতু, পরনির্ভরশীল, শিকড়হীন তো আর নই। কিছু একটা করছি, কাজে লাগছি।

আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী তা আমি জানি। শিষ্ট আমি নই, শান্তও নই। কোনওকিছুই আমি সহজে মেনে নিই না। শিবপ্রসাদ স্কুলে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি, এই স্কুলে গভীর গণ্ডগোল আছে। ধীরে ধীরে সেগুলি আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তারপর জোট বাঁধা। পারিজাত জানে না, কী একখানা টাইমবোমা যে শিবপ্রসাদ স্কুলে স্থাপন করেছে। এর জন্য তাকে নাস্তানাবুদ হতে হবে।

আমি যেদিন প্রথম স্কুলে জয়েন করি সেদিন কিছু লোক এসে বাইরে থেকে খুব শ্লোগান দিল।

কমলা সেনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যর্থ করো। অসীমা দিদিমণি গদি ছাড়ো। পারিজাতের মুন্ডু চাই।

সবাই বারণ করা সত্ত্বেও আমি ফটকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাদের লক্ষ করলাম। এরা কারা তা বুঝলাম না। তবে মনে হল এরা নিশ্চয়ই জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়। ভাড়াটে লোক হওয়াই সম্ভব।

তিনদিন বাদে স্ট্রাইক হয়ে গেল। কমলা সেনের পদত্যাগের প্রতিবাদে।

গণ্ডগোলের আঁচটা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছি। বলতে কী, গণ্ডগোলের জায়গাই আমার প্রিয়। এই আমার স্বক্ষেত্র, এই আমার ইনসেনটিভ।

একদিন অসীমাদি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ঘরে।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে কাজ করতে?

ভালই।—নিস্পৃহ গলায় বললাম। আমার চাকরি হওয়ার পিছনে ওঁর একটু হাত আছে। কিন্তু তা বলে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হওয়ারও মানে হয় না। স্কুলের হেডমাস্টার বা হেডমিসট্রেসের পদটিই একটি কায়েমি স্বার্থের সুযোগ। ভবিষ্যতে হয়তো ওঁর বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। মনটাকে বেশি কৃতজ্ঞতার মাখন মাখিয়ে রাখলে অনেক ফ্যাচাং।

উনি অবশ্য আমার মুখভাব তেমন করে লক্ষও করলেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক, বিপন্ন মুখভাব। হতেই পারে। কমলা সেন নাকি খুব ভাল অ্যাডমিনস্ট্রেটর ছিলেন। তাঁকে হটিয়ে ইনি এসেছেন। আর এই রদবদলের মূলে আছে পারিজাত। টিচার্সরুমে বসে প্রায় সারাদিনই এসব কথা হয়। কাজেই সাবধান হওয়া ভাল। লোকে যাতে ধরে না নেয় যে, আমি অসীমা বা পারিজাতের লোক। আমি তা নইও।

অসীমা দিদিমণি আমার দিকে আনমনে চেয়ে বললেন, স্কুলে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই না? এর মধ্যে এসে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে!

না। গণ্ডগোল হতেই পারে।

অসীমাদি একটু চুপ করে চেয়ে থেকে বললেন, আমার ভাল লাগে না। স্কুলটা চিরকাল শান্ত ছিল। কোনও গণ্ডগোল ছিল না। এখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক এসে বিশ্রী স্লোগান দেয়, ঢিল ছোঁড়ে। ছেলেমেয়েরা ভয় পায়।

আমি দোনোমোনো করে বলি, ওই লোকগুলো কারা তা আপনি জানেন?

কারা আর হবে? পাবলিক।

আমার সন্দেহ থেকে গেল। কমলা সেনের পদত্যাগ যদি অবৈধ বা অন্যায় কিছু হয়ে থাকে তবে আইন-আদালত আছে। আর পাবলিকের আন্দোলন ঠিক এরকম প্রকৃতির হয় না। বেশিরভাগ স্কুলেই এরকম কিছু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকে। তাতে বাইরে থেকে রোজ ঢিল পড়ার কারণ নেই। আন্দোলন আমি কিছু কম করিনি।

পরদিন লোকগুলো আবার এল। আমি এবার ফটক খুলে বেরিয়ে সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জনা ত্রিশেক লোক। আমাকে মুখোমুখি দেখে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করতে যাইনি। তবে হাতজোড় করে বললাম, আমাকে কিছু বলতে দিন।

লোকগুলো সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করল না। আমি স্কুলের সামনে একটা কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে স্ট্রিট কর্ণার করা অভ্যস্ত গলায় আধঘণ্টা ধরে একটা চোস্ত ভাষণ দিলাম। তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও ছিল।

কাজ হল। দু'দিন যাবত তারা আসছে না।

টিচার্স রুমে যারা একদম পাত্তা দিত না তারা এখন কথা-টথা বলছে।

স্কুলটা আমার ভালই লাগছে। বেশ বড় স্কুল। হাজার খানেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী, ডিসিপ্লিন চমৎকার। ক্লাস বাগে আনতে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।

আজ স্কুল শুরু হওয়ার মুখেই অসীমাদি ডেকে পাঠালেন।
পারিজাত আপনাকে একটু ডেকে পাঠিয়েছে। জরুরি দরকার।
আমাকে!—আমি একটু ভ্রু কোঁচকাই। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না।
সেক্রেটারির বাড়িতে গেলে এখন ঘটনাটা অন্যরকম দেখাবে। কিন্তু ডাকলে যেতেই হয়। বললাম, কখন?
আজই। খুব দরকার বলছিল।
অগত্যা।
পারিজাত আজও জরুরি মিটিং করছিল। সুতরাং আমাকে উমেদারের মতোই অপেক্ষা করতে হল বাইরে। আমি আগের দিনের মতোই একটা কুঞ্জবনে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। আজ অবশ্য রুমা নেই। একা আমি।
একটু বাদেই দারোয়ান এসে ডেকে নিয়ে গেল।
পারিজাত একটু ভোম হয়ে আছে। খুব মানসিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে মানুষের মুখেচোখে যেন একটা আস্তরণ পড়ে যায়। তবে আমাকে দেখে ছুরির ফলার মতো ঝিকিয়ে উঠল তার হাসি, এই যে হিরো, এসো, এসো। বোসো।
আমি বসতে বসতে বললাম, হিরো কীসের?
শুনলাম, অধরের ভাড়াটে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছ! সত্যি নাকি?
কার ভাড়াটে লোক?
একজন নমস্য ব্যক্তির। অধর বিশ্বাস।
আমার ভিতরে একটু টিকটিক আওয়াজ হল। অধর বিশ্বাস। সেই সাইক্লিস্ট! মস্তান!
বললাম, ঠিক জানেন?
পারিজাত হাসল। বলল, জানি। কিন্তু এর বেশি হিরো হতে যেয়ো না। বিপদে পড়বে।
আমার ইচ্ছে হয়েছিল, জামার কলারটা একটু তুলে দিই। তার বদলে খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একটু হাসলাম। প্রথাসিদ্ধ মস্তানদের দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে। এক সময়ে খুদে খুদে নকশাল ছেলেদের ভয়ে তাদের আমি প্রাণভয়ে পালাতে দেখেছি।
পারিজাত আমার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই আমার ভিতরটা দেখে নিয়ে বলল, তুমি অবশ্য নকশাল ছিলে। ভয়ডর কিছু কম। তাই না?
আমি গোমড়া মুখ করে রইলাম।
পারিজাত খুব আস্তে করে বলল, নিমকহারাম।
আমি ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো চমকে উঠে বলি, কী বললেন?
নিমকহারাম।
তার মানে?
লজ্জা করে না?
কী বলছেন স্পষ্ট করে বলুন।
হৃদয়হীন। অকৃতজ্ঞ।
আমি চটে উঠে বলি, খামোখা গালমন্দ করছেন কেন?
করা উচিত বলে।
আমি কী করেছি?
এই ঘোরতর বেকার সমস্যার যুগে তুমি একটা ভদ্র চাকরি পেয়েছ।
তাতে কী হল?
চাকরিটা পেয়েছ আর একজনের বদান্যতায়।

সে আবার কে?

যাক, অকৃতজ্ঞতা তাহলে ডিপ রুটেড! এর মধ্যে তাকে ভুলতেও শুরু করেছ! অ্যাঁ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই লোকটার অদ্ভুত আচরণে। কিন্তু তেজের গলায় বলি, আমি কারও বদান্যতার ধার ধারি না।

ধারো না, তার কারণ তুমি জেনুইন অকৃতজ্ঞ।

আমি অকৃতজ্ঞ নই।

পারিজাত চট করে তার টেম্পোটাকে একটু নামিয়ে এনে বলে, নও?

না।

তুমি তোমার দেশকে ভালবাসো? জনগণকে?

এ প্রশ্ন অবান্তর।

পারিজাতের দুটো চোখ চিকচিক করতে থাকে। বলে, যারা শ্রেণিশত্রু নয় তাদের কথা বলছি। তাদের ভালবাসতে তো অসুবিধে নেই?

আমি আপনার কথা ধরতে পারছি না।

ধরার দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিয়ে যাও না।

আপনি আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চান বলে মনে হচ্ছে।

বুদ্ধি তো বেশ টনটনে দেখছি।

আমি নির্বোধ নই, আপনিও জানেন।

জানি, হাড়ে হাড়ে জানি। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় তুমি তিন-তিনজন কঠোর মহিলার স্ট্রং রেকমেনডেশন জোগাড় করে ফেলেছিলে।

ও কথা থাক। কাজের কথায় আসুন।

আমি কাজের কথাই বলছি। তুমি জনগণ এবং সর্বহারাদের ভালবাসো কি না।

হয়তো বাসি।

তুমি একটা চাকরি পেয়েছ কি না।

পেয়েছি।

তা হলে?

তা হলে কী?

জনগণের প্রতি তোমার কোনও কর্তব্য আছে কি না।

সব সময়েই আছে।

পারিজাত একটু ঝুঁকে বসে আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে থেকে বলে, জনগণের মধ্যে বিশেষ একজন তোমার জন্য অনেকটাই ত্যাগ স্বীকার করেছিল। প্রায় আত্মোৎসর্গ। মনে পড়ে?

সে কে?

তাকে ভুলে যাওয়াটা অপরাধ অভিজিৎ।

আমি বিরক্ত মুখে বলি, আপনি কি প্রতিমার কথা বলছেন?

পারিজাত একটা শ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দেয়। মৃদু স্বরে বলে, যাক। নামটা অন্তত মনে আছে।

প্রতিমার কী হয়েছে?—আমি জিজ্ঞেস করি।

কী হবে? একজন নিম্ন-মধ্যবিত্তের যুবতী মেয়েদের জীবনে কী আর হয়? কিছুই হয় না। তারা বসে থাকে। অপেক্ষা করে। চাকরি বা বিয়ে কিছু একটা আশা করতে থাকে। শেষ অবধি হয়তো কোনওদিনই হয় না। তুমি কি জানো, বেকার সমস্যার মতো এইসব অনূঢ়া কন্যাদেরও একটা বিশাল সমস্যা রয়েছে এ দেশে?

জানব না কেন? আমারও দুটো বোনের বিয়ে বাকি।

তুমি জানো যে, বেকার সমস্যা এবং অনূঢ়া সমস্যা দুটোই কো-রিলেটেড?

তাই নাকি?

ন্যাকামো কোরো না অভিজিৎ। বুদ্ধিমান ছেলেদের এটা জানার কথা যে. দেশে এত বেকার না থাকলে মেয়েদের বরের অভাব হত না।

তা বটে।

তুমি কি জানো, উপযুক্ত পাত্রদের সংখ্যা কম বলেই দেশে একটা দুষ্ট পণপ্রথা ক্রমেই প্রসারলাভ করছে? এবং বেকার সমস্যা, বিয়ে ও পণপ্রথা এই তিনটেই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? জানো?

বোধহয়।

তা হলে?

তা হলে কী?

এখন চাকরি পাওয়ার পর তোমার কর্তব্য কী হওয়া উচিত?

আমি বোকার মতো চেয়ে থাকি। লোকটা বাস্তবিকই পাজির পা-ঝাড়া। তবু একে আমি ঘেন্না করতে পারছি না, এর ওপর রেগে উঠতে পারছি না। হঠাৎ হেসে ফেলে বললাম, কিছু কর্তব্য করতে হবে নাকি কারও প্রতি?

দায়িত্বশীলদের তো সেটাই মোটো হওয়া উচিত। তুমি নিজে উঠে গেছ, এবার আর একজনকেও টেনে তোলো।

কী করতে হবে?

ভেবে দেখো। আমি ফোর্স করতে চাই না।

ফোর্স করলেও লাভ নেই। কেউ ফোর্স করে কখনও আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারেনি।

পারিজাত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, মডার্ন ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই বলে ওকথা বলছ। এ যুগে বুদ্ধিমান লোকেরা ফোর্স কীভাবে অ্যাপ্লাই করে জানো?

খানিকটা জানি।

কিছুই জানো না। তোমাকে কখনও সেই যুদ্ধে নামতে হয়নি।

আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

দেখাচ্ছি। কিন্তু লক্ষ করছি, তুমি ভয় পাচ্ছ না।

আমি হেসে ফেলি, বলি, না, পাচ্ছি না।

তা হলে আমাকে স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হয়।

কীরকম?

একবার প্রতিমার সঙ্গে দেখা করে অন্তত একটা "হ্যালো" বলে এসো। এটুকু ওর পাওনা। বেচারা মহৎ হওয়ার জন্য চাকরি থেকে সরে দাঁড়াল অথচ সেই মহত্ত্বটুকু কেউ স্বীকার করল না। এটা নিষ্ঠুরতা অভিজিৎ।

আমি রাগ করে উঠে পড়লাম। বললাম, আর কোনও কথা নেই তো?

সে সব পরে হবে।

আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সাইকেলে উঠে ঝড়ের বেগে সেটাকে চালাতে লাগলাম। এসব কী হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি। ষড়যন্ত্র! প্ল্যান! ফাঁদে ফেলার চেষ্টা।

আমি মউডুবির দিকে অর্ধেক পথ গিয়েও আচমকা সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নিই।

দরজা খুলল প্রতিমা। ম্লানমুখী। কয়েকদিনেই যেন কৃশকায়া। বিষণ্ণ। কিছু বলল না প্রথমে। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ বলল, এতদিন কোথায় ছিলেন?

ফেরার পথে ধীরে ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিলাম। খুব ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে আপনমনে একটু করে হেসে উঠছি আমি। কী হল আমার হঠাৎ? কী হল? যাঃ! পাগল, পাগল, দুনিয়াটাই পাগল!

৯। পারিজাত

এবার বন্যা হল না। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে অসীমা। অভিজিৎ আজকাল স্কুলের পর রোজ প্রতিমাদের বাড়ি যায়। রুমা আবার বিয়ে করেছে। গন্ধর্বকেই। আকাশে শরতের মেঘের আনাগোনা। ভারী সুন্দর এই ঋতু। যদিও প্রকৃতির দিকে তাকানোর সময় আমার কম। তবু টের পাই। বাইরে শরতের আলো আর ছায়া সাদা ও কালো দুটি শিশুর মতো আপনমনে খেলছে।

হে আমার দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, জীবনের কোনও গল্পেরই কোনও শেষ নেই। একটা ঘটনা থেকে জীবন আর একটা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে অশেষ হয়ে চলে গল্প। এই বুড়ি পৃথিবী অবিরল বলে যাচ্ছে গল্পের পর গল্প। শেষ নেই। এই গল্পে অর্থহীন জয়, নিরানন্দ পরাজয়, ক্ষণস্থায়ী সফলতা, খণ্ডিত বিফলতা, সূক্ষ্ম প্রেম বা স্থূল বিবাহ ফিরে ফিরে আসে। আমার দারিদ্র্যসীমা পেরিয়ে আসার কিংবদন্তীও পুরনো হয়ে এল। আমি জানি, আমার মতো আরও হাজার হাজার লোক দারিদ্র্যসীমা ডিঙোবে। রচিত হবে আরও কত কিংবদন্তী। একদিন দারিদ্র্যসীমার রেলবাঁধের ওপাশে আর লোকবসতি থাকবে না। আমরা সেদিন সবাই মিলে তুলে দেব ওই রেলবাঁধ। আমি সেই স্বপ্ন দেখি।

শরতের এই রঙিন বিকেলে আজ কিছু নির্জন অবকাশ পেয়ে গেছি। কিছু উন্মন। আমার ক্যালকুলেটর বারবার সংকেত দিচ্ছে। আমার বাগানে শিউলির গন্ধ। পিছনে এক মরুভূমির মতো অতীত। সামনে এক পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।

আমি নিরালা কুঞ্জবনে একা বসে আছি। একা! অসীমা আজকাল আসার সময় পায় না।

সময় পায় না? না, কথাটা ঠিক নয়। আমি জানি, অসীমা ভয় পায়। বড় ভয় পায়। ক্যালকুলেটর কারই বা নেই! ভিখিরিরও আছে। কারও কারও ক্যালকুলেটর নির্ভুল, কারও ভুলে ভরা। অসীমার ক্যালকুলেটর কেমন তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তার যন্ত্রটি নিশ্চিত তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে, ও ভাল নয়, ওর কাছে যেয়ো না। অসীমা হয়তো খুব বেশি আসবে না আর। স্কুল তাকে অজস্র কচি হাতে জড়িয়ে ধরবে। নিয়ে নেবে। নিক।

আমি আজ কিছু ভাবছি না। কুঞ্জবনে অদ্ভুত রূপময় আঁধার। বাইরে পাখি ডাকছে। গুনগুন করছে মৌমাছি। শিউলির মাতাল গন্ধে ভরে আছে দশ দিক।

ফটকের বাইরে আজও চেঁচাচ্ছে সেই মাতাল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোককে শোনাচ্ছে আমার জীবনকাহিনি। রাজার আলমারির মধ্যে আমি কীভাবে পেয়ে যাই গুপ্তধন। কীভাবে গরিবদের শোষণ করে আমি আস্তে আস্তে উঠে গেছি টাকার পাহাড়ের চূড়ায়। আমার শ্বাসবায়ুতে মিশে আছে কত হতভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস।

আমার খারাপ লাগে না। একভাবে না একভাবে নিজের অজান্তে সে পিটিয়ে চলেছে আমারই ঢাক। গড়ে উঠছে কিংবদন্তী। রহস্য। ইন্দ্রজাল।

ফটকের মধ্যে যে চারজন ছায়ামূর্তি ঢুকল তাদের দেখে আমি চমকালাম না। সহজ, সুঠাম তাদের হাঁটার ভঙ্গি। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তাদের শরীর। ক্যালকুলেটর বলল, সাবধান! আমি তাকে চুপ করিয়ে রাখলাম। এরা অধরের লোক। সে নিজে আসেনি। আসতে নেই।

লোকগুলো দারোয়ানকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। বোধহয়, আমি কোথায় জেনে নিল।

ঘাসজমিতে তাদের পায়ের কোনও শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু তারা আসছে। তারা ভাল লোক নয়। খুনি, গুন্ডা, নিষ্ঠুর। আমি জানি।

শিউলির দম বন্ধ করা গন্ধ আমি বুক ভরে নিই। আমি জীবনে অনেক লড়াই জিতেছি। এক-আধটা লড়াই হারলে আর তত ক্ষতি হবে না আমার। বরং কিংবদন্তী সৃষ্টি হবে আবার। ঘন হয়ে উঠবে রূপকথা।

পরাজয়ের শেষ সীমানায় দাঁড়ানো অধর জানে না, উপত্যকায় আমাদের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তার রক্তে রাঙানো তলোয়ার মুছে আমি খাপে ভরে ফেলেছি। আকাশে এখন শকুন উড়ছে।

আমি একটু হাসলাম। নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে রইলাম আনমনে। শিউলির গন্ধে বুক ভরে উঠছে।

বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ছ'জন লোক। এদেরও হাঁটার ভঙ্গি সহজ, সুঠাম। চমৎকার চটপটে। ঘাসজমির ওপর ছ'টা বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চকিত পায়ে লাফিয়ে নেমে এল তারা।

অধরের লোকেরা কুঞ্জবনের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারল না শেষ অবধি। ছ'জন তাদেরই মতো আত্মবিশ্বাসী নিষ্ঠুর ও জান-কবুল লোক তাদের পথ আটকাল।

তারপর যা হয় হচ্ছিল। আমি একটা হাই তুললাম, অধরের পয়সা-খাওয়া চারটে লোকের সঙ্গে আমার বেতনভুক ছ'জন লোক খুব নিবিষ্ট এক মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঝিকোচ্ছে ছোরা, রিভলভার, নল, ঘুসি, ব্লেড। বড় একঘেয়ে।

দারিদ্র্যসীমা ডিঙোতে গিয়ে আমার পথে বহুরকম বাধা পড়েছে। এক-আধটা লাশও কি পড়েনি? কিন্তু এসবই অত্যন্ত মোটা দাগের ব্যাপার। আমার ভাল লাগে না।

শিউলির গন্ধ বড় মাতাল করেছে আজ আমাকে। নিমীলিত চক্ষে সামনের দিকে চেয়ে আমি মাতাল হয়েও যাচ্ছি। পিছনের ঘাসজমিতে লড়াইটা বোধহয় শেষ হল, কে হারল, কে জিতল তা জানার জন্য আমি মোটেই উদগ্রীব হই না। তবে জানি শেষ অবধি আমার কাছে কেউই পৌঁছতে পারবে না।

ক্লান্তিতে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজলাম।

ভুল সত্য

দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উঁচু টুলের ওপর পা দু'খানা তোলা। দু'পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাঁ হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর একটা দামি ট্রানজিস্টার রেডিয়ো। রেডিয়োর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজি চুরুটের বাক্স, দেশলাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে রোদের ঠিকরে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড়ো করে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিয়োতে। তিনি খবরটায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয়পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নীচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে— এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা...

সরোজিনী, দিগিনের বোন। এ সব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুর দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ, মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দু'দিন পর। সরোজিনী একটু পাগলি আছে। রামপ্রসাদি সুরে সারা দিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়ও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছে তাঁর। মাঝরাতে এক বার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল। উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগি ঘর। বারান্দা থেকে অনেক দূর দেখা যায়। খুব বেশি গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাঁদ-ফাঁদ দেখলে কুকুর-বিড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ওদের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে তেমন ভাল ঘুম হবে না মনে করে দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা বিয়ার দিয়ে গিলে ফেলেন। বিয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন, তাই কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন আবার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বিয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝে মধ্যে এই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, 'কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয়নি যে গোল হবে।

কাঠের সিঁড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারও এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্ত বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে, ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শানু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে, ও কাকা।

দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বলেন, হুঁ।

ঘুমোচ্ছ?

শরীরটা ভাল নেই। কেন?

সোপস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেন্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

কত?

পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন, খামোখা।

এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাব?

গেলেই ভাল। নইলে আরও টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে?

হিসেব তো এখনও শেষ করিনি। খরচ তো এখনও হচ্ছে। তবে হাজার ত্রিশেক বেরিয়ে গেছে।

আরও যাবে।

লস হবে বলছ?

হবে।

কেন?

ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ?

করিয়েছি।

কী বলে সার্ভেয়াররা?

কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভাল নয়। নীচের দিকে ভাল জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

হুঁ। — দিগিন বলেন।

কী করব?

যা বলবার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনও অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

কিন্তু কলকাতায় যে-নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভাল খদ্দের ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালই পাব।

দিগিন চোখ খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন, যা ভাল বোঝো করো।

শানু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে, তুমি একদম অ্যাডভাইস দিচ্ছ না। গত দু' বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তা হলে আমার মনের অবস্থাটা কী হয় এক বার ভেবে দেখেছ? কত টাকা জলে যাবে।

সোপস্টোন তো আর হিরে-জহরত নয়। ওর পিছনে দু' বছর অত টাকা ঢালা বোকামি হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শানু রেগে গিয়ে বলে, কিন্তু ভুটান গভর্নমেন্ট অত টাকা চাইবে কেন? ডিপোজিটটার খোঁজও তো ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন, তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যাবসা করবে।

কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে? ওরা দেবে?

খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাওনি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন?

কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমি লাভ চাইছি না। খরচটাও যদি উঠে আসত।

উঠবে না। বরং আরও টাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। দুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত।

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ দুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল, কাছেপিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনও খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়। লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরও তিন জন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, ত্রিশ হাজারের বেশিই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

ছোটকাকা।

হুঁ।

অনেক লস হয়ে গেল।

বুঝতে তো পারছি।

বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে?

কী করব?

কিছু একটা করা তো দরকার।

দু' বছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ, এ তো ভালই। তোমার লাভ যদি লবডঙ্কাও হয়, তবু ওই চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শানু কোমরে হাত দিয়ে ঋজু দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে, তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

যাচ্ছি না। গেছি।— বলে আর-একটা সরু মাদ্রাজি চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুনি তাঁর তৃতীয় কাপ চা আসবে। ত্রিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাত হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে তিনি স্ফূর্তিযুক্ত হয়ে বলেন, যা গেছে। ছেড়ে দাও। ওইটাই শেষ পর্যন্ত টিকবে।

যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেয়ো না।

ভুলিনি বলেই তো বলছি। আরও যা লস হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শানু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
সে যেতে-না-যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।
ছোটমামা।
হুঁ।
চা।
হুঁ।
ঠক করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে, কারা যেন আসছে আজকে আবার।
দিগিন অবাক হয়ে বলেন, কারা?
কী জানি!— পুন্নি ঠোঁট উলটে বলে, শুনছি কারা যেন আসবে।
কত কে আসে।— দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন, কার কথা বলছিস?
তুমি বুঝি জানো না? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।
ও।— বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ে চুমুক দেন। আগুন-গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠান্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন। পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনও শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।
তা কী করবে?— পুন্নি জিজ্ঞেস করে।
কী করব? এলে আসবে।
আমি সামনে যাব না।
সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন? চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।
আমি সামনেই যাব না।
কেন?
আমার ভাল লাগে না।
ও।— বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিয়োটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিয়ো বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতার ও পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।
ছোটমামা।
হুঁ।
আমি যা বলেছি শুনেছ তো?
শুনলাম।
আমি সামনে যাব না।
আচ্ছা।
আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।
দিগিন 'হুঁ' দেন।
ঠিক তো?— পুন্নি সন্দেহে জিজ্ঞেস করে।
হুঁ।
কী করবে?
তোর বদলে দক্লীকে দেখিয়ে দেব।
টের পাবে না?

টের পাবে কেন? এত বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দক্‌লীও তো আমাদের ভাগনিই। তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে, আহা।

দিগিন বলেন, কী হল?

পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে, দক্‌লী ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি? তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন এক বার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সে বার। তার আগের দিন একটা প্রকাণ্ড তরমুজ কিনে এনে তার এক দিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেনো, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের এক ধারে তাকে বসিয়ে অন্য ধারে নিজে বসেন। তরমুজটাকে এক বার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন, ভাইপো আবার তাঁর দিকে গড়িয়ে দেয়। এইভাবে ঘণ্টাখানেক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম তৈরি করে রেখেছিল পেটের মধ্যে, তার কোনও ধারণা ছিল না দিগিনের। পরের দিন বন্ধুরা এসে পৌঁছুনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে পরদিন সকাল। বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ওই তরমুজের ধারেকাছেও তারা ঘেঁষেনি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বিয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আদতে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। একমাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিঙের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমন্ত, জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারির কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যাবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগি ঘর সমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তাঁর হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তাঁর অভ্যাস। আর একা-বোকা থেকে থেকেই তাঁর নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোদক কিছুই বাদ রাখেননি। এখনও তাঁর নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধাধরা জীবন ভাল লাগে না।

দেশভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বউ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকিত্বটা চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগি ঘরটার আশেপাশে আরও দু'খানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাঁদের ভাঙেনি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজোজনের ওষুধের স্টেশনারি, বড় ভগ্নিপতি কয়লার ব্যাবসা করে, ছোট ভগ্নিপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটর-সাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন, কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগন থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামি একটা বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ছাঁটের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা। জুলপি চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দু' খিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

আরে দিগিনদাদা।

যাচ্ছিস কোথায়?

কাল রাতে জোর ধস নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজি তো খার্সাঙে আটকা পড়ে আছে। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এ পারে আসতে পারে তো নিয়ে আসব।

দিগিন বলল, ধস? কই আমি তো শুনিনি।

শুনবেন কী করে? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্চনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকার্ট রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি। আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। একসময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নি করেছিলেন দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভাল আয় হত।

দিগিন বলেন, বের হয়ে হবে কী? কাজ-কারবার কিছু নেই।

কাজ নেই কে বলে? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরিবের বাড়িতে। ডিসকাস করা যাবে।

দিগিন লক্ষ করেন, কাঞ্চনের জুলপির চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখন নেই। দিগিন বলেন, আসবখ'ন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে, শানুর মাথায় পোকা। সোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেন্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে। শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোকসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন, বেশ আছিস কাঞ্চন।

হাঁ দাদা, ভাল আছি। তবে ভাল আর থাকা যাবে না।

ও কথা সবাই বলে।

জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা। বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়েনি। তাঁর চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তরবাংলার সবচেয়ে বড় ব্যাবসাকেন্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরনো ঠিকাদারির ব্যাবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যাবসাতে নেই, ওকালতি করে তার একরকম চলে যায়। মেজোজন পুরনো বাজারে একটা স্টেশনারি দোকান দিয়ে বসে আছে বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না। শানু আর দু'জন ভাইপোকে নিজের ঠিকাদারিতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চালাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে অবশ্য ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। আটান্ন বছর বয়স, কিছু টাকা আছে, চলে যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভাল করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন, শানুটাকে ব্যাবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে, শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটর-সাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন, তোর সঙ্গে একদিন বসব।

আচ্ছা।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগনে উঠল। দিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেন্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। এজেন্ট ভটচায বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচাযের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ওইরকমই বয়স। ভটচায বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানিতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষণ্ণ গলায় বলেন, এই তো।

ভটচায দিগিনের অন্যমনস্কতা লক্ষ করলেন। কিন্তু বেশি কথার মধ্যে গেলেন না। তিন জন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচায বললেন, এবার পুজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

হুঁ।

আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষ পর্যন্ত।

বলে ভটচায ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একটা খান। চুরুট খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন। নিজের সরু মাদ্রাজি চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাল লাগে না। ফসফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে।

ভটচায বলেন, নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনও ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট থাকেন মশাই?

ফিট থাকি নেশা করি বলেই!

সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনও রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচায একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন, সত্যি?

দিগিন চুরুটটা আরামে টেনে হেসে বলেন, কোনও মাতালের ছোটখাটো অসুখ দেখেছেন কখনও? জেনুইন মাতালের ও সব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

দুর।

মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনও জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচায চিন্তিত মুখে বলেন, তা বটে।

তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজারভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কি না।

আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনি নেশা।

না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে, অ্যালকোহল আরও ভাল। আজ রাতে আসুন আমার ওখানে, একটা

মজার জিনিস খাওয়াব। দেশি জিনিস, সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেব। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচায। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন, আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করবেন না তো?

গিনিপিগ।— বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন, আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচায ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপনমনে হাত দু'খানা টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তাঁর মাংসপেশি বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায়নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টান-টান, হাঁটা-চলা-পরিশ্রম কোনও যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচায এবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন, শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাং ধরাবেন না তো মশাই।

দিগিন ভটচাযের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন, জীবনের একটা দিক একেবারে না-জানা থাকা কি ভাল? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভাল। নইলে যখন ওপরে যাবেন, যখন যম জিজ্ঞেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কী কী রকম সব অভিজ্ঞতা হল, তখন তো ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচায মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন, বয়সকালে রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভাঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেন্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা জোগাবে কে?

ভূতে, নেশাড়ু লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

না মশাই, আমার ও-সব দরকার নেই।

আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, এক দিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায়? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত এক দিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেব। ওই সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

বলে দিগিন ওঠেন।

আচ্ছা যাব।— ভটচায হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটর-সাইকেলে ওঠেন। আজকাল আর তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতি মাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে। তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কী কারণে যেন সংসারেব খরচের সিংহভাগ তাঁকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটর-সাইকেলটা নিয়ে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই-এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন, সাইটটা দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রিজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাক গে, ঠিকাদারিটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তাঁর মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন।

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলো বাইকটা চালান দিগিন, শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তাঁর চেনা। বাইক থামিয়ে দু'-চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোল না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায়

উপত্যকার মতো বিশাল নিচু মাঠ আর বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্জ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিয়ো স্টেশন পেরিয়ে খানিক দূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বাঁ ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক-আধটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারির লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারা দিনই থাকে।

আধমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পৌঁছে যান তিনি। অনেককাল আসা হয়নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়িঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্ত্রির তৈরি দু'-চারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারি, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্পবয়সি বাকসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এ রকম একটু সংলাপ ভেসে আসে—

মহিলাকণ্ঠ—সে কেমন দেখতে?

বাকসিদ্ধাই—রোগা, ফরসা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ—আমার ছেলের সঙ্গে মানায়?

বাকসিদ্ধাই—মানায়।

জাত?

স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ সনিশ্বাসে বলে, বিয়েটা হবে?

হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতকগুলো বাচ্চা ছেলে খেলছে। উত্তর প্রান্তে খেত। উদাস মাঠ, তার ও পাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজি চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উঁকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালি কাঠখোট্টা এক মিলিটারি সওয়াল-জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায়, সেরে যাবে। চিনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন। সিদ্ধাই তাঁকে চেনে। এক বার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে, ভাল তো?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন, না।

কী হয়েছে?

আমার ভাইপো—

বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এ সব প্রশ্নের কোনও মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় যাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন, মা, আমার মরণ কবে?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে, সে দেরি আছে।

কত দেরি?

অনেক দেরি, তবে একটা ডাঙর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

ডাঙর মেয়েছেলে? সে কে?

ফরসা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ি মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না একসময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন, কীরকম ক্ষতি?

পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলে, সাবধানে থাকবেন, তবে আপনার এখনও অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে, আর কিছু জানবেন না?

না। আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

বুড়ো মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে. শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেব, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কী? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুন্নি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন, কী রে?

ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

চা, তার এত তাড়া কী?

বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে কী করে?

দিগিন হাসলেন। ত্রিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম ম করে। বলেন, যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যথার কী? আমি তো দক্‌লীকে বলে রেখেছি, সে রাজিও হয়েছে।

পুন্নি বলে, ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে, রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভাল লাগে।

তোকে বসতে কেউ বলেছে?

না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?

হুড়োহুড়ি আবার কী!— পুন্নি ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে, চা-টা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারা দিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনও ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তাঁর নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত, তবু মনে মনে একরকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল গঞ্জ মতো জায়গা। বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যাবসা, চা-বাগানের মালিকানা কোনও চেষ্টাই তাঁর কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামির খেয়ালবশে এক বার মধ্যপ্রদেশও চলে যান হিরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে। তাঁবুতে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হিরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হিরে পাননি তা নয়। ছোট ছোট কম দামি কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনওক্রমে উঠেছিল হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জন্ডিস ধরল। মাস ছয়েক সেই রোগে শয্যাশায়ী রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর নেশাভাং একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়েছুড়ে দিয়েওছিলেন। কিন্তু তারপর এক দিন মনে হল, একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকিত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও, তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলেন হরেন বোস। সে লোকটা বড় ভালবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন, বিয়ে না করে এক রকম ভালই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি লোটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই, কিন্তু চল্লিশের পব ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ওই বয়স থেকে লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর না নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্যব্যাপদেশে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা-দুটো দিন কাটাতেন। চার ধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনও কোনও বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জ্বেলে বোতল নিয়ে বসতেন দু'জনে। কথা হত।

হরেন বোস এক দিন তাঁর শালির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বউ ছিল নেপালি। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালি ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকিত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজি ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে। করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বউয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারিতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরিতে পারিবারিক সবজির দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশি বয়স নয়, দীনদরিদ্র পোশাক পরে দু'গালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াশ, বাঁধাকপি, বিন, শুঁটি, ফুলকপি সাজানো। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালি কয়েকজন গ্যাঁদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব। মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তার রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নিচু নজরে দেখে, কু-প্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কচি আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজি হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সূর্যোদয় দেখতে। বহু বার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না, ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁপ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালি ভাষা বলতে পারেন দিগিন,

ময়না জানে ভাল বাংলা কথা। কথাবার্তার কোনও অসুবিধে হয়নি। আকাশে তখন ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পালটে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ওই বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন, থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেরেকেটে ষোলো, রাজি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল, যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলো, তা হলে থাকব।

থাকা মানে কী জানো তো?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোনও পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনও রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে। এবং সেটাই নিরাপদ। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাঁদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবনযাপন থেকেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশি কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন, তোমাকে কলকাতা দেখাব।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জিপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জিপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায় যেতে তাঁর ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়েছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করেনি।

টংগি ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন বোস, মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোনও সময়ে হাজির হতে পারে। পুলিশ লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিন দিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

কী খবর ভায়া?

ভালই।

ময়না?

আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন, জানতাম। — বলে একটু শ্বাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার উপায় নেই। নেপালি পোশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁথেয় সিঁদুর, এক বেণিতে বাঁধা চুল, খুশিতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশি হলেন। বললেন, ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকাননি। বলেন, তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজি নই।

কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

ও সব ছাড়ুন! ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপণ হিসেবে।

ময়না এ রকম সম্পর্ক মানবে?

মানবে আবার কী? মেনে তো নিয়েছে।

না, মানেনি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করোনি। বয়স হলে বুঝবে।

ও এক রকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি!

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীরভাবে বললেন, ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

দিয়ে দিচ্ছি।

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমি 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। বললেন, তা হলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন, হঠাৎ এ রকম ধারা করতে গেলে কেন?

দিগিন একটু ভেবে বলেন, আসলে কী জানেন দাদা, যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনও ঠিক করিনি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাব। ভেবেছিলাম আমার বাউন্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নীচে গভীর উপত্যকায় যেন কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁ দিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কত বার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশপাশে আবছায়ায় বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। ওই রকম খোলা জায়গায়, ওই গভীর বিশাল অন্ধকারের সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামি আর নেই। যার একটা শেকড় গজায় সে বাকি দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভাল।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন, আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরিতে কামড় বসিয়ে বললেন, তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে রে? রামরও?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন, মেয়েটা ভাল, দেখো দিগিন।

চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকেনি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দু'-চারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনও দেননি। তখন প্রাচীনপন্থী মা-বাপ বেঁচে, পুরনো প্রথাও মরে যায়নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশভাগের পর পরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে। তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দু'বছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে-করা-বউ বলে কখনও

মনে করেননি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশি নিজস্ব জীবনযাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যাবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে, সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশি কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাঁটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে, বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা-বাপ তখনও বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভাল ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশি বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু'-এক কথাতে সে রাজি হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘরদোর সাফ করলেন দিগিন। তাঁর কিছু মনে হল না। কোনও অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিঁড়েও ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশি ছিল না। বাড়ির লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভাল হয় তো তার দু'-একটা স্বভাবদোষ মানতে কারও আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ছোট একটা বাড়িতে উঠে গেছে ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন নিজেই। ময়না যৌবনকালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়েও গেছে একটা অপদার্থ জাত-ভাইয়ের সঙ্গে। পোষায়নি বলে ফিরে এসেছে। লটঘট করেছিল নির্মল সিঙের ছোটছেলে অবতার সিঙের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে-করা-বউ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয়নি, বাঁজা ময়না এখনও নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ছোট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছু দিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে। কিছু দিন আগে মারা গেছেন। তার বউ বা ছেলেপুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু ময়না একা। বড় একা।

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিকশা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তাঁর ফরসা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভাল লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন, দেখেন, যেন ঠিক পাকনা শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন, সেই লৌকিকতা।

না না, কিছু নয়।— বলে পুন্নির বাপ, একটু মিষ্টিমুখ আর কী।

রক্তে চিনি একশো কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তা হলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেলে পুন্নির বাপ। পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি নয়, সবাই জানে। তবু পুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে এক পলকের বেশি চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরি করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে দিতে বললেন, যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিজ্ঞেস করেন, কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, রং তো কালোই, মুখশ্রী ওই চলনসই।

পুন্নির বাবা বলতে গেল, কিন্তু কাজকর্ম—

ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন, ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজকর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারি নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন, কী দেবেন আপনারা?

যা চান।— দিগিন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

চাওয়ার কী? আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

হুঁ।— বলে গম্ভীরভাবে আবার চা খেলেন। বললেন, আলমারি তো গোদরেজের?

তা-ই হবে।

গয়না?

চোদ্দো-পনেরো ভরি।

ঘড়িটা?

রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন, আমি কী পাব?

মানে?

ছেলে আর ছেলের বউ তো এ সব পাবে। আমার পাওনা কী?

কী চান?

নগদ।

বলুন কত?

আমি বলব না। শুনব।

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাতজোড় করে বলেন, আমি কিছু বলব না, আরও চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অঙ্ক পেয়েছি। সব লিখে জামশেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপার পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নিপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন, দিগিন। দিগিন গেলেন না। মাদ্রাজি চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন, আমরা দুই হাজার নগদ দেব।

দুই!— ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজি চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে। তারপর হঠাৎ বললেন, দশ।

অ্যাঁ।— ভদ্রলোক তাকালেন।

দশ হাজার দেব। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নিপতি সন্দেহের চোখে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন, আচ্ছা।

আচ্ছা নয়, দশ হাজার দেব। বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখাব মতো করে কৌতূহলী চোখে

ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ-গিনিপিগের মধ্যে কোন কথায় বা কোন অবস্থায় কী রকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফরসা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলে, আমার বড় আদরের ভাগনি। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভাল বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ—

কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন, সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ নইলে একটি ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তা হলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে। লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর-একটু লাল করে তুললেন। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটায় এক বার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন, আলমারিটা গোদরেজের তো?

নিশ্চয়ই।

সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন, পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেব। আর প্রত্যেকটি এক ভরি ওজনের ছ'-গাছা চুড়ি।

আমার ছেলে কী পাবে? এ তো মেয়ের কথা হল, ভালই—

একটা স্কুটার দেব, একটা ফ্রিজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুড়ির নামজাদা লোকদের একজন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানি কেন, মেয়ের কোনও গুপ্ত খুঁত আছে কি না এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন, আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন তেমন স্বভাবের মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

না, না, তার কী দরকার?

খোঁজ নেওয়া ভাল, সন্দেহের দরকার কী?

বড়দা ভ্রু কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁর বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেননি। মেজদাও খুশি নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলে, তা হলে পাকা কথা আজই হয়ে যাক।— বলে সমর্থনের জন্য চার দিকে তাকাল। তার দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন, সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন, মন্দ কী?

তা হলে?— দিগেন জিজ্ঞেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন, ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন, না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই ঘরে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিতভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, মেয়েটিকে আর এক বার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখেমুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিনছে, একথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করেনি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন, মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড় বউমা হবে তুমি, তা রান্নাটান্না কি বুড়োর একটু সেবা-টেবা, এ সব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথা নত করে নিয়মমাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিন বার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে তিনটি ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে-ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন, মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

কথা দিচ্ছেন তা হলে?

ভদ্রলোক একরকম হাঁপধরা হাসি হেসে বললেন, ওই দেওয়াই হল।

আমরা খুব বেশি দেরি করতে পারব না।

দেরি করে আমাদেরই বা লাভ কী?

তা হলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

স্ত্রীকে সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত নিন। কিন্তু সেগুলো সেকেন্ডারি ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানিসেন্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন, তা হলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন, ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁপ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁপ ছাড়লেন দিগিনও। পুন্নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেই জন্যই তার ভাল বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবেন না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার। সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভাল মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের একজন। লেখাপড়া করেনি, জাতে নিচু, গুণের মধ্যে ভাল গোলকিপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সারা রাত্রি ধরে একটা ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে এক বার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি ফাংশানে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা-বাবা মেয়েকে শাসন করেননি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন, ও সব জাত-ফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে? বিয়ে দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল। ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশি দূর নয়! বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোক বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে

ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তার পর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায়। এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা কিছু চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ও সব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ রাঙিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না। ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টবুদ্ধি তাঁর ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন অমলকে ডেকে গোপনে বললেন, আমার ভাগনির সঙ্গে তোমার ভাব শুনছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজ-টাজ কিছু করছ?

চেষ্টা করছি।

চেষ্টায় কী হবে? ধরা-করার কেউ আছে?

না।

ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি পাকা হওয়ার আগে বিয়ে-টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি। বলল, আজ্ঞে না।

এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তাকর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয় এবং চাকরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে আসামের নেফায় তাকে বদলি করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায়নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশি হয়েছিল। অমল নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে ডেকে দিগিন বললেন, ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

কেন ছোটমামা?

মিলিটারির সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায়, কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারও হাতে যদি পড়ে লজ্জার ব্যাপার।

পুন্নি লজ্জা পেয়ে বলে, আচ্ছা।

সব ক'টা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

যদি দিতে না চায়?

দেবে, বলিস না-দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছোটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল অমল। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক-আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পুন্নির সঙ্গে। কিন্তু পুন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে, এ সত্য পুন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফলস প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

অমল ক'দিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শিগগির আর আসবে না। এই ফাঁকে পুন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরি হয়ে এসেছে। বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলেননি। দুটো গিনিপিগের ওপর

তাঁর প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেননি।

কয়েক দিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পুন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়োচিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ো চিঠি দিয়েছিল কে জানে।

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক। এবার নিশ্চিতভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধ হয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগি ঘরখানায় এসে বসেন। মনটা ভাল নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠেছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের উপর পা তুলে দেন। পুন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর একটু একা লাগবে। পুন্নিটা খুব সেবা করত।

পুন্নির কথা ভাবতে ভাবতেই পুন্নি উঠে এল নীচে থেকে।

ছোটমামা।

হুঁ।

তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

কী?

অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে?

না হয় দিলাম।

ছি ছি, লোকে কী বলবে?

কী বলবে?

ভাল বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগবে। বড়মামা, মেজোমামা, মেসোমশাই কেউ খুশি হয়নি।

কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?

বলেছে।

কী?

কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশি হয়ে গেছে।

সে আমি বুঝব। তোর পাকামির দরকার কী? যা চা করে আন।

পুন্নি রাগ করে বলে, আমি এ বিয়ে করব না।

না করিস না করবি। আমি ঠিক দক্ষিণার সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেব।

তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পুন্নি চা করতে যায়।

বড়বউদি এসে ডাকেন, দিগিন ভাই।

হুঁ।

তাজ্জব। পুন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে?

করলাম।

এত কিছুতে রাজি হলে কেন? কী এমন পাত্র?

পাত্র খারাপ না।

তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা, তুমি কী ভেবেছ বলো দেখি? ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। তুমি আগ বাড়িয়ে বললে কেন?

মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টুঁ শব্দও করতে পারবে না।

কেন? আরও অনেক কমেই তো হত। দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাত হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির গিনিপিগকেই লক্ষ করেছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখন তিনি তাকে লোভানির পর লোভানিতে উসকে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠান্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষ-গিনিপিগের বেশি কিছু নয়।

বউদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ঠাকরোন, আজ ভাল করে শুঁটকি মাছ রাঁধো তো।

কেন, কেউ খাবে নাকি?

হুঁ।

কে?

ভটচায, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্ট।

মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন, ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

বয়স হল, এখন ও সব ছাড়ো না!

ছেড়ে ধরবটা কী?

সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুঁটকি হলেই হবে নাকি?

না। ওই সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটে চচ্চড়ি তো আছেই। ভটচায মদ-টদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বউদি চলে যাওয়ার আগে বলেন, টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘি ঢালা হল। পারলে পাটিপত্রের দিন একটু কাটছাঁট কোরো।

তাই কখনও হয়! কথা হচ্ছে কথা। কিছু কাটছাঁট হবে না।

তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস দিচ্ছে, ব্যাবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন, ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকেদারি তো আছেই। চিন্তা কী?

বউদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন, পুন্নির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরিব হয়ে যাব না ঠাকরোন, ভয় নেই।

বউদি শ্বাস ফেলে বলেন, তোমরাই বোঝো। আমি মেয়েমানুষ আমার এ সব কথায় থাকার কী?

মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা বাক্যহারা হয়ে যেত।

বউদি বলেন, তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বউদি চলে যান। পুন্নি চা নিয়ে আসে। সন্ধে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোব মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যে-সব গাড়ি উঠছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

সন্ধের মুখে দিগিন পোশাক পরে মোটর-সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচায এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাসে গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধাবে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউ মার্কেটে আলো ঝলসানো দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধার আলোয় আলোময়।

দিগিন বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার পুলের কাছে এসে

ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাঁকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা শুঁড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায় বাইকটা দাঁড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব পাতা, তারপর, ঝুমকোলতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেইসঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দু'খানা ঘর, বাগান, কুয়ো, সবই আছে। বাছাই ভাল কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রিল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার। আর আছে একজন নেপালি ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে-মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকা-পয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আহ্লাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পরদা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে, কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝেমধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকি আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকিতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল, পরনে আলখাল্লা, চোখে সুর্মা মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামানো। চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধ হয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন, আও বেটা।

কখন এসেছেন?

বিকালে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

আমাদের ওখানে গেলেন না তো?

যাব। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে।

পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীর আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনও দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোট হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড় বড় দু'টি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিন্তু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালি ভাষায় কখনও কথা বলে না। এমনকী সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, ফকির সাহেবের জন্য রান্না করছি, তুমিও খেয়ে যেয়ো।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন, বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

ও।— ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোনও মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তাঁর পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিক-টিক ফেলেন না। বার দুই-তিন হেঁচকি তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন, কী খবর-টবর?

ভালই।

বন্নোরহো।

আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব?

দিনের বেলা।

আগেও তো দেখেছেন।

জরুর।

আমার মরণ কবে?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন, ওইসব জেনে কী হয় রে বেটা?

ময়না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন, মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

খোদায় মালুম।

ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন, কৌন জানে। পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কথাবার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোলো বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চলল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এ সব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরি বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন, রাখ। এক মাহিনা আওর খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্চা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন-চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে এক বার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শূন্যভাব। বহু বছর ধরেই কি ময়না তার শূন্য চোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করেনি। কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করেনি কখনও। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন। ময়না আজকাল কেবল এক রকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখেছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যত দূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনও বিশ্বাসের ভঙ্গ হয়নি। বউয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশি সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই। কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারির দোকানের সেই অশিক্ষিত মেয়েটির কী যায় আসে। বরং উলটোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌন-কাতরতার জন্যও নয়। সে বোধ হয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারেনি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফল্গুধারাকে খুঁজেছে। পায়নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও যেতে পারেনি ময়না। দাঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনিপিগকেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনও করেননি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারও বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে

ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পাননি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতর-বাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইসল বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাচ-বসানো আলমারি আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখোমুখি বসে।

ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে।— ময়না বলে।

কত?

বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্ছি আজ।

আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব'খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে, মরার কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন?

এমনই।

আমি জিজ্ঞেস করেছি।

কী?

বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

ও।

ফকির সাহেব বললেন যে, বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছা করবে।

তাই নাকি।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

কষ্ট কী? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এ সব কথা ভাল বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনও এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল, আমি কোথাও ঠিক চলে যাব।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে, শুনছ?

শুনেছি।

আমি কোথাও চলে যাব।

যেয়ো, আমি তো কখনও বারণ করিনি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে, কেন বারণ করোনি?

কেন করব?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালি মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানা রকম পাপ-বোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়নি।

প্রেশার কুকারের আর-একটা হুইসল বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধ প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নীচে বসে ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন, আজ সকালে শালুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন, সিদ্ধাই বলল, একজন ফরসা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

মেয়েছেলেটা কে?

তা বলেনি।

ফরসা আর লম্বা?

হ্যাঁ।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সে কি আমি?

কী করে বলি?

কীরকম ক্ষতি?

তা-ও স্পষ্ট করে বলেনি।

ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।

দিগিন হেসে বলেন, বোগাস। আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ও-সব বলে।

তুমি তো বিশ্বাস করো।

না, করি না।

তবে গিয়েছিলে কেন?

গিনিপিগ দেখতে।

গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।

আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি? যদি ক্ষতি করি তো আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে?

সেই জন্যই তো বলছি সব বোগাস।

ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল, ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।

শানু?— চমকে ওঠেন দিগিন, কেন?

তেমন কোনও কারণ তো বলেনি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।

কী বলল?

বলল, কাকিমা কিছু টাকা দাও, খুব লস যাচ্ছে।

দিগিন অবাক হন। বলেন, কাকিমা বলে ডাকল?

ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।

টাকা দিলে?

দিইনি। বললাম দেব।

কত?

খুব বেশি নয়। দু'হাজার। তোমাকে বলতে বারণ করেছিল।

কেন?

ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।

দিগিন আগুন-গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে নাড়তে বলেন, ডোবাবে।

কী?

ওই ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।

এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ও রকম করে ডাকেনি কখনও। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ। কখনও আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট-বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন, টাকাটা ওকে দিয়ো না।

কথা দিলাম যে!

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন, তাতে ওর ক্ষতি হবে। যত দূর জানি ও জুয়া-টুয়া খেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

চাক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না-পারা ময়না ভিখারিনির মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন, ইচ্ছে হলে দিয়ো। কিন্তু ও টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করছে। তা ছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দু'খানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে, আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তা হলে কী করতে?

শাসন করতাম।

বেশি জোর করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবার চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেব। তুমি কিছু বোলো না।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে বলেন, সোপস্টোনের পিছনে বহু টাকা নষ্ট করেছে। কিছু বলিনি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

তুমিও তো টাকা কম নষ্ট করো না।

সে করি রোজগার করে। ওর তো এ সব রোজগারের টাকা নয়। ব্যাবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেব।

সবাইকে তো ছাড়িয়ে দিয়েছ, কাকে নিয়ে থাকবে?

আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে! তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে, শানু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন, কী বললে?

শানু বিয়ে করবে।

কাকে?

পছন্দ করা মেয়েকে।

তোমাকে কে বলল?

শানু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারেন না।

ময়না নিজেই বলে, মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন। বললেন, ও।

আমি কী করব?

শানুকে বলে দিয়ো যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারি ব্যাবসার জোরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাজেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশি করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে, আমি কি তোমার বউ?

দিগিন ভ্রু কুঁচকে চেয়ে বলেন, এ সব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন?

ধরো যদি শানুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী! আমার মতো কাউকে বউ করে এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো?

পারি।— দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

কেন পারো?

কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শানুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশি। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা-করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলির চাটটা টেনে নিয়ে বললেন, বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোট খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই?

দিগিন হেসে বললেন, এ ছোট খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচায মদের মোটে স্বাদ পান না। দু'-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন, এ মশাই চলবে না! বড্ড লাউড জিনিস।

তা হলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা খিদে নষ্ট হবে।— বলে দিগিন জলপান করার মতো দিশি মদ গলায় ঢালেন।

শুঁটকি মাছ আমি বড় ভালবাসি।

একটু মাল টেনে নিন, আরও ভাল লাগবে।

ভটচায কষ্টেসৃষ্টে আরও দু'-এক চুমুক খান। বলেন, মাথা ঝিমঝিম করছে।

তা হলে আর-একটু চালান। ঝিমুনিটা কেটে ফুর্তি লাগবে।

ভটচায খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন, এটা খান। এটার স্বাদ ভাল।

পোর্ট ভটচাযের ভালই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন একেবারে। বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

আর-একটু দিই?

দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন, খুব দামি জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

খান না মশাই, দামকে ভয় কী?

দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচাযের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন 'দামি জিনিস' কথাটাই ভটচাযকে কাত করবে।

করলও। ভটচায গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন, দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনও ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে?

একজ্যাক্টলি।

ভটচায কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটু দুঃখের কথা বলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোট করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি!

ভটচায হেঁচকি তুলে বলেন, শুঁটকি মাছ!

আসছে।

খুব ভাল জিনিস।

খুব।

বহুকাল খাইনি, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয়?

হয়।

সবাই খায়?
না। আমি খাই আর বড়বউদি। আর কেউ না।
বউ থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।
দিগিন হাসেন।
ভটচায হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলেন, কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে।
দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন, কে থাকবে?
একজন মেয়েছেলে!
দিগিন হেসে বলেন, সে তো সবার থাকে।
সবার থাকে?— ভটচায হেঁচকি তোলেন।
বিয়ে করলেই থাকে।
না না, বিয়ে করা বউয়ের কথা নয়।
তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা।
ভটচায অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন, তা বটে। তা হলে আপনার একজন আছে?
একজন না, কয়েকজন।
কয়েকজন?— ভটচায চোখ বড় করে তাকাল।
লোকে বলে না সে কথা?
না তো! একজনের কথাই শুনেছি।
লোকে কমিয়ে বলেছে।
রাখেন কী করে? একজনেরই যা খরচ।
রোজগার করি। রাখি!
বেশ খরচা পড়ে, না?
তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বউ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি?
ভটচায মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলেন, বাড়িতে বসে এ সব খান, কেউ কিছু বলে না?
কী বলবে?
আপত্তি করে না?
বাড়িটা তো আমার।
তবু ফ্যামিলিতে কি এ সব চলে?
দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।
তা বটে।
ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।
কী করব?
ফুর্তি!
এই বুড়ো বয়সে?
ফুর্তির আবার বয়স কী? তা ছাড়া সারাজীবন যদি ফুর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশি সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশি খাচ্ছেন।
না, আর খাব না।
খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশি টানলে খাবার খেতে পারবেন না।
দাঁড়ান। আর দুই চুমুক।— আবার অনেকটা খেয়ে ভটচায একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বললেন, ওই! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল! পেটটা হালকা লাগছে।
লাগবেই তো। দেশিটা খেলে আরও বেরিয়ে যেত।

হ্যাঁ, ফুর্তির কথা কী যেন বলছিলেন?

এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে, বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে, তখন কী বলবেন? বলার কিছু আছে? ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করে নাকিসুরে তখন পেটের রোগ, বউয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট, ক্রেডিট, এ সবই বলতে হবে। যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে, যাও, দুনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখনি।

ভটচাযের চোখ দু'খানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন, শুঁটকি মাছ?

হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।

ভটচায মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে আবেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলেন, বাড়িতে বড় ধরাকাটা! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেসনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।

খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচায দু' চামচ ফ্রায়েড রাইস খেলেন, এক টুকরো মাংস, শুঁটকি মাছের চচ্চড়িটা মুখে তুললেন মাত্র, খেতে পারলেন না। তারপরেই গেলাস রেখে চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন, বউ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে ক'দিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন?

নিশ্চয়ই।— দিগিন বলেন।

একটা রিকশা ডেকে ভটচাযকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর-বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শানুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

কে?

আমি।

ছোটকাকা?

হ্যাঁ।

শানু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টা দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রতি দিনই সন্ধের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তাঁর নেশা হয়নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শানু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে, কিছু বলবে?

হুঁ।— বলে দিগিন শানুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভাল। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদিপাতা খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি-আঁটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শানু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র‍্যাকে সাজানো। ওয়ার্ডরোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশি জামা-কাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শানু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

শানু।

বলো।

ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শানু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল, তুমি চিরটাকাল কাকিমাকে বড় হেলাফেলা করেছ।

কাকিমা!

নয়?
দিগিন শ্বাস ফেললেন।
শানু বলে, মানুষ যা-ই বলে বলুক, আমি জানি কাকিমা বলেই।
একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন, বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন?
সম্পর্কটা সহজ করতে।
সেটা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?
শানু গম্ভীর হয়ে বলে, ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ?
অন্যায়?
অন্যায় ছাড়া কী? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে মর্যাদা।
থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন?
চেয়েছি ধার হিসেবে।
কেন?
সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।
সেটা আমাকে বলিসনি কেন?
বললে তো বকতে।
এখন কি বকব না?
শানু শ্বাস ফেলে বলল, সোপস্টোনের লসটা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলেছি তার চেয়ে বেশি লস হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশি হয়েছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবাররা খেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে না।
নিজের দু'খানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন, শানুর কোনও কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না। জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল, এ সব কথা একটা জীবনে তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তাঁর কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।
দিগিন তাঁর চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন, আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনও আছে। লোকে বলে, আমার হৃদয় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদগুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দু'হাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনও শর্টকাট রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতিস্বীকার করেছি, কিন্তু কোনও ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমরা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।
শানু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে, চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।
কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে?
একটা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।
জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাব। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে রেখো।
লেবাররা ছেড়ে দেবে না। ওদের অনেক টাকা বাকি পড়ে গেছে।
সেজন্য কে দায়ী?
আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। এখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।
খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কালই তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।
দিগিন বলেন, বুঝেছ?
শানু মাথা নাড়ল।
কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।
শানু মাথা তুলে বলে, জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।
হলে হব। তোমাকে ভাবতে হবে না।
ছোটকাকা।
বলো।
আর-একটু ভেবে দেখো।
ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।
একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।
জানি। আমি বোকা নই।
তবু যেতে বলছ?
দিগিন রাগের গলায় বলেন, শুনতেই তো পাচ্ছ।
ঠিক আছে।
যদি লেবাররা গোলমাল করতে চায় তা হলে কী করবে?
কিছু ঠিক করতে পারছি না।
ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হোয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেন্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনও ক্যানসেল করেনি, সুতরাং বাকিটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।
শানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা।
মনে রেখো লেবার পেমেন্ট সবার আগে।
আচ্ছা।
আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ?
অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।
তবু ছেড়ে দাও।
এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে?
কী বলবে? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনাররা ইনিশিয়েটিভ নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেন্ট দর কমাবে না।
ভেবে দেখি।
দেখো! আর শোনো, যদি ময়নাকে তোমার কাকিমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িয়ো না।
শানু মুখটা তুলেই নামিয়ে নেয়।
দিগিন বলেন, বুঝেছ?
শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।
ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করেনি।
দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে এক বার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু বলার আছে?
শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। কখনও ঈশ্বর, কখনও শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভাল করে চেনে, আবার

আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে, তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে, আমি প্রতিবাদ করছি না।

আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। বললেন, বুঝে দেখো।

আমি খারাপ কিছু করছি না।

তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কী করে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায় বলেন, তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতাবশত তোমার যে-কোনও ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

বলো, তাই ভেবেছিলে?

না।

তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন সাহসে?

আমি তোমাকে যথাসময়ে বলতাম।

না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

ঠিক আছে।— বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন, কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলো।

আমি কাকিমার কাছে ওকে রাখব না।

তা হলে কোথায় রাখবে?

অন্য কোথাও।

রাখবেই?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন, না।

শানু তাকায়। বলে, উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন, তুমি কাল যাচ্ছ কি না?

যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন, কালিম্পঙ আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে?

শানু মৃদুস্বরে বলে, কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্যে যাচ্ছ তা হবে না।

কী জন্যে যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে?

বুঝেছি। তুমি গোলমাল কোরো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন, শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনও বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর ঘরে চলে আসেন। একটু ঠান্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে বিয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শার্সি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তরদিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু

ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তাঁর নয়। তবু সবই তাঁকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুমচোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নীচে, বহু নীচে তিস্তা। তিস্তার দু'ধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রিজ। হঠাৎ দেখেন একটু দূরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা দুলিয়েছে। সেই দোলনায় ঝুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চিৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন...পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চিৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দক্‌লীর মা চেঁচিয়ে সুর করে গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধ হয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারা দিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দক্‌লীর বাপ চিৎকার করে ধমকাল। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনও বোঝেননি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখার কোনও মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণ কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন। সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন, আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

কেন?

লিকার খাব।

পুন্নি তা-ই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকাবে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভাল নেই। কালিম্পং যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

ছোটকাকা।

উঁ।

ঘুমোচ্ছ?

না।

আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

কেন?

তুমি বললে যে।

ও।

যাচ্ছি।

যাবে? যাও।

চেকটা লিখে রেখেছ?

হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে যাও।

শানু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্তভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশি কিছু নয়।

সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক। এত টাকার চেক কি বিনা নোটিশে ক্যাশ করবে?— শানু জিজ্ঞেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে বললেন, করবে। ভটচাযকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শানু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খসখস করে দু' লাইন লিখে দেন। শানু চলে যেতেই আবার ক্লান্তভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল, ভয়ংকর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর দেখেছেন। ওই নিস্তব্ধতা কত বার তাঁকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তাঁর কাছেই চলে আসছে তুষারশুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন পাহাড়ের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোনও মাথামুন্ডু নেই। তাঁর জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনও যোগাযোগ নেই।

পুন্নির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচাযকে দু' লাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন, এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন, এখনই কেন?

আমি কালিম্পং যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে-কোনও অজুহাতে শো করবেন।

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন। অনিচ্ছুকভাবে বলেন, আচ্ছা।

দিগিন আর কোনও দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না, এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তাঁর তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুনি তোড়জোড় করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জিপটা রেডি রাখতে হবে, দু'-চার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সে-সব জরুরি কাজ পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ। ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে। সরু মাদ্রাজি চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালি সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর নীল আকাশ।

টাকা— এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ওই শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।

মোটর-সাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ-দশ টাকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রিটা উঠে এসে বলল, একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন। চোখের আড়াল হলেই ওদের জো। তখন পিন-এর সঙ্গে এটা ভেঙেছে, ওটা পুরনো হয়েছে, সেটা পালটানো দরকার বলে নানারকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন, না রে, জেলখানায় ঢালাইয়ের কাজ হবে, এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

উত্তর দিকে চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন দিগিন, শরতের মেঘকাটা আকাশ। বর্ষার জলে বাতাসের ধুলোকণা ধুয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, আর ঝকঝকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের রং মোষের গায়ের মতো ভুষকো, তার পিছনে রুপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা। ডান দিকে আরও কয়েকটা রুপোলি চূড়া, কত বছর ধরে দেখছেন, তবু পুরনো হয় না।

উত্তরবাংলার কিছুই পুরনো হয় না। তবু কিছু কিছু হারিয়ে গেছে মানুষের অবিমৃশ্যকারিতায়। ন্যারোগেজের একটা লাইন ছিল কালিম্পঙের দিকে, নদীর ধার দিয়ে, পাহাড়ের কোলে কোলে যেত ছোট্ট রেলগাড়ি গেইলখোলা পর্যন্ত। দার্জিলিঙের মতো অত চড়াই-উতরাই ছিল না, ছিল না অত রিভার্স আর লুপ। মায়াবী মাঠ প্রান্তর, ছোট ছোট কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, নদীর খাত বেয়ে সেই ছোট ট্রেন বয়ে আনত সিকিমের কমলালেবু, কাঠ, আপেল। সেই লাইন নাকি তেমন লাভজনক হচ্ছিল না, তাই রেল কোম্পানি লাইন তুলে দিল। ওই স্বপ্নের রেলগাড়ি উঠে যাওয়ার পর বহুকাল দিগিনের মন খারাপ ছিল। মংপু বা কালিম্পঙে যেতে হলে বরাবর ওই ট্রেনে চেপে যেতেন দিগিন। রিয়াত স্টেশন থেকে একটা রোপওয়ে ছিল। সেই রোপওয়ে দিয়ে মাল এবং মানুষ দুই-ই যেত। দিগিনও গেছেন। আর যাওয়া যেত খচ্চরের পিঠে। তখনও কালিম্পঙে মোটর গাড়ির রাস্তা হয়নি। কিছুক্ষণ যেন রূপকথার রাজ্যে থেকে আসতেন। মাঝপথে একটা স্টেশন ছিল, নামটা মনে পড়ছে না, বহুকাল হল উঠে গেছে। এক দুপুরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, দিগিন চা খেতে নামলেন। তখন যৌবন বয়স। প্লাটফর্মের গায়ে প্রচণ্ড কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ছোট্ট কাঠের স্টেশন ঘর, চারদিকে খেলনা-খেলনা ভাব, ছোট লাইন, ছোট সিগন্যাল, ছোট নিচু প্লাটফর্ম। তাব চারদিকে সেই খেলাঘরের স্টেশন, ডান দিকে নদীর খাত, দু'ধারে পাহাড়ের বিশাল ঢাল। দিগিন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, দেখলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। আড়াই কি তিন বছর বয়স, গোলগাল চেহারা, শীতের চিমটিতে গালদুটো লাল, ফাটা গা, শীতের সোয়েটার গায়ে, পরনে প্যান্ট। কিন্তু দুষ্টু ছেলে সোয়েটার টেনে তুলে ফেলেছে বুকের ওপর, পেটটা উদোম। দু' মুঠিতে কিছু কাঁকর আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ খেলা ভুলে চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে, কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেননি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে, সেই শিশুটির ধারেকাছে কেউ ছিল না। একা। খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে দেখছে, দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইসল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেননি, আদর করেননি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কত বড় হয়েছে এখন, সংসারীও হয়নি কি। কিন্তু সে-সব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ওই কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, দু'হাতে দু'মুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখ লেপটানো কাজল, আর তাব চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়। তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ও রকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে। না কি শিশুটি নাড়া দেয় অক্ষম পিতৃত্বকে? কী হয়, কে জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি বীজ। কবে যেন

অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেননি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জিপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তাঁরই জিপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জিপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে ধূর্তামি, মুখে একটি নির্বিকার শয়তানি ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে, আজও শেষ হয়নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তিভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ-গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোট মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও। মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে, তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়ান না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্ট ক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাব্জির জাল-ঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোট গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা-সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড়-হারামজাদা। সরাব্জি থেকে সাহেবের নাম করে দু' বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বউ মরল। মল্লিকা তখন দু'-আড়াই বছরের, মা-মরা একলা, কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করবে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে-সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে, কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ওই মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ দিগিনের বাগান করত, মেয়েটা বাপের কোপানো জমির মাটির ঢেলা ছোট দুই হাতে চৌরস করত দিনভর রোদে বসে। বাপ ঘর ঝাঁট দিচ্ছে তো সেও একটা ন্যাতা বুলিয়ে কাঠের মেঝে মুছতে লাগত নিজের মতো করে। বদলে বাপ-বেটিতে পেটভরে ভাত খেত দুপুরে, রাতের ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যেত। তখন মাঝে-মাঝে রাঁধতও কপিল, মুরগির ঝোল, ডিমের ডালনা, খিচুড়ি।

মেয়েটাই ছিল কপিলের জীবনসর্বস্ব। মেয়ে কাঁধে সর্বত্র চলে যেত সে। কাছ-ছাড়া করত না। গ্রামগঞ্জে মেয়ে সঙ্গে করেই কীর্তন করে বেড়াত। বাপের গায়ের গন্ধে, শরীরের ছায়ায় মেয়েটা পাঁচ বছর পর্যন্ত বেড়ে উঠল। তারপর ধরল ম্যালেরিয়ায়। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার এক ধাক্কায় নিভে গেল মেয়েটা। মেয়ে-হারা বাপ সকালবেলায় কারও কাছে না গিয়ে খবরটা দিতে এল দিগিনকে।

ডাকেনি, শব্দ করেনি। দিগিন তখনও ওঠেননি ঘুম থেকে, শেষরাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল টংগি ঘরের বারান্দায়। শিলিগুড়ির সেই দুর্দান্ত শীতে গায়ে গেঞ্জির ওপর কেবলমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবের বুড়ি পিসি কীর্তন শুনে মরার আগে যে নামাবলীটা দান করে গিয়েছিলেন কপিলকে, সেইটে জড়ানো। দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। বাক্যহারা, বোধবুদ্ধি নেই, কেবল ঢোক গিলছে আর থুথু ফেলছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা আর কীর্তনের দলের বন্ধুরা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। এই সময়টায় সারা দুনিয়ার মধ্যে কপিল কেবল দিগিনকে মনে রেখে তারই কাছে চলে এসেছিল।

আজও কপিলের দিকে তাকালে সেই কপিলকে দেখতে পান দিগিন, শানু তাড়াতে বলে, তাড়ানো কি সোজা? সেই মেয়ে-হারা বাপটিকে আজও দিগিন মনের কপাট খুললেই দেখতে পান যে।

দিগিন জানেন, কপিল লোক ভাল নয়। চুরি-চামারি তো আছেই, চরিত্রের অন্য দোষও আছে। মেয়ে মরার পর কপিলকে নিজের কারবারে রাখলেন দিগিন। নানা রকম কনস্ট্রাকশনের কাজে বহু হাজার টাকার মালপত্র এখানে-সেখানে পড়ে থাকে। সে-সব পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার রাখতে হয়। সে আমলে নেপালিরাই এই কাজ করে বেড়াত। দিগিনেরও কয়েকজন নেপালি চৌকিদার ছিল। তাদের দলে কপিলকে ভিড়িয়ে নিলেন, কাঙালকে শাকের খেত দেখিয়ে দেওয়া হল। কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু কমই ছিল কপিলের। রড, সিমেন্ট, কাঠ, রং, সে কিছু কম চুরি করেনি। তবু দিগিনের প্রতি তার একরকম আনুগত্য আর ভালবাসা আছে। জিনিস না-বেচলে তার চলত না। ধরলে টপ করে স্বীকার করত।

নেপালি আর ভুটিয়ার মিশ্রণে দো-আঁশলা একটা লোক এক বার একটা চায়ের দোকান করেছিল মহানন্দা ব্রিজের উত্তরে। খুবই রহস্যময় দোকান। লোকটার এক ছুকরি বউ ছিল, নাম ছিপ্‌কি। দু' গালে অজস্র ব্রণ, রোগাটে চেহারা। অনাহার এবং অর্ধাহারের গভীর চিহ্ন ছিল চোখের কোলে, গালে। রহস্যময় সেই দোকানের সামনের দিকে সেই দো-আঁশলা লোকটা রুটি, চা, বিস্কুট এবং ডিম বেচত। আর পিছনের খুপরিতে বিক্রি হত ছিপ্‌কি আর চোলাই। সঙ্গে মেটে চচ্চড়ি কি তেলেভাজা। একটু নিচু শ্রেণির মানুষেরাই ছিল সেই দোকানের খদ্দের। সন্ধেবেলা বেশ ভিড় হত। ছিপ্‌কি তার স্বামীর সঙ্গে সামনের দোকান সামলাত, চোখে কাজল, চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাতে কাচের চুড়ি, রঙিন সস্তা শাড়ি পরনে, খুব হাসত আর চোখ হানত। ভিতরের ঘর থেকে মাতালদের স্খলিত গলার নানান শব্দ আসত। ছিপ্‌কির স্বামী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নোংরা পরদার আড়ালে চোলাইয়ের খদ্দেরদের পরিচর্যা করে আসত। লোকটা ছিল আধবুড়ো, খুব গম্ভীর, দার্শনিকের মতো মস্ত কপাল ছিল তার। একসময়ে মিলিটারির ল্যান্সনায়েক ছিল বলে শোনা যায়। মিলিটারির মতোই আবেগহীন স্বভাব ছিল তার। পরনে চাপা পাজামা গায়ে কোমরের বহু ভাঁজের কাপড়ের বন্ধনীতে গোঁজা থাকত কুক্‌রি। নেপালিরা কোমরে যে চওড়া করে কাপড়ের বন্ধনী বাঁধে তার একটা কারণ পেটটাকে গরম রাখা। পাহাড়ি অঞ্চলে পেটে ঠান্ডা লেগে এক রকমের হিল-ডায়েরিয়া হয়, সহজে সারে না। দিগিনও পাহাড়ে গেলে কোমরে পেট ঢাকা কাপড় বাঁধতেন নেপালিদের দেখাদেখি।

মাতাল আর চা-পিপাসুদের সকলেই ছিপ্‌কিকে চাইত। কিন্তু সকলের পকেটে তো পয়সা নেই। যাদের আছে তারা একটু বেশি রাতের দিকে ছিপ্‌কির স্বামীর সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে নিত। পিছনের খুপরিতে চলে যেত ছিপ্‌কিকে নিয়ে। সামনের দোকানটায় লোকটা নির্বিকার বসে থাকত। তার সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, একটা ঘেয়ো কুকুর বসে আছে দোরগোড়ায়। সামনে অন্ধকার, নদীর জল ছুঁয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই রকমই ছিল লোকটা।

কপিল সেখান থেকে গরমি রোগ নিয়ে আসে। দিগিন তাকে দু'বার চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হননি। মহানন্দা পুলের কাছে ওই

দোকানটা যেতে-আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপ্‌কিকেও দু'-চারবার লক্ষ করেছেন, কপিলকে যেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জিপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুরে বাতাসে। অন্তত চার-পাঁচ পেগ নিট হুইস্কি ছিল পেটে। মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপ্‌কির বোধ হয় খদ্দের জোটেনি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলি সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান-মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখছে। দু'-চার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপ্‌কিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধ হয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপ্‌কি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পালটে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক-আধজন যারা বসে ছিল তারাও গরম চা হুস হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপ্‌কির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল. সামনে জিপ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপ্‌কির স্বামীর সে-সব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার, কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে, চা, রুটি, ডিম।

আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগিনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন, মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জিপটা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে, ও সব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন, দর কত?

ছিপ্‌কি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনও পায়নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালিতে বলল, লোকটা কী বলছে শুনছ?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন, কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপ্‌কিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন, পঞ্চাশ টাকা!

বলেই কোটের ভিতর-পকেট থেকে অন্তত সাত-আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গুনে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপ্‌কি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পরদাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পরদা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রথম যে কথাটা মনে হল. এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসেছিলেন, গা ঘেঁষে ছিপ্‌কি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি! সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করেনি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল, এ সব কিন্তু গরমি নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে আছে। পঞ্চাশ টাকায় কেনা মেয়েছেলে, যা খুশি করতে পারেন। তবু এই মেয়েটা কপিলের এঁটো, কিংবা কপিলই এই মেয়েটার উচ্ছিষ্ট?

মেয়েটাকে এক ঝটকায় টেনে সামনে দাঁড় করালেন দিগিন। লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে রইলেন ওর দিকে। শরীরে সীমাবদ্ধ মেয়েমানুষ। নদীর মতো, সবাই স্নান করে যায়। গহিন চুলের মস্ত খোঁপা, রোগা চেহারা, সর্বশরীরে চামড়ার ওপর খসখসে ভাব। গলার চামড়ার ভাঁজে ময়লা বা পাউডার জমে আছে।

নেপালিতে বললেন, ও লোকটা তোর কে হয়?

মেয়েটা লাজুক হেসে বলল, সঙ্গে থাকে।

স্বামী?

ছিপ্‌কি মুখ ভ্যাঙাল।

দেখি তোর হাত!—বলে দিগিন ওর হাত টেনে নিবিষ্ট মনে ওর হস্তরেখা দেখলেন। ভ্রু কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখে-টেখে বললেন, দূর! তুই এখানে পড়ে আছিস কেন? তোর ভাগ্য তো খুব ভাল। এখন বয়স কত?

মেয়েটা হিসেব জানে না। অবাক হয়ে বলল, কত জানি না।

দিগিন বললেন, বাইশ-তেইশ হবে। আর এক বছরের মধ্যে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে।

সকলেরই এই দুর্বলতা থাকে, ভাগ্য বিষয়ক। মেয়েটা মাতাল দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, মাতালরা কত কাণ্ড করে। তবু হাতটা চেপে ধরে বলল, কী হবে?

তোর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, সব লেখা আছে। এ লোকটার সঙ্গে পড়ে আছিস কেন? পালা।

এই বলে দিগিন উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তোর সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছিলাম, কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম রে। তুই একদিন খুব বড় হবি তো, তাই ভয় লাগল।

দিগিন বিদায় নেওয়ার আগে আরও পঞ্চাশটা টাকা ছিপ্‌কির হাতে গোপনে দিয়ে বললেন, তোর স্বামী তোর কষ্টের টাকা সব মেরে দেয় জানি। এটা রাখ। জানি তুই যখন বড় হবি তখন এ সব দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা ভিখিরিকে দিয়ে দিবি। ভাল চাস তো কালই পালিয়ে যা!

কোথায় যাব?

কোথায় যাবি!

দিগিন একটু ভাববার ভান করেন। শেষে আবার দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন, শালবাড়িতে চ্যাটার্জির কাঠগোলায় চলে যাস। শনিবার-মঙ্গলবার থাকি। কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। ফিলমে নামবি? আমার দোস্ত আছে।

ছিপ্‌কির চোখ-মুখ কী রকম যেন উজ্জ্বল হয়েছিল ফিলমের নামে! অনেকখানি ঘাড় হেলাল, আর ছুটে এসে বুকে পড়ে একটু আদর করেছিল দিগিনকে।

মেয়েটা বোধ হয় পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরটা এক সকালে পাওয়া গেল মহানন্দার বিশুষ্ক নদীর খাতে। একটু একটু জল চুঁইয়ে বয়ে যাচ্ছে নালার মতো শীতের পাহাড়ে নদী। তারই জল ছুঁয়ে একবুক রক্ত ঢেলেছে ছিপ্‌কি। কুকরিতে পেটটা হাঁ হয়ে আছে।

লোকটা এক মাস পরে ধরা পড়ল মাদারিহাটে। দোকানটা তার আগেই উঠে গেছে।

তখন এ রকম মহানন্দার পাড়ে হামেশা লাশ পাওয়া যেত। চাটাইয়ে বেঁধে ধাঙড়রা নিয়ে আসত হাসপাতাল মর্গে। দু'-চার ঘা ছুরি চালিয়ে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিত। ধাঙড়রা ফের চাটাই-বাঁধা মড়া নিয়ে হয় পোড়াত, নয়তো পুঁতত। ছিপ্‌কির জন্য এখনও একটা কষ্ট হয় দিগিনের। পালাতে গেলেই যে খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেননি দিগিন। চালের ভুল। তা হোক, তবু দোকানটা ওঠানো গেছে। কপিল কিছুদিন মনমরা হয়ে ছিল।

এখন কপিলকে দেখে একটু ভ্রূ কোঁচকালেন দিগিন। রূঢ় মুখভাব করে একটু চেয়ে রইলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একটু কর্কশ। মুখভাবে তিনি কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।

কপিল কখনও দিগিনের চোখে তাকায় না। নানা পাপ জমে আছে ভিতরে। তাকাতে পারে না। একবার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কাল রাতে শাটারিং-এর কাঠ কারা খুলে নিয়ে গেছে। আজ ঢালাই হওয়ার কথা।

দিগিন অবাক হন। বলেন, জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল, কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তির শব্দ করে বললেন, চৌকিদার কে ছিল?

কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাছে পাঠিয়ে দেন। বলেছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কিন্তু কপিল কখনও কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনওকালে সন্ধের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন, চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরিটা পাস করতেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেন্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেন্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যায় দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারিও যাবে। চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশি লাভ খাবে, প্রথম লরিটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না। আবার তৈরি করতে ডবল গচ্চা যাচ্ছে. শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যাবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুর করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন, কতক্ষণ লাগাবি?

আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেব'খন।

দিগিন চিন্তিতভাবে জিপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সিটে বসা কপিল একটু কেশে বলল, ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন, রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন, হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশি নয়। সবাই যেন পাকে-প্রকারে, নানা আকারে-ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে। গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশি স্ট্রেচ প্যান্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জি। নীল প্যান্ট, আর হালকা হলুদ গেঞ্জিতে ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবি ধরনের চেহারা, কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন এক বার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জিপ থামতেই শানু দৌড়ে এল।

কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয়নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন, কত টাকার মাল গেছে?

তিন-চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোট কাজ ছিল, বেশি মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন, শাটারিং-এর কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছ?

শানু একটু যেন অবাক হয়ে বলে, না, এখনি আবার শাটারিং-এর কাঠ কিনব কেন? যত দূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর পি আছে। বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন, সে তুমি দেখোগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে, আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাত দিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তা ছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন, পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো। আমি কথা বলে যাব, তুমি একটা জিপ ভাড়া করে জলঢাকা চলে যাও আজই।

হেডমিস্ত্রি দিগিনের হাতের লোক। সে এসে দিগিন কিছু বলার আগেই বলল, আজই ঢালাই করে দেব। আপনি যান।

জিপ থেকে দিগিন আর নামলেন না, জিপ ছাড়তে ইঙ্গিত করলেন রমণীমোহনকে। এক বার চেয়ে দেখলেন, শানুর মুখ খুব গম্ভীর, প্রেস্টিজে লেগেছে বোধ হয়। কর্মচারীদের সামনে দিগিন ওকে পাত্তা দিলেন না তেমন। তার ওপর জলঢাকা যেতে হচ্ছে।

রমণীমোহন জিপ ছাড়ল। কপিল দৌড়ে এল জিপের সঙ্গে, কী যেন বলবার জন্যে মুখটা উন্মুখ, দিগিন চোখের ইশারা করলেন, কপিল জিপের পিছনে উঠে পড়ল।

বাসার দিকেই মুখ ঘোরাল জিপ। দিগিন চুপ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, কপিল।

আজ্ঞে।

শালখুঁটিগুলো কাকে বেচেছিস?

একটু চুপ করে থেকে কপিল বলল, অনাদিবাবুর গোলায়।

কখন?

ভোর রাতে। একটা সাপ্লাইয়ের লরি এসেছিল, তাদের ভজিয়ে মাল তুলে দিয়েছি।

কততে বেচলি?

বিনা দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ অকপটে কপিল বলল, শানুবাবুর কথা ধরবেন না। তিন-চার হাজার টাকার মাল ছিল না। মেরে কেটে হাজারখানেকের মতো হবে। আমি তিনশো পেয়েছি।

দিগিন একটু হাসলেন। কপিলকে তিনি চেনেন, এমন প্রতিশোধস্পৃহা খুব কম লোকেরই থাকে, প্রতিশোধ নেয়ও খুব কূটকৌশলে।

পিছন থেকে কপিলের হাতটা এগিয়ে এল। তাতে একশো টাকার তিনটে নোট, ভাঁজকরা, দিগিন নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। রমণীমোহনকে বললেন, সেবক রোড ধরে চলো।

বিনা উত্তরে নিউ মার্কেটের রাস্তা ধরে সেবক রোডে গাড়ি উঠিয়ে আনল রমণীমোহন, পিছনে কপিল চুপ করে বসে আছে। সে লজ্জিতও নয়, দুঃখিতও নয়, নির্বিকার। মল্লিকা মরে যাবার পর থেকেই ও রকম। ওর ভালবাসার, স্নেহের কোনও কেন্দ্রবিন্দু নেই। এখনও অবসর সময়ে কীর্তন করে। কীর্তন করতে করতে যদি কৃষ্ণভক্তি আসে কখনও, তো ভাল, না এলে একদিন বুড়ো হয়ে এমনিই মরে যাবে। কেউ কাঁদার নেই।

টাকা—এই কথাটা আবার মনে পড়ল। টাকা।

টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন মদন চৌধুরী। তেল চুকচুকে শরীরখানি। মুখভাব আহ্লাদে ভরা, পান খেতেন, বিলোতেন। স্টেশনমাস্টার হিসেবে খারাপ ছিলেন না, মানুষটাও ভাল। তার দুই মেয়ে ছিল, নমিতা আর প্রণতি। প্রণতি ছোট, দীঘল কালো চেহারা, কিন্তু কালো রঙে অমন রূপবতী সে-আমলে দেখেননি দিগিন। ভারী লোভ হত। দিগিনের বয়স তখন কিছু না। ওদের বাড়িতে যেতেন-টেতেন। প্রণতি অবশ্য খুব একটা সামনে আসত না। তবু পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ শুনতেন। পরদার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যেত। মদন চৌধুরীরা বারেন্দ্রশ্রেণি, আর সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই বলতেন, ভাল দুটো বারেন্দ্রশ্রেণির পাত্র খুঁজবেন তো। চাটুজ্জে। এ সব পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সালের কথা। তখনও ময়নাকে আনেননি দিগিন।

একবার কলকাতা যাবেন। চৌধুরী এসে বললেন, আমার বাড়ির ওরাও যাবে। আমি বলি কি আপনার সঙ্গে চলে যাক।

কে কে যাবে তা জিজ্ঞেস করলেন না দিগিন। কিন্তু উচাটন হয়ে রইলেন। প্রণতি যাবে।

যাওয়ার দিন স্টেশনে গিয়ে দেখেন প্লেস করা গাড়ির একটা ইন্টার ক্লাস কামরায় চৌধুরীর দুই মেয়ে, বউ, আর ছেলে বসে আছে। বুকখানা নড়ে উঠল দিগিনের। ভিড়ের গাড়ি নয়। তখন অফ সিজিন চলছে। ফাঁকা কামরাটায় তারা মাত্র ক'জন। সে যে বয়ঃসন্ধির আশা-নিরাশার কী গভীর উদ্বেগের দিন গেছে সব। নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়, কখনও মনে হয় সবচেয়ে আহাম্মক বোকা। তখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্যা ছিল না। তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে বুকের পাটা লাগত।

প্রণতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল তো রইলই। চৌধুরীর বউ আর ছেলে দিগিনকে খুব খাতির করতে থাকে। চৌধুরীগিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি-ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দু' চারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে-না-ছাড়তেই ঢুলুনি পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসি প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নি আর ছেলে একটা সিটে দু'ধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে, ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

কেন?

ঘুম আসছে না।—বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানি শাড়ি পরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনও ওইভাবে ছিল। খায়নি! তার নাকি খিদে নেই। দিগিন বুঝতে পারছিলেন,

তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ওই কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? না কি দিগিনের গুলচালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরি প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হালকা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরীগিন্নি ঘুমগলায় এক বার বললেন, জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠান্ডা লাগবে।

না। আমার মাথা ধরেছে।

গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়! দেখিস।

উঃ, তুমি ঘুমোও না।

কিছু তো খেলি না।—বলে চৌধুরীগিন্নি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিগিনের মাথা তখন আগুন। ওই রোগা একরত্তি মেয়েটার অত দেমাক কীসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানেন না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোনও পরিবর্তন নেই। শুধুমাত্র শরতের ঠান্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধ হয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনও দিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধু-ধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন, আলোগুলো নিভিয়ে দেব? সবাই ঘুমোচ্ছে তো, আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

শুনছেন!—দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল, বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল, দিন।

আপনার অসুবিধে হবে না তো?

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন! সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধ হয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা! আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরির মতো, রূপসি জিনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের! কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়। সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ওই মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না! আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি!

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারেন না।পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে। চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর হয়ে ঘুমের ভান করলেন।

মেয়েটা উঠল। বাথরুমের দিকে গেল পথ হাতড়ে।

খুটখাট একটু শব্দ হল বুঝি। বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কী সতর্ক মায়েদের মন! ওই যে একটু খুটখাট শব্দ হল তাইতেই চৌধুরীগিন্নি উঠে বসলেন।

প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। বাথরুমের দরজার ঘষা কাচে আলো দেখলেন। সন্দেহ হল। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে দেখে নিলেন, দিগিন তার জায়গায় আছেন কি না।

দিগিন মনে মনে হাসেন আজও। কত কূট হয় মানুষের মন! কত সন্দেহ আসে!

বাথরুম থেকে এসে আর কাঠ হয়ে থাকল না প্রণতি। সহজ হয়ে বসল। চুলটা ঠিক করল খানিক, বেণির শেষ মাথায় রিবনের ফাঁস খুলে গিয়েছিল, সেটা বাঁধল। জলের বোতল থেকে জল খেল। এবং বারংবার তাকাল দিগিনের অন্ধকার বাঙ্কের দিকে। দিগিন মনে মনে হাসলেন।

খুব মাঝরাত তখন। প্রণতি অবশেষে শুয়েছে। দিগিনের ঘুম এল না। একেবারে প্রথম রাতে না ঘুমোলে তাঁর ঘুম কেটে যায়। শুয়ে থেকে কাঁহাতক আর সময় কাটাবেন। সে আমলের ক্যাভেন্ডার সিগারেট একটা বের করে ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানছেন। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেবল দরজায় কাচ ফেলা বলে একটু ঘষা আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মুখে মেঘ জমেছে নিশ্চয়। ট্রেনটা থেমে আছে কোথাও সিগনাল না পেয়ে। বাইরে জলা-জমি থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। তখন পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল, নির্জনতা ছিল, ট্রেন যেত বিজনের ভিতর দিয়ে। অনেক দূব পর্যন্ত লোকবসতি ছিল না উত্তরবাংলায়। ভুতুড়ে মাঠে ঘাটে অলৌকিক জ্যোৎস্না খেলা করত। জিন ছিল, পরি ছিল।

সেই খুব আবছা অন্ধকার থেকে একটা অশরীরী স্বর এল, ক'টা বাজে?

দিগিন প্রথমটায় চমকে উঠলেন। এত ক্ষীণ স্বর যে প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না ভুল শুনেছেন কি না। তারপর বুঝলেন প্রণতি।

খুব সন্তর্পণে সিগারেটের আলোয় ঘড়ি দেখে বললেন, একটা।

তারপর সব চুপ।

খুব সাহস করে দিগিন আস্তে বাতাসে কথা ক'টা ছাড়লেন, তুমি ঘুমোওনি!

না। ঘুম আসছে না।—যেন কথা নয়, বাতাসের শব্দ, এত ক্ষীণ আব নরম গলা।

আমিও না।—দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাঁপুনিটা সামলালেন। বললেন, তুমি কিছু খেলে না।

আমার খিদে পায় না।

কেন?

এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দূর থেকে কানে-কানে বলা। তবু কী আশ্চর্য তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

কলকাতায় ক'দিন থাকবে?

বেশি দিন না।

বেড়াতে যাচ্ছ?

হুঁ। মামার বাড়ি।

আমি সাত দিন পরে ফিরব। তোমরা?

এক মাস।

আর কি তেমন কোনও কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত-শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল, দিগিনকে প্রায় গহিন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনও প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবু এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে এক মাসের নাম করে বহুকাল থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভাল ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনও হয়নি। মামারা বড়লোক। তারা ভাগনে-ভাগনিদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল ওরা আর আসেনি। চৌধুরীগিন্নি অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কে জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব কমবে, সময় বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটারগেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্র্যান্সশিপমেন্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্রান্সশিপমেন্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ-গাড়ি থেকে ও-গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশন-মাস্টাররা ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য রেলওয়ের কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে তারা আর-এক রকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভাল স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশন মাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলোয় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালি, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরী তাঁর মাকে মা ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরীকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরীর চেহারা এবং স্বভাব পালটে গেল, একটা ওপেন ডেলিভারি নিতে হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরীর মুখে-চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখদুটো চকচকে, সবসময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন, চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানাশুনো, জলপাইগুড়িব কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন, রিভলভার দিয়ে কী হবে?

চৌধুরী তেমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন, এত টাকা, কখন কী হয়!

চৌধুরীর বাড়ির চেহারাও পালটেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকে। বেশিরভাগ জিনিসপত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরীর বাড়ি হচ্ছে, দুটো বাড়ি একটা বউয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে দুটো ঘর। ভিতরের ঘরটা সবসময় তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় দুটো ক্যাম্পখাটে বাপ-ব্যাটা শোয়। ঝি-চাকর কাউকে রাখেনি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরী ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরীকে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর দুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরী। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরীরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরী সিক-লিভ নেবেন না, ওই অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে-কয়ে তাঁকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরী। রাশি রাশি টাকা কলকাতায় পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরীর এখন টাকা ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা রুগ্ণ খড়ি-ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে, আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরী ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগনেদের হাতে-পায়ে ধরলেন। বোন বললেন, দাদা, আমি কী করব? ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরী ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, ক'দিনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেইসময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলেমেয়ে বউ, সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত। কিন্তু ওই বাড়ির শোকটাই সামলাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরী বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে। কিছু অভাব ছিল না, তারপর হলদিবাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালই, কিন্তু সেই বড়লোকির একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে, তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরিব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরিব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিনতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেন্ট কথা ছিল, এমনি লস্ সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস সহ্য হয় না । গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন স্পোর্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে হারত সেদিন বড় মনমরা থাকত । বলত, ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই খেপাতাম। সে বড় পয়সা ভালবাসত। সবাই তাকে বলত পয়সা নিবি? অমনি সে হাত পাতে। আমি বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম। দিতাম না। সে খেপে গিয়ে বলে বেড়াত, নেম্মলটা খচ্চড়। দে'লে নে'লে, দে'লে নে'লে, ফের দে'লে, ফের নে'লে। নে'লে তো নে'লে, আর দে'লে না।

জীবনটা ওইরকম। মাঝে-মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জিপ উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ি রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রিজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নীচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনও বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দু'ধারে বালির বিছানা। বাঁ পাশের তীর ধরে ছিল রেল লাইন। ছোট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

বে-খেয়ালে গরমজামা আনেননি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়ালখুশিমতো। রমণীমোহন আর কপিলেরও গরম জামা নেই। শরৎকাল। পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনও তাঁর কোনও কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায়নি।

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন, কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয়নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থির চোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, কালিম্পং যাবেন তো?

তাই তো যাচ্ছি।

দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠান্ডা লাগবে।

কাজ। কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চার ধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরনো রেল লাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দু'মুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

ডাকলেন, কপিল।

আজ্ঞে।

ঠিকাদারের চৌকিদারি তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কী কপিল?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন, তোকে একটা বাগান বানাতে দেব। শালবাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো।

কপিল হুঁ দিল।

ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল...

মল্লিকা।— কপিল বাধা দিয়ে বলল।

দিগিন ভুলে গিয়েছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো চকচক করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমাত্র একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কী আছে? সে আর কিছু চায় না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পালটে যাচ্ছে। চতুর ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন, পারবি না?

খুব।

কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা। জিপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি লাগাবে, আর সেইসঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ি গোরুর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয়। গভীর উদ্ভিদজগতের নেশাড়ু গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশ আর তিস্তার ও পারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুঁইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট, জিপটা গুমগুম শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশি দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন।

বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তা-ই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ওই দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানখেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ি জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পং ব্যতিক্রম। এই জন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুর সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পং নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাঁকে এইখানে দেখে গেছেন দিগিন। ওই শ্বেতপাথরের কেদারায় গদি পেতে বসতেন। আদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমাদেবীকে দেখেছেন ওই কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনও। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী!

সেই রবীন্দ্রনাথের সেন্টেনারি হয়ে গেল! সময় কত তাড়াতাড়ি যায়। বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি লম্বা দাড়িওলা জোব্বা পরা মূর্তি ধীর গম্ভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জিপে উঠলেন এসে। ডাকলেন, রমণী।

আজ্ঞে।

শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

সেখানে চল।—বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন, তোরা কিছু খাসনি?

রমণী মাথা চুলকে বলে, আপনারও হয়নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভাল হোটেলে তিনজন বয়স্যের মতো সমান সমানে বসে খেলেন। দিগিন সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু'পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ওইরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে; কর্মচারী, তবু কিছু বেশি। চাকর, তবু যেন অন্য রকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তলিয়ে দেখেননি দিগিন। গোলমেলে! একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জিপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে, সেইখানে তো?

কোথায় যাওয়ার কথা তা খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারি। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসি বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা।

বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে। সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশি বলে, আর নান বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই ফরাসি সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে লেগে আছে, ত্রিশ বছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক আর কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন, কোথায়?

সেই মিসট্রেসের বাড়ি!—রমণী বলে।
কোন মিসট্রেস?
যেখানে শানুবাবু আসেন!
ওঃ।—দিগিন বুঝতে পেরে বলেন, মেয়েটা মিসট্রেস বুঝি?
না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।
দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন, শানু প্রায়ই আসে?
সপ্তাহে দু'-তিনবার।
বিধবা। তা হলে বয়স কত? বেশি?
না। কম।
বাচ্চা-কাচ্চা নেই?
না। বালবিধবা।
এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি?
এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।
নিখিল ব্যানার্জি! সে কে?
আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তরবাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটেনি, নয় তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দু'জন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্লাটফর্মে নেমে দু'জন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। দায়-দায়িত্বের চাপে চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে থাকতে থাকতেই দু'জনের রোজ খিটিমিটি বাধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত, মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সে সময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট দম্পতি। দিব্যি কথা-টথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইসলামিক হিস্ট্রির এম এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুবই কম। বসে খেত। বউ চাকরি করত। বছর সাতেক ধরে ওদের দু'জনের ঝগড়া হল। প্রেম কত দূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পং থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামি মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

শানু এখানে জুটল কী করে?

রমণীমোহন একটা ঢেকুর তুলে বলল, সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তারপরই চেনা জানা।

কে কাকে ভজাল জানিস?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে, শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভাল। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটাকে একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝ বরাবর তুলে দাঁড় করাল রমণী। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

জিপের শব্দ শুনে কেউ উঁকি দিয়েছিল বোধ হয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নিচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনও লম্বাটে টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে-না-যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উঁকি দিল। মুখে একটু হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাঁপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন, মনীষা আছে?

মেয়েটা মাথা নাড়ল, নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

আমি শান্তি চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহুদিনকার পুরনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল, আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র‍্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা। ফুলদানিতে ফুল। কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনও ভাল করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাং-দুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাঁকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন, এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পরদার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে একখানা সুন্দর ফরসা হাত পরদাটা সরাল। রঙিন ছাপা শাড়ি পরা, ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামলে নিয়ে বললেন, নামটি কী?

অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রু কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দু'ধারে দু'বার ফেরাল। অর্থাৎ না।

তোমার স্বামীর পদবি কী ছিল?—দিগিন জিজ্ঞেস করলেন।

ভট্টাচার্য।—ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

তা হলে ব্যানার্জি বললে কেন? ইচ্ছে করলেই কি পদবি বদলানো যায়?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধ হয় বাইশের বেশি কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো।

কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

ষোলো।—তেমনি ক্ষীণ উত্তর।
এখন কত বয়স?
একুশ।
বিয়ের ক'দিন পর স্বামী মারা যায়?
কাঠ-কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা এক বার করুণাভিক্ষু চোখদুটো তুলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ছ'মাস।
কী হয়েছিল?
মেয়েটি বাঁ হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।
ও!—বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, তার কথা তোমার মনে পড়ে?
মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।
মনে পড়ে না?—দিগিন প্রায় ধমকালেন।
মেয়েটি তার সজল চোখ দু'খানা তুলে তাকাল। কী মায়া থাকে চোখে! কী বিপুল ফাঁদ! দিগিনের বরফ গলতে শুরু করে।
মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, না।
এত অল্প বয়সে তোমার বিয়ে দিল কে? কেনই বা!
আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর...
বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কি না তা বুঝতে পারছিল না বোধ হয়।
দিগিন বললেন, আমি তোমার মা-বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।
বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাইনি। কিন্তু তাঁর কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেননি। তবু অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।
দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন, যাও, কফি করে আনো।
মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা বাড়ছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এ সব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না ফুটছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেননি।
মেয়েটি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশি হলেন।
নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যেভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন, কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যেয়ো না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বোলো।
একটু চুপ করে থেকে বললেন, বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশি মিশো না, বুঝলে?
মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাঁকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুত রাতে।
বাইরে অবশ্য এখনও শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।
জিপে উঠে দিগিন আর-একটা চুরুট ধরালেন। বললেন, চালা। মেহের সিং-এর দোকানে একটু থামাস।
কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিং-এর দোকান থেকে

একটা বড় পাঁইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোট। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জিপ দাঁড় করিয়ে ভ্রু কুঁচকে একটু কপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে। ছোট পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দু'জনে জিপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

কয়েক দিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটর-সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামালেন দিগিন। পিছনের সিট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরনো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারে জমি সদ্য কোপানো। কয়েকদিনে দু'বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কপিল। আরও দু' বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়ে ছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কপিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...' গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল, এখানে আনলে যে!

দিগিন ভ্রুকুটি করলেন। বললেন, কেন? খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল। বলল, ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন, যাবে ওখানে?

ময়না বলল, তুমি গেলে যাব না কেন?

এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গভীর। জ্যোৎস্না পৌঁছায়নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল, আর যেয়ো না।

কেন?

সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, তুমি কপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল, যদি না আসো?

দিগিন ভ্রু তুলে বললেন, আসব না কেন?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনও কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

ও। —বলে দিগিন ভাবলেন। বললেন, যদি না আসি তবে কপিল তোমাকে পৌঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ওইরকম। অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাঁকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে। কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা

খসে পড়ছে। কুয়াশামাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারদিকে ভুতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তাঁর মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেক দিন ঘুমোননি, বিশ্রাম নেননি। অনেক দিন যেন আবার কোনও শক্ত কাজও করেননি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে! প্রথমটায় ভয় হল, সাপ? ভূত? শত্রু?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

তোমার পায়ের শব্দ পাইনি তো!—বললেন দিগিন।

তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গিতে সাকীর একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বন করলেন। কোনও কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধ হয় তা বুঝল। বলল, এমন সুন্দর আদর হয় না। এসো, আমিও তোমাকে একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না।

কয়েক দিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দু'খানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরা-উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা একাকিত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই , প্রাণ নেই। ওরই পায়ের কাছে কোনও দুর্জ্ঞেয় দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে অঙ্কুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ, নদী-উৎস। ওকে ঘিরে আছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকেনি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লিপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেল করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরির কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘণ্টি বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘণ্টি বাজার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যান্টে ক্লিপ আঁটা, মাথায় হ্যাট।

আসছি।—বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন, টানতে পারবে তো লাহিড়ি?

পারব।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চার ধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

পারবে তো লাহিড়ি?—দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

লাহিড়ি হাঁপ-ধরা গলায় বলে, পারব, পারতেই হবে।

বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসো, আমি চালাই।

না হে, তোমাকেও তো এ রকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারিদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন, লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এ রকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন, সাদা অন্ধকার। অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার।

পুন্নি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনও দিনই আর নিলেন না।

ছায়াময়ী

ধৃতির রিভলভার নেই কিন্তু হননেচ্ছা আছে। এই ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে তার জীবনে তেমন কোনও মহিলার আগমন ঘটল না, তা বলে কি তার হৃদয়ে নারীপ্রেম নেই? ঈশ্বর বা ধর্মে তার কোনও বিশ্বাসই নেই, তবু সে জানে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একজন বা একাধিক জ্যোতিষী তাকে ওই সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

রাত দুটো। তবু এখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ঝড়ের বেগে। চিফ সাব-এডিটর উমেশ সিংহ প্রেসে নেমে গেছেন খবরের কাগজের পাতা সাজাতে। দেওয়ার মতো নতুন খবর কিছু নেই আজ। বাকি তিনজন সাব-এডিটরের একজন বাড়ি চলে গেছে, দু'জন ঘুমোচ্ছে। ধৃতি একা বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পায়জামা। টেলিপ্রিন্টারের খবর সে অনেকক্ষণ দেখছে না। কাগজ লম্বা হয়ে মেশিন থেকে বেরিয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। এবার একটু দেখতে হয়।

ধৃতি উঠে জল দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নেয়। তারপর মেশিনের কাছে আসে। মাদ্রাজে আমের ফলন কম হল এবার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, যুগোশ্লাভিয়া ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রশংসা করেছে, ইজরায়েলের নিন্দা করছে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। কোনও খবরই যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট খবর কাগজের লেজের দিকে আটকে আছে। প্লেন ক্র্যাশে ব্যাঙ্গালোরে দু'জন শিক্ষার্থী পাইলট নিহত। যাবে কি খবরটা? ইন্টারকম টেলিফোন তুলে বলল, উমেশদা, একটা ছোট প্লেন ক্র্যাশের খবর আছে। দেব?

কোথায়?

ব্যাঙ্গালোর।

ক'জন মারা গেছে?

দু'জন।

রেখে দাও। আজ আর জায়গা নেই। এমনিতেই বহু খবর বাদ গেল। ত্রিশ কলম বিজ্ঞাপন।

আচ্ছা।

ধৃতি বসে থাকে চুপ করে। অনুভব করে তার ভিতর হননেচ্ছা আছে, প্রেম আছে, আর আছে সুপ্ত সন্ন্যাস। বয়স হয়ে গেল ত্রিশের কাছাকাছি। ত্রিশ কি খুব বেশি বয়স?

টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে সাধারণত প্রেস থেকেই ফোন আসে। উমেশদা হয়তো কোনও হেডিং পালটে দিতে বলবে বা কোনও খবর ছাঁট-কাট করতে ডেকে পাঠাবে। তাই ধৃতি গিয়ে ইন্টারকম রিসিভারটা তুলে নেয়। তখনই ভুল বুঝতে পারে। এটা নয়, অন্য টেলিফোনটা বাজছে। বাইরের কল।

দ্বিতীয় রিসিভারটা তুলেই সে বলে, নিউজ।

ওপাশে অপারেটারের গলা পাওয়া যায়, এলাহাবাদ থেকে পি পি ট্রাঙ্ককল। ধৃতি রায়কে চাইছে।

রাত দুটোর সময় মাথা খুব ভাল কাজ করার কথা নয়। তাই এলাহাবাদ থেকে তার ট্রাঙ্ককল শুনেও সে তেমন চমকায় না। একটু উৎকর্ণ হয় মাত্র। তার তেমন কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন নেই, স্ত্রী বা পুত্রকন্যা নেই, তেমন কোনও প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কাজেই দুঃসংবাদ পাওয়ার কোনও ভয়ও নেই তার।

এলাহাবাদি কণ্ঠটি খুবই ক্ষীণ শোনা গেল, হ্যালো! আমি ধৃতি রায়ের সঙ্গে—

ধৃতি রায় বলছি।

মাত্র তিন মিনিট সময়, কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন।

বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি, আমি টুপুর মা। টুপুকে ওরা মেরে ফেলেছে, বুঝলেন? খবরটা আপনার কাগজে ছাপবেন কিন্তু! শুনুন, সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিচ্ছে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না। আপনি লিখবেন টুপু খুন হয়েছে।

অধৈর্য ধৃতি বলে, কিন্তু টুপু কে?

আমার মেয়ে।

আপনি কে?

আমি টুপুর মা।

আপনি আমাকে চেনেন?

চিনি। আপনি খবরের কাগজে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আপনার নামে লেখা বেরোয় কাগজে। নামে চিনি।

আমি যে নাইট শিফটে আছি তা জানলেন কী করে?

আজ বিকেলে আপনার অফিসে আর একবার ট্রাঙ্ককল করি, তখন অফিস থেকে বলেছে।

শুনুন, আপনার মুখের খবর তো আমরা ছাপতে পারি না, আপনি বরং ওখানে আমাদের যে করেসপন্ডেন্ট আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

না, না। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। টুপুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন।

ধৃতি বুঝতে পারে এলাহাবাদি পুরো পাগল। সে তাই গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, তা হলে বরং ঘটনাটা আদ্যোপান্ত লিখে ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

ছাপবেন তো?

দেখা যাক।

না, দেখা যাক নয়। ছাপতেই হবে। টুপু যে খুন হয়েছে সেটা সকলের জানা দরকার। খবরের সঙ্গে ওর একটা ছবিও পাঠাব। দেখবেন টুপু কী সুন্দর ছিল! অদ্ভুত সুন্দর। ওর নামই ছিল মিস এলাহাবাদ।

তাই নাকি?

পড়াশুনোতেও ভাল ছিল।

অপারেটর তিন মিনিটের ওয়ার্নিং দিতেই ধৃতি বলল, আচ্ছা ছাড়ছি।

ছাপবেন কিন্তু।

ধৃতির কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ফোন ছেড়ে সে উঠে মেশিন দেখতে থাকে। বাণিজ্য-মন্ত্রীর বিশাল এক বিবৃতি আসছে পার্টের পর পার্ট। এরা যে কী সাংঘাতিক বেশি কথা বলতে পারে! আর কখনও নতুন কথা বলে না।

টেবিলের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। ধৃতি আর মেশিন পাহারা না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সিগারেট শেষ হলেই চোখ বুজবে।

চোখের দুটো পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে আসছে ক্রমে। মাথার দিকে অল্প দূরেই টেলিপ্রিন্টার ঝোড়ো শব্দ তুলে যাচ্ছে। রিপোর্টারদের ঘরে নিস্ফল টেলিফোন বেজে বেজে এক সময়ে থেমে গেল। মাথার ওপরকার বাতিগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে সহদেব বেয়ারা। আবছা অন্ধকারে হলঘর ভরে গেল।

সিগারেট ফেলে ফিরে শুল ধৃতি। উমেশদা প্রেস থেকে কাগজ ছেড়ে উঠে এল, আধো ঘুমের মধ্যেও টের পেল সে।

অনেকদিন আগে স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল ধৃতি। তখন ব্যাঙ্কের অল্পবয়সি কর্মীদের কয়েকজন তাকে ধরল, আপনি ধৃতি রায়? খবরের কাগজে ফিচার লেখেন আপনিই তো?

সেই থেকে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। স্টেট ব্যাঙ্কের ওপরতলায় কমন রুম আছে। সেখানে আজকাল বিকেলের দিকে অবসর পেলে এসে টেবিল টেনিস খেলে।

আজও খেলছিল। টেবিল টেনিস সে ভালই খেলে। ইদানীং সে জাপানি কায়দায় পেন হোল্ড গ্রিপে খেলার অভ্যাস করছে। এতে একটা অসুবিধে যে ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না। বাঁ দিকে বল পড়লে হয় কোনওক্রমে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয়তো বাঁ দিকে সরে গিয়ে বলটাকে ডানদিকে নিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হয়। তবে এই কলম ধরার কায়দায় ব্যাট ধরলে মারগুলো হয় ছিটেগুলির মতো জোরালো। সে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খেলে না, এমনিতেই খেলে। কিন্তু ধৃতি যা-ই করে তাতেই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আর এই মনোযোগের গুণেই সে যখনই যা করে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় সে যে কয়েকটা ফিচার লিখেছে তার সবগুলোই ভালভাবে উতরে যায়। তার ফলে বাজারে সে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। নাম বলতেই অনেকে চিনে ফেলে। অবশ্য এর এক জ্বালাও আছে।

যেমন স্টেট ব্যাঙ্কে যে নতুন এক টেকো ভদ্রলোক এসেছেন সেই ভদ্রলোকটি তাকে আজকাল ভারী জ্বালায়। নাম অভয় মিত্র, খুবই রোগা, ছোট্ট, ক্ষয়া একটি মানুষ। গায়ের রং ময়লা। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যেই অসম্ভব বুড়িয়ে রসকষহীন হয়ে গেছে চেহারা। চোখদুটোতে একটা জুলজুলে সন্দিহান দৃষ্টি। অভয় মিত্র তার নাম শুনেই প্রথম দিনই গম্ভীর হয়ে বলেছিল, দেশে যত অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে তার বিহিত করুন। আপনারাই পারেন।

কে না জানে যে এ দেশে প্রচুর অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে! আর এও সকলেরই জানা কথা যে কিছু করার নেই।

কিন্তু অভয় মিত্র ধৃতিকে ছাড়েন না। দেখা হলেই ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকেন, আপনারা কী করছেন বলুন তো? দেশটা যে গেল!

ধৃতি খুবই ধৈর্যশীল, সহজে রাগে না। কিন্তু বিরক্ত হয়। বিরক্তি চেপে রেখে ধৃতি বলে, আমার কাগজ আমাকে মাইনে দেয় বটে, কিন্তু দেশকে দেখার দায়িত্ব দেয়নি অভয়বাবু। দিলেও কিছু তেমন করার ছিল না। খবরের কাগজ আর কতটুকু করতে পারে?

অভয় হাল ছাড়েন না। বলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখুন। শয়তানদের মুখোশ খুলে দিন।

অভয় মিত্রের ধারণা খুবই সহজ ও সরল। তিনি জানেন কিছু মুখোশ-পরা লোক আড়াল থেকে দেশটার সর্বনাশ করছে। শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, কালো টাকা জমানো থেকে সব রকম দুষ্কর্মই করছে একদল লোক।

তারা কারা?— একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ধৃতি।

তারাই দেশের শত্রু। আমি আপনাকে অনেকগুলো কেস বলতে পারি।

শুনব'খন একদিন।

এইভাবে এড়িয়েছে ধৃতি।

আজও টেবিল টেনিস খেলার দর্শকের আসনে অভয় মিত্র বসা। তিনি কোনওদিনই খেলেন না। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে বসে থাকেন। ধৃতি স্টেট ব্যাঙ্কের সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় সুব্রতকে এক গেমে হারিয়ে এসে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিল।

অভয় মিত্র বললেন, আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি ইন্টেলেকচুয়ালরা সি আই এ-র টাকা খায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে নির্বিকার ভাবে বলল, খায়।

সে কথা আপনারা কাগজে লেখেন না কেন?

আমিও খাই যে।— বলে ধৃতি হাসল।

না না, ইয়ারকির কথা নয়। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলি। ময়নাগুড়িতে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার গেল একবার। অতি সৎ লোক। কিন্তু কন্ট্রাক্টররা তাকে কিছুতেই ঘুষ না দিয়ে ছাড়বে না। তাদের ধারণা ঘুষ না নিলে ছোকরা সব ফাঁস করে দেবে। যখন কিছুতেই নিল না তখন একদিন দুম করে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটাকে আপনি কী মনে করেন?

খুব খারাপ।

ভীষণ খারাপ ব্যাপার নয় কি?

ভীষণ।

এইসব চক্রান্তের পিছনে কারা আছে সে তো আপনি ভালই জানেন।

এইসব চক্রান্ত ফাঁস করে দিন।

দেব। সময় আসুক।

সময় এসেছে, বুঝলেন! সময় এসে গেছে। ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডারে এখন প্রচণ্ড মবিলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে।

বটে? খবর পাইনি তো!

খবর আপনারা ঠিকই পান, কিন্তু সেগুলো চেপে দেন। আপনাকে আরও জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজির রেগুলার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। নেতাজি সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে চাইছেন না। কিন্তু হয়তো তাঁকে আসতেই হবে শেষ পর্যন্ত। আপনারাও জানেন যে নেতাজি বেঁচে আছেন, কিন্তু খবরটা ছাপেন না।

ধৃতি বিরক্ত হয় না। মুখ গম্ভীর করে বলে, তা অবশ্য ঠিক। সব খবর কি ছাপা যায়?

কিন্তু মুখোশ একদিন খুলে যাবেই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে।

ধৃতির সময় নেই। আবার নাইট শিফট। ঘড়ি দেখে সে উঠে পড়ে। ধৃতি আগে থাকত একটা মেসে। তার বন্ধু জয় নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনল বিস্তর টাকার ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমেই থোক ত্রিশ হাজার দিতে হয়েছিল, তারপর মাসে মাসে সাড়ে চারশো করে গুনে যেতে হচ্ছে। চাকরিটা জয় কিছু খারাপ করে না। সে বিলেতফেরত এঞ্জিনিয়ার, কলকাতার একটা এ-গ্রেড ফার্মে আছে। হাজার তিনেক টাকা পায়। কাট-ছাঁট করে আরও কিছু কম হাতে আসে।

জয়ের বয়স ধৃতির মতোই। বন্ধুত্বও খুব বেশি দিনের নয়। তৃতীয় এক বন্ধুর সূত্রে ওলিম্পিয়া রেস্টুরেন্টে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পরে খুব জমে যায়।

জয় একদিন এসে বলল, একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। একটা ঘর আছে, তুমি থাকবে?

একটু দোনা-মোনা করেছিল ধৃতি। মেসের মতো অগাধ স্বাধীনতা তো বাড়িতে পাবে না।

দ্বিধাটা বুঝে নিয়ে জয় বলল, আরে আমার হাউসহোল্ড কি আর পাঁচজনের মতো নাকি! ইউ উইল বি ফ্রি অ্যাজ লাইট অ্যান্ড এয়ার। মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই, একা বিয়ার করতে পারছি না। তুমি যদি শেয়ার করো তা হলে আমি বেঁচে যাই।

ওরা ব্যাচেলর সাবটেনান্ট খুঁজছে। ধৃতির চেয়ে ভাল লোক আর কাকে পাবে? ধৃতির আত্মীয়স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধবী নেই। ফলে হুটহাট লোকজন আসবে না।

ধৃতি রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে সে জয়ের একডালিয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে আছে। দু'তলায়

দক্ষিণ-পূর্বমুখী চমৎকার আস্তানা। সামনের দিকের বেডরুমটা ধৃতি নিয়েছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। খাওয়া-দাওয়া থাকলে ধৃতির বাঁধা নেমন্তন্ন থাকে। ধৃতি প্রতি মাসে দু'শো টাকা করে দেয়।

ধৃতি যখন ফিরল তখন প্রায় সাতটা বাজে। নাইট শিফট শুরু হবে ন'টায়। সময় আছে।

কলিং-বেল টিপতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। সামনের সিটিং-কাম-ডাইনিং হলের মাঝখানের বিশাল টানা পরদাটা সরানো। খাওয়ার টেবিলের ওপর প্লেটে পেঁয়াজ কুচি করছিল পরমা। আর আঁচলে চোখ মুছছিল।

পরমা দারুণ সুন্দরী। ইদানীং সামান্য কিছু বেশি মেদ জমে গেছে, নইলে সচরাচর এত সুন্দরী দেখাই যায় না। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে পরমা অত্যন্ত সচেতন। কখনও তাকে না-সাজা অবস্থায় ঘরেও দেখেনি ধৃতি। যখনই দেখে তখনই পরমার মুখে মৃদু বা অতিরিক্ত প্রসাধন, চোখে কাজল, ঠোঁটে কখনও হালকা কখনও গাঢ় লিপস্টিক, পরনে সব সময়ে ঝলমলে শাড়ি। তেইশ-চব্বিশের বেশি বয়স নয়।

ধৃতি শিস দিতে দিতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বলল, পরমা, কাঁদছ?

কাঁদব না? পেঁয়াজ কাটতে গেলে সবারই কান্না আসে।

আমার চিঠি-ফিটি কিছু এল শেষ ডাকে?

কে চিঠি দেবে বাবা! রোজ কেবল চিঠি!

চিঠি দেওয়ার লোক আছে।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, সে সব তো আজে-বাজে লোকের চিঠি। কে লেখা ছাপাতে চায়, কে খবর ছাপাতে চায়, কে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। ওসব কি চিঠি নাকি? আপনি প্রেমপত্র পান না কেন বলুন তো?

ধৃতি নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে, দেখো ভাই বন্ধুপত্নী, যাদের পারসোনালিটি থাকে তাদের সকলেই ভয় পায়। আমাকে প্রেমপত্র দিতে কোনও মেয়ে সাহস পায় না।

ইস্! বেশি বকবেন না। নিজে একটি ভিতুর ডিম! মেয়ে দেখলে তো খাটের তলায় লুকোন।

কবে লুকিয়েছি?

জানা আছে।

ঠোঁট ওলটালে পরমাকে বড় সুন্দর লাগে। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ধৃতি তাই স্থির চেয়ে থাকে একটু। মৃদু একটু মুগ্ধতার হাসি তার মুখে।

কোন মেয়ে না পুরুষের দৃষ্টির সরলার্থ করতে পারে! পরমা বরং তা আরও বেশি পারে। কেন না সুন্দরী বলে সে ছেলেবেলা থেকেই বহু পুরুষের নজর পেয়ে আসছে।

ধৃতি বলল, পরমা তোমার কেন একটা ছোট বোন নেই বলো তো?

থাকলে বিয়ে করতেন?

আহা, বিয়ের কথাটা ফস করে তোলা কেন? অন্তত প্রেমটা তো করা যেত।

প্রেম করতে কলজের জোর চাই সাংবাদিক মশাই। যত সস্তা ভাবছেন অত নয়।

বিয়ের আগে তুমি ক'টা প্রেম করেছ? কমিয়ে বোলো না, ঠিক করে বলো তো!

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, অনেক। কতবার তো বলেছি।

কোনওবারই সঠিক সংখ্যাটা বলোনি।

হিসেব নেই যে।

সেই সব রোমিওদের সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না?

একেবারে হয় না তা নয়।— বলে পরমা একটু চোখ পাকিয়ে মৃদু হাসে।

তাদের এখন অবস্থা কী?

প্রথম-প্রথম অক্সিজেন কোরামিন দিতে হত, এখন সব সেরে উঠছে।

ধৃতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, বাস্তবিক, একজন সুন্দরী মেয়ে যে কত পুরুষের সর্বনাশ করতে পারে!

পুরুষরা তো সর্বনাশই ভালবাসে।

শিস দিতে দিতে ধৃতি ঘরে ঢোকে। পরমা বাইরে থেকে বলে, চা চাই নাকি?

দেবে?

খেলে দেব না কেন? আহা, কী কথা!

দাও তা হলে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট-ফিস্কুট দিয়ো না আবার। আমি নেকেড চা ভালবাসি।

পরমা অত্যন্ত দুষ্টু একটা জবাব দিল, অত নেকেড ভালবাসতে হবে না।

ঘরে একা ধৃতি একটু হাসল।

তার ঘরটা অগোছালো বটে কিন্তু দামি জিনিসের অভাব নেই। একটা স্টিলের হাফ-সেকরেটারিয়েট টেবিল জানলার পাশে, টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ার, তার সিঙ্গল খাটে ফোম রবারের তোষক। মহার্ঘ্য বুককেস। একটা চারহাজারি স্টিরিয়ো গ্রামোফোন, একটা ছোট্ট জাপানি রেডিয়ো। যা রোজগার তার সবটাই কেবলমাত্র নিজের জন্য খরচ করতে পারে সে।

নিকট-আত্মীয় বলতে এক দাদা আর দিদি আছে তার। দাদা বেনারসে রেলের বুকিং ক্লার্ক। দিদি স্বামী-পুত্র নিয়ে দিল্লি প্রবাসিনী। সারা বছর ভাই-বোনে কোনও যোগাযোগ নেই। বিজয়া বা নববর্ষে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড আসে, একটা যায়। তাও সব বছর নয়। আত্মীয়তার বন্ধন বা দায় নেই বলে ধৃতির খারাপ লাগে না। বেশ আছে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, যেবার সে অফিসের কাজে দিল্লি যায়। দিদির বাড়িতে ওঠেনি, অফিস হোটেল-খরচ দিয়েছিল। দেখা হয়েছিল এক বেলার জন্য। ধৃতি দেখেছিল দিদি নিজের সংসারের সঙ্গে কী গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। ভাই বলে ধৃতিকে আদরের ত্রুটি করেনি, তবু ধৃতির নিজেকে পর মনে হয়েছিল। দাদা অবশ্য সে তুলনায় আরও পর। দিদি সেবার একটা দামি প্যান্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, ভাইয়ের হাত ধরে বিদায়ের সময়ে কেঁদেও ফেলে। কিন্তু দাদা সেরকম নয়। বছরখানেক আগে বেনারসে দাদার ছেলের পৈতে উপলক্ষ্যে গিয়ে ধৃতি প্রথম বুঝতে পারে যে না এলেই ভাল হত। দাদা তার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেনি, আর বউদি নানাভাবে তাকে শুনিয়েছে তোমার দাদার একার হাতে সংসার, কেউ তো আর সাহায্য করার নেই। খোঁজই নেয় না কেউ। এসব খোঁটা দেওয়া ধৃতির ভাল লাগে না। সে নিজে একসময়ে দাদার পয়সায় খেয়েছে পরেছে ঠিকই, কিন্তু বউদি যখন বলল, তোমার দাদা তো সকলের জন্যই করেছে, এখন তার জন্য কেউ যদি না করে তবে তো বলতেই হয় মানুষ অকৃতজ্ঞ, তখন ধৃতির ভারী ঘেন্না ধরে ভিখিরিপনা দেখে। কলকাতায় এসে সে দু'মাসে হাজারখানেক টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়।

পরমা নিজেই চা নিয়ে আসে। ধৃতি লক্ষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমা শাড়ি পালটেছে। কতবার যে দিনের মধ্যে শাড়ি পালটায় পরমা।

ধৃতি বিছানায় চিতপাত হয়ে পড়েছিল। পরমা বিছানার ওপর এক টুকরো পিসবোর্ডে চায়ের কাপ রেখে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বলল, আজ নাইট শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

জয়কে খুব ধসাচ্ছ ভাই বন্ধুপত্নী।

আহা, সিনেমায় গেলে বুঝি ধসানো হয়?

শুধু সিনেমা? ফি হপ্তায় যে শাড়ি কিনছ। টি ভি কেনার বায়না ধরেছ। সব জানি। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলেও খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে প্রায়ই। পরমা তার প্রিয় মুদ্রাদোষে ঠোঁট উলটে বলে, আমরা তো আর আপনার মতো রসকষহীন হাড়কঞ্জুস নই।

আমি কঞ্জুস?

নয় তো কী? খরচের ভয়ে তো বিয়েই করছেন না। পাছে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে কি হোটেলে খাওয়াতে হয় সেই ভয়েই বোধহয় প্রেমেও অরুচি হচ্ছে।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে চায়ে চুমুক মেরে ধৃতি বলল, তোমাদের বিবাহিতদের যা কাণ্ড-কারখানা দেখছি এরপর আহাম্মক ছাড়া কে বিয়ে করতে যায়?

মারব থাপ্পড়, কী কাণ্ড দেখলেন শুনি?

রোজ তো তোমাদের দু'জনে খটামটি লেগে যায়।

আহা, সে হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ই। তা ছাড়া ওসব ছাড়া প্রেম জমে নাকি? একঘেয়ে হয়ে যায়।

যা-ই বলো ভাই, জয়টার জন্য আমার কষ্ট হয়।

পরমা থমথমে মুখ করে বলে, বললেন তো? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। একটা চিঠি এসেছে আপনার। নীল খামে। কিছুতেই সেটা দেব না।

মাইরি?— বলে ধৃতি উঠতে চেষ্টা করে।

পরমা লঘু পায়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। ধৃতি একটু উঠতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ওঠে না। চা খেতে থাকে আস্তে আস্তে।

হলঘরে জয়ের গলা পাওয়া যায়, ওঃ, যা একখানা কাণ্ড হয়ে গেল আজ। এই পরমা, শোনো না!

পরমা কোনওদিনই জয়ের ডাকে সাড়া দেয় না। স্বামীরা আজকালকার মেয়েদের কাছে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। পরমা কোনও জবাব দিল না।

এই পরমা!— জয় ডাকে।

ভারী বিরক্তির গলায় পরমা বলে, অত চেঁচাচ্ছ কেন বলো তো! এখন যেতে পারছি না।

ডোন্ট শো মি বিজিনেস। কাম হিয়ার। গিভ মি এ—

আঃ! কী যে কোরো। দাঁড়াও, ধৃতিকে ডাকছি, এসে দেখে যাক।

ওঃ, ধৃতি দেখে কী করবে? হি ইজ ভারচুয়ালি সেক্সলেস। ওর কোনও রি-অ্যাকশন নেই।

পরমা চেঁচিয়ে ডাকল, ধৃতিবাবু! এই ধৃতি রায়!

ধৃতি শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ স্বরে ঘর থেকেই জবাব দেয়, ভাই, তোমাদের বসন্ত-উৎসবে আমাকে ডেকো না। আমি কোকিল নই, কাক।

পরমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলে, একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করা পুরুষের কর্তব্য। আপনাদের শিভালরি কোথায় গেল বলুন তো?

অগাধ জলে। পরমা, আমাদের সব ভেসে গেছে। নারী প্রগতির এই যুগে পুরুষ নাসবন্দি অপদার্থ মাত্র।

পরদার ওপাশে ঝটাপটির শব্দ হয়। আসলে ওটা জয়ের প্রেম নয়, টিকলিং। ধৃতি নির্বিকার ভাবে ধোঁয়ার রিং করার চেষ্টা করতে থাকে শুয়ে শুয়ে। সে জানে জয় সুব্রতর বোনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করেছে সম্প্রতি। জানে বলে ধৃতির এক ধরনের নির্বিকার ভাব আসে। একটু বাদে জয় ঘরে এল। তার পরনে পাজামা, কাঁধে তোয়ালে। হাতে এক গ্লাস ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এসে চেয়ারে বসে বলল, দিন দিন ডামি হয়ে যাচ্ছি মাইরি।

মানে?

মানে আর কী? কোথাও আমার কোনও ওপিনিয়ন অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে না। না ঘরে, না বাইরে। কোম্পানি আগ্রার কাছে তাদের প্রোডাকশন তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে যেতে হবে সাইট আর আদার ফেসিলিটিজ দেখতে। এ নিয়ে আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দু' ঘণ্টা মুখের ফেকো তুলে

বকলাম। কী মাল মাইরি! আসানসোলে কারখানা খোলবার লেটার অফ ইনডেন্ট পেয়ে গেছে, তবু সেখানে করবে না, আগ্রায় যাবে। হেডস্ট্রং যাকে বলে।

কবে যাচ্ছিস?

ঠিক নেই এখনও। মে বি নেক্সট মান্থ, মে বি নেক্সট উইক, ইভন টুমোরো।

ঘুরে আয়। সেকেন্ড হানিমুন হয়ে যাবে।

আর হানিমুন! ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে লালবাতি জ্বলছে। এই ফ্ল্যাটটা না বেচে দিতে হয়। আজকাল যে যত বড় চাকরি করে তার তত মানিটারি ওবলিগেশন। হ্যাঁ রে, তোরা ট্যাকসেশন নিয়ে কি কিছুই লিখবি না? খোদ অ্যামেরিকায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের বেশি ট্যাকসেশন নেই। আর এই ভুখা দেশে কেন এরকম আনহাইজনিক ট্যাকসেশন।

কে জানে!

এটা নিয়ে কিন্তু লেখা দরকার। একটা তিন হাজারি মাস মাইনের লোক আজকাল পুরো প্রলেটারিয়েট। আর ওদিকে যত ট্যাক্স রেট বাড়ছে তত বাড়ছে ট্যাক্স ক্রাইম আর হ্যাজার্ডস।

ধৃতি চিত থেকে উপুড় হয়ে বলল, তুই তো এই ফ্ল্যাটটা তোর কোম্পানিকে লিজ দিয়েছিস। তারাই তো ভাড়া গুনছে।

না করে কী করব? টাকা আসবে কোত্থেকে? আমার একমাত্র ট্যাক্স-ফ্রি ইনকাম কোনটা জানিস? তোর দেওয়া মাসে মাসে দুশো টাকা।

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই বড় চাকুরেরা আজকাল সুখে নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ, ঠান্ডা জল খেল।

ধৃতি বলল, তোর বউ আমার একটা চিঠি চুরি করেছে। মেয়েদের নিন্দে করেছিলাম বলে পানিশমেন্ট।

নিন্দে করেছিস? সর্বনাশ! সে তো সাপের লেজে পা।

ওপাশের হলঘর থেকে পরমা চেঁচিয়ে বলে, খবরদার সাপের সঙ্গে তুলনা দেবে না বলে দিচ্ছি। আমরা কি সাপ?

সাপ কি খারাপ?— জয় প্রশ্ন করে উঁচু স্বরে।

পরমা ঘরে ঢুকে আসে। হাতে এক কোষ জল। সেটা সজোরে জয়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সাপ ভাল কি না নিজে জানো না?

ধৃতি বালিশে মুখ গুঁজে বলে, আচ্ছা বাবা, আমিই না হয় সাপ। জয় ভেড়া, আর পরমা সিংহী।

সিংহী না হাতি। পরমার সরোষ উত্তর।

তবে হাতিই। দ্যাট ইজ ফাইনাল।— ধৃতি বলে।

জয় হেসে বলে, হাতি বলছে কেন জানো তো! তোমার যে একটু ফ্যাট হয়েছে তাইতেই ওর চোখ টাটায়। ওর গায়ে এক মগ জল ঢেলে দাও।

পরমা 'ঠিক বলেছ' বলে দৌড়ে গেল জল আনতে।

জয় এক প্যাকেট আবদাল্লা সিগারেট ধৃতির বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বলল, এটা তোর জন্য। রাখ।

ধৃতি পরম আলস্যে পাশ ফিরে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে, কোথায় পেলি? ফরেনের মাল দেখছি।

অফিসে একজন ক্লায়েন্ট চার প্যাকেট প্রেজেন্ট করে গেল। সদ্য ফরেন থেকে এসেছে।

ধৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানে।

জয় বলে, একটু গার্ড নে, পরমা বোধহয় সত্যিই জল আনছে।

মাইরি!— বলে ধৃতি লাফিয়ে ওঠে।

পরমা একটা লাল প্লাস্টিকের মগ হাতে ঘরে ঢুকেই ছুটে আসে। ধৃতি জাপানি ছাতাটা খুলে সামনে ধরতেই পরমা হেসে উঠে বলে, আহা, কী বুদ্ধি!

বলতে বলতে পরমা মগ থেকে জল হাতের আঁজলায় তুলে ওপর বাগে ছিটিয়ে দেয়, নানা কায়দায় ধৃতি ছাতা এদিক ওদিক করে জল আটকাতে আটকাতে বলে, আমি কী করেছি বলো তো?

হাতি বললেন কেন?

মোটেই বলিনি। তুমি বলেছ।

ইস্! আপনিই বলেছেন।

মাপ চাইছি।

কান ধরুন।

ধৃতি ছাতা ফেলে কান ধরে দাঁড়ায়।

পরমা মগ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, মেয়েদের সম্মান করতে কবে যে শিখবেন আপনারা!

কেন, খুব সম্মান করি তো।

করলে জাতটা উদ্ধার পেয়ে যেত।

জয় মৃদু হাসছিল। বলল, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না পরমা। ধৃতি এক নম্বরের উওম্যান-হেটার! নারী প্রগতির বিরোধী। আড়ালে ও মেয়েদের নামে যা তা বলে। ও যদি কখনও প্রাইম মিনিস্টার হয় তবে নাকি স্লোগান দেবে, মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও।

বটে?— পরমা চোখ বড় করে তাকায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, মাইরি না। আমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতেও যাই।

পরমা শ্বাস ফেলে বলে, আমি অবশ্য মেয়েদেব ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না। কিন্তু মেয়েদের লিবার্টিকে সাপোর্ট করি।

তোমরা তো ভাই লিবারেটেড। কেউ আজকাল মেয়েদের বাঁধে না। ছাড়া মেয়েরা কেমন চারদিকে পাখি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ফের? ছাড়া মেয়ে মানে?

মানে যারা লিবারেটেড!

সন্দেহের চোখে চেয়ে পরমা বলে, ব্যাড সেনসে বলছেন না তো?

আরে না।

জয় বলে, ব্যাড সেনসেই বলছে। ওকে ছেড়ো না।

পরমা জয়ের দিকে চেয়ে বলে, তুমি ফুট কাটছ কেন বলো তো?

আমাকে খেপিয়ে দিয়ে বিনি পয়সায় মজা দেখতে চাইছ?

ধৃতি কথাটা লুফে নিয়ে বলে, একজ্যাক্টলি। এবার জয়কেও একটু শাসন করো পরমা, বর বলে অতটা খাতির কোরো না।

কে খাতির করছে?— বলে ধৃতিকে একটা ধমক দিয়ে পরমা জয়কে বলে, আমি জোকার নাকি?

জয় খুব বিষণ্ণ হয়ে বলে, যার জন্য করি ভাল সে-ই বলে চোর!

থাক, আর সাধু সাজতে হবে না।

তুমি নারীরত্ন।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, ডিকশনারি কিংবা বঙ্কিমের বই খুললেই ওসব শব্দ জানা যায়। কমপ্লিমেন্ট দিতেও পারো না বুদ্ধু কোথাকার!

তোমার দিকে চাইলে আমার যে কথা হারিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে পড়ি।

খুব সন্তর্পণে ধৃতি বলল, পরমা সুন্দরী।
পরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এটা আবার কবে থেকে?
এইমাত্র মনে এল। ভাল না?
ভেবে দেখি।
বলছিলাম পরমা সুন্দরী, আজকের ডাকে আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?
এসেছে, কিন্তু দেব না।
না না, চাইছি না, এলেই হল। আমার যে চিঠি আসছে তার মানে হল এখনও লোকে আমাকে ভুলে যাচ্ছে না, আমি যে বেঁচে আছি তা এখনও কিছু লোক জানে, আর কষ্ট করে যে চিঠি লিখছে তার অর্থ হল আমার মতো অপদার্থকেও লোকের কিছু জানানোর আছে, বুঝলে? চিঠি আসাটাই ইম্পর্ট্যান্ট। চিঠিটা নয়।
ওঃ, খুব ফিলজফার! আচ্ছা দেব না চিঠি!
চাইনি তো। চাইছিও না।— ধৃতি বলে।
চাইছে না আবার! ভিতরে ভিতরে ছটফটাচ্ছে! কে চিঠি দিয়েছে বলুন তো? মেয়েলি হাতের লেখা আমি ঠিক চিনি।
হয়তো দিদি।— ধৃতি বলে।
না, দিদি নয়, খামের বাঁ দিকে চিঠি যে দিয়েছে তার নাম-ঠিকানা আছে।
তাই বলো!— ধৃতি একগাল হেসে বলে, আমি ভাবছি, পরমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল যে হাতের লেখা দেখে মেয়ে না ছেলে বুঝে ফেলবে!
শুনলে পরমা?— জয় ফের খোঁচায়।
পরমা বলে, আমি কালা নই।
তোমাকে বোকা বলছে।
বোকা নয়।— ধৃতি বলে, আমি বলতে চাইছি পরমা কুটিল নয়, পরমা সরল ও নিষ্পাপ।
হয়েছে! এই নিন চিঠি। আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।
বিছানার ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে পরমা চলে যায়।
ধৃতি ঘড়ি দেখে। সময় আছে। চিঠিটা নিয়ে বিছানায় ফের চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।
খামের ওপর বাঁ-ধারে লেখা, টুম্পা চৌধুরী। নামের নীচে মধ্য কলকাতার ঠিকানা।
ধৃতি টুম্পা নামে কাউকে মনে করতে পারল না। চিঠি বেশি বড়ও নয়। খুলে দেখল কয়েক ছত্র লেখা— শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার দাদা আপনার সঙ্গে পড়ত। দাদার নাম অশোক চৌধুরী। মনে আছে? একটা দরকারে এই চিঠি লিখছি। আমি একটা ডেফিসিট গ্র্যান্টের স্কুলে কাজ করি। আমাদের বিল্ডিং-এর জন্য একটা গ্র্যান্ট দরকার। আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু ধরা-করা ছাড়া তো এসব হয় না। আপনার সঙ্গে তো মিনিস্টারের জানাশোনা আছে। আমি সামনের সপ্তাহে আপনার অফিসে বা বাসায় গিয়ে দেখা করব। প্রণাম জানবেন।—টুম্পা চৌধুরী।
টুম্পা মেয়েটা দেখতে কেমন হবে তা ভাবতে ভাবতে ধৃতি উঠে পোশাক পরতে থাকে। জয় চেয়ারে বসে থেকে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে।
ধৃতি মেয়েদের অপছন্দ করে না। তবে কিনা তার কিছু বাছাবাছি আছে। মেয়ে মাত্রই তাকে আকর্ষণ করে না। এই যেমন পরমা। এত অসহনীয় সুন্দরী, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব-সাব তবু পরমার প্রতি কখনও দুর্বলতা বোধ করে না ধৃতি। অর্থাৎ পরমার চেহারা বা স্বভাবে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা ধৃতির কাছে ওকে কাম্য করে তোলেনি।
এসব বলার মতো কথা নয়। শুধু মনের মধ্যেই এসব কথা চিরকাল থেকে যায়। পরমা বন্ধুপত্নী এবং পরস্ত্রী। কাজেই কোনও রকমেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হল বাইরের সামাজিক ব্যাপার! মানুষের

মনের মধ্যে তো সমাজ নেই। সেখানে যে রাষ্ট্রের শাসন সেখানে নীতি নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই, আছে কেবল মোটা দাগের কামনা, বাসনা, লোভ, ভয়।

২

টুপুর ছবি দেখলেন? কেমন? সুন্দরী নয়? টুপু ছিল মিস এলাহাবাদ। টুপুর কথা আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।

বিশাল চিঠি। তাতে টুপুর খুন হওয়ার নানা সম্ভব ও অসম্ভব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। টুপু ছিল নিষ্পাপ, পবিত্র, স্বর্গীয় একটি মেয়ে।

চিঠিটা রেখে ধৃতি বরং ফোটোটাই দেখে। মিথ্যে নয় যে মেয়েটি সুন্দরী। এবং মিস এলাহাবাদ হলেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। লম্বাটে ছাঁদের মুখ, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে কথা ফুটে আছে। কী অসম্ভব সুন্দর টসটসে ঠোঁট দু'খানা! অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাশ থেকে অমিত উঁকি দিয়ে বলে, আরে! কার ছবি দেখছেন? দেখি দেখি!

ধৃতি ছবিটা অমিতের হাতে দিয়ে বলে, পাত্রীর মা ছবিটা পাঠিয়েছে।

বেশ দেখতে। একে বিয়ে করুন।

ধৃতি হেসে চলে, বিয়ে করা শক্ত।

কেন?

মেয়েটা এখন অনেক দূরে। সেখানে জ্যান্ত যাওয়া যায় না।

মরে গেছে?

তাই তো জানিয়েছে।

তবে যে বললেন পাত্রী!

পাত্রী মানে কি বিয়ের পাত্রী? পাত্রীর অর্থ এখানে একটি ঘটনার পাত্রী। মেয়েটা খুন হয়েছে।

ওঃ! দেখতে ভারী ভাল ছিল মেয়েটা!

ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু পাস্ট টেনস।

আপনাকে ছবি পাঠিয়েছে কেন?

কত পাগল আছে।

নিউজ এডিটর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থমকে ধৃতির সামনে ঘুরে এসে বললেন, এ সপ্তাহে আপনার ইভনিং শিফট চলছে তো?

হ্যাঁ।

কালকের মধ্যে একটা ফিচার লিখে দিতে পারবেন?

কী নিয়ে?

ম্যারেজ ল অ্যামেন্ডমেন্ট।

লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে?

আরে না, না। তাহলে আপনাকে বলা হত না। আপনি শুধু সোস্যাল ইমপ্যাক্টটার ওপর লিখবেন। কিন্তু কাল চাই।

ধৃতি মাথা নাড়ল।

এখন ইমারজেনসি চলছে। খবরের ওপর কড়া সেনসর। বস্তুত দেওয়ার মতো কোনও খবর নেই। তাই এত ফিচারের তাগিদ। টেলিপ্রিন্টারে যাও বা খবর আসে তার অর্ধেক যায় সেনসরে। ট্রেনে ডাকাতি হওয়ার খবরটাও নিজের ইচ্ছেয় ছাপা যায় না।

ধৃতি উঠে লাইব্রেরিতে চলে আসে। লাইব্রেরিয়ান অতি সুপুরুষ জয়ন্ত সেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে, দেখলে ত্রিশও মনে হয় না। চমৎকার গোছানো মানুষ। লাইব্রেরিটা ঝকঝক তকতক করছে।

জয়ন্ত গম্ভীর মানুষ, চট করে কথা বলেন না, একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে একটা মস্ত পুরনো বই দেখতে থাকেন।

ধৃতি উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে, দাদা, ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট ল নিয়ে লিখতে হবে।

জয়ন্ত এবার মৃদু একটু হাসলেন। বই থেকে মুখ তুলে বললেন, ফিচার?

হ্যাঁ।

জয়ন্ত মস্ত টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলেন, হাতটা দেখি।

জয়ন্তর ওই এক বাতিক। হাত দেখা আর কোষ্ঠী বিচার। গত শীতে কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোর টেস্ট ম্যাচের ফলাফল আশ্চর্যজনক নিখুঁত বলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা দারুণ কথা বলে দেন। রিপোর্টার সুশীল সান্যালকে গত বছর জুন মাসে হঠাৎ একদিন ডেকে বললেন, কিছু টাকা-পয়সা হাতে রাখো। তোমার দরকার হবে। আর এই হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছ, ফুর্তি লুটছ, তাও কিছুদিন বন্ধ। চুপটি করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক তাই হয়েছিল। সুশীলবাবুর পেটে টিউমার ধরা পড়ল পরের মাসে। অপারেশনের পর পাক্কা তিন মাস বিছানায় শোওয়া। টাকা গেল জলের মতো। জয়ন্ত সেনকে তাই সবাই কিছু খাতির করে। এমনিতে মানুষটি বেশি কথা বলেন না বটে কিন্তু বাতিক চাড়া দিলে অ্যাসট্রোলজি নিয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধৃতির হাতটা দেখে তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, কোষ্ঠী আছে?

ছিল। এখন নেই।

হারিয়ে ফেলেছেন?

আমার কিছু থাকে না। আমি হলাম নাগা সাধু। ভূত-ভবিষ্যৎও নেই।

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, হাতের রেখা তো তা বলছে না।

কী বলছে তবে?

ভূত ছিল, ভবিষ্যৎও আছে।

ধৃতি একটু নড়ে বসে বলে, কী রকম?

জয়ন্ত হাতটা ছেড়ে নির্বিকার ভাবে বললেন, দুম করে কি বলা যায়! তবে খুব ইন্টারেস্টিং হাত।

ধৃতি কায়দাটা বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাতটা দেখে একটু রহস্য জাগানো কথা বলেই যে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন ওর পিছনে ছোট একটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। ধৃতি যে হাত দেখায় বিশ্বাসী নয় তা বুঝে তিনি ওই চাল দিলেন। দেখতে চাইছেন এবার ধৃতি নিজেই আগ্রহ দেখায় কি না।

ধৃতি আগ্রহ দেখায় না। আবার বলে, কিন্তু আমার ল-এর কি হবে?

হবে। আমার কাছে কাটিং আছে।— বলে জয়ন্ত আবার মৃদু হেসে যোগ করলেন, কেবল আমার কাছেই সব থাকে।

সেটা জানি বলেই তো আসা।

কলিং-বেলে বেয়ারা ডেকে কাটিং বের করে দিতে বললেন জয়ন্ত।

রিডিং-এর ফাঁকা টেবিলে বসে বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং থেকে ধৃতি অ্যামেন্ডমেন্ট ল সম্পর্কে তথ্য টুকে নিচ্ছিল প্যাডে। এসব অবশ্য খুব কাজে লাগবে না। তাকে ঘুরে ঘুরে কিছু মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার না হলে ব্যাপারটা সুপাঠ্য হবে না। আইন শুকনো জিনিস, কিন্তু মানুষ কেবল আইন মানা জীব নয়।

নতুন সংশোধিত আইনে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ভারী সহজলভ্য। মামলা করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেপারেশন পাওয়া যাবে। আগে আইন ছিল, ডিভোর্সের পর কেউ এক বছর বিয়ে করতে পারবে না, নতুন আইনে সে সময় কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভাল না মন্দ তা ধৃতি জানে না। ডিভোর্স সহজলভ্য হলে কী হয় তা সে বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে ডিভোর্সের কথা মনে রেখে কেউ বিয়ে করে না।

জয়ন্ত উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন। টেবিলের সামনে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বললেন, পেয়েছেন সবকিছু?

ধৃতি মুখ তুলে হেসে বললে, এভরিথিং।

চলুন চা খেয়ে আসি। ফিরে এসে লিখবেন।

ধৃতি উঠে পড়ে। শিফটে এখনও কাজ তেমন শুরু হয়নি। সন্ধের আগে বড় খবর তেমন কিছু আসে না। তাছাড়া খবরও নেই। প্রতিদিনই ব্যানার করবার মতো খবরের অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। আজ কোনটা লিড হেডিং হবে সেটা প্রতিদিন মাথা ঘামিয়ে বের করতে হয়। সারাদিন টেলিপ্রিন্টার আর টেলেক্স বর্ণহীন গন্ধহীন জোলো খবরের রাশি উগরে দিচ্ছে। কাজেই খবর লিখবার জন্য এক্ষুনি তাকে ডেস্কে যেতে হবে না।

ধৃতি ক্যান্টিনের দিকে জয়ন্তর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, আপনি মানুষের মুখ দেখে কিছু বলতে পারেন?

জয়ন্ত বলেন, মুখ দেখে অনেকে বলে শুনেছি। আমি তেমন কিছু পারি না। তবে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে না পারলেও ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু বলা যায়।

ফোটো দেখে বলতে পারেন?

ফোটো প্রাণহীন বস্তু, তবু তা থেকেও আন্দাজ করা সম্ভব। কেন বলুন তো?

ক্যান্টিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসার পর ধৃতি হঠাৎ খুব কিছু না ভেবে-চিন্তে টুপুর ফোটোটা বের করে জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে, বলুন তো কেমন মেয়ে?

জয়ন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে ফোটোটা হাতে নিয়ে বলেন, তাই বলুন। এতদিনে তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছে! তবে ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যাপার হলে ফোটোর চেয়ে কোষ্ঠী অনেক সেফ। মেয়েটার কোষ্ঠী নেই?

ধৃতি ঠোঁট উলটে বলে, মেয়েটিই নেই।

সে কী!— বলে জয়ন্ত ছবিটা আর একবার দেখে ধৃতির দিকে তাকিয়ে বলেন, তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে কী হবে? মারা গেছে কবে?

তা জানি না। তবে বলতে পারি খুন হয়েছে।

খুন! ও বাবাঃ, পুলিশ কেস তাহলে!— বলে জয়ন্ত ছবিটা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে বললেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই।

আছে!— ধৃতি বলে, ধরুন, মেয়েটার চরিত্রে এমন কী আছে যাতে খুন হতে পারে, তা ছবি থেকে আন্দাজ করা যায় না?

জয়ন্ত গম্ভীর চোখে চেয়ে বলেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

কেউ না।

পরিচিতা তো। প্রেম-ট্রেম ছিল নাকি?

আরে না দাদা, চিনতামই না।

তবে অত ইন্টারেস্ট কেন? পুলিশ যা করবার করবে।

পুলিশ তার কাজ করবে। আমার ইন্টারেস্ট মেয়েটির জন্য নয়।

তবে?

অ্যাসট্রোলজির জন্য।

ছবিটা আবার নিয়ে জয়ন্ত তাঁর প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পকেট থেকে বের করে চোখে আঁটলেন। তাতেও হল না। একটা খুদে আতস কাচ বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ছবিটা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল। প্রায় আট-দশ মিনিট বাদে জয়ন্ত আতস কাচ আর চশমা রেখে ছবিটা দু' আঙুলে ধরে নাড়তে নাড়তে চিন্তিত মুখে প্রশ্নটা করলেন, মেয়েটা খুন হয়েছে কে বলল?

ওর মা!

তিনি আপনার কে হন?

কেউ না। চিনিই না। একটা ফোন-কলে প্রথম খবর পাই। আজ একটা চিঠিও এসেছে। দেখুন না।— বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দেয়।

জয়ন্ত খুব আলগা ভাবে চিঠিটা পড়লেন না। পড়লেন খুব মন দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট চলে গেল।

তারপর মুখ তুলে বললেন, আমি মুখ দেখে তেমন কিছু বলতে পারি না বটে, কিন্তু আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে মেয়েটা মরেনি।

বলেন কী?

জয়ন্ত আবার চা আনালেন। গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করে বললেন, আপনি জ্যোতিষবিদ্যা মানেন না?

না। মানে, তেমন মানি না।

বুঝেছি। কিন্তু মানেন না কেন? যেহেতু সেকেন্ডহ্যান্ড নলেজ তাই না?

তাই।

তবে আপনাকে যুক্তিবাদী বলতে হয়। না?

হ্যাঁ।

কিন্তু আসলে আপনি যুক্তিবাদী নন, আপনার মনন বৈজ্ঞানিক সুলভ নয়।

কেন?

একটা ফোন-কল, একটা চিঠি আর একটা ফোটো— মাত্র এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে আপনি কী করে বিশ্বাস করছেন যে মেয়েটা খুন হয়েছে?

তবে কি হয়নি?

না। আমার মন বলছে শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ।

কী করে বললেন?

বলছি তো আমার ধারণা।

কোনও লজিক্যাল বেস নেই ধারণাটার?

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললেন, আপনি আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েটা যে মরে গেছে, আপনার সে ধারণাটারও তো কোনও লজিক্যাল বেস নেই। আপনাকে একজন জানিয়েছে যে টুপু মারা গেছে বা খুন হয়েছে। আপনি সেটাই ধ্রুব বলে বিশ্বাস করছেন।

জয়ন্ত সেন ছবিটার দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মনে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, খুব সেনসিটিভ, অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল, মনের শক্তি বেশ কম, অন্যের দ্বারা চালিত হতে ভালবাসে।

কে?— ধৃতি চমকে প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে, আপনার টুপু সুন্দরী।

আমার হতে যাবে কেন?

দেখি আপনার হাতটা আর একটু!— বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ধৃতির ডান হাতটা টেনে নিলেন।

ফোটোগ্রাফার সৌরীন এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি খেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে টেবিলের ধারে এসে বলে, আমার হাতটা দেখবেন না জয়ন্তদা?

পরে।— জয়ন্তর গম্ভীর উত্তর।

অনেকদিন ধরে ঝোলাচ্ছেন। ধৃতিবাবু, কী খবর?

ভাল।

সৌরীন হঠাৎ ঝুঁকে ছবিটা দেখে বলে, বাঃ, দারুণ ছবিটা তুলেছে তো! ফোটোগ্রাফার কে?

ধৃতি হাসল। সৌরীন পেশাদার ফোটোগ্রাফার, তাই মেয়েটার চেয়ে ফোটোর সৌন্দর্যই তার কাছে বেশি গুরুতর।

ধৃতি বলে, মেয়েটা কেমন?

ভাল।— সৌরীন বলে, তবে ফ্রন্ট ফেস যতটা ভাল প্রোফাইল ততটা ভাল কি না কে জানে! মেয়েটা কে?

চিনবেন না।— ধৃতি বলল।

সৌরীন চলে গেলে জয়ন্ত ধৃতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, হুঁ।

হুঁ মানে?

মানে অনেক ব্যাপার আছে। আপনার বয়স এখন কত?

উনত্রিশ বোধহয়। কম বেশি হতে পারে।

একটা ট্র্যানজিশন আসছে।

কী রকম?

তা হুট করে বলি কেমন করে?

কবে?

শিগগিরই।

ধৃতি অবশ্য এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। সারা জীবনে সে কখনও ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। যা কিছু হয়েছে বা করেছে সে, তা সবই নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

ধৃতি বলল, খারাপ নয় তো?

হয়তো খারাপ। হয়তো ভাল।

ধৃতি হাসল। বলল, এবার আসুন ডিম খাই। আমি খাওয়াচ্ছি।

দু'জনে ওমলেট খেতে লাগল। খেতে খেতে ধৃতি বলে, জয়ন্তদা, আপনি টুপুর কেসটা যত সিরিয়াসলি দেখছেন ততটা কিছু নয়।

তাই নাকি?— নিস্পৃহ জবাব জয়ন্তর।

ওর মা চাইছে খবরটা কাগজে বেরোক।

খবরদার বের করবেন না।

আরে মশাই, আমি ইচ্ছে করলেই কি বের করতে পারব নাকি? কাগজ তো আমার ইচ্ছেয় হাবিজাবি খবর ছাপাবে না।

তা হলেও আপনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেবেন না। মেয়েটার মা ফোনে আপনাকে কী বলেছিল?

এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল করেছিল। রাত তখন দুটো-আড়াইটে। শুধু বলছিল টুপুকে খুন করা হয়েছে, আপনি খবরটা ছাপবেন।

চিঠিটা কবে এল?

আজ।

দেখি।— বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিঠি ফেরত দিয়ে জয়ন্ত হেসে বললেন, আপনি মশাই দিনকানা লোক।

কেন?

চিঠিটা ভাল করে দেখেছেন?

দেখেছি তো।

কিছুই দেখেননি। চিঠির ওপর এলাহাবাদের ডেটলাইন। কিন্তু খামের ওপর কলকাতা উনত্রিশ ডাকঘরের শিলমোহর, সেটা লক্ষ করেছেন?

ধৃতি একটা চমক খেয়ে তাড়াতাড়ি খামটা দেখে। খুবই স্পষ্ট ছাপ। ভুল নেই।

ধৃতি বলে, তাই তো!

জয়ন্ত বলেন, এবার টেলিফোনটার কথা বলুন তো।

সেটা এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককলই ছিল।

কী করে বুঝলেন?

অপারেটার বলল যে।

অপারেটারের গলা আপনি চেনেন?

না।

তবে?

তবে কী?

অপারেটার সেজে যে-কেউ ফোনে বলতে পারে এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককলে আপনাকে ডাকা হচ্ছে। অফিসের অপারেটারও সেটা ধরতে পারবে না।

সেটা ঠিক।

আমার সন্দেহ সেই ফোন-কলটা কলকাতা থেকেই এসেছিল।

ধৃতি হঠাৎ হেসে উঠে বলে, কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছিল বলছেন?

জোক কি না জানি না, তবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ। আপনি তো ভোঁতা মানুষ নন, তবে মিসলেড হলেন কী করে? এবার থেকে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলবেন।

ধৃতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ফের।

৩

ধৃতি মদের ভক্ত নয়। কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদ খেলেই তার নানারকম শারীরিক অসুবিধে হতে থাকে। কখনও আধকপালে মাথা ধরা, কখনও পেটে প্রচণ্ড গ্যাস জমে, কখনও দমফোট হয়ে হাঁসফাঁস লাগে। কাজেই পারতপক্ষে সে মদ ছোঁয় না।

অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে কেটে পড়ার তালে ছিল সে। ছ'টায় ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে গ্যারি কুপারের একটা ফিল্ম দেখাবে। ধৃতি কার্ড পায়। প্রায়ই ছবি দেখা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ ছবিটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার।

আজ চিফ সাব-এডিটার তারাপদবাবু কাজে বসেছেন। বয়স্ক লোক এবং প্রচণ্ড কাজপাগল। কোন খবরের কতটা ওজন তা তাঁর মতো কেউ বোঝে না।

ধৃতি গিয়ে বলল, তারাপদদা, আজ একটু আগে আগে চলে যাব।

যাবে?— বলে তারাপদবাবু মুখ তুলে একটু হেসে ফের বললেন, তোমার আর কী? কর্তারা ফিচার লেখাচ্ছেন তোমাকে দিয়ে। তুমি হলে যাকে বলে ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

এটা অবশ্য ঠেস-দেওয়া কথা। কিন্তু তারাপদবাবুর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ বড় একটা নেই। ভালমানুষ রসিক লোক। তাই কথাটার মধ্যে বিষ নেই।

ধৃতি হেসে বলে, ইম্পর্ট্যান্ট নয় তারাদা, আমি হচ্ছি আসলে ইম্পোটেন্ট।

তারাপদবাবু মুখখানা খুব কেজো মানুষের মতো গম্ভীর করে পিন আঁটা একটা মোটাসোটা খবরের কপি ধৃতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ খবরটা করে দিয়ে চলে যাও। এটা কাল লিড হতে পারে। বেশি বড় কোরো না।

ঘড়িতে চারটে বাজে। কপি লিখতে ধৃতির আধঘণ্টার বেশি লাগবে না। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধৃতি নিজের টেবিলে কপিটা চাপা দিয়ে রেখে সিনেমার ডিপার্টমেন্টে আড্ডা মারতে গেল।

কালীবাবু চুলে কলপ দিয়ে থাকেন। চেহারাখানা জমিদার-জমিদার ধরনের। ভারী শৌখিন লোক। এক সময়ে সিনেমায় নেমেছিলেন, পরে কিছুদিন ডিরেকশন দিলেন। তিন-চারটে ছবি ফ্লপ করার পর হলেন সিনেমার সাংবাদিক। এখন এ পত্রিকার সিনেমার পাতা এডিট করেন।

ধৃতিকে দেখে বলেন, কী ভায়া, হাতে নাকি একটা ভাল মেয়েছেলে আছে! থাকলে দাও না, সিনেমায় নামিয়ে দিই। বাংলা ছবিতে নায়িকাব দুর্ভিক্ষ চলছে দেখছ তো!

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, ভাল মেয়ে! আমার হাতে কোত্থেকে মেয়ে থাকবে কালীদা?

কেন, এই তো সৌরীন বলছিল তুমি নাকি একটা ঘ্যাম মেয়েছেলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ!

ওঃ!— বলে ধৃতি বসে।

দাও না মেয়েটার ঠিকানা। তোমার রিলেটিভ হলেও ক্ষতি নেই। আজকাল লাইন অনেক পরিষ্কার, কারও চরিত্র নষ্ট হয় না।

সেজন্য নয়। অন্য অসুবিধে আছে।

কেন লেজে খেলাচ্ছ ভাই?

সৌরীন কিছু জানে না। শুধু ছবিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে এসে আপনাকে বলেছে।

অসুবিধেটা কী?

যতদূর শুনছি মেয়েটা বেঁচে নেই।

ধৃতি দ্বিধায় পড়ে যায়। জয়ন্ত সেন বার বার বলেছিলেন, শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

ধৃতি বলল, ঠিক চিনি না। তবে জানি। মরার খবরটা অবশ্য উড়ো খবর।

কালীবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, সুন্দরী মেয়েরা মরবে কেন?

সেটাই তো প্রবলেম।

মোটেই কাজটা ভাল নয়। সুন্দরী মেয়েদের মরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে বলে, এ মেয়েটাকে নিয়ে একটি মিস্ট্রি দেখা দিয়েছে। জয়ন্তদা ছবিটা দেখে বললেন, মেয়েটা নাকি মরেনি। অথচ আমার কাছে খবর আছে—

দেখি ছবিটা। আছে?— বলে হাত বাড়ায় কালীবাবু।

ছবিটা আজকাল ধৃতির সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ধৃতি এই ছবিটার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময়ে তার মনে হয় এ ছবিটা খুব মারাত্মক একটা দলিল। কালীবাবু ছবিটা নিয়ে দেখলেন। সিনেমা লাইনের অভ্যস্ত প্রবীণ চোখ। উলটে-পালটে দেখে ছবিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বলেন, মেয়েটার নাম-ঠিকানা দিতে পারো?

নাম টুপু। ঠিকানা মুখস্থ নেই, তবে আছে বাড়িতে। এলাহাবাদের মেয়ে।

ও। একটু দূর হয়ে গেল, নইলে আজই বাড়িতে হানা দিতাম গিয়ে।

কেমন বুঝছেন ছবিটা?

খুব ভাল। তবে সিঙ্গল ফোটোগ্রাফ নয়।

তার মানে?

মানে এটা একটি জোড়ার ছবি। এর পাশে আর কেউ ছিল। কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা করে শুধু মেয়েটার ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে।

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলেন?

কালীবাবু হেসে বলেন, যা বলছি তা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বলে ধরে নিতে পারো। ছবিটা আবার ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ধৃতি ছবিটা ফের নেয়। এ পর্যন্ত অসংখ্য বার দেখেছে তবু বুঝতে পারেনি তো!

কালীবাবু বুঝিয়ে দেন, এই ডান পাশে মেয়েটার হাত ঘেঁষে একটু সাদা জমি দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ। ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড।

তোমার মাথা।

তবে কী ওটা?

ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে লাইট অ্যাশ কালার, এই সাদাটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা। ভাল করে দ্যাখো, দেখছ?

হ্যাঁ।

মানুষের কাঁধের ঢালু বুঝতে পারো না? সাদার ওপর অংশটা একটু বেঁকে গেছে দেখছ?

হ্যাঁ।

অর্থাৎ মেয়েটির পাশে সাদা বা লাইট রঙের কোনও জামা পরা এক রোমিও ছিল। এ ছবিটায় তাকে বাদ রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি একদম চেনো না?

না।

তবে এ ছবিটা এল কোথা থেকে?

এল।

খোঁজ নাও। এ মেয়েটা ফিল্মে এলে হইচই পড়ে যাবে।

খোঁজ নিতে তো এলাহাবাদ যেতে হয়!

যাবে। আমি ফিনান্স করব।

ধৃতির ফের মনে পড়ে, চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসেনি, এসেছে কলকাতা থেকে। মনে পড়ে, জয়ন্ত সেন বলেছিলেন, ট্রাঙ্ককলটা স্রেফ ধোঁকাবাজি হতে পারে।

ধৃতি নড়ে চড়ে বসে বলে, আচ্ছা কালীদা, আপনার কি মনে হয় মেয়েটা বেঁচে আছে?

কালীবাবু ছবিটা ফের দেখছিলেন হাতে নিয়ে। পুরু চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চেয়ে বললেন, থাকাই উচিত। মরবে কেন হে?

ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেন? মানে কোনও ফিলিং হয়?

খুব হয়? একটাই ফিলিং হয়।— বলে কালীবাবু বদমাশের মতো হেসে বলেন, সেক্স জেগে ওঠে।

দূর! কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় না?

তুমি একটা বুদ্ধু। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে আনক্যানি ফিলিং হতে যাবে কোন দুঃখে?

যাই, কপি পড়ে আছে।— বলে ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল।

আরে বসো বসো। চা খাও। রাগ করলে নাকি? আমি আবার একটু পষ্ট কথা বলি তো?— বলে কালীবাবু ধৃতিকে বসিয়ে টেলিফোনে ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে বলেন।

ধৃতি সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে বলে, আপনারা আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি!

কী রকম?

আমাকে মেয়েটার মা জানিয়েছিল যে, টুপু মরে গেছে। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর জয়ন্তবাবু ছবিটা দেখে বললেন তাঁর মনে হচ্ছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে।

বটে!

তাঁর কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না। তার কারণ হল চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসার কথা, কিন্তু এসেছে কলকাতা থেকে।

ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো।

আরও রহস্য হল যে আপনি আবার মেয়েটার পাশে এক অদৃশ্য রোমিওকে আবিষ্কার করলেন। তার মানে আরও জট পাকাল। মেয়েটার মা চেয়েছিল আমি মৃত্যু-সংবাদটা কাগজে বের করে দিই।

খবরদার ওসব কোরো না।

কেন?

সুন্দরীরা মরে না। তারা অমর। স্ত্রীলিঙ্গে বোধহয় অমরা বা অমরী কিছু একটা হবে।

সে যাই হোক, খবর বের করার এক্তিয়ার আমার নেই। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমি বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছি ক্রমে।

ফাঁপরের কী আছে? খোঁজ নাও। তবে পুলিশ কেস হলে গা বাঁচিয়ে সরে এসো। ছবিটার মধ্যে একটু বদ গন্ধ আছে।

তার অর্থ?

অর্থাৎ মেয়েটা খুব ইনোসেন্ট নয়। চোখ-মুখ যত সুন্দরই হোক, এর মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট দুষ্টুমি আছে। অ্যাডভেনচারাস টাইপ। পাশের ছোকরাটিকে দেখতে পেলে হত। যাক গে, তুমি গা বাঁচিয়ে চলবে।

ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল। কালীবাবু হাত তুলে থামিয়ে ফের বললেন, সিনেমায় নামাটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ভেবো না যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি তাকে সিনেমায় নামাবার জন্য পাগল হই।

বুঝলাম।

কালীবাবু একটু হেসে বলেন, আসলে জয়ন্তই আমাকে ব্যাপারটা বলছিল গতকাল। তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে একটু ওয়ার্নিং দিই।

ওয়ার্নিং কেন?

তুমি কাঁচা বয়সের ছেলে, কোথায় কোন ঘুণচক্করে পড়ে যাবে। মেয়েছেলে জাতটা যখন ভাল থাকে ভাল, যখন খারাপ হয় তখন হাড়বজ্জাত।

তাই বলুন! জানতেন।

জানতাম। আর এও বলি যে টুপুর মা ফের তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

তা করবে।

তুমি একটু রসের কথা-টথা বোলো। সিমপ্যাথি দেখাবে খুব। যদি দেখা করতে চায় তো রাজি হয়ে যেয়ো।

আচ্ছা।

ধৃতি উঠল।

৪

বুধবার জয় গেল দিল্লি। স্বভাবতই একা বাড়িতে ধৃতি আর পরমার থাকা সম্ভব নয়। ধৃতির যাওয়ার জায়গা নেই তেমন। পরমার আছে। তাই পরমা গেল বাপের বাড়ি। সেই সঙ্গে ছুঁড়ি ঝিটাকেও নিয়ে গেল। গোটা ফ্ল্যাটে ধৃতি একা।

অবশ্য ধৃতি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকে! তার আছে অফিস, আড্ডা, ফিচার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়ানো। রাতে নাইট ডিউটি নেই বলে শুধু সেই সময়টুকু সে ফ্ল্যাটে থাকে।

রাত ন'টা নাগাদ ধৃতি অফিসে একটা বড় পলিটিক্যাল কপি লেখা শেষ করল। খুব পরিশ্রম গেছে। এইবার ছুটি। চলে যাওয়ার আগে সে এর ওর তার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে রোজই। আজ বুড়ো ডেপুটি নিউজ এডিটার মদনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল।

ঠিক এইসময়ে চিফ সাব-এডিটার ডেকে বললেন, তোমার ফোন হে।

ধৃতি 'হ্যালো' শুনেই কেঁপে ওঠে একটু। টুপুর মা।

বলুন।— ধৃতি বলে।

চিঠি তো পেয়েছেন!

পেয়েছি!

ছবিটা দেখলেন?

হুঁ।

কেমন?

টুপু খুবই সুন্দরী।

আপনাকে তো বলেইছিলাম যে টুপুকে সবাই মিস এলাহাবাদ বলত। আমার টুপু ছিল সাংঘাতিক সুন্দরী।

হুঁ।

খবরটা কবে ছাপা হবে?

ধৃতি একটু ইতস্তত করে বলে, দেখুন এসব খবর ছাপার এক্তিয়ার তো আমাদের নেই।

আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

না পারি না।

দোহাই! প্লিজ! আমার টুপু আপনাদের কাছে কিছুই না জানি। কিন্তু ওর খবরটা ছাপা হলে আমি বড় শান্তি পাব। মায়ের ব্যথা তো বোঝেন না আপনারা!

শুনুন। প্রথম কথা, টুপু যদি নামকরা কেউ হত তবে খবরটা ছাপা সহজ হয়ে যেত। যদি খুনের কেস আদালতে উঠত তাও অসুবিধে হত না। কিন্তু শুধু অ্যাসাম্পশনের ওপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

দু'-চার লাইনও নয়?

না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরটা ছাপতে পারেন। কিন্তু তাতে খুনের উল্লেখ থাকলে চলবে না।

কিন্তু আমি যে সবাইকে টুপুর খুনের খবরটাই জানাতে চাই!

তাহলে আপনি পুলিশের থ্রুতে প্রসিড করুন। যদি মামলা হয় তাহলে আমি খবরটা ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আর নইলে খুনের যথেষ্ট এভিডেনস চাই। এলাহাবাদের লোকাল কাগজে কি খবরটা বেরিয়েছিল?

না।

তবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে কিছু জানাননি?

জানিয়েছি, কিন্তু তারা কোনও গা করছে না।

কেন?

তারা এটাকে খুন বলে মনে করছে না যে! তারা লাশ চায়।

লাশ! কেন, লাশ পাওয়া যায়নি?

না। কী করে যাবে? টুপুকে যে একটা পাহাড়ি নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কোথায়?

টুপুর মা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন, কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

তাহলে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? সাক্ষী আছে?

ন্ ন্ নাঃ।

তবে কী করে জানলেন?

ওরা কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে যায় আরও অনেক জায়গায়। সবশেষে ঘটনাটা ঘটে মাইথনে।

মাইথনে?

খুব নির্জন জায়গা। ওরা ফরেস্ট বাংলোতে থাকত।

কারা? টুপু আর কে?

ওঃ, সে ঠিক জানি না।

না জানলে কী করে হবে? টুপু কার সঙ্গে গিয়েছিল তা আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত।

কী করে নেব? আমি অনাথা বিধবা। টুপুর তো বাবা নেই, ভাইবোন নেই। টুপু একটিমাত্র। তবে আমাদের টাকা আছে। অনেক টাকা। খবরটা ছাপানোর জন্য যদি টাকা খরচ করতে হয় তো আমি পিছুপা হব না। বুঝলেন? টুপুই যখন নেই তখন এত টাকা আমার কোন কাজে লাগবে? আমি আপনাকে খবরটা ছাপানোর জন্য হাজার টাকা দিতে পারি। রাজি?

না।— ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, টাকা থাকলে আপনি বরং তা সৎ কাজেই ব্যয় করুন, খবরটা ছাপা গেলে আমি এমনিতেই ছাপতাম।

কিছুতেই ছাপা যাবে না?

ধৃতি হঠাৎ প্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

টুপুর মা খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললেন, কেন বলুন তো?

এলাহাবাদ থেকে কি?

আবার খানিক চুপচাপ থাকার পর টুপুর মা বলেন, না।

তবে কি কলকাতা থেকে?

হ্যাঁ। আমি কাল কলকাতায় এসেছি।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনার চিঠিটাও কিন্তু কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চিঠিতে ডেটলাইন ছিল এলাহাবাদের।

টুপুর মা লজ্জার স্বরে বলেন, সে একটা কাণ্ড। আমার একজন চেনা লোককে চিঠিটা ডাকে দিতে দিই। সে সেইদিনই কলকাতা যাচ্ছিল। তাই একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকে দিয়েছে। কিছু মনে করেছিলেন বোধহয়!

না, মনে কী করব? এরকম হতেই পারে।

আপনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন?

বিব্রত ধৃতি বলে, না না।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম টুপুর ব্যাপারেই। টুপু কলকাতায় কোথায় ছিল তা আমি জানি না।

কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

টুপু কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল?

কেন, বলিনি আপনাকে সে কথা?

না।

টুপুর মা একটু হেসে বললেন, ওমা! আমারই ভুল তবে। যা হোক, আজকাল আমার মেমরিটা একদম গেছে। হ্যাঁ, টুপু তো পালিয়েই এসেছিল। টুপু যত সুন্দরী ছিল ততটা শান্ত বা বাধ্য ছিল না। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।

ও। তা পালাল কেন?

আমি যা বারণ করতাম তাই করব এই ছিল স্বভাব টুপুর। ও খানিকটা ছেলের মতো মানুষ হয়েছিল তো। সাইকেল, সাঁতার, গাড়ি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া সব জানত।

খুব চৌখস মেয়ে তো!

খুব। একস্ট্রা-অর্ডিনারি যাকে বলা যায়।

পালাল কেন তা তো বললেন না।

টুপুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছিল।

টুপু বিয়েতে রাজি ছিল না বুঝি?

না। ও বলত আর একটু বয়স হলে সে মাদার টেরেসার আশ্রমে বা সৎসঙ্গ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে। সারা জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে।

কেন?

ও পুরুষদের পছন্দ করত না। না, কথাটা ভুল বলা হল। আসলে ও কখনও তেমন পুরুষ দেখেনি যাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা যায়। সব পুরুষমানুষকেই ও খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। বলত, এদের কাউকে বিয়ে করা যায় না।

কিন্তু পালানোর ব্যাপারটা তো বললেন না?

বলছি। আমরা ওর বিয়ে ঠিক করি একজন ব্রিলিয়ান্ট অ্যামেরিকা ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দারুণ ছেলে। টুপুর আপত্তি আমরা শুনিনি।

কেন?

শুনিনি তার কারণ চট করে এরকম ভাল পাত্র কি পাওয়া যায়, বলুন? যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, দেদার টাকা রোজগার করে, হাই পোজিশনে চাকরি করছে।

তারপর?

আশীর্বাদের আগের দিন টুপু একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। কাউকে, এমনকী আমাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি।

সঙ্গে কেউ যায়নি?

কী করে বলব?

কলকাতায় গিয়েছিল কী করে জানলেন?

সেখান থেকে আর একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখে, আমি খুব ফুর্তিতে আছি। এবার বেড়াতে যাব দার্জিলিং, নেতারহাট, মাইথন, আরও কয়েকটা জায়গার নাম লেখে। সব মনে নেই।

কিন্তু মারা যাওয়ার ব্যাপারটা?

ওঃ হ্যাঁ। মাইথন থেকে ওর শেষ চিঠি। তাতে ও খুব মন খারাপের কথা লিখেছিল। জানিয়েছিল যে কে বা কারা ওর পিছু নিয়েছে। তারা ওর ভাল করতে চায় না, ক্ষতি করতে চায়।

তারপর?

তারপর আর কোনও খবর নেই। তবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে টুপু উঁচু থেকে জলের

মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কখনও মাইথনে গেছেন?

গেছি।

আমি যাইনি। জায়গাটা কেমন?

সুন্দর।

সেখানে পাহাড় আছে?

আছে। তবে ছোট পাহাড়।

টুপুও তাই লিখেছিল। সেখানে কী একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?

আছে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির।

সেখানে সেই মন্দিরে ঢোকবার গলিতে নাকি কারা টুপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাসিয়েছিল যে মেরে ফেলবে।

কিন্তু কেন?

সে তো জানি না। টুপুর মতো মেয়ের কি শত্রু থাকতে পারে? তবু ছিল, জানেন। আর টুপু যে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের ছিল!

বুঝলাম। কিন্তু টুপুর সঙ্গে কেউ ছিল না?

হয়তো ছিল। তাদের কথা টুপু লিখত না।

কলকাতায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই?

আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। তবে আমার দিককার কোনও আত্মীয় এদিকে থাকে না। আমার বাপের বাড়ি গোরক্ষপুরে, তিন পুরুষের বাস।

টুপু কি তার বাপের বাড়িতে উঠেছিল?

টুপুর মা হেসে বললেন, টুপুর বাপের বাড়ি বলতে অবশ্য এলাহাবাদের বাড়িই বোঝায়। তবে এখানে আমার স্বামীর খুড়তুতো ভাই-টাই আছেন। বাড়ির একটা অংশ অবশ্য আমাদের। সে অংশ তালা দেওয়া থাকে, আমরা কলকাতায় এলে সেখানেই উঠি। কিন্তু টুপু এ বাড়িতে আসেনি।

ধৃতি এতক্ষণ পরে টের পেল যে, সে খামোখা এত কথা বলছে বা শুনছে। শুনে তার কোনও লাভ নেই। টুপুর ব্যাপারে তার করারও কিছু নেই।

ধৃতি বলল, সবই বুঝলাম। কিন্তু সিমপ্যাথি জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন?

শুনুন। দয়া করে আপনার বাসার ঠিকানাটা দেবেন?

কেন?

বিরক্ত হবেন না! ঠিকানাটা থাকলে আমি যদি দরকারে পড়ি তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারব। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না। আমার দেওররাও খুব সিমপ্যাথেটিক নয়। আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হব। অবশ্য যদি কখনও দরকার হয়। নইলে এমনিতে বিরক্ত করব না।

একটু দ্বিধা করেও ধৃতি ঠিকানা বলল।

আপনার বাসায় ফোন নেই?

না।

আচ্ছা, ছাড়ছি।

ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ধৃতি হাঁফ ছাড়ল।

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে দামি ডিনার খেল ধৃতি। মাঝে মাঝে খায়। বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। যতদিন এরকম একা আছে ততদিন আমিরি করে নিতে পারবে।

বিয়ে ধৃতি করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের কথা ভাবতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু ভয় পায়। সে একটু প্রাচীনপন্থী। আজকালকার মেয়েদের হাব-ভাব আর চলাফেরা দেখে তার ভয় লাগে। এরা তো ঠিক বউ হতে পারবে না। বড়জোর কম্প্যানিয়ন হতে পারে, আর বেড-ফ্রেন্ড।

ট্যাক্সি ছেড়ে ধৃতি ফ্ল্যাটে উঠে এল। দরজা ভাল করে বন্ধ করল। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ধরাল। এখন রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকবে। কয়েকটা থ্রিলার কেনা আছে। পড়বে। তার আগে একটু কিছু লিখবে। এই একা নিশুত রাতে জেগে থাকা তার বড় প্রিয়। এইটুকু একেবারে তার নিজস্ব সময়।

শৌখিন রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে চিঠির বাক্সটা দেখে আসেনি।

আবার উঠে নীচে এল ধৃতি। চিঠি পেতে সে ভীষণ ভালবাসে। রোজ চিঠি এলে কত ভাল হয়।

চিঠি ছিল। দুটো। দুটোই খাম। একটার ওপর দিদির হাতের লেখা ঠিকানা। বোধহয় দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছে ভাইকে। আর একটা খামে কোনও ডাকটিকিট নেই, হাতের লেখা অচেনা।

নিজের ঘরে এসে ধৃতি দিদির চিঠিটা প্রথমে খুলল। ভাইয়ের জন্য দিদি একটি পাত্রী দেখেছে। চিঠির সঙ্গে পাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ফোটোও আছে। দেখল ধৃতি। মন্দ নয়। তবে একটু আপস্টার্ট চেহারা। দিল্লিতে বি এ পড়ে। বাবা সরকারি অফিসার।

ধৃতি অন্য চিঠিটা খুলল। সাদা কাগজে লেখা— একা বাসায় ভূতের ভয় পাচ্ছেন না তো! ভূত না হলেও পেতনিরা কিন্তু আছে। সাবধান! আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে গেছি। যা অন্যমনস্ক আপনি, হয়তো লক্ষই করেননি। ফ্রিজে একটা চমৎকার খাবার রেখে যাচ্ছি! খাবেন। মেয়েরা কিন্তু খারাপ হয় না, পুরুষগুলোই খারাপ। চিঠিটা লেটারবক্সে রেখে যাচ্ছি যাতে চট করে নজরে পড়ে।— পরমা। পুঃ পরশু হয়তো আবার আসব। দুপুরে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

ধৃতি উঠে গিয়ে ডাইনিং হলে ফ্রিজ খুলল।

কথা ছিল এ ক'দিন ফ্রিজ বন্ধ থাকবে। ছিলও তাই। পরমা আজ চালিয়ে রেখে গেছে। একটা কাচের বাটিতে ক্ষীরের মতো কী একটা জিনিস। ঠান্ডা বস্তুটা মুখে ঠেকিয়ে ধৃতি দেখে পায়েস। তাতে কমলালেবুর গন্ধ। কাল খাবে।

ফ্রিজ বন্ধ করে ধৃতি হলঘর যখন পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটি কি সে বন্ধ করেছে? এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই বেকুব হয়ে বুঝল, সত্যিই বন্ধ ছিল না দরজাটা।

সকালে উঠে ধৃতি টের পায় সারা রাত ঘুমের মধ্যে সে কেবলই টুপুর কথা ভেবেছে। খুবই আশ্চর্য কথা।

টুপুর কথা সে ভাববে কেন? টুপু কে! টুপুকে সে তো চোখেও দেখেনি। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। নিজের কোনও দুর্বলতা বা মানসিক শ্লথভার ধরা পড়লে ধৃতি খুশি হয় না।

টুপু বা টুপুর মা'র সমস্যা নিয়ে তার ভাববার কিছু নেই। ঘটনাটার মধ্যে হয়তো কিছু রহস্য আছে। তা থাক। সে রহস্য না জানলেও তার চলবে। টুপুর মা কি পাগল? হলেই বা তার তাতে কী?

টুপু কি বেঁচে আছে? টুপু কি সত্যিই বেঁচে নেই? এসব জানবার বা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। ধৃতি স্বপ্ন-দেখা মানুষ নয়, কল্পনার ঘোড়া ছাড়তেও সে পটু নয় তেমন।

তবু কাল সারা রাত, ঘুমের মধ্যে সে কেন টুপুর কথা ভেবেছে?

দাঁত মেজে ধৃতি নিজেই চা তৈরি করে খেল। পত্রিকাটা বারান্দা থেকে এনে খুলে বসল। খবর কিছুই নেই। তবু যথাসম্ভব সে যখন খবরগুলো পড়ে দেখছ তখনও টের পেল বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে তার নানা চিন্তা-ভাবনা ঢুকে যাচ্ছে।

এবং ফের টুপুর কথাই ভাবছে সে। জ্বালাতন।

পত্রিকা ফেলে রেখে সিগারেট ধরিয়ে নিজের এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করতে থাকে ধৃতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করে কিছুই পায় না। টুপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটি ফোটোর ভিতর দিয়ে। সে ফোটোটাও খুব নির্দোষ নয়। আর টুপুর মা টেলিফোনে এবং চিঠিতে টুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছে সেইটুকু মাত্র তার জানা। অবশ্য এগুলো যোগ-বিয়োগ করে নিয়ে একটা রক্তমাংসের মেয়েকে কল্পনা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু ততদূর কল্পনাপ্রবণ তো ধৃতি এতকাল ছিল না!

অন্যমনস্কতার মধ্যে সে কখন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে, ফ্রিজ থেকে পরমার রেখে যাওয়া পায়েস বের করে খেয়েছে, আবার চা করেছে। ফের সিগারেটও ধরিয়েছে।

বিকেলের শিফটে ডিউটি। সারাটা দিনের অবকাশ পড়ে আছে। কাজ নেই বলে ধৃতি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল। চমৎকার বারান্দাটা। নীচে রাস্তা। সারাদিন বসে বসে লোক চলাচল দেখা যায়।

দেখছিল ধৃতি। কিন্তু আবার দেখছিলও না। তাব কেবলই মনে হয়, টুপুর মা যা বলছে তার সবটা সত্যি নয়। টুপু যে মারা গেছেই তার কোনও প্রমাণ নেই। সেটা হয়তো কল্পনা বা গুজব। টুপু বেঁচে আছে ঠিকই। একটা কথা কাল টুপুর মাকে জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে, টুপুর ফোটোতে তার পাশে কে ছিল, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

ধৃতির অবকাশ যে অখণ্ড তা নয়। সেই ফিচারটা সে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। প্রায় দু' সপ্তাহ আগে অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর তাকে ডেকে পণপ্রথা নিয়ে আর একটা ফিচার লিখতে বলেছেন। দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া ছিল। বিভিন্ন বাড়ির গিন্নি, কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী, সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। সে কাজ পড়ে আছে ধৃতির। এক অবান্তর চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিন তেমন প্রকট ছিল না, কিন্তু কাল বহুক্ষণ টুপুর মা-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই তার মাথাটা অশরীরী বা নিরুদ্দেশ টুপুর হেপাজতে চলে গেছে।

আজ সময় আছে। ধৃতি টুপুর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রফেসরদের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে পুলক নিমীলিত চোখে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছে, এমন দৃশ্যই দেখবে বলে আশা করেছিল ধৃতি। হুবহু মিলে গেল। প্রফেসরদের চাকরিটা আলসেমিতে ভরা। সপ্তাহে তিন-চারদিন ক্লাস থাকে, বছরে লম্বা লম্বা গোটা দুই-তিন ছুটি, আলসে না হয়ে উপায় কী? এই পুলক যে একসময়ে ফুটবলের ভাল লেফট আউট ছিল তা আজকের মোটাসোটা চেহারাটা দেখে মালুম হয় না। মুখে সর্বদা স্নিগ্ধ হাসি, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চাউনি, হাঁটাচলায় আয়েসি মন্থরতা।

ধৃতিকে দেখে সোজা হওয়াব একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আরে! আজই কি তোমার আসবার কথা ছিল নাকি? স্টুডেন্টরা তো বোধহয় কী একটা সেমিনারে গেল!

ধৃতি একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আজই আসবার কথা ছিল না ঠিকই। তবে এসে যখন গেছি তখন দু'-চারজনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। ইন্টারভিউটা আজ না নিলেই নয়।

দেখছি, তুমি বোসো।— বলে পুলক দু' মনি শরীর টেনে তুলল। রমেশ নামক কোনও বেয়ারাকে ডাকতে ডাকতে করিডোরে বেরিয়ে গেল।

পুলকদের কমপারেটিভ লিটারেচারে ছাত্র নগণ্য, ছাত্রীই বেশি। এসব ছাত্রীরাও আবার অধিকাংশই বড়লোকের মেয়ে। পণপ্রথাকে এরা কোন দৃষ্টিতে দেখে তা ধৃতির অজানা নয়। চোখা

চালাক আলট্রা স্মার্ট এসব মেয়েদের পেট থেকে কথা বের করাও মুশকিল। কিছুতেই সহজ সরলভাবে অকপট সত্যকে স্বীকার করবে না। ধৃতি তাই মনে মনে তৈরি হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশের চেষ্টায় পুলক একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে জনা ছয়েক মেয়ে ও একটি ছেলেকে জুটিয়ে দিল। ছটির মধ্যে চারটি মেয়েই দারুণ সুন্দরী। বাকি দু'জনের একজন একটু বয়স্কা এবং বিবাহিতা, অন্যটি সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কালো আভরণহীন রূপটানহীন চেহারাটায় এক ধরনের ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

ধৃতি আজকাল মেয়েদের লজ্জা পায় না, আগে পেত। সুন্দরীদের ছেড়ে সে কালো মেয়েটিকেই প্রথম প্রশ্ন করে, আপনার বিয়েতে যদি পাত্রপক্ষ পণ চান তাহলে আপনার রিঅ্যাকশন কী হবে?

আমি কালো বলে বলছেন?

তা নয়, বরং আপনাকেই সবার আগে নজরে পড়ল বলে।

মেয়েটি কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে বলে, প্রথমত আমার বিয়ে নেগোশিয়েট করে হবে না, আমি নিজেই আমার মেট বেছে নেব, পণের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নটাকে অত পারসোনেলি নেবেন না। আমি পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইছি।

ছেলেরা পণ চাইলে মেয়েদেরও কিছু কন্ডিশন থাকবে।

কী রকম কন্ডিশন?

বাবা-মা'র সঙ্গে থাকা চলবে না, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ঘরের কাজে হেলপ করতে হবে, উইক এন্ডে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, রান্না এবং ঘরের সব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে, স্বামীর পুরো রোজগারের ওপর স্ত্রীর কন্ট্রোল থাকবে...এরকম অনেক কিছু।

সুন্দরীদের মধ্যে একজন ভারী সুরেলা গলায় বলে ওঠে, অলকা আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে।

ধৃতি লিখতে লিখতে মুখ তুলে হেসে বলে, তাহলে আপনিই বলুন।

আমি! ওঃ, পণপ্রথা শুনলে এমন হাসি পায় না!— বলে মেয়েটি বাস্তবিকই হাতে মুখ ঢেকে হেসে ওঠে। সঙ্গে অন্যরাও।

ধৃতি একটু অপেক্ষা করে। হাসি থামলে মৃদু স্বরে বলে, ব্যাপারটা অবশ্য হাসির নয়।

মেয়েটি একটু গলা তুলে বলে, সিস্টেমটা ভীষণ প্রিমিটিভ।

আধুনিক সমাজেও বিস্তর প্রিমিটিভনেস রয়ে গেছে যে!

তা জানি। সেই জন্যই তো হাসি পায়।

এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনি কী করতে চান?

কেউ পণ-টন চাইলে আমি তাকে বলব, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

বিবাহিতা মহিলাটি উসখুস করছিলেন। এবার বললেন, না না, শুনুন। আমি বিবাহিতা এবং একটি মেয়ের মা। আমি জানি সিস্টেমটা প্রিমিটিভ এবং হাস্যকর। তবু বলি, এই ইভিলটাকে ওভাবে ট্যাকল করা যাবে না। আমার মেয়েটার কথাই ধরুন। ভীষণ সিরিয়াস টাইপের, খুব একটা স্মার্টও নয়। নিজের বর নিজে জোগাড় করতে পারবে না। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমি একটা ভাল পাত্র পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি কিছু পণের দাবি থাকেও তবে সেটা অন্যায় জেনেই মেয়ের স্বার্থে হয়তো আমি মেনে নেব।

সুন্দরী মেয়েটা বলল, তুমি শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবছ নীতাদি!

মেয়ের মা হ' আগে, তুইও বুঝবি।

ধৃতি প্রসঙ্গ পালটে আর একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে, পণপ্রথা ভীষণ খারাপ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা টিফলিশ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আপনাকে করব?

খুব শক্ত প্রশ্ন নয় তো?

পুলক পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরবে চুরুট টেনে যাচ্ছিল। এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে

বলল, তুমি একটি আস্ত বিচ্ছু ইন্দ্রাণী। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তোমার চেয়েও বিচ্ছু। ওয়াচ ইয়োর স্টেপ।

ইন্দ্রাণী উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলে, কংগ্র্যাটস মিস্টার বিচ্ছু। বলুন প্রশ্নটা কী।

ধৃতি খুব অকপটে মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল। এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেনি। লক্ষ করে এখন হাঁ হওয়ার জোগাড়। ছবির টুপুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কিন্তু গল্পে যা ঘটে, জীবনে তা ঘটে খুবই কদাচিৎ। এ মেয়েটির আসল টুপু হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, ধৃতি তাও জানে। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা লক্ষ করেছি পাত্রপক্ষ আজকাল যতটা দাবিদাওয়া করে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি থাকে স্বয়ং পাত্রীর।

তাই নাকি?

মেয়েরা আজকাল বাবা-মায়ের কাছ থেকে নানা কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। পণপ্রথার চেয়ে সেটা কি ভাল?

ইন্দ্রাণীর মুখ হঠাৎ ভীষণরকম গম্ভীর ও রক্তাভ হয়ে উঠল। মাথায় একটা ঝাপটা খেলিয়ে বলল, কে বলেছে ওকথা? মোটেই মেয়েরা বাপের কাছ থেকে আদায় করে না। মিথ্যে কথা।

ধৃতি নরম গলায় বলে, রাগ করবেন না। এগুলো সবই জরুরি প্রশ্ন, আপনাকে অপ্রতিভ করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।

বিবাহিতা মহিলাটি আগাগোড়া উসখুস করছিলেন, এখন হঠাৎ বলে উঠলেন, ইন্দ্রাণী যাই বলুক আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা আজকাল বড্ড ওবকম হয়েছে।

এককথায় ইন্দ্রাণী চটল। বলল, মোটেই না নীতাদি। তোমার এক্সপেরিয়েন্স অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা এই জেনারেশনের মেয়েরা মোটেই ওরকম নই। বরং আমরা মেয়েরা যতটা মা-বাবার দুঃখ বুঝি ততটা এ যুগের ছেলেরা বোঝে না।

নীতা বললেন, সেকথাও অস্বীকার করছি না।

তাহলে? আজকালকার ছেলেরা তো বিয়ে করেই বাবা-মাকে আলাদা করে দেয়। দেয় না বলো?

নীতা হেসে বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু এ যুগের ছেলেরা বিয়ে করে কাকে সেটা আগে বল, তোর মতো একালের মেয়েদেরই তো।

তা তো করেই।

সেই মেয়েরাই তো বউ হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলে, ওটা একপেশে কথা হল। সবসময়ে বউরাই পরামর্শ দেয় না, ছেলেরা নিজেরাই ডিসিশন নেয়। তোমার ডিফেক্ট কী জানো? ওভার সিমপ্লিফিকেশন।

ধৃতি বিপদে পড়ে চুপ করে ছিল। এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। পণপ্রথা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রাণী তার উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখখানা হঠাৎ ধৃতির দিকে ফিরিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, এবার বলুন তো রিপোর্টারমশাই, নিজের বিয়ের সময় আপনি কী করবেন?

আমি!— ধৃতি একটু অবাক হল। তারপর এক গাল হেসে বলল, আমার বিয়ে তো কবে হয়ে গেছে! আমি ইনসিডেন্টালি তিন ছেলেমেয়ের বাপ।

ইন্দ্রাণীর চোখে আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কিন্তু টক করে মাথাটা নুইয়ে নিল সে। তারপর ফের নিপাট ভালমানুষের মতো মুখটা তুলে বলল, আপনি পণ নেননি?

ধৃতি খুব লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বলল, সামান্য চাকরি, তাই পণও সামান্যই নিয়েছিলাম, হাজার পাঁচেক।

এই স্বীকারোক্তিতে সকলে একটু চুপ মেরে গেল। কিন্তু একটা নিঃশব্দ ছিছিক্কার স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ধৃতি।

হঠাৎ পুলক হেসে ওঠায় অ্যাটমসফিয়ারটা মার খেয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, ইয়ারকি মারছেন, না?

কেন?

আপনি মোটেই বিয়ে করেননি।

আমার বিয়েটা ফ্যাক্টর নয়। আপনি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

ইন্দ্রাণী বলল, জবাব দিইনি কে বলল? আমরা মোটেই ওরকম নই।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল ধৃতি কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। বারবার তর্ক লেগে যেতে লাগল। শেষে ঝগড়ার উপক্রম।

অবশেষে ইন্টারভিউ শেষ করে ধৃতি উঠে পড়ল। যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট।

পুলক নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াল। নিজে থেকে যেচে বলল, ইন্দ্রাণী মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগল?

খারাপ কী?

শি ইজ ইন্টারেস্টিং। পরে ওর কথা তোমাকে বলব। শি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং।

ধৃতি ফিরে এল বাসায়।

৬

টুপুর খোঁজ যদি ধৃতিকে করতেই হয় তবে তার কিছু সহায়-সম্বল দরকার। তামাম কলকাতা, মাইথন, এলাহাবাদ বা ভারতবর্ষের সমগ্র জনবসতির মধ্যে কোথায় টুপু লুকিয়ে আছে তা একা খুঁজে দেখা ধৃতির পক্ষে অসম্ভব। টুপু মরে গেছে কি না তাও বোধহয় সঠিক জানা যাবে না। মাইথনের পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড না থাকারই সম্ভাবনা।

এক দুপুরে ধৃতি টুপু সংক্রান্ত চিঠি ও ফোটো বের করে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসল। টেলিফোনে টুপুর মা'র সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে লিখল ডায়েরিতে। জয়ন্ত সেন আর কালীবাবুর সঙ্গে যা সব কথাবার্তা হয়েছে তাও বাদ দিল না। পুরো একখানা কেস হিস্ট্রি তৈরি করছিল সে। মাঝপথে কলিংবেল বাজল এবং রসভঙ্গ করে উদয় হলেন পরমা। সঙ্গে বাচ্চা ঝি।

ইস্! কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কানটাও গেছে দেখছি।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, কতক্ষণ জ্বালাবে বলো তো! ঘরের কাজ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে কেটে পড়ো। আমার জরুরি লেখা আছে।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে চোখ গোল করে বলে, বলি এ ফ্ল্যাটটা আমার না আর কারও? আমারই ফ্ল্যাট থেকে আমাকেই কিনা সরে পড়তে বলা হচ্ছে! মগের রাজত্ব নাকি?

ফ্ল্যাট তোমার হতে পারে কিন্তু আমারও প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে।

ইঃ প্রাইভেসি! ব্যাচেলরদের আবার প্রাইভেসি কী? তারা হবে সরল, দরজা জানালা খোলা ঘরের মতো, আকাশের মতো, শিশুর মতো।

থাক থাক। তুমি যে কবিতা লিখতে তা জানি।

খারাপও লিখতাম না। বিয়ে হয়েই সর্বনাশ হয়ে গেল। কবিতা উবে গেল, প্রেম উবে গেল।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও।

তার মানে?

কিছু বলিনি।

পরমা চোখ এড়িয়ে বলল, আমার অ্যাবসেনসে ঘরে কাউকে ঢোকাননি তো। ছেলেরা চরিত্রহীন হয়!

বলতে বলতে পরমা ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘরের পর্দা সরাল। পরমুহূর্তেই 'ওম্মা!' বলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ধৃতি বুঝল সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন টুপুর ফোটো লুকোনোর চেষ্টা বৃথা। তাই সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ও ভ্রুকুটিকুটিল করে নিজের ঘরে এল।

পরমা খাটের ওপর সাজানো কাগজপত্র আর ফোটো আঠামাখানো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শ্বাস ফেলে বলল, চরিত্রহীন! আগাপাশতলা চরিত্রহীন!

কে?

পরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ. প্রায় আমার মতোই সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর সে খবরটা একবার জানাননি পর্যন্ত!

তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

ইস্। আসুক না একবার কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। সাহস আছে?

আস্তে পরমা, কেউ শুনলে হাসবে।

কে আছে এখানে শুনি! আর হাসবারই বা কী আছে?

উদাস ভাবে ধৃতি বলে, পাখি-টাখিও তো আসে জানালায়, বাতাসও তো আসে, তারাই শুনে হাসবে।

চোখ পাকিয়ে পরমা বলে, হাসবে কেন?

তোমার চ্যালেঞ্জ-এর কথা শুনে। মেয়েটা কে জানো?

কে? সেটাই তো জানতে চাইছি।

মিস ক্যালকাটা ছিল, এখন মিস ইন্ডিয়া। হয়তো মিস ইউনিভার্স হয়ে যাবে।

ইল্লি। অত সোজা নয়। এবারের মিস ক্যালকাটা রুমা চ্যাটার্জি আমার বান্ধবীর বোন।

তুমি একজন সাংবাদিককে সংবাদ দিচ্ছ?

পরমা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা হার মানলাম। রুমা গতবার হয়েছিল।

এ এবার হয়েছে।

সত্যি?

সত্যি।

নাম কী?

টুপু।

যাঃ, টুপু একটা নাম নাকি? ডাকনাম হতে পারে। পোশাকি নাম কী?

তোমার বয়স কত হল পরমা?

আহা, বয়সের কথা ওঠে কীসে?

ওঠে হে ওঠে, ইউ আর নট কিপিং উইথ দা টাইম। তোমার আমলে পোশাকি নাম আর ডাকনাম আলাদা ছিল। আজকাল ও সিস্টেম নেই। এখন ছেলেমেয়েদের একটাই নাম থাকে। পল্টু, ঝন্টু, পুসি, টুপু, রুণু, নিনা...

থাক থাক, নামের লিস্টি শুনতে চাই না। মেয়েটার সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীর সঙ্গে আমার একটা রিলেশন। দাতা এবং গ্রহীতার।

তাব মানে?

অর্থাৎ তারা সৌন্দর্য বিতরণ করে এবং আমি তা আকণ্ঠ পান করি।

আর কিছু না?

ধৃতি মাথা নেড়ে করুণ মুখ করে বলে, তোমার চেহারাখানা একেবারে ফেলনা নয় বটে, কেউ কেউ সুন্দরী বলে তোমাকে ভুলও করে মানছি, কিন্তু আজ অবধি বোধহয় ভুল করেও তোমাকে কেউ বুদ্ধিমতী বলেনি।

পরমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ মা, কী সব অপমান করছে রে মুখের ওপর!

ভাই বন্ধুপত্নী, দুঃখ কোরো না, সুন্দরীদের বুদ্ধিমতী না হলেও চলে। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন যৎসামান্য বেতনের সাব-এডিটরের সঙ্গে মিস ক্যালকাটার দেবী ও ভক্ত ছাড়া আর কোনও রিলেশন হতে পারে না।

খুব পারে। নইলে ফোটোটা আপনার কাছে এল কী করে?

সে অনেক কথা। আগে তোমার ওই বাহনটিকে এক কাপ জমাটি কফি বানাতে বলো।

বলছি। আগে একটু শুনি।

আগে নয়, পরে। যাও।

উঃ!— বলে পরমা গেল।

পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, কফি আসছে, বলুন।

মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগছে?

মন্দ কী?

না না, ওরকম ভাসা-ভাসা করে নয়। বেশ ফিল করে বলো। ছবিটার দিকে তাকাও, অনুভব করো, তারপর বলো।

নাকটা কি একটু চাপা?

তাই মনে হচ্ছে?

ফোটোতে বোঝা যায় না অবশ্য। ঠোঁটদুটো কিন্তু বাপু, বেশ পুরু।

আগে কহো আর।

আর মোটামুটি চলে।

হেসে ফেলে বলে, বাস্তবিক মেয়েরা পারেও।

তার মানে?

এত সুন্দর একটা মেয়ের এতগুলো খুঁত বের করতে কোনও পুরুষ পারত না।

পরমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ইঃ পুরুষ! পুরুষদের আবার চোখ আছে নাকি? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতো হামলে পড়ে।

সব পুরুষই হ্যাংলা নয় হে বন্ধুপত্নী। এত পুরুষের মাথা খেয়েছ তবু পুরুষদের এখনও ঠিকমতো চেনোনি।

চেনার দরকার নেই। এবার বলুন তো ফোটোটা সত্যিই কার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, আগে আমার কথা একটু-আধটু বিশ্বাস করতে, আজকাল বিশ্বাস করাটা একদম ছেড়ে দিয়েছ।

আপনাকে বিশ্বাস! ও বাবা, তার চেয়ে কেউটে সাপ বেশি বিশ্বাসী। যা পাজি হয়েছেন আজকাল।

তা বলে সাপখোপের সঙ্গে তুলনা দেবে?

দেবই তো। সব সময় আমাকে টিজ করেন কেন?

মুখ দেখে তো মনে হয় টিজিংটা তোমার কিছু খারাপ লাগে না।

লাগে না ঠিকই, তা বলে সবসময়ে নিশ্চয়ই পছন্দ করি না। যেমন এখন করছি না। একটা সিরিয়াস প্রশ্ন কেবলই ইয়ারকি মেরে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলে পরমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা কটাক্ষ করল।

ধৃতি নিজের বুকে দু'হাত চেপে ধরে বলল, মর গয়া। ওরকম করে কটাক্ষ কোরো না মাইরি। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, মেয়েদের কটাক্ষ সামাল দেওয়ার মতো ইমিউনিটি নেই আমার।

খুব আছে। কটাক্ষ কিছু কম পড়ছে বলে মনে তো হয় না। আগে মেয়েদের ছবি ঘরে আসত না, আজকাল আসছে।

আরে ভাই, মেয়েটার ফোটো নয়। মিস ক্যালকাটা অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া। এর ওপর একটা ফিচার হচ্ছে আমাদের কাগজে। আমাকেই এর ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাই...

পরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ যদি মিস ইন্ডিয়া হয়ে থাকে তবে তো খেঁদি-পেঁচিদের যুগ এল।

কফি এসে যেতে দু'জনেই একটু ক্ষান্ত দিল কিছুক্ষণ। কিন্তু পরমা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব দুষ্টু চোখে লক্ষ করছিল ধৃতিকে। ধৃতি বলল, তুমি কফি খেলে না?

আমি তো আপনার আর আপনার বন্ধুর মতো নেশাখোর নই।

উদাস ধৃতি বলল, খেলে পারতে। কফিতে বুদ্ধি খোলে। বিরহের জ্বালাও কমে যায়।

আপনার মাথা। যাই বাবা, ঘরদোর সেরে আবার ফিরে যেতে হবে।

পরমা উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বলে ফেলো।

এই যে আমার স্বামী দিল্লি গেছে বলে আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে, এটার কোনও অর্থ হয়?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পরমা বেশ তেজের গলায় বলে, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। সব বুঝেও অমন না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো! আমি বলছি, রজত এখানে নেই বলে আমার এই ফ্ল্যাটে থাকা চলছে না কেন?

ধৃতি অকপট চোখে পরমার দিকে চেয়ে বোকা সেজে বলে, আমি আছি বলে।

আপনি থাকলেই বা কী? আমরা দু'জনেই থাকতে পারতাম। দিব্যি আড্ডা দিতাম, রান্না করতাম, বেড়াতাম।

ও বাবা, তুমি যে ভারী সাহসিনী হয়ে উঠেছ।

না না, ইয়ারকি নয়। আজকাল খুব নারীমুক্তি আন্দোলন-টন হচ্ছে শুনি, কিন্তু মেয়েদের এত শুচিবায়ু থাকলে সেটা হবে কী করে? পুরুষ মানেই ভক্ষক আর মেয়ে মানেই ভক্ষ্য বস্তু, এরকম ধারণাটা পালটানো যায় না?

ধৃতি পরমার সামনে এই বোধহয় প্রথম সত্যিকারের অস্বস্তি আর অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা খুব বেশি গভীর নয়। ভাববার দরকারও পড়েনি। কিন্তু পরমার প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি বলেই তার মনে হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পণ লাগে, মেয়েরা একা সর্বত্র যেতে পারে না, মেয়েদের জীবনে অনেক বারণ।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পুরুষরা এখনও পুরোপুরি পশুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরমা। যেদিন পারবে সেদিন তোমরা অনেক বেশি ফ্রিডম পাবে।

পরমা মাথা নেড়ে বলল, পুরুষদের খামোখা পশু ভাবতে যাব কেন? বড়জোর তারা ডমিন্যান্ট, কিন্তু পশু নয়। আমার বাবা পুরুষ, আমার ভাই পুরুষ, আমার স্বামী পুরুষ। আমার পুরুষ ওয়েল উইশারেরও অভাব নেই। তাদের আমি পশুর দলে ভাবতে পারি না।

আলোচনাটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পরমা।

পরমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পর্দা নিচু গলায় বলল, আমি সত্যিই বাপের বাড়িতে থাকতে ভালবাসি না। আপনার সঙ্গে আড্ডা মারাটাও আমার বেশ প্রিয়। কিন্তু তবু দেখুন,

আপনার মতো একজন নিরীহ পুরুষের সঙ্গ বর্জন করার জন্য আমাকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা মেয়েদের পক্ষে অপমান নয়?

ধৃতি হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষেও। আমার ভয়ে যে তুমি পালিয়ে আছ এটা তো আমার পক্ষে সম্মানের নয়।

পরমা হঠাৎ ধৃতিকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল, আমি ভাবছি আজ আর বাপের বাড়ি যাব না। এখানেই থাকব। রাজি?

ধৃতি একটু হাসল। হাত দুটো উলটে দিয়ে বলল, আপকো মর্জি। আমি বারণ করার কে পরমা? এ তো তোমারই ফ্ল্যাট।

ওসব বলে দায়িত্ব এড়াবেন না। এটা কার ফ্ল্যাট সেটা এ প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমি একজন যুবতী, আপনি একজন পুরুষ। আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকলে আপনি কী মনে করবেন?

ধৃতি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, কিছু মনে করব না। কলকাতায় এরকম কতজনকে থাকতে হচ্ছে। কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি অত ভাবছ কেন?

ভাবছি আপনার জন্যই। রজত দিল্লি যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থাটা করে গেছে। বিলেতে আমেরিকায় ঘুরে এসেও কেন যে ওর শুচিবায়ু কাটেনি তা কে বলবে? অথচ এতে করে খামোখা আপনাকে অপমান করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অপমান আমারও।

ধৃতি স্মিতমুখে বলল, রজতটা একটু সেকেলে। কিন্তু আমার মনে হয় ও বিশেষ তলিয়ে ভাবেনি।

ভাবা উচিত ছিল।

সকলেরই কি অত ভাবাভাবি আসে?

আপনার বন্ধুর না এলেও আমার আসে। তাই ঠিক করেছি থাকব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, থেকে যাও তা হলে।

খুশি মনে মত দিলেন তো!

দিচ্ছি। শুধু একটু কম টিকটিক করবে।

আমি কি বেশি টিকটিক করি?

না, না, তা বলছি না, তোমার টিকটিক করাটাও শুনতে ভারী ভাল। তবে কিনা—

বুঝেছি।—বলে পরমা রাগ করে বা রাগের ভান করে চলে গেল।

ধৃতি তাকে বেশি ঘাঁটাল না, বরং পণপ্রথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগল। তার ভাগ্য ভাল যে, প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকায় সে চাকরি করে এবং সাব-এডিটর হয়েও স্বনামে নানারকম ফিচার লেখার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ওপরে ওঠার পথ খোলা। সে লেখে ভাল, নামও আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের স্মৃতি খুবই কম। বারবার নামটা তাদের চোখে না পড়লে তারা তাকে মনেও রাখবে না। তবে ধৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে এবং মোটামুটি সত্য ও তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করে।

পরমা রাত্তিরে চমৎকার ডিনার খাওয়াল। আলুর দম, ডাল, পাঁপড় ভাজা আর স্যালাড। টুকটাক কথা হল। তবে ধৃতি অন্যমনস্ক ছিল, পরমাও।

রাত্রিবেলা ধৃতি একটা বই নিয়ে কাত হল বিছানায়। রোজকার অভ্যাস, কিছু না পড়লে ঘুম আসতে চায় না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পড়তে পড়তেই শুনতে পেল, পরমা তার ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজাল এবং আরও সন্তর্পণে ছিটকিনি দিল। একটু হাসল ধৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরমা জানতে পারলে কি দুঃখিত হবে যে ধৃতি কখনওই পরমার প্রতি কোনও দৈহিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে না? পরমা খুব সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ধৃতি সবসময়ে সবরকম সুন্দরী মেয়ের দিকে

আকৃষ্ট হয় না। তার একটু বাছাবাছি আছে। অনেক সময় আবার কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে।

সকালে পুলিশ এল।

আতঙ্কিত পরমা দৌড়ে এসে ঢুকল ধৃতির ঘরে। বিস্ফারিত চোখ, চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় কী করে এসেছেন বলুন তো! এত সকালে পুলিশ কেন?

ধৃতি খুব নিবিষ্টমনে খবরের কাগজ পড়ছিল। চোখ তুলে বলল, গত সাত দিনে মোটে তিনটে খুন আর চারটে ডাকাতি করাতে পেরেছি। এত কম অপরাধে তো পুলিশের টনক নড়ার কথা নয়। যাক গে, আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

বলে ধৃতি উঠল।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, সবসময়ে ইয়ার্কি একদিন আপনার বেরোবে।

হ্যাঁ, যেদিন পালে বাঘ পড়বে।

বলে ধৃতি একটু হাসল। পুলিশ কেন এসেছে তা ধৃতি জানে। প্রধানমন্ত্রীর চা-চক্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। অল্প সময়ে সঠিক ঠিকানায় আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য লালবাজারের পুলিশকে সেই ভার দেওয়া হয়।

ধৃতি পিয়োন বুক-এ সই করে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে ফেলে রাখল। একটু অবহেলার ভঙ্গি। একটা চেয়ার টেনে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আর একবার একটু গরম জল খাওয়াও পরমা। আগের বারেরটা জমেনি।

দিচ্ছি।—বলে পরমা কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

ধৃতি আড়চোখে লক্ষ করছিল পরমাকে। বলল, ওটা আসলে ওয়ারেন্ট।

পরমা উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলল, ইস্, কী লাকি আপনি! প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্ন! ভাবতেই পারছি না।

ধৃতি উদাস মুখে বলল. অত উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ভি আই পি-দের সঙ্গ খুব সুখপ্রদ নয়, অনেক বায়নাক্কা আছে।

পরমা বলল, তবু তো কাছ থেকে দেখতে পাবেন, কথাও বলবেন! আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই?

কী পরিচয়ে যাবে?

পরমা চোখ পাকিয়ে বলে, পরিচয় আবার কী? এমনি যাব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঢুকতে দেবে কেন? বউ হলেও না হয় কথা ছিল।

পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, যদি তাই সেজেই যাই?

তোমার খুব উন্নতি হয়েছে পরমা।

তার মানে?

তুমি আর আগের মতো সেকেলে নেই। বেশ আধুনিক হয়েছ। আমার বউ সেজে রাজভবনে অবধি যেতে চাইছ।

আহা, তাতে দোষ কী?

রজত শুনলে মূর্ছা যাবে।

পরমা মুখোমুখি বসে বলল. কোন ড্রেসটা পরে যাবেন?

ড্রেস? ও একটা পরলেই হল।

মাথা নেড়ে পরমা বলে, না, যা খুশি পরে গেলেই চলবে নাকি? চকোলেট রঙের সেই বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট— বুঝলেন?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, ও বাবা, তুমি আমার পোশাকেরও খবর রাখো দেখছি।
রাখব না কেন? ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি, তাই খবর রাখতে হয়।
ধৃতি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলে বলল, আজ তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছ না যে, আমাকে কোন প্লেসটা দিলে ভাল হয়। একটু আগে আমার বউ সাজতে চাইছিলে, এখন আবার বলছ ছোট ভাই। এরপর কি ভাসুর না মামাশ্বশুর?
পরমা লজ্জা পেয়ে বলে, যা বলেছি মনে থাকে যেন। সাদা প্যান্ট আর চকোলেট বুশ শার্ট।
ঠিক আছে।
প্রাইম মিনিস্টারকে কী জিজ্ঞেস করবেন?
করব কিছু একটা।
এখনও ঠিক করেননি?
প্রশ্ন করার স্কোপ কতটা পাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় উনি বলবেন, আমাদের শুনে যেতে হবে।
তবু কিছু প্রশ্ন ঠিক করে রাখা ভাল।
ধৃতি কফি খেয়ে চিন্তিতভাবে উঠে দাড়ি কামাল, স্নান করল, খেল। তারপর পরমার কথামতো পোশাক পরে বাইরের ঘরে এল। বলল, এই যে পরমা, দেখো।
পরমা খাচ্ছিল, মুখ তুলে দেখে বলল, বাঃ, এই তো স্মার্ট দেখাচ্ছে।
এমনিতে দেখায় না?
যা ক্যাবলা আপনি!
আমি ক্যাবলা?
তাছাড়া কী?—বলে পরমা হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, আজ আর বাইরে খেয়ে আসবেন না। আমি রেঁধে রাখব।
রোজ খাওয়ালে যে রজতটা ফতুর হয়ে যাবে।
যতদিন ও না আসছে ততদিন ওর বরাদ্দ খাবারটাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।
ধৃতি হাসল। বলল, ভাগ্যিস রজতের আর সব শূন্যস্থানও আমাকে পূরণ করতে হচ্ছে না।
বলেই টুক করে বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সে।

৭

ধৃতি অফিসে এসেই শুনল, ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চা-চক্রের রিপোর্টিং তাকেই করতে হবে। সে নিজেও যে আমন্ত্রিত এ কথাটা জেনে চিফ সাব এডিটর বঙ্কুবাবু বিশেষ খুশি হলেন না। বললেন, সবই কপাল রে ভাই। আমি পঁচিশ বছর এ চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঘষে যাচ্ছি, কিছুই হয়নি।
ধৃতি জবাব দিল না। মনে মনে একটু দুঃখ রইল. কপাল যে তার ভাল এ কথা সে নিজেও অস্বীকার করে না। মাত্র কিছুদিন হল সে এ চাকরি পেয়েছে। সাব এডিটর হিসেবেই। তবু তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিচার লিখতে দেওয়া হয় এবং গুরুতর ঘটনার রিপোর্টিং-এ পাঠানো হয়। ধৃতিকে যে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে অফিস তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ অফিসে ভাল ফিচার-লেখক এবং ঝানু রিপোর্টারের অভাব নেই।
প্রধানমন্ত্রী ময়দানে মিটিং সেরে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসবেন সন্ধে সাড়ে-ছ'টায়। এখনও তিনটে বাজেনি। ধৃতি সুতরাং আড্ডা মারতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সম্প্রতি কয়েকজন ট্রেনি জার্নালিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে। মোট চারজন। তারা প্রত্যেকেই স্কুল কলেজে দুর্দান্ত ছাত্র ছিল। বুধাদিত্য হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল হিউম্যানিটিজে। নকশাল আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরবর্তী রেজাল্ট তেমন ভাল নয়। রমেন স্টার পাওয়া ছেলে। এম এ-তে ইকনমিকস-এ প্রথম শ্রেণি। তুষার হায়ার সেকেন্ডারির সায়েন্স স্ট্রিমে শতকরা আটাত্তর নম্বর পেয়ে স্ট্যান্ড করেছিল। বি এসসি ফিজিক্স অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস। এম এসসি করছে। দেবাশিস দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা একাশি পেয়ে পাশ করেছিল। বি এ এম এ-তে তেমন কিছু করতে পারেনি। চারজনের গায়েই স্কুল কলেজের গন্ধ, কারও ভাল করে দাড়ি গোঁফ পোক্ত হয়নি।

এদের মধ্যে রমেনকে একটু বেশি পছন্দ করে ধৃতি। ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি গভীর। কথা কম বলে এবং সবসময়ে ওর মুখে একটা আনন্দময় উজ্জ্বলতা থাকে।

ধৃতি আজ রমেনকে একা টেবিলে কাজ করতে দেখে সামনে গিয়ে বসল।

কী হে ব্রাদার, কী হচ্ছে?

একটা রিপোর্ট লিখছি। কৃষিমন্ত্রীর ব্রিফিং।

ও বাবা, অতটা লিখছ কেন? অত বড় রিপোর্ট যাবে নাকি? ডেসকে গেলেই হয় ফেলে রাখবে, না হলে কেটে ছেঁটে সাত লাইন ছাপবে।

রমেন করুণ মুখে বলে, তা হলে না লিখলেই তো ভাল হত।

মন্ত্রীদের ব্রিফিং মানেই তো কিছু খোঁড়া অজুহাত। ওসব ছেপে আজকাল কেউ কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট করে না। খুব ছোট করে লেখো, নইলে বাদ চলে যাবে।

এই অবধি আমার মোটে চারটে খবর বেরিয়েছে। অথচ পঞ্চাশ-ষাটটা লিখতে হয়েছে।

এরকমই হয়। তবু তো তোমরা ফুল টাইম রিপোর্টার। যারা মফস্‌সলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাদের অবস্থা কত করুণ ভেবে দেখো। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে কত খবর লিখে পাঠাচ্ছে, বছরে বেরোয় একটা কি দুটো।

তা হলে আমাদের কভারেজে পাঠানোই বা কেন?

নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যখন পাকাপোক্ত হবে, স্কুপ করতে শিখবে তখন তোমাকে নিয়েই হবে টানাটানি। যদি মানসিকতা তৈরি করে নিতে পারো তা হলে জার্নালিজম দারুণ কেরিয়ার।

তা জানি। আর সেইজন্যই লেগে আছি। আপনি কি আজ পি এম-এর রাজভবনের মিটিং কভার করছেন?

হুঁ। আমি অবশ্য আলাদা ইনভিটেশনও পেয়েছি।

রমেন একটু হেসে বলে, আশ্চর্যের বিষয় হল, আমিও পেয়েছি।

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তুমিও পেয়েছ! বলোনি তো!

চান্স পাইনি। আজ সকালেই লালবাজার থেকে বাড়িতে এসে দিয়ে গেল। আসলে কী জানেন, আমি একসময়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম, কবিতাও লিখতাম, সেই সূত্র ধরে আমাকেও ডেকেছে।

এখন লেখো না?

লিখি। অল্প স্বল্প। গত মাসেই দেশ-এ আমার কবিতা ছিল।

বটে।—ধৃতি খুশি হয়ে বলে, মনে পড়েছে। আমি দেশ খুলেই আগে কবিতার পাতা পড়ে ফেলি। রমেন সেন তুমিই তা হলে!

অত অবাক হবেন না। আমার মতো কবি বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে।

তা থাক না। কবি কয়েক হাজার আছে বলেই কি তোমার দাম কমে যাবে?

ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর নিয়ম তো তাই বলে। কবিতার ডিমান্ড নেই, কিন্তু সাপ্লাই অঢেল। প্রাইস ফল করতে বাধ্য।

ইকনমিকসের নিয়ম কি আর্টে প্রযোজ্য?

খানিকটা তো বটেই। কবিতা লিখি বলে ক'জন আমাকে চেনে?

ধৃতি একটু হেসে বলে, একটা মনের মতো কবিতা লিখে তুমি যে আনন্দ পাও তা অকবিরা ক'জন পায়?

রমেনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হল। উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কবিতা লিখে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। এত আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই।

তবে! দামটা সেইদিক দিয়ে বিচার কোরো। খ্যাতি বা অর্থ দিয়ে তা মাপাই যায় না। যাক গে, যাচ্ছ তো রাজভবনে?

যাব। বড্ড ভয় করে। কী হবে গিয়ে?

চলোই না। আর কিছু না হোক, রাজভবনের ইন্টিরিয়রটা তো দেখা হবে।

তা বটে। ঠিক আছে, যাব।

কাগজ কলম নিয়ে যেয়ো। যা দেখবে বা শুনবে তার নোট নিয়ো।

আমি নোট নেব কেন? কী হবে? রিপোর্ট তো করবেন আপনি।

তাতে কী? আমি যা মিস করব তুমি হয়তো তা করবে না। দু'জনের রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে করলে জিনিসটা ভাল দাঁড়াবে।

মাথা নেড়ে রমেন বলল, ঠিক আছে।

ডেসক থেকে বিমান হাত উঁচু করে ডাকল, ধৃতি! এই ধৃতি! তোর টেলিফোন।

ধৃতি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ধৃতি বলছি।

আমি বলছি।

কে বলছেন?

গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি টুপুর মা।

ধৃতি একটু স্তব্ধ থেকে বলল, আপনি এখনও কলকাতায় আছেন?

মাইথন থেকে ঘুরে এলাম।

সেখানে কোনও খবর পেলেন?

না। কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আমার মনে হয় ওরা সবাই জানে যে টুপু খুন হয়েছিল।

ওরা মানে কারা?

ওখানকার লোকেরা।

কী বলছে তারা?

কিছুই বলছে না, আমি অনেককে টুপুর কথা জিজ্ঞেস করেছি।

শুনুন, আপনি এলাহাবাদে ফিরে যান। এভাবে ঘুরে ঘুরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

একেবারে যে পারিনি তা নয়। একজন বুড়ো লোক স্বীকার করেছে যে সে টুপুকে বা টুপুর মতো একটি মেয়েকে দেখেছে।

টুপুর মতো মেয়ে কি আর নেই? ভুলও তো হতে পারে!

পারেই তো। সেইজন্য আমি ফিফটি পারসেন্ট ধরছি। টুপুর ঘাড়ের দিকে বাঁ ধারে একটা জরুল আছে। সেটাই ওর আইডেনটিটি মার্ক। বুড়োটাকে সেই জরুলের কথা বলেছিলাম। সে বলল, হ্যাঁ, ওরকম জরুল সেও মেয়েটির ঘাড়ে দেখেছে। এতটা মিলে যাওয়ার পরও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিই কী করে বলুন!

তা বটে।

টুপুর সঙ্গে একজন লোককেও দেখেছে বুড়োটা। খুব দশাসই চেহারা। বিশাল লম্বা। লোকটা নাকি টুপুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল।

বুড়োটা কে?

একজন ফুলওয়ালা। টুপু লোকটার কাছ থেকে ফুল কিনেছিল।

ধৃতি একটু ঘামছিল উত্তেজনায়, ভয়ে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নির্বিকার রেখে সে বলল, ঠিক আছে, শুনে রাখলাম। কিন্তু আমি একজন সামান্য সাব-এডিটর। টুপুর ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারছি না। যা করার পুলিশই করবে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। টুপুর মা বলল, এখন তো ইমার্জেন্সি চলছে, তাই পুলিশ খুব এলার্ট। কিন্তু কেন যেন টুপুর ব্যাপারে তারা তেমন ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। এমনকী খুনটা পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাস করাটা নির্ভর করে এভিডেন্সের ওপর। আপনি আপনার মেয়ের খুনের কোনও এভিডেন্সই যে দিতে পারছেন না।

মায়ের মন সব টের পায়।

কিন্তু পুলিশ তো আর মা নয়?

ঠিক আছে, আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। কিন্তু কখনও-সখনও দরকার হলে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না তো!

না, বিরক্ত হব কেন?

আমি খবরের কাগজের অফিস কখনও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হই তো দেখাবেন? যদি অসুবিধে না থাকে?

নিশ্চয়ই। কবে আসবেন?

এ যাত্রায় হবে না। এলাহাবাদে আমার অনেক সম্পত্তি। সব পরের ভরসায় ফেলে এসেছি। শিগগিরই ফিরতে হচ্ছে। তবে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসি।

বেশ তো, যখন সুবিধে হবে আসবেন।

বিরক্ত হবেন না তো!

না, এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আজ ছাড়ি তা হলে?

আপনার বুঝি খুব কাজ অফিসে?

কাজ না করলে মাইনে দেবে কেন বলুন?

আজ আপনার কী কাজ?

আজ প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং কভার করতে হবে।

ওমা! প্রাইম মিনিস্টার? আপনারা কত ভাগ্যবান! কোথায় মিটিং বলুন তো।

রাজভবনে।

ইস্, কী দারুণ! আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন?

বলব হয়তো।

ভয় করবে না?

ভয় কীসের? পি এম নিজেই তো মিটিং ডেকেছেন। আমাদের কথা শুনবার জন্যই।

কী বলবেন?

ঠিক করিনি। কথা জুগিয়ে যাবে।

একটা কথা পি এমকে বলবেন?

কী কথা?

বলবেন এ দেশে মেয়েদের বড় কষ্ট।

উনি নিজেও তো মেয়ে। উনি কি আর ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা জানেন না?

জানেন। উনি সব জানেন। এ দেশের মেয়েরা ওঁর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছে। তবু আপনি তো পুরুষ মানুষ, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের কষ্টের কথা শুনলে উনি খুশি হবেন।

ওঁকে খুশি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়।

টুপুর মা একটু চুপ করে থেকে বলে, তা ঠিক। তবে কী জানেন, ওঁকে খুশি করতে কেউ চায় না, সবাই শুধু ওঁর দোষটাই দেখে। পি এম একজন মহিলা বলেই কি আপনারা পুরুষেরা ওঁকে সহ্য করতে পারেন না?

তা কেন? পি এম মহিলা না পুরুষ সেটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। আমরা দেখব ওঁর কাজ।

আমার মনে হয় পুরুষেরা ওঁকে হিংসে করে।

তা হলে পি এম পুরুষদের ভোটই পেতেন না। আপনি ভুল করছেন। এ দেশের লোকেরা ইন্দিরা গাঁধীকে মায়ের মতোই দেখে।

বলছেন! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। দেশটা একটু ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন।

তা অবশ্য ঠিক। আমি দেশের কতটুকুই বা দেখেছি! কলকাতা আর এলাহাবাদ। আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, না?

খুব না হলেও কিছু ঘুরেছি, আর লোকের সঙ্গেও মিশি। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি।

জানেন আমাদের এলাহাবাদের হাইকোর্টেই ওঁর মামলাটা হচ্ছিল, আমরা তখন প্রায়ই কোর্টে যেতাম। কী থ্রিলিং! তারপর উনি যখন হেরে গেলেন, কী মন খারাপ!

হতেই পারে। আপনি খুব ইন্দিরা-ভক্ত।

তা বলতে পারেন। আমি ওঁর ভীষণ ভক্ত। আপনি নন?

আমি! আমার কারও ভক্ত হলে চলে না।

ইন্দিরা এলাহাবাদের মেয়ে জানেন তো! আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের আনন্দ ভবন বেশি দূরেও নয়। ছাদে উঠলে দেখা যায়। আপনি তো গেছেন এলাহাবাদে, তাই না?

হ্যাঁ, তবে খুব ভাল করে শহরটা দেখিনি।

এবার গেলে দেখে আসবেন। খুব সুন্দর শহর।

আচ্ছা দেখব।

আর একটা কথা।

বলুন।

আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের।

তেমন কিছু নয়।

বলছিলাম কী, আমাকে দয়া করে পাগল ভাববেন না।

ভেবেছি নাকি?

হয়তো ভেবেছেন। ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। সেই এলাহাবাদ থেকে মাঝরাতে ট্রাঙ্ককল করা, তারপর মাঝে মাঝেই এইভাবে টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করা, তার ওপর টুপুর ঘটনা নিয়ে উটকো দায় চাপানো, আমি জানি আমার আচরণ খুব অদ্ভুত হচ্ছে। তবু আমি কিন্তু পাগল নই।

আপনি যা করেছেন তা স্বাভাবিক অবস্থায় তো করেননি।

ঠিক তাই। শোকে তাপে অস্থির হয়ে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

আমি আপনাকে পাগল ভাবিনি। কিন্তু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। টুপুর বাবা কোথায়?

ওমা! বলিনি আপনাকে?

বলেছিলেন! তবে বোধহয় ভুলে গেছি।

আমার স্বামী বেঁচে থেকেও নেই।

তার মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপুর মা বলে, মানে বুঝে আর কাজ নেই। আমার স্বামী ভাল লোক নন। তবে বড়লোকের ছেলে, তাই তাঁকে সবই মানিয়ে যায়।

তিনি এখন কোথায়?

যতদূর জানি বম্বেতে। একটি কচি মেয়ের সঙ্গে থাকেন।

তিনি বেঁচে থাকতে আপনি তাঁর সম্পত্তি পেলেন কী করে?

তাঁর সম্পত্তি পেলাম শাশুড়ি সেইরকম বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিলেন বলেই। তাছাড়া আমার বাপের বাড়িও খুব ফেলনা ছিল না। সেদিক থেকেও কিছু পেয়েছি।

মাপ করবেন, এসব প্রশ্ন করা বোধহয় ঠিক হল না।

টুপুর মা একটু হাসলেন, আমাকে যে-কোনও প্রশ্নই করতে পারেন। আমার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শোকে তাপে জ্বালায় আমি এখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। ছাড়ছি।

আচ্ছা।

ধৃতি টেলিফোন রেখে দিল। তার ভ্রূ একটু কোঁচকানো। মুখ চিন্তান্বিত।

নিউজ এডিটর ডেসকের সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে যাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ধৃতি, আজ তো তুমি পি এম-এর রাজভবন মিটিং কভার করবে।

হ্যাঁ।

কোনও পলিটিক্যাল ইস্যু তুলো না কিন্তু। মোটামুটি ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রবলেমের ওপর প্রশ্ন করতে পারো। ইমার্জেন্সি নিয়েও কিছু বলতে যেয়ো না।

না, ওসব বলব না।

আমাদের কাগজের ওপর রুলিং পার্টি খুব সন্তুষ্ট নয়। টেক-ওভারের কথাও উঠেছিল। সাবধানে এগিয়ো।

ঠিক আছে।

ইয়ং রাইটারদের কাকে কাকে চেনো?

কয়েকজনকে চিনি।

তা হলে তো ভালই। পি এমকে কী জিজ্ঞেস করবে বলে ঠিক করেছ?

ধৃতি মৃদু হেসে বলে, দেখি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতির অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে। যেমন, আপনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভালই করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনী মামলায় হেরে যাওয়ার পর করলেন কেন? এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হল না? কিংবা বিরোধীরা কোনও রাজ্যে সরকার গড়লেই কেন্দ্র তার পিছনে লাগে কেন? কেনই বা নানা উপায়ে সেই সরকারকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে? আপনার কি মনে হয় না যে এতে সেই রাজ্যের ভোটাররা অপমানিত বোধ করতে থাকে এবং ফলে দ্বিগুণ সম্ভাবনা থেকে যায় ফের ওই রাজ্যে বিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার? কিংবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন আপনার ভাবমূর্তি অতি উজ্জ্বল, যখন স্বতস্ফূর্ত ভোটের বন্যায় আপনি অনায়াসে ভেসে যেতে পারতেন তখন বাহাত্তরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক রিগিং হয় তার কোনও দরকার ছিল কি? আপনি এমনিতেই বিপুল ভোট পেতেন, তবু রিগিং করে এখানকার ভোটারদের অকারণে চটিয়ে দেওয়া কি অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? কিংবা আপনি যেমন ব্যক্তিত্বে, ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে অতীব উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মানুষ, আপনার

আশেপাশে বা কাছাকাছি তেমন একজনও নেই কেন? আপনার দলের সকলেই কেন আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনারই করুণাভিক্ষু? কেন আপনার দলে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সেকেন্ড লাইন অফ লিডারশিপ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা যাবে না। ধৃতি জানে, এই জরুরি অবস্থায় এসব প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। তাছাড়া এই চা-চক্রটি নিতান্তই বুদ্ধিজীবীদের। এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক কথাই উঠতে পারে।

নিউজ এডিটর বললেন, একটু সাবধানে প্রশ্ন-টশ্ন কোরো। আর ওয়াচ কোরো কোন কবি সাহিত্যিক কী জিজ্ঞেস করেন।

ধৃতি একটু হেসে বলে, কবি সাহিত্যিকদের আমি জানি। তারা খুব সেয়ানা লোক। কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন তারা করবে না।

সে তো জানি। তবু ওয়াচ কোরো। আর দরকার হলে গাড়ি নিয়ে যেয়ো। মোটর ভেহিকেলসে তোমার নামে গাড়ি বুক করা আছে।

দরকার নেই।

নেই? তা হলে ঠিক আছে।

মোটর ভেহিকিলসের গাড়ি নেওয়ার ঝক্কি অনেক। এই অফিসের সবচেয়ে কুখ্যাত বিভাগ হচ্ছে ওই মোটর ভেহিকিলস, গাড়ি মানেই চুরি। পার্টস, পেট্রল, টায়ার। এই কারণে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি তিতিবিরক্ত হয়ে নিজস্ব মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট তুলেই দিচ্ছে। দিয়ে বাইরের গাড়ি ভাড়া করে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃতি কয়েকবারই অফিসের কাজে গাড়ি নিয়েছে। নিতে গিয়ে দেখেছে গাড়ির ইনচার্জ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে, দয়া করার মতো গাড়ি দেয়, গাড়ির ড্রাইভারও ভদ্র ব্যবহার করে না, সব জায়গায় যেতে চায় না। বলতে গেলে মহাভারত। তাই ধৃতি অফিসের গাড়ি পারতপক্ষে নেয় না। আজও নেবে না।

পাঁচটার পর ধৃতি আর রমেন বেরোল।

রাজভবনের ফটকে কড়া পাহারা। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কার্ড দেখাতেই ফটকের পুলিশ অফিসার উলটেপালটে দেখে বলল, যান।

দু'জনে ভিতরে ঢুকতেই আবার পুলিশ ধরল এবং আবার কার্ড দেখাতে হল। এবং আবার এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলল।

রমেন নিচুস্বরে বলল, ধৃতিদা!

বলো।

বেশ ভয় ভয় করছে।

কেন বলো তো!

আপনার করছে না?

নাঃ। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভয় কীসের? আমিও গণ তিনিও গণ।

রমেন একটু হেসে বলে, পুলিশ তা মনে করে না।

তা অবশ্য ঠিক। তবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করেছে। পি এম-এর কিছু হলে সরকারের বদনাম।

রমেন মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, রাজভবনের ভিতরের এই রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন তা জানেন?

এমনি। পেবলের রাস্তা আরও কত জায়গায় আছে। বেশ লাগে।

রমেন মাথা নেড়ে বলল, না। এর একটা অন্য কারণও আছে।

তাই নাকি?

আমার কাকা পুলিশে চাকরি করতেন। বিগ অফিসার ছিলেন। নাম বললেই হয়তো চিনে ফেলবেন, তাই আপাতত নাম বলছি না। যখন চৌ এন লাই কলকাতায় এসে রাজভবনে ছিলেন তখন কাকা ছিলেন তাঁর সিকিউরিটি ইনচার্জ। তিনিই কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন।

তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

আপনার মতোই সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন। চৌ এন লাই খুব মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, মোটেই তা নয়। নুড়িপাথরের ওপর গাড়ি চললে শব্দ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে লাটসাহেবদের সিকিউরিটির জন্যই ওই ব্যবস্থা। তারপর চৌন এন লাই কাকাকে একটা গাড়ির শব্দ শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, নাউ ইউ সি দ্যাট অন এ পেবল রোড দি সাউন্ড অফ এ কার কামিং অর গোয়িং ক্যানট বি সাপ্রেসড!

ধৃতি হেসে বলল, তাই হবে। সাহেবদের খুব বুদ্ধি ছিল।

চৌ এন লাইয়েরও কম ছিল না। আমার কাকা পুলিশ হয়েও যেটা বুঝতে পারেননি উনি ঠিক পেরেছিলেন।

সিঁড়ির মুখে আর এক দফা বাধা ডিঙিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকল তারা, তখন সেখানে ভীরু ও সংকুচিত মুখে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট জড়ো হয়েছে। রাজভবনের কালো প্রাচীন লিফটের সামনে বেশ একখানা ছোটখাটো ভিড়। এদের অনেককেই ধৃতি চেনে, রমেনও।

কয়েক ব্যাচ লিফট-বাহিত হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পরই ধৃতি আর রমেনের পালা এল। লিফটম্যান সাফ জানিয়ে দিল, দোতলায় মিটিং বটে কিন্তু লিফট খারাপ বলে দোতলায় থামছে না। তিনতলায় উঠে দোতলায় নামতে হবে।

ধৃতি লিফটের ব্যাপারটা মনে মনে নোট করল। খরচের ওপর এখন কড়া সেনসর। কাজেই রাজভবনের লিফট ক্রটিযুক্ত এ খবরটা লেখা হলেও ছাপা যাবে কি না এতে ঘোর সন্দেহ।

তিনতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দু'জনে কিছু আতান্তরে পড়ে গেল। লিফটের সামনে সংকীর্ণ করিডোরে নেমে কোনদিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে সকলেই গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খেতেও কেউ সাহস করছে না। ফিসফাস কথা বলছে শুধু।

সেই ভিড়ে ধৃতি আর রমেনও দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন সকলেই খানিকটা উসখুস করছে তখনই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং তরুণ এক মিলিটারি অফিসার করিডোরে ঢুকেই হাত নেড়ে সবাইকে প্রায় গোরু তাড়ানোর মতো করে নিয়ে তুলল দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায়।

বারান্দার পরেই একখানা হলঘর। তাতে মস্ত মস্ত টেবিল পাতা। টেবিলে খাবার সাজানো থরে থরে। উর্দিপরা বেয়ারা ছাড়া সে ঘরে কেউ নেই। বোঝা গেল এই ঘরেই ইন্দিরার সঙ্গে তারা সবাই চা খাবে। তবে আপাতত প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় কয়েকজন সিগারেট ধরাল। কে এসে চুপি চুপি খবর দিল। ময়দানের মিটিং শেষ হয়েছে। ইন্দিরা রাজভবনে রওনা হয়েছেন। সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন, অসহজ, অপ্রতিভ। যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক বটে, কিন্তু সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। রাজভবনে আসা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাদের জীবনে খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। তার ওপর জরুরি অবস্থার একটা গা ছমছমে ব্যাপার তো আছেই।

খুবই আকস্মিকভাবে একটা চঞ্চলতা বয়ে গেল ভিড়ের ভিতর দিয়ে।

এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্মার্ট চেহারা, মুখে সপ্রতিভ হাসি, হাতজোড়।

বললেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তো! আসুন আসুন, এ ঘরে আসুন।

আবহাওয়াটা কিছু সহজ হয়ে গেল। হাত পায়ে সাড় এল যেন সকলের।

হলঘরে ঢুকে ভাল করে থিতু হওয়ার আগেই ধৃতি অবিশ্বাসের চোখে দেখল, ইন্দিরা ঘরে ঢুকছেন।

সে কখনও ইন্দিরা গাঁধীকে এত কাছ থেকে দেখেনি। দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। ছবিতে যেরকম দেখায় মোটেই সেরকম নন ইন্দিরা। ছোটখাটো ছিপছিপে কিশোরীপ্রতিম তাঁর শরীরের গঠন। গায়ের রং বিশুদ্ধ গোলাপি। মুখে সামান্য পথশ্রমের ছাপ আছে। কিন্তু হাসিটি অমলিন।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকেই আবহাওয়াটা আরও সহজ করে দিলেন। ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। সঙ্গে ঘুরছেন রাজ্যপাল ডায়াসের পত্নী।

ধৃতি প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ইন্দিরা তার মুখোমুখি এসে গেলেন।

ধৃতি চিন্তা না করেই হঠাৎ ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, আপনি কবিতা গল্প উপন্যাস পড়েন?

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইন্দিরা বললেন, সময় তো আমার খুব কমই হাতে থাকে। তবু পড়ি। আমি পড়তে ভালবাসি।

কীরকম লেখা আপনার ভাল লাগে?

একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, হতাশাব্যঞ্জক কিছুই আমার পছন্দ নয়, জীবনের অস্তিবাচক দিক নিয়ে লেখা আমি পছন্দ করি।

মহান ট্র্যাজেডিগুলো আপনার কেমন লাগে?

যা মহান তা তো ভাল বলেই মহান।

আর সুযোগ হল না। আর একজন এসে মৃদু ঠেলায় সরিয়ে দিল ধৃতিকে।

ধৃতি সরে এল।

ইন্দিরা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। থাক করা প্লেট থেকে একটা-দুটো তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। ধৃতি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন যে ইন্দিরার হাত থেকে প্লেট নিতে পারল। প্লেটটা নিয়েই সে মৃদু স্বরে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী মহিলা জীবনে দেখিনি। সুন্দরীরা সাধারণত বোকা হয়।

ইন্দিরা তার এই দুঃসাহসিক মন্তব্যে রাগ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চমৎকার কথা। ধৃতি মনে মনে কথাটা টুকে রাখল।

রাজভবনের জলখাবার কেমন তা সাংবাদিক হিসেবেই লক্ষ করছিল ধৃতি। খুব যে উঁচুমানের তা নয়। মোটামুটি খেয়ে নেওয়া যায়। খারাপ নয়, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তবে ইন্দিরা গাঁধীও এই খাবার মুখে দিচ্ছেন, এইটুকুই যা বলার কথা।

রমেন একটা প্যাস্ট্রি কামড়ে ধৃতিকে নিচু স্বরে বলল, পি এম-কে আমার হয়ে একটা প্রশ্ন করবেন?

কী প্রশ্ন?

উনি কবিতা পড়েন কি না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমি অলরেডি অনেক বাচালতা করে ফেলেছি। এবার তুমি করো।

ও বাবা, আমার ভয় করে।

ভয়! ইন্দিরাজিকে ভয়ের কী?

আপনার গাটস আছে, আমার নেই।

গাটস নয়। আমি জানি ইন্দিরাজি সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে। ওঁর একটা দারুণ কালচারাল

ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যা পলিটিক্যাল দলবাজিতে মার খায়নি। উনি হিউমার বোঝেন, আর্ট ভালবাসেন, সৌন্দর্যবোধ আছে, যা পলিটিক্সওয়ালাদের অধিকাংশেরই নেই। এই মানুষকে যদি ভয় পেতে হয় তো পাবে ওঁর প্রতিপক্ষরা, আমরা পাব কেন?

আপনি কি একটু ইন্দিরা-ভক্ত, ধৃতিদা?

আমি তো পলিটিক্স বুঝি না, কিন্তু মানুষ হিসেবে এই মহিলাকে আমার দারুণ ভাল লাগে। তবে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমিই বলে দিতে পারি, ইন্দিরাজি কবিতা না ভালবেসেই পারেন না। ওঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পড়ে গেল দু'জন। মুখ্যমন্ত্রী রায় সকলকেই বদান্যভাবে স্মিতহাসি বিতরণ করছিলেন। ধৃতির দিকে চেয়ে সেই হাসিমাখা মুখেই বললেন, চা খেয়েই হলঘরে চলে যাবেন, কেমন?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

হলঘরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারির মতো। ডায়াসে পাঁচখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দিরা, রাজ্যপাল ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধিজীবীরা একে একে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নাম, কী লেখেন বা আঁকেন ইত্যাদি। ইংরিজি বা হিন্দিতে। ধৃতি দ্রুত নোট নিতে নিতেই নিজের পালা এলে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে নিল।

ধৃতি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। প্রত্যেকেই আড়ষ্ট, নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং কেউই আজকের আলোচনায় প্রাধান্য চায় না। সবকিছুরই মূলে রয়েছে ইমার্জেন্সি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব জুজুর ভয়। ইউ পি-তে নাসবন্দির কথা শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে বস্তি এবং বসত উচ্ছেদের কথা কানাকানি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস সঞ্জয় গাঁধী ও তাঁর অত্যুৎসাহী সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীরাও ভীত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা ততোধিক। বিরোধী নেতাদের অনেকেই কারাগারে, ঠোঁটকাটা কতিপয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ রাজরোষের শিকার। আর সবকিছুর মূলে যিনি, সেই অখণ্ড কর্তৃত্বময়ী নারী এখন ধৃতির চোখের সামনে ওই বসে আছেন। কিন্তু ধৃতি কিছুতেই মহিলাকে অপছন্দ করতে পারছিল না। একটু অস্বস্তি তারও আছে ঠিকই, কিন্তু এই মহিলার মানবিক আকর্ষণটাও তো কম নয়। এঁকে সে ডাইনি ভাববে কী করে?

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর দু'-চারজন উঠে একে একে ভয়ে ভয়ে দু'-চার কথা বলল। তেমন কোনও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। কেউ বলল, লেখক ও কবিদের জন্য একটা স্টুডিয়ো করে দেওয়া হোক। কারও প্রস্তাব, সরকার তাদের গ্রন্থ প্রকাশে কিছু সাহায্য করুক। এইরকম সব এলেবেলে কথা।

ইন্দিরা সাধ্যমতো জবাব দিলেন। কিছু জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীও। তবে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না।

সবশেষে ইন্দিরা দু'-চারটে কথা খুব শান্ত গলায় বললেন। প্রধান কথাটা হল, এখন নিরাশার সময় নয়। নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। শিল্পে বা সাহিত্যেও কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এবং কিছু স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্ববোধও।

সবাই খুশি। তেমন কোনও ওপর-চাপান দেননি ইন্দিরা, শাসন করেননি, ভয় দেখাননি। স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সবাই। জরুরি অবস্থায় শুধু একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

ধৃতি জানে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশেরই কোনও রাজনৈতিক বোধ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতার চাষ তাঁরা বেশিরভাগই করেন না। একমাত্র বামপন্থী

লেখক কবি বা শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় তেমন বেশি নন।

তাছাড়া বামপন্থী বা মার্কসীয় সাহিত্য বাংলায় তেমন সফলও হয়নি। সুতরাং তাঁদের কথা না ধরলেও হয়। বাদবাকিরা রাজনীতিমুক্ত বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির দলীয় কোন্দল থেকে তাঁদের বাস বহুদূরে। সেটা ভাল না মন্দ সে বিচার ভিন্ন। তবে এই জরুরি অবস্থার দরুন তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই। সেই অস্বস্তি ইন্দিরা আজ কাটিয়ে দিলেন।

অফিসে এসে রিপোর্ট লিখতে ধৃতির ন'টা বেজে গেল। কপিটা নিউজ এডিটরের টেবিলে গিয়ে রেখে সে বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না। যাচ্ছি।

শরীর ভাল নেই তো অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও। বলে দিচ্ছি।

না, চলে যেতে পারব।

তা হলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দেখছি। রিপোর্টটা আপনি যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ অপেক্ষা করব কি?

না, তার দরকার নেই। কিছু অদলবদল দরকার হলে আমিই করে নিতে পারব। সেনসর থেকে আগে ঘুরে আসুক তো।

ধৃতি বেরিয়ে এল। কাউকে সঙ্গে নিল না। রাস্তায় একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। আর ট্যাকসিতে বসেই বুঝতে পারল তার প্রবল জ্বর আসছে। জ্বরের এই লক্ষণ ধৃতি খুব ভাল চেনে। ছাত্রাবস্থা থেকেই হোটেলে মেসে এবং রেস্তোরাঁয় আজেবাজে খেয়ে তার পেটে একটা বায়ুর উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যখনই উপসর্গটা দেখা দেয় তখনই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায় একশো তিন চার ডিগ্রি। এক ডাক্তার বন্ধু একবার বলেছিল, তোর জ্বর হলে পেটের চিকিৎসা করাবি, জ্বর সেরে যাবে।

এ জ্বরটা সেই জ্বর কি না বুঝতে পারছিল না সে। তবে যখন বাসার সামনে এসে নামল তখন সে টলছে এবং চোখে ঘোর দেখছে।

নিতান্তই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে চেষ্টা করল। থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে। পরমা বাসায় আছে তো! যদি না থাকে তবে একটু বিপাকে পড়তে হবে তাকে।

দোতলা অবধি উঠে তিনতলার সিঁড়িতে পা রেখে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৃতি। মাথাটা বড্ড টলমল করছে।

কী হয়েছে আপনার?

ধৃতি আবছা দেখল, একটা মেয়ে, চেনা মুখ। এই ফ্ল্যাটবাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকে। বেশ চেহারাখানা, বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি ঘন এবং গাঢ় শ্বাস ফেলছিল, শরীরটা বাস্তবিকই যে কতটা খারাপ তা এতক্ষণ সে টের পায়নি, এবার পাচ্ছে, তবু মর্যাদা বজায় রাখতে বলল, আমি পারব।

আপনার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

পারব। ও কিছু নয়।

সত্যিই পারবেন? আমার দাদা আর বাবা ঘরে আছে, তাদের ডাকি? ধরে নিয়ে ওপরে দিয়ে আসবে।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, পারব, একটু রেস্ট নিয়ে নিই তা হলেই হবে।

তবে আমাদের ফ্ল্যাটে বসে রেস্ট নিন। আমি পরমাদিকে খবর পাঠাচ্ছি।

সহৃদয় পুরুষ এবং সহৃদয়া মহিলার সংখ্যা আজকাল খুব কমে গেছে। আজকাল ফুটপাথে পড়ে-থাকা মানুষের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দায়িত্ব নিতে সকলেই ভয় পায়। মেয়েটির আন্তরিকতা তাই বেশ লাগছিল ধৃতির। সে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু দু' ধাপ সিঁড়ি নামতে গিয়েই মাথাটা একটা চক্কর দিয়ে ভোম হয়ে গেল। তারপরই চোখের

সামনে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। ধৃতি একবার হাত বাড়াল শেষ চেষ্টায় কিছু ধরে পতনটা সামলানোর জন্য। কিন্তু থাই। নিজের শরীরের ধমাস করে শানে আছড়ে পড়াব শব্দটা শুনতে পেল ধৃতি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।

যখন চোখ চাইল তখন পরমা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগ।

ধৃতি চোখ মেলতেই পরমা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে? একটু ভাল?

ধৃতি পূর্বাপর ঘটনাটা মনে করতে পারল না। শুধু মনে পড়ল, সিঁড়ির ধাপে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল লাগছিল তার। শরীরে জ্বর। কিন্তু এই জ্বর তার হয় পেটের গোলমাল থেকে। দীর্ঘকাল মেসে হোটেলে খেয়ে তার একটা বিশ্রী রকমের অম্বলের অসুখ হয়। এখনও পুরোপুরি সারেনি। সেই চোরা অম্বল থেকে পেটে গ্যাস জমে মাঝে মাঝে জ্বর হয় তার। আর এই অবস্থায় শরীর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ধৃতি পরমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ, না?

ভয় হবে না! কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন! ওরা সব ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন তো আমি সেই দৃশ্য দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসে বলে গেল, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ধৃতি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ভয় পেয়ো না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়।

জ্বর হতেই পারে। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কেন?

ধৃতি ফের একটু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই মেয়েটাকে দেখেই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

যাঃ! ইয়ারকি হচ্ছে?

কেন, মেয়েটা সুন্দর নয়?

সুন্দর নয় তো বলিনি। তবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয় মোটেই। পৃথাকে আপনি বহুবার দেখেছেন।

ধৃতির আর ইয়ারকি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

শুনছেন? ডাক্তার আপনাকে গরম দুধবার্লি খাইয়ে দিতে বলে গেছেন।

দুধ-বার্লি আমি জীবনে খাইনি। ওয়াক।

অসুখ হলে লোকে তবে কী খায়?

ও আমি পারব না।

না খেলে দুর্বল লাগবে না?

পি এম-এর পার্টিতে খেয়েছি। খিদে নেই।

কী খাওয়াল ওখানে?

অনেক কিছু।

পি এম-কে দেখলেন?

দেখলাম।

আপনি ভাগ্যবান। আমাকে দেখালেন না তো? আচ্ছা আপনি ঘুমোন। একটু বাদে তুলে খাওয়াব।

ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডেকো না পরমা। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই কি হয়? খেতে হবে।

হবেই?

না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে ওপরে এনেছিল, না?

প্রায় সেইরকম? কেন বলুন তো।

আমিও বুঝতে পারছি না হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়ের সামনে গাড়লের মতো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ওদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

পরমা সামান্য হেসে বলে, অজ্ঞান কি কেউ ইচ্ছে করে হয়?

ইচ্ছাশক্তিও এক মস্ত শক্তি। ইচ্ছাশক্তি খাটাতে পারলে আমি কিছুতেই অজ্ঞান হতাম না।

এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কেউ তো আর কিছু বলেনি!

বলার দরকারও নেই। আমি শুধু ভাবছি আমার ইচ্ছাশক্তি এত কম কেন।

মোটেই কম নয়। আজ আপনার খুব ধকল গেছে। সেইজন্য।

ধৃতি একটু গুম হয়ে থেকে বলে, আচ্ছা কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। শোনো তোমাদের রাত্রে রুটি হয়নি?

হচ্ছে।

তাই দু'খানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ডাল-ফাল যা হোক কিছু।

শঙ্কিত গলায় পরমা বলে, রুটি খেলে খারাপ হবে না তো?

আরে না। বার্লি-ফার্লি আমি কখনও খাই না। দুধও চুমুক দিয়ে খেতে পারি না। রুটিই আনো।

পরমা উঠে গেল।

ধৃতি চেয়ে রইল সিলিং-এর দিকে। বড় আলো নেভানো। ঘরে একটা কমজোরি বালবের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। ধৃতি চেয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে সে কখনও অজ্ঞান হয়নি। শরীর শত খারাপ হলেও না। তবে আজ তার এটা কী হল? ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে না তো তার? জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না তো?

নিজেকে নিয়ে ধৃতির চিন্তার শেষ নেই।

পরমা রুটি নিয়ে এল। দু'খানার বদলে ছ'খানা। ডাল, তরকারি, আলুভাজা, মাংস অবধি।

ও বাবা, এ যে ভোজের আয়োজন।

রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ। আমার বারোটা তুমিই বাজাবে।

ওমা, আমি বারোটা বাজাব কী করে?

জ্বোরো রুগিকে কেউ ঘি খাওয়ায়?

রুটি শুকনো কেউ খায়?

ধৃতি একটু হাসল। পরমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। গ্রে ম্যাটার ওর মাথায় খুবই কম। তবে পরমা মেয়েটা বড় ভাল মানুষ। ধৃতি তাই খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু বিস্বাদ মুখে তেমন কিছুই খেয়ে উঠতে পারল না। পরমার অনেক তাগিদ সত্ত্বেও না।

ওষুধ খেয়ে সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জ্বর-যন্ত্রণায় কাতর শরীরে নিপাট নিশ্ছিদ্র ঘুম হয় না। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুমের চটকা ভেঙে চোখ চেয়েই সে পিপাসায় 'ওঃ' বলে শব্দ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন কাছে এল। একটা সুন্দর গন্ধ পেল ধৃতি। ঘুমজড়ানো চোখে অবাক হয়ে দেখল, পরমা।

তুমি! তুমি জেগে আছ কেন?

ওমা! আপনার এত জ্বর আর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোব?

ধৃতি ম্লান একটু হেসে বলে, বন্ধুপত্নী, তুমি বড়ই সরলা।

সরলা! হোয়াট ডু ইউ মিন? বোকা নয় তো!

বোকা ছাড়া আর কী বলা যায় বলো তো তোমাকে! একেই তো পর-পুরুষের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বসবাস করছ। তার ওপর আবার এক ঘরে এবং এত রাতে!

তাতে কী হয়েছে বলুন তো!

এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে হতে কতক্ষণ! কথাটা বাইরে জানাজানি হলে যা একখানা নিন্দে হবে দেখো।

ঠোঁট উলটে পরমা বলে, হোক গে। তা বলে একশো চার জ্বরের একজন রুগিকে একা ঘরে ফেলে রাখতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, একটু জল দাও।

পরমা জল দেয় এবং ধৃতি শোয়ার পর তার কপালে জলে ভেজা ঠান্ডা করতলটি রেখে নরম স্বরে বলে, ঘুমোন, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার কাছে থাকব।

থাকার দরকার নেই। এবার গিয়ে ঘুমোও।

জ্বরটা আর একটু কমুক। তারপর যাব।

এত ভাবছ কেন বলো তো!

কী জানি কেন, তবে কারও অসুখ করলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আপনাকে তো দেখার কেউ নেই।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তারও এ কথাটা মনে হয়। তার বাস্তবিকই কেউ নেই। দাদা দিদি এরা থেকেও অনাত্মীয়। তবে বয়সের গুণে এবং কাজকর্মের মধ্যে থাকার দরুন আত্মীয়হীনতা তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে না। বরং কেউ না থাকায় সে অনেকটাই স্বাধীন। তবু এইরকম অসুখ-বিসুখের সময় বা হঠাৎ ডিপ্রেশন এলে একাকিত্বটা সে বড় টের পায়।

পরমা কপালে একটা জলপটি লাগাল। বলল, মাথাটা একটু ধুয়ে দিতে পারলে হত।

এত রাতে আর ঝামেলায় যেয়ো না। আমি অনেকটা ভাল ফিল করছি।

একশো চার জ্বরে কেমন ভাল ফিল করে লোকে তা জানি।

তুমি সত্যিই জেগে থাকবে নাকি?

থাকব তো বলেছি।

ধৃতি পরমার দিকে তাকাল। আবছা আলোয় এক অদ্ভুত রহস্যময় সৌন্দর্য ভর করেছে পরমার শরীরে। এলো চুলে ঘেরা মুখখানা যে কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ধৃতি পরমার প্রতি কখনওই কোনও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি। আজও করল না। কিন্তু মেয়েটার প্রতি সে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত মায়া আর ভালবাসা টের পাচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দু'খান্না হাতে পরমার হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে ধৃতি বলল, তোমার মনটা যেন চিরকাল এরকমই থাকে পরমা। তুমি বড় ভাল।

হঠাৎ পরমার মুখখানা তার মুখের খুব কাছাকাছি সরে এল।

গাঢ়স্বরে পরমা বলল, আর কমপ্লিমেন্ট দিতে হবে না। এখন ঘুমোন।

ধৃতি ঘুমোল। এক ঘুমে ভোর।

জ্বরটা ছাড়লেও দিন দুই বেরোতে পারেনি ধৃতি। তিনদিনের দিন অফিসে গেল।

ফোনটা এল চারটে নাগাদ।

এ ক'দিন অফিসে আসেননি কেন? আমি রোজ আপনাকে ফোন করেছি।

ধৃতি একটু শিহরিত হল গলাটা শুনে। বলল, আমার জ্বর ছিল।

আপনার গলার স্বরটা একটু উইক শোনাচ্ছে বটে। যাই হোক, সেদিন পি এম-এর সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউয়ের রিপোর্ট কাগজে পড়েছি। বেশ লিখেছেন। কিন্তু আপনারা কেউই পি এম-কে তেমন অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি।

পি এম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁকে রংফুটে ফেলা কি সহজ?

তা বটে।

আপনি এখনও এলাহাবাদে ফিরে যাননি?

না। রোজই যাব যাব করি। কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে যায়। আবার ভাবি, গিয়েই বা কী হবে। টুপু নেই, ফাঁকা বাড়িতে একা একা সময়ও কাটে না ওখানে।

এখানে কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন?

এখানে! ও বাবাঃ, কলকাতায় কি সময় কাটানোর অসুবিধে? ছবির একজিবিশনে যাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনি, থিয়েটার দেখি, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যাই, আর ঘুরে বেড়ানো বা মার্কেটিং তো আছেই।

হ্যাঁ, কলকাতা বেশ ইন্টারেস্টিং শহর।

আপনারও কি কলকাতা ভাল লাগে?

লাগে বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

আমার! আমার প্রায় কেউই নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকি।

ওমা। বলেননি তো কখনও?

এটা বলার মতো কোনও খবর তো নয়।

আপনার মা বাবা নেই?

না।

ভাই বোন?

আছে, তবে না থাকার মতোই।

আপনি তা হলে খুব একা?

হ্যাঁ।

ঠিক আমার মতোই।

আপনার একাকিত্ব অন্যরকম। আমার অন্যরকম।

আচ্ছা, একটা প্রস্তাব দিলে কি রাগ করবেন?

রাগ করব কেন?

আমাদের বাড়িতে আজ বা কাল একবার আসুন না!

কী হবে এসে? টুপুর ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, কারওরই কিছু করার নেই বোধহয়। কিন্তু তাতে কী? আমি আপনার একটু সঙ্গ চাই। রাজি হবেন না?

না, রাজি হতে বাধা নেই। আচ্ছা যাব'খন।

ওরকম ভাসা-ভাসা বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনি কাল বিকেলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

কখন?

চারটে।

বিকেলে যে আমার অফিস।

কখন ছুটি হয় আপনার?

রাত ন'টা।

তা হলে সকালে আসুন। এখানেই দুপুরে খেয়ে অফিসে যাবেন।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ফেলছেন! আমি কেমন লোক তাও তো জানেন না।

ওপাশে একটু হাসি শোনা গেল। টুপুর মা একটু বেশ তরল স্বরেই বলল, বরং বলুন না যে, আমি আপনার অচেনা বলেই ভয়টা বরং আপনার।

ধৃতি বলে, আমি ভবঘুরে লোক, আত্মীয়হীন, আমার বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। পুরুষদের বেলায় বিপদ কম। মহিলাদের কথা আলাদা।

আপনার কিছুই তেমন জানি না বটে, চাক্ষুষও দেখিনি, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় আপনার ফিচার পড়ে জানি যে আপনি খুব সৎ মানুষ।

ফিচার পড়ে? বাঃ, ফিচার থেকে কিছু বুঝি বোঝা যায়?

যায়। আপনি না বুঝলেও আমি বুঝি। ভুল আমার কমই হয়। আরও একটা কথা বলি। আপনার মতোই আমিও কিন্তু একা। আমার কেউ নেই বলতে গেলে। একা থাকি বলেই আমার নিরাপত্তার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামান্য কারণে অহেতুক ভয় বা সংকোচ করলে আমার চলে না। এবার বলুন আসবেন?

ঠিক আছে, যাব।

সকালেই তো?

খুব সকালে নয়। এগারোটা নাগাদ।

ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলছি, টুকে নিন।

ঠিকানা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ধৃতি ভাবতে লাগল কাজটা ঠিক হল কি না, না, ঠিক হল না। তবে এই ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে তাকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে আসছেন কিছুদিন হল। টুপু নামে এক ছায়াময়ীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক পরোক্ষ রহস্য। হয়তো মুখোমুখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে সেই রহস্যের কুয়াশা খানিকটা কাটবে। তাই ধৃতি এই ঝুঁকিটুকু নিল। বিপদে যদি বা পড়ে তার তেমন ভয়ের কিছু নেই। বিপদ তেমন আছে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

একটু অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে দিনটা কাটল ধৃতির। পত্রিকায় ফিচার লিখলে প্রচুর চিঠি আসে। ধৃতিরও এসেছে। মোট সাতখানা। সেগুলো অন্যদিন যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ে ধৃতি, আজ সেরকম আগ্রহ ছিল না। কয়েকটা খবর লিখল, আড্ডা মারল, চা খেল বারকয়েক, সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে। শরীরটাও দুর্বল।

একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ধৃতি। সাড়ে আটটায় ঘরে ফিরে এসে দেখে, পরমা দারুণ সেজে ডাইনিং টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে।

কী পরমা? তোমার পতিদেবটি ফিরেছে নাকি?

না তো! হঠাৎ কী দেখে মনে হল?

তোমার সাজ আর ব্যস্ততা দেখে।

খুব ডিটেকশন শিখেছেন।

তবে আজ এত সাজের কী হল?

বাঃ, সাজটাই বা কী করেছি! মুগার শাড়িটা অনেককাল পরি না, একটু পরেছি, তাই আবার একজনের চোখ কটকট করছে।

আহা, অত ঝলমলে জিনিস চোখে একটু লাগবেই। ব্যাপারটা একটু খুলে বললেই তো হয়। কেসটা কী?

পরমা খোঁপার মাথাটা ঠিক করতে করতে বলল, ফ্ল্যাটবাড়ি হল একটা কমিউনিটি, জানেন তো!

জানব না কেন, বুদ্ধু নাকি? ছ'মাস আগেই কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির নিয়ো কমিউনিটি নিয়ে ফিচার লিখেছিলাম।

জানি। পড়েওছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আজ দোতলায় দোলাদের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। ওদের মেয়ের জন্মদিন।

খুব খাওয়াল?

প্রচুর। মুরগি, গলদা, ভেটকি ফ্রাই, ফিশ রোল, লুচি, ফ্রায়েড রাইস, পায়েস...

রোখকে ভাই। তুমি ক্যালোরি হিসেব করে খাও না নাকি?

তার মানে?

ওরকম গান্ডেপিন্ডে খেলে যে দু'দিনেই হাতির মতো হয়ে যাবে।

আহা, আমার ফিগার নিয়ে ভেবে ভেবে তো চোখে ঘুম নেই! আমি অত বোকা নই মশাই, একখানা মুরগির ঠ্যাং দু'ঘন্টা ধরে চিবিয়ে এসেছি মাত্র।

রোল খাওনি?

আধখানা।

গলদা ছেড়ে দিলে? চল্লিশ টাকা কিলো যাচ্ছে।

ওই একটু।

দইটা কেমন ছিল?

দই! না, দই করেনি তো। আইসক্রিম।

কেমন ছিল?

বাঃ, আইসক্রিম আবার কেমন হবে? ভালই।

মিষ্টির আইটেম করেনি তা হলে! ছ্যাঁচড়া আছে।

মোটেই না। তিনরকম সন্দেশ ছিল মশাই।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, না! তোমার ফিগার কিছুতেই রাখতে পারবে না পরমা। এত যে কেন খাও!

নজর দেবেন না বলছি।

দিচ্ছি না। কেউ আর দেবেও না।

খুব হয়েছে। দোলা আপনার জন্যও চর্বচোষ্য পাঠিয়েছে। এতক্ষণ ঘরে সেগুলো নিচু আঁচে রেখে বসে আছি। দয়া করে এবার গিলুন।

আমার জন্য! আমার জন্য পাঠাবে কেন? তারা কি আমাকে চেনে?

এমনিতে চেনে না। তবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে মনে করে হঠাৎ চিনতে শুরু করেছে। যান তো, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

ধৃতি হাত-মুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু মুখে এক বিচ্ছিরি অরুচি জ্বরের পর থেকেই তার খাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। টেবিলে বসে বিপুল আয়োজনের দিকে চেয়ে সে শিউরে উঠে বলল, এক কাজ করো পরমা, মুরগি আর লুচি বাদে সব সরিয়ে নাও। ফ্রিজে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।

অরুচি হচ্ছে, না?

ভীষণ। খাবার দেখলেই এলার্জি হয় যেন।

কী করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে!

আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা আছে ভবিষ্যতে। বুঝবে।

এখনই কি বুঝছি না নাকি?

বলে পরমা সযত্নে তাকে খাবার বেড়ে দিল। একটা বাটিতে খানিকটা চাটনি দিয়ে বলল, এটা মুখে দিয়ে দিয়ে খাবেন, রুচি হবে।

খেতে খেতে ধৃতি বলল, একটা মুশকিল হয়েছে পরমা।

কী মুশকিল?

টুপুর মা নেমন্তন্ন করেছে কাল।

কে টুপুর মা?

ওই যে সেদিন সুন্দর মেয়েটার ফোটো দেখলে, মনে নেই?

ওঃ, তা সে তো মরে গেছে।
বটেই তো, কিন্তু তার মা তো মরেনি!
নেমন্তন্নটা কীসের?
বোধহয় একটু আলাপ করতে চান।
আলাপও নেই?
নাঃ, শুধু ফোনে কথা হত।
কী বলতে চায় মহিলা?
তা কী করে বলব? হয়তো টুপুর কথা।
বেচারা।
যাব কি না ভাবছি।
যাবেন না কেন?
একটু ভয়-ভয় করছে। অচেনা বাড়ি, অচেনা ফ্যামিলি...
তাতে কী, আলাপ হলেই অচেনা কেটে গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। আপনি অত ভিতু কেন?
আমি খুব ভিতু বুঝি?
ভিতু নন? আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।
ধৃতি চোখদুটো একটু বুজে রেখে খুব নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোচটি কে বলো তো!
কোচ! কীসের কোচ?
তোমাকে এইসব আধুনিক কথাবার্তার ট্রেনিং দিচ্ছে কে?
কেন? আমার বুঝি কথা আসে না?
খুব আসে, হাড়ে-হাড়ে আসে, কিন্তু ভাই বন্ধুপত্নী, তুমি তো এত প্রগতিশীলা ছিলে না এতদিন!
হচ্ছি। আপনার পাল্লায় পড়ে। সে যাক গে, সব সময়ে অত ইয়ারকি ভাল নয়। ভদ্রমহিলা ডাকল কেন সেটা ভেবে দেখা ভাল।
আমি বলি কী পরমা, মেয়েছেলের কেস যখন তুমিও সঙ্গে চলো।
আমি! ওমা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি!
গুলি মারো নেমন্তন্ন।
তা হলে কী বলে গিয়ে দাঁড়াব? একটা কিছু পরিচয় তো চাই।
বউ বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যে ব্যাচেলর তা ভদ্রমহিলা জানেন।
ইস্, ওঁর বউ সাজতে বয়ে গেছে।
একটা কাজ করা যাক পরমা, গিয়ে দু'জনে আগে হাজির হই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।
পরমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। গিয়ে দেখেই আসুন না।
ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে। বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ।
পরমা কিছুক্ষণ ধৃতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, রাত হয়েছে। রোগা শরীরে আর জেগে থাকতে হবে না। শুয়ে পড়ুন গে। শুয়ে শুয়ে ভাবুন।
ধৃতি উঠল।

এত নিরস্ত্র এবং এত অসহায় ধৃতি এর আগে কদাচিৎ বোধ করেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও অকারণ দুর্বলতা বা ভয়-ভীতি নেই। কিন্তু এই এলাহাবাদি ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা রহস্যময়তার বোধ জমেছে ধৃতির। মহিলার কথাবার্তায় উলটোপালটা ব্যাপার আছে, মানসিক ভারসাম্যও হয়তো নেই। একটু যেন বেশি গায়ে-পড়া। তাছাড়া এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককল, চিঠিতে পোস্ট অফিসের ছাপ এবং টুপুর ছবি এর সব ক'টাই সন্দেহজনক। কাজেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হতে আজ ধৃতির খুব কিন্তু-কিন্তু লাগছিল।

সকালে ধৃতি চা খেল তিন কাপ।

পরমা বলল, চায়ের কেজি কত তা মশাইয়ের জানা আছে?

কেন, চা-টা তো সেদিন আমিই কিনে আনলাম। লপচুর হাফ কেজি।

ও, আপনার পয়সায় কেনাটা বুঝি কেনা নয়?

মাইরি, তুমি জ্বালাতেও পারো।

আর শুধু চা কিনলেই তো হবে না। দুধ চিনি এসবও লাগে।

পরেরবার চিনি দুধ ছাড়াই দিয়ো।

আর দিচ্ছিই না। চিনি দুধ লিকার কোনওটাই পাচ্ছেন না আপনি।

আজ নার্ভ শক্ত রাখতে হবে পরমা। আজ এক রহস্যময়ীর সঙ্গে রহস্যময় সাক্ষাৎকাব।

আহা, রহস্যের রস তো খুব। মাঝবয়সি আধপাগল এক মহিলা, তার আবার রহস্য কীসের? খুব যে রহস্যের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে।

স্বপ্ন নয় হে, স্বপ্ন হলে তো বাঁচতাম। কী কুক্ষণেই যে নেমন্তন্নটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম।

আবার ফোন করুন না, নেমন্তন্ন ক্যানসেল করে দিন। ভিতুর ডিমদের এইসব কাজ করতে যাওয়াই ঠিক নয়। এখন দয়া করে আসুন, রোগা শরীরে খালিপেটে চা না গিলে একটু খাবার খেয়ে উদ্ধার করুন।

তোমার ব্রেকফাস্টের মেনু কী?

লুচি আর আলুভাজা।

কুকিং মিডিয়াম কি বনস্পতি নাকি?

কেন? গাওয়া ঘি চাই নাকি? গরিবের বাড়ি এটা, মনে থাকে না কেন? এখনও ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়নি।

ধৃতি ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ছেলেবেলায় কখনও এই অখাদ্যটা কারও বাড়িতে তেমন ঢুকতে দেখিনি। বনস্পতি হল পোস্ট-পার্টিশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিনেমা। কে ওটা আবিষ্কার করেছে জানো?

না। গরিবের কোনও বন্ধু হবে।

তার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

আর বনস্পতির নিন্দে করতে হবে না। আমাদের পেটে সব সয়।

ছাই সয়। সাক্ষাৎ বিষ।

আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। রুগি মানুষকে বনস্পতি খাওয়াব আমি তেমন আহাম্মক নই। ময়দায় ঘিয়ের ময়েন দিয়ে বাদাম তেলে ভাজা হচ্ছে। ভয় নেই, আসুন।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, এর চেয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট ভাল ছিল পরমা। টোস্ট, ডিম, কফি।

কাল থেকে তাই হবে। খাটুনিও কম।

ধৃতি উঠল, খেল। তারপর দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নান করে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরমা হঠাৎ উড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, কী ড্রেস পরে যাচ্ছেন দেখি! এ মা! ওই সাদা শার্ট আর ভুসকো প্যান্ট! আপনার রুচি-টুচি সব যাচ্ছে কোথায় বলুন তো!

কেন, এই তো বেশ। তা হলে কী পরব?

সেই নেভি ব্লু প্যান্টটা কোথায়?

আছে।

আর মাল্টি কালার স্ট্রাইপ শার্ট?

আছে বোধহয়।

ওই দুটো পরে যান।

অগত্যা ধৃতি তাই পরল। পরমা দেখে-টেখে বলল, মন্দ দেখাচ্ছে না। রুগ্ন ভাবটা আর চোখে পড়বে না বোধহয়।

ধৃতির পোশাকের দিকে মন ছিল না। মনে উদ্‌বেগ, অস্বস্তি। রওনা হওয়ার সময় পরমা দরজার কাছে এসে বলল, অফিসে গিয়ে একবার ফোন করবেন। লালিদের ফ্ল্যাটে আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

কেন পরমা, ফোন করব কেন?

একটু অ্যাংজাইটি হচ্ছে।

এই যে এতক্ষণ আমাকে সাহস দিচ্ছিলে!

ভয়ের কিছু নেই জানি, কিন্তু আপনার ভয় দেখে ভয় হচ্ছে। করবেন তো ফোন? তিনটে পনেরো মিনিটে।

আচ্ছা। তা হলে আমার জন্য তুমি ভাবো?

যা নাবালক! ভাবতে হয়।

ধৃতি একটু হালকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টুপুর মায়ের ঠিকানা খুব জটিল নয়। বড়লোকদের পাড়ায় বাস। সুতরাং খুঁজতে অসুবিধে হল না।

ট্যাকসি থেকে নেমে ধৃতি কিছুক্ষণ হাঁ করে বাড়িটা দেখল। বিশাল এবং পুরনো বাড়ি। জরার চিহ্ন থাকলেও জীর্ণ নয় মোটেই। সামনেই বিশাল ফটক। ফটকের ওপাশ থেকেই অন্তত দশ গজ চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু প্রকাণ্ড বারান্দায়। বারান্দায় মস্ত গোলাকার থামের বাহার। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু এখনকার পাঁচতলাকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে বসে আছে।

ফটকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক দারোয়ান মোতায়েন দেখে ধৃতি আরও ঘাবড়ে গেল।

দারোয়ান ধৃতিকে ট্যাকসি থেকে নামতে দেখেছে। উপরন্তু ওর পোশাক-আশাক এবং চেহারাটা বোধহয় দারোয়ানের খুব খারাপ লাগল না। ধৃতি সামনে যেতেই টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম গোছের ভঙ্গি করে ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চাইছেন?

টুপুর মা। মানে—

দারোয়ান গেটটা হড়াস করে খুলে দিয়ে বলল, যান।

ধৃতি অবাক হল। যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতমহলা। এর কোন মহল্লায় কে থাকে তা কে জানে?

ধৃতি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার কেমন যেন এই দুপুরেও গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে ধৃতি দেখল, একখানা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড জায়গা। সবটাই মার্বেলের মেঝে। বারান্দার তিনদিকেই প্রকাণ্ড তিনটে কাঠের ভারী পাল্লার দরজা। দু'পাশের দরজা বন্ধ, শুধু সামনেরটা খোলা।

ধৃতি পায়ে পায়ে এগোল।

দরজার মুখে দ্বিধান্বিত ধৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পুরনো জমিদারি কায়দার বাড়ি ধৃতি দূর থেকে দেখেছে অনেক, তবে কখনও ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। এইসব বাড়িতেই কি একদা ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বাইজি নাচত আর উঠত ঝনাঝন মোহরের প্যালা ফেলার শব্দ? এইসব বাড়িরই অন্দরমহলে কি গভীর রাত অবধি স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থেকে অবিরল অশ্রুমোচন করত অন্তঃপুরিকারা? চাষির গ্রাস কেড়ে নিয়েই কি একদা গড়ে ওঠেনি এইসব ইমারত? এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ঢুকে আছে পাপ আর অভিশাপ?

বাইরের ঘরটা বিশাল। এতই বিশাল যে তাতে একটা বাস্কেটবলের কোর্ট বসানো যায়। সিলিং প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। কিন্তু আসবাব তেমন কিছু নেই। কয়েকটা পুরনো প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা নিচু তক্তপোশে সাদা চাদর পাতা, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, মেঝেয় ফাটল, দাগ। দেয়ালে অনেক জায়গায় মেরামতির তাপ্পি। তবু বোঝা যায়, এ বাড়ির সুদিন অতীত হলেও একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়নি।

ধৃতি কড়া নাড়ল না বা কাউকে ডাকার চেষ্টা করল না। কারণ ধারে-কাছে কেউ নেই। ঘরটা ফাঁকা। ছাদের কাছ বরাবর কড়ি-বরগায় পায়রারা বকবক করছে। কিন্তু ধৃতির মনে হচ্ছিল, ঘর ফাঁকা হলেও কেউ কোনও এক রন্ধ্র-পথে বা ঘুলঘুলি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে ঠিকই লক্ষ করছে। এমন মনে করার কারণ নেই, অনুভূতি বলে একটা জিনিস তো আছেই।

ধৃতি সাহসী নয়, আবার খুব ভিতুও নয়। মাঝামাঝি। তার বুক একটু দুরুদুরু করছিল ঠিকই, তবে সেটা অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশ বলে। কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে গিয়ে সে একটা ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বাড়ির এক সন্দিগ্ধ ও খিটকেলে বুড়ো তাকে বাইরের ঘরে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রেখে বিস্তর জেরা করে এবং নানাবিধ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়। ধৃতি সেই থেকে অচেনা বাড়িতে ঢুকতে একটু অস্বস্তি বোধ করে আসছে।

প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। যাতায়াতকারী কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ধৃতি একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ক্ষীণ হলেও নির্ভুল শব্দ। কাছেপিঠে কোথাও, হলঘরের আশেপাশের কোনও ঘরে কারা যেন টেবিল টেনিস খেলছে।

বুকপকেটের আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নেয় ধৃতি। সে এক মস্ত খবরের কাগজের সাব-এডিটর। এই পরিচয়-পত্রখানা যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশে কাজে লাগে। রেলের রিজার্ভেশনে, থানায়, বাইরের রিপোর্টিং-এ। এ বাড়িতে কেউ তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তুললে কাজে লাগাতে পারে।

ধৃতি ভিতরে ঢুকল এবং শব্দটির অনুসরণ করে বাঁদিকে এগোল। হলঘরেব পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে। সবুজ বোর্ডের দু'পাশে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী অখণ্ড মনোযোগে টেবিল-টেনিস খেলছে। মেয়েটির পরনে লাল শার্ট এবং জিনসের শর্টস। ছেলেটির পরনেও জিনসের শর্টস, গায়ে হলুদ টি-শার্ট। দু'জনেরই নীল কেডস্। মেয়েটির চুল স্টেপিং করে কাটা। ছেলেটির চুল লম্বা। দু'জনের বয়সই পনেরো-ষোলোর মধ্যে।

ধৃতি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে প্রথম লক্ষ করল মেয়েটিই। একটা মারের পর বল কুড়িয়ে সোজা হয়েই থমকে গেল। তারপর রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, হুম ডু-ইয়া ওয়ান্ট?

কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে শেখা হেঁচকি তোলা ইংরিজি নয়। রীতিমতো মার্কিন অ্যাকসেন্ট।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

মেয়েটা ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, আছে বোধহয়। দোতলায়। পিছন দিকে সিঁড়ি আছে। গিয়ে দেখুন।

ধৃতি তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভিতরে কি খবর না দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?

মেয়েটি সার্ভ করার জন্য হাতের স্থির তোলায় বলটা রেখে বাঘিনীর মতো খাপ পেতে শরীরটাকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। সেই অবস্থাতেই ধৃতির দিকে একঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, উড শি মাইন্ড? নো প্রবলেম। শি ইজ আ বিট গা-গা। গো অ্যাহেড। আপস্টেয়ার্স, ফাস্ট রাইট হ্যান্ড রুম। নোবডি উইল মাইন্ড। নান মাইন্ডস হিয়ার। নান হ্যাজ এনিথিং লাইক মাইন্ড।

ধৃতি একসঙ্গে মেয়েটির মুখে এত কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এত কথার মানেই হয় না। তার মনে হল, এরা দুটি ভাইবোন কোনও সমৃদ্ধ দেশে, হয়তো আমেরিকায় থাকে। এ দেশে এসেছে ছুটি কাটাতে এবং সময়টা খুব ভাল কাটাচ্ছে না। নিজেদের বাড়ি কি এটা ওদের? হলে বলতে হবে, নিজেদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে ওরা মোটেই খুশি নয়। সেই বিরক্তিটাই তার কাছে প্রকাশ করল।

বেশ খোলা হাতে টপ স্পিন সার্ভ করল মেয়েটি। ছেলেটি পেন হোল্ড গ্রিপ-এ খেলছে। পিছনে দু'পা সরে গিয়ে সপাটে স্ম্যাশ করল। মেয়েটি টেবিল থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে স্ম্যাশটা তুলে দিল টেবিলে...

ধৃতির হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল এদের এলেম দেখে। তবে সে র‍্যালিটা দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাই তুখোড়। বারবার ছেলেটার ব্যাক হ্যান্ডে ফেলছে বল। পেন হোল্ড গ্রিপ-এ ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না বলে ছেলেটিকে হাত ঘুরিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হচ্ছিল। মেয়েটা পয়েন্ট নিয়ে নিল।

ধৃতি এটুকু দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে সিঁড়ি আছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেতে হবে তা মেয়েটা বলে দেয়নি। ধৃতি হলঘরটা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই পুরনো চওড়া পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দেখতে পায়। বাড়িটা খুবই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হবে। নইলে এতটা এসে ফিরে গেলে সে নিজের কাছেই নিজে কাপুরুষ থেকে যাবে চিরকাল।

সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল ধৃতি। এবং ওপরে উঠে মুখোমুখি হঠাৎ একজন দাসী গোছের মহিলাকে দেখতে পেল সে। হাতে একটা জলের বালতি।

ধৃতি খুব নরম গলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

ঝি খুব যেন অবাক হয়েছে এমন মুখ করে বলল, কার মা?

টুপুর মা। আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঝি-টার অবাক ভাব গেল না। বলল, আসতে বলেছিলেন? ওমা! সে কী গো?

এই উক্তির পর কী বলা যায় তা ধৃতির মাথায় এল না। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

ঝি-টা একটু হেসে বলল, আসতে বলবে কী? সে তো পাগল।

গা-গা বলতে নীচের মেয়েটা তা হলে বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পাগল কেন হবে টুপুর মা? একটু ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু খুব পাগল কি?

কোন ঘরটা বলুন তো?— ধৃতি জিজ্ঞেস করে।

ওই তো দরজা। ঠেলে ঢুকে যান।

ধৃতির হাত-পা ঠান্ডা আর অবশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ নয় তো? কিন্তু সামান্য একটু রোখও আছে ধৃতির। যে কোনও ঘটনারই শেষ দেখতে ভালবাসে।

দ্বিধা ঝেড়ে সে ডান দিকের দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ঘর। খুব উঁচু সিলিং। মেঝে থেকে জানালা। ঘরের মধ্যে এক বিশাল পালঙ্ক, কয়েকটা পুরনো আমলের আসবাব, অর্গান, ডেস্ক, চেয়ার, বুকশেলফ, আলনা, থ্রি পিস আয়নার ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী।

খাটের বিছানায় এক প্রৌঢ়া রোগা-ভোগা চেহারার মহিলা শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। গলা পর্যন্ত টানা লেপ। বালিশে কাঁচা-পাকা চুলের ঢল। একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়।

ধৃতি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করল যাতে উনি চোখ মেলেন।

মেললেন এবং ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

আমি ধৃতি। ধৃতি রায়।

ধৃতি রায়! কে বলো তো তুমি?

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

না তো! হ্যারিকেনটা উসকে দাও তো। তোমাকে দেখি।

এখন তো দিনের আলো।

কোথায় আলো? আলো আবার কবে ছিল? তোমার সাঁইথিয়ায় বাড়ি ছিল না?

না।

টুপুর মা উঠে বসেছেন। চোখে খর অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কার খোঁজে এসেছেন?

আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন ফোনে। মনে নেই?

ও তাই বলো। তা বোসো বোসো। আমি খুব ফোনের শব্দ পাই, বুঝলে! কেন পাই বলো তো! এত ফোন কে কাকে করে জানো?

না।

টুপুর মা'র পরনে থান, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রাচীন সব আঁকিবুকি। টুপুর মা'র যে গলা ধৃতি টেলিফোনে শুনেছে এঁর গলা মোটেই তেমন নয়।

তুমি কে বললে?

ধৃতি রায়। আমি খবরের কাগজে লিখি।

খবরের কাগজ! এখন পুরনো খবরের কাগজ কত করে কিলো যাচ্ছে বলো তো! আমাকে সেদিন একটা কাগজওয়ালা খুব ঠকিয়ে গেছে।

জানি না।

তোমার দাঁড়িপাল্লা কোথায়? বস্তা কোথায়?

আমি কাগজওয়ালা নই।

শিশি-বোতল নেবে? অনেক আছে।

ধৃতি ফাঁপড়ে পড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সন্দেহের লেশ নেই, সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভুলে পা দিয়েছে। তবু মরিয়া হয়ে সে বলল, আপনি আমাকে ফোন করে টুপুর খবর দিয়েছিলেন, মনে নেই? এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল!

টুপুর মা অন্যদিকে চেয়ে বললেন, সে কথাই তো বলছি তোমাকে বাগদি বউ, অত ঘ্যানাতে নেই। পুরুষমানুষ কি ঘ্যানানি ভালবাসে?

ধৃতি একটু একটু ঘামছে।

আচমকাই সে আয়নায় দেখল, দরজাটা সাবধানে ফাঁক করে ঝি-টা উঁকি দিল।

শুনছেন?

ধৃতি ফিরে চেয়ে বলল, কী?

উনি কি আপনার কেউ হন?

না। চেনাও নয়। ফোন পেয়ে এসেছি।

আপনি একটু বাইরে আসুন। মেজ গিন্নিমা ডাকছেন।

ধৃতি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল। টুপুর মা তাকে আর আমল না দিয়ে ফের গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

সাবধানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঝি বলল, ওই ঘর, চলে যান।

মেজ গিন্নিমা কে?

উনিই কর্ত্রী। যান না।

ধৃতি এগোল। এ ঘরের দরজা খোলা এবং সে ঘরে ঢোকার আগেই পর্দা সরিয়ে একজন অত্যন্ত ফরসা ও মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

ঘরটা বেশ আধুনিক কায়দায় সাজানো। যদিও প্রকাণ্ড, সোফা সেট আছে, দেয়ালে যামিনী রায় আছে।

তাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো! টুপুর মা নাকি আপনাকে ডেকে এনেছে? কী কাণ্ড।

ধৃতি থমথমে মুখ করে বলল, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে আপনি শুনতে চাইলে ব্যাপারটা ডিটেলসে বলতে পারি।

বলুন না। আগে একটু চা খেয়ে নিন, কেমন?

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। একটু বাদে চা এল, একটু সন্দেশের জলখাবারও।

ধৃতি শুধু চা নিল, তারপর মিনিট পনেরো ধরে আদ্যোপান্ত বলে গেল ঘটনাটা।

ভদ্রমহিলা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। কোনও উঃ, আঃ, আহা, তাই নাকি, ওমা এসব বললেন না। সব শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আশ্চর্য লাগছে কী জানেন?

কী বলুন তো?

টুপুর ঘটনাটা মোটেই মিথ্যে নয়। এরকমই ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল বছর সাতেক আগে। সেই থেকে টুপুর মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। এখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। যতদিন বাঁচবেন ওরকমই থাকবেন। তবে গল্পটার শেষটাই রহস্য। আপনাকে যে ফোন করত সে আর যেই হোক টুপুর মা নয়।

তা হলে কে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, উনি ঘর থেকেই বেরোন না। ফোন করতে জানেনও না বোধহয়। তবে যেই করুক সে আমাদের অনেক খবর রাখে।

টুপু কি সত্যিই মারা গেছে?

মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলা অসম্ভব। পুলিশও কোনও হদিশ পায়নি। কোথায় যে গেল মেয়েটা!

কিছু মাইন্ড করবেন না, উনি মানে টুপুর মা আপনার কে হন?

আমার বড় জা। ওঁরা তিন ভাই। বড় জন নেই, ছোট অর্থাৎ আমার দেওর আমেরিকায় থাকে। ওখানকারই সিটিজেন। ছুটি কাটাতে এসেছে। দু'ভাই মিলে আজ মাছ ধরতে গেছে ব্যান্ডেলে।

নীচের তলায় যে দুটি ছেলেমেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম ওরা কারা? আপনার দেওরের ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ।— বলে মেজগিন্নি একটু তেড়চা হেসে বললেন, একেবারে সাহেব-মেম। এ দেশের কিছুই পছন্দ নয়। কেবল নাক সিঁটকে থাকে সবসময়।

আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

মেয়ে শান্তিনিকেতনে। ছেলে দু'টি। দু'জনেই বাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ে।

বাঙ্গালোরে কেন?

আমরা ওখানেই থাকতাম। আমার হাজব্যান্ডের তখন ওখানে একটা পার্টনারশিপের ব্যাবসা

ছিল। উনি একটু খেয়ালি। হঠাৎ 'ভাল লাগছে না' বলে নিজের শেয়ার বেচে চলে এলেন। ছেলেরা হস্টেলে থাকে।

আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

মেজগিন্নি খুব অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টুপুর মা সেজে ফোন করার মতো কেউ তো এ বাড়িতে আছে বলে মনে হয় না!

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না, ঠিক তা বলিনি। আমি ব্যাপারটায় নিজেকে জড়াতেও চাইছিলাম না। বুঝতে পারছি না ঘটনার মানে কী?

হয়তো কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো আপনার পরিচিতা কেউ। তবে আশ্চর্যের কথা হল, টুপু সম্পর্কে সে কিছু জানে। যাক গে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখে গেলেন, এখন ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।

মেজগিন্নিকে ধৃতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোলগাল ফরসা, জমিদারগিন্নি ধরনের চেহারা। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। চোখে মুখে বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি খুব হতাশা বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা, আজ চলি।

আসুন ভাই। আপনার খবরের কাগজের লেখা আমিও কিন্তু পড়েছি। আপনি তো ফেমাস লোক।

ধৃতি ক্লিষ্ট একটু হাসল।

ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তার রিপোর্টটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আবার কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন।

আচ্ছা।

ধৃতি একা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ক্লান্ত লাগছে। হতাশ লাগছে। সে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা যে কী তা স্পষ্ট নয়। তার বদলে যা দেখল তা বিকট।

ধৃতি যখন মাঝ-সিঁড়িতে তখন তলা থেকে দুদ্দাড় করে সেই কিশোরী মেয়েটি উঠে আসছিল, পথ দিতে একটু সরে দাঁড়াল ধৃতি। মেয়েটা উঠতে উঠতে তাকে দেখে থমকে গেল। মুখে জবজব করছে ঘাম। একটু লালচে মুখ।

ডিড ইয়া মিট হার?

হ্যাঁ।

মেয়েটা হঠাৎ একটু হাসল। সুন্দর মুখশ্রী যেন আরও ফুটফুটে হয়ে উঠল।

পাগলি নয়?

ধৃতিও একটু হাসল। বলল, তাই তো মনে হল।

আপনি কি কোনও রিলেটিভ?

না! পরিচিত।

টেক হার সামহোয়ার। নার্সিংহোম বা মেন্টাল হোম কোথাও নিয়ে গেলেই তো হয়। জেঠু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, তাই দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এ বাড়ির ফোনটা কোন ঘরে?

জেঠুর ঘরে। ফোন করবেন? আসুন না আমার সঙ্গে।

না। তার দরকার নেই। ভাবছিলাম ফোন করলে টুপুর মাকে পাওয়া যাবে কি না। আচ্ছা নম্বরটা কত?

মেয়েটা নম্বর বলল। ধৃতি মনে মনে দু'-একবার আউড়ে মুখস্থ করে নিল।

মেয়েটা বলল, বাই।

তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে।

বাই।— বলে ধৃতি নেমে এল নীচে। মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। হতাশা এবং গ্লানি বোধ করছে সে। কেন যে কে জানে! এতটা আশাহত হওয়ার মতো কিছু নয়। ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হয়। পারছে না। তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জোক নয়, ভিতরে আর একটা কিছু আছে। সেটা সে ধরতে পারল না।

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েই ধৃতি যখন বেরোতে যাচ্ছিল তখন দেখল, হলঘরে সেই ঝি-টা মেঝে মুছছে উবু হয়ে বসে। তাকে দেখে কৌতূহলভরে একটু চেয়ে রইল।

ধৃতি তাকে উপেক্ষা করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একজন যে বসে আছে আপনার জন্য।

ধৃতি চমকে উঠে বলল, কে?

ঝি ফিক করে হেসে বলল, বাঃ বুড়োকর্তা আছে না?

সে আবার কে?

সে-ই তো সব। দেখা করবেন না?

বুড়ো মানুষ, খিটখিটে নন তো?

না গো, তবে খুব বকবক করেন। নতুন মানুষ পেলে তো কথাই নেই। ওইদিকে ঘর। চলে যান।

হলঘরের ডানপ্রান্তে একটা ভেজানো কপাট দেখা যাচ্ছিল। মরিয়া ধৃতি পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করল।

এসো, চলে এসো। এভরিবডি অলওয়েজ ওয়েলকম।

ধৃতি দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। লম্বাটে এবং বেশ বড়সড় ঘরখানা। দক্ষিণের জানালা দরজা খোলা বলে ধপ ধপ করছে আলো। একখানা মজবুত ও ভারী চৌকির ওপর সাদা বিছানা পাতা। দরজার পাশেই একখানা ডেক চেয়ার। তাতে সাদা দাড়িওয়ালা এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারার মানুষ বসে আছেন। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির গেঞ্জির ওপর একটা উলের গেঞ্জি। শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড। বোঝা যায় একসময়ে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এখনও শরীরে মেদের সঞ্চার নেই। বয়স আশি বা তার ওপর। কিন্তু চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভিতরে দুটি চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং কৌতুকে ভরা।

মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার পাতা। সেটা দেখিয়ে বললেন, বোসো। এ বাড়িতে নতুন কেউ এলেই আমি তাকে ডেকে পাঠাই। কিছু মনে করোনি তো?

ধৃতি বসল এবং মাথা নেড়ে বলল, না।

কার কাছে এসেছিলে?

ধৃতি হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা ভুল খবর পেয়ে এসেছিলাম। যার কাছে এসেছিলাম আসলে তার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।

একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কার কাছে এসেছিলে বলো তো?

টুপুর মা। ওই নাম নিয়ে কে যেন আমাকে অফিসে প্রায়ই টেলিফোন করত। কালও টেলিফোনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই জন্যই আসা।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে গেলেন। সামনের শূন্যে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ স্বপ্নাতুর ও ভাসা-ভাসা হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমাকে কি সে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল?

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সেইরকমই। তবে সেটা বড় কথা নয়।

বুড়োকর্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আসোনি?

আপনি খাওয়ার ব্যাপারটা বড় করে দেখছেন কেন? ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

বুড়োকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে একটু বুঝতে দাও। বুড়ো হলে মগজে ধোঁয়া জমে যায়

বটে, তবু অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তোমার নাম কী? কী করো?

ধৃতি বলল।

বুড়োকর্তা মাথা ওপর নীচে দুলিয়ে বললেন, জানি। তোমার লেখা আমি পড়েছি। খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়া আমার রোজকার কাজ।

ধৃতি বিনয়ে একটু মাথা নোয়াল। তারপর বলল, আপনি অযথা এই ঘটনাটা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হবেন না। কেউ একটু আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেয়েছিল।

রসিকতা!— বলে বুড়োকর্তা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, এমনও হতে পারে যে সে কোনও একটি সত্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। নইলে একটি মেয়ে তোমাকে বারবার ফোন করবে কেন?

সেটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

তাছাড়া সে সবটাই কিন্তু মিথ্যে বলেনি। আমার নাতনি টুপুর সত্যিই কোনও ট্রেস নেই কয়েক বছর। আমরা ধরে নিয়েছি যে সে মারা গেছে। সম্ভবত খুন হয়েছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়।

সম্ভবত সে ঘটনাটা জানে।

তা তো জানেই। কিন্তু কে হতে পারে সেটাই ভাবছি।

হয়তো আপনাদের চেনা কেউ।

তোমার কি আজ কোনও জরুরি কাজ আছে?

কেন বলুন তো?

যদি সংকোচ বোধ না করো তবে আমার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। যে-ই তোমাকে নিমন্ত্রণ করুক সে এ বাড়িকে জড়িয়েই তো করেছে। নিমন্ত্রণটা অন্তত সত্যিকারের হোক। আমার রান্না আলাদা হয়, আলাদা ব্রাহ্মণ পাচক রাঁধে, আমি ওদের সঙ্গে খাই না। এ ঘরেই সব ব্যবস্থা হবে।

আমার একদম খিদে নেই।

তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ এবং এ বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছ বলে খিদে টের পাচ্ছ না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার মনে হয়, তোমাকে যে এতদূর টেনে এনেছে তার কোনও পজিটিভ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্যও করতে পারব, যদি অবশ্য টুপুর রহস্য ভেদ করতে আগ্রহ বোধ করো।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমার আগ্রহ নেই। টুপুর কেসটা মনে হয় ক্লোজড চ্যাপ্টার। আর পুলিশই যখন কিছু পারেনি তখন আমার কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ডিটেকটিভ নই।

বুড়োকর্তা খুব সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, ঠিক কথা। অর্বাচীনের মতো দুম করে অন্য কারও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ভাল নয়। তবে এই বুড়ো মানুষটার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে বসে দু'টি খেতে, তা হলে তোমার আপত্তি হবে কেন?

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, একটিমাত্র কারণে। যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে একটা ফ্রড। আমি সেই নিমন্ত্রণ মানতে পারি না।

ফ্রড!— বুড়োকর্তা আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ঘটনাটা আমাকে আর একটু ডিটেলসে বলতে পারো? যদি বিব্রত বোধ না করো?

ধৃতি আবার একটু দম নিল। তারপর সেই নাইট ডিউটির রাত থেকে শুরু করে সব ঘটনাই বলে গেল। বুড়োকর্তা চুপ করে শুনলেন। সবটা শুনে তারপর মুখ খুললেন।

ফোটোটা তোমার কাছে আছে?

আছে।

দেখাতে পারো?

ধৃতির ব্যাগে ফোটোটা প্রায় সবসময়েই থাকে। সে বের করে বুড়োকর্তার হাতে দিল।

উনি একপলক তাকিয়েই বললেন, টুপুই। কোনও সন্দেহ নেই।

ফোটোটা ফেরত নিয়ে ধৃতি বলে, এই ফোটো কার হাতে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুড়োকর্তা হাত উলটে অসহায় ভাব করে বললেন, কে বলতে পারে তা? চিঠিটা দেখাতো পারো?

পারি।— বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দিল।

বুড়োকর্তা চিঠিটা দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর পড়লেন। ফের মাথা নেড়ে বললেন, হাতের লেখা কার কেমন তা আমি জানি না। সুতরাং এ বাড়ির কেউ লিখে থাকলেও আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ধৃতি মৃদু হেসে বলল, চিনেই বা লাভ কী? ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ধরলেই হয়।

তা বটে। তবে তুমি যত সহজে উড়িয়ে দিতে পারছ আমার পক্ষে তা অত সহজ নয়। ঘটনাটা তো এই বংশেরই। টুপুর সমস্যার কোনও সমাধানও তো হয়নি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই চিঠি আর ফোটো আপনিই রেখে দিন বরং।

লাভ কী? আমি বুড়ো, অক্ষম। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব? বরং তোমার কাছেই থাক। তুমি হয়তো বা কোনওদিন কোনও সূত্র পেয়ে যেতে পারো।

বলছেন যখন থাক। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

এবার খেতে দিতে বলি?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি খাব না। প্লিজ, আমাকে আপনি জোর করবেন না।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম রয়ে রইলেন ফের। তারপর দাড়ি গোঁফের ফাঁকে চমৎকার একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বুড়োর কাছে এসো। তোমাকে আমার বেশ লাগল।

৯

অফিসে এসে ধৃতি আজ বহুক্ষণ আনমনা রইল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াল। তারপর ফের এসে বসে রইল টেলিফোনটার কাছে।

উমেশবাবু টেলিপ্রিন্টারের কপি কাটতে কাটতে তলচোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, আজ যেন একটু বিরহী-বিরহী দেখাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

বিরহই। বউ বাপের বাড়ি গেছে।

হুঁ। বাপের বাড়ি থেকে টোপর পরে গিয়ে নিজে টেনে আনো গে না! বিয়ে করতে মুরোদ লাগে বুঝলে! এত টাকা মাইনে পাও তবু বিয়ে করার সাহস হয় না কেন? পণপ্রথার ওপর খুব তো গরম গরম ফিচার ছাড়ছ, নিজে একটা অবলা জীবকে উদ্ধার করে দেখাও না! আমি যখন বিয়ে করি তখন চাকরি ছিল না, বাপের হোটেলে খেতাম। প্রথম চাকরি হল আটাশ টাকা মাইনেয়, বুঝলে...

কথার মাঝখানেই ফোন বাজল।

উমেশবাবু 'হ্যালো' বলেই ফোনটা ধৃতির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, নাও, বাপের বাড়ি থেকেই বোধহয় করছে ফোন।

ধৃতি একটু কেঁপে উঠল। বুকটা দুরুদুরু করল। ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, হ্যালো।

ওপাশে সেই কণ্ঠস্বর। একটু কোমল। একটু বিষণ্ণতর।

আপনি না খেয়েই চলে গেলেন!

আপনার লজ্জা করে না?
শুনুন, প্লিজ। রাগ করবেন না।
রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।
জানি। আমার চেয়ে বেশি সে কথা আর কে জানে? তবু পায়ে পড়ি। রাগ করবেন না।
তা হলে আপনার পরিচয় দিন।
সেটা এখনই সম্ভব নয়। তবে আমি টুপুর মা নই।
তবে কি আপনি টুপু?
উঃ, কী যে সব বলছেন না! আপনার টেবিলের লোক নিশ্চয়ই শুনছে আর হাঁ করে চেয়ে আছে!
উমেশবাবু ঠিক হাঁ করে চেয়ে ছিলেন না। তবে স্বভাবসিদ্ধ তলচোখের চাউনিটা ধৃতির দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ধৃতি গলা আরও নামিয়ে বলল, পরিচয় না দিলে আর কোনও কথা নেই।
আপনি সবই জানতে পারবেন। শুধু একটু যদি সময় দেন।
ধৃতি দৃঢ় গলায় বলে, আর নয়। সময় এবং প্রশ্রয় আমি অনেক দিয়েছি আপনাকে। আজ রীতিমতো অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আপনি এতটা কেন করলেন? আমি তো কোনও ক্ষতি করিনি আপনার!
না। আপনার মতো ভদ্রলোক হয় না। আমি কাণ্ডটা করেছি শুধু টুপুর মায়ের অবস্থাটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন বলে।
তাতে কী লাভ? আমি তো কিছু করতে পারব না।
আপনি কি জানেন যে টুপুর মায়ের অনেক সম্পত্তি?
না। আপনার মুখে শুনেছি মাত্র।
বিশ্বাস করুন, সম্পত্তি জিনিসটা খুবই খারাপ। টুপু ছিল সেই সম্পত্তির ওয়ারিশান।
তা হবে। শুনে আমার লাভ কী?
আপনার লাভ না হলেই কি কিছু নয়? ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন তো!
শুনছি।
টুপুর মৃত্যুসংবাদ আমি রটাতে চেয়েছিলাম টুপুর জন্যেই। আমার বিশ্বাস টুপু বেঁচে আছে। কিন্তু ওর আত্মীয়রা ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চায় না। মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে ও নিরাপদ। কেউ আর ওকে মারতে চাইবে না।
কেন? টুপুর মৃত্যুতে তাদের কী লাভ?
টুপু বেঁচে থাকলে ওদের চলবে কী করে? অত বড় বাড়ি দেখলেন, কিন্তু ফোঁপড়া। কিছু নেই ওদের। পুরো সংসার চলছে টুপুদের টাকায়।
এত কথা আমাকে বলছেন কেন?
তা জানি না। বোধহয় কাউকে জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি।
তা হলে আইনের আশ্রয় নিন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুলিশেও যেতে পারেন।
আমি কে যে সেসব করতে যাব?
তবে আমিই বা কে?
একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, তা অবিশ্যি সত্যি। আপনাকে আজ হয়রান করা আমার হয়তো উচিত হয়নি, আপনি রেগে আছেন।
তা আছি।
আপনার অফিসে টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইন নেই? থাকলে দিন না। পি বি এক্স লাইনে তো কোনও কথাই গোপন থাকে না।
আর কী বলার আছে আপনার?

প্লিজ, দিন। আর টেলিফোনের কাছে থাকুন দয়া করে। আমি এক্ষুনি রিং করব।

ধৃতি রিপোর্টিং-এর একটা নম্বর দিল এবং ফোনটা রেখে রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে গজরাতে টেলিফোনটার কাছে গিয়ে বসল। এখন রিপোর্টিং ফাঁকা। প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফোনটা বাজতেই লাইন ধরল ধৃতি, হ্যাঁ বলুন।

আপনিই তো?

তবে আর কে হবে?

একটু হাসি শোনা গেল, না মানে ভীষণ ভয় করে। কী করছি কে জানে!

মজা করছেন। আর কী?

মোটেই না। রেগে আছেন বলে আপনি আমার সমস্যা বুঝতে চাইছেন না।

আপনি কে আগে বলুন। তারপর অন্য কথা।

বলব। একটু ধৈর্য ধরুন। আগে আর দু'-একটা কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন, কিন্তু প্লিজ আর গল্প ফেঁদে বসবেন না।

টুপু একটু অন্যরকম ছিল। খুব ভাল মেয়ে নয়। অনেক অ্যাফেয়ার ছিল তার।

বিরক্ত হয়ে ধৃতি বলে, এরকম কথা আগেও শুনেছি।

আর একটু শুনুন। প্লিজ।

সংক্ষেপে বলুন।

টুপু অবশেষে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটা বাজে। কিন্তু টুপুও ভাল নয়। ছেলেটার রোজগারপাতি কিছু ছিল না। তবে খুব হ্যান্ডসাম ছিল, আর সেইটেই একমাত্র তার প্লাস পয়েন্ট। রূপনারায়ণপুরে তারা কিছুদিন ঘরভাড়া করেছিল। তারপর ছেলেটা পালায়। টুপুর তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। চেহারা সুন্দর বলে আবার একজন জুটে যায়। এ বড় কন্ট্রাক্টর। বিবাহিত। ক্রমে টুপু গাঁজা, মদ, ড্রাগের নেশা করতে থাকে। একসময়ে তার জীবনে একটা গভীর জটিল অন্ধকার নেমে আসে। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল একবার। পারেনি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে এখনও বেঁচে আছে জানলেন কী করে?

জানি না। অনুমান করি।

অনুমানের কোনও বেস নেই?

আছে। টুপু এখনও রূপনারায়ণপুরে আছে বলে খবর পেয়েছি।

আপনি কি তাকে উদ্ধার করতে চান?

যদি চাই, তা হলে সেটা খুব অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে কি?

হচ্ছে। কারণ এসব মেয়েরা বড় একটা ফেরে না। মূল উপড়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে?

যদি টুপুর অনুশোচনা এসে থাকে?

ধৃতি একটু হাসল, অনুশোচনা জিনিসটা ভাল। কিন্তু ফেরার পথটাও যে বন্ধ। সংসার তো তার জন্য কোল পেতে বসে নেই। সে এখন কীরকম জীবন কাটাচ্ছে তার খবর রাখেন?

খুব লোনলি।

পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই?

না। টুপুকে এখন সবাই ভয় পায়। তার রূপ গেছে, টাকা নেই, নেশা করে করে কেমন যেন বেকুবের মতোও হয়ে গেছে।

তার চলে কী করে?

যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না বোধহয়। ধরুন একরকম ভিক্ষে করেই চলে।

ভিক্ষে?

শুনেছি সে একটা নাচগানের স্কুল করছে।

কীরকম স্কুল? চালু?

সে সেই স্কুলে চাকরি করে। নাচ গান শেখায়, সামান্য মাইনে।

তবে তো সে ভালই আছে।

না, মোটেই ভাল নেই। সে ফিরতে চায়।

ফিরতে বাধা কী?

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোথায় সে ফিরবে?

কেন? নিজেদের এলাহাবাদের বাড়িতে?

সে বাড়ি আর ওদের দখলে নেই। বিক্রি হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়রা তাকে ঢুকতেই দেবে না। তার বিয়ে করারও আর চান্স নেই। তবু সে মাঝে মাঝে ফিরতে চায়। কোথায় তা বুঝতে পারে না।

আমি কী করতে পারি বলুন?

আমার অনুরোধ আপনি একবার ওকে দেখে আসুন।

আপনি কি পাগল? টুপুকে দেখতে যাব কেন?

আপনি তো হিউম্যান স্টোরি খুঁজে বেড়ান। টুপুর ঘটনা কি হিউম্যান স্টোরি নয়?

মোটেই নয়। একটা বেহেড বেলেল্লা মেয়ের অধঃপাতে যাওয়ার গপ্পো, তাও যদি সত্যি হয়ে থাকে। আমি এখনও টুপুর গল্প বিশ্বাস করি না। করলেও ইন্টারেস্টেড নই।

আমি যদি সঙ্গে যাই?

আপনি কে?

সেইটেই তো বলতে চাইছি না। তবে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

কাল কেন? আজই নয় কেন?

প্লিজ, কাল। আমি অফিসেই আসব। তিনটেয়। কাল দেরি করবেন না, লক্ষ্মীটি।

ফোন কেটে গেল।

টেবিলে ফিরে আসতেই উমেশবাবু একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, কেসটা কী হে?

আছে একটা কেস। তবে প্রেমঘটিত নয়।

মেয়েছেলের ব্যাপারে বেশি থেকো না। বরং একটা দেখেশুনে ঝুলে পড়ো। ল্যাঠা চুকে যাক। বাঙালির শেষ সম্বল বউয়ের আঁচল।

ধৃতি খুব কষ্টে মুখে একটু হাসি আনল। মনটা একদম হাসছে না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখল, পরমা বাপের বাড়ি গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকুট: ফোন করে করে অফিসের লাইন পেলাম না। চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। প্রেশার হাই। ফ্রিজে রান্নাবান্না আছে, গরম করে খেয়ে নেবেন। পরমা। পুঃ বাবার প্রেশারটা ডিপ্লোম্যাটিকও হতে পারে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে এক ফ্ল্যাটে আছে. এটা বোধহয় পছন্দ নয়। আপনি যে ভেজিটেবল তা তো আর সবাই জানে না! ওখানে কী হল? টুপুর মা কী বলল জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

রাতটা কোনওক্রমে কাটাল ধৃতি। কিছুক্ষণ হাক্সলি পড়ল, কিছুক্ষণ গীতা। ঘুমিয়ে অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ভাবী ভ্যাবলা লাগল নিজেকে।

যখন মুখ ধুচ্ছে তখন কলিংবেল। তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলে দেখে ফুটফুটে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আমি নন্দিনী। পরমা বউদি আপনাকে সকালের চা-টা দিতে বলে গেছে।

আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

ওই তো উলটোদিকে। একদিন আসবেন।

আচ্ছা।

কাপটা থাক। পরে আমাদের কাজের মেয়ে নিয়ে যাবে।

ধৃতি সকালবেলাটা খবরের কাগজ পড়ে কাটাল। তারপব সাজগোজ করে হাতে সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়ল। অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে।

অফিসেও সময় বড় একটা কাটছিল না। তিনটেয় মেয়েটা আসবে। অন্তত আসার কথা। একটু ভয়-ভয় করছে ধৃতির। সে বুঝতে পারছে একটা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

তিনটের সময় রিসেপশনে নেমে এল ধৃতি। অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ এল না। ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে সোয়া তিন, সাড়ে তিন ছুঁই-ছুঁই। ধৃতি যখন হাল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আচমকা রিসেপশন কাউন্টারে একটি মেয়ের গলা বলে উঠল, ধৃতি রায় কি আছেন?

মেয়েটা লম্বাটে, রোগাটে, এক বেণীতে বাঁধা চুল। ফরসা? হ্যাঁ, বেশ ফরসা। মুখশ্রী এক কথায় চমৎকার। তবে না, এ আর যেই হোক, টুপু নয়।

রিসেপশনিস্ট কিছু বলার আগেই ধৃতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমিই ধৃতি রায়।

মেয়েটি ধৃতির দিকে চাইল। চমকাল না, বিস্মিত হল না, কোনও রি-অ্যাকশন দেখা গেল না চোখে। তবে একটু ক্ষীণ হাসল।

ধৃতি কাউন্টার পেরিয়ে কাছে গিয়ে বলল, এখানে বসে কথা বলবেন, না বাইরে কোথাও?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আমি তো অণিমা।

অণিমা?

চিনতে পারছেন না? লক্ষ্মণ কুণ্ডু আমার দাদা। আপনার বন্ধু লক্ষ্মণ।

ধৃতি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তাই তো! এ তো অণিমা। উত্তেজনায় সে চিনতেই পারেনি।

কী চাস তুই?

আমি স্বদেশি আমলের একটা পিরিয়ডের ওপর রিসার্চ করছি। লাইব্রেরিতে পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখব। একটু বলে দেবেন?

ধৃতি বিরক্তি চেপে ফোন তুলে লাইব্রেরিয়ানকে বলে দিল। অণিমা চলে গেলে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর রাগে হতাশায় প্রায় ফেটে পড়তে পড়তে উঠে এল নিউজ রুমে। কে তার সঙ্গে এই লাগাতার রসিকতা করে যাচ্ছে? কেনই বা? সে কি খেলার পুতুল?

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর নিজেকে ডুবিয়ে দিল কাজে। কপির পর কাপি লিখতে লাগল। সঙ্গে চা আর সিগারেট। রাগে মাথা গরম, গায়ে জ্বালা।

কিন্তু সারাক্ষণ রূপনারায়ণপুর নামটা ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। গুনগুন করে উঠছে।

ধৃতি রূপনারায়ণপুর গিয়েছিল একবার মাত্র। একজন পলাতক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ধরা পড়েছিল রূপনারায়ণপুরে। সেটা কভার করতে। তখন অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। কারও কথা বিশেষ করে মনে নেই। কিন্তু নামটা গুনগুন করছে। রূপনারায়ণপুর! রূপনারায়ণপুর।

তিনদিন বাদে ইনল্যান্ডে চিঠিটা পেল ধৃতি।

"খুব রাগ করে আছেন তো! থাকুন গে। রাগটুকু আমার কথা সারা জীবন আপনাকে বারবার মনে পড়িয়ে দেবে। আপাতত এটুকুই যা আমার লাভ।

"টুপুর কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করেছি। আসলে তা নিজেরই কথা। আমিই টুপু। যা বলেছি তার একবিন্দু মিথ্যে নয়। দেখা করার কথা ছিল। পারলাম না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

একবার শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ কি বাঁচে? বাঁচলেও আগের মতো আর হয় না।

"রূপনারায়ণপুরে আপনাকে যখন দেখেছিলাম তখন ভীষণ ভাল লেগেছিল। কৌতূহলী, উদ্যমী, সত্যানুসন্ধানী এক সাংবাদিক। উজ্জ্বল, ধারালো, স্ট্রেটকাট। তখন থেকেই আপনার কথা খুব মনে হয়। ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একবার এসে সব বলব।

"এলামও, কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হতে পারলাম না। কেমন বুক কাঁপছিল, ভয় করছিল। জীবনে কখনও তো সত্যিকারের প্রেমে পড়িনি। এই বোধহয় প্রথম। কিংবা অন্য এক আকর্ষণ। নানারকম ছলছুতো করলাম। কিন্তু তাতে আড়াল বাড়ল, ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর।

"মরেই গেছি যখন আর বেঁচে উঠবার আকাঙ্ক্ষা কেন? এর কোনও মানে হয় না। নিজে নষ্ট হয়েছি, আপনাকেও নষ্ট করে দেব হয়তো। সুন্দর মুখের অসাধ্যি কী আছে?

"নেশার কথা যা বলেছি তার সবটা সত্যি নয়। হ্যাস খেয়েছি, মদও। নেশা করিনি। কিন্তু অভ্যাস আছে। আর বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা অত ব্যাখ্যা করে হবেই বা কী?

"সেদিন তিনটের সময় গিয়েছিলাম কিন্তু। রিসেপশনের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। খুব ভিড় ছিল। আপনি আমাকে লক্ষ করেননি। চিনতেও পারতেন না। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ চোখ ভরে আপনাকে দেখলাম। খুব উদ্‌বিগ্ন, রাগী, উত্তেজিত। মনে মনে হাসছিলাম। আর বুকের মধ্যে সে কী দপদপানি!

"পায়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করবেন। আর কিছু চাই না।

"কাছে আসতে পারলাম না, সে আমারই ক্ষতি। আপনার কিছুই হারায়নি। এ দুঃসহ জীবন বহন করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটা স্বপ্ন অন্তত চাই। মিথ্যে হোক, তবু চাই। আপনাকে স্বপ্ন করে নিলাম।

"রাগিয়েছি, ভাবিয়েছি, হয়রান করেছি বলে একটুও দুঃখিত নই। বেশ করেছি। আবার যে হাত গুটিয়ে নিলাম, নিজেকে সরিয়ে নিলাম সেইটেই কি কম?

"ভাল থাকবেন।

"কী জানাব আপনাকে বলুন তো? ভালবাসা? প্রণাম? শুভেচ্ছা? যাঃ সবটাই ভারী কৃত্রিম। তার চেয়ে কিছু জানালাম না। জানানোর কী আছে?

"আসি।"

ধৃতি একবার পড়ল। দু'বার। চিঠিটা সে ফেলে দিতে পারত দুমড়ে মুচড়ে। পারল না।

তবে দিনটা তার আজ ভাল গেল না। বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। চিঠিটা তাকে আরও বহুবার পড়তে হবে সে জানে। গভীর রাত্রে, শীতে বা বৃষ্টিতে, দুঃখে বা আনন্দে, একটা মানুষ যে কত সাবলীলভাবে চিঠি হয়ে যায়!